মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার

॥ হীরক খণ্ডের সূচী ॥

(এই ১০টি বিখ্যাত উপন্যাসের আলাদা দাম ৯৫ টাকা

একত্রে বিশেষ হ্রাস মূল্য ৪৫ টাকা)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

হীরক খণ্ড সম্পর্কে

'পূর্ব' পরিকল্পনা মতো মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভারের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হোল। সুবর্ণ ও রজত খণ্ডের 'পশ্চাৎপটে' আগেই জানানো হয়েছে 'হীরক খণ্ড' (শেষ খণ্ড) পরে বেরুবে। পাঠক—পাঠিকাদের উৎসাহে, মাত্র দেড় বছরের মধ্যে 'হীরক খণ্ড' প্রকাশ করা সম্ভব হল। ছোট, বড় মিলিয়ে মনোজ বসু প্রায় তিরিশটির উপর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন। ছোট আকারের উপন্যাস ২০টির ও বেশি। **এর মধ্যে বাছাই করা ১০টি উপন্যাস সংকলিত হোল** সাহিত্য-রসিক গুণীজনের সঙ্গে পরামর্শ করে। এই ১০টি উপন্যাস তার বিষয়বস্তু ও রচনা-শৈলীর গুণে বাংলা সাহিত্যের ১০টি হীরক খণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়।

তবুও অতৃপ্তি থেকে গেল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস স্থানাভাব হেতু বাদ পড়ায়। উৎসাহী পাঠক এগুলি পড়লেই আশাকরি আমার সঙ্গে একমত হবেন। বেশির ভাগই আলাদা বই আকারে পাওয়া যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বইগুলি হোল :—

জলজঙ্গল; শত্রুপক্ষের মেয়ে; সেতুবন্ধ; বৃষ্টি বৃষ্টি; (সাজ বদল; বকুল; সবুজ চিঠি, তিনটি তারার আলো গ্রন্থে সংকলিত) পথ কে রুখবে?; সৈনিক; অগষ্ট, ১৯৪২; বাঁশের কেল্লা ইত্যাদি।

মনীষী বসু

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি
আলোকচিত্র : মোনা চৌধুরী

প্রকাশক : মনীষী বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : ভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

অনুজপ্রতিম কথাকার

শ্রীমান সন্তোষকুমার ঘোষ

পরম স্নেহাস্পদেষু

—এক—

কাপাসদা'র দীঘির কথা শোনেন। এই—তেপান্তর জুড়ে আছে। চাঁপাতলায় বাঁধাঘাট। আর আজকের দশা দেখুন। চাতাল ফেটে হাঁ হয়ে আছে। আস্ত একটা মানুষ ঢুকে যায়। শেয়ালকাঁটার জঙ্গলে পা ফেলতে পারবেন না। পা ফেলতে আসেও না কেউ এখানে। পশ্চিম পাড়ের বাঁড়ুয্যেপাড়া একেবারে নিশ্চিহ্ন। ঠাকুর-বাড়িতে ঠাকুর গোপালের নিরম্বু উপোস যাচ্ছিল, তারপরে কে বুঝি হিন্দুস্থানের পারে তুলে নিয়ে গেছে। উত্তর পাড়ের কামারপাড়াটা টিমটিম করছে কোন রকমে। তা-ও কি থাকবে? কামারশালা তো এখনই গেছে। লোহা পেটানোর শক্তসমর্থ জোয়ান-পুরুষ সবাই ওপারে। আছে গোটাকতক বুড়োবুড়ি শ্মশানের দিকে মুখ তাকিয়ে। দীঘিতে তাদের আসতে হয়। চাঁপাতলার বাঁধাঘাটে নয়—খানিকটা দূরে তালের গুঁড়ি বসিয়ে হিঞ্চেকলমীর দাম কেটে আলাদা ঘাট করে নিয়েছে। গুঁড়ির উপর বসে বাসন মাজে, ঘটি ভরে জল তুলে তুলে মাথায় দেয়। নেমে স্নান করবার জো নেই, গাদের মধ্যে কোমর অবধি বসে যাবে।

আমার গল্পের শুরু আগের আমলে। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল, তার অনেক আগে। শান-বাঁধানো ঘাট তখন ঝকঝক করে। তারা কামারনীর মেয়ে টুনিমণি সকালবেলা এসে ঝাঁটপাট দেয়। তারপরে মন হল বা বঁটি পেতে পাকা তেঁতুল কুটতে বসে। কিংবা বড়ি দিয়ে আধপাগলি মা'কে কাক তাড়াতে বসিয়ে দিয়ে গেল। ঠাকুর গোপালের সঙ্গে তারা কামারনীর বড় ঝগড়া। করকর করে কোন্দল করে ঠাকুরের সঙ্গে, আর উত্তেজনার মুখে লাঠির ঘা মারে চাতালের উপর। ঠাকুরের কী হয় জানা নেই, কাকে কিন্তু বড়িতে ঠোকর দিতে সাহস পায় না। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় চাঁপাগাছের ডালে ডালে স্বর্ণচাঁপা ফোটে। মিত্তিরপাড়া বাইতিপাড়া জোয়াদ্দারপাড়া থেকেও গিন্নিবান্নি মেয়েবউরা এত দূরে আসে জল নিতে। ঢেউ দিয়ে জলের উপরের ভাসন্ত কুটোকাটা সরিয়ে কলসিতে জল ভরে। ভকভক ভকভক করে অমন তিন-চার কলসি একসঙ্গে ভরা হচ্ছে। চাতালের উপর কলসি বসিয়ে নিজেরা পাশে জুত করে বসল। আর কতক জলে নেমে তখনো গা ধুচ্ছে। ডাল বাঁকিয়ে ধরে চাঁপাফুল পাড়ে কমবয়সি কেউ কেউ। শখের প্রাণ—খোঁপায় ফুল গুঁজে বাহার করবে।

কী রাঁধলে দিদি ও-বেলায়?

মোচার ঘণ্ট আর পুঁটিমাছের ঝোল। কী ছাই রাঁধি বল। জিনিসপত্তর আগুন। খাওয়াদাওয়া উঠে গেল এবারে। আটটা প্রাণীর ওই তো একফোঁটা সংসার—তা দু-পয়সার মাছে একটা বেলাও হয় না।

মাছ দেখছ তুমি—এর পর ভাতই তো জুটবে না। পাঁচ টাকা মনের চাল ক-জনে কিনে খাবে?

সুখ-দুঃখের কথাবার্তা এমনি নানান রকম। এপাড়া-ওপাড়ার রকমারি খবরাখবর। আপাতত সকলের বড় খবর, মিত্তিরপাড়ার তড়িৎকান্তি মিত্তিরের ছেলে হীরককান্তির বিয়ে হয়ে গেল খুব জাঁকজমক করে। গাঁয়ের সেরা ছেলে হীরক, কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। স্টেশন থেকে বাজিবাজনা করে বউ বাড়ি এনে তুলল, বউভাত-ফুলশয্যা গিয়েছে কাল।

হতে হতে সেই নতুন বউয়ের কথা উঠল। পূর্ণ জোয়াদ্দারের মেয়ে শেফালী

মুখ বেঁকিয়ে বলে, মাগো মা, দেখেছ সে বউ? সাঁড়াগাছের পেত্নী। গাছ থেকে যেন সদ্য নেমে এল।

দক্ষ-পিসি ঘাড় নাড়লেন: না রে, এমন-কিছু নিন্দের নয়। চোখ দুটো ছোট, কপালটা ভিটের মতন। কিন্তু গড়নপেটন বেশ ভালই।

শেফালী বলে, কোন চোখ দিয়ে দেখে এলে বল দিকি পিসি?

টুনিমণি বলে, দেখলাম তো আমিও। দিব্যি গায়ের রং। দুগ্গা-প্রতিমার মতো মুখখানা জ্বলজ্বল করছে।

না হবে কেন? কলকাতার মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে। দামি সাজগোজ করে, গায়ে মুখে নানান রকম সব মাখে। ফুলশয্যার সময় পটের পরী হয়ে বসে ছিল। আবার যখন চান করে উঠবে, দেখে এস তো সেই সময় গিয়ে। পরী আর নেই, দাঁড়কাক হয়ে গেছে।

দক্ষ-পিসি হাসেন। ঘাটের আরও অনেকে হাসে মুখ টিপে। হীরকের উপর শেফালীর রাগ। রাগের ঝাল সে নতুন বউয়ের উপর ঝাড়ছে। হীরক বরাবরই মাতব্বর। বছর কয়েক আগে সেই এক কাণ্ড হয়ে গেল। শেফালী একেবারে ছোট তখন—কী জানি কোন ঝোঁকের বশে প্রেমপত্র লিখেছিল সে গঙ্গেশের নামে। গঙ্গেশও ছেলেমানুষ। চিঠিটা গঙ্গেশের কাছে পৌঁছবার আগেই হীরকের হাতে পড়ে গেল। পাঠচক্র করেছে হীরক—প্রতি রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়া হয়। নৈতিক বেচাল তিলেক মাত্র দেখলে সে ক্ষেপে যায়। শেফালীকে যাচ্ছেতাই করে বলল। মেয়েদের সাঁতারের প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, শেফালী তার থেকে বাদ। গ্রামময় চাউর হল ব্যাপারটা। জোয়ার্দ্দার মশায়ের কানে উঠতে মেয়েকে খুব মারলেন তিনি। সেই রাগ শেফালী আজও পুষে রেখেছে।

টুনিমণি বলছে, তা বেছে বেছে চানের পরেই বউ দেখতে যেতে হবে, তার মানেটা কি শিউলি-দিদি? আলগা শ্রী-ছাঁদ আছে, সেই তো ঢের।

শেফালী সেই স্বরের অবিকল অনুকৃতি করে কেটে কেটে বলে, বটেই তো! দুটো হাত আছে, দুটো পা আছে, মাথা আছে, নাক আছে—সেই তো ঢের। শ্বশুর ডাক্তারি পড়ার ষোলআনা খরচা জোগাবে, শ্বশুরবাড়ি থেকে পড়বে। তড়িৎ-জ্যেঠা হিসাবি মানুষ, জমাখরচ খতিয়ে দেখে তবে বিয়ে দিয়েছেন। ওকি রে—অ্যাঁ?

উলু, উলু, উলু, উলু—

উলুধ্বনি আসে দূর থেকে। কথাবার্তা থামিয়ে ঘাটের মানুষ কান পেতেছে। কোন্ দিক থেকে আসে? কী হল কার বাড়িতে? পাড়ার কোন বাড়ি কে পোয়াতি, মোটামুটি খবর জানা আছে। উলুটা আসছে কাদের বাড়ি থেকে রে? ক'ঝাঁক উলু, গণে যাও। মেয়ে হলে তিন ঝাঁক, ছেলে হলে সাত কিংবা নয়। মেয়ে হওয়া দুঃখের ঘটনা, উলু দিয়ে রীতরক্ষা। ছেলের জন্মে আনন্দ।

কিন্তু নয় দশ এগার বার—উলু যে বেড়েই চলল। আ মরণ! দক্ষ-পিসিমা এক গাল হেসে ফেলেন: কী তোমরা গোণাগুণি করছ। রাধি পোড়ারমুখী। মনে কিসে পুলক লেগেছে, কলকল করে এপাড়া ওপাড়া উলু দিয়ে বেড়াচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের মেয়ে রাধি—রাধারাণী। দীঘির ওই পশ্চিম পাড়ে বাঁড়ুয্যে-পাড়ায় বাড়ি। সর্বক্ষণ রাধির উল্লাস। সময় সময় উল্লাসের বান ডেকে যায়, উলু হয়ে খানিকটা বেরিয়ে পড়ে।

টুনিমণি বলে, গলা ঠিক শানাইয়ের মতো মিঠে। যেন নবদ্বীপ-জোর তান ধরেছে।

দক্ষ-পিসি বলেন, দেখতেও লক্ষ্মী-ঠাকরুনটি। বয়সকালে ওর মা-ও ডাকসাইটে রূপসী ছিল। ঠাকুর গোপালের দুয়োর ধরে মেয়ে পেয়েছে। ছেলে চেয়েছিল অনেক করে। ছেলে না দিয়ে ঠাকুর কোল খালি করে নিজের ঠাকরুনটি দিয়ে দিলেন।

ঘোড়া যেমন কদমের চালে লাফ দিতে দিতে ছোটে, উলু দিয়ে তেমনিভাবে রাধারাণী ঘাটে এসে পড়ল। হাঁটনাই এই রকম, রয়ে সয়ে দেখেশুনে হাঁটে না।

জলের কলসি এক ঝাঁকিতে কাঁখে তুলে শেফালী ফরফর করে চলে গেল। আড়চোখে দেখে নিয়ে রাধি বলে, কে যায়—ভালবাসা বুঝি?

শেফালীর সেই পুরাণো রাগ রাধির উপরেও। হীরকের পয়লা নম্বর সাগরেদ রাধি—প্রেমপত্র রাধিই চুরি করে হীরককে দিয়েছিল, শেফালীর এই ধারণা। তুমুল ঝগড়াঝাটি সেই নিয়ে। খারাপ মেয়ে বলে রাধি অন্যদের মানা করেছিল শেফালীর সঙ্গে মিশতে। প্রেমপত্রে বানান ভুল করে 'ভালবসা' লিখেছিল, তাই নিয়ে আজও ঠাট্টা-তামাসা চলে—শেফালী নামের বদলে ওরা সব বলে 'ভালবসা'।

দক্ষ-পিসি বলেন, গিয়েছিলি কোথা রাধি?

হাত ঘুরিয়ে রাধি বলে, ওই তো মিত্তিরপাড়ায়। হীরক-দা'র বাড়ি থেকে আসছি। আবার যাব।

মিত্তিরপাড়াটা যেন একেবারে চোখের উপর দেখা যাচ্ছে।

দক্ষ-পিসি বলেন, রাত্তিরবেলা ম্যাচম্যাচ করে একলা অন্দুর যাস, ভয় করে না? এই বয়স, এই চেহারা তোর—

শ্মশানঘাটের কুলগাছে শাকচুন্নিরা থাকে তো—হীরক-দা'র কাছে বাজি রেখে সেই কুলের ডাল ভেঙে এনেছিলাম শোন নি পিসি?

দক্ষ-পিসি স্নেহস্বরে বলেন, তুইও শাকচুন্নি একটা। মানুষ হলে এমন করে বেড়ায় না। কিন্তু ওনাদের না মানিস, মা-মনসাকে মানবি তো? কাঁচাখেগো দেবতা।

রাধি হেসে বলে, তাই তো শব্দসাড়া করে যাচ্ছি। উলু দিই কি জন্যে? দু-পেয়ে জীবকে সবাই ভয় করে। সাপ হোক বাঘ হোক, দু-পেয়ের সাড়া পেলে ঠিক সরে যাবে।

চাঁপাফুল পাড়ছে রাধি। আগে মাটিতে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে দেখল। তারপরে হতভাগা মেয়ে করল কি—কোমরে আঁচল বেঁধে বিশাল চাঁপাগাছের মাথায় তরতর করে উঠে পড়ল। ফুল ভেঙে ভেঙে ফেলছে, নেমে এসে কুড়োবে।

টুনিমণি বলে, রাধি-মাসি, আর জন্মে তুমি হনুমান ছিলে।

রাধি বলে, মিত্তিরবাড়ি নতুন বউয়ের সঙ্গে ভাব করে এলাম। খাসা মানুষটা, বড় মিষ্টি কথাবার্তা। চাঁপাফুল পাতাব তার সঙ্গে। দুটো মালা চাই—ওর গলায় আমি একটা দেব, আমার গলায় ও একটা দেবে। ছড়াটা কী যেন পিসিমা?

ফুল পেড়ে নিয়ে রাধি বাড়ি গেল। দুটো মালা গাঁথা শেষ করতে দেরি হল অনেকটা। একটা গলায় পরেছে, আর একটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল।

মিত্তিরপাড়া পথ কম নয়। বাইরের ঘরে হীরক গুলতানি করছিল সমবয়সি ক'জনকে নিয়ে। ওদিকে নয়—হীরক-দা'র সামনে পড়বে না এখন, দেরি হয়ে যাবে। টিপিটিপি রাধি ভিতর-বাড়ি চলল।

চলে গেল নতুন বউয়ের ঘরে। বউয়ের নাম ভক্তিলতা। কালকের অত উৎসবের পর ঘর এখন ঝিমিয়ে আছে। হেরিকেন সামনে নিয়ে ভক্তিলতা চিঠি লিখছে একমনে। পা টিপে টিপে পিছনে গিয়ে রাধি গলার মালা খুলে ঝুপ করে বউয়ের গলায় ছুঁড়ে দিল।

কলকাতার মেয়ে আচমকা ভয় পেয়ে আঁতকে উঠল। রাধি খিলখিল করে হাসে। হেসে চাঁপাফুল পাতানোর ছড়া বলেঃ সাক্ষি লতা সাক্ষি পাতা সাক্ষি পাখপাখালি, আজ হইতে তুই আমার চাঁপাফুল হলি। এবারে এই মালাটা তুই আমার গলায় দে, গলায় পরিয়ে দিয়ে ছড়াটা বল্—

কতকাল আগের কথা। সেই দীঘি। চাঁপাগাছটাও খাড়া আছে, বাড়বাড়ন্ত নেই। একটা ফুল ফোটে না। দীঘির পশ্চিম পাড়ে মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের ভিটার উপর রাধি আজ মারা গেল। মড়া গাঙে ফেলে দিতে গেছে, তবু উঠোনে কালকাসুন্দের ঘন জঙ্গলে পাতিশিয়াল খ্যা-খ্যা করে কামড়াকামড়ি লাগিয়েছে।

গোড়া থেকে বলি তবে শুনুন।

= দুই =

রাধারাণীর বাপ মৃত্যুঞ্জয় গাঁয়ে এসে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন অনেকদিন। জয়ঢাকের মতন উদর। পাড়ার লোকে বলে, বিস্তর পয়সা খরচ করে ওই ঢাকখানা বানানো। পোস্টমাস্টার ছিলেন দীর্ঘকাল, নানান জায়গায় বদলি হয়ে বিস্তর ঘাটের জল খেয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় তাতে খুশিই ছিলেন। যত বেশি জায়গায় বদলি করত, তত খুশি। শুধুমাত্র জল খাওয়া নয়, রকমারি খাদ্য খাওয়া যেত। সেই তল্লাটের মিষ্টি-মিঠাই মাছ-মাংস দুধ-ঘি তরিতরকারি যত কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু—সমস্ত সংগ্রহ করে বাসায় আনতেন। সরকারি কাজটা রুজি-রোজগারের; আসল কাজ হল ওই সমস্ত। গাঁয়ের লোক দুখানা খাম-পোস্টকার্ড কিনতে এসেছে, তাকেও বসিয়ে খবরাখবর নিতেন কার বাড়ি কী ভাল জিনিস পাওয়া যাবে। হাটবারের দিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে হাটে গিয়ে চেপে বসতেন। জেলে-নিকারিরা অল্প দিনেই চিনে ফেলত তাঁকে। একটা ভাল মাছ এসেছে, খদ্দেরে ঝুঁকে পড়ে দর জিজ্ঞাসা করছে—তারা জবাবই দিতে চায় নাঃ এ জিনিস টেপাটেপি করে কেনা যায় না মশায়। পোস্টমাস্টার বাবুর জন্যে এনেছি। আসুন তিনি, দেখতে পাবে। ঠিক তাই। মৃত্যুঞ্জয় এসেই বিনাবাক্যে মাছটার কানকো ধরে খালুইতে তুলে নিলেন। দরের কথা পরে। নিত্যদিনের খদ্দের—দরও কেউ বেশি নেয় না তাঁর কাছে।

যত বয়স হচ্ছে এবং মাইনে বাড়ছে, খাদ্যের বোঝা ততই বেশি বেশি চাপছে। যাবতীয় স্বাস্থ্য শেষটা উদরে গিয়ে ভর করল। অচল হয়ে পড়ছেন দিনকেদিন। পেন্সন ছেড়ে থোক টাকা নিয়ে তখন কাপাসদা'র পৈতৃক-বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কাজকর্ম কিছুই পেরে ওঠেন না, একটি ক্ষেত্রে শুধু ক্ষমতা ষোলআনা বজায় আছে—খাওয়া। শুয়ে শুয়েও যা টানেন, দু-তিন মরদে লজ্জা পেয়ে যাবে।

দীর্ঘকাল এ হেন স্বামীর পরিচর্যা করে মনোরমারও ভাল খাওয়ার অভ্যাস। সর্বক্ষণ রান্নাঘরে পড়ে থাকেন। রাধি ছাড়া আরও তিনটে মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু এমন খাদ্যসুখের ঘরে জন্ম নিয়েও পোড়া অদৃষ্টে বেঁচে থাকতে পারল না। চার সন্তানের

আহারের দায় অতএব একলা রাধির উপর বর্তেছে। পরিমাণে সে বেশি খায় না, কিন্তু বারম্বার এবং বহু রকম খেতে হয় তাকে। খায় আর নেচেকুঁদে বেড়ায়। আদুরে মেয়েকে কেউ কিছু বলেন না। স্বাস্থ্য আর রূপ তাই এমনধারা। রূপ কেবল গায়ের রঙে নয়—হাতের নখ, এমন কি মাথার চুলও যেন রূপে রূপে ঝিলমিল করে।

কিন্তু এবারে মৃত্যুঞ্জয় আহার ও প্রীহার মায়া কাটাচ্ছেন। তাতে আর সংশয় নেই। জল-বার্লি ছাড়া কিছু পেটে তলায় না—একগুণ খেলেন তো তিনগুণ বেরিয়ে এল। খাওয়ার জন্যে জীবন-ধারণ, সেই খাওয়ার শক্তি গেল তো জীবনের আর মূল্য কী রইল? মরা-বাঁচার ব্যবস্থায় মৃত্যুঞ্জয়ের যদি হাত থাকত, নিজের ইচ্ছাতেই তিনি সরে যেতে চাইতেন—ডাক্তার-কবিরাজের এই ছেঁড়াছেঁড়ি হতে দিতেন না।

খবর পেয়ে মনোরমার বড় ভাই হারাণ মজুমদার এসে পড়লেন। তিলডাঙায় বাড়ি, রেলে যেতে হয়। পাটোয়ারি মানুষ—পেশা বিষয়কর্ম, অর্থাৎ এর পিছনের আঠা ওর পিছনে লাগিয়ে কলে কৌশলে দুটো পয়সা বের করে নেওয়া। হয়ে থাকে ভালই। পৈতৃক যা পেয়েছিলেন, বাড়িয়ে গুছিয়ে তার দশগুণ করেছেন। তিন কুঠুরি দালানও দিয়েছেন সম্প্রতি।

চুপি চুপি হারাণ বোনকে প্রশ্ন করেন, রেখে যাচ্ছে কি রকম?

সে তো জানি নে। বুঝিও নে কিছু। তুমি এসেছ, দেখ এইবারে সমস্ত।

রোগি মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পর্কে দেখবার আর কিছু নেই। সামনের একাদশী অবধি টিঁকে যান তো ঢের। মনোরমা আলমারির চাবি দিয়ে দিলেন, যাবতীয় কাগজপত্র বের করে হারাণ খতিয়ে দেখছেন। অল্পস্বল্প জমাজমি—রিটায়ার করবার পর তারই উৎপন্ন ছিল ভরসা। জমির ধান এনে এনে খেয়েছেন, কিন্তু খাজনার বাবদে পাইপয়সাও ঠেকান নি মৃত্যুঞ্জয়। ডিক্রি হয়ে আছে কতক, নিলাম হয়ে গেছে বেশির ভাগ জমি।

শুধুই খেয়েছেন দেখছি বাঁড়ুয্যে মশায়। মাছ-শাক কেবল নয়—বিষয়আশয় সমস্ত। বাস্তুভিটে দু-দশটা গাছগাছালি আর দেড় বিঘে ধানজমি—এই তোদের সম্বল। পেন্সনও বিক্রি করে পেটে দিয়েছেন। ক'খানা কাগজ কিনেছিলেন তোর নামে—তাই কেবল খেতে পারেন নি।

মনোরমা বলেন, তা-ও খেয়েছেন। সবগুলো পেরে ওঠেন নি। চিরকালের খাইয়ে মানুষ—খেতে চাইলে আমি না বলতে পারতাম না। কাগজ এক একখানা করে বের করে দিয়েছি। ওই ক'খানা রয়ে গেছে খাওয়ার এখন আর জো নেই বলে। হয়তো রাধির কপালে—তার বিয়ের খরচখরচা। ঠাকুর গোপাল সদয় হয়ে ও ক'টা টাকা থাকতে দিলেন।

রাধারাণী কাছাকাছি ঘুরছিল। সেইদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হারাণ ঘাড় নাড়লেন, নাঃ মেয়ের বিয়েয় তোর এক পয়সাও লাগবে না মনো। লুফে নেবে। বলিস তো উল্টে কিছু উশুল করেও আনতে পারব বরের ঘর থেকে।

মনোরমা বলেন, সে তো পরের কথা। এখনকার কি ব্যবস্থা—খাই কি, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে থাকি কোথায়—সেই ভাবনা ভাব এইবার দাদা। অবস্থা চোখের উপরেই তো দেখতে পাচ্ছ।

যা হবার তাই ঘটল। মৃত্যুঞ্জয় মারা গেলেন। যে কষ্টটা পাচ্ছিলেন—কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দিনরাত্রি চোখের কোণে জল গড়াত—মরে যেন বেঁচে গেলেন তিনি।

ক'দিন পরে ভাই-বোনে আবার সেই প্রসঙ্গ উঠল : রূপসী মেয়ে বলছ দাদা, আমার বুক কাঁপে। মেয়ের গায়ে যে রূপের জলুনি! দিনকে দিন দাউদাউ করে উঠছে!

দালান-কোঠার মধ্যে পাইক-দরোয়ানের পাহারায় রেখেও লোকের ভয় কাটে না। বিধবা-বেওয়া মানুষ আমি কোন সাহসে একা একা ওকে নিয়ে ভিটের ওপর থাকি ?

হারাণ লোক খারাপ নন। এসব তিনি ভাবছেন এই ক'দিন ধরে। বললেন, আমার ওখানে চল তোরা। বোন-ভাগনীকে ফেলে দিতে পারি নে। দালান-কোঠার কথাটা যখন বললি, দালানের মধ্যেই রাখব। মোহিত বউমাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করল, তার কুঠুরিতে থাকবি তোরা।

আবার বলেন, আমার কিন্তু হিসাবি সংসার। খাউন্তি-দাউন্তি মানুষ তোরা— তোর খাওয়া তো বিধাতা ঘুচিয়ে দিলেন, কিন্তু রাধি পারবে তো মামার বাড়ির খাওয়া খেয়ে ?

এখানে কোন খাওয়াই তো জুটবে না। দেড় বিঘের ধানে ক'মাস চলবে বল। আমরা ছাড়াও তারা কামারনী আর তার মেয়ে। তারা ওঁকে ধর্মবাপ বলেছিল, উনি আশ্রয় দিয়ে গেছেন। চোখ বুঁজতে বুঁজতে দূর করে দিতে পারি নে তো! খাওয়ার কথা কী বলছ দাদা, সেসব সেই মানুষটার সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

এমন অবস্থার মধ্যেও হারাণ সগর্বে একবার গোঁফ চুমরে নেন ঃ তবেই বোঝ আখের ভেবে কাজ না করার ফল। বাঁড়ুয্যে মশায়ের সম্বন্ধে ভাবতিস, অমন ধনুর্ধর স্বামী হয় না। স্বর্গে পা ঠেকাতে না ঠেকাতে এক্ষুণি আবার উল্টো সুর ধরেছিস। আর আমারও দেখবি। বাড়ির লোকে সর্বক্ষণ খিচখিচ করে, পারলে আমায় দাঁতে ফেলে চিবাত। আমি কঞ্জুষ, না খাইয়ে রাখি আমি সকলকে, ছেলে-বউ না-খাওয়ার দুঃখে কলকাতা পালাল। কিন্তু বলে রাখছি, আমি যখন চোখ বুঁজব, ওই ছেলে-মেয়েরা স্ফূর্তিতে বগল বাজাবে ঃ এমনধারা বাপ হয় না—পেটে না খেয়ে পুঁটিমাছের পোঁটা গেলে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে রেখে গেছে।

— তিন —

হারাণ মজুমদারের স্ত্রী শান্তিবালাও ভাল। গরুর গাড়ি দক্ষিণের ঘরের পৈঠার নিচে এসে থামল। গাড়োয়ান গরু দুটো খুলে বেড়ার জিওলগাছের সঙ্গে বেঁধেছে। সকলের আগে হারাণ গাড়ি থেকে নামলেন। রান্নাঘরে হলুদ বাটতে বাটতে শান্তিবালা তাকাচ্ছেন ঘাড় বাঁকিয়ে।

হারাণ বলেন, কাপাসদা থেকে চুকিয়েবুকিয়ে এল।

হলুদের হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে শান্তিবালা উঠনে এলেন। রাধি প্রণাম করতে যায়।

একি রে! অশৌচের মধ্যে প্রণাম করে নাকি ?

জড়িয়ে ধরলেন তাকে। কোলের ভিতর নিয়ে চেঁচামেচি করছেন ঃ মেয়েরা গেলি কোথায় ? চলে আয়, সোনার প্রতিমা কাকে বলে, দেখে যা চক্ষু মেলে।

চার মেয়ে, আরতি বড়। আর ছেলে মোহিত কলকাতায় চাকরি করে, বউ নিয়ে বাসা করেছে। দালানের ভিতর চার বোনে লুডো খেলছিল না কি করছিল, হুড়মুড় করে বেড়িয়ে আসে।

শান্তিবালা বললেন, দিদি হয় তোদের। আরতি, তোর নয়। রাধির তুই দেড় বছরের বড়।

নতুন জায়গায় চেনাজানা করতে রাধির এক মিনিটও লাগে না। বাপের সঙ্গে বাসায় বাসায় ঘুরেছে, আর স্বভাবটাই তার এই রকম। হেসে উঠে সে বলে, এ কেমন হল মামিমা ? অশৌচ বলে আমায় প্রণাম করতে দিলেন না, আমার পায়ে বোনেরা কেন

এসে পড়ে ?

শান্তিবালা বলেন, তবে আসল কথা বলি রে বৌটি। অশৌচ একটা ছুতো। লক্ষ্মীঠাকরুন কার পায়ে মাথা ঠেকাবেন রে ? তাঁকেই সব গড় করবে। স্বয়ং কমলা তুই কন্যে হয়ে এসেছিস। উঠোন আলো হয়ে গেল।

রাধির একটা হাত তুলে চোখের সামনে এনে ধরেন। হাত ছেড়ে দিয়ে মুখখানা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। বলেন, হল্তেলের মতন গায়ের রং। চোখ-মুখ-নাক যেভাবে যেমনটি হলে মানায়। বিধাতাপুরুষ বাটালি ধরে গড়েছেন। তুই আর পাশে দাঁড়াস নে আরতি, বড় উৎকট দেখাচ্ছে।

অগ্নিদৃষ্টি হেনে আরতি সাঁ করে চলে গেল। শান্তিবালার হুঁশ হল তখন। মেয়ে আর ছোটটি নয়, সামনের উপর এমন কথা বলা অনুচিত হয়েছে। যত রাগ গিয়ে পড়ে তখন স্বামীর উপর ঃ যক্ষি হয়ে ধনসম্পত্তি আগলাও, এক পয়সা খরচ করতে বুকের একটা পাঁজরা ছিঁড়ে যায়। চেহারা হবে কিসে মেয়ের ? লাউ-কুমড়োর মাচায় একটা-দুটো বীজ রেখে দেয় না—মেয়ের কপালেও তেমনি হবে দেখো। বিয়ে দিতে হবে না, চিরজীবন ঘরে রেখে পুষবে।

হারাণ হুঁকো-কলকে নিয়ে তামাক সাজছিলেন। মুখ তুলে সদম্ভে বলেন, হয় কি না দেখো। চেহারায় কিছু খামতি থাকে তো পণ দিয়ে তার পূরণ হবে। একটা সম্বন্ধ নাকচ হচ্ছে, আর পণের টাকা দু-শ করে বাড়িয়ে যাচ্ছি। বার-শ অবধি উঠেছে, দেখা যাক কদ্দুর গিয়ে লাগে।

কলকের আগুন দিতে দ্রুত রান্নাঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

শান্তিবালা শুধু বাড়ির মধ্যেই নিরস্ত হচ্ছেন না, পাড়ায় গিয়ে হাঁকডাক করবেন। মুশকিল হয়েছে, রাঁধাবাড়ার সময় এখন, তারপরে আবার খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা। কায়ক্লেশে দুপুরটা না কাটিয়ে উপায় নেই।

দুপুর না গড়াতেই উঠে পড়লেন। পুবের কোঠায় ঢুকে রাধিকে বললেন চল্—

রাধারাণী চক্ষের পলকে অমনি উঠে দাঁড়ায়।

শান্তিবালা হেসে বলেন, মর মুখপুড়ি। কাপড়চোপড় পরবি, সাজগোজ করবি তো একটু।

মনোরমা প্রশ্ন করেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বউ ?

এ পাড়ায়, ও-পাড়ায়। সময় হয় তো খালপারেও একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

মনোরমা বলেন—কপালে জয়পত্তর লিখে সেকালে অশ্বমেধের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তোমার যে দেখি সেই বৃত্তান্ত। বউ তুমি পাগল।

শান্তিবালা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, ইন্দু বলে একটা মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে বড় গরব। আরতিকে একদিন কুচ্ছো করেছিল ইন্দুর মা। এবারে দেখিয়ে আসি, সেই ইন্দু আমার রাধারাণীর পা ধোয়ানোর যুগ্যি নয়।

তা বলে সোমত্ত মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে বেড়ানো কি ভাল ? হারামজাদি মেয়ে তো লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে, তুড়ুক-সওয়ার—বললেই অমনি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার মুখ ছোট হয়ে যাবে না ?

তাই বটে। উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে শান্তিবালার। থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভেবে বললেন, রাধারাণী, তুমি বাড়ি থাক মা। সেজেগুজে একটা চেয়ারের উপর রাণী হয়ে বসে থাক। যাদের ইচ্ছে হবে, বাড়ি এসে দেখবেন। পাড়ায় কী জন্যে যেতে যাবে তুমি ?

মাথায় সত্যিই ছিট আছে শান্তিবালার। একপাক ঘুরে বাড়ি ফিরে এলেন। কী সব রটনা করে এসেছেন—তারপরে দেখা যায়, গিন্নিবান্নিরা আসছেন দু-একজন করে। গিন্নিরা ফিরে গিয়ে বলছেন তো বউ-মেয়েরা আসছে। পুরুষও কয়েকজন একটা কোন দরকার মুখে নিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেলেন। শান্তিবালা বসতে বলছেন তাঁদের, আসন দিচ্ছেন, পান দিচ্ছেন, জল দিচ্ছেন। তারই মধ্যে সগর্বে একবার বা তাকিয়ে নিলেন মনোরমার দিকে।

নিরিবিলি পেয়ে এক সময় মনোরমা বলেন, রূপ নিয়ে জাঁক করছ বউ, এসব কিন্তু ভাল নয়। আমার গা কাঁপে।

শান্তিবালা বলেন, রূপ হল ভগবানের দান। ক'জনে পায়? পেয়েছে যখন কেন জাঁক করব না। হাঁকডাক করে সকলকে দেখিয়ে বেড়াব ঠাকুরঝি।

মাসখানেক পরে আরতিকে দেখতে এসেছে একদল। পাঁচজন তাঁরা, সবাই প্রবীণ। সম্বন্ধটা সত্যি ভাল—এক বছরের উপর চিঠি লেখালেখি হচ্ছে। হারাণ নিজে বার দুয়েক গিয়ে খোশামুদি করে এসেছেন। নিয়মদস্তুর গয়নাগাঁটি ও বরসজ্জা ছাড়াও নগদ বরপণ বার-শ' টাকা। তা সত্ত্বেও পাত্রপক্ষ গা করেন না। মেজাজ হারিয়ে হারাণ তখন এক সঙ্গে তিন-শ' তুলে পণ পুরোপুরি দেড় হাজার হেঁকে দিলেন। তারপরেই এসেছেন এঁরা। আদর-আপ্যায়ন যথোচিত গুরুতর হয়েছে, জলখাবার খেয়েই কুটুম্বরা বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। আসন পেতে মেয়ে এনে বসাল কর্তব্যবুদ্ধির চাপে তখন উঠে বসতে হল।

পাত্রের বাপ স্বয়ং আরতিকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, আর একটা মেয়ে দেখলাম মজুমদার মশায়। আমাদের জলখাবার দিচ্ছিল।

আমার ভাগনী।

সে মেয়েও দিব্যি বিয়ের মত হয়েছে। স্বাস্থ্যশ্রীর দিক দিয়ে তার বিয়েই বরঞ্চ আগে হওয়া উচিত।

হারাণ হাত ঘুরিয়ে বলেন, হলে হবে কি! ভাঁড়ে মা ভবানী। বাপ মরার সময় শুধু ওই মেয়ে রেখে গেছেন। আর গোটা দশেক খাজনার ডিক্রি।

পাত্রের বাপ বললেন, খাসা মেয়েটা। সোনার প্রতিমা।

হারাণ বিরক্ত স্বরে বললেন, আমার মেয়ে আরতিকে কেমন দেখলেন তাই বলুন।

শুধু চোখের দেখায় তো হবে না। কুষ্ঠিটা দিয়ে দিন। মিলিয়ে দেখা হবে। তারপরে খবর দেব।

কুষ্ঠি নেই।

তাহলে জন্মপত্রিকা—কোন তারিখ কোন সময় জন্মেছে, সেইটে পেলেই হবে।

হারাণ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন, মেয়ে পছন্দ হয় নি তবে?

সে কী কথা! পছন্দ হলেও তো কুষ্ঠি চাই। মেয়ের বিয়ে দেবেন অথচ কুষ্ঠি নেই—পাকা লোক হয়ে এটা কি রকম হল মজুমদার মশায়?

পাকালোক বলেই তো ওদিকে গেলাম না। যারা বোঝে না, তারাই গণককে গচ্চা দিয়ে মরে। বিয়ের মেয়ের কুষ্ঠি লোকে আটঘাট বেঁধেই করে। কুষ্ঠি থাকলে দেখতে পেতেন, রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া আর আরতি হুবহু এক লগ্নে জন্মেছে। তবু কিন্তু মিল হত না। তার চেয়ে সোজাসুজি বলে দিন দোষটা কি দেখলেন আমার মেয়ের।

ভদ্রলোক ভিবে থেকে দুটো পানের খিলি মুখে পুরে নীরবে চিবাতে লাগলেন। আরতি উঠে গেল ভিতরে। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, স্পষ্টই বলি তবে। মেয়ের রং কাল। গোড়াতেই বলেছি, কাল মেয়ে হলে চলবে না।

হারাণ বলেন, কোন চোখ দিয়ে দেখলেন বলুন তো। আমার মেয়ে কাল বলেন তো ফর্সা মেয়ে বাংলা মুলুকে পাবেন না। বিলেত থেকে জাহাজে বয়ে আনতে হবে।

ভদ্রলোক বলেন, কেন, ওই যে ভাগনী আপনার। ফর্সা ওকেই বলে।

অমন লাখে একটা। রফা করে হারাণ বলেন, বেশ, ভাগনীকেই তবে নিয়ে নিন। সে-ও আমার দায়। হলে বুঝব, আপনার পিছনে বছর ভোর ঘোরাঘুরি মিছে হয় নি।

বেশ তো। বলে ভদ্রলোক পায়ের উপর পা তুলে আঁটোসাটো হয়ে বসলেন: আপনার ভগ্নিপতি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। সেই বিবেচনায় চার-শ' পাঁচ-শ' কম করে নেওয়া যাবে। কি বল হে?

বলে সমর্থনের জন্য পাশের পরিষদটির দিকে তাকালেন।

হারাণ মজুমদার ঘাড় নাড়ছেন: উঁহু শুধুমাত্র শাঁখা-শাড়ি। সেই শাঁখা আর শাড়ির খরচাটা মশায় বহন করলে ভাল হয়। পুরুতের দক্ষিণাও মশায়ের। যে ক'জন বরযাত্রী আসবে, হিসেবপত্তর করে তাদের খোরাকি সঙ্গে আনবেন। সোনার প্রতিমা ঘরে নিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়।

অধিক কথা না বাড়িয়ে পাত্রপক্ষ এর পর উঠে পড়লেন।

আরতি সেই গিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে বিছানার উপর। ভাল কাপড়-চোপড় পরে গয়নাগাঁটি গায়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় অমনি পড়েছে। কেউ কিছু বলতে গেলে ঝেঁকে ওঠে। উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, শান্তিবালা জোর করে তুলতে গিয়ে দেখেন মেয়ের চোখে জল। চোখের জল দেখে মায়ের প্রাণে মোচড় দিয়ে উঠল।

রোগা বলুক আরতিকে, নাক থ্যাবড়া বলুক, শতেক কুচ্ছো করুক। কিন্তু কাল বলে ওরা কোন বিবেচনায়?

মেয়ে দেখানো ব্যাপারটাও পাড়াগাঁয়ে পরব। গিন্নিবান্নি ও বউমেয়ে কয়েকজন এসেছেন। একজনে ঝাঁঝালো কন্ঠে বলেন, যাই বল মোহিতের মা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া তোমাদের মনোগত ইচ্ছে নয়। তাহলে এই কেলেঙ্কারিটা করতে না।

শান্তিবালা আকাশ থেকে পড়েন: আমরা কি করলাম?

রাধারাণীটার হাতে জলখাবার দিয়ে পাঠালে। চোখের উপর রূপ দেখিয়ে ঘুরঘুর করতে লাগল। মুনির মন টলে যায়। বলি, ফর্সার উপরেও তো আরো ফর্সা থাকে। সূর্য থাকতে তারা নজরে পড়ে না কেন? রাধিকে দেখে তারপরেই তো ওরা কাল বলে মুখ ফেরাল।

প্রথম দিনের সেই তুলনার পর থেকেই আরতি রাধারাণীর দূরে দূরে থাকে। শান্তিবালার এত উচ্ছ্বাস, তিনিও কেমন চুপ হয়ে গেলেন। দেখে শুনে মনোরমা মরমে মরে যান। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে, আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা সাধছেন বিয়ের সম্বন্ধ পন্ড করে দিয়ে। অত রূপের মেয়ে নিয়ে আসা শত্রুতা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে মনে মনোরমার ভয় হচ্ছে। পাড়ার গিন্নিরা যেমন করে বলছেন, শেষটা একদিন এরা পথে বের করে না দেয়। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? একলা হলে দায় ছিল না, পেটের শত্রু রয়েছে—সর্ব অঙ্গে যার আগুনের মতো রূপ। যার কথায় হারাণ বলেন, লাখের মধ্যে একটি।

মনোরমা বলেন, মেয়ের গতি করে দাও দাদা। নয়তো মাথা খুঁড়ে মরব। কত ভরসা দিয়েছিলে তুমি, মেয়ে নাকি লুফে নেবে। কোথায় ?

হারাণ বলেন, এখনো বলছি তাই। তোর মেয়ে পড়তে পাবে না। কিন্তু সময় দিবি তো খুঁজে পেতে আনতে? আরতিটার জন্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরছি। বচন ছেড়ে ছেড়ে তোর ভাজ আমায় পাগল করে তুলছে। এটা চুকিয়ে দিয়ে তারপরে দেখিস কী সম্বন্ধ নিয়ে আসি রাধির জন্যে।

= চার =

আবার দেখতে আসছে আরতিকে। পাত্র নিজে আসছে, সঙ্গে মহকুমা-শহরের উকিল মুরারি হালদার। মুরারি উকিলের মক্কেল হলেন হারাণ, মুরারির সেরেস্তায় তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম। সেই সূত্রে খাতির-ভালবাসা। হারাণ কতবার রাত্রিবাসও করেছেন উকিলবাবুর বাড়ি। পাত্র ম্যাট্রিক পাশ, দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা আছে মুরারির সঙ্গে। পুরোপুরি না হলেও খানিকটা মুহুরিও বটে। দিনকে দিন পশার বাড়ছে মুরারির। পুরানো পাকা মুহুরি সুরেন বক্সী একলা সব পেরে ওঠেন না, এই ছোকরা সাথেসঙ্গে থাকে। মুরারিই একবার তুলেছিল এই সম্বন্ধটা। কন্যাদায়ে হারাণ বিব্রত হয়ে বেড়াচ্ছেন,—তাই শুনে মুরারি বলল, আমাদের নবকান্তর সঙ্গে রাজি থাকেন তো বলুন। সংক্ষেপে হয়ে যাবে। আমি বললে ওর বাপ কক্ষণো দর-কষাকষি করতে যাবে না।

হারাণের চার মেয়ে মহকুমা-শহরে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিল, নবকান্ত সেই সময় একনজর দেখেও ছিল আরতিকে। তিন চার বছর আগেকার কথা, আরতি তখন এত ডাগর হয় নি। পাত্র অপছন্দ করে নি—কিন্তু নিতান্তই উকিলের মুহুরি বলে হারাণ গা করলেন না। মোক্তারি পরীক্ষা দিচ্ছে সেই নবকান্ত আসছে বছর। মুহুরিগিরি ছেড়ে মোক্তার হয়ে সে কাছারি বেরুবে। মুরারি হালদার বলেছে, মক্কেল জুটিয়ে পশার করে দেওয়ার দায়িত্ব তার। এটা উকিলবাবু স্বচ্ছন্দেই পারবে। কথা দিয়েছে হারাণের কাছে। মুখে যতই আস্ফালন করুন, চার মেয়ের বাপ হারাণ একজনের বিয়ের সর্বস্ব ব্যয় করে ফতুর হতে পারেন না। পুরানো প্রস্তাব অতএব খুঁচিয়ে তুলেছেন আবার। মহরম উপলক্ষে কাছারি দু-দিন বন্ধ। অভিভাবক স্বরূপ মুরারি নিজে পাত্রকে নিয়ে আসছে। এটা একেবারে অভাবিত। নিত্যদিন আদালতে ছুটো-ছুটি, ছুটি পেয়ে ঘরে শুয়ে দুটো দিন বিছানায় গড়িয়ে নেবে—তা নয়, কোন পাড়া-গাঁয়ে চলল মুহুরির জন্য পাত্রী পছন্দ করতে। রওনা হয়ে না বেরুন পর্যন্ত নবকান্তও বিশ্বাস করতে পারে নি। মুরারি বলে, ওকালতি পাশ করে প্রথম এসে বসলাম—মজুমদার মশায় আমার সেই আমলের মক্কেল। নবকান্তও অতি আপন জন। দেখা যাক, নিজে উপস্থিত থেকে যদি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। মেয়ে চলনসই হলে একেবারে পাকা-কথা দিয়ে আসব।

খোদ মুরারি হালদার চলে আসছে—সমারোহ পড়ে গেল হারাণের বাড়ি। কাজ-কর্মের মধ্যে শান্তিবালা এক সময় কঠিন মুখে রাধিকে বললেন, তোমায় মানা করে দিচ্ছি বাছা। ফরফর করে কুটুম্বর সামনে অমন যেও না।

সেবারে শান্তিবালাই কিন্তু বলেছিলেন রাধিকে জলখাবার দিয়ে আসতে। সে কথা বলতে গেলে কলহ বেধে যায়। মেয়ের দোষ মেনে নিয়ে মনোরমা তাড়াতাড়ি বলেন,

হতচ্ছাড়ির একটু যদি লাজলজ্জা থাকে। ভেব না বউ, সেদিন আমি তালা-চাবি দিয়ে আটক করে রাখব।

সত্যি, বিশ্বাস নেই রাধিকে। আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়, বাপ আদর দিয়ে মাথাটি খেয়ে রেখে গেছেন। নীতি-উপদেশ বড় একটা কানে নেয় না। এত কথা-কথান্তরের পরেও কুটুম্বদের সামনে গিয়ে উঠতে না পারে এমন নয়। ঠিক তালা-চাবি না দিন, মনোরমা কড়া নজরে রেখেছেন মেয়েকে। কুঠুরির বাইরে না যায়। আরতিকে দেখে কথাবার্তা শেষ করে কুটুম্বরা বিদায় হয়ে গেলে তবে সে বেরুবে।

মুরারি উকিল বলে, মেয়ে তো খাসা। আহা-মরি না হল, গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের যেমনটি হওয়া উচিত। এদিককার সব হয়ে গেল মজুমদার মশায়, বাকি এখন লেনদেনের কথাটা। তা-ও সেরে যেতে পারি, সে জোর আছে ওদের ওপর। কিন্তু নবকান্তর বাপ নিজে উপস্থিত থেকে মীমাংসা করবেন, সেইটে ভাল হয়। আমি যখন মধ্যবর্তী আছি, কোন অসুবিধা হবে না।

আরতিকে বলে, তুমি মা বসে বসে ঘামছ কেন? চলে যাও, দেখা হয়ে গেছে।

আরতি উঠে গেল। তারপরে একথা সেকথা। মক্কেলের বাড়ি উকিল এসে পড়েছে—অতএব মামলা-মোকর্দমার কথা উঠে পড়ল। ছোট্ট একটা নালা নিয়ে এই গাঁয়ের দু-ঘর নিকারি ফৌজদারি দেওয়ানি উভয় রকম মামলা করে মরছে। হারাণ এক পক্ষের মুরুব্বি, অতএব মুরারি হালদার ওকালতনামা পেয়েছেন। মুরারি বলে, এসেছি যখন সেই নালাটা একবার চোখে দেখব। গরিব মানুষ জলের মতন পয়সা খরচ করছে—দেখে যাব, কত জল আছে ওইটুকু নালায়, কত মাছ আছে জলটুকুর নিচে।

বলতে বলতে আর একটা কথা হঠাৎ বুঝি মনে পড়ে যায়: মজুমদার মশায়, আরও একটি মেয়ে আছে তো আপনার বাড়ি।

হারাণ বলেন, একটি নয়—তিন তিনটে। তবে আর বলি কেন। তারা ছোট, তাদের ভাবনা পরে। প্রজাপতির দয়ায় আরতির বিয়েটা হয়ে যাক নির্বিঘ্নে—

আপনার নিজের মেয়ের কথা হচ্ছে না। ভাগনী এসে পড়েছে, সে দায়ও তো আপনার। আসা গেছে যখন, তাকে এক নজরে দেখে যাব। কী বল?

নবকান্তর দিকে তাকাল মুরারি। উৎসাহ ভরে নবকান্ত সায় দিল: হ্যাঁ ছোড়দা—

মনে মনে প্রমাদ গণে হারাণ বলেন, শুনলেন কার কাছে?

মুরারি উকিল হেসে বলে, তিলডাঙার মক্কেল আপনি একা নন। বলে দিল, কনে দেখতে যাচ্ছেন তো সে মেয়েটাও দেখে আসবেন।

অনেক খবরই তবে জেনে এসেছে। তিরিশ টাকা ফী কবুল করে সেবারে একটা কেসে মুরারি উকিলকে জেলা-কোর্টে নিয়ে যেতে পারে নি, মক্কেলের পঙ্গপাল ঠেলে অন্য কোথাও যেতে সে নারাজ। সেই মানুষ হুট করে জঙ্গুলে পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ল, নিশ্চয় রাধারাণীর রূপের কথা কানে গেছে। রূপ দেখবার কৌতূহলে এসেছে। রাধির রূপের খবর তবে তো এ-গ্রাম ও-গ্রাম নয়, অতদূরের শহর অবধি পৌঁছেছে। এতক্ষণে হারাণের সেটা মালুম হল। দরজার ভিতরে ঢুকে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসে বলেন, অসুখ করেছে রাধির। শুয়ে আছে।

কী অসুখ?

এত বড় পাটোয়ারি মানুষ হয়েও হারাণের জিভের ডগায় কোন একটা শক্ত

অসুখের নাম এল না। বলে ফেললেন, জ্বর—

মুরারি শশব্যস্তে বলে, তবে আর উঠে এসে কাজ নেই। আমরা গিয়ে এক নজর দেখে আসি। মানে, বড্ড সুখ্যাতি কিনা আপনার ভাগ্নীর, সবাই বলে দেখে আসবেন। সাপ না ব্যাং—দেখে যাই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে।

আচ্ছা, বসুন। আসছি আমি—

পুনশ্চ ঘুরে এসে হারাণ বললেন, বসুন আপনারা। রাধিই আসছে। আপনারা কষ্ট করে যাবেন, সে হয় না।

বলছে অত করে, বের করতেই হবে রাধিকে। না দেখিয়ে উপায় নেই, উকিল মুরারিকে কোনক্রমে চটান চলবে না। শান্তিবালা অতএব পুবের দালানের দোরগোড়ায় গিয়ে ডাকলেন: যেতে হবে একবার। ডাকছে।

রাধি কাপড়ের উপরে উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণ তুলছিল। বুনানি ফেলে উঠে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছিল যেন এমনি একটা-কিছুর।

শান্তিবালা তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলেন, ছুঁড়ি একপায়ে খাড়া। তুমি ঠাকুরঝি দিব্যি তো বসে দেখছ। বলি, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরেই কি যাবে? চাকরানি ভাববে এ-বাড়ির।

মনোরমা বলেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বউ?

ডেকে পাঠিয়েছে। চোখে একবার না দেখে ওরা নড়বে না। আমরা চেপে রাখলে কি হবে, চারিদিক জুড়ে ঢাকের বাদ্যি।

মনোরমা বলেন, কারো সামনে যাবে না আমার মেয়ে।

মেয়ের উপর তাড়া দিয়ে ওঠেন: যা করছিলি কর বসে বসে।

শান্তিবালা ক্ষেপে গেলেন: উকিলবাবুর অপমান করা হবে। আরতিকে এক রকম পছন্দ করেছেন—রাগ করে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে চলে যাবেন। জমাজমির গোলমাল বাধালে উকিলবাবুর কাছে ছুটতে হয়, ভাতভিত্তি সমস্ত ওঁর সেরেস্তায় বাঁধা। শত্রুতা করে যদি সব লন্ডভন্ড করতে চাও, হোক তাই ঠাকুরঝি।

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে কাতর হয়ে যান: এত সব আমি জানতাম না বউ। রাধি তোমারও মেয়ে, যেখানে খুশি নিয়ে যাও। কিন্তু যাবে তো এই কাপড়েই যাক। চাকরানি ভেবে ওঁরা মুখ ফিরিয়ে থাকুন। সেবারের ওই কান্ডের পর আমি যে মুখ দেখাতে পারি নে তোমাদের কাছে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন: ময়লা কাপড় কী বলছ! কিছু মনে না কর তো হাঁড়ির তলার কালিঝুলি খানিকটা এনে ওর মুখে মাখিয়ে দিই। মেয়ে নিয়ে আমার ভয় ঘোচে না, কী করব ভেবে পাই নে।

রাধারাণী সহজভাবে বলে, সেবারে গিয়ে তো খাবার পরিবেশন করলাম। আজ গিয়ে কি করতে হবে, বলে দাও মামিমা।

কিছু করবি নে। ঢিবঢিব করে দুটো প্রণাম সেরে চলে আসবি।

ঘাড় বাঁকিয়ে রাধি বলে, সে আমি পারব না। কোন গুরুঠাকুররা এসে বসলেন যে প্রণাম করতে হবে।

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, না, কিছু করবি নে তুই। বেশি কাছেও যাবি নে। কোন রকমে দায় সেরে বেরিয়ে আসবি। ভাববে, মেয়েটা ভব্যতা জানে না। তার জন্য বেজার হয় তো ভালই।

আবার এসে হারাণ ভাগনীকে নিয়ে চললেন। সভয়ে নজর রাখছেন। কিন্তু যা

ভেবেছেন, তাই। তার চেয়েও বেশি। যেই মাত্র রাধারাণী গিয়ে দাঁড়াল, উকিল-মুহুরি দু-জনেরই দেবচক্ষু। পাঁঠা বলি হবার পর কাটা-মুণ্ডের উপর স্থির নিমীলিত যে দুটো চোখ, তার নাম দেবচক্ষু। কুটুম্বদের দু-জোড়া চোখের অবিকল সেই অবস্থা।

নবকান্ত ফিসফিস করে বলে, দেখুন ছোড়দা, চেয়ে দেখুন। চোখের উপরেও যেন হাসি মাখানো। মুখের আদলটাই অমনি।

মুরারি স্পষ্টভাষী। বলল, আপনার মেয়ে দেখলাম। আর এই দেখছি। যাই বলুন মজুমদার মশায়, সেই মা-লক্ষ্মীর কেমন যেন গোমড়া মুখ। ঠোঁট ফুলিয়েই আছেন।

নবকান্ত আবার বলে, হাতের তেলোর দিকটা একবার দেখুন। টুকটুক করছে। রক্ত ফুটে বেরচ্ছে যেন।

মুরারি রাধারাণীর বাঁ-হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়ঃ কী কোমল! আর সেই মা-লক্ষ্মীর খরখরে হাত। মজুমদার মশায় অবস্থাপন্ন মানুষ। নয়তো বলতাম, মেয়েকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে মাজিয়ে ওই অবস্থা করেছেন।

হস্তরেখা দেখছে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। উকিলবাবুর হয়ে গেল তো মুহুরি তখন ধরে। দেখা গেল, দু-জনেই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী।

মুরারির এক পিশতুত ভাইয়ের সম্বন্ধী হল নবকান্ত। সেই সুবাদে দাদা বলে—ছোড়দা। দেখাশুনো হয়ে যাবার পর একটু নিরিবিলি হয়েছে দু-জনা। সংকোচ ঝেড়ে ফেলে একরকম মরীয়া হয়ে নবকান্ত বলে, আগেরটা নয় কিন্তু ছোড়দা। এইটে—এই মেয়ে।

মুরারি খিঁচিয়ে ওঠেঃ একেবারে ন্যাড়া মেয়ে—মেয়ের সঙ্গে লবডঙ্কা। বলি, তোমার বাপকে সামলাবে কি করে? সাগরদত্তকাটির গাঁতি কিনবেন তিনি বরপণের টাকায়, দরদাম করে বসে আছেন।

আমি তার বোঝাপড়া করব।

মুরারি বলে, বাপে ছেলেয় কুরুক্ষেত্তর বেধে যাবে। আমায় নিমিত্তের ভাগী করবে। তা ছাড়া, সম্বন্ধ করতে এসেছি মজুমদার মশায়ের মেয়ের সঙ্গে। কোন মুখে তাঁকে বলি, মেয়ে নয়—ভাগনীকে পছন্দ। ছ্যাঁচড়া কাজ আমায় দিয়ে হবে না, সাফ কথা বলে দিচ্ছি।

তাড়া খেয়ে নবকান্ত মুখ চুপ করে রইল। যাবার সময় মুরারি হারাণকে বলে, আসছে হপ্তার শেষাশেষি আমার ওখানে চলে আসুন। যা বলবার সেই সময় বলে দেব। আসবেন নিশ্চয়, অবহেলা করবেন না।

চলে গেল ওরা। অনেক কথাই শান্তিবালার কানে গেছে। স্বামীর উপর রে-রে করে উঠলেনঃ মেয়ের বিয়েই যদি দেবে, রূপসী ভাগনীকে বাড়ি এনে তুললে কোন বিবেচনায়? ভগ্নিপতি মরতে না মরতে বয়ে আনতে হল, দুটো পাঁচটা দিন সবুর সইল না যে বিয়েটা দিয়ে নিই।

হারাণ বলেন, আমি না হয় নিয়ে এসেছি, দোষ করেছি। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে কে আর দেখত? থাকত, খেত, ঘুমোত। তুমি যে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে পাড়ার মানুষ ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলে। দেশময় চাউর হয়ে গেছে। সেই শহর অবধি। বোঝ ঠেলা এখন।

বিদেয় করে দাও।

সে তো হয় না। পর নয়—আপন বোন-ভাগনী। উঠবে গিয়ে কোথায়? আমার নিন্দে রটে যাবে। বিয়ে দিয়ে রাধিটাকে বিদেয় করব। মনোও তাই বলে। কান্নাকাটি করে। ভেবেছিলাম, আরতি বয়সে বড়—তার বিয়েটা আগে হোক, তারপর দেখব। সে বোধহয় হবার নয়। মুরারি হালদার কী বলে, শুনে আসি। ফিরে এসে কোমর বেঁধে রাধির জন্য লেগে যাব।

মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছেন কোন সময়। বলে উঠলেন, বিদেয় করতে না পার তো দাদা, কালিঝুলি মাখানো নয়, একদিন আমি এসিড ঢেলে দেব মেয়ের মুখে। উনি যখন নলহাটি পোস্টাপিসে, একটা মেয়ের মুখে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল। মা হয়ে আমাকেও তাই করতে হবে। চান করে নি ক'দিন, রুক্ষ চুল, তার উপরে ছেঁড়া ত্যানা পরিয়ে পাঠালাম,—সর্বনাশী তবু লঙ্কাকাণ্ড করে এল।

হারাণ চললেন মহকুমা শহরে মুরারি উকিলের কাছে। আরতি আর রাধিকে পাশাপাশি তুলনা করে মুখের উপরেই তো প্রায় সব বলে গেছে, রেখে-ঢেকে বলে নি। আরতি নয়, রাধিকে পছন্দ নবকান্তর—এই কথাটা ফলাও করে শোনানোর জন্য শহর অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার?

তা নয়। নবকান্তর উপর মুরারি বিষম ক্ষেপে আছে। বলে, মুহুরি না ঘোড়ার ডিম। মামলার কাজকর্ম কী বোঝে আর কী করবে। ওর বাপের হাত এড়াতে না পেরে বক্সীমশায়কে বলে কয়ে সেরেস্তার ফরাসের কোণে একটু বসতে দিয়েছি। একটা অজুহাত সৃষ্টি করে মাসিক বিশ-তিরিশ টাকার সাহায্য করি। সেই ছোঁড়ার আবার বায়নাক্কা—এ মেয়ে নয়, ও-মেয়ে। বলি, মেয়ে কি ফেলনা মজুমদার মশায়, অমন পাত্রের হাতে কেন দিতে যাবেন? আমি যখন লেগে গেছি, মাস দুই-তিনের মধ্যে ভাল পাত্র জুটিয়ে আনব। কিচ্ছু ভাববেন না, বাড়ি গিয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোন গে যান।

কথার শেষ নয়, ভূমিকা মাত্র। হারাণ সেটা বুঝতে পারছেন। মুরারি একটুখানি কি ভাবল। আইনের একটা মোটা বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল ফরফর করে। তারপর মুখ তুলে বলে, আমার ভাইকে দেখেছেন আপনি, চক বাসুদেবপুরে যে থাকে?

গোবিন্দ। সহোদর ভাই নয়, বৈমাত্রেয়। চক বাসুদেবপুরে হালদারদের প্রকাণ্ড সম্পত্তি। গোবিন্দ সেইখানে পড়ে থেকে সম্পত্তি দেখাশুনো করে। কালেভদ্রে এখানে আসে। দেখেছেন দু-একবার বটে, হারাণের স্মরণ হয়। বেঁটেখাটো রোগা মানুষটি, সর্বক্ষণ ছটফটিয়ে বেড়ায়। পলকের দেখা দেখেছেন, কথাবার্তা আলাপ পরিচয় হয় নি।

মুরারি বলে, ভাইয়ের সংসারধর্মে মতি নেই, আধা-সন্ন্যাসীর মতন চকের কাছারিতে পড়ে থাকে। বউঠান মারা যাবার পর থেকে এই অবস্থা। কিন্তু হল তো অনেক দিন, আর কেন, পুরুষমানুষের সামলে নিতে হবে না? মা এদিকে বুড়ো হয়ে পড়েছেন, আমার স্ত্রী তো বছরের মধ্যে আঠার মাস শয্যাশায়ী, একজনের এসে শক্ত মুঠোয় সংসারের হাল ধরতে হবে। মা সেইজন্য বাসুদেবপুর থেকে ভাইকে খবর দিয়ে এনেছিলেন। সকলে মিলে চাপাচাপি করতে নিমরাজি হয়ে গেছে। আগের সংসার ছিল, বয়সও হয়ে গেছে খানিকটা—আপনার মেয়ের সঙ্গে কোন সাহসে প্রস্তাব তুলি, বলুন। তাই মা বলছেন, আপনার ভাগনী রাধারাণীকে যদি দান করেন, হালদারবাড়ি আমরা লক্ষ্মীবরণ করে তুলব।

বনেদি গৃহস্থ হালদাররা, রীতিমত অবস্থাপন্ন। সম্পত্তির আয় আছে, তার উপরে ওকালতি করে মুরারি অঢেল পয়সা পিটছে। রাধারাণীকে নজরে ধরেছে। নয়তো

আরতির সঙ্গে হলেও শান্তিবালা খুব যে একটা আপত্তি করতেন তা নয়। কথার মারপ্যাঁচে মুরারি উকিল ভদ্রভাবে সেটা এড়িয়ে গেল।

ভাবতে গেলে হাতে স্বর্গ পাওয়ারই ব্যাপার। তবু হারাণ বললেন, আমার বোনকে একবার না জিজ্ঞাসা করে কী বলি। বিধবা মানুষ। ওই তো এক মেয়ে তার—

মুরারি সঙ্গে সঙ্গে বলে, জিজ্ঞাসা করবেন বইকি। ছেলের বয়স হয়েছে, আগের বউ মারা গেছে, সমস্ত বলবেন। খরচখরচা একটি পয়সা নেই, শাঁখা-শাড়ি দিয়ে সম্প্রদান। ওরাও একবার কিন্তু মেয়ে দেখতে যাবে বাসুদেবপুর থেকে। আপনাদের মতামতটা পেলে তার পরে যাবে।

হারাণ যে খবর নিয়ে ফিরবেন, সে এক রকম জানা-ই। তবু মনোরমা প্রত্যাশা করে আছেন। আরতির সম্বন্ধ পাকা করে আসবেন, রাধিকে নিয়ে ভন্ডুল ঘটবে না তার মধ্যে। কাপাসদা'র ঠাকুর গোপালের কাছে শতেক বার মনে মনে মাথা খুঁড়ছেন।

ফেরার পর হারাণের মুখের চেহারা দেখে কোন আর সংশয় রইল না। এগিয়ে এসে তবু প্রশ্ন করেন, খবর কি দাদা?

একদিকে খারাপ, আর একদিকে ভাল। ভাল যেটুকু, সে হল আশার অতীত।

শোনা গেল সবিস্তারে। শান্তিবালা সে সময়টা পাড়ায় বেরিয়েছেন। ধীরে-সুস্থে হারাণ তাই বলতে পারলেন। নবকান্ত ছোঁড়াটা উকিলের অনুরোধ সত্ত্বেও আরতিকে নাকচ করে দিল। অথচ আগেও সে কনে দেখেছে—দেখেশুনে তবে তো এগুল। রাধিকে দেখে তারা মাথা ঘুরে গেছে।

মনোরমা সভয়ে বলেন, বউ শুনে রক্ষে রাখবে না। মেয়ের মা, তাকেই বা দোষ দিই কেমন করে? আর কাজ নেই, আমরা কাপাসদা'য় চলে যাই দাদা। আরতির বিয়েথাওয়া হয়ে যাক, তারপরে আসব।

হারাণ বলেন, রাধির জন্যে চলে যাবি—তার বিয়ে এখনই তো হয়ে যায় তুই যদি মত করিস।

ওই নবকান্তর সঙ্গে? না দাদা, মত নেই আমার। আরতির জন্য এসে আমার মেয়ে নিয়ে নিল—লোকে কি বলবে! আরতিরই বা কী রকম মনে হবে!

মুহুরির সঙ্গে নয়। উকিলবাবুরই বড্ড পছন্দ রাধারাণীকে। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ধরেছেন। ভাই অবশ্য বৈমাত্রেয়। কিন্তু একান্নবর্তী। শহরের উপর মস্তবড় দোতলা বাড়ি তাঁদের। বাসুদেবপুর চকের রকম বারআনার মালিক—সেখানে পাকা কাছারি। পাত্র সেখানে থেকে তালুক-মুলুক দেখাশোনা করে। উকিলবাবু বললেন, মেয়ে তো রাজকন্যে। মুহুরির হাতে দেবেন কি, এই হালদারবাড়ি আমরাই বরণ করে আনব। আশার অতীত তবে আর কী জন্যে বলি!

ফড়ফড় কয়েকবার টেনে হুঁকো থেকে মুখ তুলে হারাণ বলেন, তবে হ্যাঁ, খুঁতও আছে। ছেলের রং কাল। আমি ভাসা-ভাসা দেখেছিলাম সেবারে, খতিয়ে দেখি নি। মুহুরি ছোঁড়াই বলল। কাল মানে বেশ কাল।

মনোরমা বলেন, হোক গে। ছেলে কাল আর ধান কাল। তাছাড়া ভাগনী তো তোমার ফর্সা আছে। ছেলেপুলে খুব একটা কুচ্ছিৎ হবে না।

ছেলে দোজবরে। উকিলবাবু বললেন সেটা। নবকান্তটা আবার ফিস-ফিসিয়ে বলে, দোজবরে নয়, তেজবরে। ছোঁড়াটার মনের জ্বালা, বানিয়ে মিথ্যেও বলতে পারে।

বলছেন হারাণ, আর ফিকফিক করে হাসেনঃ মুহুরি ছোঁড়ার কান্ড দেখে হাসিও

পায়, দুঃখও হয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধাঁ করে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। বলে, বড়-বাড়ির সম্বন্ধ—কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, পাত্র তেজবরে আমি বললাম, বুঝতে পেরেছি বাবাজি তোমার মনোগত ইচ্ছে। শুভকর্মে ভাংচি দিতে এসেছ। ধামার মতো আশাটা তোমার, কিন্তু হাতে যে মধুপর্কের বাটিও ধরে না। অতি-লোভের মুখে ছাই।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে মনোরমা তাড়াতাড়ি বলেন, ছেলে-মেয়ে নেই যখন, দোজবরে হোক আর তেজবরে হোক, এ শুধু গাল একটা। সম্বল আমার জান তো দাদা। তার মধ্যে সমস্ত সারতে হবে। বেশি খুঁতখুঁত করলে হবে কেন?

সম্বল তোর পুরোপুরি থেকে যাবে মনো। এক আধলাপয়সাও খরচ নেই। মুরারি উকিল খোলাখুলি সব বলে দিয়েছে। রোখ চেপেছে, এ মেয়ে নেবেই ওরা ঘরে।—

সহসা গলা খাটো করে হারাণ বললেন লোকে বলবে মেয়ে বেচা। নয়তো উল্টে কিছু পাইয়েও দিতে পারি। কী বলিস তুই?

শান্তিবালা সমস্ত শুনলেন। বিয়ে আরতির না হয়ে রাধারাণীর হতে যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বলা হল কথাটা। শান্তিবালা প্রসন্ন হলেন মনে হল। হালদারবাড়ির তেজবরে পাত্র না হয়ে রাজা রাজবল্লভের খাস নাতি হলেও বোধ হয় বেজার হতেন না। রূপবতী মেয়েটা সরে যাক চোখের উপর থেকে, আরতির বিয়ে তারপরে আর আটকে থাকবে না।

চক বাসুদেবপুর থেকে কনে দেখতে এল—পাত্র গোবিন্দ হালদার নয়, তার বন্ধু পূর্ণশশী সেন। পেশায় কবিরাজ, ও-তল্লাটের লোক পূর্ণশশীকে এক-ডাকে চেনে। পাত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু কথাবার্তায় সেটা বোঝা যায়। রাধারাণীর আপাদমস্তক বারকয়েক নিরীক্ষণ করে শুধুমাত্র নামটা জিজ্ঞাসা করে পূর্ণশশী রায় দিয়ে দিল ঃ দিন স্থির করে ফেলুনগে মুরারিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে। পাত্রের দিক থেকে কিছু বলবার নেই।

মুরারিও তাই বলে হারাণকে ঃ পূর্ণশশী কবিরাজের কথা আমার ভাইয়েরই কথা। ভাইয়ের কথার চেয়ে বরঞ্চ বেশি আস্থা করি যদি সেটা পূর্ণশশীর মুখ দিয়ে বেরোয়।

শুভকর্ম নির্বিঘ্নে চুকে গেল। শান্তিবালা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মেয়ের বিয়ের সবচেয়ে বড় বিঘ্নটা বিদায় হল বাড়ি থেকে।

=পাঁচ=

আর একটা কথার প্রচার নেই। গোবিন্দ হালদার বয়সে কিছু বড় মুরারির চেয়ে। লিকলিকে দেহ বলে এমনি দেখে বোঝা যায় না। দেহ যা-ই হোক, প্রতাপ বিষম। গলায় যেন ঝাঁঝ-ঘন্টা বাজে। বাসুদেবপুরের প্রজারা তটস্থ বড়বাবুর দাপটে। ফুলশয্যার রাত্রে মেয়েদের কাছেও তার কিছু পরিচয় দিল।

তিন বোন এসেছে বিয়ে উপলক্ষে। আর মুরারির বউ ছবি। তা ছাড়া এবাড়ি ওবাড়ির কয়েকটা মেয়ে এসে জুটেছে। বড় বোন অমলা ডাকাডাকি করে ঃ রাত যে পুইয়ে যায় দাদা। তুমি ছাড়াও পরিবেশন করার লোক আছে। নতুন বউ ঘুমে ঢুলছে।

বারম্বার বিরক্ত করায় গোবিন্দ খিঁচিয়ে ওঠে ঃ শাস্ত্রীয় রীতকর্ম যেটুকু নইলে নয়, তাই করিব। এক কাঁচ্চা বেশি নয়। এক গাদা ফক্কড় মেয়ে জুটিয়ে এনে ভোররাত্রি অবধি ফষ্টিনাষ্টি চালাবি তো জুতিয়ে লাট করব কিন্তু।

স্থান-কাল জ্ঞান নেই গোবিন্দর। বাইরের কত মেয়ে এসেছে, একরকম তাদের সামনেই। মেজ বোন অপর্ণার ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ির আদরের বউ। সে গ্রাহ্য করে না। দূরে ছিল, একেবারে কাছে সামনাসামনি ঝড়ের মতন এসে পড়েঃ কী, কী বললে? কী এমন বাল্মীকি মুনি রে। একটা দিন বরবউকে নিয়ে অমন ফষ্টিনাষ্টি করে থাকে মেয়েরা।

গোবিন্দ বলে, সে একটা দিন কবে হয়ে গেছে। একটা কেন, দু-দুটো দিন হয়েছে।

কিন্তু বউ হয়ে যে এল, তার তো এই প্রথম। তার মনে সাধ-আহ্লাদ আছে তো। তার সাধ মেটাতে পারবে না, আবার তবে ছাতনাতলায় বসতে গেলে কি জন্যে?

অপর্ণার মুখের কাছে গোবিন্দ জব্দ। তাড়াতাড়ি সুর পাল্টে নিয়ে রসিকতার প্রয়াস করে—আবাদ জায়গায় পড়ে-থাকা মানুষের মোটা রসিকতা। বলে, সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়। ছাতনাতলায় কেন গেলাম, তুই কি করে জানবি শ্বশুরবাড়ি থেকে। বরঞ্চ ছোট বউমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস। কামরূপ-কামিখ্যের মোহিনী কন্যে—গুণ জানে। যে দেখে সে-ই মজে যায়। মুরারি একেবারে নাছোড়বান্দা। তারপরে বলেকয়ে কবিরাজকে তিলডাঙা পাঠালাম, সে-ও দেখি ওই দলে ভিড়ে পড়ল।

অপর্ণা অধৈর্য হয়ে এসে হাত ধরলঃ চল—

কী জ্বালা, টানাটানি করিস কেন? ভাল ভাল লোক এখনো বাকি রয়ে গেছেন। সেকেন্ড-কোর্টের পেস্কার মশায় আসেন নি। ডাক্তারে কবিরাজে ওদিকে দাবায় বসে গেলেন—হীরালাল ডাক্তার আর আমাদের পূর্ণশশী। নিদেন একটা বাজি না হয়ে গেলে কিছুতে ওঠানো যাবে না। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের সব খাওয়াতে হবে। আগেভাগে ফুল-শয্যার খাটে চড়ে বসলে কী ভাববেন বল দিকি? পূর্ণশশীটা বড্ড মুখফোঁড়ঃ বলে বসবে, সন্ধ্যেবেলা চড়কে চাপলে, দু-দু'বারেও শখ মিটল না? কথার ভয় করি বড্ড ওর।

অমলা বলে, এগারটা বেজে গেছে, সন্ধ্যে হল তোমার এখন! চল বড়দা, বউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

মিছে কথা, বয়ে গেছে রাধারাণীর ঘুমুতে। ঠায় বসে আছে। বুক ঢিব-ঢিব করছে তার। বর দেখেছিল মামার বাড়ি প্রথম যখন গোবিন্দ এসে বরাসনে বসল। লুকিয়ে দেখে নিয়েছিল। শুভদৃষ্টির সময়টা তারপরে সে চোখ বন্ধ করে ছিল। বর হয়তো ভেবেছে লজ্জা। আসলে ভয়। ফুলশয্যার হোক না দেরি আরও, বিশিষ্ট যাঁদের আসবার কথা সকলে এসে যান। সকাল হয়ে যাক। নেহাৎ পক্ষে এমন সময় ঘরে নিয়ে আসুক, রীতকর্ম সারতে সারতে পাখপাখালি ডেকে ওঠে। ননদদের সঙ্গেই যাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে রাধারাণী।

তা হল না, তিন বোনে টেনেটুনে গোবিন্দকে ঘরে আনল। ছবি আসে নি। রোগা মানুষ, কোলে-কাঁকালে চার ছেলেমেয়ে, পেটেও এসেছে আবার একটি। তাছাড়া ভাসুরের বাসরে ভাদ্রবউ হয়ে আসবেই বা কেন? পাড়ার মেয়েদেরও কারো উৎসাহ নেই, গোবিন্দর মধুবাক্য কানে গিয়েছে নিশ্চয় কারও কারও। খেয়েদেয়ে যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছেঃ দূর, গোবিন্দ হালদারের ফুলশয্যা নতুন করে কি দেখব? আগে দেখেছি তো কতবার। বর মুখ গোমড়া করে থাকবে, রসের কথা বলবে না একটি। অন্য কেউ বললে হাসবে না। আর হাসেও যদি, গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে হাসি হারিয়ে যাবে—কারও নজরে আসবে না।

শেষ অবধি ওই তিন বোন—রাধির তিন ননদ। বউয়ের ঘুম ধরেছে বলছিল, কিন্তু গোবিন্দই তো ঢলে ঢলে পড়ছে বোধ করি খাটনির ক্লান্তিতেই।

অপর্ণা ফিসফিসিয়ে বলে, ছুতো। জান বউদি, তাড়াতাড়ি যেতে বলছে আমাদের। গেলে তখুনি নিজ মূর্তি ধরবে। তোমারও সেই ইচ্ছে—অ্যাঁ?

মোটাসোটা নিটোল গড়ন অপর্ণার। বর্ষার পরিপুষ্ট কলার বোগের মতন। যৌবন সামাল মানে না, পাতলা শাড়ি ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। মুখেও অবিরত অসভ্য কথাবার্তা, ঠারেঠোরে স্থূল ইঙ্গিত। বলে, সবুর সইছে না মোটে! আচ্ছা, যাই চলে তবে।

রাধি হাত জড়িয়ে ধরে বলে, যেও না ভাই। সত্যি সত্যি বলছি। ভয় করছে আমার।

ভয়তরাসি দেখনহাসি!—আট বছরের খুকি এসেছেন, ভাজা-মাছ উল্টে খেতে জানেন না!

কেমন করে বোঝাবে রাধারাণীর, মুখের কথা মোটেই নয়—মনেপ্রাণে চাইছে, থাকুক—এই অপর্ণা থাকুক রাধিকে জড়িয়ে ধরে। রাতটুকু নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিয়ে চলে যাবে।

আরও জোরে হাত চেপে ধরেছে, আর অপর্ণা তো হেসে খুন, থাক ঢের হয়েছে। ভয় করে তো নেমে গিয়ে মেজেয় মাদুর পেতে ঘুমিও। সেখানেও যায় তো চেঁচিয়ে উঠবে হাউমাউ করে। আমরা আশেপাশে সব রইলাম।

হেসে আবার বলে, আমি ঘুমুচ্ছি না বউদি। ঘুমোতে দেবে না তোমার ঠাকুরজামাই।

নতুন বউয়ের সঙ্গে আরও খানিকটা ফিসফিস গুজগুজ করে হেসে লীলায়িত ভঙ্গিতে বাসরের সর্বশেষ মেয়ে অপর্ণা বেরিয়ে যায়। কত গন্ধ মেখে এসেছিল মাগো—চলে গেছে, গন্ধ ভুরভুর করছে তবু। আর কথায় ও ইসারায় যা সমস্ত বলে গেল, দেহে মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। একটুকু থমকে দাঁড়িয়ে অপর্ণা আবার বলে, দেখেশুনে দুয়োর বন্ধ করে শোবে বউদি ভাই। চোরের উৎপাত। এই বড়দা'রই আগের ফুলশয্যায় দুটো চোর লুকিয়ে ছিল খাটের তলে। আমি আর দিদি। ঠাকুরমা তখন বেঁচে, তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বড়দা তো রেগে টং—

রাধারাণী নতুন বউ, সে কেন দরজা দিতে যাবে? যাদের বাড়ি, সেই মানুষ উঠে দিয়ে আসুক। কিন্তু ওরা চলে যেতে না যেতে গোবিন্দ নেতিয়ে পড়েছে একেবারে। রাধি আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। নতুন জায়গা—চোরের কথা বলল, সত্যি চোরেও তো ঢুকে পড়তে পারে। আস্তে আস্তে এক সময় উঠে দরজায় হুড়কো তুলে দিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় ফিরছে, প্রদীপের আলোয় দেখল—হ্যাঁ, সে স্পষ্ট দেখেছে—চোখ মিটমিট করছিল গোবিন্দ এতক্ষণ। ঘুমোয় নি, ঘুমের খেলা। নতুন বউ মুখ ফেরাতেই আগের মতন আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

রাধিও ঘুমিয়ে পড়ুক তবে। ভাল হল, শাপে বর হয়ে গেল। এমন ঘুম ঘুমাবে, ময়দা পেশার মতো চটকাচটকি করে ধরে বসিয়ে দিয়েও তাকে জাগাতে পারবে না। কিছুতে জাগবে না, এই পণ। বিশাল খাটের শেষ প্রান্তে গুটি-সুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন বউ আর বরের মাঝখানে অন্তত আরও দু-জনের শোয়ার মতন ফাঁক।

এবং সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন কত বড় ধকল গিয়েছে—এমন ক্ষণেও ঘুমিয়ে পড়া যায়। কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। শিরশির করে

পোকামাকড় হাঁটছে যেন গায়ের উপর দিয়ে। জানত, এমনিধারা হবে। রাধির সহচরীদের মধ্যে চার-পাঁচ জনের বিয়ে হয়েছে। সকলের চেয়ে বেশি ভাব চাঁপাফুল ভক্তিলতার সঙ্গে। কত সব গল্প করে ভক্তিলতা আর সেই সব মেয়েরা। কত সব রসালো ঘটনা। যাঃ, অসভ্য—ভক্তিলতার মুখ সরিয়ে দিয়েছে। হেসে হেসে আরও রসিয়ে ভক্তিলতা তার নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলত। আর বিরক্তির ভান করে রাধারাণী দুই কানে গিলে এসেছে সেই সব। তার জীবনে আজকে সেই ব্যাপার। এখনই। পোকামাকড় নয়, গোবিন্দর হাত চোরের মতন রাধির অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চরণ করছে। ক'টা দিন আগে যে পুরুষ একেবারে অচেনা ছিল, তার হাতের আঙুল। গায়ে কাঁটা দিয়েছে রাধির। জেগেছে, কিন্তু চোখ খোলে না। একখানা কাঠ হয়ে পড়ে আছে। চোখ খুলছে না বর দেখতে হবে, সেই ভয়ে। কোদালের মতন বেরিয়ে-আসা থুতনি, থুতনির উপর দিকে গুহার ভিতরে ঢুকে-যাওয়া ঠোঁট,—গোঁফের জঙ্গলের ভিতর লুকানো সে-বস্তু অনুমান করে নিতে হয়। জঙ্গলের ঊর্ধ্বে অত্যুচ্চ নাসিকা-শিখর। শিখর ঢালু হয়ে যেখানটা ললাটে মিশেছে তার দু-দিকে বটিকা প্রমাণ চোখ দুটো। রাধারাণী না তাকিয়েও বুঝতে পারে গোবিন্দর সেই কুতকুতে চোখ দুটো জ্বলছে এখন।

যা খুশি করুক। নইলে চক বাসুদেবপুরের বৈষয়িক কাজকর্ম ফেলে বিয়ের এত হাঙ্গামায় মানুষটি আসতে যাবে কেন? বিশ-বাইশ বছর ধরে লালন-করা কৌমার্য কেড়ে নেবার অধিকার পেয়েছে মন্ত্রপাঠ করে। প্রতিকার নেই, শাস্তিটা নিতেই হবে নির্বিকারে।

চোখ বুঁজে আছে এখন—চোখ বুঁজেই থাকবে বর যত দিন না পুরানো হয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দ ভাববে, বউ লাজুক—দোষ না হয়ে বরঞ্চ সেটা গুণেরই হবে। কালধর্মে সব-কিছু সয়ে যায়, অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর চোখে লাগবে না। ছোটবেলায় একটা কাল কুকুর-বাচ্চা দেখে ভয়ে সে দরজায় খিল দিত, সেই কুকুরকেই আ-তু-উ-উ বলে ভাত খাইয়েছে কত দিন, গায়ে কত হাত বুলিয়েছে।

এমনি ভাবছিল এলোমেলো। খেয়াল হল, হাত সরিয়ে নিয়েছে গোবিন্দ। সাড়াশব্দ নেই, নিঝুম অবস্থা। দারুণ তৃষ্ণা বোধ করে রাধারাণী, এক কলসি জল খেলে তবে বোধ হয় গলা ভিজবে। মানুষটা ঘর ছেড়ে নিঃসাড়ে চলে গেল নাকি? খুলতে হয় চোখ। দূরে সেই আগেকার জায়গায় মড়া হয়ে পড়ে আছে। না, ঠিক মড়া নয়—তাকাচ্ছে রাধারাণীর দিকে। চোখাচোখি পড়ে গেল। কাপড়চোপড় ঠিক করে নেয় রাধি, ব্লাউজের বোতাম এঁটে দেয়। কথাও ফুটল যে ও-পাশের ওই মড়ার মুখে, উঃ, কী গরম! হাতপাখা তুলে নিয়ে গোবিন্দ জোরে জোরে বাতাস খাচ্ছে।

গরম রাধিরও। জ্বর উঠেছে যেন গায়ে, গা পুড়ে যাচ্ছে। খাট মচমচ করে হঠাৎ গোবিন্দ উঠে পড়ে। পিছন দিককার দরজা খুলছে। খোলা কি সোজা—বাক্সপেঁটরায় ঠাসা দরজার খোপ। আগে সেগুলো সরাতে হল। আমবাগান ও ঝোপঝাপ ওদিকটা। খিড়কির পুকুর। কোথায় চলল গোবিন্দ নতুন বউকে একলা ফেলে? ভয়ে ভয়ে রাধারাণী উঠে পড়ে। দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। চাঁদ উঠেছে বেশী রাত্রে, আমের ডালের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। গোবিন্দ খিড়কি-ঘাটে গেল, ডুবে মরতে নয়—ঘটি ভরে হুড়হুড় করে জল ঢালে মাথায়। দু-হাতের কনুই অবধি ধোয়, হাঁটু অবধি ডুবিয়ে খানিকক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে মুখে জল ছিটায়। তারপর গামছায় হাত-পা মাথা ভাল করে মুছে আবার ঘরে আসছে। রাধি শুয়ে পড়ে

তাড়াতাড়ি। গোবিন্দ যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনিধারা পড়ে আছে। চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে রাধি অপেক্ষা করছে। গরম কাটিয়ে এসে বর আবার কি করে দেখ।

ঝিঁঝিঁ ডাকছে ঝিমঝিমঝিম—তা ছাড়া একেবারে নিঃশব্দ। বৈঠকখানার দেয়ালঘড়িতে টং করে একবার বাজল। রাত একটা। অথবা দেড়টা আড়াইটা সাড়ে-তিনটাও হতে পারে। আধ ঘণ্টা হবার সময়েও একবার শুধু বাজে। কিন্তু কই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? চোখ মেলে দেখে, নিদ্রা কি জাগরণ জেনে কোন লাভ নেই। দাঁড়ি টেনে দিয়েছে এই ফুলের শয্যার উপর। ডাইনের পাশবালিশ মাঝে এনে দিয়ে পাশবালিশের ব্যূহের আড়ালে চোখ বুজে আত্মরক্ষা করছে। করুণা হল রাধারাণীর। আঙুলের স্পর্শ এক সময় পোকামাকড় ভাবছিল—দুর্ধর্ষ গোটা লোকটাকে এবার পোকামাকড় বলে মনে হয়। রাধির পাশবালিশ বাঁয়ের দিকে। সেই পাশবালিশটা তুলে এনে অন্যটার গায়ে রাখল। ডবল দাঁড়ি পড়ল। দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ফুলশয্যায় বর-বউয়ের না হয়েছে তো বালিশ দুটো গায়ে গায়ে থাকল।

= ছয় =

সকালবেলা ঘাড়ে লাগে ওই অপর্ণাটা। মুখ বিষম আলগা। বলে, জানি গো, জানি সমস্ত। রাত দুপুরে পুকুরঘাট তোলপাড়। ঘুমুচ্ছিলাম তো আমি—তোমার ঠাকুরজামাই ঠেলাঠেলি করে জাগাল: শুনছ গো, ওই শোন। ঘাটে গিয়ে ওরা জলের ঢেউ দিচ্ছে। বললাম, গোসাপ জলে পড়েছে। ছেঁদো কথায় ভোলবার মানুষ কিনা! ঢেউ এসে তারপর আমার উপরে পড়ে।

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে বলে, আমায় দোষ দাও কেন ঠাকুরঝি। আমি ওর মধ্যে নেই। তিন সত্যি করছি। গোসাপ বলেছিলে তুমি—তা আদ্য অক্ষরে মিল আছে। সাপ বল আর মানুষ বল, গো বটে উভয়েই।

খিলখিল হাসি। হেসে গড়ায় দু-জনে। তারপরে আর দুই ননদ ও ছোটবউ ছবি এসে পড়ে। এবাড়ি-ওবাড়ির আরও দু-তিনটি মেয়ে। দিনটা আমোদে কেটে যায়।

এরই মধ্যে এক কাণ্ড। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর অপর্ণা বলে, বড়দা পাশা খেলতে বেরিয়ে গেল, এস বউদি আমরা তাস খেলি। মাদুর পেতে নিল দালানে। তাস বের করল। বলে, তাসখেলা জান তো ভাই বউদি? যা জান তাতেই হবে। আমরাও আনাড়ি।

বসে পড়ল। তাস ভাঁজছে। ডাবরে পানের খিলি, ডাবর পাশে নিয়ে বসেছে। কপকপ করে খিলি মুখে ফেলছে। মুখ বিকৃত করে বলে, পান খাচ্ছি না ঘাস চিবোচ্ছি বোঝা যায় না। হুঁ, মুস্কিপাতি জর্দা আছে বড়দা'র। কৌটোটা তোমার ট্রাঙ্কের উপর। এনে দাও না ভাই বউদি।

আছে সত্যি। রাধারাণী দেখেছে সেই কৌটো। ঘরে ঢুকেছে, ঝনাৎ করে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে দরজায় শিকল। আর উচ্ছ্বসিত হাসি: তাসখেলা তুমি মোটেই জান না বউদি, তোমায় নিয়ে চলবে না। যে খেলা জান, তাই খেল। জানলাটা দিয়ে দাও। চারটের পর শিকলি খুলে দেব।

তাকিয়ে দেখে, সত্যিই রে—খাটের উপর লম্বা হয়ে পড়েছে গোবিন্দ। ঘুম—ভেকধরা ঘুম নয় কাল রাত্রের মতন। মা গো মা, কত রকম কারসাজি জানে যে অপর্ণা! আগে থেকে শোনাচ্ছে, গোবিন্দ পাশাখেলায় বেরিয়ে গেছে। তাস আর পানের ডাবর সাজিয়ে নিয়েছে। তিলেক সন্দেহ না আসে মনে। ফাঁদ সাজিয়ে রেখে

পাখিকে যেমন তার মধ্যে এনে ফেলে। কিন্তু এই জায়গায় না আটকে বাঘের সঙ্গে এক খাঁচায় দিলে অনেক ছিল ভাল। বাঘের সঙ্গে কিছুক্ষণ হয়তো বা থাকা যায়, কিন্তু দিনমানে আলোর মধ্যে পতি-পরম-গুরুর সন্নিধানে সর্বদেহ হিম হয়ে আসে যে!

দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। পথ আছে পালাবার। পিছন দিককার দরজা—যে দরজা খুলে গোবিন্দ কাল রাত্রে পুকুরঘাটে গিয়েছিল। দরজার খোপের বাক্সপেঁটরা সরিয়ে পথ করা আছে, সেটা খেয়াল করে নি অপর্ণা। দেরি নয়। চক্ষের পলকে বেরিয়ে পড়ল রাধারাণী। ঘুরে আবার ওদের তাসের আড্ডায়। তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। পারলে আটক করতে?

ও মা, কেমন করে বেরুলে? বড়দা ছেড়ে দিল? মুখে কেবল তম্বি, কাজে কিছু নয়! পড়তে একবার তোমার ঠাকুরজামাইয়ের পাল্লায়—

অমলার বয়স এদের সকলের বেশী। সে ধমক দেয়: বেশ করেছে। দিন দুপুরে বর নিয়ে শোবে—গেরস্তঘরের বউ এত বেহায়া কেন হতে যাবে? বর তো রইলই—ফুরিয়ে যাচ্ছে না বর। চিরকাল ধরে থাকবে।

অপর্ণা কানে কানে বলে, দেখ বউদি, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। গুরুজন হলেও না বলে পারি নে। তোমার হল পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ। ক'দিন বা আছে দাদা বাড়িতে। বাসুদেবপুর চলে যাবে। রসগোল্লা যতক্ষণ মুখের সামনে, গোগ্রাসে গিলে খাও।

একবার বেরিয়ে এসেছে, আর ওমুখো নেওয়া যাবে না রাত্রের আগে। রাত্রিবেলা রান্নাঘরে খেতে খেতে মেয়েদের গল্প চলছে। খাওয়া হয়ে গেছে, আর সকলে উঠতে যায়—রাধারাণী বলে, শুনুন না দিদি, তারপরেও আছে। নতুন গল্প জমিয়ে বসে আবার একটা। বউয়ের শুধু রাণীর মতন চেহারাই নয়, অনেক গুণ। দু-দিনে আপন করে নিয়েছে জা-ননদদের। অমলা তাই বলছে, বাপের বাড়ি আমরা কতবার আসি। শুয়ে বসে খেয়ে কাজ করে এত মজা কখনো পেয়েছি? একটা মানুষ পা দিয়েই বাড়ির চেহারা বদলে দিয়েছে।

অপর্ণা বলে, ননদিনী রায়বাঘিনী। বাঘিনীদের বশ করে ফেলেছে বউদি, বড়দা'কে ভেড়া বানাবে। কখন বড়দা ঘরে চলে গেছে, হা-পিত্যেশ চেয়ে আছে—ওঠ দিকি এইবারে।

রাধারাণী বলে, ঠাকুরজামাই চলে গেলেন, তুমি তো ভাই একলা। আজ আমি তোমার সঙ্গে শোব।

অপর্ণা বউয়ের গালে ঠোনা মেরে কানে কানে বলে, তোমার সঙ্গে শুয়ে লাভটা কি আমার শুনি? বরঞ্চ গোলমাল হবে। ঘুমের মধ্যে তুমি আমায় বড়দা ভেবে নেবে। আর আমি ভাবব—।

এমনি অসভ্য কথা—মেয়েয় মেয়েয় হলেও লজ্জায় রাধারাণীর গাল রাঙা হয়ে ওঠে।

ছবি তাড়া দিয়ে ওঠে। বড় জা হলেও রাধি বয়সে অনেক ছোট। বলে, সেকেলে লজ্জাবতীদের হার মানিয়ে দিলে বড়দি। যাও এবারে, ঢের হয়েছে। আমাদেরও তো ঘুমটুম আছে, না সারা রাত বকরবকর করলে চলবে!

সমুদ্রে কূল দেখা যায় না কোন দিকে। কী করবে এখন রাধি, আর কী বলতে পারে এদের? ঘরে না যাবার জন্য যত কৌশল, এরা সমস্ত লজ্জা বলে ধরে নিচ্ছে। তার গরিমা বেড়ে যাচ্ছে। জা-ননদের কর্তব্যই হল প্রতিবাদ কানে না নিয়ে ঠেলেঠুলে বরের ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

অপর্ণা বলেও তাই: শোন, অমন যদি কর তিন বোন আর ছোট বউদি মিলে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে দেব বড়দা'র কোলের মধ্যে।

সে কাজ সত্যি সত্যি পারে না, এমন নয়। চারজন, আর সে একলাটি। কতক্ষণ লড়বে তাদের সঙ্গে? মধুসূদনের নাম স্মরণ করে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ, সংকটে মধুসূদন—ছোটবেলায় বাপের মুখ থেকে শ্লোক মুখস্থ করেছিল। চিরকালের ডানপিটে মেয়ে, বাজি রেখে শ্মশানের কুলগাছের ডাল ভেঙে আনার মেয়ে। আরও ছোট যখন, রাধি দাঁতাল-শুয়োর মারা দেখতে গিয়েছিল বাগানের ভিতর। শড়কির ঘা খেয়ে দাঁতাল গোঁ ধরে ছুটেছে, রে-রে-রে রব উঠেছে চতুর্দিকে—মেয়ে তখন ফনফন করে খাড়া জামগাছের উপরে চড়ে বসল। গাছে তার আগে কখনো ওঠে নি, কিন্তু অবলীলাক্রমে গেল উঠে। এমনি সব অসমসাহসী কাজ করে এসেছে, আর বরের ঘরে যেতে পারবে না এখন! হাত ছাড়িয়ে নিল সে ঘরের সামনে এসে, মাথার ঘোমটা ফেলে দিল। হঠাৎ যেন এক ভিন্ন মেয়ে। সাহেবরা বলে, গুডনাইট—সেই শোনা কথাটা এদের বলে হেসে সশব্দে সকলের মুখের উপর দরজা এঁটে দেয়।

তাকাচ্ছে একদৃষ্টে গোবিন্দর দিকে। হাসে। জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল খাটের পাশে।

ঘুমুলে?

ঘুমন্ত মানুষ সাড়া দেবে কেমন করে? হাসে রাধি খলখল করে। বলে, কাল ঘুমুলে, আবার এখনো ঘুমুচ্ছ—বেশ মজার মানুষ হয়েছি তো আমি, কাছে এলেই তোমার ঘুম পেয়ে যায়।

অপর্ণার সাগরেদ হয়ে পড়েছে রাধি—অপর্ণা সে খবর জানে না। সেরা সাগরেদ। এই দুটো দিনে দাম্পত্য গল্প সে-ও অনেক করেছে রাধির সঙ্গে। সবই যে সত্যি, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অসম্ভব নয়—ঘটানো যেতে পারে তেমনটি। অপর্ণা পেরে থাকে তো রাধি কেন পারবে না। কিসে ছোট সে। বাজি রেখে রাতদুপুরে শ্মশানঘাটে চলে গিয়েছিল—তার অসাধ্য কি আছে?

গোবিন্দ আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা দিয়ে আছে। কচ্ছপ যেমন খোলার মধ্যে থাকে। সেই চাদরের প্রান্ত শক্ত মুঠিতে এঁটে ধরল রাধারাণী। একটানে সরিয়ে ফেলবে। টানতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে খুলি দিল মুঠি। হেরিকেন-আলোর জোর কমানো। কেমন এক আতঙ্ক হল আলো মৃদু হলেও মুখ দেখা যাবে যে গোবিন্দর। দাঁড়কোদাল মডেল করে বিধাতাপুরুষ যে থুতনিখানা গড়েছেন, গোঁফের নিচেয় যে মুখটা বর্ষার গাছগাছালিতে ঢাকা ডোবার মতন। চোখে দেখতে না হয়—হেরিকেন নিভিয়ে ঘর পুরোপুরি অন্ধকার করে নিল। এবার পারবে।' ভূত-পেত্নীর সেই কুলগাছের ডাল ভেঙেছিল, আর নিষুতি আঁধারে বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না?

বউ ঘুমিয়েছে জেনে তুমি কাল যে খেলা খেলতে গিয়েছিলে, তাই আজ রাধির। খানিকটা খানিকটা অপর্ণা তার কাছ থেকে শুনে নিয়েছে—ওষুধ বাতলে দিয়েছে সে-ই। ন্যাকা মেয়ে। আট-বছরে গৌরী-দান করে পাঠায় নি তোমায়। বয়স বিশ বছর বলেছে—কোন্-না বাইশ-চব্বিশ। বড়দাও পাঠশালের পড়ুয়া নয়—দু-দুটো তাগড়া বউ পার করেছে। ছেড়ে কথা বলবে না আজ, কিসের অত! ঘুম ভাঙিয়ে তবে ছাড়বে। ঘুমিয়ে থাকবে তো বিয়ে করা কেন আবার নতুন করে?

ঘরে যখন আসতে হল—আসা কিছুতেই রদ হল না—অতএব এইমাত্র পথ।

অন্ধকার আছে, ভয়টা কিসের? বর লাফিয়ে উঠে পিটুনি দেয় যদি? সে ভাল, অনেক ভাল। জীবন্ত আছে, প্রমাণ পাওয়া যাবে তখন। পিটুনি সহ্য হবে, কিন্তু কালকের মতন অমনধারা লাঞ্ছনা আর নয়।

গোবিন্দর কানের উপরে মুখ এনে তীক্ষ্ম কণ্ঠে কু দিচ্ছে। কণ্ঠ দিয়ে সূঁচ ফোটায় যেন কানের গর্ভে। তারই মধ্যে একবার বলে নেয়, এতক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছ। ঘুমুবে না আর এখন। জাগ, জাগ, জাগতে হবে—না জাগিয়ে ছাড়ব না।

গোবিন্দ সজোরে ঝাঁকি মারে, রাধারাণী গড়িয়ে পড়ে একদিকে। মানুষটার গায়ে শক্তি আছে। বলে, বড্ড জ্বালাতন করছ। বাইরে থেকে ওরা সব লুকিয়ে দেখছে। ছি-ছি!

পেঁচা তো নয়, এই আঁধারে দেখবে কি করে? আমিই বলে দেখতে পাচ্ছি নে তোমায়, তার ওরা দেখবে!

নাঃ, বড় বেহায়া তুমি! লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছ। বাজারের মেয়ে-মানুষও এতদূর করে না।

কিন্তু রাগ করবে না কিছুতেই রাধারাণী। অপর্ণা শিখিয়ে দিয়েছে। রাগ হলেও ঠোঁটে আসবে না রাগের কোন কথা। অপর্ণা পাখি-পড়ান পড়িয়েছে। রাধি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, বাজারের মেয়েমানুষ নই বলেই তো করতে পারছি। লজ্জার সম্পর্ক কি তোমার সঙ্গে? লজ্জা বলে কি, নিন্দা-ঘৃণা মান-অপমানের সম্পর্কও নয়। মন্ত্র-পড়া পাকা গাঁথুনির সম্পর্ক আমাদের।

আবার বলে, আরও তো বিয়ে করেছিলে। দু-দু'বার। বিয়ে না-করা পরিবারও বাসুদেবপুরে আছে শুনতে পাই। তারা কি করে, তাদের গল্প বল তো শুনি।

শেষ কথাটা—বাসুদেবপুরের কথা—কানে গিয়ে পুরুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেঃ কক্ষণো নয়। ওই সব মিথ্যা অপবাদ কে রটায়?

আমিও বলি, রটনা মিথ্যা। যারা রটায় তাদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করব। এই ক'দিনের বিয়ের বউ হয়ে বলছি, আর যা-ই হোক ও-দোষ তোমার থাকতে পারে না।

নিঃশব্দতা বেশ খানিকক্ষণ। হঠাৎ একসময় গোবিন্দ আত্মগতভাবে বলে ওঠে, কি গরম! ঘাম পড়ছে দরদর করে।

একপ্রান্তে রাধি পাথর হয়ে বসেছিল। হেসে ওঠেঃ পুকুর-ঘাটে ডুব দিতে যেও না কালকের মতো। ঘামের কথা বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে যায়। আমায় জিজ্ঞাসা করে, যা নয়—যা ঘটে নি, ঘটতে পারে না, তাই সব শোনায়। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়েই আজ ঘাম মার।

এতক্ষণে এইবার বিষম রেগেছে গোবিন্দ। রাগের চোটে তিড়িং করে উঠে বসে। কাঁপছে। গলায় সেই ঝাঁঝঘণ্টা-বাজা আওয়াজ।

ইঃ, ভারি যে মুখ ফুটছে! ইটেভিটে ঘুচিয়ে তো মামার বাড়ি এসে উঠেছ। দু-সন্ধ্যে ভাত দিতে যাদের মুখ বেজার। কোন খবরটা জানি নে? বলি, এত জোর কে জোগাচ্ছে পিছন থেকে? অঙ্গের চিকন ছটায় কে মজল?

রাধি বলে, আমার মনের জোর। সত্যের জোর। গরিব বাপের মেয়ে হয়েও সেই জোরে গাঁয়ের মধ্যে ডঙ্কা মেরে বেড়িয়েছি।

নিজের মাথার বালিশটা ছুঁড়ে দিল ঘরের মেজের। মাদুর পেতে মেজের উপর শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করে শেষ রাত্রির দিকে রাধি একটু ঘুমিয়ে পড়েছে।

রোদ উঠে গেছে, ঘুমুচ্ছে পড়ে পড়ে তখনো। অপর্ণা এসে তুলে দিল। বলে, বড়দা চলে গেল। ঝগড়া হল বুঝি, ঝগড়া করে মেজের উপর শুয়েছ? পইপই করে তোমায় যে বলে দিলাম বউদি। আর বড়দা'রও কাণ্ড! ছেলেমানুষটি নয়—নতুন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

এক বাণ্ডিল নথিপত্র বগলে, মুরারি চটি ফটফট করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছে। শুনতে পেয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালঃ বড়ভাই হয়, কী আর বলি! ওটা মানুষ নয়। মুক্তোর হারের কদর মানুষ হলে বুঝত। চুলোয় যাকগে। বলি, সম্পত্তির অংশ তো আমারও। আমার আর মায়ের দুই অংশ, আর ওর একটা। কিন্তু যা-সমস্ত শুনি, বাসুদেবপুর-মুখো হতে প্রবৃত্তি হয় না। দাঁতে-মিশি বিলাস দাসী মন টেনেছে। কাছি দিয়ে বেঁধে রাখলেও কাছি ছিঁড়ে ছুটে পালাত।

দুঃখের মধ্যেও রাধারাণীর হাসি পেয়ে গেল। না—না—না—শতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠতে চায়। মিথ্যে কলঙ্ক তার জিতেন্দ্রিয় স্বামীর নামে। হাজারো রকম অন্য বদনাম দাও, কিন্তু চরিত্র হারানোর আশঙ্কা নেই গোবিন্দর। এদিক দিয়ে রাধি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ।

অপর্ণা ভাইয়ের উপর ধমকে ওঠেঃ মেয়েদের কথার মধ্যে তুমি কী জন্যে ছোড়দা? সেরেস্তায় যাচ্ছিলে, তাই যাও।

যেতে যেতে তবু মুরারি বলে, ভদ্রলোকের মেয়ে আমিই পছন্দ করে নিয়ে এসেছি এবাড়ি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বউঠান। কোনদিন-আপনার কোন রকম অসুবিধা না হয়, আমি সে দায়িত্ব নিচ্ছি।

মুরারির কথাগুলো বড় ভাল লাগে, রাধারাণী ভরসা পায়। নতুন বউয়ের জ্বলজ্বলে রূপ দেখে মেয়েমহলে ঈর্ষা। সত্যি সত্যি আপন করে পেয়েছে বোধ করি এই অপর্ণাকেই শুধু। আর পুরুষের মধ্যে মুরারিকে। বিষয় সম্পত্তি পৈতৃক। গোবিন্দ কাছারি পড়ে থাকুক আর যা-ই করুক—সম্পত্তির অংশ, মুরারি ওই যা বলে গেল, তিন ভাগের এক ভাগ। কর্তা সেই মর্মে উইল করে দিয়ে গেছেন। এর উপরে মুরারির ওকালতির রোজগার। রীতি-মতো ভাল পয়সা রোজগার করে সে। মুরারির জন্যেই হালদারবাড়ির নামডাক ষোলআনা বজায় আছে। একান্ন-পরিবারে তার খাতির সেজন্য সকলের বেশি। তার কথার উপরে কথা নেই। সেই মানুষটি রাধির পক্ষে। তবে আর ভাবনা কিসের?

দিন দুয়েক পরে মুরারি অসময়ে সেরেস্তা ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে ভিতর-বাড়ি এল। বাসুদেবপুরের একজনের মুখে কথাটা শুনেছে। তারকেশ্বরীকে ডাকেঃ ইদিকে এস মা, শুনে যাও ভাইয়ের কীর্তি।

রাধি ওধারের বারান্দায়, মুরারির সেজ সন্তান মন্টু তার কোলে। স্বামী-দেবতা কোথায় আবার নতুন কোন কীর্তি করলেন—সরে এসে সে জানলার কাছে দাঁড়ায়। মুরারি বলে, ভাই তো ক্ষেপে গেছে একেবারে। বাড়ি এনে হাত-পা বেঁধে চোর-কুঠুরিতে চাবি দিয়ে রাখ, নয়তো পাগলা-গারদে পাঠাও। তা ছাড়া উপায় নেই। পূর্ণশশীকে মেরে বসেছে এবারে গিয়ে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তারকেশ্বরী আঁতকে ওঠেনঃ পূর্ণশশী কবিরাজ?

তবে আর বলছে কি মা। বচসা হতে হতে ধাঁই করে গালে এক চড়।

অপর্ণাও এসে পড়েছে। সে বলে, কী নিয়ে বাধল—শুনেছ কিছু ছোড়দা?

জানলার আড়ালে রাধারাণী, মুরারি নিশ্চয় ঠাহর করেছে। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে

বলে, তিলডাঙায় গিয়ে কনে পছন্দ করে ভাইকে বিয়ে করতে বলেছিল, সেই হল অপরাধ। রাজা-বাদশার ঘরে যে রত্ন মানায়, তাই তোর ভাগ্যে জুটেছে। তার জন্য কোথায় ধন্য-ধন্য করবি, তা নয় উল্টে গালি-গালাজ মারামারি।

পূর্ণশশী কবিরাজের তল্লাটজোড় রোগিপত্তর—দুর্জন-সুজন কত যে তাঁবে ঘুরছে তার সীমাসংখ্যা নেই। ও মানুষ বিগড়ালে চক বাসুদেবপুরে প্রজা ঠেঙিয়ে আদায়পত্র করে খেতে হবে না, পাত্তাড়ি গুটাতে হবে দু-চার মাসের ভিতরেই। কবিরাজের সঙ্গে ভাব রেখে চলতে মুরারিই বলেছিল। এবং ভাব জমতে জমতে শেষটা এমন দাঁড়াল, দিনের মধ্যে ঘণ্টা দুই-তিন অন্তত একত্র বসে আড্ডা না দিলে ভাত হজম হত না—না গোবিন্দর, না পূর্ণশশীর। সেই ভাবের পরিণতি দাঁড়াল কিনা কাছারির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দুটো আধবুড়ো মানুষের গজ-কচ্ছপের লড়াই।

শতমুখে মুরারি গালমন্দ করে যাচ্ছে, কিন্তু রাধারাণীর কোন- কিছুই আর কানে ঢোকে না। কবিরাজ ঠেঙানোর আসল কারণ জানে না বলেই মুরারির অত ক্রোধ। কিন্তু রাধারাণীর বুঝতে বাকি নেই। কবিরাজি বটিকা ও অবলেহ দেখেছে সে গোবিন্দর ব্যাগের মধ্যে—খল-নুড়ি ও মধুর শিশি সুদ্ধ। দোষ বটেই তো পূর্ণশশী কবিরাজের—কী জন্য সে বিয়ের ব্যবস্থা দেয়! পোকামাকড়ের লুব্ধ অক্ষম সঞ্চরণ বলে ঘৃণা হয়েছিল সে রাত্রে। এখন ভাবতে পারছে, কবিরাজি ব্যবস্থারই পরীক্ষা সেটা। ভেবে লাঞ্ছনার জ্বালাটা যেন কমল।

গালিগালাজ করে মনের ঝাল মিটিয়ে মুরারি এক সময় বাইরের ঘরে সেরেস্তায় ফিরে গেল। আধেক চক্ষু বুঁজে মন্টু কাদার মতন লেপটে আছে রাধির গায়ে। মন্টুর ঠিক উপরের বোন মায়া। সে এসে নতুন-জ্যাঠাইমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। হাতে একমুঠো পাটকাঠি, হাতখানেক মাপে টুকরো-টুকরো করা। তাগিদ দিচ্ছেঃ চল না নতুন-জ্যাঠাইমা, তাড়াতাড়ি চল—

ছবি-বউ দেখে একগাল হেসে ফেললঃ কী কাণ্ড গো! চোঁ-চোঁ করে মন্টু দুধের বাটি শেষ করে ফেলল, বাড়ির মানুষ টেরও পেল না। গুণ্ডা ছেলে একেবারে ভদ্রলোক। মায়াও দেখছি মাঠেঘাটে বনে-বাদাড়ে না ঘুরে বাড়ির মধ্যে ছাতের তলায়।

মন্তর জানি ছোড়-দি।

ঠিক তাই। বেঁচেছি বাবা ক'টা দিন। ভুত-প্রেতগুলো হাড় ভাজা-ভাজা করে দেয়। আমার দুটো-একটাকে কোলে-পিঠে তুমি মানুষ করে দাও ভাই আর আমি পেরে উঠি নে।

ছবির কণ্ঠ করুণ হয়ে আসে। হেসে আবার একটু লঘু করে নেয়ঃ মায়ের কাছে তো চলে যাচ্ছ। প্রথমবারে কদ্দিন আর থাকবে! কিন্তু এরই মধ্যে যা ন্যাওটা করে ফেলেছ, মন্টু তোমায় খুঁজবে। এক কাজ ক'রো—মণ্টুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। নয়তো মন্তরটা বলে যাও, ছেলে যাতে এইরকম ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

রাধারাণী বলে, মন্তর নয় ছোড়-দি। কলিযুগে মন্তরতন্তর খাটে না। ঘুস দেদার ঘুস দিয়ে যাচ্ছি। বাখারিতে দড়ি বেঁধে ধনুক তীর করেছি; মায়ার হাতে এই যে পাটকাঠি—পাটকাঠির মাথায় কাদা চেপে তীর বানানো হবে। ধনুকে তীর ছুঁড়ে পরীক্ষা দিতে হবে তারপর। সুপারি-খোলায় বসিয়ে ছাতের উপর টেনে বেড়িয়েছি কাল সারাক্ষণ। মায়া ভারি কাজের মেয়ে, ও-ই সব জুটিয়ে এনে দেয়। ও না থাকলে হত না। পুতুল গড়ে দিয়েছি এঁটেল-মাটি দিয়ে। কাগজের নৌকো,

কাগজের দোয়াত। তবে বোঝ, জ্যাঠাইমা ছেড়ে তোমাদের কাছে কোন লোভে যেতে যাবে? তোমরা তো এসব ভাল ভাল জিনিস দেবে না, খালি দুধ খেতে বলবে।

ধবধবে গায়ের রং ছবির, একফোঁটা মানুষটি। কিন্তু হাড়ের উপরেই চামড়া—মাঝে মাংসের প্রলেপ দিতে একেবারে ভুলে গেছেন বিধাতাপুরুষ। রক্ত-মাংসের অভাবেই বোধ করি তাকে অসম্ভব রকমের ফর্সা দেখায়।

সেই কথা উঠল। ছবি বলে, তোমার মতন না হোক, ছিল সমস্ত আমার ভাই। বিয়ের সময় ফটো তুলেছিল—আলমারির মধ্যে না কোথায় আছে—খুঁজেপেতে দেখিয়ে দেব তোমায়। মাংস-রক্ত সবই ছিল, কচি লাউয়ের মতো থুকথুকে শরীর। তা পেটের শত্তুরগুলো শুষে শুষে খেয়ে নিল সব। এ বন্যের জল থামেও না।

ষাট ষাট—করে ওঠে রাধি: অমন করে বলে না ছোড়-দি। ছেলেপুলে মা-ষষ্ঠীর দান—সোনা হেন মুখ করে নিতে হয়। কত মেয়েছেলে আছে, মাথা কুটে কুটে একটা সন্তান পায় না।

সেই তো বলি। ষষ্ঠীঠাকরুনের দয়ার শেষ নেই। মন্টুর পরে ঝন্টু—তার এই সবে দাঁত উঠবার মতন। এরই মধ্যে আবার একটি—মাঘ মাস লাগাত কোলে এসে যাবে। নিজে মরি সুতিকার অসুখে, তার ভিতরে পালা করে একবার শোবার ঘরে একবার আঁতুড়ঘরে চলছে।

রাধারাণী বলে, এবারের আঁতুড়ঘরের জন্য ভেব না ছোড়-দি। আমি আছি। মন্টুকে এই দেখছ। তোমার ঝন্টুকেও দু-এক মাসের ভিতরে এমন করে নেব, মায়ের কোল ফেলে সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা ছেলেপুলে বশ করতে আমার জুড়ি নেই। বড্ড ভাল লাগে তাদের। বাচ্চা কোলে নিয়ে আমি সব ভুলতে পারি। ছোট্ট বয়স থেকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতাম এর ওর ছেলেমেয়ে কোলে করবার লোভে। মা তাই নিয়ে কত গালিগালাজ করত।

ছবি বলে, তুমি এসেছ—ক'দিন তাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। নাড়াচাড়া কর ভাই আমার ওগুলোকে, নিজের পেটে যদ্দিন না আসছে। সে আর কত? এক বছর' না হয় দু-বছর। আমার তো জনম ভোর এই চলবে। সে আমি জেনে বসে আছি। মরণ না হলে আমায় ছাড়বে না।

সকৌতুকে রাধি ঘাড় দোলায়। এক বছর, না হয় দু-বছর—তাই বটে! এক-শ' বছর দু-শ' বছর বরের সঙ্গে যদি ঘর করে, তবু সে বাচ্চা দেবে না। বড় কঞ্জুষ বর।

মক্কেলের কাজকর্ম সেরে খানিক রাত্রে মুরারি ভিতর-বাড়ি এল। মুরারির মা তারকেশ্বরী গোবিন্দর সৎমা—বুড়োমানুষ সন্ধ্যার অনতিপরেই ঘুমিয়ে পড়েন। শাশুড়ির কাছে বসে রাধারাণী মন্টুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ঘুমিয়ে ছিল মন্টু কী জানি হঠাৎ কেন জেগে পড়েছে। ছবি আর অপর্ণা রান্নাঘরে।

দরজায় ছায়া দেখে রাধি তাড়াতাড়ি উঠতে যায়। মুরারি বলে, উঠতে হবে না বউঠান। দেখছিলাম আমি। মন্টুর আপনি তো মায়ের চেয়ে বেশি হয়েছেন। সেই যা সেদিন বলেছি—কোনরকম দুর্ভাবনা করবেন না। বড়ভাই হলে কি হবে, বংশের কুলাঙ্গার ওটা। গোবরে পদ্মফুল ফুটেছিল, তার মহিমা বুঝল না। বাসুদেবপুর গিয়ে আছে—সে সম্পত্তি আমাদেরও। আমরা কিছু নিতে খেতে যাই নে। ভাইয়ের গলগ্রহ না হয়ে ওই সম্পত্তির একটা অংশ যাতে আপনি পান, সেই ব্যবস্থা করব। আর

কিছু গয়না আছে। আপনার শাশুড়ির গায়ের। আমার মায়ের আগে যিনি ছিলেন। সে গয়না সম্পূর্ণ আপনার, ছবির তাতে অংশ নেই।

বকবক করে অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়ে মুরারি গিয়ে খেতে বসল। রাধারাণী মৃদু হাতে থাবা দিচ্ছিল মন্টুর কপালে। মুরারির কথা শুনতে শুনতে হাত থেমে গিয়েছিল এক সময়। আবদারে ছেলে অমনি উম-হুম করে পাশমোড়া দেয়। আবার দ্রুত থাবা দিচ্ছে......

এত খুশি কেন ঠাকুরপো তার উপরে? মন্টুর আদর-যত্ন দেখে? ছবিদিদি পেরে ওঠে না। ঢিলে স্বভাবের মানুষ, শরীরের গতিক ওই—বড় হেনস্থা ওর ছেলেপুলের। কে কবে এমন বুকের মধ্যে নিয়ে মন্টুকে ঘুম পাড়িয়েছে! বাচ্চা ছেলের আরাম ও সমাদর দেখে বাপের প্রাণে আনন্দ। গোবিন্দ পড়ে থাকুক বাসুদেবপুরে। অথবা যে চুলোয় ইচ্ছে থাকুক। বরের সঙ্গে শোওয়া ছাড়াও জীবন আছে। বিধবা হয়েও মেয়েমানুষ পরমানন্দে সংসারধর্ম করে। মন্টু রাধির হাত ধরেছে, মায়া আঁচল টানছে, কোলে ঝন্টু—আর আসন্ন ওই সর্বশেষের বাচ্চাটি ছবি-দিদির গর্ভ থেকে সোজা একেবারে রাধির উপর। রাজেন্দ্রাণী রাধারাণী! দেবী-দশভুজার ডাইনে বাঁয়ে ছেলে-মেয়ে, উপর থেকে চালচিত্রের দেবতা-গোঁসাইরা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে মহামায়ার গরব দেখছেন—সেই প্রতিমাখানি বুঝি রাধিরই।

ক'দিন পরে আবার রাধির প্রসঙ্গ উঠেছে। তারকেশ্বরী বলছেন মুরারিকে: বুধবারে ওদের তো জোড়ে পাঠানোর কথা ছিল। দ্বিরাগমন। গোবিন্দ সরে পড়ল। বড়-বউমা একলাই তবে যাক। আর উপায় কী?

মুরারি বলে, না গেলেই বা কী! বাপের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি। সে মামা আমারই মক্কেল—অনেকদিন থেকে জানি। বোন-ভাগিনী কাঁধের উপর নেহাৎ চেপে এসে পড়ল—কী করব! দায় উদ্ধার করে দিয়েছি, মামা এখন ভাগনীকে চিনতে পারবে বলেই তো মনে হয় না।

তারকেশ্বরী বলেন, কিন্তু মা আছেন যে। বড্ড মিনতি করে বেহান আমায় চিঠি দিয়েছেন। মেয়ে পাত্রস্থ হয়েছে, কাশীবাসী হবেন এইবার। পেটমোছা কোলমোছা ওই মেয়ে—যাবার আগে একমাস দু-মাস একসঙ্গে থেকে যাবেন। এমন অবস্থায় 'না' বলা ঠিক হবে না।

মুরারি জবাব দেয় না, ভাবছে। তারকেশ্বরী বলতে লাগলেন, আমাদের এখানেই বা কী এখন! মেয়েরা ছিল এদ্দিন, হাসিখুশিতে কেটেছে। এক অপর্ণা—সে-ও পরশু চলে যাচ্ছে। নতুন এসেছে তো, আমি বলি, ঘুরে আসুক কয়েকটা দিন। মা কাশী চলে গেলে আর হয়তো কখনো যাওয়া ঘটবে না।

তবু যেন মুরারির ইতস্তত ভাব। অপর্ণা এসে পড়ল কথার মধ্যে। আর অপর্ণা যখন—পিছন দিকে অদূরে কপাটের অন্তরালে রাধারাণীও কি নেই! দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মুরারি বলে, তা বেশ তো। তোমার বাড়ির বউ, তুমি যা করবে তাই হবে। তবু একবার জিজ্ঞাসা কর বউঠানকে। তিনি কি বলেন। মন্টু আর মায়াকে ছেড়ে থাকতে পারবেন তো তিনি?

অপর্ণা বলে, বউঠান বউঠান কর কেন ছোড়দা? শুনে গা ঘিনঘিন করে। মনে হয় সেকেলে বুড়োহাবড়া দিদিমা।

মুরারি হেসে বলে, কি বলব তবে ? বড় ভাইয়ের স্ত্রী তো বটেন। কেউটেসাপ ছোট হলেও বিষ কিছু কম থাকে না। সম্পর্কে বড়—পূজনীয়া। বউদি ডাক মুখে আসে না, বয়সে বড্ড ছোট। ভাসুরের মত দেওর আমি। আমার বয়সটা কিছু কম হলে বউদি বলে ডাকতে পারতাম।

অপর্ণা বলে, ভাসুরেও তো কত আজকাল ভাদ্দরবউয়ের নাম ধরে ডাকে। রাধারাণী না হল, রাণী বলে ডাকতে পার।

তারকেশ্বরী ধমক দিয়ে ওঠেন: আধিক্যেতা! বড় ভাজের নাম ধরে ডাকবে! মুরারি আমার সে রকমের নয়। বউঠান বলছে, ওই বেশ ভাল। যা তুই।

রাধি শুনেছে। ভাবে সকল রকম বিবেচনা মানুষটির। গুণ না থাকলে বড় হয়। এই বয়সে এমন পশার। মানুষটা সকল দিক সামলে রেখেছে। এই বিশাল সংসার একটা মানুষের কথায় চলে।

=সাত=

মাত্র কয়েকটা দিনের পর রাধি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, তিলডাঙা মামার বাড়ির এবারে ভিন্ন চেহারা। বাপ মরার পর প্রথম এসে যেমনটা দেখেছিল। শান্তিবালা এসে জড়িয়ে ধরলেন। তেমনি আন্তরিকতা-ভরা আদর-যত্ন। রাধি বিবাহিতা এখন, আরতির বিয়ের আর সে বাধা নয়। সর্বাঙ্গে গয়নাগাঁটি, রূপ আরও যেন সহস্র গুণ হয়েছে।

রাধি বলে, আমার আসল শাশুড়ি তো নেই, তাঁর গয়না এই সব। আমি রেখে আসছিলাম। গাঁ-ঘরে এত সোনা পরে বেড়ানো ঠিক নয়। দেওর কিছুতে শুনলেন না। সমস্তগুলো পরে তবে আসতে দিলেন।

এই কথা নিয়ে শান্তিবালা পাড়া মাথায় করেন। সোহাগি বউ কাকে বলে চেয়ে দেখ তোমরা। রাধারাণীকে পাড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে কঙ্কণ দেখান, বাহুর অনন্ত দেখান। কাঁধের আঁচল সরিয়ে সীতাহার দেখান, কানের চুল সরিয়ে মাকড়ি দেখান। কোন গয়নায় কি পাথর বসানো, ধরে ধরে দেখিয়ে বেড়ান সমস্ত। এই এখন তাঁর দিনের বড় কাজ হয়েছে।

মনোরমা গাঢ়স্বরে বলেন, তোমাদেরই জন্য বউ। একেবারে নিরখচায় এরকম সম্বন্ধ ভাবতে পারতাম। দাদা হলেন পুরানো মক্কেল, তাঁদের সঙ্গে কত দিনের দহরম-মহরম। দাদা জুটিয়ে আনলেন, তুমি আঁচলে কোমর বেঁধে লেগে গেলে, তবে হল। নয়তো নিঃস্ব বিধবা মানুষ আমার কী ক্ষমতা ছিল বল।

শান্তিবালা এক সময় রাধির মুখ তুলে ধরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, জামাই কি বলে রে? মেয়ের সুখশান্তির জানবার জন্য মায়েরা পাগল হয়ে থাকে। নিজের মুখে বল্ তুই। লজ্জা কিসের? অন্যের কাছ থেকে মারফতি কথা শুনে সুখ হবে না।

শুনতে চাচ্ছেন এত আগ্রহ নিয়ে, তাঁদের রাধি বঞ্চিত করবে কেন? হেসে সে মুখ নিচু করে। বকবক করার চেয়ে ভাবভঙ্গিতে অনেক বেশি বলা হয়ে যায়। আনন্দে গলে গিয়ে শান্তিবালা বলেন, থাক, বুঝতে পেরেছি কিন্তু এল না কি জন্যে জামাই? শুনতে পেলাম, চকের কাছারি চলে গেছে।

রাধারাণী বলে, আসবার সমস্ত ঠিকঠাক মামিমা, চক থেকে হঠাৎ জরুরি খবর এল। বিষয়আশয়ের ব্যাপার সমস্ত ওই একজনের মুঠোয় তো! দেওর নিজের মক্কেল নিয়ে পাগল, ওদিককার কিছু দেখেন না। দেখবার দরকার হয় না, একজনেই তো করে আসছে সব। কাছারিটা পাকা-বাড়ি—আমাকেও যেতে হবে নাকি। দোতলায় একটা

নতুন ঘর তাড়াতাড়ি তুলে ফেলেছে সেইজন্য।

মনোরমাও শান্তিবালার মুখে শুনলেন। মেয়ের মাথায় হাত রেখে নিঃশব্দে আশীর্বাদ করেন তিনি। চোখে জল গড়াচ্ছে। মেয়ের এত সুখ মৃত্যুঞ্জয় চোখে দেখে যেতে পারলেন না।

জমে না কেবল আরতির সঙ্গে। রাধারাণীকে দেখলে সে পাশ কাটায়। যত শুনছে রাধির শ্বশুরবাড়ির গল্প, তত আরও মনমরা হয়ে পড়ছে। বিয়ে গাঁথল না এতদিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে আবার এক জায়গা থেকে দেখে গেছে। যেমন বরাবর হয়ে আসছে—চিঠিতে খবর দেব বলে তারা সরে পড়েছে। বয়সে ছোট হয়ে রাধারাণীর ঘর-বর হল, সেই লজ্জা আজকে যেন রাধিরও।

মনোরমার কাশীযাত্রার গোছগাছ হচ্ছে, তারিখও ঠিক হয়েছে। ইহজন্মের দিন ফুরিয়ে এল, পরকালের চিন্তা এবারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যৎসামান্য সঞ্চয় রাধির বিয়েয় লাগে নি, তীর্থবাসে খরচ হবে। মনোরমার এক খুড়তুত বোন থাকেন বাঙালিটোলায়। তিনিও বিধবা, অনেকদিন থেকে কাশীবাসী। দুই বোনে একত্র থাকবেন, স্নানান্তে শিবের মাথায় জল ঢেলে ঢেলে বেড়াবেন। তারপর একদিন বাবা বিশ্বনাথ টেনে নেবেন পাদপদ্মের নিচে। মেয়ের সুখশান্তি হল—মনোরমার এখন তীর্থধর্ম ছাড়া অন্য সাধবাসনা নেই।

হঠাৎ এই সময়ে মোহিত আর সন্ধ্যা এসে পড়ল কলকাতা থেকে। কী আনন্দ, কী আনন্দ! ঠাকুর গোপাল মনোরমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখলেন না। যাবার আগে দেখা হল দাদার ছেলে-বউর সঙ্গে। কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে মোহিত বউ নিয়ে এসেছে। আপাতত চাকরি নেই। বিলাতি মার্চেন্ট অফিসের কাজ—ভারত স্বাধীন হচ্ছে, সেই আতঙ্কে এক দেশি কোম্পানিকে ব্যবসা বিক্রি করে তারা চলে গেল। নতুন কোম্পানি এখন বুঝসমঝ করছে, দরকার হলে পরে মোহিতকে ডাকবে। ডাকবে নিশ্চয়ই, তবে মাস পাঁচ-ছয়ের আগে আশা করা যায় না।

হারাণ বলেন, ডাকলেও যাবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে কি জন্যে পরের গোলামি করতে যাবে? কোন দুঃখে? সাতটা নয় পাঁচটা নয়, বাড়ির তুমি এক ছেলে। সারাজন্ম এক কড়া দু-কড়া করে যৎসামান্য কিছু করেছি। এখন থেকে দেখেশুনে না নিলে আমার চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নয়-ছয় হয়ে যাবে।

সে যাকগে। ডাক তো আসুক কোম্পানি থেকে, সে ভাবনা তখন। মনোরমাকে ডেকে একদিন মোহিত বলে, অতদূরে কাশী কি জন্যে যাচ্ছ পিসিমা? ধর্ম কি এখানে থেকে হয় না? সেখানে খেয়েপরে বেঁচে থাকতে হবে, এখানেও। কাশী কি দুনিয়ার বাইরে?

মনোরমা বলেন, বাইরে বই কি বাবা! কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর। যত-কিছু পাপ-অন্যায় বাবার পায়ে নামিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেড়াব। মরলে সঙ্গে সঙ্গে শিবত্ব-লাভ।

মোহিত চোখ টিপে হাসিমুখে বলে, ভিতরের কথাটা বল দিকি। বাবার সংসারের হিসাবি খাওয়া সহ্য করতে পারছ না। সেই কষ্টে সংসারে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ছ। উঁ?

শান্তিবালা লুফে নিয়ে বলেন, ঠিক। সত্যি কথা বলেছিস তুই। রাধির বাপ

খাইয়ে-মানুষ ছিলেন। নিজে খেতেন, পর-অপর মানুষকে ধরে নিয়ে আকণ্ঠ খাওয়াতেন। এরাও চিরকাল ভাল খেয়েছে। দায় উদ্ধার হয়েছে, কী জন্যে তবে আর কষ্ট করবে? কাশী নাকি সেদিক দিয়েও বড্ড ভাল।

ইন্দুরা মা তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তিনি লম্বা-চওড়া গল্প ছাড়ছেন। তীর্থস্থান মাত্রেই ভাল, দেবতার খাস রাজ্যে আকাল ঢোকে না। সকলের সেরা এই কাশীধাম। দু-পয়সায় এই বড় ফুলকপি। চার পয়সা বেগুনের সের, দুধ চার আনা, ঘি দু-টাকা। গঙ্গার পোনামাছ ধড়ফড় করছে, ছ-আনা সেরে তাই বিকোয়। আরে ছি-ছি-ছি—বিধবা মানুষের খাওয়ার মধ্যে পোনা-মাছের কথা কী জন্যে এসে যায়!

সকলে মিলে স্টেশনে গিয়ে মনোরমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল। সন্ধ্যা বউটা ভারি মিশুকে, আরতির ঠিক উল্টো। গলায় গলায় ভাব জমেছে রাধারাণীর সঙ্গে।

সন্ধ্যা বলে, পিসিমা চলে গেলেন, আর তুমিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরমুখো ছুটবে, সে কিন্তু হবে না ভাই। বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে। দক্ষিণের ঘরে একা থাকতে পারবে না—তোমার ভাই থাকুকগে সেখানে। তুমি আর আমি দু-জনে পুবের কোঠায়। ভাইয়ের বদলে বোন।

কিন্তু ব্যবস্থা তার আগেই হয়ে গেছে। মোহিত এলে পুবের কোঠা ছেড়ে দিয়ে মনোরমা আর রাধি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে উঠেছিল। এবারে হারাণ নিজে দক্ষিণের ঘরে। রাধি মামির সঙ্গে মাঝের কোঠায় থাকবে।

সোহাগি বউয়ের উচ্ছল আনন্দময় সুরে রাধি বলে, ঘরের জন্য তো কিছু হচ্ছে না। কবে সমন এসে পড়ে দেখ। সেদিন কোন-কিছুতে মানাবে না। হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। মা কাশী চলে যাচ্ছেন, সেই খাতিরে এদ্দিন কিছু বলে নি। আর শুনবে না।

সন্ধ্যা বলে, সমন যাতে না আসে, সেই ব্যবস্থা কর। জামাইবাবুকে লিখে দাও না, তিনি এসে ঘুরে যান কয়েকটা দিন। ক্ষিধে মিটবে, প্রাণ জুড়োবে, কিছুদিনের মতো আর টান থাকবে না।

রাধি অন্তরঙ্গভাবে গায়ের উপর এসে বলে, সত্যি কথা বলি তবে বউদি। টানছে আমায় মন্টু আর মায়া। ছেলেটা আর মেয়েটা এমন করত—সময় সময় মনে হয়, পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে একবার তাদের কোলে-কাঁখে করে আসি।

সন্ধ্যা খিলখিল করে হাসে: এ যে আসলের চেয়ে সুদের দাম বেশি হয়ে গেল ভাই। নিজের কোলে আসুক, তখন আলাদা কথা। তত দিন ঝাড়া হাত-পা নিয়ে দিব্যি হেসেখেলে আমোদ করে বেড়াও। এই আমি যেমন আছি।

—আট—

সমন এসে গেল এরই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে। আগের ডাকের চিঠি এল, তারপরে এসে পড়লেন বিশ্বাসী প্রবীণ মুহুরি সুরেন বক্সী মশায়। ঝণ্টুর অন্নপ্রাশন। বিস্তর লোক জমবে। ছেলের মায়ের তো ওই অবস্থা। বার দুই-তিন উপর-নিচে করলেই বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘুরে পড়ে যায়। বাড়ির বড়বউ অতএব আগেভাগে গিয়ে আঁচলে ভাঁড়ারের চাবি বেঁধে সমস্ত গোছগাছ করবেন। বড়বাবু গোবিন্দও আসছেন। চক থেকে তিনি ভোজের মাছ কলাপাতা ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে আসবেন, বেশি আগে

আসা তাই সম্ভব নয়। কাজের ঠিক আগের দিন এসে পৌঁছবেন।

অমলা অপর্ণা অণিমা তিন বোন এসে পড়েছে। আত্মীয়-কুটুম্ব আরও অনেক। উৎসবের বাড়ি গমগম করছে। বিনামেঘে বজ্রাঘাত। গোবিন্দ নৌকো বোঝাই জিনিস-পত্র নিয়ে আসছিল, সেই নৌকো বানচাল। বাসুদেবপুর থেকে অল্প দূরে দুই গাঙের মোহনায়। দাঁড়ি-মাঝি সবাই জল ঝাঁপিয়ে ডাঙায় উঠল, শুধু গোবিন্দ ভেসে গেছে কোথা। অথচ সাঁতার সে ভালই জানত। কাল পূর্ণ হলে কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না—এ ছাড়া অন্য কি বলা যাবে?

একজন দাঁড়ি ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিল। রাত পোহালে এত বড় অনুষ্ঠান। যজ্ঞপন্ড তো বটেই—অনেকের সঙ্গে মুরারিও বাসুদেবপুরে ছুটল। সেখান থেকে মোহনায়, দুর্ঘটনা যেখানে হয়েছে। দড়াজাল নিয়ে জেলে নামানো হয়েছিল আগেই। মৃতদেহ পাওয়া গেল না। শীতকালে গাঙের টান প্রখর নয়। তবু এত দূরে ভেসে গেছে অথবা কুমিরে-কামটে এমন বেমালুম খেয়ে ফেলেছে যে একখানা হাড়ের পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাধারাণীকে জড়িয়ে ধরে অপর্ণা হাউ-হাউ করে কাঁদে। রাধারাণীর চোখে জল নেই, যেন সে পাথর। কী হল! নৌকো সত্যি সত্যি বানচাল, না কারসাজি শত্রুদের? ধুরন্ধর কবিরাজ পূর্ণশশীর কোন হাত আছে কিনা কে বলবে? কবিরাজের টাকা খেয়ে মাঝিমাল্লারা হয়তো কোন বিপজ্জনক দহের মধ্যে গোবিন্দকে আচমকা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পরে এই রকম রটিয়ে বেড়াচ্ছে। কত কী ভাবছে রাধি! হয়তো বা গোবিন্দ নিজেই মাঝিমাল্লাদের হাত করে নৌকো থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বউয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে সেই আতঙ্কে। এটাও একেবারে অসম্ভব নয়।

হঠাৎ এক সময় যেন সম্বিৎ পেয়ে রাধি অপর্ণার বাহুবেষ্টন ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে মণ্টুকে বুকে তুলে নেয়। মণ্টুকে ছেড়ে দিয়ে ঝণ্টুকে। ঝণ্টুকে নামিয়ে মায়াকে তুলে ধরে উঁচু করে। অশ্রুহীন শুষ্ক চোখে হাসছে যেন—কেমন এক ধরনের হাসি। রাধারাণীর এই বৃত্তান্ত যার কানে যাচ্ছে, চোখ মুছে সে কূল পায় না। এই বয়স আর এমন আশ্চর্য রূপ—কিন্তু কী কপাল নিয়ে জন্মেছে রে হতভাগী!

গা ভরে গয়না দিয়ে সাজিয়েছিল, এক একখানা করে খুলে নিতে হল। মুরারি এর মধ্যে হাঁ-হাঁ করে এসে পড়েঃ গয়না সমস্ত খুলো না মা। হাতের বালাজোড়া অন্তত থাকতে দাও। সাদা থান পরিও না, কালাপেড়ে ধুতি পরুন। নইলে চোখ তুলে চাওয়া যাবে না বউঠানের দিকে।

মেয়েরা বাপের বাড়ি উৎসব করতে এসেছিল। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল—বিদায় হয়ে গিয়ে বাঁচল যেন তারা। বাড়িটাই শ্মশানের মতো। শ্রাদ্ধশান্তি রাধারাণী করবে। অপঘাতে মৃত্যু, এর বিধিনিয়ম আলাদা—যেটুকু নিতান্ত নইলে নয় সেইভাবে অতি-সংক্ষেপে দায়সারা হল। মুরারি সান্ত্বনা দেয় মাঝে মাঝেঃ অমন ঝিম-ধরা কেন বউঠান? কী হয়েছে! ছবির অবস্থা জানেন—সংসারের সে কুটোগাছটা তুলে ধরতে পারে না। মণ্টু-ঝণ্টুর জ্যাঠাই-মা আপনিই এবার হাল ধরে বসুন। হালদার-বাড়ির সর্বময়ী আপনি। আমরা সকলে আপনার তাঁবেদার।

যথাসময়ে ছবি আঁতুড়ঘরে গেল। ঝণ্টুকে নিয়ে ভয় ছিল—তার জন্মের সময় যেমনটা হয়েছিল মণ্টুকে নিয়ে। কী কান্না, কী কান্না! ঝি-চাকর এবং বাপ মুরারি অবধি নাজেহাল। মায়ের কাছে যাবার জন্য কেঁদে কেঁদে শেষটা অসুখ করে গেল।

এবারে একা রাধারাণীই সবগুলোকে সামলাচ্ছে, অন্য কাউকে লাগে না। বাড়িতে বাচ্চা ছেলেপুলে আছে কিনা বোঝাই যায় না। সন্ধ্যার পরেই রাধির এপাশে-ওপাশে তারা শুয়ে পড়ে।

মক্কেলের কাজ করতে করতে মুরারি সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। পেট চেপে ধরেছে। ভিতরে এসে রাধারাণীর ঘরের সামনে একটু দাঁড়ায়ঃ ঝন্টু-মন্টু ঘুমিয়েছে? মরে যাচ্ছি বউঠান, ফিকব্যথাটা আবার উঠেছে। একবার উঠতে পারেন যদি—বোতলে গরম জলে ভরে আমার ঘরে দিয়ে যান। এই কাজগুলো ছবি বেশ পারে। কী যে যন্ত্রণা—ও—ও—ও—

কাতরাতে কাতরাতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অসুস্থ হয়েছে মানুষটা, এত কৈফিয়তের কি? রাধারাণী উঠে পড়ে জল গরম করে বোতলে ভরে নিয়ে গেল। মুরারি যন্ত্রণায় মুখ আকুঞ্চিত করে ও-ও—আওয়াজ করছে এক একবার। দেহ ধনুকের মতন বেঁকে উঠছে।

জলের বোতল হাতে রাধারাণী দাঁড়িয়ে আছে। এ মানুষ নিজের হাতে সেঁক দেবে কী করে? কষ্ট দেখে রাধির চোখে জল আসবার মতো। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, তবু মুরারি দেখতে পাচ্ছে না। দেখে তারপর টেনে টেনে বলছে, এসে গেছেন? ফ্লানেলের টুকরোটা দিন আগে, ড্রয়ারে রাখা আছে। গরম বোতল গায়ের উপর রাখা যাবে না তো!

কম্বল একটা মুরারির গায়ে। বাঁ-হাতখানা বেরিয়ে রাধারাণীর হাত থেকে ফ্লানেল নিয়ে আবার কম্বলের তলে ঢুকে গেল। চোখ বুজে সহসা আর্তনাদ করে ওঠে। ব্যথাটা বড় চাগিয়ে উঠল বুঝি? খানিকটা সামলে নিয়ে আবার হাত বাড়িয়ে মুরারি মিনমিন করে বলে, দিন এবারে বোতল।

বোতল গেল কম্বলের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে বের করে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল। রোগির পাশে দাঁড়িয়ে রাধি এখন কি করতে পারে ভেবে পায় না। বলে, কী হল?

মুরারি টেনে টেনে বলে, পারছি নে আমি। পেটের উপর ফ্লানেল রেখে বোতল গড়িয়ে দিচ্ছিলাম। হাত কাঁপছে কিনা। ফ্লানেল সরে গিয়ে খালি চামড়া পুড়ে গেল হয়তো।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই উকিল কথার ঝড় বইয়ে দেয় হাকিমের সামনে। মামা হারাণ মজুমদারের মুখে রাধি অনেকবার এসব শুনেছে। সেই মানুষ কী রকম অসহায়! ক্ষীণস্বর কানে যায় কি না যায়।

মুরারি বলছে, ছবি নেই আর ব্যথাটা কিনা আজকেই উঠল। রোগের সেবায় ছবি বড় ভাল।

রাধারাণী মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি চেষ্টা করে দেখব?

পারবেন আপনি? নাঃ, থাকগে। দেখুন, এমন কষ্ট—এখন যদি বিষ পাই তো খেয়ে নিই। এ যন্ত্রণার চেয়ে মরণ ভাল।

রোগি তো শিশুর সামিল। নয়তো এমন কথা বেরুচ্ছে মুরারি হেন মানুষের মুখ দিয়ে। মন্টুর যদি এমনি হত, রাধি চুপ করে থাকতে পারত? বসে পড়ল রাধি রোগির পাশে।

ব্যথা কোনখানটা, দেখিয়ে দিন।

রাধারাণীর হাত ধরে মুরারি দেখিয়ে দেয়। নরম হাত ছাড়ছে না, এঁটে ধরেছে জোর করে। যন্ত্রণার আক্ষেপে হয়তো। সহসা বোতল কেড়ে ফেলে দিয়ে কঠিন

মুঠিতে হাত ধরে যন্ত্রণার সমস্ত জায়গায় বুলিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে। পাথর হয়ে গেছে রাধি, বুক ঢিবঢিব করছে। কোথায় ফিকব্যথা? রোগি নয়, যেন মত্ত সিংহ। অভিনয় তবে সমস্ত? তিন মাস বিয়ের পরে আজও রাধি কুমারী। উঠে পালাবে সে শক্তিও নেই তার দেহে। শুধু একবার কেঁদে পড়েঃ আপনি যে আশ্রয় আমার—।

কাঁদছে রাধারাণী। বাঁধ-ভাঙা অশ্রুস্রোত। মুখে কথা নেই। আষ্টেপিষ্টে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে সেই খাটের প্রান্তে। এ কী হল? ছবি যে তার বোনের মতো। তাকে নিয়ে ছবির কত ভরসা। সেই ছবির উপরে বিশ্বাসঘাতকতা!

মুরারী ধমক দিয়ে ওঠেঃ কাঁদছ কেন, কী হয়েছে? নিচে চলে যাও। পুতুল হয়ে বসে থেক না, চোখ মোছ। রান্নাঘরের ওরা সব জিজ্ঞাসা করবে। ভাল করে মুছে ফেল। ছি-ছি, কী ন্যাকা মেয়েমানুষ তুমি! একটা কথা জেনে রাখ, তোমায় আমি ফেলব না কোনদিন।

রাধারাণী গুটিসুটি পা ফেলে নিচের তলায় নিজের ঘরে এল। যাবে না রান্নাঘরে, কারো সামনে যাবে না। বামুন-মাসি ডাকতে এসেছিল, খাবে না বলে দিয়েছে। অশুচি দেহ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পচা ঘায়ের মতন থিকথিক করছে। জ্বলছে। কী করবে, কী এখন করতে পারে সে? উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে মেজেয়। খাটের উপরে বিছানায় যেতে পারে না, মণ্টু-ঝণ্টু ঘুমুচ্ছে সেখানে। তাদের অকল্যাণ হবে।

স্বামীর উপর ভালবাসায় মন ভরে যায় হঠাৎ। কর্কশভাষী মানুষটা—অক্ষম অপদার্থ নির্বোধ। ফুলশয্যা ও তার পরের রাত্রি এক শয্যায় ছিল মানুষটার সঙ্গে। আর বাসর-রাতটাও যদি ধরতে হয়। তিনটি ব্যর্থ রাত্রি। তারই লজ্জায় যুবতী বউকে ঘুমন্ত ফেলে ঘোর থাকতে পালিয়ে গেল। চেহারাটা এরই মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে, অনেক ভেবে ভেবে একটু-আধটু মনে আসে।

কী ভেবে রাধারাণী পিছন-দরজাটা খুলে ফেলল, ফুলশয্যার রাত্রে গোবিন্দ যেমন খুলেছিল। খিড়কির ঘাটে গিয়ে মাথায় জল ঢালে। জল ঢেলে শীতল হয় না, জলে নেমে ডুব দেয়। ডুব দিল পাঁচটা-সাতটা-দশটা—।

থাকবে না এ বাড়ি, থাকবার তো উপায় রাখছে না। ওই যে কাণ্ড হয়ে গেল, মুরারি ছোঁক-ছোঁক করে সেইদিন থেকে। মক্কেল ভাগিয়ে সকাল সকাল ভিতর-বাড়ি চলে আসে। মণ্টু-ঝণ্টু ঘুমিয়েছে, রাধিও হয়তো ঘুমের আবিল এসেছে একটু। মুরারি পা টিপে টিপে এসে হাত ধরে টান দেয়। হেঁচকা টান—ডানা ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় বুঝি টানের চোটে। এস, চলে এস মুরারির ঘরে। নিরালা ঘর, ছবি এখনো আঁতুড়ে আটক পড়ে আছে। সবুর সয় না মুরারির, গড়িমসি করলে রেগে যায়। বড্ড মাথা ধরেছিল একদিন রাধির, তাতেও রেহাই হল না। সেই রাত্রির অপরাধের পর থেকে দেহটার উপর যেন মুরারির পুরো আধিপত্য।

একদিন ঝণ্টু ঘুমিয়েছে, মণ্টুটা চোখ পিটপিট করছে তখনো। তেমন চেষ্টা করলে কি আর ঘুমত না? রাধির চালাকিঃ থাকুক জেগে, বাচ্চা জেগে থাকায় একটা রাত্রি যদি মাপ হয়ে যায়।

মুরারি এসে পড়েছে। রাধি ফিস ফিস করে বলে, ঘুমোয় নি। এই দেখুন—

আচ্ছা বিচ্ছু হয়েছে তো। কাল আফিঙের বড়ি এনে দেব, দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিও। অজ্ঞান হয়ে ঘুমুবে।

ষাট, ষাট! বাপ হয়ে এমন কথা বলতে পারে, মুখে আটকায় না। চলে যাবে রাধি যেদিকে দু-চোখ যায়। কিন্তু মন্টু-ঝন্টু এই যে দু-ভাই—দশভূজার কার্তিক-গণেশ। চলে গেলে কে তাদের খাওয়াবে? থাবা দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবে কে? তার উপরে আছে মায়া। মায়াবিনী। জ্যাঠাইমা-জ্যাঠাইমা করে সারাদিন পায়ে পায়ে ঘোরে।

অতিকায় মাকড়সার মতো মুরারি কিলবিল করে জড়িয়ে ধরে রাধির রক্তশোষণ করছে। কান্না পায়, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। খিড়কির ঘাটে গিয়ে অনেকগুলো ডুব দিয়ে এসে খাটে উঠে মন্টুকে জড়িয়ে ধরে। শিশু কোলের মধ্যে নিয়ে সারাদেহ শীতল হয়। ঘুম আসে তখন।

—নয়—

দ্বিজপদ ঘুঘু লোক। হাটে হাটে কেনাবেচা করে। চারজন ভাগিদার। ভাড়া-করা এক ডিঙি আছে ওদের। কেশবপুর ডাঙা-অঞ্চলের হাট। এই শীতকালে খেজুর-গুড় ওঠে প্রচুর, দামও সস্তা। সোমবারের হাটে গুড় কিনে ডিঙি বোঝাই করল। ওদিকে আবাদ-এলাকার হাট কাটাখালিতে ধান-চালের আমদানি; আবার ডাঙা-অঞ্চলের জিনিসের টান খুব সেখানে। বুধবার কাটাখালির হাটে দ্বিজপদরা গুড় নিয়ে নামল, কিনল ধান। এই কাজ-কারবার। দু-দশ টাকা যা মুনাফা হল, তাতেই খুশি। টাকা তো ঘুরছে অবিরত। আরও আছে। চিটেগুড় কিনে মাটি মেশাল দেয়, ধান-চালে চিটে আর কাঁকর। বাড়তি মুনাফা এই প্রক্রিয়ায়।

এক হাটবারে বেশি রাতে ঘরে ফিরল। মুনাফা ভাল হয়েছে, মনে স্ফূর্তি। হাটে মোরগ কিনে কেটেকুটে তৈরী করেছে ডিঙিতে বসে। চার ভাগিদার মিলে ফিস্টি হবে। কথা উঠল, এইসব খাসি-মোরগে চই দিলে জমে ভাল। চই একরকম লতানে গাছ, ঝাল-ঝাল স্বাদ, পানের মত পাতা, দেয়াল অথবা মোটা গাছের গাটে শিকড় বসিয়ে লেপটে থাকে। হালদার বাড়ির খিড়কির পাঁচিলে আছে একটা চইগাছ—খানিকটা ডাল কেটে আনলে হয়। এ আর কী এমন শক্ত—কাস্তে নিয়ে দ্বিজপদ বেরুল। পাঁচিলের এক জায়গায় খানিকটা ভেঙে গেছে গত বর্ষায়, এখনো মেরামত হয়ে ওঠে নি—সেইখানে উঠে বসে কাস্তে দিয়ে নরম হাতে পোঁচ দিচ্ছে। দালানে সেই দিককার একটা দরজা খুলে গেল হঠাৎ। শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না। আড়াল নেই দ্বিজপদের কোনদিকে। এক্ষুণি তো দেখে ফেলবে। যে মানুষ বেরিয়ে এল দেখেই চেঁচাবে। তৈরি দ্বিজপদও। লাফ দিয়ে পড়বে ওপারে। দৌড়, দৌড়—তারপর ঝুপ করে বসে পড়বে একটা ঝোপজঙ্গল দেখে। দেয় লাফ আর কি!

কিন্তু যে বেরুল, সে-ও আর এক চোর। মুখ দেখা না যায়, কেউ চিনতে না পারে—এমনিভাবে ঘাড় নিচু করে হনহন করে চলল। ঘুরে চলল বাইরে নয়—ভিতর দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির তলায়। যতই মুখ নামাক, দ্বিজপদ চিনেছে মানুষটিকে। মজাদার ব্যাপার বলে ঠেকছে—খুঁটিয়ে দেখতে হয় তবে তো! লাফটা পাঁচিলের ওধারে না দিয়ে এধারে দিল। যে ঘর থেকে মানুষটা বেরিয়ে এসেছে, উঁকিঝুঁকি দেয় সেখানে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাড়িতে তিনজনে তারা গালিগালাজ করছে চই নিয়ে না ফেরার দরুন। আজকে থাকল এই অবধি, দেখতে হবে আর একদিন। চইগাছ ধরে টেনে-হিঁচড়ে পাঁচিলের উপর উঠল। দিল লাফ ওপারে।

দিন তিনেক পর কাটাখালির হাট থাকা সত্ত্বেও ঘাটে ডিঙি বাঁধা। হাট কামাই

দিল আজ। ব্যাপারবাণিজ্য তো বারমাস আছে, এমন মজা ক'দিন পাওয়া যায় ?

পাঁচিল টপকে এসে রাধারাণীর ঘরের পিছনে চারজনে তুমুল চেঁচাচ্ছে ঃ চোর, চোর! ঘরের মধ্যে চোর ঢুকে পড়েছে।

চাকরবাকর সব বেরিয়েছে। সুরেন বক্সী মুহুরি মশায় উঠেছেন। চোরের নামে দু-চারজন পাড়ার মানুষও সদর ফটক দিয়ে ঢুকে পড়েছে। বুড়ি তারকেশ্বরী শীতের মধ্যে তুরতুর করে উঠে দোর ঝাঁকাচ্ছেন ঃ বড় বউমা, ওঠ। চোর ঢুকেছে তোমার ঘরে।

আর দ্বিজপদ ওদিকে বিশদ ভাবে চোরের বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে ঃ আমাদের বাড়ি গিয়েছিল সিঁদ কাটতে। তাস-টাস খেলে চারজনে শুয়ে পড়েছি। খাঙে-খালে-ঘোরা মানুষ মশায়, চোখ বুজে ঘুমুই, কান দুটো ঠিক সজাগ থাকে। তাড়া করেছি তো পাঁই-পাঁই করে ছুটল। ছুটতে ছুটতে এই বাড়ি। ভাঙা পাঁচিলের ওই জায়গা দিয়ে তরতর করে উঠে পড়ল। আমরাও উঠেছি। চোর লাফ দিয়ে পড়ল তো পিছন পিছন আমরাও। ভুল করে বোধ হয় কুঠুরির দোর দেওয়া হয় নি। ঘরে ঢুকে পড়ে চোর খিল এঁটে দিল। বাবুরা পাঁচিলটুকু কেন যে ভাঙা অবস্থায় রেখেছেন—

এমন ঝাঁকাঝাঁকি, দরজা খান-খান হয়ে পড়ে আর কি! মন্টু জেগে উঠে ভয় পেয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। রাধারাণী খিল খুলে দু-দিকে কবাট টেনে দিল। তারকেশ্বরী ঢুকলেন। পিছনে মুহুরি মশায় আর পাড়ার ইতরভদ্র যারা এসেছে।

ওরে মুরারি, তুই ?

চোর কোথায়, আমাদের ছোটবাবু যে!

ছোটবাবু এখানে ? কী সর্বনাশ!

উকিলবাবু যে! নমস্কার—

তারকেশ্বরী গর্জন করে ওঠেন ঃ কালামুখি শতেকখোয়ারি, জলজ্যান্ত ভাতারটা চিবিয়ে খেয়ে এবার দেওরের ঘাড়ে লেগেছিস ?

আর, কী আশ্চর্য—সারা বাড়ি এত হৈ-চৈ, ছবি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে উপরের ঘরে। আঁতুড়ের মেয়াদ শেষ করে ক'দিন হল ঘরে এসে উঠেছে। মুরারি অতএব নিজের ঘর ছেড়ে নিচের তলায় রাধির ঘরে আসে। একরকম চোখের উপরেই এত বড় কাণ্ড—ছবি-বউ কোন-কিছু জানে না। এমন হাবাগবা মেয়েমানুষ এই যুগে! কপালও সেইজন্যে পুড়ছে।

মুরারি এক ছুটে উপরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তবু কি ঘুম ভাঙে না ছবির ? এবারে তারকেশ্বরী মুরারির উপর গর্জাচ্ছেন ঃ ওই তো যত নষ্টের গোড়া। দেখেশুনে পছন্দ করে কালসাপিনী ঘরে এনে তুলল। কুল-মান সবসুদ্ধ যায় এখন। লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রাখল না।

রাধারাণী স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। উঠে এবার পিছনের দরজা খোলে। দ্বিজপদর দলটা যেখানে। কাউকে সে গ্রাহ্য করল না, কোনদিকে তাকাল না। দুমদুম করে দৃপ্ত পা ফেলে সকলের চোখের উপর দিয়ে ঘাটে গেল। স্নান করল মাঘের নিশিরাত্রে। ভিজে কাপড় সপসপ করতে করতে ফিরে গেল ঘরের মধ্যে।

দ্বিজপদ ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে। মুরারি হালদারকে ধরিয়ে মজা করতে এসেছে তারা। হালদার-বাড়ির রূপবতী ভ্রষ্টা বউটাও স্নান করে ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে চোখের উপর দিয়ে এমনি বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে গেল, এটা উপরি লাভ।

সুরেন মুহুরিকে তারকেশ্বরী বলছেন, এ বাড়িতে আর তিলার্ধ নয় মুহুরি মশায়।

পাপের আগুনে আমার সর্বস্ব যাবে। যা করবেন, এই রাত্রের মধ্যেই। পরামাণিক ডেকে মাথা ন্যাড়া করে দিন। ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে কুলো বাজাতে বাজাতে স্টেশনে নিয়ে ভোরের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসুন। যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। হাজার চুলো হাঁ করে আছে ওসব নষ্ট মেয়ে-মানুষের জন্য।

একটু পরে আবার হাঁক দিয়ে ওঠেন ঃ কই গো, কে যাচ্ছে পরামাণিক-বাড়ি ?

সুরেন বক্সী বিচক্ষণ মানুষ, স্বর্গীয় কর্তার আমল থেকে এবাড়ি আছেন। কেউ না শোনে, এমনি ভাবে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ওসব সেকালে হত। এখন করতে যাবেন না মা। আইন খারাপ। বউমার মামা লোকটাও ফিচেল খুব। ভারি মামলাবাজ। ঘোল ঢালাঢালি করলে তো জুত পেয়ে যাবে, মোটা খেসারত আদায় করে ছাড়বে। যা-কিছু করবেন মেজাজ ঠান্ডা রেখে খুব হিসাবপত্র করে। উকিলবাবুকেই বরঞ্চ একবার জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাক।

তারকেশ্বরী অবাক হয়ে বলেন, মুরারিকে জিজ্ঞাসা করতে যাবেন—সে কী বলবে ?

প্রবীণ মুহুরি শতকণ্ঠে তারিপ করেন ঃ না মা, আপনি জানেন না। ভারি সাফ মাথা আমাদের ছোটবাবুর। আইনের দিক দিয়ে বলুন আর সামাজিক মানমর্যাদার দিক দিয়ে বলুন, ভেবে-চিন্তে সবচেয়ে ভাল পথটাই উনি বাতলে দেবেন। দেখে আসছি তো। কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না—শুধু দুটো-একটা পরামর্শ নেবার জন্য মুঠো-ভরা ফী নিয়ে সদর থেকে কত মানুষ ধন্না দিয়ে পড়ে। গুণ থাকলেই আসে। বলি উকিলের কিছু অভাব আছে সদরে ?

তারকেশ্বরী ইতস্তত করছেন ঃ সে তো ঠিক কথা। তবে কিনা বুঝতে পারছেন বক্সী মশায়,আমার সুখের ঘর ভাঙবার জন্য শয়তানী কুহকিনী ফাঁদে নিয়ে আটকেছে—

হেসে হেসে ঘাড় নেড়ে সুরেন বলেন, কিছু না, কিছু না, ছোটবাবুকে আটকাবে সে মানুষ আজও জন্মে নি। ফাঁদে উনি ইচ্ছে করে ধরা দেন। ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসতে একটা মিনিটও লাগে না।

নিচুগলায় এমনি সব কথাবার্তা। ঘরের ভিতরে রাধির কানে যায় না। তারকেশ্বরীর হাঁকডাকগুলোই শুধু সে শুনতে পেয়েছে। শুনে বড় ভয় করে। মাথা ন্যাড়া করবে বলে—মেঘের মতন ঘন ঠাসা চুল পিঠ ছাড়িয়ে পড়ে, নাপিত এসে ক্ষুর চালাবে তার উপর। তাড়াতাড়ি সে দরজা এঁটে দেয়। জনতার মধ্য দিয়ে কুলো পিটিয়ে তাড়াবে, সেটায় তত ডরায় না। এমন রসের খবর সকাল হতে না হতে এমনিই তো মুখে-মুখে এদেশ সেদেশ ছড়িয়ে পড়বে। কুলোর আওয়াজ না হলেও লোকে দেখিয়ে দেখিয়ে তার কেচ্ছা বলাবলি করবে।

— দশ —

সকাল হল। বেশ বেলাও হয়েছে। মুরারির সঙ্গে সত্যি সত্যি পরামর্শ হয়েছিল কিনা, প্রকাশ নেই। কিন্তু তারকেশ্বরীর তড়পানি একেবারে বন্ধ। যেন কিছুই হয় নি—রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্নে বুড়িমানুষ ওই রকম চেঁচামেচি করেছিলেন। চেঁচামেচির উত্তেজনার পর ঘুমুচ্ছেনই বোধ হয় ক্লান্তিতে। মুরারি শয্যা ছেড়ে দাঁতন ঘষে জিভছোলা দিয়ে সশব্দে জিভ পরিষ্কার করে যথানিয়ম কতকগুলো নথিপত্র নিয়ে হেলতে দুলতে বাইরের ঘরে গিয়ে বসেছে। চা চলে গেছে সেখানে এতক্ষণ। এবং মক্কেলও নিশ্চয় জমতে শুরু করেছে। রোজ যেমন হয়ে থাকে।

ভয়ে ভয়ে রাধি দরজা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিয়ে চারিদিক দেখে নেয়। না, কোনদিকে কেউ নেই। তবু সে বাইরে যাচ্ছে না। কিছুতে নয়। হয়তো বা টুক

করে ধরে নাপিতের সামনে বসিয়ে দিল। সে আতঙ্ক এখনো কাটে নি। মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাকে স্টেশনে……

দরজা ঠেলে এসে ঢুকল—ওমা আমার কি হবে—এ যে ছবি। কাঁদছে ছবি। কোথায় রাধি মুখ ঢাকবে, ভেবে পায় না। ছবি কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে। কাল রাতে সকলের সামনে এত লাঞ্ছনাতেও রাধারাণীর চোখে জল আসে নি, ছবির কান্নায় অপরাধী সে-ও এবার কেঁদে ভাসাল। রাধির চোখের জলে ছবির বুক ভাসছে, ছবির চোখের জলে রাধির মাথা।

রুদ্ধস্বরে রাধি বলে, বয়সে ছোট তবু সম্পর্কে বড়, সেজন্যে পায়ের ধুলো নিলে সেদিন। তার এই মান রাখলাম। জড়িয়ে ধরেছ কেন, পায়ের চটি খুলে মার আমায়। কেঁদে কেঁদে এত শাস্তি দিও না ভাই।

ছবি বলে, কাঁদছি ওই মন্টু-ঝন্টু-মায়ার কথা ভেবে। ওদের আর ছুঁতে পারবে না তুমি। শাশুড়ি বলে দিয়েছেন, ছুঁলে নোড়া দিয়ে হাত থেঁতো করে দেবেন তোমায়। আমারই ভুলের জন্য এতদূর হল। তোমার হেনস্থার জন্য আমি দায়ী।

অবাক হয়ে গেছে রাধারাণী। এ কোন কথা বলছে ছবি, তার দায়টা কিসে হল?

ছবি বলে, এতখানি বুঝতে পারি নি। ঘুমিয়ে পড়ে থাকি, শাশুড়ি বলেন। বাজে কথা, মিছে কথা। ঘুম আমার চোখে নেই। চোখ বুঁজে বুঁজে দেখি সমস্ত। দাঁতে দাঁত চেপে থাকি, প্রাণের যন্ত্রণা অন্যের কানে না যায়। উনি উঠে বেরিয়ে চলে যান—জানি নে জানি নে করে ঘুমই। সেবারে বিমলা-ঝিয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়ল। আমি কিন্তু তাতে সোয়াস্তি পাই। ভগবানের দয়া। থাকুক পড়ে ওই নেশা নিয়ে, আমায় খানিকটা রেহাই দিক। কিন্তু কদ্দিন আর একটা জায়গায়! ছুতো করে একদিন ঘাড় ধরে ঝিকে বাড়ির বার করে দিল। এমন আরও হয়েছে। তবু ভাবতে পারি নি ওই পাষণ্ড বাড়ির বউয়ের সর্বনাশ করতেও পিছপাও নয়। তোমার ঘরে চলে যায়, জানলে আড় হয়ে পড়তাম। যা হবার আমার উপর দিয়েই হোক।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে, গোড়া থেকে ওর বদ মতলব। এখন সেটা বুঝতে পারি। বটঠাকুর কিছুতে বিয়ে করবেন না, ও একেবারে আদা-জল খেয়ে লাগল। নিজে বলল, মাকে দিয়ে বলাল। পূর্ণশশী কবিরাজের সঙ্গে বটঠাকুরের ভালবাসাবাসি—তাঁর কথার উপর কক্ষণো 'না' বলবেন না। সেই জন্য চক থেকে কবিরাজ মশায়কে খবর দিয়ে নিয়ে এল। ফুসফুস-গুজগুজ চলল দু-জনে, টাকা ঘুষ দিল কিনা জানি নে। তা-ও বিচিত্র নয়। তখন জানি, বড় ভাই উদাসীনের মতো চকের কাছারি পড়ে থাকেন, তাকে সংসারে টেনে আনছে। হায় আমার পোড়াকপাল।

শুনতে শুনতে রাধারাণী পাথর হয়ে যায়। ছবির দু-চোখে জল টলটল করছে। চোখ মুছে সে বলে, পতি-পরম-গুরু—বলতে নেই। কিন্তু ও যদি মরত, আমি হয়তো বাঁচতে পারতাম। এর উপর আবার একটা যদি আসে, আঁতুড়ঘর অবধি করতে হবে না, তার আগেই চোখ উলটে পড়ব।

দুপুরবেলা পাথরের থালায় রাধির ভাত-তরকারি দিয়ে গেল। পাথরের থালা মরে না, মাজতে ঘষতে হয় না। দিয়ে গেল ঝি এসে, বামুন-মাসি হাতে করে দিল না। ঘরের সামনে রোয়াকের উপর ঠকাস করে রেখে গেল। রান্নাঘরে ঢোকা অতএব মানা। রান্নাঘরে যখন, ঠাকুরঘরে তো বটেই। অন্য কোন কোন জায়গায় সঠিক বলা যাচ্ছে

না এখনো। সেই শঙ্কাই রাধি সারা দিনমানের মধ্যে একটি বার শুধু বেরিয়ে খিড়কি-পুকুরে ডুব দিয়ে এসেছে।

ভর সন্ধ্যায় উপরের বারান্ডায় মণ্টু গলা ফাটিয়ে কাঁদছে জ্যাঠাইমা-জ্যাঠাইমা করে। মায়ার বয়স হয়েছে, তাই শব্দ করে কাঁদে না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, আলো জ্বালবে কোন লজ্জায়? সেই অন্ধকারে রাধি উৎকর্ণ হয়ে বসে বাচ্চা ছেলের কান্না শোনে। আহা, একজন কেউ কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করতে পারে না? সবাই কি কালা হয়ে গেল? ছবি নিজে তো অসুস্থ, সে পারবে না। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে মণ্টু আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়বে ঠাণ্ডা মেঝের উপর। সারা রাত্রি পড়ে থাকবে, বিছানায় তুলে শোয়াবার মানুষ হবে না।

ঘরের দরজা ফাঁক করে একজন ঢুকল অন্ধকারে। টিপিটিপি পা ফেলার ধরন দেখে বুঝেছে। কোর্ট থেকে ফিরে জলটল খেয়ে মুরারি এবারে বাইরে-বাড়ি যাচ্ছে। রাধিকে প্রবোধ দিতে এসেছে বোধ হয়। দুটো ভাল কথা বলবে, চোখের জল মুছিয়ে দেবে। তা নয়—টুক করে একখানা খাম ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুতপদে মুরারি বেরিয়ে চলে যায়।

জানলার ধারে গিয়ে একটা কবাট খুলে রাধি আঁটা খাম ছিঁড়ে ফেলল। কী লিখেছে না জানি। চিঠি নয়, এক বর্ণ লেখা নেই—দশ টাকার নোট তিনখানা।

হিসাব চুকিয়েবুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। বিমলা-ঝিকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছিল—তারই রকমফের। রাধারাণীর মাথার মধ্যে চনচন করে ওঠে। ভয় হল—ব্রহ্মতালু জ্বলে গেছে, দুম করে মরে পড়ে যাবে এইবার। কিন্তু কিছুক্ষণ যে বাঁচার দরকার। মুরারির মুখোমুখি হবে বাইরে-বাড়ি গিয়ে। মক্কেলরা এসে থাকে, আরও ভাল—তাদের সামনেই বোঝাপড়া হবে।

সেরেস্তায় মক্কেল জমে নি এখনো। সুরেন মুহুরিও নেই, একলা নবকান্ত। খুব ধমকাচ্ছে মুরারি তাকে: রায়চৌধুরি মশায় আটটায় এসে পড়বেন। সারা সকাল বসে বসে রেহেনি-খতের মুশাবিদা করলাম, কাল রেজেস্ট্রি হবে। দোয়াতসুদ্ধ কালি ঢেলে তুমি তার উপর চিত্তির করে বসে আছ।

নবকান্ত বলে, আমি নই ছোড়-দা, বেড়ালে ঢেলেছে। আপনারই পোষা বেড়াল। তাকের উপরে শলা-ইঁদুর ঘুরছিল, তাড়া করেছে। সেই সময় দোয়াত উল্টে পড়ল।

কাগজপত্তর হাতবাক্সে কেন তুলে রাখ না? আমি জানি নে, কিচ্ছু জানতে চাই নে, এক্ষুণি সমস্ত নকল করে দিতে হবে, রায়চৌধুরি মশায় আসবার আগে।

বিপন্ন মুখে নবকান্ত বলে, চার ফর্দ, পুরো এপিঠ-ওপিঠ লেখা—

গর্জন করে উঠে মুরারি বলে, চাই আমি আধঘণ্টার মধ্যে। মর আর বাঁচ, করে দিতে হবে। না পারবে তো পথ দেখ। অকর্মা পুষতে পারব না। ঢের মানুষ খোশামোদ করছে আমার এই সেরেস্তার কোণে একটু জায়গা পাবার জন্য।

রায় দিয়ে মুরারি টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে খবরের কাগজ টেনে নিল। খসখস করে অতি-দ্রুত নবকান্তর কলম চলছে। কলম ফেলে তড়াক করে সে দাঁড়ায়।

মুরারি বিরক্ত হয়ে বলে, চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল—শরীর গরম না হলে হাত আর চলে না বুঝি? নবাব! ছুতো করে এবার চায়ের আড্ডায় গিয়ে বসবে।

জবাব না দিয়ে নবকান্ত সাঁ করে বাইরে চলে যায়। কাগজ থেকে চোখ তুলতেই টের পাওয়া গেল, কেন তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সে। রাধারাণী ঢুকছে। ভেবেছে কী ছোঁড়াটা। কাজের মানুষ মুরারি এখন এই সদরঘরে বউঠানের সঙ্গে বুঝি প্রেমালাপে বসে যাবে—সেই সুযোগ করে দিয়ে গেল?

খবরের কাগজে মুরারি পুনশ্চ গভীরভাবে নিবিষ্ট। রাধাধাণী বলে, টাকা কেন দিয়ে এলে?

নোট তিনটে ছুঁড়ে দিল সে মুরারির মুখের উপর।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে মানুষ প্রথমটা যেমন কিছু বুঝে উঠতে পারে না, তেমনি নিরীহ দৃষ্টিতে মুরারি তাকাচ্ছে, অ্যাঁ—?

কিসের দাম দিয়ে এলে তাই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যা নিয়েছ, টাকায় তার শোধ হয় না।

যেন ভারি একটা রসিকতার কথা, মুরারি এমনিভাবে টেনে টেনে হাসে। উকিল-মানুষ, কথা বেচে খায়, মুখের আড় নেই। হাসি থামিয়ে বলল, দোকান খুলে প্রথম যে বউনির টাকা—কম হোক, বেশি হোক—কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখতে হয় বউঠান। বাণিজ্য ভাল জমে। টাকা অমন ছুঁড়ে দিও না, তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাও।

জবাব শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে নেই রাধারাণী, আগেই ছুটে বেরিয়েছে। ভিতর-বাড়ি থেকে একবার বাইরে এসেছে, আর ঢুকল না। চলল। কোথায় যাচ্ছে ঠিকঠিকানা নেই। বড়ঘরের বউ হয়ে ছিল, পথও জানা নেই এ জায়গার। শুধু এই জানে, রাজশয্যা পেতে দিলেও হালদার-বাড়ি আর থাকতে পারবে না। সকলে দূরে দূরে করে থাকে, ভাতের থালা রোয়াকে এনে দিয়ে ঝি হয়তো স্নান করে, অথবা গায়ে তুলসির জল ছিটায় শাশুড়ির নির্দেশ মতো। সমস্ত সওয়া যায়। কিন্তু মন্তু-ঝন্টু কেঁদে খুন হচ্ছে, কানে শুনেও তাদের ছুঁতে পারবে না—এমন জায়গায় থাকে রাধি কেমন করে?

কনকনে শীত পড়েছে। সন্ধ্যারাত্রি হলেও মফস্বল শহরে যেন রাত দুপুর। পথে একটি মানুষ নেই। ছ্যাকড়া-গাড়ি একটা-দুটো কেবল মাঝে মাঝে। রাধারাণীর পক্ষে ভাল হয়েছে—ঘোমটা টেনে সে চলেছে। সর্বনেশে রূপটা কারো চোখে না পড়ে। হালদার-বাড়ির ভ্রষ্টা বউটা পথে বেরিয়েছে, কেউ টের না পায়। তাহলে শীত যতই পড়ুক, পথ এমনধারা ফাঁকা থাকবে না। এই কিছুদিন আগে দুই মাথাওয়ালা মানুষ এনেছিল এই শহুরে—দু-পয়সা করে টিকিট। টের পেলে রাধারাণীকে দেখতেও তেমনি লোক জমে যাবে। ঘোমটার ভিতর দিয়ে এক-একবার রাধি এদিক-সেদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখে। না উঁকিঝুঁকি দেবার মানুষ নেই। যৌবন বয়সে পা দেবার পর এমন আরামের একলা যাওয়া কালেভদ্রে কদাচিৎ ঘটেছে।

হঠাৎ রাধি দাঁড়িয়ে পড়ে। সারি সারি টিনের চালা অদূরে। টেমির আলো জ্বলছে। হাটতলা—আন্দাজে বুঝেছে জায়গাটা। হাটের বার নয়, তবু শেষ রাত্রের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া এ জায়গা কখনো নিশুতি হয় না। একটি-দুটি খদ্দের এখনো দোকানগুলোয়। পাশা খেলছে কোন ঘরে, প্রচণ্ড চিৎকার করে দান ফেলছে। মাটির ঢেলার উপর হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না চাপিয়েছে একটা চালার নিচে—

ওরে বাবা! রাধি সাঁ করে ডাইনে ঘুরল। দ্রুত পা ফেলছে। কেমন এক আচ্ছন্ন

ভাব—কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই বুঝতে পারে না। ছুটে পালাচ্ছে মানুষ দেখে, এই বোধটুকু শুধু আছে। মানুষে বড় ভয়। ফাঁকা জায়গায় এসে একটুখানি হাঁপ ছেঁড়ে বাঁচে। ঘরবাড়ি গাছপালা কিছুই নেই। আর খানিকটা এগুতে—ছলাৎ-ছলাৎ জলের তফরা পাড়ের উপর—সেই আওয়াজ কানে এল। গাঙের কিনারে এসে গেছে একেবারে। খেয়া পারাপার হচ্ছে, অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ পোড়া জায়গার মুখে লাথি মেরে পার হয়ে চলে যাবে। গাঙ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে—কোথায়?—অনেক দূরে কাশীধামে যেখানে মা রয়েছে—মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুক ছেড়ে খুব খানিকক্ষণ কেঁদে নেবে রাধারাণী। কেঁদে বাঁচবে।

তখন খেয়াল হল, পার হবে, কিংবা কোনখানে চলে যাবে—একটা পয়সা তো কাছে নেই। হঠাৎ কে বলে উঠল, গাঙের ধারে কেন?

রাধারাণী চমকে তাকায়। মানুষ পিছু নিয়েছে তবে তো! নবকান্ত মুহুরি।

নবকান্ত বলে, হালদার-বাড়ি ফিরবেন না সে জানি। ও নরককুণ্ডে যেতেও বলি নে। কিন্তু পাড়ের উপর থেকে সরে আসুন। মাটিতে ফাটল হয়ে থাকে, পাড় ভেঙে ভেঙে গাঙের মধ্যে পড়ে।

মুরারি হালদার মুহুরিকে ধরতে পাঠিয়েছে, তাই ভেবেছিল গোড়ায়। জলের দিকে আরও সরে যাচ্ছিল। দরদের কথা শুনে রাধারাণী পাষাণমূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে রইল।

নবকান্ত বলছে, মুশাবিদা নিয়ে আবার বসেছিলাম। মনটা খচখচ করতে লাগল। রাগের বসে একটা-কিছু না করে বসেন। ওদের কি—আপদ সরে গেলেই বাঁচে এখন। বেরিয়ে পড়লাম, রেগেরেগে ছোড়দা তো যাচ্ছেতাই করতে লাগল। কেমন একটা মনে হল—সকলের আগে এই গাঙের দিকে ছুটেছি। ঠিক তাই, এইখানে আপনি।

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে বলে, গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরতে আসি নি। পথ চিনতে না পেরে এসেছি।

কোথায় যেতে চান বলুন।

মায়ের কথাই বারম্বার আসে মনে। কিন্তু মনোরমা তো অনেক দূরের কাশীধামে —সে শুনি এ পৃথিবীর নয়, মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে। আর রাধির বাবা—মৃত্যুঞ্জয়। তিনি আরও দূরের। নির্জন নদীকূলে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে রাধির দু-চোখ জলে ভরে যায়ঃ বাবা, তুমি এখন অন্তর্যামী, তুমি তো আকাশের তারা। সমস্ত জান, সব তুমি দেখেছ। আমার কোন দোষ নেই, সাধ্য ছিল না নিজেকে বাঁচাবার—

শুনতে পেল—নবকান্ত বলছে, তিলডাঙায় মামার বাড়ি চলে যান। আমি বলি, সেই ভাল। আপন লোক মজুমদার মশায়, তিনি কক্ষণো ফেলতে পারবেন না। স্টেশনে নিয়ে আমি গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।

রাধারাণী ইতস্তত করেঃ টিকিট কিনতে হবে তো—

নবকান্ত বলে, গরিব মানুষ আমি, মুহুরিগিরি করি, ছোড়দার খিঁচুনি খাই। তা হলেও টিকিটের দাম সিকে পাঁচেক—সেটুকু আমি পারব।

অদ্ভুত কণ্ঠ নবকান্তর। কান্নার মতো শোনাল।

স্টেশনে তখন ঘণ্টা দিয়েছে। রেললাইন ধরে তাকালে ইঞ্জিনের আলো দেখা যায় অনেক দূরে। টিকিট কেটে তাড়াতাড়ি দু-জনে প্লাটফরমের উপর এল।

কে-একজন চেনা মানুষ নবকান্তকে জিজ্ঞাসা করে, কাল তো কোর্ট রয়েছে। টিকিট কেটে কোথায় চললে এখন ?

উকিলের মুহুরি—কত নয়কে ছয় করতে হয়। গরজ মতন দুটো মিথ্যে বানিয়ে বলতে আটকাবে কেন মুখে। নবকান্ত জবাব দেয়, আমি যাচ্ছি নে। বোনকে তুলে দিতে এসেছি। এই যে জেনানা-কামরা, উঠে পড় এইখানে।

তার পরে, ছোট বোনের বিদায়ের সময় ঠিক যেমনধারা প্রবোধ দিতে হয়—

ভয় কিসের ? নাম পড়ে স্টেশনে নেমে পড়বে। কত মানুষ—চেনা কেউ না-ই বা থাকল। খাসা ওয়েটিং-রুম আছে, দরজা বন্ধ করে রাতটুকু ইজিচেয়ারে পড়ে থাকা। থানা স্টেশনের লাগোয়া, পুলিসে সারারাত টহল দিয়ে বেড়ায়। আমি তো গিয়েছি ও-জায়গায়—সেই যে ছোড়দা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম।

রাধারাণী নবকান্তর দিকে তাকাল। কনে দেখতে গিয়েছিল—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওরা দেখেছে, রাধি চোখ নিচু করে ছিল বরাবর। আজকে দেখছে অবহেলিত দরিদ্র সেই পাত্রটিকে ভাল করে। গাড়িতে উঠে জানলার ধারে এসে বসল, তখনো দেখছে। স্টেশনের আবছা কেরোসিনের আলোয় মনে হল, নবকান্তর চোখ দুটো চিকচিক করছে। কলঙ্কিনী মেয়েটার জন্য চোখ মোছে—তা হলে আছে এমন মানুষ ?

=এগার=

বাড়ির মধ্যে শান্তিবালা ওঠেন সকলের আগে। ভোরবেলা দরজা খুলেই দেখেন দক্ষিণের ঘরের পৈঠার উপর কাত হয়ে বসে একটা মেয়ে।

কে রে ?

রাধারাণী মুখ ফেরাল। মুহূর্তকাল তাকিয়ে দেখে শান্তিবালা আর্তনাদ করে ওঠেন : ওরে মা, কাপড়চোপড় গয়নাগাটি পরে রাজরাণী হয়ে এলি সেবার, এ কোন ভিখারিণী আজ আমার উঠোনে !

কান্নাকাটিতে ঘুম ভেঙে সবাই বাইরে এল। সন্ধ্যা, আরতি, আরতির অন্য তিন বোন। মোহিত ওঠে নি—কলকাতার চাকরে বাবু—গায়ে রোদ না লাগলে ঘুম ভাঙে না। আর হারাণ বাড়ি নেই, কোর্টে মামলা, এই খানিকক্ষণ আগে রাত থাকতে রওনা হয়ে গেছেন।

সন্ধ্যা কেঁদে বলে, এমন ভাবে বসে কেন ভাই ? ঘরে চল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধি বলে, না—

শান্তিবালা অবরুদ্ধ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিচ্ছেন : বুকের মধ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে। বুঝি মা, বুঝি। আমার অজিত মা-শীতলার দয়ায় ছটফট করতে করতে চোখ বুজল। কতকালের কথা। আজও ভুলতে পারি নে। যে চলে গেল, তাকে ফেরানো যাবে না। তবু বাঁচতে হবে, সবই করতে হবে। তোর মা নেই এখানে, কিন্তু আমরা তো সব রয়েছি।

আরতি ইদানীং কথা একরকম বন্ধ করেছিল রাধির সঙ্গে। তারও চোখে জল। শুকনো চোখ শুধুমাত্র রাধারাণীর। একটা জায়গায় সেই থেকে এক-ভাবে বসে আছে। নড়েচড়ে না, চোখেও বোধ করি পলক নেই।

এরই মধ্যে একবার শান্তিবালা বলেন, তোর জিনিষপত্তর কোথায় রাধি ? তুলেপেড়ে রাখুক।

কিছু নেই। যা পরে এসেছি, এই শুধু।

সন্ধ্যা আবার বলে, ঘরে এস ভাই। কাপড়টা বদলাবে। শাড়ি চলবে না—তা কাচা ধুতি আছে তোমার ভাইয়ের।

রাধারাণী ঘাড় নাড়ে। তেমনি বসে থাকে।

কিছু বিরক্ত হয়ে শান্তিবালা বলেন, এইখানে সমস্ত দিন কাটাবি নাকি? খাবি এখানে? শুবি এই জায়গায়?

রাধি বলে, খেতে দাও যদি, এখানে বসেই খাব। শোওয়া তো রাত্রিবেলা—অনেক দেরি, সেই সময় ভাবা যাবে।

কেমন এক ধরনের হাসি। ভয় হল শান্তিবালার, মাথা খারাপ হয়ে এল নাকি? জিজ্ঞাসা করেন, তোর সঙ্গে কে এসেছে?

কেউ না।

আরতি বলে, বাবাও এই খানিক আগে স্টেশনে চলে গেলেন। পথে দেখা হল না?

মামা তো গরুর-গাড়ি করে গাড়ির রাস্তায় গেছেন। আমি মাঠ ভেঙে পায়ে হেঁটে সোজাসুজি এসেছি।

হালদার-বাড়ির বউ পায়ে হেঁটে এল—এবারে কঠিন হয়ে শান্তিবালা বললেন, কী হয়েছে খুলে বল আমায়।

মামা যখন গেছেন, তাঁর মুখে শুনতে পাবে মামিমা। আমি বলতে পারব না।

বলে টালি-ছাওয়া সেই পৈঠার উপর আঁচল পেতে রাধি গড়িয়ে পড়ল।

সারাদিন এমনি কাটে। পৈঠার উপরে নয়, দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় উঠে বসেছে একসময়। পাড়ায় রটনা, হারাণ মজুমদারের ভাগনি রাধি কী এক বিষম কান্ড করে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, তারা এক-কাপড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। কত লোক দেখে গেল। জমিয়ে আলাপ করতে চায়, আলাপসালাপ করে ভিতরের কথা কিছু বের করবে—কিন্তু রাধির জবাব পায় না।

শান্তিবালা কাজের এক ফাঁকে আবার এসে পড়েন। রীতিমত ঝাঁঝালো সুর: বাইরে পড়ে থেকে আর কেলেঙ্কারি করিস নে। সংসার করতে হয় যে আমাদের, লোকের কাছে সর্বদা মুখ দেখাতে হয়। মুখ না খুলিস তো ঘরে ঢুকে মুখ লুকিয়ে থাক।

মায়ের বকুনি মোহিতের কানে গেছে। সে বলে, কেন জ্বালাতন কর? যেমন আছে পড়ে থাকতে দাও মা। মন খানিকটা ভাল হলে আপনি ঘরে যাবে। নিজের কাজে চলে যাও তুমি।

শান্তিবালা ছেলেকে ভয় করেন। ছেলের তাড়া খেয়ে ঘরে গেলেন, ত্রিসীমানায় আর নেই।

সন্ধ্যার পর হারাণ মহকুমা-শহর থেকে ফিরলেন। এসেই বললেন, রাধি এসেছে নাকি? কেন সব তোমরা ঘিরে দাঁড়িয়েছ, কী তোমাদের? চলে যাও। মোহিত আর মোহিতের মা থাকুক, তোমাদের শোনবার কিছু নয়।

সামনে থেকে সরে গিয়ে সন্ধ্যা ও মেয়েরা দরজার আড়ালে দাঁড়াল। হারাণ গিয়েছিলেন—এখন আর উকিল-বাড়ি নয়—কুটুম্বর বাড়ি। মুরারির সেরেস্তায় কাজ। কিন্তু এমন কুরুক্ষেত্তোর ব্যাপার, আগেভাগে কী করে বুঝবেন? রাধির শাশুড়ি একটি একটি করে সমস্ত বললেন। সুরেন মুহুরির সুত্রেও শুনে এসেছেন।

শান্তিবালা গালে হাত দিলেন: কী সর্বনাশ গো, এমন কে কোথায় দেখেছে!

কালামুখি কুল-মজানি—ভাল বলতে হবে তাদের, ঝাঁটার বাড়ি মেরে দূর করে দেয় নি। রাত দুপুরে নিজে বেরিয়ে চলে এল।

মোহিত এরই মধ্যে উল্টো কথা বলে, ঝাঁটা মারলে তো দু-জনকেই মারতে হয়। মুরারি হালদারটাকেও।

শান্তিবালা বলেন, যতই হোক পুরুষমানুষ সে—

মানুষটা লেখাপড়া জানে, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে থাকে একই বাড়িতে। রাধি যদি ঝাঁটার এক বাড়ি খায়, সে খাবে তিনটে। কিন্তু আমি বলি মা, বিচারটা আপাতত মুলতুবি থাক। রাত দুপুরে শখ করে বেরিয়ে আসে নি, মামা-মামির কাছে জুড়োতে এসেছে। ক'দিন একটু শান্ত হতে দাও ওকে। প্রাণে বেঁচে থাকতে দাও।

আরতি দরজার আড়াল থেকে শুনে ছুটে গিয়েছে রাধির কাছে। হাত ধরে টানে, সারা রাত বাইরে পড়ে থাকবে কেমন করে? ঘরের ভিতর যাও।

রাধি বলে, মামার কাছে শুনলে তো সব? ভাবছি, গোয়ালে গিয়ে শোব। ভগবতীরা আছেন, গোয়াল কখনো অশুচি হয় না।

থাক, খুব হয়েছে। ঘরে যাও বলছি। নয় তো দাদা ভীষণ রাগ করবে। দাদা কিছু জানে না বুঝি?

জেনেশুনেই সে তোমার পক্ষে। কাউকে সে চুকে কথা বলে না। তাকে সবাই ভয় করে। তাই বলছি, ঘরে যাও।

দিন দশেক কাটল। কেলেঙ্কারির কথা ইতর-ভদ্র জানতে কারো বাকি নেই। তিলডাঙা গ্রামে শুধু নয়, চতুর্দিকে সারা অঞ্চল জুড়ে। যা ঘটেছে তা সহস্রগুণ রটনা। ভাল গৃহস্থঘরের আশ্চর্য রূপসী মেয়েটা যে কান্ড করে বেড়াচ্ছে, খাতায় নাম লিখে বাজারে বসাটাই বাকি এখন শুধু। পুরুষ-মেয়ে সবাই ছি-ছি করে। পারতপক্ষে রাধি ঘরের বার হয় না। কিন্তু মানুষের দেহ নিয়ে কখনোসখনো না বেরিয়ে তো উপায় নেই—পুরুষ কারো যদি সামনে পড়েছে, দুটো চোখ হুলের মতো ক্ষতবিক্ষত করবে তার সর্বদেহ, জিহ্বার মতো লেহন করবে, এক্স-রে রশ্মির মতো বসনের অন্তরালও রেহাই দেবে না। আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই। মেয়েমানুষের দূরে দূরে ওৎ পেতে থাকতে হয় না, সমবেদনার অছিলা নিয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ে। দুটো চারটে কথার পরে মতলব আর গোপন থাকে না—মুরারির সঙ্গে সেই প্রথম রাত্রি এবং পরবর্তী রাত্রিগুলোর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনা। আরতিও যেখানে থাক এসে পড়বে এই সময়।

কী এক আক্রোশে পেয়ে বসেছে রাধিকে। কাউকে তাদের বঞ্চিত করে না। ভাল তোমরা সবাই, চরিত্রে একবিন্দু কালির দাগ নেই। উপযাচক হয়ে সঙ্গ দান করতে এসেছ, মূল্য দিতে হবে বইকি! ভূরি ভূরি সে মূল্য দিয়ে যাচ্ছে। শুধু একটি মুরারি হালদার নয়—আরও অনেক জনকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে বলে। মেয়েগুলো মাতালের মতন গেলে। আশার অধিক পেয়ে খুশি হয়ে যায়। এবং বাড়ি গিয়ে হয়তো বা কেউ কেউ ছটফট করে সতীসাধ্বী হবার অনুশোচনায়। ফাঁক পেলেই নতুন-কিছু শোনবার জন্য আবার রাধির কাছে চলে আসে।

আরতিকেও দেখা যায় দলের মধ্যে। রাধি তখন চুপ করে যায়। কুমারী মেয়ে এসবের মধ্যে কেন? বিরস মুখে আরতি সরে গেল। পরে টের পাওয়া গেল, পিছনে বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনে সমস্ত আরতি। শোনা নয়, গোগ্রাসে গেলা

দু-কান দিয়ে।

দক্ষিণের ঘরে একলা শোয় রাধি। ভয়ের কথা হয়ে দাঁড়াল—রাত্রিবেলা মানুষের আনাগোনা বাইরে। ছ্যাচাবাঁশের বেড়ার ঘর—বেড়া কেটে ঘরে ঢোকে যদি! মনোরমা কাশী চলে গেলে সে মাঝের কোঠায় মামির কাছে শুত, তখন হারাণ থাকতেন এই ঘরে। এবারে সে ব্যবস্থা নয়। পাপিনীকে কোঠাঘরে তুলতে যাবেন কি জন্যে?

ভয়ে রাধি ঘুমুতে পারে না। একদিন জ্যোৎস্নারাতে দেখল, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—

কে, কে ওখানে? তুমি কে?

=বার=

পুবের কোঠায় ওদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিষম লেগে গেছে। সন্ধ্যা মারমুখী। বলে, আপদ কদ্দিন আর পুষবে বাড়িতে?

মোহিত বলে, যাবে কোথায় বল। মেনে নিলাম, রাধি ভুল করেছে। কিন্তু আমরা তাড়িয়ে দিলে আরও তো রসাতলের দিকে গড়াবে।

বাড়িতে লোক হাঁটাহাঁটি করছে, জান?

নিস্পৃহ কণ্ঠে মোহিত বলে, হতে পারে। মধুর গন্ধ পেলেই মৌমাছি আসবে।

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে সন্ধ্যা বলে, মধু নয়—পায়খানার ময়লা। আসে যত ময়লার মাছি।

মোহিত বলে, একদিক দিয়ে ভাল। চারিদিকে চোরের উৎপাত। রাত্রে পাহারার কাজ হচ্ছে আমাদের বাড়ি। চোর ঢুকতে পারবে না।

সন্ধ্যা বলে, আসে যত লম্পট বদমায়েস—তারাই যদি চুরি করে? ভাল লোকে তো আসে না।

আসে না কে বলল? শীতকাল বলে আরও জুত হয়েছে। ভাল লোক মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে আলোয়ানে মুখ ঢাকা দিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে।

হঠাৎ সন্ধ্যা কঠিন সুরে বলে ওঠে সেই ভাল লোক একজন তুমিও। চোখ পাকিও না। চুরি করবে আবার চোখ পাকাবে, দুটো একসঙ্গে হবে না। মায়া বিষম উথলে উঠল, মায়ের কথার উপর চোপা করলে—তখন থেকে জানতে কিছু বাকি নেই। রাত্রে রোজ তুমি বেরিয়ে যাও।

আমি?

তুমিই তো। ভাব, আমি কিছু টের পাই নে।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সব দেখে থাক। সন্দেহ-বাতিক ছাড় দিকি। কেন মিছে অশান্তি ডেকে আন।

সন্ধ্যা বলে, দুয়োর আঁটবার সময় কাগজের টুকরো দিয়ে রেখেছিলাম দুই কপাটের ফাঁকে। সেই কাগজ সকালবেলা দেখি বাইরে পড়ে আছে। দুয়োর না খুললে কাগজ মাটিতে পড়তে পারে না।

এত প্রতাপ মোহিতের, কিন্তু স্ত্রীর কথার তোড়ে একেবারে মিইয়ে গেল। বলে, ছি-ছি, মাথা খারাপ তোমার। কী সব নোংরা কথা। কত নিকট-সম্পর্ক, আপন পিসতুত বোন হল রাধি—

বোন আগে ছিল। নষ্টদুষ্ট হয়ে গেলে পুরুষের সঙ্গে তখন একটাই শুধু সম্পর্ক। যে পুরুষই হোক—ওই। আজ আমি ছাড়ছি নে। আমার আঁচলের সঙ্গে তোমার কোঁচার মুড়োয় গিঁঠ দিয়ে রাখব। গিঁঠ খুলে দেখি কেমন করে পালাও।

মরীয়া হয়ে উঠেছে। সত্যি সত্যি গিঁঠ বাঁধে সন্ধ্যা। গর্জাচ্ছে। দ্রুত নিশ্বাসে উঠানামা করছে বুক। বলে, বাজারে চলে যাক, বাজারে গিয়ে ঘর বাঁধুকগে। কটা রং আছে, ঢং আছে—সেই দেমাকে ভাবছে, বাজারে কেন যেতে যাব—যেখানে থাকি, সেইখানেই তো বাজার। সেটা হবে না গৃহস্থবাড়ির উপর থেকে। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেব কাল। না যায় তো ঝাঁটাপেটা করব। যা ওর শ্বশুরবাড়িরাও করে নি।

সকালবেলা উঠে অবশ্য রাগ অনেকখানি পড়েছে। রাধারাণীকে কিছু বলল না, কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে মোহিতের। কোন দিকে বেরিয়েছে তো শতেক রকমের জেরা: কোথায় গিয়েছিলে? ধাপ্পা দিও না, আমার চোখে ফাঁকি চলবে না।

কী জ্বালা, কাজেকর্মে বেরুনো যাবে না। পোস্টাপিসে গিয়েছিলাম একখানা চিঠি রেজেস্ট্রি করতে।

রাধি ঠাকরুনও ঠিক ঐ সময়টায় বেরুল কেন? কোন্ ঝোপজঙ্গলে গিয়েছিলে বল রাসলীলা করতে? বেশ, নিজে আমি পোস্ট-মাস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসব।

কিন্তু ঈশ্বর জানেন, একেবারে ভিত্তিহীন কুৎসা। রাত্রে একদিন দু-দিন বেরিয়েছিল অবশ্য মোহিত, বেড়ায় চোখও রেখেছিল। রাধি ঐ সময়টা কি করে, সেইটে দেখে আসা—তা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নয়। কৌতূহল পুরুষের। কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে গেলে আরও সর্বনাশ, সোজা তাই বেকবুল যাচ্ছে। ঘরের বার না হয়েই দেখবে দিন কতক এবার। নিতান্ত বেরুবে তো একাকী কদাপি নয়—হারাণের সঙ্গে অথবা অন্য দু-চার জন সঙ্গী জুটিয়ে। অর্থাৎ সন্দেহাতীত সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ।

কিন্তু না বেরিয়েও কি রক্ষা আছে।

দক্ষিণের ঘরের দিকে চেয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল—আমি বুঝি দেখতে পাই নে, আমি কানা?

ঈশ্বর সাক্ষি, এই সময়টা মোহিতের দৃষ্টি ছিল দক্ষিণে নয়—সোজা উত্তরের দেওয়ালের দিকে। কিন্তু শুনছে কে?"

অবশেষে সন্ধ্যা শাশুড়ির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল: আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন মা। চোখের উপরে অত শয়তানি দেখতে পারি নে।

শান্তিবালা বলেন, তুমি ঘরের লক্ষ্মী, তুমি কেন যাবে মা? বাইরের ঝঞ্ঝাট বিদেয় করে দিচ্ছি, রসো।

সে তো পারবেন না মা। কিছুতে পারবেন না। খুঁটোর জোর আছে। ছেলে হয়ে মায়ের মুখের উপর হুমকি দিয়ে ওঠে, সেই তখনই টের পেয়েছি।

এমনি সময় সুরাহা হয়ে গেল। অদৃষ্ট ভাল মোহিতের। কলকাতায় জোর লেখালেখি করছিল—সেই কোম্পানি ডেকেছে আবার তাকে। মাইনে আগের চেয়ে কম। কিন্তু বিনি-মাইনেয়—এমন কি চাকরিটা না হলেও তো বাড়ি ছেড়ে কলকাতা বা যেখানে হোক সরে পড়বার অবস্থা।

ছেলে-বউ চলে গেল। তখন শান্তিবালা হুংকার দিয়ে পড়লেন: যাদের ঘরবাড়ি, তাদের বিদেয় করে দিয়ে এবারে অষ্ট অঙ্গ মেলে সুখ করবি ভেবেছিস? দূর হ।

কোথায় যাব, বলে দাও মামিমা।

যেখানে খুশি। আমি বলি, নরলোকে আর কালামুখ দেখাস নে। পুকুরে জল আছে, গোয়ালে গরুর দড়ি আছে। কিছু না হোক, ঘরের পাশে কলকেফুলের এত বড়

গাছ—তার বীচি বেটে খেয়েও তো মরতে পারিস্।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাধারাণী হারাণের কাছে চলে যায়ঃ মামি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন মামা—

হারাণ চুপ করে থাকেন।

মামি তো আত্মঘাতী হতে বলছেন। তা ছাড়া উপায়ও দেখি নে। তাই করব মামা?

হারাণ বলেন, মনোর মেয়ে তুই। কিন্তু কি করব, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিস তুই যে মা। আরতির বিয়ে ঝুলছে কাঁধের উপর, যামিনীটাও ধাঁ-ধাঁ করে সেয়ানা হচ্ছে। আরও দুটো তার পরে। পাড়াগাঁ জায়গা, সমাজ-সামাজিকতা রয়েছে। তুই আমার বাড়িতে রয়েছিস, তাই নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। কোন সম্বন্ধ এগোয় না, যেখানে যাচ্ছি মুখ ফেরায়। তোর মামি মনের ঝালে ওই সব বলেছে। কিন্তু আমাদের দিকটাও ভেবে দেখবি তো মা।

কথা একই—শান্তিবালার কথারই রকমফের। হারাণ মিষ্টি করে বলেছেন বাড়ি ছেড়ে বিদায় হয়ে যেতে।

বললেন, শুধু হাতে যাস নে। কিছু দিয়ে দিচ্ছি। ভাল হয়ে থাকিস। মেয়ে ক'টার বিয়ে হয়ে যাক, আবার নিয়ে আসব। আনব না তো মনোর মেয়ে ফেলে দিতে পারি আমি? অনটনে পড়লে লিখবি, সাধ্যমতো কিছু কিছু পাঠাব।

শ্বশুরবাড়ির ঠাঁই গেছে, মামারবাড়ি থেকেও গেল। ফুটবলের তুলনা মনে আসে। এর পায়ের লাথি খেয়ে ওর পায়ে। সেখান থেকে আর এক পায়ে—। কিন্তু আর যে জায়গাটা মামি বাতলে দিলেন, সেটা রাধির মনে ধরে না। কেন মরবে? জন্ম নেবার পর কষ্ট করে এত বড়টা হয়েছে, অঙ্গ-বোঝাই এত রূপ—মরলেই তো চুকে গেল। চিতায় পোড়াবে। আর পোড়ানোর কষ্ট না নিয়ে যদি গাঙে ফেলে দেয়, স্রোতে ভেসে ভেসে পচে গিয়ে দুর্গন্ধ হবে দেহ, কচ্ছপ-কামট-মাছে খুঁড়ে খাবে। শিয়ালে হয়তো টেনে তুলবে ডাঙায়, শকুনে ছেঁড়াছেঁড়ি করবে, লুব্ধ কাক গাছের ডালে উড়ে এসে বসবে একটুকু উচ্ছিষ্ট নাড়িভুঁড়ি পাবার আশায়। মা গো মা, সে বড় বিশ্রী। কিছুতে এসব হতে দেবে না। মরবে না রাধি, বেঁচে থাকবে। জলে ডুব দিয়ে গায়ের ময়লা ধোয়—তেমনি ডুব দিয়ে দিয়ে, ডুব দিয়ে দিয়ে সে কলঙ্কের কালি ধুয়ে সাফ-সাফাই করবে। সেই আগের মতন হবে সে আবার।

হারাণকে বলে, কাপাসদা গিয়ে থাকিগে মামা। আর কিছু না হোক, ঘর দু-খানা আছে, টুনিমণি আর তারাদিদি আছে। আর ঠাকুরবাড়ির গোপাল ঠাকুর আছেন। গোপালকে নিয়ে পড়ে থাকব দক্ষ-পিসিমার সঙ্গে। মানুষ বড্ড ছুঁচো, দরকার নেই আমার মানুষে। আমি ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকব।

=তের=

কাপাসদা এসে দিন কতক শান্তিতে কাটল। লোকে বরঞ্চ আহা-ওহো করে রাধির সম্পর্কে। এমন মেয়েটা, দেখ, যৌবনে-যোগিনী হয়ে ঠাকুরসেবা নিয়ে আছে। শুধু ঠাকুরসেবা কেন, গাঁয়ের লোকের বিপদ-আপদ—বিশেষ করে ছেলেপুলের রোগপীড়ায় সে বুক দিয়ে পড়ে খাটে। ছেলেপুলের উপর বড্ড দরদ—ষষ্ঠীঠাকরুনের মতো। খাওয়া থাকে না, ঘুম থাকে না। শিয়রে বসে বাতাস করছে, তেষ্টা পেলে জল এগিয়ে দিচ্ছে—তাড়িয়ে দিলেও সেখান থেকে নড়বে না।

আধ-পাগলি তারা। একটা দিনরাত্রির মধ্যে ওলাওঠায় সাজানো সংসার পুড়েজ্বলে গেল। স্বামী কৈলাস গেল, টুনিমণির বর সতীশ গেল, টুনিমণির পিঠোপিঠি মেয়ে

সোনামণিও গেল। কড়েরাঁড়ি টুনিমণিকে নিয়ে আছে। মাথা খারাপ সেই থেকে। অন্য কিছু নয়—বিড়বিড় করে বকে, আর সময় সময় ক্ষেপে উঠে শাপশাপান্ত করে ঠাকুর গোপালকে। তারা রান্নাঘরে গিয়ে উঠেছে—সেখানে পড়ে পড়ে আপন মনে যা খুশি বকুক। দেয়াল-দেওয়া বড় ঘরখানায় রাধি আর টুনিমণি। ভালই আছে।

ইস্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কতীর্থের মেয়েটা পগার লাফাতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়েছে, পা মচকে গেছে। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে পণ্ডিতের। এণ্ডিগেণ্ডি কতকগুলো রেখে ব্রাহ্মণী অকালে গত হয়েছেন। যজনযাজন, তার উপরে ইস্কুলের চাকরি—কাশীনাথের নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। ছেলেপুলের কোনটা কোথায়, খোঁজই নিতে পারেন না। পগারের মধ্যে পড়ে মেয়েটা আর্তনাদ করছে। বছর আষ্টেকের মেয়ে। রাধি কোলে করে তুলে তর্কতীর্থের বাড়ি নিয়ে গেছে, আহত জায়গায় তেল মালিশ করছে। হঠাৎ কাশীনাথ আগুন হয়ে এসে পড়লেন ঃ শোন, এ-বাড়িতে এস না আর তুমি। মানা করে দিচ্ছি। যা হবার হোক বুলুর, খোঁড়া হয়ে বিছানায় পড়ে থাকুক—

মনে মনে রাধি ভয় পেয়ে যায়। কণ্ঠে লঘুস্বর এনে তবু বলে, কেন, হল কী বলুন তো? খারাপটা আমি কী করলাম?

তুমি নিজে খারাপ। ছোঁবে না আমায় মেয়েকে। অস্পৃশ্যের অধম তুমি।

কাপাসদা গাঁয়েও খবর তবে এতদিনে এসে গেল! রসের কথা যে একবার শুনল, অন্যের কানে না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতে সে সোয়াস্তি পায় না। এ-কান থেকে সে-কান করে বিশ ক্রোশ পথ পার হয়ে পৌঁচেছে খবর।

তর্কতীর্থ তো বাড়ি থেকে স্পষ্টাস্পষ্টি দূর করে দিলেন। আরও কতজনের মনে মনে কী আছে, কে জানে। কারো বাড়ি যাবে না রাধি, শুধু এক ঠাকুরবাড়ি। গোপালের সেবা নিয়ে থাকবে। পাষাণের বিগ্রহ সম্পর্কে একটা সুবিধা, মুখ দিয়ে কোন-কিছু বলার উপায় নেই।

ঠাকুরবাড়ির পাঁচিলের বাইরে ফুলবাগান। পরদিন সকালবেলা রাধারাণী ফুল তুলছে। স্থলপদ্ম-গাছের কখনো ডাল ধরে টেনে, কখনো বা এক-পা উঠে ফুল তুলে তুলে ডালায় রাখছে। দক্ষ-পিসিমা আরও বুড়ো হয়েছেন, কোমর বেঁকে গেছে। কিন্তু পুজো সাজানোর কাজটা এখনো ষোলআনা তাঁর। অন্য কেউ করলে ভুলভ্রান্তি থেকে যায়, পুরুত খুঁত-খুঁত করেন। কী কাজে বাইরে এসে পিসিমা ফোকলা মুখে একগাল হেসে উঠলেন ঃ ওমা, শিউলি যে! শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে এলি, কিচ্ছু শুনি নি তো!

শেফালীরও বিয়েথাওয়া হয়ে গেছে ছ-মাসের বাচ্চা কোলে। বাচ্চার কপালে সোনার পুঁটে, চোখে কাজল, হাতে বালা, পায়ে মল।

দক্ষনন্দিনী বলেন, ছেলে না মেয়ে?

ছেলে পিসিমা—

তা গয়নাগাঁটি পরিয়ে একেবারে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন রে শিউলি?

শাশুড়ি এসব পরিয়ে দিলেন। তিন জায়ের মধ্যে কারো মেয়ে নেই, সবগুলো ছেলে। একটা মেয়ে হয়, বাড়িসুদ্ধ সকলের সাধ। দুধের স্বাদ ওরা ঘোলে মেটাচ্ছে।

নতুন মা শিউলি খিলখিল করে হেসে ওঠে।

পোড়া কপাল আমার! ছেলেকে ঘোল বলিস, আর মেয়ে হল দুধ! দূর, দূর—খুব হাসছেন দক্ষনন্দিনী। এমনি সময় রাধিকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ

আঁধার। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন ঃ ফুল তুলে তুলে কাঁড়ি করছিস কেন লা? পগারে ফেলে দে তোর ও-ফুল।

তর্কতীর্থ টুলো পণ্ডিত, তার উপরে ভিন্ন পাড়ার মানুষ। তিনি আর দক্ষ-পিসিমা এক নন। সকল মেয়ের মধ্যে রাধিকেই বেশি ভালবাসতেন এই দক্ষ-পিসি। চিরকাল। ছোট্ট বয়সে কত কোলেকাঁখে করে নাচাতেন। সেই ভাবটা এখনো—কাল সন্ধ্যা অবধিও ছিল। সেই মানুষ মুখ কাল করে বললেন, ঠাকুরবাড়ি ঢুকবি নে আর কখনো। আমরা না জানি, তোর নিজের তো সব জানা। কোন আক্কেলে এদ্দিন ছোঁয়াছুঁয়ি করেছিস?

হল কি, বল তো পিসিমা? কোথা থেকে কী তুমি শুনে এলে—

পাপ আর পারা চাপা থাকে না, ফুটে বেরোয় একদিন না একদিন। হল তাই, কীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে। তারার মেয়ে ওই যে টুনিমণি থাকে তোর সঙ্গে। কড়েরাঁড়ি—বর মরেছিল, তখন একেবারে একফোঁটা শিশু। তারপরে এত বড়টা হয়েছে গাঁয়ের উপরে থেকে। কই, তার নামে তো কেউ কখনো বলতে পারল না।

হবার নয় বুঝতে পারছে, তবু হাসি-তামাশায় রাধারাণী উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেঃ ঠাকুরবাড়ি না গিয়ে বাঁচব কেমন করে পিসিমা, ঠাকুরের সঙ্গে আমার যে আলাদা সম্পর্ক। তোমরাই বলতে, গোপাল ঠাকুরের দুয়োর ধরে মা আমায় এনেছে।

হেসে উঠল সে ঃ ঠাকুর কোল খালি করে আমায় নাকি দিয়েছিলেন। রাধারাণী নাম সেইজন্যে। গোপালের সেবা না করে উপায় আছে আমার?

দক্ষনন্দিনী আরও কঠিন হয়ে বলেন, সে যখন ছিলি তখন ছিলি। এখন নরক। ঠাকুর চন্ডালের হাতে পুজো নেবেন তো তোর হাতের নয়। পুরুত-ঠাকুর বলে পাঠিয়েছেন গোপালবাড়ির চৌকাঠ মাড়াবি নে তুই আর।

শেফালী এতক্ষণে একটি কথাও বলে নি। পরম আনন্দে শুনছিল। এইবার বলে, দেখ পিসিমা, যার বড় খুঁতখুঁতানি তার শাকেই পোকা। কতটুকু বয়স আমার তখন, কী জানি আর কী বুঝি! হীরক-দা'র লাই পেয়ে কত কান্ড করল একটা চিঠি নিয়ে। ঝগড়ার চোটে গাঁ তোলপাড়। এখন? তল্লাট জুড়ে ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। জানতে কারো বাকি নেই।

দক্ষনন্দিনী আবার ঠাকুরবাড়ি ঢুকে গেলেন। শেফালীও বক্রদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পিসির পিছন পিছন চলল। একটা কথা চেপে গেল শেফালী —শুধু মুখের ঝগড়াই নয়, রাগের বশে থুতু ছুঁড়েছিল রাধি শেফালীর দিকে। এমনি দর্প ছিল সেদিন।

ডালা-ভরা ফুল নিয়ে ঠাকুরবাড়ির দরজার সামনে রাধি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে বলে, আমার কি দোষ বল ঠাকুর? ভাল থাকব, তা হলে এমন রূপ দিলে কেন? টুনির মতন কেন হলাম না? ছাতার কাপড়ের মতো কাল কটকটে গায়ের রং, ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে-আসা একজোড়া গজদন্ত? যে পুরুষ একবার তাকাল, দ্বিতীয়বার আর সে নজর তুলবে না। অন্য কিছু না হোক, গজদন্তে এফোঁড়-ওফোঁড় হবার আশঙ্কায়। অমন হলে আপনা থেকেই তো ভাল থাকা চলত ওই টুনির মতন।

বাড়ি ফিরছে পায়ে পায়ে। চোখের জলে বারম্বার বলে, আমি কি ভাল থাকতে চাই নি? এখনো চাই ভাল হতে। গৃহস্থঘরে সারাদিনের খাটা-খাটনির পর আরামের

ঘুম—সেই ঘুম তো চেয়েছিলাম আমি ঠাকুর। ছোট্ট বয়স থেকে সেই আমার সাধ। মণ্টুর মতো তুলতুলে একটি ছেলে কোলের ভিতর, পাশে স্বামী—ঘুমের ঘোরে হাতখানা পড়েছে স্বামীর গায়ে...

বাড়ি এসে টুনিমণির কাছে কেঁদে বলে, শোন্‌ টুনি, কী নাকি কথা উঠেছে আমার নামে। ঠাকুরবাড়ি ঢুকতে মানা। কারো উঠোনে কেউ আমায় যেতে দেবে না। ফাঁকা বাড়ি, জীবন আমার কাটে কেমন করে?

বাড়ি ফাঁকা দিনের বেলাটাই। এবং খাওয়াদাওয়ায় রাত অবধি। তারপরে জমে ওঠে বাইরে। দেয়ালের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থেকেও সমস্ত টের পাওয়া যায়। পহরে শিয়াল ডেকে যত রাত বাড়ে, তত পাতার খড়খড়ানি, মানুষের পদশব্দ। তারা-পাগলি শুয়ে শুয়ে রাত্রি জাগে। তার মেয়ে টুনিমণির ঠিক উল্টো—শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম, যেন মরে ঘুমোয়। খাড়া দাঁড় করিয়ে দিলেও বোধ করি তার ঘুম ভাঙবে না। কড়েরাঁড়ি হওয়া সত্ত্বেও টুনির সতীত্বের উপর কখনো যে দাগ পড়েনি, চেহারা ছাড়াও এই নিশ্ছিদ্র ঘুম একটা কারণ। দরজার বাইরের অত আনাগোনা টুনি কিছুই টের পায় না। রাধির গা শিরশির করে সারারাত।

রাত থাকতে রাধারাণী উঠে পড়ে। উঠানে গোবরজল ছিটায়, উঠান ঝাঁট দেয়। খর-খর-খর সপ-সপাৎ।

শেষটা টুনিমণি বিদ্রোহ করে: আর তো পারি নে মাসি তোমার জ্বালায়। রাত না পোহাতে আজকাল ঝাঁটা ধরছ।

রাধি হাসে: তোর গায়ে তো লাগে না।

কানে লাগে। এক পহর রাত থাকতে শুরু কর, ঘুম কেঁচে যায়। ভাতের কষ্ট সওয়া যায়, ঘুমের কষ্ট পারি নে। উঠোন ঝাঁট দেওয়া একটু বেলায় হলে ক্ষতিটা কি?

রাধি বলে, আমার গা ঘিনঘিন করে টুনি, যতক্ষণ না ঝাঁট দিয়ে ফেলি। সকালবেলা ঠাকুরের নাম করতে করতে উঠতাম, কিন্তু আর পারি নে। মনে হয়, আদাড়-আস্তাকুড় জমে আছে। তার মধ্যে ঠাকুরের নাম হয় না। ঝাঁট দিয়ে গোবরজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিই।

হঠাৎ সে সপাৎ-সপাৎ করে ঝাঁটা মারতে লাগল মাটির উপরে।

টুনি বলে, কী মারছ মাসি, সাপটাপ নাকি?

রাধারাণী কেমন একভাবে তাকায়। বলে, হ্যাঁ টুনিমণি। কত সাপ কিলবিল করে বেড়িয়েছে, বৃষ্টি হয়েছিল তো—নরম মাটির উপর দাগ পড়ে আছে।

খানিকটা অপ্রত্যয়ের ভাবে টুনি ঘর থেকে উঠানে নেমে এল। রাধি পাগলের মতো উঠানের ভিজা মাটিতে ঝাঁটার পর ঝাঁটা মারছে।

ঠাহর করে দেখে টুনি বলে, সাপ কোথা গো? মানুষ হেঁটে বেড়িয়েছে, সেই দাগ।

সন্ধ্যাবেলা এর একটাও ছিল না। রাতের মধ্যে ছোট-বড় কত পা পড়েছে। কত মানুষের!

কণ্ঠে কান্নার সুর এল রাধির। বলে, রাতে যে উঠোনে মচ্ছব পড়ে যায়। কেন, আমি কি? কোন লোভে আসে নচ্ছারগুলো?

উৎপাত দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। নচ্ছার ছোকরার দল শুধু নয়, মান্য-গণ্য প্রবীণেরাও ক্রমশ দেখা দিচ্ছেন। মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে অতিশয় সতর্কভাবে তাঁদের

চলাফেরা, সেইজন্যে আরও বিপাকে পড়ে যান।

বড়ঘরের উত্তরে অনতিদূরে শীতল বাঁড়ুয্যের বাগিচা। লিচু পাকতে শুরু হয়েছে। বাদুড়ে না খায়, সেজন্য ফলন্ত ডালগুলো জালে ঢেকে দিয়েছেন। কিন্তু ইস্কুলে যাবার পথ বাগিচার পাশ দিয়ে। ছেলেগুলো বাদুড়ের বেশি, ইস্কুলে না গিয়ে গাছের মাথায় চড়ে বসে। তাড়া দিলে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়। বাঁড়ুয্যেমশায় এবছর তাই কাঁটাতারে বাগিচা ঘিরেছেন। হুট করে অমন ঢোকা যাবে না, তাড়া খেয়ে চোঁচা দৌড়ও দিতে পারবে না।

দুপুর রাতে বিষম একটা শব্দ বেড়ার দিকে। কী পড়ল রে, রসিক নাগর কোনটা অপঘাতে মরে দেখ। গালি দিতে দিতে হেরিকেন হাতে রাধি দোর খুলে বেরোয়। এই এক চিরকালের ব্যাধি, লোকের কিছু ঘটলে তখন তার ভয়ডর থাকে না, চুপচাপ ঘরে থাকতে পারে না। আপন-পর, ভাললোক-মন্দলোক, যে-ই হোক।

অপর কেউ নয়—সেকেন্ড পণ্ডিত মশায়। স্বয়ং কাশীনাথ তর্কতীর্থ—পরিবার গত হয়ে অশেষ ভোগান্তি যাঁর। মানী লোক বলেই বুঝি উঁচুতে উঠেছিলেন আজেবাজে দশজনার মতো উঠোনে না ঘুরে। উঁচু লিচুডালে বসে নিরিবিলি ঠাহর করা যায় ভাল। কিংবা বাড়ি থেকে একদিন দূর-দূর করে তাড়িয়েছিলেন তো—সেজন্য রাধির বাড়ির এলাকার মধ্যে পা দিতে ভরসা হয় নি। আঁধারে ভাল ঠাহর করতে পারেন নি, সরু ডাল ভেঙে এসে বেড়ার উপর পড়েছেন।

মানের কী দায়—কাঁটাতারে ছিঁড়ে সর্বাঙ্গে যেন লাঙল চষে গিয়েছে, কিন্তু উঃ—বলে আওয়াজটুকু করবার উপায় নেই। ধরে তুলে রাধারাণী দাওয়ায় বসিয়েছে। তখনও কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢেকে আছেন। বাড়ি গিয়ে কৈফিয়ত দিলেন, স্বভাবের প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে ন্যাড়াসেজির ঝোপের উপর পড়েছিলেন না দেখে।

পরের দিন শীতল বাঁড়ুয্যে বাগানে এসে স্তম্ভিত। শালের বাতির সঙ্গে পেরেক ঠুকে কাঁটাতার বসানো, সেই বেড়ার অতখানি ভেঙেচুরে মাটির উপরে পড়েছে।

বাঁড়ুয্যে চেঁচামেচি করেছেন : এ তো বড় বিপদ! শক্ত করে তারের বেড়া দিয়েও ঠেকানো যায় না—

রাধির কানে গেছে। খানিকটা স্বগতভাবে বলে, ছেলেগুলো কাঁটাতারে ঠেকায়, ধেড়েগুলোকেই ঠেকানো যায় না। হলে তো জো-সো করে তার দিয়ে আমার উঠোনটাও ঘিরে ফেলতাম।

শীতলের ভাইপো ভগীরথ প্রণিধান করে বলে, গাছে চড়েছিল কাকা। উপর থেকে ডাল ভেঙে বেড়ার উপর পড়েছে।

শীতল বলে, মানুষ নয়—মোষ তবে গাছে চড়েছিল। মানুষ পড়ে গিয়ে এরকম ভাঙে না।

রাধির পুনশ্চ স্বগতোক্তি : মোষ নয়, ঐরাবত। মোষের ওজন আর কতটুকু?

=চোদ্দ=

চলল এই রকম। অবস্থা ক্রমশ আরও সঙ্গিন। উঠান কিংবা বাঁড়ুয্যের বাগিচা নয়—মানুষ ইদানীং দাওয়ায় উঠে ধুপধাপ করে। দরজায় টোকা দেয়। সাড়া পেল না তো ঝাঁকাঝাঁকি করে দরজা, লাথি মারে। রাধি চেঁচামেচি করে দেখেছে—উল্টো ফল। উপদ্রপ বেড়ে যায়। মিহি গলায় সে বলে, যাও ভাই, লোক রয়েছে ঘরে। এখন হবে না।

বিকৃত সুরে—গলা শুনে মানুষটা না চেনা যায়—একদিন রাধির কথার পালটা জবাব এল : এমনি আসি নি গো, পকেট ভরতি নোট। দরজা খুলে দেখ।

রাধারাণী হাসে—যেন হাসছে, সেইরকম ভাব দেখায়। বলে, মরণ! টাকার লোভ দেখাচ্ছে। টাকা সবাই দিয়ে থাকে, মুফরতের কেউ নয়। ঘরে লোক থাকলে কি করব?

ব্যঙ্গধ্বনি বাইরে থেকে : শহরের হীরালাল ডাক্তারের পশার গো! রোগি মোটে কাছ ছাড়ে না।

রাগে কান্ডজ্ঞান থাকে না রাধারাণীর। অভিনয়ের মুখোশ খসে পড়ে। দড়াম করে হুড়কো খুলে বেরিয়ে আসে দাওয়ার উপর। একবার শুরু করে দিলে কিছুই আর মুখে আটকায় না। এ-পথের যা দস্তুর। আপনারা বিদগ্ধজনে বললেন, গালির ব্যাপারে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী বড় জবর। প্রাকৃত বাংলার প্রতাপটা দেখে আসুন একবার দয়া করে অজ-পাড়াগাঁয়ে গিয়ে। দেখেশুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। নৈশ প্রেমিকের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উর্ধ্বতন চতুর্দশপুরুষ সম্পর্কে রাধি তারস্বরে বিশেষণের পর বিশেষণ প্রয়োগ করে চলেছে। পর পর দু-তিন ডজন বিশেষণ চলল, মুড়োদাঁড়া নেই। দরিয়ার মুখে নদীস্রোতের মতন।

বলে, আমি তো নষ্ট মেয়েমানুষ। নিজের ঘরে দোর দিয়ে ঘুমোচ্ছি। তোরা সব দিনমানের ঋষিপুত্তুর রাতে এসে ভূতের উৎপাত লাগাস। গোরব-জল ছিটিয়ে যে কুল পাইনে সকালবেলা।

তুমুল চেঁচামেচির ছিঁটেফোঁটা ঘুমন্ত টুনিমণির কানে গিয়ে থাকবে। পরের দিন সদুপদেশ দিচ্ছে : গালাগাল দাও কেন মাসি? ওতে আরও পেয়ে বসে। ঘরে ঢুকতে পারছে না তো ওই গালি শুনবার লোভে আসবে মানুষ। দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করে বেশি করে গালি আদায় করবে।

কথা ঠিক বটে। বাইরের মচ্ছবটা পরের রাতে সত্যিই যেন অনেক বেশি। মানুষ হল মহিষের মতো এক জীব—যত পাঁক গায়ে লাগবে, তত খুশি। আজকে রাধি প্রতিজ্ঞা করেছে, রাগের মাথায় দরজা খুলে এমন কান্ড করবে না। বেরুবে না মরে গেলেও। মুখও খুলবে না। যা খুশি করুকগে ওরা। ভূতের নৃত্যে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ফিরে চলে যাবে।

নৃত্যই বটে। দাওয়ার মাটি দুমদাম করে কাঁপে। রাধারাণী দু-কানে আঙুল দিল—যাতে কিছু শুনতে না পায়। নড়াচড়া করে না, একেবারে মরে আছে যেন সে। মড়ার সঙ্গে কতক্ষণ শত্রুতা চালাবে, মড়ার কাছাকাছি কতক্ষণ টিকতে পারবে?

একদিন না পেরে শেষটা ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। ঢ্যা-কুচকুচ ঢ্যা-কুচকুচ। এই রেঃ—চিঁড়ের ধান ভিজানো কলসিতে, টুনিমণিকে নিয়ে সকালবেলা চিঁড়ে কুটবার কথা—শনির দৃষ্টি সেদিকেও পড়েছে, চিঁড়ে-কুটে খেয়ে তবে বুঝি মচ্ছব শেষ করবে।

না, গালিগালাজ একেবারে নয়—কিন্তু ঘরের বার না হয়ে উপায় কই? চকচকে ধারাল রামদাখানা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে রাধি দরজা খোলে। টিপিটিপি যাবে চলে ঢেঁকিশালে। গিয়ে যেখানটা চিঁড়ে কোটা হচ্ছে, ঝেড়ে দেবে কোপ। মরে তো ভালই। তার জন্যে যদি রাধারাণীর ফাঁসি হয়, আরো ভাল! সে মরণে সান্তনা থাকবে, শত্রু একটা নিপাত করে গেলাম।

দরজা খুলতে হড়াস করে কী বস্তু ঢেলে পড়ল দাওয়ায়। দাওয়ায় যেই নেমেছে,

পা পিছলে পড়ে যায়। হাতের রামদা ছিটকে পড়ে দূরে। ছিটকে গেছে রক্ষা, ওই দায়ে নইলে নিজেরই কাটা পড়বার কথা। পড়ে গিয়ে ব্যথা কতটা লেগেছে, সেটা বুঝবার আগে ওয়াক করে বমি ঠেলে এল। অন্ধকারে চোখে ঠাহর হচ্ছে না বটে, কিন্তু সুগন্ধে বস্তুটা মালুম পাওয়া গেল। গায়ে মাথায় কাপড়চোপড়ে লেপটে গেছে। লিচুতলার দিক থেকে হাসির আওয়াজ আসে খিকখিক করে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

আলো জ্বালবার প্রয়োজন। কিন্তু দাওয়ার উপরে এই কান্ড, ঘরের মধ্যে যায় এখন কেমন করে? ওই বস্তু না মাড়িয়ে? পায়ে পায়ে সারা ঘর নোংরা হয়ে যাবে।

ডাকছে, টুনিমণি, ওরে টুনি, ওঠ একবারটি। দেখ উঠে কী কান্ড।

টুনি যথারীতি নিঃশব্দ। গা ঝাঁকিয়েও সাড়া পাওয়া যায় না, এ ডাক তো উঠানের দূর থেকে। রান্নাঘর থেকে হঠাৎ পাগলি তারা চেঁচিয়ে উঠলঃ কানা ঠাকুর চোখে দেখে না, কালা ঠাকুর কানে শোনে না। মুখ পড়িয়ে ঠাকুর ক্ষীরোদ-সমুদ্দুরে শয়ানে রয়েছে। অঙ্গে বাত হয়েছে, নড়নচড়ন নেই। মর, মর—অকর্মার ধাড়ি।

বড়ঘরে যেতেই তো হবে একবার—আলো জ্বালতে না হোক, তালাচাবি আনতে। পুকুরে গিয়ে ডুব না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ঘুমন্ত টুনিমণির ভরসায় ঘর খোলা রেখে ঘাটে গেলে যা-কিছু আছে হাতিয়ে নিয়ে যাবে অলক্ষ্যের হাস্যরত মানুষগুলো। নড়া চলবে না এখান থেকে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত কাটাবে নাকি এমনি ভাবে? উৎকট গন্ধে গা বমি-বমি করছে, কখন বমি হয়ে যায়। হায় ভগবান।

মনের আক্রোশে আততায়ীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠেঃ ও অলপ্পেয়েরা, বলি তোদেরও নরকভোগ কমটা কী হল? এই জিনিস ভাঁড়ে করে বয়ে তো এনেছিস এতখানি পথ।

চৌকিদার রোদে বেরিয়ে হাঁক দিচ্ছে। অকূল সমুদ্রের তরী—রাধি এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। চেঁচাচ্ছেঃ ও নটবর, শোন—দেখসে এসে কী কান্ড আমার উঠোনে।

নটবর ছুটে এসে দাওয়ায় লন্ঠন তুলে দেখে বলে, এ-হে-হে—এমনধারা করে মানুষে!

উঠানের এদিক-ওদিক লন্ঠন ঘোরাচ্ছে। রাধি বলে, দেখছ কি—কেউ নেই আর এখন। পালিয়েছে। আলো দেখেছে, চামচিকে আর থাকতে পারে? এখন একটু দাঁড়াও নটবর, গোটাকতক ডুব দিয়ে আসি।

ডুব দিয়েই হল না। ছাঁচতলায় বাইরের কলসি—সেই কলসি ভরে ভরে জল এনে দাওয়ায় ঢালে। কাঁচা মেজে কাদা-কাদা হয়ে যায়। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, অত্যাচারটা দেখ নটবর। এক কুনকে চিঁড়ের ধান ভিজিয়েছিলাম। বলি টুনিমণি আছে আমি আছি, আমরা দু-জনে ভেনে কুটে নেব। তা দেখ, ওরাই নয়-ছয় করে গেল। ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছি—কিন্তু ঘর খোলা রেখে ওদিকে কেমন করে যাই?

ঢেঁকিশালে গিয়ে দেখে—যা ভাবতে পারা যায় না—ওই ভাঁড়ের বস্তু খানিকটা লোটের মধ্যে ঢেলে পাড় দিয়েছে। ছিটকে ঘরের চাল অবধি উঠে গেছে। কত শয়তানি আসে যে মানুষের। সকালবেলা চিঁড়ে কোটা বন্ধ। ঢেঁকিশালমুখো হওয়া যাবে না এই নরককুন্ড সাফাই না হওয়া অবধি।

=পনের=

হীরককান্তি বাড়ি এসেছে গ্রীষ্মের ছুটিতে। তড়িৎকান্তি মিত্তিরের ছেলে হীরক। টুনিমণি দেখেছে তাকে। পাশের গাঁয়ের সঙ্গে ফুটবল-ম্যাচ—হীরক মাঠ পরিষ্কার করছিল ছেলেদের নিয়ে। এক মুহূর্ত চুপচাপ থাকবার পাত্র নয়—সমবয়সি কতক-গুলোকে জুটিয়ে একটা না একটা হুজুকে মেতে আছে। এ স্বভাব ইস্কুলে পড়বার সময় থেকে। দরিদ্র-ভান্ডার করেছিল কাপাসদা গ্রামে। লাইব্রেরি। নৌকো-বাইচ আর সাঁতার-প্রতিযোগিতা। এখন কলকাতায় থাকতে হয় বলে গ্রাম ঠান্ডা। দলের ছেলেগুলো কতক কাজেকর্মে বাইরে চলে গেছে, বেশির ভাগ গ্রামের নিষ্কর্মা।

হীরকের নামে রাধি উচ্জ্বল হয়ে ওঠে : একলা এল, না আমার চাঁপা-ফুলকে নিয়ে এসেছে? খোঁজ নিয়ে দেখ তো টুনি।

ভক্তিলতার সঙ্গে সেই যে রাধি চাঁপাফুল পাতিয়েছিল। কলকাতার মেয়ে—তাদের ওখানে থেকে হীরক মেডিকেল কলেজে পড়ে। শ্বশুরের খরচায় ডাক্তারি পড়াটা হবে, তড়িৎকান্তি সেইজন্য সকাল সকাল ছেলের বিয়ে দিলেন। বুড়ো বয়সে বাতে তাঁকে বড় কাহিল করে ফেলেছে। শয্যাশায়ী—নিরাময় হবার আশা নেই এ-বয়সে; এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্র হীরকও বাতরোগের বিশেষজ্ঞ নয়। তড়িৎকান্তি তবু সুযোগটা নিয়ে নিলেন, রোগের সম্বন্ধে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখলেন কলকাতায়। আসুক ছেলেটা বাড়িতে—বাপ-মায়ের কাছে কয়েকটা দিন থেকে বাগানের আম-কাঁঠাল ও ঘরের গাইয়ের দুধ খেয়ে চলে যাবে। হীরক একলাই এসেছে, ভক্তিলতাকে পাঠান নি তার বাবা। পাড়াগাঁয়ে উড়োকালে সাপখোপের ভয়—দশ-বারটা দিনের জন্য কেন তবে আর?

কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে হীরক থাকে কতক্ষণ। হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। গ্রামের গৌরব, য়ুনিভার্সিটির দুটো পরীক্ষাতেই সে স্কলারশিপ পেয়েছে। টুনিমণিকে রাধি বলে, জন্মনেতা হয়ে এসেছে হীরক-দা। এক একটি মানুষ থাকে ওই রকম। ছোটবেলায় আমরা ওর কত সাগরেদি করেছি। সাঁতারের পাল্লা হত—পেন্সিল ছুরি চুলের-ফিতে এইসব প্রাইজ দিত মেয়েদের। একআধটা এখনো বোধহয় পড়ে আছে আমার বাক্সের তলায়। আমার গাছে চড়া দেখে হীরক-দা পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বলেছিল, বীরকন্যা! উঃ, কত কান্ড করা গেছে একদিন! আমরা সব বদলে গেছি, হীরক-দা আমার ঠিক সেই রকম।

হীরক গ্রামে এসেছে, তার কাছে নালিশ করবে। বিচার পাবে সুনিশ্চিত। তোমার সামনে তো সাধু-সচ্চরিত্র সদাশয় ছেলে এরা সব—কিন্তু রাতে আমার বাড়ি কি দেশদেশান্তরের মানুষ আসতে যায়? আসে এরাই। আমায় তাড়িয়ে তুলছে। আমি ভাল হয়ে থাকব, তার জন্য কত চেষ্টা করছি। কেউ তা হতে দেবে না।

ফুটবলের মাঠে যাবে তো সকলে। শীতল বাঁড়ুয্যের বাগানের ওধার দিয়ে পথ। বাড়িতে গেলে তড়িৎকান্তি হয়তো দূর-দূর করবেন—কাশীনাথ তর্কতীর্থ যেমন করেছিলেন। রাধি তাই ঠিক করেছে হীরককে পথে ধরবে। দাঁড়িয়ে আছে সেই কখন থেকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার জোগাড়। অবশেষে কলরব পাওয়া গেল। দলের ওই হতচ্ছাড়াগুলোকে রাধি মুখ দেখাতে চায় না। তারা তো তাকিয়ে দেখে না, চোখ দিয়ে গেলে। হীরকও আজ ওদের সঙ্গে মিশে ওদেরই একজন হয়ে চলেছে—

রাধারাণীর মনে বড় লাগে। সদাশিব ভোলানাথ তুমি—তোমায় ঘিরে যারা চলেছে, জান না, তারা প্রেত আর পিশাচ।

তেঁতুলগুঁড়ির পাশে রাধি সরে দাঁড়িয়েছিল, হীরককান্তি চকিতে একবার তাকাল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিল—প্রায় দৌড়ান। টের পেয়েছে, পাপের বাসা কাছাকাছি এইখানে—পাপ থেকে ছুটে পালাচ্ছে যেন। রূপসী রাধিকে তুচ্ছ করে একটা মানুষ চলে যায়, এমনি ব্যাপার আজ এই প্রথম। বড় আনন্দ রাধারাণীর—আনন্দে নাচতে নাচতে সে বাড়ি ফিরে গেল।

ভর সন্ধ্যায় রাধি সেই পথে আবার গিয়ে দাঁড়ায়। মাঠ থেকে ফিরছে। স্বামিজীর বই-পড়া কিশোরকালের সেই পবিত্র হীরক-দা আজও—তার হীরক-দা'র কাছে সংকোচ কিসের? মাঝপথ অবধি এগিয়ে গিয়ে আগের দিনের মতো রাধারাণী বলে, কারা জিতল হীরক-দা?

ভ্রষ্টা মেয়ের দুঃসাহসে সঙ্গী ছেলেরা হতভম্ব। হীরকও জবাব দিল না।

চুপ করে আছ—হেরে গেছ। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি—

সহসা উচ্ছ্বাস থামিয়ে শান্ত হয়ে বলে, একটা কথা আছে হীরক-দা, আলাদা ভাবে বলতে চাই।

কঠিন কণ্ঠে হীরক বলে, কথা আমারও একটা আছে। সেটা সদরে সকলের মধ্যে বলি। কাপাসদা ছেড়ে তুমি চলে যাও। গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তুলেছ।

রাধি বলে, ঠিক উল্টো কথাই যে আমার। দুয়োরে খিল দিয়ে আমি নিরিবিলি থাকি, তোমার এই ভূতপ্রেতগুলো গিয়ে জ্বালাতন করে। ক্ষমতা থাকে তো শাসন করে দাও। কেন ওরা অমন করবে?

হীরকের সঙ্গীদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাধারাণী ফরফর করে চলে গেল। হীরক দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভগীরথ বোমার মতন ফেটে পড়েঃ নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল নষ্ট মেয়েমানুষ। আমাদের ভূতপ্রেত বলে গেল।

হীরক বলে, নষ্ট মেয়েমানুষ—সেটা শুধু মুখে বললে কি হবে? প্রমাণ চাই তো কিছু।

হরিসাধন বলে, আজব বলছ হীরক। রাত দুপুরে চুপিসারের ব্যাপার—সাক্ষি রেখে কেউ নষ্টামি করে নাকি? মা জানে না, পেটের মেয়ে কখন কী করে আসে। স্ত্রী টের পায় না, কোল থেকে কখন স্বামী উঠে বেরিয়েছিল।

রাত্রি। আকাশ মেঘে ভরা। উল্টোপাল্টা বাতাসে গাছগাছালি পাগলের মতো মাথা দোলায়। বৃষ্টির পশলা মাঝে মাঝে।

হীরকেরা বিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে জল চকচক করছে, ধানের চারা ডুবে গিয়েছে অকাল-বর্ষায়। ঢেউ উঠছে জলে। ছলাৎ-ছলাৎ করে ঘা দিচ্ছে ডাঙার গায়ে।

ডোঙা জোগাড় হয়েছে দুটো। পাশাপাশি বাইবে। জলের উপরে ঘুরে ঘুরে আলোয় মাছ মারবে। তিনজন করে লাগে ডোঙায়। একজনে আলো ধরে ডোঙার মাথায় বসে, একজনের হাতে ধারাল দাও। আলো দেখে মাছ মাথা ভাসান দিয়ে ওঠে জলের উপর। একচুল নড়ে না, সম্মোহিত হয়ে আছে আলোর রশ্মিতে। দাও ঝেড়ে কোপ এবারে। ঘোলা জল পলকের মধ্যে রাঙা-রাঙা হয়ে যায়। জলে ডুববার আগে

কাটা-মাছ তাড়াতাড়ি তুলে ডোঙার খোলে ফেলে দাও। মাছ কাটতে গিয়ে সাপও কাটা পড়ে কখন—তুলতে গিয়ে সভয়ে হাত ফিরিয়ে নেয়। ডোঙায় আর যে তৃতীয় ব্যক্তি—সে এতক্ষণ শক্ত করে লগি মেরে পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে। মাছের সামনে আলো ধরা ও মাছ কাটা—এ দুটো ব্যাপারের মধ্যে ওই লোক নেই। কিন্তু তার কাজ শক্ত সকলের চেয়ে। ডোঙা চালায় সে খুব নরম হাতে, আওয়াজ একেবারে নেই, জলের খলবলানিতে মাছ যাতে সরে না যায়। আলো-ধরা মানুষটা বাঁ-হাত তুলবে হঠাৎ এক সময়, সঙ্গে সঙ্গে লগি জলতলে বসিয়ে ডোঙা একেবারে স্থির। যেন চুন-সুরকি দিয়ে জলের সঙ্গে ডোঙাখানা গেঁথে দিয়েছে।

পাঁচজন বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে, গঙ্গেশ শুধু নেই। হীরকের ডোঙা গঙ্গেশের বাওয়ার কথা। ডাঙায় হাঁটাহাঁটির চেয়ে ডোঙায় চলাচল গঙ্গেশের বেশি রপ্ত ; চৈত্র-বৈশাখে বিল শুকিয়ে গেলে ক'মাস তার বড় দুঃসময়। পা নামক অঙ্গযুগলের চালনা করতে হয়। বড় হাঙ্গামার ব্যাপার। পারতপক্ষে সে তখন বাড়ির বার হয় না।

ডোঙা বাওয়ার সেই মানুষ—গঙ্গেশই এসে পেঁছিল না। হীরক বলে,' দেখা যাক আর একটু।

আবার এক ঝাপটা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। গা কুটকুট করছে—তাই তো, মস্ত এক পানজোঁক উরুতে। রক্ত খেয়ে টোপা হয়েছে। রবারের মতন টেনে ছাড়াতে হয়। এঁটেল-মাটি চেপে দিয়ে রক্ত বন্ধ করে। তেপান্তর বিলে কত আলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। সকলে নেমে গেছে, আর দল বেঁধে এসে হাত-পা কোলে করে এরা বিলের ধারে দাঁড়িয়ে।

হীরক বলে, এখনো আসে না—কী আশ্চর্য !

ভগীরথ বলে, তুমি বেরিয়ে পড় হীরক। আমাদের ডোঙার হরিসাধন চলে যাক তোমার সঙ্গে। সে বাইবে।

তোমরা ?

গঙ্গেশ আসে তো যাব। নয় তো গেলাম না। আমাদের কী—কতই তো যাচ্ছি। তুমি জলকাদা ভেঙে এন্দুর এসে ফিরে যাবে, সেটা কিছুতে হয় না।

হীরক দৃঢ়স্বরে বলে, যাই তো সকলে মিলে যাব। নয়তো কেউ যাব না। মাছ মারা তো খাওয়ার জন্যে নয়—সকলে মিলে আমোদ করা। গঙ্গেশের বেশি পুলক—অত পথ ভেঙে গঞ্জ অবধি গিয়ে টর্চের নতুন ব্যাটারি নিয়ে এল। অথচ সময় কালে দেখা নেই।

ভগীরথ বলে, বর্ষার রাত্রে আরও বড় আমোদ পেয়ে গেছে অন্য জায়গায়। নিশ্চয় তাই। যাবে তো বল, আমি নিয়ে যেতে পারি সে জায়গায়। গিয়ে হাতে-নাতে ধরব।

একটা লোকের জন্য আয়োজন পন্ড। এক কথায় সকলে রাজি। কোথায় আছে চল, ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে আসব।

পথ চলেছে পা টিপে টিপে। পা পিছলে যাওয়ার ভয়। তা ছাড়া নিঃসাড়ে যাওয়াই উচিত। টিপিটিপি পিছনে গিয়ে ক্যাক করে তার টুঁটি চেপে ধরবে। গঙ্গেশকে ধরবে, আর কপালে থাকে তো ফাউস্বরূপ অতিরিক্ত কিছু দেখা যাবে। মাঝ-বিলে

মাছ ধরার চেয়ে সে মজা কিছু কম হবে না।

রাধির উঠোনে এসে পাঁচটা মানুষের দশটা চোখ নানান দিকে সঞ্চরণ করছে। ব্যাং ডাকছে খানাখন্দে, লিচুডাল থেকে টপটপ করে জল ঝরছে।

না, বাইরে কোনখানে তো দেখা যায় না।

ভগীরথ ফিসফিস করে বলে, তবে গঙ্গেশ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। অভদ্রার মধ্যে ভিতরে ঠাঁই হলে বাইরে কি জন্য ভিজতে যাবে? দাঁড়াও—

দাওয়ায় উঠে পড়ে ভগীরথ। এরা সব ছাঁচতলায়। ঠুক-ঠুক করে টোকা দেয় দরজায়। তিনবার। পরিপাটি হাত, এই টোকার আওয়াজটা কেমন আলাদা। ভিতরে ঢুকবার সকরুণ আবেদন যেন।

একটু বিরতি দিয়ে পুনশ্চ তিনবার।

রাধারাণীর গলা : লোক রয়েছে, হবে না এখন।

বিজয়গর্বে ভগীরথ দাওয়া থেকে নেমে আসে : শুনলে তো? নিজের কানে শুনতে পেলে। সতীসাধ্বী বলে সেই যে পথের উপর জাঁক করে এল—তার নিজের মুখের প্রমাণ নাও। লোক আলাদা কেউ নয়—গঙ্গেশ। আমরা জলে ভিজছি, সে হতভাগা ভিতরের তক্তাপোশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

হীরকই এবার ধাওয়ায় উঠে দুমদুম করে দরজায় লাথি মারে। রাধি করকর করে ওঠে : ভন্মার রাতে বেরিয়েছিস মুখপোড়ারা, ঘরে তোদের মা-বোন নেই?

পাড়াগাঁয়ের এইসব ছোঁড়া কাপুরুষ নয়। গালি শুনে এ-ওর গা টেপে আর ফিকফিক করে হাসে। হীরক গর্জন করে উঠল : দুয়োর খোল বলছি, নয় তো ভেঙে ফেলব।

গলা চিনতে পেরে নিমেষের মধ্যে রাধারাণী একেবারে ভিন্ন মানুষ : হীরক-দা তুমি? ওমা আমার কত ভাগ্যি, তুমি এসেছ বাড়ির উপর—

শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল : বৃষ্টিতে নেয়ে এসেছ একেবারে। কী কাণ্ড বল দিকি। আমার কাপড় দিই, তাই পরে ভিজে কাপড় শুকিয়ে ফেল।

এইবারে এতক্ষণে উঠানের দিকে নজর পড়ল। বলে, আপদগুলো সঙ্গে জুটিয়ে এনেছ, একলা আসতে বুঝি সাহস হল না হীরক-দা? কামরূপ-কামিখ্যের মতো গুণ করে ফেলি যদি তোমায়? হি-হি-হি। তা করব না—চাঁপাফুল রক্ষে রাখবে তা হলে?

হাসতে হাসতে কণ্ঠ সহসা কাতর হয়ে ওঠে। বলে : আজকে তোমার পিছন ধরে এসে ওরা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড্ড কষ্ট দেয়, আমি বলেই টিঁকে আছি। ভিতরে এস হীরক-দা, ওগুলোকে যেতে বলে দাও। দুঃখের কথা সব বলি। কথা আমার গলা ছাপিয়ে উঠছে।

তার আগেই হীরক কাদা-পায়ে ঢুকে পড়েছে। আজকে টুনিমণি নেই, রান্নাঘরে তারাও নেই। কামারপাড়ায় বিয়ে হচ্ছে, বিয়েবাড়ি গেছে। একলা রাধারাণী। টর্চ ফেলে হীরক কিছু না দেখতে পেয়ে সকলকে ডাকে : করছ কী তোমরা? চলে এস।

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে তারা বিছানা উলটায়, তক্তাপোশের নিচে উঁকিঝুঁকি দেয়। চালের কলসির ওদিকটা গিয়েও নাড়ানাড়ি করছে। পাঁচজন মানুষ ওইটুকু ঘরের মধ্যে পাকচক্কর দিচ্ছে।

আরক্ত মুখে কঠিন কণ্ঠে রাধারাণী বলে, রোজ রাত্রে এরা চুরির মতলবে আমার বাড়ি-ঘোরাফেরা করে, তুমি আজ ডাকাত হয়ে ঢুকলে হীরক-দা। কিন্তু পায়ের কাদাটা

যদি ধুয়ে আসতে! বাইরে কলসিতে জল আছে। লেপাপোঁছা গোবরমাটি-দেওয়া ঘর তুমি তছনছ করে দিলে।

হীরক বলে, থুতু ফেলতেও আসতাম না তোমার লেপাপোঁছা ঘরে। গঙ্গেশটা কোথায় দেখিয়ে দাও। তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ও, গঙ্গেশ বুঝি এখানেই আছে—এই ঘরের মধ্যে? দেখবার তো কসুর করছ না। চালের কলসি তেলের শিশি কিছুই বাদ নেই।

হীরক বলে, হার স্বীকার করছি। তুমি বলে দাও, কোনখানে আছে।

ঘরের আড়ার দিকে রাধারাণী আঙুল দেখায়। পাঁচজনের পাঁচজোড়া চোখ উপরমুখো।

ভগীরথ অধীর হয়ে বলে, কোথায়?

ওই যে, দেখছ না—ভয় পেয়ে গেছে গঙ্গেশ, গুটিগুটি সরে যাচ্ছে।

নজর করে দেখে নিয়ে হীরক বলে, টিকটিকি একটা। ওই দেখাচ্ছ?

আমি যে মন্তর জানি। কামরূপ-কামিখ্যেয় ভেড়া করে রাখে, গঙ্গেশকে আমি টিকটিকি করে রেখেছি।

বলে খিলখিল করে যেন ঢেউ দিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল। সে হাসির শেষ হয় না। অপমানিত ছোঁড়ার দল চিৎকার করে ওঠে: আমাদের বোকা বানিয়ে হাসছ তুমি এখন?

বানাতে হল আর কোথায়?

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে রাধি বলে, ঘর তো এইটুকু। টর্চ ফেলে তন্নতন্ন করে দেখলে, তবু বলে মানুষ বের করে দাও।

ভগীরথ হুংকার দিয়ে বলে, মানুষ আছে—নিজের মুখেই তো স্বীকার করলে। সকলে আমরা শুনেছি।

রাধি বলে, মিথ্যে বলতে হয় আত্মরক্ষার জন্য। তোমাদের পিরীতের ঢেউ নয়তো সামলাতে পারি নে—ঘর-দরজা ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বলতে বলতে কণ্ঠ প্রখর হয়। হীরকের দিকে চেয়ে বলে, এই নালিশটাই তোমার কাছে জানাতে চেয়েছিলাম। কেন আমায় ভাল থাকতে দেবে না? কলকাতায় কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তোমার মেলামেশা—ভেবেছিলাম এদের নোংরামির বাইরে তুমি। কিন্তু আমার একটা কথাও কানে নিলে না। গ্রাম ছাড়তে হবে, এই হল তোমার রায়। স্রোতের কুটোর মতো ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু তোমার সাগরেদগুলোর কী মুশকিল হবে, ভেবে দেখেছ? এ তবু নিজেদের গাঁয়ের মধ্যে চেনা ঘরে এসে ঢুঁ দিচ্ছে। আমি চলে গেলে জল ঝাঁপিয়ে হোঁচট খেয়ে কোন ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, ঠিকঠিকানা নেই!

দলটা বেরিয়ে যেতে রাধারাণী দরজায় সশব্দে হুড়কো তুলে দিল।

গঙ্গেশকে পথেই পাওয়া গেল। তার নিজের পুকুরটা কানায় কানায়। সোঁতা ছেড়ে দিয়ে মাছ মারছিল এতক্ষণ। সেই ঝোঁকে দেরি হয়ে গেল। তা নাই-বা হল আলোয় মাছ মারা। দেড় ঝুড়ি মাছ পেয়েছে, সকলকে খাওয়ার মাছ দিয়ে দেবে। কষ্ট করে বিল ঠেঙিয়ে যা মিলত, ভালই হবে সে তুলনায়।

= ষোল =

হারাণ মজুমদার হঠাৎ এসে পড়লেন তিলডাঙা থেকে। বলেন, খবর পাই নে অনেকদিন। দেখতে এলাম।

মনোর মেয়েকে ফেলে দিতে পারবেন না, বাড়ি থেকে তাড়াবার সময় বলে দিয়েছিলেন। তাই বোধ হয়। চোখের দেখা দেখতে উতলা হয়ে এতখানি পথ আসবেন, মামা কিন্তু এ প্রকৃতির ছিলেন না আগে। চেহারাতেও যা দেখছে—যেন শ্মশানের চিতার উপর থেকে সদ্য উঠে আসছেন। বিষম-কিছু ঘটেছে। ব্যস্ত হতে হবে না, বেরিয়ে আসবে ধীরে ধীরে দু-পাঁচ কথার মধ্যে।

তা-ই হল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন। রাধি আম কেটে দিয়েছে রেকাবিতে, কাঁঠালের কোয়া ছাড়িয়ে দিয়েছে। মুখে ফেলতে ফেলতে হারাণ বললেন, আরতিকে নিয়ে ভারি বিপদ!

অসুখ করেছে?

অসুখ ছাড়া আবার কি। বিষম অসুখ। হীরালাল ডাক্তারকে জানিস তো—তোর শ্বশুরবাড়ির চিকিচ্ছেপত্তরও তিনি করেন। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু সাফ জবাব দিয়ে দিলেন। সেখান থেকে সোজা তোর কাছে এসেছি। তুই যা করিস এখন।

রাধি ভেবে পায় না, মহকুমা-শহরের অমন বিচক্ষণ ডাক্তার যে ব্যাধিতে হার খেয়ে গেলেন, তার জন্য এখানে ছুটে আসবার হেতুটা কি? সে কী করতে পারে? আরতির জন্য ভাবনা হচ্ছে। গোড়ার ব্যবহার যাই হোক, শেষের দিকে কিন্তু সে বড় যত্ন করত রাধিকে। আহা, ভাল হয়ে উঠুক বেচারি, রোগ নিরাময় হোক।

হীরালাল ডাক্তারের সঙ্গে হারাণের পুরণো ঘনিষ্ঠতা। কী যেন একটু আত্মীয়তাও আছে। মরীয়া হয়ে মহকুমা-শহর অবধি এসে হারাণ তাঁর কাছে গিয়ে পড়লেন।

ইচ্ছে করে অধিক রাত্রেই গেলেন। সাড়ে-ন'টা বাজে, রোগি তবু একেবারে ছাড়ে নি। জন পাঁচ-ছয় এখনো। একজনের বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে হীরালালা বললেন, কী সমাচার হারাণ-দা? কবে এলেন?

প্রশ্নই করলেন। জবাবের অপেক্ষা না করে রোগির দিকে তাকিয়ে বলেন, দুটো বুকেই প্যাচ পাওয়া যাচ্ছে। দেখি, পিঠ ফিরে বসুন।

বুক-পিঠ পরীক্ষার পর আরও কিছু প্রশ্ন করে ডাক্তারবাবু প্রেস্কৃপশন লিখছেন। হঠাৎ একবার মুখ তুলে বলেন, কই, কিছু বললেন না তো!

হারাণ বলেন, এদিককার সব মিটে যাক।

এই ক'জনের হলেই বুঝি মিটে গেল? তবেই হয়েছে। কত রোগি আসবে এখনো। মিটতে সেই রাত দুপুর।

বলতে বলতে দ্বিতীয় জনের বুকে যন্ত্র বসিয়ে দেন। সে রোগি বলে, বুকের কিছু নয় ডাক্তারবাবু, দাঁত চাগিয়েছে। এমনি বোধ হয় যাবে না, তুলে ফেলতে হবে। দেখে দিন একটু ভাল করে।

এমনি ভাবে একের পর এক রোগি দেখে যাচ্ছেন। হারাণ এক পাশে চোরের মতো চুপটি করে বসে। বাড়ি থেকে সকাল সকাল দুটি খেয়ে বেরিয়েছেন, তারপর থেকে নিরম্বু। উদ্বেগে খাওয়ার কথা মনেও হয় নি। বয়স হয়ে গেছে—উদ্বেগ আর ক্লান্তিতে এখন ঝিমিয়ে পড়ছেন। রোগির পঙ্গপাল কতক্ষণে খতম হবে, কে জানে!

হঠাৎ এক সময় হাত ধুয়ে ফেলে হীরালাল সিগারেট ধরালেন। হারাণের দিকে চেয়ে বলেন, চলুন, চেম্বারে গিয়ে শুনে আসি। আপনারা বসুন একটুখানি।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলেন, বলুন কি ব্যাপার।

শান্তিবালা সবিস্তারে যাবতীয় লক্ষণ বলে দিয়েছেন। কথাটা ডাক্তারের কাছে কি ভাবে পাড়তে হবে, ট্রেনের মধ্যে সারাক্ষণ হারাণ ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছেন। কিন্তু সময় কালে মুখ দিয়ে কিছু বেরুতে চায় না। বললেন, বিপদে পড়ে এসেছি ডাক্তারবাবু।

হীরালাল হেসে বললেন, সে তো জানিই। বিপদ না হলে কেউ শখ করে কি উকিল-ডাক্তারের বাড়ি আসে?

মানে, আমার এক আত্মীয়, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তার মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। সেই জন্যে আপনার কাছে আসা। কী হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, ছেলে হবে কিংবা মেয়ে—

হারাণ ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, কুমারী মেয়ে যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি সুরে বললেন, কুমারী হোক সধবা-বিধবা যাই হোক, ওই দুয়ের একটা হবে। তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রোগপীড়ে যখন নয় হারাণ-দা, আমার কিছু করবার নেই। আচ্ছা—

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। হারাণ আর্তনাদ করে উঠলেন: মানের দায় ডাক্তারবাবু। বড় আশা করে এসেছি। আমার সেই আত্মীয় খরচপত্র করতে পিছপাও নয়। যার-তার কাছে এ সমস্ত বলা যায় না। আপনি আমার পরমাত্মীয়—

তাই আমায় ফাঁসাবার জন্য এসেছেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হারাণের দিকে চেয়ে হীরালাল বলতে লাগলেন, আপনার মুখ-চোখ দেখে বুঝছি, মেয়েটা খুব নিকটজন। উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে সতর্ক হয়ে করা যায় বইকি! রোগিণীর স্বাস্থ্যের কারণে করতেও হয় কখন সখন। কিন্তু আপনি যে রকম বলছেন, ঘোরতর বেআইনি কাজ। জেলে যাওয়ার ব্যাপার। টাকার লোভে ভুঁইফোঁড় ডাক্তার কেউ হয়তো রাজি হবে। প্রসূতিকে তারা মেরেই ফেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। নয় তো সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়। ওসব করতে যাবেন না, হিত কথা বলছি।

বেরিয়ে আবার রোগির ঘরে গেলেন। এক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে হারাণ অন্য দরজা দিয়ে বেরুলেন। ডাক্তারের মুখোমুখি হতে এখন লজ্জা করছে। উঃ, কী শত্রুতাই যে করল নচ্ছার মেয়ে!

তখন ভাগনীকে মনে পড়ে। শান্তিবালা তা-ও বলে দিয়েছেন। ডাক্তার হলে নিরাপদ। নয় তো অন্য যেসব পথ আছে।

রাধারাণী নিঃশব্দে মামার বিপদের কথা সমস্ত শুনল। হারাণ বলেন, ডাক্তার মেজাজ দেখাল আমার কাছে। কত লাঞ্ছনাই আছে যে কপালে! কালোমুখি মরে তো রক্ষেকালীর পুজো দিই।

রাধারাণী বলে, মরলে বেশি বিপদ মামা। মড়ার পেট চিরে দেখবে, পেটের মধ্যে বাচ্চা পাবে। এই অবস্থায় বাপ-মায়েরা যা করে—বলবে, তোমরাও তাই করতে গিয়ে মেরে ফেলেছ। পুলিশ হাতকড়া দিয়ে সবসুদ্ধ টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

হারাণ খপ করে রাধারাণীর হাত জড়িয়ে ধরলেন: সেইজন্যে তোর কাছে এসে পড়েছি মা। তুই একটা উপায় করে দে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধারাণী বলে, নষ্ট মেয়েমানুষ আমি, আনুষঙ্গিক সকল কাজে ওস্তাদ। তাই ভেবে দরদ হল বুঝি আজ ভাগনীকে দেখতে আসবার?

হারণ আকুল হয়ে বলেন, গুরুজন হয়ে আমি তোর পা জড়িয়ে ধরব, সেইটে

চাচ্ছিস রাধি ?

রাধারাণী খিলখিল করে হেসে ওঠে : মন্দ মেয়েও দরকার পড়ে তবে তোমাদের !

হারাণ বলেন, তুই মন্দ কি ভাল সে কথা থাক। কিন্তু পরের জন্য তুই যে বুক দিয়ে পড়ে করিস, তোর অতি-বড় শত্রুও তা অস্বীকার করবে না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তোর কাছে এসে পড়েছি।

হাসির উচ্ছ্বাস থামিয়ে রাধারাণী মুহূর্তে কঠিন হয়ে বলে উঠল, মামা, ভাগনী তোমার অসতী—কিন্তু খুনি নয়।

খুনি ? কাকে কে খুন করতে যাচ্ছে ? মানুষ কোথায় এর মধ্যে যে খুন হবে ?

ছোট-জা ছবির শরীর খারাপ বলে পেটের বাচ্চা নষ্ট করার কথা উঠেছিল। মন্টু হবার সময়টা। ছবি তা কিছুতে হতে দেয় নি। মন্টু তাই হতে পেরেছে, এমন দেব-দুর্লভ ছেলে হয়েছে। এ কাহিনী ছবির কাছে শোনা। তাই মনে পড়ে গেল রাধারাণীর। বলে, আরতির গর্ভে যা এসেছে—তোমরা যদি খোঁচাখুঁচি না কর—শিশু হয়ে একদিন জন্ম নেবে। বড় হয়ে মানুষ হবে। স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি মামা, আমি তোমাদের খুনোখুনির মধ্যে নেই।

রাধির তো দায় নয়, তাই এসব সাধু সাধু বাক্য মুখে আসছে। মুখের দিকে তাকিয়ে হারাণ নিঃসংশয়ে বুঝলেন, অনুনয়-বিনয় করে অথবা টাকাপয়সার লোভ দেখিয়ে—কোন রকমেই হবে না। চোখে অন্ধকার দেখেন তিনি। মহকুমার মধ্যে বিশিষ্ট মানুষ—দু-কান পাঁচ-কান হতে হতে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়লে মুখ দেখাতে পারবেন না তো কারও কাছে। মুখ নাই-বা দেখালেন। কিন্তু আরতির পরে আরও তিনটে মেয়ে—তাদের কী হবে। কোনদিকে কূলকিনারা দেখেন না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে হারাণ একই ভাবে বসে আছেন একটা জায়গায়।

দেখা গেল, চোখের জল গড়াচ্ছে হাঁটু বেয়ে। রাধির কষ্ট হয়। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি মামা।

ভরসা পেয়ে হারাণ মুখ তুলে বলেন, কি ?

আরতির বড়মামা ওকে তো কলকাতায় নিতে চাচ্ছিলেন। তাঁর বাসায় পাঠিয়ে দাও।

হারাণ বলেন, বুদ্ধিমতী হয়ে এটা তুই কি বললি রাধি ? কুটুম্বর বাসায় কিছু কি চাপা থাকবে ?

বাসা অবধি যেতে যাবেন কেন ? থাকবে শেয়ালদা স্টেশনে। কিংবা কোন হোটেলে এক-আধ বেলার মতো—

হোটেল থেকে তারপরে ?

হেসে ফেলল এবারে রাধি— হারাণের এই অবস্থার মধ্যেও। বলে, বিষয়আশয় নিয়ে এত প্যাঁচ খেলে বেড়াও মামা, আর এই সাদা কথাটা মাথায় ঢোকে না ? হোটেল থেকে চলে যাবে আমার সঙ্গে। যাবে তীর্থ করতে—কাশী যাবে আমার মায়ের কাছে। বুঝলে এবার ?

আবার বলে, মায়ের শরীর খারাপ—আমারও মন টানছে কাশী যাবার জন্য। মায়ের কাছে গিয়ে থাকব। শুধু টাকার অভাবে পারছি নে। তা মানসম্ভ্রমের জন্য তুমিও তো অঢেল খরচ করতে রাজি ! অসুখ ভাল হয়ে তারপরে একদিন আরতি ফিরে আসবে। বিয়েথাওয়া দিও তখন মেয়ের। এখন লোকে জানুক, কলকাতায় মামার বাসায় গিয়ে আছে আরতি।

কাপাসদা'র লোকের হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল, রাধারাণী নেই। টুনিমণির কাছে প্রশ্ন করে পাওয়া গেল, তীর্থধর্মে বেরিয়েছে। ধর্ম না কচু! ডবকা ছুঁড়ি—এ বয়সে তীর্থ করতে যাবে কোন্ দুঃখে? এ লাইনের যারা, বুড়ো হয়ে যাবার পর তাদের তীর্থে মতি হয়। কিন্তু টুনিমণিকে আর বেশি জিজ্ঞাসা করলে তেড়ে ওঠে: তোমরাই সব খেদিয়ে তুললে মাসিকে। যেখানে খুশি যাক, তোমাদের কি?

খবর শুনে হীরক বুকে থাবা দিয়ে বলে, পাপ বিদেয় হল আমারই জন্যে। বুঝেছিল, না তাড়িয়ে এ লোক কিছুতেই ছাড়বে না। গ্রাম জুড়োল রে বাবা!

ভগীরথ কিন্তু এত সহজে ছাড়ে না: তীর্থ-টির্থ মিছে কথা। কোন মতলবে কোথায় গিয়ে উঠল বল দিকি?

চুলোয় যাকগে। কী দরকার আমাদের?

একা যায় নি, কারও ঘাড়ে চেপে গিয়েছে—এই বলে দিলাম। রাধির না হোক, সেই নাগর মহাশয়ের হদিশটা নিতে হবে।

উদ্যোগী লোকের অভাব নেই গ্রামে। খবর সংগ্রহের জন্য ঘুরছে। সঠিক তারিখটা বেরুল—ভোররাত্রে পায়ে হেঁটে গিয়ে বাস ধরেছে। সেই ভোরবেলা কোন কোন নম্বরের বাস ছেড়েছে, গঞ্জের আপিসে গিয়ে খবর নাও। ড্রাইভার-কন্ডাক্টরের নাম বের কর। কন্ডাক্টরের মনে পড়ল, একটি অল্পবয়েসি মেয়ে গিয়েছিল বটে—কতজনেই তো যায়, কিন্তু ঝকঝকে রূপসী বলেই মনে পড়ে গেল। সঙ্গে ছিল বই কি মানুষ—খুব রোগা এক বৃদ্ধ লোক, মাথায় টাক। মিলছে?

নাগর নয়, রাধির মাতুল হারাণ মজুমদারই তবে। ভ্রষ্টা ভাগনী গ্রামের উপর কেচ্ছা করছে—হারাণ এসেছিলেন তাকে বিদায় করে দিতে। অঞ্চল মোটের উপর তো একটাই। মানী মানুষ, তিলডাঙায় থেকে তাঁরও কি মুখ পুড়ছে না?

হীরক বলে, তার উপর আমি যে রকম আদাজল খেয়ে লেগেছিলাম—

ভগীরথ একটা নিঃশ্বাস চেপে নেয়: আরে ভাই, তুমি হলে মরশুমি পাখি—দু-দিন এসেছ, আবার কলকাতায় গিয়ে উঠবে। তবু গ্রামের উপর একঘর ছিল। তারা আর টুনিমণি আছে—দেখে নিও, মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের উঠোনে কসাড় জঙ্গলে ঢেকে উঠবে মাস কয়েকের মধ্যে।

—সতের—

স্বৈরিণী মেয়েটাকে কাপাসদা'র মানুষ ভুলে গেছে। দশ বছর কেটেছে তারপর। ডাক্তারি পাশ করে হীরককান্তি গ্রামে এসে বসেছে। ভক্তিলতাও এখানে। টুনিমণি এখন ভক্তিলতার কাছে,—ভক্তিলতার ছেলেপুলে দেখে। ভক্তি বলেছে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নার্সিং পড়াতে দেবে। ইতিমধ্যে বাংলা-ইংরেজি শিখে নিক একটু। তাই শেখে ভক্তিলতার কাছে। টুনি ছাড়া ভক্তিলতার একদিনও চলে না।

অনেকদিন আগে রাধি ভক্তিলতাকে এক চিঠি লিখেছিল: ভাই চাঁপাফুল, বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণার পদতলে পড়ে আছি। বড় শান্তি। সকাল-সন্ধ্যা গঙ্গা-স্নান করি। পাপ ধুয়ে সাফ না করে ছাড়ছি নে। কিছুতে না। আবার যদি কখনো যাই, দেখতে পাবে তোমার চাঁপাফুল একেবারে নতুন মানুষ—

ভাল। এর চেয়ে ভাল খবর আর কি! ভক্তিলতা নতুন বউ হয়ে এল, সেদিন সকলের আগে গিয়ে পড়েছিল রাধি। স্বর্ণচাঁপার মুকুট গড়ে মাথায় দিল, চাঁপাফুল পাতাল। সেই অপরূপ রূপসী মেয়ের এই পরিণাম।

শোনা গেল, রাধারাণী ফিরেছে। মনোরমা মারা গেছেন। তারপরেও এত

বছর যা-হোক করে চালিয়েছে। আর এখন কাশীতে থাকবার অবস্থা নেই। গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

উঠেছে বাঁড়ুয্যেপাড়ায় নিজেদের বাড়ি।

সে বাড়ির কী দশা! পাগলি তারা একলা থাকে সেখানে। টুনিমণি কখন-সখন মা'কে দেখতে যায়—ভক্তিলতাও একদিন তার সঙ্গে গিয়েছিল। এমনি মানুষ বড় আর ও-মুখো হয় না। পাড়া একেবারে ফাঁকা। মরেহেজে গেছে। আর ওই যে রব উঠেছে, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হবে—আগেভাগে কতক গিয়ে ওপারে ঘর তুলেছে। তারা কামারনী বড়ঘরে তালা ঝুলিয়ে সংকীর্ণ সেই রান্নাঘরেই রয়ে গেচে। অত বড় ঘর লেপেপুঁছে পারে না। বুড়োমানুষের পক্ষে এই ভাল—রান্নাঘরের এক পাশে রাঁধাবাড়া, এক পাশে শোওয়া। একলা মানুষের কত আর জায়গা লাগে। খাওয়ার ভাবনা নেই—দেড় বিঘের ধান বর্গাদারে দিয়ে যায়। তার উপরে আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি এটা-ওটা আছে।

এতকাল পরে রাধারাণী বাড়ি ফিরে এল। এসেছে দুপুরবেলা, খবর শোনা অবধি ভক্তিলতা ছটফট করছে। সেই যে চিঠি লিখেছিল—কী রকম নতুন হয়ে এল রাধি এই দশ বছরে? বড়ঘরটায় ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছে, দেখে এসেছিল—তার ভিতরে আছে সে কী অবস্থায়? কিন্তু বউমানুষ সকলের চোখের উপর দিয়ে রাধি হেন মেয়ের কাছে হুট করে চলে যেতে পারে না। দিন গেল, রাত্রিটাও গেল—পরের দিন সকাল-বেলা হিঞ্চেশাক তুলবার ছুতোয় দীঘিতে গিয়ে সেখান থেকে লুকিয়েচুরিয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের উঠোনে।

উঠোন আর কি—বড়ঘরের ছাঁচতলা অবধি হেড়াঞ্চি ও কালকাসুন্দের ঝোপ। খুব ব্যস্ত রাধারাণী। তারা-বুড়িও লেগে গেছে দেখি তার সঙ্গে। কাটারি দিয়ে তারা ঠুকঠুক করে জঙ্গল কাটে আর হাঁপায়। বড়ঘরে ওঠার মতো পথটুকু হলে যে হয়। তালা খুলে ফেলেছে বড়ঘরের—ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি এনে রাধি ইঁদুরের গর্তে ঢালছে। দুরমুশ করছে ঢেঁকির ছেয়া খুলে এনে। তুমুল ব্যাপার। এমনি সময় বড়লোকের বউ ভক্তিলতা এসে দাঁড়াল।

রাত কাটালে এরই মধ্যে নাকি চাঁপাফুল? কী সর্বনাশ। আমায় একটা চিঠি দিলে তো হত।

রাধি রান্নাঘরের দিকে আঙুল দেখায়: ওইখানে তারা-দিদির পাশে পড়ে ছিলাম। কালকের রাত ভাল গিয়েছে, কিন্তু আজকে আর তা হবে না। সুনামের তো অন্ত নেই আমার! গাঁয়ে এসেছি সে খবর চাউর হয়ে গেছে—আজ থাকলে রান্নাঘরের ফঙ্গবেনে বেড়া রাতারাতি ভূতে উড়িয়ে দেবে। তারাদিদির শাপ-শাপান্তে ঠেকাবে না। যেমন করে হোক সন্ধ্যের মধ্যে দেয়ালের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজায় খিল দেব।

তারপর হেসে উঠে বলে, চিঠি দিলে কী করতে ভাই চাঁপাফুল? তোমাদের বাড়ি জায়গা দিতে? ঘরে না হোক গোয়ালে দিলে নাকি দোষ হয় না। কিন্তু তোমার কর্তার যা রাগ আমার উপর—পারলে আমায় দাঁতে পিষে চিবোন। আগ বাড়িয়ে আমার জন্য কিছু করতে গেলে খিটিমিটি বেধে যাবে তোমাদের মধ্যে। সেইজন্য কিছু জানাই নি।

ভক্তিলতা হয়তো বা লজ্জা পেয়েছে স্বামীর ওইরকম মনোভাবে। জবাব না দিয়ে একনজরে সে রাধারাণীর ধুলোমাটি-মাখা ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ

সে বলে ওঠে. কী মস্তর জান ভাই চাঁপাফুল—দশ বছরে যে দশটা দিনেরও বয়স বাড়ে নি।

রাধি বলে, আর কিছু নেই আমার ভাই—আছে এই সম্বলটুকু। কিন্তু তারই জন্যে তো টিকতে পারি নে। যেখানে যাই, মাছির মতন লোক ঘোরে। দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকতা শুনে ফিরছি, লোক পিছু নিয়েছে। যত বড় দেবস্থান, নোংরামি তত বেশি। তখন মা বেঁচে, যেন পর্বতের আড়ালে ছিলাম। কেউ কিছু পেরে ওঠে নি। সেই যা তোমাকে লিখেছিলাম, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। মাকে বলতাম, নাইট্রিক-এসিডে মুখ পোড়াবার কথা বলতে—কই? মায়ায় পড়ে পারছ না। টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেছে, মরবার আগে এই কাজটি অন্তত করে যাও। তাহলে অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

ভক্তিলতার এসব কিছুই কানে যায় না। মুগ্ধ স্বরে সে আগের কথাই বলে চলেছে: পশ্চিমের জলে হাওয়ায় শতদল পদ্ম হয়ে ফুটে এসেছ। মুনির মন টলে যায়। মেয়েমানুষ না হলে আমিও তো পিছু নিতাম, জড়িয়ে ধরতাম একেবারে।

রাধি হেসে তাড়া দিয়ে উঠল: চুপ। অমন করে চেঁচিয়ে বলে! ছেলের মা আমি যে এখন! ও হরি, তা বুঝি বলি নি—ছেলে নিয়ে এসেছি। রান্নাঘরে শুয়ে আছে—শরীরটা ভাল নয় বলে উঠতে দিই নি। ছেলের কানে এসব গেলে বড় লজ্জা।

সাপ দেখে মানুষ যেমন ত্রস্ত হয়, ভক্তিলতা তেমনিভাবে বলে, তোমার ছেলে—ছি-ছি, কী বল তুমি!

রাধি অভিমানের সুরে বলে, আ আমার কপাল! ছেলে বাড়িতে এল—কোথায় সকলে উলু দেবে শাঁখ বাজাবে—তা নয়, আমার আপন মানুষ হয়ে তুমি সুদ্ধ ছি-ছি করছ। ছেলে তোমায় দেখাব না চাঁপাফুল। যাও, চলে যাও তুমি—

ভক্তিলতা চাপা গলায় বলে, অন্য কাউকে বলেছ নাকি এই সব?

কেন বলব না? বাড়িতে পা দিয়েই তারা-দিদিকে বললাম। ভগীরথ-দা এসে জিজ্ঞাসা করল, কার ছেলে? তাকেও বলেছি। ছেলেকে ছেলে ছাড়া আর কি বলব?

ভক্তিলতা রাগ করে বলে, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার।

রাধারাণী নিরীহভাবে বলে, সোনা হেন ছেলেটা মা-মা—করে আঁচল ধরে বেড়াচ্ছে, বলতে তো হবে একটা-কিছু।

বলতে পারতে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। গঙ্গার ঘাটে ফেলে গিয়েছিল।

রাধি বলে, তাতে কী হত? পেটের ছেলে ফেলে দিয়ে যায় কোন কুমারী-মা, নয়তো কোন বিধবা-মা—আমারই মতন। তাহলে তো একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

ফিক করে হেসে বলে, কোন লাভ হত না। আমার যা সুনাম, কেউ ওকথা বিশ্বাস করত না। উল্টে ছেলে আমার দুঃখ পেত সেই কথা শুনে। মন গুমরে বেড়াত। মা বলা হয়তো বন্ধ করে দিত। তার চেয়ে মরণ হোক না আমার। নিজে তুমি ছেলের মা—ভেবে দেখ না, তোমার ছেলে নিয়ে যদি এমনি কথা ওঠে!

স্তব্ধ হয়ে গেল রাধি মুহূর্তকাল। হাতের কাজ বন্ধ। বলে, এই ছেলে বাঁচিয়ে তুলতে যত কষ্ট করেছি, সংসারের কোন মা তা করতে পারে জানি নে। সেই যা তোমায় লিখেছিলাম—সত্যি সত্যি শান্তিতে ছিলাম আমি, পাপের ময়লা মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়েছিল। কিন্তু মা মরার পর একেবারে অচল অবস্থা। উপোস যায় একদিন দু-দিন। নিজের কিছু নয়, কিন্তু ছেলের শুকনো মুখ দেখে পাগল হয়ে উঠি, কান্ডজ্ঞান থাকে না। যে রূপের ব্যাখ্যান করছ, তাই বেচে বেচে শেষটা চাল-ডাল তেল-নুন কিনতে হত।

ভক্তিলতা পাথর হয়ে শুনছে। বলতে বলতে রাধির দু-চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচলে মুছে ফেলে বলে, দু-খানা গয়নাগাটি যদি থাকত, তাই বেচতাম। নেই তা কি করব—রূপ বেচে বেচে ছেলে খাইয়েছি। সেই ছেলে বড় হয়ে গেছে এখন, বোঝে সব। যদি কিছু টের পায়, তখন আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। সেই ভয়ে পালিয়ে এলাম। বিঘে দেড়েক ধান-জমি আছে, আওলাতপশার কিছু আছে, দুঃখে-কণ্টে চালাব। তারপর আমার ছেলে মানুষ হয়ে গেলে আর ভাবনা কি। পায়ের উপর পা রেখে ছেলের ভাত খাব। দশ বছর বয়স হয়েছে—মরি মরি করে আর আটটা দশটা বছর।

আরও খানিক পরে ভক্তিলতা উঠল। দীঘিতে নেমে কিছু হিঞ্চেশাক তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। রাধারাণী তার হাত জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে, হীরক-দা বাড়ি রয়েছে—সেই আমার বড় শক্তি। তাকে বলে এই কাজটা কোরো চাঁপাফুল, নচ্ছার মানুষ এ-বাড়ির ছায়া না মাড়ায়। ছেলের সামনে কেউ কেলেঙ্কারি না করে বসে। আর দশটা গৃহস্থের মতন শান্তিতে ঘরবসত করব আমি।

ছেলের নাম দীপক। নাম রাখায় যখন পয়সা-খরচের ব্যাপার নেই, তখন একটু জ্বলজ্বলে নাম হবে না কেন? ভক্তিলতা চলে গেল, দীপক ঘুমুচ্ছে তখনও। কাশী থেকে বেরিয়ে পুরো তিনদিন পথে পথে—ছেলেমানুষের উপর দিয়ে বড্ড ধকল গেছে। আহা ঘুমোক—খুব খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

দুপুরবেলা খাওয়ার সময় হল, দীপক তখনো ঘুমুচ্ছে। রাধি গায়ে হাত দিয়ে দেখে, একটু যেন গরম। সন্ধ্যা নাগাদ স্পষ্ট জ্বর হল। বড়ঘরে তক্তাপোশের উপর শুইয়ে দিয়েছে। শয্যার পাশে রাধারাণী জেগে বসে। আলো জ্বলছে সমস্ত রাত। নতুন জায়গায় ভয়-ভয় করছে; তার উপর রোগির অবস্থা কখন কি রকম হয়, চোখে না দেখে সোয়াস্তি পাবে না। পাগলি তারা যথারীতি রান্নাঘরে। বলেছে বটে, দরকার পড়লে ডাকিস আমায় রাধি। কিন্তু কী বোঝে, আর কী করবে ওই মানুষ!

পরদিন সকালে জ্বরটা কিছু কম—একেবারে বিজ্বর নয়। দুপুর থেকে হু-হু করে আবার জ্বর বাড়তে লাগল। দেহ যেন তপ্তখোলা—ধানের মুঠো ছাড়লে বোধ করি খই হয়ে ফুটবে। অনেক ডাকাডাকিতে উঁ করে একটু সাড়া দেয়, টকটকে-রাঙা চোখ মেলে অর্থহীন ভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। সেই চোখ ঘোরানো দেখে রাধির প্রাণে আর জল থাকে না। কী করে এখন, কার কাছে যায়। পাশ-করা ডাক্তার হীরককান্তি গাঁয়ের উপরে—সে এসে দেখে যায় যদি। হীরকের পা জড়িয়ে ধরবে: আমার দোষঘাট যা-ই থাক হীরক-দা, দীপক তো কোন দোষ করে নি—

ছেলের কাছে তারাকে বসিয়ে রাধারাণী পায়ে পায়ে চলে গেল সেই মিস্তিরপাড়া অবধি। অপথ-কুপথ ধরে যাচ্ছে—মানুষের সামনে না পড়ে। তবু দেখে ফেলে দু-একজনে। কথা বলে না, বিস্ময়-ভরা চোখে রাধির দিকে তাকায়। চেনেই না যেন রাধিকে—নতুন মূর্তি ধরে বুঝি সে এবার গাঁয়ে উঠেছে।

তড়িৎকান্তির বাড়ি ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। অনেক মানুষ বৈঠকখানায়। কথাবার্তা যৎসামান্য—হুঁকো চলছে, গড়গড়া চলছে। হতভম্ব হয়ে রাধারাণী দাঁড়িয়ে পড়েছে। টুনিমণি এমনি সময় হনহন করে বেরিয়ে এল, এলুমিনিয়মের দুধের পাত্র হাতে। জিজ্ঞাসা করার মানুষ পাওয়া গেল একজন। রাধি কাছে এসে বলে, কেমন আছিস টুনি? বাড়ি এলাম, তা একবার চোখের দেখা দেখতেও গেলি নে?

টুনিমণি অবাক হয়ে বলে, তুমি এ জায়গায় কেন মাসি ?

রাধি বলে, ছেলের বড্ড অসুখ। চিকিচ্ছের জন্যে ডাক্তারের বাড়ি আসব না তো যাই কোথা বল্।

বৈঠকখানার দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে টুনিমণি বলে, তোমার মুন্ডপাতের জন্য লোক ডাকাডাকি হয়েছে। বিচার করতে বসেছে ওই যে সব।

রাধি বলে, আমি তো খারাপ আছিই। সেবারেও ছিলাম। সেবারে লোক ডাকা-ডাকি হয় নি—নতুন আবার কী হল রে ?

সেবারের মতন একলা যদি থাকতে, সকলে ক্ষমাঘেন্না করে নিত। কিন্তু ছেলে নিয়ে এসেছ, বিধবা মানুষ হাঁকডাক করে বলছ নিজের ছেলে তোমার—

ব্যস্ত হয়ে বলে, চল এখান থেকে। যোগানের দুধ দেয় নি এ-বেলা, দুধ আনতে যাচ্ছি। যেতে যেতে সব বলব।

মানুষগুলিকে রাধারাণী একবার ভাল করে দেখে নেয়। তাড়িৎকান্তি নিজে আছেন। সুঁচোল-নাক বিপুলদেহ ওই যিনি—বসার রকম দেখে বোঝা যায়, কাশীনাথ তর্কতীর্থ ছাড়া কেউ নয়। আরও সব বিশিষ্টেরা আছেন। গাঁয়ের যত পাকা পাকা মাথা এক-সঙ্গে মিলে বিধান দিতে বসে গেছেন।

টুনিমণি বলে, শুনতে পাচ্ছি মাসি, তোমায় একঘরে করবে। ধোপা-নাপিত বন্ধ। মানুষজন পা ফেলবে না তোমার বাড়ি।

মানুষ যাবে না, তবে তো বেঁচে যাই। মাতব্বর মশায়দের পাদোদক খাব তাহলে আমি। কিন্তু সে হবার নয় রে টুনি—

বলতে বলতে রাধারাণী কেঁদে ফেলে: কালও নিশিরাতে উৎপাত করে গেছে, দাওয়ায় উঠে কবাটে ঠুকঠুক করেছে। সেই আগেকার মতন।

আবার বলে, মানুষজন না যাক, ডাক্তারও কি যাবে না আমার বাড়ি ? রোগা ছেলের মুখে এক ফোঁটা অষুধ পড়বে না ? হীরক-দা'কে তাই বলতে এসেছিলাম।

টুনিমণি ঘাড় নাড়ে: বললে কিছু হবে না। উল্টে গালিগালাজ খাবে। ডাক্তারবাবু নাম শুনতে পারে না তোমার। হোমোপাথি পূর্ণ জোয়াদ্দারও যাবে না, মাতব্বরদের ভিতর সে একজন। তুমি বরঞ্চ যাদব কবরেজের কাছে চলে যাও। মানুষটা ভাল, মায়াদয়া আছে।

যাদব কবিরাজ মানুষটা কে—এই গ্রামেরই মেয়ে, তবু রাধারাণী ভেবে ঠিক করতে পারে না। নতুন বসত বুঝি ?

টুনিমণি সমঝে দিল: নতুন কেন হবে—চৈতন ঘরামির বাপ যাদব। আগে ওরা ঘরামির কাজ আর ক্ষেতখামার করত। তারপর চৈতন মারা গেল, জমাজমি সব নিলেমে উঠল। অত বড় সংসার চালাতে হবে তো—যাদব সেই থেকে কবিরাজি ধরেছে। যাদব-ঘরামি নয় এখন, যাদব-কবরেজ।

বলে, তা চিকিচ্ছে কিন্তু মন্দ করে না মাসি। দু-চারটে সারেও দেখেছি।

টুনিমণি বাঁয়ে বেঁকল। তাকে দরকার নেই—কবিরাজ-বাড়ি রাধি এখন বুঝতে পেরেছে। কবিরাজ বাড়িতেই ছিল, খড়ম খটখট করে দাওয়ায় জল-চৌকিতে এসে বসল। সমাদর করে ডাকে: এস মা রাধারাণী। উঠে বোসো এখানে। খবর কী ?

রাধি তেমনি উঠানের উপর দাঁড়িয়ে বলে, আমার ছেলের বড্ড অসুখ কবিরাজ মশায়।

যাদব বলে ছেলে নিয়ে বাড়ি এসে উঠেছ, শুনেছি বটে। শুনতে কারো বাকি নেই

এদিগরে। আহা-হা, কী অসুখ করে বসল তোমার ছেলের?

আমি কী বুঝি, আর কী বলব। দেখেশুনে যে রকম বোঝ চিকিচ্ছে করবে। সেই জন্যে ডাকতে এসেছি।

কবিরাজ জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, চিকিচ্ছে আলবৎ করব। কারে ডরাই? কায়েত-বামুনরা ঘোঁট পাকাচ্ছেন—ভারি ভারি ফিকির করছেন তোমায় জব্দ করবার জন্য। আমার কি? ওই মশায়দের বাড়ি গেলে আমায় তো চাটকোল পেতে বসতে দেবেন, আমি কেন ঘোঁটে থাকতে যাব? রোগি পেলেই অষুধ দেব, তা সে যে-ই হোক।

রাধি কৃতার্থ হয়ে বলে, চল তবে একটিবার।

উঁহু বাড়ি যেতে পারব না। ওইটি মাপ করতে হবে। রোগি এখানে আনতে পার ভাল, নইলে তোমার মুখে শুনে যতদূর যা হয়—

রাধি বলে, কিন্তু ঘোঁটের বাইরে তো তুমি কবিরাজ মশায়।

যাদব বলে তাই তো অষুধ দিয়ে দিচ্ছি। থাকলে কি দিতে পারতাম?

একটুখানি ইতস্তত করে বলে, তবে খুলেই বলি। তোমার বাড়ি গেলে পরিবার কুরুক্ষেত্তোর করবে। মানে নির্বোধ মেয়েমানুষ তো, নানান কথা শুনতে পাচ্ছে তোমার নামে—

সত্তর বছরের বুড়োমানুষটাকে বাড়ি নেওয়া গেল না। বামুন-কায়েত মাতব্বরদের সে গ্রাহ্য করে না—কিন্তু রাধির বাড়ি গেলে কবিরাজের বউ ওই খুনখুনে বুড়িটা নাকি মাথা-ভাঙাভাঙি করবে। বউয়ের ভয়ে যেতে পারল না। তবে আর কী উপায়? লক্ষণ শুনে বিচার-বিবেচনা করে কবিরাজ গোটাকতক রাঙাবড়ি দিল—মৃত্যুঞ্জয় রস। মৃত্যুকে করিতে জয় নাম হইল মৃত্যুঞ্জয়—পানের রস আর মধু দিয়ে মেড়ে প্রাতে এক বড়ি, বৈকালে এক বড়ি খাইয়ে যাও, জ্বর আরাম হবে।

তিনদিন এমনি গেল। জ্বর কমে না। পেটে আঙুলের ঘা দিয়ে দেখে, ঢপঢপ করছে। ভয়ে রাধি কাঁটা। ক্রমেই তো খারাপের দিকে যাচ্ছে। পাগলের মতো ছুটে ঠাকুরবাড়ি চলে যায়। তখন মনে পড়ল, মন্দিরে ঢুকতে পারবে না তো। বাইরের ইটের রোয়াকে মাথা কোটেঃ গোপাল, দেশদেশান্তর থেকে তোমার পায়ে ছেলে নিয়ে এসেছি—ওকে আরোগ্য করে দাও। দীপক ছাড়া কেউ নেই আমার।

অনেক রাতে একটু বুঝি ঘুম এসে গিয়েছিল দীপকের পাশে বাঁকা হয়ে শুয়ে—দীপকের উত্তপ্ত পিঠে হাত রেখে। স্বপ্নে দেখে, সদাহাস্যময় বংশী-বদন ঠাকুর ধমক দিচ্ছেনঃ একলা মানুষ—কোনরকম ঝঞ্ঝাট ছিল না, হেসে-খেলে আরামে থাকতিস। পরের আপদ সাধ করে কুড়িয়ে আনলি, মর এখন ছটফট করে।

সত্যি তাই। গর্ভধারিণী যে মা, তারই কাছে আপদ হল নিজের ছেলে। আহা, দীপকের কপাল নিয়ে কেউ যেন দুনিয়ায় না আসে। ভাবতে গিয়ে রাধির চোখ ভরে জল এল। ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলায়। ইস, হাত ছোঁয়ানো যায় না—হাত যে পুড়ে যাচ্ছে।

ভক্তিলতা টুনিমণির কাছে খবর পেয়েছে। ক'দিন ধরে ফাঁক খুঁজছিল। এবারেও সেই পুরানো কৌশল—হিঞ্চেশাক তুলতে এল দীঘিতে। সেখান থেকে ধাপ আর পচা-কাদা ভেঙে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাধির উঠোনে। উঠোন থেকে ঘরের মধ্যে।

ছেলের পাশে বসে রাধি পাখা করছে। ডান হাতে পাখা, বাঁ হাত কপালে ঠেকিয়ে

দেখছে মুহুর্মুহুঃ। একবার মনে হয়, কমেছে জ্বর। কমেছে বই কি—হ্যাঁ, তাই। কবিরাজের ওষুধে কাজ হয়েছে। পরক্ষণে সন্দেহ হয়, কপালের তাপ তো যেমন তেমনি।

এমনি সময় ভক্তিলতা। ঘরে ঢুকে ভক্তিলতা সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে। তবু খুট করে একটু শব্দ হয়, সেই শব্দে রাধারাণী মুখ তোলে। কাল ঠাকুরের কাছে মাথা কুটে এল, নিশ্চয় সেই জন্যে গোপাল পাঠিয়েছেন। ব্যাকুল কণ্ঠে রাধি বলে, চোখে আঁধার দেখছি চাঁপাফুল। আমি কী করব?

নির্জন সর্বত্যক্ত এই বাড়ির মধ্যে একাকী মা রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসে আছে। চোখ বসে গিয়েছে—কতদিন অনাহারে আছে যেন, কত রাত্রি ঘুমোয় নি। ছেলেপুলের মা ভক্তিলতাও। রোগির গায়ে হাত দিয়ে বলে, কই গা তেমন গরম কোথায়? মনের তাড়সে তুমি জ্বর দেখছ। প্রায় তো সেরেই গেছে, পরশু-তরশু ভাত দিতে পারবে।

রাধারাণী নির্বোধ নয়, আশার কথায় তবু যেন অবুঝ হয়ে যায় মুহূর্ত-কাল। মুখে হাসির ঝিলিক ফোটে। মাকে ভোলানো এত সোজা! জ্বর এমন-কিছু নয়—তারও এবার সেই রকম মনে হচ্ছে।

ভক্তিলতা বলে, আমি আছি এখানে, চান করে কিছু মুখে দিয়ে এস চাঁপাফুল। এক-কাপড়ে অমন ঠায় বসে থাকতে নেই। অলক্ষণ। দেখতেও খারাপ—কত বড় কী যেন একটা হয়েছে। কথা না শোন তো এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

বলতে বলতে অবশেষে রাধি উঠল। স্নান করে গুড়-নারকেল মুখে দিল একটু। দীপক অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ভক্তিলতা বলে, নিজের সর্বনাশ নিজেই বেশি করেছ চাঁপাফুল। তাই এমন একা। এতবড় গাঁয়ের মধ্যে থেকে রোগা ছেলের পাশে একটু বসবার মানুষ পাও না। বালি ফুটিয়ে দেবার একজন কেউ নেই।

রাধারাণী কাতর চোখে তাকাল: আমার দোষ নয় চাঁপাফুল—বিধাতা-পুরুষের; হাড়-মাস-চামড়ার উপরটা যে এমন করে সাজাল। এর উপরে কোনদিন তো আমি এক টুকরো সাবানও ঘষি নে। ধুলো-মাটি কালিঝুলি মেখে বেড়াই। পোড়া রূপ তবু যায় না। জীবন-ভোর এর জন্য আমার হেনস্থা। এঁটোপাতার মতো কুকুরে এসে চাটে।

গলা ধরে আসে। চুপ করে রাধি একটুখানি সামলে নেয়: আমার কত ঘেন্না যে এই দেহের উপরে, তুমি জান না চাঁপাফুল। তোমার আসার অনেক আগের এক ব্যাপার—ডানপিঠেমি করে বেড়াই, সেই সময়ে জোয়াদ্দার-পাড়ার শেফালী চিঠি লিখেছিল গঙ্গেশের নামে। কিছুই নয়—ছোট মেয়ে ঝোঁকের মাথায় করে বসেছিল। কী রাগ আমার তাই নিয়ে। গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করেছিলাম, থুতু দিয়েছিলাম তার গায়ে। সেই সব কথা আজ ভাবি। নিজের গায়ে যে থুতু দেওয়া যায় না—নইলে তাই আমি করতাম সকাল-বিকেল। কিন্তু চেষ্টাও তো কম করি নি—মানুষে কিছুতে রেহাই দেয় না। মা মরে গেলে ঠিক করলাম, ঝিগিরি রাঁধুনিগিরি করে খাব। যেখানে কাজ করতে যাই, বাড়ির পুরুষ ছোঁক-ছোঁক করে। রাজি না হলে ছুতোনাতায় তাড়িয়ে দেয়। ওই একটা জিনিস ছাড়া কেউ আমায় সিকি-পয়সা সাহায্য দেবে না।

ভক্তিলতা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। আগাগোড়া শুনে নিয়ে বলল, সকলের চেয়ে বড় দোষটা কোথায় জান চাঁপাফুল? নিরুপায় হয়ে যা করবার করলে, কিন্তু বাইরে একটা মিথ্যার পালিশ দিয়ে বেড়াতে জান না তুমি। দুনিয়ার তাই যে নিয়ম। যে যা-ই করুক, মুখে বলে না কেউ। সব মানুষ অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। এই যে তোমার

ছেলের ব্যাপার—সেদিন বললে, বানানো কথা বিশ্বাস করত না কেউ। না করুক, কানাঘুষো চলত। তবু যে নিজের একটা সাফাই বানিয়ে বলেছ, সমাজের ইজ্জত রক্ষা হত তাতে। কিন্তু তুমি একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে খালাস—দীপক তোমারই ছেলে, স্বামী না থেকেও ছেলে হয়েছে। দশেধর্মে এত বড় চোট মানিয়ে নিতে পারে না।

অনেকক্ষণ কাটল। সুখদুঃখের অনেক কথা হল। এবারে উঠবে ভক্তিলতা। বলে, মন এখানে পড়ে রইল চাঁপাফুল। ফাঁক করতে পারলেই আবার আসব।

রাধি বলে, থার্মোমিটার হলে জ্বরটা ঠিক ঠিক বোঝা যেত। কোথায় পাই? থাকলেও পাড়াপড়শি কেউ দেবে না। গঞ্জেও পাওয়া যায় না শুনলাম, ব্লাকে চলছে।

ভক্তিলতা বলে, ডাক্তারের বাড়ি থার্মোমিটার আছে। দেব পাঠিয়ে।

সাগ্রহে রাধি বলে, আমি যাব তোমার সঙ্গে? ভিতরে যাচ্ছিনে, বাইরে কোনখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

লোকে দেখে ফেলবে, জানাজানি হয়ে যাবে। তাহলে তো টুনিকে দিয়েও পাঠাতে পারতাম। তোমার কাছে আসি, কেউ না টের পায়! পাঠাবার জন্যে ভাবনা কি—খোদ ডাক্তারই নিয়ে আসবে। শুধু টেম্পারেচার নিলেই তো হবে না, দেখেশুনে ওষুধ দিয়ে যাবে।

রাধি অবাক হয়ে বলে, আসবেন হীরক-দা? বলছ কি চাঁপাফুল, পারবে তুমি পাঠাতে?

ভক্তিলতা সহজ ভাবে বলে, তা কেন পারব না? কিন্তু কী রকম ব্যস্ত মানুষ জান তো—আসতে রাত হবে।

রাধি বলে, কিংবা ইচ্ছে করেই রাত করে পাঠাবে।

সায় দিয়ে ভক্তিলতা বলে, ঠিক তাই। সমাজের ইজ্জতটা বাঁচিয়ে রেখে। বাড়ির লোকজন পাড়ার লোকজন ঘুমলে তবে পাঠিয়ে দেব। এসে দুয়োর ঠেলবে, তখন ভয় পেয়ে যেও না কিন্তু ভাই।

রাতের ভয় কী দেখাও চাঁপাফুল? মোচ্ছব তো তখনই। পেঁচা ডাকে, বাদুড় ওড়ে, সাপ বেরোয় গর্ত থেকে—আমার উঠোনে তখন মানুষের দাপাদাপি। কাপাসদা এসে গোড়ায় একদিন-দুদিন ভাল ছিল—আবার লেগে গেছে। ছেলের এত বড় অসুখ, তাই বলেও দয়া করে না।

নিশ্বাস ফেলে বলে, হীরক-দা আসবেন, এ আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না। কী ছিলাম, কী হয়েছি—তাঁর বড় ঘেন্না আমার উপরে। ওই একটা মানুষই দেখেছি ঘেন্না করে মুখ ফিরিয়ে নেন। ঘেন্না করেন, তবু কিন্তু বড় ভাল লাগে।

স্বামী-গর্বে ভক্তিলতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: তুমি বলে নয় ভাই। ও মানুষ অমনি। ঘেন্না বল তুচ্ছতাচ্ছিল্য বল, সব মেয়ের সম্পর্কে। একলা এই আমি ছাড়া কারও দিকে তাকায় না। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যাকে বলে—সত্যযুগের মানুষ। কিন্তু আমি বললে ঠিক সে চলে আসবে। না এলে তোমার ছেলের চিকিচ্ছে হবে না যে। হাতুড়ের উপর ফেলে রাখতে আমি দেব না।

হেসে উঠে আবার বলে, চাঁপাফুল ভাই, অনেক ক্ষমতা তোমার শুনতে পাই। লোকে বলে, অনেক মাথা তুমি চিবিয়ে খেয়েছ। ওর মাথায় কামড় দিতে যেও দেখি। দাঁত তোমার ভেঙে যাবে।

হাসতে হাসতে ভক্তিলতা বেরিয়ে গেল।

—আঠার—

প্রস্তাব শুনে হীরক অবাক হয়ে যায়। ভক্তিলতা ঝগড়া করছেঃ ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে তুমি গ্রামের উপর থাকতে? মানুষ হিসাবে পছন্দ না কর, ডাক্তার হিসাবে যাও। চাঁপাফুল যদি দু-টাকার জায়গায় দশ টাকা ভিজিট দিতে পারত, তখন সুড়সুড় করে চলে যেতে।

রাগ দেখে তখন হীরক হাসেঃ আমি যেতে চাইলেও তোমার তো বাধা দেওয়া উচিত। আর দশটা প্রতিপ্রাণা সতীর মতো। ওই রাধারাণী, জান, আমাদের সকলের মুখের উপর একদিন জাঁক করেছিল, কামরূপ-কামাখ্যার মন্তর জানে সে। তাই যদি সত্যি হয়—গুণ করে যদি ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয়!

ভক্তিলতাও হেসে ফেলেঃ তাই কি আর হবে শেষ অবধি? কপাল বড় পাথরচাপা। কতবার কত রকমের আশা করি, শেষ অবধি ভেস্তে যায়। চাঁপাফুল ভারি কাজের মেয়ে—নিঃসহায় একটা মেয়েলোক দু-খানা হাতে ছেলের জন্য যা করছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। মানুষ হও ভেড়া হও, তার কাছে সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না। আরামে থাকবে। আমি তার সিকির সিকিও পারি নে। তোমার দায়ে নিশ্চিন্ত হলে ছ-মাস তখন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব।

হীরক বলে, জানি গো জানি। ছুতো খুঁজছ। এক যুগ বিয়ে হয়েছে—এক পুঁথি কতবার পড়তে ভাল লাগে? কিন্তু আমাকে না সরিয়ে তুমি নিজেই ইচ্ছে মতন সরে গেলে পার। মানা করতে যাব না।

ভক্তিলতা ঘনিষ্ঠ হয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যাঁ গো, বলে দাও না কার সঙ্গে সরে পড়ব? চাঁপাফুল আমার চেয়ে অনেক—অনেক ভাল। রূপে-গুণে ভাল, বুদ্ধি-সাহসে ভাল। তোমার তো এত বন্ধুবান্ধব—সেই কলেজের আমল থেকে দেখছি—চা করতে করতে হাত পুড়িয়ে কাল করে ফেললাম, তার মধ্যে একজনও তো ভাল দেখলাম না তোমার চেয়ে। নিয়ে এস না ভাল দু-একটা জুটিয়ে—পুরানো ছেড়ে নতুন পুঁথি পড়ে দেখি।

স্বামীকে রাজি করিয়া ভক্তিলতা চুপিসাড়ে দরজা খুলে দিল। বাড়ির লোকে, পাড়ার লোকে ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে।

বড়ঘরের দাওয়ায় উঠে হীরক দরজা নাড়ল। কথা আছে তাই। আনাড়ি হাত—অন্যেরা যেমন করে, সে রকম নয়। চিনে নিয়ে রাধি তাড়াতাড়ি খিল খুলে দেয়।

হেরিকেন জ্বলছে। একটা পুরানো পোস্টকার্ড চিমনির গায়ে গুঁজে দেওয়া—দীপকের চোখে আলো না পড়ে। মেঘে ভরা আকাশ। বৃষ্টি নেই, বিষম গুমট। খুব ঘামছে ছেলেটা—গরমের জন্যে। কিন্তু রাধারাণী তা মানবে না—জ্বর রেমিশন হচ্ছে বলেই ঘাম। হাতপাখা রয়েছে হাতের কাছে, গরমে আইঢাই করছে। তবু পাখাটা নাড়বে না, হাওয়া লেগে দীপকের ঘাম পড়া পাছে বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর গোপাল, পাঁচ পয়সার ভোগ দিয়ে আসব খোকার জ্বর ছেড়ে গেলে। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে মনে পড়ে যায়, ঠাকুরবাড়ি ঢোকা তার মানা হয়ে গেছে। নাই বা গেল গোপালের কাছে—কেউ যখন থাকবে না, চুপি চুপি রোয়াকের উপর ভোগের বাতাসা রেখে আসবে। পুরুত হাতে করে না দিলেও অন্তর্যামী ঠাকুর নিয়ে নেবেন।

এই সব ভাবছে, এমনি সময় হীরক এল। কাল গগলস পরেছে চোখে, বৃষ্টি নেই

তবু বর্ষাতিতে আপাদমস্তক ঢাকা। একটি কথা না বলে রাধির দিকে না তাকিয়ে থার্মোমিটার দীপকের জিভের নিচে দেয়। হাতঘড়ি দেখছে। আলোর কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরিখ করে দেখে থার্মোমিটার আবার খাপে ঢুকিয়ে রাখে।

কী মানুষ, একটি কথা নেই এতক্ষণের মধ্যে। তখন রাধিকেই বলতে হয়, কত দেখলে?

তিনের উপর।

জবাব দিচ্ছে, মুখের দিকে তাকায় না। রাধি আকুল হয়ে বলে, কী হবে হীরক-দা?

হীরক বলে, কয়েকটা প্রশ্ন করছি। যা বলবার তারপরে বলব।

রোগের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন। পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে হীরক জবাব লিখে নিচ্ছে। শেষ হলে নিবিষ্ট হয়ে ভাবছে সেই লেখা-কাগজের দিকে চেয়ে।

রাধারাণী বলে, কবে সেরে উঠবে খোকা?

গম্ভীর নিস্পৃহ কণ্ঠে হীরক বলে, এখন কিছু বলা যায় না। টাইফয়েড—আসল নয়, প্যারাটাইফয়েড। তা-ও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আর দু-চারদিন না গেলে।

ডাক্তারি-ব্যাগ নিয়ে এসেছে। এটা-ওটা মিশিয়ে শিশিতে ঢেলে ওষুধ বানায়। বলে, এই ওষুধ চলবে আপাতত। কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা ওষুধে নয়। শুশ্রূষাই হল আসল। মন বোঝে না, সেইজন্য এক দাগ দু-দাগ ওষুধ খাওয়ানো।

ওষুধ রাধির হাতে দেয় না, ছুঁতে হয়তো বাধছে, মেঝেয় রেখে দিল। থার্মোমিটার তাকের উপর নিয়ে রাখল। বলে, অসাবধানে পড়ে গিয়ে না ভাঙে। টেম্পারেচার ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাখতে হবে। ও, ঘড়ি তো নেই—

নিজের হাতঘড়িটা খুলে থার্মোমিটারের পাশে রেখে আসে। পথ্য কখন কি দেবে, জ্বর বেশি হলে মাথায় কি ভাবে জল ঢালবে ইত্যাদি আনুপূর্বিক বুঝিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হীরক। বলে, কাল নয়—পরশু আসব এই সময়।

রাধি অনুনয় করে বলে, কালও একটিবার এস হীরক-দা।

না, দরকার হবে না—

গটমট করে হীরক বেরিয়ে গেল। নীরস কাটা-কাটা কথা। রাধি রাগে গরগর করছে। আবার আনন্দও হয় ভক্তিলতার ভাগ্যে। জাঁক করবার মতো স্বামী পেয়েছে। দেহভরা রাধির এত রূপ—চোখ তুলে একবার তাকাল না। এমনি দেমাক, এতখানি দৃঢ়তা। হীরক নাম তো সত্যি সত্যি এক হীরের টুকরো। আদাড়ে-আস্তাকুড়ে যেখানে খুশি ফেলে রাখ—মরচে ধরবে না, জ্যোতি কমবে না।

একদিন বাদ দিয়ে অমনি নিশিরাত্রে হীরক রোগি দেখতে এল আবার। প্যারা-টাইফয়েডই বটে, আশঙ্কার কিছু নেই, তবে সতর্ক থাকতে হবে। দুর্বল শরীরে ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে নিউমোনিয়া না ধরে।

আবার ক'দিন পরে এল। এমনি চলছে। জ্বর একেবারেই থাকে না সকালবেলা। সন্ধ্যার দিকে একটু হয়।

হীরক বলে, এটুকুও যাবে। ভাবনা কোরো না। দিন দশেক আমি থাকছি নে। একটা ভাল চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছি কলকাতায়, সেই তদ্বিরে যাচ্ছি।

বড় আনন্দ আজ রাধারাণীর। ছেলে আরোগ্যের পথে—সেই এক, আর হীরক খুব অন্তরঙ্গভাবে আজকাল কথা বলে। দশদিন আসবে না, সেই বলাটুকু যথেষ্ট।

না বললেই বা কী! সেই বলার সঙ্গে আবার কতখানি কৈফিয়ৎ জুড়ে দিল—কলকাতায় ভাল চাকরির কথা, চাকরির তদ্বিরের কথা। আর একটা জিনিস—সোজাসুজি তাকায় না, কিন্তু আড়চোখে হীরক লুকিয়ে দেখে। রাধির চোখে চোখ পড়তে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি লজ্জায়। লাজুক নববধূর মতন। মজা লাগে।

কিন্তু দশ নয়, তার অর্ধেক পাঁচও নয়—তিনদিনের দিন হীরক এসে পড়ল।

এত শিগগির কাজ মিটল?

হীরক আমতা-আমতা করেঃ ভক্তির অসুখ দেখে গিয়েছিলাম, মনটা উতলা ছিল। আর আমি ভেবে দেখলাম, চাকরি নিয়ে কলকাতায় পড়ে থাকা পোষাবে না। স্বাধীন প্রাকটিশ ভাল। সেই কথা শ্বশুর মশায়কে বলে চলে এলাম।

মুখ তুলে চোখ চেয়ে আজ কথাবার্তা। রাধি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কী হয়েছে চাঁপাফুলের?

মানে সাঁদকাশির ধাত তো। বর্ষার এই সময়টা হাঁপানির টান হয় একটু—

টেম্পারেচারের চার্ট তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। বলে, আর কি! অমাবস্যাটা কাটিয়ে ভাত দিয়ে দাও। রোগের চিকিচ্ছে হয়ে গেল, ভিজিট পায় নি কিন্তু এখনো ডাক্তার।

তেমনি তরল সুরে রাধারাণীও বলে, বলছি তো তাই। ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি হীরক-দা?

বলতে গিয়ে থেমে বাঁ-হাতের আঙুলে আঁচল জড়াতে লাগল। সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তারপর বলে, ইচ্ছে করে হীরক-দা, দীপকের অন্নপথ্যের দিন তুমিও এখানে বসে দুটি খেয়ে যাও। দিনের বেলা তো হবে না, রাত্রে এই যেমন সময় এসে থাক। আমার হাতের রান্না। গৃহস্থঘরের মেয়ে, বাবা খাইয়ে লোক ছিলেন, রান্নাবান্না বেশ ভালই শিখেছিলাম। খাবে?

কেন খাব না? কলকাতায় এত অজাত-কুজাত গলায় ক'গাছা সুতো ঝুলিয়ে বামুন সেজে রেঁধে রেঁধে খাইয়েছে, তোমার রান্নায় কী দোষ হল?

রাধি কেঁদে বলে, তারা অজাত হোক কুজাত হোক, সে দায় বিধাতাপুরুষের। তাদের কোন হাত ছিল না। আমি যে নিজের কাজে জাত খুইয়ে বসেছি হীরকদা।

=উনিশ=

রাত্রিবেলা এই সমস্ত কথা—দীপকের ভাল হয়ে যাওয়ার আনন্দে। পরের দিন ভক্তিলতা এসে উপস্থিত। রাধি কলকণ্ঠে আহ্বান করেঃ এস ভাই চাঁপাফুল। অসুখ শুনে বড্ড ব্যস্ত হয়েছিলাম, ভাল আছ এখন?

জানি, জানি। অসুখ হয়ে মরে গেলে মজা জমে তোমাদের। ভক্তিলতা ঝংকার দিয়ে উঠলঃ কিন্তু সে আশায় ছাই। এমন ধারা-শ্রাবণে এত জল বসাচ্ছি, হাঁচিটি পর্যন্ত হয় না।

তক্তাপোশের কাছে এসে দীপকের গায়ে হাত দিয়ে দেখে। বলে, ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে তবু আমার স্বামীকে ছাড়ছ না কেন? ভাল করলাম তার শোধ তুলছ? যে পাতে খাও, সেই পাত নোংরা কর তোমরা। গলায় দড়ি জোটে না নেমকহারাম বদমায়েস পাজি মেয়েমানুষ। ভদ্রলোকের গাঁ থেকে দূর হয়ে যাও, নিজেদের পাড়া বানিয়ে নাও গে। দূর, দূর—

কাদা-মাখা স্লিপার ক্ষিপ্তের মতন ছুঁড়ে মারে রাধির দিকে। জুতো গিয়ে পড়ে

দীপকের বিছানায়। ভয় পেয়ে রোগা ছেলে আর্তনাদ করে উঠল।

বুকের মধ্যে তাড়াতাড়ি ছেলেকে আগলে ধরে রাধি বাঘিনীর মতো তাকাল: কত দিন বাছা না খেয়ে আছে, জুতো ছুঁড়লে তুমি তার গায়ে? ছেলেপুলের মা নও তুমি! বেরোও আমার ঘর থেকে, রোগা ছেলে কাঁপছে।

ততক্ষণে দরদর ধারা নেমেছে ভক্তিলতার গাল বেয়ে। বলে রাত দুপুরে আসা-যাওয়া কোনখানে আর চাপা নেই। গ্রামসুদ্ধ ঢি-ঢি পড়েছে। সে নিন্দে মিথ্যে নয়। আগে আগে ঘুম থেকে ওকে ডেকে তুলে দিতাম। এখন সারাদিন অত খাটনি খেটে এসেও বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, তড়াক করে নিজেই উঠে পড়ে এক সময়, দুয়োর খুলে টিপিটিপি চোরের মতো বেরোয়। বাবা কলকাতায় একটা ভাল চাকরির জোগাড় করলেন, আমিও চাই তাড়াতাড়ি নিয়ে পালাতে। তা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ইন্টারভিউ না দিয়ে ফিরে চলে এল। নরকের টান ধরেছে—থাকবার জো আছে বাইরে দুটো দিন সুস্থির হয়ে?

ভক্তিলতা চলে গেছে। বজ্রাহত রাধি। আরও লজ্জা, ব্যাপারটা ঘটল দীপকের চোখের উপরে। দীপক সমস্ত কানে শুনল। লজ্জার চেয়ে ভয় বেশি। দীপকের জন্যই কাশী থেকে পালিয়ে এল। পাড়ার ছেলেরা কী সমস্ত বলেছিল দীপককে। বাড়িতে এসে এক মাস্টার পড়িয়ে যেত, সেই মাস্টারকে জড়িয়ে নোংরা কথাবার্তা। বড় হয়েছে দীপক, জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে। শুনে এসে হাউহাউ করে কাঁদে। গল্প করে, হাসির কথা বলে, গঙ্গায় নৌকো করে ঘুরিয়ে—কোনরকমে ঠাণ্ডা করা গেল না। ছেলের জন্য কাশী ছেড়ে গাঁয়ে চলে এসেছে।

সন্ধ্যার পর বার্লি খেয়ে দীপক চোখ বুজেছে। রাধিও পাশে শুয়েছে একটু। সকালবেলা ভক্তি-বউ এসে কেলেঙ্কারি করে গেল। এখনো সেই কথাগুলো ভাবে, আর জিভ কাটে মনে মনে। খোকা, তুই ভাল হয়ে ওঠ। খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যা দিকি। এ পোড়া দেশেও থাকব না। বড় হয়ে রোজগারপত্তর করবি—অনেক দূরে চলে যাব যেখানে কেউ আমাদের চেনে না, পিছনের কথা জানে না কেউ। ঘর থেকে বেরুবই না, যতদিন একেবারে বুড়ো না হচ্ছি। কিনেকেটে এনে দিবি তুই, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে রাঁধব। বুড়ো-থুত্থুড়ে হয়ে গেলে আর তখন ভয় কি! বউ এসে যাবে ততদিনে তোর। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি রাত্রে, বউ দুধ আর সবরিকলা নিয়ে এসে ডাকছে। ঘুমের ঘোরে বলছি, ক্ষিধে নেই, গলায় গলায় হচ্ছে মা। বউ বলছে, আপনি না খেলে কেউ আমরা খেতে পাচ্ছি নে মা, বাড়িসুদ্ধ উপোস। কত সুখ হবে আমার তুই খোকা যখন বড় হয়ে যাবি—

হাতখানা দীপকের গায়ে পড়েছে। চমক লাগে। গা যেন ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে। মিছা, মিছা। মায়ের মন ভুল করে অমনি। কিন্তু থার্মোমিটার ভুল করবে না—

একশ' একের উপর। ক'দিন সম্পূর্ণ ভাল থেকে আবার জ্বর কেন? শুধু জ্বর নয়, একটু পরে ওয়াক টানছে। যে বার্লিটুকু খেয়েছিল, হড়হড় করে বমি হয়ে বেরুল। তারপরে আরও দু-বার। নেতিয়ে পড়েছে ছেলে। চিঁ-চিঁ করছে: ওমা, মুখ তিতো হয়ে গেছে, মিছরি দাও। তার মানে পিত্তি বেরুচ্ছে বমি হয়ে। রাত্তিরবেলা কী করে এখন! হীরক আসবে না, ভক্তি ঠিক তাকে আটক করেছে। কোনদিন আসতে দেবে না। কালই বা সে কী করবে আবার সেই যাদব কবিরাজের শরণ নেওয়া ছাড়া?

দরজা খটখট করে ওঠে। ফিসফিসিয়ে বলে, দোর খোল—আমি, আমি।

এক নিমেষে রাধারাণী উঠে পড়ে। হীরকই তো! এমন সকাল সকাল আসে নি আর কখনো।

দরজা খুলে দিয়ে রাধারাণী কবাটের আড়ালে দাঁড়াল। হীরক ঢুকে যেতে দাওয়ায় নেমে পড়ে। কাতর কণ্ঠে বলে, আবার জ্বর হল কেন খোকার?

দেখছি—। বলে থার্মোমিটার বের করে হীরক ঝেড়ে ঝেড়ে পারা নামাচ্ছে। ঝাড়ছে তো ঝাড়ছেই। দৃষ্টি বাইরের দিকে—রাধি কথা বলছে যে অন্ধকার দাওয়া থেকে। ঘুমন্ত দীপকের একটা হাত সে উঁচু করে ধরল।

রাধি বলে, হাড্ডিসার হয়ে গেছে খোকা। বগলে তাপ উঠবে না, তুমিই তো সেজন্য থার্মোমিটার মুখে দিতে বলেছ।

হীরক বেকুব হল। মুখের ভিতর থার্মোমিটার দিয়ে বলে, কী হয়েছে বল এইবারে শুনি।

বমি তিনবার হয়েছে। জ্বর। তবে পেট ফাঁপে নি দেখলাম।

বিরক্ত হয়ে হীরক বলে, অত দূর থেকে কথা ছুঁড়লে তো হবে না। সামনে এসে ভাল করে বল।

রাধারাণী একটু চুপ করে থেকে বলে, কেন যাচ্ছি নে তুমি তো দেখেছ হীরক-দা। কাপড়ের উপর খোকা বমি করেছে, সে কাপড় কেচে দিয়েছি। যা পরে আছি, সামনে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু হীরকই উঠে ইতিমধ্যে দরজায় চলে এসেছে। হাত খানেকের ব্যবধান। বলে, হাঁ, বল এইবার সমস্ত।

রাধারাণী আবার আদ্যন্ত বলে গেল। কানে যাচ্ছে কি কিছু হীরকের? সার্চ-লাইটের মতন নজর ফেলছে কেবলই রাধারাণীর উপর। কথা শেষ হয়ে গেলে বলে, হুঁ পেট ফেঁপেছে, তার উপরে জ্বর। মুশকিল হল দেখছি।

রাধারাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, পথ দাও। আমি ঘরে আসছি।

হীরকের দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে সে দীপকের শয্যার উপর বসল। পাশের টুলখানা দেখিয়ে বলে, বস এখানে। ভাল হয়ে বসে জিজ্ঞাসাবাদ কর।

শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া পরনে। মনকে প্রবোধ দেওয়া—একটা-কিছু পরা আছে, একেবারে উলঙ্গ নয়। এক-পা এক-পা করে এসে হীরক টুলে বসে পড়ল।

অসুখের কথা কিছুই তুমি শুনলে না হীরক-দা। মন খারাপ বুঝি?

এবারে হীরক অনেকগুলো কথা বলে ফেলে: ভক্তি একেবারে ক্ষেপে গেছে। মানুষজন মানে না, কিছু না। কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ওর ধারণা, মজে গেছি আমি তোমার ভালবাসায়।

ফিকফিক করে হাসে হীরক। এ হাসি রাধারাণীর অনেক দেখা আছে। কিন্তু হীরকের মুখে ভাবতে পারা যায় না। গা ঘিনঘিন করে, হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে।

হেসে হেসে হীরক বলছে, বোকা তো আবার এদিকে! মেজাজ দেখিয়ে দুয়োরে খিল এঁটে দিল। দিল তো দিল—বয়ে গেছে আমার খোশামুদি করতে! বৈঠকখানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, যেমন মিথ্যে বদনাম দেয় তার আজ শোধ তুলব। আজকেই—

খপ করে রাধির হাত চেপে ধরে।

এ কী হীরক-দা ?

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো হীরক অসহ্য আবেগে ধুঁকছে। রাধারাণী কাতর হয়ে বলে, তোমার পায়ে পড়ি হীরক-দা। ছেলের আবার নতুন করে জ্বর হল। আমার মনের অবস্থা বুঝে দেখ একবার।

হীরক উড়িয়ে দেয়ঃ ওটা কিছু নয়। এ রোগের দস্তুর এই। যাবার মুখে একবার দু-বার ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। জ্বর দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।

আবার সেইরকম হাসি হাসছে। বলে, ডাক্তারের ভিজিট না দিলে অসুখ সারে কখনো ? ভিজিট শোধ কর, জ্বরও দেখবে নেই। লিখিত গ্যারান্টি দিতে রাজি আছি।

রাধিকে জোর করে আলিঙ্গনে বেঁধেছে। বলি-দেওয়া ছাগলের মতো অসহায় রাধি হাত-পা ছুঁড়ছে। হীরক খিঁচিয়ে ওঠেঃ ঢং ছাড় দিকি। বড্ড যে সতীপনা!

রাধি কেঁদে বলে, সতী আমি নই—দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে। কিন্তু আমি যে তোমায় সকলের থেকে আলাদা ভাবতাম হীরক-দা! অসতী বলে ঘেন্না কর, তাই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম এতদিন।

হীরক জড়িত কন্ঠে বলে, ঘেন্না—হুঁ, ঘেন্না বই কি! কোন্ ছুঁচো বলেছে ? ভক্তি ঝগড়া করে। বলে, ভালবাসায় আমি মজে গেছি। সত্যি সত্যি তাই।

রাধি বলে, সত্যি যদি হয়, মুখে আগুনে তোমার। নিজের চেয়ে বেশি কাউকে তো লোকে ভালবাসে না—আমিই ঘেন্না করি নিজেকে। নিজের এই দেহকে। এই মুখ এই ঠোঁট যত কামুকের থুতু মেখে মেখে নোংরা হয়ে গেছে। ধারালো ছুরি দিয়ে এক পর্দা যদি তুলে ফেলতে পারতাম, তবে শান্তি।

বলতে বলতে থেমে পড়ে হঠাৎ। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন দৃষ্টিতে দেখে হীরকের কান্ড। বলে, ছাড় হীরক-দা একটুখানি। এ চেহারা তোমার দেখতে পারছি নে।

পাগলের মতন ছুটে গিয়ে হেরিকেন নিভিয়ে দিল। অন্ধকার।

হীরকের কন্ঠ বড় মধুর এখন। পাখির কলকাকলি। বলে, ভেব না রাধি। তোমার ছেলের জন্য ভাবনা নেই। অসুখ সারানো শুধু নয়, ভাল ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করে একমাসের মধ্যে চেহারা কী করে দিই দেখো। আমি রোজ আসব।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে রাধারাণী বলে, যেও না হীরক-দা। খোকার কাছে একটু বস। আমি আসছি।

কোথায় যাও ?

দীঘির ঘাটে দুটো ডুব দিয়ে আসি।

জোরবাতাস দিয়েছে বাইরে, টিপটিপে বৃষ্টি। হীরক অবাক হয়ে বলে, কী সর্বনাশ! এই রাতে এখন দীঘিতে যাচ্ছ ?

রাতের রাক্ষুসি আমি যে, আমার কে কী করতে পারে ? ডুব দিয়ে অমনি ঠাকুরবাড়ির রোয়াকে মাথা ঠেকিয়ে আসব আমার খোকার নাম করে।

দীঘির ঘাটে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। মা গঙ্গা, পতিতপাবনী সনাতনী, গা জ্বালা করছে, জুড়িয়ে দাও। পাপের পুঁজরক্ত থিকথিক করছে সর্বদেহে, সাফসাফাই করে দাও॥

পরের রাতে হীরক আবার এসেছে। ডাক্তারি-ব্যাগের সঙ্গে কাপড় একখানা, বড় ঠোঙায় বেদনা-কমলালেবু। মিহি বুননের ভেলভেট-পাড় ধুতি। ধুতিখানা মেলে ধরল। বলে, সাইকেল নিয়ে নিজে গঞ্জে গিয়ে পছন্দ করলাম। তোমায় মানাবে ভাল। শাড়ি হলে আরও মানাত, কিন্তু বিধবার যে পরবার জো নেই।

রাধি সভয়ে বলে, চাঁপাফুল দেখে নি তো ?

দেখবে কি করে? বাপের বাড়ি চলে গেছে। চেঁচিয়ে কেঁদে এক-হাট মানুষ জড় করল যাবার মুখটায়। তোমাদের টুনিটাকেও নিয়ে গেল। টুনি তার মাকে একবার দেখে যাবে বলে এদিকে আসছিল—তা হাত ধরে হিড়হিড় করে গরুর-গাড়িতে তুলে দিল। যাকগে, আপদ গেছে। পর দিকি কাপড়টা, কেমন হয় দেখি।

রাধি ব্যাঙ্গের স্বরে বলে, আস্ত কাপড় কেন আনতে গেলে ? ছেঁড়া কাপড়েই তো মজা ছিল বেশ। ও, বুঝেছি হীরক-দা। কাপড় পরার পরে নয়—পরার সময়টা দেখতে চাও বুঝি তুমি ?

হীরক চোখ পাকিয়ে বলে : বড্ড যে কথার ধার। আমি নিজে আসি নি এ-বাড়ি। ভক্তি পাঠিয়েছিল তোমারই গরজে। আচ্ছা, চলে যাচ্ছি—

গরগর করতে করতে উঠে পড়ল। রাধারাণী ঝাঁপিয়ে পড়ে : যেও না। একটি কথাও বলব না আর হীরক-দা। তুমি রাগ করে গেলে খোকার চিকিচ্ছের কি হবে? সত্যিই তো, অনেক ভিজিট পাওনা আছে তোমার। কিসে শোধ হয়ে যায় বল। এতদিনের ভিজিট, তার উপরে ওষুধ আর লেবু-বেদানার দাম। কাপড়ের দামের কথা তুলব না, তা হলে আবার রেগে যাবে। কিন্তু কোনদিন কেউ আমায় ছাড়ে নি। এমনি কেউ কিছু দেয় নি। কাশীতে খোকার মাস্টার মাইনে শোধ করে নিয়েছে, বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়া আদায় করেছে। একটা ভাণ্ডার থেকেই সমস্ত।

আকুল কণ্ঠে বলে, তোমার পায়ে পড়ছি হীরক-দা, মুখ গোমড়া করে থেকো না। শোধবোধ করে নিয়ে ছেলের যাতে অসুখ সারে, তাই করে দাও।

হীরক আর নতুন কী করবে। দেহ একখানা শুকনো কাঠ—জীবন নেই, অনুভূতি নেই। পেতে দেয় সেই কাঠখানা—যার যেমন খুশি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নেচেকুঁদে যায় তার উপরে। মনের উপরেও এমনি পক্ষাঘাত এনে দাও ঠাকুর গোপাল। ভক্তিলতার মতো সরল উপকারী মেয়ের সর্বনাশ করে আর হীরকের মতো শিক্ষিত বলিষ্ঠ মানুষকে পশু বানিয়ে—তারপরেও রাধি যেন হি-হি করে হাসতে পারে।

দীপক সেইদিনই কেবল অন্নপথ্য করেছে। হঠাৎ এক কাণ্ড। রোগির তক্তপোশ মচমচ করে উঠল। জেগে পড়েছে দীপক, চোখ মেলে তাকিয়েছে। তাকিয়ে থাকা শুধু নয়, উঠে দাঁড়াল রোগা ছেলে। পা টলমল করছে। এখুনি বুঝি পড়ে যায়।

হীরক অক্টোপাস হয়ে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়ানো কী যায়! এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে রাধি ছুটে গিয়ে ছেলে ধরতে গেল। অমনি কে যেন সপাৎ করে চাবুকের বাড়ি মারে। দেহে নয়, দেহের উপর মারলে রাধির লাগে না। বুকের মধ্যে চাবুকের ঘা পড়ল : অশুচি তুমি। ঠাকুরবাড়ি যেমন ঢুকতে মানা, ছেলেও ছোঁয়া চলবে না তেমনি। ছেলের অকল্যাণ হবে।

দীপক আকুল হয়ে কাঁদছে : থাকব না আর এখানে। চলে যাব, এক্ষুণি যাব।

হীরক দোর খুলে চোরের মতন নিঃশব্দে কখন সরে পড়েছে। দীপকও শুয়েছে

আবার। দাঁড়ানোর বল নেই—কী ভাগ্যি, মুখ থুবড়ে পড়ে যায় নি।

কাশীর সেই মাস্টার মশায়ের কথাগুলো মনে পড়ছে—দীপককে যিনি পড়াতেন। মাইনে আদায়ের বেলা যা-ই হোন, শিক্ষক অতিশয় উপযুক্ত। ছাত্রের কিসে হিত হবে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর। বলতেন, শিশুর চরিত্রে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব খুব বেশি পড়ে। চোরের ছেলে চোরই হয় সাধারণত। এ জায়গা থেকে দীপককে কোন বোর্ডিং-এ রেখে দাও। মাঝে মাঝে টাকা পাঠিও।

প্রায়ই বলতেন। মায়ে ছেলেয় আলাদা হয়ে যাবে, রাধারাণী তা সইতে পারে না। একদিন সে জবাব দিল: আপনারও তখন তো কাজ থাকবে না মাস্টার মশায়। হপ্তায় হপ্তায় মাইনে আদায় হবে কেমন করে?

রাধারাণীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন মাস্টার মশায়। রাগ করে বলেন, ঠকাচ্ছ কিন্তু তুমি। হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার এটা—এমন নিম-খাওয়া মুখ করবার কথা তো নয়। তোমার কাছ থেকে এরকম মাইনে নিয়ে নিয়ে ঘেন্না ধরে গেছে। সরাও বা না সরাও, আমি আর দীপককে পড়াতে আসব না।

মায়ে-ছেলেয় কাশী ছেড়ে নতুন জায়গায় বেরিয়ে পড়বে, তখন থেকেই ঠিক করেছে। নিষ্কলঙ্ক নতুন পথ ধরবে। রাধি নিজের বাপ-মা'কে কোনদিন ভয় করে নি, কিন্তু ওই এক ফোঁটা ছেলেকে বাঘের মতো ডরায়। ছেলে নয়, এক কঠিন বিচারক। কোন রকম বেয়াদপি চলবে না তার সামনে। কিন্তু যে শঙ্কায় পালিয়ে এতদূরের কাপাসদা'য় চলে এসেছে, ঠিক সেই কাণ্ড ঘটে গেল আজকে। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। বিচারক রায় দিচ্ছে: পাপিনীর শাস্তি নিঃসঙ্গ নির্বাসন—ছেলে কোলে-পিঠে নিয়ে থাকার ইতি এবারে। অস্থির দীপক বালিশের উপরে মাথাটা ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করে। আর কাঁদে: আমি থাকব না মা, এখানে আমি থাকব না। চোখের জল গড়িয়ে তার বালিশ ভিজে গেল।

রাধারাণী সান্ত্বনা দিয়ে বলে, যাবি বই কি বাবা। এ কী একটা থাকবার জায়গা রে? সেরে ওঠে, গায়ে একটু বল হোক, আমি সঙ্গে করে দিয়ে আসব খুব ভাল এক জায়গায়।

চোখের জল মুছিয়ে দেবে, একটু আদর করবে ছেলেকে—কিন্তু উপায় তো নেই। ছোঁয়া যাবে না। ডুব দিয়ে আসবে রাধারাণী, কিন্তু এই রাত্রে ছেলে একলা ফেলে যায় কেমন করে? স্নান হবে না, সমস্তক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র মুখের সান্ত্বনা দেবে যতক্ষণ না দীপকের ঘুম এসে যায়।

দ্বিধা কাটিয়ে রাধারাণী মতলবটা মনে মনে পাকা করে ফেলল। না না, আমার কাছে আর নয় রে খোকা। বেশ তো বড় হয়ে গেছিস—এবারে ভাল একজনের কাছে গিয়ে থাকবি। আমার মামাতো বোন—মামার বড় মেয়ে আরতি। কলকাতায় মস্ত বাড়ি, মোটরগাড়ি, ছেলেমেয়ে, সুখশান্তি, মান-ঐশ্বর্য। আরতি নিয়ে গিয়ে মায়ের মতন দেখবে তোকে। ঠিক যেন নিজের মা। তিলডাঙায় চলে যাব সোমবারের দিনও নয়—আরও একটা দিন বাদ দিয়ে। মঙ্গলবারে গিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক করে আসব।

—বিশ—

তিলডাঙায় হারাণ মজুমদারের সর্বশেষ মেয়ে উৎপলার বিয়ে হয়ে গেল এই শনিবারে। ডাকযোগে একটা ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছিল রাধারাণীর নামে। শুধু

সেই চিঠির ছাপা দেখেই বোঝা যায়, জাঁকজমকের বিয়ে। বাড়ির শেষ কাজে আরতি এসেছে নিশ্চয়। শনিবারে বিয়ে, রবিবারে কনে-বিদায়। উৎসব-ক্লান্ত মানুষের বিশ্রামের জন্য সোমবারটাও বাদ দিয়েছে। দীপককে পরের দিন সকাল সকাল খাইয়ে তারা-দিদিকে কাছে বসিয়ে রেখে রাধি তিলডাঙায় চলল। একটা-দুটো কথা—কতক্ষণ আর লাগবে! সন্ধ্যার আগে ফিরবে। নিজে না গিয়ে তো উপায় নেই।

দেবদারু-পাতার ফটক করেছিল বিয়ে-বাড়ি, পাতা শুকিয়ে এসেছে। রাধি ভিতরে ঢুকল না। কী জানি, সন্ধ্যা হয়তো তেড়ে আসবে ঝাঁটা নিয়ে। ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

হারাণ মজুমদার বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন, ভূত দেখেছেন যেন।

কে রে—রাধি? কী খবর? নেমন্তন্ন-চিঠি পেয়েছিলি আমার?

রাধি বলে, চুকেবুকে গেছে কিনা, তাই কথাটা বলতে পারছ। সত্যি সত্যি এসে পড়তাম যদি?

এলে কী আর হত। যজ্ঞিবাড়ি শতেক জাত তো এসে পাত পেড়ে গেল।

তুমি কিন্তু বলেছিলে মামা, সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আবার এখানে আমায় নিয়ে আসবে।

সদুঃখে হারাণ বলেন, সবার হল আর কোথায়? নাতনি হয়েছে আবার যে দুটো। মোহিতের দুই মেয়ে।

হাসি আসে রাধারাণীর: সে তো বটেই। এই নাতনি দুটো পার হতে হতে আরও কি নাতনি হবে না? তোমার নাতনি সবগুলোকে পার করতে করতে মোহিত-দা'রও ওদিকে নাতনি হতে থাকবে। ভয় নেই, থাকতে আসি নি আমি মামা। আরতিকে একটিবার ডেকে দাও, তার সঙ্গে কথা আছে।

হারাণ ইতস্তত করেন: আজকে হবে না মা। বাড়ি-ভরা কুটুম্ব। আমার বড় জামাই—নন্দদুলাল বাবাজিও আছেন। এর মধ্যে কথাবার্তা কখন হয়। আর একদিন।

দৃঢ়কণ্ঠে রাধি বলে, এত পথ এসেছি, কথা আজ বলবই। জোরজবরদস্তি কিছু নয়। কথা বলেই চলে যাব। ডেকে দাও।

আরতি পান সাজছিল। রাধারাণী ডাকছে শুনে তারও মুখ পাংশু: যাব না। কাজকর্ম ফেলে কী করে এখন যাই? দরকারটা কী, ওখান থেকেই শুনে এলে না কেন বাবা?

আরতির স্বামী নন্দদুলাল সেখানে। সে বলে, ঘেন্না কর সে জানি। ওই চরিত্রের মেয়েমানুষ কোন্ গেরস্ত-বউ ঘেন্না না করবে? তবু বোন তো বটে। আশা করে এদ্দুর চলে এসেছে, মন নরম করে একবার দেখে আসা উচিত।

হেসে বলে, দরকার অবিশ্যি বোঝাই যাচ্ছে। অভাবে পড়েছে। ও লাইনের এই হল দস্তুর। যাদের সঙ্গে আনাগোনা, তারা সব শয়তান-ধড়িবাজ—অসুবিধা বুঝলে পিঠটান দেয়। সবে কলির সন্ধ্যে, এখনো হয়েছে কি! তবে বাড়ি বয়ে এসেছে, দিয়ে দাও গোটা কয়েক টাকা—

সুপুষ্ট মণিব্যাগটা বের করে নিয়ে নন্দদুলাল নিজেই চলল। যখন যাচ্ছে—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরিয়ে পড়ে—আরতিরও যেতে হয় পিছু পিছু।

রাধারাণী সজল চোখে বলে, টাকা নয়। ছেলেটাকে আর বাঁচাতে পারছি নে।

সেই ভার নিয়ে নিক আরতি।

প্রস্তাব শুনে নন্দদুলাল এক-পা পিছিয়ে যায়ঃ একটা আস্ত ছেলের ষোল আনা ভার নেওয়া—যে-সে ব্যাপার নাকি? আর, তোমার কুলোজ্জ্বলকারী ছেলে তো—পেট থেকে পড়লেই ওসব বাচ্চার গালে নুন পুরে মেরে ফেলে। মায়া করে বাঁচিয়েছ তো অন্য লোকে নিতে যাবে কেন?

আরতির দিকে চেয়ে সাক্ষি মানেঃ অ্যাঁ—কি বল?

আরতি কিন্তু করুণা-বিগলিত। বলে, অমনি একটা দশ-বার বছরের ছেলে বাড়ি থাকলে বড্ড সুবিধা হয়। দোকানে ছুটে গিয়ে এটা-ওটা এনে দিল, ভদ্দরলোকে এলে বৈঠকখানা খুলে বসতে দিল, চাইকি মেজ খুকীর টিফিনের সময় খাবারের কৌটো দিয়ে এল ইস্কুলে।

স্ত্রীর কথার উপরে কথা নেই। নন্দদুলালের মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যায়ঃ তবে নিয়ে চল। ভালই হবে। এই রকম একটা ছেলেরই দরকার বটে।

রাধারাণীর কথা আছে তবুও। বলে, খাটিয়ে নিলেই হবে না কেবল। ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, মানুষ হবে দীপক—

ভ্রুভঙ্গি করে নন্দদুলালঃ ও, ইস্কুলে পড়ে বুঝি বিদ্যেসাগর হবে? এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে গিয়ে উঠবে, আব্বা দেখে বাঁচি নে।

কিন্তু আরতির করুণার শেষ নেই। তাড়া দিয়ে উঠল নন্দদুলালের উপরঃ ওসব কী জন্যে বলছ? না হয় করপোরেশনের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। ফ্রী পড়বে, এক পয়সা তোমার খরচা হবে না।

নন্দদুলাল তাড়াতাড়ি বলে, খরচার জন্য কে বলছে? যতই হোক, সম্পর্কে বোন-পো হল তোমার। ছেলের যদি মাথা থাকে, পড়াশুনো ভাল ভাবে করে, আলবৎ পড়াব। যদ্দুর পড়তে চায় পড়াব।

আরতি বলে, ইস্কুলেই পড়বে দীপক, ঘরের ছেলের মতো থাকবে। আমাদের কলকাতা ফিরতে আরো ছ-সাত দিন। যাবার আগে লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসব। তদ্দিনে ছেলেও তোমার আর খানিকটা সুস্থ হোক।

অন্য লোক নয়, হারাণ মজুমদার নিজে দীপককে নিতে এসেছেন। চাপা গলায় বলেন, বুঝিস তো, বাইরের লোক এর মধ্যে ঢুকতে দেওয়া যায় না। তুই আমি আর আরতি—এই যা তিন প্রাণীর মধ্যে রইল।

রাধি ছেলে সাজাচ্ছে। অবস্থা যেমনই হোক, দীপকের জুতো-জামা-হাফপ্যান্টে কৃপণতা নেই। ধোপা বন্ধ তো বয়ে গেল। ক্ষারে কেচে ধবধবে করে এই ক'দিন বিছানার নিচে রেখে দিয়েছিল। ধোপার ইস্তিরিতে এর চেয়ে বেশি আর কী হত।

দীপকের রং একটু ময়লা বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। টানা-টানা চোখ দুটি, থোপা-থোপা চুল। পোশাক পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়ে রাধারাণী কয়েক পা পিছিয়ে দু-চোখ ভরে দেখে। চোখ আর ফেরানো যায় না। রাজপুত্র। নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র চলে যাচ্ছে, বনবাসে নয়—শহর কলকাতায়। কত আরামের জায়গা—পিচের রাস্তা, কলের জল, বিদ্যুতের আলো। সকলের চেয়ে বড় আরাম—মানুষের সমুদ্র সেখানে। কেউ কারো পিছনের খোঁজ রাখে না। আরতির ছেলে হয়ে গেল দীপক—খ্যাতির-সম্মান কত!

মনে মনে বলে, তোর সকল লজ্জা এবারে ঘুচে গেল রে খোকন। একটা খারাপ মেয়েমানুষের ঘরে দশ বছর বড় হয়েছিস, কোন দিন কেউ টের পাবে না সাধ্বীসতী আরতির ছেলে এবার থেকে তুই।

ভাবছে এই সব। আর মুখেও তাই বলে, ভারি শহর কলকাতা—বড় সুখের জায়গা। মুখ আঁধার করিস কেন খোকন? তোর নতুন-মা বড় ভাল, এক কথায় কেমন নিয়ে নিল। আমার কথা মনেও পড়বে না।

সেই যে মাস্টার মশায় সৎ পারিপার্শ্বিকের কথা বলতেন—ঠিক তাই একেবারে। আরতির মতো ভাগ্যধরী হয় না। ঘর-গৃহস্থালী, ছেলেমেয়ে, অনুগত স্বামী—দুর্গা-প্রতিমায় ঠিক যেমনটি দেখতে পাই। কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, পায়ের নিচে ভোলা-মহেশ্বর অবধি—হি-হি-হি—

দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে দীপক উচ্চকিত ওই হাসির শব্দে থমকে দাঁড়াল।

কী হল রে—অ্যাঁ? দাঁড়ালি কেন খোকন?

হারাণের দিকে চেয়ে রাধি তাড়া দিচ্ছে: চলে যাও মামা। বেলা হয়ে যায়, দেরি করছ কেন? স্টেশন কম পথ নয়, রোদে কষ্ট হবে। যাও, চলে যাও তোমরা।

তখন হারাণের আর একটা কথা মনে পড়ে যায়। ঘরের মধ্যে রাধিকে ডেকে নিয়ে বলেন, এই টাকাটা আরতি পাঠিয়ে দিয়েছে। বিস্তর করেছিস তুই, সে ঋণের শোধ হয় না—

টাকা রাধির হাতে দেন নি, তক্তাপোশের উপর রাখলেন। হাতের ঠেলায় সেগুলো মেজের উপর ছড়িয়ে রাধারাণী কেটে কেটে বলে, গরু-পোষানি দেয় মামা, আরতি ভেবেছে তেমনি ছেলে পোষানি। ভাগ্যবতী তোমার মেয়ে—ভাল ঘর বর হয়েছে, টাকাকড়ি হয়েছে। কিন্তু টাকার আমার গরজ নেই, কুড়িয়ে নিয়ে যাও।

ছেলে আবার আরতির কাছে চলে যাচ্ছে, হারাণ প্রসন্ন নন এই ব্যাপারে। দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে বলেন, না, টাকার অভাব কি তোর? ছেলেটা সরিয়ে দিয়ে আরও ঝাড়া হাত-পা হলি। টাকা তো বাতাসে উড়ে উড়ে আসবে।

দীপক নেই, কেউ নেই। দুনিয়ার সবাই ভাল রইল, আরতি ভাল—রাধিই কেবল ভাল থাকতে পারল না। বড়ঘরে সে একা। আর রান্নাঘরে তারা-পাগলি জেগে বসে কখনো বিড়বিড় করে আপন মনে, কখনো বা হাঁকাহাঁকি করে ঠাকুর গোপালের উদ্দেশে। যে ঠাকুর একটা দিনের ভিতর তার পুরো সংসার নিয়ে নিলেন—কৈলাস সতীশ আর সোনামণি ধড়ফড় করে মরল, একসঙ্গে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে গেল। কিন্তু তা বলে মানুষের কী অভাব রাধি সুন্দরীর? দগদগে ঘা দেখলে মাছি আপনি এসে ভনভন করে, তাড়িয়ে পারা যায় না।

কিন্তু ওই যে পাগলি তারা—দরদ যা-কিছু ওই একটা মানুষের। আবোল-তাবোল কথাবার্তার মাঝে সেটা বোঝা যায়। যত রাত হয়, তারার পাগলামি বাড়ে। ইদানীং আবার একটা ডাল ভেঙে রাখে হাতের কাছে। গোপালের সঙ্গে শুধুমাত্র মুখের কোন্দল করে জুত হয় না। বেড়ার উপর সপ-সপ করে ডালের বাড়ি মারে। তারই মধ্যে এক একবার চেঁচিয়ে উঠছে: ওই মরল রে রাধিটা নোংরা মাড়িয়ে—

শীতটা বড় পড়েছে এবার। শীতের মধ্যে তুরতুর করে গিয়ে রাধি দীঘির জলে ডুব দেয়। তারার কান বড় তীক্ষ্ম—জলের শব্দ শোনে আর চেঁচায়। ডুব দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে রাধি ফিরে আসে—গায়ের জ্বলুনি গেল, অশুচি বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হল।

কিন্তু কতক্ষণ ! আবার যেতে হয় দীঘির ঘাটে। আবার ডুব। শীতের দীর্ঘ রাতের মধ্যে পাঁচবার সাতবার ডুব দিয়ে আসে এক একদিন। আর তারা চেঁচামেচি করেঃ মরবি রে পোড়াকপালি। মরবি, মরবি। বড্ড নোংরা ঘাটছিস। ডুব দিতে দিতেই মারা পড়বি।

তারপরে একদিন দেখা যায়, রাধারাণী নেই। গ্রাম ছেড়েছে। কাপাসদা'র অভিশাপ বিদায় নিয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গেল, এমন পশার-প্রতিপত্তি ছেড়ে হীরক ডাক্তারও উধাও। তুমুল রসাল আলোচনা। সেই সঙ্গে গালিগালাজ রাধির নামেঃ ডাকিনী মাগি দেবতার মতন মানুষটা গুণ করে নিয়ে চলে গেল। এমন একজন পাশ-করা ডাক্তার চলে যাওয়ায় গাঁয়ের ইতরভদ্র মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে।

মাস কয়েক পরে হীরক ডাক্তারের খবর হল। না, রটনা বোধহয় মিথ্যা। কলকাতায় চাকরি নিয়েছে হীরক, বউ ছেলেপুলে নিয়ে সুখেই আছে। কিন্তু রাধারণীর কথা কেউ বলতে পারে না।

—একুশ—

কতকাল পরে সেই রাধারাণী বাড়ি এসেছে। হাটুরে মানুষরা প্রথম তাকে দেখে। সে রাধি নেই, পাপের দাগ সর্ব অঙ্গে। মা মনোরমা মায়া করে এসিড ঢালেন নি, বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর হাতে তাই বুঝি ঢেলেছেন।

তারা-পাগলি মারা গেছে অনেকদিন। রান্নাঘরটা গেছে। বড়ঘরের দেয়াল ভাঙা চালে খড়কুটো নেই, মাটির মেজেয় গোছা গোছা উলুঘাস জন্মেছে। পাকা শালের খুঁটি বলেই চাল ক'খানা রয়েছে খুঁটির উপরে। কখন পেঁছিল রাধি, কার সঙ্গে এল— কোন পুরানো প্রেমিক খুব সম্ভব দয়া করে রেখে গেছে। রাধি হয়তো ভেবেছিল— ঘর আছে, তারা-দিদি আছে, ধানজমি ও বাগবাগিচা আছে। গিয়ে পড়লেই নিশ্চিন্ত। বেগতিক দেখে সঙ্গের সাথী তাকে লিচুতলায় ফেলে চলে গেল। তা বড়ঘরের উলুবনের চেয়ে ছায়াময় লিচুতলাটা অনেক বেশি সাফসাফাই।

রাত্রিবেলা সেইখানে থেকে চেঁচাচ্ছেঃ এই, এইও—মেরে ফেলব। এই, এইও—

খ্যা-খ্যা আওয়াজ তুলে শিয়ালে শিয়ালে ঝগড়া। গঞ্জের হাট করে গঙ্গেশরা পাঁচ সাতজন বাড়ি ফিরছে। হাতে লণ্ঠন, কাঁধের ধামায় হাটবেসাতি, গল্প করতে করতে যাচ্ছে।

মানুষের সাড়া পেয়ে শিয়াল পালিয়ে যায়। আলো দেখে রাধারাণী আর্তনাদ করেঃ ওগো, কারা তোমরা—দেখে যাও। নড়বার ক্ষমতা নেই—শিয়ালে ধরে টানছে।

ঠাহর করে দেখে গঙ্গেশ বলে, দেখতে পাচ্ছ ? স্বর্গ-নরক সবই এইখানে—এই পিরথিমের উপর। পাপের শাস্তি হাতে হাতে। জ্যান্ত মানুষ. খুবলে খুবলে শিয়ালে খায়।

হাল আমলের নাস্তিকও কিছু কিছু আছে, তারা পাপের শাস্তি ও পুণ্যের জয় দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরতে পারে না। তেমনি ক'জনে কাঁধের ধামা নামিয়ে রেখে ভিটার উলুঘাস কতকটা উপড়ে রাধিকে চালের নিচে তুলে দিল। পাটকাঠির আঁটি বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিল, জ্বলবে অনেকক্ষণ। আগুন যতক্ষণ আছে, শিয়াল এগুবে না। একগাদা মাটির ঢিল এনে রাখল হাতের কাছে। আর কোথাকার এক বাতিল ভাঁড় সংগ্রহ করে দীঘি থেকে ভরে এনে দিল। বলে, নড়তে না পার, হাতে আর মুখে তো জোর আছে তোমার। চেঁচাবে আর ঢিল ছুঁড়বে, শিয়ালে কায়দা করতে পারবে

না। তেষ্টা পেলে ভাঁড়ের জলে কাপড় ভিজিয়ে মুখের মধ্যে দিও।

অনেক করল তারা। ব্যবস্থা করে দিয়ে যে যার ঘরবাড়িতে গেল। সারা রাত ধরে রাধারাণী চেঁচায়, ঢিল ছোঁড়ে। ক্ষণে ক্ষণে চেতনা স্তিমিত হয়ে যায় কেমন। যেন সে ছোট মেয়ে হয়ে গেছে আবার, গ্রামময় উলু দিয়ে দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। চন্ডীমন্ডপ-জোড়া দুর্গা-প্রতিমা। ঠাকরুনের ডাইনে বাঁয়ে কার্তিক-গণেশ লক্ষ্মী-সরস্বতী……

বাতাসে নিবন্ত পাটকাঠির আগুন দপ করে এক-একবার জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় শিয়াল দেখতে পায়। খানিক-খানিক জমাট-বাঁধা অন্ধকার যেন। লুব্ধ হয়ে আছে তারা, গুটিগুটি এগুচ্ছে। সুযোগ পেলেই এসে ধরবে। তার সেই রূপময় যৌবনে নাগরেরা যেমন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত দেহের উপর। আতঙ্কে গলার সকল জোর দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: এইও, এইও। ঢিল ছোঁড়ে এদিক সেদিক।

সকাল হল। লিচুর ডালে কাক এসে বসছে। শকুন উড়ছে মাথার উপর। সবাই কেমন টের পেয়ে যায়। তার সোনার যৌবনে যখনই যে জায়গায় গিয়েছে, লম্পট পুরুষগুলো পিছনের কথা আপনা-আপনি যেমন টের পেয়ে যেত। শকুনের দল নেমে এসে অদূরে রান্নাঘরের ভিটায় বসে গেল সারি সারি। ঘাড় বাঁকিয়ে শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। প্রবীণ পন্ডীতরা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ওই যেন পুঁথিপত্রের বিধান দিতে বসে গেছেন।

প্রহরখানেক বেলায় রাধি বাড়ির ভিটার উপরে চোখ বুজল।
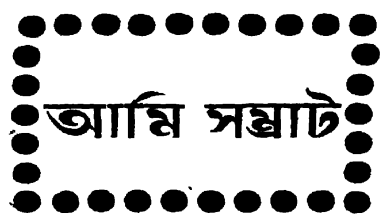
পুণ্যকীর্তি প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের স্মরণে

সেকালের নবীন লেখক আমাদের যিনি অগ্রজস্বরূপ ছিলেন

॥ এক ॥

ঝোপঝাড়ের মধ্যে তালপাতার কুঁড়েঘর। বেরিয়ে আসে—জঙ্গলে পথে ময়ূর পেখম ধরে বেরুল যেন। অপরূপ।

শুধু রূপে নয়, লেখাপড়াতেও। রিফিউজি ছেলেদের জন্য দয়াময় সরকার বাহাদুর ইস্কুল বানিয়ে দিয়েছেন, বিল্ডিংখানা দেখে চক্ষু ঠিকরে যাবে। বিল্ডিংয়েই বাজেট শেষ—তা হলেও মাস্টার বাদ দিয়ে ইস্কুল চালানো ভাল দেখায় না, কয়েকটি তাই রাখতে হয়েছে। ঠিক মতো মাইনে মেলে না বলে তাঁরাও শোধ তুলে নিচ্ছেন। ক্লাসের চেয়ারে বসা মাত্রেই নাসা-গর্জন।

অরুণেন্দু এতৎসত্ত্বেও শুধু সাদামাটা পাশ নয়—মার্কশিট দেখে হেডমাস্টার বলছেন, স্কলারশিপও নির্ঘাৎ একটা পেয়ে যাবে। আহলাদে ডগমগ হয়ে মা অমনি বললেন, চাকরি নিয়ে নে এইবারে। যেমন-তেমন চাকরি দুধ-ভাত।

যশোদা সেই সাবেক কালের মধ্যে আছেন। পাশ একটা যখন দিয়েছে, শতেক চাকরি পদপ্রান্তে লুটোপুটি খাচ্ছে—বেছে নেবার অপেক্ষা। এবং নেবার সঙ্গে-সঙ্গে ভাতের একটা পাহাড় ও দুধের এক সমুদ্র ডাইনে-বাঁয়ে এসে পড়ল—খাও ফেলাও ছড়াও যেমন খুশি।

পূর্ণেন্দু অরুণেন্দু দুই ভাই আর মা যশোদা—তিনজন নিয়ে সংসার। বড়ছেলে পূর্ণকে নিয়ে মায়ের ভয় ঘোচে না। বলেন, তাড়াতাড়ি চাকরি নিয়ে নে অরু, পুন্নকে ঘরে এনে বসাই। বেরিয়ে যায় সে, আমি ঘুরি-ফিরি আর ঠাকুরের পটের কাছে মাথা কুটি: ঘরের ছেলে সুভালাভালি ঘরে এনে দাও ঠাকুর। 'দোর খোল মা—' উঠোনে এসে ডাক দেয়, ধড়ে প্রাণ আসে আমার তখন।

এঁদের বউ আমলে যেমনধারা ছিল, মা-জননী ভাবেন এখনো তেমনিটি বুঝি। অরুণদের বাড়ি কোন পুরুষে কেউ চাকরি করে নি। সে পরিমাণ বিদ্যা ছিল না। কষ্ট করে বিদ্যার্জনের প্রয়োজনও মনে করে নি কেউ। তরিতরকারি গোয়ালের গরুর দুধ বিলবাঁওড়ের মাছ—কোন রকম অভাব ছিল না। কাপড়-জুতো এবং এটা-ওটার জন্য যৎকিঞ্চিৎ পয়সাকড়ির গরজ—ধানপাট বেচে সঙ্কুলান হয়ে যেত। ক্রমশ গাঁয়ের দুটি-চারটি ছেলে পাশ করে শহরের চাকরি নিতে লাগল। অবরে-সবরে তারা বাড়ি আসে—নতুন কেতার পোশাক-পরিচ্ছদ, বাঁকা ঢঙের কথাবার্তা, গায়ে ভুরভুরে গন্ধ—চলে যাবার পরেও কতক্ষণ ধরে বাতাসে গন্ধ উড়ে বেড়ায়। যে ক'টা দিন গাঁয়ে থাকে, রমারম খরচা করে চাকরে ছেলেগুলো। দরদাম করে না—জেলে ভেটকি মাছ বেচতে এসেছে, আট আনা চাইল তো ঠক করে আস্ত আধুলিখানা ছুঁড়ে দিয়ে মাহিন্দারকে মাছ তুলে নিতে বলে। রাজরাজড়ার কাণ্ডবাণ্ড—যশোদার স্মৃতিতে সব রয়ে গেছে। পাশ করেছে তো, অরুও চাকরি নিয়ে সর্বদুঃখের অবসান ঘটাক।

বললেন, চাকরি হলেই সর্বনেশে কাজ ছাড়িয়ে পুন্নকে তুই বাড়ি এনে বসাবি। বিনি কাজে বসে থাকবার মানুষ সে নয়—রাস্তার ধারে চালা তুলে বরঞ্চ একটা তেল-নুনের দোকান করে দিস।

আজ অরুণ একলা খেতে রাজি নয়। দাদা ফিরুক, সুখবর দিই আগে তাকে—পাশাপাশি দু-ভাই তখন বসা যাবে।

রাত ঝিমঝিম করছে। অন্ধকার ঘরে মা আর ছেলে—বিনি কাজে এরা কেরোসিন পোড়ায় না। আনন্দ উথলে উঠেছে, আসন্ন সুদিনের নানান গল্প হচ্ছে মৃদু কন্ঠে।

অবশেষে পায়ের শব্দ উঠানে। পূর্ণেন্দু বলে, এসেছি মা—আলো জ্বালো।

একছুটে উঠানে গিয়ে অরুণ দাদার পায়ে গড় করল: পাশ হয়েছি দাদা।

মার্কশিট হাতে দিল তার। মার্কশিট না দেখে পূর্ণ হাঁ করে ভাইয়ের মুখে তাকিয়ে থাকে।

অরুণ বলে, স্কলারশিপও পেয়ে যেতে পারি, হেডমাস্টার মশায় বললেন।

হাসছে না কাঁদছে—পূর্ণেন্দু ঠিক একেবারে পাগলের মতন করতে লাগল। ফতুয়ার বোতাম টপটপ করে খুলে ভাইয়ের হাতখানা টেনে বুকের উপর রাখল।

তোলপাড় লেগে গেছে এখানে—ঠাহর পাচ্ছিস? এত সুখ জীবনে পাই নি রে—আমাদের বংশে কেউ কখনো পাশ করে নি। তুই প্রথম।

অরুণ হতভম্ব হয়ে আছে।

কিছু শান্ত হয়ে পূর্ণেন্দু বলে, আমায় বিদ্বান করবার জন্য বাবা তা-হদ্দ চেষ্টা করেছিলেন। হল না, কপালে না থাকলে হয় না। গাছ-গরু হয়ে আছি। বাবার সাধ তুই পূরণ করবি, উপর থেকে তিনি দেখবেন। বংশের মুখোজ্জ্বল করবি তুই।

যশোদা রান্নাঘরে ভাত বাড়তে গিয়েছিলেন, খাবার জল গড়াতে এ-ঘরে এলেন। গভীর কণ্ঠে পূর্ণ বলল, চিরদুঃখিনী মা আমাদের—সারা জন্ম দুঃখধান্দা করেছেন। এগারো বছর বয়েসে, শুনি বউ হয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে এক-হাতে সংসার ঠেলে চলেছেন। মানুষ হয়ে মায়ের সুখশান্তি সকলের আগে দেখবি তুই।

খেটেখুটে পূর্ণেন্দু অত রাত্রে কাল বাড়ি ফিরেছে, বেলা অবধি ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবে—উপায় আছে তার! ঘোর থাকতে উঠে কেউ না জাগতে সে বেরিয়ে চলে গেছে। গেছে নিকারিপাড়ায়। পূববাংলা ছেড়ে এসে এই নিকারিরাও এক পাড়া জমিয়ে বসেছে। ভেড়ির মাছ পাইকারি কিনে হাটে হাটে বেচে বেড়ায়। অত ভোরে যাওয়ার মানে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে সব চেয়ে সরেস গলদাচিংড়ি কেনা। দেরি হলে নিকারিরা বেরিয়ে পড়বে, ভাল জিনিস মিলবে না।

অরুণেন্দু রাগারাগি করে: নিয়েছে কত, জিজ্ঞাসা করি। দর বলবে না সে জানি। কষ্টের টাকা কেন এমন ছিনিমিনি করবে। আমি যেন পর—বাড়ির মানুষ আর নই, কুটুম্ব হয়ে গেছি।

পূর্ণেন্দু তাড়া দিয়ে ওঠে: ছোট আসিছ, ছোটর মতন থাক। বড়ভাইয়ের উপর বচন ঝাড়বিনে।

বেশ, থাকলাম তাই। একটি কথা বলছিনে। খাওয়া তো আমার এক্তিয়ারে—তখন দেখা যাবে। ঐ চিংড়ি তোমায় খেতে হবে। পাতে বসলে ধরে পেড়ে খাইয়ে দেবো, তখন বুঝবে।

যশোদাও দেখা গেল ছোটছেলের দিকে। বললেন, সত্যি, ও-মাছের কি দরকার ছিল। বড় কলেজে পড়ানোর আম্বা—তাতে তো বিস্তর খরচ। কষ্টের রোজগার নয়-ছয় করলে চালাবি কেমন করে তুই?

পূর্ণেন্দু বলে, নিত্যিদিন তো নয়—শখ হল আমার, এই একটা দিন। চিংড়ির নামে অরু পাগল, ভুলে গিয়েছে?

পুরানো কথা মনে এসে হাসিতে মুখ ভরে গেল। কী-একটা ব্যাপারে বড্ড খুশি হয়ে পূর্ণ বলেছিল, তুই যা চাবি অরু, তাই দেবো। পাঁচ-ছ বছরের তখন অরু। জামা-জুতো নয়, ব্যাট-বলও নয়, অরু চেয়ে বসল চিংড়িমাছ।

হাসতে হাসতে পূর্ণেন্দু বলে, বড় হয়েছে এখন—অবস্থা বুঝে খাওয়ার কথা আর

বলে না। কিন্তু আমি ভুলি নি। তুমি বকাঝকা কোরো না মা, ঘুণাক্ষরে ওর কানে না পৌঁছয়। একে রামানন্দ তায় ধুনোর গন্ধ—তোমায় দলে পেলে ভাই একেবারে পেয়ে বসবে।

গরিবের ঘোড়া-রোগ। পূর্ণেন্দুর মাথায় চেপেছে ভাইকে প্রেসিডেন্সিতে পড়াবে।

অবাক হয়ে অরু বলে, মাইনে কত টাকা, জানো? গোবরডাঙা কলেজ বেশ ভালো। কাছাকাছি হবে। প্রিন্সিপালের সঙ্গে একদিন কথাবার্তাও বলে এসেছি।

পূর্ণেন্দু জুড়ে দিল ঃ প্রেসিডেন্সিতে পড়বি আর হিন্দু হস্টেলে থাকবি তুই।

ঠিক তুমি গুপ্তধন পেয়েছ দাদা, আমাদের কিছু বলো নি।

ভাইয়ের কথা কানে না নিয়ে পূর্ণেন্দু বলে যাচ্ছে, হরিহর স্যারের ছেলে ভুপেনও হিন্দু হস্টেলে থেকে পড়ে। দু-জনে এক ঘরে না হোক এক বাড়িতে বেশ থাকতে পারবি। হরিহরবাবুর কাছ থেকে জেনেশুনে এলাম। খরচপত্র ভাবতে গেলে হবে না। প্রেসিডেন্সিতে আর অন্য কলেজে আকাশ-পাতাল তফাত—প্রেসিডেন্সির আলাদা ইজ্জত।

অরুণ বলে, কিন্তু তোমাদের? নুন আর আলুভাতে-ভাতের উপরে আছ—ভাই পড়াতে গিয়ে তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। শহরের উপর নবাবি করব আর আমার মা-ভাই উপোস করে মরবে, সে আমি কিছুতে পারব না। অন্য কলেজেও পাশ করে থাকে দাদা।

পাশ করলেই তো হল না—

অরু বলে, ভাল রেজাল্টও করে থাকে।

পূর্ণেন্দু বলে, তা ছাড়াও আছে। প্রেসিডেন্সিতে বড় বড় লোকের ছেলেরা পড়ে। বাবার জোরে মামার জোরে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা লাটবেলাট হয়ে যাবে। ক্লাসফ্রেন্ড সম্পর্ক ধরে চাকরি-বাকরির জন্যে তাদের কাছে পড়বি গিয়ে তখন। অনেক ভেবে দেখেছি রে। হরিহরবাবুও তাই বললেন ঃ খরচা বেশি হলেও আখেরে ভাল, ঢোকাতে পারেন তো দৃকপাত করবেন না। ভুপেনের বাবদে যা পড়ে, তারও মোটামুটি একটা হিসাব নিয়েছি।

পারবে তুমি?

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে পূর্ণেন্দু বলল, আমার যে কাজ—আজকে হয়তো ঠ্যাঙানি খেলাম, কাল আবার রাজা হয়ে ফিরলাম। কিচ্ছু ভাবিস নে তুই। কাঙালের ঠাকুর আছেন—যে খায় চিনি, জোগান তাকে চিন্তামণি।

খপ করে অরুণেন্দুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল সে ঃ ব্যাগগেতা করছি ভাইডি, ইচ্ছে আমার বানচাল করে দিস নে। প্রেসিডেন্সি থেকে বি-এ পাশ কর, তার পর আর বলতে যাবো না। যা খুশি করিস।

॥ দুই ॥

অতএব অরুণেন্দু প্রেসিডেন্সিতে পড়ে, হস্টেলে থাকে। ক'মাসের মধ্যেই হিন্দু-হস্টেল ছেড়ে সস্তা মেস একটা দেখে নিল। হুকুম একেবারে কমা-সেমিকোলন অবধি মানতে হবে, এমন লক্ষণ ভাই এ যুগে হবে না—পূর্ণেন্দু তাতে রাগই করুক আর যা-ই করুক।

মেসে থাকে, আর সকাল-সন্ধ্যার জন্য ট্যুইশানি খুঁজে বেড়ায়। বন্ধুবান্ধব সকলকে ট্যুইশানি জুটিয়ে দিতে বলে। না-জানি কোন রাজা-উজিরের বেটা—চেহারায় তাই মালুম হয়। চেহারার গুণে বিস্তর ছেলে এবং কতকগুলো মেয়েও ঘেঁসে এসেছিল।

সেই ব্যক্তি জনে জনের কাছে ট্যুইশানির দায় জানাচ্ছে, শুনে সব তাজ্জব হয়ে কেটে পড়ছে। ভরসা কেউ দেয় না: এম-এ পাশ বি-টি পাশ মাস্টারমশায়রা ক্লাসে ক্লাসে টোপ ফেলেও গাঁথতে পারেন না—আর এই রকম নধর তরুণ ছেলে, গ্রাজুয়েটও নও এখন অবধি, তোমায় কে ছেলে-মেয়ে পড়াতে দিচ্ছে!

পাচ্ছেও তো কেউ কেউ—

কী জানি কেমন করে পায়। জানা নেই। তা দেখ তুমি—

শনিবারে অরুণেন্দু বাড়ি যায়। আগে ফি শনিবারে যেতো। থার্ড ইয়ারে পড়াশুনোর বেশি চাপ বলে ইদানীং সব শনিবারে ঘটে ওঠে না! বনগাঁ স্টেশনে নেমে মাইল-চারেক পায়ে হাঁটা। কসাড় জঙ্গল ছিল আগে, বুনোশুয়োর ঘোঁত-ঘোঁত করে ঘুরত। দেশ ভাগ হবার পর নিঃসম্বল রিফিউজিরা জঙ্গলের খানিক খানিক কেটে খড়ের বা পাতার ছাপড়া তুলেছে। দুই ছেলে নিয়ে যশোদাও অমনি একটা তুলে নিয়েছিলেন। ছেলেরা তারপর বড় হয়ে উঠল, যশোদাও বুড়ি হয়ে পড়েছেন। খরচার টাকা-পূর্ণেন্দু একসঙ্গে দিতে পারে না—অরুণ বাড়ি এলে যেদিন যতটা পারে দিয়ে দেয়। প্রাণ হাতে করে রোজগার—এক একটা টাকার সঙ্গে দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা আর লাঞ্ছনা জড়ানো। দাদার টাকা মুঠোয় নিয়ে অরুণের হাত জ্বালা করে, চোখে জল এসে যায়।

ঘরে ঘরে টিউটর রাখে, একের অধিক কোন কোন ক্ষেত্রে। শহর কলকাতার রেওয়াজ। ঝি-চাকর রাখতে পারে না যে গৃহস্থ, সে-ও টিউটর একটি রাখবে। ছেলে-মেয়ের পাশ হওয়ার বাবদে চাই-ই ওটা। ট্যুইশানির জন্যে অরুণেন্দু জোর খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে। বন্ধুবান্ধবেরা একেবারে মিথ্যে বলে নি, দিনকে-দিন মালুম হচ্ছে। ইস্কুলমাস্টারের দিকেই সকলের ঝোঁক। অহরহ শেখানো পড়ানো নিয়েই থাকেন, ঐ কর্মে সাতিশয় দক্ষ, সন্দেহ নেই। তার জন্যেও নয় কিন্তু। তাঁদের কাছে পড়লে তরতর করে এগিয়ে ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসতে পারবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র বাধা পাবে না। ট্যুইশানির পাইকারি ব্যবস্থাও আছে, যার নাম কোচিং ক্লাস। গৃহস্থ-পোষা আয়োজন, কম খরচায় কাজ সমাধা—একলা একখানা ট্যাক্সি না নিয়ে সকলে মিলে বাসে চললাম, এই আর কি!

এঁদের সকলের উদরপূর্তির পর বাইরে কিছু কিছু না ছিটকে পড়ে, এমন নয়। তবে বিস্তর মুখ হাঁ হয়ে আছে। অরুণেন্দু কতজনকে বলল—সামান্য-চেনা মানুষকেও দুম করে বলে বসে, সে মানুষ অবাক হয়ে যায়।

সবাই এড়িয়ে যায়, কেউ কিছু করল না। কায়দা মতন পেলে আপনজনকেই তো জুটিয়ে দেবে। যত সামান্যই হোক, ফোকটের রোজগার কে ছেড়ে দেয়। লক্ষপতির পুত্রও বাপের অজান্তে ট্যুইশানি করে কলেজ পালিয়ে সিনেমা ইত্যাদির দায়ে। অরুণেন্দু জানে তেমনি ক'জনকে।

কেউ কিছু না করল তো নিজেই হন্দমুন্দ দেখবে। মতলব ঠিক করে সন্ধ্যার পর একদিন সে বেরিয়ে পড়ল। হিন্দু হস্টেল ছেড়ে বাজে মেসে উঠেছে, বাড়তি কিছু আয় করে দাদার দায় হালকা করবে সেই প্রত্যাশায়। গলি ধরে চলেছে, এক একটা বাড়ি ঢুকে পড়ছে—

আপনি নাকি মাস্টার খুঁজছেন?

গৃহকর্তা চমকিত হয়ে বললেন, কে বলল?

তারণকৃষ্ণ রায়—

যা-খুশি নাম একটা বানিয়ে বলে দিল। ত্রিলোকতারণ বললেই বা ঠেকাত কে?

কর্তা ঘাড় নেড়ে দিলেনঃ না, মাস্টার তো রয়েছেন।

মহাশয়-লোক ইনি, সংক্ষেপে ছাড়লেন। অন্যত্র ঢুঁ দেওয়া যাবে এবার।

কিন্তু অনেকে আছেন কাঁঠালের আঠার মতন। সহজে রেহাই নেই, জেরার পর জেরাঃ নাম কি তোমার বাপু? পড়াশুনো কদ্দূর? কে কে আছেন তোমার? তারণকৃষ্ণটি কে? কদ্দিনের চেনা? কোথায় থাকেন সে লোক?

বাপরে বাপ, চোখে সরষেফুল দেখিয়ে ছাড়ে। বৃদ্ধটি বোধহয় ফৌজদারি কোর্টের উকিল। দরজার গায়ে নেমপ্লেট লটকানো কিনা, দেখে ঢোকা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে সামাল—উকিল-টুকিলের বাড়ি কদাপি নয়।

যাবতীয় জেরা অন্তে উকিলমশায় শেষ পর্যন্ত হয়তো বলে দিলেন, মাস্টার নয়—রাঁধুনি-বামুন পেলে রাখতাম।

বইপত্তরের বদলে হাতা-খুন্তির চর্চায় থাকলে বেশি কাজ দিত, মালুম হচ্ছে। ঠাকুর বিহনে মেসেও ইতিমধ্যে একটি বেলা উপোস গেছে। রাস্তায় নেমে পড়ে অরুণেন্দু চুকচুক করেঃ জামা খুলে মালকোঁচা মেরে কেন বললাম না, রান্নাঘর দেখিয়ে দেন কর্তা—

তখন আবার হয়তো নতুন ফ্যাসাদ—জাতে বামুন তো পৈতে দেখাও, গায়ত্রী মুখস্থ বলো, লক্ষ্মীপুজোর পদ্ধতি বলে যাও। আর রসুয়ে-বামুন যখন, ছ্যাঁচড়ায় কি কি মশলার প্রয়োজন সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে যাও……

মেসের রান্নাঘরে মাঝেমধ্যে ঢুকে দু-চার পদ রান্না শিখে রাখবে ঠাকুরের খোশামুদি করে। এবং খানিকটা ফেটির সুতো কিনে পুষ্ট একগোছা কোমরে রেখে দেবে। বামুনঠাকুর হতে গেলে পৈতের মতন সেই বস্তু কাঁধে তুলে দেবে—অন্য সময় কোমরে বিলুপ্ত রেখে যথারীতি কেরানির উমেদার ভদ্রমানুষ। যেমন দিনকাল, সকল দিক আটঘাট বেঁধে সর্বরকমের বন্দোবস্ত রেখে চলা উচিত। কোন ক্ষেত্রে কোনটা দরকারে লাগে বলা যায় না।

ততক্ষণে আর এক বাড়ি সে ঢুকে পড়েছে। বৃদ্ধা মহিলা, সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসে চেয়ারখানায় উবু হয়ে বসলেন। ঘাড় কাঁপছে, বসলেই ঘাড় কাঁপে।

মাস্টার চাই মা?

ছেলেপুলে থাকলে তো মাস্টার? এক ছেলে আমার, বিয়ে দিয়ে বাঁজা বউ এনেছি। তিরিশবছুরে বুড়ি হতে চলল, ড্যাং-ড্যাং করে লঙ্কা মেরে বেড়াচ্ছে। চিকিচ্ছেপত্তোর ঝাড়ফুঁক তাগাতাবিজ কত রকম হল—টাকার বৃষ্টি, কিছুতে কিছু নয়। মা-ষষ্ঠীর দয়ায় আসুক ছেলেপুলে সংসারে—মাস্টার লাগবে বইকি। বিনি মাস্টারে মুখ্যু করে রাখব না, তুমিই এসো তখন বাবা।

তবু যা-ই হোক আশা পাওয়া গেল—আজকের কিছু নয়, ভবিষ্যতের। ট্যুইশানি খোঁজাখুঁজি ছেড়ে একটা স্বাধীন ব্যবসা ধরবে নাকি? সিঁদুর ও খড়িতে বক্ষ-ললাট চিত্রবিচিত্র করে কালীঘাটের অশ্বত্থতলায় আসন জমিয়ে বসে ঝাড়ফুঁক তাগাতাবিজের ব্যবসা? টাকা পাঁচেক মূলধন—ব্যাপার-বাণিজ্যের নামে চাঁদমোহন বা জয়ন্ত যে-কেউ ওরা ধার দেবে।

কত বাড়ি ঘুরল অরুণেন্দু। দিনের পর দিন ঘুরেছে। মানুষের দেখা যাচ্ছে সর্ববস্তুর প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র টিউটর ছাড়া। একবার এক মারমুখী পালোয়ান

লোকের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল।

কে হে তুমি—জিজ্ঞাসাবাদ নেই, আচমকা ঘরে ঢুকে পড়লে?

বাইরের ঘর তো—

সামনে পড়ে রুখে দিলাম, নইলে অল্পে ছাড়তে তুমি? বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘর, তারপরে শোবার ঘর, দোতলার ঘর—। ব্যাগ হাতড়াতে, বাক্স ভাঙতে, গলা টিপে মেয়েটাকে নিকেশ করে টাকাকড়ি গয়নাপত্তোর হাতিয়ে শটকান দিতে। আকছার করছ তোমরা এই কাজ—

আজ্ঞে, তেমন লোক আমি নই।

নও তার প্রমাণ কোথা? কেৎকার মুখে সবাই ভিজে-বেড়াল।

কিছু প্রমাণ পকেটেই ছিল। আজই কলেজে মাইনে দিয়ে এসেছে, বিল-বই মেলে ধরল। ছিল রক্ষে। পালোয়ান নেড়েচেড়ে দেখে, মুখের দিকেও দেখছে কড়া নজর ফেলে। মুখটা ভাগ্যিস কচি-কচি সুকুমার দেখায়। নজর কোমল হয়ে এলো ক্রমশ।

যাও—হুকুম দিল পালোয়ান। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রে বাবা।

মাস তিন-চার এমনি ঘুরতে ঘুরতে বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়েছিল—ট্যুইশানি জুটেছিল একটা। একটা কেন চারটে—উঁহু, ন'টা।

খুলে বলি।

শ্যামবাজার তল্লাট সম্পূর্ণ সারা করে অরুণেন্দু তখন বাগবাজার ধরেছে। ভোটের সময় যেমন এক-একটা গলির বাড়ি ধরে ধরে ঘোরে। এক সন্ধ্যাবেলা আধ-অন্ধকারে একজনকে সম্পূর্ণ একলা দেখে দুর্গানাম জপতে জপতে সে ঢুকে গেল। ভদ্রলোক রঙে আছেন, মানুষ দেখে সরঞ্জাম ইত্যাদি আলমারির আড়ালে ঠেলে দিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন।

মাস্টার রাখবেন?

আলবত রাখব—

ঘোরতর চেঁচামেচি শুরু করলেন ভদ্রলোক: কই গো, কোথায় গেলে? মাস্টার এসে গেছে। একগাদা কথা শুনিয়ে এখন যে আর পাত্তা নেই। সত্যি না মিথ্যে বলেছিলাম, চর্মচক্ষে দেখ এসে এইবার।

তিনি এলেন। ঐরাবত-স্ত্রীলোক—এ্যাব্বড়ো এ্যাব্বড়ো চোখ-জোড়া অরুণেন্দুর দিকে তাক করে নিশ্চল হয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক শতকণ্ঠে অরুণেন্দুর গুণাবলীর ফিরিস্তি দিচ্ছেন—সে নিজেও যা-সব কোন পুরুষে জানে না।

কন্দর্পকান্তি চেহারা দেখছ—বনেদি রাজবংশের ছেলে। পড়াশুনোতেও হীরের টুকরো। এইটুকু মানুষ বি-টি পাশ করে হাতিবাগান ইস্কুলে ঢুকে গেছে। তুমি বিশ্বাস করলে না, কিন্তু ইস্কুলে আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছিলাম। তবেই এসেছে।

গিন্নির পছন্দ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহাল।

ওরে ছিটে, ওরে ফোঁটা, ছুটে আয় রে—তোদের মাস্টার এসে গেছে।

ছেলে এলো, মেয়ে এলো। খাসা নামকরণ—ছেলেটা ছিটে, মেয়েটা ফোঁটা। পিছন পিছন লেজুড় একজোড়া—নিতান্তই বাচ্ছা তারা। সে দুটো বিন্দু আর বিসর্গ। ছেলেমেয়েরা মায়ের স্বাস্থ্যখানি না পেয়ে বসে, গিন্নি সে বিষয়ে সদাসতর্ক। গোড়াতেই নামের বেড়া দিয়ে আটকেছেন।

বললেন, পড়াবে তুমি ছিটেকে আর ফোঁটাকে। ওদেরই আসল পড়া। বিন্দু, বিসর্গ পড়তে শেখে নি। এমনি এমনি বসে থাকবে—আমার রান্নার মধ্যে গিয়ে জ্বালাতন না করে। অ-আ'র বই একখানা করে দিয়ে দেবো, বসে বসে ছবি দেখবে।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে ঐ কথা রইল। কাল থেকেই—কেমন? কাল সন্ধ্যেবেলা। এবারে এসো।

মাইনের কথা অরুণ তুলতে পারে না, টাকাপয়সার ব্যাপারে তার লজ্জা। কিন্তু বিশাল চোখ দুটো গিন্নি এমনি এমনি ধরেন না—দৃষ্টি সকল দিকে সজাগ। ধমক দিয়ে উঠলেন তিনি: এসো বললেই অমনি চলে যাবে—দেবে থোবে কি, সেটা তো বলবে!

কত আর? হিসাব কষছেন ভদ্রলোকে: ইস্কুলের মাইনে ফোঁটার হল তিন ছিটের চার, একুনে সাতটাকা। সারা দিনমান জুড়ে তারা পড়ায়। ঘরের মাস্টার তুমি কতক্ষণই বা পড়াবে। যাকগে, পুরোপুরি দশ করেই দেবো। কি বলো?

গিন্নির দিকে তাকালেন। গিন্নি অধিক উদার, বোধকরি কর্তার পকেট থেকে যাচ্ছে বলেই। ঘাড় নেড়ে বলে দিলেন, উঁহু, পনর টাকা।

॥ তিন ॥

জীবনের প্রথম চাকরি। মাস অন্তে পনেরখানি টাকা—দৈনিক মোটামুটি আটআনা। ধনভান্ডারের চাবিকাঠি আলিবাবার হাতের মুঠোয়—আবার কি! অতখানি পথ নাচের ঢঙে হেঁটে অরুণ মেসে ফিরল। পরের দিন সন্ধ্যা হতে না হতে কর্মস্থলে।

ছিটে এলো ফোঁটা এলো, এবং বিন্দু বিসর্গ ফাউদুটোও পিছনে পিছনে দেখা দিল। আপন মনে ছবি দেখবে, গিন্নি বলেছিলেন—তেমনি পাত্রই বটে! জাতবিচ্ছু ও-দুটো—ছিটে ফোঁটার পড়া বলে দিচ্ছে, অ-আ'র বই এনে তার উপরে দু-পাশ দিয়ে ঝপ-ঝপ করে চেপে ধরল। এদেরই পড়াতে হবে আগে। একটুকু সরিয়ে দিয়েছি কি আর্তনাদ ও কাটা-কবুতরের মতো ছটফটানি। লোকে ভাববে, কী মারাটাই না মারছে বাচ্চা দুটোকে।

রান্নার মাঝে ক্ষণে ক্ষণে এসে গিন্নি তদারিক করছেন। বলেন, পড়ে কি হবে, লেখাই আসল। মাস্টার তুমি অক্ষর লিখে দাও, তার উপর দাগা বুলোক।

এই একগন্ডাতেই শেষ নয়, একটা দুটো দিন অন্তর নতুন নতুন আরও সব দেখা দিতে লাগল। ভাগনে ভাইঝি রকমারি পরিচয় দিয়ে গিন্নি এক একটাকে সতরঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে যান। কী সর্বনাশ! দুনিয়ার যেখানে যত কুটুম্ব আছে, বাড়ি এনে জমিয়েছে। ইতি পড়ে নি এখনো, আরও নাকি আসবে। ছোটখাটো ইস্কুল হয়ে উঠল যে দিনকে-দিন।

হোক তাই, আপত্তি কি। সন্ধ্যাবেলাটা পাবেন এঁরা, তার মধ্যে যেমন খুশি খাটিয়ে নিন।

এ তবু পড়ানো লেখানো আঁক-কষানো গল্প-বলা—সব কাজ একাসনে বসেই। যদি গিন্নি আদেশ করতেন, টবের গাছ ক'টায় চাট্টি করে মাটি তুলে দাও মাস্টার, কিম্বা এক বালতি জল এনে দাও কল থেকে—করতে হত তাই। বলেন না, সেটা ভাগ্য। একটা জায়গায় বসে বসেই কাজকর্ম চলে।

এত করেও হল না। একটা ছোটখাট পরীক্ষায় ছিটে অঙ্কে পেয়ে গেল দশ। গিন্নি চোখ পাকিয়ে বসে পড়েন: দশ পায় কেন?

[গোল্লাই তো পাবার কথা। নির্ঘাৎ ঢুকেছে। বাহাদুর বটে আপনার ঐটুকু ছেলে।]

গিন্নির তর্জনগর্জন : কি রকম পড়াও তুমি ?

[পড়াব কখন ? আমি তো বাচ্চা রাখার রাখাল মাত্র। বিশ দিনে আজ ন'টায় এসে পৌঁচেছে। পুরো বছরে তবে তো একশচৌষট্টি পুরে গিয়ে তারও উপরে একটার খড়-মুণ্ডের খানিক খানিক এসে যাবে। সোজা ত্রৈরাশিকের হিসাব।]

গিন্নির সিদ্ধান্ত : তোমায় দিয়ে চলবে না বাপু, অন্য মাস্টার দেখব। তুমি এসোগে।

তথাস্তু। দাদার বোঝা হালকা করবে মনে মনে আশা করে এসেছিল। চাকরি ধোপে টিকল না। তবু খানিকটা আরাম পায়। ন-নটা পশুপক্ষীকে সামাল দিতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল। আবার নাকি এক ভাগনে-বউ আসছে অর্ধেক ডজন ছেলেপুলে নিয়ে। এবার তো ঘরে ধরবে না—ছেলেপুলে নিয়ে মাস্টারকে ফুটপাথের উপর আসন নিতে হত।

গিন্নি বললেন, উনি নেই। পরশু-তরশু একদিন এসে মাইনে নিয়ে যেও।

পরশুও নয়, তার পরের দিন তক্কে তক্কে থেকে বাড়ি ফেরার মুখে কর্তাকে ধরে ফেলল। দুটো টাকা দিয়ে আবার তিনি পরশু আসতে বললেন। মাস দশেক লেগেছিল মাইনের পনের টাকা পুরোপুরি আদায় করতে।

শীতকাল। ভোরবেলা তুর-তুর করে কাঁপতে কাঁপতে ডোবার ঘাটে যশোদা বাসন মাজতে গেছেন। কুয়াশায় ঠাহর পাননি—নারকেলগুঁড়ির ঘাটে পা হড়কে পড়ে গেলেন। ঝন-ঝন করে বাসনকোসন ছড়িয়ে গেল, বিছানা ছেড়ে পূর্ণ ছুটে এসে পড়ল। ক্রমে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকেও এলো, ডোবার কিনারে বেশ একটা সোরগোল।

যশোদা ক্রমাগত বলছেন, লাগে নি, কিচ্ছু হয় নি রে। কেন তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ ?

বলছেন বটে, কিছু নয়—উঠতেও পারেন না কিন্তু। উঠতে গিয়ে জল-কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খেলেন। ধরে-পেড়ে সকলে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিল। পাড়ার একজনের মুষ্টি-যোগ জানা আছে—কয়েক রকম শিকড়-বাকড় গরুর চোনায় বেটে হাঁটুতে জাব লাগিয়ে দিল : ব্যথা টেনে যাবে, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। কতদিনে তা বলা যায় না। এই বয়সে এত বড় ঘা খেয়ে আগের মতন আবার খেটেখুটে বেড়াতে পারবেন, তাতে ঘোরতর সন্দেহ।

যাবতীয় ঝামেলা পূর্ণেন্দুকে পোহাতে হচ্ছে—মায়ের সেবাযত্ন, সংসারের রাঁধাবাড়া, জল তোলা, বাটনা বাটা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, সমস্ত। এরই মধ্যে আবার রোজগারের চেষ্টায় ছুটতে হয়। বাঁধা চাকরি নয়, সময়ের ঠিকঠিকানা নেই। কখন কি কৌশল ধরতে হবে, লহমা আগেও বোঝার উপায় নেই।

গুরুঠাকুর আত্মারাম আচার্য একই সঙ্গে পাকিস্তানের বাস ছেড়েছিলেন। ভিন কলোনির তাঁরা, তা হলেও আচার্যিঠাকুরের বউ নিস্তারিণীর হামেশাই আসা-যাওয়া। ঠাকরুন বললেন, ছেলের বিয়ে দাও পুন্নর মা। যুগ্যি হয়েছে ছেলে, পয়সাকড়ি আনছে। সংসারের দায়ও এখন বটে। বেটাছেলের বাইরে বাইরে কাজ—আবার নিত্যিদিন ঘরও সে সামলাবে কেমন করে। নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। ছেলে তোমার বড্ড ভাল, অাই কিছু বলে না।

মায়ের দুর্ঘটনার পর থেকে অরুণও যখন-তখন বাড়ি চলে আসে। এসে দাদার ও মায়ের বকুনি খায়। পরীক্ষার মুখে ছুটোছুটির মানেটা কি ? একটা দিন এখন যে এক এক মাসের সমান।

অরুণ কাতর হয়ে বলে, থাকি কেমন করে দাদা ?

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে পূর্ণেন্দু ভাইকে শান্ত করে। বলে, আমাদের সুখ-অসুখ দেখতে হবে না, ভাল হয়ে পাশ কর তুই ভাইডি। পাশের খবর কানে শুনেই মা দেখবি নিরাময় হয়ে যাবেন।

তবু সে যায়। একবার গিয়ে শুনল, পূর্ণেন্দুর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। চেঁচিয়ে-লাফিয়ে আহ্লাদের বেগে সামলে নিল সে খানিক। প্রশ্ন করে: রাজি হল দাদা ?

যশোদা বললেন, না হয়ে উপায় কি ? আমি যে অচল হয়ে পড়লাম। ঘর-সংসার দেখতে গিয়ে রোজগার বন্ধ হচ্ছে। মাইনের লোকে সংসার চলে না, ভাল লোক মেলে না আজকাল। আর মেলেও যদি, মাসের পর মাস মাইনে কোত্থেকে টানব ?

পূর্ণ বাড়ি ছিল না, খানিক পরে এলো। অরুণেন্দু বলে, সুমতি হয়েছে শুনলাম দাদা, আমার বউদিদি আনছ।

হেসে পূর্ণেন্দু বলে, বিনি-মাইনের সর্বক্ষণের ঝি—

কোন বউটি নয় শুনি ? বড়লোকদের কথা আলাদা, আমাদের গরিবগুরোর ঘরে পটের-ছবি করে দেওয়ালে টাঙানোর জন্য কেউ বউ আনে না।

দমে না অরুণ। বলছে, আমার মেসের একজন বোনের বিয়ের জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন। মেয়ে চোখেও দেখেছি, মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে এসে দুপুরবেলাটা মেসের ঘরে উঠেছিল। বেশ মেয়ে, বউদিদি হলে খাসা হবে। কথায় কথায় তোমার কথাও উঠে পড়েছিল। দেখ ভাই যদি পারো—বলে ভদ্রলোক হাত জড়িয়ে ধরলেন।

সত্যি বলছিস ? চক্ষু কপালে তুলে পূর্ণ বলে, ভদ্রলোক পাগল না ক্ষ্যাপা ? আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানে তো হাত-পা বেঁধে গাঙে ছুঁড়ে দেওয়া বোনকে—

ক্রুদ্ধ হয়ে অরুণেন্দু বলে, ভাই তুমি আমার, সেটা ভুলো না। আত্মনিন্দা যত খুশি করতে পারতে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদার যে নিন্দে হয়ে যাচ্ছে, সেটা আমি সহ্য করব না কিছুতে। শতেক রকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ভদ্রলোক—তোমার চরিত্র চেহারা স্বাস্থ্য ঘরবাড়ি সংসার খবরাখবর। সমস্ত বললাম। ঘর বলতে তালপাতার ছাপড়া, তা-ও গোপন করিনি। রোজগার কী রকম, আন্দাজ দিয়েছি। নিন্দের কথাও শুনিয়ে দিলাম: ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজেকে ছোট করার স্বভাব তোমার। এত সমস্ত শুনেও তার পরে হাত জড়িয়ে ধরলেন।

মিটিমিটি হেসে পূর্ণেন্দু বলে, কোন কায়দায় রোজগার—তার কিছু বলেছিস ?

জিজ্ঞাসা করে নি, এমনি এমনি কেন বলতে যাবে ? ম্যাজিস্ট্রেট কি মিনিস্টার যদি হতে, দেমাক করে আগ বাড়িয়ে বলতাম।

পূর্ণ বলে, রক্ষে বলিস নি। শুনে মেয়ের ভাই চোঁচা দৌড় দিত।

অরুণেন্দু বলে, দিত না। যা করেছে, ঠিক এমনিটাই করত। দিনকাল কী দাঁড়িয়েছে, শহরের উপর নিত্যিদিন চোখে দেখি। টাকা হলেই হল, টাকাটা কী করে আসছে কেউ জানতে চায় না।

জোর দিয়ে আবার বলে, বেশ তো, পরখ হয়ে যাক। গ্রীন-সিগন্যাল দিয়ে দাও তুমি, পাকা কথাবার্তার আগে সমস্ত-কিছু খুলে বলব। তবু সম্বন্ধ বাতিল হবে না, দেখো।

পূর্ণেন্দু বলে, ভাই না-হয় দায় নামিয়ে বাঁচবেন। কিন্তু আমাদের দুঃখের সংসারে বোন তো শান্তি পাবে না। নিজে জ্বলবে, আমাদেরও জ্বালাবে।

অরুণ বলে, বুঝলাম দাদা, অন্য কোথায় পছন্দ করে ফেলেছ। নয়তো এত

ফ্যাকড়া তুলবে কেন? পছন্দের সেই মেয়ে জ্বলতে জানে না বুঝি?

হেসে পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়ল: না, বর্তে যাবে। তারা আমাদের চেয়েও দুঃখী।

অরুণেন্দু অবাক হয়ে বলে, আছে কেউ এমন?

এত কথা মা বলেছেন, পাত্রীর খবরটাই বলেন নি? তিনকড়ি হালদারের মেয়ে মলিনা। জলার ধারে বটগাছতলায় যারা ঘর তুলেছে। মলিনা বউ হয়ে আসছে।

নিঃসাড় অরুণেন্দু, বজ্রাহতের মতন।

হল কি রে? পূর্ণেন্দু হি-হি করে হাসে: ঘেয়ো-কাঁঠালের মুচি খদ্দের। কাঁঠাল খুঁতো না হলে আমা হেন খদ্দের অবধি পৌঁছবে কেন? আমার ভাতভিত্তি জানে তারা, জেনেশুনেই আগ্রহ করছে। গরিবঘরের কালোকুচ্ছিত মেয়ে—

অরুণ জুড়ে দেয়: তার উপরে গন্নাকাটা—কথার আওয়াজে মানুষ হাসে।

তা হাসুক। সে মেয়েরও সাধ-আহলাদ থাকে—ঘর গৃহস্থালীর সাধ, স্বামী-শাশুড়ি-দেওর পাবার সাধ। মায়ের সেবা বেশি করে করবে মলিনা, সংসারের বেশি যত্ন নেবে।

প্রবোধ দিয়ে বলে, বেজার হোস নে ভাইডি। মায়ের সঙ্গেও এই নিয়ে লড়ালড়ি হয়েছে। তোর সাধ মায়ের সাধ সমস্ত তোর বউ এনে মেটাব। পাশ করে চাকরি-বাকরি করবি তুই, ভাল ঘরবাড়ি হবে, ঘর আলো-করা বউ নিয়ে আসব তখন।

অরুণ হেসে বলে, বউ দিয়ে আলো করার দরকার নেই—হেরিকেনে বেশ চলছে। চাকরি জুটিয়ে সকলের আগে তোমার বৃত্তি ঘোচাব। একটা-কিছু এদ্দিনে নিশ্চয় জোটাতাম। কিন্তু তুমি যে পড়াশুনোর গোঁ ধরে বসলে। দেশের সব ছেলেই যেন বি-এ পাশ। গ্র্যাজুয়েট না হলে যেন মানুষ হয় না।

পরীক্ষা দিয়ে অরুণেন্দু বাড়ি এসেছে। এইবারে পূর্ণর বিয়ে। অরুণের জন্যে আটকে ছিল এতদিন।

অতি সংক্ষিপ্ত আয়োজন। দুই ভাই এবং মা শুধু জানেন। আর ওপক্ষে খবর রাখে কনের বৈমাত্রেয় ভাই, আরও একজন দু-জন। এবং কনেও সম্ভবত।

সেদিনটা পূর্ণেন্দুর কাজকর্ম কামাই গেল—স্বাধীন জীবিকা, কারো কাছে কৈফিয়তের দায় নেই, সেই বড় সুবিধা। প্রহরখানেক রাত্রে দুই ভাই এবং পুরুতঠাকুর মশায় আমতলা বটতলা পার হয়ে মাঠ ভেঙে কনের বাড়ি চললেন। দেহের কোনখানে রক্তপাত হলে শুভকর্মে বিঘ্ন ঘটে—পুরুতঠাকুর পই-পই করে বললেন, বরের জন্য অন্তত একটা পালকি নিয়ে নাও। কিন্তু পূর্ণেন্দু বেঁকে বসল: না। শুধু আমি কেন, নতুন বউকেও কাল পায়ে হেঁটে শ্বশুরবাড়ি উঠতে হবে।

পালকি হয় নি, একজোড়া ঢোলকাঁসিও নেই—অরুণেন্দু আগে আগে হেরিকেনের আলো দেখিয়ে যাচ্ছে মেঠো পথে আছাড় খেয়ে না পড়ে যাতে বর। পড়বে না অবশ্য—এ কর্মে বরের সাতিশয় দক্ষতা। এর চেয়ে ঢের ঢের গুরুতর স্থলে তার বিচরণ—একচুল এদিক-ওদিক হলে, রক্তপাত কি—দেহখানি তালগোল পাকিয়ে পিণ্ডবৎ হয়ে যাবে। সেই বিচরণ নিত্যিদিন হরবখত করে যাচ্ছে—সামান্য একটা মাঠ ও কিছু খানাখন্দ পার হওয়া নিয়ে ঘাবড়ানোর কী আছে! হেরিকেন নিতেও আপত্তি ছিল—কিন্তু ভাই নিতান্ত নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ায় কেরোসিনের অপব্যয়টা মেনে নিতে হল।

বিয়ে সামান্যেই সমাধা—দুই টাকা দক্ষিণায় পুরুত কি আর রাতভোর মন্তোর পড়িয়ে যাবেন! কাজকর্ম সেরে পুরুত আর অরুণ সেই রাত্রেই ফেরত চলে এলো।

কনে-বাড়িতে স্থানাভাব—নতুন-জামাইকে নেহাত রাতারাতি বিদায় করা চলে না, কষ্টেসৃষ্টে তার থাকার মতন ব্যবস্থা হয়েছে। কাল দিনমানে বর-বউ হেঁটে বাড়ি আসবে। গয়নাকাটা বউয়ের ঠোঁটের খানিকটা কাটা বটে, কিন্তু পা দুখানা ষোলআনা নিখুঁত। স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে আসবে দেখো।

॥ চার ॥

পাশ করেছে অরুণেন্দু, টায়েটোয়ে পাশ। তাতেই পূর্ণেন্দু মহাখুশি। আকাট মূর্খের ভাই গ্রাজুয়েট—এঁটোপাতের ধোঁয়া সত্যি সত্যি স্বর্গে পৌঁছল তবে! ইচ্ছে মতন চাকরিবাকরি নিয়ে নিক এবারে, নিজের মা-ভাই শুধু কেন—দশের প্রতিপালক হয়ে নাম-কাম করুক। বুকে মাটি ঠেকে গেছে খরচ জোগাতে। অরুণ নিজেও বিস্তর কষ্ট করেছে। ট্যুইশানি করেছে, খবরের কাগজের হকারি করেছে, খাতা-পেন্সিল বিক্রি করে বেড়িয়েছে ইস্কুলে ইস্কুলে—যখন যেটা কায়দামতন জুটে যায়।

যাই হোক, অরুণেন্দু ভদ্র, বি-এ—বুক ফুলিয়ে লিখুক এবার থেকে। যেখানে তাদের পৈতৃক বাড়ি (এখন পাকিস্তান), তল্লাট কুড়িয়ে তথায় চারটি মাত্র গ্রাজুয়েট ছিল। কী খাতির-সম্মান সেই চারজনের! সামান্য ঘরোয়া কথাবার্তাও লোকে তটস্থ হয়ে শুনত, না-জানি কোন পাণ্ডিত্য তার মধ্যে ঝলক দিয়ে ওঠে! অরুণও আজ সেই দুর্লভ দলের একজন—যশোদা বেওয়ার ছেলে পূর্ণেন্দু ভদ্রের ভাই যে অরুণ। গাছ তৈরি হয়ে গেছে—ফল কুড়ানো এইবার।

নতুন বউ মলিনা গোড়ায় গোড়ায় কথা বলত না অরুণেন্দুর সঙ্গে, মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে সরে যেত। যশোদা বলতেন, একি বউমা, কাজে কর্মে পূর্ণ তো সর্বক্ষণ বাইরে, আমি বিছানায় পড়ে আছি, ছেলেটা বাড়ি এসে কথার দোসর পায় না। আসবেই না আর, এমনিধারা যদি মুখ ঘুরিয়ে থাক।

পূর্ণেন্দু এলে তার কাছেও বউয়ের নামে বলেন। ভর্ৎসনা করে সে মলিনাকে: কী বিদঘুটে লজ্জা তোমার! বলি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো না? মেসে পড়ে থাকে। বাড়ি আসে আপনজনের কাছে একটু যত্নআত্তি পাবে, দুটো মিষ্টি কথা শুনবে, সেই আশায়।

এর পরে আছে অরুণেন্দু নিজে। নাছোড়বান্দা হয়ে তাড়া করে মলিনাকে, 'বউদি, বউদি' করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে। শাশুড়ির বকুনি তদুপরি স্বামীর ক্রোধ—আজ মলিনা দেওরের ডাকে ছুটে পালায় না, মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। পায়ের নখে মাটিতে দাগ কাটছে।

কাছে এসে গম্ভীর কণ্ঠে অরুণ বলে, কথা বলেন না আপনি আমার সঙ্গে। ডাকলে সাড়া দেন না, অগ্রাহ্য করে চলে যান। সাহসটা কী আপনার—জানেন, আমি কে?

ভীত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখে মলিনা চোখ নিচু করল।

অরুণ বলে, নতুন এসেছেন, জানেন না তাই। 'আমি সম্রাট'। আমায় নিয়ে বাড়িসুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত। তক্তাপোশের উপরে রাজশয্যা আমার জন্য। যে ক'টা বালিশ-তোষক আছে সবগুলো সেই তক্তা-পোশে উঠে যায়—অন্য সকলের মাটির মেজের মাদুরের উপর শোওয়া। জেলেপাড়া ঘুরে ঘুরে সবচেয়ে মোটা গলদাচিংড়ি আসবে যেহেতু চিংড়িমাছ আমি খাই ভালো। দুধ কেনা হবে—মা বুড়ো-মানুষ কিম্বা দাদা এত খাটনি খেটে বেড়ায়, কেউ তা থেকে একফোঁটা পাবে না, সমস্তটুকু আমার। সর খাবো, ক্ষীর খাবো—

মলিনা কথা বলল। মৃদুস্বরে বলে, পড়াশুনো করেন যে আপনি—

মলিনার লজ্জা বটে—সেকেলে বউরা যা করত, সে জাতীয় লজ্জা নয় বোঝা গেল। গন্নাকাটা মুখে কথা উচ্চারণের লজ্জা—চেপে চেপে অতিশয় ধীর কণ্ঠে বলছে। বাপের-বাড়ি তার কথা শুনে লোকে হাসে, স্বরের অনুকরণ করে ভেংচায়। শ্বশুরবাড়িতেও সেই অবস্থা না ঘটে—মলিনা অতি-সতর্ক তাই।

বলল, পড়াশুনোয় মাথার খাটনি। ভালমন্দ খেতে হবে বইকি ঠাকুরপো।

সে পাট চুকেছে। পড়ুয়া নই এখন, পাশ-করা গ্রাজুয়েট।

প্রচণ্ড হাস্যে অরুণ নিজের বুকে একটা থাবা মারল: পাশ-টাস করে বিদ্যের চুড়োর উপর বসেছি। রকমারি চাকরি সব পায়ের নিচে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে, তুলে নিলেই হল। নিই নি এখনো—নজর ফেলে ফেলে বিবেচনায় আছি। চাকরি নিয়েই এই জমিটার উপর দোমহলা অট্টালিকা তুলে ফেলব, সামনের ঐ শেয়াকুলের জঙ্গলে দেউড়ি আর ঘড়িঘর। আমার বউদির আপাদমস্তক সোনায় হীরেয় মুড়ে দেবো, তা-ও ঠিক করে রেখেছি। রেলের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে দাদা বাড়িতে গদিনসিন হয়ে এস্টেটপত্তোর দেখবে। প্লান একেবারে নিখুঁত করে ছকে রেখেছি।

মলিনা হেসে সতর্ক মৃদু কণ্ঠে বলল, আর একটি তো বললেন না। আমার যে বোন হয়ে আসবে—

অরুণেন্দু সায় দিয়ে বলল, সত্যি, বড্ড মনে করিয়ে দিলেন। চাকরির মতন বউও পছন্দ করার ব্যাপার। দাদাকে হুঁশ করিয়ে দেবেন তো বউদি, দেখাশুনো দরদাম আরম্ভ করে দিন।

নিভৃতে মায়ের কাছে অরুণেন্দুর ভিন্ন মূর্তি: মাগো, বউ সামলাও তোমার। আদরযত্নের ঠেলায় মারা পড়ি।

বলে, বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় পড়তে গেলাম, সেই থেকে গোলমালের শুরু। তোমার ছেলে নই যেন আর আমি, দাদার ভাই নই। কলকাতা থেকে বাড়ি আসি—দেবলোক থেকে নরমূর্তি ধরে এসেছি যেন। তবু সে যা-হোক করে চলছিল, এবারে পরের মেয়ে যাঁকে বউ করে এনেছ, তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

যশোদা বিশেষ আমল না দিয়ে বললেন, পুন্ন বলে দিয়েছে।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে অরুণ বলে, সেই তো জিজ্ঞাসা। কেন দাদা আলাদা করে বলতে যাবে?

না বললে পরের মেয়ে জানবে কেমন করে? এবাড়ির তুই যে আশাভরসা—সকলে মুখ চেয়ে আছে।

ছ-মাস তো হয়ে গেল। এর মধ্যে ভরসার কতখানি কি পেয়েছ শুনি? কোন আশাটা তোমাদের পূরণ করেছি? যেখানে যাচ্ছি, দরজা বন্ধ। অপদার্থ আমি—কাজকর্ম যারা দেয়, তাদের হদিস বের করতে পারি নে।

একটু থেমে বিষন্ন তিক্তকণ্ঠে সে বলল, বউদিকে দাদা কি বলেছে জানি নে—তুমি বলে দিও মা, থালায় ভাত না দিয়ে আমার জন্য উনুনের ছাই বেড়ে দেন যেন।

যশোদা আহা-আহা করে উঠলেন: কী রকম কথার ছিরি—ছ-মাস গেছে তো কী হয়েছে। আস্তকাল পড়ে রয়েছে—কত রোজগারপত্তোর করবি, সুখশান্তি হবে। এত কষ্টের বিদ্যে বিফল যাবে না।

মা-জননীর প্রত্যয়ে চিড় খায় না। অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছেন—ছেলে গ্রাজুয়েট হয়েছে, সেই দেমাকে মটমট করছেন। সে যখন ছিল, তখন ছিল। গ্রাজুয়েট ঝাড়ুদার হয়েছে, খুঁজলে আজকের দিনে তা-ও হয়তো মিলে যাবে।

কথাগুলো মুখে এসে পড়েছিল, অরুণেন্দু চেপে নিল। কতদিনই বা আছেন আর—আশা চুরমার করে দেওয়া নিষ্ঠুরতা। মৃত্যু অবধি আশা আঁকড়ে ধরে চলে যান।

মায়ের কথা শুনে অরুণেন্দু হাসল এবার, জবাব দিল না।

যশোদা বললেন, সময়টা খারাপ যাচ্ছে তোর, ঠিকুজি বলছে। ঠাকুরটি বক্রি, বারের পুজো তাই হপ্তায় হপ্তায় দিয়ে যাচ্ছি। তার উপরে নারায়ণের বুকে-পিঠে নিত্যিদিন তুলসী পড়ছে। চাকরি শিগগিরই হবে দেখিস।

বারের পুজো মানে শনিবারের পুজো, ঠাকুর এখানে শনিঠাকুর। বেয়াড়া ঠাকুর শনি, স্পষ্টাস্পষ্টি নাম ধরতে নেই, ঠারেঠোরে বলতে হয়।

তা বেশ হয়েছে। নিজে সে চেষ্টাচরিত্র করছে—শয্যাশ্রয়ী হয়েও মা-জননী এদিকে নিশ্চিন্ত নেই। অফিসের উপরওয়ালাদের কষে অরুণ ধরাপাড়া করুক, সেই উপরওয়ালাদের উপরে যাঁরা তাঁদের তদ্বিরে মা-জননী আছেন। চাকরি না হয়ে যাবে কোথায়?

এক বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, অতিশয় সদয় কণ্ঠঃ বাবা তোমার নাম?

নাম বলল অরুণেন্দু।

কোথায় থাকা হয়?

সেটা বলি নে, মাপ করবেন। মোকামে কেউ গিয়ে হাজির হবেন, সে আমি চাই নে। সজ্জনদের নরকদর্শন করিয়ে পাপের ভাগী হই কেন? তবে চিঠিপত্রের ঠিকানা থাকেঃ মির্জাপুর স্ট্রীটের আর্য হোটেল।

এর পরে স্বভাবতই যে প্রশ্ন আসেঃ বাবাজির কী করা হয়?

উমেদারি—

বেশ, বেশ। বৃদ্ধ হেসে পড়লেনঃ হাসি-খুশি ছেলে তুমি—কথায় কথায় ঠাট্টাতামাশা।

সবিনয়ে অরুণ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাট্টাতামাশায় জীবনকে উড়িয়ে দেওয়া।

জয়ন্ত ইস্কুলের বন্ধু। পাশ দিলেই মন চনমন করে, দিগ্‌গজ একটা-কিছু হবো। যথারীতি ভর্তি হয়ে গেল গোবরডাঙা কলেজে। মাস দুই-তিন পরে ইস্তফা দিল—চালাক ছেলে, দিব্যজ্ঞান তাড়াতাড়ি এসে গেছে। দরজায় দরজায় মাথা খুঁড়ে বেড়ানোই নিয়তি—পাশ করলেই বা কি না-করলেই বা কি। পাশ করেছি বলে খাতির দেখিয়ে কেউ 'এসো' 'এসো' করবে না। কী দরকার তবে ঝামেলা বাড়ানো ও সময়ক্ষেপ করার? অরুণেন্দুর মতন দাদা-টাদা ছিল না ভাইকে গ্রাজুয়েট বানাতে যে মরণপণ নিয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অরুণ তিন তিনটে বছর জুড়ে ঘাস কাটতে লাগল, জয়ন্ত সে সময়টা তদ্বিরশাস্ত্রে হাতে-কলমে রকমারি পাঠ নিয়েছে।

বলে, ঘুস বিনে কাজ হয় না। দুনিয়ায় সবাই ঘুস খায়। কাকে কোন ঘুস কি কায়দায় দিতে হবে, সেই হল বিবেচনা।

অরুণেন্দু গড়গড় করে কতকগুলো মহা-মহা ব্যক্তির নাম করে গেলঃ এঁরা?

তুচ্ছ মানুষ তো ওঁরা। স্বর্গধামের তা-বড় তা-বড় দেবদেবীও দস্তুরমতো ঘুসেল। মন্তোর পড়ে পুজো করিঃ তুমি হেনো, তুমি তেনো—সে তো নির্জলা খোশামুদি। মামলাটা জিতিয়ে দাও, ঢাক-ঢোল-পাঁঠায় পুজো দেবো—সোজাসুজি এগ্রিমেন্ট, স্ট্যাম্প-কাগজে লেখা নেই এই যা।

তর্ক ছাড়ে না অরুণ। নাম ধরে ধরে বলছে ঃ অমুক ঘুস নেন ?

টাকাপয়সা কখনো নেবেন না। দাবায় বসতে হবে, বসে হারতে হবে। খেলা যতবারই হোক, তুমি জিততে পাবে না।

আচ্ছা, তমুক ?

মাথার চুল খাটো করে ছেঁটে হাঁটু অবধি গুনচট পরে খালি-পায়ে ও'র কাছে যাবে। গিয়েই এক ফেটি সুতো গলায় পরিয়ে দেবে, তকলিতে নিজের হাতে-কাটা পরিচয় দিয়ে।

ইত্যাদি অনেক কথা। মুগ্ধ হয়ে অরুণেন্দু বলে, অগাধ তোর জানাশোনা—এ শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায় তুই। কোন কায়দায় আমি এগোব, কিছু হদিস দিয়ে দে ভাই।

কিছু না, কিছু না। জয়ন্ত ঘাড় নাড়ল ঃ থিয়োরি যৎকিঞ্চিৎ জানলেও কাজে নেমে খুব একটা মুনাফা দেয় না। এই করলে এই হবে—ছক-বাঁধা নিয়ম নেই কিছু। ঝোপ বুঝে কোপ। জেনে বুঝে আমারই বা কী হয়েছে বল। দুত্তোর—বলে শেষটা দোকানের কাজ নিয়ে নিতে হল।

জোরে এক নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, এমন তুখোড় জয়ন্ত চৌধুরি—গোলদারি দোকানের দাড়িপাল্লা-ধারী হয়ে আছেন তিনি। থিয়োরিতে হয় না, বুঝলি রে, প্রতিভা আবশ্যক। খোশামুদি বড় কঠিন জিনিষ—মানুষের রকমারি মনমেজাজ। একই কথায় কেউ গলে গদগদ হয়, কেউ বা তিড়িং করে তেরিয়া হয়ে ওঠে।

জয়ন্তর বেলাতেও ঠিক এই ঘটেছিল। 'আপনি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, বিস্তর জন ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে থাকে' ইত্যাদি শুনে একজনে 'বসুন' 'বসুন' বলে খাতির করলেন। 'আপনার কথার বাঁধন তো খাসা'—বলে চায়ের হুকুমও দিয়েছিলেন তিনি। ঠিক ঐ কথাগুলোর প্রয়োগে অন্য-একজনে 'ইয়ার্কি ?' বলে গর্জে উঠলেন। শেষোক্ত জন যেহেতু গায়ে-গতরে ভারী, বিশেষণগুলোকে তিনি ইয়ার্কি বিবেচনা করেছেন।

পাড়ায় একটি লাইব্রেরি আছে। দুপুর দুটো থেকে রাত আটটা অবধি খোলা। নিত্যিদিন অরুণ যাবেই একবার সেখানে, যতগুলো কাগজ আছে উল্টেপাল্টে দেখবে। কলেজ স্ট্রীটে তিনটে ট্রাম ও সাতখানা বাস পুড়িয়েছে, কোন পানের দোকানে পান-বিড়ির সঙ্গে বোমা বিক্রিও ধরা পড়েছে, উজ্জ্বলমুখ দেবকিশোরের মতো দুটো ছেলে গুলিবিদ্ধ করে পথের পাশে ফেলে রেখে গেছে, কোন সুন্দরী যুবতীকে বঁটি পেড়ে চাক-চাক করে কেটেছে নাকি কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি রোমহর্ষক খবর। টেবিলে কাগজ পড়তে পায় না, এর হাত থেকে ওর হাতে ঘুরছে।

তারই মধ্যে অরুণ গিয়ে পড়ে ঃ দেখি—

আমাদের দেখাটা হয়ে যাক, তারপরে। খামোকা টানাটানি করবেন না।

অরুণ বলে, তা কেন। আপনারা খবর পড়ুন—আমার উল্টো পিঠ, কর্মখালির পাতা। খবরে আমার গরজ নেই, কয়েকটা ঠিকানা কেবল টুকে নিয়ে যাচ্ছি।

অন্যেরা অবাক হয়ে তাকায়। কোথাকার সন্ন্যাসী-ফকির এলো—দুনিয়া জুড়ে এত সোরগোল, মানুষটির মাথাব্যাথা নেই।

অরুণ বলে, চাকরি দিতে পারেন তাঁরাই শুধুমাত্র আমার দুনিয়া। অন্যদের জানি নে।

মোটা খাতা বেঁধে ঘর-ঘর ভাগ করে নিয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতার নাম-ঠিকানা, চাকরির বিবরণ, মাইনে, দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ইত্যাদি। দিনে রাত্রে এতটুকু

বসতে পারলেই মুশাবিদায় লেগে যায়। ধরে ধরে মুক্তোর মতন অক্ষরে দরখাস্ত লেখে। দরখাস্ত ডাকে ছেড়ে খাতায় যথাস্থানে তারিখ দেয়, যদি জবাব এসে যায় চুম্বক টুকে রাখে। দস্তুরমতো এক ডিপার্টমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছে—বিশাল খাতাখানায় উমেদারি-জীবনের অধ্যবসায়ের পরিচয়-চিহ্ন। সে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার, একটিমাত্র নজরেই মালুম হয়ে যাবে।

জবারের আশা করে দরখাস্তের সঙ্গে গোড়ায় গোড়ায় স্ট্যাম্প পাঠাত। কাকস্য পরিবেদনা। স্ট্যাপ বিলকুল মেরে দেয়। জ্ঞান লাভ করে অতঃপর স্ট্যাম্প পাঠানো বন্ধ করল। দশ-বিশখানা করে প্রতিদিন শুখো-দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছে। একবেলা ভাত খায়, আর একবেলা প্রাণ ভরে রাস্তায় বিনামূল্যে জল খেয়ে সেই পয়সায় দরখাস্তের ডাকটিকিট কেনে।

জয়ন্ত বলে, দরখাস্তে কী হবে রে! মিছে উপোস দিয়ে মরছিস। বিজ্ঞাপন দেয় বুঝি চাকরি দেবার জন্যে? মানুষ তো আগেই ঠিক হয়ে থাকে—ওটা রেওয়াজ। বিজ্ঞাপনের নামে খবরের-কাগজদের কিছু কিছু প্রণামী দিতে হয়।

দরখাস্ত এর পরে বিনি-টিকিটে বেয়ারিং-পোস্টে ছাড়ছে। মন বোঝে না, পাঠিয়ে যাওয়া। আর্য হোটেলের ম্যানেজারের কাছে খবর পাওয়া যায়, আটখানা খাম ফেরত এসেছিল। কোনদিন বা বলে, আজকে দশখানা। পিওন এসে খোঁজাখুঁজি করে: কোথায় অরুণেন্দুবাবু, ডবল চার্জ দিয়ে ফেরত নেবেন বেয়ারিং-চিঠি। ম্যানেজারকে শেখানো আছে, সে উড়িয়ে দেয়: অরুণেন্দু বলে কেউ হোটেলে থাকে না, ও-নামের কোন লোক জানা নেই।

দরখাস্ত লিখে লিখে আঙুলে ব্যথা—ডাকের দরখাস্তে কিছু হয় না, বহুদর্শী জয়ন্ত ঠিক কথাই বলে। বিধাতা পা নামক যুগল-যন্ত্র দিয়েছেন, সেই বস্তু অতএব হন্দমুন্দ চালিয়ে দেখ। অফিস-পাড়ায় রাস্তা ধরে ধরে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, লেন-বাইলেনও বাদ থাকবে না। হাতে দরখাস্ত নিয়ে দোর ঠেলে সটান একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়া—যে কায়দায় একদা ট্যুইশানি খুঁজত। আন্দাজি ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে লক্ষ্যে ভাগ্যক্রমে লেগেও তো যেতে পারে।

ইতিমধ্যে চাঁদমোহন বলে একজনের সঙ্গে ভাবসাব হয়েছে। চাখানা চালায় সে, নিজ নামে চাখানার নাম—চাঁদমোহন-কেবিন। ঘোরতর আড্ডাধারী মানুষ—জয়ন্ত দের দোকানের খদ্দের।

পিছনের ছোট ঘরটায় চাঁদমোহন শোয়, সেইখানে জয়ন্ত একদিন অরুণকে নিয়ে গেল। বলে, কাজের কথা আগে সেরে নিই। অরুণের চাকরি না হওয়া পর্যন্ত শোবার জন্য মেঝের উপর একটু জায়গা এবং স্যুটকেশ ও উমেদারি-খাতার জন্য তাকের উপর সামান্য একটু জায়গার আবশ্যক।

চাঁদমোহন ঘাড় নেড়ে দেয়: চলে আসুন, চারজনে শুই—চারের জায়গায় পাঁচ হলাম, এ আর বেশি কথা কী।

দুম করে তার ঘাড়ে এক ঘুসি। ঘুসি মেরে জয়ন্ত বলে, 'চলে আসুন' কি রে—গুরুঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিস? 'চলে আয়' বলবি, পয়লা দিন 'চলে এসো'তে না-হয় রফা করা গেল।

চাঁদমোহন বলে, ওই চেহারা তায় অত বিদ্যে—বেরুতে চায় না মুখ দিয়ে, জিভে আটকে আটকে যাচ্ছে।

অশেষ অধ্যবসায়ে তারপরে যেন মুখ থেকে ধাক্কা দিয়ে 'তুমি' বের করে দিল:

কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে তুমি যাবেই। সেদিন চাঁদমোহন-কেবিনকে ভুলে যেও না, লুকিয়েচুরিয়ে এসো এক-আধবার।

পয়লা দিনের কথাবার্তা এই। মাস দুই-তিনের মধ্যে অরুণেন্দু নিদারুণ রকম জমিয়ে তুলল। চাঁদমোহন বলে, কোন শালা বলবে যে তুই বিদ্বান।

সত্যি?

উল্লাসে দু-পাটি দাঁত মেলে অরুণেন্দু বলে, আরও একবার বলু ভাই, ভাল করে শুনে নিই। শুনে ভরসা আসুক।

আড্ডায় জয়ন্তকে একদিন হাজির পেয়ে বলল, চাঁদমোহন কি বলছে স্বকর্ণে শুনে নে। এর পরেও বিদ্যের খোঁটা দিবি তো ধড় থেকে মুণ্ডু মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলব।

চতুর্দিকে একবার নজর ফেলে সগর্বে অরুণ বলছে, 'ক'-লিখতে কলম ভাঙে, আমি তাদেরই একজন—কথাবার্তার ঢঙে তেমনি নাকি মালুম হয়। পেটের মধ্যে ডুবুরি নামিয়েও নাকি এক কাঁচ্চা বিদ্যের হদিস পাওয়া যাবে না। চাঁদমোহনের তাই অভিমত।

চাঁদমোহন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়ঃ হ্যাঁ, সত্যি—

রেগে জয়ন্ত বলে, সত্যি কখনো বলেছিস তুই জীবনে?

বিশ্বাস করবি নে, কিন্তু বলে থাকি অবরে-সবরে। অরুণকে নিয়ে এই একটা যেমন বললাম। মুখ ফসকে সত্যি হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, ঠেকানো যায় না।

জোর দিয়ে চাঁদমোহন আবার বলল, অরুণের বিদ্যে আছে সেটা মিথ্যে। আরও জবর মিথ্যে, অরুণের চাকরি-বাকরি নেই। বেকারের এত রংতামাসা ফুর্তিফার্তি আসে না।

পিছনে একটু ব্যাপার আছে, জয়ন্তকে এত সব শোনানো সেই জন্য। দাঁড়িপাল্লা ধরে জয়ন্ত মাল মাপামাপি করে বটে, তা বলে নিতান্ত হ্যাক-থু চাকরি নয়। রীতিমতো দু-পয়সা আছে। মালিক না হয়েও দোকানের সর্বেসর্বা সে এখন। লড়াইয়ের আমল থেকে সরল পথের ব্যাপার-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। মালিকমশায় ভীতু লোক—কখন পুলিশ এসে পড়ে হাতে-দড়ি দেয়, সেই ভয়ে দোকানের ধারেকাছেও আসেন না। জয়ন্তকে বাড়ি গিয়ে হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হয়। মালিক প্রতিদিন সেই সময় ধর্ম স্মরিয়ে দেনঃ ভেজাল দাও আর মজুত মাল সরিয়ে রাখো, অধর্ম কোরো না বাপু। মালিকের পাওনাগণ্ডার তঞ্চকতা না হয়।

অর্থাৎ জেলে যাওয়ার মধ্যে নেই, মুনাফার বেলা আছেন তিনি। তাই সই—চুটিয়ে জয়ন্ত কাজ-কারবার চালাচ্ছে।

অরুণেন্দু প্রলুব্ধ কণ্ঠে বলে, দোকানের কাজকর্ম আমায় একটা জুটিয়ে দে ভাই।

জয়ন্ত এককথায় উড়িয়ে দেয়ঃ তোর হবে না।

কেন, কি অপরাধ করলাম?

মুখ বেজার করে জয়ন্ত বলল, এক গাদা লেখাপড়া শিখে ফেলেছিস—আমি কি করব?

লেখাপড়া তো গায়ে লেখা থাকে না—

তোর আছে। মুখে বিদ্যের জ্যোতি ফুটে বেরোয়, বিদ্যের গন্ধ গায়ে ভুরভুর করে। চেহারাতেও বলছে, মস্ত দরের মানুষ তুই। এই মানুষ সের-বাটখারা নিয়ে ব্ল্যাকের ময়দা মাপছিস—খদ্দের এগোবেই না কেউ। হোমরা-চোমরা কেউ ছদ্মবেশে ফাঁদ পেতেছে, ধরে নেবে।

বিপন্ন ভাবে অরুণেন্দু বলল, মুশকিল। আচ্ছা, কালো মুখে এটা-ওটা মেখে এন্তার তো সুন্দর হয়ে যায়—ওর উল্টো কিছু বাজারে নেই যা-সমস্ত মেখে ভালো চেহারার মানুষ উৎকট হয়ে যায়?

ভেবেচিন্তে জয়ন্তর তেমন-কিছু মনে পড়ল না।

এতদিন পরে অবশেষে চাঁদমোহনের সাফাই-সাক্ষি মিলে গেল। দিব্যি-দিশেলা করে সে বলছে, বিদ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে চেহারা থেকে। বাইরের চেহারায় চিহ্নমাত্র নেই, এমন কি পেটের ভিতরে তল্লাস করেও নাকি পাওয়া যাবে না।

সগর্বে সবিশেষ শুনিয়ে অরুণেন্দু বলে, এখন? এবারে কি বলে কাটান দিবি?

প্রাণের বন্ধু জয়ন্ত, কাটান কেন সে দিতে যাবে! মালিকমশায়কে ধরে একটুকু জুটিয়েছেও সে ইতিমধ্যে। ইনকামট্যাক্সের খাতা লেখার কাজ। খতিয়ান জাবেদাখাতা ইত্যাদি গোমস্তা দোকানের গদিতে বসে হাতবাক্সর উপর রেখে লেখে। এ জিনিষ একেবারে আলাদা, মালিকের ভিতর-বাড়ি চোরকুঠুরির ভিতর এর লেখার জায়গা।

ল্যাজামুড়ি এবং পাতায় পাতায় মিল রেখে কল্পনার খেল দেখাতে হয়। আমার এই গল্প-রচনারই রকমফের আর কি! পাঠকেরা মুকিয়ে আছেন—পান থেকে চুন খসলে ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবেন। ওঁদের বেলাতেও তেমনি। ইনকামট্যাক্সের কর্তারা তিল পরিমাণ গরমিলে গোড়া ধরে টান মারবেন। দায়িত্বের ব্যাপার—অতিশয় বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন। জয়ন্ত এক সন্ধ্যায় মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অরুণকে চোরকুঠুরিতে বসিয়ে দিয়ে এলো।

চাঁদমোহনের সঙ্গে শোওয়ার ব্যবস্থা—খাওয়ার খরচারও এক রকম সংকুলান হয়ে গেল। আবার কি—অহর্নিশি এবারে লেগে পড়ো চাকরি খোঁজার কাজে।

॥ পাঁচ ॥

সুইংডোর ঠেলে অরুণেন্দু ভিতরে ঢুকল। ভদ্রলোক টেবিলে পা তুলে ঘুরন-চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আঙুলের নখ কাটছিলেন। পা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন: কি চাই?

চাকরি—

কি চাকরি?

যা দেবেন। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া। যা-ই দেবেন সোনামুখ করে নেবো। কাজ দেখিয়ে তার পরে উন্নতি।

কাজ দেখালে উন্নতি—ভদ্রলোক মুখ টিপে হাসলেন। মেজাজে ছিলেন, মানুষটি ভালও বটে। অবোধ কথাবার্তায় মজা লাগছে। বললেন, লোয়ার ডিভিসনের 'ক্লার্ক' নেওয়া হবে জনা চারেক। দরখাস্ত করে দেখতে পারেন, ছাপা ফরম, এক টাকা করে দাম। কিনতে গিয়ে কিছু বাজেখরচ আছে, ধরে নিন আরও এক টাকা। নয়তো ফরম ফুরিয়ে গেছে, পিওন বলে দেবে। যাকগে আমিই আনিয়ে দিচ্ছি, বাড়তি টাকা লাগবে না।

স্লিপে কী-একটু লিখে টাকা-সহ পাঠিয়ে দিলেন, একটু পরে ফরম এসে পেঁছিল।

লোকটি বললেন, পূরণ করে অফিসে জমা দিয়ে দেবেন। রসিদ নিয়ে নেবেন। সে-ও নির্ঝঞ্জাটে হবে না বোধহয়। কাজ নেই, আমার হাতে দিয়ে যাবেন। সোমবারে শেষ তারিখে, তার মধ্যে।

কাজ ঝুলিয়ে রাখবে, তেমন উমেদারির অরুণেন্দুর নয়। এখনই—এই মুহূর্তে। বেলা তিনটে, ঘড়ি দেখে নিল। তাড়িবাড়ি এখানকার দরখাস্ত সেরে আরও দু-জায়গায় ঢুঁ মারবে অফিস-ছুটির ভিতরে। পকেটবুকে তাই ছকে এনেছে।

ফরম পূরণ করে সামনে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করে: এবারে?

জুতোর দোকানে গিয়ে জুতো কিনে ফেলুন একজোড়া। ভারীসারি, মজবুত সোল।

অরুণ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক বলে যাচ্ছেন, সিলেকসন জানুয়ারিতে, দুটো মাস মাত্র সময়। সংকল্প করে নিন, দু-মাসের মধ্যে জুতো ক্ষয়ে ক্ষয়ে শুকতলা অবধি পেঁছিবে।

বলে হেসে উঠলেন তিনি: নাঃ, উমেদারি লাইনে আপনি নিতান্ত কাঁচা। কোম্পানির সাতজন ডিরেকটর। দু-মাসের নিত্যিদিন সাত বাড়িতে তদ্বির করে ঘুরতে ঘুরতে লোহার জুতোই তো ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চামড়ার জুতো কেন হবে না?

ফরমখানা অরুণেন্দু মেলে ধরল: এই দেখুন—

মোটা হরফের ঘন কালিতে ছাপা রয়েছে: ক্যানভাসিং কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ, উমেদার কেউ ক্যানভাসিং-এ গেলে দরখাস্ত নামঞ্জুর হবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমরাই ছেপে দিয়েছি—আপনাদের উপকারার্থে। ক্যানভাসিং নামে গুরুতর এক বস্তু আছে, পাছে ভুলে বসে থাকেন। বিনি ক্যানভাসিং-এ শুধুমাত্র কোয়ালিফিকেসনের জোরে কারো চাকরি হয় না, একটা বাচ্চা ছেলে অবধি তা জানে।

কত কত আজব বিষয় নিয়ে ক্লাস খুলছে আজকাল—পরীক্ষা নেয়, ডিপ্লোমা দেয়। আমাদের শশী মুদ্রণকর্মের ডিপ্লোমা নিয়েছে, হাবুল সাংবাদিকতার। অধ্যাপক হয়ে ঐ ঐ ক্লাসের যাঁরা পাঠ দিয়ে থাকেন, নিজেরা কোথায় পাঠ নিয়েছিলেন জবাব দিতে পারবেন না। জন-হিতে হাল আমলে ঐ সব চালু হচ্ছে। চাকরি-বাকরি পাচ্ছে না—আশাবৃক্ষ পুঁতে জলসেচন করে যাক কোনো একদিন ফললাভ হবে এই আশায়। উমেদারি নিয়েও ক্লাস ও ডিপ্লোমার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অতিশয় জটিল শাস্ত্র, হরেক তার নিয়ম-পদ্ধতি বহুদর্শীরা ঠেকে শিখেছেন, আনাড়ির কাছে খেয়ালমাফিক অল্পসল্প ভাঙেন। যেমন এই একটা। 'ক্যানভাসিং স্ট্রিক্‌টলি প্রোহিবিটেড'-এর যথার্থ মানে: ক্যানভাসিং বস্তুটা অতিশয় জরুরি, ভুলেছ কি মরেছ। ঠিক মতন মানে বোঝে না বলেই উমেদারের ঝামেলা বাড়ে।

এত হৈ-হুল্লোড়ের ছেলে, খানিক খানিক কী রকম গম্ভীর হয়ে পড়ে। ভাবে চুপচাপ। জয়ন্তর কষ্ট হয়। বলে, ঘাবড়াস নে, চেষ্টা করে যা, নিশ্চয় হবে।

অরুণ ক্ষেপে উঠল: মাতব্বরি করবি নে, বুড়োদাদার মতন মাথায় হাত বুলানো সহ্য হয় না। বচন ছাড়ুকগে সেই শালারা চাকরি-বাকরি মান-প্রতিপত্তি টাকা-পয়সা যারা কবজা করে বসে আছে।

এমন কথাবার্তা স্বভাবেই নয় বলে মুহূর্তে আবার সে পূর্ববৎ। জয়ন্তর সুরে সুর মিলিয়ে বলল, হবেই চাকরি—না হয়ে যাবে কোথায়? কায়দা রপ্ত হয়ে এসেছে—চেষ্টা কারে কয়, দেখিয়ে দেবো এবার। চাকরি পেয়ে এভাবে থাকা চলবে না—তাই তো, তাই তো—

হেসে বলে, সামনের ঐ দোতলা ফ্লাটে উঠে যাব। ফ্লাটের জিনিস সমস্ত তুই

সরবরাহ করিস। আর দোতলা থেকে হাঁক ছাড়ব, চাঁদমোহন খাবার-দাবার পাঠিয়ে দেবে।

জয়ন্ত বলে, বেকার থেকে থেকে কবি হলি যে হতভাগা। স্বপ্ন দেখছিস।

অরুণেন্দু বলে, সিনেমা দেখতে পয়সা লাগে, স্বপ্ন নিখরচায় দেখা যায়। দিব্যদৃষ্টি খুলে যাচ্ছে আমার—জীবনটাই স্বপ্ন। সুবিধা বুঝে পালটাপালটি করে ফেলছি আমি। যা-কিছু ঘটছে বলে জানি—এই চলাফেরা, চাকরির উমেদারি, মানুষকে আমড়াগাছি করা—সমস্ত অলীক। স্বপ্নই সত্য।

জয়ন্ত বলে, কিছু আশা নেই তোর ভাই। নজরটা বড্ড ছোট। স্বপ্নেই খেলি তো চিঁড়ে-মুড়ি কেন খাবি হতভাগা—পোলাও-কালিয়ায় বাধাটা কি? বাসা করলি তো আমাদের এঁদোপাড়ার মধ্যে কেন, চৌরঙ্গির উৎকৃষ্ট ফ্লাট নিবি। লাঞ্চ খাবি তো চাঁদ-কেবিনে কেন, পাঁচতারা-ওয়ালা বড় হোটেলে টেলিফোনে ফরমাস করবি।

অরুণেন্দু চিন্তিত ভাবে বলে, ফোন পেয়ে পাঠাবে তারা চাঁদমোহনের মতো?

পাঠাবে তো বটেই। কিন্তু কখন পাঠাবে সেই ভরসায় আছিস নাকি তুই? ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ছুটবে।

অরুণেন্দু তর্ক করে: গাড়ি তো ছেলেপুলে নিয়ে ইস্কুলে বেরিয়ে গেছে।

আ আমার কপাল, গাড়ি একখানা কেন হবে! অসুবিধা যখন, দুটো-তিনটে কিনলেই তো হয়।

হুঁশ হল অরুণের এবার: বটেই তো! দাম যখন লাগছে না, তিনটে কেন পুরো এক ডজন কিনে রাখা যাক। সত্যি বলেছিস জয়ন্ত। মনে মনে সমস্ত হল, কিন্তু নজর কিছুতে বড় হচ্ছে না।

চাঁদমোহন-কেবিনে হঠাৎ একদিন পূর্ণেন্দুর আবির্ভাব। দিনমানের উমেদারি সেরে সন্ধ্যাবেলা অরুণ এক কাপ চা খেয়ে নেয় এখানে, তারপর খাতা লিখতে গিয়ে বসে। নিত্যিদিনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন এসে দেখল, বাইরের বেঞ্চিখানায় পূর্ণেন্দু তার অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

ভূত দেখে লোকে আঁতকে ওঠে, অরুণেরও তাই।

দাদা?

রেলে আসার তো খরচা নেই, যখন-তখন আসতে পারি। এলে তুই বেজার হবি, সেই ভয়ে আসি নে।

ঠিকানা কি করে পেলে?

পূর্ণেন্দু মুখ টিপে হেসে বলল, আচায্যিঠাকুর খড়ি পেতে বলে দিলেন।

জয়ন্তর জেঠতুত-ভাই হলধর বিড়ি কিনতে গিয়েছিল, বিড়ি ধরিয়ে পূর্ণেন্দুর পাশে এসে বসল। ঠিকানা পাওয়ার রহস্য সেই মুহূর্তে পরিষ্কার। হলধর গ্রামে থাকে, কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে জয়ন্তর সঙ্গে চা খেয়ে গিয়েছিল এখান থেকে। অরুণেন্দু সেই সময়টা ছিল। পূর্ণেন্দুকে হদিস দিয়ে হলধরই সঙ্গে করে এনেছে, সন্দেহমাত্র নেই।

অরুণ বলে, তাই তো বলি! আচায্যিঠাকুর খড়ি পাতলে উল্টো ঠিকানা বেরিয়ে আসত। পাঁচঘরার আত্মারাম আচায্যি আর আলিপুরের আবহাওয়া-অফিস যা বলবেন, হবে ঠিক তার উল্টোটি।

আত্মারাম আচার্য যশোদার গুরুঠাকুর, তাঁরই কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। গুরু-

ঠাকুরের নির্দেশ পূর্ণ চটে যায় ঃ কোনটা তিনি উল্টো বলেছেন শুনি ?

বলেছিলেন, সম্রাট শাহানশা হবো আমি, টাকার আন্ডিলের উপর বসে থাকব।

হবি তাই। সময় কি বয়ে গেল ?

সগর্বে পূর্ণেন্দু বলতে লাগল, অঢেল লেখাপড়া শিখবি—তা-ও বলেছিলেন। পাঠশালার আটআনা মাইনেই জুটত না—মা বিশ্বাস করেন নি তখন। ঠাকুরমশায় বলেছিলেন, দেখো তোমরা—মিলিয়ে নিও। তা সর্বজনে দেখুক আজ মিলিয়ে মিলিয়ে। বি-এ পাশের গ্রাজুয়েট শুধু নয়, ভাই আমার এম-এ।

তা-ও কানে গেছে তোমার ?

কটমট করে অরুণ হলধরের দিকে তাকায় ঃ সমস্ত গিয়ে লাগিয়েছেন—কিছুই বাদ দেন নি ? চায়ের সঙ্গে জয়ন্ত সেদিন পকৌড়ি-ভাজা এনে খাইয়েছিল। তা-ও বোধহয় বলেছেন ?

পূর্ণেন্দু বলে, এম-এ পাশ আর পকৌড়ি-ভাজা এক জিনিষ হল ?

এক কেন হবে দাদা। পকৌড়ি খেয়ে সস্তায় পেট ভরানো যায়। আর এম-এ পাশের যে কাগজখানা দেবে, পুড়িয়ে চায়ের জল গরম হতে পারে বড়জোর—আর কোন কাজে আসে না।

য়ুনিভার্সিটি-হলে কনভোকেশন। কী জাঁকজমক—ইন্দ্রপুরী করে সাজিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত এসেছেন বক্তৃতা করার জন্য, গভর্নর এসেছেন। দেশের মাথা মাথা যাঁরা, কারো আসতে বড় বাকি নেই। লাইন করে দিয়েছে, ছেলেমেয়েরা একে একে এসে উপাধি-পত্র নিয়ে যাবে।

হঠাৎ বজ্রপাত সভার মধ্যে।

চিরশান্ত ছেলেটা ফুঁসে ওঠে—প্ল্যাটফরমে উঠে পড়ে মাইক টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসে ঃ ডিগ্রি চাই নে, চাকরি চাই—খেয়েপরে বাঁচতে চাই।

শত শত কন্ঠের প্রতিধ্বনি ঃ চাকরি চাই, চাকরি চাই—। তারপর উপাধিপত্র ছিঁড়ে হুড-গাউন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। সভা লন্ডভন্ড—বিশ্বপন্ডিতের বক্তৃতা জমল না। চাকরি দাও, চাকরি দাও—ধ্বনিতে য়ুনিভার্সিটির হল-বারান্দা ভেঙে চৌচির হয়ে যায় বুঝি। গভর্নর ঘাড় নিচু করে গাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা এঁটে দিলেন।

ছবিটা চকিতে অরুণেন্দুর মনের উপর দিয়ে যায়। সেদিন চোখে দেখে এসেছিল, হাড়ে মাসে বুঝে নিয়েছে এখন। যেন ভারি একটা লজ্জার কাজ করে বসেছে—মুখে বেকুবির হাসি নিয়ে হাত কচলে অরুণ ভাইয়ের কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছে ঃ নেই কাজ তো খই ভাজ—হঠাৎ হয়ে গেল দাদা। রাত এগারোটা বারোটা অবধি চাঁদমোহনরা এইখানে বসে আড্ডা জমায়—অত আমি পেরে উঠি নে। একলা ঘরে কী করি—এর ওর বই চেয়েচিন্তে চোখ বুলাতাম। টের পেয়ে জয়ন্তটা ঘাড়ে লাগল, নিজের থেকে ফী জমা দিয়ে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসিয়ে তবে ছাড়ল। দশচক্রে ভগবান ভূত বানাল।

চাঁদমোহন খদ্দেরকে চা দিচ্ছিল, এগিয়ে এসে কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটে ঃ বিশ্বাস করবেন না দাদা, পড়েছে মোটমাট পনের কি বিশটা দিন। বাজি ধরেছিলাম, যদি তুই পাশ করিস এইসা একজোড়া কবিরাজি-কাটলেট নিজ হাতে বানিয়ে খাওয়াব। হতভাগাটা তাই খেয়ে তবে ছাড়ল।

অরুণ সদম্ভে বলে, ধর বাজি আবার। ফী-টি গুলো তোরাই দিবি। ফের একদফা এম-এ পাশ করে দেখাই। এম-এ বলে কথা কি—যেটা বলবি, তাতেই পাশ করব।

দুই কাটলেট হেরে বাজিতে চাঁদমোহনের আর অভিরুচি নেই। বলে, রক্ষে কর, পরীক্ষায় পাশ-করা ডাল-ভাত তোর কাছে—একবারেই ভাল মতো বুঝে নিয়েছি। আর আমার এক ছোটকাকা ছিল—সাত সাতবার সে ফাইন্যালে বসেছে। বিয়ে হল, ছেলে হল—সেই ছেলে যখন ইস্কুলে ঢুকল, লজ্জায় তখনই ইস্তফা দিয়ে দিল। কী পড়াটাই না পড়ত ছোটকাকা! রাত দুপুরে উঠে সকাল অবধি একটানা গলা ফাটিয়ে চেঁচাত—ঘুমের মধ্যে সর্বক্ষণ শুনতাম। সেই থেকে পরীক্ষায় আতঙ্ক জন্মে গেল, ওপথে বেশি আর এগোলাম না।

বাজে গৌরচন্দ্রিকার পরে পূর্ণেন্দু এইবার আসল কথায় এলো, যার জন্য ভায়ের খোঁজে খোঁজে এন্দুর—এই চাঁদমোহন-কেবিন অবধি ধাওয়া করেছে। অরুণের হাত ধরে টান দিল: চল আমার সঙ্গে, কিছু কেনাকাটা করব।

ঘাড় নেড়ে অরুণ বলে, এখন হবে না তো দাদা, কাজ আছে।

জানি, খাতা-লেখার চাকরি। ইচ্ছে মতন কামাই করতে পারবি নে—তবে আবার চাকরি কিসের? সে তো দিনমজুরি।

যা-চ্চলে, সবই তুমি জানো দাদা। ঐ একবার দেখায় হলধর-দা অন্ধিসন্ধি সমস্ত জেনে গিয়েছেন?

পূর্ণেন্দু বলে, জ্বর হয়েছে তোর, যেতে পারলি নে—জয়ন্ত বলে দেবে। চল—

দু-ভাই কাপড়ের দোকানে ঢুকল: একটা থান-ধুতি আর শাড়ি একখানা। খেলো জিনিস না হয়, আবার মেলা দামের হলেও চলবে না।

কাপড় কেনার পর পোশাকের দোকানে: দু-মাসের বাচ্চার উপযোগী একটুকু জামা আর জাঙিয়া।

অরুণেন্দু বলে, কাপড় তো বুঝলাম মার আর বউদির। জামা কার জন্যে?

তোর বউদির মেয়ে হয়েছে যে!

অরুণেন্দু আহত কণ্ঠে বলে, এত বড় একটা খবর—আমি কিছু জানি নে!

ভাইয়ের মুখের দিকে পূর্ণেন্দু তাকিয়ে পড়ল: ও, বড় খবর এইটে! বিয়ে করলে ছেলেমেয়ে হয়—সব ঘরেই হয়ে থাকে। কিন্তু এম-এ পাশ ক'জনের ঘরে শুনি। সে খবর দিয়েছিলি তুই?

দোকান থেকে রাস্তায় নেমেছে, তখনো পূর্ণেন্দু গজরাচ্ছে: দুটো বছর কাটতে চলল, একবার তুই বাড়িমুখো হোস নি। একটা পোস্টকার্ড লিখেও খবর নেবার পিত্যেশ নেই। ভাগ্যিস হলধরের সঙ্গে দেখা, কথায় কথায় তোর কথা উঠল, কলকাতার অকূল সমুদ্দুরে তাই খুঁজে বের করলাম। আবার এখন মুখ নেড়ে ঝগড়া করছে দেখ।

কমলালেবু কিনল সে এক টাকার। বড় দুটো ফুলকপি কিনল। মিষ্টির দোকানে ঢুকে সন্দেশ কিনল।

চোখ বড় বড় করে অরুণ বলে, ও দাদা হল কি তোমার—দু-হাতে খরচ করতে লেগেছে, এমন তো কখনো দেখি নি।

পূর্ণ বলে, এখন তো নিজেরা শুধু নই—পরের মেয়ে, তোর বউদি সংসারে এসেছে। সে এসে পোঁটলাপুঁটলি হাতড়াবে, মার বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে জিনিস

দেখাবে। চাকরে-ভাই এদ্দিন বাদে বাড়ি যাচ্ছিস—খালি-হাতে উঠবি কেমন করে?

স্তম্ভিত হয়ে অরুণ বলে, বাড়ি যাচ্ছি আমি?

হ্যাঁ—

আমি চাকরে-ভাই?

পূর্ণ বলে, চাকরি করিস—সে কি মিথ্যে?

ঠিক ঠিক, দু-ঘন্টা খাতা লিখি—সেটা চাকরিই বটে। হলধর-দা চাকরির খবর তো দিয়েছে, মাইনের খবর দেয় নি? তা-ও তো জয়ন্তর কাছে শুনে নিতে পারত।

পূর্ণ বলে, মাইনের খবরে কি হবে, কেনাকাটা তোর পয়সায় তো করতে বলি নি।

থমকে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে অরুণেন্দু বলল, বাড়ি আমি যাবে না।

কেন, কি হল?

নতুন কিছু নয়, যে কারণে এই দুটো বছর বাড়ি যেতে পারি নি। ভাই-ভাজ-ভাইঝি-মা সকলের জন্য সাধ মিটিয়ে যেদিন কেনাকাটা করতে পারব, বাড়ি যাবো সেই সময়। চাকরে হীরালালজেঠা যেমন বাড়ি যেতেন।

সেকেলে কাহিনীটা চকিতে মন ছুঁয়ে গেল। হীরালাল-জেঠা পুজোর সময় বাড়ি আসতেন। কোন মার্চেন্ট-অফিসের বড়বাবু তিনি। ছয় ক্রোশ দূরে রেল-স্টেশন, স্টেশন থেকে ঘোড়ার-গাড়ি ভাড়া করে আসেন। গাড়ির আষ্টেপিষ্টে জিনিস বোঝাই —জিনিসপত্রের আন্ডিলের মধ্যে হীরালাল গোলাকার এতটুকু হয়ে বসতেন, চোখেই পড়েন না তিনি, বিস্তর ঠাহর করে তবে দেখতে হয়।

বাইরে-বাড়ির উঠানে গাড়ি এসে থামল, খোপ থেকে বেরিয়ে হীরালাল খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। তালবৃক্ষের মতন দীর্ঘ দশাসই পুরুষ। জিনিসপত্র চতুর্দিকে নামিয়ে স্তূপাকার করেছে। গাঁয়ের মানুষ আসতে কারো বাকি নেই। কী বৃত্তান্ত, না, চাকরে হীরালাল বাড়ি এলেন। ঘোড়ার-গাড়ির ছাত থেকে কাপড়ের বড় গাঁটটা নামাল। বাড়ির সবাই তো বটেই—এবাড়ি-ওবাড়ির বুড়ো-বুড়িরা, গুরু-পুরুত কামার-কুমোর ধোপা-পরামাণিক চাকর-মাহিন্দার কাপড়ে কেউ বঞ্চিত হবে না। দিন দশেক হীরালাল-জেঠা বাড়ি থাকবেন—বাড়িতে অহরহ মচ্ছব। চাকরে-মানুষটি বাড়ি এসেছেন, পরিচয় দিয়ে বলতে হবে না—উঠানে পা ফেলেই মালুম পাওয়া যাবে। অরুণেন্দু খুব ছোট তখন, নিজের তেমন-কিছু মনে নেই—যশোদার মুখে গল্প শুনত হীরালাল-জেঠার বাড়ি আসার কথা। ছবি হয়ে মনে তাই গাঁথা রয়েছে।

অরুণেন্দু বেঁকে বসল: না দাদা, আমি যাবো না। টানাটানি করো যদি, এমনি ডুব দেবো নিশানাই পাবে না আমার। কলকাতা ছেড়ে দূর-দূরান্তর পালাব।

উত্তেজিত হয়েছে খুব। কাছেই পার্ক, দু-ভাই একটা বেঞ্চি নিয়ে বসল। অরুণ বলে, পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে মা আমার পথ তাকাচ্ছেন, নতুন-মা হয়ে বউদিরও ইচ্ছে আপনজনেরা এসে পড়ে আমোদআহলাদ করুক। সমস্ত জানি দাদা, সাধ-আহলাদ আমার মনেও আসে। একছুটে বাড়ি গিয়ে উঠি, কত সময় ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু পড়ার সময়টা সবাই তোমরা কী চোখে দেখতে আমায়, কতরকম প্রত্যাশা করেছিলে—কোন লজ্জায় এখন আমি থোঁতামুখ ভোঁতা করে দাঁড়াব।

একটা লেবু খোসা ছাড়িয়ে পূর্ণ ভাইকে খাওয়াচ্ছে—দুটো একটা কোয়া নিজেও গালে ফেলছে, নয় তো অরুণ খাবে না। সন্দেশ বের করে ভইয়ের হাতে দিল, সে

আবার এতটুকু ভেঙে পূর্ণেন্দুর মুখে পুরে দিল। অনেককাল আগে দু-ভাই মিলেমিশে এমনি করে খেতো।

পূর্ণেন্দু বোঝাচ্ছেঃ মাকে সামলানো যাচ্ছে না রে ভাই। তাঁর বিদ্বান ছেলে কাজকর্ম না পেয়ে বেকার হয়ে ঘুরছে, তামা-তুলসি ছুঁয়ে বললেও মা মেনে নেবেন না। ওঁদের সেই সেকালের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছেনঃ শহরে গেলেই চাকরি, আর যেমন-তেমন চাকরি মানে দুধ-ভাত। বিশ্বাস কিছুতেই টলানো যাবে না। কাজকর্ম মেলা-মেশার মধ্যে থাকলে খানিকটা হয়তো ভুলে থাকতে পারতেন—শুয়ে শুয়ে কেবল তোরই চিন্তা সর্বক্ষণ। কুপুত্র তুই, দিনকে-দিন মাথায় ঢুকছে—আমাদের সকলকে ছেড়ে শহরের উপর সুখে-স্বচ্ছন্দে আছিস নাকি তুই। শরীরের যা দশা, যখন তখন মারা যেতে পারেন। বুকে দাগা নিয়ে যাবেন মা আমাদের।

হাত জড়িয়ে ধরল সে অরুণেন্দুরঃ একটিবার না গেলে হবে না তো ভাই। হঠাৎ একদিন ঘরে ঢুকে দেখি, মা চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন—দু-চোখে দরদর করে জল গড়াচ্ছে। তখন জেদ চেপে গেল, আনবোই তোকে বাড়িতে। খোঁজ করে করে কত কষ্টে এসে ধরেছি।

ঝিম হয়ে থাকল অরুণেন্দু। তারপর হেসে ওঠেঃ সকলের কাপড়-জামা, কেবল আমার দাদার জন্যে কিছু নয়। যে দাদা হাত চেপে ধরে একদিন প্রেসিডেন্সিতে পড়বার জন্য কলকাতা পাঠিয়েছিল, আজকে আবার হাত চেপে ধরে বাড়ি নিয়ে চলল। অরুণের নিন্দেয় পাড়াময় ছি-ছি পড়বে, দাদা হয়ে সেটা তুমি কেমন করে হতে দেবে!

দ্রুত সে আবার কাপড়ের দোকানে ঢুকে একটা ধুতি কিনল। জরি-পাড় শান্তিপুরে শৌখিন ধুতি। পূর্ণেন্দু মনিব্যাগ বের করতে যাচ্ছিল, অরুণ তাড়া দিয়ে উঠলঃ খবরদার! সব কথায় তুমি হাত জড়িয়ে ধরো, এবারে কিছুতে শুনব না।

ব্যাগ পকেটে ফেলে পূর্ণেন্দু হেসে বলে, জরি-পাড় ধুতি পরি আমি কখনো?

ধুতিই পরো না, যা-হোক একটু নেংটি মতন পরে বেড়াও। কিন্তু চাকরে-ভাই দিচ্ছে, ফেলে তো দিতে পারবে না। কপালে আছে—কষ্টেসৃষ্টে পরো জরি-পাড় ধুতি, কী করবে!

॥ ছয় ॥

স্টেশনে এসে টিকিট কিনছে। অরুণেন্দু বলে, একটা কেন দাদা?

পূর্ণেন্দু বলে, রেলগাড়ি আমাদেরই—আমি কেন টিকিট করব? প্লাটফরম-টিকিট একটা না-হয় কেনা যাক।

তা-ও কিনল না, কিনতে গিয়ে ফিরে এলো। বলে, কেন লাগবে—চোখ টিপে দিলেই হয়ে যাবে, মনে হয়। কলকাতায় আসা-যাওয়া নেই, সঠিক জানিনে। তা হলেও এক রেলগাড়ি, একই লাইন—আমাদের ওদিকে হয় তো এখানেই বা না হবে কেন? দেখি—

রেলগাড়ি আমাদের—বলে পূর্ণেন্দু সরকারি রেলগাড়ির উপরে স্বত্ব-স্বামিত্ব ঘোষণা করল। একটি বর্ণ মিথ্যা নয়, ক'টা স্টেশন পার হতেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে। দিব্যি একটা দল ওদের—চোখ-টেপাটিপি, ঠারেঠোরে কথাবার্তা, মাঝেমধ্যে দাদা চাচা মামা ইত্যাকার ডাকাডাকিও আছে। অদ্ভুত তুখোড় মানুষগুলো—মানুষের চেয়ে বরঞ্চ কাঠবিড়ালি-টিকটিকি-নেংটিইঁদুরের সঙ্গে মিলটা বেশি। ঘরব্যাভারি আমাদের পূর্ণেন্দু আর রেলের-ফড়ে এখনকার এই পুরুষ—দুটো মানুষ একেবারে আলাদা।

রেলগাড়িতে উঠে লহমার মধ্যে কেমন বদলে যায়। কামরার ভিতরে বেঞ্চির উপর বসে চলাচল নয়—দৈবেসৈবে ঢুকে গেল তো দাঁড়িয়ে থাকবে। ভদ্র হয়ে বসা অনভ্যাসে, খুব সম্ভব, ভুলে গেছে। মানুষ নয়, একদল কাঠবিড়ালি পিলপিল করে চলতি গাড়ির গা গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। চলে গেল উই ইঞ্জিন অবধি, ফিরে এলো। পাদানি নেই, দুটো পা-ই শূন্যমার্গে—জানলার রডে ঝুল খেয়ে পড়ে চলাচল। কখনো বা ফুড়ুত করে অদৃশ্য হল তলদেশে—চাকার অন্ধিসন্ধিতে নেংটি-ইঁদুরের মতন বেড়াচ্ছে। ছাতের উপরেই বা উঠে পড়ল, তিড়িং-মিড়িং করে এ-ছাতে ও-ছাতে লম্ফ দিয়ে বেড়ায়। পাশপোর্ট রে হেনো রে তেনো রে, কত না বিধিনিষেধ—কাস্টমসের কত না কড়াকড়ি! ঘোড়ার-ডিম—দেখে আসুন ফলাও কাজকারবার চলছে কেমন। গাড়ির আগাপাস্তলা জুড়ে গুপ্তভান্ডার। যে দেয়ালটা ঠেশ দিয়ে আছেন, কে জানে, ঢিলে ইস্ক্রুপটা তুলে কাঠখানা সরিয়ে দিলে হয়তো লবঙ্গর থলে বেরিয়ে পড়বে। অথবা এক ডজন রিস্টওয়াচ। চারিদিক কাঁপিয়ে রেলগাড়ি ঘোরবেগে ছুটেছে, সড়াক সড়াক করে পুলগুলো পার হয়ে যাচ্ছে—এরই মধ্যে নিশিরাত্রে এমনও হয়ে থাকে, চলন্ত চাকার মাঝে রডের উপর হাত-পা ছড়িয়ে টান-টান হয়ে কেউ শুয়ে পড়ল। দুই পাটির মধ্যে নুড়ি ঢালা—হাতখানা সামান্য নেমে গেলেই নুড়িতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। রডের আরামের শয্যায় একচুল এদিক-ওদিক হলে পড়ে গিয়ে খানিকটা মাংসপিন্ড ছাড়া কিছু আর অবশিষ্ট নেই। অতশত কে এখন ভাবে—অবাধ্য চোখ দুটো ঘুমের ভারে ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ হয়ে যায়। রেলের বাবুরা দেখেও এ সমস্ত দেখেন না। আঙুল দেখিয়ে দিলেও উদার হাসি হাসেন ঃ যেতে দিন না মশায়। আপনার ঘরের মধ্যেও তো ইঁদুর-আরশুলায় উৎপাত করে বেড়ায়, কী করে থাকেন? উদ্বাস্তুর বেদনায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যের হাসি—কলিযুগের পাপমতিরা অবশ্য বিশ্বাস করতে চায় না।

পূর্ণেন্দু এদেরই একজন। যশোদারই মতো বেঁটেখাটো ছেলেটি, দৌড়ঝাঁপের তাই সুবিধা হয়েছে। বাড়ির লোকে কাজকারবারের তবু তো পুরো চেহারাটা জানে না। ঘরের ভিতর হোগলার বেড়ার গায়ে বড়-ছোট দেবদেবীদের ছবি—লক্ষ্মী কালী গণেশ শিবদুর্গা হনুমান সরস্বতী ঘন্টাকর্ণ রামলক্ষ্মণ—মেলার বাজারে ও পাঁজির পাতায় যা-সমস্ত পাওয়া যায়। কাজে বেরুচ্ছে পূর্ণ, মলিনা তখন চতুর্দিকের পটে পটে মাথা ঠেকিয়ে ঘুরছে। আর ও-ঘরে শুয়ে শুয়ে যশোদা বিড়বিড় করছেন ঃ আমার পুন্নকে সুভালাভালি ফিরিয়ে এনে দিও ঠাকুর-ঠাকরুনেরা।

প্রতিদিনের এই নিয়ম—যে দিনটা যায়, সেই দিন ভালো।

ও পুন্নর মা, অরু কী নিয়ে এলো দেখতে এলাম—

আত্মারাম আচার্যের বউ নিস্তারিণীর গলা। অরুণেন্দু আজ বেলা করে উঠে আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে ডোবার ঘাটে যাচ্ছিল, ঘর-কানাচে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চাকরে-ছেলে আনল কি তোমাদের জন্যে?

যশোদা বললেন, বাচ্চা-খুকুর জন্যে জামা এনেছে। কাপড় সকলকার জন্যে। সন্দেশ আর কমলালেবু এনেছে। কপি আমি ভাল খাই, তা-ও দেখি দুটো হাতে করে এসেছে। বওয়াবয়ি করে বেশি কী আনতে যাবে। বায়না ধরেছে, কলকাতায় চলো, কলকাতায় বড় বড় ডাক্তার দিয়ে ভাল মতন চিকিচ্ছে-পত্তোর করাব।

[জপতপের উপর আছেন মা-জননী, শুয়ে শুয়েও ছাড়েন না—তারই মধ্যে মিথ্যে

বানাচ্ছেন কেমন দেখ। বাঘা নভেলিস্টও হেরে ভূত হয়ে যাবে।]

নিস্তারিণী বলেন, এক্ষুনি চলে যাও দিদি—এক্ষুনি, এক্ষুনি। আজ হয় তো কালকের জন্য দেরি কোরো না। আজকের মানুষ নই আমি—ঘরবাড়ি জমিজিরেত বাগান-পুকুর নিয়ে তোমাদের কত বড় গৃহস্থালী! নারকেল পেড়ে পেড়ে মাহিন্দারে এক-মানুষ সমান গাদা করে রাখত, কাঁদি কাঁদি টুকটুকে সুপারি উঠান জুড়ে ছড়িয়ে রাখত রোদে শুকানোর জন্য। এই দুটো চোখে সমস্ত দেখেছি। আবার পোড়ো জায়গায় নড়বড়ে দুটো তালপাতার ঘর—তা-ও এখন দেখতে পাচ্ছি।

জোর দিয়ে আবার বললেন, চলে যাও দিদি, শহরের উপর রাজার হালে থাকবে। নিত্যিদিন গঙ্গাস্নান করবে, মা-কালীর দর্শন পাবে—এমন ভাগ্যি ক'টা মানুষের হয়! ছেলে বলি তোমার পুন্নকে—কী কষ্ট করে ভাইকে মানুষ করল। কষ্ট করেছিল তাই সুখশান্তি এবারে—পায়ের উপর পা চাপিয়ে বসে থাকা। আর আমি দুটো অকালকুষ্মান্ড গর্ভে ধরেছি—পন্ডিত-বাড়ির ছেলে হয়ে বিড়ি বাঁধে, হাটে হাটে বিড়ি বিক্রি করে বেড়ায়।

[বিড়ি বাঁধার কলেজ হয়েছে কোথাও? ডিপ্লোমা দেয়?]

যশোদা অরুণেন্দুর আরও খবর দিচ্ছেন: বি-এ পাশ ছিল তো—সেই বি-এ'রও উপরে, এম-এ পাশ করে ফেলেছে এবার। বিদ্যের আর মুড়োদাঁড়া রইল না।

নিস্তারিণীর প্রশ্ন: অরুর মাইনে কত দিদি? মেলা টাকা নিশ্চয়—শহরের উপর বাসা করে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

অরুণেন্দু দ্রুত ডোবার ঘাটে নেমে থলবল করে মুখ ধুতে লেগেছে। দু-কানে আর শোনা যায় না।

ফিরে আসতেই মলিনা রেকাবিতে লুচি কপির-তরকারি আর বাটিতে মোহনভোগ নিয়ে এলো। বলে, খেতে লাগুন ঠাকুরপো, চা করে আনি। করে রাখিনি জুড়িয়ে যাবে বলে।

অরুণ রাগ করে বলে, চা খাবো না আমি। কোন-কিছুই খাবো না। দাঁড়ান।

থতমত খেয়ে মলিনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী লাগিয়েছেন বলুন দিকি। এমন করলে এখনই পালিয়ে যাবো।

মলিনা ভয় পেয়ে বলে, কী করলাম?

লুচি, মোহনভোগ—রাজসূয় আয়োজন। কুটুম্ব এসেছি যেন বাড়িতে।

কুটুম্ব কেন হবেন, রাজা—

কী না কী ঘটেছে—বউটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয় গিয়ে এবারে ফিক ফিক করে হাসছে। বলে, খুকুর জন্মপত্রিকা হবে বলে মা আচার্যি ঠাকুরমশায়কে খবর দিয়ে এনেছিলেন। সেই একটু সময় এসেও আপনার কথা। বিদ্বান হবেন, রাজা হবেন—আপনার ছোটবেলায় হাত দেখে তিনি বলেছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে সব ফলে যাচ্ছে। এম-এ পাশও তো করে ফেলেছেন এর মধ্যে, আমাদের কিছু জানান নি। বিদ্যের একেবারে চুড়োয় চলে গেছেন।

শুধু চুড়ো কেন বউদি ডালপালাগুলোও বাদ দিচ্ছি নে—

অরুণও হাসতে লাগল। বলে, দাদা চেপেচুপে কম করে আপনাদের বলেছে। যেটা চোখের সামনে পড়ে, পাশ করে যাচ্ছি। কাজকর্মে কখন কোনটা লাগে—পাশ করা রইল, দরকারের সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লোমা মেলে ধরব।

ঘাড় বাঁকিয়ে মলিনা বলল, দেখুন তা হলে। ভাইয়ের জাঁক মিছামিছি করেন না।

অরুণেন্দু বলে, বিদ্বান তো হয়েছি—আর রাজা হওয়ার কদ্দুর কি হল, তার কিছু বলেনি দাদা ?

সোৎসাহে মলিনা বলে, বলেন নি আবার ! চাকরি পেয়ে গেছেন ।

আর ?

বাসা হয়েছে—

অরুণ জুড়ে দিল : পাকা কোঠা—হেঁ হেঁ, খোলার চালা নয় ।

তা-ও বলেছেন । কিচ্ছু বাকি রাখেন নি অইয়ের । কথা বলতে বুক ওঁর ফুলে ওঠে । হাঁকডাক করে পাড়া জানান দিয়ে বলেন ।

বুঝেছি । সাত সকালে আচার্যিঠাকরুন মাঠ ভেঙে তাই মায়ের কাছে এসে বসেছেন । ঠাকুরমশায়ের গণনা কদ্দুর খাটল, স্বচক্ষে দেখে মাপজোপ নিয়ে যাবেন ।

মলিনা খপ করে বলল, অর্ধোদয়ের যোগ আসছে—মাকে সেই সময় গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাবেন । মার বড্ড ইচ্ছে ।

অরুণেন্দু দরাজ । স্বপ্নেই যখন খাচ্ছি, চিড়ে-মুড়ি খেতে যাবো কেন—কোপ্তা-কাবাব পোলাও-রাবড়ি খাবো । বলল, শুধু মা কেন, আপনারাও যাবেন—আপনি, খুকু, দাদা । নিজে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে যাবো ।

দরিদ্র-ঘরের কুরূপ গন্নাকাটা মেয়েটা কী করবে ভেবে পায় না । বলে, আমি কলকাতা দেখিনি ঠাকুরপো ।

সেই কলকাতায় থাকতে হবে এবার থেকে । যোগের চান সেরেই ফিরে আসা নয় আবার এখানে । নিত্যিদিন থাকবেন । দু-ভাই আমরা, মা, আপনি আর খুকু—

আহলাদে আপনহারা হয়ে মলিনা বলে, আরও একজন ।

প্রথমটা অরুণ ধরতে পারে নি, জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল ।

মলিনা বলে, আজকেই বোধহয় মেয়েওয়ালারা কনে দেখার কথা বলতে আসবে । আপনি বাড়ি এসেছেন, সে খবর উনি জানিয়ে দিয়ে গেছেন ।

উনি অর্থাৎ পূর্ণেন্দু । বাড়ি নেই সে, থাকলে একচোট হয়ে যেত । রাত দুটোয় উঠে পূর্ণেন্দু কাজে বেরিয়ে গেছে । কখন ফিরবে বাড়ির লোকে জানে না, সে নিজেও না । আদৌ ফিরবে কিনা, এমনিতরো শঙ্কা অহোরাত্রি আছে । ভাইকে না পেয়ে অরুণেন্দু আপন মনে গজ-গজ করছে । বাড়ির নাম করে দাবানলের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে দাদা কাজে বেরিয়ে গেছে ।

পাড়ার মানুষ একটি দুটি করে দেখা দিতে লাগল । বৃত্তান্তগুলো দেখা যাচ্ছে, ঘরেই শুধু নয়, পাড়া জুড়ে দস্তুরমতো ছাড়ানো । অকস্মাৎ যেন এক বারোয়ারি বস্তু হয়ে পড়েছে সে, যার যেমন খুশি বিশেষণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে । অভিধানের মতে প্রশংসা, কিন্তু গলানো সিসের মতন কানের ছিদ্র পুড়িয়ে সেগুলো ঢোকে । নিরুপায় হয়ে অরুণ কাতর স্বরে 'আজ্ঞে না' 'কী যে বলেন' ইত্যাকার বিনয় প্রকাশ করে যাচ্ছে ।

বেলা বাড়ছে, অবস্থা আরও সঙ্গিন হল । মুখের কথার উপর দিয়ে চলছিল, এর পর মালামাল হাজির হতে লাগল । বীচেকলা নিয়ে এলো একজন । বলে, তোমাদের শহরে চপ মেলে, কাটলেট মেলে, বীচেকলা মিলবে না । ভাতে দিতে বলে যাচ্ছি, খেয়ে দেখো ।

এক গিন্নি দুধের ঘটি সহ রান্নাঘরের সামনে এসে মলিনাকে ডাকলেন : ও বউমা, দুধটুকু পাত্তরে ঢেলে নিয়ে আমার ঘটি অবসর করে দাও । এই মাত্তোর দুয়ে

আনলাম, বাঁটের গরম কার্টোন। শহরে ওরা তো দুধের নামে খড়ি-গোলা জল খায়। এ জিনিষ পাবে কোথায়?

তারিণী মন্ডল এক ভাঁড় খেজুর-রস এনেছে। বলে, চাকরে-ছেলে বাড়ি এসেছে, পুন্ন গিয়ে কাল বলল। ক'টা বাছাই গাছ আছে আমার—দা কোমরে নিয়ে তক্ষুনি উঠে গেলাম। শহরে এসব জোটে না। খেয়ে দেখ, কী রকম মিষ্টি। রস কি গুড় তফাত ধরতে পারবে না।

চোঁচা দৌড় দিলে কেমন হয়, অরুণ এক একবার ভাবছে। জুত হবে না—রে-রে করে পাড়াসুদ্ধ পিছু ছুটবে, ধরে পাছড়ে ফেলে কানের কাছে সারা বেলাস্ত গুণকীর্তন চালাবে। এমনি সময় যশোদা ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিলেন: আমার কাছে আয় একটু বাবা। ঠাকুর আমায় কী দশায় ফেললেন—উঠতে গিয়েছিলাম, মাজার মধ্যে কড়াৎ করে উঠল।

উঠতে হবে না মা, আমি যাচ্ছি—

মায়ের ডাক আশীর্বাদের মতন। মানুষজনের রকমারি বচনে পাগল হবার জো হয়েছিল, ঘরে নিয়ে মা বাঁচিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণ রেহাই নেই অবশ্য, এতগুলো মুখের জায়গায় শুধু এক মায়ের মুখে শুনতে হবে এবার। তা হলেও বিস্তর বাঁচোয়া।

হাত বাড়িয়ে যশোদা শিয়রের দিক থেকে একটা কমলালেবু এনে অরুণকে দিলেন।

অরুণ বলে, লেবু তো একটা মাত্তোর—তোমার জন্যে এসেছে মা।

তা-হোক, তা-হোক—তোরা খেলেই আমার খাওয়া।

আবার দেয়ালের তাকে হাত দেবার জন্য প্রাণপণ করছেন। অরুণ বলল, কী মা?

নিস্তারঠাকরুন পাটালি দিয়ে গেলেন। ভিড়ে-পাটালি তুই কত ভালবাসতিস। পেড়ে নিয়ে খা।

অরুণেন্দু বলে, বউদি খানিক আগে একগাদা লুচি-মোহনভোগ খাওয়াল। পেটে আর জায়গা কোথা?

বউমা খাইয়েছে, আমারও তো বাবা ইচ্ছে করে।

আবার দাদা ফিরে এলে তারও ইচ্ছে করতে পারে।

যশোদা বলেন, করবেই তো। বাড়িঘরে থাকিস নে—ইচ্ছে সকলেরই করে। যে যা দেয় সোনামুখ করে খেতে হয়, 'না' বলতে নেই।

অরুণেন্দু আবদার ধরে: তুমিও খাবে কিন্তু মা। আহ্নিক-টাহ্নিক বাকি থাকে তো যা-হোক করে সেরে নাও। তুমি না খেলে আমি খাবো না।

যশোদার চোখে অকারণে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো। ছোট্ট মেয়ে খুকুরই মতন আর একটি শিশু যেন। লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে অরুণ মায়ের গালে তুলে দিচ্ছে। আলগোছে নিজের গালেও ছুঁড়ে দিচ্ছে, হাত ঠেকায় না। পাটালিরও এক টুকরো মায়ের মুখে গুঁজে দিল।

এরই মধ্যে যশোদা একবার বললেন, নিস্তারঠাকরুন এসেছিলেন, একটা কাপড় ওঁকে তুই প্রণামি দিবি। থানকাপড় না হলে আমার থানাই দিয়ে দিতাম।

অরুণ বলে, তোমার গুরুঠাকরুন বলে? পুরুতবাড়িতেও তবে তো কাপড় দিতে হয়। রাখাল পরামাণিকের বউই বা কী দোষ করল?

যশোদা বললেন, এঁদের কাছে কেউ নয়। যখন তোর একফোঁটা বয়স, আচার্যি-ঠাকুর মশায় হাত গণে বলে দিয়েছিলেন—

হেসে উঠে অরুণেন্দু পূরণ করে দিল: রাজা নয়—সমস্ত আমার মনে আছে মা,

ছোট্ট 'রাজা' কথা ঠাকুরমশায়ের গাল-ভরা হয়নি। বলেছিলেন, রাজরাজ্যেশ্বর হবো, দিকপাল সম্রাট হবো।

তবে?

অরুণ বলে, হয়ে গেছি বুঝি তাই?

যশোদা ভর্ৎসনা করে বললেন, ঠাট্টা কিসের? সবে তো শুরু—অনন্তকাল পড়ে আছে এখনো। সমস্ত হবে। আমি দেখতে পাই আর না-পাই, ঠাকুরমশায়ের কথা আমার আশীর্বাদ তোর দাদার এত আশা মিছে হয়ে যেতে পারে না।

বলছেন, দেশভুঁই ঘরবাড়ি ছেড়ে তোদের দু-ভাইকে বুকে নিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। ইষ্টদেবতার কাছে দিনরাত মাথা খুঁড়েছি: চোখ বুঁজবার আগে ওদের একটু স্থিতি করে দাও। নইলে মরেও আমার শান্তি হবে না। ঠাকুর কথা শুনেছেন—পড়শিরা এসে বলে, আমি রত্নগর্ভা। তোদের দু-জনকে নিয়েই বলে। মুখ্যু ছেলে বটে আমার পুন্ন, কিন্তু ফেলনা নয়।

কথা শেষ না হতেই অরুণ ফোঁস করে উঠল: পাশ করেনি বলেই বুঝি দাদা মুখ্যু? আমার চেয়ে বয়সে সে সামান্য বড়, কিন্তু জ্ঞানগুণে অনেক—অনেক বড়। দাদার মা হয়েই তুমি সত্যি সত্যি রত্নগর্ভা।

যশোদা বললেন, বড় বাসা খুঁজছিস শুনলাম—সবসুদ্ধ নিয়ে যাবি। সে যবে হয় হবে। সকলের আগে পুন্নকে বের করে নিয়ে যা দিকি। তুই বাড়ি এসেছিস, মেলা মানুষজন আসছে, দশ রকমে আজকে আমরা ভুলে রয়েছি। অন্যদিন, মাগো মা, পুন্ন বেরিয়ে গেল—আমি ছটফট করছি, বউটা মুখ চুণ করে রয়েছে, বাড়ি যেন ঝিম হয়ে থাকে। রাত্তিরে উঠোনে যেই ডাক দিল: মাগো, দুয়োর খোল—ধড়ে প্রাণ আসে তখন। নিত্যিদিন আমাদের এই ভোগান্তি। পুন্নর ঐ পোড়া রেলের-কাজ তুই আগে ছাড়িয়ে দে।

দেবো—। অরুণেন্দু বলল।

এমনি হয়েছে বাধা, আজকে পারিস তো কাল অবধি দেরি করা নয়। কত মানা করেছি। বলে, সংসার চলবে কিসে মা? ভাই রোজগারপত্তর করুক, এ-সব ছেড়ে-ছুঁড়ে তক্ষুনি ভদ্দরলোক হয়ে যাব। এখন তোর আর অজুহাত নেই। খরচটা কী আমাদের! বউমা আমাদের লক্ষ্মী আছে, অল্পে বিস্তর করতে পারে। বলবি তোর দাদাকে, হও ভদ্দরলোক যে রকম কথা আছে। কড়া হয়ে বলবি, তোর কথা ফেলতে পারবে না।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে যশোদা ডাকাডাকি করছেন: মানুষজনের সঙ্গে সারাক্ষণ ভ্যানর-ভ্যানর করছিস—শুয়ে থাক একটুখানি চোখ বুঁজে। আমার ঘরে আয়।

শয্যায় পাশের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, শো এইখানটা। লজ্জা কী রে—আমার চোখে সেই একফোঁটা ছেলেই তুই। মায়ের কাছে ছেলে বড় হয় না।

শুয়ে পড়তে হল পাশটিতে। সেই অনেক কাল আগে যেমন হত। ঘুম পাড়িয়ে রেখে না রান্নাঘরে যেতেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে কেঁদে উঠত সে, ভয় করত একা একা। ছুটে আসতেন মা—শিশু মাকে জড়িয়ে ধরত, জোঁকের মতন লেপটে থাকত মায়ের গায়ে। আজকেও, মাগো, বড্ড ভয় করছে—একেবারে একা আমি। যারা সব জমিয়ে আছে, ফিরে তাকিয়ে কথাটাও কানে শুনতে চায় না। ছোট্ট বয়স হলে

হাপুসনয়নে কাঁদতাম, কোলে চেপে ধরে তুমি শান্ত করতে। কারো কাছে কেঁদে একটু হালকা হবো, তা-ও আজ মানুষ পাইনে। তোমার কাছেও তো পারছিনে মা।

যশোদার এক হাত অরুণের গায়ে। মা মন্ত্র জানেন, হাত ছুঁইয়েই সর্বদুঃখ উড়িয়ে দেন। ছোটবেলা কতবার হয়েছে! বড় কান্না কাঁদছে, মা মাথায় হাত দিয়েছেন—কান্নাটান্না কোথায় গেল, মুখ ভরে হাসির ঝিলিক দিচ্ছে তখন। যাদুকর ছড়ি ছুঁইয়ে অঘটন ঘটায়—মায়ের হাতও তেমনি।

যশোদা বললেন, বাসা তো শুনলাম পাকাবাড়ি—

অরুণ বলে, কলকাতায় কাঁচাঘর আর ক'টা! এ জায়গার ঠিক উল্টো। দালান-কোঠা এখানে দৈবেসৈবে দেখি—কলকাতায় তেমনি কাঁচাঘর দেখবার জন্যে হয়তো বা একক্রোশ পথ হাঁটতে হল।

ও বাব্বা!

বিস্ময়ের ধ্বনি দিয়ে মা চুপ হয়ে গেলেন। কাঁচাঘর দর্শনার্থীর পথ-কষ্ট ভাবছেন হয়তো।

পুনরপি প্রশ্ন: মা-গঙ্গা কদ্দুর তোর বাসা থেকে?

কাছেই—

নিশ্বাস ফেললেন যশোদা: বেল পাকলে কাকের কী? ঘরের একেবারে ছাঁচতলায় হলেও আমি তো নেমে ডুব দিয়ে আসতে পারব না।

মা-জননী ধরেই নিয়েছে, এই তালপাতার কুঁড়ে বাতিল করে গঙ্গার কাছাকাছি কোন এক পাকাবাড়িতে ক্ষেত্রে গিয়ে উঠছেন। এখন একমাত্র সমস্যা, শরীরের এই অবস্থায় গঙ্গাস্নানটা কোন্ কায়দায় চালাবেন।

সুপুত্র হয়ে পঙ্গু জননীকে অধিক আর দগ্ধানো কেন—অরুণ তাড়াতাড়ি সমাধান দিয়ে দিল: তুমি এমনি থাকবে নাকি মা, অসুখবিসুখ সেরে দুদিনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বড় বড় সার্জন আছে কলকাতায়, হাতখানা পাখানা কচাৎ কচাৎ করে কেটে তক্ষুনি আবার বেমালুম জুড়ে দেয়। হাড় কোনখানে একটু বেঁকে গেছে না ফেড়ে গেছে—এতো নস্যি তাদের কাছে।

[স্বপ্নেই যখন খাবি, চিঁড়ে-মুড়ি খাওয়া কেন রে হতভাগা, রাজভোগ-ক্ষীরমোহন খা—চাঁদমোহনের মহামূল্য উক্তি।]

জোর দিয়ে অরুণ আবার বলল, কাছে না হয়ে গঙ্গা যদি দূরেই হয়, আমার মায়ের চান করা তার জন্যে আটকে থাকবে নাকি?

কথা সম্পূর্ণ না হতেই যশোদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, সে তো ঠিক। পা ভাল হয়ে গেলে হেঁটেই চলে যাবো, দূর বলে আমি ডরাইনে। তিন ক্রোশ পথ ভেঙে মাদারের থানে কতবার গিয়েছি দেখিসনি।

জিভ কেটে অরুণেন্দু 'ছিঃ' বলে ওঠে: হাঁটতে যাবে কোন দুঃখে? গাড়িতে যাবে গঙ্গাস্নানে। দুটো লোক থাকবে সঙ্গে, ঘাট বড় পিছল, সাবধানে তারা ধরে নামিয়ে দেবে। এইটুকু হবে না—কী ভাবো তুমি আমায়?

অরুণেন্দু একেবারে কল্পতরু: গঙ্গাস্নানই বা কেন শুধু—কালীঘাটে যাবে, দক্ষিণেশ্বরে যাবে। ইচ্ছে হল, চিড়েখানায় বা গেলে একদিন দু-দিন। সিনেমাতেও যেতে পারো—জাগ্রত ঠাকুরদেবতারা সব চড়বড় করে স্তম্ভ ফেড়ে নৃসিংহমূর্তি বেরিয়ে হুঙ্কার ছাড়বেন—

হামানদিস্তায় শাশুড়ির পান ছেঁচে এনে মলিনা দাঁড়িয়ে পড়েছে, অবাক হয়ে

শুনছে। অরুণেন্দু বলছে, হুঙ্কার তুলে নৃসিংহমূর্তি হিরণ্যকশিপুর ঘাড়ের উপর এইসা নখ বসিয়ে দিয়েছেন, তখন সে তারস্বরে বিষ্ণু-স্তব করছে—তুমি যাবে মা, বউদিকেও নিয়ে যাবে—

গন্নাকাটা বউ উল্লাসের মুখে স্বরের ত্রুটি ভুলে গিয়ে একগাদা কথা বলে বসল: শুধু বউদি আর মা—আর বুঝি কারো যেতে নেই?

বুঝেও না-বোঝার ভান করে অরুণেন্দু বলে, খুকুও যেতে পারে। কিন্তু কিছুই সে বুঝবে না, ভয় পেয়ে যাবে উৎকট নৃসিংহমূর্তি দেখে।

তাই বুঝি! হেসে গড়িয়ে পড়ে মলিনা: বউদি-ই কেবল বুঝি বাসা জুড়ে থাকবে। বউদির বোন চাইনে? দু-বোন না হলে একা একা আমি কলকাতায় যাবো না। স্পষ্ট কথা।

হাসতে হাসতে মলিনা চলে গেল।

বউদির বোন সংগ্রহ বাবদে যশোদারও বিন্দুমাত্র অমনোযোগ নেই। কন্যাদায়-মোচনের দায়ে আসে সব তাঁর কাছে, আমড়া-গাছি করে: ছেলেছোকরাদের মধ্যে ঐ এক হয়েছে দিদি আজকাল। কাজকর্ম না হলে খাওয়াব কি পরের মেয়ে এনে? পরের মেয়ে এসে যেন গন্ধমাদন খাবে! পরের মেয়ে এলেই যেন হাঁড়ি আলাদা করে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে! অত বিদ্যে আর অমন রূপগুণ—ছেলে দু-মাস ছ-মাসের বেশি পড়ে থাকবে না দেখতে পাবেন, লুফে নিয়ে চাকরি দেবে। আমাদের কথা তখন যেন মনে থাকে, টিপিটিপি অন্যত্র কথা দিয়ে বসবেন না।

এমনি কত কথাবার্তা হয়েছে আগে। তারা মাছির মতন—গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে যায়, আলাদা খবর দিতে হয় না। কাল স্টেশনে এসে নেমেছে, রাতটুকু পোহাতে যা দেরি—নিস্তারঠাকরুন তাঁদের কলোনির ঋষি সরকারের ভাগনীর সঙ্গে সম্বন্ধ মুখে নিয়ে হাজির। পূর্ণ কাল বাড়ি থাকবে—সরকারমশায়রা এসে দু-ভায়ের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় করে যাবেন। কনের বাপ তারপরে কলকাতায় অরুণের বাসায় গিয়ে দেখেশুনে আসবেন। কুটুম্বরা খাবেন এখানে, কিছু কেনাকাটার তো দরকার। আজ হাটবার আছে, সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেড়াতে যাস তো অরু হাটখোলায় একবার।

মায়ের হাতখানা নিয়ে অরুণ কপালের উপর রাখল। আ—! এই হাত চিরকালের সান্ত্বনা। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, কপালে চিড়িক পাড়ছে—মা হাত বুলোলে কে যেন চন্দন বেটে মাখিয়ে দিয়েছে মনে হত। কী হয়ে গেল—বিষ যে সেই হাতে! সর্বসন্তাপহারী মায়ের কোলে মহাজন যেন পাওনা-দেনার খতিয়ান নিয়ে বসেছে। হিসাব মেটাও, জোর তাগাদা।

মৃদু নাসাধ্বনি—দুপুরবেলা যশোদা যৎসামান্য ঘুমোন। আস্তে আস্তে মায়ের হাতখানা নামিয়ে নিয়ে অরুণেন্দু উঠে পড়ল। বাড়ির ত্রিসীমানায় নেই, জেগে উঠে মা আদর করে আবার না কাছে ডাকতে পারেন।

পূর্বরাত্রের প্রায় অর্ধেকটা এবং আজকের সারাদিনব্যাপী কসরত অন্তে সন্ধ্যার পর পূর্ণেন্দু বাড়ি ফিরল। তবু নাকি তাড়াতাড়ি ফিরেছে—ভাই একা একা আছে বলে কাজ ফেলে ফিরতে হল। হাত-পা ধুয়ে একটু জিরিয়ে নেবার পর অরুণেন্দু ডাকল: চলো দাদা, পশ্চিমবাড়ি থেকে পিঠে খাবার জন্য বলে গেছে।

পিঠে খাওয়া না হাতি—গলার স্বরেই পূর্ণ মালুম পেয়েছে। অরুণ আগে আগে যাচ্ছিল, খানিকটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তিনটে টাকা দাও আমায়। তার থেকে

এই পয়সাগুলো ফেরত পাবে।

ঝুল-পকেটে যা-কিছু ছিল, মুঠো করে নিয়ে পূর্ণকে দিয়ে দিল। বলে, ভাইয়ের বিয়ে দেবার পুলক—ঠেলা বোঝ এইবার। কনের মামা কাল দেখতে আসছে, হাটখোলায় গিয়ে মিষ্টিমিঠাই কিনে আনলাম। কাজ তো তোমাদের—বাড়ি থাকলে তুমিই যেতে। তোমার বকলমে কেনাকাটা করে দিলাম। টাকা আমি কেন দিতে যাব—পাবই বা কোথা?

পূর্ণ প্রবোধ দেয়ঃ বড্ড চটে গেছিস ভাই। আমি কেউ নই, বিশ্বাস কর, মা ক্ষেপে উঠেছেন আর সেই সঙ্গে মলিনা। বেটাছেলে একজন ফাঁকে ফাঁকে বেড়াচ্ছে সে ও'রা দেখতে পারেন না। তা কাল দেখে যাবে বলে কালকেই তো আর বিয়ে নয়। লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না—আস্তেব্যস্তে চলতে থাকুক কথাবার্তা। এখানেই হবে, তারও কোন মানে নেই—সম্বন্ধ এমন কত আসবে কত ভাঙবে। আমরাও গয়ংগচ্ছ করে চালিয়ে যাব। রাগারাগির কী আছে—এক বছর দু-বছরের আগে কোনখানে পাকাপাকি হচ্ছে না। তার মধ্যে একটা-কিছু জুটে যাবে নির্ঘাৎ।

ও তুমি কী বলছ, চাকরি তো জুটেই গেছে। চাকরি করছি, বাসা করেছি, তল্লাটের মধ্যে জানতে কারো বাকি নেই। মিথ্যে বানানোর এমন ক্ষমতা—ফৌজদারি-কোর্টের মোক্তার হলে না কেন দাদা? মক্কেলের ঠুলোঠুলি পড়ে যেত।

কণ্ঠস্বর কিছু উ'চু হয়ে থাকবে, ফিসফিসিয়ে পূর্ণ অনুনয় করছেঃ চুপ, ওরে চুপ—ও'দের কানে গিয়ে না ওঠে। একেবারে মিথ্যেই বা কিসে হল? খাতা লেখা জিনিসটা সামান্য হলেও চাকরি তো বটে। পাঁচজনে মিলেমিশে যে ঘরটায় থাকিস, তাকেও কি বাসা বলা যায় না? এটুকু করতে হল মায়ের জন্য। শরীরের যা দশা, দু-মাস ছ-মাসের বেশি উনি বাঁচবেন না। সারা জন্ম দুঃখধান্দা করে অন্তিমে আমাদের মুখ তাকিয়ে আছেন। আমি নই—আকাটমুখ্যু আমায় দিয়ে কিছু হবে না দুনিয়াসুদ্ধ জানে—একলা তুই, আশাভরসা তোর উপরে। আশার পূরণ হয়েছে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে তারপর ভাল কাজকর্মও পেয়ে গেছিস, অভাব অনটন ঘুচে সংসার এতদিনে লক্ষ্মীমন্ত হল—এই তৃপ্তি নিয়ে ও'কে যেতে দে। একটু মিথ্যাচার তাতে যদি হয়েই থাকে, ঠাকুর সে পাপ হিসাবে নেবেন না!

একটু থামল। তারপর জোর দিয়ে বলল, না, মিথ্যে কিছু নেই এর মধ্যে। যা হবেই, হয়ে গেছে বলে তাই একটুখানি এগিয়ে দেওয়া।

ম্লান হেসে অরুণ বলল, হবে বলে জেনেবুঝে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ দাদা?

দৃঢ়স্বরে পূর্ণ বলল, হতে বাধ্য। হাড়ভাঙা খাটনি খেটেছিস—গায়ে একটা ভালো জামা ওঠেনি, পেটে একটু ভালো জিনিস পড়েনি। খেটে খেটে সর্বরকমে নিজেকে গড়ে তুললি। তোর কাজ তুই করেছিস—যারা কাজকর্ম দেবার মালিক, তাদের কাজ ঠিক-জায়গাটিতে তোকে এবার নিয়ে বসানো। এমন বিদ্যেবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য বিনি-কাজে নষ্ট হবে—হতে পারে তাই কখনো। বিদ্যে হয়েছে সেটা মা দেখলেন, সর্বসুখ হয়েছে সেটা দেখা পরমায়ুতে বেড় পাবে না হয়তো। ভবিষ্যতের কথাটা তাই 'হয়ে গেছে' বলে চালিয়ে যাচ্ছি।

অরুণেন্দু বলল, বউদিদির কাছেও তো চালিয়েছ। সত্যি কথা তাঁকে অন্তত বলতে পারতে। বলে সামাল করে দিতে মায়ের কাছে ফাঁস না করেন।

সে-ও বড় দুঃখী রে, তারও মোটে সবুর সইছে না ভাই। মা মরেছে যখন সে তিন মাসের মেয়ে, বাবা মরেছে যখন সে তিন বছরের। বৈমাত্রের ভায়ের সংসার—

ভাই যেমন হোক, ভাইয়ের বউ চক্ষু পেড়ে দেখতে পারে না। ভূতের মতন খাটতে পারে বলে সংসারে রেখে ভাত-কাপড় দিচ্ছিল, নইলে বোধহয় পথেই বের করে দিত। তার উপরে খুঁতো-মেয়ে—কথা শুনে সবাই ভ্যাংচায়। এক এক পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে আসত, এসে পালানোর দিশা পায় না। আমাকে পেয়ে কাঁধের বোঝা নামিয়ে ভাই বেঁচে গেল। চিরটা কাল মলিনা অশান্তি ভোগ করে এসেছে—দিয়ে দিলাম একটু আনন্দ। ক্ষতি কি তাতে?

অরুণ নিশ্বাস ফেলে, বাড়ি এসেছি—তা-ও যেন দাবানলে ঘিরে ধরেছে। মার কাছে নয়, বউদির কাছে নয়, দাদা, আমি কার কাছে বসে বুকটা একটু হালকা করি বলো তো?

পিঠে খাওয়া-টাওয়া বাজে। উদ্যত অশ্রু চেপে পরের বাড়ি পিঠে খেতে বসা যায় না। নিজের বাড়িতেও না। খেতে খেতে দুই গালের উপর হয়তো-বা ধারাস্রোত বইল, সামলানো গেল না। তখন শতেক প্রশ্নের জবাব দাও, হরেক অজুহাত বানাও।

নির্জন পথে এদিকে-সেদিকে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরে চলল আবার দু-ভায়ে।

অরুণেন্দু বলে, হাত জড়িয়ে ধরে আমায় বাড়ি নিয়ে এসেছ। খপ করে হাত জড়িয়ে ধরা মোক্ষম অস্ত্র তোমার দাদা। সেই অনেক দিন আগে আরও একবার অমনি হাত ধরেছিলে, মনে পড়ে—কলকাতায় পাঠিয়েছিলে প্রেসিডেন্সিতে পড়বার জন্য? কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। আবার এই হাত ধরে বাড়ি নিয়ে এলে—কাঁদতে কাঁদতে পালাতে হচ্ছে। এত অভিনয় পারছিনে আর আমি।

আরও একটা দিন অন্তত পক্ষে থেকে যেতে হয়। আত্মারাম আচার্য মশায় নেমন্তন্ন করলেন: গরিবের বাড়ি দুটো ডালভাত খেয়ে যাবে, দু-ভাই যাবে তোমরা।

বুড়োমানুষ ভিন্ন পাড়া থেকে নিজে চলে এসেছেন। শুধুমাত্র গুরুঠাকুর নন, এই একটি পরিবারের সঙ্গে বিশেষ দহরম-মহরম তাদের। বাপের আমলে, যখন দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আসে নি, তখন থেকেই। কাজের ক্ষতি বলে অরুণেন্দু অনেক কাকুতিমিনতি করল, তিনি নাছোড়বান্দা: না বাবা, বড় ব্যথা পাবো। ছেলে দুটো তো মানুষ নয়—ঘুরে ঘুরে এক-হাতে হাটবাজার করেছি।

ভালবাসেন এদের সত্যিই, কিন্তু উদ্দেশ্যও কিছু আছে। পাশাপাশি দু-ভাই খেতে বসেছে, হুঁকো নিয়ে সামনে বসে আচার্য্যিমশায় 'এটা খাও' 'ওটা খাও' করছেন। তার মধ্যে খপ করে ছেলের কথা নিয়ে এলেন: ব্রাহ্মণসন্তান হাটে হাটে বিড়ি বেচে বেড়ায়। বিদেশ বলেই সম্ভব হচ্ছে, তা বলে এটা তো ভাল কথা নয়—

অরুণ বলে, আজকাল আর এ সমস্ত দেখতে গেলে চলে না। রোজগার করছে তো বটে।

পরিবেশন করছেন নিস্তারঠাকরুন। মুখ বেঁকিয়ে তিনি বললেন, রোজগার তো ভারি! নুন থাকে তো চাল থাকে না—

যা দিনকাল, এই বা ক'টা ছেলে পারছে বলুন।

ঠাকরুন বলে যাচ্ছেন, লেখাপড়া শেখেনি তোমার মতন, বড় কাজকর্ম কে আর দিচ্ছে—

(শেখেনি ভাগ্যিস!)

আত্মারাম ঠাকুর সোজাসুজি বললেন, বড় ছেলেটা যা করছে তাই নিয়ে থাকুক, ছোট্টুকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। শহরে-বাজারে বিনি লেখাপড়ার কাজও কত

আছে, কলকারখানায় কাজকর্ম শিখিয়ে নেয় শুনেছি। বিড়ি বাঁধার ভবিষ্যৎটা কি?

ঠাকুর-ঠাকরুনের দু-জোড়া চোখ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। জবাব কি দেবে অরুণ, ঘাড় নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। অদূরে ছোটছেলেকে দেখতে পেয়ে ঠাকরুন ডেকে বললেন, অরুর সঙ্গে তুই কলকাতায় চলে যা। সেই কথা হচ্ছে। এরা দু-ভাই বড্ড ভালো, একটা-কিছু করে দেবেই। বেশ ভালো হয়ে থাকবি।

অরুণেন্দু আঁতকে ওঠে, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে রওনা করে দিতে চান। অলক্ষ্যে রুষ্ট চোখে একবার পূর্ণেন্দুর দিকে তাকাল: বিপত্তি তোমারই জন্যে দাদা।

আত্মারাম বলছেন, একজন বড় হলে দশজনে তার কাছে প্রতিপালিত হয়। আমরা তো বুড়ো অথর্ব হয়ে পড়লাম, ছোঁড়া-দুটোকে তোমরা ছাড়া কে দেখবে?

অরুণ এতক্ষণে বলবার কথা কিছু ভেবে পেয়েছে। বলল, এবারে থাক। শিগগিরই বড় বাসা নিয়ে নিচ্ছি—মা ওঁরা সব যাবেন, ছোটু তাঁদের সঙ্গে যাবে। কলকারখানায় কোথায় কি সুবিধা হয়, আমিও এর মধ্যে খোঁজখবর নিতে থাকি।

ফিরছে দু-ভাই। অরুণ বলল, বাড়ি এসে দু-দিন জিরোব, সে পথও মেরে দিয়েছ দাদা। পালাই-পালাই ডাক ছাড়ছি।

॥ সাত ॥

যথাপূর্ব চলেছে একঘেয়ে উমেদারি। সবিস্তর বলতে গেলে লোকে কানে হাত চাপা দেবে, গল্পে ঢোকাতে গেলে সেই পাতাগুলো ফসফস করে উল্টে চলে যাবেন পাঠক। দোষ দিইনে—হা-হুতাশ দেখে দেখে আর শুনে শুনে মানুষের চোখ-কান পচে গিয়েছে। যতক্ষণ ভুলে থাকতে পারি, ততক্ষণ ভাল।

সুন্দর চেহারা, প্রদীপ্ত যৌবন, বুদ্ধি আছে, বিদ্যেও বেশ খানিকটা কবজায় এনে ফেলেছে—নিঠুরা চাকরি-সুন্দরী তবু মুখ লুকিয়ে আছেন, খুঁজে খুঁজে হয়রান।

লোহাপটির সুবিখ্যাত রঘুনাথ গুঁই, বিশাল ভুঁড়ি, মোসাহেবগুলোকে ঠেলে সরিয়ে অরুণেন্দু তাঁর সামনাসামনি দাঁড়াল: উমেদার এলাম—

কী করেন আপনি?

বললামই তো। উমেদারি।

কাজকর্ম কী করা হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

উমেদারিই আমার দিন আর রাত্রির কাজকর্ম।

রঙ্গ করবেন না—

তোফা আছেন কিনা, উমেদারি জিনিসটা আপনার কাছে রঙ্গ বলে ঠেকে। রাতদুপুর অবধি দরখাস্ত লিখি—লিখতে লিখতে আঙুলে কড়া পড়ে গেছে, টিপে দেখুন। সেই দরখাস্তের পাহাড় সকালবেলা ডাকে ছেড়ে সারা দিনমান শহরময় হড়্ড-হড়্ড করে বেড়াচ্ছি। উমেদারি রাত-দিনের কাজ, মিছে কথা বলিনি।

ভুঁড়িদাস রঘুনাথ উপদেশ ছাড়লেন: রোগই তো এই। চাকরি-চাকরি করেই বাঙালিজাত মরবে। চাকরি তো চাকরগিরি—জীবনে কখনো চাকরি করিনি—ঘেন্না করি চাকরিকে। আমি, জানেন, কী অবস্থা থেকে—

অরুণের চোখ-মুখ লাল। বলে, জানি—

কী করে জানলেন? চেনাশোনাই তো নেই আপনার সঙ্গে।

বলে যাচ্ছি, মিলিয়ে নিন। অতি-সামান্য অবস্থা থেকে আপনি এত বড় হয়েছেন। পেটের ভাত জুটত না, বললেই হয়। পি. সি. রায়ের বক্তৃতা শুনেছিলেন একদিন—

উঁহু, সে পি. সি. রায় আপনাদের পার্টির পালানচন্দ্র রায় নন। আচ্ছা, পি. সি. রায় থাকুক গে—মোটের উপর আপনি সংকল্প নিলেন, পরের গোলামি কিছুতেই নয়। তারপর অমানুষিক কষ্টস্বীকার করে, যত্ন চেষ্টা আর অধ্যবসায়ের গুণে—কেমন মিলছে না?

সবিস্ময়ে রঘুনাথ বললেন, বাঃ রে, ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছেন। জানলেন কী করে আপনি?

সব শিয়ালের এক রা—আলাদা করে জানতে হয় না। শিয়াল যখন, হুক্কা-হুয়া ঠিক একই রকম বেরুবে। লোহাপাটিতে তৈলদান আজকে ধরে তিনদিন হয়ে গেল, দর্শন ডজনের উপর হয়ে গেছে, সর্বমুখে একই কথা : সামান্য থেকে বড় হয়েছেন।

রঘুনাথ রাগ করে বললেন, বলতে চান মিথ্যেকথা বলছি?

আরে সর্বনাশ, একেবারে নির্জলা সত্যি। তবে সকলের বড় সত্যি যে বড়লোক হয়েছেন। তারই সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি পাণ্ডিত্য ডাইনে-বাঁয়ে উপদেশ ছড়ানোর এক্তিয়ার সবকিছু আপনাআপনি এসে যায়।

কারবারি লোকের রূঢ় হতে নেই। ঘাড় তুলে রঘুনাথ অন্য একজনের উপর হাঁক পেড়ে উঠলেন : উঃ, ছারপোকায় কামড়াচ্ছে। গদি তুলে কাল রোদ্দুরে দিবি, ভুল হয় না যেন।

অচঞ্চল অরুণেন্দু একসুরে বলে চলেছে, আর আমি যত পাশই করি মূর্খস্য-মূর্খ ছাড়া কিছু নই। নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন পয়লা নম্বরের হাঁদারাম।

মনের মতন কথাটি পেয়ে রঘুনাথ কিছু শোধ নিয়ে নিলেন : তাই যদি না হবেন —এত লোকে করে খাচ্ছে, আপনিই বা পারেন না কেন? বলবেন, নিজের কথাই সাতকাহন করে বলছে—কিন্তু এক-শ সাতাশটি টাকা সর্বসাকুল্যে আর এই হাত দু-খান আর মাথার বুদ্ধি—মোটমাট এই পুঁজিতে এত বড় কারবার গড়ে তুলেছি। কেউ সাহায্য করেনি।

করেছে—দৃপ্তকণ্ঠে অরুণেন্দু বলল।

আমার চেয়ে বেশি খবর রাখেন দেখছি আপনি।

রাখেন আপনিও। স্বীকার করেন না। অথবা নিজের হাত দুটো আর মাথা নিয়ে এতই অহংকার, তার দয়াটা তলিয়ে দেখেন না।

রাগে আগুন হয়ে রঘুনাথ বললেন, কে দয়া করল আমায়? কেউ নয়। চ্যালেঞ্জ করছি, নাম বলুন।

হিটলার—

অবাক হয়ে রঘুনাথ তাকিয়ে পড়েন—কাজকর্ম না পেয়ে ছোঁড়া পাগল হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে তাই, কথাবার্তা সেই রকমই বটে।

অরুণ বলে যাচ্ছে, লড়াই বাধিয়ে দুনিয়া লণ্ডভণ্ড করে দিল। তারপরে কত গবেট রাতারাতি মহামান্য মুরুব্বি হয়ে উঠল, কত ফকির মসনদে চড়ল—তড়িঘড়ি যে যদ্দুর গুছিয়ে নিতে পেরেছে। ওলটপালট আবার একটা এলে আমাদের পালা—তখনই যদি একটা মওকা পেয়ে যাই। এমনিতে কিছু হবে না, খাটাখাটনি বিস্তর করে দেখলাম।

উৎকৃষ্ট একখানা চেহারা আছে। বিধাতার দেওয়া নির্ভেজাল মাল—অবহেলা অযত্নে খুব একটা মরচে ধরে না। এই বাবদে কিছু মেয়ে আশেপাশে ঘুর ঘুর করে।

অরুণ পাত্তা দেয় না—উমেদারির তালে ব্যস্ত, কাব্য করার সময় কখন? সামনাসামনি পড়লে হুঁ-হাঁ দিয়ে সরে পড়ে।

কয়েকটা বিষম নাছোড়বান্দা। পলি একটি। ঋ-ফলার মতো লেগে আছে। ঋ-ফলা কথাটা যশোদা খুব বলেন, ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে অরুণ শিখেছে। খাসা কথা। ঋ-কার ক-এর সঙ্গে জুড়লে ফলাটা অক্ষরের পিছনে সেঁটে থাকে, তেমনি। পলিকে একদিন বলেই ফেলেছিল, ঋ-ফলা হয়ে আছেন আপনি। পলি জিজ্ঞাসা করল: ঋ-ফলা মানে কি? ব্যাখ্যা করেনি অরুণ, ভদ্রতায় আটকাল। দু-তিন বার পলি জিজ্ঞাসা করল: বললেন না তো ঋ-ফলার মানে? অরুণ বলল, অনেক বোঝাতে হবে। বাইরে বেরুব এখন, তাড়া আছে। আর একদিন।

ঘোড়ার-ডিম! কাজ একটাই এখন—দরখাস্ত রচনা করা। সে কাজ ঘরের মধ্যে খাটিয়ার উপর বসে, বাইরে বেরুতে হয় না তার জন্য। তাড়া দেখানোর জন্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে জামাটা গায়ে ঢুকিয়ে অরুণ উঠে দাঁড়াল। বিরস মুখে পলিও উঠল অগত্যা। রাস্তায় চলে এলো, পলিও আছে পিছুপিছু।

ট্রামরাস্তায় পলি যাবে জানা আছে, অরুণেন্দু উল্টোদিকে পা বাড়িয়ে বলে, নমস্কার, আমি ওইদিকে যাচ্ছি। পলি আর কী করে—বলল, নমস্কার। খুট খুট করে ট্রাম ধরতে চলল।

এদিক-সেদিক অল্পসল্প ঘোরাঘুরি করে অরুণ ফিরে এলো। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে টুক করে চাঁদ-কেবিনে ঢুকে গেল। আধ কাপ চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নেবে।

টেবিল হৈ-হৈ করে উঠল—কোণের দিকে দলটার নিজস্ব টেবিল। অরুণের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে তারা।

সুকুমার বলল, মেয়েছেলেয় এত তরাস? কাবুলিওয়ালা হলেও তো আমি এতদূর করিনে।

চাঁদমোহন এসে পড়ল এদিকে। সে বলে, অমন করতে নেই রে, মাণিক-রতন কোথায় কি আছে, কে জানে। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই—'

ছাই নয়, কয়লা।

পলির গাত্রবর্ণের ইঙ্গিত। সুকুমার টিপ্পনী ছাড়ল: ঐ কয়লা-বরণীকে পাশে বসিয়ে পাক্কা একটি ঘণ্টা গোটা ভবানীপুর মোটরে চক্কোর মেরেছি। ভয় পাইনি। তা হলে তো হাত-টাত কেঁপে রাস্তার মানুষ দু-চার গন্ডা সাবাড় হয়ে যেতো।

অ্যাঁ, পাশে বসিয়ে ঘোরাঘুরি? বলিস নি তো।

রোমান্সের গন্ধে দলের সবগুলো কান খাড়া হয়েছে। বলে, খুলে বলু। চেপে গেলে তোকেই সাবাড় করব বারোয়ারি মার মেরে।

না, চাপাচাপির কিছু নেই। সে গাড়িতে পলি ছিল, পলির দিদি ডলি ছিল, একফোঁটা ছোটভাইটা ছিল, বাপ কাশীনাথ কর মশায় ছিলেন। পলির মা কেবল বাদ। পুরোনো গাড়ি কিনলেন ওঁরা, গাড়ির ট্রায়াল হচ্ছিল। যোগাযোগ করে দিয়ে সুকুমার দেড়শ টাকা দালালি পেয়েছে।

মোটরগাড়ি কিনল?

অরুণেন্দু লাফিয়ে ওঠে: হোক না লঝঝড় গাড়ি, তা হলেও গাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। ঠিকানা দে, কোন অফিসে কাশীনাথবাবুর চাকরি। 'যেখানে দেখিবে ছাই'—লাখকথার এক কথা। এবারে পলি এলে বাছা বাছা মিষ্টিবচন ছাড়ব। আসবে কি না, কে জানে! মেয়েটা অতিশয় ঘড়েল—ঘনিষ্ঠতা অরুণ পছন্দ করছে না, সেটার

বেশ আন্দাজ পেয়ে গেছে।

আত্মগ্লানিতে পুড়ছে সে এখন। পুরানো উমেদার হয়েও শাস্ত্রটা এখনো ঠিকমতো রপ্ত হল না। কাউকে হেলা করতে নেই—ছাইগাদার তলেও মাণিক-রতন লুকিয়ে থাকতে পারে। যুবতী মেয়ে এলে মারমুখী হবে, উমেদারের পক্ষে অভ্যাসটা অতিশয় গর্হিত। চাকরির খাতিরে মেয়ের সঙ্গে মিষ্টি কথা কি—গদগদ প্রেমালাপ, চাই কি বিয়ের পর্যন্ত রাজি। নিজে হন্দমুন্দ খাটছি, সঙ্গে বরঞ্চ উকিল রূপে একটা দুটো মেয়ে ধরো। তারাও গিয়ে গিয়ে আমার হয়ে খোশামুদি করুক। রাস্তাঘাটে ট্রামে-বাসে মেয়েছেলে গিজগিজ করছে, তা সত্ত্বেও পুরুষের কাছে মেয়ের একটা আলাদা খাতির—বিশেষত ভারিক্কি বয়সের যেসব পুরুষ। এবং চাকরিদাতা সাধারণত তাঁরাই। যৌবনে মেয়েদের তেমন কাছাকাছি হতে পারতেন না, তাঁদের চোখে তরুণী মেয়েরা অদ্যাপি হুরী-পরী।

সুব্রতা মেয়েটা কিছু বেশি রকমের বেপরোয়া। গলির মোড়ে চকোলেট কিনে খাচ্ছে, অরুকে পেয়ে খানিকটা ভেঙে তার হাতে দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আর অরুণও আজ হাসিমুখে পরম বশম্বদ ভাবে চলেছে।

ঐ গলিতেই বাড়ি। বাড়ি নিয়ে তুলে হৈ-চৈ করে মাকে ডাকল, বোন দুটোকে ডাকল। মা কেমন যেন লোলুপ চোখে তাকাচ্ছেন।

সুব্রতা বলল, কলেজের বন্ধু। অনেকদিন পরে দেখা। পাড়ার মধ্যে পেয়ে গেছি আজ, পালালে 'চোর' 'চোর' রব তুলে দিতাম।

বয়স্থা মেয়েকে আজকাল নাকি টিপে দেওয়া থাকেঃ পছন্দসই ছেলে পেলে ধরেপেড়ে বাড়ি নিয়ে আসবি, আমরাও দেখব। আর অরুণেন্দুর এলেম যত সামান্যই হোক, বাইরেটা রীতিমতো চটকদার—দেখলে পলক পড়ে না চোখে। করবন্ধনে বেঁধে সুব্রতা জননী সকাশে হাজির করল—কী মতলব আছে, কে জানে।

গৃহবন্দিত্বে মুক্তি নিয়ে মেয়েরা এখন মুক্তবায়ুর শ্বাস নিচ্ছে। উত্তম। কিন্তু উল্টো এক সমস্যা তাদের জীবনে। অপরিচয়ের একটা রোমান্স ছিল তাদের সম্পর্কে—আড়াল সরে গিয়ে সেই বস্তুও ঘুচেছে। সংসারের ডাল-ভাত-চচ্চড়ি এবং আর দশটা উপকরণের মতন মেয়েরাও। তা-ও নয়—ডাল-ভাতের খরচা এ-বাজারে যথেষ্ট বেড়েছে বটে, তবু বউয়ের খরচার ধারেকাছে যায় না। বউ পোষা আর হাতি পোষা একই কথা—জনপ্রবাদে বলে। হাতি পোষার রাজারাজড়া ইদানীং বড় একটা মেলে না। তেমনি যারা গোটা বউ পুষে সংসারধর্ম করবে, এমন দুঃসাহসী যুবাপুরুষ দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আজকালকার মেয়ে যেহেতু বিয়ের-কনে মাত্র নয়, পুরোদস্তুর মানবী—তাদের নিজ চোখের পছন্দ-অপছন্দেরও একটা ব্যাপার আছে। ফলে বিয়ের হয় না বিস্তর জনার। তখন অতিশয় করুণ অবস্থা—নাক-সিঁটকানো সম্পূর্ণ উপে গিয়ে হাত-পা-মুন্ড সমন্বিত শুধু একটা বর পেলেই হল। ত-ও হয় না—যেহেতু ইতিমধ্যে বয়সের ভাঁটা সরে গিয়ে কাদামাটি বেরিয়ে পড়েছে, প্রেমিকার সঙ্গে মধুরালাপ চোখ বুঁজে করতে হয়, চোখ মেলে থাকলে ধাক্কাধাক্কি করেও কণ্ঠ দিয়ে গদগদ স্বর বের করা যায় না। বহুদর্শী মায়েরা মেয়েকে তাই নাকি সতর্ক করে দেনঃ বাছাবাছি বেশি করতে যাবি নে—বেশি যে বাছে, তারই শাকে পোকা।

অরুণেন্দুর অবশ্য শোনা কথা এসমস্ত। কিন্তু সুব্রতার এত হৈ-চৈ, সন্দেহ হয়, শিকার কবলিত করার উল্লাস কিনা। মা-জননী একনজরে দেখছেন। এতক্ষণ ধরে এত খুঁটিয়ে কী দেখেন—বহিরঙ্গ শেষ করে এখন সম্ভবত অন্তর্লোকে এক্স-রে চালাচ্ছেন।

অরুণেন্দু ঘেমে উঠেছে। পরিচয় নিষ্কাশন শুরু হয় বুঝি এবারে—কোথায় থাকে সে, সংসারে কে কে আছে, কী কাজকর্ম করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শতেক উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ায়—হেন অবস্থার মধ্যেও কন্যার পিতামাতার কবলে ইতিপূর্বে সে পড়েছে, পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। মানরক্ষার্থে তখন চটপট অবাস্তব বিবরণ রচনা করে জবাব দিয়ে যেতে হয়। সুব্রতার কাছে দু-দশ মিনিট কাটিয়ে মুফতে এক কাপ চা খেয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, চায়ের তেষ্টা পেয়েছেও খুব। কিন্তু সেই এগারোটা বেলা থেকে অফিস-কর্তাদের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে খোশামুদির পর এখন আবার নিজের সম্পর্কে বানানোর মনমেজাজ নেই।

তাড়াতাড়ি নমস্কার সেরে বেরিয়ে পড়ল: আজকে ভারি ব্যস্ত, আর এক দিন এসে গল্পগাছা করব।

এসো বাবা, তাই এসো। রবিবার সকালের দিকে এসো, উনিও থাকবেন।

বলা বাহুল্য রবিবারে অরুণ যায় নি। কোন বারেই নয়। ও-বাড়ির চৌকাঠ আর মাড়াবে না।

সুব্রতার সঙ্গে, তা বলে, দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ নয়। সুব্রতা বলে নিজের ক্ষমতায় হবে না রে, সে তো হন্দমুন্দ দেখলি। উকিল ধর্ একটা। উকিল হয়ে আমি তোর আগে আগে যাচ্ছি—

হেসে উঠে বলে, কাজ হাসিল করে দিই আগে। ফী বাবদ যা তোর ধর্মে আসে, দিস আমায়।

বলে মুখ টিপে কিঞ্চিৎ চটুল হাসি হাসল।

জাঁদরেল সম্পাদক, কলমে আগুন ছোটান। দেশের কী নিদারুণ সঙ্কট এমনি যদি মালুম না পান, তাঁর লেখা এডিটোরিয়াল হপ্তাখানেক পড়ুন—করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করবেন।

আড়াইটে নাগাদ অফিসে আসেন তিনি। খানিকটা সময় নিষ্কর্মা। চতুর্দিকে বহু লোক ঘিরে থাকে তখন। সহকারী ও সুহৃৎজনেরা থাকে, বাইরে থেকেও অনেকে আসে বিবিধ সভানুষ্ঠানে সভাপতিরূপে গাঁথবার অভিপ্রায়ে। সম্পাদক সভাপতি হলে আর দেখতে হবে না—কাগজে ফলাও করে সচিত্র রিপোর্ট বেরুবে। বক্তৃতায় যা-কিছু বলবেন সবই থাকবে, যা বলবেন না তা-ও থাকবে। বিকেলের এই সময়টা মেজাজে থাকেন সম্পাদক, জমিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে।

যাবতীয় আলোচনা ঘুরেফিরে তাঁরই গুণগানে এসে পৌঁছয়। জাতির পরিত্রাতারূপে আবির্ভাব তাঁর, মানুষ আজ কেবল তাঁরই মুখ চেয়ে আছে। কিন্তু সকালের এডিটোরিয়াল আজ তেমনধারা দানা বাঁধেনি।

এক সহকারীর দিকে মিটমিটি হেসে সম্পাদক বলেন, তাই নাকি?

আপনি লিখেছেন?

কলম ধরে না লিখলেও আমার লেখা তো বটেই।

তা বুঝেছি। ও-কলমের মাল নয়, দুটো লাইন পড়েই ধরে ফেলেছি।

সম্পাদক স্বীকার করলেন: কাল মীটিং ছিল মফস্বলে। দুপুরে একটু গড়াতেও দেয়নি, টেনে নিয়ে বের করল। এডিটোরিয়াল প্রশান্তর লেখা। কিন্তু প্রশান্ত খারাপ লেখে না তো।

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করেন: না, খারাপ কেন হবে। অন্য সব কাগজে যা বেরোয়, সে তুলনায় হীরে-মাণিক। তা হলেও খাঁটি দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে কেন?

আজকে স্যার, নিজে একখানা ছাড়ুন।

হবে তাই, নিশ্চিন্ত হয়ে যান। কিন্তু বয়স হয়ে যাচ্ছে, কদ্দিন আর পারব। কী যে করবে এরা সব তখন!

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে সম্পাদক বাথরুমে ঢুকে গেলেন। অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা শেষ। যে যার জায়গায় গিয়ে কাজে বোসো গে, বাইরের লোক সব ভেগে পড়ো। বেরিয়ে এসে সম্পাদক এবারে কলম ধরবেন।

বাথরুমে বড্ড দেরি হচ্ছে, দরজা আর খোলে না। অনিল খুশি আর ধরে রাখতে পারে না: যা মোক্ষম একখানা আজ হবে!

দ্বিধায় ঘাড় নেড়ে প্রশান্ত বলে, উল্টোটাও হতে পারে। বেরিয়ে হয়তো ইজিচেয়ারে গড়িয়ে পড়বেন: শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করছে, উঠতে পারছি নে। আজকেও তুমি চালিয়ে দাও হে প্রশান্ত—

এমনি সব জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে—বাইরে মিছিল। অগণ্য নরকণ্ঠ চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুলছে: ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

সম্পাদক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন: কী আবার আজকে। দেখ তো, দেখ তো—

ইনক্লাব জিন্দাবাদ! পাশ করেছি, চাকরি দাও। চাকরি, নয়তো বেকার ভাতা।

সম্পাদক বললেন, কী নিয়ে লিখি ভাবছিলাম। ঠিক হয়েছে।

কলম বাগিয়ে বসেছেন, চুরুট ধরিয়েছেন। স্লিপ হাতে বেয়ারা দোর ঠেলে ঢুকে পড়ল।

সম্পাদক খিঁচিয়ে উঠলেন: লেখার সময় দেখা হয় না, বলে দিতে পারলে না?

বেয়ারা বলল, কী করব—নাছোড়বান্দা। স্লিপ না আনলে এমনিতেই ঢুকে যেত।

জুলুম নাকি? ঘাড়-ধাক্কা দাও গে।

বেটাছেলে হলে যা-হয় হত। আওরত-মানুষ।

স্লিপে চোখ বুলিয়ে সম্পাদক অতএব নরম হয়ে বললেন, নিয়ে এসো। ঝগড়া করে ওদের সঙ্গে তো পারা যাবে না। বিদেয় করে কাজে বসব।

সুব্রতা এসে ঢুকল: আওয়াজ শুনতে পান?

হরবখত শুনছি, নতুন করে কী শুনব। এ সব ডাল-ভাতের সামিল হয়ে গেছে।

বেকারের দল বেরিয়েছেন। চাকরি চাই।

চেঁচালেই বুঝি চাকরি দেবে?

সুব্রতা বলে, ওঁরা চেঁচান, আপনারা লিখুন। উপরওয়ালাদের সুখনিদ্রা যদি ভাঙে। যুবকদের আজ কী সর্বনেশে অবস্থা, যদি তাঁদের মালুমে আসে।

সম্পাদক বললেন, কি লিখতে হবে, আপনি কি আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন?

না। রাস্তা যে শ্লোগানে তোলপাড় হচ্ছে, ঘরের মধ্যে আমারও সেই দরবার। চাকরি দিন একটা।

থতমত খেয়ে সম্পাদক বললেন, কি চাকরি?

যে-কোন চাকরি। আমি নই, আমার এক ভাইয়ের জন্য।

সম্পাদক বললেন, নিজেই তো চাকরি করি—চাকরি দেবার মালিক আমি নই। আমারই ছেলে বি-কম পাশ করে বসে আছে।

আমার ভাই এম-এ পাশ করে বসে আছে।

সম্পাদক বললেন, এম-এ আমাদের এখানে লাগে না। কলেজের মাস্টারি হলে এম-এ লাগত।

সুব্রতা বলে, ভাই আমার বি-এ পাশ, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ, ইস্কুল-ফাইন্যাল পাশ। যতটা লাগে হিসাবের মধ্যে নিয়ে বাড়তি বাতিল ধরবেন।

ওসব নয়। জার্নালিজমের ডিপ্লোমা দেখে নেওয়া হয় আজকাল।

সুব্রতা বলে, তা-ও বোধহয় আছে। দু-চোখে যা পড়ে, কোন শেখাই সে বাকি রাখে না। বলে, চাকরিতে লাগতে পারে। বসুন, ডেকে আনি।

অরুণেন্দু মুকিয়ে ছিল, দরজা ফাঁক হতেই ঢুকে পড়ল।

সুব্রতা বলে, জার্নালিজমের ডিপ্লোমা আছে নিশ্চয়—

অরুণ ঘাড় নাড়ে: উঁহু, খেয়াল হয়নি। চাকরি দিন, বছরের মধ্যে ডিপ্লোমা এনে দেবো। নয়তো তাড়িয়ে দেবেন।

সম্পাদক বললেন, আইন বেয়াড়া। নিয়ে তারপরে তাড়িয়ে দেওয়া চাট্টিখানা কথা নয়। তার থেকে বছরখানেক পরে ডিপ্লোমা নিয়েই আসবেন। আসবেন এ ঘরে নয়, তেতলায় ম্যানেজিং-ডিরেকটরের ঘরে। এসব চাকরি আমাদের হাতে নয়।

অধীর কণ্ঠে অরণেন্দু বলে, আপনাদের হাতে যা আছে তাই দিন দয়া করে। সবুর সইছে না।

ফোর্থ ডিভিসনের লোকজন দায়ে-দরকারে আমরা নিয়ে থাকি—

প্রশান্ত ব্যাখ্যা করে দেয়: মানে পিওন দারোয়ান বেয়ারা ঝাড়ুদার এইসব আর কি! আপনারা যা পারবেন না।

অরুণ বলে, তা-ও তো কেউ দিয়ে দেখল না। পারি না-পারি—পরখ হোক। কোট ছেড়ে ফেলব, তলার ছেঁড়া-সার্ট বেরিয়ে থাকবে। ট্রাউজার বদলে খাকির হাফপ্যাণ্ট পরে আসব। পনেরটা মিনিট শুধু সময় দেবেন আমায়।

সুব্রতার চোখ ছলছলিয়ে এলো। অরুণের হাত ধরে টেনে বলে, ঢের হয়েছে। চলে আয়।

রাস্তায় নেমে গম্ভীর চুপচাপ কয়েক মিনিট। তারপর জোর দিয়ে সুব্রতা বলল, ঘাবড়াসনে। আমি নেমেছি রণাঙ্গণে—চাকরি না হয়ে যায় কোথায় দেখি।

কী ভাবল একটুখানি। বলে, আয়—

কিছুদূর গিয়ে অরুণ বেঁকে দাঁড়াল: বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিস? আমি যাবো না। বেকার আছি তা বলে ফৌজদারি আসামি নই—জেরার তালে কেন যেতে যাব? বরঞ্চ যা বেলা আছে, আরও এক-আধটা অফিস ঘুরতে পারব।

বাড়িতে কেন নিয়ে যাব? ফিক করে সুব্রতা হাসল: গেলেও বিপদ ছিল না। জেরা আমার উপর দিয়ে বিস্তর হয়ে গেছে। সোজা বলে দিলাম, দেখতেই সুন্দর। বোকাসোকা মানুষ, কথাবার্তা কিছু ঝাল-ঝাল। একটা ক্ষমতাই আছে শুধু—দেদার পরীক্ষা পাশ করতে পারে। আর কোন কাজের নয়। তখন মা খপ করে আমার হাত এঁটে ধরে গায়ের উপর রাখল: গা ছুঁয়ে দিব্যি কর, ওর সঙ্গে মিশবিনে আর কখনো। বলতে হল, মিশবো না।

অরুণ বলে, ছি-ছি, মায়ের গা ছুঁয়ে বললি—তার পরেও মেশামেশি। তোর পাপের অন্ত নেই।

সুব্রতা হেসে বলল, চালাকি করেছিলাম রে। তড়বড় করে শেষের 'না' চেপে

দিলাম, 'মিশবো না' না বলে 'মিশবো' বলে রেখেছি। মহাগুরু ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছি 'মিশবো,' না মিশে এখন করি কি বলু।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বলে, মোড়ে গিয়ে দাঁড়া অরুণ, একটু সাজগোজ করে আসি। এক্ষুনি এসে যাব, দেরি হবে না।

অরুণেন্দু বলে, আবার কি সাজ করবি রে, বেশ তো আছিস।

নিজ দেহের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সুব্রতা বলল, না—নেই। থাকলে বলব কেন?

অতএব মোড়ের উপর অরুণ গাড়ি-মানুষ নিরীক্ষণ করছে। সামনে মেয়ে-কলেজ। একটা ক্লাস শেষ হয়েছে, গাদা গাদা মেয়ে বাইরে। ট্রাম-বাসের জন্য অপেক্ষা করছে, কতক বা গুলতানি করছে গুচ্ছ গুচ্ছ দাঁড়িয়ে। হেন অবস্থায় এই স্থলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা দৃষ্টিকটু। বিপজ্জনকও বটে। মেয়েদের কিছু কিছু সম্ভবত নিজ-মূর্তি আয়নায় দেখে না, রূপলাবণ্য নিয়ে বিষম দেমাক তাদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটা নিখরচায় তাদের রূপসুধা পান করছে, এইরূপ সন্দেহে গোটা দুই এগিয়ে এলো।

এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

অরুণেন্দু চটে গেল: ইচ্ছে হয়েছে। পাবলিক-রাস্তায় দাঁড়াব, তার জবাবদিহি কিসের?

আর মস্তানগুলো কোন রেলিং-এর ধারে কোন রোয়াকের উপর কোন গাছের তলায় বেমালুম হয়ে থাকে—ঠিক সময়টিতে যেন মন্ত্রবলে টের পায়। ধেয়ে আসছে। বিপন্ন অরুণ মনে মনে সুব্রতাকে গালিগালাজ করে: অত জাঁকালো কাপড়চোপড় পরনে—তাতেও পোষালো না। নতুন করে সাজ হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছেই—এতক্ষণ কিসে লাগে বুঝিনে। নাঃ, মেয়েলোক নড়ানোর চেয়ে হিমালয়পর্বত নড়ানো অনেক সহজ।

কী হল, কী হল—করতে করতে গুটি পাঁচ-সাত চ্যাংড়া মধ্যবর্তী হল: আমাদের পাড়ার কলেজ, আমাদের পাড়ার মেয়ে—আপনি নজর দেবার কে?

দিই নি নজর। দু-চক্ষু বুঁজে ছিলাম, ঠাহর পান নি। একচেটিয়া নজর আপনারাই দিন গে। মেয়ে-কলেজ আমাদের পাড়াতেও আছে—নজর দিতে বাস-খরচা করে এদ্দুর আসতে যাব কেন?

যুক্তিতে কুলায় না, বচসা ক্রমেই খরতর হচ্ছে। হেনকালে সুব্রতার আবির্ভাব।

অরুণ বলে, বুঝলেন এবার—কেন দাঁড়িয়ে দিলাম?

অনুযোগের সুরে সুব্রতাকে বলে, এইখানটা দেখিয়ে গেলি—দাঁড়ানোই তো গন্ধো-যন্ত্রণা। ফড়িংয়ের মতন সামনের উপর এতগুলো তিড়িং মিড়িং করছে—চোখ বুঁজে অন্ধ হয়ে দাঁড়াতে হল। তা সত্ত্বেও ছোঁড়াদের হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ার গতিক। জায়গা ছেড়ে সরতেও পারিনে, হুড্ হুড্ করে কোথায় তুই খুঁজে বেড়াবি।

পাড়ার মেয়ে সুব্রতা—ডানপিটে মেয়ে, সুনাম আছে। ছোঁড়াগুলো তক্ষুনি কেটে পড়ল।

অরুণ বলছে, কুইন এলিজাবেথেরও সাজ করতে এত সময় লাগে না।

সুব্রত বলে, রানীর চেয়ে অনেক কঠিন সাজ আমার। মানানসই শাড়ি একটা খুঁজে পাইনে। সাজগোজ যা-হোক এক রকম সারা হল তো বেরুনোর ফাঁক খুঁজছি। সদর পথে হবে না, বাবার চোখে পড়ে যাব। কানাগলির দুয়োর খুলে বেরুব—তক্কে তক্কে আছি, ঝি-চাকর কেউ দেখতে পেলে শতেক কথার তলে পড়ব: এদিকে কেন দিদিমণি, গলিতে কী তোমার? সাতচোরের একচোর হয়ে গুঁড়ি মেরে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছি।

সাজ অপরূপ বটে। আধ-ময়লা অতিসাধারণ শাড়ি পরনে, শাড়ির সঙ্গে মানান করে হাতাওয়ালা জামা। এলোচুল, মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। এমন কি, স্ট্র্যাপে তালি-দেওয়া স্যান্ডেল কোথা থেকে জোগাড় করেছে, সেই বস্তু পরে ফটফট আওয়াজে পা ফেলছে।

আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অরুণ হেসে বলল, এ সাজ কেন রে? আগেই তো বেশ ভাল ছিল।

ছিল না। কাগজের অফিসে ঢুকেই বুঝতে পারলাম। অস্বস্তি লাগছিল, তখন আর বেরিয়ে আসি কেমন করে?

অরুণ বলে, উমেদার তুই তো নোস—

সুব্রতা বলে যাচ্ছে, তখন ঢুকে পড়েছিলাম সচ্ছল বাড়ির এক শৌখিন মেয়ে। এবারে হয়ে যাচ্ছে এক উমেদারের—

উমেদারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বলবে, জিনিসটা চেপে গেল। হরিবিলাসবাবুর কাছে কী ভাবে আরম্ভ করবে, কথাগুলো কী হবে—সুব্রতা আদ্যোপান্ত মনে মনে মকসো করতে করতে যাচ্ছে।

হরিবিলাস ব্যস্ত মানুষ। দরজায় বোর্ড ঝুলানো ঃ নো ভেকেন্সি। লেখাটা সুব্রতা আঙুলে দেখিয়ে হতাশ ভাবে বলল, যা-চ্চলে।

বহুদর্শী অরুণ হেসে জ্ঞান দান করে ঃ তার মানে ঠিক জায়গায় এসে গেছি। খোঁজ নিয়ে দেখ্, চেম্বারের সামনে বারো-মাস তিরিশ-দিন বছরের পর বছর ধরে কায়েমি ভাবে এ জিনিস ঝুলছে। বলতে চাস, চাকরি এদের কস্মিন কালে খালি হয় না—মরণশীল মানুষ এদের কেরানি হয়েই মৃত্যু বিজয় করে ফেলে?

তবে?

চাকরি দেওয়ার হর্তাকর্তা আমি, বোর্ড ঝুলিয়ে সেইটে জানান দিচ্ছে। গূঢ় অর্থটা এই। ঝানু উমেদারে এক নজরে বুঝে নেয়। বেদবাক্য বলে অক্ষর মানতে গেছিস কি মরলি।

তবে মানব না—

বলে সুব্রতা সুইং-দরজার দিকে ধেয়ে গেল। বেয়ারা বাধা দিয়ে বলে, স্লিপ দিন আগে।

স্লিপের প্যাড ও পেন্সিল রয়েছে, নাম আর প্রয়োজন লিখে ভিতরে পাঠাতে হয়। সুব্রতা বলে, পরিচয় পেলে কি আর ঢুকতে দেবে?

কিন্তু বিনি হুকুমে ঢুকবেন কি করে?

এই তো ঢুকছি—

দরজা ঠেলে সুড়ুত করে টেবিলের ধারে দাঁড়াল। হরিবিলাস ঘোরতর ব্যস্ত, ফাইলে ডুবে আছেন। কাল সকালে ডিরেকটর-বোর্ডের মীটিং, তার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

মুখ তুলে ভ্রূকুটি করলেন ঃ কী চাই?

তীক্ষ্ম চোখে হরিবিলাস সুব্রতার দিকে বার কয়েক তাকালেন ঃ দরজার উপর বোর্ড ঝুলছে—দেখে আসেন নি?

সুব্রতা সকাতরে বলে, আমি আপনার মেয়ের মতো। 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন, দুঃখ লাগে।

বেশ হল তাই। চাকরি খালি নেই, কেন ঝামেলা করতে এসেছ?

সব দরজায় এমনি লটকানো। ঢুকতে মানা। কিন্তু পেট মানে না যে।

পেটের ভাবনা খুব বুঝি তোমার ?

মৃদু হাস্য খেলে যায় প্রবীণ অফিসারের মুখে : স্বাধীন-জেনানা হয়েছ—বাপের অন্ন খাবে না ?

আমতা-আমতা করে সুব্রতা বলে, আমার জন্যে ঠিক নয়—

ও, পরোপকার। না, তোমায় দালাল ধরেছে—কমিশন পাবে। দেখ, চাকরি-বাকরি বকলমে হয় না—নিজে আসতে হয়।

এসেছে বই কি। কিন্তু মেয়েছেলের সুবিধা পুরুষে পায় না তো—আমি ঢুকে গেছি, ও আটক হয়ে বাইরে পড়ে আছে।

এত সময় হরিবিলাস কাউকে দেন না। তার উপর বোর্ডের মিটিংয়ের ব্যাপারে আজ বেশি রকম ব্যস্ত। সুব্রতা দ্রুত দরজা খুলে হাত ধরে অরুণেন্দুকে নিয়ে এলো। হরিবিলাস চাচ্ছিলেনও ঠিক এই।

অরুণেন্দুকে দেখে নিয়ে গম্ভীর অভিভাবকীয় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : ছেলেটি কে হয় তোমার ?

সুব্রতা আগেই ভেবে রেখেছে। বেশি জোরদার হবে, তাই বলে দিল, স্বামী—

সশব্দে হরিবিলাস চেয়ারটা অরুণেন্দুর দিকে ঘোরালেন : এর বাপ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার। মেয়েটা ভেবেছিল চিনতে পারি নি—ওল্ড ফুল আমরা কিনা ওদের কাছে। তা বেশ হয়েছে—তুমি তো জামাই আমার। চাকরি নিশ্চয় দেবো—কিন্তু হুট করে তো হয় না, দু-চারদিন দেরি হবে। কোন কাজ পারবে তুমি ?

যা দেবেন—

কী কতগুলো কাগজে সই করাতে এক ছোকরা কর্মচারী এই সময়ে ঢুকল। হরিবিলাস তাকে বললেন, রুদ্র, তোমার টেবিলে নিয়ে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলো। নোট করে রাখো, তারপর আমায় দেবে সমস্ত। পরের ভেকেন্সিতে ছেলেটিকে ডাকব।

রুদ্র নিজ টেবিলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে : নানান ডিপার্টমেন্ট আমাদের—কোন্ কাজে সুবিধা হবে ?

অরুণ বলে, যা দেবেন—

ব্যঙ্গস্বরে রুদ্র বলল, যদি ম্যানেজার করে দেয়—পারবেন ?

পারব।

উমেদার নিয়ে মজা করা—এ জিনিসে অরুণের অঢেল অভিজ্ঞতা। একটা মিনমিনে ভাব ছিল গোড়ার দিকে, হেঁ-হেঁ করত—সেসব এখন কেটে গেছে। স্তোক দিয়ে তাকাচ্ছ তো সে-ই বা কম যাবে কেন, সমান সুরে জবাব দেয় : ম্যানেজার করলে পারব, ম্যানেজারের বেয়ারা যদি করেন তা-ও পারব।

কোয়ালিফিকেশন কী আপনার ?

একটা দুটো নয়, কাঁহাতক ফিরিস্তি দিয়ে যাই। কোন্ কোন্ চাকরি আপনার আন্দাজে আছে তাই বলুন, জবাবের সুবিধা হবে।

কৌতুককণ্ঠে রুদ্র বলছে, ধরুন ল-অফিসার। আইনের ডিগ্রি চাই।

হবে—

একাউন্টান্ট যদি হতে হয় ? কমার্সের ডিগ্রি তার জন্যে।

অরুণেন্দু নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, তা-ই হবে।

আর স্টেনো যদি লাগে ?

হেসে উঠে অরুণেন্দু বলে, ডিগ্রি নয় ডিপ্লোমা নয়, একটুকু সার্টিফিকেটের অভাবে সোনার চাকরি হাত-ছাড়া হতে দেবো নাকি?

বাব্বা, কত কি শিখে রেখেছেন!

অরুণেন্দু সগর্বে বলে, আরও তো জিজ্ঞাসা করলেন না। কাউন্টারে যদি বসাতে চান, সেলসম্যানশিপ পড়া আছে। টেলিগ্রাফির জন্য টরে-টক্কা শিখেছি। সোফার করবেন তো ড্রাইভিং লাইসেন্সও নিয়ে রেখেছি।

রুদ্র বলে, সবজান্তা যে আপনি।

হতে হয়েছে। বছরের পর বছর অবিরাম উমেদারি চালাচ্ছি। শুনি, অমুক ট্রেনিংটা যদি থাকত নিয়ে নিতে পারতাম। লেগে যাই তক্ষুনি। যেটা চাইবে, 'হাঁ' বলে যাতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারি—খুঁত খুঁজে না পায়। হতে হতে এখন আবার উল্টো খুঁত বেরুচ্ছে। বলে, হবে না—ওভার-কোয়ালিফায়েড আপনি।

রুদ্র বলে, বড় খুঁত ওটা। না-জানা ঢের ঢের ভাল. অনেক-কিছু জানলে কাজকর্ম হয় না। এটা না ওটা—মন উড়ু-উড়ু করে কেবল। অফিসের টাইপ করতে বসে খবরের-কাগজ দেখে দেখে নিজের দরখাস্তই টাইপ করবেন কেবল।

অরুণেন্দু সুব্রতার দিকে চোখ টিপল: হয়ে গেল আজকের মতন। কাল এগারোটা থেকে আবার। চল্—

রুদ্র তাড়াতাড়ি বলে, নাম-ঠিকানা দিয়ে যান। স্যার লিখে নিতে বললেন। লেখা রইল, সময়ে খবর পাবেন।

অরুণ সহাস্যে বলে, পাবো না, তামা-তুলসী ছুঁয়ে দিব্যি গালতে পারি। নাম-ঠিকানা নিশ্চয় নেবেন। অফিস-পাড়ায় সব ঘরেই প্রায় আছে—আপনাদেরই বা বঞ্চিত করি কেন?

বেরুল দু-জনে পাশাপাশি।

অরুণ বলে, চালাকি করতে গিয়ে কী বেকুবটা হলি! বুড়ো চিনে ফেলল।

বেকুব মানে? হরিবিলাস-জেঠা অন্ধ নন, আমি বেশ ভাল রকম জানি। হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেছি, তেমনি একটা ঢং দেখালাম। জেঠা মানুষটা ঘুঘু, তাহলেও বিলকুল বিশ্বাস করে ফেললেন।

ঢোক গিলে নিয়ে সুব্রতা বলল, অবিশ্যি যে-কোন মেয়ে তোর সঙ্গে প্রেমে পড়ে যেতে পারে। আর প্রেমে পড়ে বিয়ে করাও অসম্ভব কিছু নয়।

চোখ পিটপিট করে অরুণ বলে, আশা করি তুই পড়িসনি।

তাই কি বলা যায়? প্রেমিক-প্রেমিকা গোড়ার দিকে তো একেবারে বন্ধু বনে যায়। কিছু-একটা হয়েছে বলে সন্দ করি। নয়তো দেশ জুড়ে এত বেকার থাকতে তোর জন্যে এমন ঘোরাঘুরি করি কেন?

এই মরেছে! হতাশভাবে অরুণেন্দু বলে উঠল।

সুব্রতা অভয় দেয়: ঘাবড়াস কেন? ফাস্টক্লাস অনার্স আমি, সেটা ভুলিসনে। প্রেম হোক আর যাই হোক, হিসেব ঠিক থাকে। ভালরকম রোজগার যদ্দিন না হচ্ছে, বিয়েথাওয়ার আশা করিসনে।

অরুণ বলে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রে বাবা। রোজগারপত্তর কোনদিনই হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। হয়ে দরকারও নেই, তুই তখন গছে পড়তে পারিস।

আবার বলে, চা খেয়ে নিইগে চল্। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝগড়ায় জোর বাঁধছে না।

সুব্রতা বলে, বেশ তুই! দরজায় দরজায় এত ঝাঁটা-লাথি খেয়ে দিব্যি কেমন হাসতে পারিস।

ঝাঁটা-লাথি সত্যি সত্যি হলে দেহে লাগত, আপত্তি করতাম। মুখের কথা এ-কান দিয়ে ঢোকে, ও-কানে বেরোয়—মনে পৌঁছয় না। ঘোড়ার-ডিম মনই তো নেই—রগরগে মন একটা ভিতরে থাকলে উমেদারি করা চলে না।

খানিকটা হেঁটে চৌরঙ্গির একটা মাঝামাঝি রেস্তোরাঁয় ঢুকে গেল।

সুব্রতা বলে, কী খাবি বল্।

যা তুই খাওয়াবি। নিখরচায় বিষ পেলেও আপত্তি নেই। রাত্রে রুটি খাই, সেইটে যদি বাঁচাতে পারি অনেক মুনাফা।

খেতে খেতে অরুণ খপ করে জিজ্ঞাসা করলঃ একেবারে তুই ও-কথা বলে বসলি কেন?

কোন কথা?

আমায় জড়িয়ে সম্পর্ক বাড়াতে বাড়াতে কোথায় নিয়ে তুললি?

বলেছি, বর তুই আমার—

সুব্রতা সহজভাবে বলে, এর আগে ক্লাসফ্রেণ্ড বলেছি বয়ফ্রেন্ড বলেছি মামাতো-ভাই সহোদর-ভাই বলেছি—কাজ হচ্ছে না তো শেষটা বর। দেখি কয়েকটা দিন। এতেও যদি না হয় তো আর এক মতলব ভেবে রেখেছি।

কাটলেটে কামড় দেয় আর মিটিমিটি হাসে। বলে, বাচ্চা ভাড়া পাওয়া যায় শুনেছি। তাই একটা ঘাড়ে ফেলে তোর পিছনে নিয়ে অফিসে ঢুকে পড়বঃ স্বামীকে এক্ষুনি একটা চাকরি দিন স্যার, বাচ্চার মুখে জল-বার্লিটুকুও দিতে পারছি নে। ভাল অভিনয় জানি আমি—এ-ও দেখিস বিশ্বাস করবে।

॥ আট ॥

'চাকরি দিন' 'চাকরি দিন'—এ রকম আন্দাজি বুলি না ছেড়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে 'অমুক চাকরিটা দিন—' বলে যদি চেপে ধরা যায়, তবে খানিকটা কাজ হতে পারে, মনে হয়। কিন্তু কর্মখালির খবর বের করার উপায়টা কি? খবর যখন কানে এসে পৌঁছয়, তার আগেই লোক বহাল হয়ে গেছে। কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন রীতিরক্ষার এক বস্তু, সর্বলোকে জানে।

শ্মশানে ঘুরে বেড়ালে কেমনটা হয়, কিছুদিন থেকে অরুণেন্দু ভাবছে।

স্ত্রী-পুরুষ যুবা-বৃদ্ধ খাটে চড়ে এসে এসে হাজির হন। বয়স ও চেহারা থেকে অনুমান করে চাকরিস্থলের খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে। শ্মশান-বন্ধুদের সঙ্গে খাতির জমাতে হবে, অবস্থা বিশেষে দু-দশ ফোঁটা অশ্রুপাতেরও আবশ্যক হতে পারে। আরও এক রাস্তা আছে—অহোরাত্র অফিস সাজিয়ে যাঁরা মড়া রেজেস্ট্রির কাজে আছেন, তাঁদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলাঃ চাকুরে মড়া বলে যদি ধরা পড়ে, নামধাম ও অফিসের নাম দয়া করে টুকে রাখবেন—আমি এসে এসে নিয়ে যাবো। নিরম্বু দয়ার বশে নিশ্চয়ই করবেন না, খরচা করতে হবে। তা হলেও ঝামেলা কম। গোরস্থানেও অনুরূপ ব্যবস্থা হতে পারে। উমেদারিতে হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান-বৌদ্ধ নেই—কর্মটি রীতিমতো সেকুলার এ বাবদে।

খাতা লেখার ডিউটি শেষ করে এসে অরুণেন্দু দরখাস্ত লিখতে বসেছিল। বেশ একগাদা হয়েছে। সকালবেলা ডাকবাক্সে ফেলবে। এককালে দরখাস্তের সঙ্গে স্ট্যাম্প

পাঠাত জবাবের প্রত্যাশায়। বহুদিন বন্ধ করে দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও খরচা প্রচুর—ডাকটিকিটের খরচা খাইখরচা ছাড়িয়ে গেছে। কিছু দরখাস্ত ইদানীং বিনাটিকিটে বেয়ারিং-পোস্টে ছাড়ছে। অনবধানতায় ভুল হয়ে গেছে—এই আর কি। বড় বড় কোম্পানি ওরা—কয়েকটা পয়সা দিয়ে নিয়ে নেবে ঠিক। না নিলেই বা করছি কি।

দরখাস্তগুলো খামে এঁটে ঠিকানা লিখে একত্র বেঁধে রাখল। সন্ধ্যা থেকে লেখা চলছে—আঙুল টনটন করছে বড্ড। রাত্রের রুটি চাঁদ-কেবিনেই বানিয়ে দেয়। রুটি ক'খানা খেয়ে পিছন-কামরায় এসে নিঃশব্দে অরুণ শুয়ে পড়ল। ঘুম আসে না, নানান চিন্তা। এত করেও কিছু হচ্ছে না, কোনদিকে আলোর কণিকা দেখা যায় না—মানসপটে তখন ঐ শ্মশানঘাট গোরস্থান ইত্যাদি কৌশল ভেসে আসছে। দাদা পূর্ণেন্দুর মৃত্যুর সঙ্গে নিত্যদিনের লুকোচুরি খেলা—উপজীবিকা তার ওই। দাদাই এতাবৎ জিতে আসছে, কিন্তু কোনো এক ক্ষণে তিলেক অসাবধানে পেলে মৃত্যুও ছেড়ে কথা কইবে না। যশোদার কথা ভাবে—শয্যাশায়ী পঙ্গু অবস্থায় ম-জননী সম্ভবত কান পেতে আছেন, কনিষ্ঠপুত্র সম্রাট হয়ে লোকলস্কর সহ মহা ধুমধামে উঠানে এসে পড়েছে। এবং বউদি মলিনারও আশাভঙ্গের কারণ নেই—সম্রাটের তাঞ্জামের পিছনদিকে ঐ যে চতুর্দোলা। মাথায় মুকুট ঝলমলে সাজসজ্জায় সুব্রতাই বুঝি রাজরানী সেজে তালপাতার কুঁড়েঘরের ছাঁচতলায় এসে নামল। ওরে বাজনা বাজা, উলু দে। পাথরের থালায় দুধে-আলতায় গুলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়—নতুন-বউ নেমে তার মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়াবে।

স্বপ্ন দেখতে দোষ কি—নিখরচার বস্তু, দেদারু দেখে যাও। জীবনে না আসুক, স্বপ্নেই এসে যাক না খানিকক্ষণের জন্য। ধরো, ব্যবস্থা এমনি হয়ে গেছে—পড়াশুনো শেষ হতে না হতে তোমার নামে এই মোটা এক সরকারি চিঠি—এক ডজন চাকরির লিস্টি যাবতীয় বিবরণ সহ। বেছে নাও যেটা তোমার পছন্দ। নেবোই না, যদি বলোঃ না স্যার, কাজকর্মে আমার রুচি নেই, বাড়ি বসে বসে ঘুমুব, এবং তাসপাশা খেলব—পুলিশ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে সরকার তোমায় কাজে জুতে দেবে। দেশের ছেলে তুমি—তোমার জ্ঞান-বিদ্যা-শ্রমশক্তি সরকার নৈষ্কর্মে নষ্ট হতে দেবে না। দেশেরই লোকসান তাতে। শিক্ষার দায় সরকারের, আবার সেই অর্জিত শিক্ষা বিফলে না যায় সেই অপব্যয় নিরোধের দায়ও সরকার কাঁধে তুলে নিয়েছে। ব্যাপারটা নিতান্তই কল্পনা-বিলাস কিন্তু নয়। আছে এইরকম জিনিস—আছে, আছে। প্রাগ থেকে ছেলেমেয়ের একটা দল এসেছিল—একজনে বলছিল পড়াশুনো শেষ হতেই চাকরির লিস্টি চলে এলো, চাকরিও পছন্দ করে ফেলেছি। তিন মাসের ছুটি দিয়েছে—কষ্ট করে ইস্কুল-কলেজ ঠেঙালে এদ্দিন, কর্মচক্রে সেঁদিয়ে পড়বার আগে ফুর্তিফার্তি করে নাও মাঝের এই তিনটে মাস। এদেশ-সেদেশ তাই একটু চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছি। বিদেশি ছেলেটার উক্তিগুলো কি ডাহা-মিথ্যে বলে ধরব?

হরিমোহনের কাছে অরুণেন্দু ও সুব্রতা যুগলের দরবার করে গেল। তারই কয়েকটা দিন পরে এক পার্টিতে জগন্নাথের সঙ্গে দেখা। হরিমোহন অনুযোগ করলেনঃ আপনার জামাই দেখলাম। পছন্দসই জামাই বটে—দেখতে খাসা, কথাবার্তাও চমৎকার। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, আমরা একটু জানতে পারলাম না।

আমার জামাই?

জগন্নাথ আকাশ থেকে পড়লেন।

আপনার মেয়ে সুব্রতা আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল চাকরির জন্য।

স্তম্ভিত জগন্নাথ। কথাবার্তা বলে সহজ হতে গেলেন, কথা বেরুল না।

হরিমোহন বললেন, চাকরি তো আর হাতে মজুত থাকে না—বলে দিলাম সেইকথা মা-জননীকে। ওরা আমায় বড্ড দায়ের মধ্যে ফেলেছে। নতুন-জামাই আবদার ধরেছে, তার উপরে আছে সুব্রতা মায়ের সুপারিশ। যেভাবে হোক ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে। নাম লিখে নিয়েছি।

এর পরে জগন্নাথ যতক্ষণ পার্টিতে ছিলেন, হরিমোহনের পাশ কাটিয়ে বেড়ান। কারো সামনে জামাইয়ের প্রসঙ্গ উঠে না পড়ে। এই মেয়ে হতে হাড়ে-দুর্বাঘাস গজাবে, দেখা যাচ্ছে।

বাড়ি এসে সুব্রতাকে ডেকে ঘরের দরজা এঁটে দিলেন: বিয়ে করেছিস।

সুব্রতা বলে, তবু ভালো! তোমার চোখ-মুখ দেখে আর তোমার দরজা দেবার ঘটা দেখে ভাবলাম, বুঝি খুনখারাবি করে এসেছি কোথায়।

জগন্নাথ বলেন, বাজে কথা রাখ। বিয়ে করে বসেছিস কিনা, খুলে বল।

তা হলে কি টের পেতে না তোমরা?

না, পেতে দিসনে তোরা আজকাল—

জগন্নাথ খিঁচিয়ে উঠলেন মেয়ের উপর: বিদ্যেবতী স্বাধীন-জেনানা হয়েছিস—নিজের গার্জেন নিজে। রেজিস্ট্রি-অফিসে কাজকর্ম সম্পূর্ণ সেরে তারপরে সুবিধা মতন একদিন জামাই নিয়ে হাজির দিবি: বাবা, এই দেখ তোমার জামাই—

সুব্রতা বলে, মিছামিছি গাল দিচ্ছ বাবা। আমি যেন করেছি সেইরকম।

করেছিস বইকি! আমার কাছে না হোক, অন্যের কাছে ঠিক এই জিনিস করেছিস। হরিমোহনদা'র কাছে নিয়ে গিয়েছিলি।

তাই তুমি অমনি বিশ্বাস করে বসলে?

তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে জগন্নাথ বললেন, কী বলতে চাস, হরিমোহনদা মিছে কথা বললেন আমার সঙ্গে?

অম্লানবদনে হতভাগা মেয়ে বলল, মিছে কথা আমিই বলেছি হরিমোহন জেঠার সঙ্গে। বড্ড গরিব বাবা, ডেকে পাঠিয়ে তার নিজের মুখে একদিন না-হয় শোন। ছোট্ট একটা ঘরে জন পাঁচ-সাত গাদাগাদি হয়ে পড়ে থাকে, কোনদিন খায় কোনদিন খায় না। এমন মানুষ তোমার জামাই হবে কেমন করে?

তবে বলে বেড়াচ্ছিস কেন?

পরোপকার। আরও অনেক রকম বলে দেখেছি, কিছুতে কাজ দিল না। শেষটা এই মোক্ষম সম্বন্ধ বলতে লেগেছি।

পাগল নাকি তুই! খবরদার, বলবিনে এমন। সোমত্ত মেয়ে নিজ-মুখে এইসব বলে বেড়াচ্ছিস—বিয়ে হবে কোনো কালে?

সুব্রতা আবদারের ভঙ্গিতে বলে, তবে তুমিই একটা চাকরি দাও বাবা। কাউকে কিছু বলতে যাবো না।

জগন্নাথ রেগে উঠলেন: চাকরি আমি গড়াব নাকি?

তবে কিছু বলতে পারবে না। কথা দিয়েছি, চাকরি আমি দেবোই জুটিয়ে। চেষ্টা আমি সর্বরকমে করব, কথার খেলাপ হতে দেবো না।

মেয়ের জেদ দেখে জগন্নাথ নরম হলেন: ছেলেটা কে তোর শুনি?

ক্লাসফ্রেন্ড। প্রেসিডেন্সিতে একসঙ্গে পড়েছি।

পড়েছিস আরও তো কতজনের সঙ্গে। গণতিতে এক-শ দু-শ হবে।

সুব্রতা বলে, বছরের পর বছর বেকার হয়ে ঘুরছে। কত চেষ্টা করল, কিছুতে কিছু হয় না।

জগন্নাথ বললেন, এ রকম লক্ষ বেকার কলকাতা শহরে।

অরুণবাবুর চাকরি হলে লাখ থেকে একটা তবু কমবে।

সকাতরে বলে, কথা দিয়ে বসেছি—ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে আমারও তো পায়ে ব্যথা হয়ে গেল। দাও বাবা কিছু জুটিয়ে—কোনরকমে সংসার চলবার মতো হলেই হবে।

সংসারের পরিচয় নিচ্ছেন জগন্নাথ : কে কে আছেন ছেলেটার ?

আমি তা কী করে জানব ? মা আছেন শুনেছি। মায়ের উপর বড্ড টান, মায়ের নামে পাগল হয়ে ওঠে। মায়ের জন্য কিছু করতে পারল না, সেই জন্য বেশি ছটফটানি। দাদাও আছেন বটে—একবার এসে ধরে পেড়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে বলতে সুব্রতা থেমে গেল। ফিক করে হেসে আবার বলে, এত খবর কেন নিচ্ছ বাবা, সত্যি সত্যি জামাই করতে চাও ? চেহারা দেখলে সেইরকম ইচ্ছে হবে, দেখ একবার, তারপরে বোলো।

একটু থেমে মিটমিট হেসে বলল, চেহারা দিয়ে তো পেট ভরবে না, আসলে আটকাচ্ছে। তোমার জামাই হলে তো অফিসার হতে হবে আগে। আর নয়তো কালোবাজারের ফড়ে। তোমার মেয়ে যাতে আরামের মধ্যে গা ভাসিয়ে সাঁতরাতে পারে। অত হাঙ্গামে কাজ নেই বাবা, যেমন-তেমন একটা চাকরি জুটিয়ে দাও তুমি—আমার কথা রক্ষে হয়ে যাক। চাকরি হয়ে গেলে আর কোন সম্পর্ক নেই—মিথ্যে পরিচয় দিয়ে লোকের দয়া কুড়োতে যাব না। কী দরকার !

জগন্নাথ কুল দেখতে পেলেন : সত্যি বলছিস ?

দিয়ে দেখ। স্বামী-টামি কিচ্ছু বলব না। তাই বা কেন—মোটে কথাই বলব না তখন। শতেক হাত দূরে দূরে থাকব। দেখো তুমি।

মেয়ের কাঁধ থেকে ভূত নামানোর দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। নয় তো বিয়ে দেওয়া দুর্ঘট হবে। লোকের কাছে নিজেরাও মুখ দেখাতে পারবেন না। বিস্তর কলকৌশল খাটিয়ে মাস তিনেকের ভিতর জগন্নাথ চাকরি জুটিয়ে দিলেন—তাঁর নিজের অফিসে।

চাকরি এলো তবে সত্যি সত্যি—অরুণেন্দুর মুঠোয় স্বর্গ। কলম মুঠোয় ধরে প্রতিদিন দশটা-পাঁচটা পেষণ করে যাও। জীবনতরী তর তর করে চলল এবার—আবার কি! মৃত্যুর ঘাট অবধি পেঁছে দিয়ে ছুটি। যেমন-তেমন চাকরি দুধ-ভাত, যশোদা বলে থাকেন। শাক-ভাতের বদলে এবারে মা দুধ আর ভাত মনের সুখে খাবে।

জগন্নাথ অরুণকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, এই তিন মাস তোমার জন্যে যা করেছি, সে আমি জানি আর ঈশ্বর জানেন। চাকরি শুধু চেষ্টা করে হয় না, ভাগ্যেরও দরকার। ভাগ্য তোমার হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে গেল, হারাণবাবু অসুখে পড়লেন। কষে আমি নোট দিতে লাগলাম, ক্লার্ক ছাড়া একদিনও চালাতে পারব না। জানাশোনা একটি ভালো ছেলে আছে। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার দায়িত্ব নিচ্ছি। চাকরি আপাতত টেম্পোরারি, কিন্তু সেটা কিছু নয়—

গলা নিচু করে বললেন, অসুখ সাংঘাতিক। যমের দোসর—ক্যানসার। নির্ঘাৎ টেঁসে যাবেন। ও কালব্যাধি থেকে কেউ ফেরে না। কথাটা যেন ছড়িয়ে না যায়—ডাক্তারের কড়া নিষেধ। রোগির কানে গেলে দশটা দিনও আর বাঁচবেন না।

এদিকেও জগন্নাথ তিলার্ধ নিশ্চিন্ত নেই। মেয়ের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সুব্রতাকে স্মরণ করিয়ে দেন: আমার কথা আমি রেখেছি। তোর কথারও নড়াচড়া না হয় যেন।

সুব্রতা বলে, আনো সম্বন্ধ। আমি কি আপত্তি করছি?

মাসের মাইনে হাতে এসে গেল। সত্যি-চাকরির টাকা—দাদা সেই যে চাকরে-ভাই সাজিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে মা বউদি এবং পাড়াসুদ্ধ মানুষকে ভাঁওতা দিয়েছিল, সে জিনিস নয়। এবারে বাড়ি যাওয়া যেতে পারে—বিজয়ীর মতন মাথা উঁচু করে যাবে। আচার্যবাড়ির আতঙ্ক—ছেলে গছানোর জন্য তাঁরা মুকিয়ে রয়েছেন। ছোট্টুর জন্য সত্যিই এবারে চেষ্টাচরিত্র করবে, এবং হয়েও যাবে মনে হয়। যেহেতু বিদ্যের গন্ধমাত্র তার গায়ে নেই—নিরেট নির্ভেজাল মুর্খমানুষ।

সকলের বড় কাজ, রেল থেকে সরিয়ে এক্ষুনি দাদাকে বাড়ি এনে বসানো। রাস্তার ধারে একটা চালা তুলে দোকান দিয়ে দেবে, তেল-নুন-কেরোসিন বিক্রি করে যা দু-চার টাকা আসে। আর মাসের পয়লা হপ্তায় অরুণ তো নিয়মমতো টাকা পাঠিয়েই যাচ্ছে। কখনো তাতে ভুল হবে না। সংসার দিব্যি চলবে—দাদার ব্যবস্থাটা এইবার সকলের আগে।

জগন্নাথকে বলে রবিবারের সঙ্গে সোমবারটাও ছুটি করে নিয়েছে। বাড়ি যাবে। শনিবার অফিস থেকে সোজা বেরিয়ে পড়বে। বাড়িতে ইদানীং সে চিঠিপত্র লিখত না—বানিয়ে কত মিথ্যে আর লেখা যায়। বাড়ির চিঠিও পাঁচ-দশখানা এসে বন্ধ হয়ে গেছে। মা রেগে আছেন—চাকরিবাকরি নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, বাড়ির সকলের কথা ভুলে গেছে, এই রকম ধারণা। দুম করে আচমকা গিয়ে পড়ে মায়ের রাগ ভাঙাবে: মাগো, অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে এতদিনে বুঝি কূল পেলাম। কূল পেয়েই আমি বাড়ি ছুটেছি।

কিন্তু তার আগেই মায়ের চিঠি। চিঠি সর্বনেশে খবর এনে হাজির করল। আঁকা-বাঁকা অক্ষর, কাটাকুটি ও বানান-ভুলে ভরা—মায়ের জবানি বউদি চিঠি লিখে দিয়েছে: সাংঘাতিক বিপদ, পূর্ণর খোঁজখবর নেই, যে অবস্থায় থাকো বাড়ি চলে এসো।

গিয়ে পড়ল অরুণ। পুর্ণেন্দুর খবর ইতিমধ্যে মিলে গেছে। যে শঙ্কা করা গিয়েছিল তত দূর নয়—প্রাণে বেঁচে আছে সে। পাকিস্তান এলাকার মধ্যে ধরা পড়েছে। দলের অনেকগুলোকে ধরেছে—চরবৃত্তি করে বেড়ায়, এই নাকি সন্দেহ। হাজতে নিয়ে রেখেছে, মামলা হবে। এক ছোকরা কোন রকমে পালিয়ে এসে খবরটা দিল।

মা হাউ-হাউ করে কাঁদেন। কোণের দিকে ঘোমটা টেনে বউদি ঘাড় হেট করে একমনে মেয়ের কাঁথা সেলাই করছে।

অরুণ উচ্চকণ্ঠে প্রবোধ দিচ্ছে: মাকড় মারলে ধোকড় হয়, তোমরাও যেমন! চরবৃত্তি প্রমাণ করা অত সহজ নয়। আমাদেরও ডেপুটি হাই-কমিশনার মস্তবড় অফিস সাজিয়ে ঢাকায় বসে আছে। ভারতের প্রজার উপর অন্যায় জুলুম না হয়,

তাই দেখা কাজ তাদের। বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার লাগাবে, ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে আসবে দাদা দেখো। ছ্যাঁচড়া কাজে আর যেতে দিও না মা।

নতুন চাকরি, কামাই করা চলে না। বুঝিয়ে সুজিয়ে খরচখরচার টাকা যতদূর পারে মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে অরুণেন্দু কলকাতা ফিরল।

অরুণেন্দু অফিস থেকে ফিরছে। সুব্রতারা দোকানে কেনাকাটা করছিল। দেখতে পেয়ে সুব্রতা বেরিয়ে এলো।

সুসংবাদ দিল ঃ আমার বিয়ে।

চোখ বড় বড় করে অরুণেন্দু বলে, বলিস কি। বড্ড যে তাড়াতাড়ি—

বর রণদা রায়। প্রেসিডেন্সিতে আমাদের এক বছরের সিনিয়র। দেখে থাকতে পারিস আমার সঙ্গে। পড়ায় ইস্তফা দিয়ে বাঙ্গালোরে মেসোর রেয়ন-ফ্যাক্টরিতে ঢুকে গেল। বুদ্ধির কাজ করেছিল, মস্ত লোক সে এখন।

অরুণ বলে, আমি কেস করতে পারিস জানিস। তামাম অফিসপাড়া সাক্ষি মানব—আমার সঙ্গে কোনু সম্পর্ক নিজমুখে তুই পরিচয় দিয়ে বেড়িয়েছিস।

ঐ ভয়েই বাবা অতদূর নির্বাসন দিচ্ছেন—সে কি আর বুঝিনে। কলকাতায় বরের দুর্ভিক্ষ হয় নি যে বরের তল্লাসে বাঙ্গালোরে দৌড়তে হবে। এখানে বিয়ে দিতে ভরসা পান না, অফিসপাড়ার কাহিনী পাছে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যায়।

অরুণেন্দু বলে, বিয়ে না-ই হল—বিয়ের নেমন্তন্নটা যেন পাই দেখিস।

তা বলতে পারিনে—

সুব্রতার সাফ জবাব ঃ বাদই পড়বি, ধরে রাখ্। বাবার বাড়িতে বাবার নিজের বন্দোবস্ত—আমি কী করতে পারি বল্। তোকে নেমন্তন্নে ডেকে বিপদও ঘটে যেতে পারে। বিয়ে হবে শুনেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর চোখের উপর দিয়ে অন্য লোকের বউ হয়ে যাচ্ছি—হতাশপ্রেমিক তখন ছোরা বের করে আমার বুকে দিলি বা খ্যাঁচ করে বসিয়ে। অথবা নিজের বুকে।

মিটিমিটি হেসে বলল, রাজি থাকিস তো বল্। সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে তোর সঙ্গে পিঠটান দিই। আছে সাহস?

অরুণেন্দু রাজি নয় ঃ তা কেমন করে হবে, চাকরি চলে যাবে যে! আমার অনেক কষ্টের চাকরি।

সুব্রতা হাত নেড়ে বলে, যাক না। আমায় তো পেয়ে যাচ্ছিস।

তুই তো তুই—একখানা সসাগরা ধরিত্রী পেলেও চাকরি ছাড়তে রাজি নই। এ ভারতে সবকিছু মেলে, সাদা-বাজারে না হল তো কালোবাজারে, শুধু চাকরি মেলে না।

সুব্রতা একটুখানি ভাবনার ভান করে বলল, ঠিক আছে। হয়ে যাক বিয়ে নির্বিঘ্নে। চাকরিও তোর পার্মানেণ্ট হয়ে যাক। ডিভোর্স করে তখন বেরিয়ে আসব। কেমন?

ডিভোর্স বুঝি ইচ্ছে করলেই হয়?

এমন অবস্থা করে তুলব, রণু রায় নিজেই মামলা জুড়তে দিশে পাবে না। নির্ভাবনায় থাক তুই, খুব মন দিয়ে কাজকর্ম কর্, বস্ যাতে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি পার্মানেণ্ট করে নেয়।

সুব্রতা ব্যস্ত এখন। আরও কয়েকটি মেয়ে দোকানের ভিতরে। একসঙ্গে মিলে হয়তো-বা বিয়ের সওদা করতে এসেছে। খবরটা দিয়ে আবার সে দোকানে ঢুকে গেল।

মেয়ের প্রণয়পাত্র বলে অরুণের উপর জগন্নাথের সন্দেহ। এ হেন ব্যক্তিকে মেয়ের বিয়ের সময় বাড়ির উপর ডাকবেন না, সুব্রতা ভেবেছিল। নেমন্তন্নে অরুণ বাদ পড়ে যাবে, সেইটেই স্বাভাবিক।

হল ঠিক উলটোটি। গভীর জলের মাছ জগন্নাথ—অনেক গভীরে বিচরণ। নিজেই হঠাৎ অরুণের টেবিলে এসে চাপাগলায় বললেন, অবসর হলে আমার কামরায় একবারটি এসো বাবা। কথা আছে।

কামরার ভিতর নিমন্ত্রণ-চিঠি দিয়ে বললেন, অতিথি-অভ্যাগতের মতন গেলে হবে না কিন্তু বাবা। সুব্রতা তোমার বোনের মতো। আমি বুড়োমানুষ—দেখাশোনা খাটাখাটনি করে তোমাদেরই কাজ তুলে দিতে হবে।

যা বাব্বা, বোন বানিয়ে দিল রাতারাতি! ঐ আনন্দে থাকো বুড়ো। বিয়ে দিলেই আজকাল আর তালাচাবি পড়ে না। পদ্মপত্রে জল—পাকাপাকি বলে কিছু নেই আমাদের আজকের নতুন দুনিয়ায়।

বিয়ের দিন যথাসময়ে হাজির দিয়েছে। জগন্নাথ অতিমাত্রায় উদার—'বাবা' ছাড়া বুলি নেই মুখে। 'এসো বাবা, এসো এসো—' পথের উপর থেকেই হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলেন।

আগের দিনের সেই কথাবার্তার জের ধরে বললেন, সকাল সকাল আসতে বলেছিলাম। বরযাত্রীরা সব এসে গেছে। পয়লা ব্যাচেই বসেছে। টুকু দেখাশোনা করছে, তুমি থাকলে দু-জন হতে।

আহা রে, মরে যাই আর কি! টুকু জগন্নাথের ছেলে—টুকুর পাশাপাশি অরুণের নাম জুড়ে দিলেন। অরুণও সুব্রতার ভাই—কথাটা পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেওয়া। স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মেলা টাকাকড়ি থাকলে, নিদেন পক্ষে ভদ্রগোছের একটা পাকা-চাকরি থাকলে, অরুণই বরপাত্তোর হয়ে ছাঁদনাতলায় যেত। তা যখন নেই, ভাই তো ভাই-ই সই। চোরের রাত্রিবাসই লাভ। কনের ভাই হয়ে উত্তম খাওয়াটা মিলছে, সেটা ছাড়ব কেন। রাত্রিবেলার রুটির খরচা বেঁচে গেল আজ।

টুকুকে পেয়ে জগন্নাথ বললেন, জায়গা নেই আর, একটা জায়গাও হবে না? যাহোক করে অরুণেন্দুকে বসিয়ে দাও। বেচারি অনেক দূর যাবে, বেশি রাত হয়ে গেলে মুশকিল। ভিতরে চলে যাও বাবা টুকুর সঙ্গে—

একদিকে আলাদা একটু জায়গা করে অরুণকে বসিয়ে দিল। বিয়ের কনে হয়েও সুব্রতা বিষম ব্যস্ত বান্ধবীদের নিয়ে। খর-খর করে এদিক-সেদিক ঘুরছে। এরই মধ্যে একটু একলা হয়ে অরুণের কাছে এসে দাঁড়াল।

অরুণ বলে, দারুণ সেজেছিস রে! কী ভালো দেখাচ্ছে, চোখ ফেরে না!

ফেরা চোখ। প্লেটে নজর দে, নয়ত গলায় কাঁটা বিঁধে যাবে।

কাটলেটে কাঁটা কোথায়?

সুব্রতাকে ছেড়ে এবার কাটলেটের গুণ ব্যাখ্যান: মুচমুচে কাটলেট ভেজে ভেজে দিচ্ছে, খেতে বড় মজা। দেখ না খেয়ে একটা।

ভাল লাগছে তোর, তুই খা। প্রাণ ভরে খেয়ে নে।

কটমট করে তাকিয়ে সুব্রতা ঝুড়ি থেকে আরও খানকয়েক অরুণের প্লেটে ফেলে দেয়। তখনই যেন হুঁশ হল অরুণেন্দুর: ও, বিয়ের আগে খেতে নেই বুঝি তোর। কিন্তু বিয়ে তো রাত দুপুরে। ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মজা পাবি নে।

সুব্রতা শান্ত চোখে তাকিয়ে পড়ল, স্বরে তীব্রতা: তুই কি মানুষ?

অরুণ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে, আমারও ঠিক সেই সন্দেহ। ছিলাম একদিন, এখন আর নই। বছরের পর বছর উমেদারি করে পায়ে কড়া পড়ে গেছে, মনেও পড়েছে।

সুব্রতা দপ করে জ্বলে উঠল: বিনয় নয়, সত্যি সত্যি তাই। মানুষ হলে এ-বাড়ি ঢুকে তারিফ করে ভোজ খেতে পারতিস নে।

কী পারতাম? ঘরে শুয়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি দেওয়া আর ফোঁসফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা? কোনো মুনাফা নেই, দুনিয়া স্বার্থপর—কেউ তাকিয়েও দেখত না। তার চেয়ে মুফতের কাটলেটে ঠেসে উদর ভর্তি করে নিই। বুদ্ধিমানে তাই করে।

হাসতে হাসতে আবার বলে, ভাল ঘর-বর পেলি, আমোদ করে পেট ভরে ভোজ খাচ্ছি—তা এমন রেগে গেলি কেন বল্ দিকি? প্রেম-ট্রেম নয়তো রে? আমাদের গরিব ঘরে এ ঝঞ্চাট নেই। আমার বউদি আছে, তোরই বয়সি। কাপড় সিদ্ধ করে ডোবার ঘাটে আছড়ে আছড়ে কাচে, ধান ভানে, ভাত রাঁধে, কলসি কলসি জল বয়ে নিয়ে আসে। অত খাটনি খাটে, তার মধ্যে প্রেম সেঁধোবার ফাঁক কোথা? ও-জিনিস তোদের পক্ষেই সম্ভব বটে সুব্রতা। ভাল দাঁড়ে জুত করে বসতে পেলে কাকাতুয়া-ময়না-টিয়ারা তবেই 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি ছাড়তে লেগে যায়।

বরের ঘর করতে সুব্রতা তো বাঙ্গালোর চলে গেল। তারপর পুরো হপ্তাও কাটেনি—হারানচন্দ্র হেলতে দুলতে অফিসে এসে দর্শন দিলেন। চমক খেল অরুণেন্দু, চোখের উপরে যেন ভূত দেখছে। কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, সেরে এলেন?

সারব না মানে? বাবা বদ্যিনাথের চরণে গিয়ে পড়েছিলাম। বাবার মাহাত্ম, সেই সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য—দেওঘরের হাওয়া জল আর প্যাঁড়া। প্যাঁড়া গোড়ার দিকে একেবারে ছুঁতাম না। একটা দুটো করে বাড়তে বাড়তে দৈনিক এখন আধসেরে উঠে গেছে। তাই খেয়ে হজম করছি। মর্নিংওয়াক করি যশিদি স্টেশন পর্যন্ত—পায়ে হেঁটে নিত্যিদিন।

সোমবার থেকে কাজে বসবেন, আজ এসে দেখাশুনা করে যাচ্ছেন।

নিজ চেয়ারে গিয়ে অরুণেন্দু ধপ করে বসে পড়ল। স্বগত চিন্তা শব্দ হয়ে বেরুল: ক্যানসারও সারে আমার কপালে!

পাশের শৈলবাবু শুনতে পেয়ে বললেন, ছোটখাটোয় সুখ হয় না বুঝি ভায়া? চিরকেলে খাইয়ে-মানুষ—খাওয়ার অত্যাচারে অম্বলের ব্যথা ধরত। বলছেন ক্যানসার।

দোর ঠেলে অরুণ জগন্নাথের কামরায় ঢুকল: ক্যানসার সেরে-সুরে হারানবাবু যে চাঙ্গা হয়ে ফিরলেন।

একগাল হেসে প্রসন্ন কণ্ঠে জগন্নাথ বললেন, ভাল হয়েছে। বিস্তর দিনের পুরানো লোক। বলতে কি, তোমায় দিয়ে কাজ হচ্ছিল না বাপু।

কাজ তো ষোলআনাই হয়েছে। মেয়ে বেঁকে বসেছিল—বিয়েথাওয়া করে দিব্যি সে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

জগন্নাথ আর এখন উপরওয়ালা নন, চেপেচুপে কথা বলতে যাবে কেন? কপালে আঁচড় ছিল—চার মাস একনাগাড় চাকরি। মাইনের টাকা হাতে পেয়েই মাসে মাসে বাড়ি চলে গেছে, মা-বউদির তত্ত্বতালাস নিয়ে সংসার-খরচা দিয়ে এসেছে। সুব্রতার উপর অরুণ কৃতজ্ঞ, এটুকুও তার জন্য।

সুব্রতা মহানন্দে বরের ঘর করছে, অরুণ পুনর্মূষিক।

॥ নয় ॥

পলি চাকরি করে ইনপ্রুভমেণ্ট-ট্রাস্টের এস্টেটস অফিসে। কৃ-ফলার মতন দিন কতক খুব সে লেগে পড়ে ছিল, অরুণ পাত্তা দেয় না বলে ইদানীং উদাসীন। সেই অরুণ দশটার মুখে পলির অফিসের সামনে পায়চারি করছে। এসে পড়তেই একগাল হেসে বলে, অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। অফিসটা জানা ছিল, ভাবলাম এইখানে দাঁড়ালে দেখা হয়ে যাবে।

পলি অবাক হয়ে বলে, আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন ?

নয় তো ময়লা জমে ঐ যে ডাঁই হয়ে আছে—সুবাস নিচ্ছি এখানটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? দশটা বাজে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলার সময় নেই। আমি বললেও আপনার শোনার সময় হবে না। কাশীনাথ কর আপনার বাবা ?

ঘাড় নাড়ল পলি ?

ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসনে কাজ করেন তিনি ? প্রোমোশান হয়েছে কিছুদিন আগে ?

হ্যাঁ—

খুশি হয়ে অরুণেন্দু বলে, বাঃ বাঃ, ঠিক মিলে যাচ্ছে। জরুরি কথা আপনার সঙ্গে। ছুটির মুখে আবার এইখানে এসে দাঁড়াব, কেমন ?

পলির সবুর সয় না। জেদ ধরে বলে, যা বলবার এখনই বলুন। চলুন, পার্কে গিয়ে বসিগে।

অফিসে লেট হবে—

হয়, হোক গে। কামাই হলেই বা কী।

যেতে যেতে অরুণেন্দু বলল, আপনার মা শুনেছি অতিশয় স্নেহময়ী। ভগবতীর মতন।

পলি তাকিয়ে পড়েঃ কে বলল ?

অরুণেন্দু হেসে বলে, ঝানু উমেদার আর পাকা চোর সুলুক-সন্ধান নখাগ্রে নিয়ে কাজে নামে। আপনার মায়ের কাছে যেতে চাই একবার। আপনিই নিয়ে যাবেন।

বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আদুরে গলায় পলি বলে, 'আপনি-আপনি' করেন, কানে বড় বিশ্রী শোনায়।

তুমিই তো বলতে চাই। চাকরিবাকরি চাই একটা তার আগে। অতি-অবশ্য চাই, শলাপরামর্শ তারই জন্যে।

বলে দিল তো আবার কি। 'তুমি' সেই মুহূর্ত থেকে চালু। অরুণেন্দু বলে, অফিস আজ তবে সত্যি সত্যি কামাই করলে। পার্কের বেঞ্চিতে বসে কি হবে—চলো তোমাদের বাড়ি। কর্তা নেই এখন—মা আছেন বড়দিদি আছেন প্রণব আছে। আলাপ-পরিচয় করিগে চলো।

পলি সকৌতুকে বলে, আমাদের সকলের সব খবর নিয়েছ তুমি।

পুঁথি পড়ার মতন অরুণ বলে যাচ্ছে, মা তো তাসের নামে পাগল। চারজন হচ্ছি—তোমরা দু-বোন মা আর আমি। মা আবার ব্রিজ-ট্রিজ বোঝেন না—টোয়েণ্টিনাইন খেলা যাবে। চলো।

পলি হেসে খুনঃ কিচ্ছু অজানা নেই তোমার। সাক্ষাৎ অন্তর্যামী।

অরুণ বলে, পিছনের খাটনিটা জানো না তো। শুধু তোমাদের এই একটা জায়গাই নয়। যেখানে দেখিবে ছাই—সন্ধান একটু পেলেই হল, ছাই উড়োতে ছুটলাম।

চোরেরও এমনি। নিশিরাত্রে সিঁধ কেটে টাকার-ঘটি পাচার করেছে, সকালে উঠে দেখতে পেলেন। গৃহস্থ হায়-হায় করে বুক চাপড়াচ্ছে, আপনারা তারিফ করেছেন ঃ বাহাদুর বটে চোরচূড়ামণি! সকল ঘর বাদ দিয়ে বেছে বেছে ঠিক ঐ ঘরে ঢুকেছে, এবং বাক্স নয় সিন্দুক নয় মেঝে খুঁড়ে টাকার-ঘটি বের করেছে ঠিক। বাহাদুর তো কিন্তু কতদিনের কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় পিছনে রয়েছে, ক'জনে তার খবর রাখে! পরের বাড়ি ঢুকে হুট করে অমনি সিঁধ কাটা যায় না, ছ'টি মাস নেহাত পক্ষে বাড়ির চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করেছে। কোন জিনিষটা কোথায় রাখে মুখস্থ একেবারে। মানুষই বা ক'জন, কে কখন ঘুমোয়, কার ঘুম গাঢ় কার ঘুম পাতলা, রাতে বেরুনোর রোগ আছে কিনা কারো ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়ির হালচাল তন্নতন্ন করে জেনে বুঝে তবে সিঁধকাটি ধরেছে।

একখানা চুরি নামানো এবং একটি চাকরি বাগানো—পদ্ধতি উভয়েরই প্রায় এক-প্রকার। তদ্বিরশাস্ত্রের পরমপ্রাজ্ঞেরা বলে থাকেন—ডিরেকটর নয়, ম্যানেজার নয়, সেকসনের বড়বাবুটি কে খোঁজখবর নাও আগে। তাঁর নিচেই বা কারা সব আছে? আরদালি-বেয়ারারাও হেলার বস্তু নয়। থাকেন বড়বাবু কোনখানে? বাড়িতে কে কে আছে, তার মধ্যে অধিক পেয়ারের কে? ভোজন ব্যাপারে কোন কোন বস্তুতে আসক্তি? গোপন দোষদৃষ্টি যদি থাকে, তারই বা হদিস কি? মোটের উপর ডিরেকটর ম্যানেজার প্রমুখ বড় বড় চাঁইদের ধরে সামান্যই কাজ পাওয়া যায়। এ্যাপয়েন্টমেণ্ট-লেটারে সই করেন বটে, কিন্তু চাকরি তাঁরা দেন না। নিচে থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী হয়ে আসে। পুতুল-নাচের মতন হাতখানা তাঁদের সই মেরে যায়, টেরই পান না নেপথ্য থেকে কলকাঠি টিপছে অন্য মানুষ। ধরাধরি অতএব নিচু থেকে বিধেয়, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে নির্ঘাৎ পতন। শাস্ত্রের বিধানও তাই ঃ দুর্গোৎসবে বসে পুরুত সকলের আগে গণেশপুজো সারেন। বাচ্চাঠাকুরকে ভোগে তুষ্ট করে তবে জননী দশভুজা অবধি এগোনো যায়।

চাঁদ-কেবিনের জন্মকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে, সাড়ে-নটা বাজতেই সামনের রাস্তা দিয়ে এক প্রবীণ ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে চলে যান, ট্রাম-রাস্তায় পড়ে ট্রাম ধরেন। হাতে টিফিন-কৌটো এবং বগলে ছাতা—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সবঋতুতেই। অতএব অফিসের কেরানি সন্দেহ নেই। ফিরতি মুখে চাঁদ-কেবিনে ঢুকে হাফ-কাপ চা-ও খেয়ে যান মাঝে-মধ্যে। অরুণেন্দু উমেদার হিসাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও করে রেখেছিল। নাম গঙ্গাধর মুখুজ্জে, ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসন কোম্পানির পারচেজিং-সেকসনে জনৈক এ্যাসিস্টাণ্ট। বিস্তর দুঃখ করেছিলেন মুখুজ্জেমশাই ঃ সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। নামটাই শুধু বিলাতি, কোম্পানি বিলকুল দেশি হয়ে গেছে। অতবড় অফিস কুড়িয়ে লালমুখো সাহেব একটা বের করতেও পাবে না। ম্যাথুজের চেয়ারে মাধব প্রামাণিক এখন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে বসেছেন। রাস্তাটা পর্যন্ত দেশি বানিয়ে ছেড়েছে—ক্লাইভ স্ট্রীট পালটে দিয়ে নেতাজী সুভাষ রোড। একটা গুণ, এরা কখনো চাকরি খায় না। বয়সের বাঁধাবাঁধি ও নেই, এই দেখ না, চল্লিশটা বছর চালিয়েছি—তাগত থাকলে আরও চল্লিশ বছর অক্লেশে চালাতে পারব। সে আমলে এই রকম তো চলেছে, এই দেশি আমলে এরা কি করবে তা অবশ্য সঠিক বলতে পারব না।

পাঁচ-সাত দিন পাশাপাশি বসে চা খেয়েছিল, মুখুজ্জেমশায় তখন এইসব বলতেন।

কিছুদিন আর তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। মোটা রকমের অসুখ করেছে ঠিক, অল্পেস্বল্পে অফিস কামাইয়ের বান্দা এঁরা নন। আরও কিছুদিন পরে 'বলো হরি, হরিবোল' দিয়ে মড়া নিয়ে যাচ্ছে চাঁদ-কেবিনের সামনে দিয়ে। দলের মধ্যে কেবিনের দু-তিনটি চেনা খদ্দের।

কে চললেন রে পল্টু ?

গঙ্গাধর মুখুজ্জে—

কী সর্বনাশ! আরও যে চল্লিশ বছর মুখুজ্জেমশায় চালাবেন, কথা আছে। এরই মধ্যে ছেড়েছুড়ে চললেন ?

ক্যানসারও আরোগ্য হয়ে চাকরিতে ফিরে আসে, অরুণের এমনি কপাল। পুরো-পুরি প্রাণত্যাগ, শবদাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তির পরে গঙ্গাধর মুখুজ্জে আশা করি ফিরবেন না। চরবৃত্তির গুণে প্রকাশ পেল, সেকশনের বড়বাবুটি অন্য কেউ নয়—কাশীনাথ কর, পলি করের পিতৃদেব। প্রেম অতএব অবিলম্বে ঝালিয়ে নেওয়া আবশ্যক। খুঁত রেখে কাজ নয়, ঘাঁটি বাঁধতে বাঁধতে সতর্ক ভাবে এগুচ্ছে। চাকরি ঠেকায় কে এবারে!

বাইরের ঘরে কাশীনাথ খবরের কাগজ পড়ছেন। খবর মোটামুটি হয়ে গেল, বিজ্ঞাপন উল্টেপাল্টে দেখছেন। অরুণেন্দু ঢুকে পড়ে গড় হয়ে প্রণাম করল।

কাশীনাথ মুখ তুললেন। বড়বাবু হবার পর থেকে প্রণামাদি দেদার এসে থাকে—শুধো-প্রনামে তিনি বিরক্ত হন। অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, কি চাই আপনার ?

প্রয়োজন বলে ফেলা সঙ্গে সঙ্গেই উচিত হয় না, যথোচিত ক্ষেত্র বানাতে হবে আগে। অরুণেন্দু বলল, আজ্ঞে, 'আপনি' কেন বলছেন ? পুত্রতুল্য আমি।

কাশীনাথ ভ্রূকুটি করলেন: হল তাই বাপু—'তুমি' 'তুমি'। কী বলবার আছে, বলে ফেল। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

আপনি আমার দেশের লোক।

বটে ? বাড়ি কোথায় তোমার ?

পল্লীশ্রী কলোনিতে খান দুই চালা তুলে নিয়েছি। পৈত্রিক ভিটে যশোর জেলার সাতঘরা গাঁয়ে। এখন পাকিস্তানে চলে গেছে।

কাশীনাথ বললেন, ঠাকুরদার আমলে সাতঘরা বাড়ি ছিল, তা-ও বের করে ফেলেছ ?

পরমোৎসাহে অরুণেন্দু বলে, ছোটখাট একটু আত্মীয়-সম্বন্ধও আছে, হিসাবে বেরুচ্ছে।

হিসাব থাক, এসো তুমি এখন। আমি চানে যাবো।

যে আজ্ঞে—বলে তটস্থ হয়ে অরুণ উঠে দাঁড়াল। আর একবার পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে চকিতে নিষ্ক্রান্ত।

ইঙ্গিত মাত্রেই উঠে পড়বে, গড়িমসি করবে না—তদ্বির-শাস্ত্রে যাঁরা মহামহোপাধ্যায় তাঁদের উপদেশ। অরুণ আগে জানত না। এমনিধারা 'এসো'র উত্তরে ধানাই-পানাই করত কিছুক্ষণ। তাড়া খেয়ে তারপর মুখ চুণ করে পথে নামত। আনাড়ি কাঁচা উমেদার ছিল তখন। বের হয়ে গিয়ে পথে নামবে না সে আজ, পথ থেকে উঠেও এ-ঘরে আসেনি। গোড়া বেঁধে কাজ। গোড়ায় অনেকক্ষণ আগে অন্দরে এসেছিল, অন্দর থেকে বাইরের-ঘরে কাশীনাথের কাছে। কাশীনাথ বিদায় দিলেন তো শুড়-শুড় করে আবার সেই অন্দরে।

ঘণ্টা খানেক পরে কাশীনাথ অফিসে বেরুচ্ছেন। বেরিয়ে যাবার পরে অন্যদিন

অরুণ আসে। আজকেই সর্বপ্রথম তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ। বাইরের-ঘরে দেখা দিয়ে এসেছে, আবার ভিতরেও কাশীনাথ দেখতে পাচ্ছেন তাকে। প্রণবের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলছে সে—ঘর বারান্দা গলিতে পালাচ্ছে আর ধরা পড়ছে।

সবিস্ময়ে তাকাতে তাকাতে কাশীনাথ বেরিয়ে গেলেন।

অরুণ মনে মনে হাসে: হাতে যখন চাকরি, না দিয়ে যাবে কোথা বাছাধন। আটে-ঘাটে ধরেছি, নয়ন মেলে দেখে দেখে যাও।

পলির দিদি ডলি বিধবা। ছেলেপুলে নেই, টাকা আছে। বর মারা গেলে ইনসিওরেন্সের মোটা টাকা হাতে এসে গেল। মেয়ের শোক-দুঃখ কাশীনাথেরও ঘোরতর লেগেছে—চোখের আড়ালে মেয়ে রেখে সোয়াস্তি পান না। সেই থেকে ডলি বাপের সংসারে। দাবরাবের সঙ্গে আছে দস্তুরমতো।

পিকনিক আজ ডলিদের সমিতির, সকাল থেকে তারই কেনা-কাটায় বেরিয়েছিল। ফিরছে সে এখন, চানটান করে তৈরি হয়ে আবার বেরুবে। অরুণ আর প্রণব বাড়িময় ছুটোছুটি করছে। অবাক হয়ে ডলি বলল, অবেলায় এখন তোমরা খেলতে লেগেছ?

অরুণেন্দু বলে, প্রণবের কাল এগজামিন বড়দিদি।

পড়াশুনো না করে খেলছে তাই?

পড়ছেই তো। আমি পড়াচ্ছি—পাটিগণিত দেখুনগে টেবিলের উপর খোলা। অংক কষতে কষতে দেখি হাই তুলছে। তখন খেলায় নামিয়ে আনলাম। ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে যাক, আবার নিয়ে বসাব। যাবে কোথা।

তাই। কিছুক্ষণ খেলাধুলোর পর আবার প্রণব অংকে বসেছে। ওজর আপত্তি নেই, স্ফূর্তিতে কষে যাচ্ছে। লেখাপড়ায় এমন টান আগে দেখা যায়নি কখনো। গিন্নিঠাকরুন সুবাসিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। সবিস্ময়ে বলেন, পাঁচটা মিনিট ওকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যায় না—অরুণ ঠিক মন্তোর জানে, পেনুকে বশ করে ফেলেছে।

[বশ সবাইকে হতে হবে। সবুর করো না কয়েকটা দিন—ছোট ছেলে প্রণব থেকে কর্তামশায় কাশীনাথ অবধি কেউ আর বাকি থাকবে না। যে মন্তোরে যে দেবতা তুষ্ট। এ-বাড়ির ইঁদুরটা আরশুলাটাও বশে এসে যাবে। গঙ্গাধর মুখুজ্জের চাকরি কবজায় না এসে যায় কোথায় দেখি।]

ডলি-পলি দুই বোন তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরুল। ডলি সুবাসিনীকে ডেকে বলে, ফিরতে দেরি হতে পারে মা, ব্যস্ত হোয়ো না।

ডলি পিকনিকে যাচ্ছে। পলি অফিসে। বড়বাবু বলে কাশীনাথ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েন। পলির সে তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে দেরি করে যায়।

অরুণেন্দু বলল, গাড়ি গ্যারেজে পড়ে রয়েছে। কর্তা নিয়ে যাননি—আবার বিগড়েছে বুঝি?

ছিলেন কাশীনাথ ডেচপ্যাচ-ক্লার্ক, উন্নতি হয়ে পারচেজিং সেকশনের বড়বাবু। বড়বাবু হলেও কেরানি বই কিছু নন—পদমর্যাদার দিক দিয়ে তেমন-কিছু নয়, উন্নতি হয়েছে পাওনাগণ্ডায়। যেহেতু পারচেজিং অর্থাৎ কেনাকাটার সেকশন, ইতিমধ্যেই কাশীনাথ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটরগাড়ি কিনে ফেলেছেন। মোটর হাঁকিয়ে ইজ্জত বাড়ে ঠিকই, কিন্তু গাড়ি রাখার এত ঝঞ্ঝাট কে জানত।

অরুণ তাই বলছে, পুরানো গাড়ির বড্ড হ্যাঙ্গামা। নিত্যিদিন বিগড়ে বসে থাকে। তালি দিয়ে দিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ।

ডলি বলে, না গো, গাড়ি ঠিক আছে—বিগড়েছে ড্রাইভার। শহরে এক গাদা নতুন ট্যাকসি বেরিয়েছে, চাহিদা বুঝে যত ড্রাইভার জোট বেঁধে লম্বা লম্বা মাইনে হাঁকছে। গতিক দাঁড়িয়েছে, বাবু যে মাইনে পান তাঁর ড্রাইভারও সেই মাইনে দাবি করছে।

সুবাসিনী মন্তব্য ছাড়লেন: ড্রাইভার রাখা আর হাতি রাখা একরকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ড্রাইভারের খরচাই বোধহয় বেশি।

ডলি হেসে উঠে বলল, তবে মা ড্রাইভার না খুঁজে বাবাকে হাতি কিনতে বলো একটা। সে মন্দ নয়—ড্রাইভার দিয়ে না চালিয়ে হাতি জুড়ে দিও, তোমাদের গাড়ি হাতিতে টেনে নিয়ে বেড়াবে।

পলি বলে, গাড়ি আমাদের হল কিসে? খবরদার খবরদার, অমন কথা মুখেও আনবি নে দিদি। শুনে কেউ হয়তো ম্যানেজারের কানে তুলে দিল। গাড়ি তোর, ব্লু-বুকে তোর নাম রয়েছে। নিজেও তুই সেই ডাঁটে চলবি।

কেরানি মানুষ মোটরগাড়ির মালিক হলে লোকে নানান কথা বলবে। ভেবেচিন্তে কাশীনাথ গাড়ি তাই ডলির নামে কিনলেন। বলেন, সাধআহলাদ এই বয়সেই সব চুকে গেল, শ্বশুরবাড়ির ঐ অভ্যাসটুকু শুধু বজায় রেখেছে—মোটরগাড়ি চড়ে বেড়ানো। জামাইয়ের লাইফ-ইনসিওরেন্সের টাকা এসে গেল, একটা ছ্যাকড়া মোটর জোগাড় করে দিলাম সস্তাগণ্ডার মধ্যে।

কথার পৃষ্ঠে পলি জিনিসটা মনে করিয়ে দিল। অরুণেন্দু এদিকে বই-খাতা গুছিয়ে দিয়ে প্রণবকে বলল, এখন আর নয়—ছুটি তোমার। রাত্রে একবার ঝালিয়ে রেখো, সকালবেলা এসে আবার দেখব।

সুবাসিনীকে বলে, গাড়ির চাবি দিন মা।

চাবি কি হবে? সুবাসিনী বুঝতে পারেন না।

বড়দিদির সেই তো শিবপুরে পিকনিক। ট্যাকসি পান না পান, অতখানি পথ বাসে ঢিগ-ঢিগ করতে করতে যাবেন—আমি চট করে পৌঁছে দিয়ে আসি। পলি দেবীকেও অমনি অফিসে নামিয়ে দিয়ে যাব।

সুবাসিনী অবাক হয়ে বললেন: বলো কি গো, মোটর চালাতে পারো তুমি?

অরুণেন্দু ঘাড় কাত করল: প্রাকটিশ নেই অবিশ্যি অনেক দিন—

ডলি প্রশ্ন করে: আপনার লাইসেন্স আছে?

একখানা করে রেখেছি, যদি কখনো দরকারে লাগে।

করজোড় করল অরুণ: 'আপনি' 'আপনি' করবেন না বড়দিদি। মনে কষ্ট লাগে, যেন পর করে দিচ্ছেন।

পাকা হাত, মোটর-ড্রাইভারিই যেন অরুণের পেশা। প্রাকটিশ নেই ইত্যাদি বাজে কথা, বিনয়ের কথা,। বটানিক্যাল গার্ডেন অবধি এতখানি পথ বিনি ঝঞ্জাটে চলে এলো, কাশীনাথের প্রাচীন গাড়ি নিয়ে পথে বেরিয়ে কালেভদ্রে কদাচিৎ এমন ঘটে।

ডলি বলল, পিকনিকে তোমারও নেমন্তন্ন ভাই। থাকো, খেয়েদেয়ে একসঙ্গে সকলে ফেরা যাবে।

অর্থাৎ বাড়ির মোটরে এসে স্ফূর্তি লেগেছে, মোটরেই আবার ফিরতে চায়। অরুণের দোমনা ভাব দেখে বলল, জরুরি কাজকর্ম আছে নাকি খুব?

অরুণ বলে, আছে বড়দিদি। সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে আমায় ফেরত পেঁছিতে হবে। এত তাড়াতাড়ি হবে না তো আপনাদের।

হোক না হোক—আমি চলে যাব।

অরুণ অতএব রয়ে গেল। মুফতে একবেলা ভালমন্দ খেয়ে মুখ বদলানো যাচ্ছে। কে দেয়।

পরের দিন প্রণবের একজামিন। বাড়ির মধ্যে কেউ প্রায় ওঠে নি—অরুণেন্দু এসে হাজির। প্রণবকে ডেকে তুলে পড়ায় বসাল।

সুবাসিনীকে বলল, কর্তামশায়কে ট্রামে-বাসে যেতে হচ্ছে। ওঁর কষ্ট হয়। তা ছাড়া সেকশনের বড়সাহেব—ইজ্জতেও ঘা পড়ে। আমি পেঁছে দিয়ে আসব মা, ওঁকে বলে আসুন।

কাশীনাথ যথারীতি খবরের-কাগজ নিয়ে বসেছেন, অরুণের ডাক পড়ল। কর্তার চোখের উপরে অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে সে পদধূলি নিল।

কাশীনাথ বললেন, ড্রাইভিং-এ তোমার চমৎকার হাত, ডলি বলল। আমাদের যে ড্রাইভার ছিল, তার চেয়ে নাকি অনেক ভাল। এম-এ পাশ করা ছেলে মোটর-ড্রাইভারি শিখতে গেলে কেন তুমি?

অরুণেন্দু বলে, দু-চোখের মাথায় যা-কিছু পড়ে, শিখে রেখে দিই। আমার কোন বাছবিচার নেই। পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে কাজকর্ম খুঁজছি—কপাল খারাপ, কোন-কিছুই গাঁথে না। রাজা ব্রুসের মতো আমিও নাছোড়বান্দা। আশায় আশায় কোয়ালি-ফিকেশন বাড়িয়ে যাই। ড্রাইভারি থেকে ম্যানেজারি যে কাজে দেবেন, পিছপাও নই। কিন্তু দিয়ে কেউ দেখলেন না, এই বড় দুঃখ।

ম্যানেজারের নাম উঠতেই কাশীনাথ ক্ষেপে উঠলেন: ম্যাথুস অ্যান্ড হেণ্ডারসনের ম্যানেজারিতে আজকাল কোয়ালিফিকেসন লাগে নাকি? নামসইটা কায়ক্লেশে করতে পারলেই হল। দেখে এসো একদিন আমাদের মাধব প্রামাণিককে। যে আসনে বসে খোদ ম্যাথুস সাহেব বাঘের গর্জন ছাড়ত, প্রামাণিক সেখানে বসে মেনি-বিড়ালের মতন মিউ মিউ করছে। জেনারেল ম্যানেজার।

বড়বাবু হয়েই শেষ নয়, বোঝা যাচ্ছে। ম্যানেজারের চেয়ার অবধি তাক। আসল কথা, চেয়ার খালি করে দিয়ে প্রামাণিকমশায় চিতায় ওঠে না কেন ঐ গঙ্গাধর মুখুজ্জের মতো।

নামবার মুখে কাশীনাথ শতকণ্ঠে তারিফ করেন: না, ডলি একবর্ণ বাড়িয়ে বলেনি। লঝ্ঝড় গাড়িতে এতখানি পথ নিয়ে এলে— তা যেন গদিতে শুয়ে এলাম, গাড়িতে চড়েছি গায়ে-গতরে একবিন্দু মালুম হল না।

নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, পেঁছে তো দিলে বাপু, ফেরত যাবার কি? তখন আরো কষ্ট। ছোকরাদের বাড়ি যাবার টান—লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বাসে ওঠে—সে লড়াই বুড়োমানুষ আমরা পেরে উঠিনে। বাস আসে আর চলে যায়—স্ট্যাণ্ডে বুড়বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

অরুণেন্দু রা কাড়ে না, স্টিয়ারিং ধরে নির্বাক হয়ে আছে।

কাশীনাথ এবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলেন, পেঁছে দিয়ে গেলে তো ফেরতও নিয়ে যাবে বাবা। সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ চলে এসো।

আমতা-আমতা করে অরুণ বলে, ছেলে পড়াই ঐ সময়টা। অল্প টাকা দেয় বলে

ইস্কুল থেকে ফিরেই অমনি পড়তে বসে। রাত্রেও আছে একটু—দোকানে খাতা লেখার কাজ। কাঁধে বিষম দায়িত্ব স্যার, অথচ কিছুই করতে পারছি নে—মনের মধ্যে সর্বক্ষণ চাবুক মারে।

এত কথা কাশীনাথ কানে নিলেন না। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, বাসেই ফিরব—কী আর উপায়। যত রাত হয় হবে। ট্যাক্সি তো নিত্যদিন করা চলে না। ও-সময়ে পাচ্ছিই বা কোথায়?

চট করে অরুণেন্দু মনস্থির করে ফেলেঃ আসব সাড়ে-পাঁচটায়। নইলে আপনার কষ্ট হবে। গাড়ি লক করে রেখে যাচ্ছি। টুইশানিতে ইস্তফা আজ থেকে। সে বাড়ি যাবই না আর মোটে।

একটু ভেবে আপন মনেই যেন বলছে, চাকরি হলে সারাদিন খেটেখুটে গিয়ে আবার কি পড়াতে বসব? পৌঁছবই বা কেমন করে সাড়ে-পাঁচটায়? ছাড়তেই হত—সে জিনিস দশ-বিশ দিন আগেই না-হয় হয়ে যাচ্ছে।

চলল আপাতত এই অফিসে পৌঁছে দেওয়া ও ফেরত আনার কাজ। তা বলে ড্রাইভার নয় অরুণেন্দু—মোটেই নয়। বিনি-মাইনে আপ-খোরাকি। ড্রাইভারের মাইনে এম-এ পাশ শিক্ষিত ছেলে হাত পেতে নেয় কেমন করে? দেবেনই বা ওঁরা কোন লজ্জায়?

॥ দশ ॥

শুয়ে থেকে যশোদা একলাটি সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে বকেন। চোখের কোণে জল গড়ায়। মানুষ দেখলে আরও বাড়িয়ে দেন। অঙ্গ পড়ে গেছে, আর মুখের জোরটা বেড়েছে সাংঘাতিক। মলিনা পারতপক্ষে তাই সামনে আসতে চায় না। অথচ না এসেই বা করে কি, সে ছাড়া বুড়োমানুষের আছে কে দেখবার।

শাশুড়িকে চান করাতে এসেছে। কাঁখে জলের কলসি হাতে ঘটি ও বড় মানকচু-পাতা। উঠে বসতে পারেন না, শুয়ে শুয়ে সমস্ত।

বউকে দেখেই যশোদার গালিগালাজশুরু হয়ে যায়। মলিনা নয়, অরুণই যেন সামনের উপর হাজির।

পোড়াকপাল তোর মতন ছেলের। ভাইয়ের এই সর্বনেশে দশা—যে-ভাই তোর জন্যে আর সংসারের জন্যে কী না করেছে! মা-ভাই-ভাজ সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বুকিয়ে চাকরে-বাবু কলকাতায় স্ফূর্তি মেরে বেড়াচ্ছিস। এসে তো দুটো দিন খুব লম্বাচওড়া শুনিয়ে গেলি—বলি, সেই টাকায় কি চিরজন্ম সংসার চলবে?

মানকচু-পাতা যশোদার মাথার নিচে দিয়ে ঘটি থেকে মলিনা সন্তর্পণে জল ঢালছে, মাথা-ধোওয়া জল বেড়ার তলের ফুটো দিয়ে কানাচে যাচ্ছে। গামছা নিংড়ে পরিপাটি করে তারপর গা-মাথা মুছিয়ে দিল। যশোদার মুখের তিলার্ধকাল বিশ্রাম নেই, চানের মধ্যেও নয়—অবিরত চলছে। মাথা-খারাপের লক্ষণ। অভাব-অনটন দুশ্চিন্তা আর কুঁড়েঘরের মধ্যে এক শয্যার বারোমাস তিরিশ দিন পড়ে থাকা—মাথার আর অপরাধ কি।

হঠাৎ যশোদা গর্জে উঠলেনঃ চাইনে কিছু, তোর টাকাপয়সা ছোঁব না, ও হল গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত। যেখানে খুশি থাক তুই, যা ইচ্ছে কর। যে পাতে খাবো না, তা কুত্তায় চাটুক।

বধূর দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলেন, পোস্টকার্ড আনতে বলেছিলাম—

মলিনা বলে, এনেছি মা।

কালি-কলম নিয়ে এসো। আমি বলে যাচ্ছি, লেখো।

মলিনা ভয়ে ভয়ে বলে, বিকেলে লিখলে হবে। ভাত এনে দিই, বেলা হয়েছে বেশ।

যশোদা ধমক দিয়ে উঠলেন : লিখতে বলছি, লেখো তাই। এখন খাবো না—ভাত আনলে থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

চিঠির কী বয়ান মা-জননী ছেড়েছিলেন, সঠিক জানা নেই। তিনি বলে গেলেন, আর মলিনা হাঁটুর উপর পোস্টকার্ড রেখে টেরাবাঁকা লাইনে অগুন্তি বানান ভুল করে হুবহু লিখে গেল তাই।

রান্নাঘরের দিকে খুট করে কিসের একটু আওয়াজ। লেখা ফেলে মলিনা ছুটল। হুলোবেড়ালটা বড় উৎপাত করে। ঢাকাঢোকা আছে তো সমস্ত? দরজায় শিকল তোলা আছে?

আছে, ঠিক আছে।

দেখেশুনে ফিরে এলে যশোদা বললেন, কী লিখেছ—পড়ো একবার বউমা, শুনি।

আগাগোড়া পড়ে গেল মলিনা। মনোযোগ করে শুনে যশোদা এখানে ওখানে একটা-দুটো কথা জুড়ে দিলেন—আরো যাতে ঝাল বাড়ে। বললেন, বেশ হয়েছে। দশ কাজে তুমি ভুলে যেতে পারো, চিঠি আমার কাছে রইল। নিস্তার ঠাকুরুন এলে তার হাতে দেবো, যাবার পথে তিনি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে যাবেন।

অর্থাৎ এ অমূল্যনিধি বউমাকে দিয়ে ভরসা পাচ্ছেন না। দেওরের প্রতি দরদ উথলে উঠে ডাকবাক্সর বদলে হয়তো-বা ডোবার জলে ফেলল।

অফিস থেকে কাশীনাথকে বাড়ি পোঁছে দিয়ে অরুণ চাঁদ-কেবিনে চায়ের বাটি নিয়ে বসেছে। কোন রকমে গলাটা একটু সেঁকে নিয়ে আবার খাতা লেখার কাজে ছুটবে।

দুপুরবেলা চিঠি এসেছে, চাঁদমোহন এনে হাতে দিল। বলে, মায়ের চিঠি—তাই না?

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলল, বেড়ে আছিস ভাই। ঘরবাড়ি আছে, মা-ভাই আছে—বড্ড একখানা দাগা পেলি তো ছুটলি সেখানে, আদর-সোহাগে জুড়িয়ে এলি। চিঠিপত্তোর বন্ধ করে মাঝে মাঝে আবার পরখ করে দেখিস, কে কতখানি উতলা হল। আমার শালা কেউ নেই। মরে যখন যাব—নিজে পারব না, তোদের বলা রইল ভাই—গোটা কয়েক লোক ভাড়া করবি, মড়া ঘিরে বসে তারা কাঁদবে। ভাড়া যা লাগবে, হিসেব করে রেখে যাবো আমি।

অরুণেন্দু চিঠি পড়ছে, আর মৃদু মৃদু হাসছে। চা বানানোর ফাঁকে চাঁদমোহন একবার এসে জিজ্ঞাসা করল : খবর ভাল তো?

হুঁ—বলে ঘাড় নেড়ে দিয়ে চিঠি সে পকেটে পুরে ফেলল। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত, পোস্টকার্ডের চিঠি হলেও চাঁদমোহন ভিতরের মর্ম জানতে পারে নি। মলিনার হস্তাক্ষরের পাঠোদ্ধার চাটিখানি কথা নয়—অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও অরুণ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তার উপর চাঁদমোহন তো স্বমুখেই বলে থাকে, বিদ্যার ব্যাপারে কিছু 'কমজোরি' আছে সে।

গর্ভধারিণী মা কুচ্ছো করে যা-লিখুন—নতুন যিনি মা হয়েছেন, 'বাবা' 'বাছা' ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে। ইদানীং এমনি হয়েছে, অরুণ বিনে তাঁর একদণ্ড চলে না।

ভাঁড়ার দেখে সুবাসিনী মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন : একটি দানা চিনি সেই, র‍্যাশন পেতে আরও তো চার দিন। কী হবে?

হবে আমার কি। পেয়ে যাবেন।

হাসি-মুখে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে অরুণ বলে দিল।

সুবাসিনী অবাক হয়ে বলেন, বলো কি! চিনি একদম বাজারে নেই—হীরে-জহরতের সামিল হয়েছে।

আছে সমস্ত মা। বাজার বদল করেছে—সাদাবাজার থেকে কালোবাজারে গেছে। তাতে আপনার কী আসে যায়? সাদাবাজারের দরই দেবেন আপনি। কত লাগবে? র্যাশনের মালে তো কুলোয় না—কিছু বেশি করে নিয়ে নিন।

এই সমস্ত গুণের জন্যেই সুবাসিনী চোখে হারান অরুণকে!

এর পরে ভিন্ন এক প্রসঙ্গ। সুবাসিনী বললেন, গাড়ি যখন অফিস-পাড়াতেই যাচ্ছে, বাপের সঙ্গে পলিও তো যেতে পারে।

অরুণেন্দু লুফে নেয়ঃ খুব খুব, কেন পারবেন না। বাড়ির গাড়ি রয়েছে—তাতে না গিয়ে কেন যে ঝুলতে ঝুলতে ট্রামে-বাসে যান বুঝিনে।

অন্যের সামনে অরুণ-পলি পর-অপরের মতন দূরত্ব রেখে চলে, 'আপনি' 'আপনি' করে বলে। বলল, বলে দিন মা পলি দেবীকে। কর্তার অফিস থেকে ওঁর অফিস মাইলখানেক বড় জোর। পাঁচ মিনিটে আমি পেঁছে দেবো।

মেয়েকে সুবাসিনী আদেশ করলেনঃ আজকে তৈরী নও, আজ থাকল। বাসে যাবার তো দরকার নেই—বাপে-মেয়ের কাল থেকে একসঙ্গে বেরুবে। অরুণের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওঁকে অফিসে নামিয়ে তারপর তোমায় পেঁছে দিয়ে আসবে। সামান্য পথ, অরুণ বলল—ওঁর অফিস থেকে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

পলি হেসে বলল, ঐ জন্যেই তো যাইনে মা। বাবা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, দশটা না বাজতে গিয়ে অফিস আগলে বসেন। আর পৌনেএগারোটার আগে আমাদের দরজাই খোলে না। নামিয়ে দিয়ে অরুণবাবু তো হাওয়া—পুরো একঘন্টা সময় হা-পিত্যেশ আমি পথে দাঁড়িয়ে কাটাব?

কথা শোন! জোয়ান ছোঁড়া-ছুঁড়ি—সে ওকে পথে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে, একা একা উনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। গা জ্বালা করে শুনে। কলকাতা শহরে যেন বসার জায়গা নেই—পার্ক-টার্ক সমস্ত জ্বলেপুড়ে গেছে! শিক্ষিত সুদর্শন ছেলে, চাকরিও নির্ঘাৎ এইবারে—এতেও বুঝি মন উঠছে না। ফিল্ম-অ্যাকটর চাই বুঝি, না ক্রিকেটে-খেলুড়ে? পেটের মেয়েকে কত আর স্পষ্ট করে বলি!

ধৈর্য হারিয়ে ক্ষেপে গেলেন একেবারেঃ এত মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তোমার ভাগ্যে একটা বর জোটে না। হবে কি করে? যা দিনকাল—সন্দেশ-রসগোল্লা আজকাল কেউ মুখে তুলে ধরে না, খুঁজে পেতে লড়ালড়ি করে নিতে হয়। দিনকে-দিন খাটাশের চেহারা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—বাপ-মা হয়ে আমরা পর্যন্ত আঁতকে উঠি, বাইরের ছেলে ঘেষতে যাবে কোন দুঃখে? এক মেয়ে নোয়াসিঁদুর ঘুচিয়ে ধিঙ্গি হয়ে বেড়াচ্ছে, তোমার সে অবধিও পেঁছতে হবে না। চিরকাল আইবুড়ো থাকতে হবে।

এমন কটুক্তিতেও পলি রাগ করে না, হাসে।

কাজ হল কিন্তু। পরের দিন থেকে পলি আলাদা যায় না, বাপের সঙ্গে বেরোয়। আসার সময়টা—তার ছুটি আগে হয়ে যায়, একলা চলে আসে। কাশীনাথ নেমে অফিসে ঢুকলেন, পিছনের সিট থেকে পলি অমনি ড্রাইভারের পাশের সিটে চলে আসে। হাতে সময় পাক্কা এক ঘণ্টা—এক ঘণ্টা কেন, তার বেশি। সাড়ে-এগারোটায় হাজিরা দিলেও পলির অফিসে কিছু বলে না।

ভাবনাচিন্তা করে সকল দিকে দৃষ্টি রেখে নিখুঁত ব্যূহ-রচনা। দুর্গ বিজয় না হয়ে যায় কোথায় এবারে দেখি।

যথানিয়মে একদিন সন্ধ্যা পাঁচটায় অরুণেন্দু এসে গাড়িতে বার কয়েক হর্ণ দিল। দিয়ে অপেক্ষা করছে। ছ'টা বেজে গেল, অফিস খালি, কাশীনাথ বেরোন না। কী না-জানি ব্যাপার—ভিতরে ঢুকে অরুণেন্দু উঁকিঝুঁকি দেয়।

অত বড় হলঘরের মধ্যে একজন মাত্র মানুষ, কাশীনাথ—টাইপরাইটার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। নিবিষ্ট করে এক একটা চাবি টিপে কিছু টাইপ করলেন, তার পরে বিরক্তভাবে কাগজটা গুটিয়ে দলা পাকিয়ে বাস্কেটে ছুঁড়ে নতুন কাগজ নিয়ে আবার লেগে যান। পরিণামে তারও ঐ এক দশা।

অরণেন্দু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর্দশা দেখল ক্ষণকাল। তারপর সাড়া দেয়ঃ এসে গেছি স্যার। এইবারে তো বাড়ি যাবেন?

যাব তো বটেই। বিষম মুশকিলে পড়ে গেছি—

বিপন্ন স্বরে কাশীনাথ বলছেন, স্টেনো আজ তিন দিন আসে না। অথচ কয়েকটা চিঠি না ছাড়লেই নয়। কখন থেকে চেষ্টা করছি, হয় না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে গাদা হয়ে গেল।

অরুণেন্দু সবিনয়ে বলে, আমি চেষ্টা করে দেখব স্যার? প্রাকটিস নেই, ভুল আমার ও নিশ্চয় হবে।

হাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাশীনাথ, প্রাণে জল এলো। টাইপরাইটার ছেড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। দু-মিনিটে চিঠিখানা টাইপ করে অরুণেন্দু তাঁর হাতে এনে দিল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে কাশীনাথ বলেন, বাঃ বাঃ, ভুল হবে বলে যে বিনয় করছিলে! টাইপের পাকা হাত তোমার। নিখুঁত হয়েছে।

একটা হয়ে গেল তো কাগজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিন্ন একটা মুশাবিদা করছেন। বলেন, চিঠি আর ও কয়েকটা আছে। বসেছ চেয়ারে তো উঠে পড়ো না, শেষ করে যাও।

অরুণেন্দু বলে, কাগজে-কলমে লিখতে হবে কেন। ডিকটেশন দিন, নোট নিয়ে নিই। তাড়াতাড়ি হবে।

কাশীনাথ সবিস্ময়ে বললেন, সর্টহ্যাণ্ডও জানো? ওরে বাবা, সবগুলো গুণ কবজা করে বসে আছে—তোমার চাকরি ঠেকায় কে!

গুণ দেখিয়ে চাকরি হয় না স্যার। বৃথাই খেটে মরেছি, খেটে খেটে গুণ বাড়িয়ে গেছি।

মুষড়ে পড়ো কেন?

ম্লান হেসে অরুণেন্দু বলে, চার বছর ধরে অফিসে অফিসে ঘুরে মরছি—

কাশীনাথ বলেন, আজেবাজে অফিসে ঘুরেছ, যারা গুণের কদর বোঝে সেই সব অফিস বাদ দিয়ে।

তার পর চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বলেন, আচ্ছা, এইবারে দেখা যাবে। চাকরি না হয়ে দেখি যায় কোথায়।

দুটো চিঠির ডিকটেশন শেষ করে তৃতীয়টা বলতে যাচ্ছেন—অরুণেন্দু বলে, এই অবধি থাকলে হত। যাবে তো কালকের ডাকে—অফিস-টাইমে কাল এসে টাইপ করতে পারি।

মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে আবার বলে, শেষ করে দিলে অবশ্য ঝঞ্চাট মিটত,

আপনার উদ্বেগ দূর হত। কিন্তু একটা দোকানে খাতা লিখে কিছু কিছু পাই। বিকালের টুইশানি ছেড়েছি, তারপর এটাও যদি চলে যায় খরচ চালাতে পারব না স্যার।

কাশীনাথ প্রণিধান করলেন : তা ঠিক। দোকানের কাজটা ছেড়ো না, চাকরি সম্পূর্ণ হাতে না আসা পর্যন্ত চালিয়ে যাও। দশটায় কাল পলিকে পৌঁছে দিয়েই অমনি টাইপরাইটারে এসে বসবে—কেমন? যাওয়া যাক তবে।

বাড়িতে সুবাসিনী মুকিয়ে আছেন : পোলাও'র মিহিচাল চাট্টি জোগাড় করে দাও দিকি বাবা। ছোটভাই আমার বম্বে থাকে, হপ্তা খানেকের জন্য এসেছে। তাকে একদিন খেতে বলব—তা সাদা-ভাত কেমন করে পাতে বেড়ে দিই। বেশি নয়, কিলোখানেক হলেই হয়ে যাবে।

অরুণেন্দু একটুও দ্বিধা না করে ঘাড় কাত করল : হবে—

একমুখ হেসে সুবাসিনী বললেন, কর্তা বলছিলেন, চালের অভাবে লোকে কচু-ঘেচু খেয়ে মরছে, তোমার আবার এমনি চাল নয় মিহিচালের ফরমাস। তখন জাঁক করেছিলাম : অরুণ আছে। সোনার-চাঁদ ছেলে আমার—দেখে নিও তুমি। চালটা যেন সরেস হয় বাবা, কর্তার কাছে যাতে মুখ থাকে।

অরুণ বলল, আসল দেরাদুন-রাইস। নিয়ে আসব কাল, দেখে নেবেন।

ফাইফরমাস খাটতে ছেলেটার জুড়ি নেই। আর যেমন দিনকাল—এটা নেই, ওটা নেই, ফরমাস একটা-না-একটা লেগেই আছে।

সুবাসিনী বললেন, ভাল তপসেমাছ আজকাল তো বাজারে দেখিনে। পাওয়া যায়? ভাই আমার তপসেমাছ-ভাজা বড় পছন্দ করে। বম্বে ও-জিনিস মেলে না।

অরুণেন্দু কল্পতরু। বলল, পাবেন।

আর সন্দেশ? সন্দেশ তো বন্ধ। মুখ-পোড়া মন্ত্রীদের যা দু-চোখে পড়ে, বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কালোবাজারে ঢোকে—

আর ঢোকে মন্ত্রীদের বাড়ির ফ্রিজে। খেয়ে-খেয়ে ঐরাবত হাতি হল এক-একটা। পাবেন মা সন্দেশ—নয়তো শেষ-পাতে কি দেবেন? লাড্ডু খেলে তো মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়, পুরো খাওয়াটাই মাটি।

ফাইফরমাস এমনি হরবখত লেগে আছে। আর মুখ দিয়ে প্রকাশ পেলেই হল—মাল ঠিক এসে পড়বে দু-দশ ঘণ্টা বা দু-দশ দিনের মধ্যে। এলো না, এমন কদাচিৎ ঘটেছে।

সুবাসিনী পুলকে গদ-গদ হয়ে বলেন, আমরা তো মাথা খুঁড়েও কোন-একটা বের করতে পারি নে। তাল-বেতাল আছে বোধহয় তোমার তাঁবে। হুকুম মাত্রেই তারা জুটিয়ে এনে দেয়।

তাই বটে। তাল ও বেতাল—জয়ন্ত আর চাঁদমোহন। সুখ-দুঃখের নিত্যসাথী। ধুস, দুঃখের পাশাপাশি সুখের কথা কেন আবার! সুখ বলে কিছু নেই, নিতান্তই ওটা কল্পনার জিনিস। কবে কে সুখ পেয়েছে? অন্তত অরুণ তো এতখানি বয়সের মধ্যে লহমার তরে পায় নি। জয়ন্ত-চাঁদমোহনও বিস্তর দুঃখধান্ধা করে—দুঃখই ও-দুটির সঙ্গে অরুণেন্দুকে এক-জোয়ালে জুড়েছে।

গোলদারি দোকানে সর্বেসর্বা জয়ন্ত। সাদাবাজারে শুধু একটা ঠাট রেখে সে-দোকানের আসল কাজকর্ম কালোবাজারে। আর চাঁদ-কৌবিন চালিয়ে চালিয়ে চাঁদমোহন খাদ্য ব্যাপারে ঘুঘু হয়ে গেছে—ভালো-জিনিস কোনটা কোথায়, নখদর্পণে রয়েছে তার। অরুণকে ওরা ঢালাও বলে দিয়েছে, তাক করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিস তো সর্বদিক দিয়ে মোক্ষম-সোক্ষম করে ধর, ছিদ্র রাখবি নে। খেয়ে না-খেয়ে একগাদা সার্টিফিকেট

জমিয়েছিস, কর্তাকে পটা সেইগুলো দিয়ে। কন্দর্পের মতন চেহারা একখানা রয়েছে—তার সঙ্গে কিছু মিঠে-মিঠে বচন মিশিয়ে মেয়েটাকে ওদিকে পটিয়ে ফেল। আর গিন্নি পটানোর ব্যাপারে আমরা দু-জন রইলাম—চাকরি যদ্দিন না পাকাপাকি হচ্ছে, বাঘের-দুধ চাইলেও চিড়িয়াখানায় ঢুকে দুয়ে এনে দেবো। ভাবিস নে।

পুলকিত কণ্ঠে গিন্নি তাই বলছেন, এত সব জিনিস কোথায় পাও বলো তো? অবাক লাগে।

অরুণেন্দু হেসে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, সবই মা একেবারে হাতের গোড়ায় রয়েছে। স্বর্ণপ্রসবিনী আমাদের রাজ্য, কোন-কিছুর অভাব নেই। সরকারি হুকুম শুনে মুচকি হেসে তারা একটু গা-ঢাকা দিয়ে আছে এইমাত্র। তাতে কারো অসুবিধে নেই, মোকামের হদিস সবাই জানে। দুটি-চারটি সাধুসজ্জন আছেন, আঙুলে গোণা যায়—তাঁরাই কেবল জানেন না। সরকারি কর্তারা ভালো মতন জানেন। নিজেদের তিলেক-মাত্র অসুবিধা নেই—জেনেবুঝেই এত সব কড়া-কড়া হুকুম।

কাজকর্ম নিয়মদস্তুর চলছে। দশটার মিনিট দশেক আগে ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসনের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন অবধি তিন জন গাড়িতে। সামনের দিকে স্টিয়ারিং-চক্র ধারণ করে অরুণেন্দু—পিছনের সিটে বাপ আর মেয়ে। পলি অরুণে এই ক'দিনে যৎসামান্য মুখ-চেনা হয়েছে, এই গোছের একটা ভাব। কথাবার্তা উভয়ের মধ্যে বড়-একটা হয় না—প্রয়োজনে নিতান্তই যদি বলা হয়, অতিশয় সংক্ষেপে যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে 'আপনি' 'আপনি' করে।

কাশীনাথ যতক্ষণ গাড়িতে থাকেন, অবস্থা এই প্রকার। গাড়ি থেকে নেমে তিনি অফিসের ভিতরে ঢুকে গেলেন—চকিতে পট-পরিবর্তন। পিছনের সিট ছেড়ে পলি ড্রাইভারের পাশে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে, গাড়িও এতক্ষণ দেখে-শুনে অতিশয় ধীরগতিতে চলে এসেছে, কর্তা নেমে যেতে পাখা মেলল এইবারে যেন। চলছে না আর, উড়ছে। লহমায় রেডরোডে এসে পড়ে। কাল থেকে আজ এত বেলা অবধি পলি একগাদা কথা আর হাসিতে বুক বোঝাই করে গলার নলিতে ছিপি এঁটে রেখেছিল, ছিপি খুলে দিল ময়দানের পথে এসে—কলকল করে অঝোর ধারায় এবারে বেরুচ্ছে। আপনি-টাপনিগুলোও ছুঁড়ে দিয়ে হাল্কা হয়েছে, ঘরে এসে ভদ্র পোশাক ছেড়ে ফেলার মতো।

তারপরে আর এক দফা জায়গা বদলাবদলি। পলি ড্রাইভারের জায়গায় আর অরুণ গা-ঘেঁষে একেবারে তার পাশটিতে। ড্রাইভিং শেখে পলি, অরুণ শেখাচ্ছে—এ জিনিস আলগোছে দূরে-দূরে বসে হয় না, গা ঘেসে হাতে ধরে শেখাতে হয়।

অরুণ সাহস দিয়ে বলে, গাড়ি চালানো খুব সোজা। আমার মোটে এক হপ্তা লেগেছিল।

পলি বলে, ড্রাইভার না রাখতে হলে গাড়ির খরচাও এমন-কিছু নয়।

ও হরি, গাড়ি রাখার বাসনা নাকি তোমার?

পলি বলে, তুমি চালাতে পারো, আমিও পারব—খরচা শুধু পেট্রোলের। অফিসে আমার যাওয়া-আসা তোমার যাওয়া-আসা—সেদিকটাও দেখ হিসেব করে। আর বাসে তো রড ধরে বাদুড়ঝোলা হয়ে নিত্যিদিন প্রাণ হাতে করে যাওয়া—মাগো মা, আমি তো ছটফট করে মরব যতক্ষণ তুমি ফিরে না আসছ।

পলির উদ্বেগে অরুণের কৌতুক লাগে। ঘরকন্না এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে যেন। বলে, সব যেন হল। কিন্তু সকলের আগে গাড়ি একটা তো কিনতে হবে। একসঙ্গে এক কাঁড়ি টাকা লাগবে, তার হিসাবটা ভেবেছ?

পুরানো গাড়ি কিনব বাবার মতন—

হাত নেড়ে সমস্যা পলি একেবারে উড়িয়ে দেয়ঃ এদ্দিন চাকরি হল, ঘাস কেটেছি নাকি বসে-বসে? সেভিংসব্যাঙ্কে রয়েছে। যেটুকু কম পড়বে, অফিস থেকে ধার নিয়ে নেবো। অফিসও তো দুটো—আমার অফিস, তোমার অফিস। দায় জানিয়ে দু-জায়গা থেকে ভাগাভাগি করে ধার নেবো।

অরুণ বলল, চাকরি আমার হয়েই গেছে ধরে নিচ্ছ।

নিচ্ছিই তো। দু-জনের অফিস যাতায়াত বলেই না গাড়ি। আমার একার হলে কী দরকার? বিনি গাড়িতেই বরাবর তো চালিয়ে এসেছি।

এগারোটা বাজে, রোদ প্রখর। ময়দান ছেড়ে গাড়ি আবার অফিস-পাড়ায় এসেছে। পলি যথাপূর্ব সিটে। এবং অরুণেন্দুও ড্রাইভার বই আর কিছু নয়।

পলি নেমে পড়ে একটুখানি আজ অরুণের কাছে দাঁড়াল। ঢোঁক গিলে বলল, বাবা পই-পই করে মানা করেছেন কাউকে যেন না বলি। চেপেচুপে আছিও এতক্ষণ। না, তোমায় না বলে পারা যাবে না। চাউর না-হয় দেখো।

অরুণ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে পড়ল। বুক ধড়াস-ধড়াস করছে।

পলি বলে, গঙ্গাধর মুখুজ্জের জায়গায় লোক না নিলে আর চলছে না, বাবা তো জরুরি নোট দিয়ে আসছেন। সিনিয়র ডিরেক্টর এদ্দিনে ঢালাও হুকুম দিয়েছেন বাবাকে। জিনিসটা বাবা চেপে রেখেছেন—কাউকে জানতে দেন নি। মায়ের কাছে বলছিলেন, আমি শুনে নিয়েছি।

চুপ করল পলি। বলবে কি বলবে না, ইতস্তত করছে বোধহয়। অধীর হয়ে অরুণ বলল, বলো না—

পলি বলে, সুখবর। সমস্ত ভার বাবার উপরে। বলেছেন, তোমার সেকসন, কাজকর্মের জন্য তুমি সম্পূর্ণ দায়ী। তোমার পছন্দ মতো একজনকে নিয়ে নাও, তার মধ্যে আমি নাক গলাতে যাব না। বাজে লোক হলে তখন দুষব।

হেসে বলে, সেই লোক বুঝতেই পারছ তুমি ছাড়া কেউ নয়। অন্য কেউ হতে পারে না। দু-জনের অফিস যাওয়া, গাড়ি কেনা, এত সব বলছিলাম—কোনদিন বলি নে, আজ কেন বলছি, পাগলামি কেন করছি—বোঝ তবে এইবারে।

যেতে গিয়ে আবার সতর্ক করেঃ কাউকে বলবে না, খবরদার! তোমার জয়ন্ত, চাঁদমোহন বন্ধুদেরও না। জানাজানি হয়ে গেলে অনুরোধ-উপরোধের অন্ত থাকবে না। নানান রকমের বাগড়া আসবে। তাক বুঝে টিপি-টিপি বাবা তোমায় নিয়ে ফেলবেন। নেওয়া হয়ে গেলে তখন আর কি! তোমার লোক আছে, আগে তো বলোনি ভাই—এমনি সব বলে কাটান দিয়ে দেবেন। মায়ের সঙ্গে বলছিলেন বাবা। জিনিসটা একেবারে উনি চেপে গিয়েছেন।

পলির মুখে কয়েকটা দিন পরে আবার এক সুখবরঃ একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাচ্ছ যে তুমি। ভাল হয়েছে, তাই না? বিয়ের পরে বাপের-বাড়ি কেন পড়ে থাকব? আমি চাইলেও চাকরে-জামাই তুমি কেন তা হতে দেবে? অ্যালটমেণ্ট দু-হপ্তা পরে। দখল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেপে পড়বে, ফেলে রাখা চলবে না। দিন-কাল বড্ড খারাপ, বেহাত হবার ভয় আছে।

বোকা-বোকা মুখ করে অরুণেন্দু নিরুত্তাপ স্বরে বলল, চাকরি-পাওয়া বিয়ে-করা হয়ে যাচ্ছে সব দু-হপ্তার মধ্যে?

ঠাট্টা কিসের! দু-হপ্তার মধ্যে না হোক, দু-মাসে হবে। নিশ্চয় হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফ্লাট জোটানোও কম কঠিন নয় জেনো, চাকরি জোটানোর কাছাকাছি।

পলি টিপে-টিপে হাসে। বলে, এক ক্রিমিন্যাল কান্ড করে বসেছি। ইচ্ছে করলে আমায় জেলে দিতে পার। তোমার নাম জাল করেছি।

অরুণেন্দু শঙ্কিত হল। পলি ঘোরতর প্রেমে পড়েছে—'সখি আমায় ধরো-ধরো' অবস্থা। প্রেমের ধাক্কায় সব কিছু সম্ভব। জাল-জালিয়াতি সামান্য কথা, প্রেমোন্মাদ হয়ে লোকে হক না-হক মানুষ-খুন করে ফেলে।

কী করেছ, খুলে বলো।

ইমপ্রুভমেন্ট-ট্রাস্ট কয়েকটা তৈরি-ফ্লাট সস্তায় বিলি করছে। তুমি রাজি হও না-হও—ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে তোমার হয়ে আমিই দিলাম দরখাস্ত ছেড়ে। বিনি তদ্বিরে কিছু হয় না—এদ্দিনের চাকরি এখানে, কাকে ধরলে কী হয় তত্ত্বটা আমার ভালমতো জানা। উঠে পড়ে লেগে গেলাম। শ-সাতেক দরখাস্ত পড়েছিল, তবু হয়ে গেল তোমার একটা। তদ্বিরের জোরে।

অরুণ প্রশ্ন করে: আমার নাম জাল না করে দরখাস্ত নিজের নামে দিলে না কেন?

হত না। আমাদের বড়কর্তাটি এ বাবদে বড় নারাজ। বদনাম রটবে, ঘরে ঘরে নিয়ে নিচ্ছে তো বিজ্ঞাপন দিয়ে পাবলিককে ডাকে কেন? তা সে একই কথা—দরকার পড়লে বেনামিতে নিয়ে নেয়। আমার বেলা যেমনটা হল।

গাড়ি রেখে ময়দানের গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসেছে সেদিন। ভ্যানিটিব্যাগ খুলে পলি লম্বা একটা কাগজ বের করল: বাসার জন্যে কিছু ফার্নিচার আর আপাতত যা-সব লাগবে, লিস্টি করেছি দেখ। আরও কিছু মনে পড়ে তো ঢুকিয়ে দাও।

চমক খেয়ে অরুণ বলে, এত?

একটা সংসার গোড়া থেকে গুছিয়ে তুলতে কম জিনিষ লাগে! তবু তো কত বাকি রয়ে গেছে, দরকারে মনে পড়বে।

বিস্তর টাকার ধাক্কা যে!

পলি খিলখিল করে হাসে: টাকা লাগবে, তোমার কি তাতে? মোটামুটি দামের হিসাবও করেছি। সেভিংসব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তোমার কাছে রেখে দেবো। এখন তোমার উমেদারির ঝামেলা নেই, অফিস যাওয়া শুরু হয় নি—হাতে অঢেল সময়। ধীরে-সুস্থে দেখেশুনে কেনাকাটা করতে থাকো। ফাঁক পেলে আমিও জুটে যাব তোমার সঙ্গে।

উঃ, সেভিংসব্যাঙ্কে কত টাকা তোমার! সেদিন গাড়ির কথা হল, আজকে বাড়ি।

পলি বলল, গাড়ি থাক আপাতত। দু-জনের রোজগার হতে থাকলে বাবার মতন ঐ রকম একটা কেনা শক্তটা কি! বাড়িটা বেশি জরুরি। ফ্লাট যখন পেয়ে গেলাম বিয়ের পরে একটা দিনও আমি বাপের-বাড়ি থাকব না। সাজানো-গোছানো কেনাকাটা সমস্ত সেরে নাও এর মধ্যে।

অনেক দিন পরে অরুণ ভুপেন সুরকে দেখল। হরিহর সুরের ছেলে ভুপেন। হিন্দু হস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সিতে পড়ত। যার দৃষ্টান্তে পূর্ণেন্দুর মাথায় দুর্বুদ্ধি এসেছিল—অভাব-অনটনের সংসারে নিজেদের আরও বেশি করে বঞ্চিত করে ভাইকে প্রেসিডেন্সিতে পাঠাল। পাশ করে দিগগজ হয়ে আসবে ভাই, সুখ-সম্পত্তির অন্ত থাকবে না।

পাশ তো করেছি দাদা—কই, ধামা-ঝুড়ি-বস্তা নিয়ে চলে এসো, ধামা ধামা সুখ আর বস্তা বস্তা সম্পত্তি বাড়ি নিয়ে যাও।

ভূপেন উপরের ক্লাসে পড়ত। সেকেন্ডইয়ারে পড়াশুনো ছেড়ে কোথায় যেন চাকরি নিয়েছিল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার কলেজে ঢুকল। অরুণের সঙ্গে এক ক্লাসে এবার। সেই ভূপেন দশটা বেলায় ম্যাথুস এন্ড হেন্ডারসন অফিসের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কাশীনাথ গাড়ি থেকে নামলেন, তাঁর পিছু পিছু ভূপেনও ভিতরে ঢুকে গেল।

বাপ নেমে যাওয়া মাত্র পলি যথারীতি সামনের সিটে। অরুণের কী হল যেন হঠাৎ—স্টিয়ারিং-চাকায় হাত রেখে ঝিম হয়ে আছে।

পলি বলে, কী হল তোমার?

অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে অরুণেন্দু বলল, ভূপি—

পলি ব্যস্ত হয়ে বলে, ভূপি কে?

স্যারের সঙ্গে ঐ যে ঢুকে গেল। অদ্ভুত ঘড়েল। একই বছরে এক ঘরে দু-জনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বসেছিলাম। আমার খাতা হুবহু টুকে ভূপি তিনটে লেটার পেলো, আমি টায়েটোয়ে পাশ।

পড়াশুনোর ধার ধারত না ভুপেন। বলত, পন্ডশ্রম। পাশ করব, তার জন্য পড়তে হবে কেন? সত্যিই নিষ্প্রয়োজন, হাতে-হাতে দেখিয়ে দিল সে। ঈশ্বর-দত্ত অলৌকিক ক্ষমতা ধরে সে, নইলে এমন কান্ড কদাপি সম্ভব নয়। অরুণ আর ভূপির একই ঘরে সিট পড়েছে। অরুণের খাতার দিকে ভূপি একদৃষ্টে তাকিয়ে। অরুণ লিখছে তো ভূপিরও কলম চলছে, অরুণ থামল তো ভূপির কলমও থেমে যায়। লিখছে খাতার পাতে কিন্তু ভুলেও সেদিকে তাকায় না, দৃষ্টি সর্বক্ষণ অরুণেন্দুর কলম চলাচলের দিকে।

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করেঃ আমার খাতায় একনজরে কি দেখছিলি?

ভূপি বলে, অন্দুর থেকে খাতায় কিছু কি দেখা যায়? দেখছিলাম কলম। কলমের নড়াচড়া দেখে কী লেখা হচ্ছে ধরা যায়। নার্সারি-ইস্কুলে দিদিমণি লিখে দেয় বাচ্চারা তার উপর দাগা বুলোয়, অবিকল সেই জিনিস। কী লিখে এলাম জানিনে—তুই যা যা লিখেছিস, হুবহু তাই। একটি কথার হেরফের নেই।

পরীক্ষার ফল বেরুলে অরুণেন্দু জিজ্ঞাসা করেছিলঃ আমার লেখা টুকেছিলি তো টপকে গেলি আমায় কেমন করে?

তোর লেখা পুরোটাই ছিল, আর বাড়তি ছিল আমার তদ্বির। একজামিনার, হেড-একজামিনার, ট্যাবুলেটর, হেলাফেলা কাউকে করিনি। তুই এসব করতে যাস নি, সেদিক দিয়ে ওজন আমার ভারী হয়ে দাঁড়াল।

তদ্বিরে অদ্বিতীয়। সেই ছাত্রকাল থেকেই। পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে কলকাতা শহর চষে ফেলেও অরুণ একটা চাকরি জোটাতে পারে না, আর ভূপির যেন লোফালুফি চাকরি নিয়ে। আজ এ চাকরিটা ধরল, কাল ছাড়ল, পরশু ধরল নতুন-একটা—এর তার কাছে বলে বেড়ায়, অরুণের কানে আসে। ষোলআনা সত্যি কখনো নয় রং চড়িয়ে ছাড়া ভূপি বলতে পারে না। তবে খোসা-ভুষি বাদ দিয়ে সারবস্তু নিশ্চিত কিছু আছে।

এ হেন ভূপি শুধুমাত্র অফিসে নয়, কাশীনাথ বাড়ি ফিরলে রাত্রে সেই বাড়ি অবধি গিয়ে হাজির হয়েছিল। নিভৃতে চুপিচুপি কথাবার্তা। অর্থাৎ চাকরি কাশীনাথের কথায় হবে, অতিগুহ্য খবরটা তার অবিদিত নেই।

লোকটাকে দেখেই পলি কান পেতেছে। কথাবার্তা সমস্ত শুনে পরের দিন অরুণেন্দুকে বলল : ঠিক ধরেছিলে, গঙ্গাধর মুখুজ্জের চাকরিটার জন্যই বটে। এক বছরের পুরো মাইনে হিসেব করে বাবার হাতে অগ্রিম গুঁজে দিতে চায়। আবার বলে, কি জানো—

অরুণ বলল, কলেজের বন্ধু আমার। আবার এক জায়গার মানুষও বটে। চলন দেখেই ওর মনের কথা ধরতে পারি।

পলি বলে, ঘুঘুলোক একটি। ঘুষের কথাবার্তা কেমন অবলীলাক্রমে বলে গেল। বলে, পারচেজিং কাজকর্ম রয়েছে, আর আপনার মতন মানুষ মাথার উপর রইলেন—অগ্রিম যা দিচ্ছি, ওটা আমি ছ-মাস একবছরের ভিতর তুলে নিতে পারব। তারপর থেকে যত-কিছু উপরি তার একটা বাঁধা পারসেন্টেজ আপনার। মাসে মাসে ঠিক নিয়মে পেয়ে যাবেন।

অরুণেন্দুর মুখ যেন ঈষৎ পাংশু। তাকিয়ে দেখে পলি গর্জন করে উঠল : নিন না বাবা একটি পয়সা ঐ লোকের হাত থেকে। কত বড় ঘুষখোর উনি, দেখে নেবো। ধরিয়ে দিয়ে ওর চাকরি খাবো, বাবা বলে রেহাই করব না।

সে সবের প্রয়োজন হয় নি। কাশীনাথের উপর মিথ্যে দোষারোপ, লোকে প্রস্তাব দিলে তিনি কি করতে পারেন ? পলি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তড়পানিটাও খুব যে গোপন আছে, তা নয়। বড়বোন ডলির কাছে বলেছিল। বলে মানা করে দিয়েছে, বাবার কানে না যায়। ডলি অতএব সঙ্গে সঙ্গেই কানে তুলেছে, সন্দেহ নেই। ডলির এই স্বভাব। কথা কাঁটার মতন পেটের মধ্যে ফুটতে থাকে, ছাড় করে না দেওয়া অবধি সোয়াস্তি নেই। বিশেষ করে কথাটা গোপন রাখবার অনুরোধ আসে যদি।

ভূপেন সুরকে কাশীনাথ আমল দেন নি, সাচ্চা সাধুলোক হয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। পলির রাগারাগি ও ভয় দেখানো একটা কারণ, সন্দেহ নেই। আবার, এত দিনে পলির বর জুটে যাচ্ছে, সে-ও এক বিবেচনার বিষয় বটে। অরুণেন্দুকে ডেকে খোলাখুলি বললেন, চাকরি তোমার হবেই। চাউর করো না কথাটা—সিনিয়র ডিরেকটর আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছেন। মৌখিক বলে তিনি বাইরে চলে গেছেন। ভেবেচিন্তে দেখলাম, নিয়মদস্তুর লিখিত-অর্ডার থাকাই ভাল। নানা জনের স্বার্থে ঘা পড়বে, নানান রকম প্যাঁচ খেলবে—দরকারে যাতে হাতে-হাতে পাকা-দলিল দেখাতে পারি। বড়সাহেব সামনের মাসে ফিরবেন, খবর এসে গেছে। এদ্দিন কেটেছে তো আর এই একটা মাস। নির্ভাবনায় থাকো বাবা, চাকরি তুমি পেয়েই গেছ ধরে নিতে পার।

খুঁজে পেতে কাশীনাথ গাড়ির জন্য নতুন ড্রাইভার জুটিয়ে আনলেন। অরুণেন্দুকে বলেন, গাড়িতে পেঁাছে দিচ্ছ ফেরত নিয়ে আসছ, এতে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। শত্রুরা কথা তুলতে পারে। যা হয়েছে—আর কাজ নেই। এই এক মাস তুমি গা-ঢাকা দিয়ে থাক, অফিস মুখোই হবে না। চাকরিটা গেঁথে যাক— তখন আর পরোয়া কিসের ? তুমি আর আমি এক গাড়িতে যাওয়া-আসা করব।

ভাবী অফিস-এসিস্টান্ট বিশেষ করে ভাবী জামাইকে দিয়ে গাড়ি চালানো যায় না। নতুন ড্রাইভার এনে অরুণকে রেহাই দেওয়া হল অতএব। চাকরির দরখাস্ত লেখা এবং উমেদারির ঘোরাঘুরিও বন্ধ।

বিনি কাজে অরুণেন্দুর দিন আর কাটতে চায় না—

কী করি বলো তো ?

পলি বলল, কাজের অভাব কি ? ফ্ল্যাট পেয়ে যাচ্ছ, সাজাও-গোছাও মনের মতন করে।

নিচের তলায় ছিমছাম ছোট ফ্লাট। মাঝারি বেডরুম দুটো, বাড়তি আরও আধখানা ঘর—বৈঠকখানার কাজ চলবে। তা ছাড়া রান্নাঘর ইত্যাদি।

নতুন ফ্লাট—আনকোরা। প্রথম এই আমরা ঢুকছি। আসবাব-পত্তোর কিছু তো নেই, সমস্ত কিনতে হবে—খাট আলমারি থেকে ঝুল-ঝাড়া জুতোর-কালি অবধি। ঝঞ্ঝাট একটু-আধটু নয়—হাত লাগাও, বুঝতে পারবে। ফর্দ করে নিয়ে ধীরে-সুস্থে কেনা-কাটায় লেগে যাও। অফিসে বেরুনো শুরু হয়ে গেলে তখন আর সময় পাবে না।

প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা পলি অফিস-ফেরত নতুন ফ্লাটে চলে আসে। খাট আলমারি ড্রেসিংটেবিল আলনা চেয়ার কোনটা কোথায় বসবে শলাপরামর্শ হয়—এ-ঘরে না ও-ঘরে এ-পাশে না ও-পাশে, তর্কবিতর্কও হয় ঘোরতর। এক এক দিন কাজের কথা কিছু নয়—গল্প, আজেবাজে গল্প দু-জনে মুখোমুখি বসে।

পলি বলে, বাসনকোশন কিনতে যেও না তুমি। পুরুষে পারে না। রান্নাঘর আমার—সুবিধা-অসুবিধা বুঝে আমি পছন্দ করে কিনব।

খাওয়াদাওয়া আগের মতো চাঁদ-কেবিনে চলছে। দরজায় তালা দিয়ে দু-জনে বেরিয়ে পড়ে। ছোট্ট একটা পার্কের মতন আছে—একটা বেঞ্চি দখল করে বসল বা কোন দিন। তারপর পলি বাড়ি চলল, অরুণেন্দু চাঁদ-কেবিনের পুরোনো আড্ডায়। অনেক রাত্রে ফ্লাটে গিয়ে শুয়ে পড়বে।

একদিন অরুণ বলল, ফ্লাটে একলা একজন পড়ে থাকি, নিশিরাত্রে ঘুম ভেঙে কেমন যেন গা ছমছম করে।

পলি তরল কণ্ঠে বলে, ভূতের ভয় ?

আমিই ভূত হয়ে গেছি কিনা, সেই ভয়। দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে একলা হয়ে গেছি যেন হঠাৎ। মরার পরে এমনিটাই বুঝি ঘটে।

এত সাধ-আহ্লাদের মধ্যে খামোকা মরাছাড়ার কথা পলির ভাল লাগে না। কথা ঘুরিয়ে নেয় ঃ ছ-ছ'টা মানুষ এদ্দিন এক বিছানায় শুয়ে এসেছ কিনা—

অরুণেন্দু হেসে বলে, বিছানা মানে ফুটো শতরঞ্চি আর ছেঁড়া মাদুর। দস্তুরমতো হিসেব-নিকেশ করে তার উপরে শোওয়া—কতক কাত হয়ে শোবে, কতক চিত হয়ে। একসঙ্গে সবাই চিত হতে গেলে জায়গায় কুলোবে না।

পলি বলে, খেয়ে আসবার সময় ওদেরই একটি দুটি সঙ্গে আনলে তো পারো।

ঐ সুখ ছেড়ে আসবে কেন তারা ? বয়ে গেছে।

কী করব বলো, আমি তো আসতে পারিনে—

নিশ্বাস ফেলে পলি বলল, নোটিশ দেওয়া রয়েছে—সাক্ষি সঙ্গে নিয়ে রেজিস্ট্রারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে লহমার মধ্যে হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার হাতের মুঠোয় আগে চাই, ধনুক-ভাঙা পণ যে তোমার। দোষ দিইনে—দায়িত্বে ঢোকবার সময়ে আগু-পিছু ভাবতে হবে বইকি। ঘুষেলদের বিশ্বাস নেই, নিজের বাপ হলেও না। কন্যাদায় আপোষে যদি কেটে যায়, ঐ বাবাই তখন কী মূর্তি ধরবেন ঠিক কি। তুমি ঠিক করেছ।

পলি প্রস্তাব করে ঃ মাকে নিয়ে এসো ধাপধাড়া সেই পল্লীশ্রী কলোনি থেকে। দিদিকেও। তাহলে তো একা থাকতে হয় না। বেকার আছ এখনো—বাড়ি চলে যেতে অসুবিধা কিছু নেই।

বর পাচ্ছে পলি—সে একেবারে বর্তে গিয়েছে। পলি হেন আধবুড়ো কুরূপ কনের অদৃষ্টে এম-এ পাশ কন্দর্পকান্তি বর। বেকার বলে খুঁত ছিল, তা-ও খণ্ডে যাচ্ছে

আঁচরে। বিয়ের পর বান্ধবীরা অরুণকে চর্মচক্ষে দেখবে এবং, আহা রে, কতজনা তাদের মধ্যে হিংসায় বুক ফেটে টিপটাপ ভূতলে পড়ে যাবে। অরুণের কথা পলি সমস্ত জানে, দিনের পর দিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে। যশোদার নামে 'মা' সম্বোধন, মালনার নামে 'দিদি'—শাশুড়ি ও বড়জাকে যা বলে ডাকার নিয়ম।

পলি বলে, চট করে একদিন চলে যাও, গিয়ে মা-ওঁদের নিয়ে এসো। তোমায় নিয়ে কত সাধআহ্লাদ—ভুল ভেবে মা রাগ করে রয়েছেন।

ম্লান হাসি হেসে অরুণেন্দু বলে, বিস্তর ভালো ভালো কথা বলে এসেছিলাম আমার মাকে, কত রকম আশা দিয়েছিলাম। ভালো একটা বাসা দেখে নিয়ে কলকাতায় আনব, বড়-ডাক্তার দেখাব, গঙ্গায় নাইতে পাঠাব নিত্যিদিন, কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর দেখাব। আরও কত কি বলেছিলাম, মনে পড়ছে না। মানে, সম্রাট-ছেলে হয়ে মায়ের জন্য যা-সমস্ত করা উচিত।

ঝিম হয়ে রইল সে কয়েক সেকেণ্ড। বলে, আজকে ওঁদের দিন চলে কেমন করে জানিনে। বেঁচে আছেন কিনা, তাই-বা কে বলবে। কুপুত্র স্বার্থপর আত্মসুখী কুলাঙ্গার বলে বলে কড়া কড়া চিঠি আসত—নিষ্ফল বুঝে তা-ও বন্ধ করে দিয়েছেন। তাতে অন্তত বেঁচে রয়েছেন, খবরটা মিলত। আমিও চিঠি দিইনে। চিঠির চেয়ে টাকার বেশি গরজ, তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, চিঠি পাঠিয়ে খামোকা খোঁচাখুঁচি করতে যাই কেন।

পলি বলল, বাড়ি যাও তুমি। পরশু-তরশু নিয়ে এসো।

জোর দিয়ে আবার বলল, বড়-ডাক্তারই দেখানো হবে, গঙ্গাস্নান কালী-দর্শন সমস্ত হবে। মায়ের জন্য এইটুকু যদি না পারি, দুজনে সারাদিন মুখে রক্ত তুলে খাটতে গেলাম তবে কি জন্যে?

আবদারের সুরে বলে, বিয়ের পর আমার দিদি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল—শাশুড়ি-দেওর-ভাসুর জা-জাউলিতে জমজমাট সংসার। শ্বশুরবাড়ি আমারও তো—ফাঁকা ফ্ল্যাটবাড়িতে দেবা আর দেবী, সে আমার মোটেই পছন্দ নয়। নিয়ে এসো, আগেভাগে এসে ওঁরা জমিয়ে থাকুন। আমরা বেশ জোড়ে এসে দাঁড়াব, শাঁখ বাজিয়ে ওঁরা ঘরে তুলবেন।

এমনি সমস্ত কথাবার্তা হয়ে পলি বাড়ি ফিরল। মেয়ের সাড়া পেয়ে কাশীনাথ হাঁক ছাড়লেন: শোন্ রে পলি, শুনে যা। আজকে ভারি এক তাজ্জব খবর।

বড়সাহেবের দেশে ফিরতে এখনো মাসখানেক, অফিসসুদ্ধ জানে। সে মানুষ কাল বিকাল হঠাৎ দমদমায় এসে নামলেন। কাজকর্ম তাড়িতাড়ি সমাধা হয়ে গেছে, ফলাফল উত্তম—মনে খুব স্ফূর্তি। সেই মেজাজের মধ্যে কাশীনাথ অফিসে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

একথা-সেকথার পর: অ্যাসিস্টাণ্ট নেন নি এখনো? ও, মুখের কথায় হবে না বুঝি, কাগজে-কলমে চাই?

মিনিট পনেরোর ভিতর লিখিত-অর্ডার কাশীনাথের টেবিলে এসে পেঁছিল: অবিলম্বে কাশীনাথ দেখে-শুনে নিজের দায়িত্বে অ্যাসিস্টান্ট নিবে নেবেন।

কাশীনাথ বললেন, হাতে ফরমান—কাকে আর কেয়ার করি! দেরি করব না, কালই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তোকে ডাকলাম পলি, অরুণকে যদি একটা খবর পাঠাতে পারিস—আড়াইটে নাগাত অফিসে গেলে হাতে-হাতে চিঠি দেবো। না গেলেও ক্ষতি নেই অবিশ্যি—পরশুদিন ছুটি, অফিসের পিওন বাসায় দিয়ে আসতে পারবে।

'খবর যদি পাঠাতে পারিস'—কথা শোন বাবার। জুতোজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে সেই মুহূর্তে পলি ছুটল। এখন অরুণ চাঁদ-কোবিনে। আড্ডায় মত্ত, অথবা খাওয়ায় বসে গেছে। এত রাত্রে একলা মেয়েছেলের চাঁদ-কোবিন অবধি ধাওয়া করা খানিকটা দুঃসাহসের কাজ বই কি—পাড়াটার মোটেই সুনাম নেই। সকালবেলা ফ্ল্যাটে চলে গেলেই হত।

না, হত না—উল্লাসে পলি আকুলি-বিকুলি করছে, অরুণকে না বলা অবধি বাঁচে কেমন করে!

এগারো

সকালবেলা বাইরের-ঘরে কাশীনাথ চায়ের বাটি ও খবরের-কাগজ নিয়ে বসেছেন, অরুণেন্দু এসে হাজির।

এসো, এসো—

তক্তাপোশের উপর ঠিক পাশটিতে কাশীনাথ জায়গা দেখিয়ে দিলেন : বেসো বাবা। ওরে ডলি, আরও এক কাপ চা পাঠিয়ে দে এখানে। অরুণ এসেছে।

জাঁক করে বলে যাচ্ছেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার টাইপ হয়ে আছে। ম্যানেজারের সইটা শুধু বাকি। ম্যানেজার মানে মাধু প্রামাণিক। যা-কিছু সমস্ত আজকের মধ্যে হয়ে যাবে। কাল ছুটি—ব্যাংক-হলিডে। পরশু দিন থেকে গঙ্গাধর মুখুজ্জের চেয়ারে তুমি। পাকা চেয়ার—কোনদিন তার নড়ন-চড়ন নেই। সারা জন্ম এবার থেকে দশটা-পাঁচটা নির্ভাবনায় কলম চালিয়ে যাও।

তরী তা হলে কূলে ভিড়ল, এভারেস্ট-বিজয় সত্যি সত্যি ঘটল তবে! চোখ তুলে অরুণেন্দু দেখল, দরজার ফাঁকে পলি জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে কথাবার্তা তৃপ্তি ভরে যেন পান করে নিচ্ছে। উঠে প্রণাম করল সে কাশীনাথের পায়ে, পায়ের ধুলো নিল।

কাশীনাথ বললেন, অফিসে গিয়ে দেখা কোরো আজ দুটো থেকে তিনটের মধ্যে। জি. এম. থাকবে ঐ সময়টা, সই করে দেবে। কাজের চাপাচাপি না থাকলে কামরায় ডেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার নিজে হাতে দিয়ে দেবে। তার মানে নিজেকে জাহির করা —আমার অফিসের চাকরি স্বয়ং আমিই দিচ্ছি, অন্য কেউ নয়। করুকগে তাই, এইটুকুতে খুশি হয় তো হোক। আমাদের হল চাকরি পাওয়া নিয়ে কথা, কি হলো?

কাশীনাথ ফিক করে হাসলেন। হেসে বলেন, একগাদা উপদেশও ছাড়বে হয়তো। হায় রে হায়, মাধু প্রামাণিকও উপদেশ ছাড়ে—শ্রম আর অধ্যবসায়ে নাকি অসাধ্য-সাধন হয়। সাহেবরা চলে যাবার পর কোম্পানিতে লালবাতি জ্বালানোর গতিক হয়েছিল—ঐ দুটি মূলধন, অধ্যবসায় ও শ্রমের ফলেই নাকি ম্যাথুস এন্ড হেন্ডারসনের আজ এত উন্নতি। সে উন্নতি নাকি মাধব প্রামাণিকই করেছে। উন্নতি কার দ্বারা হল, সেটা ভাল মতো জানেন আমাদের বড় সাহেব—সিনিয়র ডিরেকটর। শতকণ্ঠে বলে থাকেন সে কথা। ছোটসাহেব জানলেও মুখ ফুটে কিছু বলবেন না—মাধব প্রামাণিক তাঁর সাক্ষাৎশালা। যে রকম বিদ্যেবুদ্ধি—শালা না হলে প্রামাণিক ম্যানেজার হত না, হত ম্যানেজারের আরদালি।

চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। চোঁ-চোঁ করে সরবতের মতো মেরে দিয়ে মুখ মুছে কাশীনাথ আবার বলেন, কার কতদূর এলেম বড়সাহেব বোঝেন সেটা। ঢালাও হুকুম আমার উপরে। বললেন কোম্পানির লাভ বিক্রির উপরে নয়, কেনাকাটার উপর। 'পারচেজিং-সেকশানই হল আসল। আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনিই দেখেশুনে বাছাই করে নিন। উপর থেকে আমরা বসিয়ে দিলে এফিসিয়েন্সি নষ্ট হবে। হুকুম হাতে পেয়ে আর

দেরি করি তখন। পাঁচটা বেজে গেছে—স্টেনোকে বললাম, ঘড়ি দেখলে হবে না বাপ্‌। যত দেরিই হোক, চিঠি টাইপ করে দিয়ে যেতে হবে। দিয়েছে করে তাই, তবে ছুটি।

অতএব শুভ পয়লা জুলাই থেকে গঙ্গাধর মুখুজ্জের স্থলে নতুন অ্যাসিস্টান্ট অরুণেন্দু ভদ্র। কথাবার্তা শেষ করে অরুণ বাড়ির ভিতর ঢুকল। সুখবর এ-বাড়ির, মানুষ কেন, পিঁপড়েটা মাছিটারও বোধহয় জানতে বাকি নেই। কোনদিকে ছিল ডলি, ছুটে এলো। একটা চেয়ার টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে এসে বলে, বোসো ভাই। চাকরির ঝামেলা মিটে গেলে, এবারে ঘরসংসার। মনস্থির করে ফেল তাড়াতাড়ি। পলিকে বলেছি, তোমাকেও বলছি। গায়ের রং পলির চাপা বটে—চাপা কেন, কালোই বলছি। কিন্তু গুণের দিক দিয়ে অমন মেয়ে হয় না।

বাধা দিয়ে অরুণ বলে উঠল, পলি কালো ? বলেন কি দিদি, আমি তো জানি নে।

অবাক বিস্ময়ে মুহূর্তকাল সে তাকিয়ে থাকে। বলে, কোনো মেয়ে আজকাল কালো হয় না দিদি। বাজার-ভরা রূপের মশলা, কোন দুঃখে কালো হতে যাবে ? বিধাতাপুরুষ যা খুশি একটা রং মাখিয়ে ছেড়ে দিলেন, এরা তারপরে নিজেরা মেজে-ঘষে খুঁত মেরামত করে নেবে। বিধাতাই তখন নিজের সৃষ্টি চিনতে পারবেন না।

ডলি হাসছে।

অরুণ বলে, আপনার মুখেই শুনলাম যে পলি কালো। এত মেলামেশায় আমি তো কখনো দেখতে পাইনি। মেক-আপ নিয়ে থাকে বোধহয় সর্বক্ষণ। তাই বা কেমন করে। ভোরে সদ্য ঘুম-ভাঙা অবস্থায় দেখেছি, স্নান করে বেরুনোর মুখেও দেখেছি। তবে গুণের কথা যা বললেন—ঝগড়া আর জেদ যদি গুণ বলে ধরেন, তা হলে বটে ! পলির সমান গুণবতী ত্রিভুবন খুঁজে মিলবে না।

খুব একচোট হেসে নিয়ে ডলি বলল, বুঝেছি ভাই। মনস্থির করার কথা তবে আর বলব না—বাবাকে দিনস্থির করতে বলি। একই ফ্লাটে থেকে বোন যাতে দিবারাত্রি গুণপনা দেখাতে পারে।

গিন্নিঠাকরুন সুবাসিনী এই সময় দেখা দিলেন। কথাবার্তা কিছু কানে গিয়েছে। বললেন, কালকেই কর্তা দিনস্থির করে ফেলেছেন। এই মাসের আঠাশ তারিখ। চাকরি হল তো বিয়ে কেন আর ঝুলিয়ে রাখা ? এখনও বলেন নি কাউকে, মনে মনে রেখেছেন। অফিসে দু-একদিন যেতে থাকুক, তারপরে চাউর করবেন।

অরুণকে বললেন, তোমায় যে বাবা টিনের কথা বলেছিলাম।

কেরোসিন চাই এক টিন। এক বোতল যোগাড় করতে লোকে হিমসিম হয়ে যায়, গিন্নির পুরো টিনের ফরমাস। বলেন, নিত্যি নিত্যি কাকে খোশামোদ করতে যাবো। ও তুমি আস্ত টিনই একটা জোগাড় করে দাও, মাস তিনেকের মতো নিশ্চিন্ত।

ফরমাস তো যখন-তখন—কোনদিন অরুণ 'না' বলেনি। বাড়ির গিন্নিদের এই পদ্ধতিতে মন জয় হয়, ভুয়োদর্শনে বুঝে নিয়েছে। আর এখন তো গিন্নির উপরে শাশুড়ি-মা হতে যাচ্ছেন উনি। দ্বিধা মাত্র না করে অরুণ যথারীতি ঘাড় কাত করে বলে, হবে।

হবে নয়, এখন পারো তো এখনই। উনুন ধরানো যাচ্ছে না, একেবারে বাড়ন্ত। পরশু থেকে অফিসে বেরুনো—তখন আর ঘোরাঘুরির সময় পাবে না। আর জামাই হবার পরে শুধুই তো গদিতে গড়ানো। কোন লজ্জায় তখন জামাইকে কেরোসিনের ফরমাস করতে যাব।

অরুণেন্দু বলল, আসে জয়ন্তর ভাঁড়ার থেকে। তাকে বলে রেখেছি। আবার সেখানে যাচ্ছি। ভাবনা করবেন না মা—দুপুরের মধ্যে যাতে পৌঁছে দেয়, তাই বলব।

ছুটল অরুণ গোলদারি দোকানে। জয়ন্ত এখন সেখানে, এতক্ষণে কাজে লেগে গেছে।

চাকরি পেলি তবে সত্যি সত্যি?

বৃত্তান্ত শুনে উল্লাসে জয়ন্ত পিঠে প্রচন্ড এক চাপড় মারে: উঃ, পাঁচ পাঁচটা বছর যা লেগেপড়ে আছিস, গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসলে এই তপস্যায় ঈশ্বরলাভ হয়ে যেত।

অরুণেন্দু বলে, তা হয়তো হত। কিন্তু কি লাভ আমার ঈশ্বরে? কোন কাজটা করতেন তিনি? মাস মাস ঈশ্বর মা-বউদির খরচখরচা পাঠাতেন, মাকে কলকাতায় এনে ডাক্তার দেখাতেন? আমার ধার-দেনা শুধতেন তিনি? পলিকে বউ করে এনে দিতেন? এত সমস্ত হয়ে যাচ্ছে ঝটপট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার আজ পাচ্ছি, বিয়েরও দেরি হবে না। আঠাশে আষাঢ়।

জয়ন্ত সহাস্যে বলে, পাসনি এখনো, তাই এতদূর—পাওয়ার পরে কী হবে তাই ভাবছি। এক ভিখারি লটারিতে দু-লক্ষ টাকা পেয়ে ক্যা-হুয়া হুক্কা-হুয়া হুক্কা-হুয়া করে শিয়াল-ডাক ডাকতে ডাকতে নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। দুটো থেকে তিনটেয় যেতে বলেছে—কাজ চুকিয়ে ফিরে আসতে ধর চারটে। সোজা তোর নতুন ফ্লাটে চলে যাব, জলের বালতি-টালতি জোগাড় করে আমরা সব হাজির থাকব। অজ্ঞান হলে মাথায় জল থাবড়াতে হবে।

সুবাসিনীর কেরোসিনের কথা আগেই বলা আছে, অরুণেন্দু আবার সেটা মনে করিয়ে দিল: পুরো এক টিন কিন্তু ভাই—

জয়ন্ত বলে, আলবত। চাকরি দিচ্ছে—কেরোসিন কেন, মধু ভরে দেবো টিনে।

উঁহু কেরোসিনই। পাঁচ বছরে নিদেনপক্ষে পাঁচ-শ জায়গায় উমেদারি করেছি। মধুর খাকতি নেই—মুখে মুখে দেদার মধু সকলের। অমিল কেরোসিন। কেরোসিনের টিন দুপুরের মধ্যে যেন পেঁাছে যায়, সেইটে দেখিস। কথা দিয়ে এসেছি।

জয়ন্ত চোখ কপালে তুলে বলে, ওরে বাবা, দিনদুপুরে কেমন করে হবে! জনতা বড় সেয়ানা আজকাল। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে বোতল হাতে লাইন দিয়ে আছে—হাতে-নাতে ধরতে পারলে মুন্ডু ছিঁড়ে নেবে।

বিপন্নকন্ঠে অরুণ বলল, হবু-শাশুড়িকে আমি যে কথা দিয়ে এলাম।

দিন-দুপুরে না হল, রাত-দুপুরে। কাজই তো আমার এই। দোকানের একটা ঠাট রেখে দেওয়া আছে—যেটা চাইবে, বাঁধা-জবাব: নেই। বলে রাখবি ওঁদের—পিছন-দরজায় টোকা পড়বে, দোর খুলে দেবেন—টিন অমনি টুক করে ভিতরে গিয়ে পড়বে।

উঠল অরুণেন্দু। এবারে চাঁদ-কেবিন। আড্ডা জমজমাট না থাকলেও ছিটেফোঁটা আছে নিশ্চয় এখনো। এতবড় খবর চেপে রাখা দুঃসাধ্য। আড্ডার মহৎ গুণ—চুপিসারে একটুকরো কথা ছাড়ুন, মুহূর্তে সহস্র গুণ হয়ে শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। রেডিও এতদূর পারে না।

জয়ন্তও পিছু ধরল। বলে, জায়গায় বসে মাল মাপামাপি ভালো লাগে এখন এই অবস্থায়? চেঁচামেচি লাফালাফি করে আসি খানিক, নয়তো অপঘাত হবে, দম ফেটে মরে যাবো।

যাচ্ছে দু-জনে। খামোকা জয়ন্ত বলে ওঠে, চাকরি আমায় একটা দিত কেউ! দোকানের কাজে ইস্তফা দিয়ে প্রাণভরে গঙ্গায় নেয়ে নিতাম। চেয়ারে বসার চাকরি না দেয়, বেয়ারা হয়ে টুলে বসতেও রাজি। লোকে না খেয়ে মরে, আর খাবার জিনিষ

কালোবাজারে সরিয়ে এরা টাকা পেটে। সামনের উপর আমায় রেখেছে—ধরা পড়লে ওরা ধর্মের বুলি কপচাবে, জেল-ফাঁস জনতার হাতের গণ-ধোলাই যত-কিছু আমার উপরে চলবে।

ভাঙা আড্ডা—খবর শুনে তবু যথাশক্তি কলরব করে উঠল। জয়ন্তকে বলে, মিষ্টিমিঠাই একলা তুমি সাপটাবে—সেটি হচ্ছে না। চারটেয় সবাই আমরা ফ্লাটে যাব। ভাল করে খাওয়াতে হবে, কিপটেপনা চলবে না আজ।

আকাশ অন্ধকার। থেকে থেকে বৃষ্টি নামছে, মেঘ তবু কাটে না। চারটের কিছু আগে থেকেই ফ্লাটের সামনে জয়ন্ত হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিটা যখন জোরে আসে, সামনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপরে চাঁদমোহন প্রভৃতিও এসে গেল। অরুণের দরজায় তালা ঝুলছে। গাড়ি-বারান্দার নিচে এদের গুলতানি চলল বেশ খানিকক্ষণ।

তীরবেগে ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি মেরে হাজির হলেন—কে মানুষটি দেখ দিকি ঠাহর করে। অরুণেন্দু বটে তো! সকালের সেই অরুণ এখন বিকালবেলা লাটসাহেবের মেজাজে ট্যাক্সি থেকে নামল।

আড্ডার মানুষ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—হো-হো করে অরুণেন্দু খুব একচোট হেসে নিল। একটি একটি করে সকলের মুখ পানে তাকায়। বলে, এত জনে জুটেপুটে এসেছিস! দেরি হয়ে যাচ্ছে, তবু কেউ তোরা নড়বি নে, নিশ্চিত জানতাম। কত দাম আজকে আমার!

মিটারে ষোলটাকার মতো উঠেছে। দুটো দশটাকার নোট পকেট থেকে টেনে অরুণ আলটপকা ছুঁড়ে দিল। ড্রাইভার খুচরো ফেরত দিচ্ছিল, হাত নেড়ে দিল সে: দিতে হবে না, বখশিস। চলে যাও তুমি।

লম্বা সেলাম দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি হাঁকিয়ে দিল। গতিক দেখে চক্ষু সকলের ছানাবড়া। হিসাবি ছেলে অরুণেন্দু—এক পয়সার মা-বাপ। এই নিয়ে কত ঠাট্টাতামাসা হাসি-মস্করা। চাকরি পেতে না পেতেই সম্রাট হর্ষবর্ধন হয়ে দানযজ্ঞ লাগিয়ে দিয়েছে। ট্যাক্সি বিনে চলা যায় না। নোটগুলো খই-মুড়ির সমান, মুঠো করে ছুঁড়ে দেওয়া হয়।

জয়ন্ত বলে, ষোলটাকা উঠে গেছে—গিয়েছিলি কোথা রে?

অরুণেন্দু বলে, কলকাতা শহরটা কত বড়—ভাবলাম, চক্কোর দিয়ে আন্দাজ নিয়ে আসি।

এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে?

বৃষ্টিটা বড্ড জোরে এলো—আর মনে পড়ে গেল, তোরা সব আসছিস। সবটা সেইজন্যে হল না, আধাআধি ঘুরে ফিরলাম।

জয়ন্ত গা টিপল চাঁদমোহনের। অর্থাৎ, বলেছিলাম না? স্ফূর্তির চোটে মাথার ঠিক নেই অরুণেন্দুর এখন। অতিশয় স্বাভাবিক। চাকরির আশা ছেড়েই দিয়েছিল, সেই জায়গায় এমন চাকরি—সোনার-খনি হীরের-খনি বললেই হয়। কেনাকাটা ও কন্ট্রাকটরদের বিল পাশ করার সেকশন—সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবার মুখে দু-পকেট নোট ও আধুলি-সিকিতে ঠাসা। ছেঁড়া-অচল অনেক চালায় বটে, কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়েও যা রইল—খুদ ম্যানেজারেরও লালসা জাগে চাকরি বদলাবদলি করবার জন্য।

সকলে হৈ-চৈ করছে: চাকরি হল অরুণ, খাইয়ে দে আমাদের—

অকাট্য জবাব ছিল : চাকরিই দিয়েছে, মাইনে তো দেয়নি। মাস পুরতে দে, মাইনেটা হাতে আসুক, খাওয়া-টাওয়া তখন। যে-না-সে এই বলে কাটান দিত। কিন্তু অরুণেন্দু আপাতত সম্রাট-শাহানশা—কথা পড়তে না পড়তে পকেটে হাত ঢুকে যায়। পকেটও রাজভাণ্ডার। খান চারেক নোট মুঠো করে তুলে অবহেলায় চাঁদমোহনের দিকে ছুঁড়ে দিল : চাঁদ-কেবিনে গিয়ে কবিরাজি-কাটলেট ভাজানোর জোগাড় দেখ্। খবর চাউর হয়ে পড়েছে, পুরানো ঘাঁটিতে বিস্তর এসে জুটবে। বেশি করে ভাজে যেন, যে যতগুলো চায় দিতে হবে। কাটলেটের সঙ্গে রাজভোগ। রসগোল্লা বুঝি বেআইনি—খোঁজ নিয়ে দেখগে, চোরাগোপ্তা অনেকখানে আছে। দামটা হয়তো ডবল। ত্রিভুবন খুঁজে যে দামে মেলে বের করে আনবি।

চাঁদমোহন অবাক হয়ে শুনছে, আর অন্যমনস্কভাবে হাত ঘষে নোটের ভাঁজ সমান করছে।

হি-হি করে হেসে অরুণ বলে, জাল-নোট কিনা দেখছিস বুঝি?

চাঁদমোহন বলে, নোটের কি দেখব রে, দেখতে হবে তোর পকেট। নোট ছাপানোর কল আছে পকেটে, ঝরঝরে নোট ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে।

পকেট থেকে একনাগাড় নোট বের করে যাচ্ছে—সকালবেলা যে-পকেট ছিল ফাঁকা গড়ের-মাঠ। ম্যাজিক দেখাচ্ছে, না সত্যি সত্যি?

চাঁদমোহন প্রশ্ন করে : মাইনে অগ্রিম দিল নাকি?

জয়ন্ত বলে, তাই বুঝি দিয়ে থাকে! ধার করেছে। চাকরি হল, ধার পাওয়া এবারে তো সোজা।

অরুণ ভ্রুভঙ্গি করে বলে, কঠিন কবে ছিল শুনি? চিরকেলে পাঁড়-বেকার আমি, তা দিসনি ধার তুই জয়ন্ত? দিসনি ধার চাঁদমোহন? ফেরত পাবি সেই আশায় দিয়েছিলি?

চাঁদমোহনের তুড়ুক জবাব : আলবত! ফেরত তো পাবোই—শুধো টাকা কয়েকটা নয়, কড়ায় গণ্ডায় যাবতীয় সুদ হিসাব করে। ব্যবসাদারের টাকা—হেঁ-হেঁ, এ জিনিস হজম করা চাট্টিখানি কথা নয়।

কথা না বাড়িয়ে চাঁদমোহন ছুটল। অতগুলো কাটলেট বানাতে সময় লাগবে। মালেও বোধহয় কম পড়বে, ঝটপট কিনে ফেলতে হবে বাজারে গিয়ে। অরুণ তালা খুলে ফ্লাটে ঢুকছে। অন্যদের বলে, তোরা এগুতে লাগ, হাত-পা ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে আমি আসছি।

পলি দেখা দিল। অফিস থেকে সোজা এসেছে। হাঁক পাড়ছে : খবর কি?

অরুণ দরজায় এলো। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে, এসে গেছ তুমি—ষোলকলা পরিপূর্ণ হল। সম্রাট অরুণেন্দু ফিস্টি দিচ্ছেন। চাঁদকেবিনে বিষম মজা—হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। চলো।

এসেছে পলি দ্রুতপায়ে। নিশ্বাস ঘন। পুলকিত কণ্ঠে বলল, আবার কিন্তু ক্রিমিন্যাল কাণ্ড করেছি। ফ্লাটের জন্য যেমন করেছিলাম। তোমার নাম জাল করেছি।

উল্লাসে কি করবে ঠাহর পায় না। কল-কল করে অবিচ্ছেদ বলে যাচ্ছে, একবার করে সাহস বেড়ে গেছে আমার। দেখলাম, ভালোই তো হয়। আবার আজকে। অবিকল তোমার মতন করে সই মেরে দিয়েছি।

অরুণ বলে, গাড়ি রেজেস্ট্রি করলে বুঝি?

গাড়ি এখন নয়, সে কথা তো হয়ে গেছে। তার চেয়ে অনেক জরুরি। মায়ের নামে মনিঅর্ডার করলাম। করলে তুমিই—আমি কেউ নেই। ভালো চাকরি হয়েছে—

কুপনে সুখবর জানিয়ে দিয়েছে। বাসার ঠিকানাও দিয়েছে। লিখেছে : তোমায় আর বউদিকে এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসতাম, কিন্তু চাকরির দরুন দেরি পড়ে যাচ্ছে, ছুটি নিয়ে চলে যাব শিগগির।

শুনছে অরুণ, আর পরম কৌতুকে উপভোগ করছে। প্রশ্ন করে : কত টাকা পাঠিয়েছি আমি মাকে ?

পঁচিশ—

এতে কি হবে, বেশি পাঠালাম না কেন ? কতদিন খবর নিইনি, বিস্তর ধারদেনা হয়েছে ওঁদের।

পলি সায় দিয়ে বলল, ঠিকই তো। কিন্তু মাসের শেষ—হাতে আর ছিল না। তুমি কাল মায়ের কথা বলেছিলে, ইচ্ছেটা তখনই মনে এলো। বাড়ি ফিরেই আবার বাবার মুখে চাকরির খবর। মোটে আর সবুর সইল না। ভাবলাম, এত আনন্দ আমাদের—তাঁরা কেন এর ভাগ পাবেন না ?

অ-হ-হ ! বিদ্রূপকণ্ঠে অরুণ বলে উঠল।

হাসছে সে খল খল করে। থতমত খেয়ে পলি চুপ করে যায়।

অরুণ বলে, মোটা ঘুষ দিয়ে ফ্লাট জোটালে আমার জন্য। ফার্নিচার কিনে কিনে ডাঁই করছ, মনিঅর্ডার করলে আমার মায়ের নামে। টাকা যেন খোলামকুচি। কেন, কেন বলো তো ?

ততক্ষণে সামলে নিয়ে পলি ধমকের সুরে বলল, আমার-আমার কেন করছ শুনি ? আমাদের। ফ্লাট আমাদের, ফার্নিচার আমাদের। মা আমাদের—তোমার, দাদার, দিদির, আমারও। একটি টাকাও আমি অপব্যয় করিনি। সে বরঞ্চ তুমি। খানা-পিনা এক্ষুনি না হয়ে কয়েকটা দিন চেপে থাকলেই হত। বিয়ের কিছু-না-কিছু করতেই হবে—এক খরচায় হয়ে যেতো।

খানাপিনাও তোমার টাকায়—

পলি আকাশ থেকে পড়ে : আমি কখন টাকা দিলাম ?

তুমি নয় তো কি আমি ? পাছে টাকা চেয়ে বসেন, সেই আতঙ্কে মাকে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখিনে।

পলি সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। অরুণ বলল, ফ্লাটের ভাড়ার টাকা, ফার্নিচারের বিলের টাকা—তোমার অনেক টাকাই তো আমার কাছে জমা রেখেছ।

পলি আঁতকে ওঠে : সেই টাকার নয়-ছয় করছ তুমি ?

শান্ত হাসি-ভরা মুখ অরুণের। অন্যায় করেছি—না ? বড্ড অন্যায়—

চাকরির আহ্লাদে এমন বেপরোয়া হয়ে পড়েছ—কী আশ্চর্য ? পয়লা তারিখে ওয়াদা—টাকা না পেলে যাচ্ছেতাই করে শোনাবে। শুনতে হবে তোমাকেই।

অরুণেন্দুর দৃকপাত নেই। বলে, আসুক সেই পয়লা—

পলি বলে, পয়লা পরশু—একটা দিন মাত্র মাঝে। টাকা কত খরচ হয়ে গেছে বলো দিকি।

হাসতে হাসতে অরুণ বলে, তা হয়েছে বই কি। গুণে কে দেখেছে। অর্ধেক শহর টাক্সিতে চক্কোর দিয়ে এলাম, ইচ্ছে মতন দান-খয়রাতও হয়েছে। তারপরে এই আমোদের খাওয়া। সত্যি কী ভালো যে লাগছে আজ !

আর পলি ছটফট করে মরছে : মাথা খুঁড়ি না কী করি—পরশুদিন সামাল দেবো আমি কেমন করে ?

নিজের ভাবে একটানা অরুণেন্দু বলে যাচ্ছে, খাসা লাগছে। উমেদারির শেষ—কারো খোশামোদের ধার ধারিনে। যেটা ইচ্ছে করতে পারি। মনের ভিতরের কথা মুখে বের করতে আটক নেই, ইতরকে মহৎ কালোকে ফর্সা বলতে হয় না। ভাবনা-চিন্তা দায়-দায়িত্ব সমস্ত কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। ইচ্ছে হলে উড়ে বেড়াতে পারি বোধহয়।

বাধা দিয়ে পলি বলল, দায়দায়িত্ব গেল কিসে? এবারে তো বেশি হয়ে আসছে। বাবা তারিখ অবধি ঠিক করে ফেলেছেন—আষাঢ়ের আঠাশে।

দু-হাতের বুড়োআঙুল আন্দোলিত করে অরুণেন্দু বলে, ঢনঢন ঢনঢন। আষাঢ় জন্মমাস আমার, বিয়ে হয় না।

মুখে হাসির লহর খেলছে—সত্যি নয় কখনো, ক্ষেপাচ্ছে। পলিও অতএব চপল সুরে বলল, হয় গো খুব হয়—গোড়ার তেরোটা দিন বাদ দিয়ে। ধাপ্পা দিচ্ছ কেন? মায়ের যদি খুঁতখুঁতানি থাকে, বেশ তো, ক'টা দিন পরে শ্রাবণের গোড়াতেই হতে পারবে।

একবার এদিক একবার ওদিক, কলের পুতুলের মতন অরুণ ক্রমাগত ঘাড় নাড়ছে : নয়, নয়। শ্রাবণে নয়, অঘ্রাণে নয়, কোনদিনই নয়। এমন রূপবান আমি, কালো মেয়ে বিয়ে করতে যাবো কেন?

ঠাট্টা যদি হয়ও, তবু কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কালো বলা অতিশয় জবর ঠাট্টা। অপমানে কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে পলির। ঠেশ দিয়ে বলে উঠল কালো বুঝি আজ প্রথম হলাম। কালই তো দিদিকে বলছিলে—

অরুণ বলে, তাই বটে। পলি কালো মেয়ে—কথাটা শুনে চমক খেয়েছিলাম কাল। কিন্তু কাল আর আজ এক নয়—তখন উমেদার ছিলাম আমি। উমেদার মানুষ থাকে না। বানিয়ে বানিয়ে নানান আজব কথা বলে। বলতে বাধ্য হয়। তা বলে, তুমি তো অন্ধ নও—আমার নির্জলা চাটুবাক্য বিশ্বাস করলে কেমন করে?

দু-চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টি পলির উপর ফেলে হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল : কী উৎকট কালো রে বাবা! আচ্ছা, কালো মানুষের ঘামও কি কালো হয় পলি? ঘামে ঘামে তোমার গায়ের জামাটা অবধি কালো হয়ে গেছে।

ঘাম নয়, পলির গায়ে বৃষ্টির জল। এবং পরেছে সে কালো অর্গাণ্ডির জামা। ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেওয়া এর পরে অসম্ভব। ভিতরে রহস্য আছে নিশ্চয়। সুব্রতা ছিল—বর পরিচয় দিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এই সুপুরুষ ছেলে—একা সুব্রতায় কখনো শেষ নয়। কত সুব্রতা কত দিকে—এবারে আরো চাকরি পেয়ে গেছে। রসগোল্লার উপর মাছির মতন নানান দিক থেকে তারা সব ছেঁকে ধরেছে ঠিক।

ব্যঙ্গের সুরে পলি বলল, এ কালো হঠাৎ বড় উৎকট লাগছে—আমার বাবার দয়ায় চাকরিটা পেয়ে যাবার পর।

অরুণ বলে, তোমার বাবা দয়া কাউকে করেন না। বরাবর ঘুষ নিয়ে এসেছেন, বিপাকে পড়ে এইবারটাই কেবল ঘুষ দিতে হচ্ছে। চাকরি ঘুষ দিয়ে মেয়ে গছানো।

ক্ষেপে গিয়েছে পলি : চাকরি দিয়েছেন, এই চাকরি কেড়ে নিতেও পারেন তা জেনো।

অরুণ কিছুমাত্র ভয় পায় না। বলে, বেশ তো, চাকরিটা যেখানে যাবে, প্রণয়ও সেই খানে চালান করে দাও। চুকে-বুকে গেল। আহা, রাগ করো কেন? আশাসুখে ফ্ল্যাট সাজাচ্ছ, ফ্ল্যাট তোমায় নিঃস্বত্ব হয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, আটকে রেখে শাপমন্যির ভাগী হব না। বিয়ে করে এই ফ্লাটেই এই সব ফার্নিচার নিয়ে বরের সঙ্গে ঘরকন্না পেতো।

পাটভাঙা ধুতি-জামা পরে ছিল অরুণ। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াচ্ছে। পলির দিকে তাকিয়ে বলল, চোখ যে ছলছলিয়ে উঠল—হা-হা। আবার কিছু খাটনির তালে পড়ে গেলে, কিছু সময়-ক্ষেপ—নতুন এক জনের সঙ্গে জমিয়ে নিতে হবে।

দরজায় তালা আটকে দিয়ে বলল, চাঁদ-কেবিনে ফুর্তিফার্তি এখন। ফুলস গিভ ফিস্ট—খাবার-দাবার সমস্ত তোমার টাকায়। অফিস থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছ—খেয়ে তুমিও কিছু উশুল করে যাও পলি। গরম গরম কাঠলেট, অ্যাব্বড়ো অ্যাব্বড়ো রাজভোগ—

হাত ধরতে যাচ্ছিল। পলি গর্জন করে উঠল : খবরদার!

কাল সকালে এসো তবে একবার। অতি অবশ্য এসো। ফ্লাটের কালই দখল দিতে পারব, মনে হচ্ছে।

বারান্দার উপর দুম করে লাথি মেরে পলি বলল, বয়ে গেছে—

পাক দিয়ে ঘুরে চোখের জল চাপতে চাপতে ফয়ফর করে সে বেরিয়ে গেল।

॥ বারো ॥

চাঁদ-কেবিনের পিছন দিককার ঘর। আড্ডা ভারি জমজমাট গরহাজির বড় কেউ নেই। অরুণেন্দু বসতে না বসতেই—পলিকে এই তাড়িয়ে এলো—তার ভাই প্রণব খোঁজে খোঁজে এসে উপস্থিত।

লাটসাহেবি মেজাজে অরুণ হাঁক দিল : কি চাই ?

এমনধারা কণ্ঠ প্রণব আর কখনো শোনে নি। ভয় পেয়ে সে মিনমিন করে বলল, মা পাঠালেন। টিন তো পেঁছিল না এখনো।

টিন—কিসের টিন ?

এরই মধ্যে বেমালুম সব যেন বিস্মরণ হয়ে গেছে। প্রণব থতমত খেয়ে বলল, কেরোসিন যাবে, সেই যে কথা ছিল।

না, যাবে না। বেআইনি জিনিস কেন যেতে যাবে ?

জয়ন্ত অরুণের মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিল : চুপ—কী যা-তা বলছিস !

জবাবটা নিজেই দিয়ে দিল : রাত্রের মধ্যে গিয়ে পড়বে, বলো গিয়ে খোকা। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

জয়ন্তর হাত ঠেলে সরিয়ে অরুণ বলে, কক্ষনো না। যদি পাঠাতে যাস জয়ন্ত, পুলিশ ডেকে তোকেই ধরিয়ে দেবো। কেনা-গোলাম নাকি যে হুকুম হলে জীবনপণে সেই সেই জিনিষ জোগাড় করতে হবে ? ঢের ঢের করেছি, আর নয়। ঘাড় হেঁট করে বেড়ানোর গরজ ফুরিয়ে গেছে, কাউকে কেয়ার করিনে আর এখন।

ছেলেমানুষ প্রণব অতশত কী বোঝে। ধমক খেয়ে মুখ চুণ করে সে চলে গেল।

আর অরুণেন্দু হাসিতে ফেটে পড়ে তার পিছনে : গরজের ধান্দায় না ঘুরতে হলে কী মজা তখন মানুষের—হা-হা, কী মজা !

পাগলের মতন করতে লাগল : কী মজা, কী মজা !

জয়ন্ত ভৎসর্না করে : এমনিধারা তুই—তোর এ মূর্তি ভাবতেও পারি নি কোনদিন। চক্ষুলজ্জা বলেও কি কিছু থাকতে নেই—ছিঃ।

চাঁদমোহনও টিপ্পনী কাটে : কাজের সময় কাজি কাজ ফুরোলে পাজি—সে তো জানা কথা রে ভাই, দুনিয়াময় চলে আসছে। কিন্তু ভোল-বদল বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টিকটু ঠেকছে—আমাদের পর্যন্ত।

অরুণ কানেও নিল না। হাসিমুখে তৃপ্তিভরা কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, বিশ্রী এক

দুঃস্বপ্ন যেন চেপে ছিল—ঘুমটা ভেঙে রেহাই পেয়ে গেলাম। কারো আর তাঁবেদার নই আমি, জোড়হাতে আজ্ঞে-আজ্ঞে করিনে। সম্রাট হবো, আচাষ্যিঠাকুর গুণেপড়ে বলে দিয়েছিলেন—ফলে গেল তাই। যেটা ভাবি, মন খুলে বলতে পারছি—খাতির-উপরোধ নেই। ছোট্টবেলা যেমনটা ছিলাম।

নম্র শান্ত সুন্দর-চেহারার যুবা ছেলে—লাজুক-লাজুক ভাব। দেখা যেত, আড্ডার একেবারে কোনটি নিয়ে চুপচাপ আছে। শুনত অন্যদের কথা, মজার কথায় নিঃশব্দ হাসিয় ছোঁয়া লাগত ঠোঁটের আগায়, কালেভদ্রে কদাচিৎ নিজে কথা বলত। সেই অরুণেন্দুর বিক্রম দেখ আজ—টগবগ করে কথা ফুটছে মুখে, হৈ হৈ করে চেঁচাচ্ছে, হাসিতে ঘর ফাটাচ্ছে, খাচ্ছে রাক্ষসের মতন। অবাক হয়ে সবাই বারম্বার তার দিকে তাকায়। একটা চাকরির জন্য, মা-ভাইকে একটু সুখ-সোয়াস্তি দেবার জন্য, বছরের পর বছর কী কষ্টটাই না করেছে। বড় আকাঙ্ক্ষার ধন হাতের মুঠোয় এসে পড়লে মানুষ বুঝি এমনি হয়ে যায়।

রসভঙ্গ হঠাৎ। খাতা লিখতে যায় নি বলে দোকানের মালিক লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজ কামাই করে জমাটি আড্ডার ভিতরে অরুণ, প্রধান আড্ডাধারী সে—দেখে লোকটার মেজাজ চলে গেল। বলে, উকিলবাবু আজ নিজে এসে কি করতে হয় না-হয় বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন, তা তোমারই দেখা নেই। কর্তা তাই ব্যস্ত হয়ে আমায় পাঠালেন ঃ অসুখবিসুখ করেছে ঠিক—নয় তো এদিকে কামাই করার কথা নয়। ভালোই হল, স্বচক্ষে দেখে গেলাম। অসুখের যাবতীয় লক্ষণ কর্তার কাছে নিবেদন করিগে।

দায়ে-বেদায়ে আগেও এক-আধবার কামাই হয়েছে। অরুণেন্দু হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতিমিনতি করবে, চা-রাজভোগ খাওয়াবে—লোকটার এই প্রত্যাশা। অরুণ কিন্তু ফ্যা-ফ্যা করে হাসে।

আর যাবো না, বলে দিও তোমার কর্তাকে। ভাগো।

হকচকিয়ে গিয়ে লোকটা বলে, হিসেব লেখার কাজ—না যাবে তো আগেভাগে নোটিশ দিতে হয়। হুট করে এক্ষুণি কাকে পাওয়া যায়?

অরুণ বলে, দোকানের মুটে আছে কতজনা, গাড়োয়ান আছে তাদেরই কাউকে ধরো না। উহুঁ, পাশ করেনি, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা নেই তাদের—পনের টাকায় তারা করতে যাবে কেন? কত কত বি-এ এম-এ ঘুরছে, তাদের দেখ গিয়ে। পাবে, গাদা গাদা পেয়ে যাবে।

কী মাতামাতিটা করল সারাক্ষণ। চাকরি পেয়ে বর্তে গেছে অরুণ। বারোটা বেজে গেল, আড্ডা গুটানোর তবু লক্ষ্মণ নেই।

জয়ন্ত বলে, বুঝি ভাই, স্ফূর্তির সাগরে ভাসছিস। তার উপরে অফিসের কাল ছুটি। কিন্তু আমাদের কি। সকালে উঠেই ফের দাঁড়ি ধরা—সারা রাত্রি জেগে পেরে উঠব কেন?

হাত ধরে জোরজার করে টেনে তুলল। মোড় অবধি সঙ্গে সঙ্গে গেল।

॥ তেরো ॥

বারান্দার উপর লাথি মেরে পলি বলে দিয়েছিল, আসবে না সে, কিছুতেই না, আসতে বয়ে গেছে তার। কিন্তু রোদ ওঠার আগেই হন্তদন্ত হয়ে সে চলে এসেছে। ঘোরাঘুরি করল ফ্ল্যাটের সামনে। শেষটা বারান্দায় উঠে পড়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

অরুণেন্দু ওঠে নি, দরজা বন্ধ।

দরজার কাছে গিয়ে চুপিচুপি ডাকে, অরু, অরুণ, দরজা খোল, কথা আছে। ও অরুণ—

চিন্তাভাবনা ফাঁকা হয়ে গিয়ে অরুণেন্দু গাঢ় ঘুম ঘুমচ্ছে। শুনতে পায় না। মেয়েছেলে হয়ে পড়োর মধ্যে চেঁচামেচি করে ডেকে তোলেই বা সে কোন লজ্জায়?

নিরুপায় পলি ছটফট করে বেড়াচ্ছে, কী করবে ভেবে পার না।

তখন জয়ন্তর কথা মনে হল। অরুণের সুখে দুঃখে দুই পরম বন্ধু—জয়ন্ত আর চাঁদমোহন। জয়ন্ত ইতিমধ্যে দোকানে এসে গেছে, একটি দুটি খদ্দেরও আসছে। হাত নেড়ে পলি জয়ন্তকে বাইরে ডাকল।

চলুন একবার জয়ন্তবাবু। আপনার বন্ধু এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। অসুখ-বিসুখ করল না কি হল, ডেকে দেখুন।

জয়ন্ত বলে, রাত দুপুর অবধি আড্ডা চলেছিল। তার উপর ছুটির দিন আজ, কাল থেকেই তো ঘানি-কলে জুড়ে দিচ্ছে—

পলির উতলা ভাব দেখে হেসে ফেলল সে। বলে, ভাবনার কি আছে? আজকের দিন আগেকার দিনগুলোর মতো নয়। কতকালের আশাপূরণ হল—নির্ভাবনায় প্রাণ ভরে ঘুমুচ্ছে বেচারি। আহা, ঘুমোক।

পলি কেঁদে ফেলল: হয় নি ওর চাকরি—

অ্যাঁ? বলে বজ্রাহতের মতো জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল।

পলি বলে, হওয়া-চাকরি ফসকে গেল। অন্য লোকে পেয়েছে।

বলেন কি! এমন তো হবার কথা নয়।

আমিও কি জানতাম? একগাদা কুচ্ছো কথা না-হক শোনাতে লাগল আমায়, রাগ করে চলে গেলাম। প্রণবকে এত ভালবাসত, তাকেও ধমকেছে খুব, বাড়ি গিয়ে সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। এমন ধারা মেজাজ ওর কোনদিন কেউ দেখি নি।

জয়ন্ত জুড়ে দেয়: দোকানের কাজে যায় নি বলে একটা লোক ডাকতে এসেছিল, তাকেও যাচ্ছে-তাই করে বলল।

পলি আকুল হয়ে বলল, তবেই দেখুন। এত কাল ধরে মিশছেন, দেখেছেন এমনিধারা? আমার ভয় করছে। কাল রাত করে বাবা বাড়ি ফিরলেন, তাঁর কাছে বৃত্তান্ত শুনলাম। পাজি ম্যানেজারটা বাগড়া দিয়ে দিল।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার সইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার মাধব প্রামাণিকের ঘরে কাশীনাথের ডাক পড়ল।

চেয়ার দেখিয়ে প্রামাণিক বললেন, বসুন মিস্টার কর। বড়-সাহেবের খুব বেশি আস্থা আপনার উপর।

আড়ালে যত তম্বি করুন, এখানে ভিন্ন মূর্তি। হেঁ-হেঁ করে তৃপ্তি ভরে কাশীনাথ হাসেন: একলা বড়সাহেব কেন, আপনার আস্থাই বা কম কী। আপনাদের নেকনজরে আছি বলেই দু-বেলা দুটো ডাল-ভাত খেতে পাচ্ছি।

ডাল-ভাত নয়, সেটা জানি। রীতিমতো পোলাও-কালিয়া। কী করে খান, তারও বিস্তর কেচ্ছা আমার ফাইলে আছে। ফাইল জমতে জমতে পর্বতপ্রমাণ হয়েছে।

কাশীনাথ বললেন, আপনাদের দয়া আছে বলে আমার উপর সকলের হিংসা। শত্রু আমার অনেক।

মাধব প্রামাণিক হাসিমুখে আগের কথার জের ধরে বলছেন, ফাইলের সেই পর্বত আমি আলমারির ভিতর ঢুকিয়ে তালা আটকে রেখেছি। যে পর্বতের বেশি নয়, একটা-দুটো পাথর খুলেই আপনি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবেন।

বলে মুখস্থর মতো গড়গড় করে গোটা তিনেক নমুনা ছাড়লেন। কাশীনাথ ভেবেছিলেন, সেই সেই পার্টি এবং তিনি ছাড়া তৃতীয় যিনি জানেন, তিনি হলেন অন্তর্যামী ভগবান। ভগবানের সঙ্গে মৃত্যুর পরে বোঝাপড়া—রিটায়ার করার পরে ভগবান নিয়ে পড়া যাবে, তাড়াহুড়ো কিছু নেই। কিন্তু এখন বুঝলেন, চতুর্থ আছে—এই সাধু প্রামাণিক। মুখ পাংশুবর্ণ তাঁর, নতুন দৃষ্টি খুলে গেল। এক-নম্বরের হাঁদারাম বলে ম্যানেজারকে বরাবর তাচ্ছিল্য করে এসেছেন—এই ব্যক্তি, দেখা যাচ্ছে, তাঁর অনেক উপর দিয়ে যায়।

হাসিমুখে পরম শান্তভাবে প্রামাণিক অবস্থাটা উপভোগ করছেন। প্রতিবাদে না গিয়ে কাশীনাথ সকাতরে বললেন, তালা আটকানোই থাক স্যার। বেরিয়ে পড়লে এ-বয়সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

রিটায়ারের বাকি কত?

কাশীনাথ একটু হিসাব করে বললেন, পাঁচ বছর তিন মাস।

বেশ, তার মধ্যে ও-আলমারি খোলা হবে না। বড়সাহেবের আস্থা নড়তে দেওয়া হবে না—এত বড় আস্থা যে, লোক বাছাইয়ের ষোলআনা দায়িত্ব সকলকে বাদ দিয়ে আপনার উপর দিয়েছেন।

সইয়ের জন্য রাখা হয়েছে সেই চিঠির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রামাণিক বললেন, কে-একজন অরুণেন্দু ভদ্রের নাম দেখছি টাইপ হয়ে এসেছে।

কাশীনাথ নিরীহ কণ্ঠে বলেন, তবে কোন নাম হবে স্যার!

ভূপেন্দ্রনাথ সুর। নতুন করে টাইপ করে আনুন।

কাঁটায় কাঁটায় দুটো। দোর ঠেলে অরুণ ভিতরে ঢুকে দেখল, পরম বন্ধু ভূপেন কাশীনাথের টেবিলে মুখোমুখি জমিয়ে বসে চা খাচ্ছে। অরুণকে কাশীনাথ চিনতেই পারলেন না।

থানায় খবর গেল। গুটি কয়েক কনস্টেবল নিয়ে অফিসার এসে পড়লেন। কাল রাত্রে যারা সব আড্ডা জমিয়েছিল, তাদেরও কেউ কেউ হন্তদন্ত হয়ে এসেছে—দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হল।

ছাদের আংটার সঙ্গে দড়ি বাঁধা—অরুণেন্দু মড়া হয়ে ঝুলছে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে বিঘতখানেক। ওষ্ঠের ফাঁকে চকচকে দু-পাটি দাঁত। চোখ দুটো ডবল তে-ডবল হয়ে কোটর থেকে গিলে খেতে আসছে যেন।

ঘরময় কাগজের টুকরো ছড়ানো। অফিসার হুঙ্কার ছাড়লেন: কোন-কিছুতে কেউ হাত দেবেন না। ভিতরে ঢুকবেন না—দেখতে হয়, বারান্দা থেকে দেখুন।

টুকরো কাগজ খুঁটে খুঁটে জড় করা হচ্ছে। না, দরকারি কিছু নয়। এম-এ ডিগ্রি, বি-এ ডিগ্রি, আরও কত ট্রেনিং নিয়েছে সেই সমস্ত সার্টিফিকেট। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে সমস্ত ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। মশলার দোকানে ঠোঙা বানিয়ে কাজে লাগাবে, তারও উপায় রাখেনি।

শিক্ষিত মানুষ হয়ে আত্মহত্যা করে বসলেন—ছি:!

বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়ে জয়ন্ত বিদ্রুপ-কণ্ঠে বলে, তাই বুঝি! কে বললেন কথাটা—সরকারি ভালো চাকরি বাগিয়ে দুধে-ভাতে আছেন, বলবেনই তো ভালো ভালো কথা! আদর্শের বুকনি আপনাদের মুখেই মানায় ভালো।

মরাটা ঠিক হয়েছে বলতে চান? এ তো পরাজয়।

জয়ন্ত উগ্রকণ্ঠে বলে, কোনটা ঠিক হত তবে ? নিজে না মরে আপনাদের সব মেরে মেরে বেড়ানো ? তা-ও হবে, তৈরি হতে লাগুন।

এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে অফিসার টেবিলের উপরের একটা কাগজ তুলে নিলেন : এই যে, পেয়ে গেছি, চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

চাঁদমোহন বলল, পাবেনই। নিয়মদস্তুর যেমনটি হতে হয়। অরুণ কখনো খুঁত রেখে কাজ করত না। চাকরি খোঁজার ব্যাপারে দিনের পর দিন দেখেছি।

অফিসার সশব্দে চিঠি পড়ছেন : আমার মৃত্যুর জন্য—

কে-একজন শেষটুকু পূরণ করে দিল : কেউ দায়ী নয়।

অফিসার ঘাড় নাড়লেন : সব কেসেই ঐ রকম লেখে—মরার জন্য কেউ দায়ী নয়। বাঁধা গৎ। ইনি দেখছি আলাদা কথা লিখেছেন—আমার মৃত্যুর জন্য রাজ্যসুদ্ধ দায়ী, কেবল আমি ছাড়া।

চাঁদমোহন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, নির্জলা সত্যি। নিজে সে কখনো দায়ী নয়। চেষ্টার তিলেকমাত্র কসুর ছিল না, হলপ করে বলছি। একসঙ্গে ওঠা-বসা আমাদের, রাতদিনের সাঙাত—

শেষ করতে না দিয়ে জয়ন্ত গর্জে উঠল : সাঙাত বলবি নে চাঁদমোহন—বেইমান সে, স্বার্থপর। ওর একলারই যেন কষ্ট-দুঃখ—আমরা সব সুখের সাগরে সাঁতরে বেড়াচ্ছি ! কোন-কিছু জানতে দিল না—জানালে পাছে সুইসাইড—প্যাক্ট করে বসি। একা একা ড্যাং-ড্যাং করে গিয়ে বেরুল।

দড়ি কেটে কনস্টেবলরা সন্তর্পণে মড়া নামাচ্ছে। অফিসার আর দেখতে পারেন না—দু-চোখে হাত ঢেকে বলেন, কী বীভৎস মশায়। রাত্রে ঘুম হবে না, স্বপ্নেও এই চেহারা দেখব। পরশু একটা সুইসাইডের কেস ছিল—মরেছেন বেশি মাত্রায় ঘুমের অষুধ খেয়ে। আহা-মরি মৃত্যু—মরেছেন না বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন, ধরা যায় না। এ ভদ্রলোক লিখলেন খাসা নতুন নতুন কথা, কিন্তু মান্ধাতার আমলের পথ নিতে গেলেন কেন ?

জয়ন্ত অরুণেন্দুর দিকে আবার এক নজর তাকিয়ে বলে, আপনাদের সব জিভ বের করে ভেঙচে যাবে বলে।

* * *

মনিঅর্ডার পৌঁছে গেছে। অরুর পাঠানো টাকা পেয়ে আর কুপনে খবর পড়ে অনেকদিন পরে যশোদা আজ বিছানা ছেড়ে নেমে পড়েছেন—রোগ আরোগ্য হয়ে গেল নাকি ? এতদিনে অভীষ্ট-সিদ্ধি—ঝাঁজ-শঙ্খে পাড়া তোলপাড় করে সত্যনারায়ণ-পুজো হচ্ছে, পুজোর সামনে সারাক্ষণ যশোদা করজোড়ে আছেন।

পুজো অন্তে আত্মারাম আচার্যের পুঁথিপাঠ এইবারে। তার মধ্যেও দেমাক করে আর একবার বলে নিলেন, কী ঠাকরুন, মনে পড়ছে না ? শৈশবে হাত দেখে বলেছিলাম, এ-ছেলে রাজরাজ্যেশ্বর হবে—দিকপাল সম্রাট হবে। এই তো শুরু, চড়বড় করে এবারে চলল।

অরুণেন্দুর সুঠাম দেহখানা চিরে-ফেঁড়ে ছিন্নভিন্ন করেছিল, আবার এখন একত্র করে দিয়েছে। লাস-কাটা ঘরে পড়ে আছে সে।

নতুন কালের শক্তিমান কথাকার

শ্রীমান রমাপদ চৌধুরী

স্নেহাস্পদেষু

॥ এক ॥

বিরাট অট্টালিকা। সদর মহল, অন্দর মহল। সোনাটিকারির রাজবাড়ি। সত্যি সত্যি রাজা উপাধি ছিল এ'দের এক পূর্বপুরুষ রামকুমার সোমের। রাজা রামকুমার সোম-চৌধুরি। নবাব-সরকারের কানুনগো ছিলেন তিনি, জরিপ করে লাখ দুই বিঘে জমি বের করে দিলেন। এত জমি জোতদারেরা বিনি খাজনায় ফাঁকি দিয়ে খেয়ে আসছিল। নবাব খুশি হয়ে গোটা সোনাটিকারি পরগনা রামকুমারকে বন্দোবস্ত দিয়ে দিলেন। আর রাজা বলে সনদ দিলেন।

জনপ্রবাদ এমনি। কেউ বলে সত্যি, কেউ বলে মিথ্যে। বলে, ঘুঘুলোক ছিলেন রামকুমার। নাজিরের সঙ্গে যোগসাজসে সোনাটিকারি গ্রাস করেছিলেন আসল মালিককে বঞ্চনা করে। রাজা উপাধিও ভুয়ো—ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে নামের আগে জোর করে তিনি রাজা লিখতে লাগলেন। নবাব-সরকারে অভিযোগ উঠল। রামকুমার বললেন, নামই আমার রাজা-রাম, পুরো নামটা সংক্ষেপ করে এ তাবৎ রাম বলতাম। এর উপর বলবার কিছু নেই। ডংকা মেরে সারাজীবন রামকুমার নামের আগে রাজা চালিয়ে গেলেন।

সে যাই হোক, তিন বিঘের উপর বিশাল অট্টালিকা আকাশ জুড়ে সেই আমল থেকে দাঁড়িয়ে। অহরহ মানুষজনে গমগম করত। এখন দিনকাল ভিন্ন। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে লোকে নানান রকমে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। রাজবাড়ির অন্য শরিকরা সময় থাকতে জমিজমা বিক্রি করে সরে পড়েছেন। আছেন মেজরাজা অশ্বিনীকুমার। পরগনার দেড়আনা হিস্যার মালিক তিনি। অতবড় বাড়িখানার ভিতরে তাঁরা কয়েকটি মাত্র প্রাণী—তা বলে মেজরাজার দৃক্‌পাত নেই। রীতিমত ডাকহাঁক করেই আছেন। এতখানি বয়সের মধ্যে অঞ্চলের বাইরে যাননি বড় একটা। যাবেনও না জন্মস্থান ছেড়ে, গোঁ ধরে আছেন। এখন বাড়ির মধ্যে একলা একটি পরিবার। কিন্তু সমস্ত মানুষ চলে গিয়ে সোনাটিকারি গাঁয়ের ভিতরেও যদি একলা হন, তবুও নড়বেন না দেহের ভিতরে জীবন থাকতে।

এক ছেলে আর এক মেয়ে রেখে স্ত্রী গত হলেন। বাঁশি ছ-মাসের তখন। ছেলে আশিস বাঁশির বছর পাঁচেকের বড়। বিধবা বড় বোন বিরজা এই সময়ে সংসারে এসে ছেলে-মেয়ের ভার নিলেন। রক্ষা পেলেন মেজরাজা, তাঁকে আর বিয়ে-থাওয়ার ঝামেলায় যেতে হল না। ছোট্ট সংসার—ঐ চারটি প্রাণীর। রাজবাড়ির উপরতলায় নিচের তলায় পনের-বিশখানা ঘর—মাঠের মতন এক-একখানার আয়তন, আকাশের মতন উঁচু ছাত। মোটা মোটা থাম রাতদিনের পাহারাদারের মতো অলিন্দ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। চারটি ছোটখাট মানুষ এর ভিতরে যেন নজরে আসে না।

পালানোর হিড়িক পড়েছে। আর তিনজনে ছটফট করছে, কিন্তু অশ্বিনী অবিচল। চিরকাল মানইজ্জত নিয়ে কাটিয়ে বুড়োবয়সে এখন কোন্ ভাগাড়ে মরতে যাব? যেতে হয়, তোমরা সব চলে যাও। আমি থাকব, আর—

মেজরাজার দাবার নেশা। খেলার সঙ্গী হাই-ইস্কুলের ভূতপূর্ব সেকেণ্ড-মাস্টার সদাশিব বাঁড়ুয্যে। তাঁকে দেখিয়ে বলেন, আমি থাকব আর থাকবে আমার শিব-দাদা। দু'জনে মজা করে রাঁধব বাড়ব খাব, দাবা খেলব,' সন্ধ্যা দেব বাপ-পিতামহের জায়গায়। আমার কি।

সদাশিবেরও খুব সায় ঃ গাঁখানা আমার সাজানো বাগান। একফোঁটা বয়স থেকে শুধু এই গাঁ নিয়ে আছি। একলা মানুষ, কে আমার কী করবে? গাঁ ছাড়লে দুটো দিনও বাইরে গিয়ে বাঁচব না মেজরাজা।

দাবা খেলছেন কতকাল, তার লেখাজোখা নেই। বাঁশি তখন একেবারে ছোট, বয়স দুই কি আড়াই বছর—সেই সময়ের একটা দিনের কথা ধক্ করে সদাশিবের মনে পড়ে গেল। বজ্জাতি মেয়ের সেই বয়স থেকেই। সদাশিব আলাদা নামে ডাকেন বাঁশিকে—কাঞ্চনবরনী। থপথপ করে বাঁশি খেলার জায়গায় এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই আছে। নিপাট ভালমানুষ, কিছুই যেন জানে না। মুখ তুলে সদাশিব হেসে একবার বললেন, হুঁ, দেখে দেখে খেলাটা শিখে নাও দিকি কাঞ্চনবরনী। বুড়ো হয়ে গেলাম—কবে আছি, কবে নেই। আমি গেলে মেজরাজার অনুপায়। খেলুড়ে পাবে না, দিন কাটাবে কী করে?

মেজরাজা তখন তামাক টানতে টানতে নিবিষ্ট হয়ে চাল ভাবছেন। বড় বিপাকে ফেলেছেন সদাশিব। বাঁশি হঠাৎ ডাকাতের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে কোটের উপরের ঘুঁটি হান্ডুলপান্ডুল করে দিল।

সদাশিব রে-রে করে ওঠেন ঃ দেখ, তোমার আহ্লাদে মেয়ের কান্ডখানা দেখ মেজরাজা।

অশ্বিনী চটেমটে বলেন, দাঁড়াও, বড্ড বাড়িয়েছ তুমি। মজা দেখাচ্ছি। এমন শিক্ষা দেব, কোনদিন আর ঘুঁটিতে হাত ঠেকাতে আসবে না।

প্রকান্ড চড় উঁচিয়েছেন। সদাশিবের সঙ্গে চোখোচোখি হতে হেসে ফেললেন। চড় না মেরে কোলে টেনে নিলেন বাঁশিকে।

সদাশিব বলেন, সে আমি জানি। কাঞ্চনবরনীও বোঝে সেটা। তাই অত প্রতাপ।

মেজরাজা তম্বি করেন ঃ পারি নে মারতে? তবে দেখ।

চড় তুলেছিলেন, আদর করে সেই হাতে বাঁশির গাল টিপে দেন।

সদাশিব বলে ওঠেন, কী কর, কী কর। আহা অনেক তো হল। একফোঁটা মেয়ে এত মার কী করে সইবে?

আবার অন্য সুরে বলেন, মারবেই বা কেন শুনি? কাঞ্চনবরনী তোমার উপকারই করে দিল। আর পাঁচ-সাত চালে মাত হয়ে যেতে। সাদাসিধে মাত নয়, অশ্বচক্র করে ছাড়তাম। ঘোড়ার চালে চালে তোমার রাজা সারারাত চক্কোর দিয়ে বেড়াত।

মেজরাজা বলেন, বেশ, সাজিয়ে নাও ফের। কার ঘুঁটি কোথায় ছিল সব আমার মনে আছে। মাত কে কাকে করে, দেখা যাক।

সাজাতে গিয়ে দেখা যায় লাল ঘুঁটি দু-তিনটে বাঁশির দু-হাতের মুঠোয়। দেবে না কিছুতে। তখন খোসামুদি করতে হয় ঃ আচ্ছা, তুমি সাজিয়ে দাও বাঁশি। বাঁশির মত কেউ পারে না। আমাদের চেয়ে ভাল পারে বাঁশি।

খোসামুদিতে দেবতাগোঁসাই অবধি গলে যান, বাঁশি আর কি! মনের আহ্লাদে সে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। রাজার জায়গায় বড়ে, রাজা গেলেন ঘোড়ার জায়গায়। বাঁশি একেবারে বিধাতাপুরুষ হয়ে যাকে যেখানে খুশি বসিয়ে দিচ্ছে।

সদাশিব বলেন, খাসা হয়েছে। যাও তুমি এইবারে, আমরা একটু সরিয়ে ঘুরিয়ে নি।

কিন্তু যতবার ঘুঁটি নিজ স্থানে নিয়ে আসেন, জেদি মেয়ে উল্টোপাল্টা করে দেয়।

সহসা দার্শনিক তত্ত্ব সদাশিবের মনে ভেসে আসে। বলেও ফেলেন মুখেঃ দেখ, শিশু হল ভগবান—ত্রিকালদর্শী। যা ভবিতব্য, তাই বলে দিচ্ছে। রাজা-প্রজা সব একাকার হয়ে যাবে, এর জায়গায় ও, তার জায়গায় সে। ঘুঁটির গোলমাল করে শিশু সেই কথা আগেভাগে বলে দিল।

মেজরাজা নিশ্বাস ফেললেন। খেলার মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা—কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে যেমন হঠাৎ। বলেন, দেরি বেশি নেই সেদিনের। ঝড়ের বেগে আসছে। রাজবাড়ির মেজরাজাকে সকাল-সন্ধ্যা কাছারি-দালানে ইদানীং নিজে গিয়ে বসতে হচ্ছে। ঠাটটুকু কোনরকমে বজায় রেখে প্রজাদের কেবল পায়ে ধরতে বাকি রাখি। খাজনাকাড়ি ঠিক মতো উশুল হলে তবে উনুনে হাঁড়ি উঠবে। নয় তো রাজপুত্র-রাজকন্যা মন্ত্রী-কোটাল সবসুদ্ধ পাইকারি উপোস। রাজার যে চাকরি-বাকরি করতে নেই, চাকরির বিদ্যেবুদ্ধিও নেই। কোন একটা উপায় থাকলে, সত্যি বলছি শিব-দাদা, কবে এদ্দিন রাজ্যপাট ছেড়ে পালাতাম।

সতের-আঠার বছর আগেকার কথাবার্তা। কী হয়ে গেল তারপর। নিরালা রাজবাড়ি প্রেতভূমির মতো। বাড়ির বাইরে সমস্ত সোনাটিকারি ও আর দশটা গ্রাম জুড়ে কখন কী ঘটে, এমনি ভয়ে বিহ্বল মানুষের দল। সেদিন মুখে যত বলাবলিই করুন, এতখানি সর্বনাশ কেউ ভাবতে পারেন নি।

॥ দুই ॥

রাজবাড়ির ভিতরে আরও একজন আছেন—হরিবিলাস ঘোষ। রাজ-এস্টেটের পুরানো খাজাঞ্চি। রাজবাড়ির ঘেরের মধ্যে কর্মচারীদের কোয়ার্টার। দু'খানা তিনখানা করে বসতঘর এবং রান্নাঘর ইত্যাদি। এমনি চারটে কোয়ার্টার পাশাপাশি। ম্যানেজার সুপারিন্টেন্ডেন্ট সদর-নায়েব ও খাজাঞ্চী থাকতেন। এখন সম্পত্তির সাড়ে-চৌদ্দআনা বেহাত হয়ে গেছে। চারজন বাঘা-বাঘা কর্মচারী বিশ-পঁচিশজন আমলা নিয়ে সামাল দিয়ে পারতেন না—সমস্ত গিয়ে একমাত্র হরিবিলাসে ঠেকেছে। একাধারে তিনি ম্যানেজার নায়েব ও খাজাঞ্চী। তা-ও কাজ খুঁজে পান না। পুরানো অভ্যাস মতো অশ্বিনীকে অতিশয় সমীহ করেন। পারতপক্ষে মেজরাজার মুখোমুখি হতে চান না। প্রাণের কথা যা-কিছু সদাশিবের সঙ্গে। এক-এক সময় সদাশিবকে বলেন, চিরকেলে খাটনির মানুষ, শুয়ে বসে বাত ধরে যাবার যোগাড় মাস্টারমশায়। ভাবি, যাই চলে কলকাতায়, ছেলের কাজ-কারবারে লেগে পড়িগে। ছেলেও তাই বারম্বার লিখছে। একা মানুষ তবু মস্তবড় বাসা ভাড়া করে আছে। মাকে নিয়ে তুলবে সেই বাসায়, খুব বড় ডাক্তার দেখাবে। কিন্তু বলুন মাস্টারমশায়, রুগিকে এই অবস্থায় ঠাঁইনাড়া করা কি উচিত? তার উপরে আমারও ঠিক মেজরাজার মতন—নতুন জায়গায় গিয়ে উঠতে সাহস পাই নে। হোক কলকাতা শহর—জায়গা নতুন তো বটে! বলে, হাজার রকমের সুবিধে শহরে। তবু আমাদের সোনাটিকারিই ভাল। কী বলেন মাস্টারমশায়?

হরিবিলাসের ছেলের নাম বিনয়। তিন-তিনবার ইস্কুল-ফাইনালে ফেল হল। সদাশিবের ইস্কুলের ছাত্র। গাঁয়ের সকলে হ্যাক-থু করে বিনয়কে। মূর্খস্য মূর্খ—এই সদাশিব মাস্টারমশায়ই কতবার বলেছেন। নিঃসহায় একদিন সে বেরিয়ে পড়ল। মনের ঘেন্নায় বলা যেতে পারে। সেই বিনয় শহরে গিয়ে এত চালাকচতুর হয়ে উঠবে, এমন জমিয়ে বসবে, কে ভাবতে পেরেছে! মায়ের অসুখ শুনে মাস দুই আগে একবার

সে এসেছিল। ছিল গোনাগুনতি মাত্র দুটো দিন। বেশি থাকবার উপায় নেই, সে দিকে তা হলে লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। হরিবিলাস যা বললেন—এলাহি কান্ডকারখানা। মস্তবড় ছাপাখানা করেছে, ত্রিশ-চল্লিশটা মানুষ খাটে। হুড়ুম-হাড়াম মেশিন চলছে সমস্ত দিন—কখনো বা রাত দুপুর অবধি। মায়ের জন্য একগাদা ফল নিয়ে এসেছিল বিনয়। আর কৌটো কৌটো রকমারি বিলাতি পথ্য। যে দু-দিন ছিল, দু-হাতে খরচপত্র করে চলে গেল।

অথচ তিরিশ বছরের মাস্টারিতে বিনয়ের মত অঘা ছেলে দেখেন নি সদাশিব। তখন বিনয় ক্লাস এইটে পড়ে। হেলাফেলার ক্লাস নয়, আর তিন বছর পরেই ধর ফাইনালে গিয়ে বসতে হবে। সদাশিবকে সেকেন্ড-মাস্টারি থেকে নামিয়ে দিয়েছে, তবু তখনো এসিস্টান্ট-টিচার হয়ে আছেন। দোর্দন্ডপ্রতাপ আগেকার দিনের মতোই। ছেলেরা কাছ ঘেঁষে না। তিনি আসছেন দেখতে পেলে ঝোপঝাড় অপথ-কুপথ ভেঙে পালাবে।

ক্লাস এইটের ছেলে বিনয় একদিন কাঁচামিঠে আমের লোভে দৈববুড়ির গাছে উঠে পড়েছে। দৈবসুন্দরী চোখে ঠাহর করতে পারেন না, ধরিয়ে দিল মেজরাজার মেয়ে বাঁশি। মেয়ে একটা বটে—বাঁশি না হয়ে বিচ্ছু কেন ওর নাম হল না! বিনয়ের চিরশত্রু বাঁশি। দৈব ক্যারক্যার করছেন, বিনয় কানেও নেয় না। তখন বাঁশিই বুড়ির কানে কানে বাতলে দিল : মাস্টারমশায় যাচ্ছেন—ঠাকুমা, ওঁকে ডাক দাও।

সদাশিব গাছতলায় এসে শান্ত স্বরে বললেন, নেমে আয়—

উঠে পড়েছিল সেই একেবারে মগডালে, এডাল-ওডাল করে নামছে। বাঁশি একছুটে গিয়ে একগাছা ফুলো-কঞ্চি এনে সদাশিবের হাতে দিল। শয়তানি বুদ্ধির হাঁড়ি মেয়েটা। বাঁশির দিকে এক নজরে তাকিয়ে সদাশিব অস্ত্রটা নিয়ে নিলেন। ফুলো-কঞ্চি দেখে শম্বুকের গতি হল বিনয়ের।

উপরের দিকে তাকিয়ে সদাশিব হুঙ্কার দিলেন : কই রে তাড়াতাড়ি নেমে আয়।

একসময় অবশেষে নামতেই হল ভুঁয়ে। সাদাশিব হাতের কঞ্চি আস্ফালন করছেন, অদূরে দাঁড়িয়ে বাঁশি তৃপ্তিভরে নিরীক্ষণ করছে। এইবার, এইবার! পুলকের আতিশয্যে পা-দুখানা নাচের মতন ওঠানামা করছে।

কিন্তু না মেরে সদাশিব প্রশ্ন করলেন : 'পরাকাষ্ঠা' মানে কী? ঘা কতক কঞ্চির বাড়িতে কী আর হত! এই শাস্তি অধিক গুরুতর। বিশেষ করে মহাশত্রু ঐ বাঁশির চোখের উপরে।

কী হল, মুখের বাক্যি হরে গেল যে!

কম্পমান কণ্ঠে বিনয় বলে, 'পরাকাষ্ঠা' মাস্টারমশায়? 'প'-এ আ-কার—

বানান চাই নে, মানে—

একটুখানি ভেবে বিনয় বলে, পরের কাঠ—

যা শঙ্কা করা গিয়েছিল—বাঁশি হাসিতে ফেটে চৌচির। দৈববুড়ি কী বোঝেন—তবু অন্য মানুষ না পেয়ে বাঁশি তাকেই সালিশ ধরে : শুনলে তো ঠাকুমা? 'পরাকাষ্ঠা' মানে পরের কাঠ—হি-হি-হি—

বিনয় গরম হয়ে বলে, তুই পারিস?

অন্য ব্যাপারে যাই হোক, এটা পারবে বাঁশি। নির্ভুল বলতে পারবে। কথাটা তারই বইয়ের। সদাশিব সকালবেলা বাঁশিকে পড়িয়ে আসেন। আজকেই পাওয়া গেছে কথাটা। মাথার মধ্যে ঘুরছিল, বিনয়কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সেইটেই তাঁর

মুখে এসে গেল।

জবাব দিয়ে বাঁশি সঙ্গে সঙ্গে ডানহাত বাড়িয়ে দিয়েছেঃ কান মলে দিই মাস্টারমশায়? উঃ, যা লম্বা বিনয়দা, কান হাতেই পাওয়া যায় না।

সদাশিব চটে উঠলেনঃ কান মলতে তোকে কে বললে?

আহত কণ্ঠে বাঁশি বলে, বাঃ রে, পেরেছি তো আমি।

তা বলে যে তোর বড়ভাইয়ের মতন—এক বাড়িতে থাকিস, বড়ভাই ছাড়া কী?—হুট করে তার কান মলতে যাস, বজ্জাত কোথাকার।

সুযোগ পেলেই বাঁশি বিনয়ের পিছনে লাগবে। বিনয় বেকুব হলে তার আনন্দ। সাঁতারটা বাঁশি খুব ভাল পারে। জল কেটে সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে যায় উড়ন-ডুবড়ির মতো তারা কাটতে কাটতে যেন। ঘাটে পড়ে বিনয় হয়তো তখন পা দাপাচ্ছে। তাই নিয়ে কী হাসাহাসি মেয়েটার—জলের মধ্যে থেকেও বিনয়ের গা জ্বালা করে।

একদিন তাই মরিয়া হয়ে খানিকটা দূরে চলে গেল—গিয়ে আর সামলাতে পারে না। ডুবছে, ভেসে উঠছে। জলের উপরে হাত উঁচু করে কী যেন বলছে বাঁশির উদ্দেশে। বাঁশি জল থেকে ঘাটের উপর উঠে পড়েছে তখন, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে বুকের উপর দু-হাত আড়াআড়ি রেখে নিঃশব্দে হাসছে। আর জল তোলপাড় করছে বিনয়। সত্যি সত্যি যখন তলিয়ে গেল, লাফ দিয়ে বাঁশি জলে পড়ে চক্ষের পলকে তাকে ধরে ফেলে।

বিনয়ের মা জ্ঞানদা সেইমাত্র ঘাটে এসেছেন। শরীর ভাল নয়, তবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন নি তখনো। ঐটুকু এক মেয়ে—চোখ মেলে দেখবার বস্তুই বটে—মেয়েটা কেমন অবহেলায় একখণ্ড শোলার মতন বিনয়কে ভাসিয়ে নিয়ে ঘাটের দিকে আসছে।

এত সমস্ত পলকের মধ্যে ঘটল। ঘাটে এলে সোয়াস্তি পেয়ে জ্ঞানদা ছেলেকে বকে উঠলেনঃ সাঁতার জানিস নে, কোন্ আক্কেলে অতদূরে চলে যাস?

বাঁশি তখন আবার বিনয়ের হয়ে ঝগড়া করেঃ তোমার অন্যায় কথা কাকিমা। ঘাটের রানা ধরে পা দাপিয়ে জলই ঘোলা হয় শুধু। সাঁতার শিখতে গেলে দূরে যেতে হয়।

জ্ঞানদা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, বিনয়ের প্রাণদান দিয়েছিস মা। তুই না থাকলে এক্ষুণি সর্বনাশ হয়ে যেত।

বিনয় সামলে নিয়েছে এতক্ষণে। বলে, মরেই যাচ্ছিলাম মা, বাঁশিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। তুমি আসছ দেখতে পেয়েই হয়তো—

বাঁশি বলে, না কাকিমা, মরবার কী হল? দেখছিলাম নিজে যদি আসতে পারে সাঁতরে। তা একটা পাতিহাঁস যা পারে, বিনয়দার সে মুরোদটুকু নেই।

বিনয় অভিমানের সুরে বলে, ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে ফেললাম কতটা—

প্রবীণ অভিভাবকের মতো বাঁশি সান্ত্বনা দিচ্ছেঃ কী হয়েছে! পুকুরের জল—নোনা নয়, বিষাক্ত নয়। ডুববে এক-একবার, জল খাবে, আবার ভেসে উঠবে। এমনি করেই তো শেখে মানুষে।

বলার ভঙ্গিতে জ্ঞানদার হাসি পেয়ে যায়। আদ্যিকালের বুড়ি-ঠাকরুন। কত ছোট তখন, কাঁধের উপর থোপা থোপা চুল নাচিয়ে বেড়ায়—সেই তখন থেকেই পাকা পাকা কথা মেয়ের মুখে। ঝলকানো রূপ, বুদ্ধিও ক্ষুরধার। জ্ঞানদার শরীর দিনকে দিন খারাপ হয়ে পড়ছে—বেশি দিন বাঁচবেন না, অহরহ তাঁর মনে হয়। মরার আগে এমনি একটা ছোট্ট মেয়ে ঘরে আনতে পারতেন—হেসে খেলে ঝগড়াঝাঁটি করে ঘুরত চোখের উপরে! বাঁশির কথা হচ্ছে না অবশ্য। রাজবাড়ির মেয়ে—হরিবিলাস ঘোষ

নিতান্তই পোষ্য-প্রতিপাল্য যাঁদের। মনে মনে এমন কথা ভাবতে যাওয়াও পাগলামি।

ইস্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় বিনয় ফেল হল। বার বার দু-বার ফেল হয়ে পুনশ্চ দেবে। মরিয়া হয়ে লেগেছে—পাশ করবেই এই তৃতীয় বারে। একপ্রহর রাত থাকতে উঠে মুখস্থ করে, পড়ার চোটে পাড়াসুদ্ধ ঘুম ভেঙে যায়।

সেই কথা হচ্ছিল। মেজরাজা বলেন, যেমনধারা খাটছে, নির্ঘাত এবারে পাশ। ফার্স্ট ডিভিসনে যাবে।

সদাশিব ঘাড় নাড়েন: কচু! মাথার মধ্যে ওর বিলু নেই, গোবর। তিন বারে কেন, তিরিশ বার দিয়েও যদি পাশ করে হাতের তেলোয় রোঁয়া উঠবে আমার। কথাটা বললাম, এখন শুনে রাখ, পরিণামে মিলিয়ে নিও।

বাঁশি এই সময়টা এসে পড়ল। খাজাঞ্চীর কোয়ার্টারের দিক থেকে আসছে। জ্ঞানদার কাছে প্রায়ই যায়। বড় আদরযত্ন করেন তিনি, এটা-ওটা খাওয়ান কাছে বসিয়ে।

বাঁশিকে দেখে সদাশিব বলেন, সত্যি সত্যি যার হবার ছিল, তাকে তো সংসারের রাঁধাবাড়া কুটনো-কোটায় লাগিয়ে দিচ্ছ তোমরা।

বিরজা বলেন, ছ-মাস না পুরতে মা খেয়ে অবসর হল, সংসারের কতক কতক না দেখলে বুড়োমানুষ একলা আমি কত টানব?

তারপর হেসে উঠে বলেন, তা ঐ দেখছ না, কত খাটনি খেটে বাড়ির গিন্নি বেলান্ত পরে এবারে বাড়ি ফিরলেন।

মেজরাজা ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন: ছেলেটাই ইস্তফা দিয়ে বসে রইল, মেয়ে বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়ে কী হবে?

কোলেপিঠে করে আশিসকে এত বড়টি করে তুলেছেন, তার নিন্দার কথায় বিরজা রক্ষা রাক্ষেন না। ভাইয়ের উপর করকর করে ওঠেন: রাজবাড়ির কোনু ছেলে কবে এম. এ., বি. এ পাশ করে বিদ্বান হয়েছে শুনি? একটা পাশ দিয়েছে সেই ঢের। তোমায় তো তাও হয় নি। তবে কী জন্য ছেলের কথা বলতে আস? বড়রাজার ছেলে যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছিল—ছেলের ঘেন্নাতেই ওরা তালুক বেচে দেশান্তরী হল। আর দিলীপের বউটা তো গলায় দড়ি দিয়ে বাঁচল—দারোগাকে দু-শো টাকা খাইয়ে কেলেঙ্কারি চাপা দিয়ে দিল। আমার আশিসকে নিয়ে বলুক দেখি কেউ অমন একটা কথা!

সদাশিবও জোর গলায় বিরজার সঙ্গে সায় দেন: সত্যিকার ভাল ছেলে আশিস। লেখাপড়া না করুক, দশের কাজ করছে। তিলেক বিশ্রাম নেয় না। গ্রামসুদ্ধ সকলের বলভরসা ওইটুকু ছোকরা-মানুষের উপর।

কী ভেবে হাসেন মৃদু মৃদু। হাসতে হাসতে আবার বলেন, বলেছ ঠিক কথাই বিরজাদিদি। একটা পাশ করেছে, এ-বাড়ির পক্ষে সেই তো অনেক। রাজপুত্র হয়ে অফিসের কেরানি হবে না, ইস্কুলের মাস্টারও হবে না। হয় যদি তো মিনিস্টার। তাতে বেশি লেখাপড়া লাগে না। ওই একটা পাশই হয়তো-বা বেশি হয়ে গেছে। লাগে তার জন্য দশের কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়া—যে দশের ভোট কুড়িয়ে এসেম্বলি যাবে।

মেজরাজা বলেন, মিনিস্টার নয়, পরিণামটা হবে তোমারই মতন। সে আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি শিব-দাদা। তোমার ওই বয়সের কথা ভেবে দেখ। তুমি কী হয়ে জীবন কাটালে? কিন্তু সে কথা থাক। মেয়ের পড়া নিয়ে তুমি আর তাল

লাগিও না। সেয়ানা হয়ে উঠেছে, দিনকাল ভাল নয়। গাঁয়ের এবাড়ি-ওবাড়ি ধিতিং-ধিতিং করে বেড়ায়, এ-ও আমি পছন্দ করি নে। বিয়ে-থাওয়া দিয়ে পরঘরি করতে পারলে বাঁচি।

সদাশিব নিরস্ত হবার পাত্র নন: যদ্দিন বিয়ে-থাওয়া না হচ্ছে, ঘরে বসে পড়াশুনো করুক। ওই একটা পাশই করুক না, বেশি কে বলছে। আমি পড়াব। ঘাড়ে দায়িত্ব পড়লে মেয়ের পাড়ায় ঘোরা বন্ধ হয়ে যাবে। বিয়েরও সুবিধা—সবাই আজকাল পাশ-করা মেয়ে খোঁজে। বাঁশি যা মেয়ে, একটু খাটলে ওর পাশ কেউ রুখতে পারবে না।

সদাশিবের জেদাজেদির কারণ আছে। গ্রামের হাই-ইস্কুল তিনিই একদিন গড়ে তোলেন। সদাশিব এবং তাঁর সমবয়সী ছেলে-ছোকরারা। মুরুব্বিরা মাথার উপর ছিলেন, কিছু কিছু টাকাপয়সা দিয়ে তাঁরা খালাস। লোকের ঝাড়ের বাঁশ, ক্ষেতের উলুখড় চিয়েচিন্তে এনে নিজেরা গায়ে-গতরে খেটে মাঠের মধ্যে বড় দোচালা ইস্কুলঘর তুলে দিলেন। গোড়ায় মাইনর ইস্কুল—হতে হতে তারপর হাই-ইস্কুল। মাস্টার না জোটায় সদাশিবকেও একজন মাস্টার হতে হল। সেই প্রথম অবস্থায় মাইনেকড়ি কিছু নয়, ঘরের খেয়ে ঠিক দশটায় ইস্কুলে হাজিরা দিতে হত। একটাও পাশ করেন নি, সেই হেতু হেডমাস্টার না হয়ে সেকেণ্ড-মাস্টার। কিন্তু অঞ্চলের মানুষ জানে, হেডমাস্টারের কাজ শুধুমাত্র ক্লাসে পড়ানো—ইস্কুল বলতে সেকেন্ড-মাস্টার সদাশিব বাঁড়ুয্যে।

সেই মাস্টারি চাকরি চলছে আজও। ইস্কুল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর আইনকানুন, নতুন গভর্নিং-বডি। মেম্বার বাছাইয়ের জন্য ভোটাভুটি দস্তুরমতো। সদাশিব এখন সেকেন্ড-মাস্টারও নন, জনৈক এসিস্টান্ট-টিচার। বিনা পাশের মানুষ বলে নব্য হেডমাস্টার তাঁকে ক্লাস ফোরের উপরে পাঠাতে ভরসা পান না। একেবারে না তাড়িয়ে নিচের মাস্টার করে রেখেছেন। এ-ও কত দিন চলবে, সন্দেহ আছে। সদাশিব তাই সর্বশেষ একবার দেখিয়ে দিতে চান, পড়ানোর ক্ষমতা আছে কিনা তার। বাঁশি মেয়েটাকে পেলে পাশ করানোর সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না।

সদাশিবের কথায় বাঁশিও মেতে উঠল সকাল-সন্ধ্যা দু'বার এসে সদাশিব পড়ান। বিনয়ের ধারণা, লেখাপড়ায় বাঁশির অমন উৎসাহ—সে কেবল বিনয় জব্দ হবে বলেই। বাঁশি পাশ করলে লোকে তুলনা করে দেখাবে: ছ্যা-ছ্যা, বেটাছেলে পেরে উঠল না একফোঁটা মেয়ের সঙ্গে!

সত্যি তাই হল, সদাশিবের কথা বর্ণে বর্ণে ফলে গেল। বিনয় এবারও ফেল। এবং তারই বছর খানেক পরে বাঁশি পরীক্ষায় প্রথমবার বসেই ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেই থেকে লোকের সামনে বেরোয় না। বাড়িতে সর্বক্ষণ মুখ গুঁজে থাকে। তবু রক্ষে নেই, যখন তখন বাঁশি গিয়ে পড়ে: পরীক্ষা আরও দু-একবার দিলে পারতে বিনয়দা।

নিরুত্তরে ঘাড় গুঁজে আছে তো বাঁশি বিরক্তির সুরে বলে, না পড়বে তো কাকামশায়ের সঙ্গে কাছারি-দালানে গিয়ে বোসো কাল থেকে। কান-ফোঁড়া খাতা লিখতে লেগে যাও। লিখতে লিখতে হাতের অক্ষর ভাল হবে, পরিণামে খাজাঞ্চী হবে আমাদের।

হলই না হয় মনিবের মেয়ে, তা বলে, ঘরের মধ্যে উঠে এমনি ট্যাঙস-ট্যাঙস শোনাবে। গ্রামছাড়া হয়ে তবে রেহাই। বিনয়ের ছোটমামা কলকাতায় মেসে থেকে

চাকরি করেন, তাঁর কাছে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে একজনের ধরায় ছাপাখানায় কাজ পেল একটা। আজ সেখানে হর্তাকর্তা-বিধাতা। যে ভদ্রলোকের ছাপাখানা, তাঁর নাম রঞ্জিত রায়। কলকাতায় মানুষ রায় মশায়কে একডাকে চেনে। কাজের মানুষের বড় মর্যাদা রঞ্জিতের কাছে, বিনয়কে নাকি চোখে হারান তিনি।

হরিবিলাস জাঁক করে বলেন, পাশটা করে নি ভাগ্যিস। পাশ করে কী হত? আমার ছোট শালা গ্র্যাজুয়েট হয়ে ষাট টাকায় সারাদিন অফিসে কলম ঘষে। তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে বিনয় অমন বিশটা ষাট টাকার মানুষ পুষছে।

॥ তিন ॥

স্বাধীনতা নিয়ে ডামাডোল। পুলকে হৃৎকম্প সকলের। চারিদিকে পালানোর হিড়িক। এ ছাড়া কথা নেই মানুষের মুখে। কী হবে, উঠব গিয়ে কোথা?

হরিবিলাসের এসব ভাবনার অবসর নেই। জ্ঞানদার বাড়াবাড়ি অসুখ—সর্বক্ষণ সেই চিন্তা। অসহ্য যন্ত্রণা কাটা-কবুতরের মতন জ্ঞানদা ছটফট করেন বিছানায়, সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। বিনয় আসতে পারবে না, কাজের চাপ বড় বিষম। এসেই বা কী করবে, এক-আধ দিনে সারার ব্যাধি নয়। তবে চিঠি আসে প্রায় প্রতিদিনই। মায়ের জন্য বিনয়ের প্রাণ পড়ে আছে এই সোনাটিকারিতে।

পঁচিশ মাইল দূরে জেলার সদর, সেখানে নাম-করা বড়-ডাক্তার একজন আছেন। তাঁকে এনে দেখানো হল। অঢেল খরচ। কাঁচা-রাস্তায় ট্যাক্সি করে আনতে হল, টাকা চল্লিশের মতো গেল সেই বাবদে। ডাক্তারবাবুর ফী বত্রিশ, বলে-কয়ে পঁচিশে রাজি করানো গেল। তার উপরে ওষুধপথ্যি ও আজেবাজে আর দশটা খরচা। প্রাণের বড় কিছু নেই—কথা সত্যি হলেও খরচা রাজাবাদশার পক্ষেই সম্ভব শুধু। তাই করছেন খাজাঞ্চী হরিবিলাস, খোদ মালিক মেজরাজা যা এই বাজারে পেরে ওঠেন না।

সদাশিব বলেন, কেন করবে না বল। খুঁটার জোরে মেড়া লড়ে। বিনয় হরবখত চিঠি দিচ্ছি, মায়ের চিকিৎসার কোনরকম ত্রুটি না হয়—

আবার বলেন, সাত চড়ে মুখে একটা কথা ফুটত না, সেই বিনয় একদিন এমন হয়ে উঠবে কে ভাবতে পেরেছে।

অশ্বিনী নিশ্বাস ফেলে বলেন, কপাল। কপাল ছাড়া কী আর বলি। আশিসের কথা তোমরাই সব বলে থাক—কত বুদ্ধিমান আর কী রকম চৌপিঠে। বিনয়ের যদি একগুণ হয়, আশিসের বিশগুণ হবার কথা। কিন্তু পরহিতের ভূত চেপে আছে ঘাড়ে। গ্রামের লোকে কোথায় গিয়ে উঠবে কী করবে, সর্বক্ষণের সেই ভাবনা। আমার নিজের কথা বলি নে—গলা কেটে দুই খণ্ড হলেও পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এক পা আমি নড়ব না। কিন্তু সোমত্ত বোন আর পিসি রয়েছে, তাদের ভাবনা ভাবা উচিত উপযুক্ত ছেলের।

সদাশিব তাড়াতাড়ি বলেন, আশিসের নিন্দে কর না মেজরাজা। এখনো বলছি হীরের টুকরো ছেলে। যার যে কাজ, যে পথে যার আনন্দ। এই নিয়ে তুলনা করার কিছু নেই। টাকাই জীবনের পরমার্থ নয়; আবার টাকা কিছু নয় এমন কথাও বলি নে। যে দিক দিয়ে যে জীবনের সার্থকতা খোঁজে।

ভাল ভাল কথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অশ্বিনীর আপাতত কানে ঢোকে না। মনে মনে তুলনা করছেন হরিবিলাসের সঙ্গে। পোষ্য হোক প্রতিপাল্য হোক, কর্মচারীর

অবস্থা অনেক ভাল মনিবের চেয়ে।

সোনাটিকারির বাস যদি তুলতেই হয়, মাথা পিছু টাকা চারেকের মতো সংগ্রহ হলেই হরিবিলাসের হয়ে গেল। স্টিমার ও ট্রেন ভাড়া। এবং মাথার সংখ্যাও দুটি মাত্র—স্বামী আর স্ত্রী। ছেলে কলকাতায় জমিয়ে বসেছে—উৎকৃষ্ট বাসা, ভাঁড়ারে চাল-ডাল মজুত, ব্যাংকে টাকা। উঠে পড়লেই হল। কিছু করতে হবে না, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছেলের রোজগারের ভাত খাওয়া। গাঁয়ের উপর ভালবাসা ইত্যাদি যত যা-ই বলুন, জ্ঞানদা শয্যাশায়ী বলেই আজও সেটা পেরে ওঠেন নি। সদরের ডাক্তার এনে এত খরচ-খরচার কারণও তাই। স্ত্রীকে কোনরকমে একটু খাড়া করে তুলতে পারলে বেরিয়ে পড়েন।

আর মেজরাজা অশ্বিনীর হল অকুল-পাথার। ভাবতে গিয়ে থই পান না। সবচেয়ে দায় হয়েছে সেয়ানা মেয়ে বাঁশি। শুধু সেয়ানা বললেই হল না, সুন্দরী মেয়ে। সদাশিব যার নাম দিয়েছেন কাঞ্চনবরনী। রাজবাড়ির কিছুই আর নেই, কিন্তু প্রাচীন বৈভবের ছাপ পড়ে আছে সুপ্রাচীন অট্টালিকায় আর মানুষগুলোর চেহারার উপর। ধবধবে ফর্সা রং, নিখুঁত মুখ-চোখ-নাক প্রায় সকলেরই। কিন্তু বাঁশি দিন-কে-দিন এ কী হয়ে উঠছে! পরিবারের সমস্ত মেয়েপুরুষকে ছাড়িয়ে গেল। যে বিধাতা-পুরুষ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, রাজবাড়ির ঐশ্বর্য হরণ করে নিয়ে সুদে-আসলে যেন পূরণ করে দিয়ে যাচ্ছেন একটি মেয়ের চেহারায়। এ আগুন নিয়ে পথে বেরুনো বিপদ। অট্টালিকার নিভৃতে গোপন করে রাখবেন—দেশ ভাগাভাগির হাঙ্গামায় তারও আর উপায় রইল না।

জ্ঞানদা খাড়া হয়ে উঠে কলকাতায় ছেলের বাসায় যাবেন, সে বুঝি এ জীবনে আর হল না। সদরের বড়-ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করে রায় দিয়ে গেলেন; হরিবিলাসকে নিভৃতে নিয়ে কানে কানে রোগের নাম বললেন, ক্যান্সার। শিবের অসাধ্য যে ব্যাধি। রোগও খুব এগিয়ে গেছে। সুস্থ হবার আশা নেই, তবে জীবনের মেয়াদ সামান্য হয়তো বাড়ানো যায়। এবং ওষুধপত্তর দিয়ে রোগের যন্ত্রণার কিছু উপশম করা যেতে পারে।

গাড়িতে উঠে বসে ডাক্তার আবার বলেন, অসীম সহ্যশক্তি আপনার স্ত্রীর। আমি যতক্ষণ ছিলাম, একবার উঃ-আঃ পর্যন্ত করলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। কিন্তু পেটের ভিতর কী রকমটা হচ্ছে, আমি জানি। নিজের জন্যে তাই বলি, অন্য যে ব্যাধি হয় হোক, ক্যান্সার হয়ে যেন মারা না যাই। ও কষ্টের তুলনা নেই।

শুনতে শুনতে হরিবিলাস কেঁদে পড়লেন। দু-চোখে জলের ধারা গড়াচ্ছে। বলেন, জীবনটাও ঠিক এমনি মুখ বুজে সহ্য করে গেল ডাক্তারবাবু। কোন দিন কারও কাছে একটা দুঃখের কথা বলল না। আমার কাছেও না। তিন তিনটে পেটের সন্তান গেছে। সাংসারিক অভাবও লেগে আছে বারোমাস তিরিশ দিন। ভাল কাজকর্ম করে ছেলেটা অ্যাদ্দিনে দুটো পয়সার মুখ দেখছে। বাসা করেছে মাকে নিয়ে ভাল রকম চিকিচ্ছে করাবে বলে। কিছুই যে হল না ডাক্তারবাবু। ওর মনেও কত আশা—ছেলের বিয়ে দিয়ে কলকাতার বাসায় গিয়ে সংসারধর্ম করবে—

খপ করে হরিবিলাস ডাক্তারের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন: তাই করুন, কষ্টটা যাতে কম পায়। অন্তত যদি দুটো মাসও আর ধরে রাখতে পারেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে বউয়ের মুখ দেখিয়ে দেবো। ওর বড্ড সাধ। ছেলে রোজগেরে হয়েছে, খরচপত্রের ত্রুটি হবে না ডাক্তারবাবু।

সদরের ডাক্তার আরও কয়েকবার এসে গেলেন। অজ পাড়াগাঁ জায়গায় রাজসূয় চিকিৎসা। এমন সমারোহ অন্য কারো বাড়ি দেখা যায় নি। কৃতী ছেলের ভাগ্যধরী মা—হবে না কেন?

চিকিৎসার গুণে কষ্টভোগ কিছু কমই বটে, কিন্তু মেয়াদ বুঝি আর বাড়ানো যায় না। রোগিনীর এখন-তখন অবস্থা। কাজকর্ম ফেলে বিনয় কলকাতা থেকে হাহাকার করে এসে পড়ল। মায়ের বিছানার পাশে বসেছে, টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। বাপ ছেলে দু-জনেরই নরম মন, চোখের জল কেউ সামলাতে পারে না।

ছিঃ, বিনয়দা—

কখন এসে পড়েছে বাঁশি, পিছন দিক থেকে হাত বাড়িয়ে বিনয়ের চোখ মুছে দিল। জ্ঞানদা চোখ বুজে ছিলেন। গলার স্বরে চোখ মেলে দেখেন, স্বর্ণ চাঁপার রঙের হাতখানা ঝিলিক মেরে অদৃশ্য হল। হাতের মালিকটিকেও আর দেখতে পাওয়া যায় না।

এই সময়ে একদিনের ব্যাপার। বিরজা দেখতে এসেছেন। মিনমিন করে অতি অস্পষ্টভাবে জ্ঞানদা কথা বলেন। মোটের উপর কিছু ভাল আছেন আজকের দিনটা। ম্লান হেসে জ্ঞানদা বললেন, চলে যাচ্ছি দিদি। একবার পায়ের ধুলো দাও।

বালাই ষাট!—বলতে হয়, তাই মুখের স্তোক দিচ্ছেন বিরজাঃ হয়েছে কী তোমার বউ! এমন কত জনের হয়ে থাকে। এর চেয়ে বেশি হয়। আবার সেরেসুরে উঠবে।

জ্ঞানদা বলেন, তোমরা ভালবাসো দিদি, এ তোমাদের আশীর্বাদ। কিন্তু যমদূত শিয়রের কাছে ওৎ পেতে রেয়েছে, সর্বক্ষণ আমি টের পাই। দেখ, একটা কথা মনের মধ্যে অনেক দিন ধরে আনাগোনা করে। সেদিন দেখলাম বাঁশি-মা আমার বিনয়ের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। কথাটা সেই সময় আবার নতুন করে মনে উঠল।

বিরজা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেনঃ ভাল হয়ে ওঠ বউ। তারপরে অন্য কথা।

ভাল আমি আর হব না—

হবে বই কি, নিশ্চয় হবে।

বিরজা একলা অতঃপর জ্ঞানদার কাছে বসতে সাহস পান না। কী বলে বসেন, এমন অবস্থায় স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলা কঠিন। বিনয়কে দেখছি নে। সে কোথায় গেল? বসুক এসে মায়ের কাছে—ডাকতে ডাকতে ব্যস্তভাবে বিরজা সরে গেলেন।

কথাবার্তাগুলো কি ভাবে বিনয় টের পেয়েছে। ক্ষণপরে সে এসে বলে, অসুখ হয়ে মা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

জ্ঞানদা বলেন, কেন, কম কিসে আমরা? বংশের দিক দিয়ে আমরাই বরঞ্চ উঁচু। জাঁক করবার মতো ছেলে তুই আমার বিনয়।

তোমার ছেলে নিয়ে মনে মনে তুমি যত খুশি গরব নিয়ে থাক—কিন্তু আমরা আশ্রিত, ওঁরা মনিব আমাদের, এটা কোনদিন ভুলে যেও না।

জ্ঞানদা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, ফুটো রাজত্বের দেমাক বেশি দিন নয় আর। বিদেশে থাকিস, তাই খবর জানিস নে। মেয়ের বিয়ের ভাল ভাল সম্বন্ধ কেঁচে যাচ্ছে শুধু টাকার জন্যে।

ক্লান্তিতে একটু চুপ করে থেকে বলেন, রোগা মানুষ কথাটা বললাম, তা বিরজাদিদি মুখ ঘুরিয়ে উঠে পড়লেন। বেঁচে থাকব না যে। নয়তো ভাইঝিকে কেমন ঘরে-বরে দেন, দেখতে পারতাম। আমার ছেলের তুলনায় কী রকম পাত্র সে।

রোগিনীর ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা দিয়ে সহসা বিনয় কলরব করে ওঠে: দেখ মা, বাঁশি তোমার জন্য তালশাঁস নিয়ে এসেছে দেখ। সেই যে তখন কথা হচ্ছিল—

জ্ঞানদা বেকুব হলেন। কথাবার্তা শুনে ফেলল নাকি বাঁশি? রেখেঢেকে তো কিছু বলেন নি—শুনেছে ঠিক। পেটের মধ্যে বিষম জ্বালা, সেজন্য তালশাঁসের জল খাওয়ার কথা উঠেছিল—আর দেখ, মেয়েটা তাই শুনে লোকজন যোগাড় করে কাঁচা-তাল পাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ভাল মেয়ে, বড় ভাল মন, টান আছে খুব জ্ঞানদার উপর। মেয়েটার অত দেমাক নেই।

ফোঁস করে জ্ঞানদা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

বাঁশি অনেকক্ষণ রইল। জ্ঞানদার গায়ে হাত বুলায়। পাখা করে। কথাবার্তার কিছু তার কানে গিয়েছে, মনে হয় না। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। জ্ঞানদাই বললেন, যাও মা এবারে।

উঠে দাঁড়িয়ে বাঁশি ডাকে: শোন বিনয়-দা। বাঁশঝাড়ের নিচে ভয় করে আমার। জায়গাটা পার করে দিয়ে যাও।

হঠাৎ থমকে দাড়ায় বাঁশি সেই বাঁশবনের নিচে ঘনান্ধকারের মধ্যে। তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে, আমরা দোতলার উপর থাকি আকাশ-ছোঁওয়া কোঠাবাড়িতে। তোমরা একতলার খুপরি-ঘরে। হাত বাড়াতে যেও না কখনো উপর দিকে। পয়সা হয়ে তোমার হাত যত লম্বাই হয়ে উঠুক, অতদূর নাগাল পাবে না।

বলে দুমদুম করে পা ফেলে সদর-উঠানে পড়ে, উঠান পার হয়ে লহমার মধ্যে ভিতর-বাড়ি ঢুকে গেল।

॥ চার ॥

জ্ঞানদা মারা গেলেন। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে ন্যাড়া মাথায় বিনয় কলকাতা ফিরল। কত লোক ঠিকানা চেয়ে নেয়: গাঁয়ে থাকা যাবে না। আমরাও গিয়ে পড়ব বিনয়। কোন একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তুমি কলকাতা শহরে আছ, কত বলভরসা! গিয়ে উঠব তোমার বাসায়। যতক্ষণ কিছু না হচ্ছে, নড়ব না। তাড়িয়ে তো দিতে পারবে না।

এত মানুষের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করবার শক্তি রাখে, বিনয় স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারে নি। শুনে শুনে আত্মপ্রসাদ জাগবার কথা, কিন্তু অস্বস্তিতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই গ্রাম, গ্রামের ঘরবাড়ি, লোকজন, সমাজ-সামাজিকতা কিছুই আর থাকবে না। টলছে। ভেঙে পড়ে চুরমার হবে, দেরি নেই আর তার। সকলে কলকাতা-মুখো তাকিয়ে। কলকাতা অবধি অতদূর না-ও যদি হল, অন্তত-পক্ষে সীমান্ত পার না হয়ে সোয়াস্তি নেই। পার হয়ে গিয়ে হয়তো বা মাঠ-জঙ্গল খাল-বিল—এঁরা ভাবছেন, অনেক ভাল এখানকার এই বাঁধা ঘরবাড়ির চেয়ে।

আপিসের কাজ খুব। অহোরাত্রি ঘুরছে সে চরকির মতো। সোনাটিকারিতে লোক এসে পড়ছে বাইরের গাঁ-গ্রাম থেকে। মানুষ আগে যা ছিল, এখন তার চার-পাঁচ গুণ। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে—বান ডাকলে কিম্বা বাঘে তাড়া করলে যেমন হয়। মানুষ-জন চলে গিয়ে সারা অঞ্চল ফাঁকা, শুধু এই রাজামশায়দের গাঁয়েই যা-হোক কিছু আছে। সকলে একসঙ্গে থাকলে বল অনেক। শরিকরা চলে গিয়ে রাজবাড়ির বিস্তর ঘর খালি পড়ে ছিল। আশ্রিতেরা এসে জুটেছে, মানুষ কিলবিল করছে এখন

সেখানে।

সত্যি, কেমন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চিরকালের পড়শিদের দৃষ্টি আলাদা। হয়তো বা চোখের দোষ এ-পক্ষেরই। কামলা রোগ হলে মানুষ যেমন দুনিয়াময় হলদে রং দেখে। খবরের কাগজে দাঙ্গার খবর—এপারে লেগেছে, ওপারেও। তবে এই সোনাটিকারি অঞ্চলে কিছু নয়। তবু এমনি হয়েছে—চারটে মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, অন্তরাত্মা অমনি গুর গুর করে ওঠে : এই রেঃ, লেগে যায় বুঝি। দাঙ্গা বাধানোর শলাপরামর্শ হচ্ছে।

টেঁকা যাবে না, নিঃসন্দেহ। যেতেই হবে—আজ হোক আর কাল হোক। যেতে যখন হবেই তখন আর কাল কেন, আজকেই। বেড়া-আগুনে কাল হয়তো বেরবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

মেজরাজা ছেলের নিন্দে করতেন, চোখ মেলে এবারে দেখুন কাজকর্ম। খাটতে পারে বটে আশিস। কয়েকটা দিন বিষম ঘোরাঘুরি, আহার-নিদ্রা এক রকম বন্ধ। এর বাড়ি যায়, ওর বাড়ি যায়। ঘরে ঘরে গিয়ে গাঁটরি বেঁধে দিচ্ছে। তারপর এক রাত্রে রওনা হয়ে পড়ল, সঙ্গে নানান বয়সি একগাদা স্ত্রী-পুরুষ। আশিস দলের কর্তা। খুলনা-ঘাটে সকলকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলে খাইয়ে ট্রেনে তুলে দিল। ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশন। সেখানে পৌঁছানোর পর ছুটি। শহরে হরেক দল গড়েছে—তারাই এবার ভার নিয়ে নিল। যা-কিছু করবার তারা করবে, না করলে নাচার। দুটো কথা ঠান্ডা হয়ে শোনারও সময় নেই আশিসের। পরের গাড়িতেই ফেরে। সোনাটিকারিতে ইতিমধ্যে নতুন এক দল তৈরি হয়ে আছে, তাদের আবার পেঁছে দিতে হবে। গ্রাম আর শিয়ালদহ—টানাপোড়েন অবিরত চলছে।

ট্রেন সীমান্তের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে, হিন্দুস্থান অনতিপরেই। মানুষে ঠাসা কামরাগুলো। ছাতের উপরেও উঠেছে কতক, বিচিত্র কৌশলে চাকার পাশে রডের উপরেও গিয়ে বসেছে। ওর মধ্যে চোদ্দআনা মানুষের মুখে টু-শব্দটি নেই—যেন মড়া। হিন্দুস্থানে গিয়ে উঠবে তারা। বাকি দু-আনা কাজেকর্মে চলেছে, আবার ফিরবে, খুব হল্লা-স্ফূর্তি তাদের। গাড়ি না থামতে চা—চা—করে চেঁচাচ্ছে। পান কিনে দুটো করে একসঙ্গে মুখে ভরছে। হঠাৎ বা তান ধরে ওঠে কেউ একজন।

সীমান্তের স্টেশন পার হল তো মুহূর্তে পট-পরিবর্তন। যাদের হৈ-হল্লায় কান পাতা যাচ্ছিল না, মায়ামন্ত্রে তারা একেবারে নিস্তব্ধ। আর যারা মরে ছিল এতক্ষণ, সমকণ্ঠে তারা হরিধ্বনি দিয়ে উঠল : বল হরি, হরিবোল। কে হিন্দু কে মুসলমান এখন আর নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাবের বদল দেখে বলে দেওয়া যায়।

নতুন দল নিয়ে রওনা হবার মুখে প্রতিবারই আশিস বাপকে বলে, চল বাবা এইসঙ্গে।

অশ্বিনী ভ্রূকুটি করেন : নতুন কী হল আবার?

আশিসের হাতে পাকানো খবরের-কাগজ। কলকাতা থেকে ফিরবার সময় সে রকমারি কাগজ কিনে নিয়ে আসে। ইদানীং খবরের-কাগজ দেখলে অশ্বিনী ক্ষেপে ওঠেন : মত ঝঞ্ঝাট বাড়ায় এই কাগজে, মানুষের মন তেতো করে দেয়। দু-পক্ষের গবর্নমেন্ট কাগজগুলো কেন যে বন্ধ করে দেয় না।

আশিস বলে, চোখ বুজে থাকলেই বাঁচা যায় বাবা?

চোখ মেলে থাকলেই বুঝি বেঁচে যাবে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান দুটো পথের

কোন্‌টা যম চেনে না, যমের চোখ কোথায় পড়বে না, বল্‌ দিকি আমার বাপ্‌ ।

সদাশিবকেও আশিস জিজ্ঞাসা করে, আপনার কী ইচ্ছে মাস্টার মশায় ? যাবেন ?

ইচ্ছে হলেই তো যাওয়া যাবে না, পথ আটকাবে আমার ।

আশিস গর্জন করে ওঠে : আনসার-বাহিনী ? যাবার ইচ্ছে থাকে তো বলুন ! কত জোর তাদের, দেখে নেবো ।

সদাশিব হেসে বলেন, সে বাহিনী আনসারের চেয়ে অনেক বড় বাবা । সেকালের একালের আমার যত ছাত্র । কিছুতে তারা আমায় ছেড়ে দেবে না ।

ইদানীং সদাশিব কিন্তু মাস্টারই নন মোটে । ইস্কুলটা সম্পূর্ণ তাঁর হাতে-গড়া বলে চক্ষুলজ্জায় তাঁকে একেবারে তাড়িয়ে দেয় নি, কেরানি করে রেখেছে । সেই গোড়ার আমলের এক ছাত্র আফজল খবরটা শুনে একদিন এসে পড়েছিল : মাস্টারমশায়, সত্যি এ সমস্ত ? আপনাকে নাকি ক্লাসে পড়াতে দেয় না, মাইনে আদায় করতে হয় ?

সদাশিব বলেন, একটা পাশও করি নি, পড়ানোর কি জানি আমি ? হোকগে, হোকগে—আছি তো ছাত্রদের মধ্যে, সারাদিন দিব্যি কেটে যায় ।

আফজলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আরে ছোঁড়া ! এমন ক্ষেপে যাচ্ছিস কেন রে তুই ? কী হয়েছে ?

আফজলের দাড়িতে পাক ধরে এল । সদাশিবের কাছে কিন্তু সে ছোঁড়া বই আর কিছু নয় । চোখ দুটো চকচক করে ওঠে আফজলের । অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, এত খাটুনি খেটে ইস্কুল বানালেন, শেষ পাওনা এই মাস্টারমশায় ? নামতে নামতে কোথায় এনে ফেলল আপনাকে !

সদাশিব প্রবোধ দিচ্ছেন : দায়িত্ব খসে যাচ্ছে, ভালই তো রে । দেশের যা হাল, কবে আছি কবে নেই । যা স্বপ্নেও ভাবি নি—পালাতে হয় কোন্‌ দিন বা সোনাটিকারি ছেড়ে !

আফজল বলে, হুঃ, ছাড়বেন ! যেতে দিচ্ছে কে ? পায়ে ধরে আছাড় খেয়ে পড়ব না ! একা আমি নই—যত ছাত্র আছে সেই গোড়ার আমল থেকে ।

সদাশিব বলেন, না রে, খবরের-কাগজে নানান গোলমালের কথা লিখছে । ভয়ের কথা ।

কিন্তু সদাশিবের ছাত্র আফজল বিন্দুমাত্র ভয় পায় না । বলে, কাগজের ঐ ব্যাপার সত্যি সত্যি যদি আমাদের তল্লাটে ঘটে, খোদার কসম, জান থাকতে কোন দুশমন আমাদের মাস্টারমশায়ের গায়ে হাত দিতে পারবে না ।

সদাশিব অভিভূত হয়ে রইলেন ক্ষণকাল । তারপর বকে উঠলেন : এই যে বললি ছোঁড়া, কোন-কিছু আমি পাই নি । তোদের সব এমন করে পেয়েছি—এর চেয়ে বড় পাওনা কবে কার হয়েছে রে ?

যা মুখে বলছে, আফজলেরা করবে তাই সুনিশ্চিত । যেতে দেবে না সদাশিবকে, পথের উপর আছড়ে পড়বে দল বেঁধে ।

হয়েছে ভাল । পালানোর হিড়িক যত প্রবল হচ্ছে, মেজরাজা আর সদাশিব দরজা ভেজিয়ে ততই আরও দাবায় মেতে উঠছেন । বিশাল সোনাটিকারি গ্রাম ওদিকে শ্মশানঘাটার মতো জনহীন হয়ে উঠল, দুই প্রাচীন সুহৃদের সেদিকে দৃক্‌পাত নেই ।

নৌকোর এক মোক্ষম কিস্তি দিয়ে অশ্বিনী হাঁক দেন, বাঁশি !

সদাশিবও ডাকেন, মা কাঞ্চনবরণী—

বাঁশির পাড়ায় ঘোরাধুরির বন্ধ। লোকজন নেই, যাবে কার কাছে? সর্বক্ষণ ঘরে থাকে। ডাক শুনে সে কাছে এসে দাঁড়াল।

তোর জ্যেঠাকে পান দে, আর কলকেটা পালটে দিয়ে যা আমার।

বাঁশি যেন পাখি হয়ে উড়ে বেরুল ঘর থেকে। ক্ষণপরেই ফিরে আসে। ডানহাতে ডিবের মধ্যে পানের খিলি। বাঁ-হাতে কলকের মাথায় কাঠকয়লার আগুন—ফুঁ দিতে দিতে আসছে। আগুনের আঁচে দেবীপ্রতিমার মতো মুখে রক্ত-আভা ফুটেছে। ডিবা রাখল তক্তপোশের উপর, সদাশিব ডিবা থালে দুটো খিলি মুখে দিলেন। হুঁকোর উপর কলকে বসিয়ে বাঁশি বাপের হাতে এগিয়ে দেয়।

মেয়ের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে অশ্বিনী বললেন, রাজবাড়িতেও ভয় ঢুকে গেল, আশিস নিয়ে বের করতে চায়। বলে দিয়েছি, যাও যদি ইচ্ছে হয়। যাকগে ওরা চলে—দিদি চলে যান, আশিস চলে যাক। শিব-দাদা আর আমি—তার উপরে আমাদের মা-জননী গার্জেন হয়ে এমনি যদি আশেপাশে ঘুরঘুর করে, কাউকে আর দরকার নেই। কী বলো শিব-দাদা?

সদাশিব মাথা নেড়ে সায় দেন: বটেই তো, কী দরকার!

বলতে গিয়ে চমক খেলেন সদাশিব। কোথায় ছিলেন বিরজা, করকর করে এসে পড়েন। সদাশিবের দিকেই চেয়ে তাঁকেই সাক্ষি মেনে বলেন, শোন কথা! মা-জননীকে ফেলে আমরা চলে যাব, সে তোমাদের পান-তামাক সেজে খাওয়াবে। কিছু না হোক ওই মা-জননীর অন্যেই তো পাগল হয়ে ছুটে বেরুনো উচিত। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ভাবনায় আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার কথা, তা নয় নির্বিকার বাপ বসে দাবা খেলেন আর তামাক খান।

সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ঠিক!

অশ্বিনী মুখ তুলে ম্লান হেসে বললেন, দাবা খেলে আমি ভাবনা ভুলতে চাই দিদি। ভেবে হদিস পাই নে। মেয়ে নিয়ে ঘরে থাকা মুশকিল—কিন্তু পথে বেরুনো আরও যে মুশকিল, সেটা ভেবে দেখেছ? বাঁশি আমার যদি কালো-কুচ্ছিৎ কিম্ভূতাকার মেয়ে হত!

সদাশিব পুনশ্চ সমর্থন করেন: সত্যি কথা!

একটু চুপ করে সদাশিব আবার বলেন, কিন্তু উপায় তো কিছু চাই। আমি বলি, কাঞ্চনবরণীকে পরঘরি করে দাও তাড়াতাড়ি। পথে বেরুল না, ঘরেও রইল না। যাদের বউ, তারা তখন বুঝবে। বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগো।

চেষ্টা কি কম করছি। কিন্তু—। আঙুলে কাল্পনিক টাকা বাজিয়ে অশ্বিনী বলেন, তার জন্যে চাই রুজি। রাজকোষে নিতান্তই ফুলোডুমুর। মেয়ের রূপ আছে সে ভালই, তা বলে পাওনাগণ্ডা ছাড়বে এ বাজারে এমন হাঁদারাম কেউ নেই। খাজাঞ্চি হরিবিলাস তো শুকিয়ে আছে। বলে, পৌষমাস অবধি ঠায় বসে থাকুন এখন। প্রজাপাটকের উপর যত হাঁকডাক করুণ, পৌষের কিস্তির আগে কেউ আধেলা পয়সা ঠেকাবে না। বসে বসে তা হলে কী করব বলো দাবাখেলা আর তামাক খাওরা ছাড়া?

॥ পাঁচ ॥

ক'দিন পরের কথা। পাইক চূড়ামণি সর্দার হন্তদন্ত হয়ে চলেছে। মেজরাজা তাকে ডেকে মধুস্বরে বললেন, শোওয়া নেই বসা নেই, সর্বসময়ে তো টহল দিচ্ছ। আদায়পত্তরের গতিকটা কী, তোমার কাছেই শুনি।

মনিবের তোয়াজে গলে গিয়ে চূড়ামণি বলে, হুজুরের হুকুম হয়েছে—সকাল বিকাল একগাদা করে প্রজা এনে কাছারি-দালানে হাজির করে দিই।

সে তো জানি। কিন্তু এসে কী বলে তারা? টাকাকড়ি দেয় কই?

সগর্বে চূড়ামণি বলে, না দিলে ছাড়ব কেন? একবারের জায়গায় দশবার যাব সেই লোকের বাড়ি। কোথাও পালিয়ে থাকে তো চেপে বসে থাকব, দরকার হলে উঠানের উপর উনুন খুঁড়ে রান্না-খাওয়া করব সেখানে।

তুমি এত খাটনি খাটছ, কিন্তু হরিবিলাসকে জিজ্ঞাসা করলে তো মাথা চুলকায়। বলে, আসেই মানুষ—এসে তামাক-টামাক খেয়ে চলে যায়। টাকাকড়ির বেলা লবডঙ্কা।

চূড়ামনি চুপ করে থাকে।

আশিস এসে পড়েছে কখন। হেসে উঠে সে বলে, বাক্যি হরে গেল যে সর্দার? পথে পথে ঘুরি, কিন্তু ঘরের খবরও কিছু কানে আসে। বলে ফেল পেটের মধ্যে যে সব কথা আঁকুপাকু করছে।

আজ্ঞে, খাজনাকড়ি আদায় বড়দের ব্যাপার। খাজাঞ্চিমশায় জানেন। সামান্য পাইক মানুষ আমি এর মধ্যে কী বলব?

হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে আশিস বলে, ভাগে বনিবনাও হচ্ছে না—জানি গো, জানি সে খবর।

অশ্বিনী ছেলেকে তাড়া দিয়ে উঠলেন: আচ্ছা, তুমি কী জন্য বাগড়া দাও কথার মধ্যে এসে, বৈষয়িক ব্যাপারের তুমি কী বোঝ? পরের হিত নিয়ে আছ, সেই কাজে চলে যাও।

চূড়ামণি আহত কণ্ঠে অশ্বিনীর দিকে চেয়ে বলে, তাই বলুন হুজুর। আমি পাইকগিরি করি, ছুটোছুটি গালমন্দ করে প্রজা হাজির করে দেওয়া কাজ, আমাব সঙ্গে কে ভাগাভাগি করতে যাচ্ছে? কেনই বা যাবে।

আশিস তবু নিরস্ত হয় না। বলে, ভাগ যদি না থাকবে, তোমার দশ টাকা মাইনে আর খাজাঞ্চি-কাকার পঁচিশ—এই মাইনের উপরে এমন তেলটি-ফুলটি হয়ে থাক কেমন করি শুনি? রাজবাড়ির মানুষ বলে চোখ মেলেও আমাদের অন্ধ হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু দেখতে পাই সব।

হাসতে হাসতে আবার বলে, চাইও আমরা ঠিক এই। বরাবর চেয়ে এসেছি। এই মাইনেয় কারো চলতে পারে না, সেটা কে না বোঝে? ঠারেঠোরে তাই বলা আছে—আমাদের মেরো না ভাইসকল, হাবাগবা প্রজাগুলোর উপর দিয়ে যদ্দুর পার, উশুল করে নাও।

আরও হয়তো বলত। অশ্বিনী কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়তে গেল। ছেলেকে থামিয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করেন, পুরানো লোক তুমি, বলতে গেলে ল্যাংটা বয়স থেকে আমাদের নুন খাচ্ছ। বলে ফেল দিকি ভিতরের গুহ্যকথা? জানা আছে মোটামুটি সমস্ত, তবু তোমার মুখে শোনা যাক।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে তখন চূড়ামণি নিচুগলায় বলে, টাকা দেয় বই কি প্রজারা। কাছারিতে রমারম টাকা পড়ে, হুজুরের কেবল জমা পড়ে না।

আশিস বলে, কী হয় সে টাকা? একটু থেমে অধীরকণ্ঠে বলে, কাছারির সিন্দুকে পড়ে থাকে, না অন্য কোথাও চলে যায়?

চূড়ামণি সর্দার নিরীহ মুখে বলে, শুনুন কথা। এক জায়গায় পড়ে থাকবার

জিনিস নাকি টাকা? টাকার যে পাখনা গজায়, টাকা ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়।

বলতে বলতে খেয়াল হয়, কথার টানে অনেকখানি বলে ফেলেছে। সামলে নিয়ে চূড়ামণি বলে, তাগাদায় বেরিয়েছি। বেলা হয়ে যাচ্ছে। আজ্ঞে করুন হুজুর, বেরিয়ে পড়ি।

আশিষ বাধা দিয়ে বলে, কথাটা শেষ করে যাও—

ছোট মুখে বিস্তর বড় কথা হয়ে গেছে। প্রজা হাজির করে দিয়ে আমার দায় খালাস। খাজনাকড়ি কী দিল, কোথায় গেল সে টাকা, আমি তা কেমন করে জানব? মেজরাজা মশায় সমস্ত জেনেশুনে বসে আছেন, আমায় শুধু নিমিত্তির ভাগী করা।

হনহন করে চূড়ামণি অদৃশ্য হল। আশিষ বোমার মতন ফেটে পড়েঃ সবই তো তো বলে গেল, বলতে আর বাকি রইল কোন্‌টা? আমাদের এই অস্তিরপঞ্চক অবস্থা, টাকার জন্যে বাঁশির বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। খাজাঞ্চি-কাকা তবিল মেরে বসে আছেন ওদিকে। এক্ষুণি হিসাবনিকাশ চাও বাবা। দশজনের মুকাবেলা।

কিন্তু অশ্বিনী বিচলিত নন। মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বলেন, হবে, তাড়াহুড়োর কাজ নয়।

চূড়ামণির কথা তুমি বিশ্বাস করলে না। কিন্তু পুরানো লোক বলে তোমার বোধহয় মায়া হচ্ছে।

অশ্বিনী বলেন, হরিবিলাস অনেক দিনের কর্মচারী, সেটা কিছু মিথ্যে নয়। অকাট্য প্রমাণ যতক্ষণ না পওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ সে সাধুচরিত্র। একদিন ছিল, দু-হাজার পাঁচ হাজারের তবিল হামেশাই তার কাছে মজুত থাকত। তখন কিছু করল না, এখানকার এই ছিটেফোঁটায় লোভ করতে যায় কেন?

আশিষ বলে, চূড়ামণি সর্দার মিথ্যে বানিয়ে বলবে, এতখানি সাহস হবে তার?

অশ্বিনী বার দুই এদিক-ওদিক ঘাড় নেড়ে বলেন, কক্ষনো না তবিল মেরেছে হরিবিলাস ঠিকই। কিন্তু এই বয়সে কি জন্য কুকর্ম করতে গেল সেইটে ভাবছি।

আশিষ অধীর হয়ে বলে, আমরা ভাবনাচিন্তা করতে থাকি, টের পেয়ে উনি ওদিকে সামাল হয়ে যাবেন। চোর কি সাধু খাতাপত্র দেখলেই তো প্রমাণ হয়ে যায়।

এবারে স্পষ্ট বিরক্তির সুর মেজরাজার কণ্ঠে। বললেন, এক্ষুণি কিছু নয়। বয়স হয়েছে, হুট করে কিছু করতে পারিনে তোমাদের বুদ্ধি নিয়ে। তুমি দশের হিত নিয়ে আছ, সংসারের দায়ভার আমার উপরে। যেমন বুঝি ভেবেচিন্তে সেই রকম আমায় করতে দাও বাপু।

রাত দুপুরে মেজরাজা আশিসের ঘরে এসে তাকে ডেকে তুললেন।

কী বাবা?

চলে এসো। কাছারি-দালানে যাচ্ছি।

আশিস অবাক হয়ে বলে, নিশিরাত্রে—এখন?

দশের মুকাবেলা কিছু করতে চাইনি। রাতের অপেক্ষায় চুপচাপ ছিলাম। কেউ কিছু জানবে না তুমি আর আমি ছাড়া।

আশিস বলে, দালানের চাবি তো খাজাঞ্চি-কাকার কাছে। ঢুকবে কী করে?

এসোই না—

হাসতে হাসতে অশ্বিনী বললেন, দেখ এসে ঢুকতে পার কিনা। সেই যে বললাম, দায়ভার আমার উপরে—আমিই ঢুকিয়ে দেব।

সামনের সদর-উঠানে গেলেন না। একটা ছোট্ট দরজা পিছনে খিড়কির দিকে।

সে দরজা বন্ধই থাকে সর্বদা ভারি ভারি তিনটে তালা ঝোলানো। অশ্বিনী কলঙ্ক-ধরা একতাড়া চাবি বের করলেন, চাবি আমার কাছে রয়েছে। এদিককার তালা খোলা যায়, লোকে ভাবতে ভুলে গেছে।

আশিস বলে, খুললেই বা কী হল? ভিতরের দিকে খিল-হুড়কো আঁটা।

ধাক্কা দাও দেখি এবারে। আস্তে মোলায়েম করে, আওয়াজ না হয়।

ফিসফিসিয়ে অশ্বিনী আবার বলেন, কী না কী করছি—এমনি ভাবে বিকেলবেলা কাছারির এই দিকটা এসে খিল-হুড়কো খুলে রেখে গেছি। চোরে যেমন ধারা করে। নিজের ঘরে চৌর্যবৃত্তি। হরিবিলাস ঠাহর করে নি, সে এত সমস্ত ভাবতে পারে না।

বাপ-ছেলে কাছারি-দালানে ঢুকে ভিতর থেকে এবার খিল দিয়ে দিলেন। মোমবাতি নিয়ে এসেছেন মেজরাজা। আশিসকে বলেন, জানলাগুলো ভাল করে এঁটে দাও চারিদিক ঘুরে। বাতি জ্বালব। আলো বাইরে না বেরোয়, কারও নজরে না আসে। ঐ যে বললাম, চোর হয়ে ঢুকেছি আজকে আমরা।

বাতি জ্বেলে অশ্বিনী কাছারির আয়রন-সেফ খুলে ফেললেন। আশিসের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। বলে, খাজাঞ্চির সিন্দুকের চাবি তোমার কাছেও?

মেজরাজা হেসে বললেন, দিব্যি করে বললেও কিন্তু হরিবিলাস বিশ্বাস করবে না। একসেট ডুপ্লিকেট চাবি দেয়, তা-ও তার কাছে। বছর কুড়ি আগে এই সিন্দুক কেনা। কেনবার সময় মনে হল, খাজাঞ্চির অজান্তে যদি কখনো সিন্দুক খোলার দরকার হয়, তার একটা ব্যবস্থা থাকা ভাল। বেশি পয়সা দিয়ে তখনই দুটোর জায়গায় তিনটে চাবি বানিয়ে একটা নিজের কাছে রাখলাম। বিশ বছর বাদে আজ সেই চাবি কাজে লাগল। নজর কতদূর অবধি মেলে রেখে বৈষয়িক কাজকর্ম করতে হয়, বুঝে দেখ তা হলে। হঠাৎ কিছু করবার বস্তু নয়।

টাকার থলি, রেজগির থলি, নোটের থাক বেরুল সিন্দুকের নানান খোপ থেকে। ভাল করে দেখে নিয়ে মেজরাজা বললেন, আর নেই। তুমি গুণে ফেল। আমি হিসেবটা দেখে নিই তাড়াতাড়ি।

কড়চা সেহা আর জমাখরচ তিনটে জিনিসেই মোটামুটি তহবিলের হিসাব পাওয়া যায়। টাকা সামান্যই, গুণতে আশিসের সময় লাগে না। কিন্তু খাতার প্রতিটি যোগ অশ্বিনীকে পরখ করে দেখতে হচ্ছে, ভুল বেরুচ্ছে ক্রমাগত।

উঁকি মেরে দেখে আশিস বলে, আগাগোড়াই কম। খাজাঞ্চিকাকা যোগফল ইচ্ছে করে কম করে রেখেছেন। ভুল সত্যিকার হলে দু-এক জায়গার বেশিও তো হবে।

অশ্বিনী জবাব দিলেন না।

আশিস আবার বলে, তবিলের সঙ্গে গরমিলটা হঠাৎ দেখে কেউ ধরতে না পারে, সেজন্য জাল হিসাব। পুরানো কর্মচারীর কথায় তুমি তো পঞ্চমুখ—বোঝ এইবারে।

অশ্বিনী সংক্ষেপে বললেন, একজনে সমস্ত দেখতে গেলে রাত কাবার হবে। তুমি ধর দিকি ঐ খাতাটা।

দু-জনে মিলেও ঘণ্টা তিনেক লেগে গেল। খুব একটা-কিছু নয়, শ' দেড়েক টাকার এদিক-ওদিক। এত কষ্টস্বীকারের পর হতাশ হতে হল। টাকার থলি তুলে রাখতে গিয়ে ঐ সিন্দুকেরই কোণা থেকে পাতলা এক হাতচিঠে বেরিয়ে পড়ে। বস্তুটা আগে ঠাহর হয়নি।

দেখি, দেখি, এই হল আসল। আরে সর্বনাশ।

হাতচিঠের মধ্যে কতকগুলো প্রজার নাম, নামের পাশে পাশে টাকার অঙ্ক। টাকা

দিয়ে গেছে, কিন্তু এস্টেটের খাতায় জমা পড়েনি। গোপনে হাতচিঠেয় টুকে রেখেছেন সাচ্ছল্যের দিনে দাখিলা কেটে খাতায় হিসাব তুলতে পারবেন সেইজন্য। এর নাম উশুল-ছাট—সেরেস্তায় কর্মচারীর পক্ষে সব চেয়ে বড় অপরাধ।

আশিস টিপ্পনি কাটে : তোমার যে পুরানো বিশ্বাসী লোক—

মেজরাজার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায় : তাই তো ভাবছি রে! ছাব্বিশ বছরের কাজে ছাব্বিশটা পয়সার তঞ্চক হয়নি, সেই মানুষ এমন হয়ে যায়!

আশিস বলে, পায়ের তলায় মাটি টলছে। এমনই সব হবে এখন। এদ্দিন যে হিসাবে জীবন কেটেছে, সমস্ত গরমিল এবারে। চাকরি তো চাকরি, মানুষটাই কখন আছে কখন নেই—বুদ্ধিমান এ অবস্থায় সততা আঁকড়ে ধরে মরতে যাবে কেন? কিন্তু ছাড়া হবে না, নিমকহারামের উপর দয়াধর্ম নেই। সকাল হলে থানায় এজাহার দেব। আর ঐ পথে অমনি সদরে গিয়ে ফৌজদারি রুজু করে আসব। আমিই সব করব বাবা।

চুপ! তাড়া দিয়ে উঠলেন মেজরাজা। একেবারে কিছু নয়! হরিবিলাস বুঝতে না পারে যে আমরা ভিতরে এসেছিলাম। সন্দেহ একটুও না আসে।

পুরানো কর্মচারী মশায় লজ্জা পাবেন, সেই জন্যে বুঝি?

অশ্বিনী বললেন, জেল হলে হরিবিলাসের খুবই ক্ষতি, কিন্তু আমাদেরও ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। দিনকাল খারাপ ক্ষতি আমাদেরটা যদি বাঁচানো যায়। আমি সেইটে ভাবছি।

পরদিন সকালবেলা যথারীতি কাছারি বসেছে। দালানের একপাশে তক্তাপোশের উপর মনিবের জন্য আলাদা একটু গদি। কাজকর্ম যৎসামান্য বলে গদি প্রায় শূন্যই থাকে। বিকালের দিকে কোনদিন মেজরাজা এসে হয়তো একটু বসলেন।

আজকে সকালবেলাই চলে এসেছেন। মাতব্বর প্রজা নিধিরাম রাহুতকে দেখে ডাকলেন : শোন নিধিরাম, আমার কাছে ইদিকে এসে বস।

খাতির করে বেঞ্চিতে বসিয়ে নিচুগলায় অন্তরঙ্গ ভাবে বলেন, একটা খবর কানে এল নিধিরাম। বিলে ধান-জমি কিছু কিছু তুমি নাকি ছেড়ে দিচ্ছ?

নিধিরাম ঢোক গিলে বলল, কে বলল?

মেজরাজা বলেন, বলবার কী আছে! এই তো নিয়ম হয়ে উঠেছে। তুমি বলে কেন, সকলে এই করছে। আজ বিলের জমি বেচবে, দু-দিন পরে ডাঙা-জমি বেচবে। তারপরে হল তো ভিটেমাটি বেচে দিয়ে একেবারে ফৌত।

নিধিরাম বলে, না কর্তাবাবু, আমি সে লোক নই। ভিটে-ছেড়ে যাব কোন্ চুলোয়? আমরা থাকব।

মেজরাজা একগাল হেসে বলেন, এ-ও নিয়ম। স্টিমারে ওঠার আগে পর্যন্ত বলতে হয়, যার খুশি যাক চলে, আমি এক পা নড়ছিনে ভিটেবাড়ি ছেড়ে। সে যাকগে। শুনেছি আমি বিশেষ সূত্রে। জমির যে দর ওঠে, আমায় জানিও। আমার অজান্তে যেন বিক্রি হয়ে না যায়।

এবার সহজ হয়ে নিধিরাম বলে, জমি নেবেন নাকি রাজাবাবু?

তোমার ঐ জমি যদি বিক্রি কর, নিশ্চয় নেব। অন্য কেউ বেচলে সে খবরও যেন পাই।

জমির দরদস্তুর নিয়ে কথাবার্তা চলে কিছুক্ষণ। যত নিচু গলায় হোক, সেরেস্তার কর্মচারীর কান এড়ায় না। নিধিরাম চলে গেলে হরিবিলাস কাছে এসে বলেন, কি

আশ্চর্য! এখন নতুন জমিজমা করবেন?

এই তো সময়। জমি জলের দরে যাচ্ছে। দু-শ' টাকা বিঘে হিসাবে যা বিকতো, কুড়ি টাকা পেলে মালিক এখন সোনা হেন মুখ করে তাই দিয়ে যাবে।

কিন্তু একলা খোকাবাবুই তো অঞ্চল ফাঁকা করে ফেলল।

কাঁচা বয়স— তাজা রক্তের জোরে ছটফট করে বেড়ায়। বুড়োমানুষ আমরা অমন পেরে উঠিনে, জায়গায় অনড় হয়ে থাকা আমার পছন্দ। এই যেমন আমি, শিব-দাদা— আর তুমিও।

একটু থেমে অশ্বিনী বলেন, চলে যাচ্ছে মানুষ—ভালই তো। জমিজমা কিছু বোঁচকা বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না। পুরো গাঁয়ের মালিক হয়ে বসব আমরা তিন জনে। যার বাড়ি যত আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি, সমস্ত আমাদের। যে পুকুরে যখন খুশি জাল নামিয়ে রুই-কাতলা তুলে তুলে খাব।

খুব হাসছেন: কষে আদায়পত্তর লাগাও হরি। মহাল কবুতর-চোখা করে ফেল। সমস্ত টাকা নতুন সম্পত্তিতে লগ্নি করব। আমাদের পরগনার বেশির ভাগ তো বেহাত হয়েছে। খানিক খানিক উদ্ধার করে ফেলব এই মত্তকায়।

হঠাৎ বলে উঠলেন, সালতামামি নিকাশের ভরসায় থাকলে হবে না হরি, আজ থেকেই খাতাপত্র নেড়েচেড়ে বুঝসমঝ কর। টাকার বড় টান। কোন্ কোন্ প্রজার বকেয়াবাকি, লিস্টি করে ফেলি দুজনে। কাছারিতে নিয়ে এসে তারপরে চাপাচাপি করা যাবে।

লক্ষ্য করেছেন, ফ্যাকাশে হয়ে গেল হরিবিলাসের মুখ। মিনমিন করে হরিবিলাস বলেন, এখন টাকা কে দেবে, পাবেই বা কোথায়?

মেজরাজা কড়া হয়ে রায় দিলেন: পৌষমাসে কবে নতুন ধান উঠবে, ততদিন সবুর করলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে আমি পারব না। যাদের বকেয়া বাকি, চূড়ামণি ঘাড় ধরে এনে এনে হাজির করুক। তারপরে আমি দেখব। আমি জানি, আদায় কেমন করে করতে হয়। এখন থাক, বেলা হয়ে গেছে। ওবেলা থেকেই —কেমন?

হরিবিলাস ঘাড় নেড়ে দিলেন, না নেড়ে উপায় নেই। মুখে কিছু বলেন না। চলে যাচ্ছিলেন মেজরাজা। ঘুড়ে দাঁড়ালেন হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে। বললেন, ওবেলাও তো হয় না। সদরে পুণ্ডরীক উকিলের কাছে তুমি রওনা হয়ে যাও ওবেলা। চক্কোত্তিদের গড়ভাঙা-গাঁতি নিলাম হবে, দেরিও বেশি নেই তার—মুহুরির কাছ থেকে সঠিক তারিখটা জেনে তদ্বিরের ব্যবস্থা করে এস। গোটা তিনেক ডিগ্রির তামাদি এবারে, সময় মতো যাতে জারি হয়, সেটাও মনে করিয়ে দিও। তাড়াতাড়ি ফিরে এস। ফিরলে তখন এদিককার কাজ।

অতএব সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে হরিবিলাস সদরে রওনা হয়ে গেলেন। আশিসের কানে গিয়েছে—চূড়ামণির আপাতত কোন কারণে হরিবিলাসের উপর রাগ সে-ই সব বলেছে। বিরজার কাছে গিয়ে আশিস বলে, বাবার কী রকম কাজ, বুঝতে পারিনে। চোরটাকে ভাল মতো শিক্ষা দেব—তা নয়, নাগালের বাইরে সদরে পাঠিয়ে দিলেন।

অশ্বিনী শুনতে পেয়ে দিদির সামনেই ডাকলেন ছেলেকে: এই বলেছ তুমি?

আশিস বলে, খাজাঞ্জি-কাকা খুব সম্ভব সদর থেকে কলকাতায় চলে যাবেন।

অশ্বিনী সায় দিয়ে বলেন, আমিও তাই মনে করি। বছরের মাঝখানে আচমকা হিসাব-নিকাশ চেয়েছি, প্রজা-ডাকাডাকি হবে সে-কথাও বলে দিয়েছি—এত বড় বিপদ নিশ্চয় ছেলেকে বলতে যাবে। আমিও চাচ্ছি তাই। ঠিক এই জন্যই অজুহাত করে হরিবিলাসকে সদরে পাঠালাম।

॥ ছয় ॥

পাকা লোক অশ্বিনী, লোকচরিত্র দেখে দেখে ঘুণ হয়েছেন। আন্দাজ খাঁটি। সদর থেকে হরিবিলাস কলকাতার টিকিট কাটলেন।

ঠিক কলকাতা নয়, কলকাতার বাইরে শহরতলি জায়গা। দমদম স্টেশন ছেড়ে অনেকটা দূরে যেতে হয়। গোলমেলে রাস্তা সব এদিকে—চিঠির ঠিকানায় যে রাস্তা লেখে, লোকে তা চিনতে পারে না। তাদের মুখে পৃথক নাম—রথতলা, চৌধুরিপুকুর, বাবুর বাগান—এমনি সব। শেষটা রাস্তার যদিই বা হদিস হল, নম্বর মেলে না। নম্বরের চাকতি কোন বাড়ি কেউ লাগায় না। জয়ন্তী-প্রেসের নাম করতে একজনে একটু ভেবে নিয়ে জায়গাটার বর্ণনা দিয়ে দিল।

বর্ণনা অনুযায়ী এগোতে এগোতে বিশাল বাগানবাড়ির সামনে এসে পড়লেন। ফটকখানাই বা কী—একবেলা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখবার বস্তু। ফটকের মাথার ওপর পশুরাজ সিংহ থাবার নিচে ফুটবলের সাইজের গোলাকার এক বস্তু চেপে ধরেছে। এমন বাড়িতে বিনয় থাকে? থাকে, তাতে সন্দেহ নেই—অতিকায় ফটকের গায়ে লেখা রয়েছে—জয়ন্তী-প্রেস।

রাস্তার উল্টো পারে অনেকখানি জঙ্গুলে জমি ঘিরে মস্তবড় সাইনবোর্ডে লিখে দিয়েছে—ডেভিড বিস্কুট-ফ্যাক্টরী। ইট ও লোহালকড় গাদা করে রেখেছে একদিকে। মাটি খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে, লোকজন খাটছে। জয়ন্তী-প্রেসে বিনয়ের ঠিকানা। তবু অতবড় ফটকের ভিতরে ঢুকতে পাড়াগাঁয়ের মানুষ হরিবিলাসের সাহস হচ্ছে না। ইতস্তত করছেন।

ঠাহর হল, ফটকের লাগোয়া ছোট্ট একটু চাতালের উপর গরম চা ও পান-বিড়ির দোকান। চা ভরতি পিতলের কলসি, গলার দিকে নল লাগানো। তোলা-উনুনে কলসি বসিয়ে গরম রেখেছে। ওদিককার জমি থেকে মজুর শ্রেণীর আসছে একজন দুজন, দোকানের মালিক মাটির ভাঁড়ে চা ঢেলে দিচ্ছে। চা খেয়ে একটা বিঁড়ি ধরিয়ে কাজে চলে যাচ্ছে আবার তারা।

হরিবিলাস এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, বিনয় বলে কেউ থাকে ভিতরে?

হুঁ, থাকেন। ঢুকে পড়ে সোজা চলে যান। ঝিলের পুল পার হয়ে পুকুরঘাটের পাশে পাকাবাড়ি। সেইখানে পাবেন।

হরিবিলাসের মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে জ্ঞানদার কথা ভেবে।

এমন ঘরবাড়িতে থাকে বিনয়— যদি সে একবার চোখে দেখে যেতে পারত। মাকে কলকাতায় নিয়ে আসবার কথা বিনয় বারম্বার লিখেছে, রোগের অবস্থা বিবেচনায় আনা হয়নি। কিন্তু বড়-ডাক্তার দেখিয়ে পরিণাম সম্পর্কে যখন নিঃসংশয় হওয়া গেল, সেই সময়টা এনে ফেললে হত। আনা উচিত ছিল—চিরদুঃখিনী চোখ মেলে ছেলের সুখ দেখে যেতেন। একটা সান্ত্বনা, জ্ঞানদা আজ যে লোকে আছেন সেখানে নাকি পলকে সর্বত্র ভেসে বেড়ানো চলে। বায়ুভূত হয়ে মা হয়তো ছেলের সমৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছেন।

ঢুকে পড়লেন হরিবিলাস। যত এগোচ্ছেন, তত তাজ্জব। ইন্দ্রপুরী বানিয়েছিল

রে! অযত্নে অবহেলায় জাঁকজমক মলিন হয়ে গেলেও অতীত গরিমা বোঝা যায়। গাণ্ড হেজেমজে গিয়েও থাল হয়ে থেকে যায় যেমন। অসংখ্য গাছগাছালি—আম লিচু নারকেল ইত্যাদি, এবং বিদেশের বহু নাম-না-জানা গাছ। ফুল কত রকমের—জঙ্গল হয়ে গিয়েও কিছু কিছু ফুটে রয়েছে। খানিক এগিয়ে আঁকাবাঁকা ঝিল, উপরে কাঠের পুল। এবং আরও দূরে বড়-পুকুরের পাড়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে পাকাবাড়ি। সোনাটিকারির রাজবাড়ি অতিশয় প্রকান্ড, কিন্তু হালফ্যাশানের নয়। পাড়াগাঁয়ে যত ঐশ্বর্যই থাক, হালকা কাজের উপর ছবির মতন এমন বাড়ি কেউ ভাবতে পারে না। রাজামশায়রা থাকতে পান না, কিন্তু রাজবাড়ির খাজাঞ্চির গুণবান ছেলে থাকে এমন জায়গায়।

খবর পেয়ে বিনয় বেরিয়ে আসে। কাজ করতে করতে ছুটে এসেছে। সর্বাঙ্গে কালিঝুলি-মাখা, গায়ে গেঞ্জি, পরনে নীল হাফপ্যান্ট। কী পোষাক, কী চেহারা! অদূরের কলে হাত ধুয়ে এসে বিনয় বাপের পায়ের ধুলো নেয়।

স্তম্ভিত হরিবিলাস বলেন, চাকরি করিস তুই যে বলেছিলি?

হাসিমুখে বিনয় বলে চাকরি তো এই। মেসিন চালাচ্ছিলাম বাবা। ছাপাখানার মেশিন।

ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে—

বাপের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বিনয় বলে, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে একটা পাশও যে দিইনি। কম্পোজিটার হয়ে ঢুকেছিলাম। এখনো তাই—চিমটি ধরে টাইপের পাশে টাইপ সাজিয়ে যাওয়া। ভাগ্যিস ঢুকেছিলাম, নয় তো পথে পথে ভিক্ষে করা কিম্বা না খেয়ে মরা ছাড়া উপায় ছিল না। মেশিনম্যানের বড্ড দেমাক, একদিন আসে তো দুদিন আসে না। শহরের বাইরে ধাপধাড়া জায়গা বলে প্রেসে আমাদের কাজকর্ম কম, বেশি মাইনের লোক রেখে পোষায় না তাই ভাবলাম, মেশিন চালানোই বা কী এমন শক্ত কাজ। শিখে নিয়েছি, অবরেসবরে আমিও চালাই।

একটুখানি থেমে হাসতে হাসতে বলে, এর উপরে আরও আছে বাবা। হিসাবপত্র রাখা, বিল আদায় করা, পার্টির সঙ্গে দরের ঠিকঠাক করা—প্রেস এমনই অচল, তার উপরে এক গাদা লোক রেখে পোষাবে কী করে? জয়ন্তী-প্রেসের বলতে গেলে আমিই এখন সব—কম্পোজিটার, মেশিনম্যান, একাউন্ট্যান্ট, বিল-সরকার, ম্যানেজার,—একাধারে সমস্ত।

বিনয়ের সঙ্গে হরিবিলাস চলতে আরম্ভ করেছেন। বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে সবিস্তারে শুনছেন বিনয়ের চাকরির কথা। এই বাগানবাড়ির মালিক হলেন ভবানীপুরের রায়েরা দুই ভাই—রঞ্জিত রায় ও ইন্দ্রজিত রায়। খেয়ালী রগচটা মানুষ রঞ্জিত, কিন্তু কর্মবীর। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসারে বড় হয়েছেন। ব্যবসা করে বড়লোক। স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে চিংড়িবাটায় খড়ের গোলা করলেন গোড়ায়। তারপরে এক বোন-মিলের কিছু শেয়ার কিনলেন। সেই মিল সম্পূর্ণ এখন রায়দের—সাহেব পার্টনার নিজের অংশ সামান্য টাকায় ছেড়ে দিয়ে বিলেত চলে গেছে। কিন্তু ঐ একটি মাত্র বস্তু নিয়ে থেমে থাকবার মানুষ নন রঞ্জিত রায়। ব্যবসা কত ধরলেন কত ছাড়লেন, লেখাজোখা নেই। যে-কেউ এসে কোন-একটা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেই হল। স্ত্রী জয়ন্তী মারা গেছেন, কিন্তু যত-কিছু ব্যবসা জয়ন্তীর নামে। সেই যে তিনি গায়ের গয়না খুলে ব্যবসায়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন, রঞ্জিত তা ভুলতে পারেন না। কিছু দিন আগে এই জয়ন্তী-প্রেস করেছেন। প্রেস ঘাড়ে এসে

পড়ল এক বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে। ব্যবসার জন্য তাকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। প্রেস করে চালাতে পারে না, তখন আগের টাকার উপরে আরও কিছু টাকা নিয়ে প্রেসটাই সে রঞ্জিতকে দিয়ে দিল। জায়গা না পেয়ে এই বাগানবাড়িতে তুলে এনে আপাতত কাজ চলছে। কিন্তু আর বেশি দিন নয়, প্রেসের নেশা কেটে এসেছে। বিনয় লেগে পড়ে ইতিমধ্যে কাজকর্ম ভাল করে শিখে নিচ্ছে। কাজ শিখলে বসে থাকতে হবে না। আর মনে হচ্ছে, একটুখানি সে বড়বাবুর নেকনজরে পড়েছে।

হরিবিলাস বলেন, বাসার তো এই ঠিকানাই দিয়ে থাকিস। নিয়ে চললি কন্দুর?

বাড়ি এইটাই, এই কম্পাউন্ডের ভিতরে। কম্পোজিটারকে তা বলে কি বাবা দালানকোঠায় থাকতে দেবে?

লতাপাতার মধ্যে জীর্ণ কয়েকটা টিনের খোপ। হরিবিলাস অবাক হয়ে বলেন, এই বাসা?

বিনয় সোৎসাহে বলে, কিন্তু বাইরে থেকে বুঝবার জো-টি নেই। কত কায়দা-কৌশল করে ঢেকেঢুকে আমাদের জন্য বাসা তোর করে রেখেছে, দেখ।

হরিবিলাস বলেন, তোর মাকে বাসায় আনতে বললি, লম্বা নিমন্ত্রণ দিলি তো আমাদের সকলকে। এনে তুলতিস কোথায় শুনি?

আসবে না তোমরা, সেটা জানতাম। মায়ের ঐ রকম অবস্থায় আসার তখন উপায় ছিল না।

এতক্ষণ বিনয় হাসির সুরে বলছিল। বলতে বলতে কণ্ঠ গভীর হয়ে আসে: দুঃখিনী মা আমার তবু তো জেনে গেলেন ছেলে লায়েক হয়েছে, ভাল বাসায় আরাম করে আছে। তুমিও বাবা চিরকাল তাই জেনে বসে থাকতে, রেল-স্টিমার করে শহরে এসে যদি না পড়তে। কিন্তু কী ব্যাপার বল দিকি, হঠাৎ এই রকম ভাবে এসে পড়া?

সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক এখন, পরে শোনা যাবে। ঘরে ডাব পাড়া আছে, এই বাগানের ডাব। হাত-পা ধুয়ে ডাব খেয়ে ঠান্ডা হও। একদৌড়ে আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।

একা ঘরে হরিবিলাস বারম্বার এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখেন। আর মনে মনে ভাবেন, সেই বায়ুভূত অবস্থায় জ্ঞানদা ভুলেও যেন এদিকে না এসে পড়েন। না চিনতে পারেন যেন বিনয়ের এই বাসা।

বিনয় রান্না করল। ফটকের পাশে চায়ের দোকান করেছে, রঘুমণি নাম। উনুন ধরিয়ে মশলা বেটে পুকুর থেকে জল তুলে সে-ই সমস্ত যোগাড় করে দিল। বাপ-ছেলে পাশাপাশি খেতে বসেছেন। খেতে খেতে কথাবার্তা।

হরিবিলাস বলেন, এই খাটুনির পরে আবার কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে রান্না।

বিনয় বলে, দুটো চাল ফুটিয়ে নেওয়ার কষ্ট কি বাবা? রঘুমণিই তো আর সব করে দিল।

হরিবিলাস বলেন, তাই বা কেন? মেস-টেস দেখে নিস একটা।

বিনয় বলে শহর এদিকে এখনো গড়ে ওঠেনি। মেস-হোটেল বেশি নেই। থাকলেও খরচা অনেক।

বিরক্ত কণ্ঠে হরিবিলাস বলেন, পেটে খাবার খরচটাও দেবে না তোর মনিব। এদিকে বলছিস পেয়ারের মানুষ তুই।

বিনয় বলে, খরচা কি আর পাইনে। জমাচ্ছি টাকা। রঞ্জিত রায় সত্যিই কিছু

সুনজরে দেখেন। প্রেস তিনি রাখবেন না। বললেন, টাকা জমিয়ে যাও। যদ্দুর পার নগদ দিও, বাদবাকি কাজের মুখে মাসে মাসে দিয়ে যাবে। টাকা শোধ হয়ে গেলেই পুরো মালিক। সেই চেষ্টা করছি বাবা। সত্যিই তো কম্পোজিটার হয়ে চিরকাল চলবে না। মনিবও সেই কথা বলেন, বলে বলে কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন টাকা জমাবার।

হরিবিলাস প্রশ্ন করেন, জমল কত?

বেশি নয়। চার-শ'র মতো হয়েছে। পাই তো সামান্য, এর বেশি হবে কী করে?

গম্ভীর হয়ে হরিবিলাস ঘাড় নাড়লেন: এতে হবে না তো আমার। তারপর সোজাসুজি বলেন, টাকার দায়ে এসেছি তোর কাছে। ঐ চারশ'র উপর আরও হাজার খানেক চাই।

সবিস্ময়ে বাপের দিকে চেয়ে বিনয় বলে, সে কি, অত টাকার কী দরকার পড়ল? আমিই বা পাব কোথায়?

আমি যে নিরুপায় হয়ে এসে পড়েছি বাবা। বড্ড আশা নিয়ে এসেছি।

ভাত খাচ্ছেন, এঁটো হাত—হরিবিলাস নয়তো ছেলের হাত জড়িয়ে ধরতেন ঠিক। বলেন, চিঠিতে তুই লম্বা লম্বা লিখতিস, আশা তাই আমাদের কলাগাছের মতো ফুলে উঠল। দায়ে পড়লে তোর কাছ থেকে পাব, সেই ভরসায় দু-হাতে খরচ করলাম তোর মায়ের চিকিচ্ছেয়। আর গেরো এমনি, হিসাব নিকাশ দেওয়ার রেওয়াজ বছরে একবার —চোতের সামতালির পর। পৌষ-কিস্তির আদায়টা হয়ে গেলে হ্যাঙ্গামা ছিল না, স্বচ্ছন্দে তবিল পূরণ করে রাখতাম। তা এখন সম্পত্তি কেনার ভূত চেপে বসল মেজরাজার ঘাড়ে।

আদ্যোপান্ত ঘটনা বললেন। প্রজা ডেকে ডেকে মুকাবেলা করবে। খাজনা দিয়ে গেছে, সে টাকা হরিবিলাস খরচ করে ফেলেছেন, খাতায় জমা হয়নি। মুকাবেলার মুখে তবিল-তছরুপ ধরা পড়ে যাবে। চিরকাল সুনামের সঙ্গে কাজ করে বুড়োবয়সে এই পরিণাম। এর চেয়ে সোজাসুজি যদি জেলে পাঠাত, এতদূর ডরাতাম না।

বিনয় একটু ভেবে বলে, গাঁয়ে আর না-ই ফিরে গেলে বাবা—এখানেই থাকো আমার সঙ্গে। দেশ দু-ভাগ হয়ে গেছে, টেনেহিঁচড়ে তোমায় সোনাটিকারি নিয়ে যাওয়া এখন আর সহজ হবে না।

তবু ও চোর বলবে ইতরভদ্র সকলে। মিছে কথাও নয়। সে আমি ভাবতে পারিনে বিনয়, ভাবতে গেলে পাগল হয়ে উঠি।

হরিবিলাসের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বাঁ-হাত চোখের উপর দিয়ে বারম্বার জল মুছছেন। বিনয় স্তব্ধ হয়ে ছিল। সহসা বলে উঠল, খেয়ে নাও বাবা। হবে উপায়। যে অপরাধ তুমি করে বসে আছ, আমিও তাই করব—তবিল-তছরুপ। বড়বাবু আমায় বড্ড বিশ্বাস করেন। প্রেসের বিল আদায় হয়ে পড়ে থাকে, ভবানীপুরে ওঁদের বাড়ি গিয়ে খাতাপত্রে জমা করে দিয়ে আসি। আমার নিজের না থাক প্রেসের টাকা আছে, তাই তোমায় দিয়ে দেব।

হরিবিলাস প্রবোধ দিচ্ছেন: নির্ভয়ে তুই দিয়ে দে। পৌষমাসে আমি কড়ায়-গণ্ডায় ফেরত দেব। সালতামামির নিকাশের সময় যদি কিছু ঠেকা পড়ে, তখন আবার নিয়ে নেব। আমাদের বাপ-বেটার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ চলবে, বাইরের কেউ কিছু টের পাবে না।

হরিবিলাস সোনাটিকারি ফিরে গেলেন। রঞ্জিত রায় কলকাতায় নেই এখন, পাটনায়। ক'দিন আর থাকেন কলকাতায়। প্রেসের নেশা গিয়ে বড় রীতিমত বৃহৎ ব্যবসায়ে মেতেছেন কিছুকাল থেকে। কলিয়ারির বন্দোবস্ত নিয়েছেন। কোম্পানির নাম হয়েছে জয়ন্তী কোল-কনসারন। শুরুতেই কতকগুলো বড় মামলা একটা কলিয়ারির স্বত্বাস্বত্ব নিয়ে। ছুটোছুটির অন্ত নেই। যত গোলমাল, ততই যেন মজা পেয়ে যান রঞ্জিত রায়।

একদিন শোনা গেল, ফিরেছেন বড়বাবু। হন্তদন্ত হয়ে বিনয় ভবানীপুরের বাড়ি গিয়ে পড়ে। রঞ্জিত রায় আর ম্যানেজার পুলিনবিহারী—দুজনে মামলার কথা বলছেন। বিনয়কে দেখে রঞ্জিত বিরক্ত হলেন: এই এক চোতা প্রেস হয়েছে, নিত্যিদিন তাই নিয়ে মহাভারত শোনাবে। বলো, আবার কী হয়েছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাও, জরুরি কাজ আমাদের।

থতমত খেয়ে বিনয় বলে, প্রেসের কথা নয়, আমার নিজের কথা। প্রেসের বিলের টাকা আমি খরচ করে ফেলেছি।

রঞ্জিত খিঁচিয়ে ওঠেন: বড় কীর্তি করেছ। ট্রামভাড়া দিয়ে জাঁক করে শোনাতে এসেছ তাই!

বিনয় বলে, এ তো চুরি। চুরির কথা না বলে পারলাম না আপনাকে। যে শাস্তি দেবার দিন, মাথা পেতে নেবো।

রঞ্জিত মুহূর্তকাল বিনয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। মুখে কৌতুকের হাসি। বলেন, অত করে চাইছ যখন, শাস্তি না হয় দিচ্ছি। কিন্তু কাঁপছ কেন তুমি এত? দুনিয়ায় তুমিই কি প্রথম মানুষ যে চুরি করল? ছোঃ!

তারপর জেরা আরম্ভ হল: আমি তো কখনো হিসেবপত্তর নিতে যাইনে, আগ বাড়িয়ে বলতে এলে কেন শুনি? স্বচ্ছন্দে চেপে যেতে পারতে।

বিশ্বাস করে আমার উপর ভার দিয়েছিলেন। সে বিশ্বাসের আমি মর্যাদা রাখিনি বড়বাবু।

সে তো কেউ রাখে না। নতুন ব্যাপার কিছু নয়। আমার মামাতো ভাইকে বিশ্বাস করে রাখালবাড়ি-কলিয়ারির ভার দিয়েছিলাম। হাজার দশেক টাকা মেরে আগের মালিকের সঙ্গে যোগসাজসে মামলা লড়ছে এখন আমার সঙ্গে। এই প্রেসের আগে বাগানবাড়িতে জয়ন্তী-কার্ডবোর্ড-ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি করেছিলাম, তার আগে হ্যারিকেন-লণ্ঠন তৈরির কারখানা। টাকা মেরে দিয়ে সবাই তো পালিয়ে যায়, তুমি এমন সৃষ্টিছাড়া হতে গেলে কেন?

বিনয় চুপ করে থাকে। রঞ্জিত পুলিনবিহারীর দিকে চেয়ে বলেন, কী করব, বল হে ম্যানেজার।

পুলিন বিনয়কে ভাল চোখে দেখে না। মনিবের সুনজর যার উপর, কে তাকে পছন্দ করে?

কী করা যায় ছোকরাকে নিয়ে?

পুলিন বলে, এমন অসৎ লোক প্রেসে রাখা বোধহয় ঠিক হবে না।

রঞ্জিত লুফে নিলেন কথাটা: শুধু অসৎ নয়, অপদার্থ। শোন বিনয়, প্রেসের কাজ থেকে তোমায় বরখাস্ত করলাম। প্রেসই ছেড়ে দিচ্ছি, এত ঝামেলা আর পোষাবে না। আগের মালিক আমার সেই বন্ধু কিছু নগদ টাকা দিতে চাচ্ছে। তারই তো প্রেস, আমি তাকে করে দিয়েছিলাম—যেখানে খুশি সে প্রেস তুলে নিয়ে যাক।

বরখাস্তের হুকুমে প্রীত হয়ে পুলিন বলে, যে টাকাটা বিনয় মারল, তা-ও নিশ্চয় আদায় হওয়া উচিত।

ঠিক, ঠিক! বরখাস্ত শুনেই অমনি দেশেঘরে পালাবে, সেটা হবে না বিনয়। পুলিনের আমাদের সকল দিকে দৃষ্টি। টাকা যদ্দিন শোধ না হচ্ছে, জায়গা ছেড়ে নড়তে দিচ্ছিনে। যেমন আছ থেকে যাও। বাগানবাড়ির দেখাশোনা করো। আরও চারখানা বাড়ি আছে, সেগুলো দেখ। মাইনে যা আছে তাই। দশ টাকা করে কেটে নিয়ে মাসে মাসে দেনা শোধ হবে। আরও একটা মতলব করছি। প্রেস সরে গেলে ওখানে বিস্কুটের কারখানা করব। রাস্তার ওপারে ডেভিড সাহেবের ফ্যাক্টরি, আমাদের ফ্যাক্টরি এপারে। পাল্লাপাল্লি চলবে। তোমাকেই গড়ে তুলতে হবে বিনয়, তোমার উপর ভার। পারবে না? এদ্দিন ছাপার কালি মেখে ভূত হতে, এ তো বাবুভেয়ের কাজ হে!

ভাবখানা, বিনয় ঘোরতর প্রতিবাদ করছে, তারই বিপক্ষে লড়ছেন যেন রঞ্জিত রায়। মতলবটা প্রকাশ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগলেন। এই এক বিচিত্র ভাবের মানুষ।

বিনয় বিদায় হয়ে গেলে পুলিন বলে, এতবড় জোচ্চুরিটা করল, সত্যি সত্যি দায়িত্ব দেবেন তার উপরে?

রঞ্জিত বলেন, আবার অন্যটাও দেখ। না বলে দিলে কোনদিন আমি প্রেসের বিলের ঐ টাকা ধরতে যেতাম না। ছোকরা যেমন সাধু, তেমনি জোচ্চোর। দুয়ের মিশাল। কলিয়ারি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, তার উপর ফ্যাক্টরির খুঁটিনাটি কতদূর দেখতে পারব কে জানে? ছোকরার মাথায় পোকা আছে—কোন রকমে গোলমাল ঘটালে ট্রামভাড়া করে নিজে এসে সেটা বলে যাবে। তা ছাড়া ভাল মাইনের কাজ না দিলে দেনাটাই বা তাড়াতাড়ি শোধ হয় কী করে?

॥ সাত ॥

মেজরাজা যা করলেন, ত-ও কম নাটকীয় নয়।

গড়ভাঙা গাঁতি নিলামের তারিখ সঠিক ভাবে জেনে ডিক্রিজারির যাবতীয় ব্যবস্থা সেরে হরিবিলাস সদর থেকে ফিরে এলেন। মেজ-রাজা বলেন, আজ তুমি ক্লান্ত আছ, আজকে থাক। কালও পারব না—আমার নিজের আলাদা একটু কাজ আছে। পরশুদিন হিসেবপত্তর নিয়ে বসব।

বলছেন, আর সতর্ক দৃষ্টিতে হরিবিলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাহর করছেন। ভাবভঙ্গি ভালই।

তৃতীয় দিন কাছারি-দালানে ঢুকে অশ্বিনী বলেন, কি হরি, বসবে নাকি এখন? তোমার দিক দিয়ে কিছু বাকি থাকে তো কাল বা পরশু থেকেও বসা যেতে পারে।

সময় দিচ্ছেন। হাতচিঠেয় নাম আছে বড় কম নয়। কড়চাখাতায় অতগুলো নাম তুলে ফেলে যথারীতি জমাখরচ করবে বেচারী। তাতে কিছু সময় লাগে।

হরিবিলাস বলেন, এখনই বসুন। গাঁতির নিলামের দিন ঘনিয়ে এলো। ঘরের সম্বল বুঝে নিয়ে তারপরে যদি দরকার হয়, বাইরে চেষ্টা করতে হবে।

বোঝা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত খাজাঞ্চি হরিবিলাস। তবিলের যা ঘাটতি ছিল, পূরণ হয়ে গেছে। ঠিক এই জিনিসটাই মেজরাজা চেয়েছিলেন। চেপে বসলেন হরিবিলাসের পাশে ফরাসের উপরেই। হেসে বলেন, 'কয় শুভংকর মজুত গোনো'—নগদ কী আছে সেইটে সকলের আগে। আয়রনসেফ খোল দিকি, খাতার কাজ পরে।

টাকাকড়ি গণেগেঁথে দেখা হল। ক'দিন আগে রাত্রিবেলা বাপে-ছেলেয় দেখে গেছেন, তার চতুর্গুণ। খাতার হিসাব নিয়ে অতএব তাড়াতাড়ি নেই, সেখানেও ঠিক ঠিক এই দাঁড়াবে।

মেজরাজার মুখ হাসিতে ভরে গেল। এত কাল হরিবিলাসকে দেখে আসছেন, চরিত্র-বিচারে ভুল হয়নি। টাকাকড়ি সিন্দুকের যথাস্থানে তুলে রেখে মেজরাজা বললেন, চাবি দাও হরি, বন্ধ করে ফেলি। খাতাপত্তর সব ফরাসের উপর নামিয়ে ফেল এইবারে।

হরিবিলাসের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মেজরাজা আয়রনসেফ বন্ধ করলেন। ফেরত দিলেন না চাবি, নিজের ফতুয়ার পকেটে ফেললেন। হরিবিলাস ওদিকে খাতাপত্র নামিয়ে এক জায়গায় করছেন।

মেজরাজা আঁতকে ওঠেন : ওরে বাবা, অত খাতা ঠায় বসে দেখতে পারব না তো। এক কাজ কর চূড়ামণি, ওগুলো আমার দোতলার ঘরে রেখে আয়। শুয়ে বসে সুবিধা মতন আস্তে আস্তে দেখব।

হরিবিলাস গোছগাছ করে খেরোর দপ্তরে বেঁধে দিলেন সমস্ত। চূড়ামণি ভিতরবাড়ি নিয়ে চলল।

আশিসের দিকে তাকালেন একবার মেজরাজা। সে এসে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, সিন্দুকের চাবি আমার নিজের পকেটে রেখেছি, লক্ষ্য করেছ বোধহয় হরি?

লক্ষ্য হরিবিলাস ঠিকই করেছেন। ভেবেছিলেন, অন্যমনস্ক হয়ে রাখলেন, যাবার সময় দিয়ে যাবেন।

মেজরাজা বলেন, চাবি আর তোমায় দেব না। দরকারি কাগজপত্র ভিতরবাড়ি কেন পাঠিয়ে দিলাম, তা-ও এবারে বুঝে দেখ।

হরিবিলাস ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বললেন, ব্যাপারটা কী?

ঘরের মধ্যে আরও যে একটি মানুষ রয়েছে, এতক্ষণ তা জানা যায়নি। আশিস দাঁতে দাঁত চেপে ছিল, একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। আর পারে না। বলে উঠল, ন্যাকা সাজবেন না খাজাঞ্জি-কাকা। পুরানো কর্মচারী আপনি, আমাদের অবস্থা অজানা নেই, একটা টাকা এক মোহরের সমান। এতদিন ধরে নুন খেয়ে আপনি আমাদের সর্বনাশ করছিলেন।

হরিবিলাসের মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। অশ্বিনী ছেলেকে তাড়া দিয়ে উঠলেন : আঃ আশিস, কী সব বলছ। কাকা বলে ডাক না তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে হরিবিলাসের দিকে চেয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, ছেলেমানুষের আজেবাজে কথায় কান দিও না হরি। বিষয়সম্পত্তি সমস্ত প্রায় গেছে। একজন আমলার মধ্যে একলা তুমি ছিলে শেষ পর্যন্ত। ধরে নাও, তা-ও রাখবার সামর্থ্য নেই আমাদের। দরকারও নেই। ছিটেফোঁটা যা আছে, বাপ-বেটা আমরা নিজেরা দেখতে পারব। লোকে অন্তত তাই জানুক। পুরানো লোক বরখাস্ত করে দিচ্ছি, এটা ভাল দেখাবে না। আমাদের ভিতরের ব্যাপার যা-ই হোক, লোকে কেন তা টের পাবে?

হরিবিলাস আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বয়সে আপনি আমার বড়। একটা প্রণাম করে যাই মেজরাজা। বয়স হয়ে গেছে, প্রণাম করবার মানুষ তো খুঁজে পাইনে। আপনি একজন শুধু ছিলেন—আবার কবে দেখা হয় না হয়—হয়তো বা এই শেষ প্রণাম।

মেজরাজা বলেন, দেখা না হবার কি—কোয়ার্টার ছাড়তে বলছি নে। ওখানেই থাক

তুমি। প্রবোধের সুরে পুনশ্চ বলেন, গড়ভাঙার গাঁতির নিলাম ডাকব। দাঁও মতো নতুন নতুন সম্পত্তি করার ইচ্ছে। সম্পত্তি বাড়লে লোকেরও দরকার হবে। পুরানোদের না নিয়ে তখন কি আর নতুন লোক ডাকতে যাব? যেমন আছ, তেমনি থেকে যাও হরি।

হরিবিলাস বলেন, আজ্ঞে না। গাঁয়ের মধ্যে আমি মুখ দেখাব কী করে?

গাঁয়ের মানুষ জানবে কিসে?

আপনি জেনেছেন, খোকাবাবুও জানে। আপনাদের নজরের মধ্যে পড়ি, তেমন জায়গায় থাকতে পারব না রাজাবাবু। পারি তো আজই—নয় তো কাল আমি চলে যাচ্ছি।

অশ্বিনী বলেন, ছেলের কাছে যাবে?

হরিবিলাস ঘাড় নাড়লেন: না, তারও সর্বনাশ করে এসেছি। প্রাণপাত খেটে ভবিষ্যৎ গড়ছিল, বাপ হয়ে সে পথে কাঁটা দিয়ে এসেছি। ছেলের কাছেও মুখ দেখাবার উপায় নেই রাজাবাবু।

গলা ধরে এল। সামলে নিয়ে বলেন, জামাই আছে নাতি-নাতনিরা আছে, আপাতত সেখানে গিয়ে উঠিগে। মেয়ে মরে গেছে, কতদিন থাকা যাবে জানিনে। গোটা পিরথিম তার পরে পায়ের নীচে পড়ে রইল।

আশিসকে কাছে ডেকে অশ্বিনী ফিসফিস করে বলেন, গোস্তি-নৌকো একটা তাড়াতাড়ি ভাড়া করে ফেল। ত্রিভুবন তোমার তো জানাশোনা। নেয়েরা খুব বিশ্বাসী হবে, খবরটা চাউর করে না দেয়। কৃষ্ণপক্ষ আছে, ভালই হয়েছে—আঁধারে আঁধারে মালপত্তর বোঝাই হতে পারবে।

আশিস অবাক হয়ে বলে, মাল যাবে কোথায় বাবা?

অন্য সকলের যেখানে যাচ্ছে। আমি কি সৃষ্টিছাড়া একটা-কিছু করতে যাব?

মালপত্তর সরিয়ে দেবেন? এদিকে আবার নতুন সম্পত্তির জন্যে দরাদরি করছেন।

মেজরাজা নিরীহ ভাবে বলেন, তা ছাড়া কী করব? বলে বেড়াব, টাকাকড়ি কুড়িয়েবাড়িয়ে নিচ্ছি হিন্দুস্থানে চলে যাব বলে? আনসার-বাহিনী তড়পাচ্ছে, কাউকে যেতে দেবে না—আমি তার ডবল জোরে বলি, কক্ষনো না, কিছুতে না, মরে যাক তবু যেন ভিটে ছেড়ে কেউ না নড়ে। সেই জন্যে দেখ, সকলের উপরে চরবৃত্তি করে বেড়ায়, দলের মানুষ ভেবে আমার সম্বন্ধে তারা একেবারে নিশ্চিন্ত।

আশিস বলে, মালপত্তর চলে গেলে তখন তো আর বুঝতে বাকি থাকবে না।

মেজরাজা হাসেন: তা বুঝবে বটে! বুঝে দন্ত-কড়মড়ি করবে, আর ঘরের ভাত বেশি করে খাবে। মাল ভাসল গোস্তি-নৌকোয়—তার মধ্যে ঠাঁই করে নিয়ে আমরাও গোটাকয়েক বাড়তি মাল হয়ে বসে পড়লাম। পাবে কোথায় তখন আর আমাদের।

কিছু পাকা-বুদ্ধি ছাড়েন এবার ছেলের উদ্দেশে: শোন, ধনুকের বাণ যেদিকে ছুঁড়বে টানতে হয় তার উল্টোমুখে। যত বেশি পিছন দিকে টান, বাণ তত জোরে ছুটবে। সংসারের ব্যাপারেও ঠিক তাই। কলকাতা পালানোর কায়দা এই দেখছ, আর হরিবিলাসের ব্যাপারটাও দেখেছ আগে। তুমি ভেবেছিলে, পুরানো লোক বলে দয়া করছি। বৈষয়িক লোক দয়া কাউকে করে না। তোমার কথা মতো থানা-আদালত করে হরিবিলাসকে হয়তো জেলে ঢোকানো যেত, কিন্তু এতগুলো টাকার একটি পয়সাও আদায় হত না ওর কাছে থেকে। ভাল করেছি কিনা বুঝে দেখ এবারে।

সদাশিব দাবা খেলতে এলে অশ্বিনী চুপি চুপি বলেন, চললাম এবারে শিব-দাদা।

বন্দোবস্ত সারা—শুধু পাঁজির একটা দিনের অপেক্ষা।

সদাশিব এক কথায় বলেন, আমিও যাব।

সে কি?

তোমরা যদি না যেতে তবুও চলে যেতাম।

কিন্তু যাবে কী করে? পা ধরে তোমার ছাত্রেরা টিপটাপ পায়ের উপর আছড়ে পড়বে যে!

সদাশিব বলেন, সেই আফজল কাল এসেছিল। সত্যি সত্যি সে পা জড়িয়ে ধরতে যায়ঃ মাস্টারমশায়, যান চলে আপনি, দেরি করবেন না। রবিবার হাটের সময় নানান জায়গার মানুষ এসে জড় হবে, একটা কান্ড হতে পারে সেই দিন। আফজল এইসব বলে, আর হাউহাউ করে কাঁদে।

তারপর বলেন, খবরের-কাগজ দেখে থাক মেজরাজা? লিখছে কী আজকাল? বর্ডারের ওপারেই বা খবর কী?

মেজরাজা বলেন, কাগজ কোথা পাব? স্টিমারঘাট অবধি গিয়ে কাগজ ধরতে আর ইচ্ছে হয় না। গরজটাই বা কী—যা করব সে মনে মনে ঠিক আছে। অনেক দিন থেকেই আছে, বাইরে কেবল বলিনে। গুছিয়ে নিতে দেরি হচ্ছিল। আশিসও অনেক দিন কলকাতা যায়নি। এইবারে সর্বশেষ দল নিয়ে যাওয়া।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলেন, আর ফিরব না আমরা কেউ!

দাবাখেলা সেদিন আর হল না। সদাশিব বলেন, যাওয়ার তাড়া, খেলার চাল আর মাথায় আসবে না। পায়ে পায়ে স্টিমারঘাটে চলে যাই। কাগজ কিনতে না পারি, পড়ে আসি ওখান থেকে।

বাড়ির মধ্যে বিরজার কাছে অশ্বিনী কথাটা বলেনঃ আর কি দিদি, রাজবাড়ির মায়া কাটাও এবারে। আর আসব না এবাড়ি।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেনঃ দিদি, জন্ম থেকে গাঁয়ের উপর মানুষ। বাইরের কিছুই জানলাম না এই সোনাটিকারির মাটি আর মানুষজন ছাড়া। শুধুমাত্র এক কাঠা ভুঁই নিয়েও কত মামলা-মোকদ্দমা লড়েছি। সব পড়ে রইল। পথে বেরুচ্ছি পরশুদিন—পথের আর দশটা মানুষ যা, সোনাটিকারির রাজামশায়ও তাই।

বল কি! বিরজা অবাক হয়ে গেলেন,ঃ নিতান্ত যদি বেরুতে হয়, বাঁশির বিয়ে-থাওয়ার পরে—এই তো বলে এসেছ তুমি।

অশ্বিনী বলেন, আরও কত কি বলেছি, সব এখন মনে পড়ছে না। বৈষয়িক লোকের কথা ধরতে নেই। বলি, বিয়ে যে দেব, পাত্র পাই কোথা? ভাল পাত্র নেই আর এ তল্লাটে—বর্ডার পার হয়ে বেরিয়েছে। আছে হেজে-যাওয়া পোকায়-খাওয়া দুটো-একটা—তিন কুলে যাদের কেউ নেই। বাঁশির মতো মেয়ে তেমন পাত্রে দেব না। মেয়ের বিয়ে ওপারে গিয়ে ধীরে-সুস্থে দিও দিদি।

বাঁশির মতো মেয়ে নিয়ে পথে বেরুনো—তুমিই তো বরাবর ভয় ধরিয়ে এসেছ।

মেজরাজা বলেন, পথে বেরুনোই বেশি নিরাপদ দিদি। বাড়ির মধ্যে বরঞ্চ ভয়, কখন কারা হামলা দিয়ে এসে পড়ে। স্টেশনের উপর কিংবা গাড়ির ভেতর অত লোকের মাঝখানে কে কী করবে?

হেসে বলেন, সুবিধাই বরঞ্চ এক দিক দিয়ে। সুন্দর মেয়ে দেখে লোকে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দেবে। টিকিটের জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়াতে হবে না, লাইনের মানুষ হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে টিকিট করে দেবে। মেয়েও আমাদের ডাংপিঠে।

বাঁশিকে আগে ঠেলে দিলে সে-ই আমাদের সকলকে নিয়ে যেতে পারবে।

গোপ্তি-নৌকোয় মালপত্রের সঙ্গে মিশাল হয়ে অশ্বিনীরা যাবেন। রাজবাড়ির মেজরাজা স্টিমারে, নিশিরাত্রি হলেও, যেতে পারেন না। সকলের থেকে চিরদিন আলাদা। পালাবার মুখেও আলাদা হয়ে যাবেন তিনি—যতক্ষণ অন্তত দেশের সীমানার ভিতর রয়েছেন। নৌকার বিশ্বাসী দাঁড়ি-মাঝিরাও এখন অবধি জানে, চলে যাচ্ছেন শুধু দুজন মেয়েলোক—বিরজা আর বাঁশি। আর কিছু জিনিসপত্র। মাস্টারমশায় সদাশিব তাদের অভিভাবক হয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আশিস প্রকান্ড এক দল জুটিয়ে নিয়ে স্টিমারে যাচ্ছে। খুলনা স্টেশনে এঁদের সঙ্গে না-ও যদি দেখা হয়, শিয়ালদা পেঁছে হবে।

দাঁড়ি-মাঝিরা জিনিসপত্র মাথায় নিয়ে চলল। পিছনে লোক ক'টি। সকলের পিছনে অশ্বিনী। মাঝি জিজ্ঞাসা করল, আপনি ঘাটে চললেন রাজাবাবু?

যাই, তুলে দিয়ে আসি—

তখন অবধি মেজরাজা হুংকার ছাড়ছেন: যাদের খুশি চলে যাক—আমি ভিটে ছাড়ব না। মারুক কাটুক কিছুতেই না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকব এখানে।

জোয়ার লেগেছে। মাঝি বলল, নৌকো এইবারে ছাড়ি। নেমে যান রাজাবাবু।

চকিত ভাবে মেজরাজা জনপূর্ণ অন্ধকার ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বলেন, তাই বটে! রাখ একটুখানি মাঝি, নামি। নামতে নামতে বলেন, ছেড়ে দিও না। আসছি আবার।

নেমে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী দুমদুম করে পাগলের মতো ঘাটের মাটির উপর লাথি মারেন। থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলছেন: পুড়েজ্বলে যাক। যেখানে আমরা থাকতে পারলাম না, বন্যায় ভাসুক, ঝড়ে উড়ে যাক। থুঃ-থুঃ!

সদাশিবও পিছন পিছন নেমেছেন। দু-চোখ বিস্ফারিত করে চিরদিনের গম্ভীর-স্বভাব মেজরাজার এই কান্ড দেখছেন। অশ্বিনী উঠে পড়লেন আবার নৌকোয়। সদাশিব তখন একটু মাটি তুলে চাদরের কোণে যত্ন করে বাঁধলেন। বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতন বলেন, যারা সব রইল, ভাল কোরো তাদের ঠাকুর। ক্ষেতে ধান হোক, গাছগাছালিতে ফল হোক, ভাল হোক মানুষের।

॥ আট ॥

সোনার বরন খড়ে-ছাওয়া কত ঘর দুই তীর জুড়ে। গোবরমাটি-নিকানো তকতকে ঝকঝকে কত আঙিনা। মাঝে মাঝে দালান-কোঠা দু-একটা। কত বাগবাগিচা পুকুরঘাট হরিতলা-কালীতলা। নৌকা চলেছে সমস্ত পিছনে ফেলে। নৌকার নিচে জলস্রোত কাঁদতে কাঁদতে সারা পথ সঙ্গে চলে।

তারপর খুলনা। রেলগাড়ি খুলনা থেকে কলকাতায় এনে ফেলল। শহর কলকাতা। টাকাকড়ি জিনিসপত্রের অধিক ঝামেলা নেই আর এখন, নৌকা বোঝাই করে এনেছিলেন, বর্ডারে পুলিশ দয়া করে প্রায় সমস্ত হালকা করে দিয়েছে। দিনকে-দিন আইনের কড়াকড়ি। যারা কায়দাকানুন জানে, তারা কিন্তু অবাধে বেরিয়ে যায়।

সূঁচ গলতে দিচ্ছে না, এত মালপত্র কেমন করে নিয়ে এলে হে?

ব্লাকে নিয়ে এসেছি।

নতুন একটা কথাই চালু হয়েথে 'ব্লাকে যাতায়াত'। আশিসটা দলবল নিয়ে

আলাদা চলে গেছে। এত বারের আসা-যাওয়া, কোন তদ্বিরে পুলিশ সামলাতে হয়, নিশ্চয় সে জানে। সে থাকলে খানিকটা বন্দোবস্ত হতে পারত। কিন্তু গ্রাম-অঞ্চলের পাটোয়ারি ব্যক্তি অশ্বিনী কাস্টমসের ধমকানিতে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন, তোতলা হয়ে গেছেন কেমন যেন। থান-কাপড়ের লম্বা ঘোমটা টেনে বিরজা ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে একদিকে সরে দাঁড়িয়েছেন। লোকগুলো বারম্বার বাঁশির দিকে তাকায়—আতঙ্কে অশ্বিনী ঘেমে উঠছেন ততই। মাস্টারমানুষ সদাশিব তারই মধ্যে গিয়ে বাপু-বাছা করছেন। কিন্তু কাজ হয় না।

বাঁশি ফরফর করে এগিয়ে গেল: হয়েছে কি বলুন তো, এত কড়াকড়ি কিসের? চিরকালের মতো যাচ্ছি চলে। ঘরবাড়ি জমিজমা কিছু নিয়ে যাচ্ছিনে। সামান্য দুটো-চারটে জিনিস—একেবারে নিঃসম্বল অথই-সমুদ্দুরে গিয়ে পড়ি, তাই কি চান আপনারা?

ছোকরা গোছের একজন বলে, যাচ্ছেন কী জন্যে নিজের দেশ-ভুঁই ছেড়ে? যেতে কে বলেছে? যাওয়া তো অন্যায়।

বাঁশি তীব্রস্বরে বলে, শখ করে কেউ চলে যায় না। পাঁচ পুরুষের বসত আমাদের—কোন কালে কেউ যাবার কথা ভাবেনি। চিরকাল পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে ঘরে থাকবে, তেমনি ভাবেই সংসার গুছিয়েছে। তবু যেতে হচ্ছে, নিশ্চিন্ত হয়ে আগের মতন থাকতে পারছিনে বলেই। কিন্তু সে দুঃখ আপনাদের বলে কী লাভ? দৈত্যের মতন রাষ্ট্রযন্ত্র, আপনারা তার নাটবল্টু বই তো নয়। যন্ত্রে মানুষ পেশাই হচ্ছে, আপনারা রুখবেন কেমন করে? দু-দশজনে তা পারে না।

ছোকরা বলে, ঠিক তাই। আইন করে দিয়েছে, সেই আইন খাটান কাজ আমদের। এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, তার উপর রুপোর বাসন সোনার মোহর—আপনাদেরও আটক করে কোর্টে হাজির করা উচিত—

বাঁশির ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলে, তার কাজ নেই, গাড়িতে উঠুন গিয়ে। চার-জনের মোটমাট দু-শ টাকা—তার বেশি এক আধলাও নিতে পারবেন না। গায়ে গয়না-গাঁটি আছে, ও-সমস্ত তাকিয়ে দেখছিনে। বাকি সোনা-রুপো টাকাপয়সা সরকারে জমা রইল। রসিদ নিয়ে যান। মামলা করে ছাড়িয়ে নেবেন এর পরে।

বর্ডারে সমস্ত ফেলে সম্বলহীন এসে পেঁছিলেন। শহর কলকাতা, স্বপ্নের শহর। ছোট্ট বয়স থেকে বাঁশি কত গল্প শুনেছে কতকাতার, পা দিল সেখানে এই প্রথম। বিরজা একবার কলকাতায় গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন। চুল পেকে বুড়ো হয়েছেন, সেই একবার-আসা কলকাতার গল্প আজও ফুরাল না। বাঁশির মনে পড়ে, বিরজার গা ঘেঁষে ছোট ছোট দু-খানা হাতে জড়িয়ে ধরে একফোঁটা মেয়ে আবদার করত, কলকাতার গল্প বল পিসি। সে এক অবাস্তব জায়গা—তাদের গ্রাম বা শহর-বন্দরের সঙ্গে কিছু মেলে না। গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানার বাঘ-ভালুক, পরেশনাথের বাগান, লাটসাহেবের বাড়ি, গঙ্গার উপর নৌকা ভাসিয়ে তার উপরে পুল, সেই পুলের উপর অগন্য গাড়িঘোড়া-মানুষ। অফুরন্ত আনন্দের কলকাতা। কিন্তু অতিশয় বিশ্রী। একটু বেসামাল হয়েছ কি গাড়ি ঘাড়ের উপর পড়ে চাপা দিয়ে চলে গেল। গুন্ডা-বদমায়েসে টাকাপয়সা সরিয়ে নিয়ে ফতুর করে দিল, প্রাণহানিও করতে পারে।

সেই আজব শহরের প্রান্তে এনে রেলগাড়ি নামিয়ে দিল। শিয়ালদা স্টেশন। শহর বটে একখানা—কী বিষম হৈ-চৈ। এত লোক চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—বিরজার

আজ কিন্তু ঘোমটা টেনে দিতে মনে নেই হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। তিরিশ বছর আগে দেখে গেছেন—কিন্তু এ-যেন আলাদা এক জায়গা। এই এক ট্রেন এসে পেঁছাল, ঐ এক ট্রেন ছাড়ছে ওদিকে—এক দঙ্গল নেমে পড়ল, আর এক দঙ্গল ছুটেছে গাড়ি ধরার জন্য। প্ল্যাটফরম ধরে এগিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ বেরুচ্ছে লোহার শিকের দরজা দিয়ে—ঢুকছে মানুষ ভিন্ন এক দরজায়। এলাহি কাণ্ডকারখানা।

বেরিয়ে এসে দূরের দিকে তাকিয়ে বিরজা আরও অবাক: কত ঘরবাড়ি রে বাপু! যে দিকে তাকাই, শুধু ঘর।

বাঁশি আর কখনো কলকাতা আসেনি, তার কিন্তু বিস্ময় নেই।

হেসে বলে, অত ঘর পিসিমা, আমাদের জন্য ওর একটাও নয়।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে বিরজা বলেন, ঘর নেই, তবে থাকব কোথায় আমরা?

বাঁশি চারিদিকে আঙুল ঘুরিয়ে বলে, এই যে কত মানুষ রয়েছে, আমরা কেন থাকতে পারব না?

স্টেশনে পা ফেলবার উপায় নেই। অগণ্য মানুষ সংসার জমিয়ে আছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছে এই মেজরাজা অশ্বিনীর মতোই। একটা গ্রাম সাজিয়ে নিয়েছে যেন স্টেশনের উপর। গ্রামের এবাড়ি-ওবাড়ির মধ্যে পগার কেটে বেড়া দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে—এ যেন অবিকল সেই বস্তু। যারা যতটুকু জায়গা জুটিয়েছে, পোঁটলাপুঁটলি বাক্সপেঁটরা বাসনপত্তরে ঘের দিয়ে নিয়েছে। ঐ পাঁচ বাই তিন হাত জায়গা যেন এক গৃহস্থবাড়ি। বাইরের মানুষ তুমি সেখানে গিয়ে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে টান, সুখ-দুখদুঃখের খবরাখবর নাও, তারপর ফিরে যাও নিজের কোটে। সেই গৃহস্থবাড়ির বউটা সকালবেলা দুর্গা-দর্গা—বলে ঘুম ভেঙে উঠে স্টেশনের কলে মুখ-হাত ধুয়ে এল। বাচ্চারা মুড়ি খাচ্ছে এনামেলের বাটির চতুর্দিকে বসে। অতি শৌখিন গৃহকর্তার জন্য চায়ের জল গরম করছে বউ তোলা উনুন ধরিয়ে। বঁটি পেতে তারপর কোটনা কুটতে বসে গেল। কোটনা কুটছে, আর গল্প করছে পাশের গণ্ডির মেয়েটার সঙ্গে। মাড়োয়ারিবাবু খিচুড়ি খাওয়াল—ছ্যা-ছ্যা, আসিদ্ধ ডালের ধরা-খিচুড়ি। সেবাশ্রম থেকে চিঁড়ে-মুড়ি বিলি করে যায়, অনেক ভাল সে জিনিস—কি বল ভাই, অ্যাঁ?

বিরজা শিউরে ওঠেন: এমনি করে থাকতে হবে! এই রকম হাটের মধ্যে?

বাঁশি সহজ ভাবে বলে, ঠিক পারব পিসিমা। এখন আমরা রাজবাড়ির মানুষ নই, এ জায়গা সোনাটিকারি নয়। আমাদের মতন কত সোনাটিকারি রুপোটিকারির লোক এসে জমেছে স্টেশনে। এত লোকে পারছে, আমরা কেন পারব না?

আশিসের দেখা মিলল এতক্ষণে। বড় দলটা নিয়ে সে আগের ট্রেনে পেঁছেছে। স্টেশনের আচ্ছাদনটুকুর নিচে অতগুলো সংসার কোনখানে কী ভাবে পাতা যায়—জায়গা খোঁজাখুঁজি করছিল সে কয়েকজনের সঙ্গে। ইতিমধ্যে পরের ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না। ট্রেনও যে আজ হঠাৎ সাহেবমানুষের মতো ঘড়ি ধরে চলাচল করবে, আন্দাজ করতে পারেনি।

বাঁশি বলে, আমাদেরও একটা জায়গা-টায়গা দেখ দাদা। বোঁচকা-বুঁচকির উপর বসে কতক্ষণ এমন কাটানো যায়!

ঘুরছে আশিস এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। যে ভাগ্যবানেরা আগে এসে গোটা স্টেশন ভাগাভাগি করে নিয়েছে, নিজের দখল থেকে তারা সুচ্যগ্র-পরিমাণ ছাড়বে না।

আশিষও নাছোড়বান্দা। এদিকে ঘুরেছে, ওদিকে ঘুরেছে। অনুনয়-বিনয় করছে কারও সঙ্গে বা ঝগড়া!

নাদুসনুদুস এক বুড়ো ভদ্রলোক আশিসকে ডাকলেন: শোন হে ছোকরা, এদিকে এস। কী বলছ শুনি।

খাতির জমাতে আশিস সেইখানে উবু হয়ে বসে পড়ল।

এই স্টেশনের সকলের আদি-বাসিন্দা আমি। কী বলতে চাও, আমার কাছে বল। তখন দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছু নয়, ফিসফিস-গুজগুজ সবে কেবল শুরু হয়েছে—সাহস করে বউ-ছেলেপুলের হাত ধরে এসে পড়লাম। এসেছিলাম তাই রক্ষে। কেমন খাসা জায়গাখানা পেয়ে গেছি দেখ। এপাশে দেয়ালে—দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙিয়ে নিয়েছি, কাপড়-জামা থাকে। সামনেটা একেবারে খোলা—ফুরফুরে দখিনা হাওয়া। মশাটশা নেই, তা সত্ত্বেও বেয়াড়া অভ্যাস—মশারি বিনে ঘুম হয় না। চিরটাকাল ভাল খেয়ে ভাল শুয়ে এসেছি তো! মশা নাই হোক, মশারি টাঙাতেই হবে আমায়। টাঙিয়েও থাকি রোজ। কী করে টাঙাই বল দিকি?

ঘাড় বাঁকিয়ে আশিসের দিকে রহস্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধ পা নাচাতে লাগলেন: কেমন করে, বল। তবে বুঝব এলেম আছে কিছু তোমার ঘটে।

আপাতত আশিসের এলেম দেখানোর ধৈর্য নেই। বুড়ো ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, পারলে না তো? আমি বলে দিচ্ছি। দেয়ালের পেরেক দুটোয় মশারির দুই কোণ বাঁধি। তারপর এই পোর্টম্যান্টো, আর এই জলের কলসি—হয়ে গেল আর দুটো কোণ।

আশিস প্রশ্ন করে, মশারির কোণ জলের কলসিতে আর পোর্টম্যান্টোয়—বোঝা গেল না ঠিক।

বৃদ্ধ অধীর কণ্ঠে বলেন, কী আশ্চর্য, আরও বলতে হবে? পোর্টম্যান্টোর আংটায় আমার বেতের লাঠি খাড়া করে দিই। আর কলসির জল ঢেলে ফেলে তার মধ্যে দিই ছাতা। ছাতার বাঁটে মশারির এক কোণা, আর লাঠির মাথায় অন্য কোণা। হয়ে গেল না?

নিজের কথা অনেকক্ষণ ধরে বলে বৃদ্ধ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন: তোমার কথা বল, এইবারে শুনি। আমি আদিমানুষ, আমায় বললে সকলকে বলা হয়ে যাবে।

বাড়ির লোকদের দেখিয়ে আশিস বলে, এই সকালে এসে পৌঁছলেন। নিয়ে তুলি এখন কোথায়? সকলে একটু-আধটু সরে গিয়ে আমাদেরও যদি একটা সতরঞ্চি পাতবার জায়গা করে দেন—

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গুণে নিলেন: এক দুই তিন চার—চারজন। তার উপরে তুমি। একুনে পাঁচ। পাঁচগাছি কুটো ফেল দিকি, মেজেয় পড়ে কি না। তুমি এর মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা গোটা মানুষ ঢোকাতে চাও।

আশিস সকাতরে বলে, এখন কায়ক্লেশে কোথাও বসতে পেলে সন্ধ্যে নাগাদ ঠিক জায়গা হয়ে যাবে। যাবেও তো চলে কেউ কেউ।

কে যাবে? কোন্ আহাম্মক আছে, এমন জায়গা ছেড়ে চলে যাবে?

জমাট কথাবার্তা দূর থেকে দেখে অশ্বিনীর ভরসা হয়েছে। বাঁশিকে উসকে দেন: যা না তুই দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়া। তুই গেলে তাড়াতাড়ি ফয়শালা হয়ে যাবে।

বাঁশি গেল। বৃদ্ধ কিন্তু তাকিয়েও দেখেন না, আগের কথার জের ধরে চলেছেন। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, এমন সুখ কোথা শুনি? পাকা-ঘরে আছি,

সিকিপয়সা বাড়িভাড়া দিইনে। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যায় দুনিয়া উৎসন্ন হয়ে যাক, আমাদের গায়ে একফোঁটা জল লাগবে না। তার উপরে মচ্ছব তো লেগেই আছে অহরহ। আজ অমুক বড়লোক খাওয়াচ্ছেন, কাল তমুক সেবা-সমিতি খাওয়াচ্ছে—প্রায় দিন উনুন জ্বালাতে হয় না। রাজা সীতারামের সুখ বলে থাকে—সে বোধহয় এই।

বাঁশি বলে ওঠে, তা হলেও চিরদিন তো থাকতে দেবে না স্টেশনে—

হটায় কে? রয়েছি তো ছ-মাসের উপর। গর্ব ভরে বৃদ্ধ বলেন, মাঝে মাঝে হুমকি দিয়ে পড়েঃ চলে যাও স্টেশন খালি করে দিয়ে। সরকারি লোক মানে হল রাজা, রাজবাক্যের উপর কথা বলতে নেই। ওরা বলে, উঠে যাও; আমরা বলি, যে আজ্ঞে। আবার এসে বলে, কই, গেলে না? বলি, যাব। ওরা বলে এই এক কথাই বলছ তো কদ্দিন ধরে। আমরা বলি, রাজপুরুষের কাছে দু-কথা বলি কেমন করে?

হি-হি-হি করে হাসতে হাসতে ধপাস করে তিনি শয্যায় গড়িয়ে পড়লেন। পুলকের আতিশয্যে অতি দ্রুত পা নাচাচ্ছেন।

আর একজন এদের ডাকছেন অদূরের ঘেরের মধ্য থেকেঃ জায়গা চাই তো আমার কাছে চলে এস। এই দিকে।

আশিস কাছে গিয়ে বলে, সামান্য একটু জায়গা নিয়ে তো আছেন—এর থেকে কী দেবেন, আর আপনার নিজের কী থাকবে?

বলতে গেলে গোটা পূব-বাংলা ঢুকে পড়েছে একখানা স্টেশনঘরে। ঘরখানা বড় অবিশ্যি, কিন্তু ঘর না হয়ে গড়ের মাঠ হলেও তো অকুলান পড়ত। 'যদি হয় সুজন তেঁতুলপাতায় দশজন'। তা তেঁতুলপাতার চেয়ে অনেক বড় এই জায়গা, আর দশের অনেক কম তোমরা আমরা—দুই সংসার মিলে। কেউ খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে আর কেউ অষ্টঅঙ্গ মেলে চিত হয়ে থাকবে—এটা হয় না। বিনি-পাপের দুঃখকষ্ট সকলের সমান ভাগ করে নেওয়া উচিত।

বর্ষীয়সী বিপুলকায়া মহিলাটি শুয়েছিলেন। তাঁকেই ঠেস দিয়ে বলা। তড়াক করে উঠে বসে মহিলা দু-চোখে অগ্নিবর্ষণ করছেন পুরুষটির দিকে।

কথাবার্তা কিছু কিছু সদাশিবের কানে ঢুকেছে। তিনি বলেন, ভদ্রলোক নিজে থেকে যখন বলছেন—শোওয়া না হোক, বসতে তো পারব আপাতত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, তুমি আর 'না' বোলো না বিরজা-দিদি।

বিরজা ক্রমাগত ঘাড় নাড়েন। ফিসফিস করে বলেন, না, কক্ষনো না, ভাল নয় ও-লোকটা।

বাঁশি বলে ভদ্রতা করে ডাকছে, সেই জন্যেই বুঝি খারাপ হয়ে গেল?

বিরজা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, ভদ্রতা না কচু। ডাকছে তোকে, নজর তোর দিকেই কেবল। সেটা সোজাসুজি বলে কি করে, তাই সবসুদ্ধ ডাকছে।

বাঁশি বলে, আরও তো একজনের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম পিসিমা। সে মানুষ আমল দিল না, তাকিয়েও দেখল না ভাল করে।

বিরজা বলেন, বুড়ো থুথুড়ে মানুষ—চোখেই হয়তো ভাল দেখে না। আর দেখ এই লোকটার কান্ড, গিলে খাচ্ছে যেন দুটো চোখ দিয়ে।

এদ্দিনে আমার কদর বুঝলে! বিরজার কথার ভঙ্গিতে বাঁশি হেসে ফেলেঃ সোনাটিকারিতে ঘরে পুরে রাখতে চাইতে পিসিমা। পাড়ায় এক পা বেরিয়েছি তো গালি দিয়ে ঝগড়া করে ভূত ভাগিয়ে দিতে। আজকে দেখ, আমারই জন্যে—আমায় বাইরে নিয়ে এসেছ বলেই সবসুদ্ধ হিল্লে হয়ে যাচ্ছে।

অতি সহজ ভাবে বাঁশি সেই মানুষটার মাদুরের প্রান্তে বসে পড়ে অন্য সকলকে ডাকছেঃ আসুন না মাস্টারমশায়। তোমরাও সব এস।

সেই বিপুলা মহিলা বলেন, মেয়ে একখানা বটে! উড়ে এসে জুড়ে বসল। আবার গুষ্ঠিসুদ্ধ ডাকাডাকি করে। আমরা তবে উঠে যাব নাকি?

বাঁশি বলে, রাগ কোরো না লক্ষ্মী মাসিমা। ট্রেনে সারা পথ আমরা বাদুড়ঝোলা হয়ে এসেছি। তোমরা সারারাত পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে। শুয়ে বসে বাত ধরে যাবে—যাও না, কলকাতা শহর দেখে এস একবারটি চক্কোর দিয়ে।

বলে বাঁশি টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল একটু আগে মহিলাটি যেখানে শুয়েছিলেন। রাগে গরগর করে মহিলা পাক মেরে উঠে দাঁড়ালেন।

বাঁশি বিরজাকে ডাকেঃ ও পিসিমা, শোবে নাকি? জায়গা রয়েছে আমার পাশে। বিরজা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

একটা রাত কোনক্রমে কাটল গুটিসুটি হয়ে। সকালবেলা বাঁশি আশিসকে বলে, জায়গা দেখ দাদা। এমন ভাবে থাকা যাবে না।

আশিস বলে, আহা, তুই বলে দিবি, তবে যেন আমি জায়গা দেখতে বেরুব!

কলকাতায় পা দিয়ে আশিস সত্যি একটা বেলাও জিরোয় নি। জায়গার জন্য কাল দুপুরে বেরিয়েছিল। আর একবার রাত-দুপুরে অনেক মানুষ সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে ভোর হবার একটু আগে।

বাঁশির কথায় বিরজা টিপ্পনী কেটে উঠলেনঃ তবু ভাল। নিজের সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান কিছু হয়েছে মেয়ের।

বাঁশি বলে, থাকা যাবে না—সে কথা ঠিক নয়। থাকলে কে রুখছে? কিন্তু থাকা বোধ হয় উচিত হবে না।

আশিস বলে, কেন বল দিকি?

ভাইয়ের একেবারে কাছে এসে গলা নামিয়ে বাঁশি হেসে হেসে বলে, দেখ, তাকিয়ে দেখ দাদা, সবগুলো নজর তোমার হতচ্ছাড়ী বোনটার দিকে। গরবে বুক ফুলে ওঠে না, সত্যি করে বল। এই যত লোক ভিড় করে আছে, মেরে তাড়ালেও কেউ নড়বে না যতক্ষণ আমরা আছি এখানে। কিন্তু আমি ভাবছি আরও পরের কথা। মুখে মুখে যত চাউর হবে, দলে দলে আরও সব এসে জুটবে। কাজকর্ম অচল হবে স্টেশনের। তেমনি অবস্থা হবার আগে সরে পড়া উচিত। দশের উপরে কর্তব্য আছে তো একটা।

॥ নয় ॥

কত দূর-দূরান্তর থেকে কত খাল-নদী মাঠ-গ্রাম পার হয়ে এসে পড়লাম গো তোমাদের রাজ্যে। ঠাঁই দাও অতিথিদের। জায়গা-জমি কসাড় জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, শিয়াল বনবিড়াল হায়েনা থাকে। জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে ঘর বেঁধে সেইখানে একটু মাথা গুঁজে থাকব।

কিন্তু কাকুতিমিনতি যতই কর, কেউ কানে নেবে না। এক মানুষের দুঃখে অন্য মানুষ নির্বিকার, এধাই সাধারণ নিয়ম। ঈশ্বরের ধরিত্রী পড়ে আছে, খুঁজেপেতে তার উপরে বসত গড়ে নাও। স্টেশনে শুয়ে পা নাচিয়ে কিছু হবে না। পুরুষসিংহ হবে, লক্ষ্মী তবেই লুটিয়ে এসে পড়বেন।

বেরিয়ে পড়ে আশিষ জায়গাজমি খুঁজতে। শুধুমাত্র নিজের বাড়ির কয়েকটি নয় যত লোক তার সঙ্গে এসেছে সকলের স্থিতি করে দেবার দায়িত্বভার যেন তারই উপরে।

বেরোবার সময় জোয়ানমদ্দা যত আছে সকলকে ডেকে নেয় : চলে আসুন আমার সঙ্গে। রাতের ঘুম বন্ধ করুন যতদিন না ঘরবসত হচ্ছে।

দিনমানে এর মুখে তার মুখে জায়গার খবরাখবর আসে। রাত্রিবেলা দেখতে বেরোয় দশজনের বিশজনের এক একটি দল হয়ে। মিউনিসিপ্যালিটি-এলাকায় মধ্যে সুবিধা হবে না, তার আশেপাশে। বড়লোকে অনেক জায়গা নিয়ে রেখেছে। নালা-ডোবা-জঙ্গলে ভরতি—সাপ-শিয়ালের আস্তানা। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে স্ফূর্তি বেড়েছে খুব—দাঁও মতো বিক্রি করে মোটা মুনাফা পিটবে এবার। দাঁড়াও না চাঁদ, স্ফূর্তি বের করছি তোমাদের!

মরীয়া হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। কলোনি গড়বে, জায়গা চাই। ঘুরতে ঘুরতে নাজেহাল। পছন্দসই জায়গা কোথাও মেলে না। আগে যারা এসেছে, ভাল জায়গা-জমি তারাই সব দখল করে নিয়েছে। সমস্ত রাত অবিরাম ঘুরে ঘুরে ভোরবেলা রাস্তায়-আলো নেভানোর আগে স্টেশনে নিজ নিজ ডেরায় ফিরে আসে। এসে মড়ার মতো ঘুম। ঠিক দুপুরে মীটিং বসে : কী করা যায়! বেশি বাছাবাছি করতে গেলে হবে না, কোন একখানে উঠে পড়। কেষ্টপুরের খাল পার হয়ে একটা চৌরস জায়গা, এদিক-সেদিক কতকগুলো তালগাছ ও কয়েকটা ডোবা, লাগোয়া একটা ধানক্ষেত আছে। জায়গাটা নিতান্ত মন্দ নয়। ধানক্ষেতে পুকুর কেটে মাটি তুলে উঁচু করে নিতে হবে বর্ষার আগে। শহরের এত কাছে এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথায় আর পাচ্ছ? খোঁজা-খুঁজি হল তো বিস্তর।

দলবল নিয়ে আশিস অতএব আনুষঙ্গিক কাজকর্মে লেগে পড়ল। দিনমানেও এখন তারা স্টেশনে থাকে না। জানাশোনা আলাদা এক কলোনিতে দিবারাত্রি কাজ চলছে। নতুন কলোনি গড়ার কাজ। বাঁশ-খড় কিনে এনে একসঙ্গে অমন বিশখানা ঘরের চাল বানাচ্ছে, চাল ছেয়েও ফেলেছে ভুঁয়ের উপর রেখে। বেড়া বাঁধছে চেরা-বাঁশের। সাইজ মতো খুঁটি কেটে কেটে স্তূপাকার করছে। এই সমস্ত তৈরি হয়ে রইল। তারপর শুভদিন দেখে—দিনমানে নয়, রাত্রিবেলা মরদেরা চাল-খুঁটি-বেড়া ঘাড়ে করে এনে ফেলবে সেই পছন্দ করা জায়গায়। কার ঘর কোনখানে, নক্সা বানিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে আগে থেকে। তখন আর তিলার্ধ দেরি নয়, গর্ত খুঁড়ে টপাটপ খুঁটি পুঁতে ফেল। চাল উঠে যাক খুঁটির উপরে, বেড়া তুলে দেওয়া হোক চতুর্দিক। দেখতে দেখতে পরিপাটি ঘর। খবর পেয়ে পরের দিন জমির মালিক হন্তদন্ত হয়ে আসবে, এসে কপাল চাপড়াবে। পাড়া বসে গেছে রাতারাতি। ঘর নিকানো হচ্ছে, বাচ্চা ছেলেপুলে কাঁদছে, উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়েছে কোন বাড়ি, বাসন মাজছে কোন বউ কোন এক ঘাটে গিয়ে, খুঁটি টেসান দিয়ে গৃহকর্তা তামাক খাচ্ছে কোথাও। ঠিক যেমনটি হতে হয়। মালিক মশায় এসে হয়তো কোন প্রশ্ন করলেন। শান্তিভঙ্গে বিরক্ত হয়ে গৃহকর্তা খিঁচিয়ে ওঠে তাঁর উপর : আরে মশায়, আছি তো কতকাল ধরে এখানে, আপনি কি আজ নতুন দেখছেন? ফ্যাচ-ফ্যাচ করবেন না, আর কোন কাজ থাকে তো তাই করুনগে। মুখ ভোঁতা করে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া মালিকের তখন উপায় থাকে না।

সেই দিন আসছে, দেরী নেই। আয়োজন প্রায় সারা। দিন সাতেক কেটেছে ইতিমধ্যে। এমনি অবস্থায় এক সকালবেলা বিনয় হঠাৎ স্টেশনে এসে উপস্থিত। চমকে গেল আজব ব্যাপার দেখে—পল্লীগ্রামের নতুন-বউয়ের মতো বাঁশির মাথায় কাপড়। দশ ইঞ্চির উপর ঘোমটা। বিনয়কে দেখতে পেয়ে চক্ষের পলকে বাঁশি ঘোমটা নামিয়ে

দিল। কণ্ঠে বলে, কী আশ্চর্য, বিনয়-দা এসে পড়েছে। আমরা যে এখানে, টের পেলে কেমন করে বিনয়-দা ?

কী ব্যাকুল আগ্রহ কণ্ঠের স্বরে। বিনয়ের অন্তত তাই মনে হল। বিনয় আজ যেন অকূল-সাগরে আলোকস্তম্ভ। সাত সাতটা দিন কেটে গেছে স্টেশনের হাটের মধ্যে। নতুন কলোনি হবে, সেইখানে উঠতে হবে এবার গিয়ে। সে হয়তো আরও খারাপ জায়গা, পাশাপাশি যাদের সঙ্গে থাকবে, তারা হয়তো আরও ইতর। বাঁশির মুখের তেজ ঠিকই আছে, মনে মনে ঘাবড়ে যাচ্ছে।

এমনি সময় বিনয়।

সদাশিব অশ্বিনী আর বিরজার পায়ের ধুলো নিল বিনয়। অশ্বিনী বলেন, টের পেলে কেমন করে আমরা কলকাতায় এসেছি, এসে এই স্টেশনে পড়ে আছি ?

বাবা চিঠি লিখেছেন। সোনাটিকারি ছেড়ে আপনারা চলে এলেন—খোঁজ নিয়ে যতদূর সাধ্য দেখাশুনো করতে লিখেছেন আমায়। উঠেছেন কোথা, জানা নেই। স্টেশনে এলাম—আমাদের অঞ্চলের কেউ না কেউ নিশ্চয় আছেন, তাঁদের কাছে খবর পাওয়া যাবে। বুদ্ধি করে এসে ভালই হল, আপনাদের পেয়ে গেলাম।

অশ্বিনী লজ্জা পাচ্ছেন। মামুলি দুটো-একটা কথার বেশি বলতে পারেন না। জিভ আটকে যায়। সোনাটিকারি ছেড়ে হরিবিলাসকে মাইল পাঁচেক দূরে জামাইয়ের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। সেই জায়গায় থেকেও তিনি পুরানো মনিবের খোঁজ রাখেন। এত কান্ডের পরেও ছেলেকে খোঁজখবর নিয়ে দেখাশোনা করবার জন্য চিঠি লিখেছেন।

বিরজা কিন্তু ভাল মনে নিতে পারছেন না। ফিসফিস করে বলেন, ছোঁড়া এই অবধি ধাওয়া করে এসেছে। কেন এসেছে বল দিকি ?

অশ্বিনী বলেন কেন ?

বাপের চাকরি খেয়েছ, তাই ধর্ম দেখতে এসেছে। সোনাটিকারির মেজরাজা ভিখারির বেহদ্দ হয়ে স্টেশনে বসেছে, দুচোখ ভরে মনের সাধে দেখে নিচ্ছে।

সেই কথা বাঁশির কানে গিয়ে থাকবে। বিনয়কে বলে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ কি বিনয়-দা ?

বিনয় থতমত খেয়ে বলে কেমন আছ বাঁশি ?

দিব্যি আছি। আগের চেয়ে আরও অনেক ভাল। রাজবাড়ির ছাত উঁচু বলতে তোমরা, কিন্তু উপরমুখো তাকিয়ে দেখ—সে কি এই শিয়ালদা স্টেশনের মতো ? রাজবাড়ির বড় বড় ঘর, তা হলেও কি স্টেশনের মতো বড় ? মানুষ এক সময়ে কিলবিল করত রাজবাড়ি—

চতুর্দিকে আঙুল ঘুরিয়ে বাঁশি বলে, তবু কি এত মানুষ ? দেখ কি বিনয়-দা, রাজবাড়ির ভাগ্যবতী রাজকন্যা—ঘরবাড়ি বিসর্জন দিয়ে আরও বড় জায়গায় এসে উঠেছি। এখান থেকে এবারে না জানি কোথায়—এত উঁচু ঘরে যার ছাত হল আকাশ, এমন বড় জায়গায় বেড়া দিয়ে যাতে গন্ডি ঘেরা নেই—

সেই বৃহৎ প্রত্যাশার আনন্দে বাঁশি খিলখিল করে হেসে উঠল, কথা আর শেষ হল না।

হাসি দেখে বিনয়ের চোখে জল আসবার মতো। কিছু সামলে নিয়ে বাঁশি আবার বলছে, বনেদি বাড়ির মেয়েরা অন্দরে থেকে ইতরজনকে মুখ দেখায় না। স্টেশন জায়গায় অন্দর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তবু কিন্তু আমি মুখ ঢেকে বেড়াচ্ছি বিনয়-দা।

তুমি ইতরজন নও—বড়মানুষ এখন, শহুরে মানুষ। তোমায় দেখেই মুখ খুলে ফেলেছি।

বিনয় বলে, সত্যি, তাজ্জব দেখলাম বাঁশি, তোমার মাথায় ঘোমটা।

ঐ যে বললাম—বনেদিয়ানা। তোমার কাছে বলতে কি—বনেদিয়ানার উপরে আরো কিছু আছে—পরোপকার। লোকের বিপদ দেখে আমার কষ্ট হয়। আমার পানে না চেয়ে থাকতে পারে—হাঁটে আর আড়চোখে ফিরে ফিরে তাকায়। আর হোঁচট খেয়ে পড়ে। গাড়িই ফেল করে কত জন, বউ সঙ্গে থাকলে খিঁচুনি খায়।

আবার এক চোট হাসি। সহসা গম্ভীর হয়ে বাঁশি বলে, আমার মাথার ঘোমটা দেখেই তাজ্জব হলে বিনয়-দা? কত তাজ্জব আজ চোখের সামনে। রাজবাড়ির মানুষ শিয়ালদা স্টেশনে সতরঞ্চি বিছিয়ে আস্তানা নিয়েছে। আমরা একা নই—ঐ যে আরও সব কত—যাদের আমরা চিনিনে জানিনে। উঁচুতলার মানুষেরা ভিখারির সঙ্গে লাইন দিয়ে আছে। এদেশে নাকি বিপ্লব হয়নি, চুপিসাড়ে শান্তির মধ্যে স্বাধীনতা এসে গেল। কিন্তু রক্তপাতেই যদি বিপ্লবের বিচার, সেদিক দিয়েও তো কম যাইনে আমরা। দেশের পুব আর পশ্চিমে যত রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে, কোনদিন তার মাপ হবে কিনা জানিনে।

সদাশিব নিঃশব্দে শুনছেন, একটি কথাও বলেননি এতক্ষণের মধ্যে। হাতের ইঙ্গিতে বিনয়কে ডেকে একটু দূরে নিয়ে যান। বললেন, বিনয়, উপায় করতে পারিস তো নিয়ে যা এখান থেকে কোথাও। নরককুন্ড থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যা। আজকে পারিস তো কাল অবধি দেরি করিসনে। সেকেলে মানুষ বিরজা-দিদি ঘোমটা দিয়ে থাকেন, সেটা কিছু নতুন নয়। আজ ক'দিন বাঁশি ঘোমটা দিচ্ছে, না দিয়ে উপায় নেই বলে। পুরুষেরও ঘোমটা দেওয়ার রেওয়াজ থাকলে ভাল হত, ঘোমটা দিয়ে মেজরাজা রক্ষা পেয়ে যেত। সর্বদা ভয়, পাছে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পরশুদিন তাই হতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ঘোরাল, ভাল চিনতে পারেনি তাই। বলপে বলতে যাচ্ছে, সোনাটিকারির মেজরাজা নয়? আর একজন বলছে, মেজরাজা যেদিন এখানে আসাব, কলি উলটে যাবে সেদিন।

নিশ্বাস ফেলে বলেন, কলি সত্যিই উলটেছে বাবা। বাঁশি তোমায় সেই কথাই বলছিল, এই ক'দিনে এখানে তাই চোখের উপর দেখছি আগেকার সঙ্গে কিছু আর মিলছে না।

থেমে গেলেন সদাশিব। তারপর গলা আরও নামিয়ে অকারণে এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, মেজরাজা তোকে কিছু বলবে না। বলার মুখ নেই তার। কিন্তু এই হাটের মধ্যে ঘোমটা দিয়ে আর মুখ আড়াল করে কতদিন কাটানো যায়? এদের এই দুর্দিনে তোর কিছু কর্তব্য আছে কিনা, দেখ ভেবে বিনয়।

বিনয় সহসা জবাব দিতে পারে না। রাত্রিবেলা খেটেখুটে এসে আশিস ঘুমচ্ছিল বিভোর হয়ে। চোখ মুছতে মুছতে সে উঠে পড়ে এইবার। বিনয় আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে বসল। অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, স্টেশনে এমনভাবে থাকা চলবে না আশিস-দা।

আশিস অসহিষ্ণুভাবে বলে, থাকছে কে। তিনটে কি চারটে দিন বড় জোর। সোম-মঙ্গলবার নাগাত এাস দেখবে, নেই আমরা। আমাদের তল্লাটের এই যত জনকে দেখছ, সবসুদ্ধ চলে যাব।

বিনয় বলে, সোম-মঙ্গলবারে আমি আসতে যাব না। এই একবার যা এসে

পড়েছি—দায়ে না পড়লে কোনদিনই এদিকে আসব না হতভাগা মানুষদের দুর্গতি দেখতে। তিন-চার দিন পরে যেখানে যাবার চলে যেও। কিন্তু এ জায়গায় তিলার্ধকাল আর নয়। আপাতত আমার সঙ্গে যাবে। যেতেই হবে।

অশ্বিনীর দিকে চেয়ে বলে, না নিয়ে আমি নড়ব না জেঠাবাবু। আপনার আর পিসিমার পা জড়িয়ে ধরব।

সদাশিব খুশি হয়ে বলেন, তোর বাসায় নিয়ে যাবি? শুনেছি বড় জায়গা। এত জনকে নিয়ে অসুবিধা হবে না তো রে?

বিনয় বলে, থাকবার দিক দিয়ে যদি বলেন, মানুষ বেশি হলে অসুবিধা নেই। পাকাপাকি জায়গা আশিস-দা ঠিক করে ফেলেছেন—মাঝের তিন-চারটে দিন শুধু। এই ক'দিনের ব্যবস্থা যে ভাবে হোক করতে হবে। তা ছাড়া উপায় কোথায়?

ঘোড়ার-গাড়ি ঠিক করল। যে ক'টা জিনিষ বর্ডার পার হয়ে পেঁচেছে, গাড়ির ছাতের উপর তুলে দিল। বিনয় বসল কোচোয়ানের পাশে কোচবাক্সের উপর। ভিতরে চারজন। আশিস এখন যাবে না—কাজ অনেক। অঞ্চলের মানুষ নিয়ে ভাবনা তার, শুধু নিজের বাড়ির এই কটিকে দেখলে হবে না। বিনয় ঠিকানা রেখে গেল, সন্ধ্যায় গিয়ে একবার দেখে আসবে। সোনাটিকারির সবচেয়ে বনেদি বাড়ির যাবতীয় মানুষ ও জিনিসপত্র একখানা থার্ডক্লাস গাড়ি বোঝাই হয়ে চলল।

॥ দশ ॥

সিংহওয়ালা বিশাল ফটক পার হয়ে ঘোড়ার-গাড়ি ভিতরে ঢুকল। চোখ বড় বড় হয়ে যায় সকলের। এমনি জায়গায় থাকে! সত্যি, আঙুল ফুলে কলাগাছ তো নয়—শালগাছ। ঝিলের পুল পার হয়ে বড়পুকুর-ঘাটের পাশে পাকাবাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ায়। জিনিসপত্র নামিয়ে কোচোয়ানের সঙ্গে ধরাধরি করে বিনয় বারান্দার উপর নামিয়ে রাখছে।

বাঁশি বলে, এত বড় বাসা তোমার বিনয়-দা?

সে কথার জবাব না দিয়ে বিনয় বলে, চাবি এনে ঘর খুলে দিচ্ছি। বারান্দায় উঠে বস ততক্ষণ।

চাবি আনতে যাবে—এসব ঘরে তুমি থাক না বুঝি বিনয়-দা?

বিনয় বলে, একতলার খুপরিঘরে চিরকাল মানুষ, এখানে ঘুম হবে কেন? সব মনিবই বোঝেন সেটা ভাল রকম।

ঠেসটুকু তাদের উপরেও। রাজবাড়িতে কর্মচারীদের জন্য পায়রার খোপের ব্যবস্থাই ছিল। কথাটাও বিশেষ করে যেন বাঁশিকেই বলা।—একতলার খুপরিঘরের খোঁটা একদিন সে-ই দিয়েছিল। কিন্তু আজ সেসব গায়ে মাখার দিন নয়। চাবি আনতে বিনয় চলেছে তো বাঁশিও তার পিছন ধরে চলল।

আমরা কেন তোমার ঐখানে গিয়ে থাকি না। সকলে একসঙ্গে। আলাদা করে দেবার মানেটা কি? চল, দেখে আসি কেমন সে জায়গাটা তোমার।

বিনয় বলে, ভাল জায়গা। সবুজ লতাকুঞ্জ, রকমারি ফুল ফুটে আছে—

একটুখানি হেসে বলে, আমার বাসাবাড়ি দেখে পদ্য লেখা যায় খুব। তবে থাকতে কষ্ট। বৃষ্টির ফোঁটা বাইরে পড়তে না পড়তে টিনের চালের ফুটো দিয়ে টপটপ করে ঘরে পড়বে। পড়তেই থাকবে, বৃষ্টি ধরে গেলেও পড়বে—থামাথামি নেই। বোশেখমাসে তোমাদের তুলসীমঞ্চে জলের ঝারা দিত, ঠিক সেই রকম।

বাঁশি বলে, বর্ষাকাল নয়, বৃষ্টির ভয় কিসের অত ? বৃষ্টি হলেই বা কি, ভিজতে তো মজা।

বিনয়ের টিনের ঘরের বাসায় বাঁশি ঘুরে ঘুরে দেখল অনেকক্ষণ। কেমন দেখছ ?

বাঁশি বলে, সামনেটা এমন সুন্দর লতায় পাতায় ঘেরা। যেন চিনির কোটিং-দেওয়া কুইনাইন-পিল।

থাকবে এখানে ?

বাঁশি ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ভয় করি নাকি ? ভয় জয় করেছি। শিয়ালদা স্টেশনে থেকে এসেছি—তার উপর কি চাও! দেখ, গরিবানা নিয়ে বড্ড অহংকার তোমার বিনয়-দা। তবু যদি স্টেশনের উপর ঘরবসত করতে একটা দিন! সাত সাতটা দিন আমরা তাই করে এলাম। গরিবানায় আর তুমি টক্কর দিয়ে পারবে না।

চাবি নিয়ে এসে বিনয় পাকাবাড়ির দোর খুলে দিল।

বাঁশি তখন সকলের কাছে বিনয়ের বাসার বর্ণনা দিচ্ছে। সমস্ত শুনে সদাশিব চিন্তিত ভাবে বললেন, মনিবকে না জানিয়ে ঘর তো খুলে দিচ্ছিস বিনয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল, তোর কোন ক্ষতি হবে কি না। মনিব কিছু বলবে না তোকে ? তিন-চারটে দিনের ব্যাপার মোটে—তোর ওখানেই যা-হোক করে মাথা গুঁজে থাকা যেত।

বাঁশি ঐ সঙ্গে জুড়ে দেয় ঃ শিয়ালদা স্টেশনে বসত করে এসেছি। আগুনের মধ্যে থাকলেও আর পুড়ব না, সাগরের নিচে রাখলেও ডুবব না। আমাদের সোনাটিকারির রাজত্বের কথা তুমি কিছুতে যে ভুলতে পারছ না বিনয়-দা।

বিনয় শোনে না। পাকাঘরের ভিতর জিনিসপত্র নিয়ে ঢোকাল। বলে, ভাবনা করবেন না মাস্টারমশায়। যখন প্রেসটা ছিল, রঞ্জিত রায় মাসে একবার দু-বার আসতেন। এখন দু-মাসেও একবার আসেন না। পাটনা ঝরিয়া আর কলকাতা করছেন, স্থির হয়ে থাকেন না মোটে। টেরই পাবেন না যে আপনারা এসে ক'দিন থেকে গেছেন।

সদাশিব তর্ক করেন ঃ আসেন না ঠিক কথা। কিন্তু গেরোর কথা বলা যায় না—দৈবাৎ ধর, আজকেই এসে পড়লেন। এসে দেখলেন, অনধিকার-প্রবেশ করে আছি—

দেখলে কী হবে ? বুঝিয়ে দেব, বিপদে পড়ে এসেছেন, পাকা হয়ে থাকতে আসেননি। ঘর যেমন ছিল তেমনিই তো খালি পড়ে থাকবে চারটে-পাঁচটা দিনের পর।

ভয়-দেখানো কথায় বিনয় কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করে না। বলছে, আপনি স্নেহ করেন বলে অতটা ভয় পাচ্ছেন মাস্টারমশায়। রঞ্জিত রায় সুনজরে দেখেন আমায়। আগে আরও বেশি দেখতেন। কিন্তু আমি মস্তবড় অন্যায় করেছি। যে অন্যায় কাজের জন্য আমার বাবার অত দিনের পুরানো চাকরি গেল, আমিও তাই করেছি বাধ্য হয়ে। মনিবকে গিয়ে সমস্ত খুলে বললাম। তবু বহাল রেখেছেন তিনি আমায়। আগের মাইনে বজায় রেখেছেন। মানুষটি বড় উদার—ক'জনে এমন করে বলুন! সংকোচ করবেন না মাস্টারমশায়। ক'দিনের অতিথ হয়ে আমার বাসার টিনের ঘরে অত কষ্ট করে থাকবেন—মন আমার কিছুতে সায় দিচ্ছে না।

অগত্যা সদাশিব রাজি হলেন ঃ হোক তবে তাই। বাঁশিকে সাবধান করে দিচ্ছেন, এবং বাঁশির নাম করে সকলকেই ঃ এই চারটে দিন সামনের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ সব ঘরের মধ্যে কাটাবি। নেচেকুঁদে বেড়াবিনে। কেউ বুঝতে না পারে, ভিতরে লোক এসে রয়েছে। সেটা বিনয়ের ক্ষতির কারণ হবে।

আশিস ঠিকানা নিয়ে নিয়েছিল বিনয়ের কাছ থেকে, সন্ধ্যার পর দেখতে এল। একলা নয়—সঙ্গে জন চারেক। নতুন যে কলোনি গড়া হচ্ছে—এরা সকলে মাতব্বর। জায়গা পছন্দ থেকে শুরু করে যাবতীয় বন্দোবস্ত এরাই সব করেছে।

বাঃ, বেড়ে বাগান তো! গোটা রাজ্য জুড়ে বাগান বানিয়ে রেখেছে। খরচা করে ডাঙায় উপরে খাল কেটে সেই খালের উপরে আবার পুল। শখ বটে বাবা!

সাবেক কর্তাদের শখের পরিচয় বাগানবাড়ির সর্বত্র। ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে, আর হাসে খিল-খিল করে। একটি ছেলে নীরেন। সে বলে, পয়সা থাকলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করে। পয়সার অনটনে আসল বাপের মাথা গুঁজবার একটুকু ঠাঁই জোটানো যায় না।

আশিস বলে, আমার বাবার কিন্তু দিব্যি ঠাঁই মিলেছে। কি বল হে? এমন সুন্দর ঘরবাড়ি, কে ভাবতে পেরেছে! আমরাও বড়মানুষ ছিলাম, রাজবাড়ির বিস্তর নামডাক। তা বলে এবাড়ির কাছে লাগে না। পাড়াগাঁয়ে ভাবাই যায় না এমনটা।

এরই মধ্যে বাঁশি একটু চা করেছে আশিস ও তার বন্ধু ক'টির জন্য। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আশিস হাসিমুখে বিরজাকে বলে, একবার যখন উঠে পড়েছ, এইখানে চেপে বসে থাক পিসিমা। নড়াচড়ার কী দরকার! আমরা যে জায়গা দেখছি, সে এক তেপান্তরের মাঠ। গোটা দুই-তিন ডোবা এখানে-ওখানে, একহাত দেড়হাত জল। এমন তকতকে পুকুর পাবে না—চানের পুকুর নতুন করে কেটে নিতে হবে। খাবার জল আনতে হবে মাইল-খানেক দূরে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে।

সদাশিব শুনতে পেয়ে জিভ কেটে বলেন, খবরদার, খবরদার! অমন কথা ভুলেও জিভের ডগায় আনবিনে আশিস। হরিবিলাস খাজাঞ্চিকে নিয়ে তোরা কি করলি, তার ছেলে বিনয় কী রকম শোধটা দিল, তুলনা করে দেখ। যাঁদের এই ঘরবাড়ি, তাঁদের সম্পূর্ণ গোপন করে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। কত বড় ঝুঁকি নিয়েছে—সে না বললেও বুঝতে পারি। স্টেশনে আমাদের দশা দেখে থাকতে পারেনি—নিয়ে এসে তুলল এখানে। ছোঁড়াটা পড়াশুনোয় অঘা ছিল, কিন্তু বড্ড সহৃদয়। আমাদের জন্যে তার কোন ক্ষতি হলে সেটা বিষম অন্যায় হবে।

অশ্বিনী বলেন, শিব-দাদা, নাম তোমার সদাশিব, মানুষটাও ঠিক তাই। মনের মধ্যে এতটুকু ঘোরপ্যাঁচ নেই—বুড়ো হয়েছ তবু একেবারে শিশু। শুচিবেয়ে মানুষ দিদি, দিনের মধ্যে অমন দশবার চান করেন। আশিস তাই নিয়ে তামাসা করল, তুমি একেবারে বেদবাক্য বলে ধরে নিলে।

তারপরে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কাজের কত আর বাকি?

সেই নীরেন ছেলেটি বলে, পাঁচ-ছ'খানা চালা বাঁধতে বাকি, আর সব হয়ে গেছে। রবিবারে গৃহপ্রবেশের ভাল দিন—ওর মধ্যে শেষ করে ফেলব। প্রথম মহড়ায় কুড়ি ঘর গৃহস্থ—ক্রমে আরও সব যাবে।

বিরজা বলেন, ভাবতে গেলে বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে বাবা। চোরের মতন রাত-বিরেতে পরের জায়গায় গিয়ে ওঠা—কোন অঘটন ঘটে না জানি।

আশিস ভরসা দিয়ে বলে, এই কাজ শুধু আমরাই করছিনে পিসিমা। যেখানে যত পোড়ো-জায়গা ছিল, দেখতে দেখতে ভর্তি হয়ে গেল। কলোনিতে কলোনিতে ছয়লাপ। ঘরদোর বেঁধে নির্ঝঞ্ঝাটে সবাই সংসার করছে, আমাদেরই বা অঘটন ঘটতে যাবে কেন?

নীরেন এতক্ষণ ফুঁসছিল বুঝি মনে মনে। সদাশিবকে লক্ষ্য করে বলে, আপনি

মাস্টারমশায় ন্যায়-অন্যায়ের কথা তুললেন। লাখ লাখ মানুষের উপর কত বড় অন্যায় হল, তার কোন বিচারটা হয়েছে বলুন। নিরীহ তুচ্ছ অতি-সাধারণ গৃহস্থমানুষ, রাজনীতির ঘোরপঁ্যাচ কিছু বোঝে না—রাতারাতি পথের ভিখারি হতে হল তাদের। না রইল টাকাপয়সা, না রইল মানইজ্জত। প্রাণটুকু হাতে করে যে অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিল, সেখানকার মানুষও ভাল চোখে দেখে না। সকলের আপদ-বালাই। বলে, মহাভারতের ঘটোৎকচ—নিজেরা তো মরবেই; মরবার মুখে আমাদেরও চাপা দিয়ে মারবে, সেই মতলবে এসেছে।

বলতে বলতে যেন আগুন ধরে যায় তার কণ্ঠে। বলে, মাস্টার-মশায়, আদর্শবাদী মহাপ্রাণ মানুষ আপনি। বলুন দেখি, কোন দোষে দোষী ঐ মানুষগুলো, রেলস্টেশনে মাঠে জঙ্গলে পথের ধারে পড়ে পড়ে যারা মরছে? বিচার চাচ্ছি আমরা। আকাশের আড়ালে ভগবান ফুরসত মতো কোন-একদিন বিচার করে দেবেন, অতদিন সবুর সইবে না। মাথার উপরের মুরুব্বি মানুষেরা আপন আপন মুনাফা কুড়িয়ে তুলতে ব্যস্ত। বিচারের ভার তাই নিজেরাই সাধ্যমত নিয়ে নিচ্ছি।

নীরেনের উত্তেজনায় আশিস হেসে ফেলে। বলে, যেমন ভাবে বলছে, অত ভয়ানক কিছু নয়। বড়লোকে জমি নিয়ে জঙ্গল করে রেখেছে কোন-একদিন দাঁও মারবে এই আশায়। সেইখানে গিয়ে আমরা টপাটপ ঘর তুলে নিচ্ছি। দাম যে একেবারে দেব না, এমন কথা বলিনে। ন্যায্য দাম ধীরেসুস্থে দেব—হাতে যখন টাকাকড়ি আসবে। বলুন, অন্যায়? ভগবান কি সত্যি সত্যি পৃথিবীর জমাজমি বাটোয়ারা করে দিয়েছেন ভাগ্যবান কয়েকটির মধ্যে? তাঁরা ভোগ করবেন অথবা ফেলে ছড়িয়ে রাখবেন—বাকি সকলের খোলা আকাশের নিচে, তারা দেখতে দেখতে মরাই নিয়তি?

এত সমস্ত ভারী ভারী কথার মধ্যে বিরাজ বলে উঠলেন, সেই কথা রইল তবে। রবিবার রাত্রে তোরা আসছিস, আমরা গোছ-গাছ করে থাকব। খুব বেশি রাত্তির হবে নাকি?

আশিস বলে, সাড়ে-দশটার পর নীরেন পাঁজি দেখেছে, ভাল সময় পড়বে তখন।

নীরেন হেসে সঙ্গে সঙ্গে বলে, পাঁজি দেখে তিথির হিসেব করেছি। চাঁদ ডুবে অন্ধকার হবে তখন। চোরেদের পক্ষে ভাল সময়।

॥ এগারো ॥

রবিবার রাত্রিবেলা বাগানবাড়ি ছেড়ে এঁরা চলে যাবেন। বিনয় সেই সময়টা থাকতে পারছে না। মনিববাড়ি উৎসব। রঞ্জিত রায়ের বড় মেয়ে ইলু সোনার মেডেল পেয়েছে কোন এক প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখে। তার উপরে কলিয়ারি সংক্রান্ত একটা মামলায় জিত হয়েছে। রঞ্জিত রায়কে সবাই ধরে পড়ল, দু-দুটো আনন্দের ব্যাপার—একদিন খাওয়াদাওয়া হোক সার। মামলার জিত কিছুই না—নিচের কোর্টে জিত হল কি হার হল, তাতে কোন মীমাংসা হবে না। কিন্তু মা-মরা মেয়ে ইলু নিজের গুণে মেডেল অর্জন করল, এ জিনিস দশজনের কাছে বুক ফুলিয়ে বলার মতোই বটে। হোক তাই, সকলে যখন বলছেন। তারিখটা ঐ রবিবারেই ফেলেছেন। এবং এমনি ব্যাপারে বিনয়ের উপর অনেক দায়ঝক্কি এসে পড়ে, বাজার করা থেকে শুরু করে তাকেই সমস্ত দেখতে হয়। রবিবার সকাল থেকে সে ভবানীপুরের বাড়ি পড়ে আছে। কাজকর্ম শেষ হতে অনেক রাত্রি হল, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে তখন। বৈঠকখানার একটা ইজিচেয়ারের উপর চোখ বুজে পড়ে রাতটুকু সে কাটিয়ে দিল।

ভোরবেলা বিনয় বেরিয়ে পড়ে। মনিববাড়ি আটক পড়ে বাঁশিদের চলে যাবার সময়টা দেখা হল না। কলোনি যেখানে গড়ছে, তার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। তাহলেও জায়গাটার বর্ণনা শুনে নিয়েছে ভাল করে—লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে পোঁছানো যাবে। তাই করবে—কেটে যাক এখন ক'দিন, খানিকটা ও'রা গোছগাছ করে নিন। আসছে রবিবার গিয়ে দেখাশোনা করে আসবে।

ফটকের বাইরে রঘুমণির পান-বিড়ি-চায়ের দোকানে। রঞ্জিত রায়ের স্ত্রী জয়ন্তী দেবী তখন বেঁচে, বাগানের উপর ঝোঁক পড়েছিল তাঁর—সেই আমলে রঘুমণি রাউত মালি হয়ে আসে বাগানবাড়িতে। তিনি মারা যাবার পরে বাগানের শ্রী-ছাঁদ রইল না, একের পর এক ব্যবসার পত্তন হতে লাগল এখানে। মালির কাজ ছেড়ে দিয়ে রঘুমণি ফটকের বাইরে দোকান করে বসল। স্বাধীন ব্যবসা তারও। লোকজন এদিকে কম, দোকান ভাল চলে না। কিন্তু বুড়ো বয়সে রঘুমণি নতুন কোন কাজ ধরবে! বিনয়ের সঙ্গে খাওয়াটা একরকম মুফতে চলে যাচ্ছে—আছে পড়ে তাই দোকানটা নিয়ে। তবে ভরসা দেখা দিয়েছে—ওপারের ডেভিড বিস্কুট-ফ্যাক্টরি। কারখানা চালু হয়ে গেলে অঞ্চল জমজমাট হবে। জমে যাবে তখন রঘুমণির দোকান।

ফটকে ঢোকবার সময় একটুখানি ঘুরে গিয়ে বিনয় রঘুমণিকে জিজ্ঞাসা করে, চলে গেছেন ও'রা সব? ঘরের চাবি তোমার কাছে দিয়ে যেতে বলেছিলাম।

বিড়ালের মতন রঘুমণি ফ্যাঁচ করে ওঠে: হুঁ, যাচ্ছে চলে! যাবার জন্যে এসেছে কিনা! মেলা জমিয়ে বসেছে দেখুনগে যান। শয়তানগুলোকে ঢুকতে দিয়েছেন, উল্টে আপনাকেই তাড়িয়ে তুলবে। বড়বাবু এসে দেখলে ধুন্দুমার বাধবে।

বিনয় আর দাঁড়ায় না। হনহন করে ভিতরে চলল। কী ব্যাপার, রঘুমণির কথায় কিছু বোঝা যায় না। কোন কারণে বাঁশিদের যাওয়া হয়নি। কথাটা বাবুদের কানে উঠলে বিনয়ের ক্ষতি হবে, রঘুমণি সেজন্য ক্ষেপে রয়েছে এখন।

ঝিলের পুলের উপর দাঁড়িয়ে বিনয় নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারে না। পাকাবাড়ির এদিকে-সেদিকে চালাঘর। নতুন ছাউনি, নতুন ডোয়াপোতা, নতুন বেড়া। সকালবেলা কাল বেরিয়ে পড়েছিল—তখন ঘাসবন লতাপাতা ঝোপজঙ্গল। ইতস্তত কয়েকটা ফুলগাছ। আজকে সকালবেলা দেখতে পাচ্ছে দস্তুরমতো এক পাড়া। ঝিলের পাশে জলের ধারে বসে বাসন-মাজছেন গিন্নিবান্নি গোছের কয়েকজন। কাপড় কাচছেন। বাচ্চা ছেলেপুলের ট্যাঁ-ভ্যাঁ আওয়াজও পাওয়া যায়। এঘর থেকে ওঘর থেকে কুন্ডলী হয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার মানে উনুন ধরানো হচ্ছে, রান্নাবান্না চাপিয়ে ছেলেপুলে খাওয়ানো হবে। সকালবেলা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবাড়ি যেমন হয়।

বড়-পুকুরের সিমেন্ট-বাঁধানো চাতালের উপর কামিনীফুল গাছের তলায় সদাশিবকে দেখা গেল। হাতমুখ ধুয়ে বিষণ্ণভাবে একলাটি বসে আছেন। হাত নেড়ে বিনয়কে কাছে ডাকলেন: শুনে যা বিনয়। ভাল করতে গেলি, ডেকে এনে তুললি স্টেশন থেকে, তার কী রকম শোধবোধ দিয়ে দিলাম আমরা, দেখ।

বলতে লাগলেন, রাত সাড়ে-দশটার পর এসে আমাদের নতুন কলোনিতে নিয়ে যাবে। বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে তৈরি হয়ে আছি, ঘড়ি দেখছি। অন্ধকারের মধ্যে দেখি পিলপিল করে দৈত্যদানোরা আসছে। সে যদি চোখে দেখতিস বিনয়! চাল-বেড়া-খুঁটি বয়ে এনে নামাল। কুড়ুল-খন্তা-কাটারি হাতে হাতে। এই ক'দিন রাতে রাতে লুকিয়ে এসে জায়গা-জমি নিজেদের মধ্যে বখরা করে নিয়েছে। এসে তিলার্ধ দেরি নয়—গর্ত খুঁড়ে খুঁটি পুতল, চালগুলো তুলে দিল খুঁটির মাথায়। খুঁটির গায়ে বেড়া

বসিয়ে চতুর্দিক ঘিরে ফেলল। দিব্যি এক এক চালাঘর। এমনি চালাঘর পনের বিশটা হয়ে গেল ঘন্টা তিন-চারের মধ্যে। ময়দানবের কান্ডকারখানা মহাভারতে আছে, সেই ব্যাপার। ঘর বাঁধা হয়ে গেল তো তক্ষুনি লোক ছুটেছে মেয়েছেলে নিয়ে আসতে। মেয়েলোক নইলে পুরোপুরি গৃহস্থবাড়ি হয় না, শুধু পুরুষমানুষ সহজে হটিয়ে দেওয়া যায়। যাদের বয়স বেশি আর সাহস-হিম্মত আছে, আপাতত তেমনি কিছু মেয়েলোক এসেছে। ছেলেপুলেও দু-চারটা—যাদের ফেলে আসতে পারে না। গতিকটা ভাল করে বুঝে নিয়ে রাত্রে নাকি মেয়ে-পুরুষের দঙ্গল এসে পড়বে। যত চালাঘর হয়েছে, পাশে পাশে রান্নাঘর উঠবে। শুনতে পাচ্ছি তো এই সব।

অশ্বিনীরা পাকাবাড়িটায় উঠেছিলেন, লোকজন এসে পড়ার পর এখনো সেইখানে। অন্য কেউ এ-বাড়িতে ঢুকল না। গাঁয়ে যেমন ছিল রাজবাড়ি, এখানে নতুন কলোনিতেও তেমনি প্রধান হলেন অশ্বিনী। অশ্বিনীর বয়স আর আশিসের কাজকর্মের বিবেচনায়। বাঁশির জন্যও বটে। অমন রূপসী মেয়ে নিয়ে পাকাঘরেই থাকা উচিত, অনেকখানি তাতে নিশ্চিন্ত। আরও ভাল—আশিসের দলবল প্রহরীর মতো ঘিরে রয়েছে। ছেলেরা রাত্রি জেগে পালা করে পাহারা দেবে লাঠি হাতে নিয়ে। এবং প্রকাশ্য ঐ দুটো অস্ত্র ছাড়া গোপন অস্ত্রেরও কিছু কিছু সংগ্রহ আছে। নতুন কলোনি পত্তনের পর এমনি সতর্ক হয়ে থাকার রীতি। মালিকের পক্ষ হঠাৎ দলবল নিয়ে চালাঘর ভেঙেচুরে আগুন দিয়ে উৎখাত করতে না পারে।

এইসব রাত্রিবেলার ব্যবস্থা। দিনমানে সামনের মাথায় আপাতত কোন বিপদ দেখা যাচ্ছে না। চালাঘর থেকে পুরুষমানুষ ক্রমশ একজন দু-জন করে বেরুচ্ছে। সারারাত ভূতের মতো খেটে বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিল। দাঁতন ভেঙে নিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে বাঁধানো ঘাটের উপর এসে বসছে। গাঁয়ের বারোয়ারি-তলা অথবা লাইব্রেরি ঘরের মতো এই ঘাটই একদিন কলোনির ওঠা-বসার জায়গা হয়ে উঠবে, বোঝা যাচ্ছে।

আশিসও এসে গেল। বিনয়কে এইখানে দেখে কিছু লজ্জা পেয়ে থাকবে। সদাশিবকে উদ্দেশ্য করে নিজে থেকেই বলছে, কী করব মাস্টারমশায়। দশের ব্যাপার, আমার একলার কথায় কী যায় আসে! কেউ শুনল না। বলে, কাছেপিঠে এমন আহামরি জায়গা—তেপান্তরের মাঠে কলোনি গড়ে মরতে যাই কেন? নীরেনরা সেদিন ঐ যে সঙ্গে এসেছিল, গিয়ে ওরা গল্প করল। সবসুদ্ধ রে-রে করে উঠল অমনি।

নীরেনের কিন্তু কিছুমাত্র সংকোচ নেই। হাসতে হাসতে বলে, পয়সাকড়ি দিয়ে জমি কিনতে পারব না—আমাদের হল বিনি-পয়সার ভোজ। সেই ভোজে পোলাও-কালিয়া পাচ্ছি যখন, বেগুনি-ফুলুরি খেতে গেলাম কেন? চুপিসারে এসে ঘর তুলতে হবে—তা সে বাগানবাড়ি হোক আর কেষ্টপুরের মাঠে হোক। খাটনি একই। তবে আর মাঠে যেতে যাব কেন? কপাল ভাল আমাদের, কেষ্টপুরে পাকাপাকি হবার আগে এখানটায় নজর পেঁছে গেল।

সদাশিব ব্যাকুল হয়ে বলেন, শুধু নিজেদের দিকটা দেখলে বাবা, এই বিনয়ের কথা ভাববে না একটিবার? বাগানবাড়ির মালিকরা কেউ চোখ তুলে দেখেন না, সমস্ত ভার বিনয়ের উপরে। আমাদের কষ্ট দেখে বিনয় স্টেশন থেকে ডেকে এনে আশ্রয় দিল। সেই সুবাদে তোমরা এলে, ঘুরে ঘুরে জায়গাজমি দেখলে। এখন এই বিনয়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, বল দেখি।

নীরেন নির্বিকার কণ্ঠে বলে, খারাপ কেন হবে? দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিন উনি। কাল মনিববাড়ি ছিলেন, তার মধ্যে রাতারাতি এই কান্ড হয়ে গেছে। নতুন কিছু নয়,

আকছার হচ্ছে এমনধারা। হায়-হায় করে ছুটে গিয়ে পড়ুন মনিবের কাছে। একেবারে কিছু জানেন না, বলুন গিয়ে।

আশিসও এই সঙ্গে যোগ দিল: কষে আমাদের গালিগালাজ করগে বিনয়। জানাশোনা আছে আমাদের সঙ্গে, বাবা আগে থেকে এসে উঠেছেন—মনিব এসব কথা জানবে কেমন করে? তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়বে।

এমনি কথাবার্তায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে বিনয় ভাবতে ভাবতে বাসার দিকে গেল! সেখানে বাঁশি। বাঁশি কোমরে ফেরতা দিয়ে ঝাঁটা হাতে টিনের চালের ঝুল ঝাড়ছে। ঝাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুল টেনে আনছে। সেদিন দেখে গেছে ঝুল-কালিতে ভরতি ঘর, সকালবেলা এসে তাই লেগেছে। দোর খুলে দিয়েছে রঘুমণি নিশ্চয়। রঘুমণির সঙ্গে বাঁশি এই ক'দিনে জানাশুনো করে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। বাঁশি কাজকর্ম করছে, রঘুমণি এই ফাঁকে কলসি নিয়ে বেরিয়ে গেল রান্নার জল আনতে।

বিনয় থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল দেখে। ম্লান হেসে বলে, কে থাকবে এখানে——কার জন্যে তুমি খেটে মরছ বাঁশি? বড়বাবুর কানে পেঁছিতে যেটুকু দেরি। তারপরে একটা বেলারও ঠাঁই হবে না। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পারব না আমি। দেখা-শোনার ভার আমরে উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, আমা হতে এত বড় ক্ষতিটা হল।

বাঁশি বলে, রঞ্জিত রায় টের পাবেন কী করে যে তোমার কোন হাত রয়েছে এর ভিতরে?

ঘাটে এইমাত্র যে সব কথা হল, বাঁশির মুখেও অবিকল তাই। আলোচনা আগেই তবে নিজেদের মধ্যে হয়েছে।

বাঁশি বলতে লাগল, আরও ভাল হয়েছে, কাল রাত্রে ওঁদের বাড়ি ভবানীপুরে ছিলে তুমি। কেউ কিছু বলতে এলে সাফ বেকবুল যাবে। আমরা আগে এখানে এসে উঠেছি, শুধু এক রঘুমণি জানে। সে কাউকে বলতে যাবে না।

বিনয় কাতর স্বরে বলে, ছলচাতুরি আমি পারিনে, সামান্য একটা মিথ্যেকথা বলতে বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করে। জীবনে একটিবার শুধু মিথ্যাচার করেছি—আমার মায়ের সঙ্গে। কলকাতায় ভাল চাকরি করছি, মস্তবড় বাসা ভাড়া করে আছি—এই সমস্ত বলেছিলাম। মাকে তৃপ্তি দেবার জন্য। জানি, মা আমার বাঁচবেন না। মিছে কথা বলে মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম মৃত্যুর আগে। সেই একবার যা হয়ে গেছে, আর অমন পেরে উঠব না।

বাঁশি মুহূর্তকাল স্তব্ধ রইল। সহসা তীক্ষ্ণ কন্ঠে বলে ওঠে, সেইজন্যে বলি বিনয়-দা, একালে জন্ম নেওয়া তোমাদের ঠিক হয়নি। তুমি সত্যযুগের মানুষ। সাদা কথায় যার নাম অপদার্থ।

রঘুমণি এসে পড়েছে। কাঁধ থেকে জলের কলসি নামিয়ে সে শুনছিল। সে বলে, দোষ তোমার নয় বিনয়বাবু, তুমি আর কী করেছ! কারখানার জন্য ডেভিড সাহেব আগে এই বাগানটাই নিতে চাচ্ছিল। ভাল দাম দিত। ছ-মাস তার লোক হাঁটাহাঁটি করেছে। ম্যানেজার কতবার বলল, ছোটবাবু বললেন। কিছুতেই দিলেন না বড়বাবু, গোঁ ধরে রইলেন। ছাপাখানাটা ছিল, তা-ও দিলেন তুলে। ভিটেমাটি ছেড়ে মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে, খালি জায়গাজমি দেখলেই দখল করবে। এরা না এলে অন্য দল এসে পড়ত। দোষ তো বড়বাবুর। ভাবলেন, চেপে বসে থেকে দাঁও মারব। মুলে হাবাত এখন।

ঘাড় নেড়ে বিনয় প্রতিবাদ করে: না রঘুমণি, দাঁও মারার ব্যাপার নয়। আমি

সমস্ত জানি। বড়বাবু বললেন, ডেভিড সাহেব যদি বিস্কুটের ফ্যাক্টরী করতে পারে, আমরা কেন পারব না? বাঙালি কম কিসে? কলিয়ারি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা, একসঙ্গে দুটো দিনও স্থির হয়ে কলকাতা থাকতে পারছেন না! মতলব ছিল, কলিয়ারির ঝামেলা কাটিয়ে এসে উঠেপড়ে লাগবেন। ফ্যাক্টরী নিশ্চয় হত।

॥ বার ॥

অনেক ইতস্তত করে অবশেষে বিনয় ভবানীপুরে খবর দিতে চলল। খবর কিছু আগেই পৌঁছে গেছে। জমির দালাল—লোকটা ডেভিড সাহেবের জন্য বিস্তর ছুটো-ছুটি করেছে—খবর কানে শুনেই বাস-ভাড়া খরচা করে হাজির। রঞ্জিত তখন বাড়ি নেই, ইলু আর নীলু দুই মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সম্ভবত মিউমার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা হবে তাদের জন্য, তারপর বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়ে আসবেন। বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করে তারা, বাড়িতে কার হিল্লেয় থাকবে? ছেলে রন্টু থাকে নেবুতলায় তার দিদিমার কাছে। জয়ন্তী দেবী মারা গিয়ে সংসারটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল। ছোট-ভাই ইন্দ্রজিতকেও যদি বিয়েয় রাজী করানো যেত!

রঞ্জিত রায় নেই, তবে ম্যানেজার পুলিনবিহারী অফিস-ঘরে আছে। জবরদখলের কথা লোকটা পরমানন্দে রসিয়ে রসিয়ে বলে। ডেভিড সাহেবের ভারি পছন্দ ছিল জায়গাটা, টানাহেঁচড়া করে হয়তো দেড় পর্যন্ত তোলা যেত। তা রায়মশায় মোটে কানে নিলেন না, আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতেন না। আপনিও স্যার দুর-দুর করতেন। এখন? দেড়টা তামার পয়সাও তো দেবে না ওরা। উচ্ছেদ করে জমি খাস করা—সে হল অনেক কথার কথা। মবলগ টাকা খরচা—তার উপর তদ্বিরতাগাদা।

দেড় বলে যে কথাটুকু উহ্য রাখল, সে হল লক্ষ্য। দেড় লক্ষ অবধি বাগানবাড়ির দর উঠত, দালাল বলছে তাই। মস্তবড় ক্ষতি সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁর পাঁঠা তিনি যদি লেজে কাটেন, পুলিনের কোন এক্তিয়ার আছে বলবার? বিনয়টা রয়েছে দেখাশোনার জন্য। কী চোখে দেখেছেন রঞ্জিত—এক হাজার টাকা ডাহা চুরি করল, মার্জনা অমনি সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যাপারেও হয়তো বিনয়ের যোগসাজস আছে, ভাল রকম টাকাকড়ি খেয়ে আপসে ফটক খুলে দেওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু রঞ্জিত রায়কে সে কথা বলতে যাবে কে? বলে হয়তো উল্টো-উৎপত্তি—বিনয়ের মাইনে যা আছে, বিশ টাকা আরও বাড়িয়ে দেবেন তার উপরে।

লোকটা যে কারণে এতখানি পথ চলে এসেছে—বলে, সস্তাগণ্ডায় দিতে রাজি হন তো ডেভিড সাহেবকে এখনো বলে দেখতে পারি। সাহেবের হাতে অনেক ক্ষমতা, নয়া-দিল্লির কর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম। রায়মশায় আর ডেভিড দু-জনে একসঙ্গে লাগলে রিফিউজি তাড়াতে দেরি হবে না। কথাটা জেনে রাখবেন তাঁর কাছ থেকে, আমি আবার আসব।

নমস্কার করে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে চোখ টিপে বলে, বলবেন কিন্তু ভাল করে। সাহেব আপনাকেও খুশি করবেন, কথা দিয়ে যাচ্ছি।

পুলিনবিহারী চটে উঠল: বলছ কি তুমি—ঘুষ? যেমন আর দশটা অফিসার দেখে থাক, আমাকেও তাই ভেবেছ? রঞ্জিত রায় আমার ভাই—সাক্ষাৎ মামাতো-পিসতুতো ভাই আমরা। একলা সব দিক পেরে ওঠেন না, আমি কিছু সাহায্য করি। দাদার খাতিরেই চাকরি নিলুম। নইলে এতখানি লেখাপড়া শিখে এসব কাজ করবার

কথা নয়।

সাহায্য করুন তবে দাদাকে। সবসুদ্ধ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে—ডেভিড কিছু তো দেবে। সেটা নেহাৎ হেলাফেলার হবে না। শুধু-হাতে একেবারে মুফতে সাহায্য করতে চান, তাতেও আমরা গররাজি নই। সেটা হল আপনার বিবেচনা।

লোকটা চলে গেল। খানিক পরে বিনয় এসে পড়ে। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে পুলিনবিহারী কলরব করে ওঠে: বলতে হবে না। খবর উড়ে এসেছে।

মুচকি হেসে রসিকতা করে বলে, দমদম থেকে পাখি উড়তে উড়তে এসেছিল। সেই সমস্ত বলে গেল। গুহ্যকথাও বলেছে অনেক, তোমার মুখে যা-সমস্ত পাওয়া যেত না।

মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব বুঝে নিচ্ছে বিনয়ের: বলে কী জান? তোমার বাড়ি পূর্ব-বাংলায়, যারা এসে দখল করেছে তারাও সেখানকার। তোমাদের জানাশোনা নাকি আগে থেকে, মুখশোঁকাশুঁকি আছে?

বিনয়ের মুখ পাংশু হয়ে গেছে। দেখে পুলিনের বড় তৃপ্তি। ছিপে মাছ গেঁথে ফেলে খেলিয়ে আনতে মজা লাগে। সুতোয় কখনো ঢিল দেবে, কখনো টান। বলে, কিন্তু পূর্ব-বাংলা তো একটুখানি জায়গা নয়, আমাদের এই বাংলার ডবল। পূর্ব-বাংলার ডবল। পূর্ব-বাংলার হলেই সব মানুষ সকলকে চিনবে, তার কোন মানে আছে? বড়বাবু কী করবেন জানিনে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনে। বাজে কথা। ধপ্ করে বসে পড়ে বিনয় জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, বড়বাবু কোথায়?

পুলিন বলে, কাল অতরাত্রি অবধি হৈ-চৈ গেল। ঘুম আর কতটুকু হয়েছে। কোথায় একটু বিশ্রাম নেবেন—তা নয়, সকালে উঠে ইলু-নীলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এখনো ফেরেননি। তেতে-পুড়ে ক্ষিধেতেষ্টায় আধখানা হয়ে তো ফিরবেন—সেই মুখে এ-খবর শুনে ক্ষেপে যাবেন একেবারে। কী যে হবে, জানিনে।

খবর নিজ মুখে না দিলে সন্দেহের কারণ পড়বে, বিনয় সেই জন্য চলে এসেছে। রঞ্জিত রায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, যত ভাবছে ততই আতঙ্ক লাগে। ভাগ্য ভাল, নেই তিনি এখন বাড়িতে। ক'মাস আগে এইখানে এসেই উপযাচক হয়ে আর এক অপরাধের কথা বলে গিয়েছিল। এখন অবস্থা আলাদা। বুড়ো বাপ চাকরি খুইয়ে বেকার অবস্থায় জামাইয়ের বাড়ি পড়ে আছেন। জামাইয়ের ভাই কলকাতা থেকে পড়ে, মাসে মাসে বিনয় তাকে টাকা দিয়ে আসে। সেই খাতির জামাই বাবাজী পূর্বপক্ষের শ্বশুরকে বাড়ি থাকতে দিয়েছে। এবং আদর-যত্নও যে না করে, এমন নয়। টাকা বন্ধ হয়ে গেলে আদর-যত্ন উপে গিয়ে নির্ঘাৎ হরিবিলাসকে পথে বের করে দেবে। তার উপরে একটা বড় প্রত্যাশা রয়েছে—কলিয়ারির ঝামেলা চুকে গেলে এই জায়গায় বিস্কুটের ফ্যাক্টরী হবে। তার যাবতীয় দায়িত্ব বিনয়ের উপর, রঞ্জিত রায় বলে রেখেছেন। কিন্তু পর পর দু-বার মারাত্মক অপরাধের পর কিছুই আর হবে না। ভবিষ্যৎ অন্ধকার বিনয়ের।

উঠে দাঁড়িয়ে বিনয় বলে, যাচ্ছি আমি। সন্ধ্যের দিকে আবার আসব। বলবেন বড়বাবুকে।

রঞ্জিতের কোন্ প্রশ্নের কী রকম জবাব দেবে, ধীরে সুস্থে আগে থেকে সমস্ত ভেবে রাখবে। মাস্টারমশায় সদাশিবের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে। মাস্টারমশায়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধি দিতে পারবে হয়তো বাঁশি—বাঁশির সঙ্গে পরামর্শ করবে। বিনয়ের এখন সবচেয়ে বড় ভয়, ঘাবড়ে গিয়ে ভিতরের কথা নিজেই সব বলে না ফেলে।

পুলিন বলে, থানায় খবর দিয়েছ? তা-ও বোধহয় হয় নি। যাবার মুখে এই কাজটুকু অন্তত করে যেও।

রঞ্জিত রায় অনেক বেলা করে ফিরলেন। প্রায় একটা। অফিস ঘরে ঢুকলেন একবার। কথা তো পুলিনের ঠোঁট অবধি এগিয়ে এসে আছে, কিন্তু বলবার ফুরসত কই? রঞ্জিত বললেন, চারটের গাড়িতে পাটনা রওনা হচ্ছি। পরশুদিন মামলা, মামলার কাগজপত্তর সব গুছিয়ে রেখে দাও। এক্ষুণি করতে বলছি না, খেয়েদেয়ে তারপর।

হাত উল্টে ঘড়ির দিকে একবার নজর ফেলে বললেন, বড্ড বেলা হয়ে গেছে। আচ্ছা তোমরা সব কী—বসে রয়েছ বুঝি আমার জন্যে? কোন দরকার ছিল না, খেয়ে নিলে পারতে। চলে এস তাড়াতাড়ি। হাতে মুখে একটু জল দিয়ে আমি যাচ্ছি।

না খেয়ে এই বেলা অবধি অপেক্ষা করে আছে, রঞ্জিত সেটা লক্ষ্য করেছেন। এই নিয়ে অতএব কয়েকটা ভাল ভাল কথা শোনানো যেতে পারে। পুলিন বলে, কলকাতায় এখন থাকেন কোথা—ক'টা দিন বা একসঙ্গে খাওয়া যায়। তাই ভাবলুম, সুযোগ যখন হয়েছে—

কিন্তু বলছে কাকে! রঞ্জিত ঘরে আর নেই, ঝড়ের মতন বেরিয়ে পড়েছেন। খেতে বসে সেই সময়টা ফাঁক পাওয়া গেল। তিন জনে পাশাপাশি খাচ্ছেন—রঞ্জিত ও ইন্দ্রজিৎ দু-ভাই, আর পুলিন। দয়ে পড়ে পুলিন চাকরি করছে, তবুও সে আত্মীয়-স্বজন। এবং মর্যাদায় বড়। তাই গিয়ে অন্তরঙ্গ মহলে সে দেমাক করেঃ শহরের আদি-বাসিন্দা আমরা, নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা দখল করলেন, তার আগে থেকে বসতি। চাঁপাতলা-গলির অর্ধেক জায়গাজমি ছিল আমাদের। আর ঐ রায়েদের বসবাস বনগাঁয়—সে হিসেবে অর্ধেক বাঙাল তো বটেই। বনগাঁর রায়চৌধুরী ওরা; রঞ্জিত রায়ের ঠাকুরদা ভবানীপুর কেঠোকুঠিতে সামান্য কাঠের আড়ত করে ছোট-গঙ্গার ধারে বাসা নিলেন। বেলেঘাটায় খড়ের গোলা করলেন রঞ্জিত রায়, তার পরে বোন-মিল। তাঁর আমলেই ব্যবসা ফেঁপে উঠল। আঙুল ফুলে কলাগাছ। টাকা হয়েছে বটে, কিন্তু আমদের সে বনেদিয়ানা পাবেন কোথা? অদৃষ্ট দেখ—অদৃষ্ট ছাড়া কী আর বলি! —লেখাপড়া শিখে অনার্স-গ্র্যাজুয়েট হয়ে ওঁদেরই বাড়ি আমি আজ কলম ঘষে খাই।

পুলিন এমনি সব দুঃখ করে নিভৃতে ঘনিষ্ঠ জনের কাছে। সত্যি হয়তো তাই। মনিবের ব্যবহারেও নিতান্ত আপনজনের ভাব। দুই ভাই আছেন রঞ্জিত আর ইন্দ্রজিত তার উপরে যেন আরও একটি ভাই—পুলিন।

খেতে খেতে পুলিন বলে, বিষম এক কাণ্ড হয়েছে দাদা।

মুখ তুলে রঞ্জিত তাকিয়ে পড়েন। ইন্দ্রজিতও আহার বন্ধ করেছে।

দমদমের বাগানবাড়ি রিফিউজি ঢুকে পড়েছে। কাল রাত্রে।

রঞ্জিত একটুখানি চুপ থেকে বলেন, বিনয়টা যে এইখানে পড়ে ছিল, ও থাকলে হত না। খাওয়াদাওয়া সারা হতে রাত বেশি হয়ে গেল, যায় কেমন করে? গাড়ি করে পেঁছে দেওয়া যেত অবিশ্যি সেইটে উচিত ছিল। কিন্তু এমন হবে কে ভাবতে পেরেছে? এক হিসাবে ভালই হয়েছে বোধহয়। গোয়ার্তুমি করে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ত, তখন কি আর আস্ত রাখত ওকে! একলা মানুষ অতজনকে কী করে সামাল দেবে? হয়তো বা খুনই হয়ে যেত।

আবার বলেন, একলা মানুষ না বলতে চাও, সোয়াখানা মানুষ। বুড়ো রঘুমণি সিকির বেশি নয়।

নাও, কী কথার উপর কী জবাব! এত বড় সম্পত্তি বেদখল, মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়ার কথা, রসিকতার বচন আসছে এখন মুখে। বড়ভাই ছোটভাই দুজনেই সমান এদিকে দিয়ে। ইন্দ্রজিত আধ মিনিট ক্যল ভোজন বন্ধ রেখেছিল, টপাটপ গ্রাস মুখে তুলে ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে।

পুলিনবিহারী তা বলে নিরস্ত হতে পারে না : বিনয় এসেছিল দাদা, না এলে নিতান্ত খারাপ দেখায়. তাই বোধহয় এসেছিল একবার। ডেভিডের লোক তার আগেই এসে খবর দিয়ে গেছে। বিনয়কে বললুম, দাদা আসুন, ইন্দ্র আসুন— এক্ষুণি ও'রা এসে যাবেন, আর কতক্ষণ! বসে যাও তুমি একটু। বাবু মোটে কানেই নিল না, সন্ধ্যাবেলা আসব বলে উঠে পড়ল।

রঞ্জিত বললেন, সন্ধ্যাবেলা আমি থাকছি কোথা! চারটের আগেই বেরিয়ে পড়ছি। পাটনার কাজ সেরে তার পরে ঝরিয়া যাব। কলিয়ারির ভিতরেও নানান গণ্ডগোল। যে রকম ব্যাপার, মাসখানেকের আগে কলকাতা ফিরতে পারব বলে মনে হয় না।

পুলিন বলে, সেই কথাই বললুম বিনয়কে। দাদা এই এসেছেন—কোন মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েন, ঠিকঠিকানা নেই। তোমার মুখে শুনে নিয়ে যা-হোক ব্যবস্থা করে যাবেন। এত বড় সম্পত্তি গালে চড় মেরে কেড়ে নিয়ে মনের সুখে ভোগদখল করবে, কেমন করে তা সহ্য হয়!

এবারে রঞ্জিতকে কিছু উত্তপ্ত দেখা গেল : নিয়ে নিলেই হল। ডেভিড সাহেবকে দিলাম না, ঐখানে আমরা ফ্যাক্টরী গড়ব। ডেভিড সামনের জায়গায় আছে, খুব ভাল কথা, পাল্লাপাল্লি চলবে—কাদের জিনিস ভাল হয়, কোন্ ফ্যাক্টরির নামডাক হয় বেশি। দেশি মানুষ না বিদেশি সাহেব—কারা জেতে, না দেখে ছাড়ছিনে। কলিয়ারির ঝামেলাগুলো মিটলে হয়, তখন নিজে গিয়ে ঐখানে চেপে বসি। রিফিউজি আর যেখানে খুশি দখল করুক গিয়ে, বাগানবাড়ি থেকে তাড়াবই। আমি যে অনেক-কিছু ভেবে রেখেছি।

পুলিন বলে, তাড়াচ্ছে কে? একমাস থাকছেন না তো আপনি।

আমি না থাকি, টাকাকড়ি লোকজন সব থাকছে। তুমি রইলে, বিনয় আছে। কম কিসে তোমরা?

ইন্দ্রজিতের দিকে এক নজর তাকিয়ে হাসিমুখে বলেন, আর তোমাদের ছোটবাবু রইল—ওকে ছেড়ে দিও না এবারে। নিতান্ত ছোটটি নস—কতদিন ফাঁকে ফাঁকে থাকবি রে এমন? কিছু দায়িত্বভার নিয়ে নে। বুঝলে পুলিন, ছোটবাবুকেও নিয়ে নেবে তোমাদের সঙ্গে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ আহার চলল। পুলিন মৃদুস্বরে আবার বলে, একটা কথা বলি দাদা। বিনয়ের উপর সন্দেহ আসে। নেহাৎ আন্দাজি কথা নয়, খবরাখবর নিয়েছি অনেক-কিছু। ঐ যত রিফিউজি ঢুকেছে, তারা সব বাঙাল-দেশের লোক।

রঞ্জিত হেসে উঠলেন : উঃ, মস্ত খবর জোগাড় করেছ তো! বাঙাল দেশের লোক রিফিউজি হয়ে এসেছে। বলি এ-বাংলার লোকের কী দায় পড়েছে—কোন্ দুঃখে এরা রিফিউজি হয়ে পরের সম্পত্তি জবরদখল করতে যাবে?

পুলিন স্পষ্টাস্পষ্টি বলল, মানে বিনয়ও বাঙাল-দেশের কিনা। রিফিউজিদের

সঙ্গে যোগসাজস থাকা অসম্ভব নয়। আগে না থাকলেও পরে হয়েছে নিশ্চয়। এই ব্যাপারে তার যতখানি চাড় হওয়া উচিত, তেমন-কিছু দেখলুম না। থানায় একটা খবর পর্যন্ত দেয় নি। সন্দেহ এই সব কারণে। নিতান্ত অসম্ভবও নয়—মাইনে অল্প, কিছু পান-টান খেয়ে থাকতে পারে ওদের কাছ থেকে। তাই মনে হয় দাদা, বিনয়ের উপর নির্ভর করা উচিত হবে না।

বলছে আর আড়চোখে নিরীক্ষণ করছে রঞ্জিতকে। রঞ্জিত ঘাড় নাড়ছেন। কী মন্ত্রে বশ করেছে, বিনয়ের কোন দোষ উনি দেখতে পান না। নিজের মুখে দোষ স্বীকার করলেও সঙ্গে সঙ্গে মাপ হয়ে যায়। তখন পুলিন আর একভাবে শুরু করে: অতদূর না-ও যদি হয়, বিনয়ের কাজের হেলা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকগুলো ঢুকে পড়বার আগে নিশ্চয় দেখেশুনে গেছে, আশে-পাশে ঘোরাফেরা করেছে। সেদিকে নজর রাখা উচিত ছিল তার যখন কাজই এই। কাজ ভাল করে করবে বলে ঐ জায়গায় তাকে বাসা দেওয়া হয়েছে।

রঞ্জিত গম্ভীর হয়ে বলেন, অবহেলার কথা যদি বল, সেটা আমার। পুরোপুরি আমারই। জয়ন্তী-প্রেস তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য-কিছু করা উচিত ছিল। ছোটখাট আয়োজনেও বিস্কুট-ফ্যাক্টারির পত্তন করতে পারতাম। ফ্যাক্টরী আস্তে আস্তে বড় হত। এখনকার এই দিনে অতটা জায়গা ফেলে রাখা উচিত হয়নি। কিন্তু দোষের বিচার পরে করলেও চলবে। বাগানের উদ্ধার কেমন করে হয়, সেই ভাবনা ভাব এখন।

ইন্দ্রজিত চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল। মুখ তুলে হঠাৎ প্রশ্ন করে, মানুষ কত এসে পড়েছে?

পুলিন বলে, গুণে তো আসেনি কেউ। বিনয়ের কাছে যা শুনলুম আর সেই দালাল লোকটা যেরকম বলল, পঞ্চাশ-ষাট জন হতে পারে। ইন্দ্রজিত বলে, বেশিটাই ধরে নেওয়া যাক—ষাট।

বিড়বিড় করে কী হিসাব করে। বাঁ-হাতের কর গণে কতকগুলো নামের হিসাব করছে—বিশে-বোদে-অশোক-জানকী…

তারপর বলে, বাগানের উদ্ধার এক ঘণ্টার ব্যাপার পুলিন-দা কোন ভাবনা নেই। বিশে-বোদে-অশোক ওদের বার জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ বারং ষাট—এক একজনে গড়ে পাঁচটা রিফিউজির মহড়া নেবে। কাল রাত্রে ঘরবাড়ি তুলেছে, আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত আবার ফরসা। কাল সকালে আমরা গিয়ে নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধন করে আসব।

রঞ্জিত শশব্যস্তে বলেন, ওরে বাবা! কাজ নেই তোর বাগান উদ্ধার করে। শুনছ হে পুলিন? ছোটবাবুকে তোমাদের মধ্যে নিতে বলেছিলাম—গিয়ে তো মার-মার কাট-কাট করবে। কাজ নেই, ওকে টেনো না। বিনয়ের উপর সন্দেহ—একই জায়গার মানুষ পথে পড়ে উঞ্ছবৃত্তি করছে, সহানুভূতি আসা খুব স্বাভাবিক। কিছু দোষেরও নয় সেটা। বিনয়কেও বাদ দিয়ে দাও তাহলে। একলা তুমি। তোমার অনেক কলকৌশল, সেই সমস্ত খাটিয়ে দেখগে। গোলমালে কাজ নেই—কলিয়ারিতে এই চলছে, সকল দিকে মামলা-মোকদ্দমা বাধিয়ে সামলানো যাবে না। মিষ্টি-কথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেখ। বিশ-পঞ্চাশ করে টাকা নিয়ে আপসে যদি চলে যায়, সেইটে সব চেয়ে ভাল। তুমি নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে—কেমন?

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছেন। মামলার কাগজপত্র বাছাবাছি এইবার। তার মধ্যে একবার ছোটভাইকে ডেকে রঞ্জিত বললেন, কী রকম ঝঞ্ঝাট জড়িয়ে নিয়েছি দেখ ইন্দ্র। রন্টুর পেট ফেঁপেছে বলে শাশুড়ীঠাকরুন তাকে নিয়ে কাল সকাল-সকাল চলে

গেলেন। ছেলেটা কেমন আছে একটিবার দেখে আসব, কিছুতে তার সময় হল না। নেবুতলায় গিয়ে খবর নিয়ে পাঠনার ঠিকানায় আমায় চিঠি দিস। আর ইলু-নীলুর কী সব বইয়ের দরকার, লিষ্টি দেখে কিনে দিবি সেগুলো।

॥ তের ॥

সন্ধ্যাবেলা বিনয় আবার এসেছে। পুলিন বলে, নেই দাদা। পাটনায় রওনা হয়ে গেছেন। বলছি আমি কাকে, সেটা কি আর ভাল করে না জেনেশুনে তুমি এসেছ!

বিনয় সবিস্ময়ে বলে, কেন, বড়বাবু চলে গেলে তবে আমি আসব, একথা কেন বলছেন?

পুলিন বলে, এত বড় ক্ষতির কারণ হয়ে কোন সাহসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবে! তুমি না বললেও খবর পেঁছিতে বাকি নেই। দাদা তো রেগে টং। বলি, থানায় ডায়েরী করা হয়ে গেছে? কী বলে তারা?

ও. সি.-র দেখলাম বড়বাবুর সঙ্গে জানাশোনা আছে। খাতির দেখালেন খুব। তাঁদের যা সাধ্য, নিশ্চয় তাঁরা করবেন।

পুলিন ভ্রূভঙ্গি করে বলে, তাদের সাধ্য ঘোড়ার ডিম। তাদের ভরসায় আছি কিনা! আইনে বলে ডায়েরি করতে, আইনের মান রাখা হল। দাদা নাকে-মুখে দুটো গুঁজে তক্ষুণি লালবাজারে বেরিয়ে গেলেন। মুষল সেখানে তৈরি হচ্ছে।

হাতে-নাতে প্রমাণ না থাকুক পুলিন নিঃসংশয়ে জানে, এখানকার যাবতীয় কথাবার্তা বিনয়ের সেই দেশোয়ালি রিফিউজিগুলোর কানে পেঁছে যাবে। ইচ্ছে করে তাই গরম গরম বলছে—ক্ষেত্রটা তৈরী হয়ে থাকুক পুলিনের গিয়ে পড়বার আগে।

বলে, তবে কি জান, এতখানি লেখাপড়া শিখে দাঙ্গাহাঙ্গামা-রক্তপাত তেমন আমি পছন্দ করিনে। ঐগুলো এড়ানো যায় যদি কোন রকমে। দাদার বাইরে চলে যেতে হল. এই রক্ষে। তিনি থাকলে এতক্ষণে ধুন্দুমার লেগে যেত। কাল সকালে আমি বাগানে যাচ্ছি। আপসে বিদায় হবে কিনা, কথাটা জিজ্ঞাসা করে আসব। খুব বেশি তো এক হপ্তা, তার ভিতরে বাগান খালি করে দিতে হবে। সাতের বেশি আট দিন হলে হবে না। বলবে তোমার এয়ারবন্ধুদের।

বিনয়ের গলায় জোর নেই মোটে। মিনমিন করে প্রতিবাদ করেঃ এয়ারবন্ধু কেন হতে যাবে?

হেসে উঠে পুলিন বলে, আচ্ছা, না-ই হল এয়ারবন্ধু। দুশমন পয়লা নম্বরের। সেই দুশমন মশায়দের আমি একটা সুযোগ দিলুম। না শুনলে তারপরে ভালমন্দর জন্য আমাকে দোষ দেবে না কিন্তু।

বাগানে ফিরে বিনয় সোজা গিয়ে পাকাবাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল। সদাশিবকে বলে, শুনুন মাস্টারমশায়, বড় সঙিন অবস্থা। অশ্বিনীকে বলে, আপনাকে লাঞ্ছনা করবে জ্যেঠামশায়, সে আমি চোখে দেখব কেমন করে?

বারান্দায় নয়, দরদালানেও নয়, একেবারে ভিতরের কামরায় গিয়ে বসলেন সকলে। সকালবেলা পুলিন আসছে—তার কথার কী জবাব, এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে। গোপন পরামর্শ। কলোনির গোঁয়ারগোবিন্দগুলোকে জানতে দেওয়া হবে না আপাতত। নানা জনে নানা মন্তব্য করবে, অবস্থা জটিল হবে, শান্তভাবে সকল দিক বিবেচনা করা যাবে না। নিজেদের মধ্যে একটা-কিছু সাব্যস্ত হোক, বাইরের ওরা

তারপর জানবে।

আশিসের পাত্তা নেই। কোনদিকে বেরিয়ে গেছে। কোথায় আবার। কোন এক চালাঘরে উঠে বসে গৃহস্থকে সাহস দিচ্ছে। কিম্বা সমস্ত রাত্রি জেগে পাহারা দিয়ে ঘুরবে, তার ব্যবস্থায় আছে। আশিসকে একটিবার নিয়ে আসা দরকার। সে হল মূল-পান্ডা, তাকে বাদ দিয়ে কিছুই পাকা হবে না।

বাঁশি উঠে দাঁড়ায়ঃ আমি যাচ্ছি। নীরেন-দা'র বাড়ি আছে ঠিক, আমি গিয়ে ডেকে আনি।

বিরজা তাড়া দিয়ে ওঠেনঃ এই রাত্তিরে ম্যাচম্যাচ করে যেতে হবে না তোর। নতুন জায়গা, শত্তুর চারিদিকে, ভয়ও করে না একটু! তারপরে যেন বাঘ দেখেছেন, এমনি ভাবে শিউরে ওঠেনঃ দালানের দরজা কে খুলে রেখেছে? কী বলা আছে আমার—সন্ধ্যের পর ভাল করে দেখেশুনে তবে দরজা খুলবে, খিল-খোলা অবস্থায় কখনো থাকবে না। যে খুলবে সে-ই বন্ধ করে তবে নড়বে জায়গা থেকে। বিভুঁই জায়গায় একখানা কাণ্ড ঘটে গেলে তখন কি?

দরজা খুলেছেন অপর কেউ নয়—সদাশিব। বিনয়ের ডাক শুনে খুলে দিয়েছেলেন। তার কথা শুনতে শুনতে পরে আর খিল দেবার খেয়াল হয় নি। বেকুব হয়ে গেলেন তিনি।

বিনয় বলে, আশিস-দাকে আমি ডেকে আনছি। সত্যিই তাকে দরকার—সে ছাড়া হবে না।

আশিস এলে সদাশিব বলেন, জায়গা দেখ আশিস। তাড়া-তাড়ি। সমস্ত শুনে নিয়ে আশিস শান্ত কণ্ঠে বলে, জায়গা বদলে লাভটা কি মাস্টারমশায়? যেখানেই যাই, কোন মালিক 'আসুন' 'বসুন' করে আহ্বান করবে না। লড়ালড়ি চলবেই। সে লড়াই এখানে হোক আর অন্য কোথাও হোক, একই তো ব্যাপার।

সদাশিব দৃঢ়স্বরে বলেন, ব্যাপার এক নয়। সেই নতুন জায়গায় বিনয় নেই। বিনয়ের উপর দোষ পড়বে না। আমাদের উপকার করতে গিয়ে বিনয় বিপদে পড়েছে। তাকে বাঁচাবার জন্য এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে।

বিরজা এর মধ্যে কথা বলে ওঠেনঃ যেতে পারি যদি এমনি পাকা-দালান পাই কোথাও। মাগো মা, রাত হলে প্রাণে আর জল থাকে না। দালানের দুয়োর এঁটে তবু অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

আশিস হেসে বলে, আর পুকুরের কথাটা বললে না পিসিমা? দুয়োর খুলেই বড়-পুকুর। সোনাটিকারি থাকতে দিনে যদি দশবার নাইতে, এখানে এসে সেটা বিশবার হচ্ছে।

অশ্বিনী চিন্তা করছিলেন। বলে উঠলেন, সত্যি কথা, দিদির কথা বড় সত্যি। যেখানে-সেখানে উঠতে পারিনে আমরা এই এদের সব নিয়ে। রাজবাড়ির মানইজ্জতের কথা বলিনে, সে জিনিস ওপারে ফেলে এসেছি। বলছি বাঁশির কথা। শিব-দাদা বলেন কাঞ্চনবরনী, আমার কাছে কণ্টবতী। বুকে কাঁটা, পিঠে কাঁটা—শুতে বসতে খচখচ করে ফোটে। মেয়ের মা থাকলে এই মুহূর্তে বাগান ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম। মাঠে-ময়দানে পড়ে থাকতাম। আর্মড-পুলিশ আসুক বা না আসুক, চেঁচিয়ে একটা শক্ত কথা বললেই তো আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। শুনিনি তো কখনো কারও কাছে। তার উপরে বিনয়ের ব্যাপার—ডেকে নিয়ে এসে বিনয় এখন দোষী হয়ে পড়ছে। তার কথা ভাবতে হবে বই কি! চার দিনের কড়ারে—চার দিন না-ই হল, যেতে আমাদের

হবেই। যত তাড়াতাড়ি হয়, তত ভাল। আশিস তুমি জায়গা দেখ। ভাল জায়গা শুধু এই একটিমাত্র আছে, এমন তো নয়।

আশিস বলে, জায়গা না হয় দেখলাম বাবা। পেলামও ধরো ভাল জায়গা। কিন্তু যেতে হলে একলা আমাদের এই একটা ঘরই শুধু যাবে। অন্য কেউ নড়বে না এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে। পাকা-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যাব, ওরাই তখন এসে দখল করবে। বিনয়ের অবস্থার তাতে ইতরবিশেষ হবে না।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক আলোচনা হল। সমাধান কিছুতে হয় না। দেখবে অবশ্য আশিস জায়গা। এমন দালানকোঠা, এবিনি স্নানের সুবিধা ও খাবার জলের প্রাচুর্য, তার উপরে ফলসা গাছগাছালির বাগান সাজিয়ে, হতে পারে, কেউ রিফিউজির অপেক্ষায় খালি অবস্থায় রেখে দিয়েছে। দেখবে নিশ্চয় তেমনি কোন জায়গা খোঁজাখুঁজি করে।

অনেক রাত্রে কথাবার্তার শেষে বিনয় উঠল। দরজা খুলে দেবার জন্য বাঁশি দরদালানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় বলে, সকলের সব কথা শুনলে, আমার কথাটা শুনে যাও বিনয়-দা। জায়গা পেলেও আমি কিন্তু যাব না। সকলে যায় যাক্, আমি থেকে যাব।

বিনয় বলে, জোর-জবরদস্তি করে তাড়াবে। রঞ্জিত রায়ের অনেক ক্ষমতা, বিস্তর লোকজন হাতে।

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বাঁশি বলে, আসুক না তাড়াতে। কথা রইল তাই—জোর করে যখন তাড়িয়ে দেবে, ঘর ছাড়ব সেই দিন। তার আগে কখনো নয়।

ঠিক আসবে দেখো। লোকজন এসে জিনিসপত্র দমাদম ছুঁড়ে ফেলবে। সে বড় কেলেঙ্কারি। তোমাদের তাড়িয়ে বের করছে, সে জিনিস আমি চোখে দেখব কেমন করে?

বাঁশি বলে, চোখ বন্ধ করে থেকো বিনয়-দা। কিম্বা বীরের মতো সরে পোড়ো। তাহলে চোখে দেখতে হবে না।

কেটে কেটে বাঁশি বলে যাচ্ছে, জন্মেছিলাম মস্তবড় অট্টালিকায়। অট্টালিকা ছেড়ে শিয়ালদা স্টেশনে উঠলাম। তাকিয়ে দেখতাম, তারও ছাদ অনেক উঁচু, ঘর অনেক—অনেক বড়। আবার এই যেখানটায় নিয়ে এলে—হাল-ফ্যাশানের ঝকঝকে বাড়ি, ডিসটেমপার-করা ঘর। ভাল করে থাকার কপাল করে এসেছি আমি, নড়বড়ে এঁদোঘরে কক্ষনো যাব না।

বাঁশি হাসে কি কাঁদে বোঝা যায় না। বলে, দেখ, লাঠি-বন্দুক এনে যেদিন তাড়িয়ে দেবে, বেরিয়ে এসে পুকুরঘাটের পাকা রানায়ের উপর থেকে ঝপ্‌পাস করে জলে পড়ব। গাঁয়ের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম, মনে আছে বিনয়-দা? ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবসাঁতার দিয়ে অনেক দূরে ভেসে উঠতাম। এখানে আর ভাসব না, ডুবে থাকব। ভেসে উঠলে দেখবে, আমি আর নেই। পচে ফুলে ঢাক হয়ে গিয়ে তখন আমি আর একজন।

॥ চৌদ্দ ॥

পরের দিন পুলিন চলে এসেছে। সঙ্গে রায়বাড়ির পুরনো দরোয়ানটা শুধু। ঘুরে ঘুরে দেখছে চতুর্দিক। এত করে সে ভয় দেখিয়েছিল, বিনয়টা এসে বলেনি কিছু? বাইরের দু-দু'জন জলজ্যান্ত মানুষ, একজনে তার মধ্যে হাতে-লাঠি ভোজপুরী দরোয়ান, দেখেশুনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—নতুন চালাঘরগুলো থেকে চোখ তুলে দেখল

কতজনা, পুরুষরা দেখল, মেয়েরা দেখল। কিন্তু নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। যে যার তালে আছে। গোরু-ছাগল ঢুকে পাড়ার মধ্যে ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে, এমনিতরো ভাব। ভেবে দেখতে গেলে অপমানই তো হচ্ছে এতে।

এর পরে গিয়ে পুলিন পাকাবাড়ির সামনে দাঁড়ায়। এখানে ঠিক উল্টো ব্যাপার। কোন্ দিকে ছিলেন অশ্বিনী, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন: আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—। চেঁচিয়ে তোলপাড় করছেন।

অশ্বিনীর পাশে সদাশিব। তিনি বলেন, আপনিই তো ম্যানেজারবাবু? পুলিনবাবু আপনি? কী আশ্চর্য, এই কম বয়সে একটা এস্টেটের ম্যানেজার! ম্যানেজার বলতে আমরা বুঝি কাঁচা-পাকা ভারি একজোড়া গোঁফ মুখের উপরে, মাথাজোড়া টাক, ঢাকাই-জালার সাইজের ভুঁড়ি। তেমনি একজন ছিলেন কি না আমাদের গাঁয়ে! এ ম্যানেজার কচি ছেলে একটি। আমার কত ছাত্র আছে আপনার দেড়া-দুনো বয়সের।

অশ্বিনী ওদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছেন: ওরে বাঁশি, সপটা পেতে দিয়ে যা, ম্যানেজারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

নিশ্বাস ফেলে বলেন, সমস্ত খুইয়ে এসেছি ম্যানেজারবাবু, আজ তাই মাদুর পেতে বসতে দিতে হচ্ছে। সামান্য একটা-দুটো জিনিস যা সঙ্গে এনেছিলাম, বর্ডারে কেড়েকুড়ে নিল। কী করছিস মা তুই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের পা ব্যথা হয়ে গেল যে!

শত্রুপক্ষের লোক নয়—গৃহে যেন আকস্মিকভাবে গুরুঠাকুরের শুভাগমন হয়েছে। খাতিরযত্ন তেমন। পুলিন মনে মনে হাসে: বড় সেয়ানা তুমি বুড়ো! এমন বিস্তর দেখা আছে। তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। খাতিরে ভুলে যাব তো সকল দিক সামলে ধাঁ-ধাঁ করে রায়-এস্টেটে সকলের উপর ম্যানেজার হতে পারতাম না।

বাঁশি মাদুর এনে বারান্দার উপর পেতে দিল। দেরি অকারণ নয়, একটু সাজগোজ করেছে ইতিমধ্যে। সাজ আর কি, তোলা শাড়ি বের করে পরেছে একটা। মুখখানা সাবানে ধুয়েছে। ফুল দুটো কানে দিয়েছে। এতেই অপরূপ। বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে রাজকন্যা চৌকাঠ পার হয়ে এল।

কি ভাবে কথাটা পাড়বে, মনে মনে পুলিন ঠিক করে এসেছিল। গোলমাল হয়ে যায়। আশ্চর্য রূপসী মেয়ে—এত রূপ কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ে না। সেই মেয়ে এখানে জঙ্গলপুরীতে এসে পড়েছে! সেইজন্যে তো আরও বেশি করে যাবে চলে, তিলার্ধ থাকা উচিত নয় এখানে।

বারান্দায় মাদুরের উপর পুলিন ভাল হয়ে বসল। দরোয়ানটা অনতিদূরে ঘাটের সিঁড়িতে। ক্ষণকাল চুপচাপ থেকে সহসা আড়ষ্ট ভাব ভেঙে পুলিন বলে ওঠে, দাদা—মানে এই বাগানবাড়ির মালিক রঞ্জিত রায় বড্ড চটেছেন।

অশ্বিনী সন্ত্রস্তভাবে বলেন, কেন চটলেন বাবা? চটবার মতন কী কাজ আমরা করেছি?

না বলেকয়ে এসে উঠেছেন এখানে। ঘর দখল করে আছেন। ছাপাখানা তুলে দিয়ে ঘরগুলো সবেমাত্র এই সেদিন মেরামত শেষ হয়েছে।

অতি নিরীহভাবে অশ্বিনী বলেন, ভাল বাড়ি দেখেই তো এসে উঠলাম বাবা। খোড়োবাড়ি কিম্বা ভাঙাচোরা ঘর হলে কে আসত? শখ করে আসিনি, এসেছি

ইজ্জতের দায়ে। ঘরবাড়ি মান-প্রতিপত্তি সমস্ত ছিল আমাদের। রঞ্জিত রায় মশায়ের কথা সঠিক জানিনে। কিন্তু আমাদেরও সম্ভ্রম কিছু কম ছিল না।

সদাশিব মাঝখানে পরিচয় দেন: সত্যিকার রাজা ছিলেন এক সময় এঁরা। বাড়িটাকে এখনো রাজবাড়ি বলে।

অশ্বিনী বলেন, সমস্ত ছেড়ে চলে এলাম। কারো কাছে কোন অন্যায় করিনি যার জন্যে এত বড় সর্বনাশ আমাদের। শিয়ালদা ষ্টেশনে আস্তানা নিতে হল দশ ভিখারির এক ভিখারি হয়ে। এমনও ছিল অদৃষ্টে!

বলতে বলতে গলা ধরে আসে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সামলে নিলেন অশ্বিনী। এতক্ষণ বলেছেন সমস্ত সত্যিকথা—অন্তর মেলে ধরেছেন বিরুদ্ধপক্ষের মানুষটির কাছে। এবারে ভিন্ন পথ, বিনয়ের উপরের সন্দেহ যাতে ধুয়েমুছে যায়। বলেন, স্টেশন থেকে তাড়িয়ে দিল, তারপর নানান ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছি বাবা। সঙ্গে সোমত্ত মেয়ে। মেয়ে নয়, দুশমন আমার। শেষটা একজনে খবর দিল, দমদমে অমুক বাগান একেবারে খালি পড়ে রয়েছে, বাগানের মধ্যে পাকাবাড়ি। পাকাবাড়ির নাম শুনেই উচিত-অনুচিত না ভেবে ছুটে এলাম। মেয়ে নিয়ে সামাল-সামাল, আমার বাঁশকে দেখলেন তো চোখে। মেয়ের ভাবনায় সারা রাত দু-চোখ এক করতে পারিনি। এই পাকা-দালানের দুয়োরে খিল এঁটে দিলে আর যাই হোক বেড়া কেটে ঘরে ঢোকার ভয়টা থাকে না। যেতে বলেন তো এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। কিন্তু কোনখানে গিয়ে উঠব, তার যদি একটা হদিশ দিয়ে দেন। আমরা নতুন মানুষ, কলকাতার শহরে এই প্রথম। জায়গা চিনিনে, মানুষের সঙ্গে চেনা-পরিচয় নেই।

পুলিন মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে, আমায় 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন? সঙ্কোচ লাগে।

সদাশিব পরমোৎসাহে সায় দেন: ঠিক তাই। বড্ড ভাল ছেলে তুমি। বড্ড দয়ামায়া, কথা শুনে বুঝতে পারি। আমি কিন্তু ঐ 'আপনি' বলার ভয়ে মুখ বন্ধ করে এতক্ষণ চুপচাপ আছি। মেজরাজা 'আপনি' 'আপনি' করছে, তা হেন কানের মধ্যে সীসে ঢেলে দিচ্ছে আমার।

অশ্বিনী বলেন, যে বাড়ির মানুষ আমরা, চিরদিন মানুষজনকে দিয়েছি ছাড়া হাত পেতে কারো কাছ থেকে নিইনি। সেই আমাদের চোরের মতো রাতারাতি অন্যের জায়গায় ঢুকে পড়তে হল। চলে যাব বাবা, তোমার কাছে কথা দিচ্ছি। দরকারের বেশি এক লহমাও পড়ে থাকব না। মেয়েটার বিয়ে দেব, সেই চেষ্টায় আছি। যেদিন হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে দেখবে বাগান তোমাদের খালি হয়ে গেছে। আমার ছেলে আশিস হল মাতব্বর, ঐ যারা পাড়া জমিয়ে আছে সকলের বলভরসা। আমরা চলে যাব, পাড়া-সুদ্ধ সবাই আমাদের পিছু পিছু যাবে। একটি মানুষ পড়ে থাকবে না। ঘেন্না ধরে গেছে বাবা তোমাদের হিন্দুস্থানের উপর। ভাল জায়গা না জোটে, যে দেশ ছেড়ে এসেছি সেইখানে ফিরে যাব।

সদাশিব হেসে রসিকতা করেন: সেই যে বলে থাকে বারউপোসি গেলেন তেরউপোসির বাড়ি—মানে, বারদিন উপোস করে এক বাড়ি গিয়ে অতিথি হলাম, তারা দেখি তেরদিন খায়নি। আমাদের ঠিক সেই বৃত্তান্ত। পাকিস্তানে কি-হয় কি-হয়—সেই ভাবনায় পালিয়ে চলে এলাম। ট্রেন থেকে নেমে দেখি, যমরাজ হাঁ করে রয়েছেন—ভাবাভাবির ফুরসত নেই—হাঁ-য়ের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়তে হল। মেজরাজাকে বলি, ঢের হয়েছে, আর কাজ নেই—চল, ফিরে যাই। যেতে কারু অনিচ্ছা নেই। কিন্তু—

পুলিনকেই অশ্বিনী মধ্যস্থ মেনে বসেন ঃ তুমিই বল বাবা, মেয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে ? ভাল পাত্তর পাওয়া যায় না পাকিস্তানে, সকলেই তো পার হয়ে চলে এল। সোনার পদ্ম কার হাতে তুলে দেব, বল।

পুলিন বলে, সে কথা ঠিক। মেয়ে দেবার উপযুক্ত পাত্র ওদিকে বেশি পাবেন না। বিয়েথাওয়া দিয়েই তবে চলে যাবেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি—ধীরেসুস্থে বাছাবাছি করতে গেলে হবে না। ঐ যে বললুম, দাদা আগুন হয়ে আছেন। ভাগ্যিস এ-সময়টা তিনি বাইরে। এ মাসে ফিরছেন না, বোধহয়। এরই মধ্যে শুভকর্ম সমাপন করে ফেলুন। ফিরে এসে যদি দেখেন বাগান বেদখল করে আছেন, কোনরকমে রক্ষা হবে না। নির্যাতনের চরম হবে আপনাদের উপর। আত্মীয় বলে আমাকেও যে বাদ দেবেন তা নয়। রেগে গেলে বঙ্কিত বায়ের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, শহরসুদ্ধ লোকে জানে।

অশ্বিনী খপ্ করে পুলিনের হাত জড়িয়ে ধরেন ঃ কত জানাশোনা তোমার বাবা, আমরা এ-জায়গায় নতুন। ভাল চাইনে, একটা চলনসই সম্বন্ধ জুটিয়ে দাও আমার মেয়ের জন্য। যত তাড়াতাড়ি পার। কাল হয়ে যায় তো পরশুদিন নয়। কন্যাদায় উদ্ধার হয়ে গেলে কিছুই করতে হবে না তোমাদের—মামলা মোকদ্দমা দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছুই না—আপসে বাগান খালি করে দিয়ে চলে যাব। দু-কথার মানুষ আমি নই। ঐ যত সব এসেছে, জিজ্ঞাসা করে দেখ।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা চলে। বিয়ের সম্বন্ধ জোটানোর ভার নিচ্ছে পুলিন, ঘরোয়া খবরবাদও অতএব নিতে হয়। কোন জাত কি বৃত্তান্ত—খরচপত্র করা সম্ভব হবে কিনা কিছু, এমনি সব বিবরণ।

অশ্বিনী ঘাড় নেড়ে বলেন, সবই তো বর্ডারে নিয়ে নিল। দিন চালানো মুশকিল, তার খরচপত্র! কোনো মহৎ মানুষ মেয়েটা চোখে দেখেই নিয়ে নেন যদি। শুধু শাঁখাশাড়ি দিয়ে সম্প্রদান।

সদাশিব লুফে নিয়ে বলেন, যে মানুষ নেবেন, ঠকবেন না তিনি। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—সেটা শুধু কথার কথা নয়। বাঁশির মতো মেয়ে হয় না।

পুলিন এখন পরম অন্তরঙ্গ। সদাশিবের কথায় উৎসাহ ভরে সে সায় দেয় ঃ তা বটে, তা বটে! আচ্ছা, দেখি আমি খোঁজখবর নিয়ে। পরশু-তরশু আসব আবার। এসে বলব।

চিন্তান্বিত ভাবে পুলিন ফিরে চলেছে। রিফিউজি বলতে পুরোপুরি না হোক অর্ধেক গোছের ভিখারি, এমনি একটা ধারণা ছিল এতদিন। শ্রমবিমুখ মেয়েপুরুষের দল সরকারি ডোলের জন্য হাত পেতে আছে, না পেলে কোলাহল জুড়বে। সম্মানী মানুষে দারিদ্র গোপন করে—আর এদের যত না অভাব, আরও বেশি করে জানান দেয়। নিখরচায় আহার চাই, বসবাসের জায়গা চাই। হুমকি দিয়ে সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিম-বঙ্গের অন্নে ভাগ বসাতে এসেছে, এমনি একটা বিদ্বেষ ছিল মনে মনে। আজকে পুলিন অন্য রকম দেখল। দেবতার মতন রূপ আর আভিজাত্য নিয়ে একটি বিপন্ন পরিবার অকুল-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ফিকফিক করে বাঁশি হাসছে বিনয়ের কাছে গিয়ে। মনে মনে জ্বলেপুড়ে বিনয় বলে, বিয়ের নামেই এত স্ফূর্তি ?

বাঁশি বলে, বিয়ে হয়ে গেলে কি কাণ্ড হবে, সেইটে ভেবে দেখছিলাম। ভাবতে

হাসি পেয়ে যায়। বাবার কাছে দেমাক করছিল, কলকাতার আদি-বাসিন্দা ওরা—জঙ্গল কেটে বসতি। কথাবার্তাও এখনো সেই জঙ্গলের বাঘ-ভালুকের মতো। হালুম-হুলুম, এলুম-গেলুম। মাগো মা, বিয়ে হলে তো একটা কথাও বলা যাবে না ও-বরের সঙ্গে। বলতে গেলে হাসি পাবে।

সেই ভবিষ্যৎ দিনের কথা মনে করেই বুঝি বাঁশি মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে লাগল। তাতে হল না তো আঁচল সরিয়ে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসি। এক চোট হেসে নিয়ে তারপর বলে, তুমিই দায়ী বিনয়-দা। বাগানবাড়ি নিয়ে এসে এই বিপদে ফেলেছ। কী করে ঠেকাবে এখন ভাব।

বিনয় মনে মনে খুশি, পুলিনের সঙ্গে সম্বন্ধ বাঁশি ভেঙে দিতে বলছে। কিন্তু ক্ষমতা কী আছে তার।

মুখেও তাই বলে, জেঠামশায় নিজে কথাবার্তা তুলেছেন. মাস্টারমশায় আছেন তাঁর সঙ্গে। পিসিমা আর আশিসেরও যদি মত থাকে, তার উপরে আমি কী করতে পারি বল।

বাঁশি অধীর হয়ে বলে, আমার যে অমত।

সেই কথা বল তবে ওঁদের—

বাঁশি বলে, তাই বুঝি বলা যায়! তেমনি বাড়ি কিনা আমাদের। সংসারের ভারবোঝা হয়েছি আমি, বিয়ে হলে বোঝা নামিয়ে সকলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। তোমাদের ম্যানেজার এমনি তো পাত্র হিসাবে নিন্দের নয়। বাবাকে বলতে গেলে তিনি আগুন হবেন। পিসিমা তেড়ে এসে চুলের মুঠি ধরবেন.

বিনয়ের হাত দুটি ধরে আবদারের সুরে বাঁশি বলে, আমি কিছু পারব না। যা করতে হয় তুমিই কর বিনয়-দা।

বিনয় তো ভেবে কূলকিনারা দেখে না। বলে, আমি অভিভাবক নই বাঁশি, তোমাদের আমি কেউ নই। কর্মচারীর ছেলে হিসেবে একটু সম্বন্ধ ছিল, তা-ও ঘুচে গেছে। কিসের জোরে কী করি বল? কতটুকুই-বা ক্ষমতা আমার!

স্তব্ধ হয়ে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থাকে বাঁশি। তারপরে বলে উঠল. করতে হবে না কিছু বিনয়-দা। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও গে। বিয়ের নেমন্তন্ন পাবে—আশ্রয়দাতা উপকারী মানুষ, তোমার নাম লিস্টি থেকে বাদ পড়বে না। আমি নিজে গিয়ে বলে আসব। বিয়ে দেখো আমার, ভরপেট নেমন্তন্ন খেও।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বাঁশি একরকম ছুটে বেরুল।

তারপরেও বিনয় ভাবছে। সারাদিন ধরে অনেক রকম ভেবেছে। আজব কান্ড রে বাবা! বড়বাবু নেই বলেই রিফিউজি তাড়ানোর ভার পুলিনের উপরে। সেই সূত্রে এখানে তার আসা-যাওয়া। কিন্তু জবরদখল কলোনি এই একটা মাত্র নয়। শহরতলীর যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা, রাতারাতি সেখানে কলোনি গজিয়ে উঠছে। দু-পক্ষে গোলমাল—এরা তড়পায়, ওরা তড়পায়। চাই কি আদালতে ফৌজদারি-দেওয়ানি রুজু হয়ে গেল দু-পাঁচ নম্বর। মালিকের লোক এল তো ঝগড়াঝাঁটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে এসে। এখানে উল্টো ব্যাপার। মালিকের লোক মাদুর পেতে আসর জমিয়ে বসে ভাব জমায়। ভাব বলে ভাব, মেয়ে বিয়ে করে জামাই হবার চক্রান্ত। বড়বাবু নেই বলেই এমন অরাজকতা। এতদূর সেই জন্যে সাহস করছে।

ভাবতে গিয়ে মনে হল, বড়বাবু নেই—ছোটবাবু তো রয়েছে। ছোট ভাই ইন্দ্রজিত কাঁচা-খেগো দেবতা—এক কথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তড়িঘড়ির কাজ করানোর পক্ষে এই

মানুষ ভাল। অনেক ভাল রঞ্জিত রায়ের চেয়ে।

সমস্ত রাত্রি বিনয় নানান মতলব ফেঁদেছে। ভোরে উঠে চলল সে ভবানীপুর।

॥ পনের ॥

রাত থাকতে উঠে ইন্দ্রজিত কুস্তির আখড়ায় চলে যায়। বোদে বিশে অশোক জানকী এবং আরও বহু সাগরেদ সেই আখড়ায়। ল্যাঙট পরে খালিগায়ে মাটি মেখে কুস্তি করে।

বিনয় সোজা আখড়ায় গিয়ে উঠল। বাইরের লোকের এখানে আসতে মানা। চটে গিয়েছে ইন্দ্রজিত। পেশীবহুল দৃঢ় দেহ—রক্ত-মাংসে নয়, যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া। দৈত্যের মতো এগিয়ে এসে গর্জন করে উঠল: কার হুকুমে তুমি এখানে এলে?

হকচকিয়ে যায় বিনয়—মুহূর্তকাল। কিন্তু বিপদের মুখে বুদ্ধি খুলে গেল। কাতর হয়ে বলে, ছোটবাবু, বড়বাবু বাইরে—আপনিই আমাদের মাথা এখন। আপনি ছাড়া হুকুমের মালিক কে? এমন কান্ড, না এসে উপায় ছিল না। দেরি হলে আপনিই তখন কৈফিয়ত তলব করে বসতেন।

দৃষ্টির ঝাঁজ সঙ্গে সঙ্গে কোমল হয়ে গেল। বড় খুশি ইন্দ্রজিত। লোকজন কেউ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে না। রায়বাড়ির পোষা বিড়ালটার যে খাতির, সেটুকুও তার নয়। কিন্তু রাশভারি মানুষ দাদা উপস্থিত থাকতে কাউকে কিছু বলতে পারে না। বলবে কী—এদিকে এতবড় পালোয়ান মানুষ, কিন্তু ঘাড় তুলে বড়ভাইয়ের মুখোমুখি তাকাবার তাগত নেই।

গায়ের উপর কয়েকটা প্রচন্ড থাবড়া মেরে ধুলোমাটি ঝেড়ে ফেলে ইন্দ্রজিত কতক পরিমাণে ভদ্র হয়ে দাঁড়াল। কর্তৃত্বের সুরে বলে, হুঁ, কী হয়েছে?

বিনয় মনে মনে চমৎকৃত হয়ে গেছে। এমন কায়দার কথা মুখে আসে, আগে কে জানত। বাঁশির বিপদ, কথা তাই আপনা-আপনি ঠোঁটে এগিয়ে আসে। কথার গুণে হিংস্র বাঘ বশ হয়ে গেল।

সাহস পেয়ে তখন সে আরও কিছু ভূমিকা করে নেয়: ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া হয়ে যাচ্ছে ছোটবাবু। ম্যানেজার পুলিনবাবু বলতে গেলে উপরওয়ালা আমার—তাঁরই সম্বন্ধে বলা। কিন্তু আপনাদের বাগান দেখাশোনার ভার আমার উপর দিয়েছেন। সেই বাগানের মধ্যে এতবড় ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। হয়ে গেলে তখন যে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। অসময়ে তাই আসতে হল। নইলে আমার উপরেই দোষ পড়তে, জেনেশুনে আমি গোপন করে গিয়েছি। আপনি আমায় খুন করে ফেলতেন।

ইন্দ্রজিত অধীর কন্ঠে বলে, কী করেছে পুলিন-দা, তাই বল।

বাগানে রিফিউজি ঢুকে পড়েছে। তাদের তাড়াবার জন্য বড়বাবু ম্যানেজারকে বলে গেছেন।

জানি—

দাদার উপরে ইন্দ্রজিতের কিছু অভিমান আছে। সে যে পদ্ধতি বাতলেছিল সেটা না নিয়ে পুলিনের উপরে ভার দিয়ে গেলেন। বলে, তাড়াচ্ছে না বুঝি ম্যানেজার—ঘুষ খেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে? সে আমি জানতাম।

ঘুষ নয়। বিয়ে করে ফেলছেন রিফিউজিদের একটা মেয়ে। জামাই হচ্ছেন।

উত্তেজিত কন্ঠে ইন্দ্রজিত বলে, সেই তো বড় ঘুষ। টাকাপয়সা কোথায় পাবে

রিফিউজিরা? তাই মেয়ে ঘুষ দিচ্ছে। ঘুষ পেয়ে জামাই গণ্ডগোল চাপা দিয়ে দেবে। মনের সুখে ঘরবসত করবে ওরা। মানুষ চেনেন না দাদা, দুটো 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' শুনেই গলে যান। এই ঘুষখোরটার উপর সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন।

গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ, অধিক ভাবনাচিন্তার ধার ধারে না, যা করবার লহমার মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। ল্যাঙট ছেড়ে ধুতিটা কোন গতিকে জড়িয়ে ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে দ্রুত-পায়ে ইন্দ্রজিত বাড়ি ছুটল। সোজা অফিসঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, ম্যানেজার কোথা গেল—পুলিন-দা?

দরোয়ান অবাক হয়ে গেছে এই কাগজপত্র ও হিসাবকিতাবের ঘরে ছোটবাবুর আবির্ভাব দেখে। কোনদিন ইন্দ্রজিত এমুখো হয় না।

এত সকালে তিনি তো আসেন না—

যেখানে থাকে, ডেকে নিয়ে এস। এক্ষুণি—এই দণ্ডে।

বিনয় ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। এই ব্যাপারে তার কোন হাত আছে, গোপন থাকা ভাল। ইন্দ্রজিত অধৈর্য হয়ে রোয়াকে এসে এগিয়ে দাঁড়ায়। পুলিনকে দেখে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: বিয়ে করছ নাকি তুমি?

পুলিন তার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে বলল, ভিতরে গিয়ে বসি চলুন।

ঘরে ঢুকে ইন্দ্রজিত বলে, শুনতে পেলাম, তোমার বিয়ে হচ্ছে পুলিন-দা।

পুলিন দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, ঠিকই শুনেছেন।

রিফিউজিদের এক মেয়ে?

পুলিন বলে, পাকেচক্রে আজকে সেইরকম দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু রাজবাড়ির মেয়ে।

ইন্দ্রজিত বলে, রাজা তো এখন পথে-ঘাটে। দেখেশুনে সামাল হয়ে পা ফেলতে হয়, কখন কোন রাজাকে মাড়িয়ে ফেলি।

একথার কী জবাব দেবে পুলিন!

ইন্দ্রজিত বলে চলেছে: তুমি শুধুমাত্র কর্মচারী নও, আত্মীয়-সম্পর্ক তোমার সঙ্গে, দাদা বলে ডাকি। অচেনা মানুষ তারা, দেশভুঁই কুলশীল কিছুই জানা নেই—বিয়ে অমনি করলেই হল! বিয়ের ইচ্ছে হয়ে থাকে তো মেয়ের কিছু অভাব আছে? ক-ডজন চাই মেয়ে? বিশে বোদে জানকী ওদের বলে দিচ্ছি। ভাল ভাল ঘর থেকে মেয়ের খোঁজ এনে দেবে।

পুলিন বলে, অশ্বিনীবাবু বাজে লোক নন। আমাদের স্বজাতিও বটেন। ওঁদের অঞ্চলের মধ্যে সবাই একডাকে চেনে। ভাল রকম খবরাখবর নিয়ে তবে এগিয়েছি।

ইন্দ্রজিত রায় দিয়ে দেয়: হবে না বিয়ে। জবরদস্তি করে বুকের উপর চেপে বসেছে, বুকে বসে দাড়ি ছিঁড়ছে। আমাদের মহাশত্রু—তাদের সঙ্গে তোমার ভাবসাব। আশ্চর্য!

এবার কিছু চটে গিয়ে পুলিন বলে, ভাব জমাতে হয় দায়ে পড়ে। দাদার হুকুম যে তাই। আপনি তো উপস্থিত ছিলেন সেই সময়। দাদা বললেন, মামলা-মোকদ্দমার কারণ না ঘটে, সব দিকে গোলমাল বাধিয়ে পেরে উঠব না, মিষ্টি-কথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে সরিয়ে দাও। দাদা না বললে এত বাজে সময় আমার নেই যে একঘণ্টা দু-ঘণ্টা বাগানে বসে মশার কামড় খাই। এমন টানাপোড়েন করতে দেখেছেন আগে কখনো?

ইন্দ্রজিত বলে, ভাব জমিয়ে জমিয়ে তাই বলে বিয়ে করে বসবে?

দায়ে পড়ে। নইলে কিছুতে ওঁরা সরবেন না, ধনুক-ভাঙা পণ ধরে আছেন।

অশ্বিনীবাবু কথা দিয়েছেন, মেয়ের বিয়ে যে দিন হয়ে যাবে, ঠিক তার পরের দিন যেখানকার মানুষ সেইখানে দলসুদ্ধ ফেরত চলে যাবেন। পাকিস্তানে সবই আছে—মেয়ের উপযুক্ত বরপাত্তর নেই। কাজকর্ম ছেড়ে আমি এখন কোথায় ওদের জন্য হন্ড-হন্ড করে পাত্র খুঁজে বেড়াই! শেষটা তাই বলতে হল, ফেসুন কিনে টোপর, মাথায় চাপিয়ে বরাসনে বসে পড়ি।

ইন্দ্রজিতের রাগ চলে গিয়ে পুলিনের উপর সমবেদনা জাগছে। মনিবের ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বেচারি এই কাজ করতে যাচ্ছে। কথা দাঁড়াচ্ছে রিফিউজি তাড়ানো নিয়ে। দাদা যখন উপস্থিত নেই, কর্তা ইন্দ্রজিত। নিজের মতলব খাটিয়ে দেখবে সে এই সুযোগে।

ইন্দ্রজিত বলে পাত্র খুঁজতে হবে না তোমায়, বরাসনেও বসতে হবে না। দায়িত্ব থেকে রেহাই দিচ্ছি পুলিন-দা। কোনদিন আর বাগানমুখো যেন যেতে দেখিনে। আমার এই শেষ কথা। আমি ভার নিলাম—যা করবার, আমিই করব। কী করব তা-ও বলি। তোমাদের ঐ প্যানপেনে পলিসি আমার নয়। একদিন গিয়ে—একদিন কেন, আজ বিকালেই—টুঁটি ধরে ঐ ক'টাকে রেলরাস্তার ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে আসব। ব্যস, খতম!

পুলিন সভয়ে বলে, কী সর্বনাশ! ফৌজদারি জুড়ে দেবে ওরা কোর্টে গিয়ে। দাদা পই-পই করে মানা করে গেছেন। বাঙাল মানুষ—জানেন না ওদের, যেমন তাঁদোড় তেমনি মামলাবাজ।

ইন্দ্রজিত অধীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, কোর্টে যাবার তাগত থাকতে ছেড়ে আসব নাকি? যায় তো হাসপাতালে যাবে অন্য কোথাও নয়। তুমি চুপচাপ খাতাপত্তর লেখগে বসে। তোমায় এসব ভাবতে হবে না।

যেমন কথা, সেই কাজ। বিকালবেলা ইন্দ্রজিত জীপ হাঁকিয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল। জীপ ভরতি বাছা বাছা চার সাগরেদ—জানকী বিশে বোদে ও অশোক। আরও জন দশেক আখড়ায় মজুত করে রেখে এসেছে: দরকার পড়লে জীপ পাঠিয়ে দেব। সে দরকার পড়বে না জানি। আমাদের পাঁচজনকে খতম করে তবে তো! তবু তৈরি থেকো তোমরা।

ইন্দ্রজিত এমনি খাসা মানুষ, কিন্তু রাগলে কোন-কিছুতে পিছপাও নয়। সেই মানুষটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এল—তারপর থেকে বিনয়ের সোয়াস্তি নেই! কী কান্ড ঘটে না-জানি! ক্ষণে ক্ষণে বাগানের ফটকে এসে দেখে। ফিরে এসে আদ্যোপান্ত বাঁশিকে বলেছে। বলে, ভাল করলাম কি মন্দ করলাম কে জানে! হাতে মাথা-কাটা মানুষ—কখন এসে পড়ে দেখ। খাতির-টাতির কোরো। যেমন রঞ্জিত রায় তেমনি ইন্দ্রজিত রায়—বাগানবাড়ির মালিক দু-জনেই ও'রা।

এসে পড়ল এতক্ষণে। একরশি দূর থেকেই হাঁক পাড়ছে: অশ্বিনীবাবু কে আছেন? বাইরে চলে আসুন। বেরিয়ে বারান্দায় আসুন এক্ষুণি।

তড়াক করে লাফিয়ে নামল জীপ থেকে। অশ্বিনী হন্তদন্ত হয়ে আসেন। এসে হাতজোড় করে দাঁড়ান: আসতে আজ্ঞা হোক ছোটবাবু। আজ আপনার পায়ের ধুলো পড়তে পারে—বাঁশি তাই বলছিল। ওরে বাঁশি, চেয়ার বের করে দে। প্যান্টলুন পরা ছোটবাবু মাদুরে বসতে পারবেন না।

ইন্দ্রজিত ভ্রুকুটি করে বলে, চেয়ার লাগবে না। বসবার জন্য আসি নি। কিন্তু

বাঁশিটি কে শুনি ? আমি আসব, সে লোক টের পায় কেমন করে ?

অশ্বিনী বলেন, আমার মেয়ে বাঁশি। মেয়ে নয়, গলার কাঁটা। গিলতে পারিনে, উগরে ফেলতেও পারিনে। মেয়ের দায়ে পড়েই আপনাদের জায়গার উপর আশ্রয় নিতে হয়েছে।

ইন্দ্রজিত গর্জন করে ওঠে : জায়গা ছেড়ে মান থাকতে থাকতে আপসে চলে যাবেন কিনা জানতে চাই।

সদাশিব এসে পড়েছেন। সকাতরে তিনি বলেন, সে কী কথা। আপসে নয় তো কি হাঙ্গামা করতে যাব ? সে মানুষ আমরা নই বাবা। সাতপুরুষের ভিটেমাটি গাঁ-গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি। কিসের জোরে তোমাদের হকের বাগান আঁকড়ে থাকতে যাব ? জায়গা দেখাদেখি হচ্ছে। কোনরকমে মাথা গুঁজবার মতন জায়গা পেলেই চলে যাই।

ইন্দ্রজিত মাটিতে জুতো ঠুকে বলে, ওয়াদার ধার ধারিনে মশায়।

আজকে—এক্ষুণি যেতে হবে। না যাবেন তো ওষুধ আছে। সে ওষুধ যৎসামান্য সঙ্গে আছে, বাকি সব আখড়ায় রেখে এসেছি। বলে সে জীপের চার জনকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

অশ্বিনী নির্বিকার শান্ত কণ্ঠে মেয়েকে ডেকে বললেন, ওরে বাঁশি, ছেলেরা সব এসেছেন। পাঁচ জন। তাড়াতাড়ি পাঁচ কাপ চা করে দে মা। অতগুলো কাপ নেই তো আমাদের—নীরেনের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়।

ইতিমধ্যে হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারটা টানতে টানতে বারান্দায় এনে দিয়ে বাঁশি সামনের মাঠটুকু পার হয়ে নীরেনের বাড়ির দিকে গেল। ইন্দ্রজিত দেখছে তাকিয়ে, জীপের ছোঁড়ারাও দেখল। দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রজিত, আস্তে আস্তে বসে পড়ল চেয়ারে। বলে, আজকে যাওয়ার নিতান্তই যদি অসুবিধা থাকে—বলে দিন কবে যাচ্ছেন। খুব বেশি তো এক হপ্তা, তার উপরে কিছুতে নয়। যেতেই হবে, থাকা চলবে না। পাকা-কথা শুনে নিয়ে তবে নড়ব। মিউমিউ-করা মেনি-মুখো পুলিন-দা পান নি আমায়—

অশ্বিনী বলেন, ঐ যে চেয়ার দিয়ে গেল—আমার মেয়ে বাঁশি। পাকা-কথাই দিচ্ছি, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে তারপরে একটা মিনিটও আর থাকব না। হিন্দুস্থানেই থাকব না। কলকাতার থুরে দণ্ডবৎ রে বাবা—নিজের জায়গায় যাব। কিন্তু সোমত্ত মেয়ে কাঁধে নিয়ে ফিরে যাই কেমন করে ? যাওয়া কি উচিত, আপনিই বলুন বিবেচনা করে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইন্দ্রজিত বোধ করি বিবেচনাই করছে মনে মনে। পুলিন-ঘটিত ব্যাপারটা এঁদের মুখ থেকেই শুনে নিতে চায়। বলে, এল সম্বন্ধ কিছু ?

পুলকিত স্বরে অশ্বিনী বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেছে একটা। বয়স কম, অত্যন্ত সৎ ছেলে, বি. এ. পাশ। বাইরের কেউ নয়, আপনাদের ম্যানেজার পুলিনবিহারী। যার নাম করে ঐ বলছিলেন। ইন্দ্রজিত খিঁচিয়ে ওঠে : বি-এ পাশ বলে কপালে দুটো শিং উঠেছে নাকি ? পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, খবর রাখেন না। করপোরেশনে মেথর-ঝাড়ুদার চেয়েছিল—এক-শ বি-এ-র দরখাস্ত পড়ে গেল সেই চাকরির জন্য।

অশ্বিনী বলেন, কিন্তু আমাদের পুলিনবিহারীর চাকরি তো ভালই। দেড়শ-টাকা করে দেন আপনারা। তার উপরে আপনাদের নেকনজরে আছে, আত্মীয়সম্পর্ক রয়েছে। ধাঁ-ধাঁ করে অনেক উন্নতি হবে, কী বলুন ?

সে যখন হয়, তখন হবে। মাইনে দেড়-শ কি কত, তা-ও সঠিক বলতে পারব না। দাদা জানেন। দেড়-শ টাকাই ধরে নিচ্ছি—একলা একটা মানুষেরই তো ওতে কুলায় না। এই ধরুন, তিরিশ দিনে সের ত্রিশেক মাংস—তাতেই লেগে গেল নব্বুইয়ের উপর। কত বাকি রইল হিসেব করে দেখুন এবার। দেড়-শ টাকা পায়, সেই মানুষের আবার বিয়ে করে পরের মেয়ে ঘরে আনার শখ। ছি-ছি!

অশ্বিনী যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন: সর্বনাশ, অতশত ভেবে দেখিনি তো! দেড়-শ টাকায় একজনেরই চলে না, দু-দুটো মানুষের কেমন করে চলবে। বাড়ি-ঘরদোর ছেড়ে এসে মাথায় আর কিছু নেই ছোটবাবু। আগুপিছু ভেবে দেখিনে। ঠিক বলেছেন, না খেয়ে মরবে আমার বাঁশি। কী মেয়ে দেখলেন তো চোখে। নিজের মেয়ের সম্বন্ধে জাঁক করে কিছু বলব না—

কথা শেষ হতে না দিয়ে ইন্দ্রজিত বলল, পুলিন-দা'র সঙ্গে আপনারা বিয়ে দিতে চাইলেও আমি দিতে দেব না। মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেওয়া। স্পষ্ট কথার মানুষ আমি, ঢাক-গুড়গুড় নেই। মানা না শুনলে ওষুধ প্রয়োগ হবে।

জীপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, যে ওষুধের সামান্য কিছু ঐ দেখতে পাচ্ছেন।

এমনি সময় বাঁশি থালায় উপর পাঁচ কাপ চা সাজিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরুল। জীপের চারজনকে দিয়ে বারান্দায় উঠে শেষ কাপ ইন্দ্রজিতের হাতে দিল। দিয়েই দালানে ঢুকে যাচ্ছিল, অশ্বিনী মেয়ের পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, একটুখানি দাঁড়িয়ে যা মা। ছোটবাবু, এই আমার বাঁশি। দেখুন, চেয়ে দেখুন। বাপ বলে মেয়ের সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলিনে—

সদাশিব সগর্বে বলেন, আমার ছাত্রী—আমার কাছে পড়ে পাশ করল। কিন্তু আমিই-বা কতটুকু পড়ালাম, মেয়েই বা ক'দিন পড়ল। পরীক্ষায় বসে কী সব লিখে এল, পাশ হয়ে গেল ফার্স্ট-ডিভিসানে। একটু যদি পড়ত, স্কলারশিপ পেয়ে যেত। তিরিশ বছরের মাস্টারির মধ্যে এমন বুদ্ধিমতী আমি দেখিনি বাবা। ডাকি আমি কাঞ্চনবরনী বলে—

বাঁশির একখানা হাত তুলে ধরে বলেন, তপ্ত কাঞ্চনের আভা। নামটা সেকেলে, কিন্তু এর চেয়ে মানানসই নাম আমার মনে আসে না। রাজবাড়ির মেয়ে, রাজপুত্তুর ছাড়া এ-কন্যা মানায় না। মেজরাজাকে তাই বলি, পুলিনের মতন পাত্রের হাতে কেন দিতে যাবে? থাকুক মেয়ে ঘরে, যেদিন ভাল বর জুটবে বিয়ে-থাওয়া সেইদিন। আজকে তুমিও আমার মতে মত দিলে বাবা।

অশ্বিনী বললেন, শিব-দাদা বলেন বটে, কিন্তু আমি তেমন আমল দিইনে। ভাল বর পাচ্ছি কোথা পুলিনবিহারীর চেয়ে? আপনার কথায় আজকে ভয় ধরে গেল ছোটবাবু। এতখানি কখনো তলিয়ে দেখিনি। ভাবনার কথাই বটে। শিব-দাদার কাঞ্চনবরনী যার তার হাতে পড়ে অন্নাভাবে উপোস করে না মরে।

বাঁশি ইতিমধ্যে চলে গেছে কখন। ইন্দ্রজিত জীপের দিকে হাঁক দিয়ে বলে, ড্রাইভার বাবুদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে তুমি চলে এস আবার। আমি রইলাম, একটু কথাবার্তা বলে যাই। ফিরে এসে ফটকের সামনে রাস্তার উপরে থেকো, গাড়ি ভিতরে আনবার দরকার নেই। আখড়ায় অমনি একটা খবর দিয়ে এস, যে যার বাড়ি চলে যাক।

মাদুর পেতে সদাশিব ও অশ্বিনী বারান্দায় বসে পড়লেন। ইন্দ্রজিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়: বা-রে, আমি কাঠ-কাঠ হয়ে থাকতে গেলাম কেন!

প্যান্টলুন গুটিয়ে পা ছড়িয়ে সে-ও বসে পড়ল মাদুরে।

কথাবার্তা হল অনেক। বিবেচনা করে ইন্দ্রজিতও সায় দেয়। মেয়ের বিয়ে না দিয়ে দেশেঘরে ফেরত যাওয়া উচিত হবে না। বিপদ কখন কোথায় লুকিয়ে থাকে, কেউ বলতে পারে না। এটা তবু শহর জায়গা—দরকার মতন সব রকম ব্যবস্থা হতে পারে। তার উপরে ইন্দ্রজিত সহায় রইল আখড়ার দলবল নিয়ে, দুনিয়া যারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

রাত্রি প্রহরখানেক হতে অবশেষে ইন্দ্রজিত উঠে দাঁড়ায়। অশ্বিনী শুষ্কমুখে বলেন, কী যে করব ছোটবাবু, চোখে আমি অন্ধকার দেখছি। বাগান ছেড়ে যাবার জন্য আপনারা তাড়া দিচ্ছেন। অন্যের জায়গা জুড়ে রয়েছি—অন্যায় আমাদের ষোলআনার উপর আঠারআনা। বুঝি সমস্ত, কিন্তু কূলকিনারা দেখিনে। ঐ পুলিনবিহারি ছাড়া অন্য সম্বন্ধ একটাও এল না। অথচ আপনি মানা করছেন—

ইন্দ্রজিত উত্তেজিত ভাবে বলে, তার চেয়ে মেয়েকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যান। পুলিন-দার মতো পাত্রের চেয়ে সে অনেক ভাল। বাগান ছাড়তে বলছি বলে যে এক্ষুণি ছুটে পালাতে হবে, তার কোন মানে আছে? দাদার আসতে এখনো বিশ-পঁচিশ দিন—ততদিন স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। তার মধ্যে ভাবনাচিন্তা করুন, কোন ভাল পাত্র মনে আসে কিনা। আমিও ভাবি।

ভাবনাচিন্তা ইন্দ্রজিত অনেক করল, ভাবনার চোটে সে রাত্রি লহমার তরে দু-চোখ এক করতে পারেনি। ভোরে উঠে কুস্তি ও ডনবৈঠক করে—করতেও গিয়েছিল তাই। কিন্তু স্ফূর্তি লাগে না। ধ্বক করে সমাধান একটা মনে এসে যায়। এবং যেইমাত্র মনে আসা—তিলার্ধ দেরি নয়, আখড়া থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে জামা-কাপড় পরেই রওনা। জীপ এখন নেই, জীপের পরোয়াও সে করে না—খানিক পথ বাসে চড়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে বাগানে এসে উপস্থিত। ডাকাডাকিতে অশ্বিনী আর সদাশিব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম অশ্বিনীবাবু—উঁহু, নাম ধরা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না এখন। কী বলেন মাস্টারমশায়?

॥ ষোল ॥

সকলে খুশি। ভাগ্য করে এসেছে বটে বাঁশি। এবং আরও ভাগ্য, দেশ ভাগাভাগি হয়ে হুল্লোড় বেধে গেল। সোনাটিকারি ছেড়ে সেই জন্যে আসা গিয়েছে। নয় তো কলকাতায় এমন ঘর-বর স্বপ্নেও ভাবা যেত না।

কেবল সদাশিব চিন্তান্বিত। তিনি মাথা নাড়ছেন: কাঞ্চনবরনী আর ছোটটি নয়। তার মতটা জিজ্ঞাসা কর হে তোমরা।

অশ্বিনী বলেন, লাখ টাকা খরচ করে এমন পাত্র মেলে না। এর মধ্যে জিজ্ঞাসার কী আছে? বড়লোক ওরা—কিন্তু সেটা কতখানি আন্দাজ করতে পার? বিনয়ের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি সব খবর নিয়েছি। পাঁচ-পাঁচটা কলিয়ারি, বোন-মিল, কাঠের আড়ত, কলকাতার উপর বাড়ি চারখানা, মধুপুরে বাড়ি। আর এই শখের বাগানবাড়ি, যেখানটা উঠেছি আমরা। চার হাত এখন এক করতে পারলে হয়, ওর বড়ভাই সেই পাজিটা এসে পড়বার আগে।

কিন্তু সদাশিব নিরস্ত হন না। বিরজাকে বলেন, তা হোক দিদি, তুমি একটিবার জিজ্ঞাসা কর। মেয়েরা মেয়েদের কাছে মন খুলে বলে। আশিসও জিজ্ঞাসা করে

দেখতে পারে, পিঠোপিঠি ভাই-বোন ওরা। আশিসকে হয়তো সব বলবে।

বিরজার জিজ্ঞাসার আগেই বাঁশি নিজে থেকে বলছে, এত শক্তি আমার কে জানত পিসিমা? রাজবাড়ির দেয়ালে আটক রেখেছিলে, এক-পা পাড়ায় বেরিয়েছি তো রে-রে করে উঠতে। পায় যদি তো আরও দুটো-চারটে মাস টালবাহানা কর। খবর ছড়িয়ে গেলে কোন দিন দেখবে রাজভবন থেকে খোদ গভর্নর এসে তোমাদের বারান্দায় মাদুরে চেপে বসেছেন।

আশিস এসে বলে, ভেবে দেখেছিস ভাল করে? তোর নিজের কী মত?

বিয়ের এসব কথা ভাবছিনে তো দাদা, ভাবছি কেবলই নিজের কথা। হাসতে হাসতে বলছিল বাঁশি, কণ্ঠস্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলতে লাগল, নিজের উপর ঘেন্না হয়ে যাচ্ছে দাদা। ঘেন্না এই গায়ের কটা চামড়ার উপর, মাস্টারমশায় যার জন্য কাঞ্চনবরনী বলে অত ব্যাখ্যান করেন। আমি মরে গেলে, ধর মাঠের মধ্যে মড়া ফেলে দিয়ে এলে। শকুন এসে পড়বে, কাক আসবে, শিয়াল আসবে। জ্যান্ত থাকতেও যে তাই। শিয়ালদা স্টেশনে ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখতে বললেন পিসিমা। হাতখানেক ঘোমটা টেনেছিলাম সেই ক'দিন—ভালই হল, নয় তো বরে বরে দাঙ্গা বেধে যেত। সেই জন্যে বলি দাদা, তাড়াহুড়ো নয়, আরও কিছু দিন খেলিয়ে দেখ। কত উঁচুতলার আসতে পারে, সেটা এখন তোমাদের ধারণায় আসছে না।

এবং তারপরে বাঁশি কাঁদো-কাঁদো হয়ে নিজেই বিনয়ের কাছে গিয়ে পড়ল: সর্বনাশ, বিনয়-দা। চোর তাড়িয়ে ডাকাত পত্তন করলে, বিড়াল তাড়িয়ে বাঘ। তোমার ছোটবাবুর এক তিল আর দেরি সইছে না। বলে, মাসের এই ক'টা দিনের মধ্যে বিয়ের কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে। বলে, আর পালোয়ান বর আস্তিন তুলে মাসল দেখায়।

বিনয় বলে, রাজবাড়ির মেয়ে, বড়লোকের বাড়ি ছাড়া মানাবে কেন তোমায়?

নিশ্বাস ফেলে বলে, ভালই হবে। বাগানবাড়িটা তোমার এত পছন্দ—বিয়ের পরে তুমিই আটখানা হিস্যার আইনসঙ্গত মালিক হয়ে বসবে। আমার চাকরিটুকু দয়া করে বজায় রাখ তো থাকব, নয় তো বাবার মতোই চলে যাব কোন এক দিকে।

বাঁশি সভয়ে বলে, রক্ষে কর। ঐ বরের বউ হয়ে আমি বাগানের মালিক হতে চাইনে। বাবা আর মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল—যেন ষাঁড় চেঁচাচ্ছে। বুকের মধ্যে গুরগুর করছিল আমার।

বলতে বলতে ফিক করে হেসে ফেলে। বলে, তোমার কাছে আমার লজ্জা করে না বিনয়-দা। বিয়ে করে যখন ভালবাসার কথা বলবে—মানুষজন ছুটে এসে পড়বে। দাঙ্গা বেধেছে বুঝি। ভালবেসে একখানা হাত যদি ধরে তো গেছি আমি, মটমট করে হাড় চুরমার হয়ে যাবে।

বিনয় বলে, এ তো বড় ফ্যাসাদ। এমন বর, তা-ও তোমার পছন্দ নয়। তবে কি আকাশের চাঁদ নেমে এসে পিঁড়ির উপর দাঁড়াবে।

চাঁদ আরও বেশি অপছন্দ। নাক নেই, চোখ নেই, গোলাকার থালার মতন সেই বর নিয়ে আমি কি করব! পছন্দের বরের কথা বলব তোমায় একদিন ভেবেচিন্তে। এই বীর হনুমানটিকে তাড়াও দিকি এখন।

বিনয় বলে, সেই তো মুশকিল! দুনিয়ার মধ্যে এক বড়বাবু আছেন, তিনিই শুধু ছোটভাইকে সামলাতে পারেন। ঐ যে অত হম্বিতম্বি দেখলে, বড়বাবুর সামনে একেবারে কেঁচো। এ-মাসটা বড়বাবু কলকাতার বাইরে, এই ফাঁকে বিয়ের কাজ চুকিয়ে

ফেলতে চাচ্ছে। একবার হয়ে গেলে তারপরে আর রদ হবে না তো। বড়বাবু এসে যত রাগই করুন, ভাইয়ের বউকে ফেলে দিতে পারবেন না। সেইটে ভাবছে।

বাঁশি বলে, কিন্তু আমি ভাবছি, এই লোক তোমার রোগাপটকা পুলিনবিহারী নয়। তুমি শত্রুতা করছ কোন গতিকে টের পেলে হাড়গোড় চুরমার করে দেবে একেবারে।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলে, কাজ নেই বিনয়-দা, তোমায় কিছু করতে হবে না। বাড়িসুদ্ধ সকলে খুশি, আমিই-বা কেন খুশি হতে পারব না? ইচ্ছের বর ক-জনের ভাগ্যে ঘটে বল।

এমনি সমস্ত বলে বাঁশি চলে গেল। কপালে যা-ই থাক, এত কথার পরেও বিনয় চুপচাপ থাকে কেমন করে? খানিকটা ভেবেচিন্তে সে ভবানীপুর রায়বাড়ি চলে গেল।

চুপিচুপি পুলিনকে শুভসংবাদ জানিয়ে দেয়ঃ ছোটবাবুর যে বিয়ে। শোনেন নি ম্যানেজারবাবু? বাগানবাড়ি ধুমধাড়াক্কা পড়ে গেছে। মা-বাপ নেই, মাথার উপরে শুধু এক বড়ভাই। বিয়ের সময়টা তাঁর নিশ্চয় থাকা উচিত। আপনি কী বলেন?

পুলিন স্তম্ভিত হয়ে তাকায়। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনল। তারও ঠিক সেই মত। বলে, নয় তো পরে এসে দুঃখ করবেন দাদা। আমার উপরে দোষ পড়বে। বলবেন, ভাই না হয় লজ্জায় লিখতে পারে নি, তুমি তো ছিলে। তুমি কী জন্য খবরটা দিলে না?

বিনয় বলে, সন্দেহ করবেন, আমরা সবাই আছি চক্রান্তের মধ্যে। আমি ঐ বাগানবাড়ি পড়ে থাকি, আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। বড়বাবুকে তা হলে একটা চিঠি দিন ম্যানেজারবাবু।

পুলিন বলে, চিঠি নয়, টেলিগ্রাম। ভাল হয়েছে, আজকে দাদা পাটনায় আছেন অন্য একটা মামলায়। এক্সপ্রেস-টেলিগ্রাম করলে দুপুর নাগাদ হাতে পৌঁছে যাবে।

টেলিগ্রাম পেয়ে রঞ্জিত মাথার হাত দিয়ে পড়লেন। বজ্রপাত হয়েছে যেন। এই কখনো হতে পারে—এত দূর সাহস ইন্দ্রজিতের কেমন করে হয়। একটি মাত্র ভাই—তার বিয়ের কত জাঁকজমক হবে ভেবে রেখেছেন। কিন্তু বিয়ের নামেই ইন্দ্রজিত তেরিয়া হয়ে ওঠে। ব্যবসা ও বিষয়আশয়ের ঝঞ্ঝাট একটার পর একটা এসে পড়ছে—তেমন জোর করে তাই লাগতে পারছেন না। এতদিনে হঠাৎ যদি সুমতি হয়ে থাকে, কত কত উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে—সর্বস্ব ফেলে-আসা নিঃস্ব লোকের জামাই হতে যাবে সে কোন্ দুঃখে!

মামলা ছিল পরের দিন, বিস্তর কষ্টে সেটা সোমবারে নিয়ে ফেলা গেল। রঞ্জিত কলকাতা ছুটলেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির দরজায় পা দিয়েই—ইন্দ্রজিত কোথা?

ইন্দ্রজিতকে ডেকে আনতে বুড়ো দারোয়ানকে পাঠালেন।

বিয়ে হচ্ছে তোমার, খবর পেলাম।

খবর দিল কে দাদা?

প্রশ্নটা হুংকারের মতো শোনায়। দৃষ্টি ইন্দ্রজিতের তবু ভাইয়ের দিকে নয়, মেজের দিকে নামানো।

রঞ্জিত জবাব দিলেন, খবর সত্যি হলে দেওয়াটা কিছু দোষের নয়। সত্যি কি মিথ্যে, তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি।

ইন্দ্রজিত বলে, সত্যি—

আমার ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ আমি করলাম না, জানতেই পারিনে কিছু—বিয়ের মাতব্বরটা কে, জিজ্ঞাসা করি ?

ইন্দ্রজিত চুপ করে থাকে।

নাম বল, কে ঘটকালি করছে ? পাটনায় এই নতুন জুতো কিনেছি—দুটো পাটিই তার পিঠে ছিঁড়ব। বল, কে ?

ইন্দ্রজিত জড়িত কণ্ঠে বলে, এর মধ্যে ঘটক কেউ নেই দাদা। পুলিন-দা পেরে উঠছে না বলে দলবল নিয়ে আমি বাগানে চলে গেলাম। সমস্ত রিফিউজি একেবারে উচ্ছেদ করে আসব—

তার বদলে বিয়ে সাব্যস্ত করে এলে ওদের মেয়ের সঙ্গে ?

কী করব। অশ্বিনীবাবু কন্যাদায়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে কিছুতে নড়বেন না। ধরাধরি করতে লাগলেন—

ধরাধরি আরও লোকে করছে। আজ নয়, দু-বছর ধরে। একজন হলেন পাতি-পুকুরের দে-সরকার মশায়। শুধুমাত্র হাতের ধরাধরি নয়—দেড়-শ ভরি সোনা, একসেট জড়োয়া, নগদ রুপেয়া আট হাজার—

ইন্দ্রজিত মরীয়া হয়ে বলে, আমি ওঁদের কথা দিয়ে ফেলেছি দাদা। দিনক্ষণও একরকম স্থির।

রঞ্জিত বলেন, কথা আমারও দেওয়া। আজ নয়, দু-বছর আগে। পাতিপুকুরদের বলা আছে, ভাই যদি কখনো বিয়েয় রাজি হয়, ওখানেই হবে।

ইন্দ্রজিত নিঃশব্দে হাতের গুলি ফুলিয়ে তুলেছে।

রঞ্জিত আরও উত্তেজিত হয়ে বলেন, জবাব দিতে হবে তোমার, চুপ করে থাকলে হবে না। দুই জনে আমরা কথা দিয়ে বসে আছি—কার কথা থাকবে ? তোমার, না তোমার বড় ভাইয়ের ? বড় হয়েছ এখন, বুদ্ধিবিবেচনা হয়েছে, জবাবটা শুনে চলে যাই। কে কর্তা সংসারে—তুমি, না আমি ? বিয়ের পাকা-কথা দেওয়া কার এক্তিয়ার ?

ইন্দ্রজিত মিনমিন করে বলে, আজ্ঞে, আপনার—

তাই যদি হয়, আমার হুকুম রইল বাগানমুখো কদাপি আর তুমি যাবে না। বোঝা-পড়া যত-কিছু আমিই করব। পাকা শয়তান দেখছি ঐ লোকটা যার নাম অশ্বিনী বললে। বিষম ঘড়েল। নিজে দলবল নিয়ে আমাদের বাগানবাড়ি বেদখল করে আছে —আবার মেয়ে ঠেলে দিচ্ছে, সেই মেয়ে আমাদের ভবানীপুরের বসতবাড়ির বউ হয়ে চেপে বসুক। ভেবেছিলাম, মিঠে কথাবার্তায় সরিয়ে দেব। যখন এত চালাকি, আসল মূর্তি ধরতে হল। আমার একটা মুখের কথা পেলে থানাসুদ্ধ হামলা দিয়ে পড়বে। হোক তবে তাই।

॥ সতের ॥

সমস্ত ব্যাপারটা পুলিন দরোয়ানের কাছে শুনেছে। ফিসফিস করে বিনয়কে বলে, দাদা নিজে এবারে নেমে পড়লেন। রক্ষে নেই, বিয়ে করতে হবে না আর ছোটবাবুকে। বাড়া-ভাতে ছাই পড়ে গেল।

বিনয়ের সঙ্গে পুলিনের আপাতত গলায় গলায় ভাব। পুলিন বলে, কত বলেকয়ে দাদাকে নরম করেছিলাম ঃ সর্বস্ব খুইয়ে ভদ্রলোকেরা এসে আশ্রয় নিয়েছেন, ওঁদের দিকটাও দেখতে হবে বই কি! একেবারে অকুল-পাথারে না পড়েন। তা দেখ, ঐ

অশ্বিনীবাবুর মনে মনে বজ্জাতি। নয়তো ইন্দ্রজিতের সামনে খামোকা মেয়ে হাজির করবার দরকারটা কী ছিল? বুঝুন ঠেলা এইবারে। মেয়ের বিয়ে আর দিতে হবে না—ধুমসি মেয়ের হাত ধরে বাগান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। চোখের জলে পথ দেখতে পাবেন না তখন।

বিনয় হন্তদন্ত হয়ে এই খবর অশ্বিনীকে এনে দেয়ঃ খোদ বড়বাবু চলে আসছেন—পুলিশ সঙ্গে নিয়ে। লালবাজার অবধি ওঁর খাতির। এস্পার-ওস্পার করে তবে যাবেন।

অশ্বিনীর চমক লাগে। আদ্যোপান্ত শুনে একটুখানি গুম হয়ে রইলেন। তারপর হেসে ওঠেনঃ ভালই হল। পুরুষসিংহ মানুষটিকে চোখে দেখা যাবে।

কলরব করে তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে জড় করলেনঃ বিনয় খবর এনেছে, শোন সবাই। এসে অবধি রঞ্জিত রায়ের নাম শুনে আসছ, কলোনিতে বসেই সেই মানুষের দর্শন পাওয়া যাবে। হ্যাঁ বিনয়, আসবেন তো সত্যি সত্যি—না ভুয়ো খবর। কবে আসবেন, বলে দাও।

সদাশিবকে বলেন, অতবড় মানুষটা আসছেন। খাতিরযত্ন তো করতে হয়। কোথায় নিয়ে বসাই, কী খেতে দিই—

সদাশিবকে বলেন, আসছেন, ঐ তো বলছে, একলা একটি মানুষ নয়। পুলিশ নিয়ে আসবেন। খাতিরযত্ন খাওয়ানো-বসানো অনেকজনকেই করতে হবে।

আশিস গর্জন করে উঠলঃ খাতিরযত্নের ভারটা আমার উপরেই থাকুক বাবা। আপনাদের বয়স হয়েছে, বাইরে বেরুবেন না, ঘরের মধ্যে থাকবেন। দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকবেন। যেমন করলে মানানসই হয়, আমরাই সেটা করব।

আবার বলে, এ তো জানা কথা—এসে পড়বে একদিন ওরা। সব কলোনির ঐ এক ব্যাপার। ভালই হল, কয়েকটা দিন তবু হাতে পাওয়া গেছে। একবার শিকড় গেড়ে বসে গেছি, তাড়ায় কে দেখি।

অশ্বিনী কড়া হয়ে বলেন, তুমি গন্ডগোল পাকাতে এস না এর মধ্যে। যা করবার আমি করব। মানা করে দিচ্ছি, একেবারে সামনেই আসবে না তুমি। খবরদার।

আশিস বলে, আসব না সামনে—তার জন্যে কী। সামনে আসার কাজ তো নয়। পাড়ার মধ্যে ঘরে ঘরে তৈরী হয়ে থাকব। সময় হলে রে-রে করে বেরিয়ে পড়ে টুটি ধরে সব ক'টাকে আছড়াব।

রাগে গর-গর করতে করতে আশিস বেরিয়ে গেল। অশ্বিনী একবিন্দু বিচলিত নন। বিনয়কে বলেন, আগেভাগে খবরটা দিয়ে ভাল করলে বিনয়। বারান্দার উপর চৌকি এনে তোশক পেতে ফরাস করে রাখা যাবে, বড়বাবু তার উপর এসে বসবেন। এস দিকি ধরাধরি করে চৌকিটা নিয়ে আসি ঘরের ভিতর থেকে।

বিনয় বলে, আপনি কেন টানাটানি করতে যাবেন? আমি আনছি।

হঠাৎ বাঁশি এসে পড়ে। খিল-খিল করে হেসে বলে, অত বড় চৌকি একলা তুমি নিয়ে আসবে বিনয়-দা? দেখি, পার কেমন। তাই দেখতে এলাম।

বলে কোমরের দু-পাশে দু-হাত দিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

বিনয় ঝগড়া করেঃ আমি একলা আনব, আর উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন। জেঠামশায়, বলে দিন, বাঁশি আর আমি দু-জনে ধরে এইখানে এনে চৌকি পাতি।

অভ্যর্থনার পরের অধ্যায় তখন অশ্বিনীর মাথায় ঘুরছে। বললেন, খেতে কি দেওয়া যাবে রে বাঁশি—সন্দেশ? দূরের দোকান, এখনই তা হলে ব্যবস্থা করতে হয়।

বাঁশি প্রবীণা গিন্নির মতো বলে, কতজন সঙ্গে নিয়ে আসে ঠিক নেই। দরের সন্দেহ অতগুলো মুখে দিয়ে উঠতে পারব কেন? তার চেয়ে গোটা দুই ঝুনো-নারকেল এনে দাও বিনয়-দা। আর কিছু ক্ষীর। পিসিমা খাসা চন্দ্রপুলি বানিয়ে দেবেন। ঘরের তৈরি জিনিস—খেতে ভাল, খরচার দিক দিয়ে কম।

সদাশিব হেসে বলেন, চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচ তো লোকে জামাইয়ের জলখাবারে দেয়। আসছে হাঙ্গামা করতে, কাঞ্চনবরনী তাদের চন্দ্রপুলি খাইয়ে পোষ মানাবে।

অশ্বিনীর এসব কানে যায় না, তিনি ভাবছেন তখন অন্য কথা: ওরে বাঁশি, গড়গড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে যে! আর কিছু অম্বুরি তামাক। নীরেনের কাকা হরিদাসবাবু গড়গড়ায় তামাক খান, সেইটে চেয়ে আন। মেজেঘষে ঝকককে করে ফরাসের পাশে রেখে দিবি।

আগে পিছে জন-দশেক পশ্চিমা-দারোয়ান এবং দুটো কনেস্টবল নিয়ে রঞ্জিত রায় দুড়দাড় করে বাগানবাড়ি ঢুকলেন। লড়াইয়ের সেনাপতি যেন। অশ্বিনী আর সদাশিব, দেখা গেল, এগিয়ে এসে ঝিলের পুলের উপর করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আস্তে আজ্ঞা হোক বড়বাবু। দেশ ছেড়ে আপনার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছি কত যে উপকৃত, মুখে বলা যায় না। এতদিনে যা-হোক একবার পদধূলি পড়ল।

পোকামাকড়ের দিকে যেমন তাকায়, রঞ্জিত তেমনি দৃষ্টিতে একনজর দেখে নিলেন। কানেই গেল না কোন কথা। সদ্য-তৈরি পাড়াটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। পিছন ফিরে দারোয়ানদের দিকে চেয়ে হেঁকে উঠলেন: ঘরের চাল-বেড়া লাঠি মেরে চুরমার করবে, হাঁড়িকুড়ি কাঁথামাদুর ঝিলের জলে ছুঁড়ে দেবে। উনুন ভাঙবে, মানুষ একটা একটা করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফটকের বাইরে নিয়ে ফেলবে।

অশ্বিনী হেসে বলেন: ঘাড় ধরতে দিলাম আর কি!

রঞ্জিত জ্বলে উঠলেন: দেবেন না, জোরজার করবেন? এই ক'টি লোকই সমস্ত নয়—ডেভিড সাহেবের জমিতে দেড়-শ লোক খাটছে, হাঁক দিলে তারা সব এসে পড়বে। আরও নানান ব্যবস্থা আছে। কাদের কত জোর, দেখা যাক।

অশ্বিনী হাসতে হাসতে বলেন, এই দেখুন বড়বাবু, আপনি উল্টো বুঝে নিলেন। গায়ের জোরে কি করে পারব, জোরের কথা বলছিনে। পালিয়ে যাব আমাদের ঘাড়ে হাত পড়বার আগে।

সদাশিব জুড়ে দিলেন: কাজটা আমাদের খুব রপ্ত হয়ে গেছে বোঁচাকাবিড়ে কাঁধে ছেলেপুলের হাত ধরে রাতবিরেতে টুকটুক করে কেমন সব পালিয়ে বের হয়ে যাই। বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরে টের পায় না।

হা-হা করে সদাশিবও হাসছেন। রঞ্জিত পাকাবাড়ির সামনে এসে গেছেন এতক্ষণে। বারান্দায় চৌকির উপর সতরঞ্চি তোশক ও ধবধবে চাদরে ফরাস বানানো। সেই দিকে হাত বাড়িয়ে অশ্বিনী বলেন, বসতে আজ্ঞা হয় বড়বাবু।

রঞ্জিত ঘাড় নাড়লেন: বসতে আসিনি। খাতিরে ভোলবার লোক আমি নই। গন্ডগোলের ইচ্ছে না থাকে তো দলবল নিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ুন। এই মুহূর্তে—আমার চোখের উপর দিয়ে। আজ নয় কাল যাব, এ সমস্ত শোনাশুনি নেই।

অশ্বিনী কাতর হয়ে বলেন, যেমন হুকুম, ঠিক তাই হবে। কিন্তু আমাদের কথাও একটু শুনুন। তার পরেও যদিও বলেন—চলে যাব এখনই। আপনার জায়গাজমি, আপনার ঘরবাড়ি—আমাদের কিছুই নয়। বসে বসেই হোক না কথা। ওরে বাঁশি,

কলকেটায় আগুন দিয়ে যা। আর চা-টা কি আছে তোদের, নিয়ে আয়।

যতই হোক, বয়স্ক ভদ্রলোক কথাটা বলছেন। ফরাসের উপর অঙ্গ একটু না ঠেকিয়ে পারা যায় না। বসতে বসতে রঞ্জিত বলেন, চা লাগবে না। কী বলতে চান, বলে ফেলুন। নষ্ট করার মতন সময় নেই।

কিন্তু বলছেন কাকে? দুটো মাদুর হাতে নিয়ে অশ্বিনী ইতিমধ্যে দরোয়ান-কনেস্টবলদের দিকে নেমে গেছেন। আমতলায় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলছেন, এতখানি পথ এসেছ, ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নাও।

ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে দিলেন। বলেন, বস বাপধনেরা, পা ছড়িয়ে আরাম করে বস। চা দিয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু ব্যস্ত হচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলিগে।

ফুঁ দিতে দিতে বাঁশি বেরিয়ে এসে গড়গড়ার মাথায় কলকে বসিয়ে চলে গেল। ফরসা মুখ আগুনের আভায় গোলাপি দেখাচ্ছে। রঞ্জিত তাকিয়ে দেখলেন। আমতলা থেকে এসে অশ্বিনী বারান্দার উপর উবু হয়ে বসতে যাচ্ছেন—ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রঞ্জিত পাশের জায়গা দেখিয়ে দরাজ ভাবে বলেন, নিচে কেন, ফরাসের উপর উঠে বসুন।

জিভ কেটে অশ্বিনী বলেন, সে কী কথা, আপনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারি আমি।

কেন পারবেন না? আপনি কি মানুষ নন? সম্ভ্রান্ত লোক, না হয় অবস্থার ফেরে পড়েছেন। নিজেকে ছোট ভাবেন কী জন্য?

এর পরে অশ্বিনী বারান্দার উপর না বসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রঞ্জিত বলেন, কলকে দিয়ে গেল—ঐ বুঝি আপনার মেয়ে?

অশ্বিনী ঘাড় কাত করলেন।

মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যাবেন না এখান থেকে?

জোর করবার কিছু নেই হুজুর। আপনার জায়গা—যদি আপনি সদয় হয়ে আর কয়েকটা দিন মঞ্জুর করেন।

রঞ্জিত বিরক্ত হলেন: এমন আজ্ঞে-হুজুর করবার কী আছে বলুন তো? খালি পড়ে ছিল জায়গাটা, এসে উঠেছেন। তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল।

তারপর অতিশয় অন্তরঙ্গ সুরে বলেন, বিয়ের সম্বন্ধ আসে কিছু কিছু?

অশ্বিনী গদগদ হয়ে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার জায়গাটা বড় পয়মন্ত। একের পর এক আসছে। ঠিকঠাক প্রায় হয়ে গেছে, শুধু আপনার আশীর্বাদের অপেক্ষা।

রঞ্জিত ভ্রূকুটি করলেন: আমার ভাই ইন্দ্রজিতের কথা যদি ভেবে থাকেন, সে আশা ত্যাগ করুন।

রঞ্জিতের মন ভিজেছে, এমনি অনুমান হয়েছিল। হতভম্ব হয়ে অশ্বিনী তাকিয়ে পড়লেন: আজ্ঞে?

আপনার এখানে আমার ছোটভাই কথা দিয়ে গেছে শুনলাম। তার কথার কানাকড়িও দাম নেই। আমি তার গার্জেন। পাতি-পুকুরে ভাইয়ের বিয়ে দেব, অনেক আগে কথা দিয়ে বসে আছি।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। রঞ্জিত গড়গড়া টানছেন। মুখের নল সরিয়ে সহসা প্রশ্ন করেন, একের পর এক বলছিলেন—আর কোথায় সম্বন্ধ হল?

অশ্বিনী বলেন, ইন্দ্রজিত বাবাজীর আগে আপনাদের ম্যানেজার পুলিনবিহারীর সঙ্গে কথা পাকা হয়েছিল।

রঞ্জিত ঘাড় নাড়লেন : সে-ও ছেড়ে দিন। আমি তার মানিব। মানিব শুধু নয়, তার অনেক উপরে। এইটুকু বয়স থেকে বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখানো চাকরি দেওয়া সমস্ত করেছি। ঝরিয়ার খনি গিয়ে গোটাকয়েক মামলা চলছে। ফয়সালা হয়ে গেলেই সমস্ত ভার দিয়ে তাকে সেখানে পাঠাব। বিয়ে-থাওয়ার ঝঞ্ঝাটে পুলিন এখন যেতে পারবে না। যদি যায়, চাকরি খতম হবে। কোনরকম সম্পর্ক থাকবে না আমাদের সঙ্গে।

ফড়ফড় করে আবার কিছুক্ষণ গড়গড়া টেনে মুখ তুলে রঞ্জিত বলেন, অন্য কোথাও ?

আজ্ঞে না। আর তো দেখছিনে আপাতত। তবে সময় পেলে নিশ্চয় আরও জুটে যাবে।

হুঁ—বলে রঞ্জিত ভাবলেন একটুখানি : মেয়েটা কেমন ?

সহসা কথাবার্তা বন্ধ। বাঁশি এই সময়ে ফরাসের পাশে এক-খানা টুল পেতে রঞ্জিতের জন্য চা-জলখাবার আনল। সদাশিব খানিক আগে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। কেটলি ও কতকগুলো গেলাস-কাপ হাতে বাঁশির পিছু পিছু বেরিয়ে আমতলার দিকে তিনি নেমে গেলেন।

ভাবছেন রঞ্জিত, আর এক-এক চুমুক চা খাচ্ছেন। বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে বাঁশি আবার ঘরে ঢুকে গেছে। গলা খাঁকারি দিয়ে রঞ্জিত পূর্বকথা শুরু করেন : কেমন মেয়ে, কিছু তো বললেন না।

অশ্বিনী বলেন, নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কী বলব ? চা দিয়ে গেল ঐ তো চোখেই দেখলেন হুজুর।

চোখে দেখার কথা নয়। বলি, রীতপ্রকৃতি কেমন ? হিংসুটে-কুচুটে নয় তো ? ঝগড়া করবে না, নাকে কাঁদবে না কথায় কথায় ?

অশ্বিনী গড়গড় করে একরাশ পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন। রঞ্জিত ধমক দিয়ে ওঠেন : হ্যাঁ কিম্বা না বলুন। সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনবার সময় নেই।

আজ্ঞে না ওসব কিছুই করবে না।

রঞ্জিত বলেন, তবে শুনুন দশ বছর আমার গৃহশূন্য। বিয়ে করিনি সৎমা এসে ছেলেমেয়েদের কষ্ট দেবে বলে। এখন তারা বড় হয়ে উঠেছে। কোলের ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যায়। সে ছেলে নেবুতলায় আমার শাশুড়ির কাছে মানুষ হচ্ছে। মেয়ে দুটো বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে—বড়টি থার্ড-ইয়ার, ছোটটি ইন্টারমেডিয়েট দেবে এবার। তাই ভাবছি, আপনার মেয়ের রীতপ্রকৃতি সত্যি সত্যি যদি ভাল হয়—এখন বিয়ে করলে বোধহয় দোষের হবে না।

অশ্বিনী সহসা আর কিছু বলতে পারেন না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন রঞ্জিতকে। মনের উপর একরাশ ভাবনা খেলে যায়। বাগানবাড়ি এসে অবধি রঞ্জিতের সম্বন্ধে শুনছেন। বিনয়ের কাছে শুনেছেন রাস্তার ওপারে ডেভিড সাহেবের কনট্রাক্টর এবং আরও অনেকের কাছে শুনেছেন। মানুষটা বাইরে একটু রুক্ষ বটে, কিন্তু ভিতরটা কোমল। এমন বুদ্ধিমান অধ্যবসায়ী মানুষ হয় না। পৈত্রিক কিছু ছিল অবশ্য। কিন্তু তার উপরে বিস্তর বাড়িয়েছেন নিজের চেষ্টায়। আরও হত, ভাই ইন্দ্রজিত খানিকটা হত যদি ওঁর মতন। আহোরাত্র নিজের খেয়ালে না থেকে দাদার পিছনে এসে দাঁড়াত। তাহলে বাঙালির মধ্যে একজন পয়লা নম্বরের শিল্পপতি হয়ে উঠতেন।

এত সমস্ত ভেবে নিচ্ছেন লহমার মধ্যে। রঞ্জিত তাড়া দিলেন, কথা বলছেন না যে ?

থতমত খেয়ে অশ্বিনী বলেন, পরম সৌভাগ্য আমার বাঁশির।

বলতে পারেন যে বয়েস হয়েছে—

অশ্বিনী বলেন, নিতান্ত শত্রু ছাড়া অমন কথা কেউ বলবে না। দশটা ছোকরার মাঝখানে দাঁড়ান গিয়ে হুজুর, আলাদা করে কে বের করতে পারে দেখি।

রঞ্জিত মৃদু হেসে বলেন, সে ঠিক। চেহারা কিম্বা চালচলন দেখে বয়স হয়েছে কেউ বলবে না। ইন্দ্রজিতের পাশাপাশি দাঁড়ালে লোকে তাকেই বড়ভাই বলে, আমায় বলে ছোটভাই। খাড়া হয়ে চলি, একটা দাঁত পড়েনি। মাথার সামনে টাক, পিছন দিকটা ছাঁটাই—কাজেই পাকা চুলের কথা ওঠে না। তবু বয়সের দিকটা ভাবতে হবে বই কি। হঠাৎ যদি মরে যাই, সেই জন্য বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়ি আপনার মেয়ের নামে দানপত্র করে দেব। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই। আর কোন কোন ব্যবস্থা করা যায়, ধীরে সুস্থে ভেবে দেখব।

পাটোয়ারি অশ্বিনী গদগদ হয়ে উঠলেন: উঃ, বিবেচনা কতদূর পরের মেয়ে ঘরে নিয়ে আসছেন—যাবতীয় ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই। সাধে কি আপনি দেশবিখ্যাত হয়েছেন রায়মশায়।

উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে রঞ্জিত বলেন, বসুন আরও আছে। বিয়ে কিন্তু কাল অথবা পরশু। খুব বেশি তো পরশুদিন—রবিবারে। তার বেশি সবুর সইবে না। সোমবার পাটনা-হাইকোর্টে মোকদ্দমা।

অশ্বিনী অবাক হয়ে বলেন, শুভকর্মে দিনক্ষণ আবশ্যক। পাঁজিতে ভাল দিন যদি না থাকে—

তার জন্যে ভাববেন না। পুরুতমশায়রা অদ্ভুতকর্মা। গরজ জানিয়ে উপযুক্ত দক্ষিণা ছাড়লে ঠিক ওঁরা দিন বের করে দেবেন। গরজ বলে গরজ। ছোটভাই ম্যানেজার দু-জনে ধুন্দুমার লাগিয়েছে। দেরি করলে কতদিক দিয়ে আরও কতজন জোটে, ঠিক কি। অরক্ষণীয়ার জন্য শাস্ত্রে বিশেষ বিধি—তা এর চেয়ে অরক্ষণীয়া পাত্রী কবে কোথায় হয়েছে?

একটু থেমে রঞ্জিত আবার বলেন, নয় তো গোধূলিলগ্নে। গোধূলিতে দিনক্ষণ লাগে না। রবিবারে হলে মন্তোর ক'টা পড়েই অমনি স্টেশনে ছুটতে হবে। এক মিনিট দেরি করতে পারব না। আমি পাটনায় চলে গেলে ওরা সব এসে আবার পাকচক্কোর না দেয় সেজন্য একেবারে গোড়া মেরে রেখে যেতে চাই।

তবু অশ্বিনী ইতস্তত করেন: এই একটা-দুটো দিনের মধ্যে যোগাড়-যন্তর হয়ে উঠবে কি? বিয়েথাওয়ার ব্যাপার—হাঙ্গামা কত বুঝতেই পারেন। বহুদর্শী লোক, আপনাকে কী বোঝাব।

হতেই হবে। গম্ভীর হয়ে রঞ্জিত বলতে লাগলেন: টাকা খরচ করলে কলকাতা শহরে একটা-দুটো ঘণ্টায় বাঘের দুধের যোগাড় হয়ে যায় মশায়, এ তবু পুরো দুটো দিন হাতে পাওয়া যাচ্ছে। সকালবেলা আমি হাজার তিনেক টাকা নিয়ে আসব, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যতটা পারি যোগাড়যন্তর করে দিয়ে যাব। বরযাত্রীর হাঙ্গামা নেই—বরযাত্রী একটি প্রাণীও আসবে না, জানতেই দেব না কাউকে। সে জাঁকজমক পাতি-পুকুরের ইন্দ্রজিতের বিয়ের সময়। খাওয়ানোর মধ্যে রইল শুধু কন্যাযাত্রীরা—বাগানে আপনার সঙ্গে যাঁরা সব এসে ঘর তুলেছেন। সে আর কত। চার-পাঁচ শ টাকার মধ্যে এদিককার সব হয়ে যাবে, বাকি টাকা আপনার। তা ছাড়া শ্বশুর হয়ে গেলে তখন আর রিফিউজি রইলেন না—কুটুম্ব হলেন। বাগানবাড়িতে থাকলে তখন আপত্তি

উঠবে না। ডাঁটের সঙ্গে থাকতে পারবেন যদ্দিন-না ভাল রকম কিছু বন্দোবস্ত হচ্ছে।

বিস্তর পেয়ে যাচ্ছেন—আশার অতীত। তৎসত্ত্বেও অশ্বিনী নতুন পাড়াটার দিকে আঙুল ঘুরিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে বলেন, ভাল বন্দোবস্ত শুধু আমার হলেই তো হবে না। ওদের কী হবে হুজুর? আমার ছেলেই ওদের সব এনে বসাল, তার উপরে ভরসা করে দেশ-ভুঁই ছেড়ে চলে এসেছে।

রঞ্জিত অমায়িক ভাবে বলেন, কুটুম্বর লোক যখন—ও'রাও কুটুম্ব ছাড়া কি! অন্য সুবিধা না হওয়া অবধি যেমন আছেন, থাকবেন। কি বলবেন বলুন এবারে। আমায় উঠতে হবে। এর পরেও যদি আপত্তি থাকে, বলে দিন।

খুশিতে ডগমগ হয়ে অশ্বিনী বলেন, আজ্ঞে না, কিসের আপত্তি!

গড়াগড়া টানছিলেন রঞ্জিত, এই কথার পরে মুখের নল নামিয়ে গড়াগড়া খানিকটা দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, জামাইকে কেউ 'আজ্ঞে' বলে না। বলুন—না, বাবাজি।

থতমত খেয়ে অশ্বিনী বলেন, সে তো বটেই। কিন্তু আলাপ-পরিচয় এই মাত্তর হল—এক্ষুণি সঙ্গে সঙ্গে হবে না। সইয়ে সইয়ে নিতে হবে। কন্যা-সম্প্রদানের পর মুখ দিয়ে 'বাবাজি' বেরুবে।

উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জিত সামাল করে দেন: কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। কিন্তু ঘুণাক্ষরে কারও কানে না যায়। ইন্দ্রজিত হোক পুলিন হোক, কাউকে বলবেন না। বিনয় কম্পাউন্ডের ভিতর থাকে, তার কাছে একেবারে গোপন রাখা যাবে না। কিন্তু সবখানি বলবেন না। বিয়ে ঠিক হয়েছে, এই বলতে পারেন—কে বর কি বৃত্তান্ত, টের পেয়ে না যায়। শুভকাজে বাগড়া অনেক। মন্তোর ক'টা পড়া হয়ে গেলে যত খুশি ঢাক পিটিয়ে বেড়াবেন। আগে ভাগে যদি চাউর হয়ে পড়ে, বুঝব আপনার থেকে হয়েছে। আমার মেজাজ চড়ে যাবে, সমস্ত কিছু পণ্ড হবে। আপনার আপন লোক যাঁরা আছেন, সকলকে বুঝিয়ে দেবেন এটা ভাল করে।

যে আজ্ঞে—বলে অশ্বিনী ঘাড় নোয়ালেন।

॥ আঠার ॥

রঞ্জিত রায় বিদায় হলেন তো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা এইবার। ভাল হল কি মন্দ হল। অশ্বিনী যত ভাবেন, পুলকিত হয়ে উঠছেন ততই। বলতে মানা করে গেলেন, নইলে জাঁক করে বলে বেড়াবার মতন পাত্র। নিঃসম্বল ভিখারির অবস্থায় মেয়ের এমন বিয়ে ভাবতে পারা যায় না। আকাশের চাঁদ জামাই হবার জন্য হেঁটে এসে উঠলেন। বয়সটা কিছু বেশি এবং তিনটে ছেলে-মেয়ে বর্তমান—এ দুটো ব্যাপার বলতে পারেন চাঁদের গায়ের কলঙ্ক। চাঁদ তাতে ছোট হয় না।

বিরজা বাঁশিকে এইটুকু বয়স থেকে মানুষ করেছেন, তিনিও খুশি: বয়স তা কী! হরগৌরীর মিলন। জামাইয়ের খাঁটি বয়স বলে না দিলে কে বুঝবে? তা-ই বা কত আর! ছেলেমেয়ের কথা যদি বল—ভালই তো, ভরভরন্ত সংসার। বাঁশি গিয়ে পড়লে তখন কি মেয়ে দুটো বোর্ডিং-এ, আর ছেলে দিদিমার কাছে পড়ে থাকবে? বাড়ি এসে মা-মা করে সর্বক্ষণ পিছন পিছন ঘুরবে। মেয়েমানুষের-এর বড় সুখশান্তি কিসে?

শুধুমাত্র সদাশিব দোমনা: তা হোক, তা হোক—বাঁশি বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ তোমরা।

শুভকর্মের ব্যাপারে বারম্বার এমনি বিরুদ্ধ কথায় বিরজা চটে উঠলেন: সংসারধর্ম কোনদিন করলে না, তুমি এসবের কী বোঝ শুনি? বড় হয়েছে মেয়ে, বোঝে সব—

হিত ছাড়া আমরা যে তার অহিত করব না, তা-ও সে বোঝে। বাঁশি কি ধর করে দেখেছে রঞ্জিত-বাবাজির সঙ্গে—আগেভাগে সে কী বলতে যাবে! কাল বাদে পরশু হল বিয়ের দিন—অন্য-কিছু বললেও তো এড়ানো যাবে না।

সদাশিব যা হয় বলুনগে, আসল ভয়টা আশিসকে নিয়ে। অন্যের মতামতের কিছুমাত্র পরোয়া করে না সে। মা-হারা পিঠো-পিঠি ভাই-বোন একসঙ্গে মানুষ হয়েছে, আশিস বিগড়ে গেলে বিপদ। একদঙ্গল হুটকো জোয়ান ছেলে তার হাতে, বিয়ের সময় হঠাৎ কোন বিভ্রাট ঘটিয়ে বসা তার পক্ষে অসাধ্য নয়।

আশিস এলে বিরজাই কথাটা পাড়লেন। আদ্যোপান্ত বলে ভয়ে ভয়ে তাকান মুখের দিকে। যা ভেবেছিলেন, ঠিক তার উল্টো। একমুখ হাসি নিয়ে আশিস তারিফ করেঃ বাঃ-বাঃ, কোন ঝঞ্জাট পোয়াতে হবে না, দিব্যি হল। এতগুলো পরিবারের সুব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। পরের মঙ্গলেয় জন্য লোকে জীবন পর্যন্ত দেয়। এ শুধু বিয়ে করা একটা মানুষকে। বাঁশির তো লাফাতে লাফাতে গিয়ে কনে পিঁড়িতে বসা উচিত। কোথায় গেল বাঁশি?

চিৎকার করে বোনকে ডাকছেঃ বাঁশি, ওরে বাঁশি—

বাঁশি সাড়া দিল না।

আশিষ উৎসাহ ভরে বলে যায়, বিয়ের আগে কথা আদায় করে নিতে হবে, খুব ভাল ব্যবস্থা না করে একটি প্রাণী বাগানবাড়ি থেকে নড়ানো চলবে না। এগ্রিমেণ্ট না লেখানো যায়, অন্তত পক্ষে দশের মুকাবেলা বলবেন উনি।

সদাশিব শুনছিলেন এতক্ষণ নির্বাক হয়ে। বললেন, কেবল নিজেদের দিকটাই দেখছ আশিস। বোনের দিকটা দেখতে হবে না একটু?

আলবৎ। দেখব বই কি মাস্টারমশায়।

হাসতে হাসতে আশিস বলে, বাঁশির নামে বাড়ি লিখে দেবে বলেছে, তারও পাকা বন্দোবস্ত চাই বাবা। কাজ সারা করে নিয়ে শেষটা ফাঁকি না দেয়। বাগানবাড়িতে যদি সত্যি সত্যি বিস্কুটের কারখানা করে, সেটা এবার জয়ন্তী বিস্কুট-ফ্যাক্টরি নয়। নাম দিতে হবে বাঁশি বিস্কুট-ফ্যাক্টরি।

সদাশিব বিরক্ত হয়ে বলেন, শুধু টাকাকড়ি কাজকারবারের কথাই নয়, কোন লোকের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিচ্ছ, সেটা একবার ভেবে দেখ। রঞ্জিত রায়ের বয়সটা জানা আছে?

আশিস অবহেলার ভাবে বলে, বয়স হল তো কী হয়েছে? বিধবা হবে বাঁশি? বয়ে গেল, বোনের আবার বিয়ে দেব। কিম্বা বেঁচে থেকেও যদি বনিবনাও না হয় বরের সঙ্গে—ডিভোর্স-আইন পাশ হবে, খুব বেশি দেরি নেই তার—এককাঁড়ি টাকা আদায় করে নিয়ে বোন আলাদা থাকবে।

সদাশিবকে চটিয়ে দিয়ে আশিস বলল, আচ্ছা বলছেন যখন বাঁশিকেই একবার জিজ্ঞাসা করা যাক।

বাঁশি, বাঁশি—করে ডাকছে। বাঁশি নেই।

বাঁশি তখন বিনয়ের কোয়ার্টারে গিয়ে পড়েছে। বিনয় কি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরল। বাঁশি বলে, ও বিনয়-দা সর্বনাশ! পরশুদিন যে আমার বিয়ে।

কেন জানি, ক্ষেপানো কথা বলে বিনয়ের অনুমান হল। নির্লিপ্ত কণ্ঠে সে বলে, ভালই তো! জেঠামশায়ের দায় উদ্ধার হল, গলার কাঁটা নামল। বরটা কে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত—ইন্দ্রজিত না পুলিনবিহারী?

দু-জনের কেউ নয়। ওদের চেয়ে অনেক বড়। সকলের মাথা যিনি—বড়বাবু রঞ্জিত রায়।

বিনয় অবাক হয়ে যায়ঃ বল কি গো! জয়ন্তী দেবী বছর দশেক গত হয়েছেন। শুনতে পাই অগুন্তি সম্বন্ধ এসেছিল তখন—বন্যার জলের মতন। এখনও আসে দুটো-পাঁচটা। এই দশ বছর মাসে গড়পড়তা একটা করে সম্বন্ধ ধরলেও বার-দশকে একশ কুড়ি। কাউকে আমল না দিয়ে বড়বাবু এদ্দিন তবে তোমারই অপেক্ষায় ছিলেন?

বাঁশি ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলে, রাজকন্যার অপেক্ষায়।

বিনয় বলে, সত্যি, কপাল বটে তোমার বাঁশি। অবাক হয়ে যাচ্ছি।

হি-হি করে হাসতে লাগল। বাঁশি তাড়া দিয়ে ওঠে, দাঁত বের করে হেসো না অমন। দেখতে বিশ্রী লাগে।

তাড়া খেয়ে বিনয়ের উচ্ছ্বাস বন্ধ হয়। হাসির রেখাটুকু মাত্র মুখের উপরে। সেদিকে তাকিয়ে বাঁশি আবার বলে, দেখ, কেঁদে কেঁদে হাসা ওর নাম। আমি সেটা বুঝি। দেখে গা জ্বালা করে। হেসে হেসে মজা না দেখে কী করতে হবে সেইটে ভাব। রঞ্জিত রায়কে কোন্ কায়দায় ঠেকাবে?

বিনয় বিস্ময়ের ভান করে বলে, বল কি গো, বড়বাবুকেও ঠেকাতে হবে! এ বড় বিষম ঠাঁই। ম্যানেজার ঠেকালাম ছোটবাবুকে দিয়ে, ছোটবাবু ঠেকালাম বড়বাবুকে দিয়ে। বড়বাবুর উপরে আর নেই। একটু থেমে তরলসুরে আবার বলে, কিন্তু হল কি তোমার বাঁশি, এ-বরও পছন্দ নয়? পুরুষসিংহ বলে শহরজোড়া নামডাক—

মুখ বাঁকিয়ে বাঁশি অবিকল সেই সুরে পদ্য মিলিয়ে বলে, সিংহের কেশর নেই একগাছি, মাথাজোড়া টাক। পরশুদিন বিয়ের সময় কনে খুঁজে যদি না পাওয়া যায়, তোমায় বলা রইল বিনয়-দা ঝিলের জলে খুঁজবে। কনে মরে ভাসছে, দেখতে পাবে।

বলে ফরফর করে বাঁশি চলে গেল।

বিনয়ের ভাবনা হল। বাঁশি ভয় দেখিয়ে গেছে, কিন্তু না হলেও এবারে বিপদ বড় কঠিন। কাজকর্মে প্রায়ই ভবানীপুর রায়বাড়ির অফিসে যেতে হয়—পরের দিন শনিবার সকাল সকাল সে চলে গেল। পুলিনের কাছে গিয়ে নিচু গলায় অন্তরঙ্গভাবে বলে, একটা কথা ম্যানেজারবাবু। বড়বাবু ছোটবাবু দু-জনেই আমাদের মনিব—সমান সম্বন্ধ। উভয়েরই নুন খাই আমরা। ঠিক কিনা বলুন।

পুলিনবিহারী খবরের কাগজ পড়ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বলল হুঁ—

ছোটবাবুর বিয়ের কথা যেমন বড়বাবুকে জানানো হয়েছিল বড়বাবুর বিয়ের কথাও তেমনি ছোটবাবুকে বলতে হয়। নয় তো উনি বলবেন একচোখা কর্মচারী। বদনাম হবে আমাদের।

হাতের কাগজ ফেলে সচকিত হয়ে পুলিন বলে, দাদা বিয়ে করছেন নাকি? সত্য খবর? কোথায় হচ্ছে—কবে?

বিবরণ শুনে পুলিন অবাক হয়ে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে। তারপর জ্বলে উঠলঃ আমরা সামান্য লোক—কীটানুকীট। কত রকম ঝগড়া উঠল তখন, কুলশীল চাকরিবাকরি নিয়ে কত কথা! 'দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখল মানুষের বেলা'—ওঁরা দেবতাগোঁসাই, ওঁদের দোষ কিছুতে হয় না। এত বড় আনন্দের ব্যাপারটা কাক-পক্ষীকে জানতে দিচ্ছেন না। আমরা বাজে লোক, গোলাম-নফর আমরা জানি না জানি কিছু যায় আসে না। কিন্তু একেবারে আপন যারা, তাঁদের মনের অবস্থা কী হবে? তুমি ঠিক বলেছ বিনয়। বেশি বয়সে হঠাৎ এই রকম বিয়ে—দাদা লজ্জায় বলছেন না,

কিন্তু আমাদের একটা কর্তব্য আছে বইকি!

সেই কর্তব্যের তাগিদে পুলিন বসে বসে আর খবরের-কাগজ পড়তে পারে না। উঠে পড়ল। ইন্দ্রজিতের ঘরে খোঁজ নিল, এখনো ফেরেনি কুস্তির আখড়া থেকে। পথের উপর পায়চারি করে আর ভাবে। গোখরোসাপ খুঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখতে হবে এ সময়টা। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনা করে ধীর পায়ে এগোবে।

ইন্দ্রজিত ফিরে এলে পুলকে ডগমগ হয়ে পুলিন বলে, আনন্দের খবর! দাদার এতদিনে সুমতি হল। বিয়ে করছেন। দশ বছর ধরে সংসারটা কী রকম ছন্নছাড়া হয়ে আছে, শ্রীছাঁদ আবার ফিরবে।

ইন্দ্রজিত প্রথমটা বিশ্বাস করে না। আহত কণ্ঠে বলে, তুমি জেনেছ—কিন্তু আমায় তো দাদা একটা কথাও বললেন না।

পুলিন বলে, বলেন নি আমাকেও। এতটা বয়সে বিয়ে—আর ধরুণ আপনার বউদি জয়ন্তী দেবীর নাম জুড়ে দিয়ে কত কত কাজকারবার করলেন—বলতে লজ্জা হয়েছে বোধহয়। কিন্তু এবাড়ির কোন্ কাজটা আমার অজান্তে হতে পারে? খবর ঠিক এসে যায়। বিয়ে কালকেই—গোধূলিলগ্নে। বিয়ে করে বরাসন থেকে উঠেই অমনি অমৃতসর-মেল ধরতে হাওড়া স্টেশন ছুটবেন।

পরামর্শ অনেক হল। কেলেঙ্কারি কেমন করে বন্ধ করা যায়—হ্যাঁ কেলেঙ্কারি তো বটেই—রঞ্জিত রায়ের মতো মানুষ একটা রিফিউজি মেয়ের রূপে মজে তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে বর্তমান থাকতে বুড়োবয়সে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। লোকে ছি-ছি করবে, হয়তো বা ছড়া বাঁধবে তাঁর নামে—মোহে আচ্ছন্ন বলেই এ-সমস্ত মাথায় আসছে না তাঁর। বিয়ে বন্ধ করে শুধুমাত্র রঞ্জিতকে বাঁচানো নয়, রায়বাড়ির ইজ্জত বাঁচানো।

পুলিন বারম্বার সতর্ক করে দেয়। বলে, আমি এর মধ্যে আছি, দাদা কোন গতিকে টের পেলে ঘাড়ের উপর আমার মাথা থাকবে না। আপনি আছেন, তা-ই বা প্রকাশ হবে কেন? ধরে নিন বিয়ের ব্যাপারের কেউ আমরা কিছু জানিনে।

ইন্দ্রজিত একটুখানি ভেবে নিয়ে অভয় দিল পুলিনকে: দাদা যখন আমায় অবধি বললেন না, কী জন্যে তবে জানতে যাব? তুমি কিছু জান না, আমিও জানিনে। যা করবার নিশ্চিন্ত হয়ে করে যাও পুলিন-দা। আমার মুখ দিয়ে কখনো কিছু বের হবে না।

এত কথার পরেও পুলিনবিহারী পুরোপুরি ভরসা পায় না। বলে, কাজকর্ম সমস্ত করে দিচ্ছি ছোটবাবু, কিন্তু নিজে আমি আড়ালে থাকব। বাগানমুখোই হব না তখন। এ নিয়ে কিছু বলতে পারবেন না আপনি।

ইন্দ্রজিত হেসে উঠে সায় দিল: তখন আর কাজকর্ম কী? মজা দেখা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। না গেলে মজা দেখা মাটি হবে তোমার।

॥ উনিশ ॥

ইন্দ্রজিতকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে পুলিনবিহারী এবার নেবুতলা ছুটল।

রঞ্জিতের শ্বশুরবাড়ি। ছেলে রন্টু এখানে থাকে শাশুড়ি জাহ্নবী দেবীর কাছে। এটা-সেটা নিয়ে প্রায়ই আসতে হয়, জাহ্নবী দেবী পুলিনকে ভাল মতন চেনেন।

সাষ্টাঙ্গে পুলিন প্রণাম করে: এদিকে এসেছিলাম মা, তাই ভাবলাম, কেমন আছেন খবরটা নিয়ে যাই।

জাহ্নবী দেবী বলেন, বেশ করেছ। কালই তোমার কথা হচ্ছিল। অনেকদিন

বাগানের ডাব আসেনি, রণ্টু ডাব-ডাব করে। বলি, নিজেদের অতগুলো গাছ রয়েছে তো বাজারে কিনতে যাই কেন? পুলিন একটা খবর পেলেই তো পাঠিয়ে দেয়।

পুলিন হাঁ-হাঁ করে ঃ সে তো বটেই। বাজারের ডাব কেন কিনতে হবে? বাগানে কাঁদি-কাঁদি ডাব—রণ্টুরই তো সব। কী আশ্চর্য বিনয়কে আমি গেল-হপ্তায় বলে দিয়েছি—পাঠায়নি বুঝি? রিফিউজিরা বাগানে এসে ঢুকেছে। তবে এরা ভদ্রলোক, গাছ-গাছালির ক্ষতি করে না, ঘর বেঁধে আশ্রয় নিয়ে আছে এই পর্যন্ত। আচ্ছা মা, এক্ষুণি গিয়ে আমি বিনয়ের কাছে দারোয়ান পাঠাব। ডাব পাড়িয়ে তাড়াতাড়ি যাতে পাঠায়।

জাহ্নবী দেবী বলেন, পাড়িয়ে রেখে দিতে বোলো। কবে কাকে দিয়ে পাঠাবে—অত ঝঞ্ঝাটের দরকার নেই। ফি-রবিবার আমি দক্ষিণেশ্বর মায়ের মন্দিরে যাই। ফিরতি মুখে বাগান ঘুরে আসব না হয়।

পুলিন অনুনয় করে বলে, তাই যাবেন মা। লোকজনের বড্ড অসুবিধে, সেই জন্যে সব সময় পাঠানো হয়ে ওঠে না। নইলে বিনয়ের গাফিলতি নেই। ডাব পাড়া থাকবে—এককাঁদি দু-কাঁদি যা মোটরে ধরে, নিয়ে আসবেন। কাল শুধু ঐ এক রবিবারের কথা নয়, প্রতি রবিবারে ফিরতি পথে যদি এককাঁদি করে তুলে নিয়ে আসেন, রণ্টুরা খেতে পারবে।

ইন্দ্রজিত ওদিকে মেয়েদের বোর্ডিং-এ ছুটল। একেবারে কলের মতন কাজ হচ্ছে। ইলু নীলু থাকে এখানে। তাদের ডাকিয়ে এনে ইন্দ্রজিত বলে, বাগানে পিকনিকের কথা বলে থাকিস—কাল তো রবিবার আছে, যাবি?

দু-বোনে নেচে উঠে ঃ হ্যাঁ কাকামণি, কালই। কখন নিয়ে যাবে? বড়-দিদিমণিকে তুমি বলে যাও, আমরা তৈরী হয়ে থাকব।

ইন্দ্রজিত বলে, শখ করে একদিন পিকনিক করবি—আমি বলি, বাজারে মাছ কেন কিনতে যাই, ঝিলে মাছ ধরিয়ে রান্নাবান্না করব। বেড়জাল টেনে মাছ তুলবে—সে-ও এক দেখবার জিনিস।

মেয়েরা পরমোৎসাহে বলে, সেই ভাল কাকামণি। ঝিলের মাছ ধরে সেই মাছ রান্না হবে। বাজারের মাছ তো রোজ খাই।

ইন্দ্রজিত বলে, তা হলে বরঞ্চ চান-টান করে দুপুরের মতো চাট্টি খেয়ে নিস। পিকনিকের খাওয়া খেতে দেরি হবে, হয়তো বা সন্ধ্যে। তৈরী হয়ে থাকিস তোরা এগারটা নাগাদ জীপ নিয়ে এসে আমি তুলে নেব।

নীলু বলে, খেয়েদেয়ে কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাকব। তুমি কিন্তু মোটেই দেরি করবে না কাকামণি। দেরি হলে দেখো—

ইলু বলে, চার-পাঁচটা বন্ধু নিয়ে যাব সঙ্গে। মানুষ বেশি না হলে পিকনিক কিসের? অ্যাঁ, কাকামণি?

ইন্দ্রজিত সায় দিল ঃ বেশ তো, বেশ তো। এই তবে ঠিক রইল—

ইলু নীলু আর তাদের চার বান্ধবী সকাল সকাল খেয়ে তৈরি হয়ে আছে। বারম্বার উপর-নিচে করছে। ইন্দ্রজিতের দেখা নেই। কি হল, ভুলে গেল নাকি কাকামণি? বান্ধবীদের কাছে অপদস্থ হতে হচ্ছে। অভিমানে মুখ থমথম করছে দু-বোনের।

সুপরিচিত জীপ দেখা দিল অবশেষে। তখন অপরাহ্ণ। দু-বোনে ছুটে এল ঃ

পিকনিকের লোভ দেখিয়ে···কী হয়েছে বল কাকামণি ? কোন অ্যাকসিডেন্ট হল কিনা, ভেবে ভেবে সারা হচ্ছিলাম। ঝিলে মাছ ধরা হবে, আমরা সব দেখব—সেই জন্যে দেখ কখন থেকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি।

ইন্দ্রজিত বলে, মাছ ধরা নিয়েই তো হাঙ্গামা। কসবা অবধি গিয়ে জেলে ঠিক করলাম। তাদের আবার ছেঁড়া-জাল। জাল ভাড়া করতে বেরুল দুই টাকা অগ্রিম নিয়ে। বাড়ি ফিরে এসে আমিও ছটফট করছি ঠিক তোদের মতন। বারটা অবধি দেখে খোঁজ নিতে আবার কসবায় গেলাম। জাল ভাড়া করতে তারা সেই গেছে তো গেছে—পাত্তা নেই। মাছ ধরার আশা ছেড়ে দিয়ে তখন মাছ কেনার চেষ্টা। কোন বাজারে মাছ নেই, মাছে বরফ চাপা দিয়ে ব্যাপারিরা ঘুমুচ্ছে। শেষটা বৈঠকখানা-বাজারে এসে অনেক ধস্তাধস্তি করে ঐ দুটো কিনলাম।

ভারী ওজনের দুটো রুই। বিস্তর খেটেছে ইন্দ্রজিত। মাছ শুধু নয়, চাল-ডাল, তেল-ঘি, আনাজ-মশলা কিনে সিটের পাশে গাদা করেছে। বলে, ঠাকুর-চাকর বাসে রওনা করে দিয়েছি। এতক্ষণে বাগানে পৌঁছে যাবার কথা।

ইলু বলে ওঠে, বা-রে, ঠাকুরে রান্না করল তো পিকনিক কিসের ? সে তো বাড়ির খাওয়া। রাঁধব আজ আমরা—যত জনে যাচ্ছি সকলে মিলে রাঁধব। ঠাকুর আজকে আমাদের রান্না খাবে।

॥ বিশ ॥

ফটক পার হয়ে জীপ ঢুকে যেতে নীলু সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে : বাবা যেন ওই—বাবাই তো! বড্ড মজা হল, পিকনিকে আজ বাবাকেও পেয়ে গেলাম।

ইলু চেঁচাচ্ছে : ও বাবা, এই দিকে—এই দেখ, আমরা সব এসেছি। ডাক শুনে রঞ্জিত দ্রুতপায়ে গাড়ির কাছে এলেন।

ইন্দ্রজিত বলে, ইলু-নীলুর বোর্ডিং-এ গিয়েছিলাম কাল। বাগানে এসে পিকনিক করবে, অনেকদিন থেকে বলছে। এবারে কিছুতে ছাড়ল না। ঝিলে মাছ ধরা হবে, ওদের বড় ইচ্ছে। কিন্তু জেলে জোটাতে পারলাম না। শুধু-শুধু দেরি হয়ে গেল। কখন যে কী হবে, জানিনে।

রঞ্জিত উষ্ণকণ্ঠে বলেন, রিফিউজিরা এসে পড়েছে, এ সময়টা গন্ডগোল চলছে। হাঙ্গামার মধ্যে ছেলেমানুষদের কোন্ আক্কেলে নিয়ে এলে, শুনি ?

ছাড়ে না যে—কী করব !

তারপর দূরে অশ্বিনীদের দখল-করা সেই ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিত ফোঁস করে এক নিশ্বাস ছাড়ল। বলে, নড়ছে না কিছুতে ? উঃ, কী ঝামেলা যাচ্ছে যে আপনার। দুটো দিনের জন্যেও যদি কলকাতা এলেন, তিলার্ধ জিরোবার ফুরসত হয় না। আবার এই এক তালে এসে পড়লেন।

ইলু বলে, বাবা তুমি খাবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে।

গাড়ি ধরতে হবে যে! পাটনায় কাল মোকদ্দমা।

তোমার গাড়ির আগে রান্নাবান্না হয়ে যাবে। ঠাকুরকে রাঁধতে দেব না তো, আমরা আজ রান্না করব। কত তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারি, দেখিয়ে দেব। না খেলে ছাড়বই না।

নীলু বলে, কোন্ জায়গায় উনুন করা যায় বল তো কাকামণি?

ইলু বলে, পাকাবাড়ির বারান্দার উপরটায়। বাগানে পোকা-মাকড়, নোংরা—

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি বলেন, তবে আর বলছি কি। পাকাবাড়ি রিফিউজিরা দখল করে বসেছে। এদিকে সেদিকে চালাঘর বেঁধে পাড়া জমিয়েছে। ওদের ধারে-কাছে যাবি নে তোরা। যা করতে হয় ঝিলের এ-পারে—পুল পার হবিনে, খবরদার! গুন্ডা-বজ্জাত যত—মারধর না-ই করুক, দুটো অপমানের কথাও বলতে পারে।

ইন্দ্রজিত গর্জে উঠল: আমার ভাইঝিরা সব এসেছে—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, বলে দেখুক না একবার। জিভ টেনে ছিঁড়ব না?

রঞ্জিতও সমান তেজে ভাইকে ধমক দিয়ে ওঠেন: মেয়েরা আমোদ করে বনভোজনে এসেছে, তুমি এর মাঝে গণ্ডগোল বাধাতে যেও না—মানা করে দিচ্ছি। যদি কিছু করতে হয় আজকের দিনটা কাটুক, বোর্ডিং-এ চলে যাক এরা ভালয় ভালয়, তারপরে।

মেয়েদের বোঝাচ্ছেন: নাম হল যার বনভোজন—বনে-বাগানেই খেতে হয় রে! বারান্দার উপরে খাবি তো বোর্ডিং-এর ডাইনিং-রুমের দোষটা কী হল? পিকনিক করতে এসেছিস, আমি বলি, পাঁচিলের ধারে উই যে লতাপাতায় ঘেরা জায়গা, ওরই আশে-পাশে কোথাও উনুন খুঁড়ে নিগে যা।

সন্ধ্যার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বর ফেরত জাহ্নবী দেবীর মোটর এসে পড়ল। রন্টু দিদিমাকে ছেড়ে থাকে না, জাহ্নবী দেবী নেমে পড়ে হাত ধরে তাকে নামিয়ে নিলেন।

বাবা ঐ যে! ও বাবা, বাবা গো—

ছুটে গিয়ে রন্টু রঞ্জিতের হাত জড়িয়ে ধরেছে। ষোলকলা পরিপূর্ণ। ইলু-নীলুর আরও উল্লাস—আজকের পিকনিকের মধ্যে ছোইভাইটা এবং দিদিমাকে সুদ্ধ পাওয়া গেল। এসেই জাহ্নবী ভিড়ে পড়েছেন। রঞ্জিতকে ডাক দেন: ওদিকে কী তোমার? ছটফট করছ কেন বাবা? বিষয়কর্ম একটা দিন থাকুক, পাটনা থেকে ফিরে এসে যা করবার কোরো। ছেলেটা কী করছে দেখ—কাছে তো পায় না। হাত ছাড়িয়ে চলে যেও না বাবা, দুঃখ পাবে।

ঠাকুর ও চাকর যেইমাত্র এসে পা দিয়েছে, ইলু সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিল যাও, দেখেশুনে বেড়াওগে তোমরা। ঘণ্টা দুই পরে এসে নেমন্তন্নে বসবে। হাতা-খুন্তি ছুঁতে দিচ্ছিনে, ওসব আজ আমাদের দখলে। যাও চলে, দাঁড়িয়ে থেকে করবে কী?

বিনয়েরও নিমন্ত্রণ। যখন যেটা আটকায়, আগ বাড়িয়ে এসে সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে এক সময় জাহ্নবী দেবী বললেন, ডাব পাড়িয়ে রেখেছ বিনয়—পুলিন কিছু বলে নি? আমার গাড়ির পিছনে এককাঁদি ডাব তুলে দিও, ভুলে যেও না।

বিনয় বেকুব হয়ে বলে, নানান গণ্ডগোলে কাল হয়ে ওঠেনি। পাড়ানি ঠিক আছে—ডেভিড সাহেবের জায়গায় কাজ করছে, ওদের একজন। কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে গাছে উঠবে। আছেন তো আপনি, যজ্ঞি না মিটিয়ে যেতে পারছেন না।

ইন্দ্রজিত রান্নার কাঠ কেটে দিচ্ছিল। কানে গিয়েছে। সে বলে, যজ্ঞি তো শুনতে পাচ্ছি আরও একটা আজ এখানে। রিফিউজিদের আস্তানায়। তুমি এখানকার মানুষ বিনয়, তোমার কানে কিছু যায় নি?

বিনয় নিরীহ চোখে তাকিয়ে পড়ল?

ইন্দ্রজিত একগাল হেসে বলে, রিফিউজিদের মেয়ের বিয়ে যে আজকে। এই এখনই গোধূলিলগ্নে। নেমন্তন্ন করেনি তোমায়? কী আশ্চর্য!

রঞ্জিত এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে এসে বিনয়কে ডাকলেন: একটা কথা শোন বিনয়। ওদিকে চল। খুব একটা জরুরি ব্যাপার।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নিম্নকণ্ঠে বলেন, পিকনিক নিয়ে মেতে থাকলে হবে না এখন। অনেক রকমে ভেবে দেখলাম, তুমি ছাড়া সে কাজ হবে না।

বিনয় হাত কচলে কৃতার্থ হয়ে বলে, আজ্ঞে, যা আপনার হুকুম—

রঞ্জিত লুফে নিয়ে বলেন, সে তো জানিই। কত লোকে কত নিন্দেমন্দ করতে আসে তোমার নামে, কিন্তু ঐ বিশ্বাসটা আছে বলেই সব কথা ঝেড়ে ফেলে দিই।

আবার ভাবেন একটুখানি। তারপর বলে ফেললেন, অশ্বিনীবাবুর মেয়ের বিয়ে আজকে। বিয়েটা তোমাকেই তো করে ফেলতে হয়। বিনয় আকাশ থেকে পড়ে: আমি?

তা ছাড়া কোন উপায় দেখিনে। খবর রাখ কিনা জানিনে, আমায় ও'রা বড্ড ধরে পড়লেন। রাজি হতে হল। নয়তো বাগানবাড়ি বেদখল হয়ে থাকে, বিস্তর ফেরে পড়তে হয়। বিস্কুট-ফ্যাক্টরির জন্য মেসিনের অর্ডার দিয়ে ফেলেছি, সমস্ত বরবাদ হয়ে যায়।

বিনয় ঘাড় নেড়ে বলে, আপনি হলেই সর্বাংশে সুন্দর হত বড়বাবু।

রঞ্জিত খি'চিয়ে উঠলেন: হবে কি করে, বিপদটা দেখছ না! মেয়ে দুটোর আজকেই পিকনিকের মচ্ছব লাগল! দু-বোনে এল, আবার কলেজের পুরো এক গন্ডা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। ওদিকে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যি সেরে শাশুড়িঠাকরুন এসে পড়লেন। রন্টু এসেছে, ইন্দ্রজিত এসেছে। বরাসনে আমি বসতে গেলে এখনই গজকচ্ছপের লড়াই বেধে যায়। মেয়ের আভ্যাতিক হয়ে গেছে—রাতের মধ্যে দিতেই হবে বিয়ে। পূর্ব-বাংলার লোক ওরা, এসব বড্ড মানে। বিয়ে না হলে রঞ্জিত রায় বলে খাতির করবে না—ঠেঙিয়েই মেরে ফেলবে। সেইজন্য তোমায় বলছি।

ইন্দ্রজিত এই সময় দু-হাতে বড় বড় দুই বালতি জল নিয়ে পুকুর-ঘাট থেকে পিকনিকের দিকে যাচ্ছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বিনয় বলল, ছোটবাবু স্বয়ং হাজির রয়েছেন, তাঁর চোখের সামনে—তিনি যে আমায় ধরে ঠেঙাবেন বড়বাবু, তার উপায় কী?

রঞ্জিত সগর্বে বলেন, তেমন ভাই নয় আমার ইন্দ্রজিত—আমি যদি বলে দিই, ভাই আমার কোমর বে'ধে নিজেই কনে পি'ড়ি ঘোরাতে লেগে যাবে। নিশ্চিন্ত থাক তুমি, সে দায়িত্ব আমার।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কথাটা আদ্যোপান্ত আর একবার ভেবে নিলেন বোধহয়। সজোরে ঘাড় নেড়ে বলেন, কাদের মেয়ে কোন্ অঞ্চল থেকে ভেসে এসে উঠল—আধবুড়ো দোজবরে আমার সঙ্গে হলেও হতে পারত, কিন্তু আমার ভাইয়ের সঙ্গে হবে না। পাতিপুকুরে কথা দিয়ে বসে আছি, ভদ্রলোকেরা আশায় আশায় রয়েছেন, কথা আমি প্রাণ গেলেও ভাঙতে পারব না। তার উপরেও আছে। আমার বিয়ের সময় অবস্থা সেরকম ছিল না বলে বিয়েটা নমো-নমো করে হয়েছে, বুড়ো বয়সে এখন বিয়ে করতে গেলেও চোরাগোপ্তা করতে হত। কিন্তু ভাইয়ের বেলা তা নয়। ভাইয়ের বিয়ের আর মেয়ে দুটো দুটোর বিয়েয় আমি সাধ মাটিয়ে জাঁকজমক করব। ওদের বিয়ে চুপিসারে

হতে পারে না।

বিনয় চুপ করে থাকে। রঞ্জিত আবার একটু ভেবে বলেন, পুলিনটা কাছাকাছি থাকলে বরং—উঁহু, তা-ও তো হবে না। বোন-মিলটা উঠে যাবার দাখিল, কলিয়ারির দায় পুলিনের উপর চাপিয়ে আমি এবার মিল নিয়ে পড়ব। ঝরিয়া—পাটনা ছুটোছুটি করে আর মামলা করে বেড়াতে হবে তাকে, বিয়ের রঙ্গে মাতলে হবে না। মামলা মিটে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে চেপে বসুক, তখন বিয়ের কথা। ভেবেচিন্তে দেখছি বিনয়, তুমি ছাড়া গতি নেই। বিস্কুট-ফ্যাক্টরি হতে কিছু তো দেরি আছে, বিয়ে ততদিনে পুরানো হয়ে যাবে। কাজ আটকাবে না।

বিনয় বলে, আমি সামান্য লোক—অশিক্ষিত, গরিব। তবে খুলেই বলি বড়বাবু, অনেক আগে একবার কথা উঠেছিল। আমার মায়ের বড্ড ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রস্তাব ওঁরা কানেই নিলেন না। আমায় ওঁরা মেয়ে দেবেন না কিছুতে।

রঞ্জিত তাড়া দিয়ে থামিয়ে দিলেন: তোমায় যা বলছি, তাই কর। বেলা পড়ে এল, গোধূলির বেশি দেরি নেই। মাথায় টোপর চড়িয়ে চট করে বর হয়ে এস দিকি। মেয়ে দেয় না দেয়, সে বুঝি আমার।

বিনয় নিজের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রঞ্জিত গর্জন করে ওঠেন: নিজের ভবিষ্যৎ খোয়াচ্ছ কিন্তু। অনেক কিছু ভেবে রেখেছিলাম তোমার জন্য। বাড়িভাড়া আদায়ের এই সামান্য কাজটুকু—তা-ও কিন্তু থাকবে না। বাসা ছেড়ে দিয়ে এক্ষুণি দূর হয়ে যেতে হবে।

বিনয় তাড়াতাড়ি বলে, আজ্ঞে না—অন্য-কিছু নয়। কাপড়খানা ছেঁড়া, জামাটাও ময়লা। আর ভাবছি, আমার বাবার কথা—তিনি বিয়ে দেখতে পাবেন না। বাবা ছাড়া আমার আপন কেউ নেই।

রঞ্জিত বলেন, টেলিগ্রাম করে দেবে। বিয়ে না দেখুন, বউভাতে এসে পড়বেন। মুর্শিদাবাদি গরদের জোড় কিনে কনের পিসির কাছে দিয়েছি—তোমার কপালে আছে, ছেড়া কাপড় ময়লা জামা ছেড়ে গরদের জোড় পরগে যাও। কে কিনল, আর কার ভোগে গিয়ে পেঁছিল!

অশ্বিনীর কাছে গিয়ে রঞ্জিত বলেন, ট্রেন ধরতে হবে, হাতে সময় নেই। কারবারি মানুষ, খোলাখুলি হিসাব আমার কাছে। কথাবার্তা যা হয়েছে, তার নড়চড় হবে না। তিন হাজারের মধ্যে যাবতীয় খরচ-খরচা বাদে এই ছাব্বিশ-শ' সাতান্ন টাকা ছয় পাই। টাকাটা দেখে নিন। এ টাকা আপনার। বাগানবাড়িতে যেমন আছেন থাকুন আপাতত, কেউ বাধা দেবে না। সমস্ত ঠিক আছে, বরটাই শুধু পালটে যাচ্ছে। আমি নই, বিনয়। তাতে বরঞ্চ মুনাফাই আপনাদের। আধবুড়ো বরের জায়গায় ছোকরা বর পেয়ে যাচ্ছেন। আরও তো শুনলাম, পুরানো জানাশোনা—বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আগে থেকে চলছে।

আশিস ঘাড় নেড়ে বলে, আরও কিছু আছে মশায়। বিস্কুট-ফ্যাক্টরি বসাবেন এই বাগানে, সেই চেষ্টায় আছেন। সবাইকে চিরকাল কিছু থাকতে দেবেন না। আর পেটে না খেয়ে এতগুলো মানুষ থাকেই বা কী করে? শুধুমাত্র বাবার সঙ্গে ফয়শালা হলেই হবে না, ওদের ব্যবস্থা কী ভেবেছেন, বলুন।

রঞ্জিত বলেন, ফ্যাক্টরি হলে লোক লাগবে না? হাতের কাছে এঁরা থাকতে, বাইরে লোক কেন কুড়োতে যাব? এঁরাই থাকবেন সব। আর ছোট-বড় যেমনই হোক, কোয়ার্টারও কোম্পানি দেবে। মাইনে হল, বাসা হল—এর উপরে কী চাই, বল এবারে?

না, আর কিছু নয়। প্রসন্ন হয়ে আশিস বিয়ের যোগাড়ে গেল।

সদাশিব আনন্দে কি করবেন ভেবে পান না: কী বলছেন বড়বাবু, আমাদের বিনয়ই বর হল শেষ পর্যন্ত! আহা, বেঁচেবর্তে থাক ওরা, সর্বসুখী হোক। বিয়ের মন্তর তবে আমিই পড়াব। আজেবাজে পুরুতে কাজ নেই।

অশ্বিনীর তবু কেমন ইতস্তত ভাব। সদাশিব অধীর হয়ে বলেন, ভাবছ কি মেজরাজা ?

অশ্বিনী বলেন, বাঁশিকে একটা বাড়ি লিখে দেবার কথা—সেটার কথা কিছু হল না ?

রঞ্জিত চতুর্দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন। ইলু নীলু ও তাদের বান্ধবী মেয়ে চারটি মহোৎসাহে রান্না চাপিয়েছে, ইন্দ্রজিত কাঠকুটোর যোগাড় দিচ্ছে। ডেভিড সাহেবের কাজকর্ম সেরে মজুরটা এসে পড়ল; জাহ্নবী দেবী তলায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন, লোকটা ফন ফন করে নারকেল-গাছের মাথায় উঠে যাচ্ছে।

বশম্বদ বিনয়কে এদের মধ্যে আর দেখা যায় না। তাড়াতাড়ি বরের সাজ করেছে কোন্ নেপথ্যস্থানে বসে। রন্টু কোন্ দিক দিয়ে ছুটে এসে, বাবা-বাবা—করে দু-হাতে আবার তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

বিপন্ন রঞ্জিত বলেন, আচ্ছা, হবে সেটাও। কলকাতার বাড়ি না হোক, এই দমদমে ছোটখাট একটা-কিছু করে দেব। বিনয় কাপড় বদলাতে গেছে। মন্তোর পড়তে লাগিয়ে দিয়ে আমি স্টেশনে রওনা হব। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না মশায়। কথাবার্তা তো হয়ে গেল, কাজে লেগে যান। সময় বেশী নেই।

যে আজ্ঞে—বলে তৎক্ষণাৎ অশ্বিনী পাকাবাড়ির অভ্যন্তরে অদৃশ্য হলেন।

গরদের ধুতি গরদের চাদর গায়ে জড়িয়ে বিনয় এখন আলাদা মানুষ। বিয়ের বর। বর সেজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কিন্তু সজ্জা দেখবার মানুষ কই? সংক্ষিপ্ত বিয়ে। নতুন পাড়ার মধ্যে যে ক'টি মেয়েলোক, বিয়েয় আসবেন তাঁরাই শুধু। বিয়ে না বিয়ে—চুক্তি মতো বরের নাম প্রকাশ করা হয়নি এতাবৎ, তেমন করে আসবার জন্যেও কাউকে বলা হয় নি। এইবারে আশিস যাচ্ছে, গিয়ে খবর দেবে, দুড়দাড় করে এসে পড়বেন সকলে। এখন প্রায়-নির্জন বিয়েবাড়ি।

বাঁশি হঠাৎ এসে পড়ে বিনয়ের সামনে। তাকিয়ে দেখে চোখ-ভরা হাসি নিয়ে বলে, বাঃ, দিব্যি দেখাচ্ছে তো!

বিনয় বলে, পুরো সাজ তবু হল কোথায়! বরের কপালে ফুটকি-ফুটকি চন্দন দিয়ে দেয়। তবে তো দেখাবে ভাল। অত সমস্ত কে করবে বল।

বাঁশি সকাতরে বলে, আয়না ধরে যা-হোক করে সেরে নাও। আমি পারব না। এক্ষুণি সব এসে পড়বে। কী বলবে দেখে! বিনয়ও বুঝে দেখে সেটা: তা বটে, তোমার নিজেরও সাজসজ্জা আছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাওগে, গোধূলির বাকি বেশি নেই।

একেবারে কাছে এসে চাপা গলায় বিনয় বলে, এটা কী রকম হল, বল তো? কত বড় বড় সম্বন্ধ এল—বিদ্যেয় বড়, নামে-ডাকে টাকা-পয়সায় বড়, গায়ে-গতরে বড়—সমস্ত বাতিল হয়ে গিয়ে আমি? যে আমি সেই কোন্ কালে বাতিল হয়েছিলাম।

বাঁশি মুখ বাঁকিয়ে বিনয়ের স্বরের অনুকরণ করে বলে, কত বড় বড় ভারী ভারী

সম্বন্ধ—কোনটার টাক মাথা, কোনটার অসুরের মতন চেহারা, কোনটা বাঘের মতন হালুমহুলুম করে। উঃ, কী বাঁচাটাই বেঁচে গেলাম! ভাগ্যিস তুমি কাছেপিঠে ছিলে।

কাছেপিঠে আজ কি আমায় নতুন পেলে?

বাঁশি গাঢ়স্বরে বলে, ঠিক তাই বিনয়-দা। তখন অট্টালিকার চূড়ায় থাকতাম, তোমরা খুপরিঘরে। ভাগ্যিস দেশভূঁই গেল—নতুন জায়গায় সকলে এবার একাকার।

বড় গভীর কথাবার্তা। বেশিক্ষণ বাঁশি ভব্য হয়ে পারে না। ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, মন্দটা কি হল! অনেক রকমের বর দেখে নেওয়া গেল। স্বয়ম্বরা হলেন সোনাটিকারির রাজকন্যা। সত্যি বলি বিনয়-দা, ওগুলো বর নয়—এক-একটা বাঁদর। দূর, আমি যেন কী, বিনয়-দা বিনয়-দা করছি এখনো।

রানী

শ্রীমতী অরুণা মুন্সী
শ্রীযুক্ত নীহারকুমার মুন্সী
পরমপ্রিয়েষু

॥ এক ॥

ডাক্তার ধনঞ্জয় সেন।

ধনঞ্জয় নয়, ধন্বন্তরী—নাম পড়ে গেল ধন্বন্তরী-ডাক্তার। ওষুধে ডেকে কথা বলে। হলে হবে কি—বুড়ো হয়ে গিয়ে রোগি দেখা ছেড়ে দেবার মতো। মন উড়ু-উড়ু, হরিদ্বারে পালাবেন। বন্দোবস্তের কিছু কিছু বাকি এখনো—হয়ে গেলে তিলার্ধ আর দেরি নয়। মেজাজটা বরাবরই তিরিক্ষি। ইদানীং চরমে উঠেছে। রোগি এলে বেজার হন। ছোটখাট রোগ নিয়ে এসেছ তো রক্ষে নেই—

চার বড়ি অ্যাসপিরিনে সেরে যায়, আমার কাছে কেন? পয়সায় কামড়াচ্ছে—বুঝেছি, আসল রোগটা তাই।

তাড়া খেয়ে রোগি তো হতভম্ব।

ধনঞ্জয় বলেন, দিচ্ছি প্রেস্কৃপসন। অষুধপত্তোর নয়—তেজি ঘোড়া একটা। কিনতে হবে না, ভাড়া করলেই হয়ে যাবে।

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রোগি বলে, আজ্ঞে?

ঘোড়ায় চড়ে গড়ের-মাঠে খুব খানিকটা চক্কোর দাওগে। কামড়ানি কমবে, আরাম পাবে। যাও।

রোগ কোনটা কঠিন আর কোনটা অ্যাসপিরিন-সেব্য, রোগি কেমন করে ধরবে? ধনঞ্জয়ের কাছে ভিড় করে, আর ধমক খায়। মুখ চুন করে চলে যায় তখন গোপাল-কম্পাউন্ডারের কাছে। তিনি যদি ডাক্তারকে কিছু নরম করতে পারেন।

তা দুনিয়ার মধ্যে যদি কেউ পারেন, সে গোপালই। ধনঞ্জয়ের সমবয়সি তিনি, ডাক্তারির সেই গোড়ার আমল থেকে আছেন। এসেছিলেন পাচক হয়ে—প্রমোশন পেয়ে কম্পাউন্ডার এখন।

কম্পাউন্ডার না হাতি!

ভিতরের খবর যারা জানে, তারা সব বলাবলি করেঃ ওষুধ ছুঁতে হয় না এ কম্পাউন্ডারকে। যত পেয়ারের মানুষই হও, ওষুধের ব্যাপারে ডাক্তার অতি সতর্ক। কম্পাউন্ডার নাম দিয়ে রোগির ঘাড় ভেঙে কিঞ্চিৎ পাইয়ে দেন—

বুড়ো হয়েছেন সেই অজুহাতে রোগির বাড়ি ধনঞ্জয় একলা যান না। বাড়ি নিয়ে যাবে তো গোপাল-কম্পাউন্ডারকেও নেবে। এবং ডাক্তারের ফীয়ের সঙ্গে কম্পাউন্ডারের অতিরিক্ত ফী দু'টাকা। ইচ্ছে তোমার, না পোষায় অন্য ডাক্তার দেখ।

কম্পাউন্ডারের প্রভাব চাউর হয়ে গেছে। তাড়া খেয়ে কম্পাউন্ডারকেই সকলে মুরুব্বি ধরে।

কম্পাউন্ডার ধমকান ডাক্তারকেঃ রোগি দেখলে তেড়ে উঠবে তো যন্ত্রপাতি ওষুধপত্তর গঙ্গাজলে বিসর্জন দাওগে। নিজের মায়া হয় তো বলো, আমি গঙ্গায় দিয়ে আসি। লোকের লাঞ্ছনা চোখ মেলে দেখা যায় না। সকলে জানবে, ডাক্তারিতে ইস্তফা দিয়েছ। গালি খেতে ভিড় করে আসবে না।

গোপালের কথায়, কী আশ্চর্য, ধনঞ্জয়ের রাগ একেবারে জল। হাসেন মৃদু মৃদু। হাসিমুখে বলেন, গঙ্গায় দিও না হে—ছেলে ডাক্তার হয়ে বেরুচ্ছে, তার কাজে লাগবে। কিছুই আমি সঙ্গে নিয়ে যাব না। হরিদ্বারের সে হাসপাতাল আমি একনজর দেখে এসেছি। অমন সাজসরঞ্জাম এ শহরেও বেশি নেই।

সর্বনেশে প্রসঙ্গ—গোপাল এ জিনিস সর্বদা এড়িয়ে চলতে চান। এখন তো রোগি তাড়াচ্ছেন—এর পরে নাকি কলকাতা শহর এবং বাংলাদেশই ছাড়বেন যাবতীয়

রোগি ও কম্পাউন্ডারকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে। সন্ন্যাসীরা বিরাট এক হাসপাতাল করেছেন হরিদ্বার অঞ্চলে—বিনামূল্যে চিকিৎসা। ধনঞ্জয় একটা বিভাগের ভার নিয়ে যাচ্ছেন। চিঠিচাপাটি চলছে, একবার গিয়ে দেখেও এসেছেন স্বচক্ষে। গোপালের কিন্তু বিশ্বাস, যাওয়া হবে না—শেষ অবধি ভেস্তে যাবে। মুফতের রোগি কোথায় নেই—তাদের চিকিৎসা ধনঞ্জয় এখানেও তো সাধ মিটিয়ে করে আসছেন। তবে আর হিমালয় পর্বত অবধি ধাওয়া কেন? টের পেলে রোগিরাই এসে ঘেরাও করবে, বুঝবেন ডাক্তার ঠেলা।

রোগিদের উপরেও গোপাল মাঝে মাঝে বকাবকি লাগান: বেলাজ বেশরম তোমরাও কম নও বাপু। বলি শহরের উপর কুল্লে কি এই একজন ডাক্তার? কেন এখানে অকথা-কুকথা শুনতে এসো?

রোগি সঙ্গে নিয়ে সুস্থ মানুষজন অনেকে ডাক্তারখানায় আসে, প্রবল কণ্ঠে তারা সায় দিয়ে বলে, বটেই তো, কেন আসি? মুখের কটুভাষা, তার উপরে রাঘববোয়াল একটি—গ্রাসের মধ্যে দুনিয়া ঢুকে যায়। আর আসব না। অলিতে গলিতে চেম্বার সাজিয়ে কত কত ডাক্তারবাবু অহোরাত্রি মাছি তাড়ান—গেলে জামাই-আদরে বসিয়ে রোগ দেখবেন। চা-সিগারেট খাওয়াবেন।

সুস্থ লোকের মুখে এইসব কথাবার্তা। সেই মানুষেরই রোগ হলে কিন্তু সংকল্প আর মনে থাকে না, কাতরাতে কাতরাতে ধনঞ্জয়-ডাক্তারের দরজায় ধর্না দেবে।

ধনঞ্জয়-ডাক্তারের ভিজিটের বাঁধাবাঁধি নেই—রোগি বিশেষে দর। রোগ নয়, রোগি। রোগির সাংসারিক অবস্থা কি রকম, সেই বিচার। ধনশালী হলে রক্ষে নেই ধন্বন্তরী-ডাক্তারের হাতে। যমের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবেন ঠিকই—নিজেই তারপরে যমরাজ হয়ে রোগির হাড়মাস শুষবেন।

বউ নেই ছেলেপুলে নেই, কারা খাবে ডাক্তারের টাকা?

যারা জানে তাদের জবাব: বউ-ছেলেপুলে থাকলে তবু তো গোণাগুণতির মধ্যে থাকে। এ যেন হরিঘোষের গোয়াল—কত মানুষ নিচ্ছে খাচ্ছে পোঁটলা বাঁধছে, কিছুই তার লেখাজোখা নেই—

আমাদের পাঁচু রাউত দুঃখ করে বলেছিল, বেকার পড়ে আছি, তা ভগবান মোটা রোগপীড়েও যদি একটা দিত! ভাল ভাল পথ্যি—বাপের জন্মে যা জিভে পড়েনি—ধন্বন্তরী-ডাক্তারের পয়সায় খেয়ে-দেয়ে দেহখানা তাগড়াই করে নিতাম।

এহেন পাঁচু রাউত একটি দুটি নয়। দেদার রোজগার করা সত্ত্বেও ডাক্তারের তাই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। বলতে পারেন, গোপাল-কম্পাউন্ডার চিরকালের সুহৃৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি—বেধড়ক লুণ্ঠনের ব্যাপার চলছে, তিনি কেন আয়-ব্যয় হিসাবের ভিতরে আনেন না?

আনেন না যেহেতু নিজেই তিনি পয়লা-নম্বরি মক্কেল। কম্পাউন্ডারি করে কী-ই বা আসে—সংসার-প্রতিপালন ছেলেমেয়ে পড়ানো ইত্যাদি যাবতীয় খরচ ধনঞ্জয়ের। রীতিমত রাজসিক খরচ। বড়ছেলে বকে গেল দেখে ছোটছেলেকে দেওয়া হল গোলকুন্ডা-শিক্ষাসত্রে। পাস করে এখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। খাওয়ার আয়োজনটাও একদিন দাঁড়িয়ে দেখে আসবেন—বিশেষ করে ভাবী ডাক্তার ঐ ছোটছেলের খাওয়া। দুধ-মাখন মাংস-মাছ—এই বাজারে যা সমস্ত ডাক্তার নিজের মুখেও দিতে পারেন না।

তাই ঝক্কিটা গিয়ে পড়ে ধনী রোগিদের উপর। কঠিন রোগ হয়েছে, ব্যাঙ্কে টাকাও

রয়েছে, এবং নিশ্চিত জানে ধন্বন্তরী-ডাক্তার জীবন-দানের ক্ষমতা রাখেন। অতএব টাকা ঢালে ডাক্তারকে, এবং রোগমুক্ত হবার পর 'অর্থপিশাচ' 'রাঘববোয়াল' ইত্যাদি বদনাম রটায়।

রাজবাড়ির একটি বারোমেসে বাঁধা রোগি—রোগি নয়, রোগিণী—রানী মঞ্জুপ্রভা। রোগ আছে, চেহারা দেখে কে বলবে? কিন্তু অতি দুরারোগ্য রোগ—বিয়ে হয়ে মঞ্জুপ্রভা রাজবাড়ি এলেন, সেই থেকে চিকিৎসা চলছে। তাই বা কেন, তারও আগে—মঞ্জুপ্রভার বাপের বাড়ির আমল থেকেই শোনা যায়। হপ্তায় অন্তত পক্ষে একটিবার ডাক্তার যাবেনই রাজবাড়ি। ঝড়-জল দাঙ্গা-হরতাল কোন কিছুতে আটকাবে না। এবং পৌঁছানো মাত্র হাতে হাতে মোটা ভিজিট।

দেওয়ানজি গণপতিকে এড়িয়ে খরচ-খরচা হবার জে নেই। ভিজিটের অংকটা তাঁর জানা। ডাক্তারকে দেখলে তাই বেজার হন—বিশেষ করে জমিদারি গবর্নমেন্টে খাস হয়ে যাবার পর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে খুটখুট করে ধনঞ্জয় উপরে উঠছেন, কাছারি-দালানে দেওয়ানজি অক্ষয়-মুহুরির গা টেপেন। পালোয়ান মানুষ অক্ষয়—গায়ে-গতরে দস্তুরমতো। তাকে তুলনা দিয়ে বলেন, রানী যদি রোগি হন, তুমিও রোগি তা হলে অক্ষয়। দুনিয়ার মধ্যে সুস্থ লোক একটাও তবে নেই। আর আমি তো একেবারেই নেই—বায়ুভূত হয়ে শূন্যে ভেসে রয়েছি।

অক্ষয় টিপ্পনী কাটে: ডাক্তার চিকিচ্ছের জন্যে নয়। এ হল রাজবাড়ি—আমার আপনার বাড়ির মতন নয়। রাজবাড়ির নানান ঠাটঠমক—তারই একটা হল ডাক্তার। সেকালে হাতি পুষত শুনেছি—হাতির পিঠে কেউ কোনদিন চাপত না। ডাক্তারও তাই।

গণপতি বলেন, সে সব দিন গত হয়েছে। হাতি পোষে না রাজারা কেউ—ডাক্তারই বা কেন তা হলে? রাজ্যপাট গেছে, নামে-মাত্র রাজবাড়ি। রানীমার এত বুদ্ধি, এইটেই কেবল বুঝবেন না।

বোঝেন না যে মঞ্জুপ্রভা, তা নয়। আগে যাই হোক, ইদানীং বেশ বুঝছেন। ধনঞ্জয়কে জেঠাবাবু বলেন, যে হেতু সম্বন্ধ বাপের বাড়ির। তখন থেকে এই ডাক চলে আসছে।

বলেন, ভিজিট কম করুন জেঠাবাবু—

প্রায়ই এমনি বলেন, খাস-দাসী বাবলি আড়ি পেতে শোনে।

বলেন, শরিকদের সঙ্গে গন্ডগোল, মহালগুলো গবর্নমেন্ট নিয়ে নিল—কয়েকটা ভাড়াটে বাড়ি মাত্র সম্বল। পুরনো ঠাটবাট একেবারে ছাড়া চলে না, খরচপত্র দুনো-তেদুনো বেড়ে গেছে—

ডাক্তার কোমল সুরে বলেন, খরচপত্র তোমার একলা বাড়েনি মা। ভিজিট কমালে আমাদেরই বা চলবে কিসে?

মঞ্জুপ্রভা পুনরপি বললেন, হপ্তায় হপ্তায় তবে আসবেন না।

বাবলিকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে জোর দিয়ে আবার বলেন, উদ্বেগ আপনার জানি জেঠাবাবু—ছেটেবেলা থেকে দেখে আসছি। কিন্তু শরীরটা বেশ ভালই আছে এখন। মাসে একবার করে এলেই হবে।

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বলেন, শরীর ভাল আছে কি মন্দ আছে—আমি ডাক্তার, আমার চেয়ে তুমি কি আর বেশি বোঝ? যেমন আসছি, আসতেই হবে আমায়। হরিদ্বারে

চলে গেলে তখন বন্ধ হয়ে যাবে। উদ্বেগ থাকলেও উপায় থাকবে না।

অর্থাৎ দরবার দুটোই নামঞ্জুর। সাপ্তাহিক দর্শন-দান যেমন চলছে তেমনি চলতে থাকবে। এবং দর্শনীও সিকিপয়সা কমবে না।

বাবলি ক্ষেপে গেল। যেই মাত্র ডাক্তার নেমে গেলেন, দু-হাত কোমরে দিয়ে রণমূর্তিতে সে এসে দাঁড়াল : একটা কথা বলি রানীমা, খোলাখুলি জবাব দাও—

দাসী হয়েও এমনি তার কথাবার্তা। রাজবাড়ি তো পুরোপুরি শত্রুপুরী—তার মধ্যে সহায় কেবল গণপতি, বাবলি, অক্ষয় ইত্যাদি কয়েক জন। ছোটরাজা মারা গেলে শরিকেরা উল্লাস চেপে মুখে যথোচিত হা-হুতাশ করে যে যার মহলে গিয়ে ঢুকল, এই দাসীই তখন থেকে ছায়া হয়ে দিবারাত্রি কাছে কাছে রয়েছে। রানীকে দুটো স্পষ্টকথা শোনাবার এক্তিয়ার আছে বই কি তার!

বলে, ডাক্তারের সঙ্গে কী অত ফিসফিসানি—কি বলেন উনি?

মঞ্জুপ্রভার মুখ নিমেষে সাদা হয়ে যায়। মিনমিন করে বললেন, রোগপীড়ের কথা—তুই তার কি বুঝবি?

রোগ না ঘোড়ার ডিম! ভয় দেখিয়ে ভিজিট মারার ফিকির। বছরের পর বছর তাই করে আসছে।

রানী কড়া হয়ে বলেন, এসব কথা কখনো যেন না শুনি। মানা করে দিচ্ছি বাবলি। ছোটমুখে বড় কথা—বড্ড বাড় বেড়েছে তোর দেখছি।

নাও, হয়ে গেল। ডাক্তারের উপর বিশ্বাস এক তিল নড়ানো যাবে না। নিরর্থক চেষ্টা।

॥ দুই ॥

অন্দরে এই বাবলি, আর সদর মহলে গণপতি। দেশি মতে দেওয়ান বলুন কিম্বা বিলাতি মতে ম্যানেজার বলুন, এস্টেটের ব্যাপারে তিনি সর্বময়। পুরনো লোক—এস্টেট যখন বাঁটোয়ারা হয় নি, সকলে একান্নবর্তী ছিল, তখন থেকেই আছেন।

গোলমালটা বিশেষ করে বাধল ছোটরাজা উদয়নারায়ণ মঞ্জুপ্রভাকে বিয়ে করলেন যখন। রূপের জলুসে মুগ্ধ হয়ে আপন-জন কাউকে না জানিয়ে নিতান্ত ওঁছা ঘরের মেয়ে রাজরানী করে আনলেন। জাতটাও খুব সম্ভব এক নয়। যদিও উদয়নারায়ণ বরাবর অস্বীকার করে এসেছেন। সেকালের মতন পাঁতি দেবার ঘটকমশায়রা নেই—অস্বীকার করলে কে আর ঠেকাবে?

লেগে গেল ধুন্ধুমার। এস্টেট তরফে তরফে বাঁটোয়ারা হল, শরিকেরা পৃথগন্ন। মামলা-মকদ্দমা বারোমাস লেগে আছে—দেওয়ানি ফৌজদারি উভয় প্রকার। গণপতি এই সময়টা এজমালি চাকরি ছেড়ে ছোটতরফে এলেন, এসে কড়া হাতে হাল ধরলেন। সেই থেকে আছেন।

বলেন, বিয়ে তো অজুহাত একটা। এমনিতেও হত। বলি, অন্য শরিকদের মধ্যে তো গোলমেলে বিয়ে নেই, তারা কেন পৃথক? আসলে পরিবার বড় হয়ে খরচখরচা বেড়ে গেছে, এস্টেটের আয় দিনকে দিন কমছে বই বাড়ে নি। নামটা বটে রাজবাড়ি, কিন্তু তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। পৃথক হয়ে যে যার আলাদা রুজিরোজগারের পথ দেখছে।

বিপদের উপর বিপদ। উদয়নারায়ণ অকালে অকস্মাৎ দেহ রাখলেন। প্রচণ্ড মাতাল এবং আনুষঙ্গিক নানা উচ্ছৃংখলতা—নিষ্কর্মা বড়লোকদের পক্ষে যা নিতান্ত

স্বাভাবিক। দেহখানা রোগের ডিপো হয়ে উঠেছিল, রোগের বোঝা বওয়া অসাধ্য হয়েছিল—মরেই যেন বেঁচে গেলেন তিনি।

নাবালক ছেলে অলোকনারায়ণ উত্তরাধিকারী, বিধবা রানী মঞ্জুপ্রভা কুমারের অভিভাবক—সম্পত্তির অছি। আদালতের আইনগত মামলা-মোকদ্দমা নয় শুধু এখন—মহালের উপরেও দাঙ্গাহাঙ্গামা, সম্পত্তি বেদখল। মেজতরফই করাচ্ছেন। আবার এমনও শোনা গেল, রানী মঞ্জুপ্রভাকে গুম করে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে—গার্জেন হয়ে ছোটতরফের ভার তখন তাঁদের উপর বর্তাবে।

ভাগ্যিস গণপতি ছিলেন—তিনিও সহজ পাত্র নন। রাজবাড়ির যে অংশটা ছোট-তরফের, উঁচু পাঁচিল তুলে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিলেন সেটা। লোহার ফটক বসালেন, ফটকে দিনরাত্রি বন্দুকধারী বরকন্দাজ—যে-সে বরকন্দাজ নয় লড়াই-ফেরত জওয়ান শিউনন্দন সিং। পুরনো আমলাদের কাজকর্ম চালচলন সন্দেহজনক—শত্রুদের সঙ্গে সম্ভবত তাদের যোগাযোগ আছে। বিলকুল তাদের বরখাস্ত করে কয়েকটি জোয়ানযুবা আমলা নেওয়া হল। মঞ্জুপ্রভার বাপের বাড়ির লোক তারা—ভাই সম্পর্কীয়। পরম বিশ্বস্ত। অক্ষয় যাদের মধ্যে একটি। কাছারিদালানে হাতবাক্স কোলে করে খাতা-পত্র লিখবে, দরকার মতন তেমনি লাঠি-শড়কি-বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহল যেন দুর্ভেদ্য দুর্গ একটি—বাইরের কারো ঢোকবার জো নেই, বিশেষত ছোটরানীর ভিতর-মহলে।

এই ব্যবস্থা চলে আসছে। গণপতির বয়স এখন সত্তর ছুঁই-ছুঁই। ছেলেরা সমর্থ হয়েছে, বাপ এই বয়সেও চাকরি করবেন, তাদের ঘোরতর অপছন্দ। গণপতি অজুহাত দেন: নাবালক কুমার সাবালক হয়ে যাচ্ছেন এই তো কয়েকটা বছর বাদেই। এতদিন গেছে তো যার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিই—দিয়ে ছুটি আমার। তখন কারো কিছু বলবার থাকবে না।

কিন্তু তার আগেই মুলে-হাভাত—গবর্নমেন্ট জমিদারি নিয়ে নিল। দেওয়ানজি বিস্তর আয়োজনে কাগজপত্র নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন—কিন্তু সময়কালে দেখা যায়, সাবালক কুমারের নামে হস্তান্তরের যোগ্য একটি ছিটমহলও অবশিষ্ট নেই। গমগম করত কাছারি দালান—শূন্য কাছারিতে এখন গণপতি আর অক্ষয়-মুহুরি দুই প্রাণী টিম-টিম করছেন। বাকি যত আমলা বাড়ি গিয়ে উঠেছে। মঞ্জুপ্রভা তাদের চাকরি দিয়ে এনেছিলেন—রানীর কাছে তারাই গিয়ে বলল, কাগজে কলম ছোঁয়াতে হয় না—নিষ্কর্মা বসে বসে মাইনে নিই কেমন করে? বিনি কাজে লোক পুষবেন, এস্টেটের তেমন অবস্থা আর নেই।

বৃদ্ধ দেওয়ানের সাথেসঙ্গে একটি লোক অন্তত চাই—অক্ষয় শুধু রয়ে গেছে। সম্পর্কে মঞ্জুপ্রভার মামাতো ভাই।

গণপতি নিজেও মাইনে নেওয়া বন্ধ করেছেন। ছেলেদের বোঝান: মাইনে নেই, কাজকর্ম নেই, এখন তোরা আর চাকরি বলবি কোন সুবাদে? বাড়িতে শুয়ে বসে গল্প করে সময় কাটাতাম, আমার পুরনো জায়গাতেও ঠিক তাই করি।

কাছারি-দালানে একলা গণপতি। পানের ডিবে হাতে বাবলি এসে ঢুকল। আসে এমনি যখন-তখন—অন্দরের খবরাখবর দেয়। বলে, আজকেও আবার তাই—ভিজিট কম করে নিন, নয়তো হপ্তার বদলে মাসে একবার করে আসুন। রানীমা কী যে কাতর হয়ে বললেন—আমার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু দরবার কোনটাই মঞ্জুর

হল না।

বলতে বলতে বাবলি ক্ষেপে যায়ঃ কবে যে মরবে ডাক্তার!

গণপতি ঘাড় নেড়ে রায় দিলেন ঃ কোনদিনই মরবে না।

সে কি?

নিজে হল ডাক্তার, ঘরের মধ্যে ডাক্তারখানা, ভাল ভাল ওষুধপত্তর হাতের কাছে—মরতে যাবে কেন ও-মানুষ? চিরকাল হাড় জ্বালাবে।

আরও রেগে বাবলি বলে, শিউনন্দনকে তবে টিপে দিন দেওয়ানজি। দুম করে একদিন গুলি করুক। রোগ হয়ে না মরুক, বন্দুকের গুলিতে তো মরবে। দুঁদে প্রজা কতজনকে শিউনন্দন ঠান্ডা করেছে—করুক তেমনি।

গণপতি বললেন, শিউনন্দন রানীমার বরকন্দাজ। আমার কথা সে শুনতে যাবে কেন?

কাজটা তো রানীমার-ই। ডাক্তার থাকতে রেহাই নেই তাঁর—

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বলে, শুধু মুখের বলা নয়, রানীমাকে আজ চোখ মুছতে দেখলাম। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পান চিবোতে চিবোতে গণপতি বললেন, ধীরবুদ্ধির মানুষ রানীমা, অবস্থা সবই তাঁর নখদর্পণে। জেনে-শুনেও এত বড় ডাক্তারি খরচা—আছে কোন একটা রোগ। নিশ্চয় আছে। ডাক্তার এমনি এমনি আসে না, টাকা খোলামকুচি নয় যে রানীমা শুধু শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

বাবলি বলে, কি রোগ?

তাই তো আকাশ-পাতাল ভাবি আমি—কোন্ রোগ হতে পারে? সর্বক্ষণ কাছে থেকে তুইও কিছু ধরতে পারিসনে।

বাবলি সায় দিয়ে বলে, আমায় দেখলেই ওঁদের উঁচু গলা নিচু হয়ে যায়। রুগিতে ডাক্তারে কী এত ফিসফিসানি রে বাপু! জিজ্ঞাসা করলে তেড়ে ওঠেন ঃ রোগ-পীড়ের তুই কি বুঝিস রে? জ্বরজ্বারি নয়, মাথাধরাটা অবধি নেই, কোন রকম কাতরভাব দেখিনে—

অথচ রোগ। সাংঘাতিক রোগ একটা কিছু। চড়কডাঙার খালি জমিটার উপর একটা চালা তুলে দিলে দেড়-শ টাকা ভাড়া হয়ে যায়, সে টাকা জোটানো যাচ্ছে না। অথচ হপ্তায় হপ্তায় মোটা ভিজিট দিয়ে চিকিচ্ছে।

বাবলি বলে, চিকিচ্ছে রোগির গরজে নয়, ডাক্তারের গরজে। কান্নাকাটি করেও চিকিচ্ছের রেহাই হয় না।

গণপতি নিশ্বাস ফেলে বলেন, রানী হওয়া ইস্তক কান্নাকাটিই চলছে শুধু। আমি তো জানি সব—তোরও অজানা নেই বাবলি। রানীর চেয়ে নোকর আমরা ঢের ঢের ভাল। আশাভরসা যা-কিছু কুমারের উপর—কিন্তু মেজতরফ এখন থেকেই টোপ ছাড়তে লেগেছে। গোপনে ওদের কাছে যাওয়া-আসাও চলে, শুনছি। ছেলে মানুষ করবার জন্যে তো রাজসূয় কান্ড—গোলকুন্ডায় পড়ানো, বাড়িতে মেট্রন-মাস্টার—লাটবেলাটে এদ্দুর করে না। শেষ পর্যন্ত কী হয়ে দাঁড়ায় দেখ রানীর কপালে।

॥ তিন ॥

গোলকুণ্ডা-শিক্ষাসত্র—ইস্কুল আছে, কলেজও আছে। গোলকুন্ডায় হীরের বাজার, এ-ও যেন তাই। ছেলেরা সব হীরের টুকরো। আদবকায়দা বিলাতি। এক-এক ফোঁটা ছেলে নিখুঁত উচ্চারণে এমন ইংরেজি বলে, বাঘাবোঘা সাহেব লজ্জায় বোবা হয়ে

যায়। সব বাপ-মায়ের রোখ তাই গোলকুণ্ডার উপর। ছেলে ভর্তি করে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোন গে যান। রোটারি-মেশিনে খবরের-কাগজ ছাপা দেখেছেন—মেশিনে কাগজের মুখ ধরিয়ে দিলেই গড়-গড় করে ছাপা হয়ে ভাঁজ হয়ে এসে পড়বে, শুধুমাত্র বাজারে দেবার অপেক্ষা। অবিকল সেই বস্তু। গোলকুণ্ডা থেকে যারা বেরুল, তার পরে কোনো লাইন যদি নাও ধরে—মেজে-ঘষে এমন করে দিয়েছে, স্বাধীন-ভারতে তারা পড়তে পাবে না। তবে ভর্তি কোন্ কায়দায় করবেন, সেই হল কথা। নেবে হয় তো তিরিশটা ছেলে, দরখাস্ত তিন হাজারের উপর।

একটা যুক্তি বলে দিচ্ছি। ঠিক ফুলশয্যার রাতে—দেরি করলে কিন্তু পস্তাবেন—ফুলশয্যার রাত্রে নবদম্পতি আজেবাজে প্রেমালাপ করে রাত কাটায়, তারই মধ্যে ভবিষ্যৎ পুত্রের নামকরণটাও সেরে নেবেন। এবং পরের দিন গোলকুণ্ডায় দরখাস্ত ছেড়ে আসবেন সেই নাম দিয়ে। শুভক্ষণে পুত্র জন্ম নিল, দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে—আপনিও দিনের পর দিন যাতায়াত চালিয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালেন গোলকুণ্ডার সঙ্গে। এবম্বিধ তদ্বিরের ফলে আশা করা যায়, ভর্তির পরীক্ষায় আপনার পুত্রের ডাক পড়বে।

কিন্তু ডাক পড়লেই হয় না, ভীষণ কড়া পরীক্ষা। শুধু বইয়ের পরীক্ষা নয়, ছেলের গাত্রবর্ণ নাক-চোখ-মুখ খুঁটিয়ে দেখা, প্রশ্ন করে করে কণ্ঠস্বর শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি—কোথায় লাগে সেকালের কনে-দেখা! ছেলের হয়ে গেল তো অতঃপর তার পিতৃপক্ষ ও মাতুলপক্ষ। কি কাজ করেন তাঁরা, আয় কি পরিমাণ, কোন্ রাস্তায় কত জমির উপর কেমন বাড়ি তাঁদের, কোন মডেলের কি রকম গাড়ি?

রানী মঞ্জুপ্রভার ছেলে গোলকুণ্ডায়। এ ছেলে ঢোকানো সহজ। কর্তৃপক্ষ যত কিছু চান, কুমার অলোকনারায়ণে সমস্ত মিলেছে। কিন্তু প্রশ্নঃ গোপাল-কম্পাউণ্ডারের কতগুলো বাড়ি-গাড়ি, এবং কি রোজগার? তাঁর ছেলে ঢুকে গেল কেমন করে?

উত্তরঃ মুরুব্বি যে ধনঞ্জয়-ডাক্তার। বড়ছেলে গঙ্গাধরের পরিণাম দেখে গোপাল বিষম ঘাবড়ে গেলেন। ধনঞ্জয়ের কাছে সবিস্তর বললেনঃ বাজে ইস্কুলে থাকলে দীপকেরও পরকাল ঝরঝরে হবে, উপায় কি বলো এখন।

বলাবলি কিছু নয়, দীপকের হাত ধরে ধনঞ্জয় গোলকুণ্ডায় নিয়ে সোজা হেড-মাস্টারের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি। খাতির না রেখে উপায় নেই। ধনঞ্জয় সেন না থাকলে হেডমাস্টারের নিজেরই এতদিন বার পাঁচ-সাত মরা হয়ে যেত। তা ছাড়া বাড়ির ছেলেপুলে ইত্যাদি আছে। আবার কখনো যে তেমনি অবস্থায় পড়বেন না, কে বলতে পারে? ধনঞ্জয় প্রসন্ন থাকলে অকুতোভয়ে তাঁর হাতে নিজেদের সঁপে দিতে পারবেন। অতএব দীপকের বদলে ডাক্তার-যদি অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার শিকল ধরে নিয়ে আসতেন, তাকেও হেডমাস্টার ভর্তি করে নিতেন।

গোলকুণ্ডা-ইস্কুলে দীপক এক বছর মাত্র পড়েছে আর অলোক সেই একফোঁটা বয়স থেকে। দুজনে সমবয়সি, সহপাঠী। বড় ভাব তাদের মধ্যে। প্রকাণ্ড মোটর চেপে অলোক আসে, গাড়ি পথ আলো করে দাঁড়ায়। দীপক আগেই এসে লুকিয়ে আছে। উর্দিপরা সোফার নেমে এসে নিয়মদস্তুর দরজা খুলে দেবে, অত সবুর সয় না—গাড়ি থামতে না থামতে অলোক তড়াক করে নেমে পড়ে। দুই বন্ধু গলাগলি। ক্লাস যতক্ষণ না বসে, গলাগলি হয়ে বেড়াবে আর গল্প করবে—তার মধ্যে লহমার অপব্যয়ে রাজি নয়। বই-টই সোফার গিয়ে ক্লাসে রেখে আসে।

দীপক ইস্কুলে আসে অনেক সকালে। ন'টার মধ্যেই চান-টান সেরে 'ভাত দাও'

রব তোলে। রিক্সা করে আসে, গোপাল পৌঁছে দিয়ে ঐ পথে অমনি ডাক্তারখানা যান। ডাক্তারখানা গোলকুন্ডার খুব কাছে। ছুটি হলে ব্যবস্থা ভিন্ন। দীপকই তখন হেঁটে হেঁটে ডাক্তারখানায় চলে যায়। গোপাল সেখানে—ডাক্তারখানারচাকরটা সঙ্গে দিয়ে রিক্সায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

দীপকের ঘোরতর আপত্তি: একলাই যাব ইস্কুলে—বড় হয়েছি না? গোপালকে সামনাসামনি বলে না, মায়ের কাছে দরবার: বাবা কেন কষ্ট করে আমার সঙ্গে যাবেন —কী দরকার? মানা করে দাও। বড় হয়ে গেছি—একলাই যাব। রিক্সাই বা কেন, পায়ে হেঁটে চলে যাব আমি।

বোনকেও বলে, ছুটির পরে যে ব্যবস্থা, যাবার সময়েও তাই কেন হবে না? রিক্সা যাবে তো ডাক্তারখানা অবধি যাক—তার ওদিকে নয়। ডাক্তারখানা থেকে হাঁটব আমি।

শুনে গোপাল্ ছেলের মুখে তাকিয়ে হাসেন: যাসনে রে বাবা এত শিগগির বড় হয়ে, আর ক'টা বছর সবুর কর। গোলকুণ্ডার পাট চুকে-বুকে যাক। মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়বি, বোর্ডিং-এ থাকবি। আমরা থাকব না সেখানে, রিক্সাতেও যেতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তখন বড় হয়ে যাস, কেউ কিছু বলতে যাবে না।

ইস্কুলে পেঁছে প্রায়ই দেখা যায়, ছেলে পাঁচ-দশটির বেশি আসেনি তখনো।

গোপাল বলেন, কত সকাল আছে দেখ দিকি বাবা। মাকে তুই দিশে করতে দিস নে, নিজেও আধ-খাওয়া করে আসিস।

সগর্বে গোপাল তাই আবার স্ত্রীকে শোনান: তোমার দুই ছেলেকে পাশাপাশি খতিয়ে দেখ। গঙ্গাধর ইস্কুল পালাত, ইস্কুল যেন বাঘ। আর দীপক ইস্কুলে যাবার জন্যে পাগল। রাতেও বোধহয় ভাল করে ঘুমোয় না ইস্কুলের তাড়ায়।

দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ে রাখী দীপকের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। বুদ্ধির হাঁড়ি, আর যেন চোখে-মুখে কথা বলে—পাকা পাকা বাঁধুনি-দেওয়া কথা। গুহ্যকথা রাখী-ই ফাঁস করে দেয়: তোমরা জানো না—তাড়া কি জন্যে, ছোড়দা আমায় বলেছে। ছোড়দা ছাড়া কেউ রিক্সা নিয়ে গোলকুণ্ডায় যায় না। অন্য ছেলেরা না দেখে, সকাল সকাল পেঁছে গিয়ে রিক্সা ছেড়ে দেয়। বাবাকে নিয়েও লজ্জা, সেই জন্যে একা একা যেতে চাচ্ছে।

গিন্নি বিনোদিনী গোপালকে বলেন, শুনছ গো? তোমার ডাক্তারবাবুকে বলো, ভাল ইস্কুলে দিলেই হয় না—চাকর চাই সঙ্গে যাবার, মোটরগাড়ি চাই।

গঙ্গাধর রাগে গরগর করে: দীপুকে নিয়ে বড্ড আদিখ্যেতা তোমাদের। বড়লোক ছেলেদের গায়ে গা ঠেকিয়ে মন-মেজাজ কী হয়ে উঠেছে দেখ! বাপকেও ঘেন্না। একগাদা খরচা করে বাবুয়ানি ইস্কুলে দিতে গেলে—পাড়ার ইস্কুলে কখনো কেউ যেন পাস করে না।

গোপালের অপমান হচ্ছে, রাগটা সেই কারণে। তিনি নিজে কিন্তু হেসে গড়িয়ে পড়েন: পরিচয় দিতে যাবে কেন যে আমি ওর বাপ? বুঝিয়ে দিস রাখী, বাপ তো গায়ে লেখা নেই। বলতে পারে আমিই চাকর। ওখান থেকে ডাক্তারখানা যেতে হয় —তা নইলে ছেঁড়া-কাপড় পরে পুরোপুরি চাকরের সাজ সেজেই যেতাম।

অলোকনারায়ণ ও দীপক দু-জনেই পাস করেছে।

এখন ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্র। একদিন এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। রানী মঞ্জুপ্রভা আলোকের গাড়ির মধ্যে। ছেলে নামিয়ে দিয়ে এই দিকে কোথা যাবেন। আর দীপকের রিক্সাও এইমাত্র, মিনিট কয়েক আগে, এসে পেঁছেছে। চেন ছিঁড়ে পথের

উপর খানিকক্ষণ অচল হয়ে ছিল—সেই জন্য দেরি।

অলোকের গাড়ির পাশে দীপক অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখছে। চোখে পলক পড়ে না। অলোকের মা—ইনিই রাজরানী? কী সুন্দর, কী সুন্দর!

দীপকের সঙ্গে সঙ্গে গোপালও গদগদ: রানী-দর্শন হয়ে গেল আজ তোর। তোদের মা'কে দেখিস, আর-এক মা এই দেখছিস। ভুবন আলো-করা মা, চেয়ে দেখ্—

দীপকের কথাবার্তা সেদিনটা কেবল রানী মঞ্জুপ্রভাকে ঘিরে। রানী এবং মা একধারে এই আশ্চর্য সুন্দর মহিলাটি। সাদামাটা মা তো ঘরে ঘরে—রানী যখন মা হয়ে বসেন, সেই বস্তু কী অপরূপ! অলোকের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দীপক ঐ মায়ের কথা শোনে। রানী-মায়ের যে ছেলে, তার সুখের অন্ত নেই বোধহয়।

অলোক হেসে বলে, ঠিক ধরেছিস। সুখ বড্ড বেশি আমার। তুই খাস ভাত-তরকারি, আমি খাই হীরে-মুক্তো—

ভালো খাস, মিছে কথা তো নয়—

অলোক গড়গড় করে বলে যায়, ভালো খাই ভালো পরি, ভালো ঘরে শুই, ভালো মোটরগাড়ি চড়ি। সকালে ঘুম ভেঙে উঠলাম, রাত্রিবেলা ঘুমুতে গেলাম—মাঝের সবখানি সময় আমায় নিয়ে রেল-গাড়ির মতন বাঁধা-লাইনের উপর দিয়ে চলে। ডাইনে বাঁয়ে গড়ানোর উপায় নেই। মুখ ধোওয়া, খাবার খাওয়া, বইটই নিয়ে বসা, গোলকুণ্ডায় আসা—মোটরে করে নামিয়ে দিয়ে গেল এখানে, ঢুকে গেল একপ্রস্থ। ছুটির পর যেদিন খেলা থাকে, খেলা-টেলা হয়ে গেলে মোটরে করে আবার নিয়ে ঢোকাল রাজবাড়ি। হাত-পা ধুয়ে খাবার খেয়ে প্রাইভেট-মাস্টারের কাছে পড়া এবার, তারপর খাওয়া-শোওয়া। একটা দিন পুরোপুরি কাবার—আবার পরের সকাল থেকে।

অবাক হয়ে দীপক শুনছে।

কলেজে ঢোকার পরে ইদানীং অলোকের কথাবার্তায় ধরন বদলে গেছে, বিস্তর নতুন কথা বলে সে এখন। হেসে অলোক বলে, অভাব নেই কোন-কিছুর, মুখ ফুটে চাইতেও হয় না—দরকারের জিনিস আপনা-আপনি হাতের কাছে এসে পৌঁছায়। তার জন্য বাবলি-দিদি আছে, মেট্রন আছে, ম্যানেজার আছে, আমলারা সব আছে, চাকরবাকর দরোয়ান বরকন্দাজ আছে—

মাঝখানে দীপক প্রশ্ন করে: মা?

উঁহু, ওইটে হবার জো নেই। রানী যে। রানীর কাজের অন্ত আছে? বছরের এগার মাস জুড়ে আজ এ-মহালে কাল সে-মহালে। থাকে না যে রাজবাড়িতে তা নয়—তখন চতুর্দিকে উকিল-ব্যারিস্টার, নায়েব-গোমস্তা, প্রজাপাটক। আমায় জেলখানায় রেখে সমারোহে ওদের বিষয়কর্ম চলে।

দীপকের মুখের দিকে চেয়ে জোর দিয়ে বলল, ঠিক তাই। তোদের সকলের ঘরবাড়ি, আমার জেলখানা। জেলখানার গাড়ি কয়েদি নিয়ে গোলকুণ্ডায় ঢুকিয়ে গেছে, সন্ধ্যাবেলা গাড়ি এসে এখান থেকে আবার জেলে নিয়ে পুরবে। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে আসিস একদিন দীপু। এই উঁচু পাঁচিল, মস্ত মস্ত থাম, লোহার ফটক। ঢুকতে বুক কাঁপবে তোর। ঢুকতেই তো দেবে না—বরকন্দাজরা বন্দুক উঁচিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় আছে। আর পাঁচিলের ঠিক ওধারে বড়জেঠা-মেজজেঠার মহল। জেঠাইমা'রা, জেঠতুত ভাই-বোনেরা থাকে। নেমন্তন্নে ওবাড়ি যেতে দিয়েছে, লুকিয়ে চুরিয়ে এক-আধবার এমনিও গিয়েছি। ভারি আমুদে ওরা। গান-বাজনা পার্টি-মচ্ছব লেগেই আছে। পালে-পার্বণে নাচও হয়। অল্পসল্প কানে আসে—

কিন্তু পাঁচিলের কোনখানে একটা ফোকরও রাখেনি যে চোখ তাকিয়ে দেখে নেব। ইচ্ছে করে পালিয়ে চলে যাই—যে দিকে দুই-চক্ষু যায় বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু অসম্ভব। এক বেটা আছে শিউন্দন—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কোন সময় তাকে ঘুমুতে দেখলাম না। অ্যাবড়ো অ্যাবড়ো চোখ দুটো সর্বক্ষণ মেলে রয়েছে।

কষ্ট হয় দীপকের, বলার ভঙ্গিতে হাসিও পেয়ে যায়।

অলোক বলে, রাগ চড়ে যায় এক একদিন—শিউনন্দনের বন্দুক কেড়ে নিয়ে, ইচ্ছে করে, ঝাঁকসুদ্ধ ওদের গুলি করি। বাবলি-দিদি, মেট্রন, মা—কাউকে বাদ দেবো না। সে তো আর সত্যি সত্যি হবার উপায় নেই—শুয়ে পড়ি বালিশে মুখ গুঁজে। মাস্টারকে বলি, মাথা ধরেছে—আজকে আর পড়ব না। মজা মাস্টারের—একগাল হেসে বলেন, খবরের-কাগজটা নিয়ে আয় তবে, বসে বসে পড়া যাক। আগেভাগে বেরুলে ফটকের শিউনন্দন সিং কটমট করে তাকাবে, দৃষ্টিটা আমার ভাল লাগে না। কাগজ পড়া শেষ করে মাস্টার গেলেন তো খাবার এসে পড়ল। খেলাম না, খাবার ঠেলে সরিয়ে দিলাম। ঝিয়ের মজা, পরমানন্দে থালা-সুদ্ধ নিয়ে চলে গেল।

কী আশ্চর্য, কেউ তোকে যত্ন করে না?

অলোক বলে, যত্ন করে না আবার অযত্নও করে না। মাইনে খায়, কাজ করে—কাজে কেউ খুঁত দেখাতে পারবে না।

দীপক বলে, এই রকমটা আমার হত। বেঁচে যেতাম তা হলে। যত্নের ঠেলায় জীবন বেরিয়ে যায় রে ভাই। আমারও ঠিক তোর মতন ব্যাপার—পারলে একমুখো পালাতাম। শিউনন্দন না থাক, অ্যাবড়ো অ্যাবড়ো চোখ আমার মায়েরই। সে চোখে মাছের টুকরোখানাও ফাঁকি দেওয়া যায় না, তা আস্ত একটা মানুষ পালানো!

শুনতে শুনতে চকচক করে উঠল অলোকের দৃষ্টি। বলে, আসল-মা যে! আমার হল সৎমা—আসল-মা গেছে আটমাসের বাচ্চা আমি তখন।

॥ চার ॥

অলোকের সৎমা—আমার আসল-মা বলেই এমনধারা আদর। আসল-মা যার নেই, কী হতভাগা সেই জন।

তুলনা আসে দীপকের মনে মনে: আসল-মা তবে কি একা আমারই—গঙ্গাধর আর রাখীর সৎমা? আগে বড়ভাই, পিছনে ছোটবোন—উভয়কে বাদ দিয়ে মাঝের কেবলমাত্র এক জনের মা হয় কী করে? কিন্তু মনে হয় বটে তাই বিনোদিনীর কাজকর্ম দেখে। গঙ্গাধরের কথা না-ই ধরলাম—বাপ ক্ষণে ক্ষণে শোনাচ্ছেন, বাড়ির জঞ্জাল সে, বংশের কুলাঙ্গার। শুনে শুনে মা বিগড়ে আছেন। কিন্তু রাখী? আদরযত্নের সবখানি একলা দীপকের উপর কী জন্য হবে, রাখী কেন বাদ?

যেমন এই খাওয়া। ইস্কুলে যাওয়ার তাড়া—সকালের দিকে আগে-ভাগে সকলের থেকে আলাদা হয়ে খাওয়া না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু রাত্রে? বারান্দায় রাখী পাশাপাশি ঠাঁই করছে গোপালের গঙ্গাধরের আর নিজের। আর ঘরের ভিতরে ইতিমধ্যে দীপকের খাওয়া প্রায় শেষ—বিনোদিনী এবারে রান্নাঘর থেকে দুধের বাটি নিয়ে চললেন দীপকের জন্যে।

গঙ্গাধর টিপ্পনী কাটে: দেখ্ রে রাখী, চেয়ে দেখ্। বাটি যাচ্ছে—তা-ও-ফুল-কাটা। দীপু ছেলে নয়, এ বাড়ির জামাইবাবু।

রাখী কিছুমাত্র বিচলিত নয়। বলে, হোক গে। খাবো ভাত-মাছ-তরকারি—

থালা-বাটি তো খেতে হবে না।

গঙ্গাধর বলে, তার মধ্যেও বড় মাছটা ভাল তরকারিটুকু ঘরের ভিতর ঢুকে গেছে। ফেলানো-ছড়ানো যা আছে, তাই আমাদের।

গোপালের কানে যেতে তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন : লজ্জা করে না ছোটভাইয়ের হিংসে করতে?

রাখীও বলে ছোট মন তোমার বড়দা। ছোড়দা'র তরকারি আমিই সব তুলে দিয়েছি। বাছাবাছি নেই—হাতার মুখে যা উঠেছে।

গঙ্গাধর তবু থামে না : দীপু কেন আলাদা খাবে : জাত যায় নাকি আমাদের সঙ্গে বসলে—সে বুঝি ভটচাজ্জি-বামুন, আমরা মুচি-মেথর?

কৈফিয়ৎটা যেন রাখীরই দেবার কথা। বলে, এইটুকু তো বারান্দা—চারজনে বসি কোথা এর মধ্যে?

তুই তবে ভিতরে বসবি। মেয়েছেলে সদরে বসে কেন খাবে?

গোপাল খিঁচিয়ে উঠলেন : ভোরে উঠে দীপু পড়তে বসবে। সে পাট চুকিয়ে-বুকিয়ে দিয়েছিস তুই, রাত দুপুর অবধি আড্ডা দিয়ে দাঁতে রোদ লাগলে তবে উঠিস। না খেয়ে তোর জন্যে হা-পিত্যেশ বসে থেকে তার চলবে কেন?

দুধের বাটি দিয়ে বিনোদিনী বাইরে এসেছেন। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলেন, চুপ, চুপ! শুনতে না পায়, শুনলে রক্ষে থাকবে না—

গঙ্গাধর গলা ছেড়ে দিয়ে বলে, এত ভয় কিসের শুনি? দীপু কি লাটসাহেব? আমাদের বেলা তো ভয় করতে যাও না।

যে ভয় করা যাচ্ছিল—দীপক দেখি বেরিয়ে এসেছে। দুধের বাটি হাতে। বলে, সরে বোস্ রাখী।

বিনোদিনীকে বলে, রোজ আমি এখানটা বসব মা, আমার এই কোণের জায়গা।

গঙ্গাধরের দিকে বিনোদিনী অগ্নিদৃষ্টি হানলেন : হল তো?

দীপক বলে, দাদা ঠিকই বলেছে মা। আমার কেন আলাদা খাতির—যেন আমি বাইরের মানুষ।

গঙ্গাধর আরও জোর দিয়ে বলে, বিনা প্রমাণে আমি বলিনে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। বাটি-ভরা ঘন-আঁটা দুধ তোর পাতে। আমরা কেউ চোখেও দেখিনে। যেটুকু দুধ আসে, ও-বেলা এক দফা সেঁটেছিস, বাকিটা এবেলার জন্য জ্বাল দিয়ে রেখেছে।

দীপক বলে, দুধ আমি সকালে খাবো না মা—এই বলা রইল। রাত্রে সকলে ভাগ করে খাবো। সকলের সমান ভাগ। না কুলোয়, জল মেশানো হবে।

কথা ওঠে এমনি দীপককে নিয়ে। কথা তোলে অন্য কেউ নয়—গঙ্গাধর। পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে হেথা হোথা ঘুরত, তখন রা কাড়ত না। সম্প্রতি গঙ্গা এক ওষুধ ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছে ধনঞ্জয়-ডাক্তারের সুপারিশে। রোজগার করে বাপের হাতে একটা দুটো টাকা দিচ্ছে--কথা ফুটেছে সেই থেকে, স্পষ্টবাদী হয়েছে!

পরের রাত্রেই। গঙ্গাধরের পাত্তা নেই, আজ যেন আরও বেশি রাত করছে। ক্ষিধে পেয়েছে দীপকের, ঘর-বার করছে। তবু কার সাধ্য আলাদা আজ তাকে খাওয়ায়।

রাখী চিলের মতন ছোঁ মেরে দীপকের হাত এঁটে ধরে : চলে আয় ছোড়দা—

কোথায় ?

পরী হলে বলতাম, উড়িয়ে নিয়ে তুলব মনুমেণ্টের চূড়োয়। পাখা যখন নেই, হেঁটেই চল্ তবে—

বকছে আবোল-তাবোল, আর হনহন করে চলেছে। মুঠোয় ধরা দীপকের হাত। এক বাড়ির কাছে গিয়ে থামল। বলে, মেসবাড়ি—ঢুকে পড়্। বড়দা এখানে।

দীপক ইতস্তত করে : এখানে আছে তুই কী করে জানলি ?

মেস-মেস করে থাকে। পাড়ার মধ্যে মেস এই একটা।

হেসে রাখী আবার বলে, ভয় করছে বুঝি তোর ? আমি ঢুকে যেতাম—কিন্তু মেসে বোন ঢুকেছে, বড়দা তা হলে আস্ত রাখবে না। তক্ষুণি ধরে মাথা ঠুকে দেবে।

মেসের ঘরে বেশ একটা দল জুটিয়ে তাসখেলা হচ্ছে। বাজির খেলা—টাকা ধরছে। এর মুঠো থেকে টাকা ওর মুঠোয় চলে যাচ্ছে, সেই মুঠো থেকে আবার অন্য মুঠোয়। পকেটে স্থিতি পাচ্ছে কালেভদ্রে কদাচিৎ। খাসা মজা। ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে যেন টাকা—টাকার ঘূর্ণিঝড়। অতিদ্রুত খেলা চলছে, নিবিষ্ট হয়ে খেলছে সব। মৃদু কথাবার্তা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীপক মগ্ন হয়ে দেখে। ক্ষিধে পেয়েছে, গঙ্গাধরকে সে ডাকতে এসেছে—বেমালুম সব ভুলে গেল।

দশটা বাজল কোন দিকে টং টং করে। তখন টনক নড়ে : বড্ড রাত হয়ে গেছে তো! এই অবধি আজকে।

উঠে পড়েছে সকলে।

এতক্ষণে গঙ্গাধরের দীপকের উপর নজর পড়ল : মা পাঠিয়েছে বুঝি, কতক্ষণ এসেছিস ?

এসেছে আধঘণ্টার উপর, তবু দীপক তাচ্ছিল্যের ভাবে বলে, এই তো—

যেতে যেতে গঙ্গাধর বলে, ডাকলিনে কেন ?

খেলায় ভণ্ডুল হলে তুমি রেগে যেতে দাদা।

ভাইয়ের বিবেচনায় খুশি হয়ে গঙ্গাধর বলে, ঠিক। ফিসখেলা এর নাম—বড্ড কঠিন খেলা রে! কথাবার্তায় মন নাড়া খেয়ে যায়—না ডেকে বুদ্ধির কাজ করেছিস তুই। এ বিবেচনা সকলের মাথায় আসে না।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা-পয়সা বের করে। রাস্তার আলোয় দাঁড়িয়ে গুণল : পাঁচ টাকা, খুচরো কিছু তার উপরে। দেমাক করে বলে, বসলাম মোটমাট এক টাকা মূলধন নিয়ে। দু-ঘণ্টার রোজগার চার টাকারও উপর। পারেন বাবা ?

চেনা হয়ে গেল মেসের ঘর। এর পরে আর বলতে হয় না। সন্ধ্যাবেলা চা-টা খেয়ে গঙ্গাধর বেরুল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীপকও ডাকতে যায়, গিয়ে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পড়া আপাতত সিকেয় উঠে গেছে। বলতে গেলে তুড়ুক জবাব : ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে নাকি কেউ ?

একদিন গঙ্গাধর বড় হারছে। এক-পকেট রেজগি নিয়ে এসেছিল—পকেট এখন খালি। চোখ তুলে দীপকের উপর খিঁচিয়ে উঠল—এই প্রথম দেখল যেন তাকে : তাইতো বলি, এমন হচ্ছে কেন আজ ? সামনের উপর সঙ হয়ে দাঁড়ালে মাথা আপনি গুলিয়ে যায়। মানা করে দিচ্ছি, খেলার সময় কখনো এসে দাঁড়াবিনে।

বিজয়ীদের মধ্য থেকে হেসে একজন উল্টো-কথা বলে, এসো তুমি ভাই। ভারি পয়মন্ত, নিত্যি এসো। জিতে জিতে গঙ্গার বড্ড দেমাক। দর্পচূর্ণ হল আজ।

বাড়ির পথে গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠজনোচিত শাসানি : পাজি খেলা—চোখে দেখেও নেশা ধরে যায়। মন দিয়ে পড়াশুনো করবি, এখন তাসখেলা কিসের? তা-ও আবার জুয়োর খেলা। মেসে আর আসবিনে, খেলার ধারে-কাছেও যেন না দেখতে পাই। পিটিয়ে তক্তা করব।

দীপকের গরজও নেই আর। শেখা হয়ে গেছে, হাতে-নাতে কিছু রপ্ত করে নিলেই হল। তার জন্য মেসে আসার দরকার হবে না।

গোলকুন্ডার নিজস্ব মাঠ—একটা নয়, তিন তিনটে। পুরনো-বালিগঞ্জের এক ধনী-গৃহ গোলকুন্ডা লিজ নিয়েছে। অনেক জায়গা-জমি, বাগান। গাছপালা কেটে মাঠ বানিয়ে খেলাধুলোর দরাজ বন্দোবস্ত। তা সত্ত্বেও দীপকদের হপ্তায় তিন দিনের বেশি দিতে পারেনি—সোম বুধ আর শুক্র।

এ দিনটা খেলা নেই, ছুটির পরে দীপক বাড়ি এসেছে। সময়টাও খাসা—বাবা ডাক্তারখানায়, গঙ্গাধর ফ্যাক্টরিতে, মা ঘুমুচ্ছেন এখনো। তা ছাড়া মাকে ধর্তব্যের মধ্যে কে আনে? বই রেখেই রাখীর উপর আদেশ : তাস নিয়ে আয়। হাঁ করে চেয়ে আছে হাঁদারাম মেয়ে! দাদার খেলার তাস—খুঁজে দেখ্ বিছানার নিচে-টিচে আছে কোথাও।

রাখী মুখ বাঁকিয়ে বলে, দু-জনে আবার কী খেলা!

দু-জনে হয়, পাঁচ-সাত-দশ জনেওহয়। বেশি লোক পেলে তখন অনেক জনে খেলব। রোজগারের খেলা—কত টাকা দাদার রোজগার জানিস! চাকরি করে, রোজগার করে, আবার খেলা করেও রোজগার করে। রাত দুপুর অবধি মেসে সে এমনি এমনি পড়ে থাকে না।

প্রক্রিয়াটা দীপক মোটামুটি বুঝিয়ে দিল।

রাখী বলে, বাজি ধরব তা টাকা কোথায় আমার?

আমার আছে। টাকা না হোক, পয়সা। ধার দেবো তোকে। বাজি জিতে শোধ করে দিবি।

রাখী শিষ্য, দীপক গুরু—তাসের ব্যাপারেও। গুরুশিষ্য সম্পর্কটা আগে থেকেই মোটামুটি আছে। মেয়ে-ইস্কুল একেবারে পাড়ার মধ্যে—মেয়ের কান্নাকাটিতে বিনোদিনী স্বামীকে বললেন। গোপাল আমলই দেন না একেবারে : ডাক্তারবাবু না হলে ছেলেই বড় ইস্কুলে দিতে পারতাম, তা মেয়ে! তুমি আর আজব বায়না তুলো না। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তো লাউয়ের ঘণ্ট রেঁধে জনম কাটবে, লেখাপড়া কোন্ কাজে লাগবে শুনি?

বিনোদিনী বলেন, লাগবে বিয়ের কাজেই। লেখাপড়া খানিকটা না শেখা থাকলে কোন শ্বশুরই আজকাল কনে পছন্দ করে ঘরে নিয়ে তোলে না।

স্ত্রীর জেদে গোপাল শেষ অবধি অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু বাজে কাজে পয়সা-কড়ি খরচ করতে একেবারে নারাজ। সংসার খরচা থেকে বাঁচিয়ে বিনোদিনী মাইনেটা দিতেন। দীপকের ব্যাপারে কিন্তু দরাজ হাত—লুকিয়ে চুরিয়ে দীপকও টাকাটা-সিকেটা দিত, রাখীর পড়া-টড়া বলে দিত। এমনি ভাবে কিছুকাল চলেছিল, উৎসাহ তারপর মিইয়ে এলো সকলের। রাখীরও। লেখাপড়ায় ইস্তফা পড়ল।

তাসের খেড়ির প্রয়োজনে এখন আবার দীপক তাসের পাঠ দিচ্ছে রাখীকে।

একদিন ভারি জমেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, হুঁশ নেই। গঙ্গাধরের সন্দেহ,

যেখানকার তাস ঠিক সেইখানটা থাকে ইদানীং—নড়েচড়ে বেড়ায়। ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে পা টিপে টিপে চলল সে দীপকের পড়ার ঘরে। শিকার ধরার মুখে বিড়াল যেমনধারা চলে। আচমকা কান টেনে ধরবে, হাতও বাড়িয়েছিল—সে-হাত গুটিয়ে নিতে হল। বেড়ে খেলছে গো—কোন প্রাণে এ জিনিস লণ্ডভণ্ড করে। এমনকি লোভ হচ্ছে, নিজেই পড়বে কিনা—

রাখী দেখতে পেয়েছে। খেলা মাথায় উঠল, খোঁচা দিয়ে দীপককে সজাগ করে দিয়ে সুড়ুত করে সে পালায়।

চোখ পাকিয়ে গঙ্গাধর বলে, খুব যে পরিপক্ক হয়েছিস। ক'দিন চলছে—দু-চার দিন কি দু-চার মাসের কর্ম তো নয়। আমায় বলে পাকা-তাসুড়ে, তুই যে আমার কান কেটে দিস। তা আমার নতুন তাসজোড়ায় কেন? তাস কিনতে পারিসনে?

চুলের ঝুঁটি ধরে ঠাঁই-ঠাঁই করে গালে চড়। গুম হয়ে থাকে দীপক—দাঁড়িয়ে মার খায়, নড়ে না।

বাইরে থেকে এক-নজর দেখেই রাখী মায়ের কাছে ছুটল: মারছে ছোড়দা'কে—

কানে শুনেও বিশ্বাস হয় না। হবার কথা নয়। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বিনোদিনী তাকিয়ে পড়েন।

রাখী কেঁদে বলল, ঠেকাও গিয়ে মা, নয় তো মেরে ফেলবে।

উনুনে গরম তেলে মাছ ছেড়ে দিয়েছেন, হাতের খুন্তি ফেলে বিনোদিনী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন।

আর ওদিকেই চড় মেরেই গঙ্গাধরের হুঁশ হয়েছে। এ বাড়িতে দীপককে ছুঁয়ে কথাটি পর্যন্ত বলার জো নেই—মারের কথা গোপালের কানে গেলে খুনোখুনি ঘটে যাবে।

দীপকের সঙ্গে গঙ্গাধর ভাব করছে: এই যাঃ, আদর করতে গিয়ে চড় হয়ে গেল। হাত আমার বড্ড বেআন্দাজি। আহা-মরি খেলা শিখেছিস সত্যি তুই—এ তাস ফেরত চাচ্ছিনে, বখশিস। এখন থেকে জিনিসটা তোর নিজের হয়ে গেল—মনের সাধে দিন-রাত্তির খেলবি।

এমনি ভাল ভাল দু-চার কথা বলে তাস খেসারত দিয়ে গঙ্গাধর হন হন করে বাড়ি থেকে বেরুল।

বিনোদিনী ছুটে এলেন—তখন কে কোথায়। খাতা-কলম নিয়ে দীপক গভীর অভিনিবেশে ট্রিগোনোমেট্রির আঁক কষছে।

কাঁদো-কাঁদো গলায় বিনোদিনী বলেন, গঙ্গা নাকি—

ঢোঁক গিলে থেকে গেলেন, কথাটা শেষ করতেও লজ্জা।

মুখ তুলে দীপক উল্লাস ভরে জবাব দেয়: দাদার তাস নিয়ে খেলছিলাম, তা দিয়েই দিল তাসজোড়া। নিজে সে নতুন তাস কিনে নেবে মা।

তাস নতুন শিখে দীপক খুব মেতে রইল। রাখীকে বলে, আরও হত গোলকুণ্ডার হতচ্ছাড়া খেলাগুলো যদি না থাকত। বাড়ি বসে নিত্যিদিন তাস খেলতাম।

কলেজের খেলা বাদ দেবার জো নেই। খেলা তদারকের জন্যে ব্যবস্থা আছে—কে কে হাজির, হিসাব থাকে তার। খেলতেই হবে সোম বুধ শুক্র তিনটে দিন। কলেজের ছেলে এখন, গোলকুণ্ডায় তা বলে আলাদা খাতির নেই। অলোকও খেলে। খেলার এই তিন দিন বাড়ি ফেরা অলোকের গাড়িতে। দীপকের ঘোরতর আপত্তি তবু টানাটানি জবরদস্তি করে অলোক গাড়িতে তুলে নেবে।

বেশ খানিকটা দূর থাকতে দীপক শশব্যস্ত হয়ে বলে, এই যে—এইখানটা নামব।

অলোক বলে, কোন বাড়ি তোদের?

এখান থেকে কি দেখবি—গলির ভিতরে। মোটর যাবে না, হেঁটে যাব এটুকু পথ।

মিছে কথা। বাড়ির রাস্তা ছোট হলেও মোটর স্বচ্ছন্দে ঢুকে যায়। বড়লোক বন্ধুকে বাড়ি দেখাবে না দীপক। মিছামিছি গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, গেছে চলে মোটর—বিপদ কেটেছে।

গুটি গুটি এবারে সে বাড়ির দিকে চলল।

রাখীকে বলে, কী ঝঞ্ঝাট দেখ্ দিকি। ধারে-কাছে আনিনে—হয়তো বা ধরে বসল বাড়ি যাব তোদের।

রাখী ভয় দেখায়ঃ আমি একদিন এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, 'আসুন' 'আসুন' করে পথ দেখিয়ে আনব।

খবরদার!

আরও জোর দিয়ে রাখী বলেঃ মাদুর পেতে বসতে দেবো তোর রাজকুমার বন্ধুকে।

খুন করব তা হলে। তাই বা কেন—

রাখী ফিকফিক করে হাসছে তো দীপকও হেসে ফেলল। বলে, চোখে দেখিসনি তবু এত টান! খুন না করে ঐ অলোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোকে বিদায় করব।

বেশ তো, বেশ তো! হাততালি দিয়ে ওঠে রাখীঃ বউ হয়ে রাজবাড়ি চলে যাব। এখন আছেন রানী মঞ্জুপ্রভা, তার পরে হবেন রানী রাখী—দূর, গালভরা নাম নয়, একফোঁটা একটুখানি। তা আর-খানিকটা জুড়ে দেবো না হয় রাখীর সঙ্গে। রানী রাখীসুন্দরী—

দীপক বলে, রাখী-ছুছুন্দরী—

তারপর সে গম্ভীর হল। বলে, বিপদটা দেখ। ইস্কুল থেকে একেবারে বাড়ি পর্যন্ত হানা। কোন বাড়ি তোদের? বললাম আর কি তাই—তোর মত আমাদেরও যেন রাজবাড়ি! ইচ্ছে হয়, মরুক খুঁজে কানাগলির মধ্যে।

॥ পাঁচ ॥

অলোক বাড়ি চেনে না বলে নিশ্চিন্ত আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে ক'দিন দীপক ইস্কুলে যাচ্ছে না—হরি হরি! বাড়িতে, একেবারে ঘরের মধ্যে, অলোক জুতো মসমস করে উপস্থিত। বিকালবেলা ভাই-বোনে নিরিবিলি তাস খেলছিল। কী নিয়ে তর্কাতর্কি—দীপকের গলা অলোক রাস্তা থেকেই পেয়েছে।

বলে, অসুখে তুই শয্যাশায়ী—প্রিন্সিপালের কাছে শুনলাম। তাই শুনে ছুটেছি।

দীপক বলে, ছিলাম তো ভাই শয্যায়। থাকতে দেবে তাই? টেনে তুলে খেলায় বসাল।

গায়ে হাত দিয়ে অলোক বলে, জ্বর নেই বোধহয় এখন—

দীপক বলে, জ্বর ছিল বলেই রাখী এই ক'দিন বড্ড জিতেছে। জিতে জিতে লোভ

বেড়েছে। আজকে তেমনি হল—যা-কিছু জিতেছিল সমস্ত নিয়ে নিয়েছি।

জিতে-নেওয়া সম্পদ—একগাদা পয়সা দীপক করে জাঁক দেখায়।

রাখীকে অলোক সান্ত্বনা দেয়ঃ তা কী হয়েছে, মুখ চুন করে আছেন কেন? হার হয়েছে, এক্ষুণি আবার জিতে যাবেন। আমি পাশে বসছি, জিতিয়ে তবে ছাড়ব।

দীপক সহাস্যে বলে, রাখী তোর বড্ড মান। অলোক 'আপনি' 'আপনি' করে বলছে।

রাখী বলে, বোঝ তাই। তুইও 'আপনি' বলবি ছোড়দা—

অলোককে বলে, জানেন আপনি এ খেলা?

না, কিন্তু জেনে নিতে কতক্ষণ! এসে যখন পড়েছি, না শিখে ছাড়ব না।

রাখী উঠে পড়ল। বলে, মা শুয়ে আছে, ডেকে আনি।

আলোক বলে, ডেকে তুলতে হবে না—তাড়াতাড়ি নেই। বাড়ি চিনে যখন এসে পড়েছি, হঠাৎ যাচ্ছিনে। অনেকক্ষণ থাকব। লাঠি-পেটা করুন, তবু নড়ব না।

খবর শুনে বিনোদিনী হন্তদন্ত হয়ে এলেন। অলোক গড় হয়ে প্রণাম করে। খাসা ছেলে—সুন্দর সরল নিরহংকার।

দীপক ফাঁস করে দেয়ঃ বাড়িতে সৎমা কিনা—অলোক বলেছিল, তোর আসল-মা কী রকম একদিন দেখে আসব গিয়ে। তাই বোধহয় এসেছে। আমি বলেছিলাম, সৎমা অনেক ভাল রে—আসল-মায়ে বড় হাঙ্গামা, যত্নের ঠেলায় পাগল হয়ে যাই।

বিনোদিনীর মায়ের প্রাণ আকুলিবিকুলি করে—আহা রে, বিশাল অট্টালিকার মধ্যে কেউ বোধহয় তাকিয়ে দেখে না, কী খাচ্ছে ছেলেটা, কোথায় শুচ্ছে। টাকা থাকলেই সব-কিছু হয় না।

বললেন, যখন ইচ্ছে হবে চলে এসো বাবা। সংকোচ কোরো না।

'মা' ডেকে ফেলেছে অলোক ইতিমধ্যে। বলে, তাই আসব মা। কিন্তু দীপকের সঙ্গে ঝগড়া। ও চায় না, এখানে আসি। বাড়ির নিশানা না পাই, সে জন্যে ভিন্ন গলিতে ঢুকে পড়ত।

বিনোদিনী বলেন, আমরা ফকির, আর তুমি রাজা—দীপকের আমার সেই লজ্জা।

হেসে হেসে অলোক বলে, ধাপ্পায় আমি ভুলি! ও বেড়ায় ডালে ডালে তো আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হল—গাড়ি সরিয়ে দিয়ে নিজে একটা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালাম। যা ভেবেছি—গর্ত থেকে ইঁদুর বেরুনোর মতন আবার দীপক রাস্তায় এলো। পিছন পিছন এসে বাড়ি দেখে গেলাম। আচমকা এসে অবাক করব, ভেবে রেখেছিলাম। তাই হল আজ।

গল্পগাছা আর তাসখেলায় বিকালটা যেন উড়ে চলে গেল। মিষ্টিমিঠাই এলো, সে জিনিস ছুঁলোই না অলোক। কিছুতে না। জোড়হাত করে বলে, নিত্যিদিন খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরেছে মা। তেল-লঙ্কায় মুড়ি মেখে দিন, তাই খুব মজা করে খাব। আমাদের ড্রাইভার খায়, আমারও খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু পাই কোথা, খাবোই বা কোথায় বসে? আমাদের বাড়িতে হবার জো নেই—'সর্বনাশ হল' সাড়া পড়ে যাবে।

ফ্যাক্টরি থেকে ফিরছে গঙ্গারাম। বাড়ি ঢোকবার মুখে দেখে, প্রকাণ্ড মোটর দরজার সামনে—উর্দি-পরা ড্রাইভার। থমকে দাঁড়াল—বাড়ি আমাদেরই তো, না ভুল করে অন্য কোনখানে ঢুকে পড়ছি?

অলোকনারায়ণকে বারান্ডা থেকেই দেখা যাচ্ছে। বিনোদিনী ব্যস্তসমস্ত হয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছেন বোধকরি তেল-মুড়ির ব্যবস্থায়। গঙ্গাধর প্রশ্ন করে: কে মা ওই রাজপুত্তুরের মতন ছেলেটা?

মিছে বলিস নি, রাজপুত্তুরই সত্যি সত্যি। কিন্তু কথাবার্তা শুনে কে তা বুঝবে?

গঙ্গাধরকে দেখে অলোক কলরব করে ওঠে: আসুন বড়দা। সকলের সঙ্গে দেখা হল—বলি বড়দা কেন আসছেন না? রোজই এমনি দেরি হয় নাকি? খেলা দেখছিলাম এদের—বেশ মজার খেলা। আপনি তো শুনলাম ওস্তাদের ওস্তাদ—দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার। আপানাকে কেউ হারাতে পারে না—টাকা-পয়সা যে যত আনুক, সমস্ত আপনি জিতে নেন। আপনার খেলা দেখব এসে একদিন। বাড়ি চিনে গেলাম—মায়ের হুকুমও পেয়ে গেছি, ইচ্ছে হলেই চলে আসব।

বেশ তো, বেশ তো। শুধু দেখা কেন, খেলবে। হাতে ধরে শিখিয়ে দেবো।

রাত্রে খেতে বসেও ঐ রাজপুত্র ও রাজবাড়ির প্রসঙ্গ। অতবড় বাড়ির ছেলে, তবু কত ভাল দেখ। গোপাল বলেন, পাঁচ-পাঁচটা পরগনার মালিক ছিল এক সময়। 'রাজা' উপাধি নবাব আলিবর্দির আমলের। মহালগুলো সমস্ত গেছে, ছিটেফোঁটা যা আছে টুকরো টুকরো বাটোয়ারা করে নিয়েছে। শরিকে শরিকে বিবাদ-বিসম্বাদ। তবে বড় গাঙ মজে গেলেও খালটা থেকে যায়—নগদ টাকার আন্ডিল।

নিজের মনে খানিকটা হেসে নিলেন। বলেন, এই কুমারের মা রানী মঞ্জুপ্রভা আমাদের ডাক্তারবাবুর বারোমেসে খদ্দের। রোগ নেই পীড়ে নেই, ওষুধ লাগে না, হরদম তবু মোটা ভিজিট দিয়ে যাচ্ছেন। মনের বাতিক—মৃত্যুভয়—তা ছাড়া আর কি! টাকা থাকলে পোষা বেড়ালের দানসাগর শ্রাদ্ধ, টাকা না থাকলে আপন মায়ের পিন্ডিদানের আলোচাল জোটে না। ডাক্তারবাবু এই যে যাবো-যাবো করেন, চলে গেলে রানী তারপরে বোধহয় একটা মাসও বাঁচবেন না—'মরলাম' 'মরলাম' করে সত্যি সত্যি মারা পড়বেন।

মরুভূমির মধ্যে বুঝি ওয়েসিস পেয়ে গেল অলোক। এ-বাড়ি অহরহ যাতায়াত—সপ্তাহের কোন সন্ধ্যা বড় বাদ যায় না। বিনোদিনীকে বলে 'মা', রাখীকে 'তুমি' 'তুমি' করে। দীপকের দেখা-দেখি 'তুই' ও কখনো-সখনো। আর প্রচন্ড ভক্তিমান বড়দা গঙ্গাধর সম্পর্কে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে পড়ল, সেই সময়টা একেবারে ডুব। ভাল, খুব ভাল—বাড়ি বসে পড়াশুনো করছে। পরীক্ষার মুখে আড্ডাটি বন্ধ হয়ে দীপকের পক্ষেও ভাল হয়েছে।

পরীক্ষা চুকেবুকে গেল, লম্বা ছুটি। তখনো পাত্তা নেই অলোকের। কী হল হঠাৎ, চটেমটে গেল কোন কারণে? শোনা গেল, শহরেই নেই। ঘুরছে—কন্যাকুমারী অবধি চলে গেছে।

তাই হবে—বিনোদিনী বলেন, খেটেছে পরীক্ষার সময়—দেহ তাজা করে নিচ্ছে। টাকাপয়সা আছে, কেন বেড়াবে না? এর পরে আবার তো নতুন পড়াশুনোর চাপ।

পাস করল দীপক। ফার্স্ট-ডিভিসনে তো বটেই, দস্তুরমতো মোটা নম্বর। স্কলারশিপও পাবে, এই অনুমান। আর কী আশ্চর্য, অলোক টায়েটোয়ে পাস—থার্ড-ডিভিসনে। ভাবতেও পারা যায় না। পড়াশুনোয় বরাবরই সে ভাল। দীপক

ভর্তি হওয়ার পর থেকে শিক্ষকরা এই দু-জনকে 'রেসের ঘোড়া' বলে আসছেন। ঘুরে দিতেন উভয়কে, পাল্লাটা যাতে জোর লেগে যায়। চলে এসেছে তাই বরাবর। কোন পরীক্ষায় দীপক দশ-বিশ নম্বর এগিয়ে গেল, কোন পরীক্ষায় অলোক। ইস্কুল-ফাইন্যালেও বেশ ভাল করেছে। এ হেন অলোকের পরিণাম এমনি হয়ে দাঁড়াল।

বিনোদিনী বলেন, আসা-যাওয়া কেন বন্ধ, বুঝলাম। পরীক্ষা ভাল হয়নি সেই দুঃখ।

গঙ্গাধর উড়িয়ে দেয়ঃ দুঃখ কী জন্যে হতে যাবে মা? রাজবাড়ির ছেলে—চাকরি বাকরি করতে হবে না আমাদের মতন। পড়াশুনো ওদের শখের ব্যাপার—ভাল না হল তো বয়েই গেল। তবু তো পাস করেছে—একেবারে না করলেই বা কী!

বিনোদিনী কানে নিলেন না। দীপককে বললেন, তোরই খোঁজখবর নেওয়া উচিত দীপু। আহা, সত্যিকার আপন তো কেউ নেই—কত জনে কত কি বলছে। বাড়ি চিনিস তুই, জোরজার করে ধরে নিয়ে আয়।

দীপক বলে, দুর্গের মতন বাড়ি—বন্দুক নিয়ে এই মোটা-গোঁফ বরকন্দাজ বসে গেটের উপর। কোনদিন আমি ঢুকিনি। অলোকেরও মানা আছে। বলে, ম্যানেজার ডেকে এটা ওটা জেরা করবে, শরিকদের চর বলে সব সময় সন্দেহ। যাস নে তুই, কী দরকার!

ভিতরে ঢোকে না, তবু ওদিকে গেলেই দীপক রাজবাড়ির সামনেটা ঘুরে যায়। অকারণে চক্কোর দেয় একবার দু'বার। একদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল—বেরুচ্ছে তখন অলোক।

মনে মনে অলোকের একটা ঝড়ে-বিধ্বস্ত চেহারা কল্পনা করে রেখেছিল। বিপরীত। এমনিই সুরূপ—সাজসজ্জায় সুগন্ধে আজ একেবারে মাতিয়ে চলেছে।

হাত জড়িয়ে ধরে সে দীপকের। একগাল হেসে বলে, থার্ড-ডিভিসন—জানিস তো?

ঠিক ওই জিনিসেরই যেন প্রত্যাশা ছিল—মহাবীরত্বের কাজ করে ফেলেছে, এমন-তরো ভাব।

আরও ফলাও করে বলে, পড়াশুনোর পাট শেষ একবারে—থার্ড-ডিভিসন কোথাও নেবে না। ভাল হয়েছে, পড়ার নামে আটক রেখে সর্বস্ব ওদিকে পাচার করছিল। প্রায় কাবার করে এনেছে—উচ্ছিষ্ট কি পড়ে আছে, দেখি এইবার।

দীপকের খারাপ লাগছে। কষ্ট হচ্ছে অলোকের কথা শুনে। মনের কথা কখনো নয়—পরাজয় নিয়ে বাহাদুরি করছে লজ্জা ঢাকবার জন্য।

বলে, আমাদের বাড়ি তুই আজকাল মোটে যাস নে। মা তাই বলছিল—

শেষই করতে দিল না—কলকল করে অলোক বলে, রাজবাড়ির মধ্যেই খেলা এখন আমাদের—দূরে যেতে হয় না। রাজবাড়ি মানে আমাদের ছোটতরফের জেলখানা নয়—জেঠাদের বাড়ি। জোর আড্ডা—জেঠতুত ভাইরা থাকে, বাইরে থেকেও আসে। বাজি খুব কম হল তো দশ টাকা, তার নিচে আমাদের বাজি নেই। সৎমা কি ম্যানেজার কিংবা বাড়ির অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে এসব জানে না, জানলে বাগড়া দিত।

বলতে বলতে একেবারে জ্বলে উঠলঃ এখন বুঝতে পারি সর্বনাশের মূলে ত্রিকালের ভুষণ্ডীকাক ঐ বুড়ো-দেওয়ান। সৎমার সঙ্গে যোগসাজস। পাকা প্যাটোয়ারি মানুষ আমার মেজজেঠামশায়—তাঁর চোখের উপর চুরির অসুবিধে। চক্রান্ত করে আপনদের সেইজন্যে একেবারে পর করে দিল। ছেলেমানুষ বলে কিছু বুঝতাম

না, এখন সব টের পাচ্ছি। নাবালকের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে খাওয়া—বুঝবে ঠেলা, এইবারে আমি ছেড়ে কথা কইব না।

দীপকের হাত ধরল অলোক। বলে, থাকগে, পথের উপরে আর নয়। মেজজেঠার বাড়ি এই যে—হারমোনিয়াম পেঁ্যা-পেঁ্যা করছে, ঐ ঘরে আড্ডা। যাবি তো চল। উঁহু, বড়দা আসবে খেলতে। তোর বড়দা, আমারও বড়দা। তোকে দেখলে রেগে যাবে। আমি যাব একদিন—গিয়ে সমস্ত ভাল করে বলব। রাখীকে বলিস আমার কথা, মাকে বলিস। কেমন ?

বিশ্রী লাগছে দীপকের, হুঁ-হাঁ দিয়ে সরে পড়ল। এই মাস আষ্টেকের মধ্যে অলোক যেন আলাদা আর-এক মানুস। যত বার কথা উঠল, বলে সৎমা—শুধু-মা বলা ছেড়ে দিয়েছে, দেখা যাচ্ছে। এতদূর ভাল লাগে না—এ অলোকের কথা জাঁক করে মায়ের কাছে রাখীর কাছে বলা যাবে না। গঙ্গাধর এসে এসে তো আড্ডা জমায়—সে-ও কোন দিন বাড়িতে একটি কথা বলে না অলোকের সম্বন্ধে। কেন, কে জানে।

পিতৃপুরুষের নিন্দেমন্দ করা ঠিক নয়—তবু বলতেই হবে, বিষয়ভোগী হয়ে তাঁরা অকর্মণ্য জীবনযাপন করে গেছেন। রাজবাড়ির ছেলে হয়েও অলোক তাঁদের মতো হবে না—একেবারে বিপরীত। মেকানিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে স্বহস্তে সে লোহা পিটবে। ইন্ডাস্ট্রির যুগে ঠিক যেমনটি প্রয়োজন। আর দীপকের ভবিষ্যৎ গোলকুণ্ডায় ঢোকানোর প্রথম দিনই ধনঞ্জয় সেন ঠিক করে দিয়েছেন—সে হবে ডাক্তার। অ্যাটম-বোমায় ভুবন ধ্বংস হয়ে গেলেও ধনঞ্জয়ের ইচ্ছার অন্যথা নেই।

দীপকের ঠিক ঠিক তাই হল—মেডিকেল কলেজে ঢুকে গেছে সে। ধনঞ্জয় থাকায় এখানেও নির্গোল ঢুকতে পেরেছে। আর অলোকের মুখে শোন এখন উল্টোপাল্টা কথা। নাকি লেখাপড়ার জন্যেই সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল, লেখাপড়া ঘুচিয়ে কোমর বেঁধে সে এখন সর্বনাশ ঠেকাচ্ছে।

শুনে বিনোদিনী চুকচুক করেন : আহা, মা নেই বলেই যা মনে আসে বলে, যা ইচ্ছে হয় করে। এবং মায়ের চোখের উপর বলেই (এটা বিনোদিনী অবশ্য মুখে বলেন না, মনের কথা তাঁর) দীপকের পরিপাটি জীবন চলছে।

॥ ছয় ॥

গোপাল হঠাৎ মারা গেলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ স্নানের আগে তেল মাখছিলেন —গোঙানি আওয়াজ শুনে বিনোদিনী রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখেন, মাটিতে গড়িয়ে পড়েছেন তিনি। আর্তনাদ করে উঠলেন, যে যেদিকে ছিল এসে পড়ল। দীপক ছুটল ধনঞ্জয়-ডাক্তারের কাছে। তিনি এসে তাড়াতাড়ি ইনজেকসন দিলেন। কিছুতে কিছু নয়—চেতনা ফিরল না গোপালের, আর কথা বললেন না।

কয়েক মুহূর্ত ডাক্তার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন চিরকালের সখা ও কর্মচারীর দিকে। তারপর হাত পা ছেড়ে ধপ করে শবদেহর পাশে বসে পড়লেন।

গঙ্গাধর ফ্যাক্টরিতে তখন, খবর পেয়ে এসে পড়ল। ধনঞ্জয় তখনো মুখ নিচু করে কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন, আর বিড়-বিড় করে কথা বলছেন : 'ধন্বন্তরী-ডাক্তার নামটা তুমিই তো রটিয়েছিলে। কত বড় মিথ্যে বুঝে নাও—তোমার উপর দিয়েই তার প্রমাণ হয়ে গেল। ধাপ্পা দিয়ে লোক ঠেকিয়ে এসেছি দু-জনে মিলে।

ঐ কথাই যখন-তখন মুখে : ধাপ্পাবাজি ঢের ঢের হয়েছে, এইবারে ইতি। রোগির নামে তেড়ে উঠতেন, তবু কিন্তু শক্ত কেস হলে না গিয়ে পারতেন না। ইদানীং তেমন

ক্ষেত্রেও নড়ানো যাচ্ছে না। বলেন, গোপাল চলে গেছে, ওষুধপত্তর কে দেবে? আমার হাত নুলো করে দিয়ে গেছে সে—

আবার বলেন, আগে যদিই বা একটু-আধটু পারতাম, বুড়ো হয়ে গিয়ে মাথায় আর কিছু নেই। গোপালকে দিয়েই তা প্রমাণ হল—ওর হার্টের চিকিচ্ছে আমি ছ-মাস ধরে করে এসেছি। ঘরের মানুষের বেলা যখন এই, বাইরের তোমাদের কন্দুর কী করে থাকি, বিচার করে দেখ।

হরিদ্বারে স্বামীজিকে চিঠি দিলেন: যাই-যাই করেও যেতে পারিনি, মোহচক্রে পাক খাচ্ছিলাম। মোহ কেটেছে—সামান্য একটা-দুটো দায় সেরে রওনা হয়ে পড়ছি এবার।

খবর চাউর হয়ে গেল, ডাক্তার চলে যাচ্ছেন। এবারে সত্যি সত্যি যাবেন, আর দেরি হবে না। খবর রাজবাড়ির ছোটতরফেও গিয়ে পেঁছিল।

অক্ষয়-মুহুরি পুলকিত কণ্ঠে বলে, শুনেছেন দেওয়ানজি, তল্লাট ছেড়ে একেবারে যাচ্ছেন—কোন দিন আর ফেরত আসবেন না। ঘাড় থেকে বেহ্মদত্যি নামছে, পুরুত ডেকে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের বরাদ্দ করুন

দ্বিধান্বিত কণ্ঠে গণপতি বলেন, তল্লাট হয়তো ছাড়বেন—তা বলে ভিজিটের টাকা ছাড়বেন, এমন তো কথা নেই।

অক্ষয়ের মাথায় ঢোকে না, হাঁ করে চেয়ে আছে।

রানী-মা'র ধরো হুকুম হয়ে গেল, টাকা অতঃপর হরিদ্বারে হাজির করে দিতে হবে। সত্যি সত্যি তাই হতে পারে, অবাক হবার কিছু নেই। উল্টো ফ্যাসাদ তখন—আসলের উপর মনিঅর্ডার কমিশন চেপে যায়।

চলে যাবেন ধনঞ্জয়। সামান্য একটা-দুটো দায় সেরেই রওনা হয়ে পড়বেন স্বামীজিকে লিখেছেন। সে-ও বড় চাট্টিখানি কথা নয়।

মঞ্জু প্রভার কাছে বিদায় নিতে গেছেন। বললেন, বন্দোবস্ত প্রায় সারা। দেহ হরিদ্বারের গঙ্গায় যাবে—এ দেহ নিয়ে আর আসছিনে তোমাদের মাঝে।

রাজাবাড়িতে তখনো বিয়ে হয়নি—মঞ্জুপ্রভা কুমারী-কাল থেকেই এই ধনঞ্জয়ের চিকিৎসায়। ভিজিটের পরিমাণ এবং ঘন ঘন রোগি দেখতে আসা নিয়ে নিত্যিদিন কথা কাটাকাটি। তা সত্ত্বেও মানুষটা চিরদিনের মতো চললেন, এ জীবনে কখনো আর দেখা হবে না—মঞ্জুপ্রভা মনে মনে বেদনা বোধ করছেন। শত্রুপুরীর মধ্যে আরও বেশি অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন রানী।

ডাক্তার মুহূর্ত কাল কান্না দেখলেন। কোমল কণ্ঠে বলেন, ঝি-চাকরে দেখে ফেলবে—রানীও গরিব-দুঃখীর মতো কাঁদে। দেখে অবাক হয়ে যাবে তারা।

মঞ্জুপ্রভা বলেন, রানীর খবরাখবর কোন্‌টা আপনার অজানা জেঠাবাবু? কেন কাঁদি, আপনাকেও কি বলে দিতে হবে?

ডাক্তার বললেন, চোখ মোছ। চোখের জল চিরকাল গোপন রেখেছ তো এখনই বা ধরা দেবে কেন?

সুবাধ্য মেয়ের মতো তাই করলেন মঞ্জুপ্রভা। আঁচলে চোখ মুছে বলেন, বাবা বেঁচে নেই, নিন্দে করা উচিত নয়। কিন্তু রাজবাড়ির বউ হয়ে আমি কেবল তাঁরই সাধ পূরণ করেছি। মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য মেয়ে রাজরানী—পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন হিংসায় ফেটে মরত। কিন্তু রানীর সুখসৌভাগ্য সমস্ত আপনি জানেন। অনেক

ঝা ভাবতেই পারে না, ডাক্তার হিসাবে তা-ও জানেন আপনি।

ডাক্তার বলেন, শুধু বাপের উপর দোষ দিলে হবে কেন? নিজেও কি তুমি রাজবাড়ির মোহে পড়ো নি?

না—

বুদ্ধিমতী মেয়ে তুমি। বিয়ের সময় নিতান্ত ছেলেমানুষটি ছিলে, তা-ও নয়। পাত্রের স্বভাবচরিত্রের খবর সহজেই নিতে পারতে। না নিয়ে একেবারে নির্বিকার ছিলে, তাই আমায় বিশ্বাস করতে বলো?

সত্যি তাই জেঠাবাবু। যে জিনিস ঘটবেই, লটারি-খেলার মতো চোখ বুজে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ায় অনেকখানি সোয়াস্তি। অন্যের চরিত্র নিয়ে বাছবিচারের দম্ভও কি আমার ছিল?

গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে মঞ্জুপ্রভা আবার বলেন, চরিত্রের খবর তবু এসেছিল। ডাকে বেনামি-চিঠি এলো। আমার মেজ ভাসুর পাঠিয়েছিলেন, পরে জেনেছি। বাবার নামে এসেছিল—সে চিঠি আমি খুলে পড়লাম। মাতাল লম্পট পাত্র—গুণাবলীর পুরোপুরি ফিরিস্তি প্রমাণ প্রয়োগ সহ। আমার চিঠি কেন তুই পড়িস—বাবা খুব বকাবকি করলেন। তার পরেই বোঝাচ্ছেন: শরিকে শরিকে বিবাদ-বিসংবাদ—শরিকদের কেউ ভাংচি দিয়েছে। বড়ঘরে কাজ করতে গেলে হবেই এমনি, এতে কান দিতে গেলে চলে না। কিন্তু আমি জানতাম, চিঠির প্রতিটি কথা সত্যি। রাজবাড়ির কোন্ ছেলেটাই বা গঙ্গাজলে-ধোয়া তুলসি। ভালমানুষ হয়ে চিঠি যে লিখেছে, সে নিজেও দলের বাইরে নয়। জেনে বুঝে তবু আমি সায় দিয়ে গেলাম।

ডাক্তার বলেন, কোনদিন কোন অবস্থার মধ্যেই সাহস দেখাতে পারনি তুমি, জীবনের উপর প্রত্যয় ছিল না—জীবনভোর তারই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছ। সারা জীবন এই চলবে।

মঞ্জুপ্রভা বলেন, উড়োচিঠি পুরোপুরিই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। মনে মনে তবু একটা জোর ছিল, চেহারার যে জলুষ রাজবাড়ির ছেলের মন টেনেছে, সেই দড়িতেই বেঁধে ফেলব মানুষটাকে। কিন্তু বিয়ের পরে আরও যে-সব পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে আর টেনে বাঁধবার প্রবৃত্তি রইল না। প্রয়োজনও ছিল না, ব্যাধির চরম অবস্থা তখন। আরও বরঞ্চ অযত্ন-অবহেলা দেখতাম স্বামীর উপরে, যাতে সে কাছে না আসে। আর, যে রূপের দেহ নিয়ে ভরসা করেছিলাম, অবহেলা তার উপরেও—এই দেহ ছোঁবার তৃষ্ণা যেন না জাগায়। তারপরে ছোটরাজা মরেই গেলেন। মরে তিনি বাঁচলেন, আমিও নিশ্চিন্ত। শেষ চিকিচ্ছে আপনার হাতে জেঠাবাবু—বলুন তাই কিনা?

ডাক্তার বললেন, অত্যাচারের পরিণামে সর্বাঙ্গে পচন ধরেছিল, বিষ মস্তিষ্ক অবধি গিয়েছিল। সে আমলে ওসব রোগের ভাল ওষুধপত্র কিছু ছিল না—

কাঁধে সেই থেকে দু'দিকের দুই দায়িত্ব—দুই জীবনব্রত আমার। প্রধান দায়িত্ব, ছেলে মানুষ-করা। দু-হাতে খরচ করেছি ছেলের কল্যাণে—সে তো জানেন আপনি জেঠাবাবু। কোন দিকে তিলেক ত্রুটি রাখিনি। গোলকুণ্ডায় পড়িয়েছি একফোঁটা বয়স থেকে—ভাল পড়াশোনা, ভাল শিক্ষক, ভালছেলেদের সঙ্গ, ভাল পরিবেশ। বাড়ির যিনি প্রাইভেট-মাস্টার, তিনিও বিজ্ঞ বহুদর্শী। আমাকে মহালে মহালে ঘুরতে হত—অনেক খুঁজেপেতে ভাল মেট্রন একটি জুটিয়ে আনলাম। আর সর্বক্ষণের বাবলি তো আছেই। ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে আমার ছেলে—কী আনন্দ, কী আনন্দ! যাকে পাই

শতমুখে ছেলের কথা বলি। মুখোজ্জ্বল করবে আমার ছেলে। সংসার পাইনি জীবনে, ছেলের সংসারে আমি প্রতিষ্ঠা পাব। কিন্তু কিসে কী হয়ে গেল বলুন দিকি। এত চেষ্টা করলাম, হতচ্ছাড়া শয়তান তবু সেই বাপ-ঠাকুরদার পথই খুঁজে নিল।

ডাক্তার বললেন, বিস্তর করেছ মা। কিন্তু নিজে দেখতে পারো নি, তাতেই সব পণ্ড হয়ে গেল।

সে কি আমার দোষ? রাজবাড়ির বউ হয়েও অন্দর ছেড়ে কেন আমায় মহালে মহালে ঘুরতে হয়েছিল? দুই দায়িত্বের কথা বললাম—সেই দু-নম্বর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। ভাসুররা প্রজাপাটক বিগড়ে দিচ্ছেন, মহালে না ঘুরে কী করব? রানী নিজে প্রজাদের দোরে দোরে ঘুরছে, তার অনেক দাম। সমস্ত ওই ছেলের জন্য। ভূ-সম্পত্তি এক কণিকা নষ্ট হতে দেবো না—যক্ষের মতন আগলে রেখেছি ছেলের জিনিস। কবে সাবালক হয়ে তার জিনিস সে নিয়ে নেবে, দায়িত্ব মোচন হবে আমার। কিন্তু তা-ও হল না—সরকারে গ্রাস করে নিল। রাজ্যপাট গেছে—আর এখন দেখছি, ছেলেটাও নেই আর আমার।

বুঝি বা কান্নাকাটি আবার শুরু হয়ে যায়। ডাক্তারের তাড়া রয়েছে—কান্না শোনার ধৈর্য নেই। এটা-ওটা বলে ভিজিটের টাকাটা পকেটে ফেলে তাড়াতাড়ি তিনি সরে পড়লেন।

॥ সাত ॥

গোপালের মৃত্যুর পরে, গঙ্গাধর এখন কর্তা। ফ্যাক্টরিতে প্রায়ই কামাই, সে চাকরি কতদিন বজায় থাকে দেখ।

বিনোদিনী চোখ মুছতে মুছতে ছেলেকে বোঝান: এত দিন উনি ছিলেন, পর্বতের আড়ালে ছিলে বাবা। দু-দশ টাকা যা পেয়েছ, হাতে এনে দিয়েছ—কেউ কিছু বলতে যায় নি। এবারে পুরো সংসার তোমার কাঁধে।

গঙ্গাধর মায়ের কথার পুনরাবৃত্তি করে: বাবা ছিলেন—ফ্যাক্টরিতে সওয়া-শ করে দিত, তাতেই চলে গেছে। পুরো দায়িত্ব এখন।

বিনোদিনী বলেন, ফ্যাক্টরির চাকরিও কি থাকবে? প্রায়ই তো কামাই দেখতে পাই। চাকরি কামাই করে আড্ডা জমানো।

গঙ্গাধর বলল, লেবেল-আঁটার চাকরি আমি আর করব না। জাত যায়, অথচ পেট ভরে না।

লাটের চাকরি কোথায় পাবে, নিয়ে নাও তাহলে। না, তাস খেলে খেলেই বুঝি সংসার চলবে?

গঙ্গাধর দেমাক করে বলে, চলে কি না দেখতে পাবে। বাবার আমলে যা চলত, তার চেয়ে ঢের ঢের ভাল চলবে।

বিনোদিনী দায়িত্বের ফিরিস্তি দিচ্ছেন: দীপকের পড়াশুনার মস্ত এক খরচা—

শেষই করতে দিল না। ঝাঁঝালো কণ্ঠে গঙ্গাধর বলে, আমাদের ঘরের ছেলে হবে মেডিকেল কলেজের পাস-করা ডাক্তার! গরিবের ঘোড়া-রোগ। ডাক্তারবাবু ঢুকিয়েছেন, খরচ তিনিই চালাবেন। দীপুর কথা আমায় বলতে এসো না। তোমার ও ছেলের খরচা সিকিপয়সাও আমি দেবো না।

ডাক্তার থাকলে কথাই ছিল না—চলে যাচ্ছেন যে তিনি। সে যাকগে—না-ই

বললাম দীপুর কথা। দীপু তোমার দু-চক্ষের বিষ, জানি। যা বলতে হয়, ডাক্তারবাবুকেই বলব। কিন্তু অরক্ষণীয়া বোন রয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে—বলি, রাখীকেও কি অমনি ঝেড়ে ফেলে দেবে ?

গঙ্গাধর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, রাখীর বিয়ে আলবত দেবো মা। সে আমি ভেবে রেখেছি। এমন ভাল পাত্র—সাতজন্ম মাথা খুঁড়েও তোমরা কাছ ঘেঁষতে পারতে না।

মনের মতলব অবশেষে প্রকাশ করে বলল। ব্যবসায়ে নামবে গঙ্গাধর—সিনেমার ব্যবসা। নোটের গোছা যাঁরা ছেঁড়া-কাগজের সামিল জ্ঞান করেন, তেমনি সব বড়মানুষ পিছনে রয়েছেন। নিখুঁত পরিপাটি আয়োজন। ভারি মজার ব্যবসা—টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে, ধরে নিতে পারলেই হল। যে না সে-ই লক্ষপতি। উঁহু, লক্ষপতি তো গালাগালি সিনেমাওয়ালাদের কাছে—যে না সে-ই কোটিপতি। বাবা কম্পাউন্ডারি করতেন, ছেলে ওষুধের শিশিতে লেবেল লাগাত—লেবেল-লাগানো সেই ছেলে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক ব্যবসায়ের দৌলতে।

ফ্যাক্টরির কাজে ইস্তফা দিয়ে ভবিষ্যৎ-লক্ষপতি আপাতত তাসের বাজিতে ধুন্দুমার লাগিয়েছে। রাত্রিবেলা রাজবাড়ির মেজতরফের মজলিসে বিস্তর গুণিজন জোটেন, সেখানে রাত্রি কাবার হয়ে যাবার গতিক। সকালবেলাটারই বা অপব্যয় কেন—তখনকার আড্ডা—গোপালের বাড়ির বাইরের-ঘরে। একতলার সংকীর্ণ এঁদোঘর বটে, আড্ডাধারীরা তবু তালেবর মানুষ। আলোকনারায়ণ ও তার অন্তরঙ্গেরা।

অন্তরঙ্গ-দল থেকে দীপক খারিজ হয়ে গিয়ে জ্যেষ্ঠ গঙ্গাধর এখন সেই আসনে। গোলকুন্ডার আমলের সেই অলোকও নেই আর—সাবালক হয়ে ছোটরাজা-বাহাদুর। রাজ্যপাট না থাকুক, গয়না ইত্যাদি এবং শহরের উপর বাড়ি যা আছে, তিনপুরুষ অন্তত শুয়ে-বসে হেসে-খেলে আরামে কাটানো যাবে।

সেই আড্ডায় রাখীকে চা দিতে হয়। সারা সকাল একদন্ড বসতে পায় না সে। রাখী চুপিচুপি বিনোদিনীকে বলে, শনিবারের আড্ডায় ওরা তাস খেলে না—রেসের বই নিয়ে অংক কষে। রেস খেলে ওরা মা—বড়দা'ই বড় পান্ডা।

পুরো আড্ডা চলছে তারই মধ্যে ডাক্তার ধনঞ্জয় সেন উপস্থিত। গোপালের মৃত্যুর পরে এতদিনের মধ্যে এই এলেন। দীপকের ডাক্তারি পড়াশুনো এরই ঠিক পাশের কামরায়। আড্ডার দিকে ভ্রূকুটি করে ডাক্তার গটমট করে দীপকের ঘরে ঢুকলেন।

পড়াশুনো হচ্ছে কেমন ?

দীপক ঘাড় কাত করে তটস্থ হয়ে বলে, বেশ ভাল।

ভাল না হয়ে মন্দ হবার জো আছে ? কাঁধে তাহলে মুন্ডু থাকবে না, বুঝতে পারছি। পুণ্যস্থানে যাচ্ছি—এখন আর পাঁক মাখতে চাইনে। নইলে জুতিয়ে বের করে দিতাম গঙ্গাটাকে ওর ইয়ারবন্ধু সমেত। গৃহস্থবাড়ি, সেয়ানা বোন, তোর পড়ার-ঘর পাশে—তা বলে এতটুকু সমীহ নেই।

দীপক প্রবোধ দিয়ে বলে, এই সকালবেলার দিকে যা-একটু। তারপরে বড়দা তো বাড়িই থাকে না।

ডাক্তার বিনা ভূমিকায় বলেন, মেডিকেল-হস্টেলে চলে যাচ্ছিস সামনের পয়লা থেকে। এর মধ্যে গোছগাছ সেরে নিবি। মাকে ডাক্—

দীপক নড়ে না।

কী হল ? ডেকে আন্ মা'কে—

একটুখানি ইতস্তত করে দীপক মুখ তুলে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমি যাবো না। কিছু কিছু আপনার কানে নিশ্চয় গেছে, চোখেও এই দেখছেন—গোপন করে কী হবে? বড়দা গোল্লায় গেছে একেবারে।

সেই জন্যেই তোর তাড়াতাড়ি পালানো উচিত। এত দূর জানতাম না, তা হলে আরও আগে ব্যবস্থা করে ফেলতাম।

দীপক বলে বাবা নেই, আপনিও যাচ্ছেন—এর উপরে আমি চলে গেলে মা-বোনকে দেখবার কেউ থাকবে না। অকূলে ভেসে যাবে। অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে—ডাক্তারি পড়া আর হয়ে উঠল না।

ডাক্তার কড়া সুরে বলেন, হতেই হবে।

দীপক যেন হাহাকার করে উঠল: আমার মা, আমার ছোটবোন—

সব কর্তব্য ভুলে গিয়ে এখন পড়াশুনো। শুধু পাস নয়, একেবারে শাস্ত্রের গভীরে চলে যাওয়া। হাসপাতাল গড়ার কাজ নিয়ে যাচ্ছি, পাস করে আমার কাছে চলে যাবি। হাতে ধরে শেখাব। মাকে ডেকে আন্। সব কথা তাঁকেই বুঝিয়ে বলব।

যেতে হল না, ডাক্তারের সাড়া পেয়ে বিনোদিনী নিজেই চলে এসেছেন। ঘোমটা টেনে দরজায় দাঁড়িয়েছেন।

ডাক্তার বললেন, আপনার বাড়িতে জুয়োর আড্ডা। গোপাল যেতে যেতেই এতদূর? আরও শুনে এলাম, গঙ্গা ফ্যাক্টরির কাজে ইস্তফা দিয়ে এসেছে। সুপারভাইজার আমায় বললেন। ঠিক মতো হাজিরা দেয় না, খুশি মতন চলে আসে। উপরওয়ালা হিসাবে বলতে গিয়েছিলেন—একেবারে তাই সামনাসামনি অপমান। বলেছে, এক শ দেড়-শ'র চাকরির পরোয়া করিনে—আপনার চাই তো দরখাস্ত করে দেবেন। কী লাটবেলাট হয়েছে—কেমন করে হল বলুন তো বউঠান। আমি তো কিছুই জানি নে।

বিনোদিনী সজল চোখে বলেন, বড়লোকের পাঁঠা কতকগুলো জুটেছে—তাদের গায়ে গা ঠেকিয়ে বেড়ায়। বাড়ির বড়ছেলে, কত দায়দায়িত্ব গঙ্গার কাঁধে—দীপুর পড়া, রাখীর বিয়ে—কিন্তু লম্বা লম্ব চালিয়াতি বচন ছাড়া আর কিছুই সে দেবে না। ভাবতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখি।

দীপুর ব্যবস্থা করে ফেলেছি। সেই কথা বলতে এলাম। ডাক্তারি পড়া বাড়িতে থেকে হয় না—কলেজ থেকে যখন-তখন ডাক পড়ে, কাছাকাছি না থাকলে অসুবিধা হয়। হস্টেলে যেতেই হত—এ বছর না হলেও সামনের বছর। হরিদ্বার যাবার আগেই তাই ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। দীপুকে নিয়ে আর আপনার ভোগান্তি নেই।

একটুখানি চুপ থেকে ডাক্তার অবস্থা ভেবে নিলেন বোধহয়। বলেন, বাকি এখন মেয়ের বিয়ে। বড্ড ভাল মেয়ে রাখী—সৎপাত্রে যাতে পড়ে দেখবেন। সংসারে টাকাপয়সার দরকার নিশ্চয়ই, কিন্তু টাকাই সব-কিছু নয়। পাত্রের টাকা দেখবেন না, বিদ্যা-বিনয়-সদাচার দেখবেন। আমার রোগিদের মধ্যে টাকাপয়সার মানুষ বিস্তর। টাকার পাহাড়ে বসে থেকেও সারাজীবনে লহমার তরে চোখের জল শুকাল না, এমন আমি অনেক দেখেছি।

বিনোদিনী নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, দীপুর ব্যবস্থা করে দিলেন—রাখীর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত। কবে যে প্রজাপতি মুখ তুলে চাইবেন।

ধনঞ্জয় বলেন, মবলগ টাকার ব্যাপার। আমার, জানেন তো, যত্র আয় তত্র ব্যয়—

সিকিপয়সার রেস্ত থাকে না। তার উপর রোজগার ছেড়েছুড়ে আশ্রমবাসী হচ্ছি। সম্বন্ধ ঠিকঠাক হলে তবু চিঠি দেবেন একটা, গোপালের জামাই-মেয়ের জন্য যথাসাধ্য আমি করব। নিশ্চয় করব।

বিনোদিনী বলেন, কবে যে রাখী ঘাড় থেকে নামবে। এবাড়িতে তারপরে একদণ্ডও নয়। যা গঙ্গার চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি, ওর ভাত গলা দিয়ে নামবে না।

কী দরকার। আমাদের ওখানে চলে যাবেন—

উৎসাহ ভরে ডাক্তার বলে যান, আশ্রমে স্ত্রীলোক নিষিদ্ধ। কিন্তু আশেপাশে অনেক সব থাকেন। আমি দেখাশুনো করব। গঙ্গাস্নান পুজোআচ্চা নিয়ে পুণ্যের আবহাওয়ার দিব্যি দিন কেটে যাবে।

।। আট ।।

পয়লা তারিখে দীপক হস্টেলে চলে গেল। মন টেঁকে না, শনিবার কবে আসবে, দিন গণে। শনিবারে কলেজ থেকে ফিরে মুহূর্তকাল দেরি নয়—বই-টই রেখেই বাড়ি রওনা। রবিবার সন্ধ্যায় মনমরা হয়ে আবার হস্টেলে আসে।

এক শনিবারে অমনি গিয়েছে। বারান্ডায় পা দিতেই রাখী যেন উঠে এসে পড়ল।

ওরে ছোড়দা, মস্ত খবর। তুই গেছিস, আমিও যাচ্ছি চলে।

দীপক বলে, লেখাপড়া ছেড়ে ধিঙ্গি হয়ে ঘুরছিলি। তুই যাবি আবার কোন চুলোয়?

হস্টেলের কথা হচ্ছে না—হস্টেলে কেন খেতে যাব, আধপেটা খেয়ে তোর মতন হাড্ডিসার হতে? যাব আরামের জায়গায়। শ্বশুরবাড়ি।

দীপক তাকিয়ে পড়ে।

রাখী তরল কণ্ঠে বলল, বিয়ে হবে যে আমার—

দূর! বানিয়ে বলছিস। তোকে আবার কে বিয়ে করতে যাবে?

রাখী দেমাক করে বলে, করে কিনা দেখবি। চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুর কাছে মা কিনা বলে—তুই তো ছিলি সেখানে, আমিও ছিলাম জানলার পাশে—

সে জানি। বিয়ের কথা উঠলেই যেখানে থাকিস ছুটে এসে কান পাতবি—

মা ডাক্তারবাবুকে বলল, রাখীটা ঘাড় থেকে নামলে হয়। কী ঘেন্নার কথা বলু তো। আমি কি ঘাড়ে চেপে আছি তোদের?

দীপক মাথা কাত করে সায় দিয়ে বলে, পেত্নী হয়ে—

তাই তো বলছি। হিংসুটে তোরা, দূর-ছাই করিস, দেখিস নাকি চোখ তাকিয়ে? যে-মানুষ দেখতে জানে, ঘরে নিয়ে সে সিংহাসন সাজিয়ে বসাবে।

জুতো খুলে রেখে দীপক ঘরের ভিতর তক্তাপোশে বসে পড়ল। বলে, উজবুকটা কে, বলু দিকি?

বল তুই, দেখি কেমন পারিস—

জুতোজোড়া সরিয়ে রেখে রাখী ওদিক থেকে পাজামা হাতে করে এলো, প্যাণ্ট ছেড়ে ফেলে দীপক পাজামা পরবে।

বলে, ভেবে পেলি কিছু?

দীপক সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, আলু-পটোল বেচতে আসে সেই লোকটা হতে পারে। বউ মরেছে বলে ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিল সেবার।

দোজবরে নয় আমার বর—

একটুখানি ভাবনার ভাণ করে দীপক বলে, বাড়ি ভাড়া আদায় করতে আসেন যে ভদ্রলোক, শুনেছি বিয়েই করেন নি—তিনি হবেন বোধহয়।

রাখী সগর্বে বলে, বর আমার বুড়ো নয়।

মুশকিল! কে তিনি?

মাথা চুলকে দীপক বলে, কোন্ নবকার্তিক বর হয়ে আসবে, কিছুই তো ভেবে পাচ্ছিনে।

আরও ভাব্। ক্ষিধে পেয়েছে তোর ছোড়দা, খাবার তৈরি করিগে। অনেক করে ভাবনাচিন্তা কর্ ততক্ষণ।

ছুটে গেল লুচি করতে। লুচি-তরকারি প্লেটে সাজিয়ে হাতে এনে দিল।

হতাশকণ্ঠে দীপক বলে, ত্রিভুবনের মানুষ একজন একজন করে ভেবেছি, হদিশ পেলাম না।

অথচ তোর কত কাছের মানুষ। আজকে অবিশ্যি বদল হয়েছে—একদিন ছিল কিন্তু বড্ড কাছে। অলোকনারয়ণ রায়। এই যাঃ বরের নাম ধরে ফেললাম।

ঠাট্টাতামাশার ধারেকাছেও গেল না দীপক। বলে, সত্যি?

ঘটক বড়দা নিজে। 'সখি আমায় ধরো ধরো' বলে থাকে, বরের দশা ঠিক সেই রকম—

এক লহমা গম্ভীর হয়েছিল—সামলে নিয়ে লঘু কণ্ঠে আবার দীপক বলে, হয় কেমন করে? আছে কী তোর চেহারায়?

চেহারায় নয় বোধহয়। চা খাইয়ে খাইয়ে করেছি। চায়ে নিত্যিদিন একটু করে আফিঙের জল মিশিয়ে দিই।

দীপক তাড়া দিয়ে ওঠে, বাঁদরামি করবিনে জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সঙ্গে। থাবড়া খাবি।

তা নইলে এত নেশা কেন ধরেছে বল? এই চা দিয়ে এলাম—তক্ষুনি আবার হাঁক পাড়েঃ চা নিয়ে এসো। আবার বলে, তাস খেল একটুখানি আমাদের সঙ্গে বসে।

দীপক বলে, মা কী বলেন?

রাজরানী হব, মায়ের কেন আপত্তি হবে? অলোক এখন আর কুমার নয়—ছোট-রাজা। তার বউ হয়ে আমি হব ছোটরানী। বোঝ এবারে কী জিনিস।

দীপকও নড়েচড়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল: ঠিক বটে। আমিও কম নই তবে—রাজশ্যালক।

তারপর বলে, অলোকের মা রানী মঞ্জুপ্রভার মতামতটা কী, সে তো শুনলাম না।

মা কোথা, সে তো সৎমা। শত্রুপক্ষ। আয়রনসেফ আর লকারে চাবি এমনি না দিলে জোর করে কাড়বে। জোরে না পারলে মামলা। সে মানুষের মতামতের কী দাম, কে-ই বা তা নিতে যাচ্ছে!

স্তম্ভিত হয়ে দীপক বলে, এতদূর?

মা'র কাছে বড়দা এই সব বলছিল। আর জানিস তো, বিয়ের কোন কথাই আমার কান এড়ায় না।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ রইল দীপক। তারপর ঝাঁকি দিয়ে যেন মনের ক্ষোভ সরিয়ে দেয়ঃ সে যাকগে। আমরা গরিব মানুষ, রাজরাজড়ার ব্যাপায় কেমন করে বুঝব? মামলাবাজি এর আগে জেঠাদের সঙ্গে চলত, এখন বুঝি ঘরের ভিতর মায়ে-ছেলের লেগে যাচ্ছে?

রাথী হেসে টিপ্পনী কাটেঃ রাজরাজড়া বই কি! তবে এক ছটাকও রাজ্যপাট নেই। ছোটরানী রাঁধুনি হবেন কোনো বাড়ি, ছোটরাজা বোধ হয় পাঠশালার পণ্ডিত। ঠিক জানি নে, বিদ্যেয় কুলোবে কি না ছোটরাজার।

দীপক বলে, কী বলিস, এস্টেটের দরুন কমপেনসেসনই তো পাবে এককাঁড়ি টাকা। তা বাদে ঝড়তি-পড়তি কত রকম। জমিদারি চলে গিয়েও যা আছে, আমাদের মতন বিশটা পরিবার স্বচ্ছন্দে ওরা পুষতে পারে।

গলা চড়িয়ে বলে, বিষয়-আশয় বাদ দিয়ে অলোক মানুষটাকেই শুধু বিচার করে দেখ না। চেহারায় কার্তিক—

অনেক বলতে যাচ্ছিল—বাধা দিয়ে রাখী বলে, না ছোড়দা, গণেশ—

হেসেই কুটি-কুটি। বলে, নাদুসনুদুস গোলাকার—গণেশের শুঁড়টা কেবল নেই। ধাক্কা দিলেই গড় গড় করে গড়িয়ে যাবে। পা কেন দিয়েছেন, বিধাতাপুরুষই জানেন —পায়ের কী দরকার?

দীপকের জেদ চেপেছে, সহপাঠী বন্ধুকে আকাশে না তুলে ছাড়বে না। ফলাও করে বলে, বংশগরিমাতেও কত উঁচু ওরা—

ঠিক উল্টো। রাজবংশ চিরকাল প্রজা শুষে খেয়েছে। আগে লোকে ভয় করত, সামনাসামনি সম্ভ্রম দেখাত। ঘৃণাটা এখন স্পষ্টাস্পষ্টি—মুখ ফুটে শতকণ্ঠে বলতে লেগেছে।

তুই তাই কান ভরে শুনে এসেছিস। কোন পার্কে কবে বক্তৃতা শুনলি রে?

সে কথার জবাব না দিয়ে রাখী বলে, বল্ বল্—। থেমে গেলি যে ছোড়দা, গুণের লিষ্টি সারা হয়ে গেল?

দীপক হতাশ ভাবে বলল, বুঝলাম অপছন্দ তোর। গোড়ায় খানিকট খেলিয়ে নিলি। গুণ বলে আর কী করব—কোন গুণই এখন মনে ধরবে না।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে দীপক বলে, হ্যাঁ রে বলবি একটা সত্যি কথা?

মুখ তুলে রাখী তাকিয়ে পড়লঃ বল—

ডেঁপো মেয়েগুলো মন হারিয়ে ফেলে হা-হুতাশ করে, শুনেছি। সেই কাণ্ড তোরও ঘটেছে ঠিক। কে তোর পছন্দের পাত্র, নাম ঠিকানা বল—হাত পা ধরে পাড়িগে। বোনের মুখ চেয়ে করতেই হবে আমায়।

রাখী বলে, পছন্দের আপাতত কেউ নেই, বিশ্বাস কর ছোড়দা। হলে তক্ষুণি বলব। অপছন্দ কে, সে তো বলেই দিলাম।

দীপক বোঝাচ্ছেঃ মা দাদা সকলের পছন্দ—হাঙ্গামায় কাজ কি—পছন্দ তুইও করে ফেল্ না রে ভাই। যে পাত্রই আসুক, দেখতে পাবি, সব সমান। হাত দু-খানার বেশি তিনখানা কারো নয়, মুণ্ডও একটি মাত্র। বড়দা'র মেজাজখানা দেখে থাকিস আজকাল—'না' বললে কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে। একবার ভাল করে ভেবে দেখ লক্ষ্মীসোনা বোনটি আমার।

রাখী নীরবে ভাবল খানিক। বলে, কুরুক্ষেত্র বাঁধে না অলোকই যদি নিজের ইচ্ছায় বাতিল করে দেয়।

দীপক উড়িয়ে দিলঃ আলোকের কোন্ গরজটা শুনি? সে কেন বাতিল করতে যাবে?

করাবো আমিই। পাউডার নেই কাজল নেই সুর্মা নেই রুজ নেই, চোখে পিচুটি, পোকায়-খাওয়া দাঁত, মুঠো দেড়েক চুল, শলার মতো সরু সরু আঙুল—এই চেহারায়

ঘুরঘুর করে সামনে ঘুরব। চায়ে এবার থেকে কুইনিনের জল মেশাব, মুখের কথাতেও কুইনিন। প্রেম-ট্রেম তারপর ক'টা ধোপ টেঁকে, দেখা যাবে।

গুহ্যকথা রাখী ফাঁস করে দেয়ঃ মেয়েদের সাজগোজ নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করিস তোরা। কিন্তু বিধাতার দেওয়া আসল মূর্তি যদি দেখতে দিই, পুরুষগুলো বিবাগী হয়ে দুড়দাড় করে বনে পালাবে! চুনকাম নেই রিপুকর্ম নেই তেমন তেমন মেয়ে দেখতে পান শুধু ডাক্তারে—মরণ-চিকিচ্ছের ঠিক মুখটায়, মেক-আপের যখন আর উপায় থাকে না। আর দেখেন যমরাজ—মরণ হয়ে যাবার পর, তখন মেক-আপের সাধ্য থাকে না।

॥ নয় ॥

ধনঞ্জয়-ডাক্তার হস্টেলে দীপকের ঘরে এসে উপস্থিত।

ব্যবস্থা সব সেরে ফেলেছি। দিন চার-পাঁচের ভিতর বেরিয়ে পড়ব। তোর সঙ্গে একটু কাজ বাকি। চট করে তৈরী হয়ে নে দিকি।

কোথায় যাবেন, কী বৃত্তান্ত দীপক প্রশ্ন করে না। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, প্রশ্ন করতে যাবে। চলে যাচ্ছেন বলে নিজের গাড়ি ধনঞ্জয় ছেড়ে দিয়েছেন। দান বিক্রি কোনটা করলেন, তিনি জানেন। দানই সম্ভবত।

ট্যাক্সিতে উঠে নিজে থেকেই ডাক্তার বললেন, ব্যাংকে যাচ্ছি। এজেন্টের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি। ব্যাংক থেকে মাসে মাসে টাকা আসবে।

ব্যাংক কেন? মৃদু প্রতিবাদ করে দীপকঃ বরাবর মা-ই তো সব খরচ দেয়।

আগেকার দিন হলে সাহস হত না এসব বলতে। ধনঞ্জয়ও কানে নিতেন না। আশ্রমবাসী হতে যাচ্ছেন, সেজন্য এখন থেকেই মানুষটা যেন বদলেছেন।

দীপক বলল, টাকা-পয়সা মায়ের কাছ থেকেই নিয়েছি তো এতকাল—

ধনঞ্জয় বললেন, আমি ছিলাম—নির্বিঘ্নে তাই হতে পেরেছে। আমার অসাক্ষাতে গন্ডগোল ঘটতে পারে। এক ভয় গঙ্গা—সে যা হয়ে উঠছে, মায়ের কাছ থেকে টাকা কেড়েকুড়ে নেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। আর আসল ভয়টা হল, আমায় গরহাজির দেখে টাকা ঠিক ঠিক না-ও পেঁছিতে পারে তোর মায়ের কাছে। পড়াশুনোর বাধা ঘটবে, তেমন ঝুঁকি আমি নেবো না।

দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, দুনিয়া লন্ডভন্ড হোক তোর পড়া বন্ধ হলে চলবে না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ডাক্তার কোন রকমে হতে পারলে প্রতিষ্ঠা আমিই দিতে পারব, সে জোর আমার আছে। তোর পড়ায় তিলমাত্র অসুবিধা আমি হতে দেবো না।

নাম-করা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ, ছিমছাম আধুনিক আসবাব। দরজা খুলে সোজা এজেন্টের ঘরে ঢুকে গেলেন। খাতির দেখা গেল এজেন্টের কাছেও—ডাক্তার মানুষের খাতির কোথায় বা নয়! বিশেষ করে ধনঞ্জয় সেন হেন ডাক্তার।

উঠে দাঁড়িয়ে 'আসুন' 'আসুন' করে আহ্বান করলেন। যে ক'টি চেয়ার, মানুষ-জন বসে আছে। হাঁকডাক করে বাড়তি চেয়ার আনিয়ে দিলেন।

একটু কফি হবে নাকি?

ধনঞ্জয় ঘাড় নেড়ে বললেন, দরকার নেই, সময়ও নেই। কত তাড়া বুঝতেই পারছেন! দু-এক মিনিটের বেশি থাকতে পারব না।

তারপর দীপককে দেখিয়ে বলেন, এই ছেলেটি—

এজেন্ট বলেন, বুঝেছি—দেখেই বুঝতে পেরেছি। এঁদের কাজগুলো চট করে

সেরে দিই আগে।

আগে থেকে যারা আছে, দ্রুত তাদের কাজ করছেন। মাঝে একবার বেল টিপে বেয়ারাকে বললেন, দরজা ভেজিয়ে দাও। নতুন আর কেউ ঢুকে না পড়েন। যদি কেউ আসেন, ডাক্তার সেনের হয়ে গেলে তার পরে: চারটে তো বাজে—ইন্টারভিউ আজকের মতো না-হয় বন্ধই করে দাও।

বাইরের লোক বিদায় হয়ে গেলে ধনঞ্জয় বললেন, মিস্টার পালিতকে প্রণাম কর দীপক। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু! পালিত এখানে এজেন্ট হয়ে এসেছেন বলে ব্যবস্থা খুব সহজে হয়ে গেল। চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, যা কিছু করতে হয় ইনিই করিয়ে নেবেন। দরকার মতন টাকা নিয়ে যাবি, দায়ঝঞ্ঝাটে পড়লে সোজা পালিতের কাছে চলে আসবি। গোপাল থাকলে যেমনটি হত, তেমনি। লজ্জা-সঙ্কোচ করিস নে।

পালিতকে বললেন, অ্যাকাউন্ট দীপক মজুমদারের নামে হবে। আইডেন্টিফাই আমি করছি। বড় ব্যস্ত আজ—কাগজপত্র আনুন, সই করেই পালাব। কাজ শেষ হলে ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দেবেন সব। ব্যাঙ্কে এই প্রথম এসেছে।

এমনি দু-পাঁচ কথা বলে ধনঞ্জয় বেরুলেন। বড় ব্যস্ত। ট্যাক্সি ছেড়ে দেন নি, অপেক্ষা করছিল—দ্রুতপদে গিয়ে উঠে পড়লেন।

পালিত বললেন, 'তুমি' বলেই বলছি—রাগ কোরো না। ডাক্তার সেন তোমার বিষয়ে সব বলেছেন। আমি তো রইলাম, অ্যাকাউন্টান্ট করালীর সঙ্গে চেনা-পরিচয় করে দিই। তার হাত দিয়েই সব হবে—বড় ভাল ছেলে। স্পেসিমেন সিগনেচার করো এই কাগজে—যে ক'টা ঘর আছে, সবগুলোয় সই করো। সই বদলে যায় অনেক সময়, সেজন্য বেশি সই থাকা ভাল।

সই হয়ে গেল। কাজকর্ম সারা। চেক-বই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিল।

করালী বুঝিয়ে দেয়: দরকার হলেই চেক কেটে টাকা নিয়ে যাবেন।

দীপক হেসে বলে, যত দরকার হবে দিয়ে দেবেন?

তা দেবো বই কি।

হাসিখুসি ছোকরা মানুষ। এখন ছুটির মুখ—কাজকর্ম নেই আর তেমন, অল্প সময়ের মধ্যে দীপকের সঙ্গে জমে গেল।

দীপক বলে, যত চাই দেবেন—এক-শ টাকা, দেড়-শ টাকা?

চেয়ে দেখুন না, নিশ্চয় দেবো।

পাঁচ-শ?

করালী বলে, ছাত্র-মানুষের অত কিসে লাগবে?

তর্কের ঢঙে দীপক বলে, ধরুন যদি লাগে। মনুষের কত কী ঘটতে পারে, কত রকম দুর্ঘটনা।

একগাল হেসে করালী বলে, তা হলে নিশ্চয় পাবেন। তবে এমন ক্ষেত্রে এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে।

কিছু ইতস্তত করে দীপক শুধায়: কত টাকা আছে আমার অ্যাকাউন্টে?

যা-ই থাকুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ফুরোলে এসে পড়বে। আগে যদি না ও আসে, পরে। আপনার প্রয়োজনের টাকা দিয়ে দেবার হুকুম আমার উপরে।

দীপক সকৌতুকে বলে, দিব্যি তো মজা। দীনবন্ধু-দাদার দধিভাণ্ড। সে বুঝি জানেন না? দীনবন্ধু নাম নিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরই এক দধিভাণ্ড দিয়ে গেলেন—ছোট্ট ভাঁড়, কিন্তু উপুড় করে খেয়ে আবার চিত করে ধরলেই সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ। শেষ

হবে না কিছুতে।

করালী হেসে বলে, আপনার অ্যাকাউণ্টও তাই।

কিন্তু দীনবন্ধুটি কে, ফুরোলেই যিনি পূরণ করে দেবেন?

করালী বলে, ঐটি বলা যাবে না—টপ-সিক্রেট।

আবার বলে, টাকা কে দিচ্ছেন আপনি যেমন জানতে পারবেন না, কে নিচ্ছেন তিনিও তেমনি জানবেন না। নিষেধ দু-দিক দিয়েই।

দীপক অবাক হল। প্রশ্ন করেছিল বটে, কিন্তু সুনিশ্চিত জানত—জনপ্রয় ছাড়া অন্য কেউ নয় সে মানুষ। খরচখরচা বরাবর তিনি দিয়ে এসেছেন, ভবিষ্যতেও দেবেন। হরিদ্বার থেকেই টাকা পাঠাবেন, স্বামীজির সঙ্গে সম্ভবত ব্যবস্থা হয়ে আছে। এই রকম ধারণা হয়েছিল দীপকের। কিন্তু কে টাকা নিচ্ছে একেবারেই জানেন না নাকি দাতা-মানুষটি—সে ক্ষেত্রে ধনঞ্জয়-ডাক্তার হতে পারেন না। করালীর খবরে পূর্বধারণা সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।

করালীর দিকে তাকাল দীপক আর একবার। মুখের উপর আঙুল রেখে সে মিটিমিটি হাসছে।

কে হতে পারেন সেই হৃদয়বান দাতা? কেন দিচ্ছেন ঘড়ির কাঁটার মতো এমন নিখুঁত নিয়মে? কী তাঁর উদ্দেশ্য?

॥ দশ ॥

ব্যাঙ্ক থেকে ধনঞ্জয়ের ট্যাক্সি রাজবাড়ি ছুটল।

মঞ্জুপ্রভার ঘরে ডাক্তারের জন্য বিশেষ চেয়ার—গদি-আঁটা সেই চেয়ারে তিনি যথারীতি চেপে বসলেন।

আজকেই যাচ্ছি।

মলিন মুখ মঞ্জুপ্রভার। ভালমন্দ একটি কথাও তিনি বললেন না।

ডাক্তার পুনরপি বললেন, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলে এলাম। আমি থাকব না, টাকা যেন ঠিক মতো জমা পড়ে। অনিয়ম হলে অসুবিধা ঘটবে।

টাকাকড়ি সত্যিই নেই আমার।

বিগলিত কণ্ঠে ডাক্তার বলেন, না থাকলে তো চলবে না মা। তুমিই কি আর বোঝা না এটা? দেবে ঠিকই, দিয়ে এসেছ বরাবর—কিন্তু দেরি করে ফেল, এই তোমার দোষ। এদ্দিন যখনই দরকার পড়েছে, নিজের পকেট থেকে সামলে দিয়েছি, এখন সেটা হতে পারবে না। এই জিনিসটাই বিশেষ করে তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি।

রানী আকুল হয়ে বলেন, মেরে ফেলুন জেঠাবাবু—তবু আর টাকা বেরুবে না।

ডাক্তার নিস্পন্দ কণ্ঠে বললেন, মারব না—আর আমি জানি, টাকাও ঠিক ঠিক বেরুবে, বরাবর বের করেছ, ভবিষ্যতেও করবে।

না—

বিদ্রোহিণীর কণ্ঠে বলে উঠলেন মঞ্জুপ্রভা

হাসিমুখে ডাক্তার বললেন, রাগের মাথায় বলছ। মাথা ঠাণ্ডা হলে কথা আবার ঘুরিয়ে নেবে। টাকা কেন দাও, ভাল ভাবেই তোমার জানা আছে। কম দিন তো তোমায় দেখছি নে—নিজের ইচ্ছেয় যারা দানধ্যান করে, সে মেয়ে তুমি নও। দান-খয়রাত তোমার কাছ থেকে আদায় করে নিতে হয়।

কথা শেষ করে দিয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, নিয়মমতো টাকা জমা তো দেবেই, নিয়মের বাইরে কখনো-সখনো বাড়তিও লাগতে পারে। পারে কেন বলছি, লাগবেই। এমার্জেন্সির জন্যে তৈরি থেকো, টাকা যেন সর্বদা মজুত থাকে।

কিন্তু রানীর কথা শেষ হয় নি। দ্রুত এসে প্রসারিত দুই হাতে তিনি পথ আটকে দাঁড়ান ঃ একেবারে নিরুপায় জেঠাবাবু। বিশ্বাস করুন।

ধনঞ্জয় ভ্রূকুটি করলেন ঃ অন্য সব খরচা কমাও। চাকর-বাকর ছাড়িয়ে দাও। সংসার নিজের হাতে করো। রাজবাড়ি ছেড়ে দিয়ে রানী নাম বাতিল করে সামান্য গৃহস্থ হয়ে চলে যাও কোনখানে। বিয়ের আগে যেমনটি ছিলে।

না—

মঞ্জুপ্রভা প্রবল ঘাড় নাড়েন ঃ রানী নাম আর রাজবাড়ি আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছি। এ দুটো ছাড়লে তারপর একটা দিনও আর বাঁচব না। নেই তো আর কিছু—এই আজ আমার কাছে সকলের বড়।

আমার মাসোহারা আরও ঢের ঢের বড়—

কাতরকণ্ঠে রানী বলেন, পুণ্যস্থানে যাচ্ছেন, সাধুসঙ্গ করবেন—যাত্রামুখে দয়া করুন। রেহাই দিয়ে যান। হাতজোড় করছি জেঠা বাবু।

দু-কানে আঙুল দিলেন ডাক্তার। দিয়ে হাসছেন। হাসিমুখে বলেন, আমি শুনতে পাচ্ছি নে।

মঞ্জুপ্রভা দরজা বন্ধ করলেন। খিল এঁটে দিলেন।

ডাক্তার লঘুকণ্ঠে বলেন, মতলব কি গো? তোমার অক্ষয়ের শুনি গুন্ডাদলের সঙ্গে আনাগোনা, তোমার শিউনন্দন ডজনখানেক খুন করেছে নাকি স্বহস্তে। ওদের কাছে পাঠ নিয়েছ বুঝি—খুন করবে?

পায়ের উপর মাথা খুঁড়ব যতক্ষণ না মুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন।

সত্যি সত্যি তাই। ডাক্তারের দু-পায়ে মাথা রেখে কাঁদছেন রানী। রানী মঞ্জুপ্রভা—চেহারায় আচরণে রুচিতে চিন্তায় দাক্ষিণ্যে সাহিত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় একদা যাঁর নামে জয়জয়কার পড়েছিল। পঙ্কের পদ্মফুল, লোকে বলত। ছোটরাজা পচে গলে মরছে—তবু কিন্তু কোন্ পুণ্যে না-জানি পদ্মগন্ধ নাকে পাচ্ছে চরম কষ্টের সেই দিনগুলোয়। ছোটরানী পদ্মেরই সমতুল্য—ডাক্তারের পদতলে তিনি আজ পাগলের মত মাতা কুটছেন। দোতলার মেজের উপর গুমগুম আওয়াজ।

ডাক্তার স্থিরমূর্তি। রমণীর কান্নাকাটি মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি—এ যেন তাঁর কোন ব্যাপার নয়।

ক্লান্ত মঞ্জুপ্রভা অবশেষে মুখ তুললেন। শান্তকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, হয়েছে? ওঠো তবে এইবার। ভরসা এইটুকু দিতে পারি মা, প্রয়োজন আর বেশি দিন নয়। বছর তিনেক। তারপর আর দিতে হবে না।

মঞ্জুপ্রভা বলেন, প্রয়োজন অনেক কাল ফুরিয়েছে। আমি জানি, আমি জানি।

ডাক্তার বললেন, মানে কি তোমার কথার?

যার নাম ধরে নিয়ে থাকেন, অনেক দিন সে ফৌত হয়েছে। জেনেবুঝেও তবু দিয়ে গেছি, কোন দিন আপত্তি করিনি, টাকাকড়ি অঢেল ছিল বলে। এখন আর কিছু নেই—নেই বলেই এত কান্নাকাটি করি।

ধনঞ্জয় সহাস্যে বলেন, ঠগ জোচ্চোর ব্লাকমেইলার আমি, ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়ে যাই—উঁ?

প্রমাণ দিন তা হলে—

ডাক্তার বলেন, প্রমাণ আমার মুখের কথা।

প্রমাণ আপনি দিতে পারবেন না। জানি সেটা। শুধু ঐ মুখের কথা ছাড়া আর কিছু নেই। নয়তো চাক্ষুষ একটিবার দেখিয়ে দিতেন। আমারও কিছু বলার থাকত না।

ডাক্তার বললেন, মনের সন্দেহ আকার-ইঙ্গিতে অনেকবার তুমি জানিয়েছ, জবাব আমি এড়িয়ে গিয়েছি। আজকে স্পষ্ট করে বলে ফেললে তো আমিও স্পষ্ট কথায় জবাব দিচ্ছি। চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছি, মন গুমরে থাকা কিছু নয়—জিনিসটার সত্যিই খোলাখুলি আলোচনা হওয়া উচিত।

মুহূর্তকাল ডাক্তার চুপ করে রইলেন। মনের দ্বিধা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, সে ছেলে ন-মাস ছ-মাসের পথ থাকে না। তুমি নিজেও দেখছ তাকে। যখন ইচ্ছে, চাক্ষুষ চিনিয়ে দিতে পারি। কিন্তু দেবো না।

কঠিন কণ্ঠে বললেন, চিনে নিতে তুমি বড্ড বেশি ব্যাকুল। কিন্তু আমি তা হতে দেবো না কিছুতে। তোমার অক্ষয়টি না পারে হেন কর্ম নেই—একদল গুন্ডাও তার পোষা আছে শুনতে পাই। আর শিউনন্দনও যে অহিংস বৈষ্ণব, তা-ও নয়। তোমাদের মতলব জানতে বাকি নেই—এ ধরনের চেষ্টা সেই গোড়া থেকেই তো চলছে।

হঠাৎ ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে ব্যস্ত ভাবে উঠে পড়লেন। খিল খুলে বাবলির নাম ধরে হাঁকডাক করছেন : কোথায় রে বাবলি! চলে যাচ্ছি, আর দেখা হবে না। ভাল থাকিস তোরা সকলে, আনন্দে থাকিস—

বাবলি এসে গড় হয়ে প্রণাম করল। অকস্মাৎ বাবলির নামে এত সোহাগ উথলে উঠল—চালাকিটা কে না বোঝে? বাবলিকে কাছে ডেকে রানীর মুখ বন্ধ করে দিলেন।

নিচে নেমে ডাক্তার কাছারি-দালানে গণপতির কাছে চলে গেলেন : যাবার আগে দেখা করে যাচ্ছি সকলের সঙ্গে। আর হয়তো আসা ঘটে উঠবে না।

একগাল হাসি—কোন-কিছুই ঘটেনি যেন এতক্ষণ—বললেন, কত বয়স হল ম্যানেজারবাবু? আমি বড় না আপনি বড়? যাবেন না একবার হরিদ্বারে। আগে চিঠি দেবেন—তৈরি থাকব—দু'জনে কেদার-বদরী অবধি চলে যাব। আর শোন অক্ষয়, একটা জিনিস তুমি মনে রেখো—

অক্ষয় উঠে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

ধনঞ্জয় বলেন, ওষুধ যত না হোক, পাতিলেবুটা কদাপি ছেড়ো না। দু-বেলা ভাতের সঙ্গে দুই-দুনো-চারটে লেবু অন্তত খাওয়া চাই। পেটের ব্যাথা অনেক ভাল থাকবে।

॥ দশ ॥

দীনবন্ধু-দাদার দধিভাণ্ড—যত চাও মিলে যায়, অভাব হয়না। চেক লিখে ব্যাঙ্কের কাউন্টারে জমা দিলেই টাকা। দীপকের যেন জেদ চেপে যায় : দেখি, কত টাকা দিতে পারে নেপথ্যবাসী সেই দাতামহাশয়।

নিয়মের চেয়ে এক মাসে পঞ্চাশ টাকা বেশি লিখল চেকে। পরখ করছে। টাকা সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল—পঞ্চাশ ধর্তব্যের মধ্যেই নয় ব্যাঙ্কওয়ালাদের কাছে।

কয়েকটা মাস বাদ দিয়ে, যা থাকে কপালে—এক-শ টাকা দিল একবার বাড়িয়ে। এজেন্ট পালিত সাহেবের ঘরে দীপকের ডাক পড়ল।

বোসো। কেমন আছ, পড়াশুনা চলছে তো ভাল? বই-টই কিনতে হবে বুঝি

এ-মাসে ?

ব্যস, জবাবটা তিনিই বলে দিলেন। ঘাড় নেড়ে দিয়ে ছুটি।

ফি শনিবারে দীপক হস্টেল থেকে বাড়ি আসে, রবিবার রাত্রে হস্টেলে ফিরে যায়। রমারম খরচ করে, লাটসাহেব হয়ে গেছে যেন হস্টেলে গিয়ে।

রাখী চোখ বড় বড় করে বলে, এত টাকা তোর ছোটদা ?

বড় হয়েছি না ?

বড় একটুও হোস নি, বড়লোক হয়েছিস। সত্যি, এত টাকা কোথায় পাস বল্ ?

বিনোদিনী বলেন, আলাদা দুধ-টুধ খাবার কথা, না-খেয়ে টাকা বাঁচায়। বাড়ি এসে আমাদের জন্যে খরচা করে। খবরদার, মানা করে দিচ্ছি দীপু, খালি-হাতে বাড়ি আসবি। এবার থেকে বাড়ি এসে সিকিপয়সাও খরচা করতে পারবিনে।

বটে! দীপকের আরও রোখ বেড়ে যায়। দধিভাণ্ড যতক্ষণ আছে, খরচ করা কে ঠেকাতে পারে দেখি।

এবারের চেক আরও মোটা। পঞ্চাশ, এক-শ, তারও ডবল—দু'শ টাকা বাড়িয়ে বসে আছে। কলমের খোঁচা বই তো নয়—আরে ভাই—পঞ্চাশ লিখতে যে শ্রম, দু-শ'তে তাই, দু-হাজারেও তাই। আর লিখে দিলেই যখন সেই পরিমাণ নোট খসখস করে হাতে গুণে দেবে—

এজেণ্টের ঘরে ডাক পড়ল। পড়বে জানা কথা—দীপকও তৈরি।

হাসলেন না আজ পালিত, মুখে কুশল-সম্ভাষণও নেই। বললেন, বই কেনা তো হয়ে গেছে—এবারে কী ?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়েছেন, দীপক থতমত খেয়ে গেল। প্রয়োজনের একটা ফর্দ রচনা করেছিল মনে মনে, গুলিয়ে গেল সমস্ত।

পালিত বললেন, অ্যাকাউণ্টে টাকা নেই—ওভারড্রাফট দিতে হবে। নিয়মের বেশি হলেই পার্টিকে হিসাব দিতে হবে, এই রকম চুক্তি। তবে তারা পূরণ করে দেয়।

না, মিথ্যা সে বলতে যাবে না—ঘাড় উঁচু করে দীপক সত্যি জবাব দিয়ে দেয়ঃ আমার মায়ের একটা গরম আলোয়ান দরকার, বোনের একজোড়া স্লিপার। বাড়ি-ভাড়া তিন মাসের বাকি পড়েছে—একটা মাসের ভাড়া অন্তত দিতে হবে।

শুধুমাত্র ডাক্তারি পড়ার জন্য যা লাগে, পার্টি তাই দিতে রাজি। বাড়তি তারা দেবেন না।

দীপক দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, এ-ও ডাক্তারি পড়ার জন্যে। বাড়তি কিছু নয়। ডাক্তারবাবুকে গোড়াতেই সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়েছিলাম—আপনি লিখে দেখতে পারেন বড়দা অধঃপাতে গেছে—এই অবস্থায় মা আর বোনকে ভাসিয়ে নিজে আমি হস্টেলে থেকে রাজার হালে পড়াশুনো করব, এতখানি পাষাণ-মানুষ আমি নই।

পালিত মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে চেক পাস করে দিলেন। বললেন তুমি সত্যি কথা বললে, পার্টির কাছে আমাকেই মিথ্যে খরচ দেখাতে হবে—ডাক্তারি পড়তে যেমন সব খরচা হওয়া সম্ভব। কিন্তু এমনধারা আর কোরো না, পার্টির মতিগতি মোটেই ভাল নয়, চুক্তি ভাঙার ছুতোনাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্যাঙ্কের অবশ্য ভাবনার কিছুই নেই—ডাক্তারবাবু নিজে গ্যারাণ্টর।

গদগদ হয়ে বলে উঠলেন, ধরে নাও গ্যারাণ্টর আমি নিজেই। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, আমার কাছে তা অলঙ্ঘ্য আদেশ। তাঁর উপরে আমি চির-কৃতজ্ঞ, প্রাণদান

দিয়াছিলেন তিনি আমার।

পরের শনিবারে রাখীর স্লিপার নিয়ে গেল। এবং বিনোদিনীর জন্য অলোয়ান। স্লিপার পরে রাখী ঘুরঘুর করে ঘরময় নেচে এলো খানিক। থেমে দাঁড়িয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে পদশোভা দেখতে দেখতে বলে, কী সুন্দর মানিয়েছে—এমন পছন্দ তোর ছোড়দা।

পা দুটো তা বলে স্থির নয়, উঠছে পড়ছে অবিরত। অর্থাৎ নৃত্য আর এক দফা শুরু হয়ে যায় আর কি!

দীপক তাড়া দিয়ে উঠে: থাম্ বলছি রাখী, চুপচাপ বোস—

রাখী অগত্যা পা ঝুলিয়ে তক্তাপোষে বসে পড়ল। বলে, এ জুতো পরে চুপ করে থাকা যায় না, নাচতে ইচ্ছে করে কেবলই।

আট টাকার স্লিপার—ছিঁড়ে এখুনি শতকুটি হয়ে যাবে তোর নাচের ঠেলায়।

হেসে দীপক আবার বলে, আট টাকার জিনিসে নেচে মরছিস আর আটের জায়গায় আটচল্লিশ হলে তো পাগল হয়ে লম্ফঝম্প জুড়ে দিতিস।

তাড়া খেয়ে রাখী কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়েছে। বলে চিরকাল তুই হস্টেল থেকে পড়াশুনো করে যা। পাশ যেন কোন দিন না হোস। চিরকাল ধরে আমার জুতো আসবে।

দীপক বলে, জুতো দমাদম পিঠে পড়বে তোর ইচ্ছে সত্যি সত্যি যদি ফলে যায়।

গণপতি অতিশয় বিচলিত। অনেক ভাড়াটে ভাড়া বন্ধ করেছে কিছু কাল থেকে। মেজতরফ টিপে দিয়েছে, খবর পাওয়া গেল! রানী কে আবার? ছোটরাজা লুচ্চো-মাতাল—কোন এক বস্তির মেয়ে কুড়িয়ে এনেছিল। ঠিকমতো বিয়ে হয়েছিল কিনা, তাতেই সন্দেহ। আর হলেই বা কি। ছেলে বর্তমান থাকতে সম্পত্তি স্ত্রীলোকে অর্শাবে কেন? কুমার অলোকনারায়ণ সাবালক হয়েছেন। তিনিই এখন ছোটরাজা। মালিক তিনি, ভাড়া তাঁকেই দেবে। রাণী মঞ্জুপ্রভার সেরেস্তায় আদায় দিলে বিপদে পড়ে যাবে কিন্তু।

না-দেবার কথা বড় মিষ্ট—পরামর্শ অতএব ভাড়াটারে মনে ধরেছে: কাজ কি বাবু আমাদের অতশত ল্যাঠায়—গণ্ডগোলের ফয়শালা হোক, নামপত্তন হয়ে ছোটরাজা সম্পত্তির দখল নিন, ততদিন বরঞ্চ চেপেচুপে থাকি। ভাড়ার টাকা কাউকে দিচ্ছি নে।

রাজবাড়ির ঠাটবাট নেই-নেই করেও যা আছে, একেবারে তুচ্ছ নয়। পসার-প্রতিপত্তি এইবারে ধ্বসে যাবার অবস্থা। নিষ্ফল আক্রোশে গণপতি গর্জাচ্ছেন—তাঁর পরাজয়, শরিকদের ষোলআনা জিত।

এই অবস্থার মধ্যে একটা গোপন-প্রস্তাব এসেছে। ঝানু কয়েকটা ভাড়াটে বলে পাঠিয়েছে, বকেয়া ভাড়া তারা শোধ করে দেবে, কিন্তু সিকি টাকা বাদ। ধরে নিন, কমিশন দিচ্ছেন। পুরো টাকার রসিদ দিতে হবে সুবিধা মতো পিছনের একটা তারিখ দিয়ে।

দায়ে পড়ে এ জিনিসও আজ বিবেচনার মধ্যে আনতে হচ্ছে। কিন্তু কাগজে-কলমে হওয়া ঠিক নয়, এই জন্যে অক্ষয়ের প্রয়োজন। অক্ষয় চলে যাক—সে গিয়ে দর-কষাকষি করে রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে আসুক। টাকার বড্ড দরকার পড়েছে। ইনকামট্যাক্স কালেকের মধ্যে শোধ না হলে সার্টিফিকেট করবে। সে বড় বিষম ঝামেলা। বাজে-খরচও অনেক বেরিয়ে যায়।

কিন্তু প্রয়োজন বলেই বুঝি অক্ষয়ের পাত্তা নেই একেবারে। গণপতি উৎকণ্ঠায় ঘর-বার করছেন। ডুব মারল কোথায় যে হতভাগা।

সন্ধ্যা উতরে গেছে, হেন কালে অক্ষয় এসে হাজির হল। সঙ্গে আর চারজন। ট্যাক্সি করে এসেছে—জায়গা থাকলে আরও বেশি লোক নিয়ে আসত। হুড়মুড় করে সকলে কাছারি-দালানে ঢুকে পড়ল।

গণপতি খি'চিয়ে উঠেছিলেন—লোকজন দেখে থামলেন। অগ্রবর্তী প্রবীণ লোকটা পরিচয় দিল, 'সোনাঘর' নামক জুয়েলারি-দোকানের মালিক সে। বউবাজারের রীতিমতো বনেদি দোকান 'সোনাঘর'।

বৃত্তান্ত শুনে গণপতি স্তম্ভিত। রানীর নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্য—ছেলে থেকে আরম্ভ করে কেউ আজ আপন নেই দুনিয়ার উপর। সম্পর্ক টানলে এই অক্ষয় তাঁর মামাতো-ভাই। গরিব বলে চাকরি দিয়ে তাকে প্রতিপালন করছেন, প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস করেন। আর ছোকরাও এমন ভাব দেখায়, রানীর আদেশ পেলে নিজ মুণ্ড স্বহস্তে কেটে থালায় সাজিয়ে পদতলে উপঢৌকন দিতে পারে।

এ হেন অক্ষয় চোর। ব্রোচ চুরি করে দোকানে বিক্রি করতে গিয়েছিল। আছে এমনি বিস্তর দোকান চোরাই গয়নার ফলাও কারবার যাদের—'সোনাঘর' সে দলের নয় (গণপতির পাকা গোঁফের ফাঁকে এ অবস্থার মধ্যেও কিঞ্চিৎ হাসি খেলে যায়ঃ কোন্ অবস্থায় পড়ে সদাচারী হয়েছ, অক্ষয়ের কাছে সবিশেষ না শোনা পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না)। নজর ফেলেই মালিকমশায় বুঝেছেন কোন বড় বাড়ির অন্দরবাসিনীর মাল—এই ছে'ড়ালোকের হাত দিয়ে সাচ্চা পথে এমন মাল কদাপি এসে বাজারে পে'ছিয় নি। কিন্তু হলে হবে কি—লোকটা সাংঘাতিক ত্যাদোড়, নামধাম আপসে কিছু বলবে না। এবং লোকজনও বিস্তর জুটে গেছে—আদায় তারা করবেই। শেষটা কোন একজন চেনা লোক বেরিয়ে পড়ল, তারই কাছে রাজবাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। পুলিসে দিই নি—বামাল হুজুরে হাজির করে দিয়ে আমাদের ছুটি। পুলিসে বিচার হয় না ; দু-পাঁচ টাকা ঘুষ ছাড়লেই খালাস দিয়ে দেয়।

(গণপতির ক্ষুদ্র হাসি গোঁফ ভেদ করে প্রসারিত এবার। নামধাম আদায়ের প্রক্রিয়া বেআন্দাজি রকম অধিক হয়ে গেছে। মুখের একটা পাশ ফোলা—বোলতায় কামড়ানোর মতো। এবং কষে রক্তের ছাপা—একটা দুটো দাঁতও নড়ে গেছে সম্ভবত। এই অবস্থায় পুলিসে দিতে গেলে চোরের বদলে মালিকমশাইদেরই দু-পাঁচ টাকা নয়, বিশ-পঞ্চাশ ঘুষ ছাড়তে হবে।)

কী আশ্চর্য ব্যাপার—দোকানের বিবরণে যা পাওয়া গেল, রাজবাড়ির কঠিন ফটক পার হয়ে কাছারি-দালানেও ঠিক ঠিক সেই জিনিস। দু-চার কথা হতে না হতে যেন তারে তারে খবর হয়ে গেল—গয়নাচোর রাজবাড়িতে। দাঁত ভেঙেছে মুখ ফুলে গেছে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ মোটামুটি অটুট এখনো। মরে গিয়েও তো মানুষ পাশ-মোড়া দিয়ে উঠবে এ-হেন মজা দেখবার জন্য।

মেজতরফে জোর আড্ডা চলছিল তখন। আড্ডা ভেঙে হৈ-হৈ করে সবাই ছুটল। খোদ ছোটরাজা অলোকনারায়ণ দলের আগে—তাকে দেখে মাটিতে বন্দুক ঠুকে শিউনারায়ণ অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। অলোক, জেঠতুত-ভাইরা, গঙ্গাধর ও এয়ারবন্ধুগণ—তাদের সঙ্গে বেওয়ারিশ পথের লোকও অনেক। অত বড় কাছারি-দালানে লহমার মধ্যে তিলধারণের জায়গা নেই।

গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ অক্ষয়। রানী মঞ্জুপ্রভা তাকে 'ভাই' 'ভাই' বলে মাথা বিগড়ে দিয়েছেন—লোকজনের উপর, বিশেষ করে শরিকদের উপর কথায় কথায় তেড়ে গিয়ে পড়ে। অক্ষয়ের উপর মেজতরফের ও বড়তরফের প্রচন্ড রাগ। কায়দায় পাওয়া গেল অবশেষে সেই মানুষটাকে—

জেঠতুত-ভাইদের একটি এগিয়ে এসে বলে, দিন তো—জিনিসটা দেখি।

হাতে নিয়ে উত্তেজিত কন্ঠে বলে, ওরে বাবা, আসল কমলহীরে। জ্যোতি বেরুচ্ছে দেখুন না। এই জিনিস পাচার হয়ে যাচ্ছিল। কমসে কম পাঁচ-শ টাকা দাম।

মারগুঁতোন খেয়ে অক্ষয় ঝিম হয়েছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। জুয়েলারি-দোকানের মালিক লোকটার দিকে চোখ পাকিয়ে বলে, কি বলেছিলেন মশায়? হীরেই নয় আদপে, কাচ। দাম পঁচিশ। ফেরতও দিলেন না—পুলিসের ভয় দেখালেন।

চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, একলা, গিয়ে পড়েছিলাম, কি বলব। মার খেয়ে এলাম, চোরও হলাম।

ব্রোচ অলোকের হাতে তখন। নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সে বলে, পাঁচ-শ কি বল মেজদা, পাঁচলক্ষ টাকা এর দাম। আমার মায়ের গায়ের জিনিস—মা পরে বেড়াতেন এই গয়না।

অলোকের মরা-মায়ের গয়না সত্যিই। মঞ্জুপ্রভাকে বিয়ে করে আনলেন—তখন উদয়নারায়ণ সব গয়না তাঁকে দিয়ে দিলেন। শুধু গয়নাই নয় আগের রানীর যত কিছু জিনিসপত্র ছিল, সমস্ত। অলোক একফোঁটা শিশু তখন—এসবের কি জানে, আর কি বোঝে। বড় হলে তাকে গোলকুন্ডা-শিক্ষাসত্রে দেওয়া হল। ছেলে যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি পড়াশুনোয়। ক্ষুরধার মেধা—ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় না কোন পরীক্ষায়। মঞ্জুপ্রভা কোলে তুলে নাচাতেন, চুমোয় চুমোয় অস্থির করতেন। একদিন আয়রনসেফ থেকে গয়নার বাক্স বের করেছেন ব্যাঙ্কের লকারে পাঠাবেন বলে। অলোক এসে দাঁড়াল ড্যাবডেবে চোখ মেলে। বাঁ-হাত বাড়িয়ে আলগোছে রানী তাকে বাঁ-কোলে টেনে নিলেন। আর ডান-পায়ের উপর ফর্দ—ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গয়না বাক্সে তুলে ফেলছেন। এরই মধ্যে একবার ছেলেকে বললেন, তোরই মায়ের জিনিস রে খোকা। আমায় দিয়েছিল—ক'দিনই বা পরতে পারলাম! সাবধান করে রেখে দিচ্ছি। তোর বউ এসে পরবে, গা ভরে আমি সাজিয়ে দেবো।

মেলানো হয়ে গেলে ফর্দও গয়নার বাক্সে ঢুকে গেল। ডান-হাঁটু সম্পূর্ণ খালি তখন। বললেন, ডান-কোলে তোর বউয়ের জায়গা। গয়না পরে গা-মাথা ঝিকঝিক করবে—এইখানটা তাকে বসাব। আর বাঁদিকে তুই তো আছিস বসে। দু-কোলে দু-জন—তখন আর নড়েও তো বসা যাবে না—কাজকর্ম বাবলিই সব করে দেবে।

ছোট ছেলে হয়েও অলোক মায়ের নির্বোধ কথায় হেসে উঠল: মা যেন কী! আমি তখনো বুঝি কোলে বসার মতন থাকব?

থাকবি রে থাকবি। ক'টা বছর বাদেই বিয়ে দেবো তোর। দেরি করতে গিয়ে যদি মরে যাই। তা হলে তো বউ দেখা হবে না আমার।

এমনি কত আবোল-তাবোল বকতেন ছেলে নিয়ে। আজকে অলোক ভিন্ন এক জন। গর্জে উঠল অক্ষয়ের উপর: আমার মায়ের জিনিস চুরি করে বেচতে গিয়েছিলি? বেইমান নিমক-হারাম—

ঠাস-ঠাস করে চড়। অবস্থা গতিকে হয়—নেংটি-ইঁদুরের মতো ছোকরা হাতির সমান পালোয়ানকে মেরে বসল। চতুর্দিকে চেঁচামেচি, গালিগালাজ। তারই মধ্যে

গঙ্গাধর তারস্বরে সতর্ক করে দিচ্ছে: উঁহু উঁহু, মুখের উপরে কেন ছোটরাজা? গায়ের উপর এই এত চিহ্ন করে দিয়েছে—বুঝতে হবে, আনাড়ি হাতের কাজ। ঠেঙানোয় মেজাজ হারাতে নেই, জায়গার হিসাব রাখতে হয়-কোথায় চড়, কোথায় কিল, কোথায় লাথি। জায়গা বুঝে আছে—যত ইচ্ছে মারুন, নিশানা থাকবে না।

কলরবের অবসান সহসা। দরজার মুখ থেকে মানুষ সরে গিয়ে শশব্যস্তে পথ করে দিল। রানী মঞ্জুপ্রভা। প্রৌঢ়ত্ব পেঁৗছে গেছেন কে বলবে—লাবণ্য দেহের উপর উছলে পড়ছে।

রানী বললেন, আমার গয়না। অক্ষয় চুরি করেনি, তাকে দিয়ে আমিই বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম।

সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার অক্ষয়কে দেখে নিয়ে বললেন, এমন বোকা দেখিনি। গয়না যে দায়ে-বেদায়ে বিক্রির জন্য, সে-কথা মুখ ফুটে বলতে লজ্জা! এত লাঞ্ছনার পরেও গোপন করে রেখেছে।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে অক্ষয় অলোকের হাত চেপে ধরল—যে হাতের মুঠোর মধ্যে হীরের ব্রোচ। বলে, গয়না কেন নিয়েছেন? ফেরত দিয়ে দিন—ভালর তরে বলছি।

নিজের বাড়ির উপরে—দলবল চতুর্দিকে ঘিরে আছে—অলোকই বা ভয় পেতে যাবে কেন? সমান দর্পে সে-ও বলে, কী জন্য ফেরত দেবো? আমার মায়ের জিনিস, গয়নার মালিক আমি। আমিই—অন্য কেউ নয়।

মঞ্জুপ্রভার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বলে, বাবার অসুখের মধ্যে কোত্থেকে কে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, যথাসর্বস্ব পাচার করে দিচ্ছে। একটা জিনিস আজ হাতে-নাতে ধরা পড়ল। সেফ আর লকারের চাবি এক্ষুনি আমি পেতে চাই। এই মুহূর্তে। নয়তো পুলিস মোতায়েন করব, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম এনে সমস্ত সিল করে দেবো—উ-হু-হু—

ধ্বক করে অক্ষয়ের দু-চোখে আগুন জ্বলে উঠল, পালোয়ানি মুষ্টির চাপে কব্জির হাড় বুঝি চুরমার হয়ে যায়। মঞ্জুপ্রভার দিকে তাকিয়ে পড়েছে। জীবন দেওয়ার কথা হামেশাই বলে থাকে—স্বল্পশিক্ষিত এরা, উপকারীর কাছে মুখে যা বলে কাজেও ঠিক ঠিক তাই করতে পিছপাও নয়। ইঙ্গিত পেলে হাত ছেড়ে বাঘের মতন ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কর্ত্রীর ও নিজের উপর সকল অপমানের শোধ তুলে নেবে লহমার মধ্যে।

কিন্তু মঞ্জুপ্রভা শান্ত স্বরে বললেন, খোকার হাত ছেড়ে দাও অক্ষয়! সত্যিই ওর মায়ের জিনিস। নিয়ে নিক।

যারা ভিড় করেছে তাদের দিকে চেয়ে রানী বললেন, চলে যান আপনারা, এখানে আর কিছু নেই। অক্ষয় তুমি আমার সঙ্গে এসো—কোথায় কোথায় কেটে গেছে কী হয়েছে, ভাল করে দেখি।

॥ এগারো ॥

মজা শেষ করে আবার সব মেজতরফের আড্ডায় গিয়ে বসেছে। দুই জন কেবল নেই—অলোক আর গঙ্গাধর। অলোককে নিয়ে গঙ্গাধর নিজের বাড়ি এসেছে।

দরজা খুলে দিয়ে রাখী চলে যাচ্ছিল। গঙ্গাধর বলে, যাসনে রাখী, দাঁড়া। ছোটরাজা তোকে একটা জিনিস দিতে এসেছেন।

বলে কাপড়-চোপড় ছাড়তে না কি করতে গঙ্গাধর ভিতরের দিকে চলে গেল।

সুদর্শন একটা কৌটো অলোক রাখীর হাতে দিল। রাখী অবাক হয়ে বলে, গয়না যে দেখছি।

আমার জিনিস—

নিরীহ কণ্ঠে রাখী প্রশ্ন করে: ব্রোচ পরেন বুঝি আপনি?

আমার মা পরতেন। মা মারা গেলে সৎমা কোত্থেকে এসে জেঁকে বসল। কত ঐশ্বর্য যে পাচার হয়ে গেছে! এটিও যাচ্ছিল, কপাল-গুণে উদ্ধার হল। আজকেই—এই ঘণ্টাখানেক আগে।

রাখী বলে, হীরেমুক্তো কখনো দেখিনি—এই বুঝি? এ গয়না অনেক দামী তা হলে—

আরও বেশী দামী আমার মরা-মা পরতেন বলে। চোর-ডাকাত খুনী-গুন্ডা ওদের তাঁবে—অমূল্য জিনিস বাড়িতে রাখতে এক মিনিটও ভরসা পাইনে। হাতে যেমনি এলো, দিতে এসেছি।

রাখীর তো 'বক্কেশ্বরী' বলে নাম—কথা বলতে গিয়ে সেই এক-ফোঁটা বয়সে এমন পাকাপাকা কথা বলত, গোপাল মেয়েকে বক্কেশ্বরী বলে ডাকতেন। ডাকে সাড়া দিয়ে রাখী থপথপ করে চলে আসত। কোথায় কেউ রাখীর সঙ্গে পারবে না। কিন্তু আজ এ কেমন হল—গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকের মধ্যে দুরু-দুরু করছে। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে না-বোঝার ভান করে বলে, আমাদের এই গরিব ঘর—দামী গয়না আমিই বা কোথায় রাখি বলুন।

ঘরে রেখে দিতে কে বলছে, গায়ে পরে বেড়াবে—

গদগদ হয়ে অলোক বলে, মা থাকলে তিনি নিজের হাতে পরিয়ে দিতেন, মা নেই বলে আমি এনেছি। আমার মায়ের জিনিস ছুড়ে ফেলতে পারবে না তুমি কখনো।

সিগারেট ধরিয়ে গঙ্গাধর কখন এসেছে, কেউ দেখেনি। দরজায় দাঁড়িয়ে সে শুনছিল। সহসা উচ্চ-হাসি হেসে ওঠে: বড্ড মুশকিলে ফেলেছে রাখী। ফেলে দিতে পারবিনে, দামী জিনিস যেখানে সেখানে রাখতেও ভয়। সেকেলে প্যাটার্নের বলে যে বিক্রি করে দিবি—মঞ্জুপ্রভার লোক আজকেই সাত-চোরের পিটুনি খেয়েছে। যা গতিক, গায়ে পরে থাকা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখিনে।

জ্যেষ্ঠ ভাই এর মধ্যে এসে পড়ায় রাখী একেবারে চুপ হয়ে গেছে, ঘাড় নিচু করে আঙুলে আঁচল জড়াচ্ছে। লজ্জা দেখে গঙ্গাধর কৌতুক পায়। উচ্চকণ্ঠে বিনোদিনীকে ডাকে: এদিকে এসো একবার মা, কে এসেছে দেখ। রাখীর বড্ড মুশকিল। আমার কথা কানে নিচ্ছে না, কী করবে তুমিই না-হয় বলে দিয়ে যাও।

বিনোদিনী এসে পড়লেন। এক-মুখ হাসি—কর্তা চলে যাওয়ার পর এমন হাসি আর হাসেন নি। সাত রাজার ধন মাণিক হাতের মুঠোয় আপনা-আপনি চলে এলো।

অলোককে বললেন, বোসো বাবা। মিষ্টিমুখ না করে পালিয়ে যাবে না কিন্তু—

দ্রুত চললেন সেই মিষ্টির আয়োজনে। রাখীও পিছু নিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে পুলকিত কণ্ঠে বিনোদিনী তাড়া দিয়ে উঠলেন: তুই কেন আসছিস, তোকে কে ডাকছে রে? যা চলে ওখানে। ঝি এসে গেছে, তাকে দিয়ে সব আনিয়ে নেবো। তোকে ফোপর-দালালি করতে হবে না।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে চা-মিষ্টি খেয়ে বিনোদিনীর পায়ের ধুলো নিয়ে অলোক নারায়ণ বিদায় হল। বুক ঠুকে গঙ্গাধর বলে, গঙ্গা তো তোমাদের গোল্লায়-যাওয়া ছেলে মা। আর দীপক সর্বগুণাধার। এবারে কী বলবে বলো। বলেছিলাম,

এমন পাত্র আনব, সাতজন্ম মাথা খুঁড়েও তোমরা তার কাছ ঘেঁষতে পারবে না। অক্ষরে অক্ষরে তাই মিলিয়ে নাও। অথচ ভাবসাব যত কিছু গোড়ায় তো দীপকের সঙ্গেই, এক-ক্লাসে দুজনে পড়েছে। চেষ্টা সে করেছে কখনো, বলেছে একটি কথা? বয়ে গেছে!

শনিবারে দীপক বাড়ি এসেছে, রাখী তার কাছে যেন উড়ে এসে পড়ল। কলকণ্ঠে বলে, আমি খুব খু-উব ভাল দেখতে। অপরূপ সুন্দরী। সেকালে নুরজাহান-পদ্মিনীরা ছিল, একালে আমি। না রে ছোড়দা?

দীপক ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ঘোড়ার ডিম—

রাখী কিছুতে মানবে না। নাছোড়বান্দা হয়ে বলে, না ছোড়দা, চালাকি করিস নে।

দীপক বলে, আয়না তো আছে ঘরে। নিত্যিদিন মুখ দেখে থাকিস। আরও একবার দেখ্ না হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

একবার কেন, হাজারখানেক বার দেখা হয়ে গেল এই ক'দিনে। নিজের চেহারা নিজে ঠিক বোঝা যায় না।

দীপক বলে, জ্ঞান হওয়া ইস্তক তোকে দেখছি। দেখে দেখে চোখের তারা ক্ষইয়ে ফেললাম। আমি যা বলি, বিনা তর্কেই সেটা মেনে নেওয়া উচিত।

সে তো হতেই পারত। কিন্তু হিংসুটে মানুষ যে তুই—হিংসার বশে মিথ্যে করে বলিস।

মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ হয়ে রাখী আবদারের সুরে বলে, সত্যি কথাটা বল্ আজকে ভাই ছোড়দা। খুব রূপসী আমি—উঁ?

সত্যি কথাই বলছি। সাংঘাতিক কুরূপ কুচ্ছিত। সারা কলকাতার মধ্যে তোর জুড়ি নেই।

রাখী হাততালি দিয়ে উঠল: যাক, খানিকটা তা হলে মিলে গেল। দুই বন্ধু তোরা গোড়ায় বটে উল্টো বলিস, শেষে পেঁছে গিয়ে একই কথা—আমার জুড়ি নেই সারা শহরে। সে অলক বরঞ্চ আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেয়—সারা ভারতে আমার জুড়ি নেই। দুনিয়ার মধ্যেও নেই।

দুড়দাড় করে গিয়ে রাখী ব্রোচ বের করে আনল।

বলে, রূপসী আমি সেটা কেবল মুখের কথা নয়—দেখ্ কী দিয়েছে রূপসীকে। হাতে নেড়েচেড়ে দেখ্। কাচ নয়, হীরে। ও কি রে, চক্ষু একেবারে চড়কগাছ হয়ে গেল। কতবড় রূপসী, বোঝ্, তাহলে। অল্পসল্প রূপে কেউ আসল-হীরে দেয় না।

তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, এই দামের জিনিস নিয়ে কী করি আমি বল্ তো। আকাশ-পাতাল ভেবেও হদিশ পাচ্ছি নে। ফেরত দিতে গেলাম তো তেরিয়া: মায়ের গহনা—মরা মা'কে অপমান করা হয় ফেরত দিলে। বিক্রি করব—ওরে বাবা। এক ভদ্রলোক নাকি বেচতে গিয়েছিল, আগাপাস্তলা তাকে পিটিয়েছে। সেই যে বলে, মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খায় মাথায় রাখলে উকুনে খায়—। বিষম বিপদ হল যে আমার!

দীপক বলে, গায়ে পর্। গয়না নিয়ে মেয়েলোকে যা করে।

তাই তো হত। মরিয়া হয়ে-পরে ফেলতাম, কিন্তু গুচ্ছের হীরেমুক্তো বসিয়ে

রেখেছে—

হীরেমুক্তো পরবি, ভালই তো।

আমরা কি পারি কখনো? দেখেছিস? আমার মা পরে, মামিরা পরে বেড়ায়?

পায় না, সেই জন্যে।

পেলেও পরব না, ঘেন্না!

ভ্রূভঙ্গি করে রাখী বলে, কুকি-সর্দাররা মাথায় পালক করে। তুই পরিসনে—তবে কি বলব, পাস না সেই জন্যে? যাদের যা ফ্যাশান। হীরেমুক্তো পরা আমাদের গরিবদের ফ্যাশান নয়। পরলে লোকে ড্যাবড্যাব করে তাকাবে, হাসি-তামাসা করবে।

আপাতত এই অবধি। পরের দিন দীপক হস্টেলে ফিরে যাচ্ছে—কোন্ দিক দিয়ে চিলের মতন রাখী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ডান-হাত এঁটে ধরেছে।

দেখি না, হাতটা মেলে ধর্—

দীপক বলে, তোর মুঠোয় কী—আগে বল্।

মুঠোর মধ্যে পোকামাকড় নিয়ে ঘুরছি, তাই বুঝি ভেবেছিল?

জোর করে দীপকের হাত টেনে ব্রোচটা দিয়ে দিল: ব্যস, হয়ে গেল তোর জিনিস। যা ভাবনাটা হয়েছিল—

একগাল হেসে বলে, কী করি, কী করি—কাল থেকে ভাবছি। বিক্রি চলবে না, ফেরত চলবে না, এক হতে পারে—দান। আমি তোকে দান করে দিলাম। আমার ছুটি। আমি আর কিচ্ছু জানি নে।

দীপক বলে, বাঃ রে, ব্রোচ আমার বেশ কাজে লাগবে? তোর মতন আমিও দান করে দিই তবে।

চোখ বড় বড় করে রাখী সতর্ক করে: আমায় নয় কিন্তু—খবরদার! তা হলে ফেরত দেওয়া হবে। তোর বন্ধুর মরা-মায়ের অপমান। কী আর করবি ছোড়্-দা, রেখে দে যদ্দিন না ঠিক মতন দানের লোক পাচ্ছিস।

মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে মিটিমিটি হাসে। বলে, তোর বউকে দান করিস। রেখে দে যদ্দিন সে না আসছে।

রাজবাড়ির বউ হবো—আমায় তো আর গরিব-ঘরে আসতে দেবে না। হল-ই বা ভাইয়ের বিয়ে! ভাজের জন্য যৌতুকের গয়না আগেভাগে তোর কাছে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি।

॥ বারো ॥

হাসিখুশি ঠাট্টাতামাশার মধ্যে কাল দীপক হস্টেলে গিয়েছিল। ঠিক দুপুরে হঠাৎ সে বাড়ি এসে হাজির।

গঙ্গাধরের কী সব কাজকর্ম, ব্যাপার-বাণিজ্য—সর্বক্ষণ সে মহাব্যস্ত, খেয়ে দেয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে গেছে। রান্নাঘরের পাট সেরে বিনোদিনীও ঘরে ঢুকে গেছেন।

রাখী দিনমানে ঘুমোয় না, মায়ের ব্লাউজের হাতার উপরে একমনে ফুল তুলছে সুচ আর রঙিন সুতো নিয়ে। চোখ তুলে দেখল দীপক।

বলে, অসময়ে যে ছোড়্দা? ছুটি আছে, না ফ্রেঞ্চ-লিভ নিয়ে নিলি? ফেলে গেছিস বুঝি কিছু? ব্রোচ কাল মা'র কাছে রেখে গেছিস—আজকে আর ছাড়ছি নে।

আচমকা দীপক বলে, জানিস রাখী, তুই আমার বোন নোস, মা আমার মা নয়—

রাখীও সমান সুরে বলে যায়, মা নয়—মাস্টারমশায়। বোন নই—দারোগাসাহেব।

মুখের উপর দৃষ্টি পড়ে স্তম্ভিত হয়। কালকের উল্লসিত উদ্ভাসিত দীপক নয়—যেন মৃত্যু হয়ে গেছে তার, এক প্রেতমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

কেঁদে উঠে রাখী বলে, কী হয়েছে ছোড়দা? খুলে বলু আমায়।

দীপক বলে যাচ্ছে, গোত্র-পরিচয় নেই আমার। কোথায় কোনু নরককুণ্ডে পড়ে ছিলাম, ডাক্তারবাবু কুড়িয়ে এনে তোদের মধ্যে দিলেন।

সজল চোখে রাখী মুখের উপর একটুকু হাসি আনল: বড়ভাই বলে জাঁক করিস ছোড়দা, একটা পাঁচ বছরের ছেলের চেয়েও তুই ছেলেমানুষ। আজব কথা কোথায় শুনলি, কে বলেছে? ঠাট্টা করে কেউ যদি বলেও থাকে, তাই তুই সত্যি ধরে নিবি? চেহারা একদিনে কী হয়ে গেছে, আয়না ধরে দেখু।

সান্ত্বনা কানে নিল না দীপক। প্রশ্ন করে, মা কোথায়?

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ঘরে ঢুকে গেল।

বিনোদিনী ধড়মড় করে উঠে বসলেন: দীপু? শুকনো মুখ—খাসনি বুঝি এখনো?

হাউ-হাউ করে দীপক কেঁদে পড়ল। আকুল কণ্ঠে বলে, আমি তোমার ছেলে নই মা?

আচমকা বজ্রপাত। বিনোদিনীর মুখের সবটুকু রক্ত নিমেষে যেন নিংড়ে শুষে নিল। কথা ফোটে না ক্ষণকাল। অনেক কষ্টে শুষ্ক কণ্ঠে শেষটা বললেন, ওমা সে কী কথা! কে বলেছে?

দীপক বলে, জবাব দাও আগে। সত্যিকার মা নও তুমি—আমি এক গচ্ছিত-রাখা ছেলে। কে আমার মা? বাপ কে? কোথা থেকে এসেছি আমি?

কী পাগলামি দেখ ছেলের। আসবি আবার কোথা থেকে?

জবাব দিতে বিনোদিনীর গলা কেঁপে যায়। সামলে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, আমিই তো মা। আমি ছাড়া আবার কে?

মোক্ষম একটি অস্ত্র আছে, দীপক জানে সেটা। মা-কালীর পট। জীবন্ত জাগ্রত ঠাকরুন লক-লক জিহ্বা মেলে ছবি রূপে দেয়ালে রয়েছেন। বিনোদিনীকে টেনে সে পটের কাছে নিয়ে যায়: হাত দিয়ে ছোঁও মা-কালীকে। ছুচ্ছ কই? হাত সরাচ্ছ কেন? বলো এইবারে, মা তুমি আমার—

পট ছুঁয়ে বিনোদিনী নিঃশব্দ হয়ে আছেন—না-রাম না-গঙ্গা একটি কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে।

দীপক আকুল স্বরে বলে, বলো মা, বলো—

দেবীর পায়ে বিনোদিনী মনে মনে মাথা খোঁড়েন: অপরাধ নিও না মা, আমার এই মিথ্যে কথার জন্যে। সত্যি বললে সর্বনাশ। দীপু আমার পাগল হয়ে যাবে, বিবাগী হয়ে যাবে—বেরিয়ে পড়বে বিবাগী হয়ে। জেনেশুনে মিথ্যে বলছি, মার্জনা করো অন্তর্যামী ঠাকরুন।

দীপক বলে, চুপ করে রইলে যে?

রাখী এসে পড়েছে। মা-র অবস্থা বুঝতে পেরে সে-ও চোখ টিপে প্রাণপণে উৎসাহ দিচ্ছে।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিনোদিনী বললেন, মা-কালীর পা ছুঁয়ে বলি, আমিই

তোর মা। কুলোকে মিথ্যে বলেছে। ওসব তুই কানেও নিসনে বাবা।

বলতে বলতে মধুর তৃপ্তিতে মন ভরে উঠল। দেবী প্রসন্ন, নইলে মিথ্যে বলায় এত বড় আনন্দ কেন, জপতপের মধ্যেও যা কোনদিন পান নি? পট যেন নিঃশব্দ ভাষায় সান্ত্বনা দিচ্ছেন: শুধু গর্ভে ধরেই বুঝি মা হওয়া যায়! তুই-ই দীপুর মা-জননী, একটি কথাও তোর মিথ্যে নয়।

কিন্তু উল্টো ফল। দীপক ক্ষেপে আগুন: মিথ্যেবাদী! জন্ম থেকে আমার সঙ্গে অভিনয় করে আসছ সিনেমা-থিয়েটারে যেমন করে। কেঁদেকেটে এত করে বললাম, সত্যিকথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরুল না।

পকেট থেকে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে দুপুরের খর রৌদ্রে হন হন করে সে বেরুল।

স্তম্ভিত বিনোদিনী। তারপর তিনিও কেঁদে পড়লেন। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মেয়ের উপর: চলে গেল, হাতখানাও ধরতে পারলিনে? নিরম্বু উপোস করে আছে ঠিক—মুখ দেখেই আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আমি আর কী করব, ছুটোছুটির ক্ষমতা আছে আমার? অত বড় ধাড়ি মেয়ে পুতুল হয়ে চুপচাপ রইলি।

রাগ না করে রাখী মা'কে প্রবোধ দেয়: যাবে কোথায় ছোড়দা? কিছু ভেবো না মা। আবার আসবে। আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে কখনো? লম্বা লম্বা বচন—ইঃ, ভারি মাতব্বর হয়ে উঠেছে। তবু যদি ঘটে বুদ্ধি থাকত একটুখানি।

মেজে থেকে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ছে। ডাকের চিঠি। লিখেছেন অন্য কেউ নয়, ডাক্তার ধনঞ্জয় সেন স্বয়ং। তিনি মিথ্যে কথা লিখবেন তো সাচ্চা সত্যবাদী কে আছে দুনিয়ার মধ্যে?

> গোপাল মজুমদার তোমার পিতা নন। যাঁদের মা-ভাই-বোন জেনে আছ, কোন সম্পর্কই নেই তাঁদের সঙ্গে। এখন হস্টেলে রয়েছ, বলতে গেলে আজন্ম তুমি হস্টেলে। হস্টেল-খরচা যিনি দিচ্ছেন, তোমার যাবতীয় খরচ বরাবর তিনিই বহন করে এসেছেন। ইদানীং ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে যান—তখন আমার হাতে দিতেন, আমি গোপালের কাছে পেঁছে দিতাম। গোপাল মারা গেলেন, আমিও দেশ ছেড়েছি। সেই জন্য তোমায় তাড়াতাড়ি হস্টেলে পাঠানো হল। এবং টাকা এখন ব্যাঙ্কের মারফতে হচ্ছে।
>
> গুহ্য কথা এতকাল জানানোর প্রয়োজন হয় নি। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে রোজগারে নামবে পরিবার-প্রতিপালনের জন্যে—একদিন আমায় বলেছিলে। তখন বলতে গিয়েও বলিনি যে গোপালের সংসার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই তোমার। আমি চলে আসার পর বাড়াবাড়ি লাগিয়েছ, খবর পাচ্ছি—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে সংসারে খরচ করছ। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব, তোমার জন্মের সময় থেকে আমার এই প্রতিজ্ঞা। এই শর্তেই দাতা টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। তোমার নিজস্ব প্রয়োজনের বাইরে তাঁর টাকা খরচ হবে, এটা অতিশয় গর্হিত।
>
> হিমালয়ের শান্তিময় কোলে এসেছি—সমস্ত ছেড়েও তোমার দায়িত্ব শুধু ছাড়তে পারিনি। দাতা বরাবর আমায় ভয় করে এসেছেন, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন এখন তিনি। ব্যাঙ্কে ঠিক মতো জমা পড়ছে না, তার জন্যে অবিরত চিঠিপত্র লিখতে হয়। সেই টাকা ভিন্ন ব্যাপারে যাচ্ছে, টের পেলে তিনি মস্ত বড় অজুহাত পেয়ে যাবেন। তা ছাড়া তোমার পক্ষে প্রতারণাও বটে। পড়াশুনো অন্তে টাকা নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে,আবধ স্বাধীনতা তখন তোমার—নিজের রোজগারের টাকা যথেচ্ছ খরচ করো। এখন কদাপি নয়।

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেছে। আরও খানিকটা পরে রাখী ডাকল, মা—

বিনোদিনী পথের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছেড়ে বসেছিলেন। মেয়ের ডাকে সম্বিত হল যেন।

রাখী বলে, ডাক্তারবাবু কখনো মিথ্যে লিখবেন না। বলো মা, তোমার মুখে একটু শুনি।

নিশ্বাস ফেলে বিনোদিনী বললেন, কী আর বলবার আছে! এত কাল পরে ডাক্তারবাবু নিজে ফাঁস করে দিলেন। এক-রত্তি বাচ্চা এনে দিয়েছিলেন—আমার এই একহাতে এত-বড়টা করে তুলেছি। ভেবেছিলাম কোনো দিন কেউ জানতে পারবে না। তিন জন শুধু আমরা জানি—তার মধ্যে উনি চোখ বুজেছেন, ডাক্তারবাবুও হরিদ্বার চলে গেছেন। কেন যে শক্তি-শেল ছুঁড়লেন সেখান থেকে! সংসারধর্ম করেন নি কখনো—ছেলে-পুলে নাড়াচাড়া না করলে মানুষ পাষাণ হয়ে যায়, মায়ামমতা থাকে না।

এমনি বলে যাচ্ছেন বিনোদিনী, দরদর করে চোখের জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

মেয়েকে সতর্ক করে দেন ঃ গঙ্গার কানে যেন না ওঠে, খবরদার! বড্ড অভিমানী ছেলে দীপু—গঙ্গা এই নিয়ে ঢাক পেটাতে থাকলে কোনদিন সে আর এ বাড়ির ছায়া মাড়াবে না।

রাখী ভ্রূভঙ্গি করে বলে, আসবে না আবার! হস্টেলে ঢুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব। সত্যি মা, অবাক হয়ে যাচ্ছি—এতকাল কেটেছে ঘুণাক্ষরে কাউকে কিছু টের পেতে দাও নি। ঘরের মেয়ে আমি সর্বক্ষণ তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছি—আমাকেও না।

বিনোদিনী বলেন, ডাক্তারের মানা ছিল। একবিন্দু জানাজানি হলে চিরকালের মতো তিনি বিগড়ে যেতেন। তার মানে বুঝতে পারিস? দীপু আসবার আগে যে অবস্থায় ছিলাম, আবার তেমনি। সে জিনিস তোরা ভাবতে পারবি নে।

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছে আজও বিনোদিনী শিউরে ওঠেন। শাশুড়ি তখন বেঁচে। কলকাতা থেকে বিস্তর দূরে আজাঙ্গি গাঁয়ের খোড়োঘরে তাঁরা থাকেন—শাশুড়ি, বউ আর দু-বছরের শিশু গঙ্গাধর। গোপাল শহরে ধনঞ্জয়-ডাক্তারের কাজ করেন—কম্পাউন্ডারি অবধি পৌঁছননি তখনো, রাঁধাবাড়া আর সংসার দেখাশুনোর কাজ। মাসান্তে বিনোদিনীর কাছে মনিঅর্ডার যেত—গোনাগণতি সেই কয়েকটা টাকা এবং ক্ষেতের সামান্য ধানে কোনরকমে কায়ক্লেশে দিন কাটত। হঠাৎ কপাল ফিরে গেল। গোপালের উপর ধনঞ্জয় সদ্যোজাত শিশুর ভার দিলেন—নিজের সন্তান বলে চালাতে হবে। শহরের উপর এই বাড়ি ডাক্তারই ভাড়া করে দিলেন—সেই থেকে কলকাতার বাসা।

বারম্বার বিনোদিনী আঁচলে চোখ মোছেন। অশ্রুজল থামে না। বলেন, গোপন রেখেছি বলছিস তুই রাখী—একেবারে ভুলেই ছিলাম যে দীপক পরের ছেলে। গঙ্গা আর তোর থেকে আলাদা চোখে দেখিনি কখনো।

রাখী বলে, মিছে কথা বলছ মা—আলাদা চোখেই দেখতে তাকে। আমাদের চেয়ে দীপুকে তুমি বেশি ভালবাসতে। বড্ড হিংসে হত। বড়দা খোলাখুলি মুখের উপর বলে দিত, আমি মনে মনে ফুঁসে বেড়াতাম।

রাখীও কেঁদে পড়ল ঃ এতদিন যা জেনেছি, সব মিথ্যে হয়ে গেল মা। ছোড়দা

পর-মানুষ। কী রকম করে পথে বেরিয়ে গেল—এত বড় সংসারের মধ্যে কেউ তার আপন নেই।

॥ তেরো ॥

না, আছে বইকি। আপন লোক একটি অন্তত রয়েছেন—জন্ম থেকেই যিনি হস্টেলে-খরচা দিয়ে আসছেন। আগে দিতেন গোপালের বাড়ির হস্টেল-খরচা, এখন মেডিকেল-হস্টেলের খরচা। বিধাতাপুরুষের মতন অলক্ষ্য থেকে তিনি পালন করে যান—অথচ পরিচয় জানে না দীপক, চোখে দেখল না তাঁকে কোন দিন। কে তিনি—বিশাল ধরিত্রীর মাঝে সেই একটিমাত্র আত্মীয়? পুরুষ না মেয়ে, চেহারা কেমন, কোথায় বসতি? কোন এক দৈব ঘটনায় চিনে ফেলে টিপিটিপি গিয়ে পিছন থেকে হঠাৎ দীপক যদি তাঁর হাত চেপে ধরে?

ছুটি এখন কলেজের, হস্টেল প্রায় শূন্য। দীপক চুপচাপ শয্যায় পড়ে থাকে, কখনো বা উদ্‌ভ্রান্তের মতন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে ফিরে ব্যাঙ্কে চলে আসে। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, ঢুকে পড়ে কখনো বা। কাউণ্টারের উপর নজর রাখে। করালী বলেছিল, টাকা যার-তার হাত দিয়ে জমা দেওয়া যায়—নিজেকে আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। আসতেও তো পারেন দাতা-মানুষটি নিজে। নয় তো যে লোক এসেছে তার পিছন পিছন গিয়ে ডিটেকটিভের মতো ঠিকানার হদিস নেওয়া যায়। করালী বলে, জমা ইদানীং পড়ছেই না মোটে—যা ছিল নিঃশেষ হয়ে গিয়ে ওভারড্রাফট চলছে। অতএব আসতেই হবে তাঁকে অচিরে টাকা জমা দিতে—ওভারড্রাফট চিরকাল চলবে না, ব্যাঙ্ক সদাব্রত খুলে বসে নি।

যা রাখী মুখে বলেছিল, ঠিক ঠিক তাই। একদিন সে হস্টেলে এসে হাজির। আসন্ন সন্ধ্যা—যা একটি-দুটি ছেলে হস্টেলে আছে, এ সময়টা কেউ ঘরে বসে থাকে না। কিন্তু দীপক আছে, রাখী ঠিক আন্দাজ করেছে—নিরিবিলি তাকে পাওয়া গেল।

একলা ঘরে খাটের উপর চিত হয়ে দীপক ছাদের শোভা দেখছিল। রাখীকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তুই কেন এসেছিস?

রাখী সহজ ভাবে বলে, তোর কাছে ছোড়দা। কদ্দিন বাড়ি যাসনি, ধরে নিয়ে যাব বলে এসেছি।

দীপক ভেঙে পড়ল : কে আমি ও-বাড়ির? ছোড়দা নই, আমি তোদের কেউ নয়। সে কথা তুই জানিস, মা জানে—

মুখের উপর খপ করে হাত চাপা দিয়ে রাখী বলে, ব্যস ব্যস—শুধু এই দু-জন। অন্য কেউ নয়, দুনিয়ার উপর দুটো মানুষ কেবল জেনে রইল।

পরক্ষণে সংশোধন করে নিল : আরও একজন—ধনঞ্জয়-ডাক্তার। পেলে বুড়োকে একবার দেখে নিতাম। এক-পা অন্তর্জলীতে—চিঠি ছুঁড়ে এতবড় ঘা কেন দিলেন আমাদের সংসারে? কী দোষ করেছি তাঁর কাছে?

একটুখানি চুপ থেকে বলে, সে যাকগে। জানা রইল মোটমাট তিন জনের। বুড়ো ডাক্তার তার মধ্যে হিমালয়ে মহাপ্রস্থানে গেছে—তাঁর জানা না-জানায় কিছু যায়-আসে না।

দীপক বলে, জানে আরও একজন—

সজোরে ঘাড় নেড়ে রাখী বলল, না, একজনও আর নয়। বড়দাকে বলিনি আমরা। কোনো দিন বলব না।

দীপক এক-সুরে বলে যাচ্ছে, আর সেই মানুষটা তো জানে—চিরকাল যে আমার হস্টেলে-খরচা জোগাচ্ছে। না জানলে সে টাকা খরচ করতে যাবে কেন?

কৌতূহলী রাখী বলে, জানতে পেরেছিস মানুষটা কে?

কই আর পারলাম!

সখেদে দীপক ঘাড় নাড়ল: চেষ্টা কত রকম করছি, তবু অজানা রয়ে গেল। ভাগ্যটা দেখ্‌ রাখী—সারা জগতে সত্যিকার সম্বন্ধ একজনের সঙ্গে, তারও কোনো পরিচয় জানি নে। আপন বলে কোনদিন কাছে গিয়ে দাঁড়াব না।

এমনি কথা বেরুল তোর মুখ দিয়ে? ছোড়দা তুই ইতর, তুই ছোটলোক—

ক্ষেপে গেছে রাখী: টাকা ছাড়া আর কী দিয়েছে তোর সেই আপন-মানুষ? জানি জানি, টাকার সঙ্গেই তোর সম্বন্ধ। যখনই জানলি তোর জন্যে অন্য লোকে টাকা দেয়, আমরা সব একেবারে ধুয়ে-মুছে গেলাম। রোস তবে, দেখিয়ে দেবো আমার টাকা। বড়দা নিজে ঘটক, মায়েরও সেই সাধ-ইচ্ছে। অলোক নিত্যিদিন এসে গরুড়পাখির মতন বসে থাকে। শুধু আমার একটা মুখের কথার ওয়াস্তা—

উত্তেজনায় কথা বেরোয় না ক্ষণকাল, সাপের মতন ফোঁস-ফোঁস করছে। বলে, আয়রনসেফের চাবি সৎমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে—সমস্ত গয়না এখন অলোকের দখলে। ব্রোচ দেখেই অবাক হয়েছিলি, বিয়ের পর রাজরানী হয়ে রানীর সাজ সেজে একদিন তোকে দেখিয়ে যাব। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল অবধি গয়না। খান দুই-চার ছুঁড়ে দিয়ে যাব—শর্তে-বাঁধা কয়েকটা টাকার জন্য ব্যাঙ্কে গিয়ে আর হাত পাততে না হয়। টাকায় তোকে কেনা যায়—টাকার জোরে ছোড়দা তোকে কিনে রেখে যাব। তখন নিশ্চয় আপন বলবি, মা-বোন বলে মেনে নিবি আমাদের।

খাটের প্রান্তে বসেছিল, রাগে রাগে উঠে পড়ল। আক্রোশ মিটিয়ে আবার বলে, তুই আর অলোক দুই বন্ধু তোরা হুবহু এক। পাষণ্ড, নৃশংস। এয়ারবন্ধু জুটিয়ে—তার মধ্যে বড়দা'ও ছিল—আর শরিকদের কাছ থেকে সিপাহি-বরকন্দাজ চেয়ে নিয়ে, দিন-দুপুরে চড়াও হয়ে শতেক অপমান করে চাবি ছিনিয়ে নিল। অথচ এত বয়স অবধি 'মা' ডেকে এসেছে সেই মানুষকে। তুইও অবিকল তাই। গর্ভে না ধরলে, যত যা-ই করুক, সেই মা তোরা বাতিল করে দিস।

দীপক বলে ওঠে, গালি দিসনে রাখী, হাতজোড় করছি। সত্যিই আমি অমানুষ।

সজল কণ্ঠ দীপকের। আর আগুনে জল পড়ার মতো রাখীও মুহূর্তে কাতর হয়ে যায়: তোর জন্যে মা অন্নজল ত্যাগ করেছে। জোরজার করে বসিয়ে দিলাম তো দু-গ্রাস মুখে ঠেকিয়ে উঠে পড়ল। দেহ আধখানা হয়ে গেছে—এমনি হলে ক'দিন আর বাঁচবে? বাড়ি চল্‌ একবার ছোড়দা, অন্তত এক লহমার জন্যে। মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আয়—বলে আয়, ছাড়িসনি তুই আমাদের। আমি সেই জন্য এসেছি।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে দীপক বলল, বোস্‌ রাখী—

একছুটে সে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে বলল, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নেই। না বলে বেরুনো মানা, হস্টেল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। চলে যা এখন রাখী। মাকে বলবি, শনিবারে আমি নিশ্চয়ই যাবো।

রাখীর পিছু পিছু ট্রাম-রাস্তা অবধি যাচ্ছে। ধরা-গলায় সহসা বলে, রাখী শোন্‌—

গলা একেবারে নামিয়ে বলল, মাকে বলিস আমারও বড় কান্না পায়।

বলেই মুখ ফিরিয়ে দীপক হনহন করে আবার হস্টেলে ঢুকে পড়ল।

দেহ-মন রাখীর এখন এত হালকা—নাচতে ইচ্ছে যায়। হেঁটে নয়, নেচে নেচেই যেন বাড়ি গিয়ে ঢুকল। শনিবার দীপু বাড়ি আসছে।

শনিবারের আগেই এক কাণ্ড। চেক লিখে নিয়ে দীপক যথারীতি ব্যাংকে গেছে, এজেণ্ট পালিতসাহেবের ঘরে ডাক পড়ল। সেই পয়লা দিনের মতন বাইরের লোক সরিয়ে পালিত দরজা ভেজিয়ে দিলেন। বলেন, হরিদ্বার থেকে ডাক্তার সেন চিঠি দিয়েছেন। একটা জিনিস গচ্ছিত আছে আমাদের কাছে—তোমায় সেটা দিতে লিখেছেন। চিঠির এইখানটা পড়ে দেখ তুমি—

দীপকের একাউণ্টে আদৌ জমা পড়ছে না—এর মূলে অর্থাভাব নিশ্চয়ই। কিন্তু বৃহত্তর কারণ আছে। পার্টি সন্দেহ করেছে, দীপক দীর্ঘকাল আগে মারা গেছে—দীপক নামে যে টাকা নেয়, সে অন্য লোক। এত দূর থেকে চিঠি লিখে টাকা আদায় হবে না, উভয় পক্ষের এবার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ভিন্ন গতি নেই। লেফাফা দীপককে ডেলিভারি দেবেন। ঠিকানা অনুযায়ী সে চলে যাবে সামান্য কিছু প্রমাণ হাতে নিয়ে। পার্টিকেও আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে রাখলাম—

সিল-করা ভারী ওজনের লেফাফা স্ট্রং-রুম থেকে বের করে এনে পালিতসাহেব স্বহস্তে ডেলিভারি দিলেন। ট্যাক্সি নিয়ে দীপক হস্টেলে ছুটল। ছুটি চলছে, হস্টেলে লোকজন সামান্যই। দরজায় খিল এঁটে দুরুদুরু বুকে সে লেফাফা ছিঁড়ে ফেলে। কাগজপত্র সযত্নে ফিতে দিয়ে বাঁধা—উপরে ধনঞ্জয় সেনের একটুকু লেখা দীপকের নামে :

কাগজগুলো তোমার জীবনকাঠি—সতর্কভাবে রেখো। রানী মঞ্জুপ্রভা তোমার গর্ভধারিণী মা—

॥ চোদ্দ ॥

চলুন যাই—বাইশ বছরের অতীতে একটা চক্কর দিয়ে আসি। বিখ্যাত চন্দনা বাইজি শোভাবাজার আলো করে আছে তখন। আলোকের বাপ উদয়নারায়ণের স্বভাবতই সেখানে যাতায়াত। কিঞ্চিৎ গা-ঢাকা দিয়ে গলিঘুঁজি হয়ে যান। এই সময়ে মঞ্জুপ্রভাকে দেখতে পেলেন। দেখে স্তম্ভিত।

গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে হে। খোঁজখবর নাও দিকি।

চর খোঁজ নিয়ে এলো : নজর বটে রাজাবাহাদুরের। এক্স-রে'র মতন ভিতর অবধি সেঁধিয়ে যায়। মেয়েটা পদ্ম, ফুটন্ত শতদল-পদ্ম একটি। আর বাপ গোবরই বটে—একেবারে পচা-গোবর।

আদালতে টাউটগিরি করেন লোকনাথ। এ বাজারে তাতে ডাল-ভাতটাও জোটে না। ভিন্ন কাজকারবার আছে, তাই বাঁচোয়া। ঘুষের দালালি। ঘুষ কে না চায়? কিন্তু সরাসরি হাত পেতে নেওয়া সকলের সাহসে কুলোয় না। বিপজ্জনকও বটে। তার জন্য মধ্যবর্তী চাই একজন। লোকনাথ কমিশনে সেই কর্ম করে থাকেন। সন্ধ্যার পর লোকনাথের গলিটায় দেখতে পাবেন মস্ত এক একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে।

আরও কিছুদিন যায়। বাইজির বাড়ি ঢুকে পড়ার চেয়ে এ-গলি সে-গলি ঘোরাঘুরি করাটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে উদয়নারায়ণের কাছে। পারিষদেরা প্রস্তাব করে, ঘোরাঘুরি অনেক তো হল। পদ্ম এইবার রাজবাড়িতে তুলে হীরেমুক্তোয় মুড়ে

ফেলনুন ছোট-রাজাবাহাদুর।

কিন্তু লোকনাথ ঘড়েল মানুষ, রাজার নামে গদগদ হবার পাত্র নন। সোজা ঘাড় নেড়ে দিলেন ঃ সে কেমন করে হয় ? ছোটরানী যে বর্তমান।

রাজরাজড়ার ঘরে একটা রানী নিয়ে ঘর করেছে, রামসীতা বাদ দিয়ে আর কোথা শুনেছেন ?

লোকনাথ বলেন, ছোটরাজার স্বভাবচরিত্রও তো আমি বাড়ি বসে নিত্যিদিন দেখতে পাই।

গান শুনতে যান বাইজির কাছে। বংশ ধরেই ও'রা গীত-বাদ্যের পৃষ্ঠপোষক।

লোকনাথ রাজি নন, কিন্তু এত বড় প্রস্তাবটা উড়িয়েও দেন না একেবারে। হচ্ছে-হবে করে সময় নিচ্ছেন। ভালই করেছিলেন—পরিণামে দেখা গেল।

মঞ্জুপ্রভা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার ধনঞ্জয় সেন তখন শোভাবাজার অঞ্চলে থাকতেন—লোকনাথের ঐ গলিতেই। ডাক্তারের ডাক পড়ল।

প্রণিধান করে দেখে ধনঞ্জয় উঠলেন। লোকনাথকে বলেন, আসুন—বলতে বলতে যাই।

রাস্তায় পড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন, মেয়ে পোয়াতি— অন্তত তিনমাসের।

লোকনাথ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ঃ অসম্ভব। ভুল হয়েছে আপনার। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ !

ধনঞ্জয় বললেন, ভুল তো হতেই পারে। তবে এত সামান্য ব্যাপারে ভুল করেছি, মনে হয় না। আপনি অন্য ডাক্তার দেখাতে পারেন। তবে আমি বলি, কাজ নেই, জানাজানি হয়ে যেতে পারে। চুপচাপ থেকে লক্ষ্য করুন। অন্য-কিছু করতে যাবেন না, পাশেই থাকি—আমার নজর এড়াতে পারবেন না। ঘোরতর বিপদে পড়বেন।

মাস তিনেক পরে লোকনাথ ঘোষ শুষ্কমুখে এক রাত্রে ডাক্তারের বাড়ি এসে উপস্থিত।

ধনঞ্জয় সবেমাত্র ডাক্তারখানা থেকে ফিরেছেন। প্রশ্নমাত্র না করে বললেন, আসতে হবে—সে তো জানা কথা। আরও আগে আসবেন ভেবেছিলাম। ফল অবশ্য একই—আগে এলেও যা হত, এখনো তাই। আরও মাস তিন-চারের অপেক্ষা।

লোকনাথ বলেন, যা বলেছিলেন ঠিক ঠিক তাই, এখন আর সন্দেহ নেই। কী হবে ডাক্তার বাবু ?

ডাক্তার নিরুদ্বিগ্ন ভাবে সিগারেট ধরালেন।

লোকনাথ হাহাকার করে ওঠেন ঃ কী হবে ?

ছেলে হবে কিংবা মেয়ে হবে, আবার কি !

দয়া করুন ডাক্তারবাবু—

হাত জড়িয়ে ধরলেন লোকনাথ ঃ মঞ্জুর নিচেও তিন মেয়ে। ধনসম্পত্তি না থাকুক, বংশগৌরবের দিক দিয়ে দাক্ষিণ-রাঢ়ী সমাজে আমাদের সমতুল্য খুব কম আছে।

ধনঞ্জয় বললেন, ডাক্তার আমি—হত্যা আমার কাজ নয়, মানুষকে বাঁচিয়ে তোলাই আমার ব্রত।

একটুকু ভ্রূণ—মানুষ তো হয় নি এখনো।

হবে একদিন। হতে পারে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী মানুষ—

লোকনাথ সকাতরে তাকিয়ে আছেন, ডাক্তার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। হঠাৎ উঠে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শেষ-কথা বলা হয়ে গেছে—গর্ভের সন্তান বাঁচবেই। আদালতের মানুষ আপনি, আইনকানুন সবই জানেন—হত্যা করলে জেল-বাস অনিবার্য। তবে সম্ভ্রমহানির কথা যা বললেন—মেয়েদের বিয়েথাওয়ার অসুবিধা—এ সম্বন্ধে আমি ভেবেচিন্তে দেখব। নিশ্চয় দেখব।

কিছু কাল পরে মঞ্জুপ্রভার মাসতুত-বোনের বিয়ে। মাসির এই এক মেয়ে, মঞ্জুরই সমবয়সি—মাসি-মেসো যাবার জন্য বিশেষ করে লিখেছেন। অনুরোধ পড়ে লোকনাথ মেয়ে নিয়ে কুটুম্ববাড়ি গেলেন। বিয়ে অন্তে লোকনাথ ফিরে এসে যথারীতি কাজকর্মে লেগে গেলেন, মঞ্জুকে মাসি ছাড়লেন না কিছুতে। ঘরবাড়ি খালি করে মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি গেছে, মঞ্জু চোখের সামনে ঘুর-ঘুর করলে তবু খানিক সোয়াস্তি পাবেন। মেয়ে-জামাই শিগগিরই তো জোড়ে আসছে—সেই ক'টা দিন থেকে যাক অন্তত।

মিছে কথা, প্রতিবেশীদের লোকনাথ ভাঁওতা দিয়েছেন। আসলে মঞ্জুপ্রভা খুলনায় আছেন—সেখানকার এক নার্সিং-হোমে। খুলনার নিকটবর্তী সেনহাটির সুবিখ্যাত সেনবংশের সন্তান ধনঞ্জয়। খুলনায় তাঁর অগুণতি আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব। সবে পাকিস্তান হয়েছে, পাশপোর্ট-ভিসার চল হয়নি তখনো। কলকাতা থেকে খুলনা ঘন্টা কয়েকের পথ। হপ্তায় হপ্তায় ধনঞ্জয় দেশঘরে যান।

নার্সিং-হোমে মঞ্জুপ্রভার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল—সেই ছেলে দীপক।

লোকনাথ বললেন, ছেলে তো হল ডাক্তারবাবু—এবার?

মানুষ করব। শেষ করেই দিতেন আপনারা, সে বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছিলেন। আমার ভয়ে শেষটা পিছিয়ে গেলেন। বাঁচিয়ে রেখেছি যখন আমি, যাতে মানুষের মতন মানুষ হয় সে দায়ও আমায় নিতে হবে।

লোকনাথ করজোড়ে বলেন, বাচ্চা কিন্তু আমার বাড়ি তোলবার আদেশ করবেন না। লোকলজ্জায় তা হলে গলায় দড়ি দিতে হবে।

ডাক্তার অভয় দিলেন। তারপরেই গোপালের বাসা হল, রান্নাবান্নার কাজ থেকে গোপালের কম্পাউন্ডারিতে প্রমোশন।

ধনঞ্জয়কে মঞ্জুপ্রভা জেঠাবাবু বলছেন তখন থেকেই: আমি কি করব জেঠাবাবু, বলে দিন।

বিয়েথাওয়া করো—আবার কি! মনের গ্লানি কেটে ক্রমশ আর দশজনের মতো হয়ে যাবে। বাচ্চার বাপের পরিচয় বলো আমায়, সেখানে ঘটকালি করতে চলে যাই। আপসে রাজি না হয় তো দশের মুকাবেলা শয়তানটাকে কানে ধরে বরাসনে বসাব।

মঞ্জুপ্রভা কিছুতে পরিচয় বললেন না। উঁচু বংশের ভাল ছেলে—নাকি মাস তিনেক আগে মারা গেছে। পরিচয় বলে দিয়ে কলঙ্ক বাড়ানো শুধু। দোষ তার একলার নয় জেঠাবাবু, আমারও আছে। আমারই বরঞ্চ বেশি। মরা-মানুষকে শাস্তি দিয়ে কী লাভ?

হয়তো বা মিছে কথা—সে মানুষ জীবন্ত আজও, মঞ্জুপ্রভা ইচ্ছে করেই নাম করলেন না। ধনঞ্জয় এক-কথায় মেনে নিয়ে বললেন, তবে তো আরও ভাল—বিধবা তুমি এক হিসাবে। স্লেটের লেখার মতো পিছনটা মুছে ফেলে বিয়ে করে ফেল। আগের বার মন্ত্র পড়া বাদ গিয়েছিল, এবারে ষোলআনা নিয়ম মাফিক—কোন অঙ্গে খুঁত থাকবে না।

উদয়নারায়ণের বিবাহিত স্ত্রী ইতিমধ্যে দেহরক্ষা করে ছোটরানীর পালঙ্ক-শয্যা

খালি করে গেছেন, সেদিক দিয়েও বাধা নেই। বিয়ের হৈ-চৈ কিছু হল না—মঞ্জুপ্রভা ছোটরানী হয়ে টিপিটিপি রাজবাড়ি উঠে পড়লেন।

বিয়ের সময়টাও উদয়নারায়ণ নানা রোগে ভুগছেন। দেহের উপর বেপরোয়া অত্যাচার হয়েছে, তারই ফল ফলতে লেগেছে। বছর দুয়েকের মধ্যে একেবারে শয্যাশায়ী। রাজবাড়ির বাঁধা ডাক্তারদের চিকিৎসায় ছিলেন। তাঁদের জেদ করে সরিয়ে দিয়ে মঞ্জুপ্রভা ধনঞ্জয়-ডাক্তারের উপর রোগির ভার দিলেন। তখন প্রায় শেষ অবস্থা, ডাক্তারের কিছু করবার নেই।

রানীকে একদিন নিভৃতে নিয়ে ধনঞ্জয় খুব ভর্ৎসনা করলেন: এই ছাড়া পাত্র ছিল না? ছি-ছি! কেন তুমি হতে দিলে, কেন লোকনাথবাবুকে ঠেকাও নি?

মঞ্জুপ্রভা জবাব দিলেন: আমিই বা কী এমন সতীলক্ষ্মী। আমার উপযুক্ত পাত্র এই—

কিন্তু এই কুৎসিত ব্যাধি—সঠিক অবস্থা আগেভাগে অবশ্য জানবার কথা নয়, কিন্তু আন্দাজ করা যেত।

মঞ্জুপ্রভা বলেছিলেন, জানলেও বাধা দিতাম না জেঠাবাবু। এ ব্যাধি আমি তো বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করি। স্বামীত্বের অধিকার খাটাতে পারল না মানুষটা—অথচ রাজরানী নাম পেলাম, টাকাকড়ি রাজ্যপাট হীরেমুক্তো সমস্ত হল। না হলে প্রায়শ্চিত্তের টাকা হপ্তায় হপ্তায় আপনাকে যোগান দিতাম কেমন করে?

বলতে বলতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন মঞ্জুপ্রভা। মুখের উপর আলোর দ্যুতি—ডাক্তার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন।

বলেন, বিয়ে নিয়ে একটুও ক্ষোভ নেই জেঠাবাবু। স্বামী না-ই হল, ছেলে পেয়ে গেছি আমি। আমার এই অলোক। যাকে আপনি কোল থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন—কোথায় নিয়ে রাখলেন, বেঁচে আছে না মারা গেছে, কিছুই আর ভাবনা করিনে। টাকা চাচ্ছেন, দিয়ে যাচ্ছি। যদ্দিন পারি দিয়ে যাব। কিন্তু অলোক চিরকাল আমার বুক জুড়ে থাক।

মুখে এমনি সব বলেন, আর শিশু অলোককে নিয়ে কী করছেন আর কী না করছেন! কখনো কোলে কখনো কাঁধে কখনো বা মাথায়। স্বামীর আসন্ন মৃত্যু বিস্মরণ হয়ে একফোঁটা ছেলে নিয়ে আত্মহারা।

॥ পনের ॥

ছুটি চলছে, হস্টেল নির্জন, তবু দীপক ঘরের খিল-ছিটকিনি সবগুলো এঁটে দিয়েছে। জোর আলো জেলে কাগজপত্র একটি একটি করে লাইন ধরে ধরে পড়ল। জন্মের তাবৎ ইতিহাস। এবং তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ—বার্থ-সার্টিফিকেট, চিঠিপত্র, যে ডাক্তার ও নার্সরা ডেলিভারির ব্যাপারে ছিল তাদের প্রতিজনের জবানবন্দি, নার্সিং-হোমের খাতাপত্র থেকে প্রয়োজনীয় অনুলিপি। কী যে নেই, তা জানি নে। প্রতিপক্ষ যেন দুঁদে ব্যারিস্টার, তার মুখ বন্ধ করবার জন্য ডাক্তারবাবু ভেবে ভেবে অকাট্য জবাব বানিয়ে রেখেছেন।

অলোককে নিয়ে কত প্রত্যাশা করেছিলে মা, সমস্ত সে ভেঙে দিয়ে গেছে। কিন্তু অবহেলার আর যে একটি ছেলে আছে, সে-ই আজ গিয়ে তোমার চোখ মুছিয়ে দেবে।

রাজবাড়ি, ছোটতরফ—পাঁচিল তুলে যেখানে গণপতি ছোট-খাট এক দুর্গ বানিয়ে রেখেছেন। মধ্যাহ্ন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ফটকের পাহারাদার শিউনন্দন—বন্দুক রেখে

আপাতত সে রোটি পাকানোয় ব্যস্ত।

সরাসরি দীপক ঢুকে পড়ল। কাছারি-দালান শূন্য, বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে।

কে ওখানে?

বাপ রে, কী বাজখাঁই গলা! অক্ষয়—আবার কে? দূর থেকে যেন এক বিশ-মনি মুগুর ছুড়ে মারল: কে তুমি, কী চাও?

দীপক বলে, রানী-মার সঙ্গে দেখা করব।

যার-তার সঙ্গে তিনি দেখা করেন না। নাম কি তোমার?

নাম বললে চিনবেন না।

অক্ষয় আগুন হল: রানী কি সামান্য লোক, যে অজানা অচেনা লোক এসে দাঁড়াবে আর তরতর করে তিনি নেমে আসবেন। চলে যাও ছোকরা, দিকদারি কোরো না—

নড়ে না দেখে হাঁক পেড়ে উঠল: কোথায় থাকো শিউনন্দন? যে-না-সেই হুট করে ঢুকে পড়ে—

দীপকের রাগ হয় না, দেমাকে বরঞ্চ বুক ভরে যায়। আমার মা রাজরানী—আজেবাজে আর দশটা মায়ের মতন নয়, যে মুখের কথা ছাড়লেই অমনি দেখা দেবেন। কিন্তু জো-সো করে যাক দেখা একটিবার—তখন বুঝবে মানুষটা আমি কে। কতদূর খাতির আমার। রানী-দর্শন যত দুর্লভই হোক, আমি মায়ের গায়ে গায়ে গড়াব।

মুখ তুলে দৃপ্তকণ্ঠে দীপক বলে, দেখা আমি করবই। আমার দরকার। দরকার আপনাদের রানীরও।

কথা শুনে আর মুখ দেখে অক্ষয় থতমত খেয়ে যায়। দীপক আবার বলে, আমায় নামে চিনবেন না—ডাক্তার ধনঞ্জয় সেন হরিদ্বারে আছেন, তার নাম করুনগে আপনি। তাঁর চিঠির কথায় এসেছি।

অক্ষয় ভিতরে চলে গেল। দীপক দাঁড়িয়েই আছে। ভৃত্য ঝাড়পোঁছ করছিল, করুণা হল বুঝি। বারাণ্ডার বেঞ্চিটা দেখিয়ে দেয়: কতক্ষণ এমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, বোসো গিয়ে ওখানটা।

চাকর-বাকর বসার বেঞ্চি। বসি তো এখন—এর পর কোথায় নিয়ে বসাবে, চক্ষু মেলে দেখো সর্বজনা।

সেই ক্ষণ এসে পড়েছে। বাবলি এসে ডাকে, চলে এসো—

উপরতলায় বড় হল-ঘর। ঝকঝকে তকতকে। দেয়াল-জোড়া বিশাল আয়না—মেঝেতেই তো মুখ দেখা যায়, দেয়ালের আয়না লাগে কিসে?'

মুখ তুলে হঠাৎ দেখে মা এসে গেছেন—রানী মঞ্জুপ্রভা। একদিন মাত্র এক ঝলক দেখা—গোলকুন্ডা-শিক্ষাসত্রে গিয়েছিলেন মা অলোকের সঙ্গে এক-গাড়িতে অলোককে নামিয়ে দিয়ে মা চলে গেলেন। আসল-মা কিন্তু দীপকেরই, অলোকের সৎ-মা। সাদামাটা হিসাবেও মায়ের বয়স কম পক্ষে চল্লিশ। চোখে দেখে কিন্তু যে-না-সেই বলবে, মিছে কথা—উনি তো প্রায় দীপুরই বয়সি। হাসি-মাখা মুখ—দেবী-প্রতিমার মতন ঐ মুখ গড়বার সময় বিধাতাপুরুষ হাসিও মাখিয়ে দিয়েছিল একসঙ্গে। খুলনায় ধনঞ্জয়-ডাক্তার কোল থেকে সন্তান নিয়ে নিলেন—সেই থেকে মা তার জন্যে হাপুস নয়নে কতই না কেঁদেছেন—কাগজপত্র পড়ার পরে সারাক্ষণ দীপক এই সমস্ত ভেবেছে। কিন্তু এ মা বুঝি কাঁদতে পারে না—বুকের ভিতরটা আছাড়িপিছাড়ি খেলেও চোখ

দুটো কাঁদবে না।

মঞ্জুপ্রভা বললেন, কী চাই তোমার? কে তুমি?

আপনার ছেলে আমি—

বলো কি গো, আমার ছেলে?

চোখ বড়-বড় করে মঞ্জুপ্রভা কৌতুককণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমি কই ছেলে তো চিনি নে—কোনো জন্মে দেখিনি। কোত্থেকে এলে তুমি, কেমন করে ছেলে হলে?

বাবলির দিকে চেয়ে মন্তব্য করেন: মাথায় ছিট আছে। গোটা-পাঁচেক টাকা দিয়ে বিদেয় করে দে।

ঝনাৎ করে আলমারির চাবি ছুঁড়ে দিলেন। বাবলি বুঝি টাকা আনতেই চলে গেল।

দীপক ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে, খুলনা শহরে জন্মেছিলাম আমি। সেখানকার এক নার্সিং-হোমে—দেখুন তো, মনে পড়ে কি না?

তাই নাকি?

অমায়িক হাসি হেসে মঞ্জুপ্রভা উড়িয়ে দিলেন একেবারে: খুলনা আমি চোখেই দেখিনি। পাকিস্তান হয়ে গেছে—ভবিষ্যতেও যে দেখব, সে উপায় নেই।

চলে যাবার জন্য তিনিও বুঝি পা বাড়িয়েছেন, ক্রুদ্ধ দীপক গর্জন করে ওঠে: এত সহজে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তুমি আমার মা—। জলের মতো প্রমাণ করে দেবো। আমি তৈরি হয়ে এসেছি।

বটে, বটে!

ভাবখানা, যেন আজব কথা শুনে রানী বড় কৌতুক পাচ্ছেন: কী রকম তৈরি হয়েছ শুনি। কী আছে তোমার প্রমাণ?

পাহাড়-প্রমাণ কাগজপত্র। টেনে আনা সহজ নয়। আনলে বিপদও ঘটতে পারে, ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন। আমি কিন্তু সে-কথা বিশ্বাস করিনি। কিছুই আনব না, একবার ভেবেছিলাম—মুখের কথা নিয়ে দাঁড়াব। গৃহস্থ-ঘরের আর-দশটি মায়ের মতন হলে তাই চলত। ছেলের পরিচয়ে দাঁড়ালেই হল—পরিচয় মিথ্যে হলেও সেসব মায়ের কোলছাড়া হতে হয় না। কিন্তু তুমি হলে রাজরানী—খালি-হাতে এসে খাতির পাওয়া যায় না, কিছু অন্তত ভেট লাগে।

বলতে বলতে পকেট থেকে চিঠি বের করে মেলে ধরল: তোমার নিজের হাতের চিঠি মা-জননী। বাইশ বছর আগে ধনঞ্জয় সেনকে লিখেছিলে খুলনা থেকে। চেয়ে দেখ।

দেখি, দেখি—

হাত বাড়িয়ে মঞ্জুপ্রভা কেড়ে নিতে যান। পাঁকালমাছের মতন পিছলে গিয়ে দীপক বলে: পারবে না মা। ফুটবল-মাঠেও কেউ আমার সঙ্গে পারে না—সকলের পা থেকে বল কাটান দিয়ে দুম করে গোলে মেরে দিই।

জাল চিঠি—

দীপক বলে যাচ্ছে, একখানা চিঠি গেলেই বা কি, আরও কত আছে। বার্থ-সার্টিফিকেট, নার্সিং-হোমের পুরানো কাগজপত্র, নার্সের জবানবন্দি—ক'টা কাড়বে মা-জননী? আজকের এই দিনটা ডাক্তারবাবু সেই কত কাল আগে যেন চোখে দেখতে পেয়েছিলেন। প্রমাণে এতটুকু খুঁত রাখেন নি।

বাবলি এতক্ষণে ফিরল টাকা নিয়ে। তাকে দেখে রানী সাহস পেলেন যেন। বলেন, যেমন ভেবেছিলাম তা নয় রে বাবলি—পাগল নয়, শয়তান। সাহসটা দেখ,

বাড়ির মধ্যে ব্লাকমেইল করতে ঢুকেছে। মেজতরফের চক্রান্ত, সে আর দেখতে হবে না—জাল চিঠি বানিয়ে তারাই পাঠিয়েছে।

দীপক খলখল করে হেসে উঠলঃ আজকে আসি মা। চিঠি জাল কি আসল, ভেবেচিন্তে বিচার করো কয়েকটা দিন। আবার এসে জেনে যাব। মেজ-রাজাদের কথা মনে করিয়ে দিলে, ভালই হল, তোমার একলার বিচারে যদি না হয় ওঁরা সকলে মিলে জেনে-বুঝে বিচার করে দেবেন। রকমারি মাল আমার ভাণ্ডারে—একে একে সব বেরিয়ে আসবে।

বেরিয়ে পড়ল সে ঘর থেকে। মঞ্জুপ্রভাও পিছু-পিছু ছুটলেন। আলুথালু বেশে পাগল হয়ে ছুটছেন। বাবলিকে বলেন ধর, যেতে দিস না ওকে, চিঠি কেড়ে নে। অক্ষয়কে ডাকছেনঃ গেলে কোথা অক্ষয়? বাড়ি বয়ে যাচ্ছে-তাই অপমান করে যায়—কেউ কোন-খানে নেই আমার? ধরো, হাত-পা বেঁধে গুমটিঘরে চালান দাও—

কোন্ দিক দিয়ে ছুটে এসে অক্ষয় সিঁড়ির মুখ আটকাল। পারে না, পাশ কাটিয়ে দীপক তরতর করে নেমে গেল। কাছারি-দালানের দিকে না গিয়ে এক লাফে উঠানের উপর।

মাতালের মতন টলতে টলতে এসে মঞ্জুপ্রভা উপরের বারান্দা থেকে চেঁচাচ্ছেনঃ আটক করো শিউনন্দন, যেতে দিও না। ফটক বন্ধ করে দাও। আমায় অপমান করে পালাচ্ছে।

দীপক ফটকে এসে পড়েছে ততক্ষণে—

দুম করে গুলি।

॥ ষোল ॥

গুলি চলে গেল কানের পাশ দিয়ে। খুব রক্ষে হয়েছে।

দীপক ফটক পেরিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে পড়ল। বড়রাস্তায় পড়েছে।

এবার কি হবে গর্ভধারিণী-মা আমার? কে কী করতে পারে এখন?

রাজবাড়ির দিকে মুখ তুলে দীপক দু-হাতের বুড়োআঙুল আন্দোলিত করে পথের পাগলের মতন হাসে। আর বিড়বিড় করে বলে, কলা খাও রাজরানী-মা, এই কলা—এই কলা! গর্ভে আসা থেকেই তোমার চেষ্টার কসুর নেই—তখন পারোনি ধনঞ্জয়-ডাক্তারের শাসানিতে। ভূমিষ্ঠ হয়ে মাতৃক্রোড়ে গোনাগণতি তিরিশটা দিন—ডাক্তার-নার্স তক্কে-তক্কে ছিল বলে সে সুযোগটাও পিছলে গেল। ধনঞ্জয়-ডাক্তার নিয়ে গিয়ে এই বাইশটা বছর কোন হদিশ পেতে দেননি তোমার চেলাচামুণ্ডাদের। আজকে প্রথম আমার মা-দেখা। আসল-মা দেখলাম আজ জীবনে—বিনোদিনীর মতন ভুয়ো-মা নয়। তোমার দুর্গের ভিতরে ঢুকে একেবারেই তো গায়ের উপর পড়েছিলাম মা-জননী—আজকেই বা ছোবল মারতে পারলে কই?

দুপুরবেলার ঘটনা। তারপর বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা—বেশ ঘোর হয়েছে।

বিশীর্ণ মুখ দীপকের, চোখের কোণে কালি। একটা বেলার মধ্যেই যুগযুগান্ত কেটে গেছে। কত বছর ধরে যেন কাল-রোগে ভুগছে। থপ-থপ করে সে বাড়ি এসে উপস্থিত। গোপাল-কম্পাউণ্ডারের বাড়ি—ধনঞ্জয়-ডাক্তার ভাড়া করেছিলেন দীপককে এনে রাখবার জন্য। গোপালের বাড়ি নয় এখন আর, দীপকও বিদায় হয়ে গেছে। গঙ্গাধরের বাড়ি—তাই এখন বলতে হবে।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ গঙ্গাধর। বাড়ি প্রায়ই থাকে না, যেটুকু সময় থাকে ইয়ারবন্ধু নিয়ে

বাইরের-ঘরে আড্ডা জমায়। রমারম টাকা খরচ করে, এ বাড়িতে এত খরচ কেউ দেখেনি। কিন্তু রোজগারটা কিসের, সঠিক বলবার উপায় নেই। নাকি ব্যবসা-বাণিজ্য করে। বাণিজ্যটা কিসের হে? নাকি অনেক রকমের—আপনারই বা এত জেরার দরকার কি মশাই?

দীপকের ঘর রাখী এখন দখল করে আছে। পা টিপে টিপে দীপক ঢুকল। কেউ নেই, আলো নেভানো।

অনতিপরে রাখী এসে পড়ে।

কে রে? আরে, ছোড়দা তুই? চুপচাপ কেন এমন? চমকে গিয়েছিলাম, চেঁচাতাম আর একটু হলে। শনিবারে আসবি বলে দিয়েছিস, আগেই এসে গেলি। মা তো বাড়ি নেই। চক্কোত্তিদের আভার পাকা-দেখা আজ, মাকে ধরে নিয়ে গেল। খবর দিইগে, তোর কথা শুনে ছুটে চলে আসবে।

একটানা বলে যাচ্ছে। বলতে বলতে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এক মুহূর্ত। বলে, তুই একটা পাগল। ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিস—কী হয়েছে শুনি? আমার তো ভাল লাগছে। ভীষণ ভাল লাগছে।

বেদনার্ত দৃষ্টি তুলে দীপক বলে, কী ভাল লাগছে রাখী?

মায়ের বাবার ছেলে নোস তুই, আমার ভাই নোস। এবাড়ির আপন-কেউ নোস তুই। যত ভাবি, স্ফূর্তি লেগে যায় মনে। স্ফূর্তিতে নাচতে ইচ্ছে করে।

স্ফূর্তি সংযত করে বলে, খাসা এক মতলব এসেছে। বলি?

মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের ভঙ্গি করে রাখী বলল, ওরে বাবা! বলব না—তুই মেরে বসবি। বয়স হয়েছে আমার, কুড়ি পুরে গেল, মহিলা দস্তুরমতো—কচি খুকিটি নই। চড়চাপড় কি ভাল? অভয় দিস তো খুলে বলি আমার মতলবটা। আর সাহস দিস তো তোর-দেওয়া সেই শ্লিপার ছুঁড়ে মেরে আসি অলোকের মুখে।

এত বলছে—কিছুতে হাসি ফোটানো যায় না দীপকের মুখে, একটা পালটা জবাব আদায় করা যায়না মুখ থেকে। গম্ভীর মুখ থমথম করছে। ফিতেয়-বাঁধা কাগজের বাণ্ডিল বের করল দীপক কোটের পকেট থেকে।

ভাবভঙ্গিতে রাখী ভয় পেয়ে যায়। বলে, কী ওসব?

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে সব ফিরিস্ত করে দিয়েছেন। মৃত্যুবাণ সাজিয়ে রেখেছেন। চোখ বুলিয়ে দেখ্। বলে দে, কী করব আমি। মাথায় কিছু আসছে না।

বাণ্ডিল খুলে নিয়ে রাখী পড়তে লাগল।

দীপক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে, আজ আমার বড্ড শুভদিন রাখী, মাতৃদর্শন হয়ে গেল। নির্ভেজাল আসল-মা আমার—এত দিনের জাল-মা নয়। গর্ভে আসা ইস্তক চেষ্টা করে আসছে, নিজের কোটে পেয়ে মা আজ শেষ করে দিচ্ছিল। অদৃষ্ট ভাল, অল্পের জন্য বেঁচে এসেছি। অলোক বলত, শিউনন্দনের কখনো তাক ফসকায় না। আমারই বেলা ফসকে গেল। এর পরে কী করব, বলে দে আমায়। মাথা একেবারে ফোঁপরা, কোন-কিছু ভেবে পাচ্ছিনে। তোকে সেই জন্য জিজ্ঞাসা করছি। ডাক্তারবাবুকেও চিঠি দিয়েছি: কী করব, জানিয়ে দিন আমায়।

মাঝে দুটো রাত গেছে। তৃতীয় রাত্রি। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে মানুষ-চলাচলের আওয়াজ।

কে?

টর্চ পড়ল দীপকের মুখের উপর। ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন বুকে রিভলভার ধরল : টুঁ শব্দ করেছিস কি সঙ্গে সঙ্গে খতম—

কারা এসেছে, বুঝতে কিছু বাকি নেই। কী উদ্দেশ্যে এসেছে, তা-ও জানে। দীপকের তখন অদ্ভুত এক মনের অবস্থা। ভয় তিলেক মাত্র নয়, বিষম হাসি পাচ্ছে।

বলে, কী আছে যে নিতে এসেছ? ক'টি টাকা মাসিক বরাদ্দ, তা-ও তো এবারে পেলাম না।

টাকাকড়ি কে চায়?

দীপক বলে, হাতঘড়ি আছে, ফাউন্টেনপেন আছে—ও দুটো নিয়ে নাও। কাপড়চোপড়ে ইচ্ছে থাকে তো তা-ও নিতে পার। নিয়েথুয়ে চলে যাও ভাই, আমি ঘুমোব।

আরে মোলো! ছ্যাঁচড়া-চোর ভেবেছ আমাদের—

টর্চের আলো ঘরের এদিক-সেদিক ফেলছে। বলে, চাবি দাও—বাক্স খুলব।

তড়াক করে উঠে দীপক নিজেই বাক্স খুলে দিল। ফিরে আবার খাটে এসে বসেছে। রিভলবার এতক্ষণ সামনে ধরা ছিল—পিছন দিকে নিয়ে পিঠে তাক করল।

চোখ মিটমিট করে দীপক দেখছে। কোন্ বস্তু খোঁজাখুঁজি করছে, ভাল মতন জানা আছে। শুধু জানে না, কোন্ কৌশলে ঘরে ঢুকে পড়েছে ওরা। তা সে যা-ই হোক, কার্যসিদ্ধি বটে তো। বাক্সের ভিতরে কাজজের বাণ্ডিল—ফিতে বেঁধে এক জায়গায় রাখা ছিল। কাগজপত্র বগলদাবায় করে হাসিস্ফূর্তির অবধি নেই। দীপকের পিঠে রিভলবার, উল্টোমুখ করে সে আছে। তা হলেও আন্দাজ হচ্ছে, একপাক ওরা নেচেও নিল বুঝি উল্লাসের চোটে।

রিভলভার-ধরা লোকটা বলল, যাচ্ছি। চেঁচামেচি করবে তো বলো, একেবারে শেষ করে দিয়ে যাই।

দীপক বলে, কিছুই করব না, কথা দিচ্ছি। চলে যাও তোমরা, শুয়ে পড়ি।

কলিকালে কথার আবার দাম। রিভলভার ধরে আছি তাই ভালমানুষ। সরালেই অমনি নিজমূর্তি ধরবে।

একটুখানি ভাবল। বলে, কলিকালে কথায় যে বিশ্বাস করে সে হল পয়লা-নম্বরি আহাম্মক। উঠে পড়ো তুমি—আগে আগে চলো। রিভলভার উঁচিয়ে আমি পিছনে রয়েছি।

আড়ামোড়া ভেঙে অগত্যা দীপক উঠে পড়ল : বিশ্বাস করবে না তো চলো। ঘুমের দফাটি শেষ করে দিলে আজ রাত্রের মতো।

বারান্দায় বেরুল। কৃষ্ণপক্ষ, আকাশে তারার মালা। আগের মানুষ তিনজন সরে পড়েছে বমাল নিয়ে। আর পিছনের জন—মুখ ঘোরাবার জো নেই তো, দেবে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপে। থপথপ থপথপ চমান মাপের পা ফেলে সিঁড়ির পানে চলেছে।

একটা বাঁক ঘুরতে—হঠাৎ দীপককে দুর্জয় সাহস পেয়ে বসল। দেখিই না চেয়ে। চেঁচালে গুলি করবে—কিন্তু মুখ ফেরালেও গুলি, এমন তো কোন চুক্তি নেই—

হরি, হরি! পিছনের মানুষটাও উবে গেছে ইতিমধ্যে। একলা দীপক। নীরন্ধ্র নিশীথ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখে। পাইপ বেয়ে সড়াৎ করে নেমে পড়েছে—হ্যাঁ, ভারি সুবিধা এই জায়গা দিয়ে নামা-ওঠার। এসেও ছিল ঠিক পাইপের পথে। লোকটা নেমে পালিয়েছে—আর দীপক, দেখ, বারান্দা ধরে

ক্রমাগত চলেছে সিঁড়ির দিকে—সাহস করে না তাকালে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামত নিশি-পাওয়ার মতো। হাঁদারাম আর কাকে বলে!

কী কায়দায় ঘরে ঢুকেছিল, তা-ও এবারে বেশ মালুম হল। পিছনের দরজাটা বারোমাস বন্ধই থাকে—দেখা যাচ্ছে, ছিটকিনি খোলা সেই দরজার। ঝাঁট দেবার সময় চাকরে নিশ্চয় দরজা খুলে রেখেছিল—এবং এই প্রকার বন্দোবস্তে যথোচিত খরচখরচাও করেছে সন্দেহ নেই। অত শত না দেখে দীপক শুয়ে পড়েছিল। তারই খেসারত এই ঘুমের ব্যাঘাত।

আপদ-বিদায় হয়েছে, ঘুমানো যাক নিশ্চিন্তে এবার। ঘুম ভাঙিয়ে এ রাত্রে আর হট্টগোল করতে আসছে না।

॥ সতেরো ॥

পরদিন হস্টেলের সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। নির্ঘাৎ আসবে, দীপক জানত। এবং আসবে ট্যাক্সিই—রাজবাড়ির গাড়ি নয়। বেয়ারা খবর দিল: এক মহিলা দেখা করতে চান, ভিজিটর্স-রুমে বসে আছেন।

নেমে এসে দেখে বাবলি। দুতিয়ালি করতে এসেছে—আসতেই হবে।

বিস্ময়ের ভান করে দীপক বলে, আপনি হঠাৎ?

বাবলি নিম্নকণ্ঠে বলে, আমি শুধু নই—রানী-মা আছেন। তিনি তো সুট করে যেখানে-সেখানে উঠতে পারেন না। গাড়িতে রয়েছেন, কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

মা এসেছেন আমার কাছে?

একছুটে দীপক বাইরের রাস্তায় চলে গেল। ট্যাক্সির ভিতরে মঞ্জুপ্রভা সত্যিই।

এই অবধি চলে এসেছ—এত দয়া তোমার মাগো??

মঞ্জুপ্রভা বলেন, জরুরি কথাবার্তা আছে। একগাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। আলাদা এক ট্যাক্সি নিয়ে একটু পরেই তুমি চলে এসো।

কোথায় মা?

আমার বাড়িতে। সেদিন যেখানে গিয়েছিলে। দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি চলে এসো। লাভ হবে তোমার, আমি বলছি।

সেদিনের মতো? মাপ করো মা, ওবাড়ি আর নয়। আমার উপরে অতি প্রসন্ন। তাঁদের আশীর্বাদের জোরেই পৈতৃক প্রাণ নিয়ে বিস্তর কষ্টে ফিরেছি। সেদিনের জের কাটেনি এখনো, রাত দুপুরে কাল রিভলবার নিয়ে পড়েছিল। একটিকে চিনলাম, চেনার মধ্যে একটুও সন্দেহ নেই মা—তোমার বড্ড আপন মানুষ অক্ষয়। হাতের গুলি দেখেই চিনে ফেললাম—কিন্তু বললাম—কিন্তু বললাম না যে চিনেছি। রিভলভারের গুলি দিল বা একটা মগজে ঢুকিয়ে! বাক্স খুলে ঘর তন্নতন্ন করে যা-কিছু নেবার নিয়ে চলে গেল। আর দেখ মা, কত ভালছেলে আমি তোমার—ঘুণাক্ষরে কাউকে কিছু বলিনি। লোক-জানাজানি হতে দিই নি।

মঞ্জুপ্রভা তিক্তকণ্ঠে বলেন, নিয়ে গেছে নকল-কাগজ—কোন্ দুঃখে তবে আর জানাজানি করতে যাবে।

প্রাণ ভরে দীপক হাসতে লাগল। বলে, নকল হলেও যত্ন করে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে কপি-করা—কমা-সেমিকোলনেরও ছাড় নেই। রাখী করে দিয়েছে। ছোটবোন জেনে চিরকাল হুকুম করে এসেছি। এখন সে কেউ নয়, তবু কাজটা আমার করে দিল। পুরানো কথা সবই তুমি ভুলে গেছ—ঐগুলো একবার পড়ে দেখো মা, আমার মনে পড়ে যাবে। আমিই যে তোমার গর্ভের ছেলে, একবিন্দু সন্দেহ

থাকবে না।

মঞ্জুপ্রভা বলেন, আসল-কাগজপত্র কোথা ?

কোন চিন্তা নেই মা, খুব নিরাপদ জায়গায় আছে। তোমার রাজবাড়ি সেদিন মাত্র একটা-দুটো জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম—সেগুলো কিন্তু আসল। আশায় আশায় নিয়েছিলাম—পরিচয় পেয়ে তক্ষুনি কোলে টেনে নেবে আমায়। কোল দিলে না মা, বন্দুক মারলে! তাক ফসকেছিল সেদিন, কিন্তু জানি সে-ই শেষ নয়—তোমরা আবার আসবে। ছেলের মমতা কাটানো তো সোজা নয়। তোমার চেলা-চামুণ্ডারা এসেছিল কাল রাত্রে—তুমি নিজে এসেছ এই এখন। জেনেবুঝেই নকল-কাগজ বাক্সে রেখে আসল বস্তু সরিয়ে দিয়েছি। রাজরানীর ছেলে আমি, রামা-শ্যামা নই—এমন জাঁকের পরিচয় লুপ্ত হতে দেবো কেন? খুন যদি হয়ে যাই, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাউর হবে, সেই ব্যবস্থা করা আছে।

মঞ্জুপ্রভা অবাক হয়ে কথা শুনছিলেন। বললেন, কী ধূর্ত তুমি!

পরম কৃতার্থ হয়ে দীপক বলে, কেমন মায়ের ছেলে সেটা দেখবে তো!

ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে মঞ্জুপ্রভা ডাকলেন: উঠে এসো—

বাবলিকে বললেন, বাসে করে তুই বাড়ি চলে যা। দীপকের সঙ্গে থাকি একটু।

নির্ভয়ে দীপক মায়ের পাশটিতে বসে পড়ল। মনে মনে হাসে: সন্তানের কেশাগ্র স্পর্শ করেন, সে তাগত নেই আর মা জননীর। কেননা, বিপদ ঘটালে সব কীর্তি অমনি ফাঁস হয়ে যাবে।

ট্যাক্সি নির্জন গঙ্গার ধারে এসে গেল। হাসে দীপক মনে মনে: আত্মহত্যা করব বলে ঐ গঙ্গায় যদি ঝাঁপ দিই, মা-ও অমনি ধরু ধরু করে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন। কেন না, দীপক মারা গেলে মায়ের পক্ষেও তা মরণের বাড়া! ঠিক যেমন সামান্য-সাধারণ মায়েদের বেলা হয়ে থাকে।

ময়দানের এক গাছতলার ঘাসের উপর বসল দু-জনে—পাশাপাশি, গায়ে গায়ে। দীপকের গায়ে মঞ্জুপ্রভা হাত রাখলেন, হাত বুলালেন গায়ে-মাথায়। মা আর ছেলে এরা দুজনে—এক নজর দেখে যে-না-সে বলে দেবে।

মিটিমিটি তাকায় দীপক আর হাসে: যতক্ষণ কাগজ হাতে আছে, মা তুমি পরম স্নেহময়ী। স্নেহ না দিলে রক্ষে আছে।

মঞ্জুপ্রভা হঠাৎ বললেন, কাগজপত্তর আমার দিয়ে দাও।

দীপক হাসতে হাসতে বলে, দলবল দিয়ে হল না—মা এবারে নিজে আসরে নামল।

রানী বলতে লাগলেন, কাগজ আমি সামাল করে রেখে দেবো। আমার মৃত্যুবাণ, তুমি তো জানো। সেদিন মেজতরফের ভয় দেখিয়ে এসেছিলে—সত্যিসত্যি যদি তাদের হাতে চলে যায়, পরিণামটা কী বলো দেখি?

দীপক মুখস্থর মতো বলে যায়, রাজবাড়ি থেকে পথে নামবে, মান ইজ্জত ভুঁয়ে লুটাবে। রানী থেকে ভিখারিণী।

রানী বললেন, আত্মহত্যা করতে হবে আমায়—

না-ও হতে পারে। পথ থেকে বস্তির ঘরে গরিব ছেলের কাছে আসতে যদি রাজি হও। ভিখারিণী তখন জননী।

একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে দীপক আবার বলে, জানি সে হয় না। সিনেমা-থিয়েটারেই হয়, খুব হাততালি পড়ে।

মঞ্জুপ্রভা বিরক্ত ভাবে বললেন, বুঝলাম দেবে না তুমি কাগজ। বয়সটা কম হলেও তুমি অতি সেয়ানা।

জগৎ-সংসারে যার কেউ নেই, ভেবেচিন্তে তাকে চলতে হবে বইকি। তোমার কাছে মা মৃত্যুবান—কিন্তু আমার যে জীবনকাঠি। ডাক্তারবাবু লিখেছেন—আমি বেঁচে নেই, ধরে নিয়েই টাকাকড়ি তুমি বন্ধ করে দিয়েছ। দস্তুরমতো বেঁচে রয়েছি—টাকা তুমি দেবে ঐ কাগজগুলোর জোরে। যত দিন চাইব, দিয়ে যেতে হবে। না হলে রেহাই নেই।

মঞ্জুপ্রভা বলেন, টাকা চাচ্ছ তো?

তার চেয়ে বেশিই চেয়েছিলাম—আমি মা চেয়েছিলাম। সে যাক গে। মা হতে হবে না—তারই দরদাম হোক এখন।

মাথার উপর হাত ছিল, ঝটিতি সরিয়ে নিয়ে মঞ্জুপ্রভা খাড়া হয়ে বসলেন ঃ কত টাকা? মাসে মাসে নয়—যা দেবার একসঙ্গে দিয়ে দেবো। কাগজপত্তর দিয়ে চুকিয়ে-বুকিয়ে তুমি চলে যাও।

আদর করতে করতে মা যেন চাবুক কষিয়ে দিল হঠাৎ। দীপক বোবা হয়ে গেছে।

মঞ্জুপ্রভা তাগিদ দেন ঃ কী ভাবছ?

টাকা দিয়ে মা জননী খালাস পেতে চাচ্ছ—একটুকু ভাবনা করব না? এমন লেনদেন দুনিয়ার উপর এই বুঝি প্রথম। মা না হয়ে তুমি রানী হয়ে থাকতে চাও—দাম কিছু বেশিই হবে। কত চাইব—দশ লাখ?

কায়দায় পেয়ে ঠাট্টা করছ?

দীপক বলে, সত্যি বলছি মা, বড়-টাকার অঙ্ক আমার একেবারে মাথায় আসে না। পঞ্চাশ একশ'র বেশি পাইনি তো বড় একটা। বেশি হল বুঝি—আচ্ছা, দশ হাজার?

ব্লাকমেইল করা বলে একে—

অধীর কণ্ঠে দীপক বলে, কিন্তু কি জিনিস দিচ্ছি, সেটাও তো দেখবে। বাইশ বছর বাদে মা পেয়ে চিরকালের মতো ছেড়ে দিচ্ছি। থাক এখন, মাথা ঝিমঝিম করছে—দরদাম ভাবতে পারছি নে। ডাক্তারবাবুকে চিঠি দিয়েছি—আজকালের মধ্যে জবাব পাবো। তিনি হয়তো হদিশ দেবেন দামের। আজকে আসি।

উঠে পড়ে সে হাঁটতে গিয়ে টলে টলে পড়ে। মঞ্জুপ্রভা নিঃশব্দে দেখছেন। তারপর সদয় ভাবে বলেন, ট্যাক্সিতে পেঁছে দিই হস্টেলে?

না—

॥ আঠারো ॥

ধনঞ্জয় সেন জবাব পাঠিয়েছেন। চিঠির সঙ্গে টাকা।

রানী যে মা হতে পারে না, এমন নয়। অলোকের ক্ষেত্রে বাধেনি। কিন্তু মা হতে গিয়ে রানীগিরি খোয়াবে না কিছুতে। রানী হবার জন্যেই উদয়নারায়ণের সঙ্গে বিয়েয় আপত্তি করেনি। মঞ্জুর কাগজপত্র তোমায় দিয়েছি, তোমার মা হবে তেমন আশায় নয়—তোমায় সে টাকা দেবে। তা-ও সে দেবে না, বুঝতে পারছি। যতদিন সঙ্গিত ছিল, নির্বিবাদে দিয়ে গেছে। সঙ্গতি একেবারে ফুরিয়েছে, সেই জন্য নানান ফ্যাকড়া। কাজ নেই—চলে এসো এখানে। মানুষ তোমায় আমি করবই। আমার সঙ্গে কাজ করে হাতে-কলমে শিখবে ডাক্তারির যা আসল শিক্ষা—নর-সেবা। ডিগ্রির প্রয়োজন বলে যদি কখনো মনে করি, তা-ও হবে। ভাল ভাল কলেজ এদিকেও আছে—স্বামীজিদের খাতিরে ঢোকানো কঠিন হবে না।

গোপালের স্ত্রীর জীবনও দুর্বহ, দেখে এসেছি। মেয়ের বিয়ের পরেই তিনি চলে আসুন। কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না, ভাল বন্দোবস্ত করে দেবো। হরিদ্বারে আসার রাহাখরচ পাঠালাম। পত্রপাঠমাত্র চলে এসো, সব ব্যবস্থা করে রেখেছি—

সেই চিঠি হাতে করে দীপক বিনোদিনীকে প্রণাম করতে এসেছে। রান্নাঘরে রান্না করছিলেন তিনি। বলে, চলে যাচ্ছি মা। রাত পৌনে-ন'টার গাড়িতে।

চিঠি পড়ে শোনাল।

বিনোদিনী বললেন, তাই যা বাবা, আমি আপত্তি করব না। রানী-রাক্ষুসী কখন কী করে ঠিক নেই, দূরে গিয়ে থাকাই ভাল।

মত দিয়ে ফেলে তবু আবার খুঁত-খুঁত করেন: মেডিকেল কলেজে অ্যাদ্দিন পড়লি, দুটো বছরের আর উপায় হল না?

দীপক সগর্বে বলে, সেখানে আরও ভাল পড়া হবে মা—সন্ন্যাসী-দের সেই হাসপাতালে। নর তাঁদের কাছে নারায়ণ, চিকিচ্ছে হল নারায়ণ-সেবা। এমন ছিকিচ্ছে অন্য কোথায় শিখতে পাব?

নিজেকে বিনোদিনী প্রবোধ দিচ্ছেন: আমিও তো যাচ্ছি চলে। গঙ্গা পেটের ছেলে কখনো নয়—পেটের দুশমন। তুই-ই আসল-ছেলে আমার। পুণ্যের জায়গায় গিয়ে থাকব, গঙ্গাস্নান ঠাকুর-দর্শন হবে, আর সকলের বড়—নিত্যিদিন তোকে দেখতে পাব। রাখীর তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—বিয়েটা দিয়েই রওনা হয়ে পড়ব। ডাক্তারবাবুকে বলে রাখিস।

বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেছে, এ খবর দীপকের অজানা। রাখীও বলেনি কিছু। চেয়ে দেখল রাখীর দিকে—চোখদুটো হাসছে তার।

দীপক বলে, কবে বিয়ে মা, অলোকের সঙ্গেই তো?

তা ছাড়া আবার কি। গঙ্গা দিন স্থির করে ফেলেছে—আসছে মাসের ষোলই। তা ভেবে দেখলাম, এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ কোথায় আর পাচ্ছি? গাঙটা মজে গেলেও খাল থেকে যায়—নেই-নেই করেও এখনো যা আছে, আমাদের মতো দশটা-বিশটা তারা টাকা দিয়ে কিনে ফেলতে পারে।

দীপক বলে, বিশটা না পারুক, রাখীটাকে কিন্তু কিনে ফেলেছে। হাসছে কি রকম দেখ মা—

রাখী মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে: হাসব, বেশ করব। তুই তো সন্ন্যাসীর আশ্রমে চললি—লোকে হাসে কি কাঁদে, তা নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন রে?

হাস্ না, কে মানা করছে! বিয়ে হতে যাচ্ছে, হাসিরই তো দিন। আমার যাবার দিনে ঝগড়াঝাঁটি করবি নে। কাগজগুলো দিয়ে দে, চলে যাই। গোছগাছ বিস্তর বাকি।

হঠাৎ বুঝতে পারেনি রাখী: কোন্ কাগজ?

রানীর যা মৃত্যুবাণ। তোর কাছে রাখতে দিয়েছি। ও-জিনিস ফেলে যাওয়া উচিত হবে না।

কাগজের তাড়া বের করে দিল রাখী।

হাতে নিয়ে দীপক মুহূর্তকাল ভাবল। বলে, সরো দিকি মা, পথ দাও—

রান্নাঘরে ঢুকে কাগজের তাড়া উনুনে গুঁজে দিল। হি-হি করে হাসে আর বলে, অগ্নয়ে স্বাহা!

রাখী ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, কী করলি ওরে গোমুখ্যু হাঁদারাম! রানী তো বেঁচে গেল—একটি পয়সাও দেবে না আর কখনো।

দিলেও নিতাম নাকি? জেনেশুনে ও মায়ের পয়সা ছুঁলে হাত নোংরা হয়ে যাবে।

আটটা-বিয়াল্লিশের ট্রেন—সাতটা বাজতে-না-বাজতে রাখী দীপকের হস্টেলে গিয়ে হাজির।

তুই কেন এলি এখানে?

বা-রে, গাড়িতে তুলে দিতে হবে না বুঝি! নইলে তুই-ই আবার বলতিস, আপন ছিল পর হয়ে গেছে—সেই জন্যে এলো না।

বেরিয়ে পড়েছে। হ্যারিসন রোডের মোড় ছাড়িয়ে এক জায়গায় রাখী 'রোখো' 'রোখো' করে ওঠে: থামাও ট্যাক্সি, একটুখানি নামব।

দীপককে বলে, তুইও নেমে আয়। আমার ঐ চেনা-দোকান—একটা স্যুটকেস রেখে গেছি। মেয়েছেলে আমি টানাটানি করব, হাত-পা কোলে করে তুই ট্যাক্সিতে বসে থাকবি—লোকে কী বলবে শুনি?

আনকোরা নতুন স্যুটকেস, ভারীসারিও বেশ। লোকলজ্জা ঠেকাতে দীপককেই অতএব সেই বস্তু ঘাড়ে নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলতে হল।

বলে, স্যুটকেস কিনলি কেন?

তোকে উপহার। নইলে তো মনে মনে দুঃখ করবি, দেখ, চলে যাচ্ছি—একটা-কোন জিনিস দিল না।

দীপক বলে, বিস্তর টাকা খরচা করেছিস—

ঘাড় দুলিয়ে রাখী বলল, খুলে দেখবি ভিতরেও কত জিনিস। সারা বিকেল ঘুরে ঘুরে বাজার করেছি।

অত টাকা কে দিয়েছে?

অলোক—আবার কে?

খিলখিল করে হেসে উঠল রাখী: তোর সেই ব্রোচ। সে নাকি বিক্রি করা যায় না—বেচতে গেলে ঠেঙানি দেয়। আমায় তো দিব্যি তিন-শ টাকা দিয়ে দিল।

রুমালে বাঁধা টিকিট বের করে দীপকের হাতে দিয়ে বলে, আরও কিনেছি, এই দেখ্—হরিদ্বারের টিকিট।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দীপক ধমক দিয়ে ওঠে: কী সাংঘাতিক মেয়ে! তুই কি জন্যে যাবি?

রাখী রাগ করে বলে, তোর তো কোন দায় ঠেকতে হবে না। ডাক্তারবাবু মায়ের জন্য বন্দোবস্ত রেখেছেন। মা না গিয়ে সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি।

গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে সেই মুহূর্তে রাখী হেসে উঠল: বুঝলি নে? কী হাঁদারাম রে! তোকে উপহার। সুন্দর একটা স্যুটকেস, ভিতরে ঠাসা জিনিসপত্তোর আর ফাউ পাচ্ছিস রাখী—রাখী-ছুছুন্দরী। তোরই দেওয়া নাম রে! খাসা নাম। নয় তো আবার নিন্দেমন্দ করতিস, শুধু স্যুটকেস দিয়েই দায় সারল।

দীপক অবাক হয়ে বলে, রাজরানী হতে যাচ্ছিলি যে তুই—

রক্ষে করো। একটা রানী তো চোখেই দেখলাম, রানীর যা খোয়ার! কাজ নেই রানীগিরিতে।

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে মুখের উপর মুখ এনে রাখী ফিসফিস করে বলে, তুই আমার ছোড়্দা নোস, আপন-লোক কেউ নোস—শুনে আমার নাচতে ইচ্ছে করছিল সেদিন।

॥ শেষ ॥

আমার ফাঁসি হল

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীমান সাগরময় ঘোষ

করকমলেষু

আমার ফাঁসি হল। রাত তিনটে, জীবন-কাহিনী লিখছি। যে দিব্যি করতে বলবেন, রাজি আছি। সত্যি সত্যি ফাঁসিতে ঝুলেছিলাম আমি। সেই থেকে এক মজার অবস্থা। দিনমানে আপনাদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াই জীবন্ত নরমূর্তিতে। হাসি পায়, ছদ্মবেশ কেউ কখনও বুঝতে পারেন না। এবং আমি একা নই, আমার মতন আরও কতজন আছেন। আপনাদের ভাই-বাদার আত্মীয়বন্ধু। টের পেলে আঁতকে উঠবেন। রূপকথায় শুনেছেন, রাক্ষসী রাজরানী হয়ে থাকে; রাত্রিবেলা ঘুমন্ত রাজার পাশ থেকে উঠে চরে ফিরে বেড়ায়। মানুষের ঘাড় মটকে তাজা রক্ত শোষে, হাতিশালে ঢুকে হাতির শুঁড় ছিঁড়ে নটের ডাঁটার মত চিবোয়। ভোর হবার মুখে ভয়ংকরী ভোল পালটে আবার রাজবধূ। শান্ত লাজবতী, রূপে-গুণে জুড়ি মেলে না। নিতান্ত গল্প-কথা বলবেন আর কী করে? আমিই তো সেই একটি। তবে ঘাড় মটকাই না, রক্তমোক্ষণে রুচি নেই, শাক-চচ্চড়ি-ভাতেই তুষ্ট। মরে গেছি, তবু কিছুই যেন হয় নি এমনিতরো ভাব।

রাতের বেলা লিখছি, দিনমানের ভদ্র পোশাকে চালচলন উৎকট লাগছে এখন। চম্পার কাছে একদিন বলছিলাম, সে তো হেসেই কুটিকুটি : উঃ রে, এত কল্পনা খেলে তোমার মাথায়! আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা খাতির বন্ধুত্ব—চম্পা বলে, ও তোমার দিনমানের স্বপ্ন—আসলে কিছুই নয়। আমি কিন্তু চম্পার মতন অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারি নে। কিছু সন্দেহ থাকে, সত্যিই কি অহরহ আপনাদের ঠকাচ্ছি মরে যাবার পরেও? কে বলে দেবে খাঁটি খবর, কার উপর ভরসা করব?

রাত তিনটেয় এইসব ভাবছি; দিনের বেলা আর এক রকম। তখন মনে হয়, রাতের এইগুলোই আজগুবি। আমার দুই জীবন, দুইরকম অস্তিত্ব। রাতে যা আছি, দিনে তা নই। রাত বলে দিনমান প্রহেলিকা। দিন হাসে : রাতের ঐসব বিদঘুটে স্বপ্ন। জন্মের পর থেকে বেঁচে ছিলাম, অথবা ফাঁসির পরেই বেঁচে উঠলাম—কার কাছে খাঁটি জবাব পাই?

আপনারা যাদের জীবন্ত বলেন, এই নিশিরাত্রে কাউকে তাদের পাচ্ছি নে। কলম হাতে নিয়ে বসেছি—চম্পা কোনদিকে আছে, হয়ত বা ইচ্ছে করেই সরেছে লিখবার অবাধ অবসর দিয়ে। আরও ঘণ্টা কয়েক পরে আপনাদের দিনমান হবে। এদের তখন রাত্রি—জ্বলজ্বলে সূর্যের আলোয় ভরা সুপ্তিমগ্ন রাত্রি এদের। শুয়ে পড়ব, এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখব কত রকম। তখন আবার মনে হবে, এখনকার এই সত্য অস্তিত্বই বুঝি স্বপ্ন। কী রকম ধাঁধা ভাবুন দিকি! স্বপ্নে জাগরণে গোলমাল লেগে যায়। স্বপ্ন কি লাবণ্য, অথবা স্বপ্ন এই চম্পা? ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে, পাগল না হয়ে যাই।

যা হোক একটা সাব্যস্ত করে নিন আপনারা নিজ নিজ মরজি মত। আমায় জিজ্ঞেস করবেন না, আমি গল্প বলে খালাস। আমার আত্মকথা—সেই যখন আপনাদের মত দেমাকে ধরাতলে ধুলো উড়িয়ে বিচরণ করতাম। কিংবা স্বপ্নের ঘোরে মনে হত, বেঁচে থেকে বহাল তবিয়তে ঘুরছি আপনাদের মতন লোকজনের সংসারে।

বনেদি বাড়ির ছেলে। এমন দিন ছিল, ডায়নামো বসিয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানো হত আমাদের বাড়ি। ভাঙা কলকব্জা জঙ্গলের মধ্যে জং ধরে পড়ে আছে, গিয়ে দেখতে পারেন। কর্তারা গেলেন, তারপরে কী অলক্ষ্মী ভর করল—আট শরিকের মামলা-মোকদ্দমায় সমস্ত উড়ে-পুড়ে গেল চোখের উপর দিয়ে। আজ এ তালুকটা নিলাম

হচ্ছে, কাল ওই খামারটা। এরই মধ্যে এক আশ্বিনের ঝড়ে বাগানের প্রায় সবগুলো ভাল গাছগাছালি উপড়ে পড়ল। নৌকাডুবি হয়ে বছর-খোরাকি ধান-চাল গেল গাঙের নিচে। ধনসম্পত্তি পাখনা মেলে পত-পত করে উড়ে পালাচ্ছে। মা-বাবা আগেই গেছেন, তখন আমি ছেলেমানুষ। বাবা গেছেন, মাথার উপর দাদা আছেন অবশ্য। আছেন বউদিও ছেলেমেয়েরা। এবং বনেদি পরিবার বলে কিছু আসবাবপত্তর, খানকয়েক রুপোর বাসন, গয়নাগাঁটি দু-চারখানা।

সম্বল মাত্র এই। যে জায়গায় এত হাঁক-ডাক পশার প্রতিপত্তি, ঘাড় নিচু করে নিতান্তই দশের একজন হয়ে সেখানে টেকা যায় না। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে গিয়ে সুবিধা হল। ঐ নাম করে কলকাতায় গিয়ে উঠলাম। শহরে কে কাকে চেনে? ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র, কোঁচার মুড়োয় দু-সের চাল কিনে আনছি, কেউ তা তাকিয়ে দেখতে যাবে না।

আরও হল। উদ্বাস্তু হওয়ার দরুন কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর দাদা এক চাকরি পেয়ে গেলেন। এক কারখানার সালতামামি খাতা লেখার কাজ। আমিও কলেজে ঢুকে টপাটপ গোটা দুই পাস করে ফেলেছি। চাকরি করা এবং পাস করা—দুটো ব্যাপারের কোনটাই আমাদের কোন পুরুষে হয় নি। পাস করে আলস্যে বসে নেই—যে ব্রতের যে রকম বিধি—খবরের কাগজ দেখে নিয়মিত দরখাস্ত ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু শহরে ঘোরাফেরা করলেও আসলে মফস্বলের মানুষ তো, কাকে ধরলে কী হয় এই তত্ত্বে একেবারে আনাড়ি। দরখাস্ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে স্ট্যাম্পের খরচা মোটা অঙ্কের হয়ে উঠল, ফল কিছু হয় না। মরীয়া হয়ে তখন বেয়ারিং-পোস্টে ছাড়তে লাগলাম। তাতে উল্টো উৎপত্তি—দরখাস্ত ঘুরে এসে ডবল মাশুল আদায় করে নিয়ে যায়।

একবার ইতিমধ্যে এক সরকারি পরীক্ষায় বসেছিলাম। এবং কী আশ্চর্য, খবর পেলাম পাস হয়ে গেছি নাকি টায়েটোয়ে। বাপ-ঠাকুরদার পুণ্যবল ছিল, নয়তো একরকম অঘটন ঘটে না। তারপরেও আছি বসে—বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে তাস খেলি, গুলতানি করি, গানের গলা থাকায় পাড়ায় কিছু নাম হয়ে গেছে—হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে চেঁচাই কখনো সখনো। দরখাস্তের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, একটা-দুটো ছাড়ি পছন্দমত পেলে। বউদি ওদিকে উঠে পড়ে কনে দেখে বেড়াচ্ছেন। ঘটকী লাগিয়েছেন; চেনা-জানার ভিতর যাকে পাচ্ছেন, তাকে বলেন। চাকরি হচ্ছে না তো বিয়েটা হয়ে যাক। আমার এই বয়সে পৌঁছবার আগেই আমাদের বাড়ির সকলেই ছেলেমেয়ের বাপ। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু একটা মানুষ আধা-সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাই বা চোখ মেলে কী করে দেখা যায়। স্ত্রী ভাগ্যে ধন—চাকরি-বাকরি এবং যাবতীয় সুখ-সৌভাগ্য আটকে রয়েছে শুধু একটি ভাগ্যবতী স্ত্রীর অপেক্ষায়।

বছর দেড়েক এমনি যায়। হঠাৎ সরকারি চিঠি, আমাকে সাবরেজিস্ট্রার করা হয়েছে বিরাটগড় নামক জায়গায়। জায়গায় বসবার আগে আট সপ্তাহের শিক্ষানবিসি। বউদি বেঁকে বসলেন: উঁহু, এখন কী করে যাওয়া হয়?

এক্ষুনি যেতে হবে। কাল-পরশুর ভিতর। কত ভাগ্যে চাকরি জুটেছে।

দাদারও সেই মত। ফাগুনের আর পাঁচটা দিন আছে। চোত পড়ে যাবে, তার আগে রওনা হয়ে পড়।

বউদি বলেন, চোত পার করে বোশেখে হাতিবাগানের মেয়ে ঘরে এনে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যাবে। খাসা মেয়েটি।

রাশিভারি মানুষ দাদা, কম কথা বলেন। যা বলেন, হুকুমের মতো আমার কাছে।

আমি সরে পড়ি, অন্তরালে যাই। বুঝুন এবারে দু-জনে। দুই গুরুজন আমার।

দাদা বলেন, চাকরি বসে থাকবে না তোমার খাসা মেয়ের খাতিরে।

বউদি বলেন, না থাকে অন্য একটা দেখে নেবে। আরও দু-চার মাস পরে হবে না হয়। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে বসে নেই তো ঠাকুরপোর চাকরির আশায়। বোশেখ নিদেন পক্ষে জষ্ঠির পর মেয়ে তারা ঝুলিয়ে রাখবে না, অন্য জায়গায় সম্বন্ধ করবে।

গোটা তিরিশ জায়গায় বাতিল করে এই মেয়ে খানিকটা বোধহয় বউদির মনে ধরেছে। দেওরকে কী তালেবর যে ভাবেন! দুনিয়ার তাবৎ মেয়ে একটা জায়গায় সভা করে বসিয়ে তার ভিতরে বাছাই করলে তবে বোধহয় খুঁতখুঁতানি যেত। ফোটো আমার হাতে দিয়ে বলেন, নাকটা আর একটু খাড়া হলে যেন ভাল হত, কী বল?

নাকই তো দেখি নে বউদি, খাঁদাবোঁচা—পুরোপুরি মঙ্গোলিয়ান।

বউদি রাগ করে বলেন, কুচ্ছো করতে ডাকা হয় নি। চল একবার, নিজের চোখে দেখে আসবে।

লোকে পাগল বলবে তা হলে আমায়। চাকরিতে না গিয়ে কনে দেখতে ছুটল।

বউদি চুপ করে গেলেন। এদিকে টুনু আমায় ধরেছে, চিড়িয়াখানায় যাব ফুলকাকা—

এই তো, ও-মাসে দেখিয়ে আনলাম।

রাঙা-বাঁদর এসেছে একটা। আমি দেখব।

আচ্ছা—

কখন যাবে?

টুনুর মাথায় একটা কিছু ঢুকলে হয়। সকাল দুপুর সন্ধ্যা, এমন কি রাত্রে এক ঘুমের পরে উঠে বায়না: লাল-বাঁদর দেখব, নিয়ে চল।

নাও, ঠেকাও। কী আবদারে ছেলে বানিয়েছ বউদি!

বউদি বলেন, আমি, না তুমি ঠাকুরপো! আরও তো চারটে ছেলেমেয়ে আমার—করুক দেখি কেউ এরকম। তোমার দাদা তাই বলেছেন, টুনুকে ও সঙ্গে নিয়ে যাক। আমরা কেউ ও-ছেলে সামলাতে পারব না।

সত্যি, টুনুর জন্য মন খারাপ হচ্ছে। কতদিন আর কোলে করব না, কোলে বসে আবদার করবে না টুনুমনি! ওকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে বড়। এক লহমা আমার কাছছাড়া হতে চায় না, রাত্রে শোয় আমার কাছে। ছেলের যখন দেড় বছর বয়স, বউদি বড় অসুখে পড়েছিল। দাদার এসব ধকল সয় না। টুনু সেই সময় থেকে আমার নেওটা।

রিকশা ডেকে এনেছি, বউদিও দেখি সেজেগুজে এসে হাজির।

রিকশা কী হবে ঠাকুরপো? হেঁটে যাই এইটুকু, বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরব।

বাপ রে বাপ! চড়চড়ে রোদে তুমিও যাচ্ছ লাল-বাঁদর দেখতে? মায়ের এমন পুলক, ছেলের হবে না কেন?

অনতিপরে টের পেলাম, চিড়িয়াখানার গরজটা বউদিরই। টুনুকে নাচিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখাশুনোর পর ফিরে আসছি। বউদিকে বললাম, খাঁচায় না রেখে তোমার লাল-বাঁদর ছাড়া দিয়ে রেখেছে। আমাদের সামনে এতক্ষণ ঘুরে ফিরে বেড়াল।

কেমন দেখলে বল?

মুখে পোড়ার ছাপটাপ নেই যখন—হনুমান নয়, বাঁদরই। ঠোঁটে লাল নখে লাল পরনে রাঙা শাড়ি—বাঁদর লালই বটে, মিছে কথা বল নি।

বউদি একটু ভেবে বলেন, নাক নিয়ে তুমি খুঁত-খুঁত করেছিলে, নাক কিন্তু ঠিকই আছে। আজ আবার খুঁটিয়ে দেখলাম। তবে রঙটা ফ্যাকাশে মতন। আর একটু ঘোর হলে ভাল হত। কী বল?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, ঠিক তাই। বাঙালির ঘরে অতদূর সাদা হয় কী করে? বোধহয় শ্বেতকুষ্ঠ। আবার যেদিন এই মেয়ে দেখবে, আমি বলি কী, কোন একজন কবিরাজ সঙ্গে নিয়ে যেও।

হেসে ফেলে বউদি বললেন, তোমার মুণ্ডু!

দেওর মোটামুটি পছন্দ করেছে, হাসি সেইজন্য। এই আমার বউদি। যাওয়ার দিনও বলেছেন, ওদের বলে-কয়ে রাখব। হপ্তা-খানেকের ছুটি নিয়ে এস, তাতেই হবে। চাকরিতে বসে খানিকটা সামাল দিয়ে নাও গে, তারপরে ছুটির চেষ্টা কোর।

যখন যাব সে কী কান্না টুনুর! সে-ও যাবে, জুতো-জামা পরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা করা যায় না। দিনমানের গাড়ি বাতিল করি অগত্যা। আর-একটা আছে অনেক রাত্রে, সে গাড়িতে ধকল বিস্তর। রাত্রি-জাগরণ তো বটেই, তার উপরে এমনিধারা ভিড় যে বসবার জায়গা মেলে না, সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু উপায় নেই, টুনু না ঘুমানো পর্যন্ত বাড়ি থেকে নড়া চলবে না।

টুনু ঘুমিয়ে পড়লে তার হাতখানা তুলে কড়ে আঙুলে দাঁত ঠেকিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এইরকম বিধি—আঙুল কামড়ে মায়ার বন্ধন ছেদন করে বেরিয়ে যাওয়া। ফুলকাকার দুঃখে এর পর কোন শক্ত অসুখ-বিসুখে না পড়ে ছেলে।

সদরে মাস দুয়েকের শিক্ষানবিসি। আরও কিছুদিন চেয়েছিলাম, ওঁরা বললেন, এতেই হবে, কাজের ভিতরে পড়ে বাকি সমস্ত শেখা হয়ে যাবে। রেজেষ্ট্রি অফিস বিরাটগড়ে অল্পদিন হয়েছে। এর আগে ছিলেন এক প্রবীণ মানুষ। তম্বির-তদারক করে বদলির হুকুম বের করেছেন তিনি। সদর ছাড়বার আগের দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। জায়গাটার খবরাখবর নিলাম। দাঙ্গার সময়টা বিরাটগড় একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ইদানীং জমে উঠেছে আবার। অনেক উদ্বাস্তু এসে পড়েছে, জঙ্গল কেটে তারা বসবাস করছে। থানা, পোস্টাফিস, রেজেষ্ট্রি অফিস, ফ্রী প্রাইমারী ইস্কুল সমস্ত নূতন। সেকেলে চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারি—গ্রামের কয়েকজন ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড টাকা জমা দিয়ে বানিয়েছিলেন—নূতন পাকাবাড়িতে উঠে গিয়ে নাম বদলে এখন হেলথ সেন্টার হয়েছে। জায়গাটার প্রশংসা করলেন ভদ্রলোক। বললেন, শহরে বাজারে আমাদের কেউ পোঁছে না, ওখানে খাতিরটা দেখবেন? হোড় মশায় কাজ করেন রেজেষ্ট্রি অফিসে। হেসে বললেন, অফিসের ভিতরে নয়, বাইরের বারান্দায়। দলিল-পত্র লেখেন, আর স্ট্যাম্পের ভেণ্ডার। অভাবি লোক, একটু হাতটানও আছে—কোন রকম অসুবিধা হলে তাঁকে বলবেন। বলতেও হবে না। তাঁর হিত করবার ঠেলা সামলানোই দায় হয়ে উঠবে। সরকারি ডাক্তার আছেন, ভোলানাথের মত মানুষ। এক দোষ, গল্প পেলে হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। মোটের উপর থাকবেন খারাপ নয়। আমার চলে আসতে হল আলাদা কারণে। পি-ডবলিউ-ডির গয়ংগচ্ছ কাজ, কোয়ার্টার বানাতে নিদেন পক্ষে তিনটি বচ্ছর এখনও। সংসারি মানুষ, ঘর-সংসার ছেড়ে একা একা কতদিন থাকতে পারি? বয়স হয়ে একটু আয়েশি হয়ে পড়েছি। আপনার তা নয় মশায়। একবার জমে গেলে তারপর বদলি হলেও নড়তে চাইবেন না।

জায়গা ভালমন্দ যা-ই হোক, সে এখন ভেবে লাভ নেই। চাকরি নিয়েছি, যেতে

হবে। নদী-খালের পথ। শেয়ারের নৌকো না হলে বেশি খরচা পড়ে। নিজস্ব ভাড়ার নৌকো সব সময় পাওয়াও যায় না। যত প্যাসেঞ্জার সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধ্যের মুখে ঘাটে এসে জমে। নৌকা ছাড়ে তখন।

রাত বেশি হয়ে গেল পৌঁছতে। প্যাসেঞ্জার এ-ঘাটে ও-ঘাটে উঠছে নামছে। এ তল্লাটের মানুষ সময়ের ধার ধারে না। পৌঁছে গেলেই হল। তার উপরে ভাঁটার জল বড্ড নেমে গিয়েছিল, খালের মধ্যে নৌকো বেঁধে থাকতে হল অনেকক্ষণ। অজানা জায়গা-তবে অসুবিধে এমন-কিছু হল না। মাঝি স্থানীয় লোক, খাতির করে লণ্ঠন ধরে সে আমায় বাসাবাড়িতে তুলে দিয়েছে। দোচালা ঘর, বাঁশের বেড়া, গেলপাতার ছাউনি। মাঝি বলে, তক্তাপোশ রয়েছে, বিছানাটা ছড়িয়ে পড়ুন। রাত বেশি নেই, চোখ বুজতে না বুজতেই সকাল হয়ে যাবে।

লণ্ঠন জেবলে রেখে সে চলে গেল। বুদ্ধি করে পাঁউরুটি আর বাতাসা এনেছিলাম, তাই চিবিয়ে পুকুরঘাটে নেমে আঁজলা করে জল খেয়ে দুয়োরে খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম।

অজানা জায়গা, ভাল ঘুম হল না। ভোরবেলা দরজা খুলে দেখি, পাকা-চুল লিকলিকে দেহ এক ব্যক্তি দাওয়ার উপর খুঁটি ঠেস দিয়ে চোখ বুজে আছেন। দরজা খুলতে একটুখানি শব্দ—মানুষটি অমনি ধড়মড় করে উঠে কোমর অবধি ঝুঁকে যুক্তকর কপালে ঠেকালেন ঃ অধীনের নাম দয়ালহরি হোড়—

সেই যে হোড় মশায়ের কথা শুনে এসেছি। ডাকতে হল না, নিয়ে যেতে এসেছেন। গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন, নিবাস এই বিরাটগড়। আদি বসতি কালনায়। অনেক কালের কথা হুজুর, বর্গির হাঙ্গামার সময় আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভিটে ত্যাগ করে আসেন। জ্ঞাতগুষ্ঠি আছে সেখানে। হুজুরের জন্য ক'দিন থেকে ঘাটে ঘোরাঘুরি করছি। কালও অনেক রাত্রি অবধি ছিলাম। কোথায় নামা হল, কিছু তো টের পেলাম না। কদমতলার ঘাটে, না গোলবাড়ির ঘাটে?

কোথায় নামিয়ে দিল, কী করে বলি। কদমগাছ তো দেখলাম না কাছে পিঠে কোথাও।

হোড় মশায় বলেন, কদমগাছ নেই। ছিল বোধহয় এককালে নয়তো নাম হবে কেন। গোলবাড়ির ঘাটে বরঞ্চ ভাঙ্গাচুরো ইটের গাঁথনি রয়ে গেছে। রাত্তির না হলে গোলবাড়িও দেখতে পেতেন। দূর নয় ঘাট থেকে।

তবে গোলবাড়ির ঘাটই হবে। জুতোয় ইটের ঠোক্কর খেলাম, মাঝি তাড়তাড়ি আলো নিয়ে আগে চলে এল। দেদার ইট।

মুশকিল দেখুন। আমি সেই সময়টা কদমতলার ঘাটে চটাপট চাপড় মেরে মশা তাড়িয়ে মরছি। ভুল হল, বাসাটা একবার আমার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

একা আসেন নি, উঠানে আর-একটি দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখে চোখে আর পলক পড়ে না। মানুষ না দৈত্য-দানো? অমন দশাসই জোয়ান পুরুষ বাংলা দেশের মাটিতে বড় একটা দেখি না।

হোড় মশায় বলেন, আমাদের হরিশ। লোকের দরকার হবে হুজুরের, তাই একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার আগে চাটুজ্জে হুজুর ছিলেন, তাঁরও রাঁধাবাড়া করত। রাঁধাবাড়া, কাপড় কাচা, জল তোলা, বাসন মাজা, গা-হাত-পা টেপা সমস্ত করবে। বিশ্বাসী ছোকরা—হাট করতে দিলে আনিটা দুয়ানিটা এদিক-ওদিক করতে পারে। তার বেশি কিছু করবে না। চাটুজ্জে হুজুরও তেমনি, নিজে হাট

করতে যেতেন—দু-আনার কুচো-চিংড়ি কিনবেন তো দু-গণ্ডা ফাউ চেয়ে নেবেন। না দিলে নিজেই খামচা করে তুলে নেবেন মাছের ডালি থেকে। আপিসের হাকিম, কিছু বলতেও পারে না, কবে কোন খত-তমসুকের ব্যাপারে গিয়ে পড়তে হয়।

ডাকলেন ঃ এই ছোঁড়া, চলে আয় এদিকে। মনিব তোর। মাইনের কথা সামনা-সামনি বলে নে। বলছে হুজুর, বারো টাকা। চক্ষুপর্দা নেই আজকালকার ছোঁড়াদের। বারো টাকা এক লাট-সাহেবের মাইনে। আমি বলেছি, হুজুরকে বলেকয়ে আট টাকা অবধি তুলে দেব। কী বলেন হুজুর, বেশি বলে ফেলেছি?

বারো টাকাই দেব আমি।

হোড় ক্ষণকাল অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। হরিশকে বলেন, গড় কর ছোঁড়া পায়ের ধুলো নে। গায়ে মাথায় মাখ। এমন মনিব ভূ-ভারতে পাবি নে। কলকাতার মানুষ, চায়ের অভ্যাস আছে, তাই বুঝে চা-চিনির জোগাড় রেখেছি। জল চাপাতে লাগ, আমি এক-ছুটে দুধ নিয়ে আসি। চা করতে জানিস তো রে?

আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, জানবে কী করে? কৃপণের জাসু ছিলেন চাটুজ্জে হুজুর। অন্য কেউ দিলে খেতেন, নিজের ঘরে চায়ের পাট ছিল না। আচ্ছা, আসি আমি। আমিই চা করে দেব। সব রকম অভ্যাস আছে হুজুর।

বয়স হয়েছে, আর চেহারায় তো শুকনো একখানা লম্বা কাঠি। বেরিয়ে গেলেন তীরের মতন। পয়সাকড়ি কিছু হাতে দেব, তার ফুরসত পেলাম না। আজব মানুষ। কথাই বা ক'টা বলতে দিলেন এতক্ষণের মধ্যে? একাই সব বলেন।

মুখ-হাত ধুয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরছি। দয়ালহরি দেখি হন্তদন্ত হয়ে আসছেন ঘটি-ভরতি দুধ নিয়ে। বলেন, দেরি হয়ে গেল, গাই দুয়ে আনতে হল—চায়ের অভাবে হুজুরের কষ্ট হয়েছে। কাল থেকে এমন আর হবে না।

এত দুধ কেন?

মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে মনোভাব আন্দাজ করে নেন ঃ দুধে রুচি নেই বুঝি? কাল তবে কিছু বেশি করেই আনব, হরিশ ক্ষীর করে দেবে। দুধ না চলে ক্ষীর খাবেন।

এবারে ছাড়ি না। মনিব্যাগ বের করলাম। দয়ালহরি জিভ বের করে তিন পা পিছিয়ে যান ঃ সর্বনাশ! ঘরের দুধ—তার জন্য দাম নেব হাত পেতে? ভগবতীর বাঁটের দুধ জাতগোয়ালা ছাড়া কেউ বেচতে পারে না, বেচলে গায়ে শ্বেতি বেরোয়।

দুধ না হয় হল। কিন্তু চা নিয়ে এসেছেন, সে তো নিজের ক্ষেতে জন্মায় নি। চিনিও গাছের নয়।

হবে, হবে। এমন নির্দয় কেন হুজুর, আমার কোন জিনিস নিতে চাচ্ছেন না? চাটুজ্জে হুজুর, এদিক দিয়ে ভাল—না বলতেন না কখনও। উল্টে নিজে থেকেই কত ফরমাশ করতেন।

বলতে বলতে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। গরম চা বানিয়ে আনলেন কাচের গ্লাসে। হরিশকে বলেন, রবিবার আজ, কাছারির তাড়া নেই। তুই ছোঁড়া জেলেপাড়ায় চলে যা—ভাল মাছ দেখে-শুনে নিয়ে আয়। আমি চাট্টি সরু চালের জোগাড় দেখছি।

চাউর হয়ে গেছে আমার আসার খবর। অনেকে এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামের মধ্যে বাইরের মানুষ চারজন আমরা—সরকারি ডাক্তার, থানার বড়-দারোগা, ছোট দারোগা এবং আমি এই সাব-রেজিস্ট্রার।

সন্ধ্যাবেলা ছোটবাবু এসে থানায় টেনে নিয়ে গেলেন।

ব্রিজ জানেন তো? অকশানই চলবে, কনট্রাক্ট আমরা খেলি নে। আপনার আগে যিনি ছিলেন, একেবারে ঘরকুনো তিনি। ঘরে বসে বসে ঝিমতেন, টেনে বের করা যেত না। বিদেশ-বিভুঁয়ে দু-হাত তাস খেলব, তা এমনি জায়গা—চারটে খেলুড়ে একসঙ্গে জোটানো দায়। আমাদের আবার দেখেশুনে চলতে হয়, বাজে লোকের সঙ্গে মিশলে পজিশন থাকে না। সরকারি কাজকর্মের অসুবিধা হয়।

এখানেও দেখছি দয়ালহরি হোড়। কোচড়-ভরতি পেয়ারা এনে আমাদের মাদুরের উপর ঢেলে দিলেন। সরকারি ডাক্তার বলেন, পেয়ারা গুচ্ছের নিয়ে এলেন কেন? খেলে পেট কামড়ায়, বদহজম হয়।

বড়-দারোগা বেছেগুছে সুপক্ক দেখে একটা নিয়ে নিলেন। হেসে বলেন, আমাদের বুঝি ছেলেছোকরা ঠাহর করলে হোড়-মশায়। দাঁত কোথায় যে পেয়ারা চিবোব?

কাশীর পেয়ারা হুজুর। আমার ঠাকুরদামশাই খোদ কাশীধাম থেকে চারা এনে পুঁতেছিলেন। চিবতে হবে না, গালে ফেললে মাখনের মতো আপনি গলে যাবে।

বলে দয়ালহরি আমার পাশে চেপে বসলেন। এদের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি খাতির জমিয়েছেন। ছোটবাবু বাজে লোকজনের কথা বললেন, ইনি তবে সে দলের বাইরে। আমার পাশে বসে জুত দিচ্ছেন; ফিসফিসিয়ে বলেন, কষে সাহেব মেরে দিন, বাঁয়ে টেক্কা নেই।

বড়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন: এই হোড় মশায়, আমার তাস দেখেছ উঁকি দিয়ে। কিছু বলবে না তুমি—একটি কথাও নয়, খবরদার।

সে কী কথা হুজুর। এমনি চোখে কম দেখি, এত দূর থেকে সবই তো ঝাপসা।

বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। বাইরে আবার তাঁর গলা: ঘোড়াকে খোল-বিচালি দিয়েছেন সিপাহিসাহেব—হি-হি-হি—যেন গাই-গরু, খোল খাইয়ে দুধ দুইবেন। এত চোর-ছ্যাঁচোড় আপনাদের তাঁবে, বিলের চোঁচো-ঘাস কেটে এনে দিলে তো পারে। গোটা দুই লোক দেবেন কাল সকালে, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কাদা জলের জায়গা—আমি সঙ্গে না থাকলে বাবুরা অতদূর সেই নাবাল অবধি যাবেন না।

বিরাটগড়ের নাম শুনে ভেবেছিলাম বিরাট বিপুল কোন জায়গা। ছিল তাই একদিন। বড় জমিদার তিন ঘর—এক বাড়ির তো রাজা বলে ডাক। বড় তিন ঘর বাদ দিয়ে মেজো-সেজোরাও ছিল।, হাঁকডাকের অন্ত ছিল না। দুর্গাপুজার সময় পাল্লা হত, কাদের ঠাকুর কত বড়, মচ্ছবের কী কী আয়োজন কোন্ বাড়িতে।

দয়ালহরি বলেন, গাঁয়ের ভিতর একটা পাক দিয়ে আসুন—ভাঙাচুরো দালান-কোঠা আর কসাড় জঙ্গল। সাপ-শুয়োরে পাকা দালান বিনা ট্যাক্সয় পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করছে। শীতকালে বড় মিঞারাও (রাত্রিবেলা কথাবার্তা হচ্ছিল। দয়াল-আকারে ইঙ্গিতে বাঘের কথা বুঝিয়ে দিলেন, খোলাখুলি নাম করতে ভরসা পান না) বেড়াতে আসেন। রূপকথায় রাক্ষসে-খাওয়া পাতালপুরীর গল্প আছে—অবিকল সেই কাণ্ড হুজুর, কড়মড় করে বিরাটগড় চিবিয়ে খেয়ে গেছে।

তাই। আমাদের দেশের বাড়িটা যেরকম, তেমনি বাড়ি একটা-দুটো নয়, গ্রামময় ছড়ানো। মানুষজন গিসগিস করত। দিনকাল খারাপ হয়ে পেটের ধান্দায় কে কোন্ দিকে ছিটকে পড়ল। তার উপরে দাঙ্গা। অঞ্চলটা হিন্দুস্থানে না পাকিস্থানে পড়বে,

তাই নিয়ে টানাপোড়েন চলেছিল অনেক দিন। বড়মানুষের অট্টালিকা যেমন ভেঙে পড়ে আছে, গরিবের পোড়ো ভিটেও তেমনি বিস্তর। দয়ালহরি বলেন, এক গোল-বাড়ির ভিতরেই দশ-পনেরোটা মরে পড়ে ছিল। চাচা আপন বাঁচা তখন, কে কার খোঁজ নেয়! দিন কতক পরে গন্ধ ছাড়তে লাগল। আমার বাড়ির একেবারে সামনা-সামনি—আমার দায়টা বেশি। শেষটা ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে দুজনে মড়ার ব্যবস্থা করলাম। ব্যবস্থা আর কী। গাঙের উপরেই তো বাড়ি টেনেটুনে কোন গতিকে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেওয়া। যেন কালকের কথা। কী দিন সব গেছে, গ্রাম সেই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। শ্মশানক্ষেত্র। আবার একটু জমে উঠছে এখন। উদ্বাস্তুরা আছে, ভাল ভাল মানুষও আসছেন বাইরে থেকে। যেমন এই হুজুর এসেছেন।

হুজুর কিন্তু পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছেন ক'টা দিনের মধ্যে। শহর থেকে এসেছি, ভালয় ভালয় শহরে গিয়ে উঠি রে বাবা! টুনুর আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠি এসেছে; তৎসহ বউদির এক টাটকা খবর—চাঁপাতলায় একটা ভাল কনে দেখে এসেছেন, হাতিবাগান তার পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারে না, সাক্ষাৎ পরীর অঙ্গ থেকে ডানা দুখানা কেটে দিলে যে বস্তু দাঁড়ায়। পাঁচ-দশটা দিন ছুটি মেলে না তোমার ঐ হতভাগা চাকরি থেকে?

আমিও ভাবছি প্রায় সেইরকম। ছুটি-ছাটায় কী হবে, চাকরির পায়ে ষোলআনা দণ্ডবৎ করে উঠি গিয়ে পুনশ্চ আমাদের রোয়াকে। চাকরি অন্য কোথাও যত দিন না জোটে, ইয়ার-বন্ধু সহ যথারীতি রাজা-উজির নিধন-কর্মে লেগে যাই।

মতলবটা বউদিকে নয়, সরাসরি দাদার কাছে জানালাম। যাঁর মত না পেলে কিছু হবে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেক অসুবিধার কথা লিখলাম। কিছু কিছু বাড়িয়েও লিখলাম। দাদার ঘোরতর আপত্তি। কারখানার কেরানি হয়ে হালফিলের দুনিয়া বুঝে নিয়েছেন। গাঁয়ে পড়ে থাকলে এ বুদ্ধি খুলত না। লিখলেন, কপালগুণে সোনার চাকরি জুটে গেছে। কদাপি কোনরকমে কাজের অবহেলা না হয়। অসুবিধা হলে চেপে-চুপে থাকবে। ও-চাকরির নিয়ম, আজ এখানে কাল ওখানে—বারো ঘাটের জল খাইয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বরঞ্চ উপরওয়ালার কাছে তদ্বির কর, তরিঘড়ি যাতে ভাল জায়গায় বদলি করে দেয়। সেই বাবদে বাজে খরচা লাগলে পিছপাও হয়ো না।

ভাল অর্থে দাদা ভাবছেন দুই-চার পয়সা উপরি আছে যেখানে। আর আমি ভাবি, আড্ডা দেবার জুত—গোনাগুনতি এই চার জন সঙ্গী এবং কালেভদ্রে কোন কোন সন্ধ্যায় নিরামিষ তাসখেলা মাত্র নয়। খেলার নামে হুল্লোড়, গানের নামে চিৎকার, তর্কের নামে ঘুষোঘুষি। কিন্তু পাহাড় নড়লেও দাদার কথা নড়বে না। তাঁর হুকুমমত রয়েছি বিরাটগড়ে পড়ে এবং উপরওয়ালার কাছে লেখালেখি করছি, বাজে-খরচা করতেও রাজি, কিন্তু কী পদ্ধতিতে কোন্ লোকের মারফতে এগুব, সঠিক জানা না থাকায় ভরসা করতে পারি নে।

হরিশ আছে। তুখোড় ছোকরা। গুণপনার দিনকে দিন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আপিসের চাপরাসির কাজটাও তাকে দিয়েছি ইতিমধ্যে। কাপড়-জামা সাবান-কেচে রান্না সেরে জুতোয় বুরুশ ঘষে বাসন মেজে তারপর ঝাঁ করে উদি-চাপরাস পরে নিয়ে গোঁফ চুমরে এসে দাঁড়ায়, তখন আলাদা এক মূর্তি। বেলা দশটায় চাপরাসি সহ হাকিম সাহেব এজলাসে গিয়ে ওঠেন। এই পাড়াগাঁয়ে আরশুলাকে কেউ পাখি বলে

না, কিন্তু সাব-রেজিস্ট্রারকে বলে হাকিম—দয়ালহরি একা নন, সবসুদ্ধ হুজুর-হুজুর করে। শুনতে খাসা লাগে, মেঝের তখন জুতো ঠুকতে ইচ্ছে করে। চারটে অবধি উঁচু মেজাজে কেটে যায় এমনি। রেজেস্ট্রি অফিসের হাকিম সাহেব।

সরকারি ডাক্তার মিশুক লোক। বয়সে প্রবীণ—আছেন অনেক কাল এখানে, সেকেলে চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারির আমল থেকে। এ-পথে এলেই রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে সাড়া নেন। বাসায় থাকলে সাইকেল থেকে নেমে এসে ওঠেন।

তামাক সাজুরে হরিশ। তামাকের পাট নেই বুঝি—সিগারেট। এই এক হয়েছে আপনাদের! বলবেন, হাঙ্গামা কম। আরে ভায়া, জমিয়ে বসে মউজ না হল তো নেশা কিসের শুনি? ভাত-ডাল নয় যে খেতেই হবে। হাঙ্গামা এড়াতে চান তো ও-পাট ছেড়ে দিলেই হয়।

ভাল পসার ডাক্তারবাবুর। সকালের দিকে সরকারী ডিউটি, বাকি সময় সাইকেলের উপরেই আছেন। বয়স হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার পরে বড়-একটা বেরোন না। দূর-দূরন্তর হল তো দিনমানেও যেতে চান না। নিতান্তই যেতে হল তো ঘোড়ায় ব্যবস্থা আছে।

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে সিগারেট টানতে টানতে ডাক্তারবাবু বলেন, খাটনিই সার ভায়া। টাকার অংকে কিছু নয়। মানুষে ছাড়ে না, তাই বেরুতে হয়। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, জল নেই। ছ্যা-ছ্যা, এ কী একটা জীবন! ছেলেটা লেখাপড়া যদি শেখে, আর যা-ই হোক, তাকে ডাক্তারি পড়তে দেব না। গিন্নি বলেন, ডাক্তার জামাইও আনা হবে না মেয়ের বিয়ে দিয়ে। সকালে একদিন সেন্টারে গিয়ে সেখানকার ভিড়টা দেখে আসবেন। আমি বুড়োমানুষ, কম্পাউন্ডার আরও বুড়ো হয়ে পড়েছে। সে বলে, অষুধের জল বয়ে পারি নে, রোজ দেড়-দু কলসি লাগে।

আমি বলি, ওই জলই তো? জল ছাড়া অন্য কিছু দেন নাকি আপনারা? বিশেষ এই মফস্বল জায়গায়?

ডাক্তারবাবুও হেসে তেমনি জবাব দেন, দিই বইকি। অষুধে রঙ ধরাই তবে কেমন করে—বেগুনি, গোলাপি, লাল। মুখেও দিয়ে দেখবেন কী বিষম উৎকট। সে যা-ই হোক, খাটতে রাজি আছি ভায়া। পেটে খেলে পিঠে সয়। খাটুনির সঙ্গে সঙ্গে পকেটও ভরতো যদি, তবে আর কোন দুঃখ ছিল না।

বদলি হয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। যোগাড়-যন্তর করে আবার চলে এলেন। নগদ ও নাকি ছাড়তে হয়েছিল এই ব্যাপারে। দয়ালহরির কাছে এসব শোনা। উনি নিজেও বলেন। বউ-ছেলেপুলে দেশে রেখে একলা একটি প্রাণী আছেন পড়ে। অতএব মুখেরই হা-হুতাশ—ভিতরে মজা আছে।

ডাক্তারবাবু বলেন, লোকে বলে টাকার লোভে আছি। তা নয়, মায়ায় পড়ে গেছি। এ তল্লাটে বিশ মাইল অবধি আমার নাম করে যান, বাচ্চা ছেলেটি অবধি চিনবে। সেই কোন্‌কালে ক্যাম্বেল ইস্কুলের একখানা সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিলাম, নতুন জায়গায় গিয়ে কে আমায় আমল দেবে? কাজ দেখিয়ে পসার জমাব, সে অনেক কথা। থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে পড়ব তদ্দিনে।

চতুর্দিক একবার তাকিয়ে নিয়ে নিশ্বাস ফেললেন সহসা: কী বলব, এই বিরাটগড় জায়গাও একেবারে নতুন ঠেকে আমার কাছে। কী জাঁকজমক দেখেছি। পুরানো কথা ছেড়ে হালফিলের ওই গোলবাড়ি ধরুন। শ্রীনগরে বড় ব্যবসা ছিল ওঁদের!

কাশ্মীরে আস্তে আস্তে গোলমাল জমে আসছে। বুঝতে পারলেন, শান্তিতে ব্যবসা করা বেশি দিন আর ঘটবে না। ব্যবসা-পত্র গুটিয়ে ফেলে তখন পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠলেন। কী ধুমধাড়াক্কা চলল দিনকতক! চেহারা কী মানুষগুলোর! কিবা পুরুষ, কিবা মেয়ে। এই লম্বা গড়ন, দুধে-আলতায় মেশানো রঙ, ভ্রু-চোখ টানা-টানা। রোজ সন্ধ্যায় আমায় যেতে হবে একটিবার। অসুখ-বিসুখ না থাকলেও যাই। অসুখ নয় বা কী করে বলি! গিন্নির বারো মাস বাতের ব্যারাম। তা ছাড়া কারও মাথা টিপ-টিপ করছে, কারও ঘুম হয় নি ভাল, কারও বা বার দুয়েক ঢেকুর উঠেছে। শরীর ভাল আছে শুনলে বড়লোকের মন-মেজাজ বিগড়ে যায়—ভাবে, ডাক্তার যত্ন করে দেখছে না। আমার কী—যাকে যা বললে খুশি হবে, তাই বলি। খাওয়াটা এক বেলা ওখানে—রাতে কোনদিন বাসায় খেতে হয় না। মাস-মাইনে দু'শ টাকা। পয়লা তারিখে দুখানা এক-শ টাকার নোট খামে করে এনে দিয়ে যায়। মেজাজি বড়লোক। চোখের উপরে সমস্ত শেষ হয়ে গেল। আর এখন গাঁয়ে এসে জুটেছে দেখুন না—লোক নয় তো পোক, পোকার মতন কিলবিল করে। ঘরবাড়ি টাকাপয়সা ফেলে উদ্বাস্তু হয়ে রাজ্যের রোগ-পীড়েগুলোই কেবল সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

কথার মধ্যে হঠাৎ ডাক্তারবাবু তড়াক করে উঠে পড়লেন।

বসবার জো আছে ভায়া। জেলেপাড়ায় খাবি খাচ্ছে একটা। ভুলে গিয়েছিলাম। হয়তো বা টেঁসে গেছে এতক্ষণে। মড়িবাঁধার উয্যুগ করছে। খালি পকেটে অঞ্চলময় এখন ডন কষে বেড়ানো।

সাইকেলের বেল বাজিয়ে সাঁ-সা করে ডাক্তারবাবু ছুটলেন।

সন্ধ্যাবেলা থানায় ডাক পড়ে প্রায়ই। হ্যারিকেন ও লাঠি-বন্দুক নিয়ে কনস্টেবল চলে আসে। ছোট দারোগার বিষম তাসের নেশা—কাজের দায়ে বাইরে গেলে অবশ্য হয়ে ওঠে না—থানায় উপস্থিত থাকলে তাসে তাঁরা বসবেনই। ডাক্তারবাবু যান—ডাক্তারবাবু ছোট দারোগা বড় দারোগা তিনজন তো আছেনই, এবং আমি অথবা দয়ালহরি। দয়ালহরির অন্য দশটা কাজে যেমন, খেলার ব্যাপারেও তাই। হুকুমের মাত্র অপেক্ষা। আমায় পেলে তাঁকে আর বসতে হয় না। হাকিম হাজির থাকতে ভেন্ডারকে কে ডাকে? তাসখেলার ব্যাপারেও পাড়ার মধ্যে আমার নাম ছিল—এখানে আনাড়িদের মধ্যে তো শাহান-শা সম্রাট।

চিরকেলে আড্ডাবাজ মানুষ আমি; কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন বিতৃষ্ণা ধরে আসছে। এটা-ওটা অজুহাত দেখিয়ে কনস্টবলদের ফিরিয়ে দিই অনেক দিন। খেলার ঝোঁক ছোট দারোগার যতই থাক্, আদপে তিনি খেলতে জানেন না। এবং অঞ্চলটার অধিপতিস্বরূপ নিজেদের বিবেচনা করে খেলার ভিতর ক্ষণে ক্ষণে মেজাজ দেখান। আমার বরদাস্ত হয় না। একদিন তার চরম দেখতে পেলাম। পাশের এক গাঁয়ে বৈশাখ মাস ধরে মেলা বসে, গ্রাম্য ছুতোরের গড়া অনেক রকম কাঠের জিনিস আমদানি হয় সেখানে। হরিশকে নিয়ে একদিন সেখানে গিয়ে একগাদা কাঠের খেলনা কিনলাম টুনুবাবুর জন্য। পুজোয় বাড়ি যাব, খেলনা পেয়ে সে আহ্লাদে নৃত্য করবে।

ফিরে আসছি, রাত হয়ে গেছে খানিকটা, থানার কাছে এসে কানে এল ছোটবাবু বিষম ক্রোধে কার উপর গর্জাচ্ছেন। হরিশকে বাসায় যেতে বলে আমি ঢুকে পড়লাম। ও হরি, তাস খেলার ব্যাপার! চটেন ছোটবাবু, কিন্তু এত উত্তেজনা দেখি নি কোনদিন। হোড় মশায় তাঁর পার্টনার। খুন, না চুরি-ডাকাতি করেছেন—ঠিক

তেমনিভাবে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, চোখ ছলছল করছে তাঁর। আমতা-আমতা করে কী একটু বলতে গেলেন, ছোটবাবু তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে বুড়ো মানুষটার টুঁটি চেপে ধরলেন। বাঘে যেমন হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি হতভম্ব, এরকম ব্যাপার ধারণায় আসে না। শীর্ণ দয়ালহরি থরথর করে কাঁপছেন। এমন আর হবে না হুজুর, এই ধরনের বলতে যাচ্ছেন কিছু। কিন্তু ছোটবাবুর তাড়ায় বক্তব্য আটকে যায়। আমি গিয়ে পড়েছিলাম ভাগ্যিস, নয়তো শুধু গলা চেপে ধরায় বোধহয় শেষ হত না, কিলটা ঘুষিটা হত। আমায় দেখে দয়াল-হরিকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা নরম হয়ে ছোটবাবু নিজ স্থানে বসলেন: চিঁড়ে-হরতন ক'টা রঙই কেবল চিনে রেখেছেন হোড় মশায়? যাক গে, বেঁচে গেলেন। খেলুড়ে মানুষ এসে গেছেন। কাজকর্ম থাকে তো বেরিয়ে পড়ুন—চলে যান।

এই কাণ্ডের পরেও খেলায় বসতে বলে। মানুষকে কী ভাবে ওরা? ডাক্তারবাবু বলেন, দাঁড়িয়ে কী ভাবেন? বসুন।

কেন?

বড় দারোগা বলেন, হোড়ের হাত নিয়ে বসে যান। বড্ড জমেছে। স্লামে স্লামে আমাদের ছয়লাপ। হেরে গিয়ে ছোটবাবু অত ক্ষেপেছেন।

আমি বললাম, দেখছি তাই। কিন্তু আরও হেরে গিয়ে আমার উপরেও যদি হামলা দেন। তখন তো ব্যাপার একতরফা হবে না।

বড় দারোগা হাঁ হাঁ করে ওঠেন: হোড় আর আপনি। ছি-ছি, এমন কথা বললেন কী করে?

মাপ করবেন, খেলবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না আমার—

বলে গটমট করে নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এলাম। পরদিন অফিসে ঢুকতে দেখলাম, হোড় মশায় মক্কেলপরিবৃত হয়ে খসখস করে দলিল লিখে যাচ্ছেন। হাকিম এসে যাওয়ায় চারিদিকে তটস্থ ভাব—তাঁর নিচু ঘাড় উঁচু হয়ে উঠল না। আমার জুতোর আওয়াজ একেবারেই কানে যায় নি, এটা মনে হয় না। লজ্জা—কী লাঞ্ছনাই হল তুচ্ছ তাসখেলা নিয়ে। লজ্জা আমারও। অন্য দিন দাঁড়াই, কাজকর্মের ভিড় কেমন হবে আন্দাজ নিই, দু-চারটে কথাও বলি এর-ওর সঙ্গে। আজকে তাড়াতাড়ি নিজের ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকে মোটাসোটা এক আইনের বই খুলে বসলাম।

ক'দিন কাটল। আর যাই নে থানায়। কনস্টেবল যথারীতি ডাকতে আসে। এসে ফিরে যায়। একদিন—পরে শুনলাম দয়াল-হরিকে পাওয়া যায় নি, কোন মক্কেলের বাড়ি নিমন্ত্রণে খেতে গিয়েছিলেন—আমি যাব না বললেও কনস্টেবল নড়ে না। নিয়েই যাবে। আমারও তখন মেজাজ বিগড়ে যায়: খুনি আসামী নাকি, ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছ? বেরিয়ে যাও বলছি উঠোন থেকে।

কনস্টেবল ফিরে গিয়ে কী বলেছে জানি নে, পরদিন ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত।

হল কী ভায়া, খেলাটেলা বন্ধ করে দিলেন?

আর যাব না ডাক্তারবাবু।

কেন, ঘরে বসে কী করবেন?

সেদিন ওই কাণ্ড হয়ে গেল, আপনার চোখের উপরেই তো হল, তারপরে কী করে যাওয়া চলে বলুন?

ডাক্তারবাবু অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলেন, কী হল সেদিন?

ছোট দারোগা ভদ্রলোককে অমনভাবে অপমান করলেন। কী আশ্চর্য, কিছুই আপনার মনে পড়ছে না ?

ডাক্তার বললেন, রসুন রসুন। দয়ালহরির গলা চেপে ধরেছিল, তাই বোধহয় বলছেন ? কিন্তু অপমান হবে কেন ?

অপমান কিসে হয় তা হলে ?

আমার আপনার অপমান হতে পারে। অতখানি লাগেও না। কিন্তু টৌনি মানুষ, মোসাহেবি করে বেড়ায়—ওদের চামড়া মোটা, গায়ে লাগে না। আপনি তো রেগেমেগে চলে এলেন। তখন আবার সেই আসরেই হোড় মশায় বসে গেল।

টৌনি কথাটার সঙ্গে পরিচয় এখানে এসে। মক্কেলের হয়ে তদ্বির-তদারক করে, কাজ হাসিলের জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বাছবিচার নেই। এই হল টৌনির ব্যবসা। যাদের হাতে কাজ আছে, খাতির রেখে চলতে হয় সেইসব লোকের সঙ্গে। মাথার লোকের সঙ্গে খাতির আছে বুঝলে তবেই মক্কেল জমে।

ডাক্তারবাবু বলছেন, সেই দিন খেলেছে, রোজই খেলে। আপনি যান না, কিন্তু খেলা একটা দিনও বন্ধ নেই। কম বয়স আপনার, তাই মাথা গরম করেন। অকারণে চটিয়ে দিলেন ছোটবাবুকে। বাইরের ক'টি প্রাণী আমরা এখানে। দায়ে-বেদায়ে পরস্পরকে কাজে লাগে। নিজেদের মধ্যে মন-ভাঙাভাঙি হওয়া ঠিক নয়।

ডাক্তারবাবুর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। অফিস-ফেরতা সেদিন দয়ালহরিকে ডেকে এলাম ঃ যাবেন আমার ওখানে একবার।

যে আজ্ঞে।—বলে মাথা কাত করলেন। এবং যথাকালে এসে উপস্থিত। সোজা রেজেস্ট্রি অফিস থেকে চলে আসেন নি। শুধু হাতেও নয়—শুধু হাতে আসেন কালে-ভদ্রে কদাচিৎ—হাতে একটা লাউ। লাউ নামিয়ে রেখে—ঐ তো লম্বা মানুষ, ঘাড় বাঁকিয়ে প্রায় গোলাকার হয়ে নমস্কার সেরে বললেন, গাছের লাউ হুজুর।

এসব কেন আনেন ? হরিশ মুসুরিডালই পারে না, তার লাউ রাঁধবে !

তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন ঃ শুনলাম তাস খেলতে যান আপনি থানায় ?

দু-পাটি দন্ত বিকশিত করে দয়ালহরি বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ—

সেদিনের ওই কান্ডের পরেও ?

দোষ আমারই ছিল। ছোটবাবু চোখ টিপছেন টেক্কা মারবার জন্য, আমি নজর করে দেখি নি। চোখের দৃষ্টি ভাল নেই, সব সময় সব জিনিস নজরে আসে না।

তাই টুঁটি ধরবেন একজন ভদ্রলোকের ?

এই কথায় ভদ্রলোক গদগদ হয়ে উঠলেন ঃ দেখুন তাই। আপনি মহৎ বলে বুঝেছেন ব্যাপারটা। ভদ্রলোক তো কতই থাকে, বিশেষ মানী লোক আমরা এদিগরের। উপাধি আমাদের হোড়-রায়, লম্বা হয়ে যায় বলে রায়টা আর লিখি নে। ছোটবাবুর গায়ে যেন অসুরের বল, দম আটকে অক্কা পেতাম আর-একটু হলে। রাতে ঘাড় ফেরাতে পারি নে। বড় বউয়ের হাঁপানির টান, সে উঠতে পারল না তো নিজের হাতে সারা রাত তারপিন মালিশ করি। দু-তিন দিন মালিশের পর ব্যথাটা গেল। সেই সেই থেকে খুব নজর রেখে খেলি হুজুর। আর কখনও অমনধারা হবে না।

তারপর সকাতরে বলেন, হুজুর যাচ্ছেন না কেন ? হুজুর গেলে তো আমার খেলা মাপ হয়ে যায়।

এই মানুষের জন্য চটে রয়েছি আমি, এই নিয়ে ঘোঁট পাকাতে যাচ্ছিলাম ? পরের দিন তেল মেখে স্নানে যাচ্ছি তখন আর এক মজা। রাধানাথ হঠাৎ আমার বাসায়।

রাধানাথও রেজেস্ট্রি অফিসের দলিল-লেখক, বয়স কম, অল্প দিন এই কাজে এসেছে, মক্কেল জোটাতে পারে নি এখনও সে রকম। রাধানাথও লাউ এনেছে—একটা নয়, দু হাতে দুটো।

কী চাই?

হুজুর লাউ ভালবাসেন।

কে বলল?

আজ্ঞে—থতমত খেয়ে সে চুপ করে যায়।

চটে গিয়ে বলি, কোথায় পেলেন এ সব আজব কথা? লাউ আমি খাই নে, হরিশও রাঁধতে জানে না।

লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি পুকুরঘাটে নেমে যাই। স্নান সেরে এসে দেখি, রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে হরিশের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। আমায় দেখে সুড় সুড় করে সরে পড়ল।

হরিশকে বললাম, কালকের লাউ পড়ে আছে, আবার লাউ রাখতে গেলি কেন?

এক গাঁয়ের মানুষ। ফেরত দিলে আমারই উপর রাগ করবে। বলবে, সরকারি কাজ পেয়ে বেটার দেমাক হয়েছে। তার চেয়ে কুচি কুচি করে কেটে গরুর মুখে ধরব। ভগবতী খেয়ে নেবেন, পুণ্যি হবে।

হঠাৎ এত লাউ আসতে লাগল কেন বল্‌ দিকি?

দুটি প্রাণী এক বাসায় বসবাস করি—চাপরাসি হলেও হরিশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফিক ফিক করে সে হাসতে লাগল। বলে, এ আর কী দেখছেন? রটনা হয়ে গেছে, লাউ এখন ঝাঁকা ঝাঁকা আসবে। কাল হোড় মশায় এলেন, রাধানাথ তখন রাস্তার উপর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে। আরও সব নিশ্চয় এদিকে ওদিকে ছিল। না দেখলেই বা কী? হোড় মশায়ই তো জাঁক করে সকলকে বলে বেড়ান। থানার দারোগারা চোখে হারান ওঁকে, রেজেস্ট্রি অফিসের হাকিম হামেশাই বাসায় ডেকে পাঠান। দেখেও তাই সকলে। তারাও অমনি হোড় মশায়ের মতন খাতির জমাতে চায়।

এখন মনে পড়ছে। কাল যখন দয়ালহরিকে বাসায় আসতে বললাম, 'যে আজ্ঞে' বলে চতুর্দিকে উনি দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তাই বটে। হরিশের কাছে শুনে মানেটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

কনস্টেবল ডাকতে আসে না। আর কেন, নিজেই চলে গেলাম থানায়। রচনাশক্তি আছে আমার বেশ—এতদিন না আসার একটা লাগসই কৈফিয়ত খাড়া করলাম। ওঁদেরও লোকাভাব। ছোটবাবুর মনে রাগ থাকলেও দু-চারটে মিষ্টি কথায় সমস্ত মিটে গেল। খেলাটা ভাল জমল সেদিন। খেলা ভেঙে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছি।

অভাবে মানুষ কী হয়ে যায়, এই দয়ালহরির বেলা দেখুন। এত মোসাহেবিও পারে মানুষে! বিশেষ অমনি এক ঘটনা হয়ে যাবার পর!

ডাক্তারবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, যার যে ব্যবসা। মেথর যদি শুচিবেয়ে হয়ে যায় যে ময়লা ঘাটবে না, কিংবা আমি ডাক্তার যদি বলি যে মড়া ছুঁতে পারব না, তবে তো ভাত জুটবে না পেটে। আপনার হাকিমি চাকরি—হ্যাঁ, মান টেনে বেড়াতে পারেন স্বচ্ছন্দে। হোড় মশায়দের গলাধাক্কা দিন, তবু দেখবেন ছিনে-জোঁকের মতন গা লেপটে বেড়াচ্ছে—মক্কেলদের দেখিয়ে দেখিয়ে। কী, না খাতিরটা দেখে নাও হুজুরের

কাছে। হুজুরকে দিচ্ছি বলে আজেবাজে কত পয়সা ফাঁকি দিয়ে নেয় সে যদি খবর রাখেন!

কী সাংঘাতিক! তবে তো সামাল হতে হয় এদের কাছ থেকে!

সামলাবেন ক'জনকে ভায়া? কাজেকর্মে লাগেও তো মানুষ-জন। যার সঙ্গে মেলামেশা করবেন, সে-ই সুযোগ নেবে। ও ঠেকাবার জো নেই। আপনি নতুন মানুষ বলেই বলছি চোখ নিচু করে তাকাবেন না ওসব দিকে। আপনি করে খাচ্ছেন, যার যেমন পথ—তাদেরও নিজের কায়দায় করে খেতে দিন।

যাচ্ছি আবার তাসের আড্ডায়। আর কিছু দৃক্‌পাত করি নে। তবে নিয়মিতভাবে নয়। একদিন যাই তো দু-দিন যাই নে। যোগাযোগটা আছে এই মাত্র। না যাওয়ার ভিন্ন কারণও ঘটেছে। গোপনে বলি, খবরদার চাউর করে দেবেন না। গানের গলা আছে, সে তো জানেন। পাড়ার সরস্বতী-পুজোয় বছর বছর গান লিখবারও দায় ছিল আমার। সেই রোগটা অধিক প্রকট হয়েছে এখানে। পাঁচ-সাত লাইনে গান বাঁধা হয়ে যেত, সেই বস্তু এখন পাঁচ-সাত পাতা জোড়া পদ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। বয়সটা খারাপ, কাজকর্ম সামান্যই এবং চতুর্দিকে গাঙ-খাল ও সবুজ গাছপালা। পদ্যের আয়তন দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। আড্ডায় না গিয়ে নিরিবিলি খাতাপত্র নিয়ে বসি। তিন-চারটে খাতা ভরাট হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

মাস কয়েক কাটল। বিরাটগড় বেশ গা-সওয়া হয়েছে। বদলির জন্য তেমন ছটফটানি নেই। দিনমানে মন্দ লাগে না। হাকিমরূপে খানিকটা সময় সমারোহে অফিসে কাটে। কোন বড় জায়গা হলে—নতুন মানুষ আমি—কারও না কারও অধীনে কাজ করতে হত। এখানে একেশ্বর। পদ্য জমে উঠল তো গেলাম অফিসে একটা-দুটোয়। দলিল জমা দিয়ে লোকগুলো তীর্থকাকের মত বসে আছে। দেরি হোক যা-ই হোক, মোটের উপর এসে গেছি, তাতেই এরা কৃতার্থ। এ নিয়ে সদরে কেউ লেখালেখি করতে যাবে না, সে প্রশ্ন মনেও আসে না কারও।

অফিসের পরে নদীর ধারে ঘোরাঘুরি করি খানিকটা—এই অভ্যাস করে নিয়েছি। পরিত্যক্ত কোন ভাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম হয়তো কোনদিন। শিয়াল ঘুরছে কী যেন শুঁকে শুঁকে, মানুষ দেখে বাড়ির ভিতর ঘন জঙ্গলের দিকে পালাল। কত উৎসব-সমারোহ হত, কত মানুষের হৈ-চৈ—আজকে দেখুন সেই জায়গার দশা। মনটা উদাস হয়ে যায়। ঘুরতে ঘুরতে তার পরে হয়তো গেলাম থানায়, আড্ডা দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে এলাম। অথবা বাসায় এসে হ্যারিকেন জেলে বসে পড়লাম। হরিশকে চা আনতে বলি কিংবা কাছে ডেকে এনে এ-গল্প সে-গল্প করি তার সঙ্গে।

এ পর্যন্ত এক রকম কাটে। কিন্তু মুশকিল আরও পরে, রাত্রি গভীর হয়ে উঠলে। যেন ভিন্ন জগৎ। কলকাতা শহরে দিনে রাতে তফাত বড় নেই। আস্থা করা যায়, হ্যাঁ, একই জায়গা বটে, রাস্তা ঘরবাড়ি মানুষ-জন এক। কিন্তু বিরাটগড় দিনমানের চেহারা বদলে ফেলে ভিন্ন রকম হয়ে গেছে রাত্রে। দিনের লোক যারা, ঘরে ঘরে তারা সব খিল এঁটে দিয়েছে। নতুন একদল বেরিয়েছে। এসেছে ভাঙা অট্টালিকার অন্ধিসন্ধি থেকে, গাছের ঘনপত্রের ভিতর থেকে, নানান অলক্ষ্য অগোচর জায়গা থেকে। কোনখানে সারাদিন অন্ধকারের সঙ্গে লেপটে থাকে, সময় বুঝে বেরিয়ে পড়ে সবসুদ্ধ। তোলপাড় লাগিয়ে দেয়। তক্ষক ডাকে ঘরের আড়ায়। ফেউ ডাকে জঙ্গলে—তার মানে বড়মিঞা কিংবা ওই-জাতীয় বড়দের কেউ দর্শন দিয়েছেন। বাদুড়ের ঝাঁক কিচিরমিচির করে

দেবদার্র পাকা ফল খায়, গাছের উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আম-কাঁঠালের বাগিচা বাসাবাড়ির প্রায় চতুর্দিকে। পুরানো বাগান, অতিকায় গাছপালা। মাথায় মাথায় আঁটা—যেন জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদ-সূর্যি এলাকার মধ্যে উঁকি দিতে দেবে না। পাঁজি দেখে বলতে হবে, তিথিটা অমাবস্যা না পূর্ণিমা—চোখে দেখে ধরবার জো নেই। গা সিরসির করে—এই বুঝি সাপ এসে ঢুকল বেড়ার ছিদ্রপথে, বাঘ বুঝি হামলা দিয়ে পড়ে বেড়ার উপর! কবি নিশিরাত্রে দার্শনিক হয়ে যান—কাজ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে মানুষে মানুষে তফাত হয়ে থাকা একান্ত অনুচিত, এই মহাতত্ত্ব মনে পড়ে যায়। দাওয়ার এক দিকে হরিশ ছ্যাঁচাবাঁশের বেড়া দিয়ে নিয়েছে, সেই জায়গা থেকে তাকে ঘরের ভিতরে ডেকে নিই। হাকিম ও চাপরাসির পাশাপাশি শয্যা। দশেধর্মে দেখে না এই যা—দেখতে পেলে আমার এই ঔদার্যে ধন্য ধন্য করত।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে ঘুম ভেগে উঠে হরিশ ডাকছে, উঠে পড়ুন হুজুর, উঠুন। বেড়ার ওদিকে জলের তোড় শোনা যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। সর্বনাশ, এত জল! উঠানে স্রোত বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলেছে আজ দু'দিন ধরে। কিন্তু বিকাল থেকে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ। তখন তো এত জল দেখা যায় নি।

এদিক-ওদিক তাকাই। জলের সমুদ্র। মেঘভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অফিস-বাড়ি দ্বীপের মত দেখায়। উঁচু পোতার উপর বাড়ি, জিওলের ডাল পুঁতে কাঁটাতারে ঘেরা চারিদিক। বেড়ার নীচে জলের ধাক্কা দিচ্ছে, এখানে এই দাওয়া থেকেই নজরে আসছে। দাওয়ায় বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। ভারি এক আফালি করল। হরিশ চুকচুক করে: ইস, একেবারে ছাঁচতলায় গো! মস্ত বড় কাতলা। পুকুর-টুকুর সব ভেসে গিয়ে মাছ বেরিয়ে পড়ল। খেপলা-জাল পেলে এক্ষুনি ওটাকে কায়দা করতাম।

বান ডেকেছে। সকালের আলো ফুটলে লটবহর নিয়ে এক-হাঁটু জল ভেঙে রেজেস্ট্রি অফিসের দালানে উঠলাম। এসেছিলাম ভাগ্যিস। বানের তোড়ে সন্ধ্যাবেলা কাঁচা বাসাবাড়ি ভেঙে পড়ল। ভাঙা চাল, খুঁটি বেড়া এদিক-সেদিক ভেসে চলেছে। ওইখানে থেকে গেলে আমাদেরও বোধহয় অমনি ভাসতে হত।

যদি বলি, মজাও পাচ্ছি আমি—অবিশ্বাস করবেন না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কলকাতায় লিখি-লিখি করেও এ ব্যাপারের কিছু জানালাম না। কী হবে—দাদা-বউদি ব্যস্ত হবেন মিছিমিছি। বন্যা এ তল্লাটে নতুন নয়, বন্যার ভয়ে কে কবে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে? যাই বলুন, শহরের কোন এক বড় অফিসের কেরানি হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল এখানে। মুক্তি আছে। দাদাকে লিখে দিলাম, বৃষ্টি-বাদলা বড্ড হচ্ছে, পথঘাট ভেসে গেছে। এবং দাদারও জবাব আসবে জানি: সাবধানে থেকো, কুইনাইন খেয়ো রোজ দু-বড়ি করে। সকালে একটা সন্ধ্যায় একটা, জল না ফুটিয়ে খেয়ো না, ইত্যাদি।

দিন চারেক পরে জল সরে গিয়ে ফের ডাঙা দেখা গেল। তখন ঘরের সমস্যা। সরকারি অফিসের মধ্যে চিরদিন বসবাস চলে না। জায়গাই বা কোথা? ভেণ্ডারদের সেরেস্তার পাশে একটু ঢাকা বারান্দা। দেয়ালটা বেড়ায় ঘিরে পোস্টাফিস বসিয়েছে। নতুন বাঁশ-খুঁটি দিয়ে আবার ওইরকম খোড়ো-ঘর তুলে দেবে, সেখানে পুনশ্চ গিয়ে উঠব, তাতে আমার ঘোর আপত্তি। বৃষ্টি-বাদলা চলল তো এখন—আশ্বিনের ঝড়-

বাতাসের বড় মরশুম সামনে। এবার হরিশ ডেকে তুলেছিল—এমন হতে পারে, দুজনের কেউ আমরা টের পেলাম না, ঝপাস করে ছাউনিসুদ্ধ চাল ভেঙে ঘাড়ের উপর পড়ল। চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয় সে ভী আচ্ছা—পাকা জায়গা ছাড়া থাকছি নে। ডাক্তারবাবু ও দারোগাদ্বয়ও চিন্তিত হয়েছেন—তাই তো কী করা যায়! একসঙ্গে বেশ থাকা যাচ্ছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাকরি জোটানও সোজা নয় আজকাল। কিন্তু চিন্তা ও আলোচনায় কোন্ সুরাহা হতে পারে—দালানকোঠার বাসাবাড়ি কে বানিয়ে দিচ্ছে সাব-রেজিস্ট্রার হাকিমের জন্যে?

তারপরে বড় দারোগাবাবুরই খেয়াল হল কথাটা। হোড় মশায়কে বললেন, গোলবাড়িতে দাও না হে ব্যবস্থা করে। মাখন মিত্তির ক'টা ঘর মেরামত করে নিয়েছিল—সে যখন আসছে না, মিত্তিরকে লিখে চাবি আনিয়ে ঘর খুলে দাও। আমার আর ডাক্তরবাবুর নাম করে লেখ, আপত্তি করবে না।

হোড় মশায় প্রস্তাবে তেমন গা করেন না। মিনমিন করে বললেন, তা হলে তো ভালই হয়। চাবির জন্যে আটকাচ্ছে না, আমার কাছেও চাবি ছিল একসেট, খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু উনি কি থাকতে পারবেন?

আমি বললাম, ঘরবাড়ি বাইরে থেকে তো ভালই মনে হল। অসুবিধে কী?

হোড় মশায় বলেন, মিত্তির ওই মানুষ। এসেও ছিল থাকবে বলে। সে কিন্তু থাকতে পারে নি। এক দিনে বাপ-বাপ করে পালাল।

বড় দারোগা টেবিল চাপড়ে বললেন, কুছ পরোয়া নেই। মাখন মিত্তির আর আপনি! বন্ধুলোক আপনি, সরকারি লোকও বটেন। কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব বাড়ির সামনে। সারা রাত্তির পাহারা দেবে। কোন রকম উৎপাত হবে না। কী আশ্চর্য, আকাশ-পাতাল ভেবে মরছি—গোলবাড়ির কথা কেন যে মনে পড়ে নি—

হোড় মশায়ের দ্বিধা তবু ঘোচে না: তা বেশ তো চাবি-ছোড়ান পাওয়া যাবে। হুকুম হলেই তালা খুলে দেব। ঘরও খাসা। রাঙা মেঝে, রঙ-করা দেয়াল, মিত্তিরের শখ-করে-কেনা আসবাব-পত্তর—সরকারি পাকা-বাসা যদ্দিন না বানিয়ে দিচ্ছে স্বচ্ছন্দে ভোগ-দখল করুন গে ওইসব। কথা হল, কনস্টেবলের ব্যাপার নয়—একটা কেন, এক গণ্ডা মোতায়েন করলেও কিছু করতে পারবে না। কনস্টেবল চোর-ডাকাত সামলাতে পারে, ওঁদের উপর কোন্ এক্তিয়ার আছে বলুন?

গোলবাড়ি ও মাখন মিত্তিরের ব্যাপার আগে কিছু শুনেছি, আরও বিশদভাবে শোনা গেল। গ্রামের এক পাশে নদীর কাছা-কাছি সেকেলে বাড়ি। চকমিলান—অর্থাৎ উঠান ঘিরে চারি-দিকেই দালান-কোঠা। দোতলা। সদরে ছিল সিংদরজা—গুল-পেরেক বসান প্রকাণ্ড কপাট, এমন শক্ত যে, কুড়াল মারলে ফিরে আসে। অত বড় বাড়ি, ঢোকবার সেই একমাত্র পথ। খিড়কির বাগানে যাবার আর-একটা ছোট্ট দরজা পিছন দিকে, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাগানের চারিদিক, বাইরে থেকে বাগানে ঢোকা যায় না। দেয়াল পাক্কা দু-হাত আড়াই হাত চওড়া—জানলা নয়, ছোট ছোট ঘুলঘুলি। ডাকাতে হানা দিয়ে এ-বাড়ির কিছু করতে পারবে না। ইয়োরোপে যেমন ক্যাসল বানাত সেকালে।

কতকটা ক্যাসলের মতই সামনের ঘরটা গোলাকার। গোল গোল থাম। এত উঁচু এমন গোলঘর-ওয়ালা বাড়ি এ তল্লাটে আর নেই। নৌকোয় যেতে যেতে এক বাঁক আগে থেকে লোকে গোল-বাড়ি দেখায়। বিরাটগড় গাঁয়ের নিশানা। কোন্

চৌধুরি নবাব-সরকারে কাজ করতেন, তাঁর এই বসতবাড়ি। হাঁকডাকের অন্ত ছিল না, হাতে মাথা কাটতেন তাঁরা নাকি সে আমলে।

নবাবি আমল গিয়ে কোম্পানির আমল—তখন আর-এক যুগ। তালুক-মুলুক একের পর এক লাটে উঠে চৌধুরিদের অবস্থা একেবারে পড়ে গেল। গ্রাম ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন অনেক দূরে কোথায়। শোনা যায় পেশোয়ার, তারপরে কাশ্মীর। সেইখানে ব্যবসা ফেঁদে বসলেন।

মোটরগাড়ি ও মোটরের কলকব্জা আমদানি বাইরে থেকে। প্রায় একচেটিয়া কারবার—লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন আবার। দু-হাতে রোজগার। কিন্তু বিরাটগড় গ্রামের লোকের কী—রূপকথার মত গল্প শোনে তারা! অবাস্তব এক ব্যাপার, সত্যি যে গ্রামের কেউ এমন আছেন, বিশ্বাস করে না। গোলবাড়ির সিংদরজায় মস্ত বড় তালা, বাড়ির উঠানে একহাঁটু জঙ্গল। চৈত্র মাসে চৌধুরিদের কোন কর্মচারী এসে তালা খুলতেন। ঘরদোরে ঝাঁট-পাট পড়ত। সাল-তামামি খাজনা মিটিয়ে দিয়ে আসতেন কাছারি গিয়ে। বছরের ভিতর সেই মাত্র পাঁচ-সাতটা দিন—তারপরে আবার তালা ঝুলত যেমন-কে-তেমন। জঙ্গল এঁটে থাকত।

কিন্তু এই সেবারে কাশ্মীর মহারাজার সঙ্গে বড় গোলমালের সময়টা চৌধুরিরা সবসুদ্ধ হুড়মুড় করে এসে পড়লেন। অনেক মানুষ, অগন্য চাকর-বাকর। সকলের আগে এল মাখন মিস্তির। গাঁয়ের ভিতর প্রথম এই মাখন মিস্তিরের উদয়। গোলবাড়ির সঙ্গে মাখনের কোন্ সম্পর্ক সঠিক জানবার উপায় নেই। ধবধবে রঙ বলে বড়-চৌধুরিকে সবাই বলত সাহেব-কর্তা। মাখন নাকি তাঁর ভাগনি-জামাই—ভাগনি মরে যাবার পর বিয়ে-থাওয়া করে নি, মামাশ্বশুরদের কাজ-কারবার দেখে। আবার কেউ বলে, শুধু মাত্র ম্যানেজার, মাইনে-খাওয়া লোক, অতিশয় করিতকর্মা বলে কর্তার কাছে অমন খাতির। মোটের উপর দেখা গেল, সর্ব ব্যাপারে মাখনের অখণ্ড কর্তৃত্ব। শ্রীনগরের কারবারেও নাকি সে ছিল সর্বেসর্বা—সাহেব-কর্তাকে যা বলত, চোখ বুজে তিনি তাই মেনে নিতেন। কর্তাদের পৈতৃক গাঁয়ে ঘরে ফেরার মতলব হল, মাখনই আগে এসে সকল রকম ব্যবস্থা করে। বিস্তর লোক লাগিয়ে চারি-দিক সাফ-সাফাই করল, কলি ফেরাল আগাগোড়া, ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন মেঝে বানাল। কাজেকর্মে লোকজনের ব্যস্ততায় বাড়ি সরগরম। আর দয়ালহরি হোড় জুটে গেছেন তার মধ্যে। বিশেষ মানুষ যে-কেউ গাঁয়ে আসবে, দয়ালহরি আগ-বাড়িয়ে পড়ে খাটা-খাটনি করেন। তাঁর স্বভাব এই। গোলবাড়ির ব্যাপারেও অন্যথা হল না। মাখন মিস্তিরের ডান হাত হয়ে পড়লেন তিনি অচিরে।

কাশ্মীরের কাজ-কারবার পাকাপাকি গুটিয়ে চলে এসেছেন, চতুর্দিকে এই রটনা। সেখানে থাকতে ভরসা করা যায় না। কারবার গুটিয়ে নাকি অঢেল টাকা পয়সা নিয়ে এসেছেন। বাংলা দেশে নতুন একটা কিছু জমিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত গাঁয়ে থাকবেন। চেষ্টা-চরিত্র চলছে ভিতরে ভিতরে।

কিন্তু সাহেব-কর্তা তা বলেন না। মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছেন। নিজের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ে, উপরন্তু ভাগনি একটি। সেই অত দূরে পাহাড়ের ঘেরের ভিতর বাঙালী পাবেন কোথা? চিঠিপত্রের মারফতে এ সমস্ত হয় না। বিয়ে দিতে এসেছেন, শুভকর্ম চুকিয়ে ফিরে চলে যাবেন। কী চেহারা—তিনটি মেয়েরই। গোলাপ ফুলের রঙ। মোম-মাজা নিটোল শরীরে রূপ যেন গড়িয়ে পড়ে। ঘন কালো চুল, ঝকমকে চোখ। যেখানে যেমনটি হলে মানায়। বিধাতাপুরুষ যেন বাটালি ধরে গড়ে তুলেছেন।

সৃষ্টির গোড়া থেকে এই কাজ করে করে হাত পেকে গেছে। বুড়ো বয়সে তাই ঝোঁক হল, যত গুণপনা আছে সমস্ত খাটিয়ে নিখুঁত করে গড়বেন তিনটে মেয়ে। সেই ওরা তিন জন। শুধু মাত্র চেহারাই নয়, হাসি কথাবার্তা ছুটোছুটি তা-ও ওদের রূপের মধ্যে।

এমন সব মেয়ের বরের ভাবনা কী! তার উপরে টাকা ঢালবেন। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল। সাহেব কর্তার মেয়ে সকলের বড়, তার বিয়ের তারিখ সকলের আগে। এমনি সময় অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। এই অঞ্চলটা কেউ বলে পাকিস্তানে পড়বে, কেউ বলে হিন্দুস্থানে। নানা রকম গুজব উঠছে প্রতিদিন। চিরকালের পড়শি—হেসে ছাড়া কথা কইত না, তারাই সব কী রকম হয়ে গেছে, ছোরায় শান দিয়ে রাখছে। গোলবাড়ির বিরাট আয়োজন—কিন্তু গতিক দেখে উৎসবের মজা মাথায় উঠল। পালাতে পারলে আর কিছু চান না। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করা হয়ে গেছে। কিন্তু বড় মুশকিল সোমত্ত মেয়েগুলো নিয়ে। গোটা জেলা জুড়ে তাদের রূপের খ্যাতি। নদী-খালের দেশ, নৌকো ছাড়া গতি নেই, পথের উপর যে গ্রামগুলো পড়বে, সেইখানে গোলমালটা বেশি। কেমন করে কোন্ কৌশলে সকলকে নিয়ে বের করা যায়? বিরাটগড়ে চকমিলান বাড়ির মধ্যে দুয়োর এঁটে তবু যা হোক আছেন, এই অবস্থায় ফাঁকা নদীর উপর বেরুনো আর আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া এক কথা।

তবে মাখন মিত্তির একটুও দমে নি। গোটা অঞ্চল সমভূত হয়ে গেলেও গোলবাড়ির পলস্তারা এক ইঞ্চি খসবে না। জীবন দিয়ে রুখবে সে। ক'দিন খুব ছুটোছুটি করে মাতব্বরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এল। টাকা ছাড়তে হবে। বিয়ে এইখানেই—কোনরকম চিন্তার হেতু নেই। টাকা পেলে ওই মাতব্বররা যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দেবে। একদল জোয়ান পুরুষ দেবে—বরের নৌকার আগে পিছে আলাদা ডিঙিতে পাহারা দিয়ে তারা বিয়েবাড়ি পৌঁছে দেবে। গাঙের এপারে-ওপারে কেউ চোখ তুলে চেয়ে দেখবে না। বিয়ের পর বর-বউ এবং গোলবাড়ি ছেড়ে অন্য যাঁরা চলে যেতে চান সকলকে নিয়ে স্টেশনে একেবারে রেলগাড়ির খোপে তুলে দিয়ে তবে তাদের ছুটি। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না। কিছু টাকা খরচের ব্যাপার, এই যা।

সাহেব-কর্তাকে বুঝিয়ে এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে মাখন মিত্তির বিয়ের দু-দিন আগে রওনা হয়ে গেল। ফিরবে বরের নৌকোয়, বরপক্ষকে সঙ্গে করে নিয়ে। বিয়ে-বাড়ির সকলে পথ তাকাচ্ছে। নৌকোও অনেকগুলো লাগল এসে ঘাটে। কিছু রাত হয়েছে। সেটা হবেই—পথঘাট দেখে বুঝে সামাল হয়ে আসতে হল। মশাল নিয়ে কন্যাপক্ষ বর এগুতে ছুটেছে। ওরে বাবা, এ কী কাণ্ড! সিংদরজা বন্ধ করে দেওয়া হল তাড়াতাড়ি। মানুষগুলোকে মেরে-ধরে, মশাল কেড়ে নিয়ে দরজার উপর টিন-টিন কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাচ্ছে। সাহেব-কর্তা দোতলার গোলঘর থেকে দুড়ুম-দাড়াম বন্দুক ছুঁড়ছেন। কিন্তু ওদিকে কোন কায়দায় আর-একটা দল ছাতের উপর উঠে পড়েছে। ভিতর থেকে তারা সিংদরজা খুলে দিল।

তারপরের বৃত্তান্ত সবাই জানে। তখনকার খবরের কাগজে উঠেছিল, আপনারাও পড়েছেন সে-সব কথা।

মাখন মিত্তিরকে, ধরে নেওয়া হল, টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু বছর পাঁচ-ছয় পরে, চারিদিক ঠাণ্ডা, লোকে প্রায় ভুলেই গেছে সে-সব দিনের কথা। হঠাৎ একদিন গাঁয়ের মধ্যে মাখনের আবির্ভাব। এতদিন কোথায় ছিল, কী করছিল—একমাত্র কেউ যদি জানে, সে হলেন দয়ালহরি হোড়। তিনি ঘাড় নাড়েন, তাঁকেও নাকি

কিছু বলে নি। হতে পারে ; ওই রকম ঘুঘু ব্যক্তি ভিতরের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে বলে না। আত্মীয় হিসাবে মাখন ওয়ারিশান—সে এসে বাড়ির জঙ্গল সাফ-সাফাই করে ফেলল। যেমন সেই গোলবাড়ির খোদ মালিকরা এসে পৌঁছবার মুখে করেছিল একবার। দাঙ্গার সময় দরজা-জানলা সমস্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল, সদর থেকে ছুতোর এনে একালের ফ্যাশান-মত গোটা কয়েক ঘরের বড় বড় দরজা-জানলা বানিয়ে নিল, দামি খাট-বিছানা ও আসবাবপত্র কিনে আনল নৌকো ভরে। বলল, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে এসে কায়েমি বসবাস করবে বিরাটগড়ে। সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন। আগের বারে শোনা যেত প্রথম বয়সে বউ গত হবার পর বিয়ে-থাওয়া করে নি, করবেও না আর জীবনে। এখন অবস্থা অতিরিক্ত সচ্ছল হওয়ায় প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে সম্ভবত।

সে যাই হোক, বউ আনা অবধি সবুর সইল না—ক'দিন মাত্র থেকেই চোঁচা দৌড়। এত পয়সা খরচ করেছিল—তারপর কত-দিন কেটেছে, একখানা পোস্টকার্ড লিখেও খবরবাদ নেয় নি। নাকি ভূতের বাড়ি—প্রভুরা কিলবিল করেন ঘরে উঠানে ও আমতলায়। রাত্রি হলে মচ্ছব লেগে যায়। বাড়ি মেরামতের সময় মাখন মিস্তির বিস্তর শান্তিভঙ্গ করেছে তাঁদের। তা ছাড়া যদি সাহেব-কর্তা ও তাঁর পরিজনবর্গ হন, তবে তো পুরানো রাগ থাকবারও কথা। মোটের উপর, চোখের দেখা মাত্র নয়—রীতিমত মোলাকাত হয়েছে নাকি মিস্তিরের সঙ্গে : ভালয় ভালয় সরে পড়, নয়তো বিপদে পড়বে। গুচ্ছের খানেক টাকা গিয়েছে, কিন্তু এমন শাসানির পরেও কার বুকের পাটা আছে ওই ঘরবাড়িতে পড়ে থাকতে পারে ?

আমাদের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু গোড়ায় ছিলেন না, পরে এসে পড়লেন। তিনি হেসে খুন : ভূত, না ঘোড়ার ডিম ভায়া। আমি আজকের লোক নই। চোখের উপর সমস্ত দেখলাম। বিষম পাপীলোক মাখন, মনে মনে তার প্রতিক্রিয়া আছে। একটা রাত্রি বাস করে সকালবেলা ডাক্তারের জরুরি ডাক পড়ল। সমস্ত রাত মাখন আবোল-তাবোল বকছে—মাথা খারাপ হবার অবস্থা। এক নজর দেখেই রোগটা আমি আন্দাজ করে ফেললাম। জেরায় বাকিটুকু বেরিয়ে গেল। সত্যিই লোকটা বড়লোক হয়ে পড়েছে। নৌকো বোঝাই করে ওই যে দামি দামি আসবাব নিয়ে এল শহর থেকে, নৌকোর পাটার তলায় কাঠের বাক্স ভরতি আরও বস্তু ছিল—খাঁটি বিলাতি মাল। তারই ক্রিয়া। সন্ধ্যার পর থেকে এমন বেএক্তিয়ার হয়ে পড়ত, সে চোখে গরু-মানুষ, পেত্নি-ভূতের তফাত থাকে না। সকালবেলা আমি গেছি, তখনও তার জের রয়েছে।

বড় দারোগাবাবু স্ফূর্তি দিচ্ছেন : শুনলেন তো, ওইখানে গিয়ে উঠুন তবে। লেখাপড়া শিখেছেন, বয়স অল্প—কুসংস্কার কেন থাকবে গোমুখ্যুদের মত। কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব, সমস্ত রাত্রি টহল দিয়ে বেড়াবে। তার উপরে আপনার হরিশচন্দ্র—ভূতের বাপ ব্রহ্মদৈত্যও এগোবে না ওই পেল্লায় পুরুষের সামনে। চাই কি আপনি নিজেও বন্দুকের লাইসেন্স করে নিন একটা। কিছু শক্ত নয়, কালেক্টরকে বলে আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভাল হবে, বাওড়ে খুব পাখি পড়ে—পাখি মারতে যাব দল বেঁধে।

এত কথার পরেও চুপচাপ থাকলে নেহাত কাপুরুষ ভাববেন সকলে। দেখা যাক দু-পাঁচ দিন, গোলমাল বুঝলে ছুতো-নাতায় বেরিয়ে পড়া যাবে। দয়ালহরিও তখন উৎসাহ দেখাচ্ছেন : আমার বাড়ি একেবারে কাছে হুজুর। মাঠের এপার ওপার।

হররোজ দেখা-শুনো হবে। সামনের উপর হানাবাড়ি দেখে মেয়েদের গা ছমছম করে, বেলা না ডুবতে ঘরে ঢুকে দুয়োর দেয়। গোলবাড়িতে মানুষের ওঠাবসা হলে সোয়াস্তি পেয়ে যাই।

উঠলাম গিয়ে গোলবাড়ি—যা থাকে কপালে! চাবি খুঁজে পেতে দয়ালহরির একটা বেলাও দেরি হল না। ঘর চমৎকার। ডিসটেমপার-করা দেয়াল—মানুষ যাই হোক, মাখন মিত্তিরের রুচি আছে। জংলি গাঁয়ের পোড়োবাড়ির ভিতর একটুকু ইন্দ্রপুরী বানিয়ে গেছে। নতুন বাসা খুব পছন্দ আমার। দুয়োর আঁটলেই নিঃশঙ্ক। এক ওই ওঁরা থাকলেন, লোহার দুর্গ বানিয়েও যাঁদের রোখা যায় না। বেশ তো, মিলে মিশে থাকা যাক সকলে—একলা প্রাণী আমাকে ক্ষমা-ঘেন্না করে এক প্রান্তে একটি ঘরে থাকতে দিন। দেখা হলে আরজি জানাব। অনুরোধ অন্যায্য নয়, অতএব মঞ্জুর হবে আশা করতে পারি।

কিন্তু দেখাই পেলাম না কারও। মিথ্যে বলব না—প্রথম দুটো-একটা রাত ভয়-ভয় করত, তারপরে ভুলেই গেলাম। যত আজগুবি রটনা। ডাক্তারের কথা ঠিক—মাতাল মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম। অপরাধী অনুশোচনার বশে কী সব দেখেছে! মাখন মিত্তির পালাল, বাড়ির বদনাম সেই থেকে অঞ্চলময় ছড়িয়ে পড়ল। আমার পক্ষে ভাল, নয়তো কি এমন ঘরবাড়ি খালি পড়ে থাকত, কবে আমি এসে অধিষ্ঠান করব সেই অপেক্ষায়?

সামনের গোলঘরে সাহেব-কর্তার বৈঠকখানা ছিল বোধ হয়। আমার শোওয়া-বসা সমস্ত সেখানে। দারোগা পুরোপুরি প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। কনস্টেবল পাহারা দিতে আসে। এক ঘুমের পরও জানলা দিয়ে দেখেছি, লোকটা ফটকের চাতালের উপর বসে আছে।

মাস দুয়েক কেটে গেল, আছি বেশ আরামে। গোড়ার দিকে হরিশ ঘরের ভিতর মেঝেয় বিছানা করে শুত, এখন কড়াকড়ি নেই, দরদালানে গিয়েও শুতে পারে। শোয়ও তাই। বিছানায় বসেই বিড়ি ধরাতে পারে, ঘন ঘন বাইরে গিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসবার প্রয়োজন হয় না। জানি না, মাখন মিত্তির সত্যি কিছু দেখেছিল কি না। তা-ও যদি হয়, এতদিনে তাঁরা বাস উঠিয়ে দিয়ে অন্যত্র সরে পড়েছেন। কোন সন্দেহ নেই।

বন্দুকের লাইসেন্স হল। বড় দারোগাই কালেক্টরির নিলাম থেকে একটা বন্দুক সস্তার মধ্যে সংগ্রহ করে দিলেন। বন্দুক দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে সেই দিন সন্ধ্যার আড্ডায় তাঁকে বললাম, আর কেন, কনস্টেবল সরিয়ে দিন এবার। বেচারিকে মিছামিছি রাত জাগিয়ে আমায় শাপমন্যির ভাগী করছেন।

বড় দারোগা বললেন, শাপমন্যি কেন দেবে, ও-লোকের চাকরিই এই। পাহারা দেওয়া। আপনার এখানে না হলে অন্য কোথাও দেবে।

পাহারা দেবে, তা জেগে থাকতে যাবে কেন? মাইনেও দেন ঘুমিয়ে পাহারার মত। আমি আপনাদের খাতিরের মানুষ, আমার বাসায় জেগে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। আর মনে মনে সারা রাত্তির গালি দেয় আমায়। কোন দরকার নেই—দেখা গেল তো এতদিন। ঝানু লোক মাখন মিত্তির—নিশ্চয় কোন মতলব নিয়ে গালগল্প চালিয়ে গেছে।

কনস্টেবল যথোচিত বকশিশ নিয়ে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। দয়ালহরিও নির্ভয়।

এদিককার ছায়া মাড়াতেন না—গোলবাড়ির সামনে পড়তে হবে সেজন্য, শুনেছি, ওঁর বাড়ির পিছন দিককার সঁড়িপথ দিয়ে চলাচল করে এসেছেন এ যাবৎ। এখন দিনে রাতে এই পথে আনাগোনা। বাড়ির সামনে এসে অন্ততপক্ষে একবার 'হুজুর' বলে ডাক দিয়ে আপ্যায়ন করে যান। নজরে পড়লে ঢুকে পড়েন ফটকের ভিতর।

ভাল লাগছে তো হুজুর? কোন রকম অসুবিধা হলে গোলামের কানে যেন পৌঁছয়। উই যে খোড়ো চাল দেখতে পাচ্ছেন, ওটা ওঠা-বসার ঘর আমার। জোরে হাঁক দিলেই শুনতে পাব। ঘরের পিছনে চন্ডীমন্ডপ। ঠাকুর তোলবার সাধ্য নেই, চন্ডীমন্ডপে গরু থাকে এখন। নাটমন্ডপটা একেবারে পড়ে গেছে। তারপরে পাঁচিল, ভিতর-বাড়ির আরম্ভ হল। পুরা দশ বিঘের উপর ভদ্রাসন। এলাহি ব্যাপার। একদিন কিন্তু হুজুরের পায়ের ধুলো দিতে হবে। বড় বউ আজকেও বলছিল।

যাব বই কি! আপনাদের গ্রাম—আপনার পাড়ার মধ্যে, বলতে গেলে, আপনারই আশ্রয়ে আছি। এই যে নবাবি হালে রয়েছি—আপনি থেকে চাবি খুলে বন্দোবস্ত করে দিলেন, তবে তো! যেদিন সুবিধা, আপনি এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

সে সুবিধা আজও হয়ে ওঠে নি। অবস্থা বুঝি। এককালে হয়তো সচ্ছলতা ছিল, মেজাজখানা আছে, নিয়ে গিয়ে খুব ধুম-ধাড়াক্কা করার ইচ্ছা, কিন্তু সঙ্গতিতে কুলিয়ে ওঠে না। আমিও উচ্চবাচ্য করি নে। কথা উঠলে বরঞ্চ চাপা দিতে চাই: হবে একদিন হোড় মশায় তার জন্যে কী? আছি আপনার উঠানের পরে বললে হয়, এক ডাকের ওয়াস্তা। কাজের চাপটা কমুক, আমি নিজেই তখন বলব।

পুজোর সময় কলকাতায় কাটিয়ে এলাম কয়েকটা দিন। কী আশ্চর্য, এ আমার কেমন হল, এত পেয়ারের শহর—এখন যে একটা দিনেই হাঁপ ধরে আসে। সারবন্দি যত ইঁটের খাঁচা, পোকা-মাকড়ের মত মানুষ তার মধ্যে কিলবিল করে। খটখটে বাঁধা-রাস্তাগুলো জুতোর তলায় যেন মুগুর মারছে প্রতি পদে। বিশ্রী, বিশ্রী। অবাক হয়ে যাই, এই ক'মাসে মানুষটা কত আলাদা হয়ে গেলাম। তখন ভাবনা ছিল, কী জল-জঙ্গলের পাড়াগাঁয়ে থাকব। এখন অতখানি স্পষ্ট না হলেও মনে মনে বিতৃষ্ণা, লোকে কেমন করে শহরে কাটায় আঁটো-সাঁটো মাপের জীবন নিয়ে। দুর্দান্ত স্বামী বশ করার অনেক শিকড়-মাকড় ঝাড়-ফুঁক চলিত আছে পাড়াগাঁয়ে। বিরাটগড়ের থানায় এক বউকে ধরে এনেছিল, ভাতের সঙ্গে অজান্তে শিকড়বাটা খেয়ে ভেদবমি হয়ে পুরুষটার যায়-যায় অবস্থা। সে যাই হোক, ক্বচিৎ কখনও প্রাণহানি ঘটলেও শিকড়ের ফল নাকি অব্যর্থ। বাঘের মত স্বামী কেঁচো হয়ে বউয়ের আঁচলের নীচে গড়ায়। আমি ভাবছি, বিরাটগড় আমারও উপর তেমনি কোন ওষুধ প্রয়োগ করল নাকি?

এক আমার টুনু। ইস্কুলে দেওয়া হয়েছে তাকে, এবং ঘোর বেগে সে অ-আ-ক-খ শিখছে। নিশ্বাস ফেলি। আহা, ঘুড়ি নিয়ে মাঠের এপার-ওপার ছুটোছুটি করে না, গাঙে ঝাঁপায় না, গাছের মগডালে উঠে ডাল বাঁকিয়ে জামরুল পাড়ে না, বিলের আল বেয়ে ছোট্ট ছাতা মাথায় গুটগুট করে নেমন্তন্ন খেতে যায় না ভিন্ন গ্রামে। কী-ই বা পাচ্ছে জীবনে। শুধু জুতো-জামা আর গোটা কতক খেলনা, ইস্কুলে যাওয়া, পরীক্ষা দেওয়া, বড় জোর বন্ধ ঘরে কোন একদিন সিনেমা দেখা মা-বাবার সঙ্গে। অথবা সেই একদিন চিড়িয়াখানায় দেখিয়ে আনলাম খাঁচায়-আটক কতকগুলো জন্তু-জানোয়ার—আর একটু বড় খাঁচায় ওরা সব যেমন রয়েছে।

চল টুনু আমার সঙ্গে। কলকাতা বিচ্ছিরি।

বউদি হেসে বলেন, তাই নিয়ে যাও ভাই ঠাকুরপো। হাড়ে বাতাস লাগুক আমার। কিন্তু থাকবে কার সঙ্গে? তুমি কাজে যাবে, টুনু তখন যার কাছে থাকবে সেই মানুষটাকে আন দিকি আগে। টুনুর টুকটুকে কাকিমা।

ওই কথারই জের চলল তারপরে। বউদি বললেন, এখন অকাল চলছে। অঘ্রাণে নয়তো মাঘ মাসের গোড়ার দিকে ছুটি বন্দোবস্ত কোর।

দেখা যাবে। মনে করিয়ে দিও সেই সময়।

ওসব জানি নে, আসবেই তুমি। নতুন একটা মেয়ে দেখলাম ফড়েপুকুরে। আমি বলি কী, এই যাত্রায় তুমি মেয়েটা দেখে যাও। মেয়েওয়ালাদের খবর পাঠিয়ে দিই, কেমন? বড় ভাল মেয়ে।

ভালর উপরে আরও তো ভাল আছে বউদি। তার উপরে আরও। সেই মাঘ অবধি কত ভাল তলিয়ে যাবে, কত কত নতুন ভাল উঠবে। কোথাও আমি যেতে পারব না। ছুটিতে এসেছি—নড়ে বসব না, স্রেফ শুয়ে বসে কাটিয়ে যাব। যা করতে হয় তুমি একাই সব পারবে।

দাদারও সেই কথা: তোমার ভাল কন্দুর উঠে সোয়াস্তি পাবে, নিজে জান না। তোমার বিধাতাপুরুষেরও ধারণা নেই। দুটো দিনের জন্য এসেছে, ওকে কেন টানাহেঁচড়া কর?

ভোটে হেরে বউদি চুপ করে গেলেন। আমি কিন্তু শুয়ে বসে নেই একটা দিনও। বিরাটগড় থেকে একটা খাতা কবিতায় ভরাট করে এনেছি—এই ক'মাসের ফসল। খাতা-সহ কলকাতার নামী লেখকদের আড্ডায় ঘোরাফেরা করি। কায়দা বুঝে শুনিয়েও দিই দু-চারটে। এবং অবাক কান্ড, আহা-ওহো করেছেনও কোন কোন ব্যক্তি। এই নতুন স্ফূর্তিতে পাগল হয়ে আছি। পুরানো বন্ধুরা প্রায় সব বাতিল। গানেও মন নেই। ডুগি-তবলায় কয়েকটা বোল তুলেছিলাম চাকরি পাবার আগে। এসে দেখেছি, তবলার ছাউনি ইঁদুরে কেটেছে। আপদ গেছে। ডুগির উপর প্রচন্ড ঘুষি মেরে সেটারও ছাউনি ফাঁসিয়ে দিলাম।

বউদি বললেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটি কয়েকটা দিন বাড়িয়ে নাও। চাঁপাতলা কি ফড়েপুকুর যেখানে হোক, পাকা-দেখাটা চুকিয়ে দিই। খানিকটা নিশ্চিন্ত। তারপরে চাকরিতে যেও।

আরে সর্বনাশ, চাকরি চলে যাবে। ঝাড়ুদারেব চাকরির জন্যেও ম্যাট্রিক পাস দরখাস্ত নিয়ে ছোটে। কী দিনকাল পড়েছে, জান না বউদি।

চাকরির কথা প্রসঙ্গে দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, উপরওয়ালার সঙ্গে জমল কী রকম শুনি? বদলি হবার বন্দোবস্ত কিছু হচ্ছে?

মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিই, দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছি তো এক নাগাড়ে—

শুধো দরখাস্তের কাজ নয়। শোন, নতুন গুড়ের কিছু ভাল সন্দেশ নিয়ে যাও এবার কলকাতা থেকে। দরখাস্তের সঙ্গে দিও।

কিন্তু কোথায় দিতে হবে, তাই তো জানি নে। শেষটা হিতে-বিপরীত না ঘটে বসে।

দাদা খিঁচিয়ে ওঠেন: কী করছিলে তবে এতকাল ধরে? শুধু কাজ করে গেলেই হয় না। কাজ দেখিয়ে উন্নতি হয়, শুনেছ কোনদিন? তদ্বির চাই। ওই ধাপধাড়া জায়গায় দেখতে পাচ্ছি চিরকাল তোমায় পচে মরতে হবে। বয়স হচ্ছে, ভেবেছিলাম জ্ঞানবুদ্ধিও হয়েছে। নাঃ, একেবারে কিছু নয়।

ঘাড় নিচু করে নির্বাক থাকি, আর কী করব। শহরের চাকরিতে বসে দাদার জ্ঞান-বুদ্ধি খুলে গেছে। আমিও এসব একেবারে বুঝি না, তা নয়। কিন্তু যত-কিছু বললাম, ডাহা মিথ্যা। দরখাস্ত গোড়ার দিকে দু-একটা ছেড়েছি, এখন অনেকদিন আর উচ্চবাচ্য করি নে। বিরাটগড়ে লোকের ভিড় কম, কবিতার পক্ষে এটি প্রশস্ত। অহরহ লোকগুলো তটস্থ হয়ে 'হুজুর হুজুর' করে—আমা হেন ব্যক্তিকে এত বড় খাতির দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র বিরাটগড় ছাড়া অন্য কোনখানে কেউ করবে না। দাদা যাই বলুন, এই ধাপধাড়া স্থানেই থাকাত চাই আমি আপাতত কিছুকাল।

বিরাটগড় ফিরে দেখি, হরিশ ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। সরকারি চাপরাসি হওয়ার দরুন বরের বাজারে হু-হু করে তার দর চড়ে গেছে। সেই লোভ সামলাতে না পেরে বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেলেছে ছুটির মধ্যে। যথাসময়ে ঢোল কাঁসি বাজিয়ে বিয়ে করে এল। তারপরেই নতুন উপসর্গ—রাত্রে আমার সঙ্গে গোলবাড়ি থাকতে পারে না, রাঁধাবাড়া করে খাইয়ে দিয়ে চলে যায়। আমার হয়ে গেলে নিজে এক কাঁসর ভাত নিয়ে বসে না আগেকার মত। হন্তদন্ত হয়ে বেরোয়, এঁটো বাসন পড়ে থাকে, সকালবেলা এসে মাজা-ধোওয়া করবে। বুঝতে পারি, বাড়িতে তার জন্য ভাত বেড়ে থালা সাজিয়ে বসে আছে আর-একজন। আমার আপত্তি নেই—বরঞ্চ ভালই। হরিশ চলে যাবার পর খাতা খুলে সশব্দে নিজের কবিতা পাঠ করি। যতই হোক, হাকিম মানুষ—চাপরাসির সামনে সুর করে কবিতা পড়তে লজ্জা করে।

ডাক্তারবাবু বড় ভাল লোক। যত পরিচয় হচ্ছে, মজে যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে। তিনি ঠাট্টা করেন : চাপরাসি বিয়ে করে ফেলল, হাকিমের সাহস হয় না। না ভায়া, এর পরে একলা থাকা আর মানাচ্ছে না।

দয়ালহরি সেখানে। তাঁকে বললেন, কোমর বেঁধে ঘটকালিতে লাগ দিকি হোড় মশায়। তোমায় লোকে এত ধুরন্ধর বলে, দেখি সেটা কী রকম!

আমি বলি, খুব খাঁটি কথা বলেছেন ডাক্তারবাবু, সাহস হয় না সত্যি। হবে কী করে? কপাল খারাপ, তাই চাপরাসি না হয়ে হাকিম হয়েছি। হাকিমের গোনাগুনতি মাইনে—সরকার যে ক'টি তঙ্কা দেন, বাড়তি এক পয়সাও নয়। চাপরাসি দুয়োর ধরে দাঁড়িয়ে থাকে—যত লোক দলিল রেজেস্ট্রি করবে, নিদেন পক্ষে একটা দুয়ানি গুঁজে দেবে তার হাতে।

হাসতে হাসতে দয়ালহরির দিকে চেয়ে বলি, হরিশকে সমঝে দেবেন তো হোড় মশায়, হাকিমের চোখের উপরে অমন যেন হাত না পাতে। যা করতে হয়, মক্কেলদের আড়ালে-আবডালে নিয়ে করবে।

হাকিমত্বের ব্যবধান আমি ঘুচিয়ে দিলেও দয়ালহরি মানেন কী করে? ডাক্তারবাবুর অথবা আমার একটি কথাও যেন কানে যায় নি, এমনিধারা ভাব দেখিয়ে হরিশকে ডাকতে ডাকতে তিনি দরদালানে চললেন। ভেবেছিলাম, সমঝে দিতে গেলেন এখনই। কিন্তু সে ব্যাপার নয়। স্ত্রীর নাম করে বলেছেন, বড় বউ কী জন্যে ডাকছে তোকে বাবা। আমার সঙ্গে চলে আয়। দেরি করিস নে।

তার মানে রান্না-করা তরকারি, কখনও বা পিঠে-পায়েস। আগে লাউটা কলাটা হাতে করে আসতেন, বাড়ির কাছাকাছি হওয়ার ইদানীং রাঁধা ব্যঞ্জন আসছে। প্রায়ই আসে এমনি। বুড়ো মানুষটি মাঠের আ'লপথ ধরে নিজের হাতে বয়ে আনতেন। একদিন কড়াভাবে মানা করে দিলাম : ছি-ছি, সম্ভ্রান্ত প্রবীণ মানুষ নিজে এমনি করে

আনবেন তো আমি কক্ষনো স্পর্শ করব না। এই আমার শেষ কথা। সেই থেকে হরিশকে ডেকে নিয়ে যান। এবং ভাষাটা ওই। বিদেশে-বিভুঁয়ে একলা পড়ে থাকি—আর শ্রীমান হরিশের রান্নায় যে রকম তরিবত। বিয়ের পরে আরও যেন বাহার খুলেছে, আর দশটা বস্তুর সঙ্গে রন্ধনবিদ্যাও যেন বউকে সমর্পণ করে বসে আছে। সকালবেলা মাছের ঝোলে নুন দেয় নি তো তাড়া খেয়ে সন্ধ্যাবেলা ডবল করে নুন দিল। দৌড়-ঝাঁপের রাঁধাবাড়া—সকালে অফিস, রাত্রিবেলা নতুন বিয়ের বউ। এই সব বিবেচনা করে আমিও গলাধঃকরণ করে যাই—নুন বেশি হলে জল ঢেলে হালকা করে নিই, কম হলে নুন মাখি। হেন অবস্থায় মুখে যাই বলি, মনে মনে প্রত্যাশা, হোড় মশায়ের বাড়ির বড় বউ কখন ডেকে পাঠান হরিশকে। দিন পাঁচ-সাত ডাক না পৌঁছলে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। রাগ করলেন নাকি বড় বউ এবং ও-বাড়ির অন্যান্য যাঁরা আছেন?

রাগের কারণও কিছু ঘটতে পারে। ঐ যে শুনলেন—গোলবাড়ি আর দয়ালহরির বাড়ির মাঝখানে মাঠ একটা। মাঠ খুব বড় বটে, কিন্তু আউশ ধান কাটা হয়ে গেছে, দয়ালহরির বেড়ার জিওল-গাছের পাতাও ঝরে গেছে সমস্ত। গোলবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের বাইরের উঠোনের কাজকর্ম চলাফেরা দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াই। হাকিম মানুষকে গাঁয়ের মধ্যে সতর্ক হয়ে চলতে হয়। কারাগারের মতন কতকটা। হোড়-বাড়ির দিকে যখন-তখন তাক করে আছি, লোকে দেখতে পেলে কথা উঠবে। ওঁরাও বা কী মনে করবেন? বুঝি সমস্ত। তবু কেমন ইচ্ছে হয় অমনি এসে দাঁড়াবার। সামলাতে পারি নে। আমার বউদির ঘর-গৃহস্থালি থেকে আলাদা হয়ে অনেক দিন একা একা আছি। তাই বুঝি ঝোঁক চাপে গৃহস্থালির এইটুকু চোখে দেখবার।

একদিন হরিশকে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করে বললাম, একটা মেয়ে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে। আগে কখনও দেখি নি।

অফিসে হরিশ চাপরাসি, কিন্তু অনেক দিন পাশাপাশি রাত কাটানোর দরুন বাসায় সময়বিশেষে সে সখাস্থানীয়।

হোড় মশায়ের বাইরে-বাড়ি ওটা বেগুনক্ষেত বুঝি? দেখিস নি হরিশ, এক ঢ্যাঙা মেয়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষেতে বেগুন তুলে বেড়ায়?

হরিশ বলে, সোমত্ত মেয়ে, বিয়ে-থাওয়া হবে—অমন করে কুচ্ছো করতে নেই হুজুর। চেহারায় না হোক, মনটা বড্ড ভাল। হেসে ছাড়া কথা বলে না। হোড় মশায়ের মেয়ে। আপনাদের কলকাতায় থাকত। মা-শীতলার দয়া হল, অসুখ থেকে উঠে চলে এসেছে। বড় ভোগান্তি হয়েছে। বড়বউ ঠাকরুন শীতের মরশুমে হাঁপান তো পড়ে পড়ে। মেয়েটা এসেছে, ভাত জল পাচ্ছেন তাই সকলে। নয়তো হোড় মশায়কেই হাঁড়ি ঠেলতে হত।

গাঁয়ের মানুষ হরিশ, সব বাড়িতে আনাগোনা। বিশেষ করে দয়ালহরির বাড়ি হামেশাই এটা ওটা আনতে যায় বলে ওখানকার সমস্ত খবর নখদর্পণে। বলে, ছোট্টবেলা থেকে শহরে মানুষ। বড্ড ফিটফাট থাকে হুজুর, আমাদের পাড়াগাঁয়ের মতন নয়। মামার কলকাতায় বাসা, সেখানে দিদিমার কাছে ছিল। দিদিমা মারা গেল, মামাও মরল। মামী জ্বালাযন্ত্রণা দেয়। ছিল তবু, বসন্ত হল তারপরে। মামী সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে বিদেয় করল। হোড় মশায়কে একটা চিঠি লিখেও খবর দেয় নি। মেয়ে হাসপাতাল থেকে সোজা টিকিট করে রেলে চেপেছে। আর ও-মুখো

হবে না।

হাড়গিলে বলছি লম্বা ধাঁচের মেয়ে বলে। অত বড় মাঠ, তারপরে দয়ালহরির বাইরের উঠানটাও ছোট নয়। আমিই বা দিনমানে কতটুকু সময় থাকি গোলবাড়িতে। তার মধ্যে কাজ-কর্মে মেয়েটা একবার হয়তো বাড়ির বাইরে এল। হাড়গিলে কিংবা মাছরাঙা এতদূর থেকে এই সামান্য দেখায় তার বিচার হয় না। ওটা কথার কথা, বুঝতেই পারছেন।

হরিশ ফিকফিক করে হাসছে। বলে, চালচলন হুজুরের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। পুকুরে নামবে না কিছুতে, ডুবে যাবার ভয়। তোলা-জলে চান করে। হুজুরের জল তোলবার অসুবিধা নেই—আমি তো আছিই, তা ছাড়া যে মানুষকে বলবেন, সোনা হেন মুখ করে তুলে দিয়ে যাবে। ওর জল কে তুলে দেয়? তা দেখুন গে, কলস ভরে ভরে নিজেই জল তুলে জালা ভরতি করে রাখে।

এই এক পরিচয়েই মেয়েটা যেন আপন হয়ে গেল। গাঁয়ের মধ্যে আমরা দুটি স্বতন্ত্র নরনারী—সাধারণ দশজনের সঙ্গে বেমিল। মেয়েটা আজন্ম শহুরে। আমি গাঁয়ে থাকলেও এক দ্বীপের মধ্যে ছিলাম বলতে পারেন। লবণ-সাগর চারিদিকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, মাঝখানে আমাদের চকমিলানো বাড়ির বনেদি জীবনযাত্রা। (বর্ণনাটা কবির মতন হল না?) নদী-খালে না-ই হোক, খিড়কি পুকুরেও কোনদিন গা ডুবিয়ে স্নান করি নি। জলের ভিতরে সাপ কচ্ছপ-কাঁকড়া কখন কিসে কামড়ায়, কে বলতে পারে? দয়ালহরির মেয়েও সম্ভবত তাই। অদৃষ্টের ফেরে দুজনে এই জঙ্গুলে জায়গায় এসে পড়েছি, কিন্তু শহরের অভ্যাস নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। আউশক্ষেতের ওপারে অস্পষ্ট দীর্ঘাকার একটুকু ছায়া দেখে সুখ হয় না—কাছাকাছি একদিন ভাল করে দেখতে পেতাম।

রবিবারে অফিস নেই। হরিশ রান্নাঘরে। আমি উঁকি দিই: অত কী রাঁধিস রে? সপ্তার মধ্যে কুল্যে এই একদিন ছুটি, তা দেখছি বেশি তোর কাজ পড়ে যায়।

হরিশের সত্যি একটা টান পড়ে গেছে আমার উপর। বলে, অন্য দিন তো খাওয়াই হয় না। দশটা না বাজতে আপিসে ছোটাছুটি—কোন গতিকে দুটো চাল ফুটিয়ে দিই। রাত্রেও ব্যস্ত, ফাঁকা বাড়িতে একলা বউ। আজকে জেলেপাড়ায় গিয়ে খাসা কয়েকটা ট্যাংরা মাছ পেলাম—

রান্না পরে হবে। বাইরে আয়। গল্প করা যাক।

হরিশ বলে, কড়াইয়ে তেল চাপিয়েছি যে!

কড়া হয়েই বলি, তর্ক করিস নে, নামিয়ে রেখে আয়।

শশব্যস্তে হরিশ বলল, আসছি আজ্ঞে।

কিন্তু ওই মুখেই। ঘনিষ্ঠ হওয়ার দরুন হুকুমের জোর কমে গেছে। কড়াই নামায় না, মাছ ভাজা শেষ করে জল ঢেলে ঝোল চাপিয়ে বাইরে আসে।

আমার গল্পের গরজ ফুরিয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা মেয়ে এক্ষুনি জল নিয়ে গেল গোলবাড়ির পুকুর থেকে। পুকুর নয়, দীঘি বললে চলে। দামে আঁটা, ঘাটের কাছে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার। তবে জলটা খুব ভাল। অনেক বউ-মেয়ে কলসি কাঁখে জল নিতে আসে। সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় কখনও-সখনও নজরে পড়ে। পরনের শাড়ি হাঁটুতে উঠে এসেছে, যাবতীয় কাপড় জড় হয়েছে মাথার ঘোমটায়। কিন্তু এই একটা মেয়ে আজ আলাদা দেখলাম। খোলা চুল পিঠের উপর ছড়ানো, ধবধবে

কাপড়-পরা, ভরা কলসি নিয়ে মাঠের আ'ল ধরে ধীরে ধীরে চলে গেল। চলল দয়ালহরির বাড়ি। আমি দেখতে পেলাম, তখন অনেকটা দূরে এগিয়ে পড়েছে। পিছন থেকে দেখছি। হরিশ থাকলে নিজ থেকে হয়তো বলত, হাড়গিলে বলেন হুজুর, ঐ দেখুন, মেয়েটা কি মন্দ? যদি অবশ্য দয়ালহরির সেই শহুরে মেয়ে হয়।

হরিশ যখন বেরুল, ততক্ষণে মাঠ পার হয়ে সে বাড়ি ঢুকে পড়েছে। ও-কথা কিছু হল না। আমি বললাম, দেখ হরিশ, গাঁসুদ্ধ জুটেপুটে আমাদের পুকুরের সব জল তুলে নিয়ে যাবার মতলব করেছে।

হরিশ বলে, আর দিনকতক যাক, দেখতে পাবেন পুকুরপাড়ে মেলা বসে গেছে। গাঁয়ের যত পুকুর-ডোবা শুকিয়ে তলার মাটি ফেটে চৌচির হবে। তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে বুধহাটা-সুজনপুরের মানুষ কলসি কলসি জল বাঁকে বয়ে নিয়ে যাবে।

হোড় মশায়ের বাড়ি থেকেও জল নিয়ে গেল। ও-বাড়ি থেকে কলসি বেরুতে কোনদিন দেখি নি।

হরিশ আশ্চর্য হল: বোশেখ না পড়তেই ওদের পুকুর শুকোল? আরও তো আস্ত কাল পড়ে আছে। এরকম হয় না কখনও।

হোড়ের পুকুরের জল এবারে তাড়াতাড়ি শুকোনোর কারণ আমারই ইচ্ছাশক্তি কিনা জানি নে। সকালে এক কলসি নিয়ে গেছে, এবেলাও এল। ছুটির দিন বলে ছোট-দারোগা দুপুরে একহাত বসবার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। মাথা ধরেছে বলে যাই নি। বেলা পড়ে গেছে, একটা চেয়ার টেনে এনে বসেছি আমতলায়। দেখে ফেললাম মুখোমুখি একবারে। আরও মেয়ে-বউরা জল নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এক নজরে মালুম হল, এ মেয়ে আমাদের কলকাতার বটে। কলসি কাঁখের উপর ধরবার কায়দাটুকু শিখে নিতে পারে নি—অর্ধেক জল ছলকে পড়ে শাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাঠের আ'ল পথে যাবার সময় পা হড়কে কলসিসুদ্ধ নীচে গড়িয়ে না পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পেল, সাব-রেজিস্ট্রার হাকিম গোলবাড়ির আমতলায় দাঁড়িয়ে নজর হানছে। অন্য মেয়ে-বউ যেমন করে—কেউ হাত তুলে ঘোমটা বাড়িয়ে দেয়, কেউ-বা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খায়, কোন লজ্জাবতী মাঠ-পগার পেরিয়ে সজারুর মতন চোঁচা ছুটে পালায় (সজারু বলছি যেহেতু পায়ের তোড়ায় ঝুনঝুন আওয়াজ ওঠে দৌড়ানোর সময়)। আর এ মেয়ে আমার দিকে একবার নজর তুলে দেখে, যেমন যাচ্ছিল ধীরে ধীরে তেমনি চলে গেল।

এর পরে পিটুনি দিই না কী করি বলুন তো হরিশটাকে? এই মেয়ের বলেছিল চেহারা সুবিধের নয়। এবং রঙ চাপা। অর্থাৎ সাদা কথায় যার অর্থ হল কালো। আপনারা বলবেন, ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়েছিল ওর মুখে—সময়টাকে কন্যা সুন্দর বেলা বলে—কালো মেয়ে সময়ের গুণে ফরসা দেখেছি। বেশ তো, হোড়-বাড়ির পুকুর যখন শুকিয়ে গেছে এবং গোলবাড়ির পুকুরে অগাধ জল, জল নিতে কতবার আসবে যাবে, কত দিন দেখতে পাব। রোজ কিছু আর ডুবন্ত বেলা থাকবে না।

বেশি দেরি হল না, ঘন্টা দশ-বারো পরেই। বিষম গুমট, হাওয়া একেবারে নেই। সবগুলো জানলা খোলা, তবু ঘুম হয় না রাত্রে। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। খুব ভোরবেলা। চাঁদ আছে আকাশে। জ্যোৎস্না আর ভোরের আলোয় মিলে মিশে গেছে। বিছানার উপর আধঘুমে পড়ে আছি। হঠাৎ দেখতে পাই, আমতলায় সেই মেয়ে। কাল যেখানটায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখেছিলাম, ঠিক সেইখান থেকে দালানের দিকে মুখ করে আমায় দেখছে। ঘুমজড়ানো আমার চোখে আজকে আরও চমৎকার লাগল।

স্বপ্নের মেয়ে বলে মনে হয়। এক নজরে দেখছিল এতক্ষণ—যেইমাত্র পাশ ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গে উধাও। পাখি যেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম, দরজা খুলে চলে এলাম বাইরে। কোথায়! এত ভোরে কেন এসেছিল, কে জানে?

হরিশ এলে ঘটনা বললাম। ধরা-ছোঁওয়া না পায়, তেমনিভাবে সামাল হয়ে বলছি, ভোররাত্রে আমতলায় কাকে যেন দেখলাম। কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। চোর-টোর কিনা, কে জানে?

হরিশ হাসেঃ সবে এই শুরু। জষ্ঠিমাসটা পড়তে দিন, মানুষ আমতলায় রাত-দিন চরে বেড়াবে। এই দেখে আসছি হুজুর, আম কুড়োবার সময় ভূতের ভয় থাকে না। বাগান এদ্দিন বেওয়ারিশ পড়ে ছিল—যেমন খুশি গাছে উঠে পাড়ত, তলায় কুড়াত। কানাইবাঁশি গাছের আম আগে পেকে যায়, সে খবর অবধি জেনে বসে আছে। পাকে বোশেখের গোড়ায়, এই চোত মাসে তার টনক নড়েছে। আচ্ছা, আমিও আছি। ঐ গাছের যত আম কাঁচা-ডাঁসা সমস্ত আজ মুড়িয়ে পাড়ব। তখন কী লোভে আসে দেখি।

ব্যস্ত হয়ে বলি, উঁহু, অমন কাজও নয় হরিশ। একটি আম পাড়বি নে। যেমন আছে তেমনি থাকুক। চিরকাল দশজনে খেয়ে আসছে—দরকার নেই শাপমন্যি কুড়োবার। পেকে দুটো চারটে করে তলায় পড়বে, দেশের মানুষ কুড়িয়ে খাবে। সেই ভাল।

তাই ঠিক, আমের লোভেই এসেছিল। চলল এখন এই ব্যাপার। জল নিয়ে যায় ওই অতটা দূরের ঘাট থেকে। আম পড়ে একেবারে উঠানের উপর। অতএব উঠানেই আসতে হবে আম কুড়াতে। এখন এই কানাইবাঁশি—একে একে তারপর সব গাছের আম পেকে যাবে। বিকালবেলা ঝড় উঠবে কালবৈশাখীর, ফলন্ত ডাল আছাড়ি-পিছাড়ি খাবে। টুপটাপ শিলাবৃষ্টির মত পড়বে আম। আর জলে ভিজে ওরা সব তলায় তলায় ছুটোছুটি করবে। চলল এই এখন।

বউদির চিঠি পেয়েছি দিন চারেক আগেঃ ছুটি নিয়ে এস। সকলে মিলে তা হলে কদিন দেশে কাটিয়ে আসা যায়। খুব নাকি আম হয়েছে এবারে। আমাদের হাঁড়ির-বাড়ির, গোপালে-ধোবা, বোম্বাইয়ের ডাল ভেঙে পড়ার গতিক।

যাই কি না যাই—চিঠি পাওয়ার পর থেকে দোমনা ছিলাম। আজকে জবাব চলে গেল, যাবার তো ইচ্ছে হয়েছিল বউদি, কিন্তু ছুটি দিল না। নতুন এক উপরওয়ালা এসেছে, বড় বেয়াড়া। জায়গা ছেড়ে যাবার উপায় নেই।

হরিশকে আম পাড়তে মানা করে দিয়েছি। আম পেকে টুকটুক করছে—করুক না। পাখিতে ঠুকরে ঠুকরে খায়—ক'টা আর খাবে? বছরের এই একটা-দুটো মাস বই নয়, সকলকে খেতে দিতে হয়। কোনদিন তুই গাছে চড়তে যাবি নে হরিশ। সারাদিন সারারাত্রি টুপটাপ করে তলায় পড়ছে তা পড়ুক। পড়ে থাকুক অমনি, যার খুশি কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তোর আমার জন্যেও দু-চারটে ওর ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনবি। কিন্তু বেশি নয়, খবরদার! ঘরে এনে গাদা করবি নে। দশজনে ভাগাভাগি করে খেয়েই সুখ।

জল নেবার সময় দয়ালহরির মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখি। কলসি নিয়ে ধীরে ধীরে আসে, কলসি ভরে নিয়ে ধীর পায়ে ফিরে যায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখি। গোলবাড়ির হাতার মধ্যেও পেয়েছি দিন পাঁচ-সাত। আমতলায়—কিন্তু আম কুড়াচ্ছে না। এখানে

ভিন্ন ভাব, লুকোচুরি খেলার ধরন। চোখাচোখি হতেই সরে চলে যায়। বুঝি সেটা। পাড়াগাঁ জায়গা—নিন্দে রটতে কতক্ষণ। দয়ালহরির বাড়ি থেকেও বোধ করি মেয়েকে সমঝে দিয়েছে: শহুরে রকমসকম বিরাটগড়ে চলবে না। তবু আসে লুকিয়ে-চুরিয়ে, এসে দেখে যায়। শুনেছে নিশ্চয়, শহর থেকে ছিটকে-পড়া আর-একজন আছে তারই মত। দুজনে ভিন্ন জাতের আমরা, অন্য সকলের থেকে আলাদা। সেই টানে চলে আসে।

একদিন অফিস থেকে ফিরছি। দয়ালহরিও চলেছেন, সঙ্গে চারজন ভদ্রলোক।

আপনাকে ক'দিন দেখতে পাইনি হোড় মশায়। অফিসেও তো আসছেন না।

দয়ালহরি বললেন, এই এঁদের ওখানে গিয়েছিলাম। সাত-আট ক্রোশ দূরে ষষ্ঠী-পুকুর, কাছে-পিঠে নয়। লাবণ্যর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

দয়ালহরির মেয়ের নাম পাওয়া গেল লাবণ্য। নাম বেশ মানান করে রেখেছেন। না জেনেও আমি বোধহয় আন্দাজে বলতে পারতাম এই নাম। লাবণ্য, লাবণ্য। কিন্তু দয়ালহরির কী রকম কান্ড, কোন্ সব মানুষ বাড়ি নিয়ে তুলছেন মেয়ে দেখানোর জন্য। এরা মাথার চুল খুলে দিয়ে মাপবে, হাঁটিয়ে দেখবে, ইঁচড়ের ডালনা কোন্ প্রক্রিয়ায় রান্না হয় প্রশ্ন করবে। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মাঠের ধারে এসে পড়েছি। জুতো খুলে ফুঃ-ফুঃ করে ধুলো ঝেড়ে হাতে করে নিচ্ছে এবারে আ'লের উপর উঠবে বলে। খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে সেজন্য। জুতো পরার অভ্যাস বেশি আছে বলে মনে হয় না। জুতো পায়ে এমনিই বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল, খুলে নিয়ে বাঁচল।

বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে হোড় মশায়?

দূরবর্তী কুটুম্বদের দিকে এক নজর তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে দয়ালহরি বলেন, কোথায় কী। সবে তো মেয়ে দেখা—মেয়ে পছন্দ হবে, দেনাপাওনার আশকারা হবে। লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না। গয়নায় মোটামুটি আমি গা সাজিয়ে দেব। সাবেকি জিনিস কিছু ঘরে আছে, নূতন করে গড়াতে হবে না। কিন্তু নগদ থাই হলে পেরে উঠব না। এই মেয়েই সব নয়। আরও কত রকম দায় আছে। হিসেব করে চলি বলেই মানসম্ভ্রম নিয়ে টিঁকে আছি ভিটের উপর।

গায়ে-পড়া হয়ে পরামর্শ ছাড়ি: নগদ চাইল না বলেই অমনি কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। মেয়ে ফেলনা নয়, বিচার-বিবেচনা করবেন। পাত্র কী রকম শুনি?

এক-মুখ হেসে গদগদ হয়ে দয়ালহরি ঘাড় নাড়লেন: সেদিক দিয়ে বলবার কিছু নেই। পাত্র ভাল বলেই তো মরি এমন ছুটোছুটি করে। লেখাপড়া জানে, ম্যাট্রিক পাস। প্রাইমারি ইস্কুলের পন্ডিত হয়েছে। সরকারি চাকরি—বয়স বাড়লে মাইনে কোন না ষাট-সত্তরে দাঁড়াবে। ঘরের খেয়ে মাস অন্তে অতগুলি টাকা—কোনরকম ঝামেলা নেই, এক পা নড়ে বসতে হবে না। লেগে যায় তো জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি দিন ঠিক করে ফেলব। শুভস্য শীঘ্রম্, কী বলেন?

গলা আরও নামিয়ে বলতে লাগলেন: এর বেশি কোথায় পাচ্ছি? লাটসাহেব কে আমার জামাই হয়ে ছাদনাতলায় বসবে? মেয়ে যদি অপ্সরী-কিন্নরী হত কিংবা বস্তা ভরে টাকা ঢালতে পারতাম, তবে না হয় কথা ছিল। কী বলেন?

বারম্বার আমায় সালিশ মানেন, মনে যা-ই থাক, ঘাড় না নেড়ে উপায় কী। কুটুম্বর দল এসে পড়েছে, নিতান্ত কানা-চোখ এবং অর্ধপিশাচ না হলে অমন মেয়ে ছেড়ে

যাবে না সুনিশ্চিত। এক পাড়ার মধ্যে থাকি, এবাড়ি-ওবাড়ি, দিনরাত দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, বাড়ি থেকে রাঁধা-তরকারি পাঠিয়ে খাতির দেখানো হয়। এবং হরিশের মুখে শুনি, তার দু-একখানা লাবণ্যর নিজের হাতের। অথচ বিয়ে-থাওয়ার মতন এতবড় ব্যাপারে আগেভাগে একটি মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলেন না!

পাড়াগাঁ জায়গায় কুটুম্বরা রাত্রিবেলা কখনো চলে যাচ্ছে না, জোর খাওয়া-দাওয়া আজ দয়ালহরির বাড়ি। ঘরে বসে আমিও ভাগ পাব। হরিশ হাসতে হাসতে সেই কথা তুলল। হেসে বলে, আজ কিছু রাঁধতে হবে না। দুটো চাল ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে। তাও-লাগাবে না হয়তো, হোড় মশায় লুচি-টুচি পাঠাবে।

আমি আগুন হয়ে উঠি: দিন-কে-দিন কী হ্যাংলামি বাড়ছে তোর! তার মানে সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে উঠতে চাস। বেশ তাই, আজকে তোর রাঁধতে হবে না। বাড়ি চলে যা, আমি চিঁড়ে ভিজিয়ে খাব।

মেজাজ দেখে হরিশ অবাক। এমন অনেক দিন হয়েছে দয়ালহরি হাট করে বড় ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন—আমিই বলেছি, দেরি করে উনুন ধরাবি হরিশ। ভাতটা গরম গরম চাই। অমন ইলিশের ঝোলের সঙ্গে গরম ভাত ছাড়া জমবে না। আমার ওই ভাব জেনেই তো হরিশ বলল, তার কী দোষ?

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! ভাত-তরকারি ষোলআনা রান্না করে খাইয়ে দিয়ে হরিশ অনেকক্ষণ চলে গেছে। রাত দুপুর হল। দয়ালহরি খোঁজ নিলেন না তো আমার! হরিশের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে আমার কী কথাবার্তা হয়েছে, তিনি তা জানবেন কী করে? অনেকবার রাস্তা অবধি বেরিয়ে এসে হোড়-বাড়ির দিকে তাকিয়েছি। কুটুম্ব আসার দরুন বাইরের ঘরে বেশিক্ষণ ধরে আলো জ্বলবার কথা—তা-ও তো কিছু মনে হচ্ছে না।

পরদিন রেজেস্ট্রি অফিসে যথাস্থানে দয়ালহরিকে দেখলাম। ঘাড় হেঁট করে দলিল লিখে যাচ্ছেন। জুতোর শব্দে ঘাড় তুললেন একবার। অপ্রসন্ন বলেই মনে হল। অফিসের মধ্যে হাকিম আমি, ঘরোয়া কথাবার্তা চলে না। বিকালে বাসায় ফিরছি, তখন দেখি পিছু পিছু আসছেন। আমাও উদ্বেগ আকণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে। প্রশ্ন করলাম, খবর কী হোড় মশায়? পাকা কথাবার্তা হয়ে গেল?

বারুদে আগুনের ফুলকি পড়ল যেন।

বলবেন না, বলবেন না। ছোটলোক, পাজির পা-ঝাড়া। তিন-তিনটে দিন আমার সকল কাজকর্ম বন্ধ। গুরুঠাকুরের মত তোয়াজ করে বাড়ি ডেকে আনলাম। এল তা-ও একটি দুটি নয়, পুরো এক গণ্ডা। নৌকোভাড়ায় সাড়ে পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। পান-বিড়ি মুহুর্মুহু এনে ধরছি মুখের কাছে। তা খেয়েদেয়ে মুখের উপর কিনা বলে, মেয়ে ভাল নয়—নগদ টাকায় কদ্দুর কী পুষিয়ে দেবেন, সেই কথাবার্তা আগে।

বলেন কী! কোন্ সাহেব-বিবির দেশের লোক—ওই মেয়ের নিন্দে করে?

দয়ালহরি বললেন, সে ধরি নে। নজর সকলের সমান হয় না। হাটে লাউ-বেগুন কিনতে গিয়েও লোকের কত রকম বাছাবাছি, কত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তাই বলে কটকট করে মুখের উপর বলবে, এক হাজার এক টাকায় ও-মেয়ে ঘরে নিতে পারি। আধলা পয়সা কম হবে না।

আচ্ছা অভদ্র তো।

পাড়াগাঁয়ের গাছমুখ্যু—মেয়ে আমার কলকাতায় মানুষ, লেখাপড়া জানে, তার

কদর ওরা কী বোঝে? হাজার টাকা। টাকা দিয়ে অমন ঘরে কাজ করতে যাবো কেন? হাজারটা পয়সাও দেব না, এই আমার পণ। সে যাক গে. না পোষায় না করলি। কিন্তু দরাদরিটা আড়ালে হলেই হত। সেইটে আমার বেশি রাগের কারণ। কী বলব হুজুর, মায়ের দু-চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল।

অশ্রুমুখী অপমানিতা মেয়েটিকে যেন চোখের উপর দেখছি। মনে মনে তবু আনন্দ। ঝড় ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা কেটে গেছে যেমন করেই হোক।

দয়ালহরি বললেন, আমিও ছাড়ি নি হুজুর। রাগের মাথায় রাজভাষাই বেরিয়ে গেল। গেট আউট, এক্ষুনি বেরোও। রাত্তির বেলা, উড়োকালে সাপখোপের ভয়— তা মগজে রক্ত চড়ে গেল কেমন। হাট থেকে এক কুড়ি গলদা-চিংড়ি কিনেছিলাম, সকালবেলা পচা মাছগুলো আদাড়ে ফেলে দিলাম। রাতে রাঁধাবাড়া হয় নি, বাড়িসুদ্ধ লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এরপরে একরকম চুপচাপ চলেছি। ভাবছি। দয়ালহরির জানবার কথা নয়— আমি তো দেখে নিয়েছি মেয়েকে। মেয়ে খারাপ বলে কোন্ বিবেচনায়? ভুল হল তবে নাকি আমার? অন্য কাউকে দেখেছি? কিন্তু হোড়-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জল নিয়ে ফের সেখানেই ঢোকে। ঐ বয়সের অন্য কেউ নেই, সে খবর নিয়েছি হরিশের কাছে। তবু এ প্রসঙ্গ তুলতে পারি নে। গ্রামের মধ্যে হাকিম মানুষ— আমার অফিসের এক ভেন্ডারের মেয়ের সম্পর্কে আগ্রহ দেখানো চলে কেমন করে?

মনের উল্লাসে দয়ালহরিকে বললাম, আপনার বাড়ির রান্না কতই খেয়েছি, আমার এখানে খেয়ে যান আজকে। হরিশকে আপনি দিয়েছেন, কী রকম করছে একটা দিন পরখ করে যাওয়াও তো উচিত। একেবারে খেয়েদেয়ে যাবেন এখান থেকে, আসুন ততক্ষণ গল্প-সল্প করা যাক। হরিশ বরঞ্চ এক ছুটে আপনার বাড়ি খবর দিয়ে আসুক।

দয়ালহরির বড় সংকোচ। সেটা বুঝতে পারি—আমি এজলাসের চেয়ারে-বসা হাকিম, ওঁর আসন রোয়াকের উপরে মাদুর। বড্ড না-না করছেন। তখন আমি হাত ধরে ফেললাম: রোজ মিষ্টি মিঠাই খেয়ে একদিন নিম-উচ্ছে খেতে হয়। দেহের পক্ষে ভাল। আসুন, আসুন। হরিশের রান্না তা বলে নিমের মতন অত কটু হবে না।

অগুন্তি ঘর গোলবাড়িতে। মাখন মিস্তির তার চার-পাঁচটা মনের মত করে মেরামত করিয়েছিল। আমি সামনের গোলঘরটা মাত্র নিয়েছি। শোওয়া-বসা সমস্ত সেখানে। ঘর বেশি নিলে সাফ-সাফাই রাখবার হাঙ্গামা। আর হরিশ লম্বা দরদালানের এক পাশে ইট দিয়ে উনুন গেঁথে নিয়েছে। আগে তার শোবার ঘরও ছিল ওখানে, ইদানীং শুধুমাত্র রান্নাঘর। সন্ধ্যার পরে রাঁধতে রাঁধতে ঘরের ভিতর সে আমারে মুখ দেখতে পায়। এঘরে ওঘরে কথাবার্তাও চলে। আজকে গোলঘরের খাটের উপরে দয়ালহরির সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছি। প্রবোধ দিচ্ছি তাঁকে: ভাববেন না, মেয়ের বিয়ে আটকে থাকবে না। ওই যে আপনারা বলে থাকেন, মেয়ে জন্মেছে যখন বর ব্যাটা জন্মে গেছে তার আগে। ঠিক তাই। বরঞ্চ ভালই হল অভদ্র লোকগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে।

দয়ালহরি অবাক করে দিলেন: ছেদ আর কোথায় হল হুজুর, ঝুলছে এখনও। ভেবেছিলাম তাই বটে। কিন্তু অত কথা-কথান্তর, কিছুই ওরা গায়ে মাখে নি। বিকেলে ওদের লোক কাছারি এসে দেখা করে বলে গেল, সাত-শ অবধি নামতে রাজি। বাড়ির লোকজন ছ্যাঁচড়ার বেহদ্দ। বিশেষ করে বাবরি-চুলওয়ালা সেই লোকটা— পাত্রের খুড়ো হলেন তিনি। তবে যাই বলুন হুজুর, পাত্রটি লোভনীয়। কী বলেন? কিন্তু সাত-শই বা কি জন্যে দেব? আরও নামবে। নেমে শূন্যিতে আসুক, তখন

দেখব। সেটা আর ভাঙলাম না। বললাম, দেখি ভেবে। ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকতে মেজাজ দেখাতে নেই। কাল ভুল করেছিলাম, আজ অনেকটা শুধরে নিয়েছি।

হতে হতে এর পর দয়ালহরির সংসারের কথা। এবং সেই থেকে লাবণ্যর কথা। আহা, জন্ম থেকে কী কষ্টটা পাচ্ছে! কষ্ট আঁতুড় থেকেই। আঁতুড়ঘরে আগুন লেগে যায়। মেয়েটাকে যা-ই হোক উদ্ধার করা গেল, মেয়ের মা'র সর্বাঙ্গ পুড়ল। অনেক কষ্টে বিস্তর চিকিৎসাপত্তোর করে প্রাণটা বেঁচেছে। কিন্তু শুধুমাত্র আগুনে পোড়া নয়—হাঁপানি গেঁটেবাত অম্লশূল আরও বিশখানা রোগ বড়বউয়ের। শরীরটা ব্যাধির কারখানাবিশেষ। দশ-পাঁচটা মাইনের ঝি-চাকর নেই, সংসারের কাজকর্ম সমস্ত করতে হয় এই অবস্থার মধ্যে। কষ্ট দেখে মেয়ের দিদিমা নাতনিকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। বুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, লাবণ্য যা হোক এক রকম ছিল, বুড়ি-অন্তে আবার দুঃখের দশা। ঠেলা-গুঁতো লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটানো। হতভাগী মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে একটু সুখশান্তি পায়, সেইজন্য এদেশ-সেদেশ সম্বন্ধ খুঁজে বেড়ানো। দেখবেন তো হুজুর। মেয়ে কলকাতায় বড় হয়েছে, কলকাতার কোন পাত্র যদি পাওয়া যেত! কিন্তু এই ধাপধাড়া জায়গার লোকে নগদ সাত-শ হেঁকে বসে থাকে, কলকাতার ল্যাজে হাত দিতে যাই বা কোন্ সাহসে?

দু-পাঁচ কথার পরে আবার বলেন, ভুলবেন না হুজুর। নগদ পণ দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের পুরনো ঘর, গয়নাগাঁটি কিছু বেরোবে। ভাল ভাল গয়না দু-পাঁচখানা। ওর মামা থাকতে কলকাতার সম্বন্ধ কয়েকটা এসেছিল, দেখেও গিয়েছিল ওদের চাঁপাতলার বাসায় বসে। তিনি ঘটক লাগিয়েছিলেন। কিন্তু কপাল খারাপ, সে মামাও টপ করে মরে গেলেন।

ফোঁস করে দয়ালহরি নিশ্বাস ছাড়লেন। চাঁপাতলার নাম আমি তো বউদির চিঠিতে পেয়েছি—ডানাশূন্য পরী যেখানে দেখে এসেছেন। হতে পারে এই লাবণ্য। ধরেই নিচ্ছি আমি তাই।

ধারা শ্রাবণ, তারপরে পচা ভাদ্র। ভাদ্র মাসটা বড় খারাপ। টিপটিপে বৃষ্টি, পথেঘাটে প্যাচপেচে কাদা, পাট-পচানি জলের গন্ধে সর্বক্ষণ নাকে কাপড় দিতে হবে। তার উপরে মশা। মশার ঠেলায় তাসের আড্ডা পুরোপুরি বন্ধ। হেন বীর কে আছে, সন্ধ্যার পরে মশারির বাইরে বসে থাকবে! ডাক্তারবাবুর রোগীর ভিড় সারা বছরই, কিন্তু এখন একেবারে নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। প্রতি বাড়িতেই রোজ একটা দুটো করে শয্যা নিচ্ছে। শীত করে জ্বর আসে, হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপুনি লাগে। লেপ-কাঁথা, কম্বল, শতরঞ্জি, মাদুর, মশারি বাড়িতে যত-কিছু আছে সমস্ত গায়ে চাপিয়ে শীত কাটে না, গলা দিয়ে উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ গান বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া। একেবারে খাঁটি বস্তু—তার প্রধান লক্ষণ, গান বেরুবে জ্বর আসবার মুখটায়।

দেখতে দেখতে এমন অবস্থা, মানুষের মুখ দেখতে পাই নে। দলিল রেজেস্ট্রি বাবদে কালে-ভদ্রে একজন দুজন আসে। এক ঘটি জল এগিয়ে দেবার সুস্থ মানুষ পাওয়া দায়, জমিজমা খরিদ-বিক্রির পুলক আপাতত ঠাণ্ডা। ভয়ে ভয়ে কুইনাইন ধরেছি। গোড়ায় এক বড়ি সকালবেলা, এখন সকাল-দুপুর-রাত্রি তিনবার করে চালাচ্ছি। ভাত বন্ধ করে শুধুমাত্র চা-কুইনাইনে পেট ভরাব কিনা ভাবি। তবু রক্ষা হল না, জ্বরে ধরল। প্রকোপ বড্ড বেশি। নতুন মানুষ, এ রোগে প্রথম এই পড়লাম—

সেইজন্যে। অথবা ম্যালেরিয়ার যেন বোধজ্ঞান আছে, চোখ পাকিয়ে আমার টুঁটি চেপে ধরেছে: কুইনাইনে যে রুখতে গিয়েছিলি বড়? ঠেকাক কুইনাইনে। কাঁপতে কাঁপতে চৈতন্য হারাবার গতিক। কাঁপুনি থেমে শেষটা আগুন ছোটে গা দিয়ে। এ সমস্ত পরে শুনেছি হরিশের কাছে, আমার বোঝবার শক্তি ছিল না। দয়ালহরিও বলেছেন। উনি প্রায়ই আসতেন। এ জায়গার মানুষ ভুগে ভুগে জ্বরের ধারা বুঝে ফেলেছে, গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। চিকিৎসা আবার কী—পনের-বিশ দিন ভুগে আপনি খাড়া হয়ে উঠবে। জ্বর বেশি হলে মাথায় জল ঢালুন, জ্বর কমলে কুইনাইন-মিকশ্চার খান। এ ছাড়া কিছু করণীয় নেই। তবে আমার বেলা ডাক্তারবাবু রোজ এসে দেখে যেতেন। বাড়াবাড়ির মুখে হরিশ রাত্রিবেলাও থাকত। মুখের কাছে জলের গেলাসটি এগিয়ে ধরা, বমি সাফ-সাফাই করা, ক্ষিধে পেলে নারিকেল-পাতা জ্বেলে তাড়াতাড়ি এক ঝিনুক বার্লি জলে ফুটিয়ে আনা—একজন কেউ না হলে এত সমস্ত করে কে? সকলের পরামর্শে হরিশ বউকে বাপের বাড়ি রেখে এসেছিল কয়েকটা দিন।

বেহুঁশ হয়ে প্রলাপ বকতাম। এমন কি, থানার বড়বাবু ছোট-বাবু দেখতে এসে একদিন দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। নৌকো পাঠিয়ে সদর থেকে বড় ডাক্তার আনার প্রস্তাব হল। কলকাতায় দাদাকে লেখার কথাও হচ্ছিল। ঠিকানা কোথায় পাওয়া যায়?

দয়ালহরি বললেন, আমি জানি। অসুখে পড়বার পর যত চিঠিপত্র আসে, আমিই এনে দিই। একলা প্রাণী পড়ে আছেন, বয়সে ছেলেমানুষ। দায়ে-বেদায়ে লাগতে পারে, তাই ভেবে সেরেস্তায় ঠিকানাটা টুকে রেখে দিয়েছি।

এ সমস্ত হরিশ আমায় পরে বলেছে। কিন্তু অতদূর আবশ্যক হল না। সেই রাতেই ঘাম দিয়ে জ্বর রেমিশন হল। জ্বর এল আবার পরদিন, কিন্তু প্রকোপ বেশি নয়। এইবার কমতির দিকে চলল, ম্যালেরিয়ার রীতি এই।

আর ক'দিন পরে দয়ালহরিই বললেন, হুজুরের দাদার কাছে কিন্তু জানানো হয় নি।

ভাল হয়ে যাচ্ছি, আমিই জানিয়ে দেব ক'দিন পরে। খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন। খবর পেয়েই তো হুড়মুড় করে এসে পড়তেন, কোথায় থাকতেন, কী হত—

দয়ালহরি বললেন, আমরা এত জনে আছি, থাকবার জায়গার কি অভাব হত, পথে পড়ে থাকতেন? সেটা কিছু নয়। ভাবনা হল, ওঁরাও যদি জ্বরে পড়ে যান। পড়তেনও ঠিক। নতুন মানুষ পেলে ধরবেই। আপনার বেলা যা হল—এত কুইনাইন খেয়েও পারলেন রুখতে?

ভালই হয়েছে। দাদা-বউদিকে আর কিছু জানাচ্ছি নে। যাচ্ছি তো সামনের পুজোয়—তখন গিয়ে বলব। বলতে হবে না, চেহারা দেখে টের পাবেন। ছুটি নিয়ে দশ-পনের দিন বেশি কাটিয়ে শরীরটা মেরামত করে ফিরব।

জ্বর তাড়িয়ে ডাক্তারবাবু অবশেষে অন্নপথ্য দিলেন। আর দশজনের চেয়ে ভোগান্তি কিছু বেশি হল, এই যা।

শুনবেন তবে? অবাক হবেন না, অন্নপথ্যের দিন আমার খুব খারাপ লাগছিল। ওঁরা যাকে বলেন বেহুঁশ হওয়া, সে অবস্থা আসবে না তবে আর? মজায় থাকতাম জ্বরের যখন বাড়াবাড়ি হত। অতিরিক্ত কুইনাইন খেয়ে কানে তালা লাগে—হলপ করে বলছি, আমার সে বস্তু নয়—অনেকগুলো ক্ষীণ মধুস্বর বাজত কানে। তার-যন্ত্রের অতি-মিহি সুরের বাজনা। অভিনব ঘরকন্না ছড়ানো যেন চারিদিকে—ব্যস্ত-

সমস্ত এক দঙ্গল নরনারী। ফুটফুটে বললে কিছুই হল না, উজ্জ্বল দিনের আলোর মত তাদের চেহারা। এই গোলঘরের ভিতর দিয়ে কতবার আনাগোনা—কিন্তু আমি জলজ্যান্ত মানুষটা খাটের উপর পড়ে আছি, মেঝের উপরে আরও একজন হরিশ—কিছু ওরা দেখতে পায় না, কানেও শোনে না। এত চলাফেরা করছে, পা কখনও পড়ে না শক্ত ভূমির উপর, ক্ষীণতম শব্দ নেই। আমার গায়ের উপর দিয়ে আড়াআড়ি খাট পার হয়ে দেয়াল ভেদ করে কেমন স্বচ্ছন্দে চলে গেল, কোন-কিছু বাধে না কোথাও। অবাক হয়ে মজা দেখি, ইচ্ছে করে আমি ওই কায়দাটা পেতাম! এবং বিশ্বাস হচ্ছে, চেষ্টা করলে ঠিক পারব আমি, কঠিন কিছু নয়। অমনি হালকা আমিও হয়ে যেতে পারি!

এমনি সময় হরিশ হঠাৎ রসভঙ্গ করে: কী দেখেন হুজুর, অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে? ওষুধ খান। জল এনেছি কুলকুচো করে নিন আগে। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কী হয়ে গেল স্লেটের লেখা জলে ধুয়ে ফেলার মত। কিংবা সিনেমার রীল ছিঁড়ে গিয়ে সাদা পর্দা মাঝখানে বেরিয়ে পড়ে যেমন। সেই অবস্থায় হাত তোলার যদি শক্তি থাকত, ঠিক আমি মেরে বসতাম হরিশকে। লাঠি তুলতে পারলে এক বাড়িতে মাথা ফাটাতাম তারপর সম্বিৎ ফিরে আসে: তাই তো, অসুখে ভুগছি আমি। কলকাতা থেকে অনেক দূরে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি। দাদা-বউদি কাছে নেই, টুনুও নেই। ভাগ্যবেশে হঠাৎ বুঝি কোন রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, আমায় ওরা খাটো করে সামান্য সংসারে ফিরিয়ে আনল।

একদিন দয়ালহরির মেয়েকেও দেখলাম যেন ওই এরসা মানুষেব জনতার ভিতরে। কী নিয়ে লাবণ্যকে তাড়া করছে সমবয়সী ক'জন। একপিঠ চুল উড়ছে ছুটাছুটিতে, সদ্য স্নান করে এল বুঝি? এই রেঃ, ধরে ফেলল লাবণ্যকে, শাস্তিটা কী দেয় না জানি। হাসি—তুবড়িবাজির মত ঘরময় হাসির ফুলকি। আর কথা। উঁহু, কথা বলে না ওরা, গান গায়। সত্যি লাবণ্য, না অন্য কেউ? মাথায় গোলমাল লেগে যায় আমার। ঠিক করে কিছু ভাবতে পারি নে। যা হবার হোক গে। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলাম।

আরও একদিন। লাবণ্য আজ একা। বড় গম্ভীর, চোখ ছলছল করছে। আহা, আঁধার মুখও এমন খাসা! কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই ঘরের ভিতর! পেয়েছেও যেন—ছোট্ট ছোট্ট জিনিস, খুঁটে খুঁটে বাঁ-হাতের মুঠোয় রাখল। কিন্তু আমি এই এত বড় মানুষটা কিছুতে নজরে পড়ি নে। হাত উঁচু করে তুলেছি, চেচাচ্ছিও বোধহয়। কিছু না, দেয়াল পার হয়ে আমবাগানের দিকে ভেসে বেরিয়ে গেল।

এমনি কত! এখন ভুলে গেছি। আরোগ্য হয়ে অন্নপথ্য পেলাম—তারপর থেকে ভেবে ভেবেও আর মনে পড়ে না। শুধু ঘুম আসবার মুখটায়—যতক্ষণ ঘুম না এঁটে আসে—কত সব জায়গার ভাসা চেহারা দেখতে পাই। জ্বর বন্ধ হলেও উঠতে পারি নি অনেকদিন। ঢেঁকিতে চিঁড়ে কোটা দেখেছেন, আমায় যেন তেমনি করে গড়ের মধ্যে ফেলে আষ্টেপিষ্টে কুটে রেখে গেল।

হাকিম বিহনে রেজেষ্ট্রি অফিসের কাজ বন্ধ ছিল কয়েকটা দিন। তার পরে সদর থেকে একজন এসে পড়ল আমার চেয়েও বয়স কম। আপাতত এক মাসের জন্য এসেছে, আমি ভাল হয়ে উঠলেই চলে যাবে। ছোট দারোগার সঙ্গে কী রকমের শালা-ভগ্নিপতির সম্পর্ক—অতএব বাসার সমস্যা নেই, থানার কোয়ার্টারে এসে উঠেছে। প্রায়ই আমায় দেখতে আসে। বলে, খাড়া হয়ে উঠুন দাদা, আর তো পেরে উঠি নে—দম

বন্ধ হয়ে আসছে। কেমন করে থাকেন আপনারা বলতে পারি নে।

পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছে। আর আমার আজ এমনি গতিক, ঠেঙালি দিলেও নড়ছি নে বিরাটগড় থেকে। কেমন সব উল্টোপাল্টা আমার কাছে, অন্য দশজনের সঙ্গে মিলছে না। জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকতাম, সেই ঘোর কেটে যাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে এখন রীতিমত। ডাক্তারবাবু, দয়ালহরি এবং দারোগারা ষড়যন্ত্র করে তাড়াতাড়ি জ্বর তাড়িয়ে দিলেন। হিংসুটে ওঁরা, আমার অত সুখ সহ্য হচ্ছিল না।

চাপরাশি হরিশকে অফিসের সময়টা হাজির দিতে হয়। ফাঁকা দুপুর। অসুখের মধ্যেও দুপুর ছিল, কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিলাম না। তখনই আরও ঘর ভরে যেত জনতায়। একটা ভিন্ন জগতের দরজা খুলে গিয়েছিল যেন। সে জায়গা আলাদা কোথাও নয়, আমাদের এই সংসারেই ব্যেপে রয়েছে। এর চেয়ে অনেক বড় অনেক বিস্তীর্ণ। শুয়ে শুয়ে ওই দেখতে পাচ্ছি পিঁপড়ের সারি চৌকাঠের পাশে বাসা গড়েছে। বারান্দার দিক থেকে খাদ্যের কণিকা বয়ে বয়ে এনে রাখছে। দুর্ভেদ্য নিরাপদ আশ্রয় ওদের। কিন্তু আমার কাছে? জুতোর তলায় লহমার মধ্যে পিষে ফেলতে পারি সমস্ত। উপমাটা লাগসই হচ্ছে না। পিঁপড়ে ওই তো নজরে আসছে। আণব প্রাণী, মাইক্রোব, ইন্দ্রিয়-সীমানার বাইরে যাদের বসবাস—অবাধে তাদের উপর বিচরণ করে বেড়াই, বুঝতে পারি নে। ঠিক তেমনি সম্পর্ক যেন আমাদের এবং সেই তাদের মধ্যে। রোগের বিছানায় হঠাৎ তৃতীয় নেত্র খুলে গিয়েছিল, সেই ক'দিনে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। শুধুমাত্র যুক্তিবিচারে অনুভূতি এমন গভীর হয় না।

এখন ভিন্ন অবস্থা। নিঃসঙ্গ। তারা তো বাতাসের মতন অদৃশ্য হয়ে গেছে, আবার রক্তমাংসের স্থূল চেহারারও কেউ আসছে না। মানুষ কাজকর্মে ব্যস্ত, কাজ ফেলে কে রোগীর কাছে বসে থাকবে? একলা প্রাণী পড়ে থাকি ঘরের মধ্যে। মা-বাবা কবে চলে গেছেন, তাঁদের কথা ভাবি। ছোটবেলা থেকে যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারাও সব মনে আসে। পিছন ফিরে সেই বয়সটায় চক্কোর দিয়ে বেড়াই। কতজনে নেই তাদের মধ্যে। আরও যত বয়স হবে, মরা বন্ধুদের সংখ্যা বাড়বে ততই। আজকে কোথায় তারা সব—ভাবতে গিয়ে থই পাই নে।

যত মরা মানুষের কথা ভাবি। দলে ভারী তারাই, জ্যান্ত আর ক'জন? মরছে তো আজ থেকে নয়—সৃষ্টি-সংসারের শুরু যখন, সেই থেকে। আদমের আমল থেকে। উঃ, কী ভিড় সেই মরা রাজ্যে! ভাগ্যিস খেতে হয় না ওদের, বায়ুভূত বলে জায়গাও লাগে না। নইলে তো লড়ালড়ি বেধে যেত। আমিও আর একজন ভিড় বাড়াচ্ছিলাম তাদের মধ্যে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ডাক্তারবাবু বলেন, একদিন বড় ক্রাইসিস—ভয় হয়েছিল তাঁর। টেম্পারেচার হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। বেহুঁশ। নাড়ির বেগ মণিবন্ধে নয়, বাহু অবধি উঠেছে। তারপরে সামলে সিলাম। এমনি অসুখ-বিসুখের সময় মায়ের কোলের ভিতর বাঁকা হয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম সেকালে—রোগ হওয়াটা সত্যি বড় আরামের ছিল। আজকে ধরুন, সেই মা মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ালেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

কিংবা এসে গেল প্রভাস—ছেলেবেলায় আমার সর্বক্ষণের সাথী। ঠিক দুপুরবেলা মগডাল থেকে পড়ে গেল, সন্ধ্যা হতে না হতে মাদুরে মুড়ে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে শ্মশানঘাটে নিয়ে পোড়াল। সেই প্রভাস যদি এতকাল পরে খবরাখবর নিতে চলে আসে এই ঘরের মধ্যে? অথবা ঝিকমিকে এক কিশোরী—কি নাম তার? মায়া বোধহয়। ভোজ খাচ্ছিলাম উঠানে সামিয়ানার নীচে। কাজের বাড়ি অনেক আত্মীয়-

কুটুম্ব এসেছে, তাদেরই কেউ হবে। মেয়েটি। বাংলা-ঘরে বাঁশের খুঁটির পেলা—সেই একটা খুঁটির গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াদাওয়া দেখছিল। উঠতি বয়স তখন আমার—ঠিক একখানি প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে, এমনিধারা মনে হল। সে রাতে ঘুম হয় নি অনেকক্ষণ, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করি। মায়া এসে বসুক আমার কাছে, দুটো কথা বলে যাক। তারপরে শুনেছিলাম, নদীতে চান করতে গিয়ে কুমিরে ধরেছিল মায়াকে। ঘাটের জলে খানিকটা রক্ত, আর কোন চিহ্ন মেলে নি। না রে ভাই, কাজ নেই—বলছি, কাজ নেই তাদের কারও ফিরে আসবার চুকিয়ে-বুকিয়ে চলে গেছে তো সেই পরিচ্ছেদ আবার কেন ?

বরঞ্চ দয়ালহরির মেয়ের এসে দেখে যাওয়া উচিত। বিদেশ-বিভুঁয়ে একলা পড়ে আছি—কলকাতার মানুষ হয়ে সৌজন্যবোধ কেন থাকবে না ? ব্যবধান তো একটা মাঠের এপার আর ওপার। আম কুড়োবার সময় ভোররাত্রে উঠে আসা যায়, আর নিরালা দুপুরে দরজায় দাঁড়িয়ে একটিবার চোখের দেখা চলে না ?

ভাবতে ভাবতে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে উঠি। বিছানায় পড়ে থাকতে পারি নে। বাইরে যাব, চৌকাঠ পার হয়ে যাই নি কতদিন। কিন্তু পা টলমল করে। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি বুঝতে পারি নি। জানলার চাতালে তাড়াতাড়ি বসে পড়তে হয়। গরাদ আঁকড়ে থাকি দু-হাতে প্রাণপণে। মাথা ঘুরে পড়ে না যাই। গোলবাড়ির পুকুরে লাবণ্য জল নিতে আসে না বোধহয় আজকাল। বর্ষার পরে হোড় মশায়ের বাড়ির পুকুরই জলে টইটম্বুর, দূরের জল বয়ে নেবার কী গরজ ? আরও বিপদ, ওদের বেড়ার জিওল-গাছে পাতা গজিয়েছে—সবুজ পাতার বোঝায় বাইরে-বাড়ি ঢেকে গিয়েছে একেবারে। সারাক্ষণ নজর মেলেও কিছু দেখতে পাই নে।

অফিসের ফিরতি পথে দয়ালহরি খবরবাদ নিতে আসেন। চিঠিপত্র থাকলে দিয়ে যান। আগে রোজই আসতেন, এখন দুটো একটা দিন ফাঁক যায়।

কেমন আছেন ?

একটু ভাল। ক্ষিধেটা খুব হয়েছে।

তবে তো পনের আনা সেরে গেছে। ক্ষিধে বেড়েছে, আর ভাবনা নেই।

দেহ যত দুর্বল হোক, মাথা আমার ষোল আনা সুস্থ। শুকনো মুখে বলি, ভাবনা বরঞ্চ বেড়েই গেছে। ক্ষিধে পায় একটা-দুটোর সময়। কী খাই কী খাই অবস্থা। যম-ক্ষিধে যাকে বলে।

হরিশ অনেক আগে ফিরেছে। বাসন ধুচ্ছিল রোয়াকে বসে। সেখান থেকে হাঁ-হাঁ করে ওঠে: অমন অলক্ষুণে কথা মুখেও আনবেন না হুজুর। এত ভোগান্তি গেল। ক্ষিধে পায় তো খাবেন। টিনের বিস্কুট রয়েছে।

কথা কেড়ে নিয়ে দয়ালহরি বলেন, কমলানেবু আনিস নে কেন রে ? আজকাল বারো মাস পাওয়া যায়। তোরা না পারিস, আমায় বলবি। সদর থেকে আনিয়ে দেব। কত মানুষ যায়, হুজুরের নাম করে বলে দিলেই এনে দেবে।

আমি বললাম, কী ভয়ানক ক্ষিধে—নেবু-বিস্কুটে তার কী হবে ? মালসাখানেক বার্লি-সাবু গিলতে পারলে তবে বোধহয় সে আগুন ঠাণ্ডা হত।

হরিশ বলে, তাই হবে, আমার আগে বলেন নি কেন ? কাল থেকে বার্লি ফুটিয়ে ঢাকা দিয়ে যাব।

হেসে বলি, তবেই হয়েছে। মিছে কষ্ট তোকে করতে হবে না। ঠাণ্ডা বার্লি খাইয়ে দেখিস নি এর আগে ? বমি হয়ে যায়। এক গুণ খেলে তিন গুন বেরিয়ে

আসে। গরম-গরম হলে তবে গিয়ে পেটে ভর থাকে।

হরিশ নিরুপায়ের মত মুখ করে থাকে। দয়ালহরির দিকে আমি সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়েছি। কথা তো ছুঁড়ে দিলাম, কী রকম ফলাফল হয় দেখি। কিছু না, কিছু না। ঝানু লোক—তাঁর যে এ ব্যাপারে কিছু করণীয় থাকতে পারে, কোনক্রমে তা মনে আসছে না। ইচ্ছে হলে তিনিই বার্লি-সেবনের ব্যবস্থা করতে পারেন। হরিশকে দিয়ে কৌটো কৌটো বার্লি আমি হোড়বাড়ি পাঠিয়ে দেব, জলে ফুটিয়ে দুপুরবেলা বাটিখানেক করে ওঁরা পাঠাবেন। ঝি-চাকর রাখবার অবস্থা দয়ালহরির নয়। সে আমি জানি! এবং এ-ও জানি, লাবণ্যের জন্মের সময় বড়বউ অগ্নিদগ্ধ হলেন, পা দুটো একেবারে পঙ্গু সেই থেকে। দু-হাতে ভর দিয়ে ব্যাঙের মতন থপথপ করে বাড়ির মধ্যে কোন গতিকে বেড়ান। মাঠ ভেঙে বার্লি দিয়ে যাবার তাগত বড়বউয়ের নেই। কিন্তু তালগাছের মতন মেয়েটা আছে কী করতে? স্ফূর্তি করে আম কুড়িয়ে বেড়াতে পারে, রোগি মানুষের ক্ষিদের সময় এক বাটি বার্লি দিয়ে যেতে পারবে না? কিন্তু ভাবছে কে এতসব? আমার কথা কানেই গেল না তো দয়ালহরির।

বরঞ্চ হরিশ বেশ চিন্তিত। পরদিন অফিসে যাওয়ার সময় বলল, একটা কথা ভাবছি হুজুর। আমার পিসশাশুড়ি বেওয়া মানুষ আছেন, দায় জানালে তিনি এসে দু-পাঁচটা দিন থেকে যেতে পারেন। থাকবেন আমার বাড়ি, দুপুরবেলাটা এসে পথ্যি রেঁধে দেবেন। কি অন্য যদি কোন দরকারে লাগে। রবিবারের আর দুটো দিন—এই দুটো দিন থাকুন কষ্ট করে বিস্কুট চিবিয়ে। রবিবারে গিয়ে তাঁকে এনে ফেলব।

হরিস অফিসে গেল। তারপরে আমি একা। খাতা-কলম নিয়ে বসলাম অনেকদিন পরে। দু-চার ছত্র এসে যায় যদি। দুর! বই পড়তে গেলাম। পাতাখানেক পড়ে মনে হল, চোখ দিয়ে পড়ছি শুধু, কি ছাইভাস্ম পড়লাম মনে ঢোকে না। চিঠি ফেঁদে বসলাম একখানা। খানিকটা টুনুকে : অনেক খেলনা কিনেছি তোমার জন্য। এক গাদা। পুজোর সময় নিয়ে যাব। বউদিকে লিখলাম : চারিদিকে জ্বরজারি। সে যে কী অবস্থা, কলকাতায় বসে তার কোন আন্দাজ পাবে না। কিন্তু কুইনাইনের কল্যাণে আমি ঠিক আছি। কেবল কান ভোঁ-ভোঁ করে। সে ভারি মজা। ঝিঁঝি ডাকছে কোথায় অনেক দূরে। অথবা কার বাড়ি বিয়ে হচ্ছে যেন, সানাই বাজছে, আওয়াজটা বড্ড মিহি। বউদি, নিখরচায় ভাল সানাই শুনবে তো কুইনাইন ধর···

অনেকটা লিখে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মাথা দপ-দপ করছে, শীত লাগছে। এই রেঃ, জ্বর আসে বুঝি। এই অবস্থায় লেখার খাটনি খেটে জ্বরটা আমিই আবার নিয়ে এলাম ডেকে। ডাক্তারবাবু শুনলে খাপ্পা হবেন। চাদর মুড়ি দিয়ে টান-টান হয়ে পড়লাম। ঘুমোই। ঘুমিয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাব।

কতক্ষণ পড়ে আছি, বলতে পারি নে। আঙুলে রগ টিপে আছি, কষ্ট আরও বেড়েছে। তখন মনে হল, অডিকলোনে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কপালে পটি দিই। অডিকলোন দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, উঠে নিয়ে আসি। মুখের চাদর সরিয়ে দেখি—

সে ছবি কোনদিন ভুলব না। এত কাছাকাছি কখনও পাই নি, এমন ভাল করে আর দেখি নি। আমার শিয়রের পাশে এসে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ধবধব করছে ফরসা রং। দুধের মত—উঁহু, জ্যোৎস্নার মত। জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ আমেজ মাখানো। আমার সামনে দয়ালহরি চুপচাপ মুখ বুজে ছিলেন, বাড়ি গিয়ে ঠিক গল্প করেছেন আমার অসহায় অবস্থার কথা। মেয়ের কী মন হল—বার্লি নেই তো খালি হাতে চলে এসেছে। কে চায় বার্লি খেতে—বার্লি তো আমার পেটেই

দাঁড়ায় না, ওয়াক করে বমি করে ফেলি। আর ওই কানা লোকগুলোর কথা ভাবছি—এক কানা হলেন দয়ালহরি, আর কানা ষষ্ঠীপুকুরের বাঁদর-চতুষ্টয়, যারা মেয়ে দেখতে এসেছিল। হরিশও কানা। নয়তো এই মেয়ের চেহারা নিয়ে কথা বলে? আচ্ছা, রোগাতুর দৃষ্টি বলেই কি আজকে আমার এত সুন্দর লাগে?

তাকিয়ে পড়তে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, কষ্ট হচ্ছে?

না, না—বেশ তো আছি।

মিথ্যাও নয় জবাবটা। বলুন দিকি, কষ্ট থাকে অমন মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দরদ জানাবার পর? এতক্ষণের আহা-উহু চক্ষের পলকে গানের মতন সুরেলা হয়ে উঠেছে।

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু না বসে চকিতে বেরিয়ে চলে যায়ঃ আজকে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে—কেমন?

হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ বুঝলাম। হরিশ এসে পড়েছে। রাস্তায় দূরে তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পালাল।

মুখ কালো করে হরিশকে বলি, এত সকাল সকাল?

নতুন হুজুরকে বললাম আপনার কথা। গিয়ে বার্লি রেঁধে দেব। বলতেই তিনি ছুটি দিয়ে দিলেন।

কে খাচ্ছে তোর বার্লি? হয়েছে কী আমার? আমার কথা কী জন্যে বলতে গেলি তাঁর কাছে?

রাগ দেখে হরিশ হকচকিয়ে যায়।

ছুতো করে পালিয়ে আসা! সরকারের মাইনে খাস না যে যখন-তখন চলে এলেই হল?

হরিশ আস্তে আস্তে বলে, রোজ তো নয়। এই আজ হল, আর কালকের দিনটা। পরশু তো পিসিমাকে নিয়ে আসছি।

কাউকে আনতে হবে না তোর। ওই এক মতলব হয়েছে। জানিস যে, বার্লি খেতে পারি নে, বমি হয়। রোগা শরীরে বমি করতে করতে চোখ উলটে পড়ব। সেইটে না ঘটিয়ে ছাড়বি নে।

হরিশ সরে গেল। লাবণ্য কথা রেখেছে। সেই থেকে রোজ দুপুরে চলে আসে। কথাবার্তা অতি সামান্য, কোনদিন একেবারেই নয়, মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। তা-ও সামান্যক্ষণ—দু-পাঁচ মিনিট। ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল, হপ্তা দুয়েকের মধ্যে একেবারে নিরাময়। গ্রাম-অঞ্চলে সাধু-ফকিরেরা ঝাড়ফুঁক দিয়ে ব্যাধি সারায়। ডাক্তারবাবু যত ওষুধই দিন, আমি জানি, দু চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে লাবণ্যই আমার জ্বর সারিয়ে দিল।

জ্বর বন্ধ হবার পরে কালে-ভাদ্রে কদাচ দেখা পাই। নতুন হিম পড়ছে। দুটো একটা মাস এখন খুব সামাল হয়ে থাকতে হবে, ডাক্তারবাবু পই পই করে বলেন। ঠাণ্ডা লাগানো বিষের মত শরীরের পক্ষে। এবং শীতকালে আবার যদি জ্বরে পড়েন, যত ওষুধই খান, জ্বর চলবে ফাগুন-চৈত্র অবধি।

বললেন, স্থান পরিবর্তনে উপকার হয়। আর কোথাও সুবিধা না পান, পুজোর সময়টা কলকাতায় থেকে আসুন, তাতেই কাজ হবে। আমি কিন্তু আগে-ভাগে উল্টোরকম লিখে দিয়েছিঃ বনেদি গ্রাম, দশ-বারোখানা প্রতিমা উঠবে, এখন থেকে সোরগোল পড়ে গেছে। গ্রামের বাসিন্দা যে যেখানে থাকে, সকলে এই সময় এসে

পড়েছে। সারা গ্রাম এক হয়ে গেছে উৎসবের আনন্দে। সব বাড়ি নিমন্ত্রণ—যে-কোন এক জায়গায় খেয়ে নিলেই হল। এই কান্ড চলল এখন শ্যামাপুজো অবধি। চাঁদা তুলে প্যাণ্ডেলের সর্বজনীন পুজো আর কানে-তালা-ধরানো মাইকের অট্টরোলের মধ্যে এই বিরাটগড়ের দুর্গোৎসব তোমার ধারণায় আসবে না বউদি। গ্রামসুদ্ধ মিলে ধরাধরি করছে, কিছুতে এখন আমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে দেবে না। শীতকালে বড়দিনের সময় নিশ্চয় যাব, ওই সঙ্গে কয়েকটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে। ছুটি অনেক জমেছে।

দয়ালহরি গল্প করেছিলেন সেকালের বিরাটগড়ের—পুজোর সময় গাঁয়ের যে-রকম বাহার খুলত। সেই বর্ণনা হুবহু লিখে দিলাম চিঠিতে। সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পুজোর সময় এবারে ঢাকের বাড়িটাও পড়ে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি এখন নড়তে পারব না। দাদা-বৌদিকে ধাপ্পা দিচ্ছি—সে না-হয় হল—ভাবতে অবাব লাগে, টুনুমণিকে অবধি ভুলতে বসেছি।

ডাক্তারবাবুর কাছে সাফাই গাই ঃ শরীরের এমন দশা, এক পা নড়তে মাথা ঘোরে। নৌকো-ট্রেনের অত ধকল সয়ে কলকাতা অবধি আমার পেঁছানো ঘটবে না, পথে কোন-খানে পড়ে মরব।

পুজোর মুখে নতুন সাব-রেজিস্ট্রার চলে গেলেন। একরকম পালিয়ে যাওয়া। বিরাটগড় ছেড়ে বাঁচলেন যেন ভদ্রলোক। ছুটির পরে আমায় অফিস করতে হচ্ছে। বেশি খাটি নে, বেলাবেলি বাসায় ফিরে আসি। ডাক্তারবাবুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করি, ঠাণ্ডা লেগে আবার যদি অসুখে পড়ি নির্ঘাত মারা যাব এবারে।

সন্ধ্যা হতে না-হতে দুয়োর ভেজিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসি। কিছু গানের চর্চা ছিল, সে তো জানেন। গলার সুরের জন্য তারিফ পেয়েছি এক বয়সে। সময় কাটানোর জন্য একটু-আধটু গানও শুরু করেছি। এক অভাবিত সুবিধা হয়ে গেল। দয়ালহরি শুনেছেন বুঝি একদিন—বললেন, খালি গলায় কেন হুজুর? লাবণ্যর হারমোনিয়াম আছে, ও গাইতে চায় না। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, বলেন তো সেইটে আনিয়ে দিই।

নিজেই ঠিক বয়ে আনতেন। কিন্তু আমি চটে যাই বলে হরিশকে নিয়ে গেলেন। হারমোনিয়াম এসে পড়ল। বাজারের ফঙ্গবেনে বস্তু নয়। আমি দেখে অবাক। কলকাতায় মল্লিকদের বাড়ি এই রকম জিনিস দেখেছিলাম। তাঁরা বোনেদি গৃহস্থ, সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক তিন-চার পুরুষ ধরে। ওঁদেরই কে বিলেত থেকে আনিয়েছিলেন। ঠিক এই বস্তু কি না, বলবার মত জ্ঞান নেই। কিন্তু চেহারাটা এমনি।

এ জিনিস কোথায় পেলেন হোড় মশাই?

ভাল জিনিস? কী জানি, আমি বুঝি নে। লাবণ্যর দিদিমার কাণ্ড। তাঁর শখ ছিল অনেক। নাতনিকে গান-বাজনা শিখিয়ে হাল ফ্যাশানের বানাবেন। শহুরে ছেলে দেখে বিয়ে দেবেন। মরে গেলেন তিনি। মরবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশান মাথায় উঠে গেল। তাই ভাবলাম অব্যবহারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে—মেয়ের হল না তো গুণীজনের কিছু কাজে আসুক।

নাড়াচাড়া করে দেখে বলি, এর তো অনেক দাম।

দয়ালহরি একটু থতমত খেলেন মনে হল। অবহেলার ভাবে বললেন, দাম না হাতী! দাম হলে কি জোটানো যেত! আমায় যারা জামাই করেছিল, বুঝতেই পারেন, তারা রাজা রাজবল্লভ নয়। শাশুড়ি পেয়েছিলেন কোথায় সস্তায়। ওঁদের চাঁপাতলার বাসার কাছেই হল চোরাবাজার। সস্তায় অনেক জিনিস পাওয়া যায়।

দাম-টামের কথা জানি নে, আমায় কেউ কিছু বলে নি।

বাজিয়ে দেখছি। কী করে রেখেছে জিনিসটা। বেলোর চামড়া আরশুলায় কাটা। কেশো রুগির মন ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরোয়। রীডগুলো যেন বুড়ো মানুষের নড়া দাঁত—সাবধানে টিপতে হবে, নয়তো খুলে পড়ে যেতে পারে। তা হোক, তবু লাবণ্যর জিনিস। অনেক দাম আমার কাছে।

আপনার মেয়ে গান-টান শিখেছে কিছু?

উঁহু, একেবারে নয়। শাশুড়ি ঠাকরুন বেঁচে থাকলে কী হত বলা যায় না। ভাগ্যিস শেখে নি। একটু-আধটু লেখাপড়া জানে বলে। ষষ্ঠীপুকুরের ওরা কাঁইকুঁই করছিল: কলম পিশতে হবে না মশায়, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানতে জানে কিনা তাই বলুন। গানের কথা টের পেলে রক্ষে ছিল? বলত, বাইজি বউ ঘরে নেব—একশ-এক টাকা বাড়তি ধরে দিতে হবে গানের খুঁত ঢাকবার জন্য। জানেন না হুজুর, আমাদের নচ্ছার পাড়াগাঁয়ের গতিক।

আওয়াজ যেমনই হোক, লাবণ্যর হারমোনিয়াম। চাঁপার কলির মত আঙুল ঘুরে বেড়িয়েছে রীডের উপর দিয়ে, বাঁ হাতে আলসে লাবণ্য বেলো টেনেছে। বিরাটগড়ের ভারি সব সমঝদার মানুষ কিনা! এই বাজনার সঙ্গে আমার গান খাসা মিলবে। আমার গলার সুর আর লাবণ্যর বাজানো হারমোনিয়াম।

ডাক্তারের সব কথা কে কবে মেনে চলতে পারে? সন্ধ্যার পর বাসা থেকে না বেরুলেই হল। দুয়োর-জানলা এখন খুলে দিই—গলাও খুব দরাজ হয়েছে, গাঁ-গাঁ করে গীত অভ্যাস করি। গানে নাকি বনের পশু বশ মানে। হয়তো তাই। কিন্তু যেসব মানুষ শহরে থেকে এসেছে, তারা কদাপি নয়। বন্য পশুর বেশি বেয়াড়া শহরে-থাকা মানুষ।

মরীয়া হয়ে একদিন চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত সোজা কয়েকটা কথা: গান গেয়ে গেয়ে গলার নলি ছিঁড়ে গেল, একটিবার এক লহমার জন্যে তবু দেখা মেলে না। অসুখের সময় রোজ আসা হত। তবে তো অসুখই ভাল। রোজ আমি দরজা-জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগাই, ভাগ্যবশে আবার যদি অসুখ করে। আবার তবে আসবে একজন।

চিঠি তো লেখা হল—পাঠানো যায় এখন কেমন করে? কার হাত দিয়ে? হরিশকে দিয়ে হবে না। হাকিমের কান্ড দেখে মনে মনে সে কী ভাববে? এহেন রসাল ব্যাপারের ভাগ নতুন বিয়ের বউকে না দিয়ে পারবে না। বউকে বলে মানা করে দেবে: খবরদার রা কাড়বে না মুখে। তার অর্থ, গ্রামময় জানাজানি। পড়তে লিখতে শিখে বেটা বিপদ ঘটিয়েছে।

হোড় মশায়ের জিওলগাছে আবার পাতা ঝরতে শুরু হয়েছে। দূর থেকে হাড়গিলে দেবীর কখনো সখনো দর্শন মেলে। বারান্দায় বসে সকালে রোদ পোহাচ্ছি। হরিশ ওদিকে রান্নার কাজে ব্যাস্ত। রাস্তা দিয়ে এক রাখাল ছোঁড়া ছাগলের পাল নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ডাকলাম, এই, শুনে যা একটা কথা—

সিকি হাতে দিয়ে বললাম, পানের বরোজে টাটকা তোলা পান পাওয়া যায় এখন সকালবেলা। দু-আনার পান কিনে দিয়ে যা তো তাড়াতাড়ি। বাকি দু-আনা তুই নিয়ে নিবি।

মোটা মুনাফা পেয়ে ছোঁড়ার মুখে হাসি ধরে না। সিকি মুঠোয় পুরো চলে যাচ্ছে—

আর দেখ, উই যে দেখতে পাচ্ছিস—

অধীর হয়ে সে বলে, পানের বরোজ আমি জানি।

গাঁয়ের মানুষ তোরা আবার কোন্‌টা না জানিস? বাইরে থেকে এসে আমরাই বরঞ্চ কিছু জানলাম না। হোড় মশায়ের বেগুনক্ষেতে একজন ওই বেগুন তুলে তুলে বেড়াচ্ছে—দেখতে পাচ্ছিস তো—ওকে এই কাগজটা দিবি। কী বলে, শুনে আসবি তার কাছ থেকে।

ছোঁড়া চলল। ছাগলগুলো পথের এদিকে সেদিকে ঘাস খুঁটে খাচ্ছে। আমি এক নজরে তাকিয়ে ওদিকে। অজানা মেয়ের নামে প্রথম এই চিঠি—সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—আর কখনও এমন কর্ম করি নি। চিঠি পাঠানোর পর বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে, না জানি কী ঘটে! ওই তরফের আগ্রহ দেখে তবে তো আমি লিখেছি চিঠি। ক্ষণ পরে দেখলাম, রাখাল ছোঁড়া দৌড়চ্ছে। আলের পথে নয়, আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এল। দম নিতে পারে না।

খবর কী রে?

পান দিল না। বরোজ থেকে বিক্রি হয় না। হাটে গিয়ে কিনতে হবে।

আর সেই কাগজ?

গোখরো-সাপের মতন ফোঁস করে উঠল বাবু। কাঁটাসুদ্ধ বেগুন ছুঁড়ে মারল আমার দিকে।

মেয়েলোকের ভয়ে মরীয়া হয়ে ছুটেছিস? কী রকম বেটা ছেলে রে তুই?

এমন কথার উপর কোন্‌ বেটাছেলের না লজ্জা হয়। হলই বা বয়সে ছোট। বলে, মেয়েলোকের ভয় কেন হবে বাবু। বুড়োও দেখি 'কী—কী হয়েছে' করে ক্ষেতের দিকে আসছে। তখন আমি সরে পড়লাম।

উদ্বেগ, আবার দয়ালহরিকে বলে-টলে দেয় নাকি? পুরো সিকিটাই বখশিশ হিসাবে দিয়ে বিদায় করলুম—গোখরো-সাপের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে বলে। সারাদিন মনে নানারকম তোলাপাড়া করছি। অফিস থেকে ফিরে দেখি, ঘরের মেঝেয় একখানা আঁটা খাম। জানালা দিয়ে কেউ ফেলে গেছে। রাখাল ছোঁড়ার উপর বেগুন ছুঁড়তে গিয়েছিল, আমার উপরে চিঠি ছুঁড়েছে।

অতি সংক্ষিপ্ত দু-ছত্রের চিঠি। লিখেছে, কোনও দিন কোন-খানে যাই নি আমি। মিথ্যে কথা লিখে চিঠি পাঠানোর হেতু কী?

আস নি তুমি—মিথ্যে কথা? তাই তবে মেনে নিলাম। আমারেই চোখের ভুল, দিনের পর দিন চোখ ভুল দেখেছে। হাত-খানেক দূর থেকেও চোখের ভুল। কাগজের উপর তাই আবার লিখে জানিয়েছে। বেশ!

দু-দিন পরে আবার তেমনি এক চিঠি পড়ল। আগের চিঠি অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়। একশ-পাঁচ জ্বর শুনে গিয়েছিলাম একদিন। একটা দিন মাত্র, মিনিট খানেকের জন্য। বাইরে থেকে এক নজর উঁকি দিয়ে আসি। রোজ যেতাম, এমন কথা কী জন্য তবে লেখা হয়? ছোট্ট একটা ব্যাপার নিয়ে চিঠি চালা-চালিরই বা কী দরকার?

আবার কদিন পরে পুনশ্চ চিঠি: না হয় গিয়েছি চার-পাঁচ দিন। বিদেশি মানুষ একলা রোগে ছটফট করছেন, কানে শুনে কেউ চুপচাপ থাকতে পারে না। বাইরে থেকে দেখে এসেছি, ঘরের ভিতরে যাই নি তো। বাবার কানে না ওঠে, দোহাই আপনার। গল্প করতে করতে বলে বসবেন না। আপনার চিঠি যখন এনে দিল, বাবা এমনিই খানিকটা দেখে ফেলেছেন। আজে বাজে কথা বলে আমি চাপা দিয়ে

দিলাম।

চিঠি পড়ছি—চোখ তুলে দেখি লেখিকাই অদূরে ঘনপক্ষ্ম ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হাসছে মুচকি মুচকি।

জিজ্ঞাসা করলাম এত খেলানো হচ্ছে কেন?

মজা—

চিঠিতে যা লিখেছি, মুখেও এসে পড়ে আবার তাই: বাসায় যতক্ষণ থাকি, একা একা বড্ড কষ্ট হয়। অসুখই ভাল ছিল আমার।

হেসে হেসে এক আশ্চর্য চাউনি চেয়ে সে বলে, অসুখ তো এখনই। বারোমাসে যাপ্য ব্যাধি। জ্বরের ওই ক'টা দিনই ভাল হয়ে গিয়েছেন কপালক্রমে।

খিলখিল করে হেসে উঠল। আজব কথা বলে, হেঁয়ালির ভাষা। বলে, রংমহলে রূপের মেলা। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়েছিলেন তার একটুখানি। কয়েকটা দিনে সামান্য একটু দেখেছেন। আর ডাক্তারে বলে কিনা ভুল দেখেছে, প্রলাপ বকছে।

আপনাদের কাছে আবোল-তাবোল, কিন্তু আমার মনের সঙ্গে লাবণ্যর কথা অদ্ভুত রকম মিলে যায়। জানল কী করে? এ মেয়েরও অসুখ করেছিল—আমার মতন অমনি সব দেখেছে? অসুখ-বিসুখে চেতনা সব স্তিমিত হয়ে যায়—আরে দূর, কী বলে বসলাম! একেবারে উল্টো। নবচেতনা জাগে সেই সময়, প্রখর দৃষ্টি খুলে যায়। রংমহল বলছে লাবণ্য—ভারি উজ্জ্বল সেই মহলের রং, বড় স্নিগ্ধ। বাসিন্দাদের হালকা চলাফেরা এতটুকু আওয়াজ হয় না। মজার সংসার ওদের। হাসি আর আনন্দ। সেই কয়েকটা দিনে আমি আঁচ পেয়ে গেছি। তারপরেই পর্দা পড়ে গেল।

শুধু একটা চোখের দেখায় সুখ হয় না লাবণ্য। রংমহলে ঢুকতে পারি কী করে সেইটে বল।

সাহস থাকলেই পারা যায়। আধ মিনিটও লাগে না। ভীরুরা পেরে উঠে না।

হেঁয়ালির মতন জবাব দিয়ে রহস্যভরা চোখে চেয়ে তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে। কী বলল, কিছুই মাথায় ঢোকে না। দেখি, পথের উপরে হরিশ। আর-কিছু জিজ্ঞাসা করব; সে সময় নেই। আমি আগে চলে আসি, তারপর সেরেস্তাদারবাবু কাগজপত্র গুছিয়ে বেরোন। হরিশ অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ করে হাটখোলাটা ঘুরে সংসারের এটা সেটা সওদা করে নিয়ে আসে। আজকে বোধহয় হাটখোলায় দরকার ছিল না।

বলে দিলাম, আবার আসবেন কিন্তু। কাল। ভুলে যাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে লাবণ্য ঘাড় নাড়ল। তারপরে আমতলা দিয়ে পাঁচিলের বাইরে কোনদিকে চলে গেল, আর দেখলাম না। বাড়ি ফিরল না এখন, তবে তো ফাঁকা মাঠের উপর আলপথে বাবলাবনের পাশে পাশে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেতাম।

পরের দিন বেশি সকাল করে ফিরলাম। লাবণ্যও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে!

কথা রেখেছেন তবে! এসেছি এই কত তাড়াতাড়ি দেখুন। কাজকর্ম সব চুলোয় গেল। হরিশ হতভাগার জন্যে। আজ ওকে বলে এসেছি, সেরেস্তাদারের সঙ্গে পাঁচটা অবধি থাকবে। এক মিনিট আগে অফিস ছাড়বে না। ততক্ষণ আমরা নিরিবিলি। আচ্ছা, আমি সকাল সকাল বেরুই শরীর খারাপের ছুতো করে। আপনি কী বলে বাড়ি থেকে বেরোন? আগে তো বিকালে জলের কলসি কাঁখে আসতেন, এখন কোন্ অজুহাত?

লাবণ্য অন্য কথা বলে, আপনি-আপনি করেন কেন আমায়? চেহারা দেখে কি মনে হয়, খুব ভারিক্কি হয়ে গেছি আমি? আদ্যি-কালের বদ্যি-বুড়ি?

সে কী কথা, বুড়ো হতে যাবেন কেন?—হেসে উঠে আবার বলি, বুড়ো আপনি কোনদিন হবেন না।

লাবণ্যও হেসে হেসে বলছে, কণ্ঠস্বরে তবু কেমন উদ্বেগের আভাস: বলুন, বলুন না। আমায় দেখে বয়স বেশি মনে হয়? মুখের উপর জাল জাল দাগ? দেখুন—নজর করে দেখে তবে বলবেন।

বুঝতে পারছি, থুবড়ো মেয়ে বা অমনি কিছু বলে থাকবে বাড়ির কেউ। মেয়ের মনে সেই অভিমান ঘুরছে। আমায় বলছে 'তুমি' বলে ডাকতে। লাবণ্য এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে—স্বর্গ আজ আমার হাতের মুঠোয়।

বেশ 'তুমি' বললেই যদি ওইসব বাজে কথা বন্ধ হয়, তবে তাই। তুমি, তুমি, তুমি। লাবণ্য—তোমার মতন দুনিয়ার কেউ নেই। রোজই আসবে তুমি। একবার নয়, একশ'বার এস, হাজারবার এস।

ভারি মজা চলল এরপর দিনকতক। নিরিবিলি থাকলেই সে চলে আসে। বাড়িতে অর্ধেক-পঙ্গু মা, দয়ালহরি তে বেশি সময় বাইরে বাইরে, আর আছে ছোট ভাইবোন কয়েকটি। কতগুলো সঠিক জানি নে। কলকাতার মেয়ের পক্ষে ওদের ধোঁকা দিয়ে চলে আসা কিছু নয়। কিন্তু কেমন করে টের পায়, ঠিক এই সময়টা একলা চুপচাপ আছি আমি?

শরীর খারাপের অজুহাত আর বেশিদিন চালানো যাচ্ছেন। কাজকর্ম জমে পাহাড়-প্রমাণ হচ্ছে। এ জায়গার মানুষগুলো সর্বংসহা, তাই রক্ষা। কিন্তু সহিষ্ণুতার শেষ আছে। কোন এক দিন সদরে চিঠি চলে যেতে পারে। অথবা কলকাতার কোনও খবরের কাগজে।

সন্ধ্যাটাই ভাল। হরিশকে সকাল-সকাল সরিয়ে দিই: অসুখ একেবারে সেরে গিয়েছে হরিশ, আর তোকে অত খাটতে হবে না। দুখানা রুটি সেঁকে রেখে বাড়ি চলে যাস। দুধ আছে, দুধ-চিনি আর রুটি দিয়ে খাসা পথ্য হবে আমার। সোমত্ত বউ অত রাত্রি একলা ঘরে থাকবে, সেটা ভাল নয়। ঘোর না হতেই বাড়ি চলে যাবি। আমার কী, পড়াশুনো আছে, গানবাজনা আছে—একলা আমি থাকব ভাল।

কিন্তু হরিশের পাকামি আছে। আদর্শ প্রভুভক্তি—শুধু দুট- রুটি তার মনঃপুত নয়। দু-একখানা তরকারি রান্না করে সামনে বসে খাওয়ানোর জন্য গড়িমসি করে। শেষটা একদিন আচ্ছা করে কড়কে দিই: এমন নাছোড়বান্দা কেন রে? বলেছি, তরকারি লাগবে না রুটির সঙ্গে—এক রাশ খাইয়ে বদহজম ঘটিয়ে আবার বুঝি রোগ ডেকে আনবি?

বকুনির ভয়ে হরিশ সেই থেকে বেলাবেলি সরে পড়ে। আমার সঙ্গীত সাধনা শুরু হয়ে যায়। একদিন এমন হল, হরিশকে সরিয়ে দিয়ে হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল ছুঁইয়ে সবে একবার সা-রে-গা-মা তুলেছি—

রীডের উপরের আঙুল তুলে কলকণ্ঠে বলে উঠি, দেখেছি গো দেখতে পেয়েছি। আবার কোন্ লুকোচুরি খেলা? আমার চোখে লুকিয়ে থাকবে, এই ক্ষমতা নেই তোমার লাবণ্য। এস—খাটের উপর ভাল হয়ে বসে গান শুনতে হবে।

দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল—আরে সর্বনাশ, আলাদা একজন। লাবণ্য তো নয়, ঝিকমিকে লাবণ্য ফুড়ুত করে কোন দিকে পালিয়েছে। কুৎসিত চেহারা, একটা চোখের সাদা ঢেলা বেরিয়ে এসেছে। ভূতের বাড়ি বলে গোলবাড়ির বদনাম—কোন্ অন্ধিসন্ধি

থেকে প্রেতিনী বেরিয়ে এল এতদিনে। চেঁচামেচি করে আমার তো একখানা কান্ড ঘটাবার কথা—এ জায়গার হাকিম বলেই কোনক্রমে সামলে নিলাম।

কে আপনি ?

হকচকিয়ে যায় সে। মুখে জবাব আসে না।

আপনি কে ? কী নাম আপনার ?

লাবণ্য—

কন্ঠস্বর কাঁপছে। জোচ্চুরি বলেই এমনি। মতলব করে লুকিয়ে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। ওই যে বললাম 'দেখতে পেয়েছি'—অমনি ভেবেছে, ওকেই দেখেছি আমি। বোকা বনে ঘরে ঢুকে ধরা পড়ে গেল।

ধমক দিয়ে বলি, লাবণ্য ! লাবণ্যকে চিনি নে যেন আমি ! ধাপ্পা দেওয়ার জায়গা পেলেন না ? এক চোখ পিটপিট করে উনি লাবণ্য হতে এসেছেন !

সেই একটা চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। কানা মেয়েটার চোখ নিয়ে খোঁটা দিলাম, এক বিন্দু লজ্জা হল না আমার। একটুকু মায়া নেই ! পাংশুমুখে সে বলে, আর চেঁচাবেন না। রক্ষে করুন। গান হচ্ছিল, তাই একটু দাঁড়িয়েছিলাম। অন্যায় হয়েছে। চলে যাচ্ছি আমি।—যাচ্ছি।

সন্ধ্যাটা মনোরম হয়ে উঠেছিল। মাটি করে দিল। কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছি: চরবৃত্তি করতে এসেছিলেন। পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, কে আপনি। জানতে চাই সমস্ত কথা। কে পাঠিয়েছে আপনাকে ?

ফরফর করে চলে গেল জবাব না দিয়ে। ঝুপসি-ঝুপসি গাছ-পালার আড়ালে অদৃশ্য হল। রাত্রিবেলা যুবতী মেয়ের পিছনে ছুটব, এটা হতে পারে না। বিশেষ করে হাকিম যখন আমি। যা ভাবছি, যদিঃ সত্যি চর হয়েই এসে থাকে, আরও আমার অখ্যাতি রটবে। কাজ নেই গন্ডগোলে।

আমার লাবণ্য এল আর-একটু পরে। গুম হয়ে ভাবছি তখন। নিঃশব্দ পায়ে এসেছে। ডাকে নি, কিছু না। হাসছে মৃদু মৃদু। ঘাড় তুলে হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলাম।

এক কান্ড হয়েছে, জান লাবণ্য ? কে-এক মেয়ে এসেছিল স্পাই হয়ে। আমাদের কথা গাঁয়ে বোধ হয় কানাঘুষো হচ্ছে। চুপি-চুপি এসে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ধরে ফেললাম।

লাবণ্য চোখ বড় বড় করে বলে, তাই নাকি ?

আবার নাম বলে কিনা লাবণ্য।

লাবাণ্য বলে, হতেও পারে।

কী হতে পারে ? কানা-চোখ ঝাঁঝরা মুখ হতকুচ্ছিৎ সে হবে লাবণ্য !

আশ্চর্য হয়ে তার মুখে তাকাই। দু-চোখে চাপা হাসি তার। একবর্ণ আমার কথা বিশ্বাস করে নি। তা হলে বিচলিত হত। বললাম, সত্যি বলছি। মনে হয়, এই গাঁয়ের কেউ। এসেছিল আমরা কী কথাবার্তা বলি শুনে যাবার জন্য।

লাবণ্য ফিক করে হেসে বলে, তা কেন ? তোমায় দেখে ঢুকে পড়ল কথাবার্তা বলবার জন্য। তোমায় তার ভাল লেগেছে। নিশ্চয় বলছি তাই।

কাছ ঘেঁসে এসে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, হ্যাঁ গো, কী সব কথাবার্তা হল ? মিষ্টি মিষ্টি ভালবাসার কথা ?

কী বলছ তুমি লাবণ্য, ছিঃ ! ভালবাসা যেন হাটের মাল ! যেখানে-সেখানেই

বললেই হল।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার কথা উপভোগ করছে। কী রকম ক্ষুধিতের মতন তাকিয়ে আছে, আরও বুঝি বেশি করে শুনতে চায়। বললাম, ভালবাসার কথা তোমারই জন্যে শুধু। দুনিয়ার অন্য কোন মেয়ের শোনবার নয়।

অনিন্দ্য মুখখানি আমার দিকে তুলে ধরে সে বলল, কেন, আমি কী?

একফালি জ্যোৎস্না এসে দাঁড়িয়েছ তুমি আমার লাবণ্য। আর কালো-কটকটে সেই মেয়ে—যেন কাদার ঢিবি।

এমন খোশামুদি কথার উপরেও লাবণ্য ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল। হাসি কিন্তু মুখে—হাসি ভিন্ন মুখে বুঝি অন্য ছায়া পড়ে না।

এ কী, হিংসে হল তোমার? ভারি মজা তো!

লাবণ্য বলে, বড্ড হিংসে আমার। আর ভয়। ওই যাই বললে তুমি—কাদা হলে ছানতে পার, গড়তে পার, গায়ে লেপটে নিতে পার। জ্যোৎস্নার তো কেবল ভেসে ভেসে বেড়ানো—ধরা ছোঁয়া যায় না, আপন করে আটকানো যায় না, শুধুই কেবল পদ্য লেখা। দেখ, তুমি ভুল দেখ নি—সত্যি আমি এসেছিলাম, ওই মেয়েটা ঢুকছে দেখে সরে দাঁড়ালাম। কী তুমি বলবে, আড়ি পেতে শুনছিলাম ভয়ে ভয়ে। নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম।

আর মোটে দাঁড়ায় না। হাসুক আর যা-ই করুক, ভয় পেয়ে গেছে মনে মনে। ভয়েরই কথা। অত আসা যাওয়া দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায়—লোকের নজরে পড়েছে, হাতেনাতে ধরবার জন্য মেয়েটা এসেছিল। পাড়ারই মেয়ে খুব সম্ভব, লাবণ্যের জানা-শোনারে মধ্যে। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি—খবর চাউর করে দেবে আক্রোশ-বশে। কলঙ্ক মুখে মুখে আগুনের মত ছড়াবে। কী গঞ্জনা পাড়াগাঁয়ের সমাজে। আমারই ভুল কবিতা লিখে আর আজেবাজে গল্প করে এতদিন চলতে দেওয়া। আর নয়।

পরদিন দয়ালহরিকে বাসায় ডেকে—যা থাকে কপালে—কথাটা পেড়ে ফেললাম: আপনার মেয়ের বিয়ের কথা বলছিলাম। আমি অযোগ্য হয়তো। যদি অনুগ্রহ করে ...মানে দাদাই অভিভাবক আমার, কলকাতার ঠিকানা আপনার জানা আছে। আমার মত আছে জানলে তাঁদের দিক দিয়ে খুব সম্ভব আপত্তি হবে না। কিছুদিন থেকে ভাবছি কথাটা, যদি আপনি প্রস্তাবে রাজি থাকেন—

দয়ালহরি বিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। কিছু যেন বুঝতে পারছেন না। তারপর হাউহাউ করে এক গাদা কথা বলে চলেছেন। কান্না না আনন্দ বুঝতে পারি নে।

আপনি—তুমি বাবা, পায়ে ঠাঁই দেবে লাবণ্যকে? আঁতুড়ঘর থেকেই ঠেলাগুঁতো খেয়ে মানুষ, জনমদুখিনীর এতবড় ভাগ্য! একা ওর ভাগ্য নয়, আমাদের বংশ ধরে সকলের।

কেল্লা ফতে, আবার কী! লাবণ্য দেবী, এইবারে তুমি একেবারে আমার। এই গোলঘরের ভিতরেই বাসর আমাদের। গান শোনাব পাশে বসিয়ে ভোর-রাত্রি অবধি। কাদা আর জ্যোৎস্নার একটা তুলনা হল না—তা কাদারই মতন যদি হাতে ছানি আর গায়ের উপর লেপটে রাখি, কে কী বলতে পারবে তখন?

সন্ধ্যার মুখে অফিস থেকে আমাদের কথাবার্তা। হরিশ চা করে দিল, চা ইত্যাদি

খেয়ে মাঠের আল ধরে দয়ালহরি দ্রুতপায়ে বাড়ি চললেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আমি। অনতিপরেই আবার দেখতে পাই, বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। চঞ্চল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, চুপচাপ বসে হুঁকো টানবার অবস্থা নেই। বাড়ির মধ্যে খবরটা দিয়ে গ্রাম টহল দিতে বেরুলেন। ও'র স্বভাব টের পেয়েছি এতদিনে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিরাটগড়ের আপামর-সাধারণ সমস্ত ব্যাপার জেনে যাবে। কত সোমত্ত মেয়ের মা-বাপের হিংসায় ঘুম হবে না। যে মেয়েটা ওত পেতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তারও। আমিও চাচ্ছি ঠিক তাই। লাবণ্য ও আমাকে নিয়ে কথাবার্তা যদি কিছু উঠে থাকে, এবার সকলে খোলাখুলি জানুক, লাবণ্য আসে আমারই কাছে এবং এর পরে কায়েমি হয়ে থেকে যাবে। শুধু পাঁজিতে ভাল একটা শুভদিনের অপেক্ষা।

না, ঠিক উল্টো। এলেন দয়ালহরি আমারই কাছে। এই চলে গেলেন, একটু পরে আবার ফিরে এসেছেন। বললেন, খবরদার, খবরদার। কথাটা পাঁচ কান না হয়ে যায় বাবাজি। সেইটে সমঝে দিতে এলাম। আশীর্বাদ হয়ে যাক, তারপরে। পরম ছ্যাঁচড়া জায়গা—কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। ভাংচি দেবে ঘোঁট পাকাবে। আশীর্বাদ হয়ে গেলে তার পরে এই কলা। পৌষ মাস পড়বার আগেই আশীর্বাদ সারতে হবে। পাঁজি দেখলাম, আঠারোই মোটামুটি দিন আছে। ওই দিন।

দাদাকে তো জানিয়ে দিতে হবে।

আমি লিখব না, তুমি লেখ। আগ বাড়িয়ে আমার লেখাটা ভাল হবে না। ভাববেন, আমিই তোমায় ভজিয়েছি। ওই আঠারোই'র আগে আসতে লেখ। বরের আশীর্বাদ, কনের আশীর্বাদ একদিনে। দোসরা মাঘ বিয়ে। বলছিলাম তাই বড়-বউকে। পোড়াকপালি শতেকখোয়ারি বলে মেয়েকে গালি দাও, কপালখানা কী করে এসেছে দেখ এইবার। আকাশের চাঁদ নেমে এসে গরিবের উঠোনে বর হয়ে দাঁড়াবে।

দয়ালহরি চলে গেলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। বাপের মতন দাদা, বড্ড রাশভারি। সেজন্য সোজাসুজি তাঁকে না জানিয়ে বউদিকে লিখলাম। উল্লাসে আজকে আর থই পাচ্ছি নে, সে মনোভাব চিঠির লেখাতেও ঝকমক করছে: বউদি ভাই, তোমার চাঁপাতলার পাখনা-কাটা পরী বিরাটগড়ে এসে লুকিয়ে আছে। চাঁপা-তলার ঠিকানাটা দাও নি, তা হলে মিলিয়ে নিতাম। তবু নিশ্চয় সেই, সন্দেহ করা চলে না। এমন রূপ আর এমনি স্বভাবের মেয়ে খুঁজে বের করতে পারে, সে চোখ আমার বউদিরই শুধু আছে। মেয়ের ঘরবাড়ি এখানে—কলকাতায় মামার বাড়ি থাকত, তুমি সেই সময় দেখে এসেছ। তোমার ইচ্ছা শিরোধার্য করলাম বউদি, মেয়ের বাপের কাছে এক রকম রাজি হয়ে এসেছি। অঘ্রানে মলমাস, বিয়ে মাঘের আগে নয়। তবু এঁরা আশীর্বাদটা সেরে রাখতে চান মেয়ের বাপ নয়তো ভরসা রাখতে পারেন না। আবার মুশকিল, ষষ্ঠীপুকুর বলে এক লক্ষ্মীছাড়া জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসে মজুত আছে, সাতশ'টি টাকায় আটকে রয়েছে। কন্যাপক্ষ অতদূর উঠবেন না, বরপক্ষও নামবেন না। হঠাৎ যদি কোন পক্ষের সুমতি হয়ে যায়, তোমার বউদি, তখন তো কপাল চাপড়ানো। সেই হেতু সত্বর হওয়ার দরকার। মেয়ের বাপ আঠারোই পাকা দেখতে চান। বিয়ে দোসরা মাঘ। তার আগে দাদার এসে মেয়ে দেখে কথাবার্তা বলার দরকার। আমার চোখে ভুল হতে পারে—দাদা না এলে কিছুই পাকা হচ্ছে না।

বউদির জবাব এল: তোমার দেখায় ভুল হবে কেন ভাই? তুমি রাজি তো আমরা সকলে রাজি। টুনুকে বললাম, সে তো রাজি হয়ে মাথা কোমর অবধি কাত করে আনল। নতুন কাকিমার জন্য লাফাচ্ছে। তোমার দাদার এখন যাওয়া মুশকিল, ও'র

মনিবের ইনকামট্যাক্সের মামলা চলছে। জান তো, মনিব কী রকম নির্ভর করে ওঁর উপর—দুটো একটা দিনের জন্যও ছাড়তে পারবে না। দরকারও নেই, উনি বলছেন। বিয়ের যখন দেরি আছে, তার আগে সুযোগমত গিয়ে কনে আশীর্বাদ করে আসবেন।

আবার লিখেছেন, চাঁপাতলার যে মেয়ের কথা তোমায় লিখেছিলাম, তার বিয়ে হয়ে গেছে। চাঁপাতলা কি একটুখানি জায়গা, মেয়ে কি একটা সেখানে? মেয়েটার চুল দেখলাম কটা মতন—আমারও তাই শেষটা তেমন ইচ্ছা ছিল না...

মন্ত্রগুপ্তি বটে! উভয় শক্তিই ধরেন দয়ালহরি—কথা ছড়াতে যেমন ওস্তাদ, ঠোঁটে কুলুপ এঁটে থাকতেও তেমনি। গ্রামের মধ্যে এত বড় ব্যাপার, এত সমস্ত তোড়জোড়, অথচ কাকপক্ষীতে জানতে পারে নি। আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন সতেরো তারিখে দয়ালহরি মুখ খুললেন। যত্রতত্র নয়—সন্ধ্যাবেলা থানায় আমাদের আড্ডা বসেছে, সেইখানে গিয়ে বললেন। কন্যার পিতা হিসাবে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন ওঁদের। আমার নিবেদন, শুভ পাকাদেখা আগামী কাল, আপনারা উপস্থিত-অনুপস্থিত সবাশুদ্ধ আমার বাড়িতে পদধূলি দেবেন, পান তামাক খাবেন। একত্র হয়ে সকলে পাত্র আশীর্বাদ করতে যাব।

সকলে হৈ-হৈ করে ওঠেন : পাত্র কে হোড় মশায়? সমস্ত ঠিকঠাক করে ফেলেছেন, আমরা কই ঘুণাক্ষরে জানি নে!

দয়ালহরি একগাল হেসে আমায় দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধতা, এ-ওর মুখে তাকায়। বড়-দারোগা বললেন, ডুবে ডুবে জল খান মশায়! পাত্র হলেন শেষটা আপনি?

দয়ালহরি বললেন, আমি কিছু জানি নে। হুজুর নিজে উপযাচক হয়ে—আরে দূর, হুজুর বলি কেন, অভ্যাসবশে এসে যায়—বাবাজি নিজে থেকে প্রস্তাব করলেন। ভাল ঘরের ছেলে, ভাল সহবৎ—কত রকম বিনয় করে বললেন। আমি তবু বললাম, বড় ভাই মাথার উপরে, তাঁকে সমস্ত জানানো তো উচিত। তা ভাইয়েরও মত এসে গেছে। তিনি মহাশয় লোক—আসতে পারছেন না, কিন্তু খুশি হয়ে মত দিয়েছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, কনে চোখে দেখেছেন ভায়া?

হেসে ঘাড় নাড়ি : দেখেছি বই কি। কাছাকাছি তো বাড়ি।

দয়ালহরি বলেন, ওর বারান্দা থেকে আমাদের উঠোন দেখা যায়। সর্বদাই দেখছেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ভাল হোক আপনার। সুখী হোন।

তারপরে একটা সমস্যা উঠল, আশীর্বাদ কোন্ জায়গায় হতে পারে? বরের বাড়ি কন্যাপক্ষ আসেন, এই হল রীতি। কিন্তু আর যেখানে হোক, গোলবাড়িতে শুভকাজ কদাপি নয়। ডাক্তারবাবু শিউরে ওঠেন। দয়ালহরি অতশত আগে ভাবেন নি, তাঁরও এখন ঘোরতর আপত্তি। অলক্ষুণে বাড়ি—বিয়ে হতে হতে হল না, কনে মরে পড়ে রইল। একলা কনে নয়, তার মা-বাপ যত আত্মীয়-স্বজন। মরে পচে গন্ধ হয়ে গেল। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রইল ঘরের মেঝেয়। আর ও-বাড়িতে শঙ্খ বাজবে না, উলু দেবে না কেউ কোনদিন।

দয়ালহরি বলেন, ধানদুর্বো মাথায় দিতে হাত কেঁপে যাবে আমার, আশীর্বাদ উচ্চারণ করতে গলা শুকোবে। সে কী কাণ্ড—এখনও সব চোখের উপর ভাসে। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ভাবতে গেলে।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, বয়সে আমি অনেক বড়, জাতেও কায়েত। কলমির ঝাড়ের মতন আমরা কায়েতজাত—টেনে দেখুন, একটা-না-একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়বে। কন্যাদায় উদ্ধার করছেন, মহৎ প্রাণ আপনার, ঠাকুর মঙ্গল করবেন। আপনার দাদা যখন আসতে পারলেন না, আপাতত আমায় তাঁর জায়গা নিতে দিন। আমি বরকর্তা, আমার বাসায় এসে কন্যাপক্ষ আশীর্বাদ করবেন।

এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না। সুতহিবুক যোগ পাঁচটা বত্রিশ থেকে। আশীর্বাদ ওই সময়। ডাক্তারবাবু বললেন, এই তবে পাকা রইল। পাঁচটা নাগাত আপনি চলে যাবেন। চন্দন-টন্দন মেখে, গিলে-করা পাঞ্জাবি ফুল-কোঁচা ধুতি পরে পুরো-পুরি বর সাজতে হবে। খুঁত রাখা চলবে না। মেয়েরা নেই, বেটাছেলেদের করতে হবে সমস্ত। সময় থাকতে আগেভাগে যাবেন। বড়বাবু ছোটবাবু আপনারাও যাবেন কিন্তু বরের সঙ্গে। আমরাই সকলে মিলে রীত-রক্ষা করব।

দয়ালহরি করজোড়ে বলেন, আজ্ঞে না। ওঁরা আমার বড় হিতৈষী, সর্বদা দৃষ্টিমুখ দেন—ওঁরা কনেপক্ষ। আমার বাড়ি থেকে একদল হয়ে গিয়ে আশীর্বাদ করে আসব।

ডাক্তারবাবু কৃত্রিম কোপে বলেন, আর আমি কেবল ক্ষতিই করে বেড়াই, হিত কারও কখনও করি নে?

দয়ালহরি হরি কচলে হেঁ-হেঁ করেন।

তবে আমিই বা কনেপক্ষ না হব কেন? বর সেজেগুজে আমার বাইরের ঘরে বসে থাকবে, আমি হোড় মশায়দের সঙ্গে আশীর্বাদ করতে আসব।

বড়-দারোগা হেসে বললেন, তা যদি বলেন বর নিজেই তো সকলের বড় হিতৈষী। হোড় মশায়ের মুরুব্বি উনি। আশীর্বাদের জন্য ওরই বরঞ্চ দলের আগে আসা উচিত।

হাসাহাসি চলল খানিকটা। ছোট-দরোগা বললেন, তবে খুলেই বলি। আপনার উপর খুব খানিকটা রাগ ছিল স্যার। সেই একদিন খেলা নিয়ে হোড় মশায়ের সঙ্গে বকাবকি হল, আপনি তাই নিয়ে অকারণে ফরফর করে চলে গেলেন। খেলা বন্ধ করে দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিন বছর অন্তে খত-হ্যাণ্ডনোট তামাদি হয়, কিন্তু দারোগো আর কেউটেসাপের রাগ ইহজন্ম তামাদি হয় না। কিন্তু তাই হয়ে গেল আজকে। উদার পুরুষ বটে আপনি। গরিবের কন্যাদায়ে লোকে দশ-বিশ টাকার সাহায্য করে, কিন্তু যেচে গিয়ে এভাবে কেউ দায় উদ্ধার করে না। বয়সে আপনি ছোট,নয়তো পায়ের ধুলো নিতাম এই দশজনের মাঝখানে।

লজ্জায় এর পরে স্থানত্যাগ করা ছাড়া উপায় কী? কিন্তু যাই বা কোথায়? সর্বত্র এই কথা, সবাই ধন্য-ধন্য করে। কেউ মুখে বলে স্পষ্ট করে, কারও চেয়ে দেখার মধ্যে টের পাওয়া যায়। দলিল রেজেস্ট্রীর জন্য যারা দূর-দূরান্তর থেকে আসে, তারাও সম্ভ্রম-দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। বিরাটগড়ে এসে লাভ অফুরন্ত হল। লাবণ্য, তোমায় পেলাম আর এই অঞ্চলভরা এত সুখ্যাতি।

আশীর্বাদ যথারীতি হয়ে গেল। একটা আংটি দিয়েছেন। আকারে ছোট, মাঝের আঙুলে যায় না, কড়ে আঙুলে অনেক কষ্টে ঢোকানো গেল। দয়ালহরি লজ্জা পেয়ে বলেন, গোপন কিছু নেই—ঘরে ছিল, তাই দিয়েছি। বাবাজির আঙুলের মাপে নতুন গড়িয়ে দেব, তার সময় ছিল না। আর বলতে কী, ট্যাকও ফাঁকা। তবে পুরনো হলেও ভাল জিনিস। ডাক্তারবাবু তো জিনিস চেনেন, আংটির পাথরখানা দেখুন না।

আমার হাত টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন। মণিরত্ন চেনেন তিনি সত্যি—এক বয়সে নাকি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, বই-টই অনেক পড়া আছে। ঠাহর করে দেখে বললেন, তাই তো হে, বৈদূর্যমণি। এ জিনিস কোথায় পেলে বল দিকি? খাঁটি কথা বল।

দয়ালহরি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, পুরনো ঘর আমাদের। কর্তাদের আমলে বিস্তর ছিল। গেছে সব। এক-আধ গুঁড়ো এমনি তলানি পড়ে আছে। তা সকলের মুকাবেলা বলছি—গয়নাও দেব আমি দু-পাঁচখানা। নতুন নয়, তবে সাচ্চা মাল। গা সাজিয়ে দেব।

কথা শুনে ডাক্তারবাবু ভ্রূকুটি করলেন। ফিসফিস করে আমায় বলেন, বনেদিয়ানা দেখাচ্ছে। নবাব খাঞ্জে-খাঁর নাতি! আমি যেন কিছু জানি নে! গরীবের দায় উদ্ধার করেছেন, ভাল কথা। তা বলে ধাপ্পায় ভুলবেন না ভায়া। আংটিটা সত্যি ভাল, দামি জিনিস। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, এমন-কিছু সেকেলে নয়। হয়তো বা চোরাই মাল। তাছাড়া পাবে কোথায়? ও-মানুষ সব পারে। বাজে ভাঁওতা আমি সহ্য করতে পারি নে।

মনটা খারাপ হল। দয়ালহরির বিপক্ষে আগেও শুনেছি। কিন্তু আজ থেকে সম্পর্ক আলাদা। লাবণ্যর বাবা—আমার অতি আপন জন। ডাক্তারবাবু এমন করে না বললেও পারতেন আজকের দিনটায়।

কাজকর্ম চুকিয়ে বাসায় ফিরতে সন্ধ্যে। শীতটা বড় কম আজকে। ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে। বড়-দারোগা বলছিলেন, আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে অ্যাটম-বোমের কাণ্ড। অঘ্রানে বসন্ত-কাল পড়ে গেল। বসন্তরোগেরও ধুন্দুমার লাগবে এইবার। ডাক্তারবাবুর মজা।

বারান্দায় উঠে একটুখানি দাঁড়াই। কী আশ্চর্য জ্যোৎস্না! দিনমানের মতন চারিদিক দেখা যায়। দিনমানটাই যেন মোলায়েম হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি হয়েছে। অতদূরে হোড়-বাড়ির চালের মটকা অবধি স্পষ্ট দেখছি।

শোন শোন, ও লাবণ্য আমতলায় কেন? আমের ডালে বোলই ধরে নি এখনও—কিসের লোভে ঘুরছ? কাছে এস—কী হল এতক্ষণ ধরে, খবর শুনবে না? খবরের জন্যে ঘুরঘুর করছ, সে কি আর বুঝি নে? লজ্জা কিসের? এস।

ফটকের গরাদ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, ভিতরে আসে না। কথা যা বলে, তার দুনো হাসি। চোখ-মুখ নাচানো তারও দুনো। বলছে, এক গাঁয়ের এবাড়ি-ওবাড়ি বিয়ে, তার মধ্যে মজা কোথায়? গোলবাড়ি থেকে বর হয়ে তুমি চুপিসারে বেরুবে, সে আমার মোটেই ভালো লাগে না। ঘাটের উপরে অনেক দূর থেকে, ধর, বড় বড় পানসি এসে লাগল—বরের নৌকো, বরযাত্রীদের নৌকো পুরুত আর প্রবীণেরা আলাদা নৌকোয়, আগে-পিছে বাজনাদারের নৌকো। ঘাটে নেমে তোলপাড়। ঢোল কাঁসি সানাই বাজে। সোঁ সাঁ করে হাউই ওঠে আকাশে, আকাশে উঠে তারা কাটে। চরকি-বাজি ঘোরে বোঁ-বোঁ করে—আগুনের সুদর্শনচক্র। গাঁয়ের যত মানুষ ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের কনে আমি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি সকলের নজর এড়িয়ে। ভারি ভাল লাগে। এমনি সমস্ত জাঁকজমকের বিয়ে পছন্দ আমার।

কথা তো নয়, মনের খুশি উপচে পড়া আবোল তাবোল। হেসে উঠলাম: বেশ তো, এস না, ভিতরে চলে এস। যুক্তি করি দুজনে, কী রকম হলে ভাল হয়।

উহুঁ, এমনি আমার কত নিন্দে! এইমাত্র এক কাণ্ড হয়ে গেল, জান? আমি চুল বাঁধছি। মা এসে চুলের মুঠি চেপে ধরল। এই মারে তো এই মারে। হাকিম মানুষ হয়ে কী করে জানল রে তোকে? না জানলে অমন চাঁদের মতন ছেলে আপনি এসে ধরা দেয়? বল্ হতভাগা মেয়ে, সত্যি কথা বল। গোলবাড়ির পুকুরের জল আনতে গিয়ে সেই সময় বুঝি যেতিস লুকিয়েচুরিয়ে? ভাবসাব করেছিস?

শুনলে গো, তুমি হলে নাকি চাঁদ! চাঁদ ধরেছি বলে মা আমার চুলের মুঠি ধরে গালি দিচ্ছে, আবার হাসিতে ফেটে পড়ছে: ধন্যি কলিকালের মেয়ে রে বাবা, তোদের খুরে দণ্ডবৎ। পছন্দের বর নিজে ধরে নিয়ে এলি, অন্য কাউকে কিছু করতে হল না। তা বেশ হল, দিব্যি হল, সোনার পালঙ্কে রাজরাজেশ্বরী হয়ে বোসগে মা আমার। মায়ের চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক এসে জমতে লাগল। লজ্জা, লজ্জা! আমি তখন দে ছুট—

দয়ালহরি সংসারের কি বর্ণনা দিয়ে থাকেন, আর লাবণ্যের মুখে আহা-মরি এ কোন ছবি! দয়ালহরি হেন মানুষ সব পারেন—ওই যা বললেন ডাক্তারবাবু। পাছে কোন দাবি-দাওয়া করে বসি, ইনিয়ে-বিনিয়ে দুর্দশা শোনালেন। খুব সম্ভব তাই। তাই নিশ্চয়। বাড়ির এই হাসকুটে মেয়েটা আর কৌতুকি মা—মায়ের কাছে থেকে ছুটতে ছুটতে মেয়ে পালিয়ে এসেছে। ছুটে এসেছে কিনা—বুক উঠছে নামছে, আর মুখের উপর ভুবনমোহন হাসি।

ক্ষেপে গেলাম যেন। ধরে ফেলব আর এখন ভয়টা কিসের? ওই খাটের উপর বসে ঠাণ্ডা হয়ে বিয়ের যুক্তি পরামর্শ আমাদের দুজনের। হাঁক-ডাক করে তারপরে গান শোনাব। মোমের মতন কোমল নিটোল পা দুটি ঝুলিয়ে দিয়ে বসে থাকবে লাবণ্য। কী আর হবে! লোকে বলবে বেহায়া বর, বেহায়া বউ। আমাদের বয়ে গেল।

কিন্তু কথা শোনার মেয়ে কিনা! পালাচ্ছে, আমিও পিছনে ছুটি। ভয় সংকোচ গিয়ে এক্ষুনি হঠাৎ বীরপুরুষ হয়েছি। থমকে দাঁড়াল সে খানিকটা দূরে গিয়ে। খিলখিল হাসি: ধরুন দিকি, কত ক্ষমতা! সে আর পারতে হয় না। ধরুন, ধরুন—

রূপ আর যৌবন হেসে হেসে ডাকছে। পাগল হয়ে ছুটেছি। ছুটতে ছুটতে কাছে এসে গেছি। ধরি এইবারে। ডান দিক খানিকটা অমনি সরে চলে যায়। থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। হেসে হেসে ভেঙে পড়ছে—স্ফূর্তি আমায় বেকুব বানিয়ে। হাসির দমকে দমকে জ্যোৎস্নার দরিয়ায় যেন ঢেউ দিয়েছে। পাঁকাল মাছের মতন লাবণ্য তার ভিতরে পিছলে পিছলে পালায়।

আচ্ছা, এইবারে। ধর। চু-উ-উ—। ছেলেরা কপাটিখেলার সময় দম ধরে যেমন ছোটে। এই ক'মাস অনেক শিখেছে দেখি শহুরে মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের খেলাধুলো রপ্ত করেছে, খেলাচ্ছে আমায় নিয়ে। নিঃসীম স্তব্ধতা—তার মধ্যে উড়ছে ভ্রমর গুঞ্জনধ্বনি করে। সোনার ভ্রমর।

পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছি, তখন মালুম হল মাঠে নেবে পড়েছি। ধান কাটা হয়ে গেছে, তার গোড়াগুলো উঁচিয়ে রয়েছে শূলের মতো। মাটি যেন পাথর। লাবণ্য কিন্তু অবহেলায় ছুটছে তার উপর দিয়ে। তার পায়ে লাগে না। ছুটছে, কিংবা উড়ছে। শাড়িতে ঢাকা পা যেন লঘু দুটি পাখনা—মাটির গায়ে গায়ে পাখনা দুটি উড়ছে। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। মাঠের মধ্যে উঁচু টিলায় বাবলাবন, পাখির কিচিরমিচির সেখানে। কে হঠাৎ ডেকে ওঠে, মুংলি—! মুংলি গরুর নাম। মুংলি—

ই-ই-ই—! এদিকে সেদিকে গর্ চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা এখনও, গোয়ালে যায় নি। পোষা গাইগর্কে খংজে খংজে বেড়াচ্ছে।

থেমে যাই, মান্ষ আছে তবে তো মাঠে। রাত্রিবেলা সোমত্ত মেয়ের পিছ্ ছুটেছি, হোক না ভাবী বউ, কেউ দেখতে পেলে তাড়া করে আসবে। চিনে ফেলে তখনই ভাববে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে হাকিমের। কী সর্বনাশ! থেমে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে পড়ে কাতর হয়ে বলছি; হার মানছি ও লাবণ্য ধরা দাও এবারে। ধরা দাও।

লাবণ্যও দেখি থেমেছে। হাসছে মিটিমিটি। পাগলই করবে আমায়, ভাল থাকতে দেবে না। আচমকা ছুট দিয়ে ধরি গিয়ে এইবারে। দ্ হাত বাড়িয়েছি, টেনে নেব ব্কের মধ্যে—

হঠাৎ সে আর্তনাদ করে ওঠে: হাতে কী তোমার? দেখি, দেখি। আমার সেই আংটি। আমার আংটি কে তোমায় দিল?

হতব্দ্ধি হয়ে বলি, হোড় মশায় দিয়েছেন আশীর্বাদে।

আমার আঙ্ল থেকে ওই আংটি টেনে খ্লে নিয়েছিল। চামড়ার এক পর্দা উঠে গেল, একটু তব্ মায়া নেই। জানোয়ার, জানোয়ার! টাকা ওদের সব। হাতটা সরিয়ে নেব, আমার যে তখন সে ক্ষমতা নেই!

ম্খ-চোখ তার কী রকম হয়ে উঠল। আমার ভয় করে। মাথাম্ন্ড্ নেই, সব কী বলছে? পাগল নাকি! ঠান্ডা করবার অভিপ্রায়ে বলি, আমি আর তুমি কি আলাদা? অমন করে বলে না লক্ষ্মীটি। আমার কষ্ট হয়। আংটি আমার হাতে ছোট হয়েছে, তোমার ঠিক-ঠিক হবে। এস, পরিয়ে দিই।

ড্করে কেঁদে উঠল এবারে: আমায় পরানো যায় না। সেই যা তুমি বল কবিত্ব করে—আমি শ্ধ্ জ্যোৎস্নাই। শ্ধ্ই চোখে দেখবার। ধরতে পারবে না। জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারবে না। ঘরে আমার ঠাঁই নেই—দিন-রাত ভেসে বেড়ানো, নেশা ধরিয়ে দেওয়া তোমাদের চোখে, আর কান পেতে ভালবাসার কথা শোনা। ব্কে আমি কোনদিন জায়গা পাব না।

কী যেন হয়ে গেল পলকের মধ্যে। হাত বাড়িয়েছিলাম, হাতের নাগালে এল না। ঠান্ডা মাথায় ভাবনার অবস্থা আমার নেই। ধন্কের তীর যেমন সাঁ করে চলে যায়, তেমনি সরে পড়ল কোথায় পলকের মধ্যে।

কোথায়, কোথায়!—কোন্—দিকে গেল? বাবলাবনে শাড়িপরা কে একজন। ওইখানে গিয়ে কাঁদছে। না, কাঁদছে না এখন, একটা গাইগর্র গলায় হাত ব্লাচ্ছে। আমি পিছনে, টের পায় নি। পিছন থেকে হাত জড়িয়ে ধরি: কী হয়েছে বল? কত আর খেলাবে আমায়? আংটি তোমার বাবাই তো দিলেন, নিয়ে নাও তুমি সে আংটি। ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ঝটিতি ম্খ ফেরাল। কোথায় লাবণ্য—সেই জন, চর সন্দেহে যাকে গালিগালাজ করেছিলাম। ভাবছি, চোখ খারাপ হয়ে গেল নাকি আমার? র্পের অলক্ষ্য রশিতে সারা মাঠ হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেড়াল আমায়। ওই কতটুকু দ্র থেকে ছ্টে চলে এল—বাবলাতলায় হাত ধরে ফেলতেই ভিন্ন একজন। আলতো র্প ছোঁয়া পেয়ে যেন ঝুরঝুরিয়ে ঝরে গেল কেয়ার পরাগের মতন। জোনাকি যেন আলোক ঢেকে ফেলে লহমার মধ্যে কিল-বিলে পোকা হয়ে গেল।

হাত ছেড়ে দিলাম, কিংবা ঝাঁকি মেরে সে-ই ছাড়িয়ে দিল। দ্ হাত কোমরে দিয়ে ঘ্রে দাঁড়াল। কী ভয়ঙ্কর! প্রেতিনী ভেবেছিলাম একদিন, তব্ তো এমন সামনা-

সামনি এ চেহারা দেখি নি। একটা চোখে আগুনের হলকা, আর কানা-চোখের উল্টনো ঢেলাটা বুলেটের মতন তাক করে আছে ওপাশে। কথা বেরুচ্ছে না বুঝি—ঠোঁট কাঁপল কয়েকবার। তারপর বলে, আপনার ঐ কথা আমিই তো জিজ্ঞাসা করব। আর কত খেলাবেন বলুন দিকি?

হতভম্ব হয়ে বলি, আমি কী করেছি?

বাসায় ডেকে পাঠিয়ে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়ালেন। বাবার কাছে যেচে বিয়ের কথা পাড়লেন তারপরে। এখন আবার আশীর্বাদের আংটি ফেরত দিচ্ছেন।

কবে আমি বাসায় ডেকেছি আপনাকে?

এমনি নয়, চিঠি লিখে। রাখাল ছোঁড়ার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ভণ্ড মিথ্যেবাদী—এখন আর কিছুই মনে পড়বে না।

কী সর্বনাশ, আপনাকে দিয়েছিল সে চিঠি?

আমার নামের চিঠি—লাবণ্য নাম লেখা। আমায় ছাড়া কাকে দেবে? মিথ্যে বলে পার পাবেন না। রেখে দিয়েছি সে চিঠি, ফেলি নি। একলা অসুখে পড়ে আছেন, খবর শুনে কী রকম মনে হল—বাইরে থেকে ক'দিন উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম। ভিতরেও যাইনি। সেই বড় দোষ হল? কিসের সেঁক বুঝি নে—কুচ্ছিত চেহারা, তার উপরে আমরা গরিব।

কণ্ঠস্বরে সকল তিক্ততা ঢেলে দিয়ে উৎকট হাসি হাসল: যা ভেবেছেন, হবে না। আংটি যখন একবার পরে ফেলেছেন, আর রেহাই নেই। দশের মুকাবেলা পরেছেন, বড় বড় সব সাক্ষি। আমি ঠেকাতে গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন। বাবাকে নয়, মায়ের কাছে কেঁদে গিয়ে পড়লাম: বিয়ে দিও না তোমরা—ওই আরশুলা-হাকিমের সঙ্গে তো কিছুতে নয়। ও-লোকের চেয়ে মুখ্যুসুখ্যু চাষাভুষো অনেক ভাল। মা যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করল। বাবা শুনে রাগের বশে গুমগুম করে পিঠে কিল। ঠাণ্ডা মাথায় পরে আমিও ভাবলাম, গরিবের মেয়ে মানমর্যাদা কিসের? বাবার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। এই সংসারে চিরকাল থাকা চলবে না, বিদেয় হতে হবে। যেতেই হবে যে জায়গায় হোক। মরবার হলে তো কলকাতায় খাসা গঙ্গা ছিল, এখানকার নোনা গাঙে ডুবতে যাব কেন? কলকাতায় মামার বাড়ির ছাত ছিল, লাফ দিয়ে পড়লে নিশ্চিন্ত—গাঁয়ে এসে গরুর দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলো-ঝুলি করার মানে হয় না। মরতে যখন সাহস পাইনি, হোক বিয়ে—দেখাই যাক। আপনি বিদ্বান মানুষ, দেখতে ভাল। খেতে পরতে দেবেন, আর না হয় লাথিঝাঁটা খাওয়াবেন সেই সঙ্গে। সে আমার খুব অভ্যাস আছে। অপমান করে একদিন বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলেন বলেই তো এত বড় লাভ হাতছাড়া করা যায় না।

এক গাদা কথা বলে পিছন ঘুরে গরুর পিঠে থাবড়া দিল। গরু তাড়িয়ে বাড়ির দিকে চলল। পাথর হয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সারারাত্রি ছটফট করেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেল। ওই কানা মেয়ে যদি লাবণ্য, কাকে নিয়ে মেতে ছিলাম এতদিন? কার পিছনে ছুটোছুটি করেছি? ষড়যন্ত্র একটা। সেই আশ্চর্য রূপসী দয়ালহরির চেনাজানা কেউ হয়তো বা দয়ালহরির মেয়ের সখি। চালাকি করে আমায় ফাঁদে ফেলেছে। পাড়াগাঁয়ে এমন ঘটনা নতুন নয়—ফরসা মেয়ে দেখিয়ে সাত পাকের সময়টা কালো মেয়ে কনে-পিঁড়ির উপর বসিয়ে আনে। এদের পদ্ধতি কিছু নতুন, কালটা আধুনিক বলেই। এখনকার পাত্র শুধুমাত্র

চোখের দেখা দেখে পুলকিত হয়ে বরাসনে বসে না। কথাবার্তা বলে ভাবসাব জমাতে চায়। লাবণ্য সেজে সেই কাজ করে দিল। তারপরে আমাকে দায়-উদ্ধারক উদারপ্রান বানিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অঞ্চলময় চাউর করে ভাল ভাল স্যাক্ষি রেখে আশীর্বাদ অবধি চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। হিসাবপত্র করে ছকে ফেলে কাজ হাসিল করা—পিছনে বড় মাথা কাজ করছে। সুন্দরী শয়তানীকে আর একটিবার হাতের কাছে পাওয়া যায় না? ছেড়ে কথা বলব না-তখন।

ঘুম নেই। চোখ বুজে শুই আর উঠে উঠে বসি। বিছানা ছেড়ে চক্কোর দিয়ে বেড়াই কখনও বা নিশি পাওয়ার মতন। সে অবস্থা বুঝবেন না আপনারা—বুঝতে না হয় যেন কখনও। হঠাৎ যেন কান্নার শব্দ আসে কানে। আসে কোন্ দিক দিয়ে? একবার মনে হল আমার বুকের ভেতর কান্না ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমিই ঠিক কেঁদে উঠেছি। এমন কি, চোখে হাত বুলিয়ে দেখি ভিজে-ভিজে কি না। কিংবা কত বছর আগে এক রাত্রে এই বিয়েবাড়িতে যে তুমুল কান্নার রোল উঠেছিল, পোড়োবাড়ির গোপন কোন কক্ষে আটক হয়ে আছে, তার বুঝি একটুখানি কে ছেড়ে দিল। আজ সন্ধ্যায় ধবধবে মেয়েটা পাগলের মত হয়ে গিয়ে হঠাৎ যেমন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল—স্পষ্ট নয়, কান পাতলে সেইরকম যেন শুনতে পাচ্ছি। নিস্তব্ধ রাতে কান পেতে অনেক দূরের ঝিল্লিধ্বনি শোনার মত।

এদিকে ওদিকে দেখছি। ঘরের ভিতরে কিছু নয়, জানালা খুলে দিয়ে বাইরের পানে তাকাই। রাত্রি শেষ। জ্যোৎস্না ডুবে গেছে, আমতলায় নিবিড় অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কুঁজোর জল মাথায় থাবড়ে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুম—ঘুম—ঘুম।

সকালবেলা মাঠ পার হয়ে হোড়-বাড়ি ছুটেছি। এত কাছে থাকি, প্রথম দিন থেকেই দয়ালহরির এমন খাতিরের মানুষ, রাঁধা-ব্যঞ্জন পিঠা-পায়স অবিরত বওয়াবয়ি হয়েছে—কিন্তু আমি আজ প্রথম এই বাড়ি। দয়ালহরি আয়োজন করে একদিন বাড়িতে আহ্বান করবেন—মনের সংকল্পটা মাঝে মাঝে ব্যক্ত করেন—অতএব আহ্বানের অপেক্ষাতেই আসতে পারি নি এত কাল। সেই রাজসুয় কাণ্ডই সত্যি সত্যি হতে চলল, পালকি চড়িয়ে জামাই করে বাড়ি নিয়ে আসছেন। সেইটের যদি কোনপ্রকারে মার্জনা হয়। সর্বনাশের মুখে আঁকুপাকু করে মানুষ, যা মাথায় আসে করে বসে। আমার ঠিক সেই গতিক।

বাইরের এদিকটায় জনমানব নেই। ঘুম থেকে ওঠেনি কেউ, না কী ব্যাপার? সুপারি-পাতার বেড়া দিয়ে ভিতরের অংশ আলাদা করা। সেদিকে মুখ বাড়িয়েছি··· একটানা আওয়াজ কিসের? ক্ষণে ক্ষণে তীব্র তীক্ষ্ণ ভয়ানক হয়ে ওঠে, আবার কমে যায়, কিন্তু একেবারে থামে না। আওয়াজ ঘরের ভিতর থেকে আসছে।

সহসা পুরুষের গর্জন: সারারাত্তির গেল সকালবেলাতেও হাপর চালাবি? বাইরে যা এখন, রান্নাঘরে চলে যা বলছি।

তাই বটে, কামারশালে হাপর চালানোর মতন কতকটা। ভরর-ভরর ভস-ভস, ভস-ভস ভরর-ভরর। বাইরের বাতাস প্রাণপণে কুড়িয়ে দেহে ঢোকাচ্ছে, দেহের ভিতর থেকে বাতাসের শেষ কণিকা অবধি বের করে দিচ্ছে। সমস্ত জীবনসত্তার একটিমাত্র কাজ শুধু এই। নিদারুণ শ্রমে ফুসফুসটা সজোরে হাহাকার করে উঠছে এক-একবার যেন।

এত করে বলছি, কানে যায় না বুঝি? রাতের মধ্যে দুটো চোখ এক করতে দিলি

নে। এইবারে রেহাই দে একটু। তোর দুটো পায়ে পড়ি, চলে যা বেরিয়ে।

আওয়াজের ক্ষণিক বিরতি দিয়ে স্ত্রীকণ্ঠ করকর করে ওঠে: তুমি যাও যে চুলোয় খুশি। আমি পারব না। সাত লঙ্কা নড়ে বেড়াবার অত ক্ষমতা নেই আমার।

হায় ভগবান, হায় ভগবান! না নড়বি তো ন্যাকড়া গুঁজে দে মুখের ভিতরে। আওয়াজ না বেরোয়।

তুমি কানের ভিতরে ন্যাকড়া গোঁজ। গুঁজে দিয়ে ঘম-ঘুম ঘুমোওগে।

পিছিয়ে বাইরের দিকে চলে এসেছি ইতিমধ্যে। এক পক্ষ হলেন দয়ালহরি। বরাবর তাঁর মিনমিনে কণ্ঠ শুনি, নিজের ঘরে সিংহনাদ ছাড়ছেন। বিপরীতে নিশ্চয় বড়বউ—যাঁর হাতের রান্না বিস্তর খেয়েছি এবং লোকের কাছে যার কথা উঠলে দয়ালহরি গদগদ হয়ে ওঠেন। ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ির দাম্পত্যালাপ কান পেতে কেমন করে শুনি? পিছিয়ে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

ফিরে যাব কি না, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবছি। ইতিমধ্যে আরও সব কথাবার্তা হয়ে থাকবে, দূর বলে সম্যক কানে আসে নি। হঠাৎ শুনি, গুম-গুম-গুম আচ্ছা-রকম পিটুনি। আলাপের এতদূর পরিণতি ভাবতে পারিনি। ঘাড় নিচু করে হেঁ হেঁ করে বেড়ানো মানুষ দয়ালহরি বাড়ির মধ্যে এমন ধারা বীরপুরুষ, চাক্ষুস না দেখলে প্রত্যয় হয় না।

বড়বউয়ের আর্তনাদ: ওরে বাবা, মরে গেলাম—

মরিস নে তো। না মরে চিরটাকাল জ্বালালি এমনভাবে। কত জন্মের শত্রু। বাড়িঘর জমিজিরেত তো অর্ধেক গিয়ে আছে। আমিও যাব। একটা একটা করে সবাইকে খেয়ে তারপরে নিজে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি তুই। মড়া ফেলবার একটা লোক থাকবে না, শিয়াল কুকুরে টেনে খাবে। তাই তোর কপালে আছে।

কথার ফাঁকে ঢিবঢাব দু-চারটে করে পড়ছে! আর বড়বউ মরি-বাঁচি চেঁচাচ্ছেন: গেছি রে, মেরে ফেলল রে খুনে ডাকাত। আধ-মরা মানুষ বলেও দয়াধর্ম নেই। ওরে, পাড়ার সব মরে গেল নাকি—কেউ একবার থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসে না? হাতকড়া দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাক।

পাড়ার মানুষ কি, বাড়ির বড় মেয়েটাই তো নির্বিকার। লাবণ্য বেরিয়েছে। বাইরে-বাড়ি কোন কাজে আসছিল। আমায় দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এল।

চলে যাচ্ছেন কেন? আসুন, ভিতরে আসুন। মাকে মারছেন বাবা। এইবারে বেরুবেন। আচ্ছা, আমি গিয়ে খবর দিচ্ছি, আপনি যাবেন না।

দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়ে ধীরেসুস্থে ঘরের ভিতর ঢুকল। আজব কাণ্ড। মাকে ঠেঙানোর কথা কেমন সহজভাবে বলে। যেন সকাল বেলার নিত্যক্রিয়া—মুখ ধোওয়া, উঠানে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, বাইরের উনুনে ফ্যানসা-ভাত চাপানো—এইসবের আগেকার একটা ব্যাপার। গাছ থেকে পাতা পড়ার মত এই ব্যাপারে তাকিয়ে দেখার কিছু নেই। আমার আসার খবর বলেছে গিয়ে লাবণ্য। মুহূর্তে চারিদিক ঠান্ডা। জোড়ে বেরিয়ে এলেন—দয়ালহরি, পিছনে বড়বউ।

গাছপেত্নী বলে নাম আছে একটা। চোখে না-ই দেখি, ছেলে-বয়সের রূপকথা এবং পটুয়াদের ছবিতে তার চেহারাটা পেয়েছি। কিন্তু জ্যান্ত মানুষের কাছে কোথায় লাগে কল্পনার বস্তু? নমুনা এই বড়বউ। লম্বা লাঠির মাথায় একটা বড় গ্লোব বসানো—এতেই বর্ণনা হয়ে গেল। বিশাল মাথাটা পাল্লার এক দিকে তুলে দিন, এবং বাকি সমস্ত দেহ অন্য দিকে—ওজনে সমানে দাঁড়াবে। দাঁড়িপাল্লায় না তুলেই

স্বচ্ছন্দে বলা যায়। অবাক হতে হয়, ওই বৃহৎ গোলক কাঠির মত দেহ বয়ে বেড়াচ্ছে কী করে?

বড়বউ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: দেখ, মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান দেখ একবার। পর-অপরের মতন বাবাকে দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়েছে! ঘরে যাও বাবা, খাটের উপরে বোস গিয়ে। এতকাল শহরে কাটিয়ে এসেও মেয়ের জ্ঞানবুদ্ধি হল না।

মধুর মোলায়েম কণ্ঠস্বর—আহা-হা, অন্তর একেবারে শীতল করে দেয়। মা ছোট্ট বয়সে গেছেন, তাঁর কথা জানি নে। আমার বউদিও কিন্তু এমন মিষ্টি সুরে বলতে পারেন না। দয়ালহরি কথার কথায় বড়বউয়ের গল্প ফাঁদেন। শুনে শুনে এক বাৎসল্য-ভরা-মা-জননীর ছবি পেতাম। শুধু এই গলা শুনেই মনে হচ্ছে, অন্তত এই সম্পর্কে দয়ালহরি মিথ্যে বলে নি। মুখে যে কথাগুলো বললেন, আশ্চর্যভাবে আমার মনের ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কথা শুনতে হবে কিন্তু চোখ বুজে। চোখ মেলে দেখতে গেলে বিতৃষ্ণা আসবে। কী উৎকট চেষ্টাই না হচ্ছে কথাগুলো কন্ঠদেশ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করবার। চোখ বড় হয়ে কোটরের তলা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, গলার শিরা-উপশিরা দড়ির মতন টান-টান হয়ে ওঠে। কথার চাপে হয়তো বা শ্বাস আটকে শিরা ছিঁড়ে ধপাস করে ভুঁয়ে পড়ে যাবেন। কী জন্যে এত কথা বলতে যান উনি—শুয়ে পড়ে থাকুন না, উঠে আসবারই বা কী দরকার?

উঠে আসা শুধু নয়, দ্রুত উঠানে নামলেন। রান্নাঘর মুখো যাচ্ছেন। কত কষ্টের যে যাওয়া! বসে বসে দু হাতে ভর দিয়ে থপথপিয়ে যাচ্ছেন ব্যাঙের মত। ভাবী জামাই বাড়িতে পেয়ে গেছেন, রান্নাঘরের কায়দা দেখাবেন কিঞ্চিৎ। কত পাঠিয়েছেন এযাবৎ—খাদ্য বললে হবে না, এক-একটি নিপুন শিল্পকর্ম। খাওয়ার আগে হাতে ধরে দেখাতে হয়। দাঁত দিয়ে কামড় দিতে সংকোচ লাগে। আজকেও ঠিক সেই কর্মে রান্নাঘরে চললেন। বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠে, বিশুষ্ক এই হাড় ক'খানার উপর কেমন করে দয়ালহরির হাত উঠল! কাল থেকে সম্পর্ক পালটেছে—শ্বশুর-জামাই আমরা। এবং এসেছিও দরবার করতে। কিছুই সে সব মনে রইল না—পদ-পতিপত্তির জোরে এতদিন ধমকে এসেছি, সেই ধমকই মুখে এসে গেল।

কি রকম মানুষ আপনি হোড় মশায়—ছি ছি! অসুখে-বিসুখে এই তো সিকিখানা হয়ে আছেন। মায়াদয়ার কথা ধরি নে, ওসবের ধার ধারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু হিসাবি মানুষ তো আপনি—মারতে গিয়ে আপনার হাতেই তো বেশি লাগে।

বড়বউ রান্নাঘরের ছাঁচতলা থেকে ফিরে দাঁড়ালেন। দয়ালহরির জবাবের আগেই বলে উঠলেন, ও কিছু নয় বাবা। কোন্ সংসারে না আছে। দুটো মেটে-কলসি গায়ে গায়ে রাখলে ঘা-গুঁতো লাগে। এ তবু দু-জন মানুষ পঁচিশ বছর ঘরসংসার করছি। কিছু না, কিছু না। একটু জলটল না খেয়ে তুমি কিন্তু যেতে পারবে না বাবা।

দয়ালহরি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠলেন: তোমারই বা আক্কেল কী রকম বাবাজি? হুট করে অন্দরে ঢুকে পড়লে। দু-একবার কাশতে হয়, কিংবা সাড়া দিতে হয়—বাড়ি আছেন নাকি? অবিশ্যি তুমি আপন মানুষ—দেখেছ, দেখেছ। আজ না হল, দু-দিন পরে তো দেখতেই। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি। তবে আমার কথাটাও শোন, দু-পক্ষের বিচার হোক। আগুনের তাতে বসে একগাদা রান্নাবান্না করবে—খোশামোদ করেছি, মাথার দিব্যি

দিয়েছি—এত জিনিস রাঁধে, নিজে যদি তার থেকে কণিকা মুখে দেয়! বারোজনকে খাইয়ে দেবে—বললে বিশ্বাস করবে না, বাড়তি হলে পথের মানুষ ডেকে ডেকে খাওয়াবে! ভাল রান্না হয়েছে, ওই যে মুখে একবার বলল—তাতেই কৃতার্থ। আর আমি খেটে-খুটে বাড়ির উঠানে পা দিয়ে দেখব শুকনো কঞ্চি একখানা। কঞ্চি, যাই হোক, বাঁশবনে চুপচাপ পড়ে থাকে—এ কঞ্চি ফ্যাসফ্যাস করে কামারের জাঁতা টেনে মরে দিনরাত। দেখে আর প্রাণে জল থাকে না।

অতিশয় বেজার মুখে হুঁকোদান থেকে হুঁকো টেনে দাওয়ার ধারে গিয়ে ছড়ছড় করে বাসি জল ফেলে দিলেন। খোলের ফুটোর মধ্যে গাড়ুর নল লাগিয়ে নতুন জল ঢালছেন। কথার জের চলেছে: পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যাপার। দিন নেই, রাত নেই। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই। কত সয় বল মানুষের? বাড়িতে দাঁড়াতে পারি নে। তোমরা দেখ, আপিস হয়ে গেলেও বুড়ো বাড়ি যায় না, থানায় যাচ্ছে, এখানে-ওখানে ফোঁপোর-দালালি করে বেড়াচ্ছে। আসব কোন্ আনন্দে বল, বাড়িতে আমার কিসের টান।

যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণ ভাল। সারাদিন খেটেখুটে রাত্তিরে দু-দণ্ড সোয়াস্তিতে ঘুমোব, সে উপায় নেই। কতক্ষণ ভাল লাগে? ক'দিন মানুষের ধৈর্য থাকে? এক-আধ দিন নয়, পঁচিশ পঁচিশটা বছর। মাথা খারাপ হয় কিনা, তুমিই বল। সময় সময় সত্যি ইচ্ছে করে মারতে মারতে একেবারে মেরে ফেলে দিই। আমি মরে গেলে ও যে ভিক্ষে করে খাবে, ভগবান সে উপায় রাখে নি।

বলতে বলতে গলা যেন ধরে এল। কলকে নিয়ে গম্ভীর মনোযোগে তামাক সাজতে বসলেন।

বড়বউ ইতিমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে তারস্বরে হাঁপাচ্ছেন। হাতের কাজও চলছে, কড়াইয়ে ভাজাভুজির আওয়াজ।

ইতস্তত করে অবশেষে আসল কথা বলে ফেললাম, দেখুন, ষষ্ঠী-পুকুরের একবারটি খবর পাঠালে হয়।

দয়ালহরি ঘাড় তুলে তাকালেন: কেন?

কাতর হয়ে বলি, সাত-শ'টাকার জন্যে সম্বন্ধটা আটকে রয়েছে, সে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দয়ালহরি ভ্রূকুটি করেন: সাত সকালে বাসি হাতে, বাসি মুখে এই তুমি বলতে এসেছ? সেদিন যে খুব ধানাইপানাই করলে—অযোগ্য পাত্র তুমি, অনুগ্রহ করতে বলছিলে। কী হে, মনে পড়ছে না?

মাথা চুলকাই। জবাবের কী আছে!

অনুগ্রহ চেয়েছিলে, তা সেই অনুগ্রহ-ই করলাম আমি। প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছি। যোগ্য-অযোগ্যের বিচার করলাম না। নতুন আবার কী হল?

আগের সে দয়ালহরি নেই। কথাবার্তা চালচলন আলাদা। আমার সেদিনের কথাগুলো তাক করে করে ছুঁড়ছেন। নিরুপায়ে মার খাওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আজ নাকি আমার জীবন মরণ সমস্যা। আমতা-আমতা করে তাই বলতে হয়, ষষ্ঠীপুকুরের ওঁরা আগে এসেছিলেন তো। কথাবার্তাও এগিয়েছিল।

দেমাক করে ভেঙে দিয়ে গেল। এবারের প্রস্তাব। সে তুলনায় কত ভাল পাত্র পেয়ে গেছি, হিসাব করে দেখুকগে। ভাবছি, বরের খুড়ো সেই বাবরি-চুলওয়ালা লোকটাকে বিয়ের নেমন্তন্ন পাঠাব। মনের দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ে বেটা টেকো হয়ে যাবে।

রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসেন। তখন মরিয়া হয়ে বলি, পণের সেই সাত-শ' টাকা আমি দিয়ে দেব। আরও পাঁচ-শ' না হয় এদিকে-সেদিকে খরচের বাবদ—

দয়ালহরি গম্ভীর হয়ে গেছেন। বললেন, কন্যা দান করতে পারি তোমায়। প্রস্তাব করেছিলে, রাজি হয়ে গেছি। কিন্তু ভিক্ষে নিতে যাব কেন? তোমারই বা সাহস হল কী করে যে ভিক্ষা দিতে চাইছ? এমন আস্পর্ধা ভাল নয়।

লাবণ্য এই সময় লোহার হাতায় আগুন এনে বাপের কলকেয় দিল। তাকাল আমার দিকে। চোখে হাসি উপছে পড়ছে। ভারি যেন মজা!

ধীরেসুস্থে কলকে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে গোটাকয়েক সুখ-টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দয়ালহরি বললেন, বাবাজী, পুরনো ঘর আমাদের। অবস্থা পড়ে গেছে, কিন্তু ভিক্ষের টাকায় মেয়ের বিয়ে দেব না। আমার বাড়ির উপর বসে এত বড় কথা বললে—অন্য কেউ হলে কান ধরে বের করে দিতাম। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, জামাই মানুষ তুমি—ঠিক ঠিক জবাবটাও তো দিতে পারছি নে। যাকগে, বাজে কথায় কাজ নেই। ষষ্ঠীপুকুরের চেয়ে বেশি পছন্দ তোমায়। তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করব। সেই জোগাড়ে লেগে যাও।

রায় দিয়ে তামাক টানতে টানতে উঠে পড়লেন। বোঝা গেল সমস্ত। নাগপাশে জড়িয়ে গেছি। একটা একটা করে দিন কেটে যায়। দয়ালহরি একবার করে উদ্যোগ-আয়োজনের খবর শুনিয়ে যান। আজকে ঢুলির বায়না হল। গাঁয়ের কী হয়েছে—সারা বিরাটগড় ঢুঁড়ে সামিয়ানা মিলল না, সদর থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে। আর নয়তো ধুতি-শাড়ির আচ্ছাদন দিয়ে কাজ চালানো ছাড়া উপায় নেই। দুর্ধর্ষ গোয়ালা দইয়ের দাম হাঁকছে পঁয়তাল্লিশ টাকা মন। এই সেদিন অবধি দশ টাকায় দই ভোজের পাতে খেয়ে লোকে বাহবা-বাহবা করেছে। সেই জায়গায় পঁচিশ টাকা বললাম তো গোয়ালা কী বলে জান বাবাজী? হবে না কেন পঁচিশ টাকায়? কিন্তু দুধে হবে না—জল। জল জমিয়ে দেব। সে ক্ষমতা রাখে দুর্যোধন। বাবুমশায়, তেমন তেমন ঢাকবার জিনিস পেলে গোটা পুকুর জমিয়ে দই বানাতে পারি।

এমন সব মজায় কথায় হাসবার অবস্থা নেই আমার। দয়ালহরি বলেন, ছোটবাবু মাঝে পড়ে শেষটা পঁয়ত্রিশে রফা করে দিলেন। মানুষ কী রকম ত্যাঁদোড় হয়েছে দেখ, দারোগার কথাতেও দর কমাতে চায় না। দারোগা ধমক দিলে আগে মাংনা দিয়ে যেত। তবে আমার হল নমো-নমো করে দায় সারা। মাল নিচ্ছি মোটমাট পনের সের, কত আর ঠকাবি বল?

মতলব করে এসে শুনিয়ে যান কি না, জানি না। শুনি আর কাঠ হয়ে যাই।

শুভদিন এগিয়ে আসছে। আর বিয়ের পরেই তো আমার ফাঁসিকাঠে চড়বার দিন এগুতে লাগল। ফাঁসির আগে কিন্তু এমনধারা হয় নি। বিয়ের চেয়ে ফাঁসির ধকল অনেক কম।

একদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ সেই শয়তানীকে পেয়ে গেলাম। সেই রূপসী। সাহসটা বুঝুন, একেবারে ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। আগে যেমন আসা যাওয়া করত।

ক্ষিপ্ত হয়ে বলি, তুমি সর্বনাশ করেছ। কী করেছি আমি, কোন্ শত্রুতা আমার সঙ্গে?

মেয়েটা তিলেক বিচলিত নয়। আগেকার চপলতা নেই। শান্ত হয়ে তাকিয়ে

আছে।

কে তুমি? দয়ালহরির সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার?

বিষাদে ম্লান দৃষ্টি তুলে সে বলল, কিছু না, কিছু না। দুনিয়ার কারও সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

তুমি জোচ্চুরি করেছ। রূপের ফাঁদে ফেলে কুৎসিত মেয়েটা আমার কাঁধে গছিয়ে দিচ্ছ।

গালি যেন কানে যায় না। আগ্রহে বরঞ্চ স্তিমিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: রূপ আছে আমার? দেখতে পাচ্ছ আমার রূপ? তোমার চোখে ভাল লাগে?

মাথা খারাপ নাকি মেয়েটার? কোনও মুগ্ধজন কখনও বন্দনা জানায় নি, আয়নার নিজের মুখ দেখে নি? জানেই না রূপ আছে কিনা তার?

একেবারে কাছ ঘেঁসে মুখের পানে মুখ তুলে বলে, সত্যি আমায় দেখতে ভাল? আমতলায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে আমারই জন্যে, লাবণ্য আসবে বলে নয়?

কী আশ্চর্য! কটকটে-কালো মৌচাকের মতন ফুটো-ফুটো মুখ, তার জন্য পথ তাকাতে যাব?

আমিও তাই ভাবতাম। তোমার মুখের ভাল ভাল কথা—সমস্ত আমার, একটি কথাও লাবণ্যর নয়। তবু কিন্তু ভয় ঘুচত না। একদিন তার পরখ করলাম। তুমি গান করছ। লাবণ্য এসেছিল, সরে গিয়ে আমি লাবণ্যর পথ করে দিলাম। আড়ি পেতে শুনছি, কী কথা বল তুমি তার সঙ্গে। দেখলাম, তাড়িয়ে দিলে; কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেল। কত শান্তি যে পেলাম তখন।

যে মেয়ে আমার নিয়ে এমন ব্যাকুল, তার উপরে কতক্ষন রাগ থাকে? রাগ আমার জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। বললাম, অনেক লুকোচুরি হয়েছে। আর নয়। আজ আমি তোমার সমস্ত কথা শুনব। নয় তো ছেড়ে দেব না।

কোন্ লোভে মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: ছাড়বে না? কী করবে তবে? ধরবে? ধর না, ধর আমায়—

রাত্রিবেলা সেই আশ্চর্য মেয়ে আমার ঘরের মধ্যে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাকে ধরতে বলছে। পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আমন্ত্রণ। আমি কিছু সিদ্ধতাপস নই। গায়ে কাঁটা দিয়েছে, ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছি। কী অসহ অবস্থা তখন। হাত কিন্তু ফিরে এল—কিছুই নয়, শূন্য, একটা ছায়া। সে ছায়া কাছ থেকে অতি স্পষ্ট দেখেছি—দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ মাত্র নয়, ঘনতা আছে। থ্রি-ডাইমেনশন সিনেমা ছবির মতো। তবু কিন্তু আছে সে দাঁড়িয়ে। বিষন্ন কাতর মুখের আকুতি: ধর গো, আমার যে বড় সাধ। কুৎসিত লাবণ্যর গায়ে গায়ে কতদিন ছায়া হয়ে ঘুরেছি। আমায় জোচ্চোর বললে—সত্যি সত্যি তাই। ওই মেয়ে যা নয়, তাই সাজিয়ে দেখিয়েছি। লোভে পড়ে করেছি—যদি দুটো ভালবাসার কথা বল, যদি একটু ছোঁয়া দাও, একবার যদি আলিঙ্গনে বাঁধ। আমার ছায়ায় লাবণ্যের তুমি ওই রূপ দেখেছিলে। শঠ আমি, শাস্তি দেবে না? দাও গো, দাও। রাগ করে ক্ষেপে উঠে দু-হাতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে নাও তোমার বুকের উপর। যেমন লাবণ্যকে নেবে ক'দিন পরে বিয়ের মন্ত্র ক'টা পড়ানো হয়ে যাবার পর।

বলতে বলতে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আমিও তো অধীর হয়ে উঠেছি: চেয়ে দেখ। দেখ। নিতে পারছি কই তোমায়? হাতে ঠেকছ না। আমি কী করব।

হাতই তুললে না মোটে, ঠেকবে কিসে? মনে ভাবছ, খুব একটা চেষ্টাচরিত্র হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন হয়। বিছানার উপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এদেশে-সেদেশে ছুটোছুটি কর, অথচ একটা পা-ও নড়ে না যেমন।

সে তো স্বপ্ন। এখন জেগে রয়েছি আমি—

জোরে ঘাড় নেড়ে সে বলে, না স্বপ্ন এখনই। আমরা জেগে—আমি আমার মা-বাপ আর বোনেরা। আরও কত। তুমি বিভোর হয়ে ঘুম দিচ্ছ—আর জেনে বসে আছ, এটা করছি সেটা করছি। ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে—তাকে বলে মৃত্যু। জেগে তখন হাসবে: কত সব কান্ড করেছি এতক্ষণ—স্বপ্নে হাকিম হয়েছিলাম, স্বপ্নে বিয়ে করেছি লাবণ্য নামে বিকটাকার এক কনে···

শুনতে শুনতে আমারও মনে হল তাই। ঘুমুচ্ছি নাকি আমি? চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেখি। কিন্তু ঘুম যদি হয়, চোখে হাত দিয়েই বা কী বুঝব? এ-ও আর-এক স্বপ্ন—চোখে হাত বুলিয়ে এই ঘুম পরখ করা। ঘুম আর জাগরণে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সেই সন্দেহের আজ অবধি মীমাংসায় পেঁছিনো গেল না। আমার এই কাহিনী দুই জীবনের কলহ—ঘুমের আর জাগরণের। বসে বসে জীবন-কথা লিখছি—ঠিক জানি, আমার পিছন দিকে এই দুটো চোখের আড়ালে কোন কিছুই নেই, একেবারে ফাঁকা। যেই চোখ ফেরালাম, চকিতে ওদিকটা বানানো হয়ে গেল—নজরের আড়ালের সামনেটা অনাবশ্যক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোপাট। সিনেমা-স্টুডিয়োর ছবি তোলার মতন কতকটা। ছবিতে দেখেন বিশাল অট্টালিকা, কিন্তু বানিয়েছে যতটুকু, মাত্র ক্যামেরায় আসবে। দোতলার সিঁড়ির হয়তো চারটে ধাপ, ঘরের হয়তো দেড়খানা দেয়াল। বাকি আর কিছু নেই। দর্শক ভাবে, গোটা বস্তুটাই রয়েছে। জগৎটাও তাই।

এই আমার মনের গতিক। আপনারা কতজনে পাগল ভাবেন আমায়, হাসাহাসি করেন—মন্তব্য কদাচিৎ কানে এসে যায়। আমিও আপনাদের ভেবে একা-একা খলখল করে হাসি: দেখ দেখ, পাগলা-গারদের লোকগুলো আমাকেই আবার পাগল বলছে।

সেই মেয়েকে বললাম, হল না হয় তাই। আবার হাত না উঠুক, ছুঁতে না পারি, কান দুটো খোলা আছে। তোমার পরিচয় বল, শুনতে পাব। নাম কী তোমার?

নাম? নামে কি চিনবে? চম্পা। আর দুই বোন আমার—যুঁই আর জবা। দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা কোর, সে সব জানে।

নামটা চিনি-চিনি করি। বিশেষ করে পাশাপাশি তিনটে ফুলের নাম পেয়ে। ডাক্তারবাবুর কাছেই বোধহয় শুনেছিলাম। জিজ্ঞাসা করি, সাহেব-কর্তার মেয়ে না তুমি?

ঘাড় নেড়ে চম্পা সায় দেয়। বলে, এই গোলবাড়ি আমাদের। এই যেখানটা তুমি রয়েছ।

এর মধ্যে ভিন্ন কথা নিয়ে আসে: জবাবটা বড় হিংসুটে। তুমি পায়চারি কর, তখন বলে কী জান? মেঝেয় অত জুতো ঠক-ঠকিয়ে বেড়ায় কেন? অত দেমাক কিসের? ওকেও যেতে হবে। এমনি কত জনের ঘরবাড়ি জায়গাজমি জ্যান্তরা বারম্বার এসে দখল করেছে। জ্যান্ত মানে—যে-রকমটা ভাব নিজেকে তুমি। চিরকাল ধরে সকলে মরে আসছে, তুমিই কি চিরকাল বাঁচবে?

তোমারই ত বিয়ে হচ্ছিল এই বাড়িতে?

চম্পা বলে, তোমার ঠিক মাথার উপর দোতালার ঘর। তার উপরে ছাত। তার

তার পাশে চিলেকোঠা। চুপি চুপি আমি চিলেকোঠার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বরের নৌকো গোলবাড়ির ঘাটে এসে লাগবে—কত বাজিবাজনা, কত মশাল, সেই আলোয় সকলের আগে বর আমাকে দেখে নেবে। সেই জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তা আমারই দুই বোন—দুই মুখপুড়ি জবা-যুঁই টের পেয়ে গেছে। তারাও দেখি পিছনে। রাত কত হয়ে গেল, বাড়িসুদ্ধ মানুষ ঘাটের দিকে তাকিয়ে। তারপরে এসে গেল নৌকা দুটো-একটা নয়, অনেক—অনেক। কিন্তু বর কই? বর আমার এল না। মশাল নিয়ে ঘাটে বর এগুতে গিয়েছিল, সেই মশাল কেড়ে বাইরের বাজনদারদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে জ্বলছে। এই গোলঘরের লাগোয়া সিংহদরজা—তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করেছে তো দমাদম কুড়ুল পড়ে তার উপরে? আমগাছের মগডাল থেকে ছাদে লাফিয়ে পড়ে আমাদের তিন বোনের বুকে-পিঠে-ঘাড়ে এদিকে চকাচক ছোরা চালাচ্ছে—

বলছে, আর হাসছে দেখি চম্পা। শুনতে শুনতে আমার দম আটকে আসে, হাসে সে তখন। বলে, প্রথম তুমি সেই বিরাটগড়ে এলে, মনে পড়ে? রাতদুপুর হয়ে গেছে, গোলবাড়ির ঘাটে এক ডিঙি লাগল। ডিঙি থেকে তুমি নামছ। লণ্ঠন ধরে মাঝি পথ দেখিয়ে চলেছে। দেখছি আমরা এ-বাড়ি থেকে। জবাটা বড্ড পাজী, সে বলে কী জান? সেদিন বর পৌঁছতে পারে নি—দেখ দিদি, ওই দেখ, তোর বর এসে গেল? আসছে এতকাল পরে। কী বখা মেয়ে, কলজেটা ছোরায় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েও তার হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করতে পারে নি। তুমি কিন্তু এ-বাড়ি এলে না—অন্য বাসায় গিয়ে উঠলে। কিন্তু জবার কথাই সত্যিই হল—ঘুরে ফিরে আসতে হল সেই। মরা-বাড়িতে জীবন্ত লোকের বাসা।

আমার আজও সন্দেহ গেল না, সেই সময়টা আমি জেগে ছিলাম না স্বপ্ন দেখেছি? কিংবা জাগরণ আর স্বপ্ন মুখোমুখি হয়ে এত সব কথাবার্তা বলে গেল?

পরের দিন দয়ালহরিকে জিজ্ঞাসা করে নিঃসংশয় হই: চম্পা, জবা, যুঁই—জানতেন এই নামের তিনটি মেয়ে?

নিস্পৃহভাবে তিনি বললেন, সাহেবকর্তা বাড়ির মেয়েদের ফুল দিয়ে নাম রাখতেন। এমনিও ফুল ভালবাসতেন খুব। কর্তা গিন্নি দুজনেই। কাশ্মীরে ফুলের দেশে থাকতেন কি না!

নাম কিন্তু ঠিক ঠিক রেখেছিলেন। মেয়েরা ছিল ফুলের মতন।

দয়ালহরি তাকিয়ে পড়লেন: তুমি দেখলে কোথা হে? গল্প শুনেছ—ডাক্তারবাবুর কাছে? ওঁর খুব যাতায়াত ছিল।' কিন্তু বেশি রং ফলিয়ে বলেন, এই যা।

তারপরে যে জন্য আজ আমার কাছে এসেছেন: কলকাতায় যাওয়ার ঠিকঠাক করেছ, তা আমায় মুখের কথাটা বললে না কেন বাবাজি?

কী সর্বনাশ, কতগুলো চোখ দয়ালহরির? একটা নিশ্চয় পিছন দিকে, চুলের ভিতরে ঢাকা। মনে মনে কিছু ভাবলেও এ লোকের বোধ করি নজরে এসে যায়।

বলছেন, এ তল্লাটের লোকেও বিয়েথাওয়া করে। বিয়ের সওদা করতে কলকাতা অবধি যেতে হয় না। সদরে সব-কিছু পাওয়া যায় বুঝলে?

কনের খোঁজে আমার বউদি সারা কোলকাতা চুঁড়ে বেড়ান। বিরাটগড়ের এই উৎপাত চেপে পড়ে সমস্ত বরবাদ করে দিচ্ছে। ঝেড়ে ফেলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ব, এই ঠিক করেছিলাম। পালিয়ে বাঁচতে চাই। দয়ালহরির হা-হুতাশ পঁচিশ বছর

ধরে চলেছে। কাঁচা বয়স আমার—হয়তো আমায় দুনো-পাঁচিশ বেঁচে থাকতে হবে। বড়বউ পঙ্গু হওয়ায় দয়ালহরিরর তবু একটা সুবিধা, যত কিছু হাঙ্গামা বাড়ির ভিতরেই—বাইরে বেরুলে নির্ঝঞ্ঝাট। থাকেনও তাই বাইরে বাইরে। বড়বউ, তা ছাড়া, কলকাতার নয় বলে নবেলি বুলি নেই মুখে। মার খেয়ে ঝগড়া করে পরক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে উনুনে কড়াই চাপিয়ে দেন। কিন্তু লাবণ্য নামক শহুরে বস্তুটিকে ঘরের ভিতরে আটক রাখা চলবে না, ঋ-ফলার মত পিছন সেঁটে থাকবে অহরহ। এবং ট্যাঙস-ট্যাঙস কথা শোনাবে। যতই ভাবি, অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে। কাজ নেই আমার সরকারি চাকরি করে। চাকরি এবং বিরাটগড় ছেড়ে সরে পড়ি রে বাবা। তা দেখি, সমস্ত জানেন দয়ালহরি। ঘাটের নেপাল মাঝির খবর অবধি জেনে বসে আছেন।

বলেন, পাঁচ টাকায় তুমি নেপাল মাঝির নৌকো ঠিক করেছ। বেটা জোচ্চোর, গরজ বুঝে ডবল ভাড়া হেঁকেছে। শুনে তো ছোটবাবু আগুন। দু-টাকা তুমি আবার আগাম দিয়েছ। থানায় নিয়ে গোটাকতক রুদ্দা ঝেড়ে দিতে বেটা নাক-কান মলে টাকা ফেরত দিয়ে এল।

পাঁচ টাকা হোক আর দশ টাকাই হোক, আমার টাকা আমি দিয়েছি। ছোট-দারোগা কোন্ আইনে নেপাল মাঝিকে মারধোর করে?

রাগে রাগে থানায় ছুটলাম। ছোটবাবু হেসে ঠাণ্ডা ভাবে বলেন, আইন পাস হয় স্যার দিল্লির পার্লামেন্টে, কলকাতার এসেম্বলিতে। বিরাটগড় দূরের জায়গা, পথেরও অনেক ধকল। সব আইন ঠিকমত এসে পেঁছিতে পারে না। আমাদেরই আইন বানিয়ে নিতে হয়।

বড়বাবু কথাটা লুফে নিয়ে বলেন, এই কাজটা কিন্তু ষোলআনা আইনসম্মত। হোড় মশায়ের মেয়েকে ফুসলেছেন আপনি, নিজ হাতে চিঠি লিখে তাকে বাসায় এনেছেন। সে দলিল আমাদের হাতে আছে। উড়ে উড়ে মধু খাচ্ছিলেন, বেকায়দায় পড়ে শেষটা বিয়েয় রাজি হতে হল। এখন আবার অন্য মতলব ভাঁজছেন। ফৌজ-দারির কারণ ঘটে। সরকারি লোক বলে আপনার দায়িত্ব আরো বেশি। বুঝে দেখুন সমস্ত। আপনি বন্ধুলোক, আবার হোড় মশায়ও বিশেষ অনুগত আমাদের। কারও উপর অন্যায় জুলুম হয়, আমরা চাইনে।

দয়ালহরি ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। তিনি বললেন, শুভকর্ম মাঘ মাসে হবার কথা, কিন্তু বাবাজির মতিগতি বুঝে অত দেরি করা ঠিক হবে না। ঠাকুর মশায় বিধান দিলেন কন্যা অরক্ষণীয়া হলে মলমাস বলে আটকায় না। ক'টা দিন পরে উনত্রিশে অঘ্রাণ একটা মাঝারি গোছের দিন আছে। কী বলেন আপনারা?

সবাই এরা একজোট। পরিপাটি বন্দোবস্ত। জায়গাটাও এমন বেয়াড়া—চারিদিকে নদীখাল, নৌকো ছাড়া নড়বার জো নেই। সে নৌকোর পথ মেরে দিয়ে বসে আছে। নেপাল মাঝির দুর্দশার পর কেউ আর আমায় নৌকোয় তুলবে না।

আবার কী আশ্চর্য, বাসায় ঢুকবার মুখে দেখি লাবণ্য। হাতে গরুর দড়ি কুণ্ডলী করা, এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। বলে, মুংলিটা কোন্ দিকে গেল, বড্ড জ্বালাতন করছে। শিঙে দড়ি দিয়ে গোয়ালে তুলতে পারলে যে বাঁচি।

হাসছে নাকি মিটিমিটি, কথাটা রূপক? আবছায়া সন্ধ্যায় ঠিক ধরতে পারি নে। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ধারালো দৃষ্টি দিয়ে ছোরার মতন খোঁচাচ্ছে। বলে, আপনি বুঝি পালাচ্ছিলেন? এতদিন বাবাকে চিনলেন না? এ-গাঁয়ে আমার বাবায়

চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় না। ধরুন, ওই গোলবাড়ির ব্যাপার—বিয়ের রাত্রে লঙ্কাকাণ্ড। বাবা বলেন, তিনি টের পেয়ে-ছিলেন আগেভাগে, সমস্ত জানতেন। এই যাঃ, সব আপনাকে বলে ফেললাম। আমি আবার ঠিক লণ্টো, পেটে কোন কথা থাকে না। বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, এইটে জেনে রাখুন। মিছে পাকছাট মারতে যাবেন না। আপনার কষ্ট, এদেরও হয়রানি। তার উপরে আপনার সেই চিঠি বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। আমাদের পাকা দলিল। গোলমাল করলে ফ্যাসাদে পড়বেন।

শুভার্থীর মতন বোঝাবার ভঙ্গিতে বলি, এমন বিয়েয় সুখী হবে তুমি?

ধক করে মেয়েটার চোখ জ্বলে উঠল যেন: সুখ কি পেয়েছি কখনও? বিধাতা-পুরুষের ভাণ্ডার দুটো—একদলের জন্য রূপগুণ আর সুখসৌভাগ্য, অন্য দলের অশান্তি আর চোখের জল। সুখ আমি চাই নে, একটু যদি সোয়াস্তি পেতাম। না পেলেও ক্ষতি নেই। যা আছি তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না। আর কিছু না হোক, জায়গাটা বদল হবে, নতুন নতুন মুখের গালি শোনা যাবে। ভালয় ভালয় কাটলে যে হয় এই ক'টা দিন।

ধীরে ধীরে বিজয়িনীর মত পা ফেলে সে মাঠে নেমে গেল। গরুর খোঁজে সম্ভবত। আগে অনেক দিন গাঙের পাড়ে দাঁড়িয়ে জেলেদের মাছধরা দেখতাম। বেউটি-জালে বড় মাছ পড়েছে—যত আফালি করুক জাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না। জলে নেমে কানকো ঠেসে ধরবার আগে জেলেরা ধীরেসুস্থে এক ছিলিম তামাক খেয়ে নেয়। লাবণ্যর ওই চলার ভঙ্গির সঙ্গে কেমন তার মিল আছে।

দু দিন কি তিন দিন পরে। এজলাসে কাজ করছি, একটা দলিল এসে পড়ল হাতে। দয়ালহরি রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করেছেন। সোলেনামা। পড়ে স্তম্ভিত হই। পুকুর-বাগান-ভদ্রাসন কিছুই আর দয়ালহরির নেই। পুরোনো দেনার দায়ে মহাজন বিক্রি করে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও মামলা করে নানান অজুহাতে এতদিন দখলে রেখে-ছিলেন। শেষ মামলাতেও হেরে গিয়ে মহাজনের হাতে-পায়ে ধরে এবারে এই আপোস-রফা হচ্ছে: ভদ্রাসন হইতে উচ্ছেদ এক মাস কাল স্থগিত থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে আমি অথবা আমার ওয়ারিশগণ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিব। এতদর্থে সুস্থশরীরে সরল মনে অত্র সোলেনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম।

বেজার মুখে—চাপা গলায় অবশ্য—দয়ালহরি বলছেন, মেয়ের বিয়ে ক'টা দিন পরে, ব্যাটা বলছে কিনা বিদেয় হয়ে যাও। বোঝ আক্কেল! বিয়ে কি তবে পথের উপর দাঁড়িয়ে হবে?

বললাম, একটা মাস তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন?

হোড়মশায় তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, তার মধ্যে শোধ করে দেব। ব্যবস্থা ঘরেই রয়েছে। ক'খানা গয়না-বিক্রির ব্যাপার, কারও কাছে আমার হাত পাততে হবে না। যদি বলি, দিয়ে দিন নি কেন এতদিন। ঘরের জিনিস কেউ কি সহজে বের করে? চেষ্টা করে দেখেছিলাম, যদি ঘুলিয়ে দেওয়া যায়।

প্রায় ফিসফিস করে বলেন, এখনও হাল ছাড়ি নি একেবারে। বুঝলে না, সময় নিয়ে মাথার উপরের কোপটা কাঁধে নামিয়ে আনা।

দাদা সেই দিন এসে পড়লেন কলকাতা থেকে। বাসায় ফিরে দেখলাম, বারান্দায় বসে আছেন। এসেছেন অনেকক্ষণ—থানা ঘুরে সবিস্তারে খবরাখবর নিয়ে এসেছেন। ওঁদের যে কী পরিপাটি বন্দোবস্ত, আরও ভাল করে মালুম হল। চমৎকৃত হয়ে যেতে

হয়। দয়ালহরি স্বহস্তে কলকাতায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি দাদা ফেলে দিলেন আমার সামনে। পড়তে গিয়ে কান গরম হয়ে ওঠে। আমার সম্বন্ধে যা লিখবার লিখুন, মেয়ের চরিত্র নিয়েও লিখছেন বাপ হয়ে। আমার ফুসলানিতে মাঠ পার হয়ে সে আমার ঘরে যেত। লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারি নে দাদার দিকে। কৈফিয়তের কিছু নেই—কথা তো খানিকটা সত্যিই। সকল দোষে দোষী আমি। চম্পার উপরে দোষ চাপাতে গেলে হাসবে সবাই, পাগল বলবে। এতদিন পরে লেখা এই গল্প পড়ে আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আপনারাই কতজনে কত কী ভাবছেন। সে আমি জানি।

মরিয়া হয়ে বলি, বিয়ে কি হবেই দাদা ?

না হবার উপায় রেখেছ ? গোলমাল করলে ঘরে তালা বন্ধ করবে। বর, বরকর্তা দুজনকেই। থানা থেকে আচ্ছা রকম শাসানি দিল। কনে-আশীর্বাদ সেরেই চলে যাব ভেবেছিলাম। এখন যে ফাঁদে ফেলেছে, আভ্যুদিকের মন্তর পড়া শেষ না করে এক পা নড়তে দেবে না।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠলেন : কী দুর্বুদ্ধি হল—টুনুর মা এত করে মানা করে, যেতে দিও না লক্ষ্মীছাড়া জায়গায়। কিছু কানে নিলাম না। ভায়ার ভবিষ্যৎ দেখছি আমি। সমস্ত ছারখারে গেল এই জায়গায় এসে। তোমার রুচি পর্যন্ত এন্দুর নেমেছে। ভদ্র সমাজে বলার কথা নয়। গা ঘিনঘিন করছে। কলকাতায় ফিরে সকলের আগে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে তবে সোয়াস্তি।

নিরুপায়। স্রোতে গা ভাসানো ছাড়া কোন কিছু করণীয় নেই। মনের এক অদ্ভুত নিরুদ্বেগ অবস্থা। বিয়ের দিন এসে যাচ্ছে তো যাক। ফাঁসির দিন যেমন অপ্রতিরোধ্য রূপে আসে। ডাক্তারবাবুই একমাত্র সুহৃদ আমার। এখনও ভিতরের গোল-মালটা তাঁকে বলি নি। পরের কাছে বোকামি জাহির করে লাভ কী ? কুরূপ-কুৎসিত জেনেশুনেই যেন বিয়ে করছি—মহাপ্রাণ বলে আরও তাই খাতির বেড়েছে ডাক্তারবাবুর কাছে। অবসর পেলেই তাঁর বাড়ি চলে যাই, ঘাঁটিয়ে ঘাটিয়ে সেই আমলের গল্প শুনি। চম্পার কথা অনেক—অনেক করে শুনতে ইচ্ছা করে :

তিন সোমত্ত মেয়ে—চম্পা জবা যুঁই। তোলা নামও একটা করে ছিল—লগ্নপত্রের সময় সেই সব নাম বেরুল। সংস্কৃত মন্ত্রের মত কঠিন উচ্চারণ, কঠিন বানান। মানে নিশ্চয় খুব ভাল। মন্ত্রের মানে ভাল বই কবে মন্দ হয় ? কিন্তু ঘরব্যাভারি চলে না। সেই সব সাধু নাম মনে নেই ডাক্তারবাবুর।

বিয়ে চম্পার। পাত্র সদরের সরকারি উকিলের ছেলে। মেডিকেল কলেজ থেকে বেরুতে লড়াইয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে। বিরাট আয়োজন। আর গোলবাড়ির সব ব্যাপারে যেমন, মাখন মিত্তির ষোল আনা কর্তা। লোকটা মানুষ খাটাতে জানে, নিজেও খাটে অসুরের মতন। পানসি নিয়ে আজ সদরে ছুটল, কাল বা কলকাতায়। ভারে ভারে জিনিস-পত্র আসছে। কত রকমের গয়না, কত কাপড়-চোপড়। উদ্যোগ-পর্বেই লোকের তাক লেগে যায়। গায়ে-হলুদে গাঁয়ের যত বউ ঝি আসবে—খাওয়াদাওয়া তো আছেই—প্রতি এয়োস্ত্রীকে সোনা বাঁধানো শাঁখা আর শাড়ি দেওয়া হবে। হিসাব করে সেসব আলাদা গোছানো হল। লোকে বলে, দেদার রয়েছে—দেবে না কেন ? এত দিয়েও শেষ করতে পারছে কই ?

আর ওই মেয়ে তিনটে—বিশেষ করে বিয়ের কনে চম্পা। বিদেশ-বিভুঁয়ে ছিল বলে

এই অঞ্চলের মত নয়—লজ্জাশরম কম। ভাল ঘর-বরে যাচ্ছে, সে আনন্দ উপছে পড়ছে হাসিখুশিতে। তিন বোনে বাড়িময় কী কাণ্ড যে করে বেড়াত!

ডাক্তারবাবু বললেন, সাহেব-গিন্নির বাতের অসুখ এই সময়টা বেড়ে ওঠায় হামেশাই আমায় গোলবাড়ি আসতে হত। কী যে করে মেয়েগুলো, কেমন করে তার বর্ণনা দিই। এ ওকে তাড়া করছে, ছুটোছুটি, ধুপধাপ সিঁড়ি ভাঙছে, তার মধ্যে এক কলি গান গেয়ে উঠল বা হঠাৎ। খিড়কি-পুকুরে গা ধুতে গিয়ে এক প্রহর অবধি জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে। সাহেব-গিন্নি ঝি পাঠিয়ে ডাকাডাকি করছেন, তা কেউ কানে নেবে না। বকশিশের ব্যাপার হলে সিকি-দুয়ানি এমন কি পুরো টাকাও ছুঁড়ে দিচ্ছে কথায় কথায়। ফকির-বোষ্টমকে তামার পয়সা দেয় না—বারকোশ-ভরা চাল, চালের উপরে রুপোর টাকা। ম্যাজিক-বাক্সে ছবি দেখাতে এসেছে, দু-পয়সা করে নেয়। যত ছেলেপুলে ভিড় করছে, তারের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চম্পা লোকটার সামনে টাকা ছুঁড়ে দেয়ঃ ছবি সকলকে দেখিয়ে দাও। কেউ বাদ যাবে না। লাগে তো আরও টাকা দেব।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল হঠাৎ! উজ্জ্বল দিনমান মেঘে ঢেকে অন্ধকার হলে যেমনটা হয়। চতুর্দিকে দাঙ্গার খবর। সে যাই হোক, বিরাটগড়ে গোলমাল হবে না—সবাই পাড়া-প্রতিবেশী, এ জায়গায় ঝামেলার মানুষ কোথা? শুভকর্ম চুকে গেলে গাঁ-অঞ্চলে আর নয়, গোলবাড়িতে আগের মত তালা ঝুলিয়ে সবসুদ্ধ কলকাতায় গিয়ে উঠবেন। জবা-যূথীয়ের বিয়ে সেখানে। মাখন মিত্তির বাড়িও একটা ঠিকঠাক করেছে, কথাবার্তা বলে টাকা দিয়ে বায়না করে এসেছে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজের মারফতে সেই কলকাতার খবর পাওয়া গেল। ভাগ্যিস যাওয়া হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে যেটা সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে জানি, সেখানেই বেশি গোলমাল। দুনিয়ায় পা রেখে চলা দায়। কলকাতায় ভাগ্যিস তাঁরা যান নি—কলকাতায় না গিয়ে বরঞ্চ ভিন্ন দিকে সুন্দরবনের জঙ্গলে যাওয়া ভাল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মানুষের মতন অত হিংস্র নয়।

কিন্তু কী কাণ্ড! কলকাতার হাওয়া এদিকেও যে ধেয়ে আসে। ঘূর্ণিঝড়—চারিদিক ওলটপালট হয়ে মানুষজন কে কোথায় ছিটকে পড়ে। মানুষ আজব জীব। আজকে গলায় গলায় ভাব, দশ মিনিটের অদর্শনে বুকের ভিতরে মোচড় মারে—সকালবেলা উঠে হয়তো দেখব, ছোরা উঁচিয়ে তেড়ে আসছে তারা পরস্পরের দিকে। হাবাগবা মানুষটি—যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়, হঠাৎ দেখতে পাই ফটাফট আওয়াজে হাল-আমলের বেঁটে-বন্দুক ছুঁড়ে সে মানুষের পর মানুষ ঘায়েল করছে! কোথায় পায় বন্দুক, বন্দুক চালাতে শিখলই বা কবে, খোদায় মালুম? মানুষকে বিশ্বাস নেই ভায়া। সাপ-বাঘ-কুমির সবাইকে বিশ্বাস করবেন—মানুষ কিছুতে নয়।

বিরাটগড়ে তখন থানা হয় নি। সদর থানার অধীনে এ জায়গা। অরাজক অবস্থা, কে কার খবর রাখে? খবর পেলেই বা কী! পুলিশেরও পৈতৃক প্রাণের মায়া আছে।

খবর গড়াতে গড়াতে দিন দশেক পরে কলকাতা পেঁছে গেল। রোমহর্ষক বলে খবরের কাগজে লেখালেখি চলল বেশ কিছুদিন। দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের টনক নড়ল অবশেষে। বন্দুক সহ পুলিসের একটা মাঝারি দল গ্রামের উপর আস্তানা গাড়ল। তখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যারা নাটের গুরু, ধরা দেবার প্রত্যাশায় তারা চুপচাপ এতদিন বসে থাকে না; কোন মুলুকে সরে গিয়ে আবার কোন নতুন ফিকিরে আছে।

কিন্তু কাজ দেখাতে হবে—ইটেভিটে-শূন্য গোবেচারা গোটাকতক ধরে ধরে চালান দিল। সাহস পেয়ে পুরানো বাসিন্দাদের দু-চার জন ফিরে আসছে। দয়ালহরি হোড়ও ফিরল। গোলমালের মুখে ঠিক সময়টিতে সরে পড়েছিল। আগে থেকে টের পেয়ে সড়াক করে পাঁকাল মাছের মত পিছলে গেল। লাবণ্যর পিঠে একটা ছেলে হয়ে মারা যায়। তারপর অনেকদিন দয়ালহরির স্ত্রীর আর কিছু হয় নি। সংসারে তিনি আর দয়ালহরি। আর লাবণ্য তো কলকাতায়। তাহলে অথর্ব পঙ্গু মানুষ—মুশকিল হল বড়বউকে নিয়ে। দয়ালহরি চেষ্টা করেছিল তাকে সুদ্ধ নৌকোয় তুলে নেবার! কিন্তু অতখানি ব্যবস্থা করার ফুরসত হল না। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এই নীতিতে একলা বেরিয়ে পড়ল তখন। আর কী আশ্চর্য, হোড়ের ঘরবাড়ি গোলবাড়ির এত কাছে, অথচ ওদিকটা কেউ উঁকি দিয়েও দেখে নি। বড়বউকে ক'টা দিন উপোস দিতে হয়েছিল, এইমাত্র। তা ছাড়া আর কিছু হয় নি। দয়ালহরি ফিরে এসে ঠিক সমস্ত পেয়ে গেল।

তামাক এনে দিল এই সময়টা। ফড়-ফড় করে গোটা দুই টান দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, গাঁয়ের পুরানো বাসিন্দা অনেকেই কিন্তু ফিরল না। আজও ফেরে নি। খুব সম্ভব দুনিয়ার উপরেই নেই। মাখন মিস্ত্রিরের কথা হত সেই সময়। তালেবর লোক, গিয়েছিল দাঙ্গার মাতব্বরদের কাছে—পুলিস তাই অনেক খোঁজা-খুঁজি করল। মিস্ত্রিরকেও শেষ করে দিয়েছে, এই রকম ধরে নেওয়া হল। আমি বললাম, হতে পারে না। কলির প্রহ্লাদ—ওকে কাটতে পারে, এমন অস্ত্র আজও তৈরী হয় নি। তাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। আমার বরঞ্চ মনে হয়, গোলবাড়ির হাঙ্গামাটা তারই চক্রান্ত। সাহেবকর্তা প্রাণের দায়ে দু-হাতে টাকা ঢেলেছেন—তাঁরা বেঁচে থাকলে পরে কোনদিন কৈফিয়তের ভাগী হতে হবে, মরে গেলে মিস্ত্রির একেবারে নিরঙ্কুশ। নইলে বুঝে দেখ, ছাতের কাছাকাছি ধিড়িঙ্গে আমগাছ—সেই গাছে চড়বে বলে অতদূর থেকে মই এনেছে নৌকায় করে। দড়ি নিয়ে এসেছে, গাছের ডালে বেঁধে ঝুলে খেয়ে ছাতের উপর পড়বে। আগে থাকতে ভেবেচিন্তে প্যান করা। নয়তো গোলবাড়ি ঢুকে পড়া সহজ হত না। ক-মিনিটের মধ্যে তিন-চারটে ঘায়েল হয়েছিল সাহেব-কর্তার বন্দুকে। অদ্ভুত টিপ ছিল তার।

ডাক্তারবাবু চোখ বুজে হুঁকো টানতে লাগলেন। চুপচাপ। ধোঁয়া কুণ্ডলী হয়ে উঠল। শেষ টান টেনে হুঁকো নামিয়ে রেখে আবার বলতে লাগলেন, বিকেলবেলাটা হোড়মশায় আমায় এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, গোলবাড়ির ছাতে মড়া পচছে এখনও। সেই তিন বোন—

সে কী?

ডালের নীচে বলেই শকুন পড়ে নি, শকুনে দেখতে পায় নি। কিন্তু মড়ার একটা ব্যবস্থা করা ত চাই। চলুন।

কেন জানি নে, চিলেকোঠার পাশে কোণের দিকটায় কারও নজর পড়ে নি। বাড়ির মধ্যে গেছেই বা কটা মানুষ। অতগুলো খুনের পর গ্রামের কেউ ভয়ে ও-মুখো হত না। এমন কি, বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েও হাঁটত না কেউ পারতপক্ষে। দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকালেই বুক ধড়াস-ধড়াস করত। কত বছর হয়ে গেছে ভায়া, এখনও লোকের ষোলআনা ভয় ভাঙে নি।

মেয়ে তিনটে ডাক্তার-কাকা বলে ডাকত আমায়, আনন্দের প্রতিমা। হাসি ছাড়া মুখ দেখি নি। তাদের কথা শুনে থাকতে পারলাম না। ছাতের উপরে মোটা মোটা

আমের ডাল ঝুঁকে এসে পড়েছে, সেই ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় পড়ে আছে তিন বোন। বারো-চোদ্দ দিন হয়ে গেছে, বিষম দুর্গন্ধ, মাছি ভনভন করছে। নাকে কাপড় দিয়ে কাছে যেতে হল। কী বলব ভায়া, আজও যেন চোখের উপর দেখতে পাই। আকাশমুখো মুখ—তিনজনের আলাদা আলাদা তিন চেহারা। চম্পা হাসছে। চাপ চাপ রক্ত জমে ছড়ানো চুলে জটা বেঁধেছে, বুকের কাপড়ের উপর জমাট কালো রক্ত—এতবার ছোরা মেরেছে, মুখের হাসি তবু মুছে দিতে পারে নি। আবার জবাটা ছিল ভারি চঞ্চল, দুড়দাড় ছুটে বেড়াত। দু-পাটি উলঙ্গ দাঁত, চোখ বোজা—মনে হল দাঁত বের করে আততায়ীকে ভেংচি কাটছিল মৃত্যুর সময়টা। জবার গা ঘেঁষে যূঁই। বড্ড ভয়কাতুরে, দিনমানেও একলা ঘরে থাকতে পারত না, জবা খুব ক্ষেপাত তাই নিয়ে। আমরাও ঠাট্টা-তামাশা করতাম। আহা, বড্ড কেঁদেছিল মেয়েটা—চোখের পাতা ভিজে আছে বুঝি এখনও, কোঁচার খুঁটে জল মুছে দিতে ইচ্ছে করে। তখন ঘোর হয়ে গেছে। আমি আর দয়ালহরি ছাতের কার্নিসের উপর দিয়ে একটা একটা করে নীচের আমতলায় ফেলে দিলাম তিনজনকে! শব্দ করে পড়ল ভারী আসবাবপত্রের মতন। টানতে টানতে সেখান থেকে গাঙের খোলে। বিয়ে হয়ে বাজনা বাজিয়ে ওই গাঙের উপর দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা, তা গাঙের জলেই ফেলে দিলাম তাদের। মানুষ কোথা পাই তখনকার সময়ে, এর বেশী আর কিছু করার উপায় ছিল না।

এক রোগী এসে পড়ায় ডাক্তারবাবুর গল্পে ছেদ পড়ল। আমিও সইতে পারছিলাম না। রক্ষে পেয়ে গেলাম।

আমার বিয়ে হল। এক রকম জিনিস আছে—দীপক-বাজি। অথবা সরা-বাজি। সকলের অবস্থা সমান নয়, বাজি-বাজনা সব বিয়েয় হয় না। কিন্তু নিতান্ত অপারগ না হলে কয়েকটা দীপকের জোগাড় করবেই। বাজিকর লাগে না, নিজেরা জ্বালিয়ে ধরে শুভদৃষ্টির সময়টা। দিনমান হয়ে যায়। কড়া রোদের দিনমান নয়, অতি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোর মত। আমি দাঁড়িয়েচি জলচৌকির উপর, মাথার উপরে চাদর ঢাকা দিয়েছে। কনে পিঁড়িতে বসিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে উঁচু করে তুলে ধরল সেই চাদরের নীচে। কনের মাথায় ঘোমটা সরিয়ে দিল। পাশ থেকে কে বলছে, চোখ খুলে ভাল করে দেখে নাও এই শুভক্ষণে? তবে তো সুখশান্তি হবে, দুজনায় ভাব-সাব হবে। শি-ই-স-ই করে দীপক জ্বলল দু-পাশে দুটো।

ডাক্তারবাবুর গলা শুনলাম: গা-ভরা গয়নার কথা বলছিলে হোড়মশায়, সে সব কি হয়ে গেল? দু-গাছা শাঁখা পরিয়ে এমন ন্যাড়া কনে কেউ ছাদনাতলায় আনে!

দাদা বললেন, এই ভাল হয়েছে, খুব ভাল। ভাই আমার বিনি-গয়নায় পছন্দ করেছে! গয়নায় বেশী কি জৌলুষ বাড়ত?

আমি কিছু তাকিয়ে দেখি নি। লাবণ্য তাকিয়েছিল, পরে তার কাছে জানলাম। বাসরের মধ্যেই বলল, সে বুঝি ধৈর্য ধরতে পারছিল না। খরদৃষ্টিতে চেয়ে চাপা গলায় কানে কানে বলে, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজেছিলেন, চিরকাল পারবেন অমনি চোখ বুজে থাকতে।

কথা সত্যি। ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু বুজে অন্ধ হব, সমস্ত জীবন ধরে এরকম চলে না। দেখতেই হবে বউয়ের দিকে তাকিয়ে, না দেখে উপায় নেই। লাবণ্য সেটা মনে করিয়ে দিয়ে বেশী ভয় ধরিয়ে দিল। আজকে এই বাসরের রাতটুকু কাটাতে হিমসিম খাচ্ছি, কত রকম বুদ্ধি খেলাচ্ছি। যত গরিবানার বিয়েই হোক, এবাড়ি-

ওবাড়ির মেয়ে-বউ কয়েকটা এসেছে। ফলাও করে গল্প জমিয়েছি তাদের সঙ্গে। পুলকে অতিমাত্রায় ডগমগ হয়ে গেছি যেন আমি। গান গাইতে বলছি তাদের, নিজেও গাইছি। একখানা দু-খানা করে অনেকগুলো গেয়ে ফেলেছি—কান্না না এসে গানই আসছে কেবল। মেয়েদের চোখে ঘুমের ঝিমুনি, বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ছাড়ছে কে? বরকেই বাসরের মেয়েরা খোশামোদ করে—আমি উল্টো তাদের বলছি, আর একটু থেকে যান, খুব ভাল একখানা গান গাইব এইবার। গানও টেনে টেনে লম্বা করি। হাতঘড়ি দেখি, আর আগামী দিনের দিনমণির উদ্দেশে মনে মনে বলি, এই একটা দিন সূয্যিঠাকুর আগেভাগে উদয় হও, মেয়েরা উঠতে উঠতে পুবে ফরসা দিক। আমি বেঁচে যাব, সৃষ্টিও তাতে রসাতলে যাবে না।

এক সময় অবশেষ চলে গেল মেয়েরা। আমি হাই তুলছি। বড্ড ঘুম ধরেছে, এক্ষুণি যেন গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ব। গা সিরসির করছে—ওই বস্তু স্ত্রীর অধিকারে কখন চেপে এসে পড়ে এই একান্ত সান্নিধ্যের মওকায়! আরও মুশকিল, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ—বাসরের প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলবে, নেবানো অলক্ষণ। অন্ধকার অনেক ভাল, চেহারাটা স্পস্টাস্পষ্টি চোখের উপরে না থাকায় আতঙ্ক কিছু কম থাকে, যৌবনের স্পর্শের অনুভূতি দৃষ্টির বীভৎসতা কিছু মোলায়েম করে আনে। আলো থাকলে সেটা হয় না। আলোকিত বাসরে কোন্ কৌশলে সকাল অবধি কাটাব ভেবে দিশা পাই নে।

বড় একটা হাই তুলে উল্টো দিকে ফিরে ঘুমের ভান করি। লাবণ্য খলখল করে হেসে ওঠে। পাতা পাতা কবিতা লিখেছি, অতএব কল্পনার দৌড় আপনাদের দশ জনের চেয়ে নিশ্চয় আমার অনেক বেশী। কিন্তু মানুষীর অমন হাসি কল্পনার চোদ্দ-পুরুষের আন্দাজে আসে না। বলে, মুখ কিরিয়ে শুলেন, আমার বুঝি মুখ দেখবেন না? আমি যদি এখন ওপাশে চলে যাই? কিংবা জোর করে আপনার মুখ টেনে ফেরাই এদিকে? বসন্ত চোখের ঢেলা গেলে দিয়েছে, কিন্তু হাত নুলো করে নি।

বলে একেবারে গায়ে লেপটে পড়ল। বাঁ হাতটা ফেলে দিল বুকের উপর। কী ভারী, বিশমণি পাথর একখানা দড়াম করে যেন আছড়ে মারল। দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। স্ত্রীলোক এবং যুবতীও। আমার মনে হল, বোড়া সাপে পাকে পাকে বেড় দিয়েছে আমায়। দম আটকে মারবে।

আর কী উৎকট আওয়াজ এই সময়টা রান্নাঘরের দিকে। গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং, বর্ষারাতে ব্যাং ডাকে যেমন। একবার বা মনে হয়, ধুনুরিরা তুলো ধুনছে—টং টং ঘ্যাস ঘ্যাস।

দয়ালহরির গলা পাই: আজকের রাতটা ক্ষমা দাও বড়বউ। জামাই-মেয়ে ও ঘরে। কাল থেকে আবার লেগো। ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে যখন পথে গিয়ে দাঁড়াব, সেই সময়টা খুব কাজ দেবে। ডবল করে লেগে যেও তখন।

পথে দাঁড়াবার কথা হচ্ছে, তার মানে দেনার টাকা শোধ হবার আশা নেই। এটা আমি সেই দিনই বুঝেছিলাম। পারলেও দেবেন না টাকা। ভাঁওতা দিয়ে একটা মাসের সময় নেওয়া নতুন কোন মতলব খাটাবার জন্য।

ঘর-তক্তাপোশ আমাদের বাসরের জন্য ছেড়ে দিয়ে ওঁরা আজকে রান্নাঘরে শুয়েছেন। শাশুড়ির গলার আওয়াজ সেই একদিন সকালবেলা শুনেছি—নিশুতি রাত্রে এখন আলাদা বস্তু, দিনমানের সঙ্গে একেবারে মেলে না। বোধ করি, ঘুমের আবেশ জুড়ে গিয়ে গলায় এ হেন রকমারি সুর বেরুচ্ছে। পুরুষ-সিংহ বলি শ্বশুর

মশায়কে, ঘরের মধ্যে এই কান্ড নিয়ে পঁচিশ বছরে হাজার হাজার রাত কাটিয়ে আসছেন।

বলছেন মেয়েটার গতি হল, গলার বড় কাঁটাখানা নেমে গেল। এবারে তুমি কবে নামবে বলতে পার? বুড়ো হয়ে গেছি আর এখন পেরে উঠছি নে।

শাশুড়ি টেনে টেনে বলেন, তুমি গলা টিপে ধরে শেষ করে দাও। বাঁচাও আমায়। পোড়া যমরাজের দয়াধর্ম নেই। ভালটা-খেকো যম। কানা যম, চোখে দেখে না।

দয়ালহরি টিপ্পনী কাটেন: কালা যম, কানেও তো কিছু শুনতে পায় না।

জনম ধরে শ্বাস টানছি। দম বেরিয়ে যায় না একদিন। গন্ডারের চামড়ার ফুসফুস দেছে বিধাতা—ফুটোফাটা হয় না রে। দাঙ্গায় কত গাঁ-এর উচ্ছন্ন হল, কত লোক মরল—একলা মানুষ আমি বাড়ি আগলে রইলাম, কোন হাড় হাবাতে এগিয়ে এল না।

দয়ালহরির পুনশ্চ রসিকতা: এসেছিল হয়তো। গলার বাজনা শুনে ভয় পেয়ে পালাল। কত রকমের সুর বেরোয়, নিজে তা বুঝতে পার না বড়বউ। বাইরের লোকে বোঝে। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। আর ওই জামাই হতভাগা বুঝতে পারছে।

দাম্পত্য রসালাপ। পঁচিশ বছর ধরে এই ব্যাপার চলছে। জামাই মানুষ আমার পক্ষে শোনা অনুচিত। কিন্তু উত্তাল বাদ্যভান্ডারের সঙ্গে গানের কথার মত আপনি কানে ঢুকছে। কী করি—চোখবুজে পড়ে আছি, কানের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দিই নাকি?

হঠাৎ দয়ালহরি হাহাকার করে উঠলেন: ভুল হয়েছিল বড়বউ। বড্ড ভুল করেছি সেই সময়টা পালিয়ে গিয়ে। তুমি বাতিল পঙ্গু মেয়েমানুষ একলা পড়ে আছ—জানে, টাকা-পয়সা মালপত্তর নিয়ে আমি সরে পড়েছি, হেলা করে সেইজন্যে এল না। আমি থাকলে আসত, নির্ঘাত সাবাড় করত। মুক্তি পেয়ে যেতাম—পোড়া দেহ বয়ে বেড়াতে হত না।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যম ডাকছেন, দাঙ্গাবাজদের ডেকে ডেকে মুক্তি চাইছেন। অথচ কত সহজ মরা! বিধাতা-পুরুষ বলে সত্যি যদি কেউ থাকেন—যেমন তিনি জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েছেন, রেহাই পাবার উপায়ও দিয়েছেন অজস্র। অতএব কায়দা হাতের কাছে থাকতে মানুষ বাঁচার ঝামেলায় যায় কেন? আলস্য, অথবা গতানুগতিকতার মোহ। আর এক হতে পারে, মরার পরের অবস্থা জানা নেই বলেই ভয় পায় কাপুরুষের দল। লাবণ্যর সেদিনের কথাগুলোই ঘুরিয়ে বলা যায়, ভাল কিছু না পেলেও ক্ষতি নেই। বেঁচেবর্তে থেকে যে রকমটা আছি, তার চেয়ে কখনও খারাপ হতে পারে না। আর কিছু না হোক, জায়গা বদল হবে।

লাবণ্য দেখি খুকখুক করে হাসছে। আমার গায়ে খোঁচা দেয়: কী গো, ঘুমুলেন নাকি? বাহাদুরি ঘুমের। গর্ভধারিণী মা-হলেও আমি আঁতকে আঁতকে উঠি। বাবাও ঘুমোন না একসঙ্গে এতকাল ঘর করে। নতুন লোক আপনি যেন মরে ঘুমুচ্ছেন।

পরের দিনটা কালরাত্রি। রাত্রিবেলা বর-বউয়ে দেখা হতে নেই। তবু যাই হোক নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে। মুনি-ঋষিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, ভেবেচিন্তে এই কালরাত্রির বিধান দিয়ে গেছেন। অনেক ধকলের পর একটা রাত্রির সোয়াস্তি খানিকটা সইয়ে নেওয়া। তারপর থেকে এক নাগাড়ে চলল। এক, মরে বাঁচতে পার,

যতদিন জীবন থাকে তার মধ্যে রেহাই হবে না।

বাসর থেকে বেরিয়ে ভোরবেলা মাঠ পার হয়ে গোলবাড়ি এলাম। ছুটে পালানোর মতন। মাথায় হাত দিয়ে ঝিম হয়ে আছি। হরিশ এসে দালানে খুটখাট করছে, টের পাচ্ছি সমস্ত। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। বোষ্টম গান ধরেছে বাইরের আমতলায়। সকালে এসে মাঝে মাঝে গান শুনিয়ে যায়। এই সব গ্রাম্য গান ভাল লাগে আমার। ওদের ডাকিয়ে এনে শুনি, পয়সা দিই।

মান করেছেন বিধুমুখী—

আরক্ত চোখ তুলে চেঁচিয়ে উঠি: চুপ, চুপ কর। নিকুচি করেছে তোমার বিধুমুখীর।

হরিশ ছুটে এল। গান থামিয়ে বুড়ো বোষ্টম দাঁত বের করে হাসছে: আজকে সিকি দিলে হবে না বাবা। পুরো একটা টাকা।

বেরোও—

আপনারা নিদয় হলে বাঁচব কেমনে হুজুর?

বাঁচতে কে বলছে! মর, মরে যাও—

হরিশ দুঃখিত হয়ে বলে, শুভকর্ম বলেই এসেছে। ওরা পেয়ে থাকে। এখন চলে যাও বাবাঠাকুর, হুজুরের মন ঠিক নেই।

পুকুরঘাটের ধার থেকে দাদা উঠে এলেন। জামা-জুতো পরতে পরতে বলেন, আমি চলি। কাজকর্ম যা ছিল হয়ে গেছে, আজকে ওরা আটকাবে না।

ঘাড় নিচু করে থাকি। আমার এই দাদা—বাপের মতন অভিভাবক—কথাবার্তার কোন্ মুখ আছে তাঁর কাছে? এই ক'দিনে একটা বারও বউদি কিংবা টুনুর কথা উঠল না। বউদিকে হয়তো জানতেই দেবেন না বিয়ের খবর। একা আমি পড়ে রইলাম। ফুলশয্যা বাকি এখনও। তারপর বিরাটগড় ছাড় আর চাকরিই ছেড়ে দাও, বউ ঘাড়ে নিয়ে বেরুতে হবে। এমন বউ—ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে গেলে জোঁকের মতন এঁটে থাকবে। চম্পার চালাকি, চম্পা আমার এই সর্বনাশটা করল।

সেই দিন রাত্রিবেলা চম্পা এসে হি-হি করে হাসছে: গা সাজিয়ে তোমার বউকে গয়না দেবার কথা। দিয়েছে?

মিথ্যুক বুড়ো, জুয়াচোর—

আমার রাগটা খুব উপভোগ করে, গালিগুলো মেনে নেয়। প্রসন্নমুখে ঘাড় নাড়ে, বলেছ ঠিক। হোড়মশায় ভারি শয়তান! তা হলেও নিজের মেয়েকে ফাঁকি দেবার মতলব ছিল না। কী করবে, ঝিকমিকে গয়না সব কটকটে কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরেমুক্তো কাচ। হ্যাঁ গো, সত্যি—ম্যাজিকে হয়ে গেল।

হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির দমকে কথা বেরোয় না। বলে, দয়ালহরি ঘরের মেঝেয় গয়নার বাক্স পুঁতে রেখেছিল। যে-ঘরে তোমাদের বিয়ের বাসর, সেখানে—তক্তপোশের তলায়। দুয়োরে খিল এঁটে বিয়ের আগের দিন রাত্রিবেলা খন্তা দিয়ে মেঝের মাটি খুঁড়ে ফেলল। চন্দনকাঠের বাক্স খুলে উলটেপালটে দেখে, আর কপাল থাবড়ায়। হি-হি-হি। সেই নাচুনিটা যদি দেখতে!

বিমূঢ়ের মতন চেয়ে আছি দেখে চম্পা হাসি থামাল: চোরের উপর বাটপাড়ি গো! দয়ালহরির চেয়ে ঢের বেশি ঘোড়েল মাখন মিত্তির। ওকে সে ইচ্ছামত বেচতে পারে, কিনতেও পারে। গয়না আমার— মিত্তির কলকাতা থেকে বিয়ের গয়না গড়িয়ে আনল।

বাবার কাছ থেকে পুরো দাম নিয়ে ঝুটো-জিনিস এনে দিল। জানে, বিয়ে হবে না। দাঙ্গার মাতব্বরদের সঙ্গে আগে-ভাগে বন্দোবস্তা করে এসেছে, সময় মতন তারা এসে পড়বে জানে, দু-পাঁচ দিনের ব্যাপার—তার মধ্যে গিল্টির গয়না কালো হবে না। তারপরে হাঙ্গামা যখন ঘটবে, পাথর ঠুকে গয়না যাচাইয়ের লোক পড়ে থাকবে না কেউ। জানে, আমায় মেরে ফেলবে, গয়না যার গায়ে পরবার কথা—

বলতে বলতে ফেঁদে উঠল। দশ বছরের পুরনো শোক উথলে ওঠে ছায়াময়ীর কণ্ঠে: মাথায় মারল লোহার বাড়ি, পিঠে মারল ছোরার কোপ। আমি কোনও দোষ করি নি। আশি-নব্বুই হয়ে যায় কতজনের, চুল পাকে দাঁত পড়ে, তবু তারা বেঁচে থাকে। আমি কেন বাঁচতে পারলাম না? পা বাড়িয়ে আমি কেন ছুঁতে পারি নে মাটি? হাত বাড়িয়ে কেন ধরতে পারি নে তোমায়? বিয়ের কনে চুপিচুপি গিয়ে ছাতের আলসে ধরে দাঁড়িয়েছি…

জবা যুঁই নিঃসাড়ে পাশে এসেছে। জবা বলল, বর দেখেছিস? ওই দেখ—ওই বোধ হয় বড় ছই দেওয়া নৌকোটায়। নৌকোর বহর সাজিয়ে এসেছে বিয়ে করতে!

যুঁই বলল, আলো জ্বালে নি দাঙ্গার ভয়ে। মানুষের দঙ্গল নিয়ে এসেছে। প্যাটার উপরে কত মানুষ বসে আছে ওই সারি সারি!

জবা বলল, ভয়ে পড়ে আনতে হয়। পুলিস হতে পারে। কিংবা হয়তো লেঠেল। বিশ-ত্রিশ জন এসে পড়েও যাতে কায়দা করতে না পারে।

যুঁইয়ের মনটা বড় নরম। ভিজে-ভিজে গলায় বলল, কত আলো কত বাজি-বাজনা হবে, সেখানে পুলিস মোতায়েন রেখে আঁধারে আঁধারে দিদির বিয়ে—

জবা বলল, হোক গে। এসে পড়েছে তবু ভালয় ভালয়। যা সব কাণ্ড চারিদিকে!

নৌকো লাগল ঘাটে। যে ঘাটে প্রথম তুমি এসে নামলে, মাঝি যেখান থেকে লণ্ঠন ধরে গাঁয়ে নিয়ে এল। নৌকোর মাথা পাড়ে ছুঁয়েছে, কি না-ছুঁয়েছে যাত্রীরা লাফিয়ে পড়ল। পড়েই দৌড়চ্ছে আমাদের বাড়ির দিকে।

যুঁই বলল, দৌড়য় কেন বরযাত্রীরা?

জবা বলল, বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারলে তবে সোয়াস্তি। যা কাণ্ড চারিদিকে। মনে হয়, পথেই কোনখানে তাড়া খেয়ে এসেছে।

যুঁই কেঁদে বলল, কবে যে আবার মানুষ ভাল হবে, সকলের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে আসবে!

ওদের আলো নেই দেখে মশাল নিয়ে কনেপক্ষের লোক বেরিয়েছে। এগিয়ে আনবে। মশাল কেড়ে নিয়ে তারা রে-রে-রে হুংকার দিয়ে উঠল। ঘড়াং করে সিংদরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে দরজা নেই তুমি দেখতে পাচ্ছ না, একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে। তিন বোন থরথর কাঁপছি আমরা চিলেকোঠার দেয়াল ঘেঁসে—

আর এক মেয়ে সহসা যেন বাতাসে ভেসে এসে চম্পার কাঁধে হাত বেড় দিয়ে দাঁড়াল। বলে, মিথ্যে বলবি নে চম্পা। কাঁপছিলি তুই আর যুঁই। আমার মজা লাগছিল। আলোর দুঃখ করেছিল যুঁই—বাজনাদারদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল, কত আলো হয়ে গেল লহমার মধ্যে। তোর বিয়ের মতন অত আলো কোন বিয়ের হয় না রে চম্পা।

চম্পা বলে, এমনি সময় ধুমধাপ আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, আমের ডাল থেকে মরদেরা ছাতের উপর পড়ছে। ডালে দড়ি বেঁধেছে, সেই ধরে ঝুল খেয়ে পড়ল।

পালাব, নীচে যাব, সময় দিল না। মানুষ নই যেন আমরা, ক্যাচ-ক্যাচ করে কচু, কলাগাছের উপর যেন ছোরা মারছে। আলোর বড়াই তো করলি জবা, বাসরের কথাটা বললি নে? বিয়ের বাসর ওই ছাতের উপরে রক্তের সমুদ্দুরে খেলছে। জবা যূঁইয়ের বড় সাধ ছিল বাসর জাগবার, তারা আমার পাশে পড়ে রইল।

জবা মুখ ঘুরিয়ে জাঁক করে-বলে, সে কি বরমশায় তোমার ওই কালকের একটা রাত্রির বাসর? যে বাসর সকালে হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায়? কতদিন আর কত-রাত্রি তিন বোনে পাশাপাশি পড়ে আছি বাসরে। মাছি ভনভন করে ঘাসের জায়গায়, পোকা কিলবিল করে। তারপর একদিন দেখি, তোমার শ্বশুরমশায় নাকে কাপড় জড়িয়ে বাড়ি ঢুকছে। দুয়োর-জানালা ভেঙে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বাড়ি ঢুকতে মুশকিল নেই, কাউকে এত্তেলা দিতে হয় না। একলা মানুষ চোরের মতন টিপিটিপি ঢুকে পড়ল। একেবারে দোতলায়।

চম্পা বলে, দোতলায় বাবার ঘরে দেওয়ালের সঙ্গে আলমারি গাঁথা। চোরা-আলমারি—এমনি দেখে বোঝবার জো নেই। তার ভিতরে গয়নার বাক্স। মাখন মিস্তির সমস্ত জানত, কলকাতা থেকে গয়না কিনে এনে সে-ই নিজ হাতে রেখে দিয়েছিল। তার মত আপন কে ছিল আমাদের? দয়ালহরি দোতলার ঘরে এসে সকলের আগে আলমারিটা খুলে ফেলল। তিলেক খোঁজাখুঁজি নেই, একেবারে যেন হিসাব-করা ব্যাপার।

জবা বলে আলমারির কথা কে তাকে বলল? চাবি কে দিল? বলতে পার ওগো নতুন বর? আমাদের পরম আপন সেই মাখন মিস্তির। মাখনের কাজে-কর্মে জোগাড় দিয়েছিল তোমার শ্বশুর—তাই ওই বখরা পেল। এক বাক্স ঝুটো গয়না। হি-হি-হি—।

হেসে হেটে ফেটে পড়ে জবা। চম্পা বলছে, তারপরেও দেখি সারা বাড়ি তন্নতন্ন করছে। চশমা পরে এসেছে সেদিন, একটা সুঁচ অবধি চোখে এড়ায় না। দামি জিনিসপত্র লুঠ হয়ে গেছে, পাবে আর কোন্ ছাই! ওই যে হারমোনিয়াম তুমি বাজিয়ে থাক, যূঁইয়ের হারমোনিয়াম। ওটা বয়ে নিয়ে গেল সেইদিন। তবু ভাল, ঘরের জিনিসটা আবার আমাদের ঘরে ফিরে এসেছে।

জবা বলে, ছাতে উঠে দয়ালহরি চিলেকোঠার পাশে আমাদের পেয়ে গেল শেষটা। হাঁটু ভেঙে পাশে বসে নিরিখ করে দেখে। চম্পার কম্ব-গলা ফোলা আঙুল টিপে টিপে আংটি খুলে নিল। একটা কানপাশা আমার আগেই কোথা ছিটকে গেছে, এলো খোঁপায় চাপা আছে আর একটা। ঠিক বের করেছে। জিনিসটা ভাল—শুধু একটা বলেই তোমার বউ সেটা কানে পরে নি। মুন্ডু ঘুরিয়ে হেঁচকা টানে আমার কানের নেতি ছিঁড়ে সেটা নিয়ে নিল। ছায়ার মানুষ না হলে কানের ছেঁড়াটুকু দেখাতে পারতাম।

যে প্রশ্ন কত বন্ধুর কাছে জানিয়ে রেখেছি, তাই আমার মনে এসে গেল। জিজ্ঞাসা করি, রাজ্যটা তোমাদের কী রকম বল তো? সত্যি খবর দাও। যে যায়, গিয়ে তো একেবারে বোবা হয়ে পড়ে।

জবা ঘাড় দুলিয়ে বলে, খাসা—চমৎকার। লোহার ডান্ডায় ব্যাথা লাগে না। ছোরার ঘায়ে রক্ত পড়ে না। হালকা হয়ে ভেসে বেড়াই দিব্যি।

চম্পা কিন্তু হাহাকার করে উঠেঃ না গো, না গো, কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমায়? মাংস চাই, রক্ত চাই, মাটির উপর পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতে চাই। বাতাস

হয়ে ভেসে ভেসে আর পারি নে।

এসব হল রাতের কথা—কালরাত্রির ব্যাপার। সত্যি কিংবা মিথ্যে, আমি হলপ করে বলতে পারব না স্বপ্নে আর জাগরণে গোলমাল আমার। আমি বলব সত্যি, আপনারা বলবেন স্বপ্ন। তাই তো শুনতেই হবে কাহিনীর বাকিটুকু।

রাত গিয়ে দিনমান হয়। নতুন বউ বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ি ঘর করতে এল। শ্বশুরের বাড়ি নয়। বরের অস্থায়ী বাসা—সাহেবকর্তার গোলঘর। ভুখড় মেয়ে—এসেই কেমন এক লহমার মধ্যে জেনে-বুঝে দখল করে নিল সমস্ত। ফুলশয্যা হবে, হরিশকে নিয়ে নিজেই সব ব্যবস্থা করছে। খাট ঠেলে দিল ঘরের একপাশে, মেঝের উপরে বড় করে বিছানা। শহরের মতন পয়সা ফেলে এ জায়গায় ফুল মেলে না, হরিশকে পাঠাল ফুলের যোগাড়ে। বিরাজ-বুড়ির ছাঁচতলায় দোমুখি ফুল ফুটে আছে, দুর্গাবাড়ির বাগান খুঁজলে গাঁদা মিলতে পারে, খানাখন্দে রাস্তায় পগারে সাদা, রাঙা দু-রকমের শাপলা পাওয়া যাবে। ওই হয়ে যাবে। নমো-নমো করে কাজ সারা। লোক বেশি আসছে না। এলেও মুশকিল। লাবণ্য বউ হয়ে বসল তো কে তাদের খাতির-যত্ন করে? হরিশের বউ আর পিসিকে আনবার কথা হয়েছিল, হরিশই বুঝি তুলেছিল কথাটা। আমিই চুপি চুপি মানা করে দিয়েছি: খবরদার, ঝামেলা বাড়াবি নে। টাকা-পয়সা নেই, ফুলশয্যায় সাকুল্যে পাঁচ টাকার নোট ছাড়ব একখানা, তার মধ্যেই সব। বিয়েতে শুধু মাত্র মেয়েই দিয়েছে, তা-ও ষোলআনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গওয়ালা মেয়ে নয়। খরচা পাঁচের বেশি আসে কোত্থেকে?

আমার কথা বুঝে হরিশ চুপ করে গিয়েছে। ওর কাছে এখনও প্রহেলিকা, কেন আমি ক্ষেপে গেলাম এই কন্যার জন্যে? অনেকের কাছেই। কিন্তু আমার কী জবাব? আমার জবাব কেউ মানবে না। উল্টে কেন শখ করে পাগল অপবাদ নিতে যাই?

ভেবেছিলাম, গুটি দশ-বারো মেয়ে আসবেন অন্তত পক্ষে। তা-ও নয়। পুরুষ হলে পাওয়া যেত, কিন্তু ফুলশয্যা মেয়েদের ব্যাপার। দু-একজন যাঁরা এসেছিলেন, সন্ধ্যা হতে না হতে এটা-ওটা বলে সরে পড়লেন। এত বছরেও গোলবাড়ির বিভীষিকা যায় নি। ভূতের ভয়—রাত্রি বেশি হলেই ভূত-পেত্নীর মচ্ছব লেগে যাবে বাড়ির অন্দরে। আমার ভয় আরও বেশি। মাত্র দুটো প্রাণী নিয়ে ফুলশয্যা। বাসরঘরে গানটান গেয়ে মেয়েদের আটকে রেখে তবু অনেকক্ষণ বেঁচেছিলাম, আজকে লাবণ্যর অবাধ রাজ্যপাট।

একটা টেবিল আছে ঘরের কোণে, অফিসের কিছু পুরানো ফাইল। অভিনিবেশ সহকারে তাই নিয়ে পড়েছি—পাতা ওল্টাচ্ছি, পড়ছি, লিখছি এটা-সেটা। হঠাৎ কী যেন বিষম ব্যাপার ঘটে গেছে—এই পড়া ও লেখায় তিলেক ভুলচুক হলে কাল সকালে চাকরি চলে যাবে। কিন্তু ময়লা মেখে বসে থাকলেই যমরাজ কিছু রেহাই করে না। বুঝতে পারি, আসা হল ঘরের ভিতর এইবারে। পদশব্দ পাই। ফুলশয্যার রাত, মনে পড়েছে?…বক্ষ দুরু-দুরু করেছিল আপনাদের, আকুলিবিকুলি করছিলেন বুকে তুলে নেবার জন্য। আমার ঠিক উল্টা, বুকের ধুকপুকুনিটা থেমে যাবার দাখিল। দরজা বন্ধ করল—আরে সর্বনাশ, বাইরের দরজা দালানের দরজা দু-দিকেরই। দুটো পথই বন্ধ। আসে টেবিলের দিকে—শাড়ি দেখেছি আড়চোখে চেয়ে। ঘাড় নিচু করে গভীর মনোযোগে আমি কাজে নিবিষ্ট, টেরই পাচ্ছি না আসে কি না কেউ। কাছে—

আরও কাছে। এইবারে বুঝি দু-হাত আমার গলায় বেড় দিয়ে—আপনাদের শুনতে পাই, বাহুবল্লরী কাঁধের উপর এলিয়ে ওড়ে—আমার প্রাণবায়ুটুকু বাহুর ফাঁসে শেষ করে গো এইবার ! এই পান্ডববর্জিত দেশে, হায় হায়, কেউ নেই আমার—ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা…

না, যত নির্দয় ভেবেছিলাম ততদূর নয়। হাতের বেষ্টন নয়। মালা ফেলে দিল ঝুপ করে গলায়—গাঁদাফুলের মালা। মালারচনা করে রেখেছে—জানেও দেখি সব ! সইয়ে সইয়ে দেখছে বোধ হয়—ফুলের মালা দিয়ে পরখ করছে।

এরই মধ্যে মন শক্ত করে, ফাইল ঠেলে দিলাম একপাশে। লেখার খাতা বন্ধ করেছি। মরার চাইতে মরার ভাবনায় অশান্তি বেশি। ঘাড় উঁচু করি বেপরোয়া-ভাবে। লাবণ্য সামনের চেয়ারটায় বসেছে।

হেসে উঠল হি-হি করে ঃ সাহস হল তবে তাকাতে? বউয়ের রূপ দেখছেন—প্রেম জমে আসছে, উঁ? দেখুন, নয়ন ভরে দেখে নিন।

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে আবার বলে, পুরুষ মানুষ বটে। লড়াইয়ে গেলে কেউ-কেটা হতে পারতেন। অত কী দেখেন আমার মুখে? আমার নিজের মুখ—আমি কিন্তু চেয়ে দেখতে ভরসা পাই নে। হাসপাতাল থেকে বসন্ত সেরে এসে একটা দিন শুধু আয়না দেখেছিলাম। দেখে আঁতকে উঠে আয়না ছুঁড়ে ফেললাম। আর দেখি নে সেই থেকে। আপনি তো বেশ এতক্ষণ চেয়ে আছেন, মুখ ফেরান না, থুতু ফেলেন না।

একটা কিছু বলতে হয়—তাই বললাম, ইস, সারা মুখ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

যেন ভ্রমবেশে একটা বড় গুণের কথা বাদ থেকে যাচ্ছে, এমনিভাবে লাবণ্য বলে, আর চোখ? বাঁ-চোখের মণি সাদা মার্বেলের মত—দেখতে পাচ্ছেন না? ডান চোখে হাত-চাপা দিলে অন্ধকার দুনিয়া। যা-ই বলুন, এ বাহাদুরি বিধাতাপুরুষের নয়। জন্মের সময় তিনি এতদূর দেন নি। মা শীতলার কারুকর্ম—শিল-কাটাই করে দিলেন। আপনি কলকাতার, আমিও কলকাতার—উপমাটা বুঝবেন। শিল কাটবে গো—বলে রাস্তায় রাস্তায় হাঁকে, এক বাড়িতে গিয়ে ঠুক ঠুক করে ছেনি ধরে শিল কাটতে বসে যায়, সেই ব্যাপার। বাঁ চোখের উপরে ঠোকরটা বে আন্দাজি পড়ে ঢেলা গলে গিয়ে নতুন এক বাহার খুলল।

চোখের পাতা বেশি করে মেলে উল্টানো ঢেলা ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বাকি চোখটা বিঘূর্ণিত করে কেমন কেমন তাকাচ্ছে। এত কাছাকাছি সহ্য করতে পারি নে। বড্ড ঘুম পেয়েছে—এমনি ভাবে হাই তুলে বিছানায় চলে যাই। লাবণ্যর কথা ছেদহীন চলেছে ঃ মামী দু চোখে দেখতে পারে না। চব্বিশ ঘণ্টা শত্রুটা করত। বসন্ত হয়ে ঘুটে কয়লার অন্ধকার ঘরে পড়ে ছিলাম, জানি পাঁচ সাতটা দিনের ভিতর নিমতলার গঙ্গায় গিয়ে ঠাণ্ডা হবে। মামী তা হতে দিল না, হাসপাতালে পাঠাল। আর কী আশ্চর্য, ডাক্তাররাও লাসঘরে চালান না করে সেরেসুরে গেটের বের করে দিল একদিন। ট্রেনের টিকিট কিনে পাকাপাকি গাঁয়ে পাঠাবার সময় মামী প্রাণ ভরে আশীর্বাদ দিয়ে গেল ঃ আকাশের যত তারা, পাতালের যত বালি, তত তোর পরমায়ু হোক। সকলের শত্রুতা সেধে গেল। কিন্তু যেটা চেয়েছিল, হয় কই? দুয়োরে দুয়োরে লাথি ঝাঁটা না খেয়ে উল্টে আমার ভাল ঘর-বর হয়ে গেল। মামীকে এত করে লিখলাম বিয়ের সময় আসবার জন্য। চোখে দেখে গিয়ে খাণ্ডবদাহনে জ্বলবে, জীবনে আর সোয়াস্তি পাবে না। সকল শোধ তুলে নেব ভেবেছিলাম, তা সে এলই

-না মোটে।

একটা চোখে তাকাত তাকাতে লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে উঠল। মামীকে না পেয়ে শোধ তুলে নেবার জন্য উপায় বুঝি ভেবে পেয়েছে। খাটের উপরের বালিশ এনে বিছানার মাথার দিকে রাখল। এবারে তার বালিশটা নিয়ে এসে রেখে দিল আমার বালিশের উপর। দু বালিশ পর পর রেখে হাত ঘষছে। ধুলো ময়লা ঝাড়ছে, না আদর বুলাচ্ছে বালিশের গায়ে?—পরের ব্যাপারের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

একটা কাজ করবে লাবণ্য? আমার একটা উপকার?

দেওয়াল টাঙানো বন্দুকটা নামিয়ে গুলি ভরলাম। লাবণ্য চুপচাপ দেখছে। আমিও চোখ তুলে তার দিকে দেখি এক একবার। কী ঘৃণা উপচে পড়ছে কুৎসিত মুখের ওই চোখটা দিয়ে। আমার বুকের উপর আঙুল রেখে বলি, এইবারে—এইখানটায় বন্দুকের নল বসিয়ে ট্রিগার টিপে দাও।

ঘাড় নেড়ে লাবণ্য ঝেড়ে ফেলে দেয়: আমি পারব না।

খাটনির কিছু নয়। একটা আঙুলে চেপে দেওয়া একটুখানি।

এত যদি সহজ, আপনিই করুন সেটা। আমায় কেন?

অত বড় লম্বা নল। বুকে নল রাখলে ট্রিগার অবধি হাতই পৌছবে না। পিস্তল হলে হত।

বন্দুকেও হয়। কেন হবে না, কত জনে করে থাকে। নিজে মরতে হলে নলের মুখ বুকে রাখবেন না, থুতনির নীচে রাখুন। বন্দুক খাড়া করে পা দিয়ে ট্রিগার টিপে দেবেন, ব্যাস। কাগজে পড়েছি। কায়দা বলে দিলাম, দেখুন এইবারে চেষ্টা করে।

অত্যন্ত সহজভাবে আনুপূর্বিক বুঝিয়ে দিয়ে একটু হেসে লাবণ্য বলে, আমি কেন করতে যাব? আমার তো উল্টো স্বার্থ। আমার স্বামী হবার দায় থেকে পালাতে চাইছেন, সে সুবিধা আমি কেন করে দিতে যাব বলুন?

বন্দুকের গুলি না ছেড়ে ঘুরন্ত চোখটা আমার দিকে তাক করেছে। শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তে। ফুলশয্যাতেও নাকি আলো জেলে রাখতে হয়। যে অলক্ষণ হয় হোকগে. প্রদীপ নিবিয়ে দিলাম আমি ফুঁ দিয়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি। অক্টোপাস আধখানা হাতের ভরে পিল পিল করে এগিয়ে আসে। কালো পাথরের মত ভারি অন্ধকার চারিদিক দিয়ে চেপে এসে পড়ছে। টুনুর কথা ভাবছি। যে বাবা মা ছেলে বয়সে মারা গেছেন তাঁদের কথা…

দীপ নেবানো গোলঘরে, বিশ্বাস করুন, হঠাৎ যেন ভিন্ন লোকে চলে গেলাম। সেই যেমন অসুখের সময়টা হয়েছিল। তখন আভাস মাত্র পেয়েছিলাম, আজকে কে যেন ফটক খুলে দিয়ে অন্ধকারে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। এই গোলবাড়ি, সরকারি চাকরি, বিয়ে থাওয়া, আজকের করাল ফুলশয্যায় প্যাঁচে প্যাঁচে জড়ানো লাবণ্যের দেহের শিকল—সমস্ত অবাস্তব। এতক্ষণের আতঙ্কের বোঝা তুলোর মতন লঘু হয়ে গেল। মরণেও ঠিক এই রকম—ভুক্তভোগীর কথা শুনুন, পরলোক তাত্ত্বিকের আন্দাজি গবেষণা নয়—ভয়টা যতক্ষণ মরণ এসে না পৌঁছয়। এসে পড়লে আর কিছু নেই। বিশ্ব সংসারে যা কিছু এতকাল জেনে বুঝে আছি, সমস্ত ভুয়ো। ঠিক তেমনি ভুয়ো হয়ে গেল পলকের মধ্যে লাবণ্য সহ আমার এই জীবনটা। হাসি পাচ্ছে, কী বোকা আমি—এতকাল এইসব সত্য ভেবে এসেছি!…

দয়ালহরির সাড়া পাই : কই গো, ঘুমিয়ে পড়েছ তোমরা? দেরি হয়ে গেল। দুয়োর খোল।

লাবণ্য উঠে গিয়ে আলো জেবলে দরজা খুলে দিল। শাশুড়ি ঠাকরুন বরকনের খাবার পাঠিয়েছেন। মেয়ে তো ফুলশয্যা নিয়ে থাকবে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে তাদের? খাবার তৈরী করে পাঠিয়েছেন—তাই থালায় বাটিতে রকমারি তরকারি, লুচি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরপুরিয়া, গোপালভোগ। এ সমস্ত দয়ালহরি বয়ে নিয়ে এসেছেন, আরও কত কী আছে পিছনে হরিশের হাতে। একা দয়ালহরি এত জিনিস কী করে আনেন, সন্ধ্যাবেলা তিনি হরিশকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে ও খেটেছে বড়বউয়ের সাথে-সঙ্গে।

দয়ালহরি বললেন, বড়বউ দেরি করিয়ে দিল। ভোরবেলা থেকে সে রান্নাঘরে। একটি বারও বেরোয় নি। টানটাও বড্ড বেড়েছে ক'দিন, তার উপর এই খাটনি। বলে, ক'পা হেঁটে গিয়ে মেয়ের একটু সংসার গুছিয়ে দেব, মেয়ের সুখশান্তি চোখে দেখে আসব, কিছুই তো পোড়া কপালে হল না। ফুলশয্যায় মানুষ কত রকম তত্ত্ব-তালাস করে। ঘরে বসে গতরে খেটে দু-খানা তরকারি রেঁধে দিচ্ছি শুধু।

বাধা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি : মেয়ের গা সাজিয়ে গয়না দেবেন বলেছিলেন—তার কী হল?

দয়ালহরি আকাশ থেকে পড়লেন : আমি?

জড়োয়া গয়না হীরে-মুক্তোর গাঁথা। আপনারা তো পুরানো ঘর—গয়না সাদা হয়ে থাকে, ঘরের মধ্যে মাটির নীচে পোঁতা থাকে। কী আশ্চর্য, এতজনকে ডেকে ডেকে শোনালেন, এখন যে কিছুই মনে পড়ছে না।

বাপের দিক হয়ে লাবণ্য বলে, গয়না তো গায়ে পরবার। তাতে কোন্ লাভটা হত শুনি? গয়নায় আমার ছেঁদা ছেঁদা মুখ ভরাট হত? ঢাকা পড়ত কানা বাঁ চোখটা?

হেসে উঠে বলি, খবর রাখি হোড়মশায়। সেই গয়না সমস্ত কালো হয়ে গেল। সোনা হল লোহা, হীরে-মুক্তো কাচ।

খিক খিক করে হাসতে লাগলাম, এই আমার মনে আছে। অমন কুৎসিত হাসি আমার মুখে বেরোয়, আগে কখনও জানতাম না। এখনও বিশ্বাস করি নে। আমার হাসিও নয়, আদপে, অন্য কেউ নিশ্চয় হেসে উঠেছিল আমার মুখ দিয়ে।

সে হাসি দেখে ভয় পেলেন দয়ালহরি। করুণ কণ্ঠে বলেন, দেব কোত্থেকে বাবা? নাখন মিস্তির বেইমানি করল। গ্রাস করল সব একাই। মেয়ের গয়না দেব, মেয়ের বিয়ের খরচপত্র করব, বাড়ির দেনা শুধব—সমস্ত বরবাদ। ক'টা দিন পরে—তুমি জান বাবা সমস্ত—ঘরবাড়ি ছেড়ে বড়বউ আর কাচ্চাবাচ্চার হাত ধরে পথে বেরুনো ছাড়া গতি নেই।

থামলেন একটু। তিক্ত হাসিতে সারা মুখ বীভৎস হয়ে গেল। বলছেন, মন্দ হবে না। সদরের একটা তেমাথা জায়গা দেখে রেখেছি। বড়বউয়ের হাত ধরে সেখানে নিয়ে বসিয়ে দেব। খোঁড়া মেয়েমানুষ, চেহারাখানা ওই, তার উপরে হাঁপানির টান—অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলো ঘিরে থাকবে চতুর্দিকে। ভিখারি সেজে বসতে হবে না—ভগবানই আপনা থেকে সব গুছিয়ে দিয়েছেন। তা ভেবে দেখলাম, ভালই হবে। শতেক ছ্যাচড়ামি করে যা রোজগার করি, এর চেয়ে অনেক ভাল।

আরও ভাল আছে। এর চেয়ে অনেক—অনেক ভাল।

বিমূঢ় হয়ে দয়ালহরি তাকিয়ে পড়লেন। বললাম, মরে যান না কেন একেবারে? তার চেয়ে ভাল আর নেই। এক কাজ করুন, আমায় মেরে দিন—আমি বেঁচে যাই। আর এত বড় মহৎ কাজ বৃথা যাবে না। সদাশয় সরকার বাহাদুর পিঠ পিঠ আপনাকেও মেরে পরোপকারের পুরস্কার দেবেন।

না বাবাজি, না। ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।

ভয় পাচ্ছেন? আপনার মেয়ে কিন্তু এমনধারা নয়। গুলি ভরলাম, দেখল সে চেয়ে চেয়ে। গুলি করতেও পারে। কিন্তু ভাবছে এক গুলিতে শেষ না করে দিনে-রাত্রে তিলে তিলে মারলে মজাটা বেশি। সেই জন্যে একেবারে শেষ করতে চায় না।

হাতে বন্দুক দিলাম। বলি, টিপে দিন ঘোড়াটা।

কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। অস্ফুট স্বরে বলেন, উঁ?

দেখিয়ে দিতে হবে? আচ্ছা, দিন আমায়—

যন্ত্রচালিতের মত বন্দুক ফিরিয়ে দিলেন আমার হাতে। তারপরে কী হল, কেমন করে হল একেবারে ঝাপসা। শুধু একটি বার দেখেছিলাম, শ্বশুর মশায় গোলঘরের রক্তাক্ত মেঝেয় গড়াচ্ছেন। বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

* * *

কত সহজ মৃত্যু! লহমার মধ্যে সমস্ত ঠাণ্ডা। কিন্তু আমায় নিয়ে বড্ড বেশি খেলাচ্ছে এরা। বিড়ালের যেমন ইঁদুর-শিকার। থাবার মধ্যে পেয়ে তারপরে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করতে দেয়। এক কামড়ে খেয়ে সুখ হয় না। ইঁদুর এদিকে-ওদিকে ছোটে, বেশি দূরে গেল তো মুখ করে কাছে নিয়ে এল। আবার ছোটে, আবার ধরে। শেষ কামড় তো আছেই। কিংবা ধরুন, ছিপে মাছ খেলানো। খেলিয়ে নিয়ে শেষ মোক্ষম টান। আমারও ঠিক তাই—ছোট-কোর্ট থেকে মেজ-কোর্ট। মেজ থেকে বড়য়। অগুন্তি সাক্ষিসাবুদ হাকিম-উকিল, দুপক্ষের জেরা-সাওয়াল, ভারি ভারি কেতাব খোলা কথায় কথায়—আর কাঠগড়ার মধ্যে সকলের থেকে আলাদা রাজাধিরাজ আমি। ক্ষণে ক্ষণে সকলে তাকায় আমার দিকে, আমায় ঘিরে যাবতীয় আয়োজন। আত্মগৌরবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। আবার লজ্জাও লাগে—নাঃ, বাড়াবাড়ি করছে সামান্য এতটুকু কাজের জন্য। খুন তো করেছি একটিমাত্র মানুষ—তা-ও দয়ালহরি হোড়, যে লোক মানুষ কিংবা জন্তু তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আর যাঁরা এক সঙ্গে হাজার হাজার সাবাড় করেছেন, তাঁদের তো কেউ ধর্মাধিকরণে নিয়ে এসে খাতির জমায় না। লড়াইয়ের ইয়োরোপ একটিবার দেখে আসুন। আমারও বন্ধুর মুখে শোনা অবশ্য। এ বাড়িতে তিন-শ মরেছে, ওই মাঠে সাত-শ, এই শহরে চল্লিশ হাজার। মানুষ, না ছারপোকা! ছারপোকাও এক-একবারে অতগুলো করে মারা যায় না। সেই কাজ করে ফেলেন তাঁরা চক্ষের পলকে। কিংবা স্বদেশেও দেখেছিলেন সেই দাঙ্গার সময়টা। কলা-মুলোর মত কী রকম মানুষ কাটে। এক গোলবাড়িতেই কতগুলো গেল হিসাব করুন। সেই বীরবর্গের তুলনায় নিতান্ত কীটস্য কীট—আমায় নিয়ে ধুমধাম কেন।

বউদি দেখা করতে এলেন বিকেলবেলা। টুনুও আছে। রোজ আসছেন। দেখাশুনোর নিয়মকানুন শিথিল করে দিয়েছে ক'দিন থেকে, খাতিরটা বড্ড বেড়েছে। কলকাতা থেকে এসে ছোট্ট এক বাসা নিয়ে আছেন ওঁরা। সাবরেজিস্ট্রার হয়ে এই জায়গায় শিক্ষানবিশি করে গেছি মাস দুয়েক—চেনা জায়গা। ওঁদের বাসা চোখে দেখে যেতে পারলাম না, কিন্তু দীঘির পাড়ে জিমনাস্টিক-মাঠের পাশে—জায়গাটা বুঝতে পারছি।

আর কি বউদি, ঝামেলা মিটে এল এইবারে। কাল-পরশরে মধ্যে বাসা ছেড়ে দিয়ে সবসন্ধ আবার কলকাতায় ফিরতে পারবে। পরশ নয়, খুব সম্ভব কালই। কাল আর তোমাদের দেখা করতে আসতে হবে না; সেল তখন ফাঁকা। বাড়িওয়ালাকে বলে রেখেছ, বাসা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছ তোমরা?

বউদির দু-চোখ রাঙা। কেঁদে কেঁদে রাঙা করেছেন। আমার কথায় আবার তাঁর চোখ ভরে গেল। মাথার কাপড় লম্বা ক'রে টেনে দিলেন, সেকালে লজ্জাবতী বউরা যেমন করত। এখন অবশ্য লজ্জার কারণে নয়, ভয়। আমার জন্যে ভয় কতকটা আছে—কান্না দেখলে আকুল হয়ে পড়ব, এইরকম হয়তো ভাবছেন। কিন্তু ভয় বেশি টুনুকে নিয়ে। প্রথমটা সে ডুকরে কেঁদে উঠবে, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে সারাক্ষণ! ছেলের এখন বোঝবার বুদ্ধি হয়েছে। বউদির কান্না দেখে প্রথম দিন সেকি কান্ড—টুনুকে থামনো যায় না, ছটফট করে কাটা-কবুতরের মত: কাকামণি যাব, কাকু তুমি ওখানে কেন, বাইরে চলে এস। আমি কোলে উঠব। বউদি চোখ মুছে ফেললেন তাড়াতাড়ি, আর আমি বিষম আনন্দে হো হো করে হাসি। ছেলে শান্ত হয় না। সেদিন থেকে বউদি টুনুর সামনে কিছুতে চোখের জল ফেলেন না। কী রকম মজা হয়েছে—যা-ই কিছু আমি বলি, কাঁদবার জো নেই। দৈবাৎ জল এসে গেলে চোখ ঢেকে ফেলতে হবে। টুনুর ডাগর চক্ষু-তারকা দুটো পাহারা দিয়ে ঘুরছে। আমার হাসি দেখে টুনু হাসে, কিন্তু তখনও মায়ের মুখে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মুখ আঁধার কি না, মায়ের চোখে জলের চিহ্ন কিনা।

কতদিন কাকামণি তোমার কাছে যাই নি, বল তো? কতদিন কাছে শুই নি, এক সঙ্গে বেড়াই নি?

তুমি বড় হয়েছ কিনা টুনুমণি, ভারিক্কি হয়েছ। বড় হয়ে গিয়ে তুমিও আগের মতন করে হাসতে পার না।

খিলখিল খিলখিল উইল জলস্রোতের হাসি হাসত। ঠোঁটে মুখে পড়ে গেছে—ঝিরঝিরে একটু-একটু হাসি এখন। মনের দুঃখটা গোপনে বলি আপনাদের—টুনুকে বুকে নিতে পারি নে, কাঁধে তুলতে পারিনে—সাদা রঙ-করা কঠিন গরাদ আমাদের মাঝে। আমারও এখনকার একটি মাত্র দুঃখ এই।

কত রকমের খাবার করে নিয়ে আসেন বউদি। বাড়ির বানানো, দোকানেরও একটা দুটো। মনে গেঁথে রেখেছেন—কোন্ কোন্ বস্তু আমার পছন্দ কোনটা তার মধ্যে খাওয়া হয় নি অনেকদিন। আইন হঠাৎ আজ বড্ড বেশি সদয়। আর একটা ব্যাপার ঠাহর হল—পাশের দোতলা ওয়ার্ডে উপরের ঘরগুলো খালি করে ফেলেছে। বছরে বারকয়েক শুনেছি ঘটে থাকে এমনি—দোতলার যত কয়েদি ভূতলে নামিয়ে দেয়। নিয়ম হল, ফাঁসির তারিখ আগে বলবে না। মাত্র আসামী জানবে ঘণ্টা করেক আগে। কিন্তু চোখ দুটো নিতান্ত অন্ধ না হলে জানতে কিছু আটকায় না। দোতলা থেকে ফাঁসির জায়গা দেখা যায়। দোতলা খালি করে দিল—তার মানে তুমি যে জানলা খুলে নিখরচায় মজা দেখবে, সেটা হচ্ছে না। অতএব অনুমান করা যায়, মজাটা জমবে আজকেই। রাত্রিবেলা ক্ষেপে ক্ষেপে কর্মকর্তারা উদয় হবেন যথানিয়মে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে ইংরেজি ও বাংলায় ভাল করে সমঝে দিয়ে যাবেন, আমায় ফাঁসিতে ঝোলানো হবে যতক্ষণ না মৃত্যু হচ্ছে। মাইনে-করা ঠাকুরমশায় উত্তম উত্তম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শোনাবেন বলির পাঁঠার কানে পরুতের মন্ত্র শোনাবার মত। শেষ-

রাত্রে এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে, স্নান করিয়ে নতুন পোষাক পরাবে। বলির পাঁঠাকেও হাড়িকাঠে দেবার আগে স্নান করানোর বিধি। বলিদানের ব্যাপার দেখেই বোধ হয় এই সব নিয়ম হয়েছে। কী সমারোহ তারপরে! জহ্লাদ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জেলখানার কেষ্টবিষ্টু সবাই চলে এসেছে—বন্দুক তুলে সারবন্দী এ-ও একরকম গার্ড-অব-অনার। এমন একটা ব্যাপার কি ওই সব চোর পকেটমার ছ্যাঁচড়া কয়েদিগুলোকে দেখতে দেবে? দেখতে চাও, নিজে ভারিক্কি রকমের কিছু করে আদালতের বেড়াগুলো ডিঙিয়ে চলে এস ফাঁসি সেলে। দু-চোখ ভরে নিজের উপর দিয়ে দেখো তখন।

যাকগে, যাকগে। খাওয়াচ্ছেন আমায় বউদি। নাছোড়বান্দা হয়ে বড্ড বেশি খাওয়াচ্ছেন। বাটি থেকে একটা একটা করে তুলে দিচ্ছেন হাতে। মালপো ক'খানা। মনে আছে বউদি, নতুন বউ এসে পাকপ্রণালী পড়ে তুমি মালপো বানিয়েছিল? হাসিঠাট্টা করল সকলে, তোমার সেই মালপো খাওয়ার মানুষ মেলে না। একেবারে ক্ষেপে গেলে তুমি—কতবার জিনিসপত্র নষ্ট করে এটা-ওটা যোগ করে পরিমাণ কম-বেশি করে শেষটা যে বস্তু উতরাল, ভুবনে তার জুড়ি নেই। আজকে যা খাইয়ে গেলে বউদি, এক মাস এর স্বাদ লেগে থাকবে মুখে।

দাদা আর লাবণ্য আসছে। দাদা, মনে হচ্ছে বেশ পছন্দ করে ফেলেছেন লাবণ্যকে। গেট অবধি এসে মনে পড়ে গেল—দুজনে আবার বেরিয়ে গেলেন সেন্ট কিনতে। ভাল হল। সেন্টের শিশি সময় থাকতে যদি হাতে পেঁছয়, আমার নতুন পোশাকটায় সেন্ট মেখে কিঞ্চিৎ বাবুয়ানা করা যাবে।

লাবণ্য বউদির পাশে এসে দাঁড়ল। বউদি, জায়ের বড় সাধ ছিল তোমার। সারা কলকাতা মেয়ে দেখে দেখে বেড়িয়েছ। দুই জারে সাধ মিটিয়ে সংসার কর এখন। লাবণ্য সিঁথির উপর চওড়া করে সিঁদুর টেনেছে। চুলে ঢাকা পড়ে গিয়ে পাছে আমার নজরে না আসে। অথবা পরে আর পরতে পাবে না—আক্রোশ ভরে বেশি করে পরে আমায় দেখাচ্ছে। বিরাটগড় থেকে এইখানে লাবণ্যকে আনিয়েছেন, সকলে এক বাসায় আছেন। নীচের কোর্ট থেকেই লাবণ্য যতদূর পারে আমার সঙ্গে শত্রুতা সেধেছে। পরিষ্কার মিছে কথা বলল, ঈশ্বরের নাম নিয়ে হলপ করে বলল, দয়াল-হরিকে আমি মারি নি। কে মেরেছে তা সে জানে না। জানালা থেকে গুলি এসে বিঁধল। পাটোয়ারি লোক, টৌনির ব্যবসা, সম্পত্তি ও টাকাকড়ি ঠকানোর ব্যাপারে কত লোকের আক্রোশ রয়েছে—কে মেরে ফেলেছে কে জানে? করুণার্দ্র হয়ে নিজে উপযাচক হয়ে আমি তাঁর মেয়ে বিয়ে করেছি, হঠাৎ কী কারণ ঘটতে পারে ফুলশয্যার সময়ে শ্বশুরকে খুন করার? সরকারি উকিলের ধমক খেয়েও লাবণ্য ভড়কে যায় নি একটুকু। সাংঘাতিক মেয়ে—বেঁচেবর্তে থাকে তো বাপকে ছাড়িয়ে যাবে ফেরেব্বাজিতে। ধমক খেয়ে আরও জোর দিয়ে বলল, হরিশ আর বাবা খাবার নিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে, আমি আসন পাতছি—ঠিক সেই সময় খোলা দরজার বাইরে দুম করে আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার লুটিয়ে পড়লেন। বাবার খুন নিয়ে মিথ্যে বলতে পারি আমি?

এই সব বলছে, তার মধ্যে মধ্যে অলক্ষ্যে আমার দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হেসে নিল একবার। কাঠগড়ায় আমার চুল অবধি খাড়া। কথার চেয়েও লাবণ্যের হাসির মানে প্রাঞ্জল। হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে তো সরে পড়তে দেবে না—তারই প্রাণপণ চেষ্টা। প্রায় পৌরাণিক সাবিত্রী—যমের মুখ অবধি স্বামীকে তাড়া করে ফিরছে। কী বিপদ বুঝে দেখুন হতভাগা স্বামীর—মরে গেছি, তা সত্ত্বেও বউ বাঁদের গলকম্বলের

মত জ্বলতে জ্বলতে চলল। নিজে তো অপদার্থ ভীতু মেয়ে! বিষ খায় নি, জলে ঝাঁপ দেয় নি, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে নি—কিছুই করতে পারল না। আমি যে সাহস করে ওই সব আদিম পন্থা না নিয়ে খবরের কাগজে নাম উঠিয়ে ধুমধাড়াক্কা করে চলে যাচ্ছি, শতেক রকমে তার বাগড়া দিয়েছে। জজের মুখোমুখি বুক চিতিয়ে আমি বললাম, দয়ালহরি চতুর মানুষ। আইন দিয়ে কোনদিন তোমরা ছুঁতে পারতে না। যারা আইন করে তাদের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধি রাখে সে। তোমাদের কাজটা আমি সোজাসুজি সেরে দিলাম। হেন স্বীকারোক্তির পরেও আমার উকিল হাল ছাড়ে না। বলে, আসামির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বদ্ধ উন্মাদ। ডাক্তার দেখিয়ে পাগলা-গারদে রাখতে হবে। এই সব। কাণ্ড দেখুন দিকি! শত্রুতায় কেউ এরা কম যায় না।

টুনু হাত বাড়াল গারদের ভিতর দিয়ে। তুলতুলে হাত মুঠোয় ভরে নিই। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় টুনু. কিন্তু হবে কী করে? গরাদগুলো রাক্ষসের দাঁত—সাদা সাদা লম্বা দাঁত মেলে রাক্ষস হাঁ করে রয়েছে। বড্ড ভয় টুনুমণি, তুমি সরে যাও। রাত হয়েছে—রাক্ষসেরা বাঘেরা ভূতেরা পুলিসেরা এবারে সব রোঁদে বেরুবে। বাড়ি চলে যাও সকলে তোমরা।

বললে হয়তো ব্যবস্থা করে দিত। টুনুকে ভিতরে নিয়ে এসে, কিংবা যেমন ভাবে হোক বুকে তুলতে দিতো আমায় একবার। জেলর বড় ভাল লোক। ডাক্তারবাবু ভাল। সব মানুষই ভাল, সকলেই বড্ড আপন আজকে। ভালবাসার চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সব অপ্রীতি মুছে গেল যেন রাতারাতি। হঠাৎ রাজাধিরাজ হয়ে গেছি। জল খাব বলে হাত তুলেছিলাম, ছুটোছুটি করে ঝকঝকে মাজা ফেলোয় জল এনে দিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিজ্ঞাসা করেন, কী ইচ্ছে তোমার, কোন্ জিনিসটা চাই বল? যার মুখে তাকাই, মনে হয় চোখ ছলছল করছে। কেন হে, ব্যাপারটা কী? সম্ভ্রম—বীরপুজা? তোমরা পার না, আমি এই কেমন ড্যাংড্যাং করে চলে যাচ্ছি? আর এক হতে পারে—বড় চাকরি নিয়ে চাকরিস্থলে চলেছি, কানে শুনতে পেয়ে পরম শত্রুও যেমন ভালবাসায় গদগদ হয়ে ওঠে। চলে যাচ্ছি—খাতির সেই জন্যে। যদি বলি, না ভাই, যাওয়াটা বাতিল হল শেষ অবধি—অর্থাৎ আমি দয়া-ভিক্ষা না চাওয়া সত্ত্বেও দিল্লি থেকে মার্জনার টেলিগ্রাম এসে পড়ল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সকলের নিজ মূর্তি বেরিয়ে পড়বে। কুটুম্বরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে, আপদবালাই বিদায় হয় না কেন? আবার জামাটা যে-ই সত্যি সত্যি গায়ে চড়িয়েছি, দেখতে পাবেন, খাতির করে পান সেজে এনে মুখের কাছে ধরছে। তেমনি ব্যাপার।

দিগন্ত অন্ধকারে ওঁরা তিনজন টুনুর হাত ধরে চলে গেলেন। আর আসবেন না। কোনদিকে একটা মানুষ দেখতে পাই নে, ওই পাষাণমূর্তির মত নিশ্চল ওয়ার্ডারটি ছাড়া। বয়ে গেল—মনের মধ্যে আর কত মানুষজনের আনাগোনা। দেখুন, মহাব্যোমে স্পুটনিক ছাড়ুন আর যাই করুন, মনের শক্তির ধারেকাছেও যেতে পারছেন না। উপমা জুড়ে ভারিক্কি করে বলে থাকেন মনোরথ—চক্ষের পলক ফেলতে যে সময় লাগে তার ভিতরে কোন্ রথ, বলুন তো এমন ধারা বেড়াতে পারে ভূত-ভবিষ্যতের হাজার-লক্ষ বছর পার হয়ে?

আমি যখন ছোট। ওই টুনুর মতন—উঁহু, টুনুর চেয়ে বড়ই হব কিছু। বাড়ির আটক মানতে চাই নে কিছুতে। ছুটে ছুটে বাইরের উঠানে যাই, উঠান পেরিয়ে

ফটকের কাছে দাঁড়াই। তবু কারও নজর পড়ল না তো ফটক পার হয়ে জাঙাল ছাড়িয়ে গুটগুট করে পা ফেলে বিলের ধারে চৌমাথা অবধি যাই। একদিন বিলেও নেমেছিলাম, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চলে আসি। এখন খুব বড় হয়ে গেছি কিনা—অজানা বুলে আজ দেখুন একটুও আর ভয় করছে না।

সেকালে আমাদের গাঁয়ের এক সন্ধ্যা। গৃহস্থবাড়ির ঘরে ঘরে দীপ দেখাচ্ছে, শাঁখ বাজছে—আজকের জেলখানার এই নিষ্কর্মা সন্ধ্যাবেলা নয়। মেঘ করেছে—আকাশের দিকে চেয়ে মাকে বারংবার বলি, বাবা কখন আসবে? এত দেরি—আসে না কেন বাবা এখনও [আচ্ছা, বাবা সেই মৃত্যুপারের দেশে ঠিক এই সময়ে মাকেও তো জিজ্ঞাসা করতে পারে: আর কত ঘুমোবে খোকা? জাগছে না কেন?]

মা প্রবোধ দিলেন, এক্ষুণি এসে যাবেন।

বৃষ্টি হবে ঝড় হবে, গাছপালা সব ভেঙে পড়বে—

তার অগেই পেঁছিবেন।

কেউ না দেখে—কেউ না টের পায়, এমনি এক নিরালা জায়গায় গিয়ে সেদিন বারংবার আমি আকাশের কাছে মাথা কুটেছিলাম ; নারায়ণ, কেষ্ট-রাধা, বাবা পাঁচপীর হে মা শীতলা, আমার বাবা এক্ষুণি ফিরে আসুক—মোটে দেরি না হয়। তোমাদের হরির লুঠ দেব।

ছোট পিসি শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় একটা সিকি হাতে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিলেন। সিকিটা সরিয়ে রেখেছি লম্বা বিস্কুটের কৌটোয় কড়ে-পুতুলগুলোর নীচে। সেই সঙ্গতির জোরেই যাবতীয় ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে খুশি করবার ভরসা রাখি।

আরও মেঘ জমেছে, ঝিলিক দিচ্ছে মেঘ চিরে চিরে। আমাদের পাড়াটা ঘিরে গড়খাই—নারায়ণকোঠা, সেই গড়খাইয়ের একেবারে কিনারে। এর উঠান ওর কানাচ দিয়ে যেতে হয়। কাঁসর-ঘণ্টা বাজে—সেই দূরের গাঁয়ে সন্ধ্যাবেলা আজকেও হয়তো বাজছে তেমনি। আসন্ন দুর্যোগে মাকে বলে বেরনো যাবে না—না বলেই তাই টিপি-টিপি চলে যাই সেখানে।

থমথম করছে চারিদিকে, হাওয়া নেই। ঠাকুরের শীতল-ভোগ হচ্ছে, ধূপ-ধুনোয় গন্ধে সহজ ভাবে দম নেওয়া দায়। এই সময়টা প্রায়ই আমি এসে সতৃষ্ণ চোখে পুজো দেখি। পুজো অন্তে প্রসাদ—অতএব ঠিক সময়টির আগে এসে পড়লে চুপচাপ শেষ অবধি দেখতেই হবে। আজ কিন্তু প্রসাদের লোভে নয়। বাবাকে এনে দাও ঠাকুর, বাবা যেন দেরি না করে! ঝড়-বাতাসে কিছু না হয় যেন আমার বাবার! ঠাকুর, রাগ না কর তো তোমার প্রসাদ অবধি দাঁড়িয়ে থাকতেও চাই নে। গাঙের ঘাটে বাবা এল কি না দেখে আসি।

ঠাকুর-দেবতারা কী জীবন্ত ছিলেন সেই আমার ছোটবেলায়! সকলের ছেলে-বেলাতেও ঠিক অমনি। সেদিন ভারি এক দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম। কেউ জানে না—শুধু নারায়ণ ঠাকুর আর আমি। এক দৌড়ে চলে গেলাম গাঙ অবধি। রাত হয়ে গেছে. মেঘভরা আকাশের নীচে ঘনকালো অন্ধকার। মানুষ নেই কোনদিকে—অন্ধকার ফুঁড়ে নজর পেঁছিয় না, আছে কি না কেউ বলাও যায় না ঠিক করে। তার উপরে কবিরাজের ভিটের কসাড় বাঁশবাগান। দল বেঁধে যেতেই দিনমানেও গা ছমছম করে। কবিরাজের নির্বংশ বাড়ির সেকালের তাঁরা সব বাঁশঝাড়ের দুর্নিরীক্ষ চূড়ায় চূড়ায় বিচরণ করেন। ছেলেমানুষ তো আমি—তখন বড্ড ভয় পেতাম। আমায় দেখে তাঁদেরও যেন টনক নড়ে ওঠে, কটর-কটর-কট এ-ঝাড়ে ও-ঝাড়ে আওয়াজ তুলে ভয়

দেখান। হঠাৎ বা একটা বাঁশ নুইয়ে নিয়ে আসেন একেবারে মাথার উপরে। দিন-দুপুরে এই অবস্থা, কিন্তু সেই রাত্রিবেলা বাবার ভাবনায় হুঁসজ্ঞান ছিল না, ছুটতে ছুটতে গাঙের ঘাটে দাঁড়াই। গাঙের উপর একটা নৌকো নেই। অশ্বত্থতলায় জলের মধ্যে ঝুরি নেমে গেছে, তার ভিতরে গোটা কয়েক ডিঙি। দুর্যোগ দেখে মুখ-লুকিয়ে যেন পালিয়ে বসে আছে।

এক মাঝি দেখতে পেয়ে বলে, বাড়ি যাও খোকা, একা-একা ঘুরছে কেন? বাতাস উঠবে।

আমার বাবা—

তোমার বাবা বুঝি নৌকোয়? তা কান্না কিসের? নৌকো কোনখানে বেঁধে রেখেছে—মেঘ কেটে গেলে ছাড়বে। তুমি ঘরে যাও, ঘরের লোক ভাবছে।

তখন চমক লাগে। মা ঠিক খোঁজাখুঁজি করছে। চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে এইবার। দৈত্যের একটা দল কোথায় বুঝি আটকানো ছিল—ছাড়া পেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়েছে। দাপাদাপি লাগিয়েছে—আমাদের ঘরবাড়ি বাগবাগিচা লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

ভিজে কাপড়চোপড় ভিজে চুল ভিজে গা-হাত-পা, ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলাম। মা দেখতে পেলে তো রক্ষে থাকবে না—উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখি, রান্নাঘরে মা রাঁধুনি-মাসির সঙ্গে কি বকাবকি করছে। আমি বাড়ি নেই, কিচ্ছু মা টের পায় নি। কাপড় ছেড়ে গায়ের জল মুছে দিব্যি আবার ভালমানুষ ছেলে—সেই সময় মা এঘরে এলেন। দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলি, কখন আসবে বাবা—আর কতক্ষণ?

ঘুমব না, কিছুতেই না—যতক্ষণ না বাবা ফিরে আসে। চোখ ড্যাবড্যাব করে আছি। আর ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়ছি মনে মনে: আমার বাবার গায়ে ঝড়বৃষ্টি না লাগে, এক্ষুণি যেন বাড়ি আসে। এক্ষুণি—এই আমি জেগে থাকতে থাকতে।

কিন্তু ঘুমে চোখ ভেঙে আসে, ঠেকানো যায় না। কখন ঘুমিয়ে গেছি—রাত দুপুরে বাবা এসে আমায় নিয়ে শুয়েছে, আমি কিছু জানি নে। বিভোরে ঘুমুচ্ছি।

এবারে ঠাকুর কথা শুনলেন। কিন্তু আর একদিন কত সাধ্য-সাধনা করলাম, কানে নিলেন না তিনি। বাবা যেদিন মারা গেলেন। পাড়ার লোকজনের আসা-যাওয়া বেড়েছে বিকাল থেকে। বাবার গলায় শ্লেষ্মা-আটকানো ঘড়বড় আওয়াজ। চোখ বুজে আছেন। পাখার হাওয়া করছেন বড়-পিসিমা শিয়রে বসে। বুকে পুরানো-ঘি মালিশ করছেন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশায়ের প্রিয় ছোট ভাই—এক-একবার বিছানার ধারে আসছেন, ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে। এত কষ্ট চোখে দেখতে পারেন না। জ্যাঠামশায়ের সেই আসা এবং ছুটে যাওয়া স্পষ্ট মনে রয়ে গেছে আজও।

জ্ঞাতিদের একজন এসে বলছেন, চিনতে পার, ও ছোড়দা? কষ্ট হচ্ছে খুব? বাবা চোখ মেললেন একবার—সাদা কাচের মত মণি। জবাব দেবার চেষ্টাও করলেন না। আবার আস্তে আস্তে চোখ বুজে এল। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির আশেপাশে কাল-কপাটির পাতা মুদে আসে যেমন। অশ্বিনীর অনেক রকম মুষ্টিযোগ জানা আছে। বলে, শ্বেত-আকন্দের পাতায় সেঁক দিলে উদ্বেগ কমবে। আরাম পাবেন। কাচের চৌখুপির ভিতর টেমি ভরে অশ্বিনী বেরুল, কোথায় শ্বেত-আকন্দ আছে খুঁজে-পেতে আনতে।

ধনঞ্জয় কবিরাজ বিকাল থেকে হাজির আছেন। তালের ডাঁটার রস বের করে তার

সঙ্গে সূচিকাভরণ দেওয়া হয়েছে তিনবার, ফল পাওয়া যায় না। ঘুমে আমি ঢুলে ঢুলে পড়ছি। এত মানুষ বাড়িতে, আঁধার-মুখে চুপিসাড়ে এতসব কাজকর্ম চলেছে—জেগে থাকা আমারও দরকার। কিন্তু পারি কই? হাই উঠছে, বসে থাকতে পারি নে আর। পশ্চিমের দালানে শুয়ে পড়েছি। বাড়ির সব ছেলে-মেয়ে ঘুমুচ্ছে অকাতরে। তাদের বাপের তো অসুখ নয়—তারা কেন ঘুমুবে না? আমার ঘুমানো অন্যায়।

সেই আর একদিনের মত ঠাকুরের কাছে মনে মনে কান্নাকাটি করছি: বাবাকে ভাল করে দাও। রাতের মধ্যেই যেন সেরে ওঠেন যেন, গলার ওই টান না থাকে। ঘুম থেকে উঠে যেন দেখতে পাই, বাবার সব কষ্ট সেরে গেছে, বাবা হাসছেন।

কত রাত্রি জানি না, কে যেন আমায় টেনে তুলল বিছানা থেকে। খোলা বারাণ্ডায় বাবাকে বের করে এনেছে। অনেক মানুষ মিলে ভীষণ কণ্ঠে নাম শোনাচ্ছে বাবার কানের কাছে মাথা ঝুঁকে পড়ে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে—হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। উঃ, ঠাকুরদেবতার নাম কী ভয়ঙ্কর সময়বিশেষে! কান্নার রোল চারিদিকে। মড়ার এদিকে-সেদিকে গোটা দুই-তিন ক্ষীণ আলো, বাকি সব জায়গা অন্ধকারে থমথম করছে। কাঁদতে কাঁদতে বড়পিসিমাই বোধ হয় আমায় কোলে করে বাবার পায়ের দিকে নিয়ে গেলেন। দাদাও সেখানে। ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে জলে ভরতি করেছে। অন্তর্জলী। দাদাকে কে বলল, পা দুটো ডুবিয়ে দে জলের মধ্যে। আমায় বলে, তুইও ধরু পা। আমার ইচ্ছা পা ধরবার নয়, বাবার মুখ দেখবার। যে-মুখে কত আদরের কথা শুনেছি। সেই হাতখানা একটু ছোঁব, যে-হাত বাবা পিঠের উপরে বেড় দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরতেন। হাউমাউ করে কাঁদছি। সকলে কাঁদছে—পরম শত্রু এসে দাঁড়ালেও এই আসরে কাঁদতে হবে। জ্যাঠামশায়ের কাছে নিয়ে গেল, দু-হাতে টেনে নিয়ে তিনি বুকে চেপে ধরলেন। গম্ভীর মানুষ, এমন ভাব আর কখনও দেখি নি, ভেঙে পড়েছেন। বলছেন, কাঁদিস নে। আমি রয়েছি, সকলে রয়েছে। যে চলে গেল, আপদবালাই নিয়ে যাক চলে। বয়ে গেল।

তখন আমার বেশ ভাল লাগছে। বাবা গিয়ে হঠাৎ খাতির বেড়েছে বাড়িসুদ্ধ সকলের কাছে। এত বড় ছেলে তবু কোলে কোলে ঘুরতে লাগলাম।

তার পরদিন দুপুরবেলা। বাসি-মড়া রয়েছে পড়ে। চারপো দোষ পেয়েছে, প্রাচিত্তির না হওয়া পর্যন্ত মড়ায় কেউ কাঁধ দেবে না। সেই সব হতে হতে বেলা দুপুর। রীতকর্ম সমাধা করে শ্মশানযাত্রার তোড়জোড় হচ্ছে। ছোট মানুষ আমায় যেতে দেবে না, দাদা যাচ্ছেন। মড়া কাঁধে তুলে হরিধ্বনি দিচ্ছে: বল হরি, হরিবোল! এমনি গা-কেঁপে-ওঠা ঈশ্বরের নাম কেন যে করে মানুষ!

দিদি আর আমি দক্ষিণের ঘরে দরজার উপরে বসে বলাবলি করছি, বাবা আর আসবে না, কোনদিনও না। না দিদি?

সেই দিদি কবে মারা গেছে! কে কে মরেছে, আঙুল গুনে দেখি। মা, বড়-পিসিমা, ধনঞ্জয়-কবিরাজ, অশ্বিনী, জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা—বাবার মৃত্যু ঠেকাতে খুব যাঁরা ছুটোছুটি করেছিলেন, নিজেরাই গেছেন এখন। ভাবতে গিয়ে থই পাওয়া যায় না। উঃ, কত মরেছে! ফাঁসি না হয়ে বেঁচেবর্তে থাকলে আরও কত কত মানুষের মরা দেখতাম! ছেলেবেলার সব চেয়ে বড় বন্ধু সেই যে প্রভাস গাছ থেকে পড়ে মরল—তার সঙ্গে চুক্তি ছিল, যে আগে যাবে, যেমন করে হোক খবরটা জানিয়ে দেবে ওদিককার। মরার পরে হতভাগা প্রভাস বেমালুম সব ভুলে মেরে দিল। গিয়ে যদি দেখা পাই, বোঝাপড়া সেই সময়। থাবড়া কষে দেব পিঠে। না, তারও উপায় নেই। পিঠে

তো লাগবে না, আমার হাতই মোটে উঠবে না—চম্পা যার জন্যে হাহাকার করে। অতএব বেঁচে গেলি রে প্রভাস। তোদের বিস্মৃতির কারণটাও ধরি-ধরি করছি এতদিনে। আমাদের গাঁয়ের ক্ষুদি নাপিতানী ছেলের যে ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে বিচার চেয়ে চেয়ে বেড়াত। দশ দুয়োরে দাসীবৃত্তি চেড়িবৃত্তি করে ছেলে মানুষ করল; লায়েক হয়ে ছেলে শহরে গেল রুজিরোজগারের ধান্দায়। আর আসে না, খবরবাদ দেয় না। ডাকিনী শহর জাদু করেছে ক্ষুদির ছেলেকে, দুঃখী মাকে সে ভুলে গেছে। প্রভাসেরও ঠিক তাই। স্বচ্ছন্দ লঘু আরাম পেয়ে কাঁটা-কাঁকরের ধরিত্রীর দিকে নিচু হয়ে তাকাতে মন চায় না, ঘেন্না করে।

সেই এক সময়ে বাবার জন্য ঠাকুরের কাছে দরবার করেছি—টুনুরও সেই বয়স—হয়তো সে-ও কান্নাকাটি করছে খোদাতালা-ঈশ্বর-গড সকলের কাছে। কতই আজব কান্ড ঘটে দুনিয়ায়। ভাবনার পায়ে কেউ তো শিকল দেয় নি—ধরুন, তাই একটা হল। জেলখানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল হঠাৎ এক ভূমিকম্পে। ইট-লোহা-রাবিশের স্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ধরুন, জিমন্যাস্টিক-মাঠের পাশে একতলা বাসাবাড়ির জানলায় গিয়ে ডাক দিলাম, ও টুনু, ঘুমুচ্ছ?

আমার পুরনো রসিকতা: ঘুমিয়ে থাক তো টুনুমণি, 'হ্যাঁ' বলে জবাব দাও।...

জেল-ফটকের পেটা ঘড়ি ঢং করে একবার বাজে। লোহার গরাদ-ঘেরা আমার এই সর্বশেষ রাত্রি। বুদ্ধিমান বলে আমার নামডাক—ধরাধরির লোক না থাকা সত্ত্বেও সরকারি চাকরি পেয়েছি, এই নিরিখে বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি অতিরিক্ত রকম বেড়ে গেছে। এত বছর ধরে গড়ে-তোলা সেই আমার সমস্ত বোধ-চেতনা ভোররাত্রে নিবে যাবে সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করার মতন। তারপর? আপনারা হাতড়ে বেড়ান সেই পরের ব্যাপারটা সঠিক বোঝবার জন্য। কত পণ্ডিত কত রকম বলেন—বস্তা বস্তা কথার কচকচি। সঠিক বার্তা আমিই শুধু জেনেবুঝে আছি। মহাব্যোমের কোন এক চলিষ্ণু জগতে গ্রহ-তারকার মত ঘুরতে ঘুরতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই। তন্দ্রার ঘোরে ছোট এক পৃথিবী, সেই পৃথিবীর মধ্যে ততোধিক ছোট এক সংসারের কল্পনা। ক্ষণিকের ব্যাপার, জলের দাগের মত এক লহমায় তার সকল চিহ্ন মুছে যায়। তা হলে দেখুন, মৃত্যুর উল্টা মানে—সুপ্তি থেকে পুনর্জাগরণ। মৃত্যুর ওপারে গিয়েই উদ্দাম হাসি হেসে উঠব: স্বপ্নের ভিতর কত খেলা খেলে এলাম রে! ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম কতবার। সংসার-সংসার খেলে এসেছি—খেলা হলেও সময় সময় কিন্তু নিতান্ত মন্দ লাগে নি।

চোখ বুজে আছি। একফালি আলো ফেলল কে যেন। বোজা চোখের পাতার উপর আলোর ঘা দিল। চোখ মেলে তাজ্জব। সত্যি বলছি, নিশ্চিত মৃত্যুর আগের কথা অপ্রত্যয় করবেন না, অগুন্তি মানুষ আমার সেলের ভিতরে। মানুষের উপর মানুষ চেপে বসেছে। মরা মানুষ। এবং জ্যান্ত মানুষও। দূর-পিছনে যে বয়স ফেলে এসেছি, সেই বয়সটা খুঁজে পেতে ফেরত চেয়ে নিয়ে জামার মতন গায়ে পরেছি।

গাঁয়ের বাড়ির দরদালানে কুলুঙ্গির ভিতর বসে আছি আমি। লাল গামছা মাথায় দিয়ে বউ হয়ে আছি। মা বলছেন, মুখ দেখি আমাদের রাঙা-বউয়ের—ফেরাও দেখি মুখখানা। হাঁ কর দিকি বউ। ওমা, মা, আমসত্ত্ব মুখের মধ্যে কেন বউয়ের? তাই এত লজ্জা।...

গুনগুন গুনগুন গুঞ্জন উঠছে আমাদের সেকালের পাঠশালা-ঘরের দাওয়ায়।

ছেলেরা দুলে দুলে পড়া তৈরি করছে। দ্বারিক পন্ডিত মশায় জলচৌকির উপর বসে বারান্ডার খুঁটি ঠেস দিয়ে অংক লিখে দিচ্ছেন আমার শ্লেটে। শ্লেট ধুতে গেছে ক'জন ওই পুকুরঘাটে—কামিনীফুলতলায় ভাঙা রানার উপর উবু হয়ে বসে শ্লেট মাজছে। পশ্চিম-আকাশে পড়ন্ত সূর্য—প্রভাসের বজ্জাতি, সূর্যের উল্টো দিকে মেলে ধরে নাড়ছে শ্লেট। গোলাকার এক টুকরো রোদ নাচছে ওই সঙ্গে।

দেখুন পন্ডিত মশায়, আমি অংক কষছি—প্রভাস তা করতে দেবে না।

পন্ডিত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলছেন, কোথায় প্রভাস?

ওই যে, দেখুন ওই কামিনীফুলতলায়। রোদ ফেলছে আমার চোখে।···

হঠাৎ কে ফিসফিসিয়ে আমার কানের কাছে বলে, ভয় করছে তোমার?

চমক লাগে। এতকাল পরে দরদ উথলে উঠল বুঝি প্রভাসের। এদিক-ওদিকে তাকাই সেদিনের সেই দ্বারিক পন্ডিতের মতন। কাউকে দেখি নে।

আবার বলছে, ভয় কিসের? কোন ভয় নেই, এক সঙ্গে মিলেমিশে বেজায় থাকা যাবে।

স্বর একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। প্রভাস নয়, বয়স্ক মানুষের ভারি গলা। প্রভাস তবে বড় ভারিক্কি হয়েছে। কিন্তু বয়স তো ওদের হয় না। কত বছর আগেকার চম্পা, বিয়ের কনে আজও—বিয়ের রাত্রে ছাতের উপর চুরি করে বর দেখার কৌতূহল বেমানান লাগে না। একটু বদলায় নি, একটা দিনও বয়স বাড়ে নি তারপরে। প্রভাসেরও তাই। এ গলা অন্য কারও। তুমি কে?

স্পষ্ট গলায় এবার জবাব এল, দিব্যি আছি, বড্ড স্ফূর্তিতে রয়েছি। সব ভারবোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। শরীর হালকা, মনও তাই। এত সোয়াস্তি আমার জীবনে পাই নি। এস, চলে এস বাবাজি। খাসা থাকবে। আমি মিথ্যে বলছি নে।

আর সন্দেহ নেই। দয়ালহরি। চোখে না দেখেও চিনতে পারি। প্রথম কথাতেই চেনা উচিত। চিরকালের মোসাহেবি মিনমিনে গলা আনন্দে উচ্ছলিত হয়েছে—চিনে ফেলার পরেও দ্বিধা কাটতে চায় না।

রাগ করেন নি হোড় মশায়?

রাগ কিসের? গুলি করে বুক ছেঁদা করলে, আমায় তো বাঁচিয়ে দিলে বাবাজি।

দেখতে পেলাম ফাঁসি-সেলের সাদা গরাদ লেপটে আছেন তিনি। জাল-জাল কাপড়ের উপর উল বুনে মেয়েরা ছবি তোলে, সেই রকম দেখাচ্ছে।

ব্যাধি আরোগ্য করে দিলে বাবাজি এক লহমায়। কী আরাম, কী আরাম। যতক্ষণ দলিল লিখি, এক রকমে সময় কেটে যায়। তারপরে এবাড়ি ওবাড়ি এর-তার তোয়াজ করে বেড়ানো। এতখানি বয়সের মধ্যে সুখশান্তি একটা দিনের তরে হল না। সুখ চুলোয় যাক, নিজের বাড়িতে দু-দন্ড চোখ বুজে সোয়াস্তি নেব, তার উপায় নেই। বাইরে বাইরে টহল দিয়ে ফিরি। লোকে নাক সিঁটকায়ঃ বেটা খোশামুদে। শঠ, তঞ্চক বলে গালিগালাজ করে। কিন্তু বাপ-পিতামহ তালুকমুলুক রেখে যায় নি। কেউ লেখাপড়া শেখায় নি তোমার মত। সুপারিশের জোর নেই। কী করে চালাই তবে। ভালমানুষেরা হল বোকা মানুষ। বাহবা খুব মেলে, কিন্তু ভাত মেলে না। আমি সেই জন্যে ভাল হতে গেলাম না।

কথা শুনে কষ্ট হয়। বুক দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছিল, সেই জায়গাটা মর। বোঝার করে দেখছি ঃ সে সময়টা বড্ড লেগেছিল হোড় মশায়?

দয়ালহরি কানেও নিলেন না। বলছেন, সবই যে পেটের ধান্দায় করতাম, তা নয়।

শেষটা নেশা লেগে গেল। মানুষকে বোকা বানিয়ে দুটো পয়সা বের করে নেওয়া, এর হকের সম্পত্তি ওকে পাইয়ে দেওয়া, এর মধ্যে বাহাদুরি রয়েছে। বুদ্ধির প্যাঁচ-কষাকষি। এক রকমের রোগও বলতে পার। মনে পড়ছে বাবাজি, ছোটবেলা সাঁতার কাটতে গিয়ে গাঙের টানে ভেসে যাচ্ছিলাম। আমার মেজোখুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনেহিঁচড়ে ডাঙায় তুললেন। এবারে তুমি তুললে। পাঁকের ভিতর থেকে টেনে তুলে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছ! রক্তের সঙ্গে মনের ঝুলকালিও সব বেরিয়ে গেল। ফাঁকায় দম নিয়ে বাঁচছি।

আপনার বোধ হয় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, যখন আমার গুলি গিয়ে বিঁধল?

কিছু না, কিছু না। এ ভারি মজা! ঠিক সময়টাতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়, কোন রকম হুঁশ থাকে না। যন্ত্রণা যা কিছু গোড়ায়। মরব-মরব একটা আতঙ্ক। মিথ্যে বলছি নে বাবাজি। মাটির উপরে যতক্ষণ পা ছিল, দেদার মিথ্যে বলতাম। না বললে চলে না। এখন কী দায়? বড্ড উপকার করলে তুমি আমার। কাপুরুষ আমি, নিজে থেকে কখনও সাহস হত না। সে কাজটা তুমি করে দিলে। এই পুণ্যফলে, দেখ, তোমারও ভাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর কতক্ষণ!

কতক্ষণ আর? আমারও মনে মনে সেই প্রশ্ন। অধীর হয়ে পড়ছি। শুকতারা উঠবার সময় হল বোধ হয়। কখন প্রভুদের শুভাগমন হবে সেলের চাবি হাতে নিয়ে? ফাঁসিতে লটকে দিয়ে আমার এই মস্ত উপকারটা করবে? আরও কতজনকে লটকেছে এমনি, তবে তো বিস্তর পুণ্য ওদের। পুণ্যের ফলে ওদের কেউ লটকে দেয় না কেন? ভয় করে হয়তো। পুণ্য তো পাহাড়-প্রমাণ—আমার শত গুণ, সহস্র গুণ—ভয় করে, ফাঁসির দড়িতে অতখানি পুণ্যের ভর সইবে না। ছিঁড়ে পড়বে।

ছিঁড়ে পড়লে সে নাকি বিষম ব্যাপার। আর ফাঁসি দেওয়া চলবে না আসামিকে—সে তখন মুক্ত। আইনে সঠিক কী বলে জানা নেই, কথাটা দু-একদিন আগে উঠলে জেলের বাবুকে জিজ্ঞাসা করা যেত। সে যা-ই হোক, লোকের মধ্যে রটনা কিন্তু ওই। বিধাতাপুরুষ নামক এক অদ্ভুতকর্মা স্থপিত আব্রহ্মস্তম্ব জীবজগৎ গড়ছেন। তাঁর সঙ্গে একরকম বুঝসমঝ আছে বোধ হয় রাজপুরুষদের—ফাঁসির দড়টা সড়াক করে নেমে গলায় এঁটে যাবে, দড়ি ছিঁড়লে কিংবা ফাঁস আটকে গেলে আর হবে না। পাঁঠাবলির মতন। এক কোপে কাটা পড়ল তো উত্তম। নতুবা বলি অসিদ্ধ—দেবতার সে পাঁঠায় রুচি নেই। ছুঁড়ে ফেলে দাও সেই পাঁঠা।

কত সাবধানতা ফাঁসি পণ্ড হবার এই ভয়ে! আমার ওজন নিয়েছে। ফাঁসির দড়িতে ওই ওজনের মাল টাঙিয়ে ছিঁড়ে পড়ে কি না, পরখ করে দেখেছে আগেভাগে। দড়িতে চর্বি ও কলা মাখাচ্ছে বারংবার—শুকিয়ে নিচ্ছে, আবার মাখাচ্ছে। টান দেওয়া মাত্রেই যাতে ফাঁস এঁটে যায়। তোড়জোড়ের অন্ত নেই। একখানা এই মোটা বই আছে ফাঁসি দেবার প্রণালী সম্বন্ধে। দুর্গোৎসব প্রকরণ কোথায় লাগে তার কাছে! আইন-কর্তা কেমন স্বচ্ছন্দভাবে সবিস্তার লিখে গেছেন—লিখবার সময় আশেপাশে নিশ্চয় ঘুরছিল তাঁর ভালবাসার মানুষেরা। হয়তো বা দড়িটা মনে মনে তাদের গলায় বসিয়ে অবস্থার আন্দাজ করে নিয়েছেন।

কী আশ্চর্য, সেই কাণ্ড ঘটল যে সত্যি সত্যি। নিতান্তই আমার কপাল মন্দ—লাখের মধ্যে বা একটা শোনা যায় না।

আকাশে পুরানো সাক্ষি সেই পোহাতি-তারা। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় কিলবিল

করছে কালো কালো ছায়ামূর্তিরা ফাঁসিমঞ্চের ভয়ে। আইনের যত পাহারাদার—হাজির সবাই। সেলের পিছন-দরজা খুলে দিল। দরজা থেকে পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে পৌঁছেছে মঞ্চ অবধি। কাঁদে নাকি এই সময় কোন কোন আসামি—অজ্ঞান হয়েও যায়। একবার এক পাড়াগাঁয়ের স্টিমারঘাটে দেখেছিলাম, একটা মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে, আর বাড়িসুদ্ধ—খুব সম্ভব পাড়াসুদ্ধ—মেয়েলোক আর্তনাদ করছে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কি না, যাচ্ছে লোকটা পেটের ধান্দায় অজানা শহরে। প্রায় সেই ব্যাপারই তো!

ভূমি থেকে দেড়-মানুষ উঁচু হবে মঞ্চ। কিন্তু মনে হচ্ছে, অনেক—অনেক উঁচুতে আমি। প্লেনে চড়ে মেঘের ভিতর দিয়ে ধরণীর দিকে যেমন অবহেলার নজর পড়ে। আহা, জীবনের ব্যাধিতে ভুগছে মাটির গায়ে লেপটে-থাকা চারদিককার এই সমস্ত লোক। এই সব কৃপার পাত্র। যেটুকু চোখে দেখতে পায়, তাই ভাবে পরম বস্তু। চাপা হাসিতে আমার যে দম ফেটে যাবার জোগাড়।

দুটো খুঁটির মাথায় একটা মোটা কাঠ—হরাইজেণ্টাল-বার অবিকল। তার মাঝামাঝি দুই আংটায় দড়ি পরানো। একেবারে এক সঙ্গে দুজনকে ঝোলানো চলে। হয়েও থাকে তাই একাধিক আসামি মজুত থাকলে। মাইনে-করা জহ্লাদ নয়, ঠিকে চুক্তি—এক-একটা মানুষের জন্য এত করে পাবে। দুটো মানুষ একবারে ঝোলানোয় পাইকারি হারে রেট বোধকরি কিছু কমই হবে।

গটমট করে দাঁড়িয়েছি এসে মঞ্চের তক্তার উপর, দড়ি-ঝোলানো আংটার নীচে। তৈরী আমি, শুরু কর এবারে প্রক্রিয়াগুলো। হাত দুটো বেঁধে দিল পিছনে—অবোধেরা ভেবেছে, ফাঁসির দড়ি আঁকড়ে ধরে আমি হয়তো যজ্ঞ পণ্ড করতে যাব। ঝোলানো টুপি মাথায়—চোখ-মুখ ঢেকে গেল। আমার এত বড় উৎসব চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেবে না। বিড়বিড় করে কানের কাছে মন্ত্র শুনিয়ে গেল—পুরুত নয়, জহ্লাদ।—বাবু, আইন দস্তুর মত হামাকে এই কাম করতে হচ্ছে। হামার কসুর লিবেন না।

সকল দায় আইনকর্তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে খালাস থাকল। বিনয়ের দিক দিয়ে লোকটা টেক্কা। বলা যায় না, ভূত হয়ে গিয়ে আমার কী রকম মতিগতি হবে। ঘাড় ভাঙতে হলে তাকে রেহাই দিয়ে অন্যদের যেন ঘাড় ভাঙি—মতলব হল এই। আমায় বলে কয়ে জহ্লাদ এবার হাতল ধরে দাঁড়িয়েছে। চোখ ঢেকে দিলেও কায়দাকানুন শোনা আছে। দাঁড়িয়ে আছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমের অপেক্ষায়। মুখে তিনি কিছু বলবেন না, রুমাল নিয়ে হাত তুলে আছেন। মুঠো খুলে ছেড়ে দিলেন রুমাল—ব্যাস!

ঘড়াং করে আওয়াজ। পায়ের নীচের তক্তা সরে গেল। মরে গিয়ে হাত পাঁচ-ছয় নিচুতে ঝুলতে থাকবে—কিন্তু কী হল? কী আশ্চর্য ব্যাপার! পড়ে গেলাম পাতকুয়ার মতন গর্তের তলায়। আছাড় খেয়ে ব্যথা লাগল, কিন্তু মরে গেছি কই? হায় রে, প্রহ্লাদ হয়ে গেলাম—পাপ কলিযুগে আমার মরণ নেই। জজ গম্ভীর মুখে রায় দিয়েছিল, তোমায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হবে যতক্ষণ না তুমি মারা যাও। রায় পড়েই এজলাস থেকে উঠে গেল, সেদিন আর কোন কাজকর্ম হবে না। যে-কলম দিয়ে রায় লিখেছে, সে কলমেও কাজ করবে না আর কখনও। কিন্তু হল না কিছুই, দড়ি ছিঁড়ে পড়েছে। কোনখানে অসাবধানে রেখেছিল দড়ি—ইঁদুর কেটে দিয়েছে বোধ হয় চর্বি ও পাকাকলার লোভে। অত আইনের কচকচি, জজের অত আড়ম্বরের রায়

ইঁদুরের দাঁতে বানচাল হয়ে গেল।

হৈ-চৈ পড়ে গেছে। অন্ধকার গর্তের মধ্যে কানে আসে প্রতিটি কথা। ভারি গলায় কে-একজন বলল, লোকটার বড় কপালজোর। যা কখনও হয় না, তাই ঘটল। চাকরি নিয়ে টান পড়বে আমাদের।

মঞ্চতলের ঘুলঘুলি খুলে ফেলল, যেখান থেকে মড়া বাইরে তুলে আনে ফাঁসির পরে। শাস্তিভোগের পর এবারে ছাড়া পাব। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছি। ক'জন ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল। হাতের বাঁধন কাটল, চোখের ঢাকা খুলে দিল।

চলে যান, জেল থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাকে আটকে রাখা এখন বে-আইনি।

ভোরের আলো ফুটছে চারিদিকে। জেলের ফটক খুলে দিল। আমায় দেখে মাথা নিচু করে সিপাহিরা। নবজন্মের মানুষ।

রাস্তায় লোকজন কদাচিৎ দু-একটি। এখনও সব জেগে ওঠে নি। যখন শিক্ষানবিশ ছিলাম, জেলখানার সামনের এই পথে নদীর ধার অবধি কতদিন বেড়াতে গিয়েছি। আট মাস পায়ে হাঁটি নি, অভ্যাস নেই। আজকে কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। চেনা একজনের সঙ্গে দেখা, এক হোটেলে খেতাম। হন হন করে খুব ব্যস্তভাবে সে চলেছে, ট্রেন ধরবে বোধ হয়। মুখ ফিরিয়ে একটুকু হেসে চলে গেল। নিশ্চয় আমার খবর রাখে না। তা হলে আঁতকে উঠত, থমকে দাঁড়াত, গাড়ি ফেল হয়ে যেত তার।

দীঘি। দীঘি পাড়ে জিমন্যাস্টিক ক্লাবের মাঠ। এত ভোরে মাটি মেখে কুস্তিতে লেগেছে কয় জোয়ান। মাঠের পাশে একতলা বাসা।

বউদি, দোর খোল বউদি, আমি এসেছি—

বউদি, দরজা খুললেন। লাবণ্য পিছনটিতে। অবাক হয়ে থাকেন মুহূর্তকাল। কথা বেরোয় না। বলতে গিয়ে ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে। ঝরঝর করে কেঁদে ভাসালেন।

টুনুমণি কোথায়? ঘুমুচ্ছ? ঘুমিয়ে থাকো তো 'হ্যাঁ' বলে ওঠ—

গলা শুনে ডাকাত ছেলে জেগে গেছে। দৌড়চ্ছে। বড় বড় চুল উড়ছে দৌড়বার বেগে। দু-হাত বাড়িয়ে আসছে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

কাকামণি, আমি জানতাম তুমি আসবে। ঠিক আসবে। ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি। চোখ মুছিয়ে ঠাকুর বললেন, আজকেই এসে পড়বে তোর কাকু।

কতদিন টুনুকে কোলে তুলতে পাই নি! মরুভূমির উপর জল পড়লে যেমন হয়। আদরে আদরে অস্থির করছি। নাচাচ্ছি দু-হাতে তুলে, কাঁধে করছি, বুকে চেপে ধরছি—

আরে, আরে, অত জোরে গলা ধোরো না টুনুমণি, লাগে—

টুনুর বাহু নয়, ফাঁসির দড়ি। সত্যি সত্যি ফাঁস এইবারে। আগে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। একটুকু সময়ের স্বপ্ন। মনোরথে চড়ে ছুটে এক পাক বাসাবাড়ি বেরিয়ে এসেছি। দয়ালহরি ঠিক বলেছেন—এক মুহূর্ত। মুহূর্তের এইটুকু আচ্ছন্ন ভাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভার বয়ে এসেছে এতদিন, হঠাৎ দায়দায়িত্ব একেবারে ছেড়ে দিল। নিরন্ধ্র অন্ধকার···সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলছি যেন। তারপর···তার পরে আর কিছু নেই!

আমার মৃতদেহ ঘাড় ধরে আধ ঘণ্টা ঝুলল আঁটোসাঁটো গর্তের ভিতর। তারপরে টেনে বাইরে আনে। ফেলে রেখেছে। রক্তাক্ত চক্ষুতারা বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে, জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে। কী বীভৎস। ওই মুখে ক্রিম ঘষতাম—মাথার চুলে গন্ধতেল মাখতাম, টেড়ি কাটতাম কত যত্নে। কাঁটা ফুটেছিল পায়ে, সারা রাত তার জন্য ছটফট করেছিলাম একদিন। থুঃ, থুঃ—এত মমতা বেঢপ ওই দেহটার উপর!

রাজহংস নয়, পেখম-তোলা ময়ূর নয়—দুই ঠ্যাঙে চরে বেড়ানো লম্বা খিঁড়িঙ্গে মানুষের দেহ। হাড়ের ফ্রেমের গায়ে শিরা-উপশিরা আর মাংস—নিতান্ত কুদর্শন বলেই উপরে একটা চামড়া। ময়লা তোষক আর ছেঁড়া-কাঁথার উপরে চাদর ঢাকা দেয় যেমন। থুতু ফেলছি: থুঃ, থুঃ। থুতু পড়ে না তো মুখ দিয়ে। লাথি মারব ওই কুৎসিত দেহটার উপর, পায়ের ধাক্কায় দৃষ্টির আড়ালে সরাব। ছুঁতে পারি নে, পায়ে স্পর্শ পাই নে। বায়ুভূত হয়ে গেছি।

প্রেম নয়, মিছে কথা

আমার আযৌবন সুহৃৎ
কবি জসীম উদ্‌দীনের
করকমলে

॥ এক ॥

নামলেন চারজন এঁরা—শিল্পী মণিলাল দত্ত, শ্রীমতী দত্ত এবং নাতি-নাতনি রাহুল ও নীপা। সকাল সাতটা-দশ। উঁহু, কালেকটরির ঘড়িতে সাতটা-চল্লিশ। গিন্নি কিছু অবাক হলেন। খুরশিদ বুঝতে পেরেছে। বলে, বুঝলেন না চাচি? বাংলাদেশের ঘড়ি আধ ঘণ্টা আগে আগে চলে।

খিল খিল করে হেসে উঠল: তার মানে আমাদের বারোটা বেজে যাবে ভারতের আধ ঘণ্টা আগে।

বাসে এই খুরশিদ ছেলেটির সঙ্গে আলাপ। এবং দেখতে দেখতে জমে গিয়েছে। কলকাতা গিয়েছিল সে বিশ বছর পরে, এঁরাও যেমন কলকাতা থেকে বাড়ি দেখতে যাচ্ছেন। পার্কসার্কাস ইস্কুলে পড়ত খুরশিদ তারক দত্ত রোডের বাসায় থেকে, বাংলা ভাগ হয়ে গেলে যশোর চলে যায়। মোটে পঁচাত্তর মাইল। কত দূর-দূরান্তর গিয়েছে, তবু কুড়ি-কুড়িটা বছরের মধ্যে কলকাতায় গিয়ে একটি বার চোখের দেখা দেখতে পারেনি। এঁদেরও ঠিক তাই—এত কাছের বাড়ি, কিন্তু পথ আটকে দিয়েছিল। বাংলাদেশ এবারে মুক্তি পেয়ে গেছে—স্বাধীন সেকুলার দেশ। সাধ মিটিয়ে এপারে-ওপারে পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিচ্ছে। খুরশিদ বলছিল, তারক দত্ত রোডের পুরানো বাসাবাড়ির সামনে দিয়ে এই ক'দিনে কতবার যে পাকচক্কোর মেরেছি লেখা-জোখা নেই।

এঁরা যাচ্ছেন মুলটি ও নন্দনপুর—গিন্নির বাপের ভিটা ও শ্বশুরের ভিটা এই দুই গ্রামে। খুরশিদের বাড়িও কাছাকাছি—রাজগঞ্জে। আরও এক পরিচয় বেরিয়ে গেল। খুরশিদের বাপ সেকেন্দার আলি ছিলেন জেলা-ইনস্পেক্টর। আজকের বিখ্যাত শিল্পী মণিলাল তখন মুলটি ইস্কুলের এক নগণ্য মাস্টার। অদ্ভুত তাঁর ছবির হাত, বিশেষত চটপট স্কেচ আঁকানোয় জুড়ি মিলত না। উঁচু দরের প্রতিভা না হলে বিনা শিক্ষায় এমনটি সম্ভব না। মুলটি ইস্কুলের নানা রকম গলদ শুনে ইনস্পেক্টর সাহেব তদারকে এসেছেন। নিজে এই তল্লাটের মানুষ বলে ইস্কুল নিয়ে উঠে-পড়ে লেগে-ছিলেন তখন। কাজে ব্যস্ত আলি সাহেব, মণিলাল কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর ছবি বানিয়ে হাতে এনে দিলেন। তিনি তো স্তম্ভিত—এমন রত্ন এই জঘন্য জঙ্গুলে জায়গায়! জেলার সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট খুব শিল্পোৎসাহী, তাঁর কাছে সেকেন্দার আলি মণিলালের কথা বললেন, সদরে নিয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর আঙুল ফুলে, কলাগাছ বললে হবে না, শালগাছ হয়ে গেছে। দেশের বাঘা বাঘা শিল্পীদের সঙ্গে লোকে এক নিশ্বাসে মণিলাল দত্তের নাম করে। যাক গে, সে তো ভিন্ন কাহিনী। জানা গেল, আলি সাহেব বেঁচে আছেন এখনো, রাজগঞ্জেই আছেন। তাঁরই ছোট ছেলে খুরশিদ।

মণিলাল খুশি হয়ে বললেন, ভাল আছেন তিনি? পুণ্যাত্মা মানুষ—থাকবেনই তো! আমার যত-কিছু, তিনিই তার মূলে। তাঁকে আমার সালাম জানিও বাবা।

খুরশিদ বলে, ভাবনা নেই চাচা। মুলটি অবধি আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি। মুলটি আগে পড়বে, আজকের রাত সেখানে থেকে কাল নন্দনপুর যাবেন। হেঁটেই যাবেন, চাচির জন্যে শুধু পালকি—

গিন্নি বলে উঠলেন, আমিও হাঁটব।

রাহুল-নীপা হেসেই খুন: দিদা কি বলে শোন! হেঁটে যাবে নাকি এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রাম।

গিন্নি চটেছেন এবার। বললেন, তোরা কি জানিস। মুলটি আর নন্দনপুর মাঠের এপার আর ওপার। পথটুকু আমি হাঁটিনি কখনো, দৌড়েছি।

এই সদর থেকে গ্রাম দুটো বারো-তেরো মাইল। খুরশিদ ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া করল। মণিলাল তো অবাক: যাবে ঘোড়ার গাড়ি? সে আমলে গরুর-গাড়ি যেতেই তো গা-গতর ব্যথা হয়ে যেত। এই উঁচুতে উঠছে, খানার মধ্যে এই আবার হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

খুরশিদ বলে, পিচের রাস্তা—ঘোড়ার-গাড়ি কি বলেন, মোটর থাকলে হুস করে লহমায় পেঁছে দিয়ে আসত। কিন্তু মোটর-গাড়ি সব লুঠপাট করে নিয়ে গেছে, নয়তো পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আবার বলল, পাকিস্তানি আমলে আর কিছু না হোক, রাস্তাঘাট বানিয়েছে খুব। বিশেষ করে বর্ডারের কাছাকাছি এই সব এলাকায়। রাস্তা ভাল না হলে সৈন্য চলাচলে অসুবিধে যে।

চেনাই যায় না পুরানো সেই মুলটি গ্রাম। দোতলা ইস্কুলবাড়ি ঝকঝক করছে, মণিলাল কিছুকাল যেখানে মাস্টারি করেছিলেন। গিন্নির বাপের-বাড়ি—ঘোষবাড়ির কিন্তু চিহ্নমাত্র নেই। দালানের ভিত খুঁড়ে মাটির তলের ইঁট অবধি বিক্রি করে দিয়েছে। বাপ মধুসূদন ঘোষ, বাগবাগিচার বড্ড শখ ছিল তাঁর। কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে কলমের চারা এনে পুঁতেছিলেন—আম ছাড়াও গোলাপজাম, জামরুল, সপেটা, লিচু, এমন কি তেজপাতার গাছ অবধি। মালিক নেই—ফলফুলুরি খা না রে বাপু, তা নয়, গাছ কেটে কেটে উনুনে পুড়িয়েছে। অত বড় বাগিচায় একটা গাছ নেই—ফাঁকা মাঠ, আউশধানের ক্ষেত। কি ভাগ্যি, বুড়ো নারকেলগাছ একটা রয়ে গেছে—তাই থেকে অন্দরবাড়ির পাঁচিলের হদিস পাওয়া গেল। নারকেলগাছ বাদ দিয়ে পাঁচিল ঐ জায়গা থেকে বেঁকে গিয়েছিল।

খাতা-পেন্সিল হাতে, মণিলাল এদিক সেদিক বেড়াচ্ছেন, রাহুল তাঁর সঙ্গে। আর গিন্নি নীপাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন: গোলা ছিল নারকেল-গাছ ঘেঁষে, গোলার পাশে আমার বিয়ের ছাতনাতলা হয়েছিল—এইখানটা আন্দাজ হচ্ছে। চার কোণে চার কলার বোগ—মাঝখানটায় চিত্তির-করা জলচৌকির উপর তোর দাদু দাঁড়িয়ে। ঢোল-কাঁসি-শানাই মানুষজনে চারিদিক গমগম করছে। কনে-পিঁড়িতে আমি ঘাড় গুঁজে চোখ বুঁজে রয়েছি, সাতপাক ঘোরাচ্ছে আমায়—

নীপা বলল, তোমাদের তো প্রেমের বিয়ে দিদা। চোখ বুঁজতে গেলে কেন?

প্রেম-ট্রেম ছিল না রে আমাদের আমলে। ঝগড়ার বিয়ে, মারামারির বিয়ে। মেরে কতদিন ভূত ভাগিয়েছি—বিয়ের সময় তবু ভিজে-বেরালটি। নয়তো সবাই বলাবলি করত, ওমা, দেখ, বিয়ের কনে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। নিন্দে রটে যত।

মোটা মানুষ এইটুকু ঘুরেই নারকেলগাছের গোড়ায় ধপ করে বসে পড়লেন। চোখ বুঁজেছেন।

খুরশিদ ছিল না, সর্দারপাড়ায় আত্মীয়-বাড়ি গিয়েছিল। সে ও-বাড়ির আরশাদকে নিয়ে ফিরে এল। বলে, চাচির যে বসে বসেই একঘুম হয়ে গেল—হি-হি-হি। এদের বাড়ি চলুন সব। টিউবওয়েল আছে—হাত-পা ধুয়ে নাস্তা খেয়ে নিইগে।

কলকাতার মানুষ এসেছে, চাউর হয়ে গেছে। ভিড় বেশ, নিরন্নই প্রায় সব। ভুঁয়ের ফসল ঘরে তুলতে পারেনি, জঙ্গীরা পঙ্গপালের মতন পড়ে শেষ করে দিয়েছে।

রোগা ডিগডিগে কয়েকটা ছোঁড়া ডাংগুলি খেলছে—হঠাৎ বলে উঠল, খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং—

গিন্নিকে উদ্দেশ করে। মোটা মানুষ, তায় বাতের দোষ। হাঁটছেন, আর সেকালের মধ্যে মশগুল হয়ে আছেন একেবারে। খেয়াল করেননি, সত্যিই বড্ড খোঁড়াচ্ছেন তিনি। বেঢপ মোটা বলে উৎকট দেখাচ্ছে। ছোঁড়াগুলো দূরে থেকে ছড়া কাটছে, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখে গিন্নিও হাসছেন। নীপাকে বললেন, বিয়ের রাত্রে বাসরঘরে তোর দাদু প্রথম আমায় কি বলেছিল জানিস ?

বলো না, বলো না—বলে নীপা জড়িয়ে ধরল।

খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং—ঐ ছড়াই।

খুরশিদ বিষম চটেছে, আরশাদকে চোখ টিপে দিল। ধরবার জন্য আরশাদ ছুটল, ছোঁড়ারা পালাচ্ছে। একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে টানতে টানতে নিয়ে এল।

খুরশিদ গর্জন করে উঠল ঃ নচ্ছার বেয়াদব শয়তান—

ঠাই-ঠাই করে গালে চড়। গিন্নি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ঃ ছেলেমানুষ এরা কী বোঝে ? বড় হলে চেপেচুপে থাকত, মনে মনে হাসত। বড়য়-ছোটয় এই তো তফাত।

নিজেই এগিয়ে এসে ছেলেটাকে মুক্ত করে দিলেন। বলেন, খোঁড়াচ্ছি দেখে মজা লাগছে—না ? খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং—তারপরে কী, বলতে পারিস ?

পারলেও ছেলেটা বলছে কিনা আর ! প্রাণ উড়ে গেছে তার ভয়ে।

হেসে উঠে গিন্নি বললেন, পারলি নে তো ? কার দুয়োরে গিয়েছিলি, কে ভেঙেছে ঠ্যাং ? কত আমরা ছড়া কাটতাম আমার এই বাপের-বাড়ির গাঁয়ে।

পাঁচ টাকার একটা নোট তার মুঠোয় গুঁজে দিলেন ঃ বাজারখোলায় মিঠাই-এর দোকান দেখে এলাম—সবাই তোরা মিষ্টি কিনে খা গিয়ে।

॥ দুই ॥

পিছনের কথায় যাই চলুন। সেকালে এই গাঁয়ের একজন ছিলেন মধুসূদন ঘোষ। গালভরা নামের ঝোঁক তাঁর। বলতেন, বড় নামে যখন বেশি ট্যাকসো নেই, ওতে কৃপণতা করব কেন ? ছেলের নাম রাখলেন রত্নেশ্বর, মেয়ের নাম ইন্দুলেখা। শেষ বয়সে আবার যে ছেলে হলো তার নাম রুদ্রেশ্বর। কিন্তু কোন নাম টেকেনি। ছেলে দুটো কালু-ভুলু—আর মেয়েটা—স্থূলবপু এই যে গিন্নিঠাকরুন এসেছেন—পাটকাঠির মতন লিকলিকে ছিলেন ইনি, বাতাসের আগে ছুটতেন। পিসি তাই ছটাকি ছটাকি করতেন, ওজনে কয়েক ছটাক নাকি। পিসির সেই নামই মুখে মুখে চলল।

মেয়ে কিছু বড় বলে মধুসূদনের স্ত্রী রাধিকা ননদের কাছে দরবার করতেন। নামটা কেমনধারা যেন হলো ঠাকুরঝি ! বিয়ে-থাওয়া হবে, কনে দেখতে এসে শুনবে—ছটাকি। নাম শুনেই তারা মুখ বাঁকাবে।

পিসির সাফ জবাব ঃ বলতে গেলে দাঁত ভাঙে, লিখতে গেলে কলম ভাঙে, ও-সব নাম চলবে না। ছটাকিই তো ভাল।

বালবিধবা হয়ে চিরকাল তিনি বাপের সংসারে এবং পরবর্তীকালে ভাইয়ের সংসারে। প্রচণ্ড দাবরাব। নাম কৃষ্ণভাবিনী—হালের ছোঁড়াছুঁড়িরা ঘুরিয়ে কৃষ্ণবাঘিনী বলে।

হতে হতে শুধু বাঘিনী। লুকিয়ে-চুরিয়ে বলে অবশ্য, কার ঘাড়ের উপর ক'টা মাথা আছে সামনাসামনি বলতে যাবে!

নিরুপায় রাধিকা কি করেন—পিসির নামই কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও মোলায়েম করে নিলেন—ছটাকি করে নিলেন ছটা।

ছটার বারো-তেরো বছর বয়স, সেই সময়ে ছেলে রত্নেশ্বর অর্থাৎ কালু হঠাৎ মারা গেল। মধুসূদন বাড়ি না, সুন্দরবনের দূর জঙ্গলে নোনাপানি খেয়ে পড়ে থাকেন। ফরেস্টারের চাকরি। সুন্দরবন সে আমলে কুবেরের ভাণ্ডার। মধু, সুন্দরি ও গরান কাঠ, হরিণের চামড়া, ঘর-ছাওয়ার গোলপাতা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং উপরি পাওনার লেখাজোখা নেই। সরকার যদি বলতেন মাইনে একপয়সাও দেবো না, উল্টে চাকরি বজায় রাখার জন্য বার্ষিক সেলামি দিতে হবে, তবু ফরেস্টারের অভাব হতো না। এহেন চাকরি মধুসূদনের।

প্রথম অপত্যশোক রাধিকার বড্ড লেগেছে। দিন-রাত্রি কাঁদেন, ক্ষণে ক্ষণে ফিট হয়ে পড়েন। জলের কলসি নিয়ে ভিজে সপসপ করতে করতে একদিন পুকুরঘাট থেকে ফিরছেন, ধপ করে পড়ে গেলেন। চৈত্র মাস, কড়া রোদে আমের গুটি ঝরে পড়ে, ছটাকি তলায় তলায় ঘুরছিল। আর্তনাদ করে উঠল সে। মানুষজন ছুটে এল। উঠোনের হুড়কোর ধারে রাধিকা অজ্ঞান হয়ে আছেন, জলের কলসি ভেঙে শতখান হয়েছে।

জল ঢালছে কেউ মাথায়, কেউ বা বাতাস করছে। করতে করতে সাড় এল। বউ, ও বউ—ঝুঁকে পড়ে ভাবিনী ডাকছেন। রোদ এসে মুখে পড়েছে। রাধিকা বিড়বিড় করে কি বলেন, আর আকাশে হাতছানি দেন। কি বলেন, শোন তো স্থির হয়ে কান পেতে। বলছেন, নেই—নেই।

সর্বনাশ, মাথা খারাপের লক্ষণ যে!

মধুসূদনের কাছে খবর গেল। বনকরের কাজে ছুটিছাটা বড় কম। দায় জানিয়ে বিস্তর লেখালেখির পর অবশেষে এক হপ্তার ছুটি মঞ্জুর হয়ে এল। সাত দিনের ভিতর আসতে যেতে আড়াই আর আড়াই এই পাঁচটা দিন তো পথেই কেটে যাচ্ছে। সন্তান-শোকের চেয়েও স্ত্রীর অবস্থা দেখে অধিক বিচলিত হলেন মধুসূদন। উপায় কি এখন? মুরুব্বিরা একবাক্যে বলেন, নিজের কাছে রাখো গে কিছুদিন। চৈত্র মাসের আকাশে আগুন, বুকের মধ্যেও আগুন জ্বলছে। জঙ্গলের ঠাণ্ডারাজ্যে গেলে খানিক-খানিক জুড়িয়ে যাবে। এখনকার দিনে বাদা আর ভয়ের জায়গা নেই। ঐ তো সাতাশকাঠির রামশরণ হালদার বাড়িসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে বাদায় নিয়ে তুলেছেন।

প্রবীণ নীলকণ্ঠ কবিরাজও চোখ টিপে ঐ ব্যবস্থা দিলেন: 'দেবী এক মুলুকে, দেবা আর মুলুকে—বারো মাস তিরিশ দিন। ভাল মাথাই বিগড়ে যায়, বউমা তো শোকে-তাপে জ্বলছেন। অষুধপত্তোরে ঘোড়ার-ডিম হবে—কাছে নিয়ে রাখো গে, দু'দিনে সামলে উঠবেন।

হক কথা। কিন্তু যাবতীয় লটবহর গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে অজাঙ্গ জঙ্গলে ঢোকা চাট্টিখানি কথা নয়, দুটো দিনের মধ্যে সে জিনিস হয় না। কোয়ার্টার বলে ঘর একটা আছে বটে, রান্নাঘর-উঠোনও আছে—কিন্তু একলা মানুষ বলে মধুসূদন শোওয়া-বসা-খাওয়া সমস্ত অফিসঘরে সারেন। রান্নাবান্নার জন্য যতীন নামে এক ছোঁড়া আছে, রাত্রে কাঠের মেজের উপর দু'জনে কাছাকাছি শয্যা পেতে নেন। কোয়ার্টার তাই আস্তাকুড় হয়ে আছে, উঠানে ও মাটির রান্নাঘরে ঘোর জঙ্গল। সাফ-সাফাই করতে

সময় লাগবে। সমস্ত সমাধা করে—নিজে আর আসতে পারবেন না, হেডগার্ড সাতকড়িকে পাঠাবেন। সে এসে ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে।

ভাবিনীকে মধুসূদন বললেন, তুমিও চলো দিদি। কাজকর্মে অনেক সময় আমার বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। তুমি বাসার উপর থাকলে নিশ্চিন্ত।

ভাবিনী ঘাড় নাড়েন ঃ এ-বাড়িও যে তাহলে আর এক বাদাবন হয়ে যাবে।

সৈরভী নামে মাহিষ্যপাড়ার এক মেয়েকে বরে নেয় না, রাধিকা এনে এ-বাড়ি রেখেছেন। মাসে মাসে দেনও কিছু কিছু। আমি যাবো, আমি যাবো—করে সে নাচন জুড়ে দেয়।

মধুসূদন আপত্তি করেন ঃ উঁহু, দিদি রয়ে যাচ্ছেন। একলা উনি কেমন করে থাকবেন ?

সৈরভী বলে, আমি থেকে কি করব ? সকলে চারিচরণে রয়েছেন, তাই বা আমি ক'টা কাজ করতে পাই। পিসিঠাকরুন একাই সব করবেন। তাতেও সুখ হয় না—এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে কাজ করে দিয়ে আসেন। এখনই এই, আর কেউ যখন থাকবেন না—ওরে বাবা! হাত-পা বেঁধে পিসিঠাকরুন পিঁড়ি পেতে আমায় বসিয়ে রাখবেন।

মধুসূদন হেসে বললেন, তা থাকিস তুই পিঁড়িতে বসে। আমি ঠিক ঠিক মাইনে দিয়ে যাবো।

হাতে পায়ে আমার বাত ধরে যাবে বাবু। কাজ করব না, মাইনেই বা কেন নিতে যাব ?

মধুসূদন বলেন, কাজ মোটে করবিনে, সে তো নয়। ঝগড়া করবি দিদির সঙ্গে।

সৈরভী বলল, আমি ঝগড়া পারিনে।

তা বটে, তা বটে। মধুসূদন প্রণিধান করলেন ঃ তল্লাটের মধ্যে কে-ই বা পারে দিদির সঙ্গে ? কিন্তু একজনে যে ঝগড়া হয় না—তুই হাজির থাকলেই হবে, তোকে সামনে রেখে একাই দিদি চালিয়ে যাবেন।

সৈরভী বলে, ঠিক কথা বলেছেন। একলা ঝগড়া হয় না—কেউ না থাকলে সারা দিন খেটেখুটে রাতটুকু ভাবিনী পিসি নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুমিয়ে নিতে পারবেন।

প্রতিবেশী শশধর কথার মাঝে এসে পড়লেন ঃ বলছে কি সৈরভী ?

মধুসূদন বলেম, সৈরভীও বাদায় যাবে বলছে। মানুষ না থাকলে দিদি নাকি খুব ভাল থাকবেন, রাত্রে চুপচাপ ঘুমোবেন।

শশধর উঁহু উঁহু করে উঠলেন ঃ অমন কাজও করিসনে সৈরভী। দিদির জন্যে না হোক, আমাদের জন্য, পাড়ার ইতরভদ্র সকলের জন্য থাকতে হবে তোকে। ঝগড়া-ঝাঁটি বন্ধ করে দিদি চুপচাপ হয়ে যাবেন—সর্বনেশে কান্ড। রাত দুপুরে ধুন্দুমার—আমরা তার মধ্যে আরাম করে ঘুমোই। চোর-ছ্যাঁচোড় পাড়ার ত্রি-সীমানায় ঢোকে না—টাকাপয়সা উঠোনে মেলে দিয়ে রাখলেও কোন বেটা ছুঁতে আসবে না।

সৈরভী অনুকল্প হিসাবে তার বুড়োথুত্থুড়ে মাকে এনে দিল। ঝগড়ায় প্রতিপক্ষ অতিঅবশ্য চাই, কিন্তু সেজন্য যত বড় খান্ডারনীই হোক, ভাবিনী ঠাকরুনের মুখের সামনে নির্বাক পুতুল মাত্র। অতএব বুড়ো মায়ে অসুবিধা নেই। জলজ্যান্ত মানুষই বা কেন, একটা বাঁশের লাঠি দাঁড় করিয়ে রাখলেও তো কাজ চলা উচিত।

মধুসূদন এই এসে গেলেন, আবার এখন কিছুতে মোকাম ছাড়তে দেবে না। মরে গেলেও না। হেডগার্ড সাতকড়িকে পাঠালেন। সাতকড়ির বাড়ি এই মুলটিতেই—পশ্চিমপাড়ায়। মধুসূদনকে ধরেছিল, চেষ্টাচরিত্র করে তিনি বনকরের কাজ ঢুকিয়ে

নিলেন। লেখাপড়া কিছু কম জানার দরুন গার্ড হয়ে ঢুকতে হলো। কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে সাতকড়ি বাড়ি এসেছে, তার সঙ্গে এঁরা সব যাচ্ছেন—রাধিকা, ছটা ও নাছোড়বান্দা সৈরভী।

॥ তিন ॥

শেষরাত্রি। আকাশে তারা দপ-দপ করছে। গরুর-গাড়িতে ওঠার সময় রাধিকা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন। ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজের মধ্যে গ্রামপথে এক-সময় অবশেষে কান্না মিলাল, চোখের জল মুছে রাধিকা শান্ত হলেন। ছটা ভ্যানর-ভ্যানর করছে—কথার একটা দুটো জবাব দিতে হচ্ছে। তার এই প্রথম দূরদেশে যাওয়া—নদী দেখবে, নৌকো দেখবে। নৌকোর উপর ভেসে ভেসে যাবে। দিন কেটে যাবে নদীর উপর, রাত্রি আসবে। রাত্রিও কেটে যাবে।

রাধিকা বলছেন, রাত আছে খুকি, একটু শুয়ে নে। অত কি দেখছিস এক নজরে?

দেখছে, নতুন আর কি—ঘরবাড়ি গাছপালা মাঠঘাট। শেষরাত্রের পাতলা অন্ধকার মুড়ি দিয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে সব। গরুর-গাড়ি টিকির-টিকির করে যাচ্ছে—গরু ঠিক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে। গাড়োয়ানও জেগে নেই—নইলে এক-আধবার কি হেই-হুই করত না? কতদূর আর কাটাখালির ঘাট, গাড়ি যত এগোচ্ছে, কাটাখালি তার নদীটা নিয়ে তত যেন পিছিয়ে পড়ছে। আধেক-আঁধারে খেলা চলছে যেন গাড়িতে আর গাঙে। এ ধরতে যাচ্ছে, পালাচ্ছে ও ততই।

রাত পোহাল অবশেষে। দিব্যি ফরসা। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। মানুষও জেগেছে, ঘর-কানাচে গাড়ি গিয়ে পড়লে শব্দসাড়া পাওয়া যায়। সামনে তাকায় ছটা, গরু দুটো ঢিগ ঢিগ করে চলেছে তো চলেইছে। ডাইনে তাকায়, সাতকড়ি-জেঠারও ঠিক গরুর মতন হাঁটনা। রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ গাড়ি হুড়মুড় করে পাতালমুখো ছুটল। এসে গেছে কাটাখালি—নদীর খোলে নামছে।

শুকনোর সময় চড়া পড়ে গিয়ে জলধারা অতি সংকীর্ণ। ছটা মুষড়ে গেল: ধুস, এই তোমার নদী! এ তো লাফিয়ে পার হতে পারি।

রাধিকা হাসিমুখে বললেন, হনুমান সাগর লাফিয়ে পার হয়েছিলেন, আর আমার হনুমান-মেয়ে গাঙ লাফাবে—কত বড় কথা!

ছটার মাথায় অন্য ভাবনা ঢুকে গেছে: গাঙ ধরে যদি এইদিকে যাই—

গরুর-গাড়ি ছেড়ে সকলে নেমে পড়েছেন। প্রসন্ন সকালটা রাধিকার বড় ভাল লাগছে। ছটার সেই গাঙ ধরে চলে যাওয়া—বলছে, ধরো মা, যাচ্ছি আমি, কেবলই যাচ্ছি—

সৈরভী দুম করে বলে উঠল, যাও না, মানা করছে কে?

যেতে যেতে যেতে—তারপরে?

সৈরভী হাত দুলিয়ে বলে দেয়: তারপরেও যাও।

মাস ধরে গেলাম, বছর ধরে গেলাম, গাঙের শেষ মাথায় যখন পৌঁছে গেছি—

সাতকড়ি বলে দিল, সাগর।

শোনা কথা নয়, বইয়ে পড়া নয়, বাদার মানুষ নিজের চোখ দুটো দিয়ে দেখেছে। বড় বড় ভয়াল নদীর উপর দিয়ে সাগরের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে কতবার।

সেই সাগরের কিছু ফলাও বর্ণনা দিয়ে সাতকড়ি বাহাদুরি নেবে, ততক্ষণে ছটা মতি পরিবর্তন করে ফেলেছে। বলে, ওদিকে গেলাম না, যাচ্ছি এই উল্টো দিকে।

দু-মাস, ছ-মাস—

রাধিকা থামিয়ে দিলেন ঃ আর পারবি নে। পর্বত। চূড়া আকাশে ঠেকেছে। সেই আকাশ থেকে কলকল করে গাঙ নামছে।

ডিঙি ভাড়া করে সাতকড়ি কাটাখালির ঘাটে রেখে গেছে। জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে বোটের ব্যবস্থা। মালপত্তোর ডিঙিতে তোলা হলো। সাতকড়ি ডাকছে ঃ ওঠো তো এইবার। গোন লেগেছে, ছাড়বে।

জল থমথমা হয়ে ছিল, টান ধরেছে। আগনৌকোয় বসে গাঙের জলে থলবল করে ছটা পায়ের কাদা ধুয়ে নিল। করুণ কণ্ঠে বলে, আলতা ধুয়ে গেল—যাঃ। কেমন সুন্দর করে পটলিদি পরিয়ে দিয়েছিল।

ডিঙিতে ছই দিয়ে নিয়েছে—যে গরুর-গাড়িতে এল তারই মতন। দুটো লোক সামনাসামনি পা মেলে বসে তামাক খাচ্ছিল—হুঁকো রেখে ধাঁ করে ঘুরে দু-পাশের দাঁড়ে বসে গেল। কী মোক্ষম বাওয়া বাইছে কাঁ-কোঁ আওয়াজ তুলে। গাঙের জল উথাল-পাথাল। সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে ডিঙি। আর ওদিকে ঐ যে একটা লোক, যাকে মাঝি বলা হয়, লোকটার ভারি মজা!—নিষ্কর্মা বসে আছে। কদাচিৎ বা ঝপাঝপ কয়েকটা টান দিয়ে দিল। আবার চুপ।

কূল ঘেঁষে যাচ্ছে। ডাঙার পথ আর গাঙে যেন পাল্লাপাল্লি—পথেরও মুড়োদাঁড়া নেই। বড় বড় কয়েকটা তেঁতুলগাছ এল—তলার এদিকে সেদিকে চালাঘর হা-হা করছে মানুষজনের অভাবে। হাটখোলা—সাতকড়ি বলে দিল। হাটের সময় হলে দেখতে পেতে কী প্রচণ্ড ভিড়, কত কেনা-বেচা। এক ক্রোশ দূর থেকে আওয়াজ পেতে। আরও বেলা হলো, মানুষজন গরু-ছাগল নজরে পড়ছে। গাঙের উপর ঝুঁকে-পড়া নারকেলগাছে চড়ে এক ছোঁড়া কাঁদি কেটে দিল। জলে এসে পড়ল, জল ছিটকে গা ভিজিয়ে দিল ছটার। আর একটু হলে কাঁদিসুদ্ধ ঘাড়ের উপর পড়ত যে। সাঁকো একটা—নিচে দিয়ে যাবে, কিন্তু ছইয়ে আটকাচ্ছে। দাঁড় ছেড়ে উঠে দাঁড়ি একজন সাঁকোর বাঁশ উঁচু করে ধরল, সড়াক করে বেরিয়ে গেল ডিঙি।

ও সৈরভী, ও মা, খোপের মধ্যে কি তোমাদের? বাইরে এসে দেখ না—

ছটা উল্লাসে চেঁচাচ্ছে। পাড়ের পথ ধরে এক জোড়া পালকি যায়। বর-বউ। ভাল দেখতে পাবে বলে ছটা ছইয়ের উপর উঠে পড়ল। গোলপাতায় ছাওয়া ছই মচ মচ করে উঠল—ভেঙেচুরে না পড়ে। ছোট ছোট দুই পালকি কখনো আগুপিছু, কখনো বা পাশাপাশি যাচ্ছে। বর দেখা যায় পালকির দরজা দিয়ে—একেবারে একফোঁটা শিশু। ঢোল-কাঁসি নেই আর দশটা বিয়ের মতো—ঢোলক আর মন্দিরা। পালকি বইছে যেসব বেহারা, বাজাচ্ছে তাদের ভিতরের জনা কয়েক। গানও গাইছে তারা। ওদের মধ্যে ক'টা মেয়ে-বেহারা—ছটা ভেবেছিল তাই বটে—সাতকড়ি হেসে রহস্য ফাঁস করে দিল। মেয়ে ওদের একটাও নয়—শাড়ি ও পরচুল্লা পরে মেয়ে সেজেছে। পায়ে ঘুঙুর, গানের তালে তালে নাচছে তারা—কাঁধের পালকিও নাচের সঙ্গে দুলছে। ডিঙি থেকে এতগুলো লোক তাকিয়ে পড়েছে, এবং ছটা একেবারে ছইয়ের শীর্ষে—তাই দেখে বউয়ের পালকির দরজা ওদের একজনে খুলে দিল। আরে আরে, বউ দেখি আরও ছোট—আমাদের ছটার চেয়েও কমবয়সি।

সৈরভী বলে, ও মা, বাবুকে বলো না, ছটার বিয়েটা দিয়ে দিন।

যে-ই না বলা, হুড়ুম করে কি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈরভীর ঘাড়ে। চিল-শকুন

নয়, ছইয়ের উপর থেকে ছুটা লাফ দিয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই, দমাদ্দম কিলোচ্ছে।

ঠেলেঠুলে কবলমুক্ত হয়ে সৈরভী বলে, মেয়ে একখানা তুমি বাবা! বাঘিনী ঠাকরুনের ভাইঝিই বটে। একটু এদিক-ওদিক হলে যে গাঙের গর্ভে চলে যেতে হতো।

গাঙ কিছু বড় হয়ে এখন ডিঙি মাঝ বরাবর চলছে। কত গাঁ-গ্রাম মাঠঘাট পার হয়ে এল। আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারির বাগান এপারে ওপারে। এক জায়গায় বেশ মজা—এপারে ঘরবাড়ি ও ঘাট, ওপারেও ঠিক তাই। বউ-ঝিরা ঘাটে নেমে চান করছে, কাপড় কাচছে, কলসি ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে। এপারে-ওপারে গল্পগাছাও চলছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। তাতে জুত হলো না বুঝি—কলসি বুকের তলে দিয়ে সাঁতরে একটা মেয়ে এপারে চলে এল। এসে নিচুগলায় বলাবলি হচ্ছে। ডিঙি ছাড়িয়ে চলে এল, মেয়েটার চোখ ঘুরানো, তবু নজরে পাওয়া যায়, খিলখিল খুকখুক হাসি কানে আসে।

সাতকড়িকে ছুটা বলে, এমনি গাঙের উপর বাড়ি হলে বেশ হয়। না জেঠা?

সাতকড়ি বলল, গাঙের উপরের বাড়িতেই যাচ্ছ তো এবার। এ আর কি—সে সব মস্ত মস্ত গাঙ।

কত বড়? দূরের বাবলাগাছটা দেখিয়ে বলল, অত দূর?

ওর দশগুণ বিশগুণ। গাঙ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে যাবে মা-জননী। চোখ বুজে পড়বে, গাঙ যাতে না দেখতে হয়।

বাঁক ঘুরে গিয়ে গাঁ-গ্রাম অদৃশ্য। তলতাবাঁশ জলে ঝুঁকে পড়েছে, কঞ্চিতে কঞ্চিতে নিম্নমুখ বাদুড়। অজস্র বাদুড়-ফল ফলেছে, হঠাৎ মনে হবে। উল্টো পারে বিল। বিল থেকে পাশখালি এসে পড়েছে। ঘাস বোঝাই তিনটে ডোঙা ধুজি মারতে মারতে সেই পথে গাঙে এনে ফেলল। মাঝির কি ভাবোদ্রেক ঘটল, গান ধরল সে হঠাৎ:

> গুরু ভবপারের কান্ডারী।
> গুরু কি পার করিতে পারে
> হয় যদি তোর ছিন্নতরী?
> নবছিদ্র তরী 'পরে
> জল ওঠে তার নবদ্বারে—
> যাবি যদি ভবপারে
> তরী ছাড় শীঘ্র করে।

মাঝিকে দেখিয়ে ছুটা বলল, মানুষটা গতরখেকো জেঠা। গান গায় ভাল, খাটতে পারে না। ও বাইলে নৌকো আরও কত জোরে চলত।

সাতকড়ি চোখ টিপে বলে, ছুটা-মা বলছে কাজ করো না তুমি মাঝি। চুপচাপ বসে থাকো, আর গান গাও।

মাঝি রাগের ভান করে বলে, চুপচাপই থাকি তবে। এমনিও বদনাম, অমনিও তাই।

জল থেকে হাল একটু তুলে ধরতেই ডিঙি পাক খেয়ে গেল। মাছ ধরার জন্য পাড়ের দিকে পাটা দিয়ে ঘিরেছে, তারই ভিতর সেঁধিয়ে পড়ে আর কি! ছুটা আঁতকে উঠল। হাসতে হাসতে মাঝি হাল বেয়ে ডিঙি ঘুরিয়ে যথাস্থানে আবার নিয়ে এল। বলে, দেখতে পেলে কাজ আমার?

হঠাৎ সাতকড়িকে উচ্চাঙ্গের ভাবে পেয়ে যায়—এক্ষুনি যে দেহতত্ত্ব শুনল, তারই

ফল আর কি। বলে, ভগবানের কাজও এমনিধারা। হাল ধরে আছেন, ব্রহ্মাণ্ড ঠিকঠাক চলছে। মনে হবে, কিছু করেন না তিনি, ক্ষীরোদসাগরে পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছেন।

ছইয়ের খোপ থেকে রাধিকা মেয়েকে ডাকাডাকি করছেন: ঠা-ঠা রোদ্দুরে কেন, ভিতরে চলে আয়।

তা বই কি! বাড়িতেও তুমি ঘরে আটকে ফেল, ছলে ছুতোয় বেরুতে হয়। এমন খোলা গাঙে খোপের ভিতরে ঢুকে জুজুবুড়ি হয়ে বসতে বয়ে গেছে। চেঁচাক গে মা, ছুটা কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

মাঝিকে সাতকড়ি বলছে, বেলা মাথার উপরে। চাট্টি চিঁড়ে চিবিয়ে আছে সব। আর কতক্ষণ?

এতক্ষণে তো গিয়ে পড়বার কথা। মুখোড় বাতাসে দিক করছে বড্ড।

দাঁড়িদের উপর মাঝি হাঁক পাড়ল: টেনে চল ভাই। ভাঁটা থাকতে থাকতে ট্যাংরামারি পেঁছিতে হবে। বেগোন হলে বড় ভোগান্তি।

কষে দাঁড় টানছে। মাঝিও কড়া হাতে হাল বাইছে জলে আলোড়ন তুলে। গাঙ বেশ বড় হয়ে গেছে এখন, হাঁক পেড়েও এপারে ওপারে কথাবার্তা চলবে না।

ভ্যালা রে ভাইসব! পক্ষীরাজ উড়ে চলেছে।

স্ফূর্তি দিচ্ছে মাঝি। নিজ হাতের হালে হুড়ুম-হাড়াম আওয়াজ তুলে জল ভাঙছে। বাঁকখানা ঘুরে মুখোড় বাতাসও তেমন নেই। গাঙের স্রোত নাচাচ্ছে যেন ডিঙিখানা ধরে—ছোট্ট ছেলেটাকে হাতে তুলে যেমন নাচায়।

পাহাড় একটা। উঁহু, ঝুরি-নামা প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ—কাছে এসে বোঝা যায়। যাক, এসেছি তাহলে। দাঁড়ি-মাঝি সব সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে। জোয়ারের টান ধরে গেছে—আর দেরি হলে কাদা ভেঙে গুণ-টানা ছাড়া উপায় ছিল না।

বড় নদীতে এসে মিশল এতক্ষণের সামান্য গাঙ। মোহানাটাকে ট্যাংরামারি বলে—অশ্বত্থগাছ নিশানা। অশ্বত্থতলা আবার তিন রাস্তার মুখ। খেয়াঘাট অদূরে, বিস্তর লোক পারাপার হয়। দোকানও আছে, চাল-ডাল, নুন-তেল, হাঁড়ি-মালসা মেলে।

॥ চার ॥

ট্যাংরামারি ডিঙি বাঁধল। অর্ধেক জোয়ারে ছাড়বে। জোয়ার শেষ করে ভাঁটা ধরবে আবার সজনেখালি গিয়ে। বোট অপেক্ষা করছে সেখানে—ডিঙি ছেড়ে সরকারি বোটে চাপবে।

রাঁধাবাড়া এই জায়গায়। চাল-ডাল, আনাজপত্র সঙ্গে আছে—তবু যেহেতু হাতের কাছে দোকান, ভাণ্ডার এখন খরচা করবে না, কেনাকাটা করে নেবে। অধিক কিছু নয়—চালে-ডালে খিচুড়ি এবং আলু-ভাতে। থালা আছে সঙ্গে, কিন্তু মাজা-ঘসার হাঙ্গামায় কে যায়? অদূরের জলায় পদ্মবন। ফুল বেশি নয়, পাতা ছত্রাকার হয়ে আছে।

এক দাঁড়ি গিয়ে পদ্মপাতা তুলে আনল। পদ্মপাতায় রাধিকা খিচুড়ি ঢেলে ঢেলে দেবেন। কলাপাতায় ভোজ খাওয়া যেমন।

নদীর ঘাটে একটুকু জায়গা কঞ্চির বেড়ায় শক্ত করে ঘেরা। চান করবে তো ঐ ঘেরের মধ্যে—পথিকজনের সুবিধার্থে খেয়ার ইজারাদার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

অকূল গাঙে এমন খোপ-কাটা কেন ? সৈরভী জিজ্ঞাসা করল।

মাঝি বলল, যাও না গাঙে নেমে। জল থেকে উঠে দেখবে, বাঁ-হাতটাই নেই। হাত কি হলো, হাত কোথা গেল ? টেরও পাওনি কামটে কখন কুচ করে কেটে নিয়ে গেছে। রক্ত পড়ে গাঙের জল রাঙা হয়ে যাচ্ছে।

তেল মেখে ফেলেছে সৈরভী। স্নান বাতিল—মা গঙ্গার নাম করে ঘটির জল একটু মাথায় থাবড়ে দিল। সাতকড়ি ভরসা দিচ্ছেঃ আহা, ঘেরা জায়গায় ভয়টা কি ? বেড়া গলে পুঁটিমাছটাও সেঁধুতে পারে না, ঐখানে যাও তুমি।

তা কে বলতে পারে। জলে-ডোবা বেড়া—খানিক খানিক হয়তো বা ভেঙে গেছে জলের নিচে, দেখতে পাচ্ছিনে। কুমির-কামট ওত পেতে রয়েছে। গাঙে না গিয়ে শেষটা সৈরভী পদ্মবনের এঁদো জলার দিকে গুটি-গুটি চলল।

ছটা সৈরভীর পিছু পিছু যাচ্ছে। একটু গিয়ে পাক খেয়ে চু-উ-উ করে বুড়ি-চ্ছু খেলার মতো দম ধরে গাঙের দিকে ছুটল। ঘাটের দিকে গেল না সে, ঘেরের বাইরে মুক্ত গাঙে ঝপাস করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ভুস-ভুস করে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে সর্বচক্ষুর সামনে।

কী সর্বনাশ। ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন রাধিকা, চেঁচামেচি গালিগালাজ করছেনঃ উঠে পড় লক্ষ্মীছাড়ী, শিগগির ওঠ। ডাকাত-মেয়ে পথের উপর কী বিভ্রাট ঘটায় দেখ!

ভিজে কাপড় সপসপ করতে করতে ছটা সামনে এসে হি-হি করে হাসেঃ কামটে কাটেনি মা, হিসেব করে নাও। হাত আছে, পা আছে, নাক-কান-চোখ সমস্ত ঠিকঠাক আছে। মিথ্যেমিথ্যি লোকে ভয় দেখায়, হাতে হাতে সেইটে দেখিয়ে দিলাম।

সৈরভীর দিকে নজর পড়ে হেসেই খুনঃ দেখ দেখ, কাদা মেখে ভূত হয়ে আসছে। এ নাওয়ার দরকারটা কি ছিল ? বসে পড়ো এখানে সৈরভী-দি—

গলুইয়ে বসিয়ে গাঙের জল ঘটি ঘটি তুলে তার গায়ে ঢালছে। গাঙে হাত ডুবিয়ে জল তুলছে, সকলে হাঁ-হাঁ করে, ছটার ভ্রূক্ষেপ নেই। রাধিকা এসে হাতের ঘটি কেড়ে নিয়ে সেই ঘটিরই এক ঘা পিঠের উপর। মার খেয়ে ছটা হাসে।

চালে-ডালে খিচুড়ি, মশলার মধ্যে নুন ও আস্ত লংকা। আর সর্ষের তেল খানিকটা। তাই যেন অমৃত। ঝুরি-নামা অশ্বত্থতলা বেশ কেমন ঘর ঘর দেখাচ্ছে। তলায় শুকনো পাতা পড়ে পড়ে গাদা হয়েছে, কিছু ঝেঁটিয়ে ফেলে পদ্মপাতা নিয়ে সারবন্দি সব বসে গেল। রাধিকা একবাটি দু'বাটি করে সকলের পাতে দিয়ে গেলেন। পথের রান্নার আলাদা কেমন স্বাদ—খেয়েছে যারা, তারা বলতে পারবে। কিসমিস-দেওয়া ঘিয়ের মোহনভোগ বাড়িতে ছটার মুখে রোচে না, সেই মেয়ে পথের এই আজব খিচুড়ি চেটে-মুছে খেল, কণিকামাত্র পড়ে নেই।

রাধিকা ছটাকে ডাকলেনঃ রাত থাকতে উঠেছিলি, ভিতরে আয়, ঘুমিয়ে নে একটুখানি।

সুশীল সুবাধ্য মেয়ে মায়ের পাশটিতে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল—শুয়েই চোখ বোঁজা। বসে বসে ঘুমানোর ব্যাপারে সাতকড়ির খ্যাতি আছে, ঘুমের জন্য তাকে শুতে হয় না। একটা গুঁড়ির উপর পা ঝুলিয়ে বসে দিব্যি সে ঘুমিয়ে পড়ল। নাইয়াদেরও ঝিমুনি ধরেছে—কিন্তু একটু পরেই নৌকো ছাড়বে, ঘুমোয় কখন ? কড়া দা-কাটা তামাক টেনে টেনে ঘুম তাড়াচ্ছে।

ছটা চুপিসারে কখন উঠে পড়ে মাঝির সঙ্গে ভাব জমিয়েছে—বকর বকর করছে।

হালে একটুখানি সে বসবে। মাঝিও গররাজী নয়, সবুর করতে বলছে। বড়গাঙের মধ্যে এখন নয়—এর পরে দোখালায় ঢুকব, তখন হাল ধোরো। যাচ্ছি এখনো অনেকক্ষণ—তার মধ্যে শিখিয়ে পড়িয়ে তোমায় পাকা মাঝি বানিয়ে দেবো দিদিমণি। নৌকো নিয়ে একলা যেমন খুশি বেড়িও।

ঘোলা জল। ঝুঁকে পড়ে ছটা জলে হাত ডোবায়, কথা শোনে না। তরতর করে ডিঙি যাচ্ছে, হাতে জল কাটছে—খাসা লাগে। এককোশ জল তুলে মুখে দিয়ে থু-থু করে ফেলে দিল।

মাঝি হাসছে: খেলে না যে বড়!

কাটাখালিতে, আজকেই ভোরবেলা, ছিল ফটিকজল। দুপুরে ট্যাংরামারির জলে চান করেছে, রান্না করাও গেছে, খায়নি অবশ্য সে জল। এখন, এ যে বিষমকুট—গালে তুলেছে তো মুখ একেবারে নুন-নুন হয়ে গেছে।

পরের দিন অপরাহ্ণে সজনেখালি—বাদাবনের দরজা। বোট গেরাবি করে আছে, ডিঙি তার গায়ে লাগল। সরকারি কাজে আটকা ছিল বলে বোট কাটাখালি অবধি যেতে পারেনি। দরকারও ছিল না, ছোটখাট গাঙে ডিঙিই যথেষ্ট। ডিঙি বরঞ্চ তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছল।

ডিঙি ছেড়ে বোটে এইবার। জিনিসপত্র তুলে ফেলল। জলের উপরে ভাসমান দিব্যি একখানা ঘর। বোটে রান্না, বোটে স্নান, বোটে ঘুম। মাটিতে যা-একটু পা ঠেকিয়ে নিতে পার এইখানে। আর পা দেবে সেই ফরেস্ট-অফিসে গিয়ে: সে-ও মাটি নয়, তক্তার পাটাতন—এই বোটে যেমন আছ, প্রায় তেমনি।

সাতকড়ির সঙ্গে গল্পে গল্পে ছটা সব জেনে নিচ্ছে। সাতকড়ি বলে, সব ভাল। খাওয়ার সুখ, পয়সাকড়িতে সুখ, হুকুম-হাকামে সুখ। বনকরের লোক আমরাই বা কে, আর কলকাতার লাট-বাহাদুরই বা কে! কাজে কর্মে কোথা দিয়ে দিন চলে যায়, আমরা টেরই পাইনে। তবে সঙ্গীসাথী পাবে না বলে তোমার একটু কষ্ট হবে গোড়ায় গোড়ায়। পরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এটুকুও হতো না। আমার ভাগনে মণিকে জানো না, নন্দনপুরের মণিলাল, নড়াল কলেজে বি-এ পড়ছে—

জানে না আবার! ছটা জানে না তল্লাটে এমন কে আছে? তবে জানাই শুধু, বেটাছেলে বলে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মানে চুলোচুলি মারামারি এই সমস্ত বাদ, মুখ ভ্যাংচানি অবধি হয়ে ইতি পড়েছে। ছবির নেশা মণিলালের। তুলি আছে, পেন্সিল আছে, রঙের কখনো-সখনো অভাব পড়লে গাছ-গাছালির সঙ্গে দোকানের এটা-ওটা মশলা মিশিয়ে মতলব মতন রঙ বানিয়ে নেয়।

ছবি এঁকে একবার ছটাকে দেখিয়েছিল: কার ছবি বল তো!

ছটা প্রণিধান করে বলল, গরু—মুংলি গরুটা বোধহয়।

তোর মুন্ডু—। বলে ছটার হাত থেকে মণিলাল ছবি ছিনিয়ে নিল। দিনের পর দিন আয়নার সামনে বসে অনেক যত্নে নিজের ছবি এঁকেছে, আর ছটা বলে কিনা গরু। তারপরেও আবার তর্ক: মাথার দু-পাশে দুটো শিং ঐ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!

মণিলাল বলেছিল, তোরও একটা ছবি আঁকছি দাঁড়া না—লেজ তুলে চার হাতে গাছ বেয়ে উঠছিস।

সাতকড়ি বলছে, মণি বড্ড জ্বরজারিতে ভুগছে। কুইনিন খেয়ে দু-দিন চারদিন ভাল থাকে, আবার পড়ে। একেবারে কাঠিখানা হয়ে গেছে। ওর মাকে বললাম, বাদায়

আমার কাছে কিছুদিন থেকে আসুক। নোনায় ফাঁকার মধ্যে জ্বর পালাতে দিশে পাবে না। রং কালো হয়ে গেলেও দেহ তাগড়াই হবে। এখন হলে একসঙ্গে যেতে পারত। কিন্তু কলেজ রয়েছে। তাছাড়া একজনদের ছেলে পড়িয়ে সেখানে খাওয়া-থাকা পায়—সে ছেলের একজামিন। বোশেখ মাসে গরমের ছুটিতে যাবে।

নদী এখানটা চওড়া খুব, কিন্তু শেষ-ভাটায় জলধারা সরু হয়ে গেছে। ওপারে বন—এপারে মানষেলা, সজনেখালি। বনের ফাঁকে ফাঁকে অনেকদূর অবধি নজর চলে। তখন মনে হবে, বন নয়—বাগবাগিচা। তলায় তলায় এগিয়ে গেলে ঘরবাড়িও পাওয়া যাবে। এপারে ঘাটের উপর মোটা মোটা গাছ কয়েকটা, কেওড়াগাছ—ডাঙা অঞ্চলে এ-গাছ বড় দেখা যায় না। ঝড়ঝাপটা ও স্রোতের টানে ইতস্তত কয়েকটা উপড়ে পড়ে আছে।

হাটবার আজ, হাট বসেছে। বাদা অঞ্চলের বড় হাট সজনেখালি। বিস্তর হাটুরে মানুষ—নৌকোয় নৌকোয় ধুল-পরিমান।

সাতকড়িকে উঠতেই হবে হাটে। কোয়ার্টারের গিন্নি যাচ্ছেন, মেয়ে যাচ্ছে, হাট না করলে খাবে কি হপ্তাভোর?

সাতকড়ি উঠে যাচ্ছে তো ছটাও কি ছেড়ে দেবে?

মা তুমি 'না' কোরো না। মাটিতে পা ছুঁইয়ে আসি। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরেছে, ছাড়িয়ে আসি এটু।

সাতকড়ি বলেছিল নামার কথা, সে-ই এখন আবার ভয় দেখাচ্ছেঃ কত কাদা ভাঙতে হবে ঠাহর পাচ্ছ? নোনাকাদা কী বস্তু জানো না, কলসি কলসি জল ঢেলেও ধুতে পারবে না।

পড়ে-যাওয়া এক গাছের দিকে ছটা আঙুল দেখায়ঃ কাদায় যেতে যাব কেন জেঠা? দিব্যি ঐ গাছের উপর দিয়ে পাড়ে গিয়ে উঠব।

সৈরভী বলল, পা পিছলে যায় তো চিত্তির। কাদায় গড়াগড়ি খাবে।

কাজের গরজে সৈরভী দিদি হয়ে গেল। ছটা বলে, তুমি আছ সৈরভী-দিদি, পা পিছলাব কেন? পাশে পাশে তুমি যাবে, তোমার কাঁধে হাত রেখে কাদা বাঁচিয়ে দিব্যি পাড়ে গিয়ে উঠব।

রাধিকা গলুইয়ের উপর। বললেন, উনি ভর দিয়ে যাবেন বলে সৈরভী কাদায় কাদায় যাবে। আবদার!

তার আগেই এক ধাক্কায় ছটা সৈরভীকে কাদায় নামিয়ে দিয়েছে। মায়ের কথার জবাব দিলঃ একজনে কাদা ভাঙলেই হয়ে যায়, দু'জনের ভেঙে তবে লাভটা কি? হিংসুটেরাই ঐরকম করে, আমার সৈরভীদিদি সে-রকম নয়।

নৌকোয় নৌকোয় ঘাটের জল দেখবার জো নেই। পায়ে হেঁটে আর ক'টা মানুষ আসে—পথঘাট নেই, হাঁটবেই বা কোথা? মানুষ এখানে জলচর। অবাক হলো নৌকোর ভিড়ের মধ্যে একটা ডিঙির উপর নজর পড়ে গিয়ে। বিশাল ভুঁড়ি বের করে কালো কালো বেঁটেখাটো কতকগুলো লোক দু-সারি হয়ে ডিঙি জুড়ে বসে রয়েছে। হঠাৎ দেখে মনে হবে এইরকম। মিঠে জল মেটে-জালা ভরতি করে জঙ্গলরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

ধান-চাল হাঁস-মুরগি ও ডিমের অফুরন্ত আমদানি। আর এসেছে মাছ। কত নেবে, কত খাবে। আর দুটো নতুন জিনিস, ডাঙামুলুকে যা হাটেঘাটে পাও না—

মধু আর হরিণের মাংস। ঘাটে উঠেই প্রথমে দেখবে, কলসি কলসি মধু বেচতে বসে গেছে। লালচে মধু, আর কাচের মতন স্বচ্ছ সাদা মধু। সাদা মধুর দরটা কিছু বেশি—চিনি আর গুড়ের যে পার্থক্য। বিনিপাশে বেআইনি ভাবে মারা হরিণের ছাল ছাড়িয়ে বেচতে নিয়ে আসে, দাম সস্তা। হরিণের মাংসের মজা এই, যত পচবে খেতে তত ভাল। টক-টক স্বাদ, বেশি কেওড়াপাতা খায় বলে—পচলে সেটা মিইয়ে আসে।

সওদা সারা করে সাতকড়ি বোটে ফিরল। কাঁধের ঝুড়ি ভরতি নটেশাক, কচুশাক, কলমিশাক, উচ্ছে, বেগুন, কাঁচকলা, ঝিঙে। বিষম হাসিখুশি, সাত রাজ্যের ধন মাণিক পেয়ে গেছে আজকের হাটে। অজঙ্গি বাদাবাদ্যে আনাজ-তরকারি মাণিকই বটে।

মাছ আনেননি? রাধিকা শুধালেন।

সামান্য এনেছি। বেশি কি হবে। কাল বিকেল নাগাত গিয়ে পড়ব, তারপরে তো মাছে মাছে ছয়লাপ।

ঝুড়ির উপর দিকে তরকারি, নিচে মাছ। পারশে ভাঙান আর পায়রাচাঁদা।

রাধিকা বললেন, এই আপনার সামান্য হলো? খাবো তো চারজন আমরা। কমসম আপনি কিনতে পারেন না।

মুখ কাচুমাচু করে সাতকড়ি বলে, কি করি বউমা। দরদাম করিনি, কিচ্ছু না—দুয়ানি ফেলে দিলাম, এতগুলো দিয়ে দিল। বোটে চেপে যাচ্ছি সর্বজনায় চোখের সামনে দিয়ে, বাবুর একটা নামডাক আছে—দু-আনার নিচেই বা বলি কেমন করে? তা আমরা আছি, দাঁড়িমাঝিও এতগুলো যাচ্ছে—মাছ তাদের কিছু কিছু দিয়ে দিলে হবে।

পায়রাচাঁদা একটার দুরন্ত সাইজ—বগিথালায় ফেললে পুরোপুরি জুড়ে যায়। সাতকড়ি বলল, মা-জননীর কথা ভেবে এনেছি। মাছটা কেটে ফেলিসনে সৈরভী, আস্ত এমনি দিতে হবে।

রাধিকা আপত্তি করে বললেন, দে মশায়ের যেমন কথা! মেয়ে মাছের তো সিকির সিকিও খেতে পারবে না।

সাতকড়ি বলে, যদ্দুর পারে পারবে, আর সব ফেলে দেবে গাঙের জলে। খাওয়ার জন্যে তো নয়, দেখার জন্যে। মা জননী খাচ্ছে, মাছে থালাখানা জুড়ে রয়েছে—আমরা সব দেখব।

রাধিকা কি বলবেন আর প্রবীন মানুষের কথার উপরে! চুপ করে গেলেন।

সুমুঘ-আধার রাত্রি। চড়ন্দার সকলে শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ তোলপাড় পড়ে গেল। ভূমিকম্প? জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। এধারের বাক্সপেঁটরা ওধারে চলে যাচ্ছে। উনুনটা কাত হয়ে পড়ল। শিকেয় ঝোলানো হাঁড়িকুড়ি দোলনার ছেলের মত প্রচণ্ডবেগে এদিক-ওদিক দুলছে। হড়াশ করে বিশাল এক ঢেউ কামরার ভিতরে ঢুকে বিছানা-কাপড়চোপড় ভিজিয়ে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছটা চেঁচিয়ে উঠল, যে যেখানে ছিল উঠে পড়েছে। সাতকড়ি আগনৌকায় বেরিয়ে পড়ছিল—দাঁড়িমাঝি সমস্বরে না-না করে ওঠে: মানুষসুদ্ধ ভাসায়ে গাঙে নিয়ে ফেলবেনে, টাল সামলাতি পারবানে না।

বোট, মনে হলো, ভুস করে পাতালে ডুব দিয়েছে। জলের তলে সকলে। তবু কিন্তু ডোবে না, ভেসে ওঠে পরক্ষণে। দাঁড়িরা সর্বশক্তিতে বাইছে। খুঁটোয় পা আটকানো—দাঁড়টানার মুখে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে, আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। কাড়ালের উপর মাঝিও কষে হাল বাইছে, দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে গায়ে। রাধিকা

জবুথবু হয়ে মাঝির দিকে মুখ করে বসেছেন। মাঝি সাহস দেয়ঃ ভয় কি মা-ঠাকরুন। এক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে নে। তিরমোহিনীর এইখানটা একটু গোলমাল করে। পার হয়ে গেলাম বলে। অন্ধকারে যা দেখা যায়—জল আর জল। তিন নদী এক জায়গায় মিলেছে—কূলের সাকিন নেই।

মাঝির কথা ঠিক—খুব খানিকটা ধুন্দুমার করে হঠাৎ জল শান্ত হয়ে গেল। বোট তরতর করে যাচ্ছে, মাঝি কলকে ধরাল। বনের মাথায় চাঁদ দেখা দিয়েছে, চারিদিক দিব্যি স্পষ্ট হয়ে এল। মোহানা কাটিয়ে এসে এখন এক ছোট গাঙে পড়েছে। এপার-ওপার দু-পারই নজরে আসে।

বন উভয় দিকে। গোলঝাড়—কী বাহার মরি মরি! নারকেলের মতন পাতা ভুঁই ফুঁড়ে উঠেছে, জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে, বাদামি ফলের কাঁদি কাঁদি ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। হেঁতাল—ঠিক যেন খেজুরগাছ। ঝুপসি ঝুপসি গেঁয়োগাছ। বড়গাছও কত—সুঁদুরি গরান পশুর কাঁকড়া খলিশ বাইন কেওড়া ধুঁধুল। আঙুল তুলে সাতকড়ি দেখিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছে। বুনোলতা গাছেদের মাথায় মাথায়, পায়ের গোড়ায় সুচোল-মুখ শুলো। নেমে যে আরামে হাঁটবে সেটি হচ্ছে না—পা রক্তাক্ত করে দেবে। বনের দেশে এসে পড়লাম, মানুষ পছন্দসই নয় এদের। ঢোকবার মুখে ত্রিমোহিনীর গাঙ কী রকম নাস্তানাবুদ করল, দেখলে না!

পরের দিন। দুপুর গড়িয়ে গেল, ছটার আর ভাল লাগছে না। জল আর বন। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা নৌকোর দেখা মেলে. মানুষ দেখা ও মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা সেইসময়। সে জিনিস খুব কম হয়ে পড়েছে এখন। নদী প্রকাণ্ড হয়েছে—বনের অন্ধি-সন্ধি থেকে কত নদী কত খাল এসে এসে পড়েছে। ও-পার অদৃশ্য। এ-পারও চলে গিয়ে, জল—শুধু জলই বুঝি এর পর। কাটা-খালির সেই গাঙ যেতে যেতে সত্যি সাগর হয়ে পড়ল।

সাতকড়িকে বলে, মাঝি পথ ভুল করেছে জেঠা। সাগরে নিয়ে চলল।

সাতকড়ি প্রবোধ দেয়ঃ না রে পাগলি। প্রায় তো এসে গিয়েছি, আর সামান্য পথ।

ছটা অধীর কণ্ঠে বলে, কাটাখালি ছাড়া থেকে ঐ তো এক কথা তোমার—এসে গেলাম, এসে গেলাম।

বোটম্যানদের জিজ্ঞাসা করে দেখ্—

ওদের চোখ টিপে দিয়েছ জেঠামশায়। ওরা কি আলাদা কিছু বলবে?

সকাল থেকে ছটা আজ এমনি লেগেছে। বোট এখন কূল ঘেঁষে যাচ্ছে। বড় একখানা বাঁক ঘুরে হঠাৎ বাড়ি দেখা গেল। এসেছি—সত্যি সত্যি এসে গেলাম তবে।

দোতলা সমান উঁচু বাড়ি। নদী থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে—সিঁড়ির মাথায় বারাণ্ডা, আর নিচে জলের উপর কাঠের জেটি।

সাতকড়ি দেখালঃ বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, ঐ দেখ—

বারাণ্ডার রেলিংয়ে তিন-চার জন ঝুঁকে ছিল, সিঁড়ি বেয়ে তারা জেটিতে নামল। বোট কাছাকাছি এসেছে, মধুসূধনকে চেনা যাচ্ছে, সকলের আগে তিনি। ছটা চেঁচিয়ে উঠলঃ বাবা!

এদিকে সেদিকে গেরাবি-করা নৌকো। কাঠের ও গোলপাতার কিস্তি—সুন্দরবনের ভাণ্ডার থেকে ভরা সাজিয়ে নিয়ে ফেরত যাচ্ছে। বাদায় ঢোকবার পাশের দরবার নিয়ে কতক ধন্না দিয়ে পড়ে আছে।

॥ পাঁচ ॥

মোটা মোটা খুঁটির উপর তক্তার পাটাতন। তার উপরে ঘর—টিনের ছাউনি। বারাণ্ডার লাগোয়া অফিসঘর, পিছন দিকে কোয়ার্টার। কসাড়বনে বিঘে কতক জমি খাবলা করে নিয়ে তিনদিকে খুঁটি-তক্তার পাঁচিলে ঘের দিয়ে নিয়েছে। খোলা দিকটায় গাঙ—বাইরে চলাচলের একমাত্র পথ। ডাঙার উপরে পা ফেলে ফেলে যাওয়া—সে বড় কঠিন জিনিস, হরেক রকমের বন্দোবস্ত তার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছটা সকলের আগে উপরে উঠে গেল। অফিসঘর পার হয়ে বাসাঘরে—শোওয়া-বসা যে ঘরে হবে। তার ওদিকে রান্নাঘর, স্নানের ঘর। এবং গার্ড ও বোটম্যানদের জন্য কয়েকটা ঘর পাশাপাশি। চারিদিকে এক চক্কোর মেরে উঠানে নামল সে ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে। অনেকখানি জায়গা, উঁচু বেশ। দু-পাশে দুই পুকুর। পুকুর কেটে সেই মাটিতে জায়গা উঁচু করেছে। পুকুর দেখে ছটার ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে যায়। পুরো তিনটে দিন বসে বসে হাত-পা ধরে গেছে—সাঁতরে বার কয়েক এপার-ওপার করলে চাঙ্গা হতে পারে।

যতীন ছোড়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে—চেনা-পরিচয় আছে, মধুসূদনের সঙ্গে একবার মুলটি গিয়ে ছিল কয়েকটা দিন। যতীন বলল, সাঁতার কাটা যাবে না কেন। তবে বিষম কটু জল, মুখের মধ্যে গেলে থু-থু করতে হবে। মিঠা জলের পুকুরও আছে—স্টেশন থেকে সামান্য দূরে। পুরানো পুকুর, কোন আমলে কারা কেটেছিল, কে জানে। সেইদিক দিয়ে বড় সুখ—খাবার জলের অভাব আমাদের নেই।

পিছন দিককার পাঁচিলের ঘেরে ছোট্ট একটু দরজা—মিঠাজল ওই দিকে। তালা-বন্ধ দরজা—খিল হুড়কো ছিটকিনি-আঁটা। জল আনবার গরজ পড়লে তবেই দরজা খোলা হয়। লোকজন নিয়ে খুব সতর্ক হয়ে পাঁচিলের বাইরে যায়।

রাত্রি হল। ভাত-তরকারি আজ পয়লা দিন যতীন শোবার ঘরে নিয়ে এল। খাওয়া-আঁচানো ঘরের মধ্যেই। দিনমানে এঘর-ওঘর উঠোন-রান্নাঘর কোরো—রাত্রি-বেলা বেরিয়ে কাজ নেই। কোন স্টেশনের উঠোনে সেদিন নাকি বাঘ ঘুরতে দেখা গেছে। গরমের রাত্রে সাপেরা তো আকচার যত্রতত্র হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। বনরাজ্যে দিবারাত্রি তাদের ষোলআনা রাজত্ব ছিল—দিনমানটা আমরা দখল নিয়ে নিচ্ছি, রাত্রে বাগে পেলে ওরা ছেড়ে কথা হইবে না।

ছটার খারাপ লাগছে। জনপ্রাণী নেই, বনের মতন তাকেও বোবা হয়ে থাকতে হবে। হাঁটা-চলার জায়গা নেই—অচল পা-দুটো দিয়ে ঠিক একদিন গাছের মতোই শিকড় বেরিয়ে যাবে। পাঁচিলের লাগোয়া বিশাল ঐ কেওড়াগাছ—আর ঘরের মধ্যেও তো একটা গাছ, হ্যাঁ গাছই বলতে হবে—গাছের নাম ছটাকি।

গাঙে গাঙে তিনদিন-তেরাত্তির পরে মেজেয় ঢালা-বিছানা। চোখ বুঁজে মনে হচ্ছে এখনো বোটের উপরে—ঘরের কাঠের মেজে হুবহু সেই বোটের পাটাতন। একঘুমের পর জেগে উঠেও সেই অনুভূতি—বোটে ভেসে যাচ্ছে, নিচে জলস্রোত। চোখ মেলে ছটা এদিক-ওদিক তাকায়। বারাণ্ডায় সারারাত আলো ঝোলানো থাকে—অকূল গাঙে মাঝিমাল্লাদের নিশানা। ঘুলঘুলি দিয়ে কিছু আলো ঘরে ঢুকেছে। বোট ছেড়ে ঘরে এসে শুয়েছে—তখন আর ছটার সন্দেহ থাকে না। জলের আওয়াজ কেন তবে—যেখানটা শুয়ে আছে ঠিক তার নিচে? ছলাৎ ছলাৎ করে জল প্রহত হচ্ছে। ভয় পেয়ে গেছে সে—বাবা বাবা করে ঘুমন্ত মধুসূদনকে ডাকে।

কি রে?

ঢেউ ভাঙছে যেন মেজের নিচে ?

গাঙে জোয়ার লেগেছে—। মধুসূদন নির্বিকার ভাবে বললেন।

ঘরের মধ্যে গাঙ।

ঘরে বাইরে সব জায়গায়—

মধুসূদন আমল দিলেন না। বলেন, জোয়ারে এই রকম হবে, ভাঁটায় জল নেমে যাবে। ঘুমো তুই।

পাশ ফিরে নির্ভাবনায় তিনি ঘুমোতে লাগলেন।

বনকে ছটা বোবা ভাবছিল—একেবারে যে উল্টো! মানুষে আর ক'টা কথা বলে, বনের কলরবে ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙে যায়। শতেক দিক থেকে একশ রকম কণ্ঠে বনের কথা। মোরগ ডাকে কোঁকর-কো কোঁকর-কো ঘোর জঙ্গলের মধ্যে—গাঁ-গ্রামে যেন ডাক শুনি। বনমোরগ—শিকারীরা মাঝে-মধ্যে অফিসে ভেট দিয়ে যেত, ছটা পরে দেখেছে। পোষা-মোরগের মতোই—রংটা কিছু বেশি ঘোরালো। (একবার গাছের কোটরে হাত ঢুকিয়ে, মোরগ নয়—মোরগের পেটের নিচে থেকে নিজেই ছ'টা ডিম চুরি করে এনেছিল। যাক গে, বলবেন না যেন কাউকে।) বনের অধিষ্ঠাত্রী বনবিবির নামে মানত করে লোকে বাদায় ঢোকে। পাঁঠা-মোষে দেবীর অরুচি, মোরগটা বেশি পছন্দ করেন। বলি দিতে হয় না, দেবীর নামে ছেড়ে দিয়ে আসে। তাদেরই ছা-বাচ্চারা জঙ্গলের যত্রতত্র চরে বেড়ায়। ওড়েও বটে।

কত রকমের পাখী! বনটিয়া শামখোল করমকুলি কাস্তেচোরা বাঁশকুরালে বিলবাগচু দুধরাজ রক্তরাজ ভীমরাজ—নামে নামে মহাভারত হয়ে যাবে। পাখির বাতান আছে, যতীন বলল—মিঠাপুকুরের ধারে কয়েকটা কেওড়া ও ওড়া গাছের উপর। কিচির-মিচিরে কনে তালা ধরিয়ে দেয়।

শুধু পাখি? কথা না বলে কে জঙ্গল-রাজ্যে? গাছপালা জলবাতাস—মানষেলার মধ্যে যারা চুপচাপ নিপাট-ভালমানুষ—বাদাবনে এসে হুল্লোড় দেখ তাদের।

যতীন বলল, আরও তো শোনেনি খুকু, কাতর হয়ে রাত্রে ঘুমুচ্ছিলে। হরিণের ডাক, বাঘের ডাক। ডাকের মধ্যেও ঘোরপ্যাঁচ কত। থাকো বুঝতে পারবে।

রাধিকা রান্নাঘর নিয়ে পড়েছেন। রাঁধতে খাওয়াতে ভালবাসেন তিনি চিরকাল। গাঁয়ে মাছ দুর্লভ, সামান্য যা মেলে আগুন-ছোঁয়া দর। মানুষ হিসাব করে এক টুকরো আধ-টুকরোর বেশি দিতে পায়তেন না। মাছের অভাব তরি-তরকারিতে পূরণ হতো। এখানে বিপরীত। কত মাছ খাবে, খাও না। জেলেরা দিয়ে যায়—'আর না' 'আর না' করলেও ঢেলে দিয়ে পালায়। তাছাড়াও খাঁড়ির সঙ্গে উঠোনের পুকুরের যোগাযোগ—এক খেওন জাল ফেলে টেনে তোলা দায়। অভাব আনাজের। হাটের সওদা সাতদিন অন্তর আসে, তার মধ্যে আধ-শুকনো তরকারি থাকে এটা-ওটা। সেই হাটবেসাতি কোন হপ্তায় এলোই না হয়তো।

মনের সাধে রাধিকা রকমারি মাছের ব্যঞ্জন বানাচ্ছেন। যতীনকে হাতে ধরে শেখাচ্ছেন—রান্নার রাজসূয় ব্যাপার এঁরা ফিরে যাবার পরেও যাতে চালু থাকে। যতীনের বিষম উৎসাহ—বাবু কতটুকু আর খাবেন, মহানন্দে নিজেই সে সাঁটবে।

॥ ছয় ॥

এক বিকালে মণিলাল এসে পড়ল। ছাত্রের এগজামিন সারা হতেই বেরিয়ে পড়েছে

—প্রকাসির উত্তম বন্দোবস্ত আছে, কলেজ বন্ধ হওয়া অবধি অতএব দেরি করা নিষ্প্রয়োজন। সাতকড়িকে চিঠি দেওয়া ছিল—সজনেখালি অবধি গিয়ে ভাগনেকে সে নিয়ে এসেছে।

এসব জায়গায় মানুষ এলে, বিশেষ করে চেনা মানুষ কেউ এলে, উৎসব পড়ে যায়। আর মণিলাল তো নিজস্ব মানুষ একেবারে। সত্যি, খুব রোগা হয়ে গেছে সে। রাধিকা বললেন, দে মশায় কখন আসেন কখন যান, ঠিকঠিকানা নেই। এসে তারপরে তো রাঁধাবাড়া করবেন—অনিয়মে তোমার শরীর সারবে না বাবা। যতদিন আছে, আমাদের এখানেই চাট্টি চাট্টি খেও।

কাসুন্দি আর আমসি নিয়ে এসেছে মণিলাল। বাঘিনী ঠাকরুন দিয়েছেন, না এনে উপায় কি? প্রকাণ্ড একটা ইঁচোড়ও দিচ্ছিলেন। বললেন, মেয়েটা তলায় তলায় আমের গুঁটি কুড়িয়ে ঘুরত—সে পোড়া দেশে শুনেছি আম-কাঠাল নেই। নিয়ে যা, কত আহ্লাদ করবে দেখিস। দূরের গোলমেলে রাস্তা ইত্যাদি বলে অনেক কষ্টে ইঁচোড়টা মাপ হলো, কাসুন্দি-আমসি বয়ে আনতে হলো।

মণিলাল যাচ্ছে শুনতে পেয়ে ভাবিনী বড্ড খুশি। বুড়োমানুষ মাঠ ভেঙে নন্দনপুর অবধি এসে হাজির। বললেন, ছটফটে মেয়ে—গাঁ-ময় হৈ-হৈ করে বেড়াত। একা একা এখন মুখ শুকনো করে চুপচাপ থাকে। তুই গেলে মনের সুখে ক'টা দিন কথা বলে বাঁচবে।

শুনতে শুনতে ছটা ভ্রূকুটি করেঃ যা যা, দেমাক করিসনে—কত আমার কথা বলার লোক!

মণিলাল আহত কণ্ঠে বলে, দেমাক কিসে হলো। আমি তো বলিনি—তোর জন্যে পিসিমা বড্ড ভাবেন, তিনি বলেছিলেন। আমি আরো বোঝালাম, মেসোমশায় অবিশ্যি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মাসিমা তো—

শেষ করতে না দিয়ে ছটা বলে, মা আরও ব্যস্ত—রান্নাঘর নিয়ে। যতীন আর সৈরভীও ব্যস্ত—মায়ের যোগাড় দিতে দিতে দিনরাত্তির হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

মণিলাল সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে।

ছটা খিল খিল করে হেসে বলে, নিত্যিদিন যজ্ঞিবাড়ি এখানে।

এত রেঁধে খায় কে?

আমরা যদ্দুর পারি খাই। পাঁচ-ছ'টা বেড়াল আছে, কোত্থেকে একটা ভুঁদো কুকুর এসে জুটেছে, তারা সব খায়। মাঝেমধ্যে বোটম্যানরাও কেউ কেউ নিয়ে যায়। বাদ-বাকি দুই পুকুরের জলে—অগুন্তি মাছ পুকুরে, তারা সব খায়।

মণিলাল বলে, কষ্ট করে এত রাঁধাবাড়ার কি দরকার?

ছটা বলে, সুখই তো রাঁধাবাড়ায়। সর্বক্ষণ মা রান্নাঘরে ওদের সব নিয়ে সুখ করছে। কায়দা পেয়ে গেছে, আর মা ছাড়ে!

জোর দিয়ে আবার বলল, আমার তা বলে মোটেই একটা ঠেকে না, মুখ শুকনো করে আমি থাকিনে। পিসিমা মিছামিছি ভাবেন।

দেশে-ঘরে ভাবিনী-পিসির উদ্বেগ—আবার এখানেও একদিন বাবা-মায়ে ঐ ধরনের বলাবলি হচ্ছে, ছটার কানে গেল। মধুসূদন বলছেন, মেয়েটা বেশ খানিকটা সইয়ে নিয়েছিল। মণি আসার পরে এখন একজুটি হয়ে দুটিতে আছে—চলে গেলে একলা হয়ে পড়বে, বিষম কষ্ট হবে তখন।

ছটার হাসি পাচ্ছে।

মণি যেন একমাত্র সাথী—গেলে বুক চাপড়াবে, আছাড়িপিছাড়ি খাবে! যাক না চলে সে, আর সৈরভী অষ্টপ্রহর বাটনা বাটুক, মাছ কাটুক, যতীন রান্নাবান্নার পাঠ নিক। বয়ে গেছে। বনের সঙ্গে তাব জমিয়ে নিয়েছে ছুটা, অগুন্তি সঙ্গীসাথী এখন। কত রকমের পাখি—ছোটখাট দোয়েল ঘুঘু গয়াল বাটাংরা সব, আবার দৈত্যাকার গাড়াপোলা মদনটাক। ভীমরাজ কথা বলে থেকে থেকে, বাঁশকুরাল হুঙ্কার ছাড়ে। বিলবাগচু গাছের মাথার সারাদিন ঝিমোয়, যখনই তাকাও চুপচাপ বসে রয়েছে—সূর্য ডোবার পরে চরে নামে আহারের চেষ্টায়। উঠোনের ঘাসে তিড়িং-মিড়িং করে ফড়িং লাফায়। নানান রঙের নানান চেহারার মেঘ ভাসে আকাশে, ফুল উঁকিঝুঁকি দেয় ঝোপ ঝাড় থেকে।

জলে আর জঙ্গলে সারাক্ষণ ধরে খেলা—এই ঝগড়া চলছে, এই আবার ভাব একটু পরেই। বারান্দার উপর ঝুঁকে পড়ে ছুটা দেখে, দেখার আর শেষ নেই। ভরা জোয়ারে, দেখ, লাখে লাখে ঢেউ পাড়ের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, খোকা-খোকা গাছের মুণ্ড চেপে ধরে জলের মধ্যে, ঝাঁকি দিয়ে তখুনি সে গাছ আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় গাছের গোড়ার মাটি ধুয়ে শিকড় সম্পূর্ণ আলগা করে দিয়েছে—দেখতে যেন বুড়োমানুষের শিরাবহুল হাত। শীর্ণ হাতে মোক্ষম-সোক্ষম করে মাটি আঁকড়ে ধরে কোন রকমে টিকে আছে, গাঙের স্রোত ভাসিয়ে নিতে পারছে না। গাছদের দশা দেখে ছুটার কষ্ট হয়—হঠাৎ বা সশব্দে আহা-রে বলে ওঠে। মণিলাল তখন হয়তো কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে আঁকিচোক কাটছে—ছুটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে পড়ে।

আবার ভাটির সময় দেখ। গাঙের এখন ভাঙা কপাল—পাশা বিলকুল উলটেছে। জল অনেক নেমে গেছে—জঙ্গল থেকে বিস্তর দূরে। মাঝখানে কাদায়-লেপা সমতল দূরপ্রসারী চর। হাওয়ায় লতাপাতার মাঝ থেকে হিস হিস একটা আওয়াজ উঠছে, বিদ্রূপ—কথাগুলোও ছুটা যেন শুনতে পাচ্ছে: বড্ড যে বাড় বেড়েছিল—কেমন জব্দ, কেমন! তবু গাঙ সর্বশক্তি একত্র করে ঢেউ তুলছে বনের অভিমুখে—দুর্বল ঢেউ, উঠতে না উঠতে ভেঙে যায়। ছাড়ে না—আবার তোলে ঢেউ, আবার ভাঙে। অক্ষম হাস্যকর চেষ্টা—আকশের চাঁদ-তারাদের ধরবার জন্য বামনের নুলো হাত বাড়ানোর মতো। কাণ্ড দেখে ছুটা তো হেসে হেসে খুন। মণিলাল ওদিকে ভেবেই পায় না, আধপাগলা মেয়েটা অত হাসে কি জন্য!

আর মুলটি গাঁয়ে বসে বাঘিনী পিসিমা নিশ্বাস ফেলছেন: আহা-রে, জঙ্গলের মধ্যে নিঃসঙ্গ মেয়েটা মুখ চুন করে রয়েছে।

•

পাঁচিলের দরজা খোলে এক-একদিন, কলসি নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে মিঠাপুকুরে যায়। ঘাটে বাওয়ালি কাঠুরে যারা থাকে, তারাও জুটে পড়ে ঐ সঙ্গে। ফরেস্টগার্ড বন্দুক নিয়ে যাচ্ছে। সমারোহ ব্যাপার। পাঁচিল-ঘেরা দুর্গ থেকে বনরাজ্যে সশস্ত্র অভিযান যেন!

ছুটা যেখানেই থাকুক আর যা-ই করুক, ছুটে এসে পড়বে। পাঁচিলের চাবি যতীনের হেপাজতে। এ সময়টা সে এক আলাদা মানুষ। তালা খুলতে খুলতে তাড়া দিয়ে ওঠে: যাও যাও, ইদিকে কি তোমার?

ছুটা বলে, বাইরে যাচ্ছি নাকি? উঁকি দিয়ে দেখছি কী সব আছে ওধারে!

যতীন তামাসা করে, ভূত-বেহ্মদত্যি জিন-পরীরা সব গাছে গাছে বাসা বেঁধে

রয়েছে। সরো সরো, দরজা দিই।

সবগুলে লোক বেরিয়ে গেলে যতীন আবার ওদিক থেকে তালা এ'টে দেয়। তবু ছটা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কলরব দূরবর্তী হয়ে যায়। ফাঁকা দেওড় করছে কানে আসে।

এক দপুরে বড্ড সুযোগ এল। ডেপুটি-কনজারভেটরের ডাকে মধুসূদন সাতকড়িকে নিয়ে ভিন্ন এক স্টেশনে গেছেন। যতীন তাসে বসেছে জেটির এক কাঠুরে-নৌকায় গিয়ে। গ্রীষ্মের এই দুপুরবেলা খোলা বারাণ্ডায় সৈরভী বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। রাধিকা মেয়েকে গ্রেপ্তার করে নিজঘরে এনে শুইয়ে নিজেই মুহূর্তমাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছেন—তাক বুঝে মেয়ে টিপিটিপি বেরুল। তালার চাবি যতীন রান্নাঘরের চালের বাতায় গুঁজে রাখে, দেখা আছে। নিঃসাড়ে চাল অবধি বেয়ে উঠে চাবি নিয়ে নিল সে। সাতকড়ির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে, মণিলাল ঢাউশ একখানা বইয়ের পাতা উলটাচ্ছে।

চক্ষু কপালে তুলে ছটা বলে, জেঠা নেই—আজও পড়ছিস?

মণিলাল পরমাগ্রহে বলে, পড়বি তুই? কিচ্ছু তো করার নেই এখানে। পড়াশুনো কর। আমি পড়াব।

তুই?

অবাক হলি যে? নড়ালে থেকে পড়ি যেমন, পড়াইও তো আমি। খুব ভাল পড়াই রে—যাদের বাড়ি পড়াই, তারা বিষম খুশি। বইটই নিয়ে এসেছিস তো।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে ঐসব ঝঞ্ঝাটের কথা—ধানের হাটে ওল নামানো একেই বলে থাকে। কথা না বাড়িয়ে ছটা মণিলালের হাত ধরে টান দিল: চল্—

উঠানে নামিয়ে এনেছে। নাছোড়বান্দা মণিলাল বলছে, মেসোমশাইকে বলব পড়ার কথা। বই যদি না এনে থাকিস, এবারে যখন সদরে যাবেন উনিই কেনা-কাটা করে আনবেন।

ভালমন্দ কিছুই না বলে ছটা পাঁচিলের চাবি খুলছে। বলে, মিঠাপুকুর দেখে আসি চল্—

শিউরে উঠে মণিলাল বলে, সর্বনাশ!

চোখে-মুখে ভয় দেখতে পেয়ে ছটা হাসছে। বলে, দেখেশুনে বেরিয়েছি। ঘুমুচ্ছে সবাই, টের পাবে না।

ঘরে টের না পাক, জঙ্গলের ওরা টের পাবে ঠিক। ওরা ঘুমোয় না।

কাতর হয়ে মণিলাল আবার বলে, কেন পাগলামি করছিস? ফের্—

ক্রুদ্ধ হয়ে ছটা বলল, একাই আমি যাবো, তোর যেতে হবে না। ভীতু কোথাকার!

ম্যাচ-ম্যাচ করে সে চলল। ক'পা গিয়ে তালা আঁটবার কথা মনে পড়ে গেল—পিছনে ঘুরে দেখল, মণিলালও বেরিয়ে এসেছে।

নরম কণ্ঠে তখন বলে, তুই কেন আসতে গেলি? একাই তো যাচ্ছিলাম।

চটে উঠে মণিলাল বলল, যেতে যেতে কদ্দুর চলে যেতিস—তোর কি মাথায় কিছু আছে?

কথা শুনে ছটা ফিক করে হেসে ফেলল: যাই-ই যদি, পিছনে তুই বুঝি পায়ে দড়ি দিয়ে টানবি?

পরক্ষণে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, ঘরের লোক দেখেনি—জঙ্গলের ওরা কি আর নজর

পেতে বসে রয়েছে? আর দেখলেই বা কি, বন্দুক সঙ্গে নেই কেমন করে বুঝবে? কোনো মিঞা ধারে-কাছে আসবে না দেখিস—যতীনদের বেলাও তো আসে না।

কত ফুল, দেখ দেখ, বাদাবন এক সাজানো বাগান। খলসিফুল, হেঁতালফুল কেওড়াফুল, গেঁওফুল, গরানের ফুল—এসব গাছ ছটার চেনা হয়ে গেছে—আরও কত কত নাম-না-জানা ফুল। সাদা খইয়ের মতন ছোট্ট ছোট্ট ফুল—শালুক ফুল কি ওগুলো? লতাই বা কত রকমের। পত্রহীন সরু সোনালি লতা—সোনার সাতনরী হার পরে বাহার করে আছে গাছেরা। মৌমাছি উড়ছে, প্রজাপতি উড়ছে। মণিলাল আগেই যা বলে রেখেছে—ফুল তুলতে তুলতে এগুচ্ছে ছটা। এগুচ্ছেই। ছুটে ছুটে ফুল তোলে—এক হাতে কুলোয় না, এ-হাত ও-হাত দুই হাতে। মণিলালকে দিচ্ছে, কোঁচার কাপড়ে কোচড় বানিয়ে নিয়েছে সে। জোয়ার গোনে এ সমস্ত জায়গা ডুবে যায়। মিঠাজলের প্রয়োজনে যখন-তখন যেতে হয় বলে উঁচু করে ভেড়ি বাঁধা আছে মিঠাপুকুর অবধি। ভেড়ির উপর থেকে কতটুকুই বা হাত যায়—ছটা নিচে নেমে পড়ল। নোনা কাদায় পায়ের এক বিঘত ডুবে গেছে—এ কাদা ছাড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। সে যাকগে, সে তো পরের কথা। পাগল হয়ে ছটা ফুল তুলছে, ফুলের দস্তুরমতো এক বোঝা—

মণিলাল বলে, অনেক তো হলো। ঘরে চল্ এবারে—

ছটার কানে যায় না। হাতের নাগালে তেমন আর পাচ্ছে না তো গাছেই উঠে পড়ল সে। ফনফন করে কারে কাঠবিড়ালির মতো এ-ডাল ও-ডাল করছে। এই কর্মেও এত বড় ওস্তাদ' কে জানত! ফুল দেখে এক-একবার মগডাল অবধি চলে যায়, ডাল নুয়ে পড়ে।

মণিলাল সভয়ে নিচে থেকে বলে, ডাল ভেঙে পড়বি রে ছটা। হাত-পা ভাঙবে।

এবারে কানে গেছে। যাঃ—বলে মণিকে নির্ভয় করে: হাত-পা কেন ভাঙবে—কাদা না নিচে?

তখন মণিলাল ভিন্ন পথে যায়: কতক্ষণ বেরিয়েছি খেয়াল আছে? বাসার সব জেগে উঠলে রক্ষে থাকবে না।

ফিরতি মুখে হুঁশ হলো, ফুল তো দেদার তুলেছি—ফুলের এখন কি গতি করা যায়? একটি মাত্র ফুল নিয়েও বাসায় ঢোকা যাবে না, জেরার তলে পড়তে হবে। যত্রতত্র ফেলে দেওয়াও যায় না—জল নিতে এসে লোকের নজরে পড়ে যাবে, এক জায়গায় এত ফুল দেখে প্রশ্ন জাগবে মনে। চট করে ছটার মাথায় এসে গেল, অনতিদূরে খাড়ি মতন একটা নজরে এসেছে—সেই জলে বিসর্জন দেওয়া যাক।

রং-বেরংয়ের খাসা খাসা ফুল—আহা, কোঁচড় মুঠো করে নিয়ে দুজনে জলে ছুড়ছে। ভাসতে ডুবতে টানের মুখে ফুল অদৃশ্য হয়ে গেল। বনের জিনিস আবার বনকে দিয়ে দিলাম, মা-বনবিবি জলের নিচে থেকে নিয়ে নিলেন। দেখতে পেলে না, ঠিক হাত পেতে নেওয়ার মতন?

ফুল ফেলে দিয়ে বিষণ্ণ মুখে ফিরছে—আরে দেখ দেখ—হরগোজা ঝাড়ের উপর কী এক বস্তু চকচক করছে। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঝাড়ের মধ্যে ছটা চলে এল। মৌচাক এক টুকরো—ঝড়-বাতাসে কোন গাছ থেকে ভেঙে এসে পড়েছে। কাচের মতন স্বচ্ছ মধু ভিতরে।

ছটা বলে, মাকে ফুল দিলাম, মা আমাদের মধু খেতে দিয়েছেন।

চাকসুদ্ধ মুখে পুরল দুজনে। চুষে চুষে মধু খেতে মজা। ছটা বলে, বন কত কি দেয় দেখলি! ফাঁক পেলেই আমরা বনে চলে আসব, কেমন?

॥ সাত ॥

এত ঢাকাঢাকি, ব্যাপারটা তবু না-জানি কেমন করে বেরিয়ে গেল। কী ডাকাতে মেয়ে রে বাবা, শখ করে বাঘের মুখে চলে গিয়েছিল। চুলের মুঠো ধরে মধুসূদন ঠাস ঠাস করে দিলেন কয়েকটা চড়ঃ নাকে খত দে, কোনোদিন আর বাড়ির বার হবিনে—

রাধিকা এসে পড়ে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিলেন। স্বামীকে দোষেনঃ মর্দানিতে তোমরাই তো আসকারা দিয়েছ—তোমার দিদি আর তুমি। গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না। নিজের কাজে যাও তুমি।

মধুসূদন গজরাচ্ছেনঃ আর কখনো যাবিনে বল্—

রাধিকাই বলেন, যাবে না। আমিই বলে দিচ্ছি। কেমন করে যাবে? যতীন যেখানে-সেখানে চাবি ফেলে রাখত, আমি নিয়ে এখন বাক্সে পুরেছি। চাবি আর হাতাতে হবে না বাছাধনের।

বাপের মার খেয়ে কাঁদছে বটে ছটা, কিন্তু চাপা হাসিও ঠোঁটের কোণে। বাবার হাতের মার কখনো বৃথা যায় না, পরিবর্তে একটা কিছু পাবেই। আর হাসি পাচ্ছে মায়ের ঐ দেমাকের কথা শুনে। তালা না খুলে যেন পাঁচিল পার হওয়া যায় না।

কায়দা একটা ইতিমধ্যেই ছটা ভেবে নিয়েছে। এবং শুধু ভাবনা মাত্র নয়, হাতেনাতে কাল দুপুরে খানিকটা পরখও করেছে। উঠানের পাশে পাঁচলের লাগোয়া ঐ কেওড়াগাছ, আর পাঁচিলের ঠিক ওপারে হেঁতালবন—নজর ফেললেই তো মাথা আপনাআপনি খুলে যায়। কেওড়া-ডালে ঝুল খেয়ে হেঁতালবনে গিয়ে পড়া খুব সোজা নয়—বুকে সাহস চাই এবং লম্ফটা ঠিক তাক হওয়া চাই। কিন্তু সাহস ও কষ্টের কাজ বলে মজাটাও তেমনি বেশি। বনমুরগি ডাকে খুব ঐ দিকটায়, বাসা আছে নিশ্চয় কোন গাছের গর্তে। বাসা খুঁজে নিয়ে মুরগি ধরা ছটার ইদানীং মাথায় ঘুরছে।

ইচ্ছা যখন হয়েছে, দেরি করা ঠিক নয়। কেওড়াগাছের দিকে, ধরো, মধুসূদনেরও নজর পড়ে গেল, সন্দেহবশে তিনি গাছ কাটিয়ে দিলেন। হয়ে গেল বাইরে যাওয়া, মোরগ খোঁজা। শুভস্য শীঘ্রম্—সুযোগ পাওয়া মাত্রেই।

এবারে ছটা সম্পূর্ণ একলা বেরুল, মণিলালও নয়। সেদিনের কাজকর্ম চাউর হওয়ার মূলে মণিলালও আছে কিনা বলা যায় না। ঐ ভাল মানুষগুলোর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। মণিলালকে নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য হলো না, সন্দেহ ঘনীভূত আরো সেই কারণে। হয়তো বা কৈফিয়ত দিয়েছে, ছটা একলা বেরিয়ে যাচ্ছিল—সামলানোর জন্য সঙ্গে যেতে হয়েছিল। একেবারে মিথ্যেও নয় সেটা।

বনমোরগের ডাক যেদিক থেকে আসে, জায়গার আন্দাজ করে রেখেছে। গাছে গাছে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, গর্ত আছে কোথায়। গাছের গর্তে মুরগি থাকে, ডিম পাড়ে সেখানে, ডিমে তা দেয়। গর্তে হাত ঢুকিয়ে মুরগি ধরা সেই অবস্থায় কঠিন হয় না।

গল্পে গল্পে ছটা সমস্ত জেনে নিয়েছে, যতীন বলেছে। বাদাবনের সবকিছু যতীনের নখদর্পণে। তবু নিজে সে কখনো মুরগি ধরতে যায়নি। ডিম খাওয়ার লোভে গর্তে অনেক সময় সাপ ঢুকে যায়। সাপে যতীনের বড় ভয়।

সাপ থাকুক যাই থাকুক, কী করা যাবে—উপরমুখো চেয়ে চেয়ে ছটা বনে ঘুরছে,

সন্দেহবশে উঠে পড়ছে কোন কোন গাছে। নিচে থেকে গর্তের মতোই দেখাচ্ছিল, আসলে কিছুই নয়—ঝড়ে ডাল ভেঙে গিয়ে ঐরকমটা হয়েছে।

পয়লা দিন বৃথা গেল। কায়দা বুঝে আবার একদিন বেরিয়েছে। ফিরে এসে যতীনের সঙ্গে ফিসফিসানি ঃ একটা জিনিস এনেছি যতীন-দা। কাউকে বলবে না, দিব্যি করো!

কি জিনিস?

খাওয়ার জিনিস, দিব্যি করো আগে, তবে তো বলব।

খাওয়ার নামে যতীন সব করতে পারে। অর্জাঙ্গ জঙ্গলে বছরের পর বছর পড়ে আছে দেদার মাছ খেতে পায় বলে। দিনকতক যতীন খুব জবরে ভুগেছিল। কখন জবর-বিচ্ছেদ হবে—কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঝিম হয়ে থাকত। ঘাম হয়ে তারপরে যে-ই গা জুড়াল, যতীন অমনি তড়াক করে উঠে এক কাঁসর ভাত নিয়ে বসত। যতীন বলে, কষ্ট করে যে প্রাণ ধরে আছি, সে কেবল ভালমন্দ খেতে পাব বলেই।

খাওয়ার জিনিস শুনে যতীন কালীর দিব্যি মহাদেবের দিব্যি লক্ষ্মীর দিব্যি কেষ্টঠাকুরের দিব্যি বনবিবির দিব্যি গাজি-কালুর দিব্যি—পটাপট ডজনখানেক দিব্যি গেলে বলল, প্রাণ থাকতে কখনো ফাঁস করব না। বলো কোন্ জিনিস!

বনমুরগির ডিম এনে ছাইগাদায় ঢুকিয়ে রেখেছে। ছাই সরিয়ে ছুটা যতীনকে দেখিয়ে দিল।

যতীন বলে, ডিম মুরগির তো বটে? সাপেরও ডিম হয়। সে ডিমে বিষ।

মুরগি ডিমের উপর বসে তা দিচ্ছিল। ইচ্ছে করলে মুরগিও ধরে আনতে পারতাম।

যতীন চুক চুক করে ঃ আনলে না কেন?

ডিমে ডাকে না—তার জন্যেও তোমায় খোশামোদ করতে হচ্ছে। জলজ্যান্ত মুরগিটা বাসায় এনে তুললে রক্ষে ছিল?

তা বটে!

প্রণিধান করে যতীন বলে, মুরগির গর্তটা আমায় দেখিয়ে দিও, জল আনবার মুখে আমি ধরে আনব। আমি আনলে দোষ হবে না।

শতকণ্ঠে ছুটার তারিপ করছে ঃ ধন্যি মেয়ে বটে তুমি। এত সমস্ত খোঁজ-খবর রাখো। আমি এদ্দিন আছি, আমার কিন্তু খেয়ালে আসেনি।

রাত্রে খেয়েদেয়ে ছুটা ঘরে ঢুকেছে, বাইরে এসে যতীন—ছুটা ছুটা করে ডাকছে।

রাধিকা বলেন, ওকে কেন?

খাবার জল চেয়ে এসেছিল। নিয়ে এসেছি।

ডাহা মিথ্যে এসে বলল। ইঙ্গিত ছুটা বুঝেছে, তাড়াতাড়ি সে বাইরে এল। একজোড়া সিদ্ধ ডিম যতীন নিয়ে এসেছে। তাড়া দেয় ঃ কোঁত কোঁত করে গিলে ফেল না—দেখছ কি? তারপরে জল খেয়ে নাও। কষ্ট করে এনেছ, না দিয়ে খেলে হজম হবে না। ধর্ম রাখি কি রকম, দেখ। আরও কিন্তু আনবে।

একটা ডিম যতীনকে ফেরত দিয়ে ছুটা বলল, মণিকেও ডেকে এমনি জল খাইয়ে এসো গে। ডিম তুমিই যেন এনেছ। আমার কথা টের পেলে তখুনি কিন্তু বলে দেবে।

কাঠ-কাটা গোলপাতা-কাটা মধু-ভাঙা জোংড়া-কুড়ানোর নৌকোরা ঘাটে গেরাপি করে। শিকারী নৌকোও আসে মাঝে মধ্যে। বনরাজ্যে মানষেলার গন্ধ নিয়ে আসে এরা সব। পাশ নিয়ে বাদায় ঢুকবে, অনেক তার ঝামেলা—রাত্রিবেলাটা, হয়তো বা পুরো দিন ও রাত্রি, থেকেই যেতে হলো। যতীন এসে পলকে ভাব জমিয়ে ফেলে, ডাঙা অঞ্চলের কথা শোনে, নানান খবরাখবর নেয়, তাস-দাবা খেলে। গীতবাদ্যের মানুষ থাকে এক এক নৌকোয়, গান ও ঢোলকবাদ্য শোনা যায় সেদিন। ছটাই বা হাত-পা কোলে করে ঊর্ধ্বলোক থেকে কাঁহাতক দেখে যাবে! নেমে গেল ফুড়ুত করে। টের পেয়ে রাধিকা আচ্ছা রকম বকাবকি লাগালেন।

মণিলালকে পেয়ে ছটা বলল, তুইও গিয়েছিলি আমার সঙ্গে।

না তো—

গিয়েছিলি, জানিসনে—। চোখ টিপে দিল খুব কড়া করে।

মেয়ের পক্ষে মধুসূদন দাঁড়ালেন: জঙ্গলে পড়ে আছে ছেলেমানুষ, দেশ-ঘরের জন্যে মন আনচান করে। গাঁ-অঞ্চলের মানুষ দেখে আর থাকতে পারেনি। একলাও যায়নি—ছাত্রী-মাস্টার দু'জনে গিয়েছিল। দুটো-চারটে কথাবার্তা বলে ফিরে এসেছে তো কি হয়েছে?

বাপের মত পেয়েছে, তা হলেও ছটা মায়ের চোখের সামনে দিয়ে কখনো জেটিতে নামে না, আড়াল করে যায়। মধু-কাটার পুরো মরশুম এখন—মধুর নৌকোর অঢেল আনাগোনা। এক বুড়ো মউল, সখারাম তার নাম, অসুখ হয়ে ঘাটে আটকা পড়ে গেছে। ডাক্তার-কবিরাজের অভাব বলে মধুসূদন 'গৃহচিকিৎসা' বই ও হোমিওপ্যাথি কৌটো রাখেন, বিপদে-আপদে কাজ দেয়। রোগ-লক্ষণ বলে বাবার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে ছটা সখারামকে খাইয়ে দিল, বার্লি রেঁধে দিয়ে এল। সখারাম গদ্‌গদ: বাদাবনের লক্ষ্মীঠাকরুনডি—নামডা কও দিনি তোমার!

ছটা হেসে বলে, নাম ইন্দুলেখা। দাঁত পড়ে গেছে—সে তোমার জিভে আসবে না। ছটা-ছটা করে সকলে।

সখারাম বলে, একটুখানি ভাল মধু তোমারে খাতি দিয়ে যাবো মা, সুভালাভালি যদি ফিরতি পারি।

কেন, না ফেরার কি হলো?

একফোঁটা ছটার কণ্ঠে প্রবীণার মতো ধমকের সুর। বলে, কুডাক ডাকছ কেন মুরুব্বিমশাই?

সখারাম বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, খাসা যাচ্ছিলাম—মালে হাজির হয়ে এদ্দিন কাজে-কামে লাগি যাতাম। তা অব্যেঘাত কী রকম দেখ। দু-দুডো দিন পড়ে থাকলাম—আর বাড়ির মানুষ, বলতি গেলি, না-খেয়েই তো রয়েছে।

কেন, না-খেয়ে আছে কেন?

বাদাবনে মানুষ থাকতি, বাড়ির উনুন দিনমানে জ্বালা যায় না।

গল্পের গন্ধ পেয়ে ছটা পাটার উপরে জাবড়ে বসল। সখারাম মউলের মুখে শুনছে—মধু-কাটা শক্ত কাজ, অনিয়ম হলেই ঘাড় মটকাবে। বাদায় বেরিয়ে পুরুষদের পক্ষে ষোল-আনা নীতি-নিয়ম মানা সম্ভব নয়, ঘরে থেকে মেয়েরাই করে সে-সব। পরিচ্ছন্ন শুদ্ধাচারে থাকে—মা বনবিবির নামে পুজো দেয় নিত্যিদিন, মানত করে। রান্নাবান্না করে না—আগুনই দেবে না উনুনে। আগুনের ধোঁয়ায় বন নাকি ঝাপসা হয়ে যায়—গাছের উপরে এবং ডাইনে বাঁয়ে নজর ঠিকমতন পেঁছয় না। মউলরা বাড়ি না ফেরা

পর্যন্ত এমনি। মধুর ভরা তারপরে একদিন গাঁয়ের ঘাটে লাগল, ঘরের-পুরুষ নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেছে। চট করে অমনি যে নেমে পড়ল, সে হবে না। নিয়মের কাজকর্ম এখনও। বরণকুলো মাথায় করে মেয়েরা সব ঘাটে আসছে—গোড়ায় ডিঙা-বরণ। মধু ঘরে তোলা সকলের শেষে।

মৌপোক অর্থাৎ মৌমাছির ওড়া দেখে মউলের দল জায়গা পছন্দ করে নেয়। দুই গাঙ দুই দিকে—জায়গাটা এমনি হলে দু-পাশ দিয়ে বিপদের ঝুঁকি থাকে না। এর ভিতরেও ডাইনে বাঁয়ে একশ' দেড়শ' হাত নিয়ে এক-একজনের এলাকা। মৌপোক উড়ে যাচ্ছে, ছোটো তাকে অনুসরণ করে—দৃষ্টি উপরমুখো। নজর বাইরে যেতে দেবে না মৌপোক থেকে। ছোটখাট খাল পড়েছে—ভ্রূক্ষেপ নেই, ঝপ্‌পাস করে পড়ল লাফিয়ে খালের মধ্যে। শুলোর গুঁতো খাচ্ছে, পা রক্তাক্ত—পায়ের দিকে এখন কে তাকাতে যাবে? মৌপোক নজর থেকে যেন না হারায়। কোন্ গাছে গিয়ে বসে দেখ—চাক সেইখানে।

মউলের নজর উপর-আকাশে এবং উঁচু ডালপালায়, মাটির দিকে দেখে না। ছুটন্ত মউল দেখলে বাঘ ঠিক পিছু নেবে, তাক মতন ঘাড়ের উপর পড়বে। মুখে নিয়ে বন-জঙ্গল ভেঙে দে-ছুট। মানুষটা আর নেই—রক্তের দাগ ঝোপঝাপের উপর।

জোংড়া-খোঁটাদেরও ঘটে এমনি মা-বনবিবি নির্দয় হলে। ছটা একদিন অফিসের বারান্ডা থেকে একটা জোংড়া-খোঁটা দল দেখেছিল। তারা অবশ্য ভালোয় ভালোয় নৌকো ভরতি করে হেলতে দুলতে চলে গেল। দেখতে বেশ লাগে। ভাঁটা সরে গিয়ে চর জেগেছে। গাঙের জল অনেকখানি দূরে, বাদার জঙ্গলও দূরবর্তী। জল আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত এক সড়ক যেন। পরিচ্ছন্ন সমতল—ভোঁ-ও-ও করে পুরো দমে মোটরগাড়ি ছুটিয়ে দেওয়া যায় জায়গার উপর দিয়ে। দেখতেই শুধু ঐ রকম—ছটা ভাল মতন বুঝেছে মণিলালের সঙ্গে পাঁচিলের বাইরে বেরিয়েছিল যেদিন। নোনা কাদা ওর নাম—এক ছিটে গায়ে লেগেছে তো ধুয়ে ফেলতে পুরো কলসি জল লাগবে।

চরের এখানে ওখানে গাঢ় হলুদ রঙের অজস্র ফুল ছড়ানো। রেলিঙে ঝুঁকে ছটা দেখছে। না, ফুল হবে কেন? ঝপাঝপ দাঁড় বেয়ে একটা নৌকো ঘাটের দিকে আসছে—কাছাকাছি ফুলগুলো চকিতে অমনি মাটির তলে ঢোকে। ফুল নয়, ক্ষুদে ক্ষুদে এক ঠ্যাং-ওয়ালা কাঁকড়া। খাওয়া চলে না, কোন রকম কাজে আসে না—ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের উপর শোভা বিস্তার করে থাকে শুধু।

বাঁকের মুখে লাইনবন্দী মানুষ—জোংড়া খুঁটছে। জোংড়াও শামুক, গাজরের আকৃতি। জোয়ার-জলে অজস্র জোংড়া ভেসে আসে, পড়ে থাকে চরের উপর। ঝুড়ি নিয়ে কুড়োতে কুড়োতে জোংড়া-খোঁটারা এদিকে আসছে। কাছাকাছি এসে পড়ল। একটা ডিঙির খোলে ঢেলে দিয়ে আসে, এসে আবার খোঁটে। ভরা ডিঙি তারপরে গঞ্জে নিয়ে খালাস করে, চুনুরিরা পুড়িয়ে বাখারি-চুন বানায়। সারা বাদাবন জুড়ে মা-বনবিবি কত জিনিস ছড়িয়ে রাখেন, কুড়িয়ে নিলেই হলো। একেবারে মুফতে নয় অবশ্য, রাজার রাজভাগ কিছু আদায় দিতে হয়। তারই জন্যে মধুসূদনরা অফিস সাজিয়ে তক্কে-তক্কে থাকেন।

জোংড়ার কাজেও বিপদ খুব, সখারাম বলেছিল। দলটা তো জোংড়া খুঁজে খুঁজে এগোচ্ছে। পাঁচ-সাত জোড়া উপাদেয় খাদ্য ফাঁকার মধ্যে ঘুরঘুর করছে—জঙ্গলে নাম-করতে-নেই সেই-তিনি ওত পেতে দেখছেন, মুখে লালা ঝরছে, আর অল্প অল্প

লেজের বাড়ি দিচ্ছেন মাটির উপর। দু-পেয়ে জীবকে সবাই ভয় করে—সুনিশ্চিত না হয়ে ঘাটা দেবেন না তিনি। এক জায়গায় কাদা গভীর—পা ফেলে টেনে তোলা মুশকিল। এমনি অবস্থায় কেউ হয়তো লাইন ভেঙে পিছিয়ে পড়েছে। আর যাবে কোথা—চিলে ছোঁ দেওয়ার মতন আচমকা সেই মানুষটার উপর। হুঙ্কার শুনে সবাই পালাচ্ছে, প্রাণভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকটা ঠিক কার উপরে মালুম হচ্ছে না—সবাই ভাবছে আমার উপরে বুঝি। পিছনের মানুষটি কখন উধাও হয়ে গেছে—ডিঙিতে উঠে তবে ঠাহর হলো।

সখারামদের কাজ-কাম ভাল হয়নি, মন বিষণ্ণ। তবু বুড়ো জেদ ধরেছে, স্টেশনে ঘুরে মধু দিয়ে যাবে। যৎসামান্য, এই ধরো ঘটিখানেক—কিন্তু খলসি-ফুলের মধু, অতিশয় সরেস বস্তু, ছটার নামে আলাদা করে রাখা।

অন্যেরা আড় হয়ে পড়ল: কোটালের টান। খরস্রোতে কুটোগাছটি ফেললে দু-খন্ড হয়ে যাচ্ছে। তায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। হেন অবস্থায় তিন গাঙের মোহানায় নৌকো বেকায়দায় খান খান হতে পারে।

বুড়ো মুরুব্বিকে তবু বোঝানো গেল না। রাত ঝিম ঝিম করছে, হুড়ুম-হাড়াম করে ঢেউ আছড়ে পড়ছে জেটির উপর। মধুর নৌকো লাগাতেই হলো ঘাটে।

সকালবেলা ছটা ঘুম ভেঙে উঠতে রাধিকা বললেন, রাত দুপুরে এক নৌকো এসে তোকে ডাকাডাকি করছিল। পোকের রস দিয়ে গেছে তোর নাম করে।

কি দিয়ে গেছে মা?

পোকের রস।

মেয়ে অবাক হয়ে আছে দেখে রাধিকা সৈরভীকে বললেন, বুঝিয়ে দে না, আমি তো নাম করতে পারিনে।

সৈরভী বলে, মধু দিয়ে গেছে। মধু মা কেমন করে বলবে? কর্তার নাম যে ঐ।

ছটা বলে, কেন, বললে কি হয়?

সৈরভী বলল, শ্বশুর-ভাশুর-সোয়ামির নাম ধরতে নেই। তোমার বরের তুমি নাম ধরে ডেকো দিদি। সেকেলে মানুষ ওঁদের মুখে আসবে না।

মধু হয়ে গেল পোকের রস। হি-হি-হি—

হেসে হেসে খুন হচ্ছে ছটা। বলে, মজার নাম বের করেছে মা—পোকের-রস।

প্রথম রাত্রে ভয় পেয়ে গিয়েছিল—গাঙ ঘরের মধ্যে চলে এল নাকি? তারপরে ব্যাপারটা বুঝেছে। আসে গাঙ নিত্যদিন, নিত্যি রাতে—ঘরের মধ্যে নয়, ঘরের নিচে। মোটা মোটা শাল-সুঁদুরের খুঁটির উপরে ঘরবাড়ি, তক্তার পাটলাচ করা মেজে। মেজের তলে ফাঁকা। জেটিতে নেমে ছটা ঐ পাতালতলে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেছে। উপরতলায় তারা সব কাজকর্ম করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, কিংবা ফতর-ফতর করে নাক ডাকছে, নিচে সেই সময়টা জোয়ার-জলে তুফান উঠছে অথবা ভাঁটা সরে গিয়ে তাদের মুলটির বাড়ির গোবর-মাটি নিকানো আঙিনার মতন হয়েছে। ভাবতে বেশ মজা লাগে—তাই না?

জরুরী ডাক পেয়ে মধুসূদন সদরে গেছেন। তিন দিন আজ স্টেশন-ছাড়া। আর, বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর্—ফরেস্টার বিহনে অফিস খাঁ খাঁ করছে। একটা মানুষ দেখা যায় না কোনোদিকে।

ভাদ্রমাস। ছড়া-ছড়া বৃষ্টি, অক্ষুণ আবার রোদ চিকচিক করে ভিজে ডালপালার উপর। কাঁদতে কাঁদতে বনশিশুরা চোখ না মুছেই যেন হেসে উঠল। মণিলাল অনেকদিন বাড়ি ফিরে গেছে। ছটার একা একা ভাল লাগছে না, রেলিং ঝুঁকে মোহানার দিকে চেয়ে আছে। গাঙের জলে কখনো রোদ, কখনো মেঘ-ছায়া। দূরে এক জেলে-ডিঙি দেখা যায়। মুখোড় বাতাস পিঠেন স্রোত, লড়ালড়ি লেগে গেছে জলে ও বাতাসে —ডিঙি পড়বি তো পড় ওদের ঐ ধুন্দুমারের মধ্যে। আর যাবে কোথা। দু'পক্ষের যত আক্রোশ সামান্য ডিঙিটার উপর গিয়ে পড়ে। ঝুঁটি ধরে যেন নাড়া দিচ্ছে : আসবি আর এখানে—আসবি? মণিলালের সঙ্গে জঙ্গলে বেরুনোর ব্যাপারে মধুসূদন যেমন ছটার ঝুঁটি ধরেছিলেন। মার খাওয়ার পরে যে প্রাপ্তিটা ঘটে তা-ও ছটা পেয়ে গেছে। নতুন ধরনের পোশাকের সেট—শালোয়ার-কামিজ।

ভ্রূ উলটে রাধিকা বলেছিলেন, মেয়ে এই আজব পোশাক পরে বেড়াবে নাকি? কী ঘেন্না!

মধুসূদন বললেন, সাহেবের মেয়েরা পরে। খাসা দেখায়। তাই দেখে কিনে ফেললাম।

তাদের মানাতে পারে। তাই বলে তোমার মেয়ে?

সে মেয়ে কটকটে কালো। তাকে যদি মানায়, আমার ফরসা মেয়েরই বা বেমানান হবে কেন?

রাধিকা অন্য দিক দিয়ে গেলেন : তা জঙ্গলে পরে দেখাবে কাকে?

দেশ-ঘরে গিয়ে পরবে।

একটা গুহ্যকথা মধুসূদন ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললেন : বাদার অন্ন কদ্দিন আর ভোগে আছে জানিনে। মুখুজ্জের কথাবার্তা আজকাল যেন কেমন-কেমন! তার মানে কোটনারা কান ভারী করেছে তাঁর।

আট

জেলেডিঙির দুর্গতি দেখছিল ছটা বারান্দায়। যায়-যায় অবস্থা। না, ঢেউয়ের কবল কেটে বেরিয়ে এল অনেক কষ্টে। ঝপাঝপ ঝপাঝপ তিন-চারটা হাতে বোঠে মারছে। দৌড়—দৌড়—

নতুন পোশাকের কথা এই সময়টা মনে পড়ে গেল। শূন্য ঘরে, এখন মুখ বাঁকানোর কেউ নেই—জিনিসটা পরে আয়নায় ঘুরে ফিরে দেখবে, বাহার খোলে কি রকম।

ভেজানো দরজা খুলে ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠল। একা-একা লাগছিল—মানুষ যে কত! রীতিমত তাগতওয়ালা সব মানুষ। ঘোর বিক্রমে চেঁচাচ্ছে, পেটাচ্ছেও দমাদ্দম। ঘরের ভিতরে নয়, ঘরের নিচে। ঘরের নিচে যে পাতালপুরী, লড়ালড়ি সেখানে লেগে গেছে, কাঠের মেজে ফুঁড়ে অল্পস্বল্প কানে আসছে। যেটুকু আসছে, তাতেই তাজ্জব।

ছটা কানের পাশে আড়াআড়ি হাত রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল, তারপর শুয়েই পড়ল কাত হয়ে মেঝের উপর কান রেখে। জুত হচ্ছে না। হঠাৎ এক অদ্ভুত সমাধান বেরিয়ে গেল, আলাদিন হঠাৎ যেমন গুপ্তদরজা খোলার মন্ত্র পেয়ে গিয়েছিল। বড় বড় কড়ির উপরে তক্তার টুকরো ইস্কুপে এঁটে মেজে বানিয়েছে। একটা ইস্কুপ কেমন ঢলঢলে—নোনা জলবাতাসে মরচে ধরে লোহা ক্ষয়ে গেছে। ইস্কুপ খুলে গেল অল্প চেষ্টাতেই, মোচড় দিতে তক্তাটুকুও উঠে এল। সামান্য একটু ফাঁক হয়েছে—তক্তাটা

বসিয়ে দিলেই ফাঁক ভরাট হবে আবার, কেউ কিছু জানতে পারবে না। ভাল হলো—কান শুধু নয়, দৃষ্টিও চলবে এবার নিচে।

নিচে নৌকো এনে বেঁধেছে, নাইয়াদের মধ্যে কলহ। হাঁড়িতে জল চাপিয়ে চাল ছাড়তে গিয়ে দেখেছে, কলসিতে মুঠো কয়েক মাত্র আছে। সজনেখালির নিচে দিয়ে এসেছে, চাল কেনার তবু হুঁশ হলো না। যে ছোঁড়া রান্না করে, ক্ষিধের মাথায় দারুণ ক্রোধে সবাই তার উপর গজরাচ্ছে। এবং গর্জনেই শোধ যায়নি, বর্ষণও কিছু ঘটেছে।

ছটাকে মজায় পেয়ে গেল। চালের হাঁড়া এই ঘরেই—ন্যাকড়ায় কিছু চাল বেঁধে টুপ করে তক্তার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিল। পড়েছে ঠিক জায়গাতেই—তোলা-উনুনের পাশে। তক্তা যথাস্থানে বসিয়ে মুহূর্তে ফাঁক মেরে দিল। উপরে তাকিয়ে কোন-কিছুর হদিশ পাবে না। নাইয়ারা কি ভাবছে—বনের দেবী বনবিবি শাড়ির ন্যাকড়ায় চাল বেঁধে ছুড়ে দিয়েছেন মানুষগুলো উপোসী যায় দেখে? ভাবে ছটা এইসব, আর আপন মনে হাসে।

মণিলাল চলে যাওয়া থেকে ফাঁকা-ফাঁকা লাগত, দিব্যি একটা কাজ পাওয়া গেল। অধোলোক চেয়ে চেয়ে দেখা। নতুন এক জগৎ-আবিষ্কার। ভগবান নাকি অদৃশ্য ঊর্ধ্বলোক থেকে তাবৎ পৃথিবীতে নজর ফেলেন। ছটারও হুবহু তাই—উপর থেকে সমস্ত। জোয়ার গোনে জলে নিচেটা ভরে যায়, জল এক এক সময় মেজের কাছাকাছি এসে পড়ে। শুয়ে তখন ছিদ্রপথে হাত ঝুলিয়ে দিলে হাত বোধহয় জলে গিয়ে পেঁছিবে। তফরা ওঠে সেই জলের উপর। একদিন বেশ বড় মাছে ঘাই মেরেছিল। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে যদি নামিয়ে দেওয়া যায় নির্ঘাৎ মাছ গাঁথবে, ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে মাছের যোগাড় হয়ে যাবে।

যতীনকে বলেওছিল, সুতো-বঁড়শি এনে দাও যতীনদা, তোমাদের মাছ মেরে খাওয়াব। কায়দাটা অবশ্য বলেনি। যতীন কানেও নিল না। বলে, মাছের অভাব আছে নাকি যে তোমায় মাছ মেরে খাওয়াতে হবে?

খাওয়টাই বোঝে শুধু যতীন—মাছ খাওয়ার চেয়ে মাছ মারায় যে বেশি সুখ, সে ওর মাথায় ঢুকবে না?

জোয়ারে এই, ভাঁটায় ভিন্ন চেহারা। বনের বাসিন্দা কিছু কিছু বেড়াতে আসে সেই সময়। দুশমণ দু-পেয়ে জীব ঠিক ঠিক মাথার উপরে, বুঝবে কেমন করে? শুয়োর এসে ঘোঁত ঘোঁত করে ঘোরে, কাদায় মুখ ঢুকিয়ে লাঙল চষার মতন করে কী যেন খোঁজে। খরগোস আসে, এক লহমা কান খাড়া করে থেকে তারপর চোঁচা দৌড়। একদিন হরিণ এল পাঁচ-সাতটা—বনভোজনের মেজাজ। জোয়ারের তোড়ে ডুবন্ত গাছগাছালির পাতা ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে, ভাটার স্রোত তারপর ঝাঁটপাট দিয়ে সমস্ত সাফ-সাফাই করে দিয়ে যায়—বাদাবনের এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এ জায়গায় তা হয়ে ওঠে না—সারবন্দি খুঁটিগুলোর গায়ে লতাপাতা কিছু কিছু আটকে থাকে, হরিণ এসে মজাসে খুঁটে খুঁটে খায়।

নৌকোর মাল্লাদের চাল দিয়েছিলাম, রোসো, তোমাদেরও দেবো—ছটা মনে মনে ঠিক করল।

উঠোনের কেওড়াগাছ থেকে কিছু কচিপাতা পেড়ে রেখে দিল। আবার একদিন হরিণ এসেছে, ফুটো দিয়ে আলগোছে কেওড়াপাতা ফেলবে—হরিণ মানুষের মতন হাঁদা নয়, অনেক বেশি সতর্ক। শব্দ একটু হয়েছে কি না-হয়েছে—দে ছুট। পলকে অদৃশ্য।

হরিণদের কাছে ছটার ভগবান হওয়া ঘটল না।

মশা খুব এই বর্ষার সময়টা সন্ধ্যা হতে না হতে বন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে গায়ে পড়ে, গান শোনায়। ধুনোর ধোঁয়ায় মানায় না। ছটারা মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

মধুসূদন বলেন, দশটা-পাঁচটার অফিস নয় আমার—আমি কি করি? রাত্রে যখন কাজ পড়ে, দু-পাশে দুই ধুনুচি রেখেও রক্ষে হয় না। হাতে কলম ধরবেন কি—দুটো হাতেই সারাক্ষণ গায়ে চাপড় মারতে হয়।

ছটাকে যতীন বলল, মশার চোটে হরিণও বনে থাকতে পারে না। খানিকটা রাত্রি হলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িও, জেটির কাছাকাছি সব আসবে, দেখো।

সত্যি? তিড়িং করে ছটা লাফিয়ে ওঠে: ঠিক বলছ যতীনদা?

উৎসাহ পরক্ষণে মিইয়ে যায়: যা মশা, দাঁড়াব কি করে?

যতীন বলে, ফাঁকায় মশা না। হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। মশা নেই বলেই তো হরিণ আসে।

যতীন বারান্দায় শোয়, যথারীতি মাদুর পেতে পড়েছে। এখন হরিণ-খরগোস কাঁক-করমকুলি প্রমুখ যাবতীয় পশুপাখিরা মিছিল করে চরে আসুক না—যতীনের কিছুমাত্র মাথাব্যাথা নেই। তবে হ্যাঁ, মারতে পারো যদি, তখন সে নিশ্চয় আছে। মশলাপাতি সহযোগে জুত করে পাক করবে। এবং বড় এক বাটি সরিয়ে রেখে দেবে আগামীকালের জন্য। মাদুরে পড়া মাত্রই যতীন চোখ বুঁজেছে।

অধীর হয়ে ছটা বলে, আসে কই হরিণ?

ঘুমের মধ্যেই যতীন জবাব দেয়: টুঁ শব্দটি নয়। শব্দ হলেই পালাবে। ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।

দাঁড়িয়েই আছে ছটা অতএব। পূর্ণিমার রাত। সারা দিনমান বৃষ্টি হয়ে আকাশের সব মেঘ ফুরিয়ে গেছে, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। ছায়া-ছায়া ওদিকটা ঐ যে—ভুল হয়ে যায়, বাদা ছেড়ে বুঝি গ্রামে ফিরে গেছে। আম-জাম পেয়ারা-কাঁঠাল নারকেল-সুপারির বাগবাগিচা, ভিতরে ভিতরে গৃহস্থের ঘরবাড়িও আছে বোধহয়। মরা-ভাঁটায় গাঙ এখন দূরে গিয়ে পড়েছে—পুকুরের মতন নিথর জল। নতুন বিয়ের বউ হয়ে গিয়ে ডানপিটে মেয়েটা হঠাৎ নরম-সরম হয়ে যায়—গাঙের গতিক সেইরকম। জল পড়ার ক্ষীণ আওয়াজ জঙ্গলের ভিতর দিকে। গাছের উপরে রাত্রিচর পাখীর পাখার ঝাপটানি—

হরিণই বটে, বনের প্রান্তসীমায় জ্যোৎস্না-ঢালা চরের উপর। ছোট-বড় মিশিয়ে দিব্যি একটা দল ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। বাচ্চাগুলো মা-হরিণের গায়ে গায়ে লেপটে আছে যেন। একটা নিচু ডাল মুখ দিয়ে টেনে মা দাঁড়িয়ে পড়ল। বাচ্চা মুখ তুলেছে, নাগাল পাচ্ছে না। ডাল টেনে আরও নামিয়ে মা বাচ্চার একেবারে মুখের উপর এনে ধরল। খুঁটে আরাম করে পাতা খাচ্ছে সেই বাচ্চা। খাওয়া হয়ে গেল তো ডাল ছেড়ে দিল মা-হরিণ—ডাল সড়াক করে উপরে উঠে গেল। মা আর বাচ্চা এবারে দূরের দিকে চলল জুত মতন আর একটা ডালের খোঁজে নিশ্চয়। ছটা নজর ধরে আছে, এই দুটিকে নজরের বাইরে যেতে দেবে না।

সমস্ত মাটি। কোন্ দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ। চর ফাঁকা চক্ষের নিমেষে, হরিণ নেই। ঘুম ভেঙে যতীন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল: পড়ল নাকি রে?

বাওন-শিকার—যতীন ধরে নিয়েছে, ফলাফল জিজ্ঞাসা করছে। ছটা চুপ করে থাকে, জবাব দেয় না। আষাঢ়ের গোড়ার দিকে সাতকড়ি একদিন খুব তোড়জোড় করে বাওন-শিকারে বেরিয়েছিল। ডিঙি-নৌকো, আট-ব্যাটারির জোরালো টর্চ—বন্দুক

তো আছেই। বাওনের এমনি মজা, বন্দুকের অভাবে শড়কি-বর্শা দিয়েও কাজ হাসিল করা যায়—সাতকড়ি দেমাক করে বলত। নিজে কিন্তু সেদিন অর্ধেক রাত ছুটোছুটি করে একেবারে শূন্যহাতে ফিরেছিল। আলো নাকি ঠিক মতো ফেলতে পারেনি। ভাগ্যিস পারেনি জেঠা—ছটা বিষম খুশি। ভালমানুষ হরিণেরা আপন সুখে চরে বেড়াচ্ছে—টর্চ আচমকা চোখের উপর গিয়ে পড়ে। তীব্র তীক্ষ্ম আলো ইস্পাতে তারের মতন চোখের মণি দুটো বিঁধে ফেলে শিকারকে টেনে ধরে আছে। ডিঙি আস্তে আস্তে পাড়ের দিকে যাচ্ছে, টর্চ ধরা আছে ঠিক মতো। আলো সামান্য এদিক-সেদিক হলেই হরিণ পালাবে।

যতীন চারিদিক ঠাহর করে হতাশ হয়ে বলল, কিছু পড়ে থাকে তো অনেক দূরে, হাটগাছার ওদিকে। ধুস! আমি ভাবলাম ঘাটের নিচে আমাদের কালী নস্করের দেওড়।

সদর থেকে মধুসূদন বেজার মুখে ফিরলেন। বদলি করেছে। সেই খোশ-খবর স্বমুখে দেবার জন্য মুখুজ্জে সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কর্তা-গিন্নিতে কথা হচ্ছে। মধুসূদন বলছেন, তদবিরে খামতি ছিল, বুঝতে পারছি। তা সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে জানিয়ে দিলেই পারত। বাঘের দুধ চাইলেও জঙ্গলের বাঘ দুয়ে হুজুরে ভেট দিয়ে আসতাম।

রাধিকা শুধালেন : কোথায় পাঠাচ্ছে?

চুমকুড়ি বলে গাঙ আছে না—সেই তল্লাটে ঘের পড়েছে, কুপ-অফিস বানিয়েছে—

বাদায় যত্রতত্র গাছ কাটা মানা—এলাকা বাছাই করে ঘের দিয়ে দেয়। ঘেরের মধ্যেও আবার গাছ বাছাই—গাছের গায়ে মার্কামারা। শুধুমাত্র সেই সেই গাছে কুড়ুল পড়বে। ঘোর জঙ্গলে এর জন্য অস্থায়ী অফিস বসে, কুপ-অফিস বলে তাকে। মানুষের মুখ দেখা যায় না, কিছু কিছু কাঠুরে ছাড়া। গাছগাছালি পাখপাখালি আর জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে ঘরবসত। মধুসূদনকে এমনি এক জায়গায় যেতে হচ্ছে।

রাধিকা রায় দিলেন : চাকরি ছাড়ো।

অবোধ মেয়েমানুষের দিকে মধুসূদন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালেন। বলেন, মুখুজ্জে-শালা চাচ্ছেও তাই। দিব্যি মাছে-ভাতে আছি, দেখে মানুষের চোখ টাটায়, আমার নামে লাগানি-ভাঙানি করে। মুখুজ্জে তাইতে বিষনজরে দেখছে—এত লোক থাকতে আমার উপর অজভিগ জঙ্গলে যাবার হুকুম।

বলতে বলতে গর্জে উঠলেন : আমিও সহজ পাত্র নই। কত ধানে কত চাল—হন্দ-মুন্দ না দেখে ছাড়ব না।

রাধিকা সভয়ে বলেন, কাজ নেই। নোনা জল খেয়ে বাঘ-কুমিরের মুখে কতদিন আর পড়ে থাকবে? চাকরি ছেড়ে বাড়ি চলো—দু'বেলা খাচ্ছি, না হয় একবেলা করে খাব। উপরওয়ালার সঙ্গে লড়ালড়ি করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে যাবে।

মধুসূদন সবিস্ময়ে বলেন, ওপরওয়ালার সঙ্গে কি? লড়ালড়ি যতকিছু কোটনা ঐ সাতকড়েটার সঙ্গে। আমি বিদেয় হলে তার পোয়া-বারো—প্রোমোশন আদায় করবে ভেবেছে। গন্ডগোলের মূলে সে রয়েছে, নিমকহারামটাকে জব্দ আমি করবই। আমি ফরেস্টার, সে এক পুঁচকে গার্ড। তেল মাখাচ্ছে মুখুজ্জেকে—কতটুকু ক্ষমতা, মাখাচ্ছে সে কটু ভেরেণ্ডার তেল। আর আমি মধ্যমনারায়ণ মাখাব। মা-বনবিবির

আশীর্বাদ নিয়ে আবার এক জবর ষ্টেশনে যবে, জমিয়ে সংসারধর্ম করব সবসুদ্ধ নিয়ে।

রাধিকা বললেন, মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে—বিয়েথাওয়া দিতে হবে না?

উদাসীন কণ্ঠে মধুসূদন বললেন, দাও না—

রাধিকা জ্বলে উঠলেনঃ জঙ্গলের শুয়োর বাঁদর যা-হোক কিছু ধরে এনে তবে জামাই করো। মানুষ-জামাই কোথায় এখানে?

ছটা এসে পড়ল এই সময়। নতুন জায়গার নামে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। বলে, কবে যাবে বাবা সেখানে—কবে?

সামনের মাস-পয়লা থেকে। পঁচিশ দিন আর আছে।

কী মজা, কী মজা—! দু-হাতে ছটা তালি দিয়ে ওঠে।

মধুসূদন বললেন, বেল পাকলে কাকের কি? মুলটিতে তোদের রেখে আসছি। কুপ-অফিসে একখানা নড়বাড় টিনের ঘর শুধু—খাওয়া-শোওয়া-অফিস সমস্ত তার মধ্যে। ঘেরের গাছগুলো কাটা হয়ে গেলে তখনও যদি ধড়ে প্রাণ নিয়ে টিকে থাকি—ডেরাডাণ্ডা তুলে ছোটো আর এক বনে, নতুন যেখানে ঘের দিয়েছে।

বাড়ি ফেরা—কতদূরের সেই মুলটি! ভেবেচিন্তে মধুসূদন ডিঙিই ঠিক করলেন। গাঁয়ের বিল এখন জলে টইটম্বুর। ডিঙি হলে একেবারে বাড়ির পাশে বাগের নিচে নিয়ে বাঁধবে, ডাক দিলে বাড়ির লোক হৈ-হৈ করে এসে যাবে—কাটাখালি নেমে গরুর-গাড়ির হাঙ্গামা করতে হবে না। আরও ভাল, জুড়ন মাঝিকে পাওয়া গেল। অমন মাঝি বাদা অঞ্চলে দ্বিতীয় নেই। জুড়নের হাতে বোঠে দিয়ে, ডিঙি কেন, কলার ভেলাতেও অকূল দরিয়া পাড়ি দেওয়া যায়।

॥ নয় ॥

জোয়ারে ডিঙি ছাড়ল। বিদায়, বিদায়!

ছটার চোখ ছলছল করছে। দেখতে দেখতে কতকাল কেটে গেছে। পশু-পাখি গাছপালা নদীখালেরা সব পড়শি। অন্য কাজ না থাকায় এদেরই দেখত ছটা তাকিয়ে তাকিয়ে। অন্য কেউ না থাকাতে ডেকে ডেকে কথাবার্তা বলত। ওরাও জবাব দিত মনে হয়—ঠারেঠোরে আকারে-ইঙ্গিতে। আকাশের নীচে গাঙের চরে, বনের ধারে খেলা ওদের নিত্যিদিন চলবে, ছটা নামের মেয়েটা বারাণ্ডায় ঝুঁকে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না।

বাঁকের আড়ালে ফরেস্ট-স্টেশন আস্তে আস্তে আড়াল হয়ে গেল। ছটা ছইয়ের উপর। রাধিকা হাঁক পাড়ছেনঃ গড়িয়ে পড়বি রে, নেমে আয়। গোলপাতার ছই—পানসির ছইয়ের মতন চওড়াও নয়, সরু গোলাকার, গড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু হিতকথা কানে নেবে ও-মেয়ে! তর্ক করেঃ পড়ি তো সাঁতরে উঠব আবার।

সৈরভী বলে, আপিসের পুষ্করণী নয় খুকি, কুমিরে কামটে বোঝাই।

ছটা দেমাক করেঃ সাঁতরে তারা আমার সঙ্গে পারবে? সে আর হতে হয় না।

ছইয়ের বাইরে মধুসূদন, তিনি তাকিয়ে দেখলেন। পড়ার মেয়ে নয়—ছইয়ের গায়ে জোঁকের মতন এঁটে আছে।

রাধিকা স্বামীর উপর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেনঃ তুমি তো কিছু বলবে না, মুখে ছিপি এঁটে আছ। পড়ে গেলে তখন কি হবে?

বলছি, বলছি—

নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসে মধুসূদন বলেন, নেমে আয় ছটা। পড়ে গেলে বুঝবি তখন।

রাধিকা রাগ করে উঠলেন: অমন বলা বলতে হবে না তোমায়। তোমরা যদি কড়া হতে, মেয়ে এমন বাঁদর হতে পারে?

মেয়ে সেই সময়ে চেঁচিয়ে উঠল: দেখ দেখ বাবা, বাঁদর—

মধুসূদন রঙ্গ করে বলেন, আবার কোথায়? একটা তো ছইয়ের উপরে দেখছি।

ছটা বলছে, কত বাঁদর—উঃ! না দাঁড়ালে দেখবে কি করে? ছই ধরে দাঁড়াও, পড়বে না।

গাছপালাহীন খানিকটা ফাঁকা জায়গা—বানরে হুটোপাটি করছে সেখানে। মধুসূদন দেখে বললেন, মেকোকাঁকড়া ডাঙায় উঠছে, ধরে ধরে খাচ্ছে স্ফূর্তি করে। জলে নেমে ঢেউ দিচ্ছে দেখ কেমন—ঢেউয়ের সঙ্গে আরও যাতে কাঁকড়া উঠে পড়ে।

দেখার জিনিসই বটে! মাছ ধরার এক একটা গনে মানুষদের যেমন দেখা যায়। এদের ঝক্কিঝামেলা নেই—ধরো, মারো, মুখে চালান করো। টের পেয়ে আরও সব বানর ছুটোছুটি করে বন থেকে বেরুচ্ছে। ভিড়টা বেশি রকম হয়ে যাওয়ায় কাড়াকাড়ি লেগে গেল এবার। হতে হতে মারামারি। পরাজিত কয়েকটা অল্প দূরে সরে গিয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে।

ছটা বলে, রাম-অনুচর ওরা—নিরামিষ কলাটা-মুলোটা খায় জানতাম। মাছও খায়?

মধুসূদন বললেন, বাদাবনে খাচ্ছে পেটের দায়ে। ক্ষিধের মুখে ভটাচার্জিপনা চলে না। বাঁদর তো বাঁদর—বাঘে চুনোমাছ ধরে ধরে খাচ্ছে দেখেছি আমি। পেটের খিদে এমনি জিনিস।

মধুসূদন স্বচক্ষে না-ও দেখতে পারেন, তবে ভাঁটার উজানে বাঘে মাছ ধরতে ধরতে যাচ্ছে—কাঠুরে-বাওয়ালি অনেকেই দেখে থাকে। ধরেই অমনি খায় না, কচ করে কামড় দিয়ে ফেলে দেয় পাড়ের দিকে। ফেলতে ফেলতে এগুচ্ছে। চালাক কি রকম বুঝুন। ধরেই সঙ্গে সঙ্গে খেতে গেলে সময় যাবে, টানের মুখে ততক্ষণে মাছ কিছু পালাবে—সে জিনিস হতে দেবে না। মেরে মেরে ফেলে যাচ্ছে—খাল ধরেই আবার ফিরবে, কুড়িয়ে মউজ করে খেতে খেতে আসবে তখন। রসদের বন্দোবস্তটা আগে, খাওয়া পরে—ধীরেসুস্থে।

যতীনও যাচ্ছে। কয়েকটা দিন বাড়ি ঘুরে আসবে। তারও বাড়ি ঐ অঞ্চলে—কাটাখালি নেমে চলে যাবে—মধুসূদনের সঙ্গে বাদায় ফিরবে, আবার আগ-নৌকোয় বোঠে বেয়ে দিচ্ছে সে।

বেলা পড়ে এসেছে, ছইয়ের তলে ঢুকে মধুসূদন এবার একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন। মচমচানি আওয়াজ তুলে হেলেদুলে ডিঙি চলেছে।

ছটা হঠাৎ নেমে এসে বাপের গা ঝাঁকায়: মেঘ করেছে—বাবা। দ্যাখসে—

এ অপরূপ জিনিস বাপকে না দেখিয়ে সুখ হয় না বাপ-সোহাগি মেয়ের। টেনে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। পশ্চিমা মেঘ ছুটে আসছে—সেই সঙ্গে আকাশ-জোড়া এক ধরনের গোঙানি। দেখতে দেখতে মেঘ সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। বিকালবেলাতেই ঘুরকুট্টি আঁধার। গাঙের জল কালো। সকল সৃষ্টি পুঞ্জিত করেও ও-পার এখন নজরে আসে না, মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কাছের এই তীরে বন—বন কে বলবে,

নীরন্ধ্র এক কালো যবনিকা।

ও জুড়ন!

ডেকে মধুসূদন কিছু উপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন। না শুনেই জুড়ন মাঝি খলখল করে হেসে উঠল: ঠিক আছি বাবু।

গাঙের উপরে আঁধারটা তত ঘন নয়। জুড়নের অদ্ভুত চেহারা—লড়নেওয়ালা সে যেন। চোখে মুখে শঙ্কা নয়, সংকল্প। হাল ধরে টান-টান হয়ে বসেছে। হাত দুটো এখন বুঝি রক্ত-মাংসের নয়, ইস্পাতের—আঘাতে ঠং-ঠং করে বাজবে।

প্রচণ্ড ধাক্কা একটা। ঢেউ বয়ে গেল পাটার উপর দিয়ে। খোলেও বেশ খানিকটা ঢুকল। গোঁ-গোঁ গোঁ-গোঁ করে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে পড়ছে। গাঙ উথাল-পাথাল। ডিঙি টাল খেয়ে খেয়ে পড়ে—হায় হায়, গেল বুঝি এইবার। জুড়ন অভয় দিচ্ছে: বাতাসের বাপের ক্ষমতা নেই বেকায়দায় ফেলবে। কতক্ষণ আর লড়বে—মুরোদ জানা আছে, নেতিয়ে পড়বে এক্ষুনি।

কিসের জোরে দম্ভ, কে জানে! এখন আবার কড় কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোনো দিকে জনপ্রাণী নেই—একটা নৌকা গেল না এতক্ষণের মধ্যে। জল, জল, জল—আর জঙ্গল বাঁ-দিকে। আর ক্রুদ্ধ মেঘ মাথার উপরে সারা আকাশ গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি এল ঝেঁপে—নীচে সীমাহারা জল, উপর থেকেও জল। এক সুবিধা, বিদ্যুৎ-চমকানিতে চতুর্দিকের আন্দাজ পাওয়া গেল। ভয়ার মধ্যে জুড়ন. দেখি, দূর-গাঙের দিকে ডিঙি ছুটিয়ে দিয়েছে। সর্বনাশ, পাগল না ক্ষ্যাপা রে! ঝড়ে ধারাবর্ষণে সূচীভেদ্য অন্ধকারে মাঝির মাথায় অপদেবতা ভর করেছে ঠিক।

জুড়ন বলল, ঠিক যাচ্ছি। নয়তো চরে তুলে ডিঙির তলা ফাঁসাবে।

জুড়নই ঠিক, অনতিপরে আর সন্দেহ রইল না। ঝড়ের দম ফুরিয়ে এল, কমতে কমতে শেষটা শুধু বৃষ্টি। তা-ও গেল। আকাশ-ভরা তারা। শান্ত প্রসন্ন নদী। একটু আগে এত বড় ধুন্দুমার কাণ্ড হয়ে গেছে, কে বলবে!

কাটাখালি ছাড়িয়ে ডিঙি বিলে গিয়ে পড়ল। এক-হাঁটু, খুব বেশি তো এক-বুক জল। সে জলও বড় দেখা যায় না—ধানগাছ জলের উপরে মাথা তুলে আছে। খসখস আওয়াজ তুলে ডিঙি ধানগাছের উপর দিয়েই যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে পতিত জমি—শোলার জঙ্গল, চেঁচোঘাস। অজস্র শালুক আর শাপলা ফুটে আছে—শাদা শাপলা, লাল শাপলা। হাত বাড়িয়ে ছটা দীর্ঘ ডাঁটাসুদ্ধ তুলে তুলে ডিঙির খোলে গাদা করে ফেলছে। দূরে দিগন্ত-সীমানায় গাছপালা—তার মধ্যে নারকেলগাছ, তালগাছ, খেজুরগাছ, সকলকে ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলেছে, ঐ গাছগুলোই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না শুধু।

গা-গ্রাম ঐসব খানে—ওরই মধ্যে মুলটি গ্রাম, সেখানে ছটাদের বাগের নিচে মাদারতলায় ডিঙি গিয়ে ভিড়বে।

উদ্বিগ্ন হয়ে ছটা বার বার শুধায়: দেখতে সব তো একই রকম বাবা। ওর মধ্যে কোনটা মুলটি, কেমন করে বুঝবে?

মধুসূদন হেসে আঙুল বাড়ালেন: ঐ দেখ্। মাদারগাছ দেখতে পাচ্ছিসনে?

প্রাণপণে দৃষ্টি বিসারিত করে ছটা বলে, না তো—

গাছ এখন ন্যাড়া কিনা, ঠাহর পাচ্ছিনে। ফাল্গুনমাস হলে রাঙা রাঙা ফুলে নজর টেনে ধরত।

বিলে পড়ে বোঠে তুলে ফেলেছে, ধ্বজি মেরে মেরে যাচ্ছে এখন। কী বাতাস! ধানগাছের খাড়া মাথায় ঝাপটা মারে, শুয়ে পড়ে গাছ জলের উপর। খাড়া হয়েছে, অমনি আবার ঝাপটা। এই খেলা কাটাখালি থেকেই দেখতে দেখতে আসছে। বাদাবনে গাছগাছালি অর জোয়ার-ভাটার খেলা, এখানে বিলের মধ্যে খেলা বাতাসে আর ধানবনে। খেলা আর খেলা—সেখানে নিত্যিদিন জঙ্গলের খেলা দেখে এসে বিল এই ধানবনের খেলা দেখতে দেখতে যাচ্ছে। খেলার কোথায় ছাড়ান নেই।

উঁচু মতন দেখাচ্ছে—কাছে এসে মালুম হলো ঘরই বটে। এ জিনিসের আলাদা নাম হয়েছে—টোঙ। জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে ছোট একটু মাচা, মাচার উপরে যৎসামান্য আচ্ছাদন। দুটো-তিনটে মানুষ ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে কোন রকমে বসতে পারে। শুতেও পারে হয়তো, তবে পা মেলে পুরোপুরি লম্বা হয়ে নয়। সে বিলাসিতার জন্যে কেউ বিলে আসে না—গ্রামেই তো ঘর-বাড়ি রয়েছে। তলার এখানটা পাটা দিয়ে মাছ আটকেছে—মাছ ধরে, আর টোঙে বসে পালা করে দিবারাত্রি পাহারা দেয়।

মধুসূদন বললেন, দিদি এতক্ষণে রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমুচ্ছেন। মাছ নিয়ে গেলে মাছের ঝোল-ভাত তাড়াতাড়ি হতে পারবে।

একটা বুড়োলোক এখন পাহারায়। আধেক চোখ বুঁজে লোকটা ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানছে। মধুসূদন বললেন, মাছ আছে মুরুব্বি?

নাঃ—বলে সংক্ষেপে সেবে লোকটা নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ল।

ছটা করকর করে ওঠে: মাছ থাকবে না তো মিছামিছি মাঝবিলে পড়ে থাকা কেন?

কথার ঢঙে কৌতুক লাগল। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে বুড়ো বলল, কাল হাটবার ছিল—সব মাছ নিকারিরা টেনে নিয়ে গেছে।

একেবারে বাড়ন্ত কি হতে পারে? হাপর তোল, দেখি।

বলে ছটা বুড়োর অপেক্ষাই নেই—ডিঙির ছুঁইয়ে উঠে গেল, সেখান থেকে এক লম্ফে টোঙের উপর। হুঁকো ফেলে বুড়ো শশব্যস্ত হয়ে উঠল: অত বড় লাফ দিলে—এমন ডাকাতে মেয়ে তো বাপের জন্মে দেখিনি। ঐ হাপর রয়েছে—টানাটানি করে পেরে উঠবে না।

বাঁশের শলায় বোনা ভারীসারি বস্তু, জলের মধ্যে ডোবানো—সামান্য একটুকু জেগে আছে। ছটা বলে টানাটানির কী দরকার। হাত ঢুকিয়ে দু-চারটে ওর মধ্য থেকে বার করে আনি।

তাদের ডোঙা হাপরের পাশে, ছটা ডোঙায় নেমে পড়ে হাপরে হাত ঢুকিয়ে দেয়। মাছ খলবল করে ওঠে।

করো কি, করো কি বুড়ো বলে ওঠে: কই-মাগুর-সিঙি রয়েছে কানমাছও আছে ক'টা। কাঁটা যদি মেরে দেয়, বুঝবে ঠেলা।

ছটার ভ্রূক্ষেপ নেই। বলে, এ আর কী! বুঝলে চাচা, একদিন বনমুরগি ধরতে গিয়ে সাপ এঁটে ধরেছিলাম আর একটু হলে।

টুক করে বড় এক মাগুরের কানকো চেপে তুলে ধরল। কোথায় রাখা যায়, কোথায়—এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

জুড়ন মাঝি কাড়ালে এসে গামছা পাতল: এখানে ফেলে দাও—

হাপরে ছটা আবার হাত ঢুকাল। দু-হাতে দুটো মাগুর একসঙ্গে এবার। ব্যাস—

কাণ্ড দেখে বুড়োর চক্ষু দুটো ঠিকরে বেরুনোর গতিক। বলে, এতে হবে কেন ? নাও—

মধুসূদন বললেন, খুব হবে। অল্প মানুষ আমরা। আর দরকার নেই।

ঘাড় নেড়ে বুড়ো বলে, তিন-শত্তুর নিচ্ছ। আমি কি শত্তুর ?

ছটার দিকে চেয়ে আদেশের সুরে বলল, বের করো।

রীতিরক্ষার মতো ছটা ছোট একটা কই নিয়ে এল: হলো তো ?

মধুসূদন মনিব্যাগ বের করলেন। বুড়ো না-না- করে ওঠে: মেয়েকে খেতে দিয়েছি। পয়সা কিসের ?

সে হয় না।

না হয় তো হাপরের মাছ হাপরে আবার ঢেলে দাও। হাটুরে পাইকার ছাড়া খুচরো বিক্রি এখানে নেই।

ছটা বাপকে বলল, তোমার অন্যায় বাবা। চাচা আমায় খেতে দিলেন, তার আবার দাম কি ?

বুড়ো ফোকলা মুখের হাসি হেসে বলল, তাই দেখ দিনি মা। ঘরে আমারও মেয়ে আছে—তোমার বয়সি।

ডোঙা এদিক-ওদিক টলছে, সেই ডোঙার মাথা থেকে অবলীলাক্রমে হাঁটতে হাঁটতে ওদিককার শেষ মুড়োয় গিয়ে ছটা তড়াক করে ডিঙিতে উঠে পড়ল। জুড়নকে বলল, দাঁড়াও একটু—ছেড়ো না।

তাড়াতাড়ি একটা জামা বের করে টোঙের দিকে তুলে ধরল: ধরো, আমার বোনটিকে দিচ্ছি।

সম্পর্ক পাতিয়ে পাতিয়ে বড় মিষ্টি করে বলে মেয়েটা। বড্ড ভালো। আনকোরা জিনিসটা, দামীও নিশ্চয়। বুড়ো কিন্তু-কিন্তু করে: তোমার শখের জিনিস—

ছটা আগুন হয়ে বলে, জামা না নেবে তো তোমার মাছও আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো। সাফ কথা আমার, হ্যাঁ—

নিতে হলো, নিয়ে সযত্নে বুড়ো মাদুরের তলে রাখল। বলে, ঐ তো, মুলটি দেখা যাচ্ছে। তোমাদের বাড়ি একদিন যাবো, তোমার বুনডিরি সাথে নিয়ে যাবো মা।

ছটা জুড়ে দেয়: জামা পরিয়ে নিয়ে যাবে—কেমন ?

ডিঙি ছাড়ল। রাধিকা বললেন, কোন্ জামাটা দিলি রে ?

মুখ বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ছটা বলল, সেই যে শালোয়ার আর কামিজ—

রাধিকা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, হারামজাদি মুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করে না। দামী জিনিসটা দিলি তো দানছত্তোর করে ?

ছটা বলে, বন-জঙ্গলে কেউ দেখে না বলে সেখানে এক-আধ দিন পরতাম। তাই বলে লোকালয়ের মধ্যে—তুমিই তো কত ছি-ছি করেছিলে মা। আমার হলো কানা গরু বামুনকে দান—নিজে পরব না, তাই দিয়ে দিলাম। হি-হি-হি—

॥ দশ ॥

ন্যাড়া-শিমুলতলায় ডিঙি বাঁধল। ডাঙা ছুঁতে না ছুঁতে ছটা লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট। কাদা-জল এখানে-ওখানে, ছিটকে উঠে গায়ে লাগে। পুকুর-পাড়ে এসে লহমার তরে থমকে দাঁড়াল। কানায় কানায় জল উপচে পড়ছে। ছটার ইচ্ছে করে, ঝপ্‌পাস করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—জলে দাপাদাপি করে কলমিলতা ছিঁড়ে ডুবসাঁতার দিয়ে

চিতসাঁতার দিয়ে বার কতক এপার-ওপার করে দেহটা চাঙ্গা করে নিয়ে। তিন দিন ডিঙির উপর কাটিয়ে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। হঠাৎ গিয়ে পড়ে পিসিকে চমকে দেওয়া তাহলে হয় না। অতএব সাঁতার মুলতুবি রইল, রক্ষে পেয়ে গেল পুকুর। ছটা ডবল জোরে ছুট দিল।

ভামিনী পিসি দাওয়ায়। ডাঁটি-ভাঙা চশমা নাকের উপর উঠেছে। কি গতিকে চালের সঙ্গে মুসুরিকলাই মিশে গেছি। মুসুরি ঠাকুরমশায়দের মতে আমিষ—আমিষ-মিশানো চালে বিধবা মানুষের ভাত হবে কমন করে? চাল অতএব কুলোয় ঢেলে একটা একটা করে মুসুরি বেছে ফেলছেন। ক'দিন ধরে তাঁর এই কাজ। চিলের মতন হঠাৎ ঝাপটা মেরে চাল ছড়িয়ে কুলো সরিয়ে নিল।

ভামিনী গর্জে উঠলেন : কে রে অলপ্পেয়ে?

সমান গর্জন বিপরীতে : কুলোয় পা ঢেকে রেখেছে, পায়ের ধুলো নেবো না?

ছটার দিকে ভামিনী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। ছটা ধমক দেয় : মুখের বাক্যি হরে গেছে? আগে তো পিসিমা এমন ছিলে না!

ভামিনী বললেন, বড়োসড়ো হয়ে গেছিস বেশ।

ছটার পুনশ্চ ধমক : খুঁড়ছ?

ওমা, কখন? একেবারে পাটকাঠিখানা ছিলি, হাওয়ায় উড়তিস—এখন একটু মানুষের মতন···আর সব কই রে? মধু আসেনি?

দেখতে দেখতে পাড়া ভেঙে এসে পড়ল। নোনা রাজ্যে বাদাবনে কাটিয়ে এল, কেমন হয়ে এসেছে দেখি। বর্ধনদের গিন্নি বললেন, খাসা শ্রী খুলেছে ছটাকির মা। মেয়ের বিয়ে-থাওয়া দাও এবারে?

রাধিকা বললেন, বিয়ে কি আমাদের হাতে দিদি? আর-জন্মে যাদের হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছে, তাদের জিনিস সময় হলে তারাই খুঁজেপেতে নেবে। বয়স কী-ই বা, আর চাল-চলনে তো একেবারেই ছেলেমানুষ।

দিন সাতেক বাড়ি কাটিয়ে যতীন আজ মুলটি এসে পেঁছিল। মধুসূদনের সঙ্গে নতুন কর্মস্থান কুপ-অফিসেই যাবে। খেতে বসে রাধিকার পানে মুখ তুলে সে অবাক হয়ে তাকাল : জঙ্গলে মাছের রকমারি তরকারি করে খাওয়াতেন মা, এখানে আঁশটে গন্ধটুকুও পাচ্ছিনে।

রাধিকা বললেন, হাটবার ছাড়া মাছ মেলে না এখানে।

যতীন বলে, পুকুরে বড় বড় আফালি করছিল। বাবু কদ্দিন পরে বাড়ি এলেন —নোনা রাজ্যে মাছ যতই খান, বাড়ির পুকুরের স্বাদ আলাদা। আমি মাছ ধরে দেবো।

মধুসূদন পাশাপাশি খাচ্ছিলেন। বললেন, পুকুরের কানায় কানায় জল, মাছ ধরা এখন চাট্টিখানি কথা নয়।

যতীন বলে, ছিপে ধরব বাবু। যেগুলো ভাসন্ত মাছ তার ভিতরের কতক কতক জালে বেড় পড়ে। ছিপের আলাদা ব্যাপার—সারা পুকুরে একটা মাছও যদি থাকে, ঠিক মতন চার দিয়ে সেই মাছটাও টেনে তুলতে পারি। নইলে আর মাছুড়ে বলে কেন।

ছটা আহ্লাদে লাফিয়ে ওঠে : বড় বড় রুই কাতলা মৃগেল আছে, সবাই বলে। একটা দুটো তোল দিকি কেমন। ছিপে মাছ মারতে বড্ড মজা।

যতীন বলে, হুইল-ছিপ আছে ? এমনি ছিপেও যে হবে না, তা নয়। আস্ফালিতে আন্দাজ হয় পাঁচ-সাত সেরের নিচে মাছ নেই। হুইলের সুবিধে হলো, সুতো ছিঁড়ে পালাতে পারবে না। যত টানছে তত আমি সুতো ছেড়ে যাচ্ছি। অবিশ্যি না যদি পাওয়া যায়, মাছ-মারা তাই বলে কি আটকে থাকবে ?

খোঁজখবর করে ছটা হুইল-ছিপই জুটিয়ে আনল। উঠোন খুঁড়ে কেঁচো তুলে দিল। কুঁড়োর সঙ্গে নালশোর ডিম চটকে চার বানাল। যেমন যেমন যতীন বলছে। পুকুর-ধারে গিয়ে যতীন ছিপ ফেলে বসল, ছটা একেবারে পাশটিতে। মাছ মারতে বসে কথা বলা যায় না—বলতেও হয় না। মনের কথা ছটা ঠিক ঠিক বুঝে নিয়ে দরকারের জিনিস হাতের কাছে এনে ধরছে।

বৃষ্টি এল ঝুপ ঝুপ করে। যতীন বলে, ঘরে যাও না খুকি! শখ করে জলে ভেজা কেন ?

এখনই যদি মাছে খায় ?

আমি তো রইলাম।

তোমার যদি ঝিমুনি ধরে, চোখ বুজে পড়ো!

বাড়ির ওদিক থেকেও বিষম ডাকাডাকি লাগিয়েছে। অতিষ্ঠ হয়ে ছটা উঠল। তক্ষুনি আবার, কোন অজুহাতে কে জানে, ফিরে এসে জায়গা নিয়ে বসল।

ঘোর হয়ে গেছে। ছটা বলল, তুমি কেবল মুখসর্বস্ব যতীন-দা। পরের বাড়ি থেকে হুইল চেয়ে নিয়ে এসেছি—জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেবো ?

যতীন বলে, চারে তো এসেছিল। তোমাদের পুকুরের হলো নবাব-বাদশা মাছ—কেঁচো তারা পছন্দ করে না। ঠোক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। হতো বোলতার টোপ, না-গিলে যেত কোথায় দেখতাম।

বিরস মুখে হুইলের সুতো গোটাতে গোটাতে বলল, মাছেদের কাছে কেঁচো হলো ডাল-ভাত, বোলতার ডিম কোপ্তা-কাবাব।

ছটা অধীর কণ্ঠে বলে, বললে না কেন আমায় সে কথা ?

বললে কি হতো ? বৃষ্টিবাদলার এখন চাক পাওয়া সোজা নয়।

ছটা বলে, পাই না পাই দেখো। কালকের মধ্যেই দেখিয়ে দেবো।

যতীন বলল, কাল বিকেলে আমরা তো রওনা হয়ে যাচ্ছি।

থেকে যাও যতীন-দা। অন্তত একটা দিন। যা-হোক একটা ছুতো বের করো। বলো যে পেট কামড়াচ্ছে।

মাছ খাবার জন্যে ? ধুস। আজকে ডাহা বেকুব হলাম। জলের মাছের মরজি কিছু বলা যায় না, কালও যদি এমনি হয়। কী দরকার! পথের দুটো-তিনটে দিনের কষ্ট—তারপরে তো মাছের ভান্ডারে পেঁৗছে গেলাম।

যতীন গেছে, ছটা তা বলে মতলব ছাড়েনি। পুকুরের মাছ তুলবেই ডাঙায়। হুইল-ছিপটা ফেরত না দিয়ে রেখে দিয়েছে—যাদের ছিপ তারাও গরজ করেনি এখন ছিপের মাছের মরশুম নয় বলে। ঠিক দুপুরে বাড়ির সব ঘুমোলে ছটাই চুপিসারে এসে বসবে। বড় মাছ যদি গাঁথতে পারে, তখন মা'র গালি দেবার কথা মনে থাকবে না—জুত করে রাঁধবে বলে রান্নাঘরে ছুটবে।

মউলরা আকাশে মুখ করে মৌমাছির পিছনে ছোটে—ছটার ঠিক সেই কায়দা। বোলতা ওড়া দেখলেই পিছু নেয়। মেয়েটার অসাধ্য কর্ম নেই—বের করেছে এক চাক।

বর্ধনদের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের কার্নিশের নিচে। মানুষের নজর ও বৃষ্টি এড়ানোর জন্য আহা-মরি জায়গা বেছেছে বোলতারা। ভাঙা দেয়ালে উঠে অশ্বত্থগাছের ভিতর দিয়ে করে করে অনেক চেষ্টায় ছটা চাক বের করল।

লম্বা লগি নিল, লগির মাথায় কাস্তে। নিজের মাথায় কাপড় জড়িয়েছে—মানুষ বলে ধরতে না পারে। লগিতে নাগাল পাচ্ছে না তো অশ্বত্থের একটা ডালে উঠে পড়ল। দিল কাস্তের পোঁচ। কপাল মন্দ, গ্রহের ফের। চাক ভেঙে মাটিতে না পড়ে অশ্বত্থের ডালে-পাতায় আটকে গেল ছটা। যেখানটা দাঁড়িয়েছে, তারই কাছাকাছি। আর যাবে কোথা—ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা এসে পড়ল। নেমে পড়বে ছটা, তা দিশা করতে দেয় না—আক্রোশ ভরে হুল ফোটাচ্ছে। বিপদের মধ্যেও ছটার টনটনে হুঁশজ্ঞান—অদূরের পোয়ালগাদা আন্দাজ করে ঝাঁপ দিল।

বিষম জ্বলুনি, কিন্তু মুখে টু-শব্দটি নেই—শাড়ির কাপড় আরও ভাল করে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পোয়ালের মাচার নিচে চলে গেল। নিঃসাড়ে পড়ে আছে—বোলতায় মানুষ-শদ্র বলে বুঝবে না, গাছের মুড়ো বা ঐ জাতীয় কিছু। দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণ চেষ্টায় সে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে। কাজ দিল এতে—কিছু পাক-চক্কোর দিয়ে বোলতারা চলে গেল। গুটি-গুটি বেরিয়ে তখন দৌড়। ঘরে গিয়ে মেজের উপর এপাশ ওপাশ করছে, মুখে তখনও আওয়াজ নেই। কানে শুনে পাছে লোকজন ছুটে আসে। সে ভারি লজ্জার। বকুনিও হবে একচোট।

তবু চাপা দেওয়া গেল না। যন্ত্রণা কমল, কিন্তু মুখ ফুলে ঢোল। চোখ দুটো আছে কি নেই—ফুলোর মধ্যে ছোট্ট হয়ে কুতকুত করছে।

রাধিকা ঢুকে বললেন, শুয়ে কেন রে অসময়ে ?

ছটা বলে, ছুটোছুটি করলে দোষ, আবার চুপচাপ শুয়ে আছি তাতেও দোষ ?

দেড় পহর বেলায় তুমি তো এমনি এমনি শুয়ে থাকার মেয়ে নও। মুখ ঢাকছিস কেন ? দেখি—

জোর করে রাধিকা মেয়ের মুখ ঘুরিয়ে ধরলেন।

॥ এগারো ॥

মণিলালের খবর ঃ পরীক্ষা দিয়ে ছোটমাসির বাড়ি সে আম খেতে গিয়েছিল। বনেদি গৃহস্থ তাঁরা—চার-চারটে আমবাগানের মালিক। কিন্তু সে-আমের পাট কবে চুকেবুকে গেছে, অদ্যাপি ফেরে না। পড়াশুনোর ঝঞ্ঝাট নেই, স্ফূর্তির প্রাণ এখন। আবার অন্য কোথাও গেছে কিনা কে জানে।

সেই মানুষ এক সকালে ছটাদের বাড়ি হঠাৎ এসে উপস্থিত। উঠানে এসে সাড়া নিচ্ছে ঃ কই রে, গোবিন্দর-মা কোথায় গেলি ?

ফিরেছে কাল রাত্রে। মধুসূদনের বাড়ি আসার কথা শুনেছে। এবং বোলতার কামড়ে ছটার নাস্তানাবুদ হবার কথাও। রাত পোহালেই চলে এসেছে। শুধু গোবিন্দর মা-য় সুখ হচ্ছে না, সশব্দে পুরো ছড়া কাটছে ঃ গাল-ফুলো গোবিন্দর-মা, চালতে-তলায় যেও না—

ছটা পুরোপুরি আরোগ্য হয়ে গেছে—ফুলোটুলো কিচ্ছু নেই। তরতর করে সামনে এসে মুখ বাড়িয়ে দিল ঃ দেখ, গাল-ফুলো কোথায়। কেন মিথ্যে করে 'গোবিন্দর-মা' বলবি ?

মণিলালের এ্যাব্বড়ো-এ্যাব্বড়ো চোখ। বছর দেড়েক দেখা নেই—বিধাতা এর

মধ্যে গড়েপিটে একেবারে যে নতুন করে দিয়েছে। নোনতা জলহাওয়ার দরুন রংটা ময়লা —তাতেই বেশি বাহার খুলেছে।

মনোভাবটা ছুটা না বুঝতে পারে। দেমাকে তাহলে ধরাখানাকে সরাজ্ঞান করবে। ধমকের সুরে মণিলাল বলল, বনে থেকে থেকে তুই আর মানুষ নোস ছুটা।

ছুটা মেনে নেয়ঃ পাখি। বসন্তবউরি কি কোকিল। কিংবা দুধরাজ।

ঘাড় নেড়ে মণিলাল বলে, উঁহু, বাঁদর। গাছে গাছে বেড়াস। কী সর্বনেশে কাণ্ড করেছিলি—অল্পের জন্য বেঁচে গেছিস।

কৈফিয়তের সুরে ছুটা বলল, নচ্ছার মাছগুলোর বোলতার ডিম ছাড়া অন্য কিছু মুখে রোচে না, কি করব? চাকের জন্যে গাছে উঠতে হলো।

মণিলাল বলল, বর্ষাকালে খাল-বিল মাছে ঠাসা। পুকুরে ছিপ ফেলে এখন হাঁ-পিত্যেশ বসে থাকে, এমন গাড়োল দেখিনি বাবা। তোদের ন্যাড়াকে খানকয়েক চারো-ঘুনসি কিনে দিস, সন্ধ্যেবেলা বিলের এখানে-ওখানে পেতে আসবে, সকালে ঝাড়ার সময় মাছে খালুই বোঝাই হয়ে যাবে দেখিস।

মধুসূদনের বাড়ির অদূরে হাই ইস্কুল। পুরানো ইস্কুল—নামডাক আছে, ছাত্রদের মধ্যে কেষ্টবিষ্টু হয়েছেন অনেকে। হতে এখনো পারে। ছাত্র যথেষ্ট, ইস্কুলবাড়ি খোড়োচালের হলেও নিন্দের নয়। অভাব শুধু মাস্টারের—মাইনে না পাওয়ার দরুন মাস্টার টেকে না। বিশেষত মাস্টারের গায়ে একটা-আধটা পাশের আঁচড় যদি থাকে।

পদ্মপত্রে জলবৎ মাস্টারেরা টলটলায়মান, চিরস্থির শুধুমাত্র ক্লার্ক, বিপিন সমাদ্দার। তিনি এসে মণিলালকে পাকড়ালেনঃ বাড়ি বসে গজালি না পিটে কিছু বিদ্যাদান করো। ইস্কুলের পুরানো ছাত্র হিসাবে দাবিও আছে তোমার উপর।

মণিলালকে অতএব ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারের চেয়ারে বসতে হচ্ছে। বিপিনের হাত এড়ানো অসম্ভব।

সন্ধ্যার পরেই আলো নিভিয়ে ভামিনী নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন। জ্ঞান দেবেন বলে ভাইঝিকে সেই সময়টা প্রায়ই ডাকেন।

আর ছোট্টটি নোস। স্বভাবে নরম-শরম হবি—এ দেখি আরও উল্টো হয়ে এসেছিস।

ছুটা বলে, বাদাবনে পাঠিয়েছিলে যেমন!

ভাবিনী বলে যাচ্ছেন, হাঁটা তো ভুলেই গেছিস, খালি ছোটা আর লাফানো। মাটির উপরেই বা কতক্ষণ—এ-গাছে আর ও-গাছে। জলে নামলি তো পানকৌড়ির মতন সারাবেলাস্ত ডুবছিস আর ভাসছিস।

করুণ সুরে ছুটা বলে, অনভ্যাস পিসিমা। বাদাবনে হাঁটবে কোথা? গাঁয়ের মতন সমান চৌরস জায়গা তো নয়—জঙ্গল আর জলা। জঙ্গলে পা দিলেই তো বাঘ দাঁতাল আর সাপ চক্কোর মারতে লাগল চৌদিকে।

ভামিনী শিউরে উঠে বললেন, সত্যি?

জিজ্ঞাসা কোরো বাবাকে। আর জলে নেমেছি তো কুমিরের তাড়া। বাঘে তবু হাতখানা পাখানা ছিঁড়ে সজনের ডাঁটার মতো চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। হাত নেই পা নেই, মানুষটা তবু বেঁচে রয়েছে—বাদাবনে কত এমন দেখতে পাবে। কুমিরের টুকরো-টাকরায় খিদে মেটে না। হাঁ করে আমার মতন আস্ত মানুষটা মুখের মধ্যে

পুরে কোঁৎ করে গিলে ফেলে। ঠিক সেই লহমায় কেউ যদি কুমিরটাকে মেরে পেট চিরে ফেলে, একেবারে নিখুঁত আমায় পেয়ে যাবে—গায়ে দাঁতের একটা দাগ পড়েনি। পেট থেকে বেরিয়ে পড়েই হয়তো বলছি, ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি পিসি, তোমার চালভাজা ছোঁচ-বাতাসা যা থাকে বের করো।

পিসি বলে উঠলেন, ওরে বাবা!

কণ্ঠে দেমাকের সুর এনে ছটা এবার বলে, সাঁতার কেটে সেই কুমিরের মুখ থেকে পালানো—বোঝ কী ব্যাপার! বুকের নিচে কলসি নিয়ে গল্পগাছা করতে করতে সে-রকম সাঁতার হয় না। জলের উপরে রেলগাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছি যেন। খানিকটা পিছু পিছু ছুটে থোঁতামুখ ভোঁতা করে কুমির হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় ফিরে যায়। আমিও ততক্ষণে ডাঙায়।

খুব জমে গিয়েছে। ভাইঝির ডানপিটেমি শুনতে শুনতে ভামিনীর মন চলে যায় —শ্বশুরবাড়ির বউ ছিলেন তিনি যখন। সে বাড়ি একেবারে গাঙের উপর। বাঘ আসত মাঝেমধ্যে, রাতদুপুরে ফেউ ডাকত। কুমিরের অত্যাচারে গাঙের কাছাকাছি কেউ গরু বাঁধত না। খুঁটো উপড়ে গরু টানতে টানতে গাঙে নিয়ে যেত, অসহায় গরু হাম্বা-হাম্বা করত। এমন অনেক হয়েছে। বউ হয়েও ভামিনী এসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না—রাতদুপুরে উঠে জলকাদা ভেঙে গাঙের ধারের মিছরিগোলা-গাছের তাল কুড়োতে যেতেন। বউয়ের কীর্তিকলাপ টের পেতেন শুধুমাত্র বর—টিপিটিপি তিনিও পিছু নিতেন। মিছরিগোলার তাল অতি সুতার—রসগোল্লা ফেলে লোকে ঐ তাল চাইত।

ছটার গল্প চলছে ওদিকেঃ কুমিরের সঙ্গে, পিসিমা, কামটও গিজগিজ করছে। কামট আরও সর্বনেশে—জলের নিচে কোথায় যে আছে, ঠাহর পাবার জো নেই। দাঁতে ক্ষুরের ধার। কুচ করে হাতখানা কেটে নিয়ে গেল—কষ্ট নেই, টেরই পেলে না। চানের পর ডাঙায় উঠে খোঁজ হলোঃ কইগো, আমার যে একটা বাঁ-হাত ছিল—গেল কোথা?

ঘেটের-বাছা সুভালাভালি ঘরে ফিরেছে—অন্ধকারে ভামিনী তার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। মামলা এখন তারই স্বপক্ষে, বুঝতে পারছে ছটা। বলে, তুমিই পিসিমা বিচার করে বলো। গাছে চড়ব না, জলে সাঁতরাব না—সব অভ্যেস একদিনে ঝেড়ে ফেলা যায়? চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে শুয়ে কাটাতে বলছে—তার চেয়ে মুখ-হাত-পাগুলো কেটে দিলেই তো চুকেবুকে যায়। কী বলো, অ্যাঁ পিসিমা?

পুরোপুরি সমর্থন দিয়ে ভামিনী বলে উঠলেন, এখন বললে কি হবে? নিয়ে যায় কেন ওরা বাদায়? বলেছিলাম তো, মেয়ে আমার কাছে রেখে যা। উল্টে তখন আমায় সুদ্ধ টেনে নিতে চায়।

ছটা শিউরে উঠে বলল, ভাগ্যিস যাওনি। তোমারও ঠিক আমার দশা হতো পিসিমা। সাঁতরাবার জন্য, গাছে ওঠার জন্য হাত-পা কুটকুট করত। তোমার দেহে কুলাত না। কষ্টই কেবল বাড়ত।

চুমকুড়ি কুপ-অফিসে ঘর একখানা মাত্র। আর আছে কয়েকটা বোট—তাতেও কিছু লোকজন থাকে। হেডগার্ড সাতকড়ির বোটে স্থিতি, ডাঙার উপর ঠাঁই মেলেনি।

রাত্রে ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দুই-মশারির ভিতরে দু'জন—মধুসূদন আর যতীন। বউ-মেয়ে নিয়ে বহুদিন একত্র থেকে মধুসূদনের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে—কাজের

সময় যা-হোক একরকম, অন্য সময় বড্ড খালি-খালি ঠেকে। যতক্ষণ যতীনের হুঁ-হাঁ দেবার তাগত থাকে, মধুসূদন তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলেন। সুখ আর কোথা, বলেন দুঃখের কথাই : দূর দূর! চাকরির মুখে ঝাড়ু মেরে বাড়ি গিয়ে উঠব। ছটার মা'র ইচ্ছেও তাই। খুদকুঁড়ো যা আছে, চলে যাবে একরকম। জঙ্গল-রাজ্যে নোনাজল খেয়ে চিরকাল কেন পড়ে থাকতে যাব?

যতীন প্রতিবাদ করে : শুধুই কি আর নোনাজল? নোনাজলে মাছ কিরকম সেটা বলুন বাবু!

মধুসূদন খিঁচিয়ে ওঠেন : খালি মাছ আর মাছ! মাছ খেয়েই বুঝি চতুবর্গ লাভ হয়?

যতীন একটু নীরব থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে, বাড়িতে সুখ-সোয়াস্তি ঠিক, খাওয়ার বেলা কিন্তু কলমিশাক আর বীচেকলা-ভাতে। শুধু সুখ-সোয়াস্তিতে আমার পোষাবে না বাবু। আপনি চাকরি ছাড়লে আমায় অন্য কারো সঙ্গে জুটিয়ে দিয়ে যাবেন। রাঁধাবাড়া করব, খাবো-দাবো, ব্যস। বাদা ছেড়ে আমি যাবো না।

গোড়ায় গোড়ায় মধুসূদন ভারি মুষড়ে পড়েছিলেন। অমনি ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই হতো। সে ভাবটা ক্রমশ কাটিয়ে উঠছেন, বিষন্ন মুখে ধীরে ধীরে হাসি দেখা দিচ্ছে।

খেতে খেতে একদিন মধুসূদন খলখল করে হেসে উঠলেন—শোওয়া পর্যন্ত সবুর সয় না। বললেন, 'খেদাই নে তোর উঠোন চষি'—মুখুজ্জের চক্রান্তটা তাই। কুপ-অফিসে চালান করে ভাবল, শুখো মাইনের গোনা টাকায় পোষাতে পারবে না—চাকরি ছেড়ে বাপ-বাপ করে পালাবে। সেটি হচ্ছে না, গ্যাঁট হয়ে চেপে রইলাম। আরে বাপু, হোক না অজঙ্গি জঙ্গল—দেনেওয়ালা যিনি তাঁর এলাকার বাইরে তো নয়। তাঁর দয়া হলে ছপ্পর ফুঁড়ে দিয়ে দেবেন।

চুমকুড়ি অফিসেও অতএব খনি আবিষ্কার হয়েছে। সে খনি সোনা-রুপোরও নয়, কোহিনুর-হীরের—মধুসূদনের কথাবার্তা ও হাসির বহর দেখে মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

কপাল বটে মণিলালের। চারিদিকে গাদা গাদা বেকার, আর মণির বেলা পরীক্ষা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অমনি চাকরি। ফল বেরুনোর সবুর সয় না।

এবং হপ্তা দুই যেতে না যেতেই প্রোমোশান। বিপিন সমাদ্দার বললেন, খাসা পড়াও হে তুমি। মুলটি হাই ইস্কুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার হয়ে যাও কাল থেকে।

মণিলাল অবাক হয়ে বলে, বলেন কি! এখন অবধি গ্রাজুয়েটও তো নই।

বিপিন বলেন, হওনি—হয়ে যাবে। দু-দুখানা পাশ কবজা করে ফেলেছ, ওখানাও আটকে থাকবে না। ইস্কুলে হেডমাস্টার নেই, অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টারও নেই—কাজের বড় অসুবিধা। একখানা সার্কুলারের নিচে নাম-সই করার লোক পাইনে। কাল থেকে তুমি সই দেবে—নামের নিচে অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার। 'হেডমাস্টার' দস্তুর মতো ফলাও করে লিখবে, তার আগে একটুখানি হিজিবিজি—'অ্যাসিস্ট্যান্ট' লিখেছ, না-ও বুঝতে পারে। না পারে তো বয়ে গেল, সেইটেই তো চাই—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'—আইন বাঁচানো নিয়ে কথা।

বিপিন সমাদ্দারের নজরে ধরেছে—মাইনে কদ্দুর কি জুটবে বলা না গেলেও চাকরি যে পাকা তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বিপিন বললেন, ইস্কুল তোমারই—সকলকে দিয়ে-থুয়ে যা থাকবে, তুমি নিয়ে নিও। আমরা তাকিয়ে দেখতেও যাবো না। টাকার

গরজই বা কি তোমার ? বছর-খোরাকি ধানের সংস্থান আছে, আওলাতপসার আছে, মামামশায়ের বনকরের চাকরি—কোমর বেঁধে তুমি দশের হিত করে বেড়াও।

এ-হেন পাকা-চাকরির জন্য মণিলালের মা দত্তগিন্নি সাত-সকালে ভাত বেঁধে দিতে নারাজ। অতএব চিঁড়েটা মুড়িটা খেয়ে মণিলাল ইস্কুলে আসে, টিফিনের সময় পশ্চিমপাড়ায় মামার-বাড়ি গিয়ে দুপুরের ভাত খেয়ে আসে। কিন্তু মুশকিল হয়ে দাঁড়াল, ঐ পথের চারটে জায়গায় সংঘাতিক রকমের কাদা। পা দিলেই হাঁটু অবধি তলিয়ে যায়, সেই পা টেনে তুলতে চোখের জল বেরোয়। দুটো ভাত খাবার জন্য এত কষ্ট পোষাবে না। টিফিনে ইদানীং সে বেরুচ্ছে না, এটা-ওটা খেয়ে থাকে।

কী করে রাধিকার কানে গেছে। ইস্কুল অদূরে, একদিন তিনি মণিলালকে পথের উপর ধরলেন: কাদা ভাঙার ভয়ে মামার-বাড়ি যাও না, সারা বেলাস্ত উপোস করে থাকো। বলি, আমরা কি চালের ভাত খাইনে ? আজ থেকে আমার এখানে খাবে।

খেতে হচ্ছে অতএব। বাড়ির সামনে দিয়ে পথ, এড়ানোর উপায় নেই।

বিনি কাজে নিত্যিদিন খাওয়া কেমন-কেমন লাগে। নিজেই মণিলাল কথা তুলল: এখন ছটা পড়াশুনো করে ? বনকর অফিসে কিন্তু বেশ হচ্ছিল—না মাসিমা ?

পড়ে বই কি ! রাধিকা ভ্রু-ভঙ্গি করে বললেন, গাছ থেকে তলায় লাফিয়ে পড়ে, পাড় থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। একটা দুটো সম্বন্ধ আসতে লেগেছে—এসেই তারা জিজ্ঞাসা করে, মেয়ের লেখাপড়া কদ্দুর ?

মুরুব্বি মানুষের ঢঙে মণিলাল বলে, যখন যে হুজুগ ওঠে। আপনাদের কালে জিজ্ঞাসা করত, মেয়ে রাঁধাবাড়া সেলাই-ফোঁড়াই কেমন জানে ? এখনকার জিজ্ঞাসা লেখাপড়া। এ তবু ভালো—শহর-জায়গায় আরও উদ্ভট মাসিমা, মেয়ে নাচতে-গাইতে পারে কেমন ? বুঝুন।

একটু ইতস্তত করে বলে, ইস্কুলে চারটেয় ছুটি। বাড়ি গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ভাল লাগে না। ছটাকে ঐ সময়ে একটু-আধটু পড়াই না কেন। কি বলেন আপনি ?

রাধিকা খুশি হয়ে বললেন, ভাল কথা বলেছ বাবা। কিছু যদি রপ্ত করে দিতে পার, বিয়ের পক্ষে সুবিধা হয়। যেটুকু পারো, সেই লাভ।

শুভস্য শীঘ্রম্—সেই বিকাল থেকেই। মণিলালের স্বর গম্ভীর—মাস্টার-মানুষের যেমন হতে হয়, হালকা হলে পড়ুয়া ভয় করবে কেন ? বলে, আমি চলে আসার পরে বইয়ের পাতা খুলতিস একটু-আধটু—না, বনে বনে বাঁদরামি শুধু ?

ছটা কলকল করে বলল, সেই বই সারা করেছি, তার পরে আরও কত। বাবা পড়া ধরত যে—না পারলে ঠেঙানি। বাঘিনীপিসিমা ছিল না, আমার হয়ে কে লড়বে ? নির্ভয়ে ঠেঙাতে পারত।

বই হাতে দিয়ে মণিলাল বলল, পড়ু দিকি।

উল্টে-পাল্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছটা দেখছে।

মণিলাল বলে, কি হলো রে ?

পড়ব ?

বললাম তো। পড়ার জন্যে তিথি-নক্ষত্র, অমৃতযোগ-মাহেন্দ্রযোগ দেখতে হবে নাকি ?

ছটা আবার বলল, পড়ে যাই তা হলে—কেমন ?

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়ছে, কয়েক ছত্র পড়ার পরে বেগ এসে যায়। গড়গড় করে পড়ে

যাচ্ছে ঃ নচ্ছার বজ্জাত লম্বা-খিড়িঙ্গে তালপাতার সেপাই—

চমক খেয়ে মণিলাল বলে, বইয়ে আছে নাকি ?

ছটা বলে, নয় তো পাচ্ছি কোথা ?

দেখি কেমন ! 'সীতার বনবাসে' এই সমস্ত ? চালাকির জায়গা পাসনি ?

এক টানে মণিলাল বই কেড়ে নিল ঃ দেখা কোন্‌খানে—

ছটা নিরীহ মুখে বলে, নেই বুঝি ? যুক্তাক্ষর-টর তেমন আসে না আমার। ঐ সমস্তই রয়েছে, মনে হলো।

সুর পালটে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ঃ না থাকলেও থাকা উচিত ছিল। গোড়ায় তো শিখিয়ে নিতে হবে। তা নয়, বসেই অমনি এগজামিন—শক্ত শক্ত দাঁতভাঙা কথা। সহজ কথা দুনিয়ার উপর থেকে উড়ে-পুড়ে গেছে যেন। তার মানে, বকুনি খাওয়ানো মায়ের কাছে। শুধু বজ্জাত কেন, আপনি মাস্টারমশাই একেবারে হাড়-বজ্জাত।

॥ বারো ॥

ঠাকুরবাড়ি রথযাত্রা ও মেলা। লোক জমেছে, বাইরে থেকে দোকানপাট এসেছে। নাটমণ্ডপে যাত্রার আসর। পালা আরম্ভ হতে বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে গেল। কিন্তু আকাশের অবস্থা ভাল না। রথের ঠাকুরদের উদ্দেশে মনে মনে সব মাথা কুটছে ঃ সামলে যায় যেন ঠাকুর—যাত্রাগান পণ্ড না হয়।

মণিলাল মেলায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করল, নাটমণ্ডপে জলচৌকির উপর তার জন্যে আলাদা করে রাখা আসনে বসল একটুখানি। আকাশের দিকে ও হাতঘড়ির দিকে চেয়ে তড়াক করে সে উঠে পড়ল—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং ন'টা বেজে গেছে। রাত্রে একচোট ঢালবে, সন্দেহ নেই। যেতে হবে নন্দনপুর অবধি নোনাখোলার মাঠ ভেঙে।

দত্তবাড়ির সেই আগেকার মনু নয়—হাই ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার রীতিমত। পরনে অতএব ধোপদস্ত কাপড়, গায়ে ধবধবে কামিজ, পায়ে বার্নিশ-জুতো। এত সমস্ত নিয়ে সঙ্কটে পড়েছে সে। তবু রক্ষে, রাত্রিবেলা কেউ দেখতে পাচ্ছে না এখন। কাপড় হাঁটুর উপর তুলে মালকোঁচা সেঁটেছে, জামা যথাসম্ভব কোমরে গুঁজেছে। বাঁ-হাতে জুতোজোড়া ঝুলিয়ে নিয়েছে, ডান হাতে হেরিকেন। অতিশয় সন্তর্পণে যাচ্ছে—পা পিছলে আছাড় না খায়, কাপড়-জামা লাট হয়ে যাবে তাহলে।

হলে হবে কি—হড়াৎ করে কাদাজল কোনদিক দিয়ে আচমকা গায়ের উপর পড়ল। ভূতের কারসাজি বলে অন্ধকার পথে হঠাৎ একবার মনে হলো। কিংবা ক্লাস নাইনের সুশীল সুবোধ ছেলেগুলোও হতে পারে, সম্প্রতি হাফ-ইয়ারলি এগজামিনের ইংরেজিতে যাদের বেধড়ক ফেল করিয়েছে। মেলা থেকেই পিছু নিয়েছে ঠিক—একা এমন অরক্ষিত অবস্থায় মাঠের রাস্তায় আসা ঠিক হয়নি, সঙ্গীসাথী জুটিয়ে আনা উচিত ছিল।

এত সমস্ত চকিতে মনে পড়ে গেল। হেরিকেন তুলে ধরে কড়া গলায় হাঁক দিল ঃ কে রে ?

কর্মটি ইস্কুলের ছেলেদের নয়—ভূতেরও নয়, সেই জাতীয় বটে—পেত্নীর। হেরিকেনের যেটুকু আলো গায়ে পড়েছে—কাদামাখা পরিপূর্ণ এক পেত্নীই।

মণিলাল হুঙ্কার ছাড়ল ঃ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মাঠে কি করিস ?

মেলায় তো ছিলাম। গান ভাল লাগল না তোরই মতন। তুই উঠলি তো আমিও উঠে পড়লাম।

যেটা কানে সবচেয়ে কটু লাগছে, সেইটে মণিলাল আগে সেরে নেয় ঃ তুই-তোকারি

করিস কেন? ইস্কুলের বড় মাস্টার এখন আমি, তোরও প্রাইভেট মাস্টার।

ছটার হাজির-জবাবঃ সে যখন আছিস তখন। তখন তো আপনি-আপনি করে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাই। বল্ তাই কিনা—

কথা সত্যি, মণিলাল ভেবে দেখল। এবারে আসল প্রশ্নঃ যাচ্ছিস কোথা তুই?

যাচ্ছিলাম বাড়ি—

বাড়ি তো পেছনে ছেড়ে এসেছিস।

তুই আছিস বলে বাড়ি ঢুকিনি। ভাবলাম, একা নই যখন ভয় কিসের?

ভয় তোর আছে তা হলে? শুনে সোয়াস্তি পেলাম।

খপ করে মণিলালের হাত এঁটে ধরে ছটা জলের দিকে টানে। বলে, চারো ঝেড়ে আনিগে চল্। কুয়োর ধারে কাঠশোলা-ঝাড়ের মধ্যে মেলা চারো পাতে। সকালবেলা খালুই-ভরা মাছ নিয়ে যায়, নিত্যিদিন দেখি।

মণিলাল হাত ছাড়িয়ে নিল। আবদারের সুরে ছটা বলে, চারিদিকে মাছে মাছে ছয়লাপ, বর্ষাকালে যারা ছিপ ফেলে ঘুন হয়ে বসে থাকে তারা সব গাড়োল—তুই-ই তো বলেছিলি। চারো-ঘুনসির মতলবও তোর।

তখন তোর প্রাইভেট-টিচার ছিলাম না, হাই ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টারও নই—

ছটা বলে, রাত্তিরবেলা মাস্টারিটা ছাড়লি না-হয় একটু। বাদাবনের সেই দু'জন আবার যেন হয়ে গেছি—কে দেখছে? ডোঙা রয়েছে, শোলাবনও ঐ ঝাপসা মতন দেখা যাচ্ছে। ক'টা ধুজি মারলেই গিয়ে পড়ব।

কণ্ঠ কাতর হয়ে উঠল। বলে, তুই লোভ ধরিয়ে দিলি—সেই থেকে এদিকে নজর আমার। লোকে কত কত চারো-ঘুনসি পেতে যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। কি করব, সোমত্ত হয়ে গেছি নাকি—সর্বক্ষণ সবাই সামাল-সামাল করে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টারও লোভাতুর হয়ে উঠল। সত্যিই তো, কে দেখছে?

কাঠশোলা-ঝাড়ও দূরে নয়। কাদা-টাদা ধুয়ে ফেললেই আবার যে-মাস্টার সে-ই। কে দেখছে!

তবু বলল, রাত্তিরে বাইরে ঘুরছিস—বাড়ির লোকে টের পেলে আস্ত রাখবে না তোকে।

বাড়ির লোক মানে তো মা। মশগুল হয়ে সে যাত্রা শুনছে। সৈরভী মায়ের সঙ্গে। বাড়ি আগলাচ্ছেন পিসিমা, সন্ধ্যে থেকে তাঁর নাক ডাকছে। পিসিকে নিয়ে আমার ভাবনা নেই।

ছটা বাড়ি ফিরল—মণিলাল ফিরে তাদের উঠোন অবধি পেঁছে দিয়ে গেছে। রাধিকা তাঁর ঘরে তালা দিয়ে গেছেন। ভামিনীর ঘরেও খিল আঁটা ভিতর থেকে। তবে কায়দা আছে—বেড়ার ফুটোয় হাত ঢুকিয়ে ছটা খিল খুলতে পারে। বলেছিল ঠিকই—ভামিনী নাক ডাকছেন। চোখও বন্ধ। কিন্তু হলে হবে কি, কান দুটো বিষম সজাগ। দাওয়ায় পা পড়তেই বাঘিনী চেঁচিয়ে উঠলেনঃ কে রে, কে ওখানে?

সাড়া না দিয়ে আর উপায় থাকে না।

ভামিনী বললেন, এর মধ্যে এলি যে?

ভাল লাগছিল না পিসিমা।

বেড়ার ফুটোয় হাত ঢুকিয়ে খিল খুলতে হলো না, ভামিনী নিজেই খুলে দিলেন।

বললেন, এলি কার সঙ্গে ?

মাস্টারমশায় বাড়ি যাচ্ছিলেন—তাঁকে বললাম। তিনি রেখে গেলেন।

চুপিসারে ঘরে ঢুকে মাদুর নিয়ে গড়িয়ে পড়বে ভেবেছিল। ফাঁক মতন কাপড় বদলে নেবে। দিনমানে ভালমানুষ হবে ঃ পিসির কাছে ছিলাম আমি রাত্রে।

মতলবটা এই। সমস্ত বরবাদ—খস করে ভামিনী টেমি জ্বাললেন।

কাদা মেখে ভূত হয়েছিস যে। ভিজে সপসপ করছে।

পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম পিসিমা।

পড়ে এমনিধারা হবে কেন? কাদায় জলে গড়াগড়ি খেয়েছিস। কি হয়েছে, বল্—

পরদিন বিকালে মণিলাল যথারীতি পড়াচ্ছে।

পড়াশুনো মানে তো নিষ্কর্মা হয়ে ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা—ভামিনী তাই বোঝেন। ঝাঁটা মারো অমন জিনিসের মুখে! তিনি এ ঘরের ছায়াও মাড়ান না কখনো। আজকে ঝড় তুলে ঘরে ঢুকলেন।

ছুটা সোমত্ত হয়েছে না?

মণিলালের কপালে ঘাম ফুটেছে ঃ হয়েছেই তো—

রাতে কাল কি হয়েছিল, বল্—

ধ্বকধ্বক আগুন জ্বলছে বৃদ্ধার দু'চোখে। ছবিতে বিশ্বামিত্র মুনির যেমন দেখা যায়। মণিলাল হতভম্ব হয়ে আছে।

ভামিনী গর্জে উঠলেন ঃ সত্যি কথা বল্ যদি বাঁচতে চাস। নয়তো ঝাঁটাপেটা করব. মাস্টার বলে রক্ষে হবে না।

মিথ্যে মণিলালের মুখে এমনিই আসে না—ও বিষয়ে ওস্তাদের ওস্তাদ পিসির ভাইঝিটি। বলল, আমার দোষ নেই পিসিমা, কিছু আমি জানতাম না। কাদা বাঁচিয়ে একা একা বাড়ি ফিরছি—বাঁকা-তালগাছ অবধি গেছি, আচমকা গায়ে কাদা ছিটিয়ে টের পাইয়ে দিল, এতক্ষণ পিছু পিছু আসছিল। রাত্তিরবেলা মাঠের মাঝখানে তখন কি লাঠালাঠি করব?

ভামিনী কিছু নরম এখন। বললেন, লাঠি নিয়ে চলিসনেও তো তোরা—

চললেই বা কি। লাঠি দূরস্থান—সোমত্ত মেয়ে, মুখের হাঁকডাকেরও উপায় নেই। লোক-জানাজানি হবার ভয়। ছুটা জো পেয়ে গেছে—অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার মানুষ আমায় দিয়ে শোলাবন অবধি ডোঙা বাইয়ে তবে ছাড়ল।

ছুটা এতক্ষণে এইবার কলকল করে কৈফিয়ত দেয় ঃ শোলাবনে চারো পাতে পিসিমা, নাকি মেলা মাছ পড়ে। ভাবলাম দেখেই আসি, সত্যি না মিথ্যে।

মণিলাল ওদিকে বলে যাচ্ছে, শোলাবনে না গিয়ে, পিসিমা, ডোঙা থেকে ঝপ্পাস করে লাফ। সাপের আড্ডা ওখানে। তা আমি কি করব—সোমত্ত মেয়ে হয়ে পড়েছে, টেনে ধরতে পারিনে।

ভামিনীর এখন উল্টো সুর। বললেন, মাছ ধরা কী জিনিস জানিসনে তো। সাপের ভয়-টয় তখন থাকে না।

মণিলাল বলছে, চারো তুলে তুলে ডোঙায় ঝাড়ছে। পচা কাদা মেখে তখন যা চেহারা—

মাছ ধরতে গিয়ে কাদা লাগবে না—তুই কী রে!

আজেবাজে কথা ছেড়ে ভামিনী বৈষয়িক প্রসঙ্গে এলেন। ছটাকে প্রশ্ন ঃ চারো ঝাড়লি, মাছ কি হলো ?

ছটা বলে, দু'জনে যখন গেছি, কাজের কম-বেশি দেখতে গেলে হয় না—সমান সমান দুই ভাগ। ভালো করিনি পিসিমা ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ভামিনী বললেন, তোর ভাগ কোথায় গেল ?

সেটাও মাস্টারমশায়কে দিয়ে দিলাম।

ভামিনী ভ্রুকুটি করলেন কেন ?

নইলে সবাই টের পেয়ে যেত। মায়ের মেজাজ তো জানো—চুলের মুঠি ধরত আমার।

ভামিনী বলেন, আ আমার নবাব-নন্দিনী। মা গুরুজন—একটু চুলের মুঠি ধরল তো ঝুরঝুর করে বুঝি চুল থেকে হীরে-মুক্তো পড়ে যেত! মুখের মাছ এই জন্যে তুই দান করে এলি? আগে তো এমন ভীতু ছিলিনে।

ছটা বিষন্ন কণ্ঠে বলে, সোমত্ত হয়ে গেছি যে! ঘড়ি-ঘড়ি তোমরা কানের কাছে শোনাচ্ছ, কি করব ?

শোনাচ্ছি বলেই কি মুখের জিনিস ফেলে আসতে হবে? চুল ধরার ভয় করিস তুই—ছিঃ।

ভাইঝিকে ছেড়ে ঝাঁজ এইবারে মণিলালের উপর ঃ তোর আক্কেলও বলিহারি যাই। নিজের ভাগটাও যখন দিয়ে দিল, আজ দুপুরে নেমন্তন্ন করলিনে কেন? সে মায়াদয়া থাকলে তো। বেহায়া বেয়াক্কিলে স্বার্থপর। একা একা তাহন্দ সেঁটেছিস, ওর অদৃষ্টে জুটেছে ডাঁটাচচ্চড়ি আর ভাত।

গোলপাতা বোঝাই সাঙড়নৌকো যাচ্ছে চুমকড়ি গাঙের উপর দিয়ে। ভরা জোয়ার, পিঠেন বাতাস। চারখানা দাঁড়ের দুটো মাত্র নামিয়েছে—নৌকো তরতর করে যাচ্ছে মাঝগাঙ দিয়ে।

পাশখালি দিয়ে হুশ করে এক টাপুরে বেরিয়ে পড়ল। শৌখিন কোন বাবুভেয়ে সদলবলে শিকারে চলেছেন, মালুম হচ্ছে। বাদাবনে এমন অনেক যায়। দলপতি বাবুটির বন্দুকের আওয়াজে হয়তো ভিরমি লাগে—দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে নৌকোয় তিনি শুয়ে থাকেন, লোকজন বনে নেমে শিকার করে আনে। কিন্তু মানষেলায় ফিরে ফিরে শিকারের সবখানি বাহাদুরি কিন্তু বাবুমশাই একলাই নিয়ে নেবেন—হরিণের শিঙেল মাথা তাঁর দেয়ালে নিয়ে আটকাবেন।

টাপুরের মাল্লা সাঙড়ের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ছে ঃ কলকেডার মাথায় এটু আগুন দাও দিনি। দেকাঠি ভিজে গেছে, ধরানো যাচ্ছে না।

সাঙের গ্রাহ্য নেই, বেয়েই যাচ্ছে।

শিকারী নৌকোর উগ্রকণ্ঠ ঃ কানে নেচ্ছ না যে ?

কানে নিলি উজোন ঠেলতি হবেনে এর পরে—

এবং নাইয়াদের মাঝে কি চোখাচোখি হলো—যে দুটো দাঁড় তোলা ছিল, তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিয়ে ঝপাঝপ মারতে লাগল। বোঝাই সাঙড় উড়ে চলল যেন। শিকারী নৌকোও কম যায় না। পাল্লাপাল্লি দুয়ের মধ্যে—নৌকো-বাইচের সময় যেমন হয়। হঠাৎ দেখা যায়, বাবুভেয়ে মানুষটি চকিতে সাজবদল করে সাহেব হয়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছেন। পেট্রোল-অফিসার—চলতি কথায় পিটেল সাহেব বলে। শিকার না ঘোড়ার ডিম—ছদ্মবেশে এরা বাদার অন্ধি-সন্ধি ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

পিটেল বন্দুক তাক করে গর্জন ছাড়েঃ কাছে আয়, নৌকো পাশে এনে লাগা। তল্লাশ হবে।

অকুতোভয় গোলপাতা-ব্যাপারী বলল, তা করেন না তল্লাশ—একবার ছেড়ে দশবার করেন। ধর্মপথে কাজকারবার—জুয়োচুরি-ফেরেব্বাজির মুখে মারি ঝাড়ু। আসতি আজ্ঞে হয় হুজুর, উঠে আসেন—

আসার সুবিধা হবে বলে তক্তা ফেলে দিল দু'নৌকোর মাঝে, বাঁশের ধনুজির এক মুড়ো এ-নৌকোয় একজনে ধরে দাঁড়াল, আর এক মুড়ো অন্য নৌকোয় আর একজন। বলে, বাঁশ ধরে ধরে আসেন তক্তার উপর দিয়ে।

শিকারী মাল্লারা পাগড়ি-চাপরাস পরে ইতিমধ্যে ষোলআনা কনস্টেবল্। পিটেলের পিছু পিছু তারাও সব উঠে এল। ব্যাপারী সকাতরে দরবার জানায়ঃ কাজ সারে এট্টু ঝটপট ছাড়ে দেবেন হুজুর। নয়তো উজোন ঠেলে মরতি হবেনে। জায়গাডা আবার ভাল না।

খাতির করে জলচৌকি দিল সাহেবের বসার জন্য। ব্যাপারী পায়ের কাছে বসে হাতবাক্স খুলে কাগজপত্র বের করে দিল। পাতা-কাটার পাশ আছে যথাবিধি। নৌকোর মাপেও কোনরকম হেরফের নেই।

পিটেল সাহেব বলে, পালাচ্ছিলে কেন তবে অমন করে? পালানো দেখেই তো সন্দেহ হলো।

ঝড় কেটেছে বুঝে একগাল হেসে ব্যাপারী বলে, সাহেবসুবো দেখলি আমারগে গা কাঁপে। হুকুম দিয়ে দেন, নৌকো ছাড়ি এবারে।

যাবে তো বটেই। এ জায়গা আবার গরম (ব্যাঘ্রসংকুল) খুব—ঘোর না হতে সরে পড়।

বলছে পিটেল, কিন্তু ওঠার গতিক নয়। একজনের দিকে চোখ টিপে দিয়েছে, টাপুরে গিয়ে সে গোটাকয়েক লোহার শিক নিয়ে এল। গোল-পাতার আঁটির মধ্যে শিক ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খোঁচাচ্ছে চার-পাঁচ জনে—এঁদো-পুকুরের হাবড়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে যে কায়দায় কচ্ছপ খোঁজে। যা ভেবেছে তাই—

পিটেল হেসে বলল, গোলপাতা জমে গিয়ে নিরেট হলো নাকি? আঁটি তোল, সে কেমন।

গোলের আঁটির ভিতরে মূল্যবান সুঁদুরকাঠ।

পাতার মধ্যে বড় বড় কাঠ এমনি এমনি ঢুকে যায় না। সদর থেকে তলব এল—আসবেই, মধুসূদন জানতেন। হাতেনাতে পেয়েছে, মুখুজ্জে রক্ষে রাখবে না।

আধময়লা কাপড়, ছেঁড়া জামা, তালি-দেওয়া জুতো-ছাতা এক প্রস্থ আলাদা করে তোলা থাকে। উপরওয়ালার কাছে যাবার পোশাক। সেই পোশাকে মধুসূদন মুখ কাচুমাচু করে মুখুজ্জের সামনে দাঁড়ালেন।

ঘেরির গাছ গোলপাতার মধ্যে সেঁদোয় কি করে।

অসুখে পড়েছিলাম স্যার, পাঁচ-সাত দিন মাথা তুলতে পারিনি। বাজে লোক দিয়ে কাজকর্ম—তার মধ্যে কখন কাণ্ডটা ঘটে গেছে।

মুখুজ্জে বলেন, অসুখ তো লেগেই আছে আপনার। নৌকোর মাপের হেরফের বেরুল একবার, তখনও বলেছিলেন মাথা টনটন করছিল বলে লেখার গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

মধুসূদন সপ্রতিভ কণ্ঠে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুখ আরো একবার হয়েছিল বটে।

কতবার হয়েছে ! ক'টা হিসেব পেঁছিয় আমাদের কাছে ?

হাসতে হাসতে মুখুজ্জে আবার বললেন, বাদাবনে আপনার শরীর টিকছে না। কাজ ছেড়ে দেশে-ঘরে গিয়ে এবার শরীরের যত্ন নিন।

মধুসূদন কাকুতিমিনতি করছেন ঃ এইবারটা মাপ করে নিন। অসুখবিসুখ আর হবে না, এই শেষ।

মুখুজ্জে বলেন, তাহলে চলবে কিসে ? সরকার যা দেয়, সেই ক'টি টাকা নিয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকা পোষায় কারো ? ভালো কথাই বলছি ঘোষমশায়, আপোসে চাকরি ছেড়ে মানে-মানে চলে যান, কোনরকম গণ্ডগোল হবে না। চাকরি কদ্দিন হলো ?

বিড়বিড় করে একটু হিসাব করে নিয়ে মধুসূদন বললেন, বারো বছর—

বেশ তো হলো। বারো বছর নিরঙ্কুশ রাজ্যভোগ হলো, এবার অন্য লোক আসুক। একলা চিরকাল আঁকড়ে থাকবেন, সেটা স্বার্থপরেরর মতন কথা। অন্যেরা তবে যায় কোথায় ?

॥ তের ॥

বরখাস্ত হয়ে মধুসূদন মুলটি এসে উঠলেন। বুক ফুলিয়ে সকলের কাছে দেমাক করেন ঃ এক যুগ—বারো বচ্ছর বনকরে কাটিয়ে এলাম—কে পারে ? চার বছর পাঁচ বছর—এমনিই তো সব। লাগেও না তার বেশি। তেমন তেমন করিতকর্মা হলে ওরই মধ্যে যা করবে—নিজের বাকি জীবন পায়ের উপর পা দিয়ে বসে কাটাবে, ছেলেপুলের সংস্থান রেখে যাবে—তাদের ছেলের, তাদের নাতিরও। এই না হলে মানুষ বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নোনাজল খেয়ে পড়ে থাকতে যাবে কেন ? আমার কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল—কদ্দিন থাকা যায় দেখি। বারো বছর থেকেছি —এটা রেকর্ড। চাকরির মেয়াদ সম্পূর্ণ শেষ করে পেন্সনভোগী হয়ে ঘরে বসব, সে আশা কখনো করিনি—এসব চাকরিতে কেউ তা করে না।

চাকরি নেই, উপরওয়ালা কানভারী করবে সে শঙ্কাও নেই—ছেঁড়া জামা, তালিমারা জুতো ইত্যাদি আঁস্তাকুড়ে গেছে—মধুসূদনের পরনে এখন ফিন-ফিনে শান্তিপুরে ধুতি, গায়ে সিল্কের গেঞ্জি। তিনটে পাঁজা পুড়িয়েছেন, বাড়িতে দালান-কোঠা হবে। এক পুরানো আড়তদারের সঙ্গে যথাযথ বন্দোবস্ত ছিল—বাদার আমদানি একভরা সুঁদুরি ও গরানকাঠ এসে পড়ল। পাকাবাড়ির আগে মধুসূদন আটচালা ও ছ'চালা ঘর তুললেন, তার যাবতীয় আড়াখুঁটি সুঁদুরিকাঠের, বেড়া গরানের। তল্লাটে রৈ-রৈ পড়ে গেল—বরখাস্ত হয়ে মধুসূদন ঘোষ বাড়ি এসে উঠেছেন, আসল মূর্তি প্রকাশ পাচ্ছে এতদিন।

ইস্কুলের পর বিকেলবেলা মণিলাল যথারীতি পড়াতে এসেছে। বই-খাতা নিয়ে ছটা আজ অপেক্ষায় আছে। লেখাপড়ায় এতদূর নিষ্ঠা—বলি চাঁদ-সূর্য্যি আকাশে উঠছে তো ঠিক ঠিক ?

মণিলাল অবাক হয়ে বলে, হলো কি রে ?

বাইরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ছটা ফিসফিস করে বলে, বাবা কলকাতায় গিয়েছিল না—ফিরে এসেছে, বাড়িতেই আছে এখন।

একটি মানুষকে সমীহ করিস তবে দুনিয়ায় ? মোসোমশায়ের ভাগ্যি অনেক।

লেখাপড়াটা কিন্তু ভিন্ন গরজে। খবর রাখে না মণিলাল। ছটা টিপে টিপে হাসছে।

মণিলাল বলে যাচ্ছে, অন্যদিন সাড়াই পাইনে। ডাকতে ডাকতে তারপরে এলি তো ধপ করে বই ছুঁড়ে দিয়ে দশ হাত দূরে বকের মতন ঘাড় উঁচু করে থাকিস।

ছুটা বলে, বলছি তো তাই। এক কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে বাবা। ফাঁড়ার মুখে পড়েছি—ফাঁড়া কাটানোর জন্যে আমিও মরীয়া—

আরও গলা নামিয়ে বলল, আমায় দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতায় ছোট-মামার বাসায়। বিরাট সম্বন্ধ—পাত্তোর হবু-ইঞ্জিনিয়ার। প্রায় গেঁথে ফেলেছে বাবা। সকলের গোড়ায় তারা নাকি জিজ্ঞাসা করেছে, মেয়ের লেখাপড়া কদ্দুর? মেয়েছেলের যেন অন্য কিছু লাগে না—শুধুই লেখাপড়া। বাবা বলে এসেছে, পাশ-টাশ না হলেও বাংলা আর ইংরাজি এ দুটো খুব ভালো রকম রপ্ত আছে। বলে এখন আমায় চুমরাচ্ছে: চেষ্টা করলে তোর অসাধ্য কিছু নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে দুটো তিনটে মাস ঠেলে নিয়ে যাবো—লেগে যা তুই প্রাণপণে। তাই লেগেছি—ইঞ্জিনিয়ার বর পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, কি বলিস?

মণিলালও ভরসা দেয় খুব। বলে, ঘাবড়াসনে—আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। একটু যদি মন দিস, তোর সঙ্গে কে পারবে? পাশ-টাশ নয়, বলে এসেছেন তো মেসোমশায়—ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে দেবো তোকে, ফার্স্ট ডিভিসনে। দুটো বছর সময় দিন আমায়।

দুটো বছর! মুখে কাপড় দিয়ে ছুটা হাসতে লাগল। বলে, দু-বছরে তো গিন্নি আমি দস্তুরমতো। এক বাচ্চা কাঁখে, এক বাচ্চা বুকে নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছি। কপালে এ্যাব্বড়ো মাটির ফোঁটা, বাঁ-হাতে পেঁচো-পাঁচির মাদুলি। পাশ-করা যদি হতামও, সে-পাশ ততদিনে অন্তর্জলীতে ঢুকে যেতো।

খুক-খুক খিল-খিল হাসি।

এইও—বলে কর্তব্যনিষ্ঠ মণিলাল নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসল। 'রয়াল রিডার' মেলে ধরে বলল, একটি বাজে কথা নয়—বাংলা কর্ এইখানটা।

খাতা নিয়ে ঘাড় হেঁট করে ছুটা করছে তাই। পুরানো ভূতটা হঠাৎ ঘাড়ে চাপে। কলম ছুঁড়ে দিয়ে মণিলালের দিকে চেয়ে বলল, কষ্ট হচ্ছে না তোর?

মণিলাল ফোঁস করে উঠল: পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে—এখনো তুই-তোকারি?

মাস্টারির কিছু নয়—তাহলে 'আপনি'ই বলতাম। হঠাৎ তুই গম্ভীর হয়ে গেলি —কি ভাবছিস বল্। সত্যি বলবি।

মণিলাল বলল, ছবিটা নিয়ে উঠেপড়ে লাগতে হবে এবার।

কিসের ছবি?

তোর একটা ছবি করছি না—যত্ন করে করছি বলে সময় লাগছে। শেষ করে ফেলে তোর বিয়ের উপহার দেবো সেটা।

বড্ড যে খুশি তুই—

মণিলাল বলল, খুশি তো বটেই। ভাল ঘরে যাচ্ছিস, ইঞ্জিনিয়ার বর। ভাল খাবি, ভাল পরবি—

ছুটা লুফে নিয়ে বলল, আর নেমন্তন্নে তুইও একদিন ভাল খাবি—তোর সেই আনন্দ।

তোর বিয়ের শুধু একদিনের একটা খাওয়াতেই শোধ যাবে নাকি? হপ্তা-ভোর খাব।

এবম্বিধ পড়াশুনো ঘরের মধ্যে ঘোর বেগে চলছে—কান দুটো তীক্ষ্ণ করে

মধুসূদন বাইরে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। মিনমিনে যৎসামান্য আওয়াজ, স্পষ্ট কিছু নয়। পড়ানোটা ঠিক আদর্শস্থানীয় বলে মনে হচ্ছে না তাঁর।

নিরিবিলি রাধিকাকে বললেন, মাস্টার রাখলে—তা বুড়োহাবড়া একটা মিলল না?

রাধিকা বললেন, ছটার পুরানো মাস্টার তো—

বাদাবনে যা চলে, মানষেলায় তা চালাবে? বোটের মাঝি সেখানে তো গলায় ফেটির সুতো ঝুলিয়ে পুরুতঠাকুর হয়ে বসে, কুড়ুল-মারা কাঠুরে ন'সিকের হোমিওপ্যাথি বাক্স কিনে জাঁদরেল ডাক্তারবাবু। না পেলে উপায় কি? দুপুরে মণিলাল চাট্টি চাট্টি খাচ্ছে তো খেয়ে যাক—তার বেশি জড়িও না। খবরদার, খবরদার—প্রেম ট্রেম ঘটে গেলে পস্তাবে তখন।

রাধিকা উড়িয়ে দিলেন: দূর, চুলোচুলি দুটোর মধ্যে। আমিই বুঝিয়ে-সুজিয়ে বকেঝকে ঠাণ্ডা রাখি।

মধুসূদন চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন: না গো, গতিক ভাল ঠেকছে না। এক মেয়ে আমাদের, সুপাত্রে দেবো, প্রায় বন্দোবস্ত করে ফেলেছি—বরবাদ না হয়ে যায়। সাতকড়ি গার্ড হয়ে আমারই তাঁবে ছিল, বেহাই হয়ে সেই মানুষ কোলাকুলি করবে—

বলতে বলতে আগুন হলেন: নিমকহারাম শয়তান—নিজে আমার চাকরিটা নিয়েছে, আবার ভাগনেটা টুইয়ে দিয়েছে, মেয়েটাও যাতে নিয়ে নেয়।

কর্তার কাছে রাধিকা নস্যাৎ করলেন, মনটা কিন্তু সেই থেকে ভারী হয়ে আছে। মণি শেষটা জামাই হয়ে আসবে? এমন নাকি আকচার হচ্ছে—মেয়ে আর অজানা-অচেনা ছোঁড়া হাত-ধরাধরি করে এসে পায়ের গোড়ায় ঢপাঢপ গড় করল। মেয়ে বলে দিচ্ছে, মা, তোমাদের জামাই। বিয়েথাওয়া সারা করে যুগলে দর্শন দিতে এসেছে।

সেইদিনই শোনা গেল, এগজামিনের ফল বেরিয়েছে—মণিলাল ফেল। রাধিকা আর স্থির থাকতে পারেন না, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভামিনীর শরণাপন্ন হলেন: মণিলালের যা অবস্থা—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। বি-এ-টাও ফেল হয়ে বসে আছে। হিত করতে গিয়ে বিপরীত করলাম নাকি ঠাকুরঝি? ভালোর তরে পড়াতে দিলাম—তোমার ভাই বলছেন, মেয়ে প্রেমে পড়ে গেছে।

হাল আমলের এই সব গোলমেলে জিনিস ভামিনী বুঝে উঠতে পারেন না। বললেন, কিসে পড়ে গেল?

রাধিকা খুব প্রাঞ্জল করে বললেন, মণির উপর ছটার নাকি টান পড়ে গেছে।

ভামিনী বললেন, পড়বে না কেন?, এ্যাদ্দিনের জানাশোনা আসা-যাওয়া—বলি, তোমার পড়েনি? নইলে উপোস করুক যা-ই করুক, তুমি যেচে কেন খাবার কথা বলতে গিয়েছিলে?

বলে ভাল করিনি বোধহয়। তোমার ভাই বলছিলেন তাই। দুটোর মধ্যে বিয়ে হয়ে গেলে তো সর্বনাশ!

ভামিনী চমক খেয়ে বললেন, হলেই হলো! দিতে যাচ্ছে কে বিয়ে?

প্রেম হলে তখন আর দিতে হয় না ঠাকুরঝি। নিজেরাই করে ফেলে।

প্রেম, প্রেম, প্রেম—বার কতক বলে বলে হাল আমলের নতুন কথাটা ঠাকুরুন রপ্ত করে নিলেন। সহসা দন্ত-কিড়মিড় করে উঠলেন: প্রেমের নিকুচি করেছে। চুলের মুঠো ধরে পাক দেবো না তাহলে? ঝাঁটাপেটা করব না আগাপাস্তলা?

গিয়ে পড়লেন তখনই ছটার উপর: চৌকিদারের ভাগেটা ফেল্ল হয়েছে—তারই

সঙ্গে তুই প্রেম করলি ?

ছটা আকাশ থেকে পড়েঃ মিছে কথা। কে বলল পিসিমা ? একদম মিছে।

তবে ওটাকে এলাকাড়ি দিস কেন ?

কাজ পাই বলে। একটা-কিছু বললে মুখের কথা মুখে থাকতে করে দেয়। ধরো না, সেদিনের সেই ঘুরকুট্টি আঁধারে ডোঙা বেয়ে শোলাবনে চারো ঝাড়তে যাওয়া। যাদের চারো, টের পেলে মেরে ভূত ভাগাত—মাস্টার বলে খাতির করত মা। এক কথায় সেখানে নিয়ে তুলল—অমন কে করে বলো? সাতু-জেঠা করতেন, জঙ্গলে দেখেছি—সরকারি চাকর তিনি। আর, মাস্টারমশায় হলো আমাদের চাকর বিনি-মাইনের।

প্রণিধান করলেন ভামিনি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করেনঃ ঠিক তো রে? আর কিছু নয় ?

আর কি বলতে চাও পিসিমা ?

পিসি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, আমি নই—বলে তোর মা-বাবা। বড্ডফুসফুস-গুজগুজ করিস—তাই বলছে প্রেম-ট্রেম হলো কিনা।

হি-হি-হি—। ছটা তো হেসেই খুন। বলে, পোড়াকপাল, আর মানুষ পেলাম না। বাড়ি বলতে চারপোতার মধ্যে চালাঘর খান দুই। ইস্কুলের মাস্টার হয়েছে, সে ইস্কুল মাইনে দেয় না। দূর, দূর—

পুলকিত ভামিনী আরও ধরিয়ে দিচ্ছেনঃ মধুর চাপরাসী ছিল ওর মামা সাতকড়ি—চাপরাস এঁটে টুলে বসত—

ছটা একটানা বলে যাচ্ছে, হাটবাজার করতেন, কাঠ ভাঙতেন, জঙ্গলে জঙ্গলে পাহারা দিয়ে ঘুরতেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি পিসি। যাচ্ছি তাঁর ভাগনে-বউ হতে! সাতজন্ম বিয়ে না হলেও নয়।

ভামিনী সায় দিয়ে বললেন, আমিও তাই বলছিলাম। প্রেম করে আখের খোয়াবে, ছটা আমাদের তেমন মেয়ে নয়।

ছটার বলার এখনো বাকিঃ শুনেছি পিসিমা, কায়েতও নয় ওরা। দত্ত উপাধি কত জাতেরই হয়ে থাকে। জাত ভাঁড়িয়ে কায়েত হয়ে আছে ওরা। বিয়ে হলে তো ভিন্ন জাতের হয়ে যাবো পিসিমা, তোমরা আমার হাতের জলটুকুও খাবে না।

ভামিনী গিয়ে ভাই-ভাজের কাছে দেমাক করেনঃ আমার সঙ্গে ওঠা-বসা ওর, আমাদের কাছে শিক্ষাদিক্ষা। নির্ভাবনায় থাকো, প্রেম-ট্রেমের মধ্যে যাবার মেয়ে ছটা নয়।

•

মেয়ের বিয়ের জন্য মধুসূদন বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন। নশ্বর জগৎসংসার, আজ আছি তো কাল নেই—ল্যাঠা চুকিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ঘটক লাগিয়েছেন, আপন পর যাকে পাচ্ছেন বলছেন। সম্বন্ধ আসছেও। গোটা চার-পাঁচ তার মধ্যে মনে ধরল।

রাধিকার তিন ভাই—বিমল কমল অমল। সকলের ছোট অমল খবরের-কাগজের রিপোর্টার, কলকাতায় বাসা করে আছে। মধুসূদন তার কাছে গিয়ে পড়লেন। পছন্দের পাত্র কলকাতায় যে ক'টি আছে, শালা-ভগ্নিপতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তাদের, যাবতীয় খবরাখবর নিলেন। একটি তার মধ্যে তারাপদ। বড় পছন্দসই। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, চেহারায় রাজপুত্র। আই. এস. সি-তে বেশ ভাল করেছিল, বিনা তদ্বিরে তাই ঢুকতে পেরেছে। বাপ নেই। জেঠা হিন্দু-য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক,

কাশীর পাকা বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। তারাপদর পড়ার খরচা তিনিই চালিয়ে যাচ্ছেন নিজ সংসারের প্রচুর অসুবিধা ঘটিয়ে।

বাড়ি ফিরে মধুসূদন স্ত্রীর কাছে সবিস্তারে সব বললেন। মেলা ঘোরা-ঘুরির দরকার নেই। মেয়েটা দেখিয়ে দিয়ে কাজ ঐখানে পাকা করে ফেলি। কেমন ?

রাধিকা সংশয় তোলেন : ছেলে লেখাপড়ায় অত ভালো, আর তোমার মেয়ের তো 'ক' লিখতে কলম ভাঙে। তাই নিয়ে কথা উঠবে না ?

সকলের গোড়াতেই তো সেই কথা। পাত্রের মা মেয়ের লেখাপড়ার কথা তোলেন, কানে না নিয়ে আমি কেবল পণের অঙ্কটা শোনাই। পড়া চাপা পড়ে টাকার কথাই শেষটা চলল।

রাধিকা পুনরপি বলেন, ছেলের রং ধবধবে বলছ। মেয়ের রং নিয়েও খুঁত-খুঁতানি হতে পারে

মধুসূদন ঘাড় নেড়ে বললেন, হবে না। জবর টোপ ফেলে এসেছি—টাকাতেই মেয়ের গায়ের রং ধবধবে করে দেবে।

একটু থেমে আবার বললেন, তা সত্ত্বেও এলাকাড়ি দিও না। মেয়ে দেখাতে কলকাতায় যাবো পুজোর পর। আচ্ছা করে তদ্দিন সাবান খষাঘষিতে লেগে যাও তোমরা। আর মণিলালও লেখাপড়া যতটা পারে সড়গড় করে দিক।

পাত্রের মাকে 'বেয়ান' বলেও ডেকে এসেছেন এক-আধবার। বুঝিয়েছেন : হীরের টুকরো ছেলে, পরীক্ষা দিলে নির্ঘাৎ পাশ। যেমন-তেমন পাশ নয়—ফার্স্টক্লাস পাওয়াই সম্ভব। তবে সেই অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কথা। আপনার ভাশুর-মশায় মহাপ্রাণ মানুষ জানি, কিন্তু খরচাও তাঁর বিস্তর। পড়ানোর ভারটা আমার উপরে দিন। সম্পূর্ণ টাকা হিসেব করে অগ্রিম দিয়ে দিচ্ছি—গাঙ পার হয়ে কুমিরকে কলা দেখানো আমার নিয়ম নয়। মেয়ে আমার সাত নয় পাঁচ নয়—ঐ একটি।

তারাপদর মা খুশি হয়ে মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করতে বলেছেন। কয়েকটি আত্মীয়জন নিয়ে বেয়ান নিজে দেখবেন, ইচ্ছে হলে ছেলেও দেখতে পারবে। মেয়ে কলকাতায় নিয়ে দেখালে সুবিধা হবে। অমলের বাসা রয়েছে—এ-পক্ষেরও অসুবিধা নেই। বেয়ান কিন্তু কারো বাসায় আসতে চান না। তবে ? দাক্ষিণেশ্বরেই ভালো। মায়ের বাড়ি ওঁরা পুজো দিতে আসবেন, এ তরফের এঁরাও গিয়ে পড়বেন সেইদিন। মন্দির, গাছপালা, গঙ্গা,—মেয়ে দেখানোর পক্ষে অতি উপাদেয় স্থান।

যে আজ্ঞে—। বলে মধুসূদন সায় দিয়ে এসেছেন। পাত্রপক্ষ যা বলে ঘাড় হেঁট করে 'হাঁ' দিতে হয়। আবার আসুক না আমাদের দিন—রুদ্রেশ্বর (রাধিকার ছ'মাসের ছেলে) বড় হোক, আমরা তখন হিমালয়ের চূড়ায় তুলে কিংবা কন্যাকুমারিকার জলে নামিয়ে মেয়ে দেখাতে বলব।

চোদ্দ

কলকাতা রওনা হচ্ছেন—রাধিকা বললেন, আমিও যাই। নয়তো হনুমান মেয়ে সামলাবে কে ? যত বয়স হচ্ছে, আরও যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অমলের বউ মীরা, এক বাচ্চার মা। বিয়ে খুব বেশিদিন হয়নি, হাসিখুশি বউটি। দক্ষিণেশ্বর গিয়ে মন্দিরের বাইরে বাগানে সবাই বসেছেন। কনে দেখতে তারাপদর মা এইখানটা আসবেন—এসে পৌঁছননি এখনো।

আগ-ডালে সুতো জড়িয়ে একটা ঘুড়ি ছিঁড়ে আছে। ছটা বলে, ওদের আসার এখনো ঢের ঢের দেরি। ঘুড়িটা পেড়ে আনি ছোটমামী।

রাধিকা তাড়া দিয়ে উঠলেন ঃ এইও—

ওরা আসতে না আসতে আমি নেমে পড়ব। দেখ না—

কতক্ষণ ধরে কত যত্নে মীরা সাজিয়ে এনেছে—এখন সে জুতো খুলে গাছের ডালে ঝুল খেয়ে পড়ল। রাধিকা গর্জে উঠলেন ঃ মেরে তক্তা বানাব—বুঝবি ঠেলা। বিয়ের কনে বলে ছাড়ব না।

মীরা বলে, ক্ষেপাচ্ছে আপনাকে দিদি। সত্যি সত্যি উঠবে বুঝি? আপনিও যেমন!

ও না পারে, এমন কাজ নেই। তোমরা জানো না, আমি জানি। মেয়ের ধকলে হাড় আমার কালি-কালি হয়ে গেল।

না, মীরার কথাই ঠিক, গাছের ডাল ছেড়ে দিয়েছে ছটা। গঙ্গার দিকে কয়েক পা এগুল। মীরার দিকে ফিরে বলে, বানের গঙ্গাতেও আমি সাঁতার কাটতে পারি। সাঁতরে এক্ষনি ঐ বেলুড়ের পাড়ে গিয়ে উঠব। হাসছ ছোটমামী, পারিনে বুঝি? বেশ, বাজি ধরো—

রাধিকা সন্ত্রস্ত হয়ে মধুসূদনকে বলেন, ক্ষেপে গেছে। দড়ি কিনে এনে আষ্টেপিষ্টে বাঁধো—নড়তে না পারে।

ছটা খিল খিল করে হাসে ঃ সেই ভালো মা। বেঁধে মন্দিরের সামনে ফেলে রাখ—শুধু তারা কেন, যত লেকে কালীদর্শনে এসেছে ভিড় করে এসে মেয়ে দেখবে। ইঞ্জিনিয়ারের মা যদিই বা গরপছন্দ করেন, অত লোকের মধ্যে কারো না কারো পছন্দে পড়ে যাব।

মধুসূদন টোপ ফেলে এনেছেন—অব্যর্থ সে টোপ, দেখা যাচ্ছে। তারাপদর মা কয়েকটি গিন্নিবান্নি সহ কনে দেখছেন—বাঃ-বাঃ করে তিনি কূল পান না। ছটার যা দেখেন, যা-কিছু শোনেন, সমস্ত ভালো। বলেছেন, বেশি ফর্সা ভালো নয়। নিজের পেটের ছেলে হলেও বলছি, একটু ময়লা-ময়লা হলে তারাপদকে বেশি ভাল দেখাত। মেমসাহেবগুলোকে দেখে আমার তো মনে হয়, গায়ে শ্বেতি উঠেছে।

ছটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন, রঙে চেহারায় আমার এই মা'টিকে মানিয়েছে কেমন! লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো বসে আছে—দেখে চোখ জুড়োয়।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখা সম্পর্কেও তারাপদর মা, দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত অনুদার মত পোষণ করেন। নামটা সই করা, 'কেমন আছ' 'ভাল আছি' গোছের এক-আধখানা চিঠিপত্র লেখা এবং দুধের হিসাব, ধোপার হিসাব, রাখার মতো বিদ্যা হলেই মেয়ে-ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। গাদা গাদা মেয়ে বি-এ এম-এ পাশ করেছে, ওদের দিয়ে সংসার-ধর্ম হয় না। আমার বউমাকে নিচ্ছি ঘরগৃহস্থালীর জন্য, ট্যাং-ট্যাং করে অফিস করে বেড়ানোর জন্য।

কাশীতে ভাশুরের কাছে তারাপদর মা চিঠি লিখবেন। সদাশিব মানুষ তিনি—বলেই দিয়েছেন, তোমাদের পছন্দে আমার পছন্দ। শুভকর্ম মাঘের গোড়ার দিকে হতে পারবে। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় আসবেন তিনি, প্রয়োজনে ঐ সঙ্গে আরও মাসখানেকের ছুটি বাড়িয়ে নেবেন। যত যা-ই বলুন, আসলে তিনিই সব—চূড়ান্ত তাঁরই উপর নির্ভর করেছে। হালের ফোটো একখানা বরঞ্চ দিয়ে যাবেন, কাশীতে পাঠিয়ে দেবো।

ফোটো নিয়ে আসেনি, মীরা সঙ্গে করে নিয়ে স্টুডিও থেকে খাসা করে ছবি তুলিয়ে

আনল। ছবি দিতে গিয়ে মধুসূদন শুনলেন, তারাপদও গিয়েছিল সেদিন—মন্দির দেখে বেড়াচ্ছে, এমনিভাবে দূরে দূরে ঘুরছিল। হস্টেলে একবারই মাত্র দেখেছিলেন, ভিড়ের ভিতর তিনি ধরতে পারেননি। ছেলেরও অপছন্দ নয়। চৌঠা মাঘ আজামৌজা এঁরা দিন ঠিক করে দিলেন। কাশীর কর্তা বড়দিনে এসে পাকাদেখা দেখবেন।

লাখ কথার নিচে নাকি বিয়ে হয় না। কথা শ'পাঁচেকও পুরল কিনা সন্দেহ, বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। মধুসূদনরা আরও কয়েকটা দিন কলকাতায় থেকে যাচ্ছেন. কাপড়-চোপড় এবং হাল ফ্যাসানের দু-একখানা গয়নাগাঁটির সওদা হচ্ছে।

মীরার প্রশংসায় রাধিকা শতমুখ। মেয়েকে ডেকে ডেকে শোনানঃ সংসারের কাজকর্ম সব একহাতে করছে—তার মধ্যেও কী রকম ফিটফাট দেখ। নরমশরম চালচলন—বাড়ির মধ্যে মানুষ আছে বোঝাই যায় না। আর তুই চলিস—দৰ্প্যিদানো যেন দুনিয়া লণ্ডভণ্ড করে বেড়াচ্ছে। কথাবার্তার সময় মাথার ঝিটকি নাড়িয়ে দিস।

মীরাকে বললেন, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কী কাণ্ড করবে না জানি। ভাবতে গেলে বুক শুকিয়ে আসে। তোমায় খুব ভালবাসে ছোটবউ, তুমি একটু ভাল করে সমঝে দাও ওকে।

ছটাই এসে বলল, তা কি কি আমায় করতে হবে, মহলা দিয়ে দাও ছোটমামী।

মীরা লজ্জা পেয়ে বলে, তোমাদের গাঁয়েই কত বউ—এইবার গিয়ে তাদের চালচলন দেখো।

উঁহু, এড়িয়ে গেলে হবে না। মায়ের চোখ তোমার উপরে—ঠিক ঠিক তোমারই মতন আর একটা বউ হতে হবে। হাঁটব তো এমনি করে?

ঘাড় নিচু করে এক একখানা করে পা ফেলে মন্থরগমনে দালানের শেষ অবধি গেল। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেঃ হচ্ছে?

মীরা হাসছে। যা দেখাল, অতদূর অবশ্য নয়। তাহলেও গাঁ থেকে কয়েকটা দিনের জন্য বড় ননদ ও নন্দাই এসেছেন—কিছু বাড়াবাড়ি রকমের লজ্জা দেখানো হচ্ছে বই কি! তাই বলে কি অমনি?

ছটা বলে, এই রকম করতে হয়—না ছোটমামী?

মীরা নিম্নকণ্ঠে বলল, লোকের সামনে—

লোক যখন না থাকে?

কান মলতে হয় বরের।

যাও—

হয় রে। প্যান প্যান করেছ কি মরেছ—বরে একেবারে পেয়ে বসবে।

ছটাও তখন মীরার সুরে সুর মিলিয়ে বলল, ও কাজটা খুব পারব—

এবং বর বস্তুটির অভাবে—বাচ্চা মেয়ের পুতুলটা হাতের কাছে পেয়ে গেল—মোচড় দিয়ে তারই একটা কান ছিঁড়ে নিল। তুমি কান মলে থাক ছোটমামী?

মলি বই কি—নইলে ঠাণ্ডা থাকে! কানটা তা বলে একেবারে ছিঁড়ে নিও না, লোকে বলবে ছটার কান-ছেঁড়া বর।

অমল কি-কাজে পিছন-দরজায় এসেছে, এরা দেখেনি। মীরাকে বলল, কি হচ্ছে?

তার আগেই ছটাই কল কল করে নালিশ করছেঃ হ্যাঁ ছোটমামা, কান মলে ছোটমামী নাকি তোমায় ঠাণ্ডা রাখে? আমি বলছি, যাঃ, তাই কখনো হয়!

অমল সহাস্যে বলে পাগলি ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ তুমি? তামাসা বুঝবে না—যা মেয়ে

সত্যি সত্যি হয়তো ঐরকম করে বসবে।

মুলটি ফিরে গিয়ে বিয়ের গোছগাছ এইবারে। পাড়ার মানুষ গ্রামের মানুষের স্ফূর্তি—পিসি-ভাইঝির মন কিন্তু ভাল না।

ছটা বলে, আছি আর ক'দিনই বা!

আঙুলের কর গুণে সঠিক হিসাব দেয়ঃ এক মাস সাতাশ দিন। দিন মোটে দাঁড়ায় না পিসিমা, সড়াক-সড়াক করে পালাচ্ছে।

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে পিসি বোঝাচ্ছেনঃ বাপের-বাড়ির মেয়ে ছিলি, শ্বশুর-বাড়ির বউ হয়ে ঘরসংসার করগে এইবার।

ঝাঁকি মেরে মাথা সরিয়ে ছটা ফোঁস করে উঠলঃ তুমি বলছ পিসিমা?

ভামিনী বললেন, এর চেয়ে আনন্দের জিনিস—

শেষ করতে না দিয়ে ছটা বলে, তোমারও এই কথা?

তড়াক করে উঠে শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে মুখ ঢেকে লম্বা ঘোমটা টানল। মীরার ঢঙে গুটিগুটি হেঁটে দেখায়। বলে, ও পিসিমা, দুটো মাস পরে এই দশা আমার।

কাঁদো-কাঁদো গলা। এ কী রে, চোখে সত্যি সত্যি যে জল। ছটার চোখে জল—অদ্ভুত ব্যাপার। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি যাবার মুখে কোন কোন মেয়ে কাঁদে বটে—বিয়ের নামেই ছটার কান্না।

কিন্তু ছটা হেন মেয়ে বউ সেজে কতক্ষণ থাকবে! ঘোমটা নামিয়ে আঁচল কোমরে বাঁধতে বাঁধতে দৌড়। ও-দিগরে আর নেই।

অনতিপরে দেখা যায়, একপাঁজা মটরলতা বুকে নিয়ে বাড়িমুখো ছুটছে। আরও তিন-চারটে মেয়ে সঙ্গে। দয়াল মোড়ল তাড়া করেছে—পিছন দিকে দেখা যায়।

কি দয়াল, কি হয়েছে—ভামিনী মাঝে এসে পড়লেন।

দয়াল বলে, আমার কলাইক্ষেতে ওরা গিয়ে পড়েছিল।

শুঁটির লোভে গিয়েছিল। ক্ষেত থাকলে অমন যাবেই। সামনের মাঘে ছটার বিয়ে, দু-মাসও আর নেই। খেয়ে নিক এই ক'টা দিন।

গাঁয়ের মেয়েটা বউ হয়ে যাচ্ছে, কোনদিন তখন ক্ষেতে যাবে না। তাকে আর কি বলবে—পান-তামাক খেয়ে হাসিমুখে দয়াল মোড়ল চলে গেল।

রাধিকা বলেন, তোমার সাহস পেয়ে আজকাল বড্ড বাড় বাড়িয়েছে ঠাকুরঝি। কাউকে গ্রাহ্য করে না।

ভামিনী বলেন, করে নিক—বিয়ের পরে তো করতে আসবে না। সয়ে যাও বউ, খিচখিচ কোরো না।

ছটা সমস্ত শুনেছে। বাঘিনীর পাড়পত্র—আর তাকে পায় কে! চৌঠা মাঘের মাঝে যে ক'টা দিন আছে, জন্মের শোধ কুমারীত্ব করে নিচ্ছে। সে কী প্রচণ্ড ব্যাপার—যুগপৎ জলে স্থলে এবং গাছে চড়াও আছে যখন, অন্তরীক্ষে—মুলটির মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু বলে না—ছটা হেন মেয়ে ঘোমটার নিচে জবুথবু হয়ে থাকবে, নতুন অজানা সংসারে টিপে টিপে পা ফেলবে—সেই করুণ দৃশ্য মনে মনে মনে কল্পনা করে ক্ষমাঘেন্না করে যায়।

বুড়ি-চ্ছু খেলে—সোমত্ত হয়ে গেছে কিনা, ছেলে-খেলুড়ে নেবার জো নই—সব-গুলো মেয়ে। চু-উ-উ—দম ধরে দৌড়। ভ্রমরের একটানা গুঞ্জনের মতো! এক-

পায়ে লাফানোর খেলা—লাফিয়ে অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে এল। কানামাছি খেলে—চোখ-বাঁধা অবস্থায় দু-হাত বাড়িয়ে এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে ঘুরছে, হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটার ঘাড়ে বিষম চাপড়। কলরব : ওরে বাবা পিঠ ভেঙে দিয়েছে ঠিক—নয়তো নিরিখ করে চড় কষাল কেমন করে?

কাদা মাখে ইচ্ছাসুখে। ইটখোলার খানা—বর্ষায় জল জমে, পাট পচানি দেয়, পাট কাচে। পাট নিয়ে ঘরে তোলে, ধবধবে পাটকাঠি ডাঁই হয়ে পড়ে থাকে। সাদা পাহাড় যেন। তারই উপর দিয়ে ছটা ছুটে বেড়ায়—ছটাক পরিমাণ দেহ বলেই পারে। পাটকাঠি মটমট করে ভাঙে। রূপকথায় যেমন আছে—রাজকন্যার হাড়-মটমট ব্যারাম। ওঝা-বদ্যি কত আসে, ব্যাধি সারে না। এ-পাশ ও-পাশ করতে হাড়-পাঁজরাগুলো মটমট করে ওঠে। শেষকালে রাজপুত্তুর এলেন গুণীদের ছদ্মবেশে। তিনি চিকিৎসা করলেন। এবং ভিজিটের বাবদ গোটা কন্যাকেই নিয়ে গেলেন। কায়দাটা বুঝলেন না? চালাকি করে রাজকন্যা বিছানার নিচে পাটকাঠি রেখে দিয়েছিলেন।

লাফালাফি করে ছটা পাটকঠির উপরে। পাটকাঠি সরে যাচ্ছে, ভাঙছে। ইটখোলায় এখন জল বড় নেই, পচা কাদা—পা ঠেকালে হাঁটু অবধি ভুস করে তলিয়ে যায়। মাছ আছে নাকি সেই কাদার মধ্যে—পাড়া-বেপাড়ার ছেলেগুলো হাতড়া দিয়ে মাছ ধরছে। অর্থাৎ যত্রতত্র হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে হাতে মাছ ঠেকবে সেই আশায়। মাছ কতটা কি পেয়েছে বলে না—কাদা মেখে সব ভূত। মুখের দিকে চেয়ে চেনা যায় না, কথা বলিয়ে তবে চিনতে হয়।

ছটা ছাড়বে এমন মওকা!

যেখানে পাটকাঠি সব চেয়ে উঁচু, সেখানে উঠে, হাত পা'র বশ ছেড়ে দিল সে। মজা করে নেমে যাচ্ছে পাহাড় থেকে নিচে পড়বার মতন। ব্যালান্স রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তিলেক টলছে না। সড়াক করে কাদার মধ্যে। মাছ না-ই বা পেল, কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া যাচ্ছে বেশ। কাদা কিছু তরল হলে ডুবও দিত বোধহয়। মাছ ধরার নামে আচ্ছা রকম নর্তন-কুর্দন করে কাদা মাখছে—এত সুখ কারো কারো সহ্য হয়নি, বাড়িতে খবর পেঁছে দিয়েছে। ভামিনী বাঘের মতন হামলা দিয়ে পড়ে হাত ধরে টানতে টানতে পুকুর-ঘাটে কাদা ধুতে বসিয়ে দিলেন।

কোন কোন দিন ভোর হতে না হতে পুকুরে গিয়েও পড়ে। মনের সুখে সাঁতার কাটছে। লাল শাপলা ফুটে একটা দিক আলো হয়ে আছে—শাপলা তুলে তুলে প্রত্যাশীদের জন্য পাড়ে দিয়ে আসছে। দল বেঁধে পাতিহাঁস ভাসছে—ছটা তাড়া করেছে, পাল্লা দিয়ে সাঁতরাচ্ছে হাঁসের সঙ্গে। সেজঠাকরুনের শুচিবাই—স্নান করে যতবার তিনি উঠতে যাচ্ছেন, জল দিচ্ছে তাঁর গায়ে। গালি-গালাজ করতে করতে ঠাকরুন আবার স্নানে নামেন। ডুব দিয়ে দিয়ে ছটার চোখ লাল, আঙুলের চামড়া ঠরসে গেছে—ওঠার তবু নাম নেই।

পুকুরে বেগ মেটে না—দৌড়তে দৌড়তে গ্রাম-সীমানায় প্রাচীন দীঘির উঁচু পাড়ে উঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সেখান থেকে।

শুনতে পেয়ে রাধিকা গালিগালাজ করেন : গোঁজা-টোজা বিঁধে যাবে কোনদিন টের পাবি হারামজাদি।

ছটার কানে নিতে বয়ে গেছে। জল ছিটায়, শেওলা ছোঁড়াছুঁড়ি করে সঙ্গিনীদের সঙ্গে। কচুরিপানার থোপা থোপা বেগুনি ফুল তুলে কোচড় ভরছে—

মণিলাল পাড় ধরে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে—ইস্কুলেই যাচ্ছে ঠিক। ফেল করার পর

থেকে ছটা তার নতুন নাম দিয়েছেঃ ফেল-করা মাস্টার। আরও সংক্ষেপে ফেল্‌নু মাস্টার। মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চাগিয়ে উঠল—টিপিটিপি ডাঙায় না উঠে পিছন দিক থেকে গায়ে কচুরিপানা ছুঁড়ে দিল। দিয়েই দৌড়। রাগে গরগর করতে করতে মণিলালও তাড়া করেছে। খানিকটা গিয়ে ছটার খেয়াল হলো, অভেদ্য কবজকুণ্ডল পরা রয়েছে তার—ঠেঙানি পাছের কথা, কান কি চুল ধরে টানা, এমন কি গায়ে আঙুল ঠেকানোর এক্তিয়ার নেই কারো—সে কি জন্য ছুটে মরছে? দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দাঁড়িয়ে দাঁত মেলে হাসছে।

ধরবি নাকি ও ফেল্‌নু? ধর্‌ না, কত হিম্মৎ দেখি।

মণিলালও থমকে দাঁড়িয়েছে। মজাটা বেশ। সোমত্ত মেয়ে যা খুশি করে যাবে, পাল্টা কিছু করার জো নেই। বলল, পানা ছুঁড়ে কেন মারলি?

ছটার মন্তব্যঃ গোবর তো ছুঁড়িনি—

জনান্তিকে আবার বলছে, ইঞ্জিনিয়ারের বউ যখন হব, বি.এ. ফেল দিয়ে বাসন মাজাব আমি।

মণিলাল গর্জে উঠলঃ আমিও শোধ নেবো দেখিস। লোকের সামনে মুখ তোলার উপায় রাখব না।

কেমন করে?

বলে দিলাম আর কি!

পাক দিয়ে ঘুরে মণিলাল হনহন করে চলল। মেয়েলোকের কৌতূহল উসকে দিলে রক্ষা নেই। সামলে থাকতে পারবে না—খোশামোদ করবে, হাতে-পায়ে ধরবে। হলো তাই, ছুটে এসে ছটা মণিলালের দু-হাত ধরল। সোমত্ত মেয়েকে ছুঁলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, কিন্তু সোমত্ত মেয়ে নিজে ছুঁলে বোধহয় দোষ নেই। হাত ধরে আবদারের সুরে ছটা বলছে, বল্‌ না, কি করবি?

অনেক খোশামুদির পর মণিলাল বলল, মানুষটা তুই ছোঁয়ার বাইরে গেছিস, কিন্তু ছবিটা আমার হাতের মধ্যে সেটা ভুলিসনে। সকল শোক ছবির উপর নিয়ে নেবো।

কোন ছবি?

উপহার দেবো যে ছবি। বিয়ের সময় ছাদনাতলায় বরযাত্রী কন্যাযাত্রী সকলের সামনে টাঙিয়ে দেবো।

মণিলাল ভামিনীর কাছেও গিয়ে পড়লঃ শিক্ষক বলে আমার একটা ইজ্জত আছে পিসিমা। এক সাবজেক্টে ফেল করেছি, তার জন্য যা-তা বলছে—নামই পালটে দিয়েছে আমার। দৈবাৎ একটা পেপার খারাপ হয়েছিল, সামনের বার নির্ঘাৎ পাশ করে যাবো।

ছটার মৃদু মন্তব্যঃ কোন বারই না।

মণিলাল বলে, শুনলেন? নিজে যেন পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস সমস্ত কবজা করে বসে আছে।

পিসি ছটাকে শাসন করেনঃ ঝগড়াঝাঁটি ফের? বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না তোর?

ছটা মুখ করুণ করে বলে, হচ্ছেই তো! তাই কি মানবে? মানে না বলেই ঝগড়া।

এবার মণিলালের মন্তব্যঃ বিয়ের নামে কপালের উপর দুটো করে শিং গজায়। সত্যি না মিথ্যে হাত বুলিয়ে দেখা যেতে পারে।

ছটা বলে, শুনছ পিসিমা?

মণিলাল বলে, কারো নাম করে বলিনি পিসিমা। বিয়ে জগতের মধ্যে কেবল একটা মানুষেরই হবে না।

পিসি কড়া হয়ে হুকুম দিলেন: কথাবার্তা তোদের বন্ধ। সাদামাটা কথাও না। মণি ডাকলে জবাব দিবিনে ছটা, মুখ ফিরিয়ে চলে যাবি।

ঠোঁটে কুলুপ এঁটে দিলেন বাঘিনী-পিসি। যেটুকু রইল, সে হলো মুখ ভ্যাংচানো অথবা মুখ টিপে হাসা। কিন্তু মানুষটা যদি ছটার দিকে না তাকায়, সে অস্ত্র কোন্ কাজ দেবে বলো!

পনর

নন্দনপুর দত্তবাড়ি। বাইরের দিককার ঘরটা মণিলালের—ঐখানে শোওয়া-বসা পড়াশুনো। ছবি আঁকার বাতিক আছে—স্টুডিও-ঘরও ঐ। ইস্কুলের অ্যানুয়েল-পরীক্ষা হয়ে গেছে, মেলা খাতা এসেছে, তাড়াতাড়ি দেখে দিতে হবে। সকাল থেকে মণিলাল ঐ কর্মে ছিল। হুঁশ হলো, এগারোটা বেজে গেছে তখন। ইস্কুলে ক্লাশ বসে না আজকাল—যাকগে যাক, আজ কামাই। সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে খাতা দেখা শেষ করে ফেলি, আপদ চুকিয়ে দিই।

খাতা দেখছে সে একমনে। রান্নাঘরে ভাত দেওয়া হয়েছে, বোন দিবা এসে ডাকাডাকি করে তুলতে পারল না। দত্তগিন্নি তখন নিজে এসে পড়লেন।

ঘরের দরজায় তালা দিয়ে টেনে দেখে নিঃসংশয় হয়ে মণিলাল রান্নাঘরে চলল। খাতার ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক, যেহেতু ইস্কুলের ছেলেগুলোর সুশীল সুবোধ বলে খ্যাতি নেই। পরীক্ষায় বসে টোকাটুকি করা, পরীক্ষা হয়ে গেলে পরের অধ্যায়ে খাতা পাচার করা ইত্যাদি কর্মে সাতিশয় ওস্তাদ তারা। ও-বছর হেডপণ্ডিতের বাড়ি খাতা সরানোর ব্যাপার ঘটেছিল, এবং তৎসহ নিদ্রামগ্ন পণ্ডিতের তৈলচিক্কণ টিকিটিও। সব মাস্টার সেই থেকে সন্ত্রস্ত।

কিন্তু আজকের এই দিনদুপুরে—মণিলাল আর দিবা খেতে বসেছে মা দেওয়া-থোওয়া করছেন—হুড়মুড় করে কি পড়ল রে বাইরের ঘরের ভিতর?

কে, কে ওখানে? দিবার খাওয়া সারা হয়েছে, সে ছুটল। দত্তগিন্নিও গেলেন।

কাচনির বেড়ার ফাঁকে আবছা মতন দেখতে পেয়ে দিবা 'চোর', 'চোর' বলে চেঁচাচ্ছে ও দাদা, চোর ঢুকেছে তোমার ঘরে।

হাঁক পেড়ে মণিলালও এঁটো-হাতে উঠে পড়ল। দরজার তালা যেমন ছিল তেমনি আছে, চোর কোন কায়দায় ঢুকল তবে?

বাহাদুর চোর! বেড়ার মাথা ও চালের মধ্যে সামান্য ফাঁক, ইঁদুরটা বিড়ালটা গলে যেতে পারে। আর দেখা যাচ্ছে, ছটাও পারে। ইজেলে ছবি—একটু একটু করে অনেকদিন ধরে করছে। ঢুকেই ছটা প্রথমে ছবি দেখল। আহা, কী সুন্দর হচ্ছিল—ছটা এত রূপসী ঘুণাক্ষরে জানত না তো! মণিলালের তুলি তাকে রূপ দিয়েছে, দিয়ে আবার হরণ করে নিচ্ছে। মিছামিছি তড়পায়নি সে—অপমানের শোধ তুলছে ছবির উপর দিয়ে, নিজের বানানো বলে এতটুকু মায়া হলো না। দুই গজদন্ত তুলে দিয়েছে ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে, একটা কান দৃশ্যমান—পেঁচ টেনে নেতিটা তার লম্বা করেছে। হচ্ছিল লক্ষ্মী ঠাকরুনটি, সেই বস্তু হিড়িম্বা রাক্ষসী বানিয়ে তুলেছে। আরও কি মাথায় আছে, কে জানে। ছটা তুলি হাতে নিল—একটা নয়, দু-হাতে দুটো। আক্রোশ ভরে ছবিতে রং লেপছে' রঙে সমস্ত ডুবে যাক। কিন্তু বিপদ

ঘটল—অতিরিক্ত রাগে ও তাড়াতাড়িতে ইজেল উলটে পড়ল, জলের কুঁজোটা ভাঙল—

কে? কে ওখানে?

আসছে সব দুড়দাড় করে। পালাচ্ছে ছটা—এসেছিল, সেই পথেই। লাফ দিয়ে তীরের বাঁশ ধরে আড়ায় উঠে পড়ল। বেড়ার উপর দিয়ে বাইরের দিকে পা বের করে দেবে—কি গতিকে তীর খুলে গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মেয়েয়। অস্পষ্ট আর্তনাদ একটু—বিষম চোট খেয়েছে, অল্পস্বল্পে মুখ খোলার মেয়ে নয় বাঘিনী-ঠাকরুনের পেয়ারের ভাইঝি ছটাকিবালা।

হৈ-হৈ ব্যাপার। বাড়ির এরা আছেই, পাড়া ভেঙে এসে পড়ল।

দত্তবাড়িতে ছটা নিমখুন হয়ে পড়ে আছে, মুলটি অবধি খবর চলে গেছে। মধুসূদন বাড়িতে না—ভামিনী নোনাখোলার মাঠ ভেঙে পাগল হয়ে চলে এলেন, রাধিকা সঙ্গে।

চোখ পাকালেন ভামিনী মণিলালের দিকে। থতমত খেয়ে সে বলে, আমার কি দোষ পিসিমা? বেড়া টপকে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার ছবির কি দশা করেছে দেখুন!

পিসি গর্জে উঠলেন: মেয়েটার এই দশা—ছবির শোক এখন উথলে উঠল। বেশ করেছে, খাসা করেছে। আমি নিজে এবারে তোর ছারপোকার কাঁথায় আগুন ধরিয়ে যাব।

মণিলাল বলে, বাঃ রে, আমি কি করলাম? পালাতে গিয়ে নিজেই তো আড়া থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছে।

মণিলালের উপর তাড়না, ছটা কাতরানি থামিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছে। কর-কর করে সে বলে উঠল, না পিসিমা, পড়িনি আমি—ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

মণিলাল বলে, দিলে ঠিক হতো। কিন্তু হবে কি করে—সোমত্ত হয়ে বসে আছে, গায়ে হাত ঠেকানোর জোটি নেই। মুখের দুটো গালিগালাজ—তা কথাই পিসিমা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘরে চোর ঢুকেছে, হৈ-হৈ করে সব আসছি—ভয়ের চোটে দিশা করতে না পেরে মাটিতে পড়ল।

ছটা ভ্রূভঙ্গি করে উড়িয়ে দেয়: শোন কথা? ভয়ে নাকি পড়ে গেছি। ভয় পেতে দেখেছে কেউ কখনো? পড়েছি-ই বা কবে কোথায়?

সে সত্যি। রাধিকা মেয়ের পাশে বসে হাঁটুতে তেল মালিশ করছিলেন। সায় দিয়ে বললেন, ঘরে বাইরে এইটুকু বয়স থেকে দস্যিপনা করে বেড়ায়—পড়ে যাবার কথা কখনো শুনিনি। আজকেই প্রথম।

মণিলাল বলল, তখন ছিল ছটাক ওজনের একফোঁটা খুকিমানুষ, আর এখন তো দিনে দিনে হয়ে উঠছে এক ঐরাবত—

এবং কথার সঙ্গে দু-হাত বিস্তার করে ঐরাবতের যথোচিত আয়তন দেখিয়ে দিল।

পা চেপে ধরে ছটা আঃ উঃ—করছিল, পায়ের ব্যথা ভুলে হি-হি করে হেসে উঠল: হাতীতে বুঝি ঘরের আড়ায় চড়ে? গাছমুখ্যু একেবারে। ফেলুমাস্টার নাম কি এমনি এমনি?

লাগেনি বেশি, ঝগড়ার দাপটে মালুম পাওয়া যাচ্ছে। জনতার রায় মোটামুটি মণিলালের পক্ষে গেল। অকুস্থল যখন নন্দনপুর—মাঠ পার হয়ে ছটাই এসেছে, মণিলাল যায়নি ছটাদের বাড়ি—দোষ অতএব ছটারই। চালাঘরের আড়ার উপর থেকে মেজেয় পড়ে যাওয়া—ছটা হেন মেয়ের কাছে এটুকু ডাল-ভাতের সামিল। বাড়ি নিয়ে শুইয়ে রাখো, চুন-হলুদ ফেটিয়ে পায়ের ওখানটা দাওগে—রাত পোহালে মেয়ে দেখবে ড্যাংড্যাং করে লাফাচ্ছে।

কনুই ধরে রাধিকা দু-পা হাঁটাবার চেষ্টা করলেন—উঃ উঃ করে মেয়ে বসে পড়ল। কাজ নেই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এমনি অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া। আপাতত সম্ভবও নয় সেটা।

কাহার-পাড়া থেকে পালকি আনানো হলো, দত্তগিন্নি পালকিতে পুরু করে তোষক পেতে দিলেন—মাঠের উঁচুনিচু পথে ওঠানামায় ব্যথা না লাগে। সন্তর্পণে ধরে পালকিতে তোলা হচ্ছে—ছটার নালিশঃ দেখ দেখ পিসিমা, ফেলুমাস্টার ভ্যাংচাচ্ছে। আমি খোঁড়াচ্ছি তো সে-ও খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ঐ দেখ।

মণিলাল ঘরে ঢুকে যাচ্ছে—তার খোঁড়ানো কেউ দেখতে পায়নি। সত্যিই খুঁড়িয়ে থাকে তো সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

বাঘিনী-পিসি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেনঃ মানলাম, তুই কিছু করিসনি—ছটাকি আপনি পড়েছে। কিন্তু জখম হওয়া তো মিছে নয়—তাই নিয়ে ভ্যাংচাবি তুই? একটু মায়াদয়া থাকবে না?

আঘাত যত সামান্য বলে সকলে উড়িয়ে দিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। গোড়ায় পাতামুঠোর চিকিৎসা চলল কিছুদিন, সেই সঙ্গে হোমওপ্যাথি আর্নিকা। ব্যথা টেনেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে না—ছটা পা টেনে টেনে হাঁটে।

শীতকালের ব্যথা সহজে সারে না, সবাই বলছে। কিন্তু বড়দিন যে এসে যায়, পাত্রের জেঠা কাশীর অধ্যাপকমশায় এসে পাকা দেখবেন। চৌঠা মাঘও দেখতে দেখতে এসে পড়বে। বিয়ের কনে ওদিকে খোঁড়া হয়ে রইল।

মধুসূদন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সদরের হাসপাতালে নিয়ে এক্স-রে করিয়ে আনলেন। হাড়-টাড় ভাঙেনি—ভিতরের কোন গোলমাল পাওয়া গেল না। ছটাও শতকণ্ঠে তাই বলে, বাবা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, মিছামিছি উতলা হয়ে পড়ল। কিছু হয়নি, আমি জানি। ব্যথা-ট্যথা একদম গেছে, হাঁটতে গিয়ে শিরায় সামান্য টান পড়ে।

ডাক্তার অভয় দিলেনঃ চলতে ফিরতে ওটুকুও সেরে যাবে।

মধুসূদন সকাতরে বললেন, আমার যে শিরে-সংক্রান্তি। দু-চারদিনের মধ্যে যাতে সেরে যায়, তার কোন ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু।

আচ্ছা বলে ডাক্তার গুচ্চের ওষুধ দিলেন, এবং এ-বাবদে এক গাদা টাকা গুণে নিলেন।

পাত্রের জেঠা কাশীধাম থেকে পৌঁছে গেছেন, চিঠি এল। বারোই পৌষ মুলটি আসবেন, স্টেশন থেকে সরাসরি পালকিতেই আসবেন তিনি। শরীর ভাল না, বেশিক্ষণ থাকবেন না—সন্ধ্যার আগে সেই পালকিতেই আবার ফেরত চলে যাবেন।

মধুসূদন গজর-গজর করছেনঃ শরীর ভাল না তো বিশ্রাম-টিশ্রাম নিন, কাজের দিন বরকর্তা হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসবেন। এই ধাপধাড়া জায়গায় ওঁর আবার আলাদা করে আসার কি গরজ? পাত্রের মা কনে দেখেছেন, পাত্র নিজে দেখেছে, তাদের সব পছন্দ হয়েছে। উনি কি ঘরগৃহস্থালী করবেন বউ নিয়ে?

ছটাকে বললেন, হাঁট দিকি মা, সজনেগাছ অবধি চলে যা। লাগছে?

মুখের বিকৃতি চেপে নিয়ে ছটা বলল, না—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মধুসূদন তার পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। বলছেন পা চেপে চেপে—হ্যাঁ, বেশ নরমশরম হয়ে—খাসা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ এমনি মহলা দেবার পর খানিকটা প্রসন্ন হয়ে বললেন, সামান্য একটু টেনে হাঁটছিস। বুড়োমানুষ ওটুকু আর ধরতে পারবে না।

॥ ষোল ॥

কাশীর জেঠাবাবু এলেন। দলে আর তিনজন—বিল ভেঙে সাঁকো পার হয়ে তাঁরা আড়াআড়ি চলে এসেছেন। মেজেয় ফরাস পেতে বসানো হয়েছে তাঁদের। সামনের ফুল-লতাপাতা-বোনা আসনে ছটা বসেছে।

হায়রে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা। বুড়ো হলে কি হবে, জেঠাবাবুটি রীতিমত প্রগতিবান। প্রবাসে পড়ে থাকার দরুন এমনি হয়েছেন।

বললেন, জবুথবু কেন আজকালকার মেয়ে? সেসব দিন চলে গেছে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াবে। তোমাদের গ্রুপ-ফোটো বুঝি দেয়ালে? নামিয়ে আনো দিকি মা, সকলকে দেখি।

হাঁটার পরীক্ষা, বোঝা গেল। সেকাল হলে সোজাসুজি হাঁটতে বলত, এবং মাটি অবধি ঝুঁকে চলনের দোষত্রুটি দেখত। একালেও হুবহু তাই—কথাগুলো ঘুরিয়ে মিষ্টি করে বলেন শুধু।

ছটা যে বুঝেও বুঝল না। রয়েসয়ে পা টিপে টিপে গজেন্দ্র-গতিতে হাঁটবার কথা—কতক্ষণ ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে মধুসূদন রপ্ত করে দিয়েছেন—ন্যাং-ন্যাং করে সে ছুটল ফটো পেড়ে আনতে। সাধারণ অবস্থার চেয়েও খোঁড়ানোটা অনেক বেশি। এবং বেশ দৃষ্টিকটু।

বৃদ্ধ চমক খেয়ে বললেন, হাঁটনা মা-লক্ষ্মীর এমনধারা কেন? একখানা পা ছোট নাকি?

ছোট হবে কেন? পা পিছলে পড়ে একটুখানি চোট লেগেছে।

জেঠাবাবু চুকচুক করেন: আহা-হা। তা ভাবনা করবেন না ঘোষমশাই। এদের বয়সে অমন কত চোট লাগে, সেরেও যায়।

গম্ভীর হলেন এর পর। তেমন-কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলেন।

হাতঘড়ি দেখে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠলেন: গাড়ি আটটায়। যেতে ঘণ্টাদেড়েক তো লাগবেই। উঠি।

পালকিতে উঠতে উঠতে মধুসূদনকে বললেন, ছুটির পরেও আমি থাকব। মা-লক্ষ্মী নির্দোষ হয়ে সারলে একখানা পোস্টকার্ড ছেড়ে দেবেন। আবার আসব।

লজ্জা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে মধুসূদন বিয়ের প্রসঙ্গ তুললেন: চৌঠা মাঘ তো এসে গেল—মাঝে আর বিশটে দিন! যোগাড়যন্তর সব করে ফেলেছি। কিন্তু অস্থিত-পঞ্চক অবস্থার মধ্যে আত্মীয়কুটুম্ব কাউকে তো বলা যাচ্ছে না।

বৃদ্ধ উদাসকণ্ঠে বললেন, বিয়েথাওয়া এখন হচ্ছে কি করে? পা সারিয়ে মেয়ে আগে খাড়া করে তুলুন, ওসব তারপরে।

বেহারারা পালকি কাঁধে তুলে এ-হে ও-হো ডাক ছেড়ে রওনা হয়ে পড়ল। ফাঁসল তবে ইঞ্জিনিয়ারিং-পড়া ছেলে। অপমানে মধুসূদনের মুখ কালিবর্ণ। এতদূর এগিয়ে এমন লোক-জানাজানি হবার পর সামান্য পায়ের ব্যথা বরবাদ করে দিল।

চুলোয় যাকগে। ভাল সম্বন্ধে আরো একটা হাতে আছে। ছেলেটি ডাক্তার,

বছর দেড়েক পাশ করেছে—তৈরি মাল। সে হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং-ছাত্রের চেয়ে অনেক ভাল। সংসারের কর্তা বড়ভাই ছটাকে দেখে পছন্দ করে গেছেন। কিন্তু ভীষণ খাই—নগদে গয়নায় হাজার পনেরোর মতন। হবে না কেন? পাশ করার পর ছেলে মাঝারি গোছের একটা চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছে। পুরোপুরি তৈরি অতএব।

টাকার অঙ্ক শুনে মধুসূদন চেপে ছিলেন, কোনরকম উচ্চবাচ্য করেননি এতদিন। কিন্তু মানইজ্জতে ঘা পড়ে যাচ্ছে, টাকার হিসাব করতে গেলে হবে না। শুভকর্ম চৌঠা মাঘ হওয়া আর সম্ভব নয়। তবে তাড়াহুড়ো করে মাঘ মাসের ভিতরে যেভাবে হোক সমাধা করবেন।

চিঠিপত্র নয়, পাত্রের জ্যেষ্ঠের কাছে মধুসূদন নিজে গিয়ে পড়লেন: ভাই আপনার রত্নবিশেষ। দাবি যা করেছেন, তার উপর আমি একটি কথাও বলব না। আঁকেমুখে ভজিয়ে দেবো। কনে তো দেখাই আছে—পণের অর্ধেক আগাম নিয়ে লগ্নপত্র সেরে দিন। মাঘের আঠাশে আর উনত্রিশে দুটোই বিয়ের তারিখ। যেদিন খুশি।

এমন ঢালাও কথাবার্তার উপরেও জ্যেষ্ঠ দেখি প্যাঁচ খেলছেন। বলেন, মেয়ে দেখেছি বটে, অপছন্দের মেয়ে নয় তা-ও মানি, ভাইকে তবু একবার দেখিয়ে নিতে চাই। চাকরিসূত্রে ভাই শিগগিরই জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছে, বাসা করে থাকবে। শেষকালে যদি কথা ওঠে, আমি তার দায়িত্ব নিতে চাইনে।

ডাক্তার পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখতে আসছে। যথারীতি ছটাকে আসন পেতে বসানো হয়েছে। দেয়ালের গ্রুপ-ফটো সরিয়ে দিয়েছে। দেয়ালে কি ঘরের মধ্যে কোন কিছুই রাখেনি যে ফরমাস করবে, এটা আনো ওটা সরিয়ে দাও। পইপই করে ছটাকে সামলে দিয়েছেন, যা-ই বলুক আর যা-ই করুক, আসন ছেড়ে এক-পা নড়বিনে তুই। নড়বার কিছু হলে আমরাই তা করে দেবো। লজ্জা দেখিয়ে তুই জড়সড় হয়ে থাকবি।

ছটা ঘাড় নেড়ে মহোৎসাহে বলে, কুকুর-বেড়াল যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে-না, তেমনি হয়ে থাকব আমি।

মধুসূদন বলেন, না রে, তাহলে কুঁজো বলবে। সিধে হয়ে থাকবি, কিন্তু কাপড়-চোপড় জড়িয়ে জবড়জং হয়ে।

এটা বেশ ভাল করে বুঝে নিয়ে ছটা দ্বিতীয় দফায় বলছে, যত যা-ই বলুক, মোটেই আমি সাড়া দেবো না—অ্যাঁ বাবা?

তা হলে কালা বলবে। সাড়া দিবি, তবে জায়গা ছাড়বিনে। আমরাই সামলে সুমলে নেবো।

এমনি অনেকরকম শিখানো-পড়ানো আছে। পাত্র এল দুই বন্ধু সহ। ছটাকে ঘরে বসিয়ে রেখেছে—কিন্তু ঘরেই ঢুকল না তারা। বলে, রোদ্দুরটা বেশ লাগছে। রোয়াকের উপরে বসি আমরা, কনেও এইখানটা চলে আসুন।

হলো তো? কি করবেন, করুন এইবার। হাঁটানো ছাড়া রোয়াক অবধি পালকি-বেহারা করে আনা চলে না। কনের পায়ের সম্বন্ধে কিছু-না কিছু শুনে থাকবে—মতলব পাকিয়ে এসেছে। দুই বন্ধু, দেখ না, দুদিক দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে ছটার পা ফেলার দিকে তাকিয়ে—পদযুগল ছাড়া অন্য কিছু দ্রষ্টব্য নেই যেন। হবু-ইঞ্জিনিয়ার ফেঁসেছে—এবং এই পুরো-ডাক্তারিটিও নিঃসন্দেহে ফাঁসবে।

সম্বন্ধ টেকে না—বিপদ হলো দেখছি। পায়ের ত্রুটির কথা চাউর হচ্ছে, বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে দিনকে-দিন। যত দেরি হবে, হিতৈষীজনের অভাব নেই—

ব্যাপারটা ডালপালা সহযোগে বেশি করে ছড়াবে। মধুসূদন ক্ষেপে উঠলেন—দিন-রাত্রি মেয়ের বিয়ের চিন্তা।

সেই গোড়ার আমলে ঘটক একটা খবর এনেছিল, পাত্র দোজবরে এবং মুনসেফ। সবিশেষ শুনে মধুসূদন তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেন। ছেলেপুলে হবার আগেই প্রথম পক্ষ গত হয়েছে, সেটা মন্দের ভালো। তবু মনে খুঁত-খুঁতানি থেকে যায়, টোপর এর আগে একবার চড়িয়েছিল তো মাথায়। বাজারের পুরোনো ফার্নিচার কেনার সামিল—ব্যবহারে গা ঘিনঘিন করে। পুরানো হাত ফেরতা মাল চলবে না তাঁর ছুটার ব্যাপারে।

কিন্তু অধিকতর আপত্তি হয়েছিল চাকরির কারণে। হাকিম বলে খাতির-সম্মান যত বড়ই হোক, মাসান্তে শুখো মাইনে—সরকার বাহাদুর গোণাগুণতি যা দেন, তার উপরে আধেলাপয়সা উপরি নেই। ভূতপূর্ব ফরেস্টার মধুসূদন ঘোষ উপরি রোজগারের নিরিখে মানুষের মূল্য বিচার করেন: সে হিসাবে জামাই হবার পক্ষে মুনসেফের চেয়ে মুনসেফের পেশকারের দাবি অধিক জোরালো। মাইনে ও মানইজ্জত যত সামান্যই হোক, রোজগার দিয়ে পেশকার বাবু খোদ মুনসেফকেই কিনে ফেলতে পারেন।

দায়ে পড়ে সেই ঘটকের কাছে মধুসূদন নিজে চলে গেলেন: হাকিম পাত্তোরটা কোথাও গেঁথে গেল কিনা খবর নাও। থাকে তো তাদের নিয়ে এসো, মেয়ে দেখুন। হাকিম তো হাকিমই সই। দোজবরে—তা আর কি করা যায়।

না, গাঁথেনি—আছে ছুটো এখনতক। টোপ ফেলছে অনেক জনা, গেলেনি কোন টোপ। হাকিমের বাপ মেয়ে দেখতে এলেন। দুটো-পাঁচটা আজেবাজে জিজ্ঞাসার পর সোজাসুজি ফরমাশ: খানিকটা হাঁটো দিকি মা, ঐ দেয়াল অবধি চলে যাও।

মধুসূদন মেজাজ হারালেন। হবেই না তো কিসের পরোয়া? বললেন, রূপ-গুণ কোন-কিছু কাজে লাগে না, শুধুই হাঁটনা। বলি, বউ নিয়ে কি রেসে পাঠাবেন মশাই?

ভদ্রলোক বললেন, অঙ্গগুলো তো নিখুঁত আবশ্যক।

অঙ্গ তো একটা মাত্র নয়। নাক-চোখ-মুখ তাকিয়েও দেখলেন না, সকলের আগে পায়ের খবর। পায়ের উপর এত রোখ কেন বলুন তো?

বলুন তো কেন?

ভদ্রলোক টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। বলেন, ঘোষমশায়, আপনি ভাগ্যবান লোক। কতদিকে কত সুহৃৎ, লেখাজোখা নেই। উড়োচিঠি চলে গেল: খুঁতো মেয়ে—খোঁড়া পা। ভাল করে হাঁটিয়ে দেখে নেবেন।

দোজবরে হাকিম পাত্র—সেখানেও এই। এর পরে আরও দু-তিন জায়গা থেকে এসেছিল—অবস্থার ইতরবিশেষ নেই। মোটের উপর এটা পরিষ্কার, এই মুলটি অঞ্চলে যতদিন আছেন মেয়ে দেখিয়ে বিন্দুমাত্র লাভ নেই। মেয়ের পা টেনে হাঁটাই সার—হাঁটার হিসাবে নিখিল-ভারত পরিক্রমা সারা হয়ে গেলেও পাত্র গাঁথবে না। পৈতৃক ভিটা ছেড়ে সবসুদ্ধ যদি দূর-দূরান্তরে আস্তানা গাড়েন, তবে কিছু সুরাহা হতে পারে।

শীতকালে এখন কাদাজল শুকিয়েছে, পশ্চিমপাড়ায় সাতকড়ির বাড়ি যাবার অসুবিধে নেই। দুপুরে মণিলাল ঘোষবাড়ি আর আসে না, মামার-বাড়িতে খায়।

ধরতে হবে তাকে—বাড়ির সামনের পথে মধুসূদন নজর রেখেছেন। পুরো হপ্তা গেল, মণিলালের পাত্তা মেলে না। বোঝা যাচ্ছে, সোজা রাস্তা এড়িয়ে বাগান-আগান ভেঙে যায় সে। পাপ-মনে ভয় ঢুকেছে।

টিফিনের সময়ের আন্দাজে একদিন মধুসূদন সাতকড়ির বাড়ি চলে গেলেন। পাঁচিল ঘেরা বাড়ি, পাঁচিলের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন ঃ কোথায় রে মণি ? বাইরে আয়।

মণিলাল ইস্কুল থেকে সবে এসে দাঁড়িয়েছে, খেতে বসবে এখন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। মধুসূদনের দিকে চাওয়া যায় না, মুখের উপর অগ্নিকাণ্ড। মণিলাল বলল, এখানে কেন, ভিতরে এসে বসুন মেসোমশায়।

আপ্যায়ন মধুসূদন কানেও নিলেন না। ফেটে পড়লেন ঃ নেমকহারাম—যেমন মামা তেমনি ভাগনে। যে পাতে খাস, খাওয়া অন্তে সেই পাতেই হেগে করিস তোরা।

ক্লাসে বকে বকে মণিলালের মুখ তিতো হয়ে গেছে। ঘরে এসে একটু জিরোতে না জিরোতে উৎকট চেঁচামেচি। কিছু গরম সুরেই সে বলল, খালি গালিগালাজই করছেন—কি হয়েছে, বলবেন তো সেটা ?

ন্যাকা সাজছে। জানিসনে কি হয়েছে ?

না। কিছু বলবার থাকে তো বলুন। কথা কাটাকাটির সময় নেই—দুটো মুখে দিয়ে এক্ষুনি আবার ইস্কুলে ছুটতে হবে।

শত্রুতা সাধছিস তুই, যে সম্বন্ধটা আসে উড়োচিঠি দিয়ে ভাংচি দিস।

না—

দৃঢ়কণ্ঠে মণিলাল বলে, আমি নই। কেউ কিছু করলে তার জন্য আমায় কেন দুষবেন ?

বুঝিনে আমরা কিছু—ঘাস খাই, উঁ ? হারামজাদা বেইমান কুকুর—

গালাগালির স্রোত চলল। মণিলাল দড়াম করে মুখের উপর পাঁচিলের দরজা এঁটে দিল।

মধুসূদন থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতদূর আস্পর্ধা !

সতর

রাগের মাথায় কাজটা করে ফেলে মণিলালের মহাআতঙ্ক।

মামী—সাতকড়ির বউ, ওদিকে হাঁকাহাঁকি লাগিয়েছেন ঃ চোখ-রাঙানির কি ধার ধারি, চালে চাল দিয়ে বসত করি আমরা ? মেজাজ দেখাতে এসেছেন ! পরের বাড়ি চোরাই কর্ম করতে গিয়ে মেয়ের ঠ্যাং ভেঙেছে—খোঁড়া মেয়েকে নিতে যাবে, মেয়ের তো মন্বন্তর হয়নি। বেশ করেছিস তুই, উচিত মতো জবাব দিয়েছিস। খেতে বোস এবারে, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

খাওয়া আর আসছে না, দু-এক গ্রাস মুখে দিয়েই মণিলাল উঠে পড়ল রাগের বশে ঘোর অন্যায় করে বসল—মধুসূদনেই শেষ নয়, বড়-সেনাপতি বাঘিনী পিসি এসে পড়বেন। দরজা বন্ধ করে সেখানে পার পাওয়া যাবে না। এসে পড়লেন বলে। পিসি রাগলে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড। এ বাড়ি না পেলে ইস্কুল অবধি হানা দেবেন, ধুন্দুমার লাগাবেন শিক্ষক-ছাত্র সকলের মাঝখানে। কেলেঙ্কারির চরম। চুলোয় যাক ইস্কুল—মুলটি গ্রামের ত্রিসীমানায় থাকবে না রাগ ওঁদের খানিকটা উপশম না হওয়া পর্যন্ত।

আধখাওয়া সেরে হনহন করে নোনাখোলার মাঠ ভেঙে মণিলাল নন্দনপুর নিজের

বাড়ি গিয়ে উঠল। এখানে জোর কত! মা আছে বোন আছে, আর হাঁক পাড়লে পড়শিরা রে-রে—করে বেরিয়ে পড়বে। ছটা এসে আচ্ছা রকম টের পেয়ে গেছে। সে মামলায় মণিলালের জিত—ষোলআনার উপর আঠারোআনা। মেয়েটার জন্মের শোধ একটা পা গেল, তার উপরে নিন্দে-মন্দ যত-কিছু কুড়াল সে-ই।

বাড়ির উঠানে সে অস্থিরভাবে চক্কোর মারে, আর ঘন ঘন মাঠের দিকে তাকায়।

আশঙ্কা অমূলক নয়—ভামিনীকে দেখা গেল অনতিপরেই। একলা তিনি। মধুসূদন নেই কেউ নেই—বাঘিনী-পিসির মানুষ লাগে না, একাই তিনি এক সহস্র—মাঠের ডেলাবন ভেঙে একা একা তিনি ঝড়ের বেগে আসছেন। বুক্ষ নেই আর। বুক ঢিব-ঢিব করছে, দুর্গা-নাম জপছে মণিলাল মনে মনে।

কাছাকাছি হতেই 'আসুন' 'আসুন' করে সে রাস্তা অবধি ছুটে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ে বাঘিনী চোখ পাকালেনঃ বড্ড যে খাতির! আর মধুকে বাড়ি ঢুকতে দিসনি তুই?

মণিলাল আকাশ থেকে পড়েঃ কী সর্বনাশ, তা কেন হবে?

বল্ তবে কি হয়েছে!

আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক। ছটার বিয়ের সম্বন্ধ আসে, আমি নাকি উড়ো চিঠি পাঠিয়ে ভন্ডুল করে দিই। মাস্টার-মানুষ আমি—ছটা ছাত্রী। কী লজ্জার কথা বলুন তো পিসিমা!

ভামিনী ভ্রকুটি করে বললেন, তুই লিখিসনি, তবে কে লিখতে গেছে?

মণিলাল সক্ষোভে বলে, তল্লাটের মধ্যে সকলে গোমুখ্য, একা আমিই কেবল লিখতে পড়তে জানি। বলি, মেয়েকেও তো পড়তে লিখতে শিখিয়েছেন। ক'টা দিন বাদায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, মেসোমশায় সেখানেও ছাড়েননি——মেয়ে পড়ানোর কাজে আমায় জুতে দিলেন।

বলতে চাস, ছটাকি নিজের নামে লেখে?

তা লিখবে কেন! নিজেদের মেয়ে ধোয়া-তুলসিপাতা, ভাজা-মাছখানা উল্টে খেতে জানে না। আমি পরের বাড়ির উড়ো আপদ—

বলতে বলতে গলা বুজে আসে, বাকি কথাগুলো ধাক্কা দিয়ে যেন বের করে দিলঃ যত দোষ নন্দ ঘোষ! পরের বাড়ির ছেলে বলে আমার উপরেই যত তম্বি। মেসোমশাই মামার-বাড়ি গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললেন। মুলুটি ছেড়ে বাড়ি এসে পালালাম তো আপনি এই অবধি তেড়ে এসেছেন।

ইতিমধ্যে দত্তগিন্নি এসেছেন, দিবা এসেছে। এ-বাড়ির ও-বাড়ির জনা কয়েক এসেও জুটেছে। চোখের অগ্নিবর্ষণ করলেন বাঘিনী—পড়শিরা ছিটকে গিয়ে পড়ল। দত্তগিন্নির হাত ধরে টেনে বললেন, চলো মণির মা, ঘরে গিয়ে বসিগে।

দু-পা গিয়েই বলে ফেললেন, দিক গে ভাঙচি যার যেমন খুশি। মেয়েটা তোমাকেই নিতে হবে মণির মা।

হঠাৎ-প্রস্তাবে দত্তগিন্নি দিশা করতে পারেন না। বললেন, ছটার বিয়ে মণির সঙ্গে?

আদা-জল খেয়ে চিঠি ছাড়ছে—উপায় কি বলো?

বলতে বলতে ফোঁস করে বৃথা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বলেন, মধুর মোটা আশা ছিল রাজা-উজির জামাই করবে, বউ নিয়ে তারা রাজঅট্টালিকায় তুলবে। তার জন্যে গয়নায় বরসজ্জায় নগদে দিতো-থুতোও বিস্তর। কপালে না থাকলে হয় না, বুঝলে? হতে করতে তোমার ফেল-করা ছেলে, আর এই খোড়ো-ঘরবাড়ি।

থেমে একটু দম নিয়ে জোরগলায় বললেন, পাত্তোর নিরেস বলে পাওনাটা তা বলে কম হতে দিচ্ছিনে। আসলে তো ছটারই পাওনা—সে ফাঁকিতে পড়বে, আমি থাকতে সেটা হবে না। যা যা দেবে মনন করেছিল, কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত আদায় করে নেবো। বনকরে গিয়ে মধু কত বড় ফেরেব্বাজ হয়েছে, দেখে নেবো—হ্যাঁ।

বলে মাঠ-পারে মুলটি গাঁয়ের অলক্ষ্য মধুসূদনের উদ্দেশে কটমট করে তাকালেন।

ভামিনীকে দাওয়ায় নিয়ে বসিয়েছে। দিবা সামনাসামনি বসে হামানদিস্তা নিয়ে পান সেঁচছে তাঁর জন্য। বুড়ির কথাবার্তার ধরন দিবার মোটেই ভাল লাগেনি। ভালমানুষের ঢঙে সে বলল, ছটা সেই যে টেনে টেনে হাঁটত, এখন কেমন পিসিমা ?

ভামিনী প্রাঞ্জল করে দিলেন : টেনে হাঁটা কিসের, খোঁড়াই তো। দুনিয়া-সুদ্ধ জানে, তুই জানিসনে ? না, জেনেশুনে ন্যাকামি করছিস ?

এক ঝলক অগ্নিবর্ষণ করেন মেয়েটার উপর। বলেন, অন্যেরা যা বলুক, খোঁড়ার খোঁটা তোরা কোন্ আক্কেলে দিবি ? ভাল মেয়ে এই বাড়ি এসে খোঁড়া হয়ে ফিরে গেল। কী করেছিলি, তোরাই জানিস—টাকার বৃষ্টি করেও খোঁড়া নাম ঘোচানো গেল না। নইলে ছটা এ বাড়ির বউ—সাতজন্ম তোরা যদি তপস্যা করতিস তবু তো এমন হবার কথা নয়।

বোনকে ধমক দিয়ে মণিলাল গোলমেলে কথা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে ফেলতে চায়। বলে, কানে নিও না পিসিমা, দিবাটা বড্ড বাজে বকে। জানতে চাইছে, পায়ের দোষটুকু সম্পূর্ণ সেরেসুরে গেছে কিনা। মানে, খেলুড়ে ছিল তো ওরা—কুমির-কুমির কানামাছি চোর-পুলিশ কত খেলেছে। এক বাড়িতে হলে সেইটে আবার মজা করে চালাতে পারে—এই আর কি !

দত্তগিন্নিরও দোনামনা ভাব : কম হোক বেশি হোক বাড়ির বউটা খুঁতো হয়ে যাচ্ছে তো। আত্মীয়-কুটুম্ব নানান জনে নানা কথা বলবে। দাদাকে চিঠি লিখে দিই, তিনিই বা কি বলেন—

মণিলাল উৎসাহভরে বলে, লিখবেই তো মা। তিনি বরকর্তা। সরকারি কাজের ছুটিছাটা আগে থাকতে নিতে হয়। মামা কী যে খুশি হবেন। ছটাকে মা-মা—করে অজ্ঞান, বাদাবনে দেখতে পেতাম।

সুর বদল করে আবার বলে, আত্মীয়-কুটুম্বরা বলবে না কেন, বউ নিয়ে তাদের তো ঘর করতে হবে না। ভাবো দেখি মা, ছটার পা দু'খানা নিখুঁত থাকলে রক্ষে ছিল। ভাত চাপিয়ে দিয়ে হয়তো বা একছুটে চলে গেল মুলটি ঘোষবাড়ি—মায়ের কাছে। ভাত এদিকে পুড়ে কয়লা।

ভামিনী পিসি আরও নির্ভয় করেন : হুঁ, যাচ্ছে মুলটি ! সাদা জমিতেই হাঁটতে পারে না, মাঠের ডেলাবন ভাঙবে সেই মানুষ ! আমারই ভাল পা দেখ্ কুষ্ঠরোগীর মতন হয়ে গেছে।

মণিলাল জুড়ে দেয় : পা সেরেসুরে আবার যে সেই আগের মতই হবে তা হবার নয়—হাসপাতালের বিলেত-ফেরত ডাক্তার অবধি দেখেছে, তাই না পিসিমা ?

ভামিনী প্রবল ঘাড় নাড়লেন : ভাল হবার হলে এদ্দিন কি পড়ে থাকত এমনি ? না, তোর সঙ্গে বিয়ের কথা উঠত ? তুই ভাবিসনে বাবা। ছটার পা যেমন আছে, তেমনি থাকবে। চিরকাল।

রাত দুপুরে লগ্ন। বাসরের রীতকর্ম সারা হলো, রাত পোহাতে তখন সামান্য বাকি। মণিলাল বেচারি ঝিম হয়ে পড়েছে। বাঘিনী-পিসি বউ-মেয়েদের তাড়া

করছেন ঃ বাড়ি যা তোরা সব। এদের একটু ঘুমোতে দে, নয়তো মারা পড়বে। এখন যা, সকালবেলা এসে বাসিবিয়ে-টিয়ে দিবি।

উৎসব-ক্লান্ত বাড়ি নিশুতে হয়ে গেল। ছটা বাইরে গিয়ে এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে এল। না, কেউ নেই। দুয়োর দিচ্ছে।

মণিলাল চোখ বুজে ছিল, কত ঘুম ঘুমোচ্ছে যেন। যেই না দরজা দেওয়া, খাট থেকে সড়াক করে নেমে পড়ল। খোঁড়ানোর ভঙ্গি করে, আর নিচু গলায় ছাড়া কাটে ঃ খোড়া ন্যাং-ন্যাং-ন্যাং—

বাসরে নববধূর সঙ্গে প্রথম কথা।

ছটার মুখে কুলুঙ্গির প্রদীপের আলো পড়েছে, হাসিতে সে মুখ ঝিকমিক করছে। চাপা গলায় বলল, কেমন খোঁড়া দেখতে চাস? দেবো জোড়াপায়ের লাথি ছিটকে গিয়ে পড়বি।

বধূর পালটা পতি-সম্ভাষণ।

বিয়ে হয়ে গিয়ে মণিলাল এখন কায়দায় পেয়েছে। সেটা শুনিয়ে দেয় ঃ হ্যারে, এটা কি বললি, পতি হয়ে গেছি না আমি?

জিভ কাটল ছটা ঃ সত্যিই তো। দাঁড়াও। মনে ছিল না আমার—আনকোরা নতুন কিনা। দাঁড়াতে বললাম না চুপচাপ?

আরে আরে, হুকুম ঝাড়ে যে লাটসাহেবের মতন। কড়া সুরে মণিলাল বলে, কেন দাঁড়াব?

ততোধিক কড়া হয়ে ছটা বলে, গড় করব, পায়ের ধুলো নিয়ে মুখে মাথায় দেবো। পাপ করলাম, তার বিধান না হলে নরকে ডুবে মরব যে।

মরতে হয় মরবি, আমার কি। 'পতি পরম গুরু' চিরুনিতে আয়নায় কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত। আর জলজ্যান্ত সেই পতিকে জোড়াপায়ের লাথি। পা আমি কিছুতে ছুঁতে দেব না, কেমন করে ধুলো নিস দেখি।

বলতে বলতে মণিলাল দরজার দিকে যাচ্ছে। পালাবে নাকি দরজা খুলে?

আর ছটা দেরি করে! দৌড়ে গিয়ে দু-পা জড়িয়ে ধরল। হা-ডু-ডু খেলার মতন। পড়ে যেতো মণি আর একটু হলে।

মাথা তুলে বিজয়িনীর মতন ছটা বলল, কেমন, পা যে ছুঁতে দেবে না?

যুগল-পা কষে এঁটে ধরে, কেউটেসাপে যেমন ছোবলের পর ছোবল মারে, ছটা ঢপ ঢপ করে পায়ের উপর মাথা ঠুকছে। ঠুকছে তো ঠুকছেই—ছাড়ে না। বাহাদুরি নিচ্ছে মাঝে মাঝে উপর দিকে মাথা তুলে ঃ গড় করতে দেবে না যে? কেমন? কেমন?

কিন্তু মণিলাল দেখছে অন্য এক জিনিস। দেখে পাথর হয়ে গেছে। বলে, তুই দৌড়ে এলি—পা যে ভাল হয়ে গেছে। একটুও তো খোঁড়ার লক্ষ্মণ নেই।

সেরে গেল হঠাৎ—

কেমন করে, কবে থেকে? এ বড় তাজ্জব।

ছটা বলে, মায়ের এক ছেলে তুমি। খুঁতো-বউ বলে তোমার মায়ের খুঁত-খুঁতানি ছিল, মা-কালী তাই সেরে দিলেন। তা ভালই তো—

হেসে গলে গলে পড়ছে সে। বলে, মুখ গোমড়া করছ কেন গো? খোঁড়া বউ রাত না পোয়াতে নিখুঁত বউ হয়ে গেল। লাভই তো তোমাদের।

মণিলাল বলে, লাভে কাজ নেই। নিখুঁত বউ দু-দুখানা ভাল পা নিয়ে ক'দিনটই বা ঘরে থাকবে। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ছিল ভাল।

আবার বলে, ঘোর চক্রান্ত, এখন বুঝলাম। খোঁড়া দেখেই আমি সাহস করে ছাতনাতলায় নেমেছিলাম।

দুঃখের ভান করে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছটা বলে, সাত পাক সারা হয়ে গেছে, কী আর করবে এখন বলো!

পৌরুষ গর্জে উঠল মণিলালের: একটু যদি বেয়াড়াপনা দেখেছি, যেদিকে দু-চক্ষু যায় বেরিয়ে পড়ব। ত্রিভুবন খুঁজে পাবে না। স্পষ্টকথা আমার—হাঁ।

নতুন বউ সঙ্গে সঙ্গে বলে, ইঁট মেরে তবে খোঁড়া করে রাখবো। একখানা পা অন্তত। সত্যি সত্যি খোঁড়া। আমিই তখন ছড়া কাটব: খোঁড়া ন্যাং-ন্যাং, কার দুয়োরে গিয়েছিলি—

বলতে বলতে থেমে গেল। হুঁশ হলো, পতিকে উপযুক্ত ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানো হচ্ছে না। নিজের গাল দু-হাতে চড়ায়: ছি-ছি, অকথা-কুকথা মুখে এসে গেল। অভ্যাস-দোষ। ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল আমার। যাচ্ছ কোথা, দাঁড়াও—

দাঁড় করিয়ে আবার এক চোট প্রণাম!

হার মানি নি, দেখ

পরমপ্রীতিভাজন

ডঃ শ্রীমান ভূদেব চৌধুরী

করকমলেষু

এমন নাকি হয় না। শুনুন আগে, তারপর বলবেন।

গঞ্জ সিরাজকাটি, ভদ্রানদীর উপর। সলিল মিত্তিরের বাসাবাড়ির রোয়াক। দুই বোন, মঞ্জরী আর মন্দিরা, বড়ি দিচ্ছে। মঞ্জরী আনাড়ি, মন্দিরা এই কর্মে ওস্তাদ। এ-ও এক শিল্পকর্ম—বড়িতে শঙ্খ বানাচ্ছে মাছ বানাচ্ছে। হাতে কাই নিয়ে কোন কায়দায় মুঠো করলে বড়ি বেরিয়ে আসে, ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছে মঞ্জরীকে।

দুই বোনে পুরানো গল্প হচ্ছে।

মঞ্জরী বলল, উঃ, কী ভয়টা দিয়েছিল উড়োচিঠি ছেড়ে। আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, সত্যিই-বা। তুই ঠিক ধরেছিলি—ভাংচি-দেওয়া চিঠি।

মন্দা শিউরে উঠে বলল, চিঠি ভাগ্যিস আমার হাতে দিলেন মা। অন্য কারো হাতে পড়লে বিষম হৈ-চৈ হত।

মঞ্জরী বলে, বিয়ে ভেঙেই যেত—

এমনি সময় সাইকেল ধরে সলিল উপস্থিত। কাজে বেরুচ্ছে। সহাস্যে সে বলল, কি ভাঙাভাঙি হচ্ছে?

মঞ্জরী বলে, বিয়ের মুখটায় তোমার নিন্দেমন্দ করে বেনামি চিঠি গিয়েছিল—

মন্দিরার দিকে মিটিমিটি হেসে সলিল বলে, বটে বটে, আমায়ও নিন্দে মন্দ! কোন দুরাত্মার হেন কাজ, জানা গেছে নাকি সেজদি?

অর্থাৎ সংবাদটা সলিলের কাছে নতুন নয়। এতদিনের ঘরকন্নায় মজাদার কাহিনী মন্দা কি বরকে না শুনিয়ে ছেড়েছে? হাসিতামাসা কত হয়েছে এই নিয়ে।

তবু মঞ্জরী বলে যাচ্ছে, মায়ের নামের চিঠি বলে পিওন মায়ের হাতেই দিয়েছিল। সে চিঠি পড়লে, মা যা নার্ভাস মানুষ, সম্বন্ধ ভেঙে যেত। কিন্তু মায়ের ছিল হাতজোড়া—

মন্দিরা বলে, হতেই হবে। জন্ম জন্ম এদের হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছি—দাসীবৃত্তি চেড়ীবৃত্তি আমার যে কপালের লিখন।

সলিল সাক্ষি মানে মঞ্জরীকে: শুনলেন? দাসীবৃত্তি করে না কি আমার। হুকুমের গোলাম করে রেখেছে, তাতেও সুখ পায় না।

মন্দিরা বলে, দুর্বাসামুনি বলে থাকি। সত্যি কি মিথ্যে—কলকাতায় দেখলি ক'দিন, এখানেও দেখছিস—তুই-ই বল সেজদি। পান থেকে চুন খসতে দেবে না—দাসীবৃত্তি ছাড়া একে কি বলে?

অভিযোগ সলিল কানে শুনছে আর হাসছে। মঞ্জরী ষোলআনা সলিলের দিকে। বলল, কী জানি, আমি তো কিছু দেখিনে। বড্ড ভাল তোর বর। একটু-আধটু দাপট যদি থাকেও, সে ভাল—নইলে আর পুরুষ কিসের? অলকেশের, দেখিস নি,-মাথা খারাপ হয়েছিল—তখনো কী তেজ! সর্বাঙ্গে আমার কালশিটে বের করে ছেড়েছিল। মেনিমুখো পুরুষ আমার দু-চক্ষের বিষ।

মামলায় জিতে সলিল বীরদাপে বেরিয়ে গেল। আত্মপক্ষে মন্দিরা আরও কী-সব বলতে যাচ্ছিল, দোতলার ঘরে তুমুল চিৎকার—ডাকাত পড়েছে যেন ওখানে।

মন্দিরা সহাস্যে নিজের দুরদৃষ্টের কথা বলে, শোনু, সাত-পাগলের সংসার হয়েছে আমার। ফেলে-ঝেলে একদিন বেরিয়ে পড়ব যেদিকে দু-চোখ যায়।

পরীবালা দোতলা থেকে চেঁচাচ্ছে: মন্দা, তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখে যাও। শিগগির, শিগগির—

মন্দিরা বলে, শুনছিস? বড়ি ফেলে ছোটো এখন উপরে। না গেলে রক্ষে

রাখবে না।

চিৎকার, ক্রমাগত চিৎকার : এসো শিগগির, দেখে যাও। এর পরে আর হবে না, চলে এসো—

স্বর আরেও উগ্র হল : কী এমন রাজ-কাজে আছে? একটুকু আসতে পার না?

মন্দিরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, চল্ সেজদি, রেগে কাঁই হচ্ছে। সারাটা দিন কথাই বলবে না। খাবে না হয়তো, মেয়ে নিয়ে একমুখো বেরিয়ে পড়বে। একরোখা ঐ সব মানুষকে বড্ড ভয় আমার।

না, গোড়া থেকেই ধরি। লম্বা চওড়া কিছু নয়—চারটে বছর। চার বছর আগেকার এক রবিবার। জেলার সদর শহর—এই গঞ্জ থেকে সাইকেলে ঘণ্টা তিনেকের পথ, নৌকোয় দেড় গোন...

॥ এক ॥

রবিবারে কোর্ট-কাছারি বন্ধ। অনিল মিত্তির উকিলমশায়ের ছুটির মেজাজ। মক্কেলের কাজকর্ম করবেন না, অভ্যাসবশে তবু কাছারিঘরে নিজ চেয়ারে এসে বসেছেন।

পাশে তিন তক্তাপোশ জুড়ে প্রকাণ্ড ফরাস। সতরঞ্চি, চাদর, তাকিয়া। মিত্তির-মশায়ের দুরন্ত পশার—জুনিয়ার দুইজন, মুহুরি দুইটি। মক্কেলের ভিড়ে কাছারি গম গম করে, আজকে প্রায় ফাঁকা—সর্বসাকুল্য দশ-বারো জন উপস্থিত। ঘনিষ্ঠ মক্কেল আছেন কয়েকটি, আর পড়শি ও বান্ধবেরা। গল্পগুজব ও চা-সিগারেট চলছে।

এই মফস্বল শহরে এক বৃদ্ধ রায়বাহাদুর আছেন, খুব জাঁকজমকে তাঁর ছেলের বিয়ে হল। সেই গল্প হচ্ছে। কলকাতার পাত্রী। বর-সজ্জায় রায়বাহাদুর মোটরগাড়ি পর্যন্ত আদায় করেছেন—সেই মোটর হাঁকিয়ে বর-কনে এবং ড্রাইভারের পাশে স্বয়ং রায়বাহাদুর কলকাতা থেকে এই দেড়-শ মাইল পথ চলে এলেন। গাড়ি পরখ করা হল, রেল-ভাড়াটাও বাঁচল। বরসজ্জার বহর এই, তার উপরে নগদ পণ কত নিয়েছেন আইনের ভয়ে তার প্রকাশ নেই। তবে মাছি মেরে হাত গন্ধ করেন নি রায়বাহাদুর, স্বচ্ছন্দে সেটা অনুমান করা যায়।

সকলে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন : দিনকে-দিন কী অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। আমাদের মতন দরগরিব গৃহস্থঘরে মেয়ের বিয়ে এরপর হবেই না মোটে। ছেলেই বা কী এমন। বিলেত গিয়েছিল, কিন্তু বিলেত গেলেই দুটো শিং গজায় না। কত বিলেত-ফেরত দেশে ফিরে হা-অন্ন যো-অন্ন করে বেড়াচ্ছে। ব্যারিস্টারি পাস করে এসেছে শুনি। কিন্তু পাস করা ব্যারিস্টার পেটের দায়ে ইস্কুল-মাস্টারি ধরেছে, এমনও দেখা আছে।

দেশের অবস্থা নিয়ে এমনি বিলাপ-পরিতাপ হচ্ছে, তার মধ্যে অনিল হঠাৎ বললেন, ভাইয়ের বিয়ে দেব। পুজোর সময় বাড়ি গিয়ে মায়ের হুকুম আদায় করে এনেছি।

আলোচনা ঘুরে অনিলের মাতৃভক্তির প্রসঙ্গ উঠল : কত দিকে কতই তো উকিল-ব্যারিস্টার—মিত্তির-মশায়ের এই রোজগার মায়ের আশীর্বাদের জোর আছে বলেই। বার লাইব্রেরির বারান্দায় মক্কেল কাতার দিয়ে বসে থাকে, অন্য সকলের চোখ টাটায়।

কিছু না, কিছু না—বলে অনিল নস্যাৎ করে দিলেন : দুটো-তিনটে বছর যেতে দিন—রোজগার কারে কয়, সে আমার ভাই দেখিয়ে দেবে। মাথা থেকে বেড়ে মতলব বের করেছে।

সিরাজকাটি গঞ্জে সলিল কয়লার ডিপো খুলেছে, বেশ ভাল চলছে নাকি। অনিল বলছেন, মামলা-মোকদ্দমা আর ক'টা বাড়িতে? কিন্তু সব বাড়িতে উনুন ধরাতে হয়। কাঠকুটো অমিল, কয়লা ছাড়া গতি নেই। আমিও আছি সদরের উপরে। ওয়াগন ভর্তি কয়লা এসে এখান থেকেই বাঁটোয়ারা হয়। অন্য কেউ পাক আর না পাক, সিরাজকাটি কোল-ডিপো ঠিক ঠিক মাল পেয়ে যাচ্ছে।

বটেই তো! তদ্বিরে বলুন টাকা-পয়সায় বলুন কোন দিকে তো খামতি নেই। আপনারা যাতে হাত ঠেকাবেন, সোনা।

অনিল মিত্তির বললেন, মা-র আগ্রহ ছিল না এতদিন। বিষয় সম্পত্তি যা-থাক, ছেলের নিজের রোজগার না থাকলে পরের মেয়ে ঘাড়ে চাপাতে নেই। এবারে পুজোর সময় গিয়ে ডিপোর হিসেবপত্তর তন্নতন্ন করে দেখলাম। মাকে বলি, এর পরেও আর দেরি কেন করবে? এখানকার বাসায় ধরুন নিত্যিদিন দশ-বারোটি মক্কেলের পাতা পড়ে। আমার তিন ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পড়ছে। এই সব ছেড়ে বড়বউ এক পা কোথাও নড়তে পারে না। গাঁয়ের বাড়ি মা একলা। বয়স হয়েছে, তার উপর ব্লাডপ্রেসার। দিনকে দিন অচল হয়ে পড়ছেন। ছোটবউ এসে সংসারের ভার নিক, মায়ের সেবা-যত্ন করুক।

থামলেন অনিল, সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন একবার। পুনশ্চ বলেন, অঘ্রানে বা মাঘে বিয়ে দেব, দেরি করব না। আপনাদের জানাশোনার মধ্যে ভাল পাত্রী থাকে তো বলবেন। সেকালে ঘটক মশায়েরা যোগাযোগ ঘটাতেন, এখন তো বাতিল তাঁরা সব—

একজনে রসান দিয়ে বললেন, ঘটক এখন খবরের-কাগজ। রোববারে আজকেই নজর দিয়ে দেখুন না—পুরো একখানা পাতার আগাপাস্তলা পাত্র-পাত্রী সংবাদ। পাত্রী সবগুলোই পয়লা নম্বুরি, নিরেস খুঁজতে গেলে পাবেন না। বাবরে বাপ, এত অপ্সরী-কিন্নরীও জন্মাচ্ছে ঘরে ঘরে!

অনিল বললেন, তামাশা নয়—পয়লা নম্বুরি পাত্রী আমরাও চাই। সত্যকার সুন্দরী—

একজনে বলে, সে তো হল। আসলেরও একটু আঁচ দিয়ে দিন সার, শুনে রাখি।

আসলেই এই, সুন্দরী মেয়ে—

লোকটি এবারে বিশদ করে বলছে, খরচপত্র করার ক্ষমতা সকলের তো সমান থাকে না। দাবিদাওয়া কি রকম শুনতে পেলে কোমর বেঁধে খোঁজখবরে লেগে যাই।

মুহুরি গুরুপদ বারান্দার তক্তাপোশে হাতবাক্সর সামনে বসে খস-খস করে একটা জবানবন্দির নকল করে যাচ্ছে। কাজটা জরুরি বলে ছুটির দিনেও এসেছে। কলম তুলে কান খাড়া করে সে কথাবার্তা শুনছে।

অনিল মিত্তির জবাব দিলেন, দাবিদাওয়া এক পয়সাও নয়। ভাই বেচতে যাব তেমন দুরবস্থায় পড়ি নি। পণ নিয়ে বিয়ে দেওয়া, আমি বেচাই বলি। শুধুই শাঁখা-শাড়ি দিয়ে সম্প্রদান—ব্যস।

সমস্বরে সকলে সাধুবাদ করছে। রায়বাহাদুর ভদ্রলোকটিরই বা কোন অভাব মোটরে করে ছেলে-বউ বাড়ি আনার ক্ষমতা তাঁর নিজেরই কি নেই? তবু মেয়েওয়ালার ঘাড় ভেঙে মোটর আদায় করলেন। আর এই উকিলবাবুর প্রস্তাবও শোনা গেল। যার যেমন রুচি-প্রবৃত্তি।

আড্ডা ভেঙে একে দুয়ে সব বিদায় হয়ে গেল। তেলের বাটি হাতে ভৃত্য দেখা

দিল, ছুটির দিনে আচ্ছা করে আজ তেল মাখাবে। গুরুপদর উদ্দেশে অনিল বললেন, ক'টা বাজে হুঁশ আছে মুহুরি মশায়? ছুটির দিনে অত খেটো না—বাড়ি যাও, বউমা আছেন ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের সঙ্গে থাকগে। বেলা হয়েছে, এখান থেকেই চাট্টি খেয়ে যাও বরঞ্চ।

শহর-সীমানার বাইরে মেঠোপাড়ায় কয়েকটা খোড়োঘর তুলে গুরুপদ আছে, সাইকেলে যাতায়াত করে। মেঠোপাড়ার হঠাৎ কপাল খুলে গেছে—নদী বাঁধবন্দি করে ঐ জায়গা থেকে নানান দিকে খাল কাটা হচ্ছে মাঠে মাঠে জলসেচের জন্য। কণ্ট্রাক্টর এঞ্জিনিয়ার কুলিমজুর বিস্তর এসে পড়েছে—পুরোপুরি গ্রাম-জায়গা ঘোর বেগে এখন শহরের চেহারা নিচ্ছে। ভাল ভাল লোকে জমি কিনে বাড়ি তুলছে, জমির দর হু-হু করে বাড়ছে। গুরুপদ মনে মনে নিজের গাল চড়ায়: মাত্র দশ কাঠা না কিনে দশ বিঘে জমি কেন তখন বেড় দিয়ে রাখে নি!

ইজিচেয়ারের উপর চাদর পেতে নিয়ে একটা খাটো কাপড় পরে অনিল গড়িয়ে পড়লেন। তেল মাখানো হচ্ছে। হাতবাক্স ছেড়ে গুরুপদ কাছে এসে দাঁড়াল।

অনিল বললেন, কিছু বলবে?

ছোটবাবুর বিয়ের কথা হচ্ছিল—পাত্রীর খবর আমার কাছে একটা আছে।

বেশ তো, বেশ তো।—

আগ্রহে অনিল কিঞ্চিৎ খাড়া হয়ে উঠলেন।

গুরুপদ বলে, দেবব্রত নন্দী—ফার্স্ট ক্লাস-ফার্স্ট ইরিগেশন-এঞ্জিনিয়ার—পালিত-পালিত-কোম্পানির হয়ে আমাদের পাড়ায় লকগেটের কাজ দেখছে। আত্মীয়ও বটে—আমার এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে ওর বড়বোনের বিয়ে হয়েছিল। সরল স্বভাব, বংজাতি ফেরেব-বাজি টেংডাই-মণ্ডাইয়ের ধার ধারে না।

বলেই যাচ্ছে একটানা। হেসে উঠে অনিল থামিয়ে দিলেন: এঞ্জিনিয়ারে কি হবে মুহুরিমশায়? পাত্র নয়, আমি পাত্রী খুঁজছি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, পাত্রীতেই আসছি। পাত্রী দেবব্রতর ছোট বোন। অত বড় গুণের ভাই—

অনিল কথাটুকু শেষ করে দিলেন: বোনও গুণবতী হবে, সন্দেহ কি। তা হলেও 'আগে দর্শনধারী, পরে তো গুণ বিচারি'। রূপটা আগে, চোখ চেয়ে গোড়ায় যা দেখতে হয়। মেয়ে রূপসী হওয়া চাই।

গুরুপদ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই হবে। রীতিমত রূপসী। দাদার বিয়ের বরযাত্রী গিয়েছিলাম। ভাই-বোন সব ক'টির সুন্দর চেহারা। দেবব্রত সেদিন পাত্রীর ফোটো দেখাল। নজর ফেরে না, কি বলব।

অনিল বললেন, কাল যখন আসবে, ফোটোটা নিয়ে এসো। বড়বউ দেখবে, আরও একজন দু-জনকে দেখাব। চানে যাও এখন, বেলা হয়েছে।

সোমবারে গুরুপদ খামে-ভরা ফোটো এনে দিল। একটা গোলমেলে কেস নিয়ে অনিল খুব ব্যস্ত—জেরায় সাক্ষিদের তুলোধোনা করবেন, আসামি তরফের সঙ্গে আলোচনা করে তারই নোট নিচ্ছিলেন। কাজ থামিয়ে ফোটোর দিকে রইলেন ক্ষণকাল। একবার দূরে সরিয়ে নেন, একবার কাছে নিয়ে আসেন।

বসুন একটু, আমি আসছি—বলে মক্কেলদের বসিয়ে রেখে বাড়ির ভিতর গেলেন। স্ত্রী লক্ষ্মীরাণীর হাতে ফোটো দিয়ে বললেন, দেখ দিকি, ছোট-জা পছন্দ হয় কিনা।

এখন নয়—মাথায় মামলা ঘুরছে এখন, কোর্ট থেকে ফিরে এসে শুনব। দুপুরে এ-বাড়ির ও-বাড়ির আসছেন তো সব, তাঁদেরও দেখিও।

কোর্ট থেকে ফিরে অনিল কিছু সময় বাড়ির ভিতর বসেন। গল্পগাছা করেন স্ত্রীর সঙ্গে, জলখাবর খান, বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে তুলে নাচান। বড় ছেলেটাকে পেলে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞাসা করেন।

লক্ষ্মীরাণী ভর্ৎসনা করেন: ওসব কেন জিজ্ঞাসা করতে যাও বল তো? তোমার ঐ একটু জিজ্ঞাসায় ছেলে বুঝি বিদ্যাসাগর হয়ে যাবে। মাঝে থেকে এই হয়—ইস্কুল থেকে বাড়িতে পা দিয়েই খাই-খাই করে ছেলে আমায় পাগল করে তোলে।

অনিল বললেন, সেই দশটার সময় খেয়ে বেরোয়, ক্ষিধে পেয়ে যায়।

ক্ষিধে না হাতি। ক্ষিধে-তেষ্টা আছে নাকি ছেলের? মুখে কিছু ফেলতে পারলেই মাঠে পড়তে পারে। খেলার টান আছে ঠিকই, তারও বেশি তোমার মুখোমুখি না পড়তে হয়, পড়া জিজ্ঞাসা করতে না পারো। একটু পরেই তো সেরেস্তায় বসে যাবে, তারপর থেকে 'তুমি কার, কে তোমার'—বাড়ির মধ্যে ওদেরই রাজত্ব।

এমনি নানান কথাবার্তা। এই সময়টুকু অনিল মিত্তির উকিল থাকেন না, সংসারের মানুষ। আজকে এসে প্রথম কথা: মেয়ে কেমন দেখলে বল।

লক্ষ্মীরাণী একটু ইতস্তত করে বললেন, সম্বন্ধ নিয়ে আর এগিয়ো না। বাতিল করে দাও।

অনিল আকাশ থেকে পড়েন: বলছ কি। এমন হ্যাক-থু'র মেয়ে—গিয়ে একবার চোখে দেখে আসব, তারও অযোগ্য?

হেসে উঠে পরক্ষণে লঘু করে নিলেন: হিংসে, বুঝতে পেরেছি। ছোটবউ এসে বড়জাকে হারিয়ে দেবে—তাই তুমি বাগড়া দিচ্ছ।

লক্ষ্মীরাণী হাসলেন না। বললেন, ঢলঢলে মিষ্টি মুখ—আদর-কাড়া চাউনি। ছবি দেখেই মায়ায় পড়ে গেছি। এই মেয়ে ঠাকুরপোর হাতে পড়বে, ভাবতে খুব খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যার পর অনিল সেরেস্তায় বসেছেন। গম্ভীর মুখ, কী যেন চিন্তায় আছেন। গুরুপদ জিজ্ঞাসা করবার ভরসা পায় নি, অনিলই শেষটা প্রসঙ্গ তুললেন: দেবব্রতবাবু সময় করে যদি একবার আসেন তো ভাল হয়। আমার যেতে হলে সামনের রবিবারের আগে নয়। অত দেরি করতে চাইনে।

গুরুপদ তটস্থ হয়ে বলে, সে কি কথা! দেবব্রতর বোনের দায়, আসবে তো সে-ই। আপনি কেন যেতে যাবেন?

অনিল বললেন, দায়, তো আমারও—ভাইয়ের দায়। মায়ের শরীরের অবস্থা ইদানীং তাঁকেও বেশ ভাবিয়ে তুলেছে, সলিলকে সংসারী করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। সম্ভব হলে রবিবারে বরঞ্চ সকলে গিয়ে পাত্রী দেখে আসব।

পরের দিন কাছারি-ফেরত অনিল দেখলেন, দেবব্রত এসে বসে রয়েছে। উঠে সে প্রণাম করল। বোনের ফোটো দেখেছেন—ভাই-বোনের মুখের আদল একরকম। কেমন এক জাদু-মাখানো, দেখলে ভাল না বেসে পারা যায় না।

অনিল স্নেহকণ্ঠে বললেন, বসো ভাই, ধড়াচূড়ো ছেড়ে এক্ষুনি আসছি। কতক্ষণ এসেছ, চা-টা দিয়েছে তো?

পা বাড়িয়েই আবার ফিরলেন: এখানেই বা কেন! তুমি ভিতরে চল। দু-জনে

একসঙ্গে চা খাব, চা খেতে খেতে কথাবার্তা হবে।

দেবব্রত বলে, চা-খাবার এই মাত্তর খেয়েছি—

খেয়েছ, বেশ করেছ। আবার খাবে। চায়ের বাটি সামনে না হলে কথাবার্তা জমে না।

অলঙ্ঘ্য আদেশ। একটা হাত অনিল আলতো ভাবে দেবব্রতর কাঁধে রেখেছেন। একরকম গ্রেপ্তার করে বাড়ির ভিতর নিয়ে বসালেন।

তারানাথ নন্দী রেলে কাজ করতেন। শেষ কয়েকটা বছর পদোন্নতি হয়ে স্টেশন-মাস্টার হয়েছিলেন। চার মেয়ে, এক ছেলে। চাকরি-সূত্রে চিরকাল বারোঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছেন, তার ভিতরেও উপরের তিন মেয়ে পাত্রস্থ করে গেছেন। তিন মেয়ের পর ছেলে—এই দেবব্রত। তারপরে সর্বশেষ সন্তান আরও এক মেয়ে—মন্দিরা। মন্দিরার বিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি—চাড়ও ছিল না। চাকরিস্থল তখন বারাণসী, ছেলে-মেয়ে দুটিতেই জোর পড়াশুনো করছিল। হঠাৎ তারানাথকে স্টেশন-মাস্টার করে এক গেঁয়ো স্টেশনে পাঠাল। সব ব্যবস্থা ওলটপালট। দেবব্রত এঞ্জিনিয়ারিং-হস্টেলে আছে—আবার মন্দিরাকেও হস্টেলে রাখবেন, এত পয়সা কোথায়? মেয়ের পড়াশুনোর ইস্তফা অগত্যা। বিয়ে দেবার জন্য তারানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু সেই ধাপধাড়া জায়গায় কোন সম্বন্ধ এগোয় না। লম্বা ছুটির জন্য দরখাস্ত দিলেন—কলকাতায় গিয়ে দেখে-শুনে বিয়ে দিয়ে আসবেন, বড় ও মেজ মেয়ের বেলা যেমন হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই যমরাজ নিয়ে নিলেন তাঁকে। শেষ-রাতে কলেরা, ডাক্তার অভাবে চিকিৎসাই হল না—সন্ধ্যা না হতেই শেষ। টেলিগ্রাম পেয়ে দেবব্রত ডাক্তার নিয়ে পেঁছিল, তার ঘণ্টা চারেক আগে রোগি মারা গেছেন। তারানাথ ছেলের হাতের আগুনটা পেলেন, এই পর্যন্ত।

দেবব্রত বলল, আমাদের বাড়ি এই মহকুমার ভিতরেই—দশঘরা গ্রাম।

অনিল ঘাড় নাড়লেন: জানি জায়গাটা। ওখানকার মক্কেলের কাজও করেছি।

দেবব্রত বলছে, পৈতৃক ভিটে আর সামান্য জমিজমা আছে। জ্ঞাতি-খুড়ো ভোগ-দখল করছিলেন। ছিল ভাগ্যিস, তাই এসে আশ্রয় নিতে পেরেছি।

কথার মাঝে অনিল উঠে পড়লেন: আসছি, এক মিনিট।

ফোটো হাতে করে ফিরলেন। বলেন, ভাই তো এখানে থাকে না—তার ছবি। নিয়ে গিয়ে দেখগে তোমরা সকলে। পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার তোমাদেরও আছে। অসুবিধা না হলে সামনের রবিবারে দশঘরা গিয়ে মেয়ে দেখে আসতে পারি। রবিবার ছাড়া আমার সময় নেই। এ রবিবার না হলে আবার সেই পরের রবিবার। সাত-সাতটা দিন দেরি, সে আমি চাইনে।

চমক খেয়ে দেবব্রত বলে, আপনি যাবেন?

পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থ—শহুরে চালচলন আমরা পারিনে। মরে গেলেও ভাই নিজের পাত্রী দেখতে যাবে না। আমি ছাড়া তবে কে যায়?

দেবব্রত বলে, হুকুম করলে মেঠোপাড়ায় গুরুদা'র বাড়িতে বোনকে নিয়ে আসতে পারি। গুরুদা বলেছেনও তাই।

ব্যাপার কি হে, অত আপত্তি কিসের?

অনিল মিত্তির হো-হো করে হেসে উঠলেন: আপত্তি শোনাশুনি নেই। যাব আমি—মায়ের চাট্টি প্রসাদও পেয়ে আসব। আর প্রজাপতির নির্বন্ধ যদি থাকে, তোমার

বোন সারাসরি আমাদের বাড়িতেই উঠবে—অন্য বাড়ি কেন যেতে যাবে ?

সামান্য একটু কথা উঠেছে, পাত্র-পাত্রী থাকলেই ওঠে এমন। দেবব্রত ভাবতেই পারছে না, এই দরের মানুষ ঠ্যাং-ঠ্যাং করতে করতে চলে যাবেন জঙ্গল ও বাঁশবনে ভরা তাদের দশঘরা অবধি, গিয়ে বসবেন খোড়োচালের নিচে দাওয়ার ভাঙা-তক্তপোশে।

মিনমিন করে সে আবার বলে, স্টেশন থেকে চার মাইল আমাদের গ্রাম। ধান কাটার মরশুমে এখন পালকি-বেহারা জোটানো যাবে না। কাঁধে করে মানুষ বইবে না—এমন একটা কথাও খুব চলছে বেহারাপাড়ায়। রাস্তা এমন যে গরুর-গাড়িতেও গা-গতর ব্যথা—

যাবেনই অনিল। বলেন, পালকি গরুর-গাড়ি নয়, হেঁটেই যাব। ভয় দেখাচ্ছ কিসের হে—আমিও গাঁয়ের মানুষ। শহরে উকিলবাবু হয়ে আছি—পা দুটো তা-বলে খোঁড়া হয়ে যায় নি।

কথাবার্তা লক্ষ্মীরাণী সব শুনেছেন। বললেন, হবে না, মিথ্যে যাওয়া। তারা খোঁজখবর নেবে না ভেবেছ ?

দেখা যাক।

রাগে গরগর করতে করতে লক্ষ্মীরাণী বলেন, এ বিয়ে না দিয়ে মেয়ের হাত-পা বেঁধে যেন জলে ছুঁড়ে দেয়।

ছোট্ট মানুষটি গিরিবালা, ঘরসংসার নিয়ে থাকতেন। স্বামীর মৃত্যুতে সেই মানুষ কেমন যেন হয়ে গেছেন। কেউ তাঁর হাসিমুখ দেখে নি তারপরে। সোমত্ত মেয়ে ঘাড়ের উপর, ভাবতে গিয়ে থই পান না। ছেলে পড়াশুনোয় যত ভালই হোক, সাংসারিক ব্যাপারে নিতান্ত আনাড়ি। বড় মেয়ে অকালে বিধবা হয়ে পড়ে রয়েছে—একটা সুব্যবস্থা করার জন্য তারানাথ আঁকুপাকু করতেন, কিন্তু পরমায়ুতে বেড় পেল না। যত ভাবেন, চোখে অন্ধকার দেখেন গিরিবালা।

বাপের মৃত্যুর পর মন্দিরাও ভিন্ন এক রকম—হঠাৎ যেন গিন্নিবান্নি হয়ে উঠেছে। এমন করে সে মাকে নিয়ে—

গিরিবালা বলেন, একফোঁটা মেয়ে যেন আমি, কিছু জানিনে, কিছু বুঝিনে। কথায় কথায় চোখ পাকিয়ে উঠিস।

মেয়েই তো তুমি। কে মা কে মেয়ে, পাশাপাশি দাঁড়াই—অজানা কেউ এসে তোমাকেই মেয়ে বলবে, আমায় মা।

গিরিবালার চোখে ঘুম নেই। মেয়েও দেখি একঘুমের পর উঠে পড়েছে।

ঘুম আসছে না বুঝি ?

গিরিবালা সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিঃসাড়।

মন্দিরা বলে, চালাকি বুঝি আমি। রাজ্যের ভাবনা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে পাক খাওয়াচ্ছ, আসবে কি করে ঘুম ? ঘাপটি মেরে থাকলে ছাড়ব না—ঘুমোও তুমি।

মেয়ে উঠে বিছানায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মায়ের মাথা কোলের উপর তুলে নেয়। তালপাতার পাখা নিয়ে বাতাস করছে। গুণ গুণিয়ে গানও করে : ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুমলে-গাছের পাতা—

তারানাথের খুড়তুত ভাই শ্রীনাথ, এক বাস্তুজমির উপর বসতি। বৈষয়িক মানুষ

তিনি, দস্তুরমতো ভাল অবস্থা। রংটা খুব ফর্সা বলে শ্রীনাথের বউকে সকলে রাঙাবউ বলে। দুই জায়ে বেশ ভাবসাব জমেছে। রাঙাবউয়ের কাছে গিরিবালা মেয়ের গল্প করছেন। বলেন, অবস্থা বোঝ আমার। মেয়ে বসে রইল, হেরিকেন জ্বলছে পিট-পিট করে। পাখা করে করে হাত ব্যথা হয়ে গেল মেয়ের। মড়া হয়ে পড়ে আছি—তবু ছাড়ে নাকি! শয়তান মেয়ে নিচু হয়ে ঠাহর করে দেখে, চোখ মিটমিট করছি না সত্যি সত্যি ঘুমিয়েছি। ছোটবয়সে পুতুল খেলত, আমাকেও তেমনি এক পুতুল বানিয়ে নিয়েছে।

রাঙাবউ এক মুহূর্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোল-মোছা মেয়ে চলে গেলে তোমার বড় কষ্ট হবে বউ।

সে ভাবলে তো হবে না। যে হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছে, যেতেই হবে সেখানে। কোথায় সে ঘর, হদিস হচ্ছে না। ঐ আমার একফোঁটা দেবু, সংসারের কিছু জানে না বোঝে না, যত চাপ তার ঘাড়ের উপরে। মেয়েটার গতি না হওয়া অবধি ঝেড়ে-কেটে সে-ও তো বেরুতে পারছে না কোথাও।

খপ করে রাঙাবউয়ের হাত জড়িয়ে ধরলেন: ঠাকুরপোকে তুমি ভাই বলো একটু ভাল করে। উনি না লাগলে হবে না।

গোড়ায় ভেবেছিল, দেবব্রত নিজেই অনিলদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। সেই মতো ডাকে চিঠি ছেড়ে দিল। কিন্তু চিঠির উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না বোধহয়, চিঠি ঠিক মতো না-ও পেঁছুতে পারে। শনিবারটা ছুটি নিয়ে একদিন আগেই সে দশঘরায় গিয়ে হাজির। কাল আবার স্টেশন অবধি গিয়ে ওদের সব অভ্যর্থনা করে আনবে।

অনিল মিত্তির হেন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আসছেন, শুনে শ্রীনাথ তাজ্জব: কী জানি বাপু, আমার তো বিশ্বাস হয় না। বড়লোকের ঝোঁক হল, মুখের কথায় মহানুভবতা শুনিয়ে দিলেন। ট্রেন এসে পেঁছিলে দেখবে ভোঁ-ভোঁ। ফৌজদারি উকিল, মিথ্যে-কথা ওদের ডাল-ভাতের সামিল। ছেলেমানুষ তুমি, উকিলের কথা বেদবাক্য বলে ধরে নিয়েছ।

উঠানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা। মালতী বলে উঠল, তাই ভেবে হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকা তো যায় না। তিন-চার জনে আসবেন—খাবেন এখানে, নিজমুখে বলে দিয়েছেন। হাটঘাট করতে হবে, দেবু সেইজন্য একদিন আগে চলে এলো।

শ্রীনাথ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন: তা বেশ করেছে। এসে পড়লে তখনকার উপায় কি? হাটে সকাল সকাল যাক দেবু, ভাল মাছ-শাক পরে আর থাকে না।

ঐ হাটেরই প্রয়োজনে টাকাপয়সা বের করতে দেবব্রত ঘরে ঢুকেছে—ঢুকে মন্দার মুখোমুখি পড়ল! বাহাদুরি দেখিয়ে বলে, কত বড় সম্বন্ধ, শুনেছিস?

খুশি হবে কি, উল্টে মন্দিরা কোমর বেঁধে ঝগড়া করে: সম্বন্ধ কেন আনিস বল তো। সেই আবার গালিগালাজ, কান্নাকাটি—আমার ভাল লাগে না।

একটু হাসির ভাব করল: করিস নিজের গরজে—আমায় তাড়িয়ে বের করে তারপর নিজের বউ আনবি। ঐ পণ রাখতে গেলে কোন দিন তোকে আর কলকাতায় যেতে হবে না।

এই বারে দেখিস। উদার মানুষ, বাজে কুসংস্কারের ধার ধারেন না। ভাংচি দিয়ে তাঁকে টলানো যাবে না।

শ্রীনাথ বলছেন, বাইরের সব আসছেন, হেজিপেজি কেউ নন—ওঠা-বসা কোথায় হবে, ভেবেছিস তোরা কিছু? বলছিলাম, আমার বৈঠকখানায় ব্যবস্থা করলে কেমন হয়।

দেবব্রত বেরিয়ে এসে বলল, আমিও তাই ভাবতে ভাবতে এসেছি, বড়কাকাকে বলতে হবে।

শ্রীনাথ লুফে নিয়ে বললেন, বলবার কি আছে? বলি দায়িত্ব কি আমারও নয়? দশঘরার নন্দীবাড়ি বলতে আমিও তার মধ্যে পড়ি।

মালতী মুখ আড়াল করে বাঁকাহাসি হাসছে।

শ্রীনাথ বললেন, তারানাথ-দা আর আমি প্রায় একবয়সি, একই সঙ্গে মানুষ। চাকরি নিয়ে সে বাইরে কাটিয়ে গেল। গাঁয়ের জমিজমা দেখাশুনো করে খাজনা-কড়ি দিয়ে আমিই ষোল-আনা বজায় রেখেছি। কেউ বলতে যায় নি, দায়িত্ব বুঝে নিজেই করেছি। বলি, বাস্তুভিটেয় আসতেই তো হবে একদিন—বেহাত হয়ে গেলে তখনকার উপায় কি?

দেবব্রত গদগদ হয়ে বলে, আপনি বড়কাকা বিস্তর করেছেন। এই সম্বন্ধে যাতে লেগে যায়, আপনাকেই চেষ্টাচরিত্র করতে হবে।

মালতি ভ্রূকুটি করছিল। শ্রীনাথ চলে গেলে বলল, অত খোশামুদি কিসের জন্যে রে? তেল-সিঁদুর যতই দিস, ভবী ভোলাতে পারবি নে।

দেবব্রত বলে, উপকার যা পেয়েছি সে তো ভোলবার নয়। জমাজমি ভিটেবাড়ি ওঁর কেনা ছিল বলেই ফেরত পেয়ে গেলাম। অন্য কারো হলে পথে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না।

তিক্তকণ্ঠে মালতী বলল, খাজনা বাকি ফেলে নিলাম করিয়ে সমস্ত গ্রাস করেছিলেন। সুচগ্র জমি দেবো না, ক্ষমতা থাকে মামলা করোগে—মুখের উপর বলেছিলেন ঐ মানুষ।

সেই মানুষই আবার নিজের ইচ্ছেয় সমস্ত লিখেপড়ে দিলেন—

নিজের ইচ্ছে নয়, গুঁতো খেয়ে তবে দিতে হল।

রাঙাবউ হন্তদন্ত হয়ে আসছেন দেখে চুপ। দেবব্রত হাটের থলিটা তুলে নিল।

হাত নেড়ে রাঙাবউ নিরস্ত করেন: হাটের কি গরজ দেবু? ভাই-বোনে গল্প করছিলে, তাই করো বসে। শুধুমাত্র কুটুম্বরা খাবেন সে কেমন করে হয়, সবাই তোমরা কাল আমাদের ওখানে খাবে। বলতে এসে সেই আসল কথাটাই উনি বাদ দিয়ে গেছেন। তাই আমায় পাঠালেন: ছুটে যাও—দেবু হাটে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার আগে। কাল তোমাদের উনুনে আগুন পড়বে না। দিদির নিরামিষ রান্নাটাও আগেভাগে সেরে আলগোছে আমি তোমাদের ঘরে রেখে যাব।

মুখফোড় মালতী না বলে আর পারল না: কি বলছ রাঙাকাকি। রাঁধাবাড়া আমাদের বাড়িতেই তো। খাওয়াটুকু কেবল তোমাদের দরদালানে বসে।

সে কি রে?

অবাক হয়ে রাঙাবউ বললেন, আমাদের বুঝি রান্নাঘর নেই—রেঁধেবেড়ে খাইনে আমরা?

কী জানি, বড়কাকা তাই বলে গেলেন। রান্না করে তোমাদের ওখানে পাঠাব, বাটি থালা যা লাগে সেগুলো তোমরা দেবে।

রাঙাবউ রাগ করে উঠলেন: তাই বলেছেন বুঝি? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরে,

এক কথা বলতে অন্য কথা বলে বসেন। ঐ মানুষই আবার বাড়ি গিয়ে আমায় বললেন, শুধু কুটুম্ব খাবে সে কেমন কথা। সবসুদ্ধ খাবে, বলে এসোগে। তাড়িয়ে পাঠালেন, দিশা করতে দেন না।

মালতীকে ধমকে উঠলেন: তোমরাই বা কেমন। কী করে ভাবতে পারলে, বাড়িতে কুটুম্ব খাবেন—ভাত পাঠাতে হবে এই বাড়ি থেকে। এত নিরন্ন আমরা?

দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় গিরিবালা। এদের ছেড়ে রাঙাবউ তাঁর কাছে চললেন।

মালতী বলে, এই এঁরই পুণ্যের জোরে বড়কাকার উন্নতি। সেই যে হঠাৎ বড়কাকার সুমতি হয়েছিল, নিজে উদ্যোগী হয়ে মুক্তিপত্র রেজেস্ট্রি করে জমাজমি দিয়ে দিলেন, মূলে রাঙাকাকিমা। কাঠ-কাঠ উপোস দিয়ে পড়ে রইলেন: হয় দেবে, নয় তো মরব আমি। চারদিন এই অবস্থায় গেল, তারপরে বড়কাকা নরম হলেন। প্যাঁচ তখনও ছাড়েন নি: এ যাবৎ খাজনা-কড়ি দিয়ে এসেছি, সেটা ওরা দিয়ে দিক। রাঙাকাকিমা তা-ও হতে দিলেন না। খাজনা যেমন দিয়েছ, জমির ফসলও তেমনি খেয়ে এসেছ। এক পয়সাও দেবে না ওরা।

দেবব্রত অবাক হয়ে শুনছিল। বলে এতসব তো শুনি নি। তুমি জানলে কি করে দিদি?

মালতী বলে, বড়কাকার যেটুকু ভাল কাজকর্ম, নির্ঘাত জানবি, সেটা রাঙাকাকিমার। কিন্তু করবেন বড়কাকার বেনামিতে। নিজে কিছু নন, স্বামীই দাতা দয়ালু সদাশয়, সকলের কাছে জাহির করে বেড়ান। এ-ঘর আর ও-ঘর বলে আমার চোখে ফাঁকি পড়ে না।

একটু থেমে জোর দিয়ে বলল, আমাদের কুটুম্ব নিজের বাড়ি নিয়ে খাওয়ানো, এরও মূলে কাকিমা। বড়কাকা নিজের ইচ্ছেয় করেন নি, সে মানুষই নন উনি।

দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় ডান-পা ছড়িয়ে গিরিবালা সলতে পাকাচ্ছেন। সন্ধ্যা আসন্ন, সন্ধ্যা দিতে হবে তার আয়োজন। রাঙাবউ হাসতে হাসতে গিয়ে ছাঁচতলায় দাঁড়ালেন।

দেবুকে বড় যে তাচ্ছিল্য করতে দিদি। সম্বন্ধ যা জুটিয়েছে, এমনটি তপস্যা করে মেলে না।

গিরিবালা নিরুৎসুক ভাবে বললেন, না আঁচালে বিশ্বাস নেই রে বউ।

মেয়েটা সুশ্রী বলে সম্বন্ধ নিজে থেকেই কয়েকটা এসেছিল। এই দশঘরায় আসার পরেও দুই জায়গা থেকে। কথাবার্তা পাকাপাকি হতে যায়, হঠাৎ রহস্যজনক ভাবে পাত্রপক্ষ পিছিয়ে পড়ল। এক জায়গায় বলল, ছেলে এখন বিয়ে করবে না। আর এক জায়গায়: পাত্র-পাত্রীর গণে মেলেনি।

সম্বন্ধ ভেঙে যায়, আর গিরিবালা কেঁদে ভাসান। যত রাগ মেয়ের উপর ঝাড়েন: তোর অদৃষ্টে বিয়ে নেই, চিরকাল আইবুড় থাকতে হবে। দেবুটাও সঙ্গে সঙ্গে।

মন্দিরা একদিন বলেছিল, থাকলামই না হয় আইবুড়। তিন জামাই তো এনে দেখলে—জামাইয়ের সাধ মিটল না তোমার।

আর যাবে কোথা! গিরিবালার চোখে-মুখে যেন আগুন খেলে যায়। চিৎকার করে উঠলেন: বল্ তাই, গলা ফাটিয়ে বল্। ঢাক পেটা, ধর্ম দেখ্ দিদিদের পোড়াকপাল নিয়ে। নিজের লোকে ছাড়ে না তো কোটনাদের দোষ কি। তারা তো ভাংচি দেবেই।

দু-দুটো সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার দুঃখ গিরিবালা মনে পুষে রেখেছেন—রাঙাবউর জবাবে তা-ই তুললেন : ভাল সম্বন্ধ এর আগেও তো এসেছিল বউ—

রাঙাবউ ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, তারা এর পায়ের নখের যুগ্যি নয়। সদরের সব ক'টি উকিল-মোক্তার ও'র তো জানা—অনিল উকিলের কথায় পঞ্চমুখ, নাকি দু-হাতে রোজগার। ছেলে নিজেও ভাল ব্যবসা ফে'দে ফেলেছে। আর বাড়ির অবস্থা যা শুনলাম, কাজ-কর্ম কিছুই না করে পায়ের উপর পা রেখে তিনপুরুষ স্বচ্ছন্দে খেয়ে যেতে পারবে।

ক্লান্ত কণ্ঠে গিরিবালা বললেন, তাই আমার একটুও ভরসা হচ্ছে না। বট্‌ঠাকুরপো পাকালোক, তাঁরও হচ্ছে না। খেয়ালের বসে বড়মানুষ লম্বা বচন ছেড়েছে। হতে পারে এই কখনো? গল্পেই কেবল শোনা যায়।

উনি বুঝি বলে গেছেন?

রাঙাবউর মুখ কঠিন হল, কিন্তু কণ্ঠস্বর মোলায়েম। বললেন, পাটোয়ারি মানুষ—ভাল কিছু ও'দের বিশ্বাসে আসে না। বেশ তো, রাত পোহালেই কালকের দিন, দেখা যাক—আসেন কিনা ও'রা, মেয়ে দেখেই বা কী বলেন।

॥ তিন ॥

মন্দিরারা চার বোন। বড় তিনটির বিয়ে হয়ে গেছে, তারানাথ জীবিত থাকতে চেষ্টাচরিত্র ও সাধ্যাতীত খরচা করেছিলেন তিনি, কিন্তু কোন বিয়ে সুখের হয়নি। তিন বোনেরই এক দশা—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। শেষের দিকে তারানাথের মুখে হাসি ছিল না, খেতে হয় তাই দু-চার দলা মুখে দিয়ে উঠে পড়তেন মেয়েদের অবস্থা ভেবে। গিরিবালাকে একদিন বলেছিলেন, সোনা-মুঠো ধরলে ওদের কপালে ছাই-মুঠো হয়ে যায়। তোমারই গর্ভের দোষ। নইলে তিনটেরই ছকে-ফেলা এক রকম দশা হয় কি করে?

গিরিবালারও চোখের জল শুকায় না।

মালতী বড় মেয়ে। বিস্তর দেখে শুনে, সরমঙ্গল মজুমদারবাড়ির ছেলে অনুপমের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। গুরুপদ এরই কথা বলছিল—সম্পর্কে অনুপমের সে ভাই হয়। হীরের টুকরো জামাই—যেমন দেখতেশুনতে, তেমনি লেখাপড়ায়। ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। বিনয়ী সৎস্বভাব। স্বভাবই শেষটা কাল হয়ে দাঁড়াল। ফেরেব্বাজি জানে না, একটা মিথ্যেকথা বলতেই তিনবার ঢোক গেলে, অতিশয় সাদা মন। তোমার সঙ্গে আজকেই ধরো প্রথম পরিচয়—আধঘণ্টার মধ্যে মনের কথা সমস্ত বলে-কয়ে খালাস, রাখ-ঢাক কিছু নেই। চাকরির সন্ধান পেলেই দরখাস্ত দেয়—ফল কিছু হয় না, স্ট্যাম্পখরচা গুণাগার। বাপ জিজ্ঞাসা করেন : কাকে ধরলে কি হবে, খোঁজখবর নিয়েছ কিছু? অনুপম ঘাড় নেড়ে দেয় : না তো।—মুখ ভেঙচে বাপ বলেন, না তো—চাকরি তোমার আকাশ থেকে পড়বে, ঝাঁকায় ভরে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে?

অবোধ দৃষ্টি মেলে অনুপম শুধায় : কি করব তা হলে?

ধরাধরি, তদ্বির-তদারক—সকলে যা করে থাকে।

খি'চুনি খেয়ে অনুপমের কিঞ্চিৎ ক্রোধ হয়ে থাকবে। দরখাস্তের একটা ছাপা-ফরম এনে ধরল : পড়ে দেখ। ক্যানভ্যাসিং স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড—মাথায় উপস বড় করে ছেপে দিয়েছে।

ছেপে দিয়েছে, তোমার মতন পাশ করা গাছমুখ্যু দু-একটা আছে, তাদের জন্য ও মনে করিয়ে দিচ্ছে, ক্যানভ্যাসিং নামে বস্তু আছে, সেটা অতিঅবশ্য চাই।

বছর ছয়েক অনুপম একাদিক্রমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, গাঁথে না চাকরি। রোজগারে এলো না, তেমন বিদ্যে নিয়ে ধুয়ে খাবে নাকি? অনুপম আস্ত একটা গাড়োল, ধরে নিয়েছে এখন সবাই। মালতীও। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে মালতীকে এসে বলে, চারটে পয়সা দাও দিকি, এক কাপ চা খেয়ে আসি। চায়ের চারটে পয়সা জোটানোরও মুরোদ নেই, স্ত্রীর কাছে হাত পাততে হয়। সে স্ত্রী যেন পয়সার গাছ—সে-ই যেন আপিসে চাকরি-বাকরি করে। অহরহ সকলের কাছে খোঁটা খেতে খেতে মালতীরও বিতৃষ্ণা—মুখ ফিরিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাবে সে একটা আনি ছুঁড়ে দেয়। অনুপমের দৃক্‌পাত নেই—কুড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে সে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু সামান্য ব্যাপারে একদিন চরম হয়ে গেল। নতুন ঠিকরি-কলাই উঠেছে। অনুপম সাধ করে বলেছিল, ভাজা-ঠিকরির ডাল আমি বড় ভাল খাই। মা মারা যাবার পরে তেমনটি আর খেলাম না। রেঁধো দিকি আজকে। অসুবিধা ছিল না, ঠিকরি-কলাই ঘরেই আছে। এমনিই হয়তো ঐ ডাল রাঁধত, কিন্তু ফরমাশ পেয়ে মালতী বিগড়ে গেল। রাঁধল সে মসুরির ডাল। অনুপমের ফিরতে সেদিন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা, মালতীরও। যারা কাজে বেরুনোর বেরিয়ে গেছে, অন্যেরা গড়াচ্ছে। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অনুপম নিজেই পিঁড়ি পেতে নিল, ভাত-ব্যঞ্জন ঢাকা ছিল, মালতী উঠে এসে সামনে এনে দিল।

আজ অনুপমের কী হয়েছে—খেতে গিয়ে সর্বাগ্রে ডালের বাটি তুলে ঠাহর করে দেখে: কি ডাল রেঁধেছ?

দেখ? চোখ আছে তো দুটো।

শান্ত গোবেচারা মানুষটা—যা কোনদিন করে না, চোখ পাকিয়ে স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ চায়: ঠিকরির-ডালের কথা বলেছিলাম—কেন রাঁধোনি?

সমান সুরে মালতী জবাব দিল: আমি পারব না। দাসী-বাঁদী যারা আছে তাদের দিয়ে রাঁধাওগে।

তড়াক করে অনুপম অমনি উঠে পড়ল। অভিনব—কোনদিন সে এমন করে না। বলল, খাবো না আমি।

মালতী বলে, না খেলে তো বয়ে গেল। নিগুর্ণ পুরুষের অত নোলা কেন? জিভ-জোড়া পেড়ে কেটে ফেলতে পারো না?

না খেয়ে চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ফট-ফট করে অনুপম ঘরে ঢুকে গেল।

বয়ে গেছে, বয়ে গেছে! বাড়ির সকলের কাছে ভারবোঝা হয়ে পড়েছে স্বামী-স্ত্রী তারা দুজন। বুড়োকর্তা নিতান্ত মাথার উপরে বর্তমান, প্রকাশ্য ঝগড়া-ঝাটি তেমন একটা হতে পারে না। কিন্তু চালচলনে কথাবার্তায় প্রতিক্ষণ হুল ফোটায়। বেহায়া বেলাজ মানুষটা তা বুঝবে না। বুঝলে, এত লোকের হচ্ছে—এদ্দিনের মধ্যে সামান্য কিছুও কি জোটাতে পারত না!

ও-মানুষের উপর কোন মমতা নেই—হওয়া উচিত নয়। ঘুমন্ত বড়জায়ের ঘরে ঢুকে মালতীও মেজের উপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ অনুপম ঘরে ছিল, কখন বেরিয়ে গেছে, কেউ জানে না। রাত্রে বাড়ি এলো না, পরের দিনও না। তার পরের দিন দুপুর নাগাত একটা খামের চিঠি এলো মালতীর নামে, হাতের লেখা অনুপমের। কারো নজরে পড়বার আগে ঘরের খিল

এঁটে মালতী খাম খুলল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলরব, কান্নাকাটি—অনুপমের মরা-দেহ দীঘিতে ভেসে উঠেছে। চাকরি খোঁজার দায় থেকে নিষ্কৃতি এতদিনে।

অবাক কাণ্ড। শতেক লাঞ্ছনা নিত্যদিন হেসে উড়িয়ে দেয়, সেই মানুষ তুচ্ছ ঠিকরি-ডালের জন্য প্রাণ দিয়ে বসল। ঝোঁকের মাথায় করেছে, তা-ও নয়। ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় সতর্ক আয়োজন—মৃত্যু কোন রকমে ফসকাতে না পারে। সাঁতার জানে না অনুপম, তবু ভরসা করতে পারে নি। শেষ সময়টা প্রাণের জন্য আঁকুপাকু করতে করতে দৈবাৎ যদি ডাঙায় উঠে যায়। যতগুলো ধুতি ছিল, একটার পর একটা পরে নিয়েছে। জামাও অমনি একের উপর এক। গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে গিঁট দিয়েছে, মোজা পরেছে, জুতো পায়ে দিয়েছে। দেহটা যতদূর ভারী করে নেওয়া যায়—জলে ভিজে এর পরে ঐ ভার চতুর্গুণ বেড়ে যাবে, পাতাল মুখো টানবে, ভেসে উঠে দম ফেলতে দেবে না। এতদূর বিচার-বিবেচনা। দীঘির এক দিকে ঘন জঙ্গল, কেয়ার ঝাড়—মৃত্যুর সাজসজ্জা ঐখানে সমাপন করেছে নিশ্চয়। উদ্ভট সজ্জায় বাড়ি থেকে বেরুলে কারো না কারো নজরে পড়ে যেত। দুটো চিঠিও লিখে গেছে—এক চিঠি মালতীকে, কী লিখেছিল সংসারের মধ্যে একমাত্র সে-ই কেবল জেনে রইল। আর এক দীর্ঘ চিঠি পাওয়া গেল মৃতের জামার পকেটে—ভিজে-জবজবে হয়ে কালি লেপটে গেছে, একবর্ণ পাঠোদ্ধার হল না।

শবদেহ ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের সব অপরাধের মার্জনা হয়ে গেল। দরদ উথলে উঠল সকলের। বুড়ো শ্বশুর চোখ কটমট করেন মালতীর দিকে। জায়েরা অন্তরালে বলাবলি করে। শেষটা পাড়ার মানুষও বলতে লাগল। অমন শিক্ষিত গুণবান ছেলে চিরকাল কি আর বসে থাকত। বলি, পেটে না খেয়ে তো ছিলে না! অহরহ খিটিমিটি কত আর সহ্য করবে—কলা দেখিয়ে চলে গেল। দোষ শুধুমাত্র যেন মালতীর। চোখে জল দেখলে বলবে ঢং। বলবে, ও-ই তো মেরে ফেলল—এখন মায়াকান্না কাঁদছে দেখ।

ছুটি নিয়ে তারানাথ এসে পড়লেন। অবস্থা বুঝে মেয়ে নিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, এ পোড়া-সংসারে আর তুই আসিসনে মা। একমুঠো অন্ন দেবুর জোটে তো তোরও জুটবে।

মালতী সেই বাপের বাড়ি এসে উঠল। তারপর বাপ মারা গেলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে মা-ও হঠাৎ যেন বুড়ি হয়ে পড়েছেন। সংসার দেখাশুনোর ভার বেশ খানিকটা মালতীর উপরে এখন।

মালতীর পরে মাধবী। তার বিয়েও তারানাথ ভাল ছেলের সঙ্গে দিয়েছিলেন। এবং তারও কপালপোড়া। খুব একটা ভাল স্টেশনে তারানাথ ছিলেন তখন—ভাল স্টেশন মানে উপরি-রোজগার যেখানে ভাল। বিয়েয় প্রচুর খরচপত্র করেছিলেন। জামাই মানস-কুমারের সরকারি চাকরি। দেশ ভাগ হয়ে দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে, তাদের পুনর্বাসন-দপ্তরে ইতিমধ্যেই মানস কেষ্ট-বিষ্টু একজন। কর্মদক্ষ রীতিমত, এবং উপরওয়ালার খোশামুদিতেও দড়। উভয় গুণের সমন্বয়ে তরতর করে সে উপরে উঠে যাচ্ছে—উপর থেকে আরও উপরে, একেবারে সর্বোচ্চ চূড়োর চূড়ামণি হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। কিন্তু ধপ করে ভূতলে-পতন। এক উদ্বাস্তু যুবতী মা হয়েছে—পিতৃত্বের দায় মানসের উপর চাপিয়ে মেয়েটা মামলা জুড়ে দিল। কী লজ্জা, কী লজ্জা! মানস বলে, ষড়যন্ত্র। দ্রুত উন্নতি অন্যদের চক্ষুশূল হয়েছে, তারাই সব পিছনে

থেকে করাচ্ছে। অফিসের সহকর্মী নিতান্ত ঘনিষ্ঠ কারো কারো নাম এই সম্পর্কে শোনা যাচ্ছে। অসম্ভব নয়। ফরিয়াদি-পক্ষে ব্যারিস্টার অবধি দাঁড় করিয়েছে—একটা নিরন্ন মেয়ের নিজের ক্ষমতায় এতদূর হতে পারে না। মানসও সর্বস্ব পণ করে লাগল। গা-ভরা গয়না ছিল মাধবীর—একখানা একখানা করে সমস্ত গেল। ভি. আই. পি. রোডে পাঁচ কাঠার একটা প্লট কিনেছিল, তা-ও গেল। সর্বস্ব গিয়েও শেষরক্ষা হল না—পাঁচ বছরের জেল।

তারানাথ চলে এসেছেন। বাপকে দেখিয়ে দেখিয়ে মাধবী হাতের শাঁখা ভাঙল। বলে, সোনাদানা সমস্ত গেছে, শাঁখাই বা কেন আর? ঘেন্না করে পরে থাকতে। সিঁথির সিঁদুরও মুছে ফেলল। বলে, বিধবা আমি—দিদির মতন। আমি বেশি হতভাগী। বড় জামাই তোমার মারা গেছে, মেজো জামাই বেঁচে থেকে কলঙ্কে মুখ পুড়িয়েছে—একলা নিজের নয়—আমার, অবোধ বাচ্চা-ছেলেটারও।

বাপের সঙ্গে কিছুতে গেল না সে, ছেলে নিয়ে পড়ে রইল। তারানাথ বললেন, শহরে-বাজারে তো কম খরচ নয়—চালাবি কেমন করে?

তিন টাকা ভাড়ায় বস্তির ঘর দেখে রেখেছি, সেখানে গিয়ে উঠব। কিছু না জোটে তো কাগজের ঠোঙা বানাব। কালামুখ আমি লোকের মাঝে কেমন করে দেখাব বাবা।

বলে মাধবী হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়ল।

তারানাথ ফিরে গেলেন। ভাবলেন, দু-মাস চার-মাস বাদে যৎসামান্য সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবে, গোঁ থাকবে না আর এমন, মেজাজ জুড়োবে।

বছর কেটে গেল—মালতী বস্তির ঘরে যায় নি, আগের ফ্লাটেই আছে। নানান কথা কানে আসে। খালি-হাত দুটোয় নাকি সোনা উঠেছে। ভানু সরকার মানসের ঠিক নিচে ডেপুটি-অফিসার ছিল—এদের সঙ্গে বরাবরকার দহরম-মহরম। মানসকে সে দাদা বলত, মাধবীকে বউদি। এখন ভানু রিহ্যাবিলিটেশন-অফিসার মানসের জায়গায়। মাধবীর সংসার সে-ই দেখছে। এবং আরও বিশ্রী ব্যাপার—পেয়িং-গেস্ট হয়ে ঐ ফ্লাটেই নাকি সে আস্তানা নিয়েছে। শোনা কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না—কি কাজে কলকাতায় এসে দেবব্রত মেজদিদিকে দেখতে গিয়েছিল, সেই সময় স্বচক্ষে দেখল সব।

মাধবীই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে: খুব আমার বদনাম—না রে?

দেবব্রত আমতা আমতা করে বলল, মামলায় ঐ ভানুবাবুই শুনেছি ও-পক্ষের গোপন তদ্বির চালাত মেজদাদাবাবুকে ফাঁসিয়ে নিজে যাতে তাঁর চেয়ারে বসতে পারে।

অবহেলার ভঙ্গিতে মাধবী বলে, হতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিনি, পচাপাঁক ঘাটতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু গড়েপিটে মিথ্যা জিনিস কিছু বানায় নি—সত্য যাতে চাপা দিতে না পারে, পাপের যাতে শাস্তি হয়, তাই করেছে। অন্যায়টা কি?

বলতে বলতে কণ্ঠে যেন আগুন ধরে যায়। কোন অভাবটা ছিল তার বল্ দিকি। ঘরের স্ত্রী এমন-কিছু কুরূপ-কুচ্ছিত নয়। ফুলের মতন ফুটফুটে ছেলে এলো। বুক দিয়ে পড়ে সবাই সেবাযত্ন করতাম। তবু টাকার লোভ দেখিয়ে অভাবী মেয়েটার সর্বনাশ করে দিল। সে টাকাও নিজের নয়, সরকারি খয়রাতি টাকা। কোর্টের মধ্যে মেয়েটা হাপুস নয়নে কাঁদছিল, আত্মজনের মধ্যে ঠাঁই নেই—অকূল সমুদ্রে পড়েছে। সেই সময় হাতে একটা-কিছু পেলে কাঠগড়ার আসামি তাকে হয়তো খুন করে ফেলতাম।

চুপ করে মুহূর্তকাল মাধবী উত্তেজনা সামলে নিল। বলে, জেল থেকে না

বেরনো অবধি না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে আমার অবোধ খোকার দিকে না-তাকিয়ে দিবানিশি আমি ওর ধ্যান করব, তেমন পতিপ্রাণা সাধ্বী হতে পারলাম না ভাই। কিন্তু তোরা কেন নিন্দের ভাগী হতে যাবি—রটিয়ে দিস, আমি নেই।

মাধবীর পিঠোপিঠি মঞ্জরী চার বোনের মধ্যে সব চেয়ে রূপসী। তার বিয়ে তারানাথের আয়োজনে হয় নি। অলকেশ নামে একটি ছেলের সঙ্গে ভাব করে সিবিল-ম্যারেজ করল। তারানাথ বারাণসীতে তখন। বিয়ের পর যুগলে এসে বাড়ির সকলকে জানাল। চাপাগলায় কিছু তর্জনগর্জন চলল মেয়ের উপর। খুব বেশি নয় —কারণ রাজপুত্রের মতন ছেলে, বাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। জাতটা বোধহয় এক নয়—প্রবাসে সে খবর না নিলেই হল। ব্যাপারটা তারানাথ চাউর হতে দিলেন না—হিন্দু মতে আবার বিয়ে হোক। অলকেশের বাপ-মায়েরও সেই ইচ্ছা। নিমন্ত্রণ-চিঠি ছেপে পুরুত ডেকে ষোল আনা বিধিমতে আবার বিয়ের অনুষ্ঠান হল। অলক বাড়ির এক ছেলে, শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে মঞ্জরীরও আদরযত্ন খুব।

কিন্তু মেয়েগুলো কী অদৃষ্ট করে এসেছে—সুখ নেই কারো কপালে। অলকেশ পাগল হয়ে গেল। কেন হল, ডাক্তারবাবুরা গবেষণা করুন গে। চিকিৎসাপত্তোর বিস্তর হয়েছে, এখনো চলছে—কিছুতে কিছু হয় না। দেব-সেবার মতন করে মঞ্জরী অলকের সেবাযত্ন করে যাচ্ছে। লোকে ধন্য-ধন্য করে—এমন মেয়ের কপালে বিধাতা এ কী অঘটন লিখেছেন! উদ্দন্ড পাগল নয়—ধীর শান্ত। কতকগুলো বিশেষ উপসর্গ আছে। সর্বক্ষণ ঠোঁট নড়ছে, আপন মনে বিড়-বিড় করে। গাছপালা পশু-পাখি সকলের ভাষা নাকি বুঝতে পারে সে। বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়—গাছের সঙ্গে লতার সঙ্গে কাঠবিড়ালির সঙ্গে ডেকে কথা বলে। দেখে লোকে বলে, পাগল কোথা—কবি। ঘোরতর স্বভাবকবি। লেখেও ঠিক লুকিয়ে লুকিয়ে। খুঁজে দেখ, খাতা পেয়ে যাবে।

আর এক বিদঘুটে ধারণায় অলককে পেয়ে বসেছে—মৃত্যু হবে না তার—ভব্যমানুষ পেলেই শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করে: বিশ্বব্রহ্মান্ড লয় পেয়ে যাবে, আমিই একলা থাকব। কী বিপদ বলুন তো, আমি এখন কি করি।

ডাক্তারের কাছেও এই প্রশ্ন: উপায় কি হবে ডাক্তারবাবু? আমি অমর—বিষ খেয়ে মরব না, বন্দুকের গুলি তলোয়ারের কোপ খেয়েও নয়। জলে ঝাঁপ দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়েও না। এ তো মুশকিল হল—

চোখে ধারা গড়াচ্ছে: আমি কি করব? আমি কি করব?

রোগির মনের দুশ্চিন্তা ডাক্তার হাসি-তামাসায় উড়িয়ে দিতে চান: কম বয়সে এখনই মরার জন্য উতলা কেন?

অলকেশ বলে, এখনকার নয়, হাজার বছরেও নয়, লাখ লাখ কোটি কোটি বছরের কথা ভাবছি আমি। পৃথিবী লয় পেয়ে গেছে, আমি ঠিক আছি—কী ল্যাঠা ভাবুন তো।

ডাক্তার সহাস্যে বললেন, পৃথিবী নেই—আছেন কিসের উপর তখন?

গ্রহ-উপগ্রহের মতন শূন্যে চক্কোর দিচ্ছি—ভাবতে গেলে প্রাণে জল থাকে না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার প্রবোধ দেন: না না, এখন থেকে অত ভাবাভাবির কিছু নেই। হাজার খানেক বছর চুপচাপ তো থাকুন—এর মধ্যে কোন একটা সুরাহা হয়ে যাবে। আমিই করে দেবো।

আশাঙ্কিত হয়ে অলক বলে, পারবেন ?

আলবৎ পারব। না পারলে এত জোর করে বলছি কেন ?

মঞ্জরীকে ডাক্তার গোপনে বললেন, ভয়ের কথা মা। অন্য কিছু বলছিনে—ছাত থেকে লাফিয়ে কিম্বা জলে ঝাঁপ দিয়ে পরখ করতে গেল, মরণ হবে কি হবে না। কড়া নজর রাখবেন।

সেটা মঞ্জরীকে বলে দিতে হয় না। অলককে চোখে চোখে রাখে। একেবারে চোখের ভিতরে মণি করে রাখতে পারলেই বুঝি নিশ্চিন্ত হত।

পাগল হোক যা-ই হোক, স্ত্রীর উপর অধিকার-বোধটা ষোলআনা। মঞ্জরী সুন্দরী, সে জ্ঞান টনটনে। একদিন পার্কে বসেছে দুজনে, অদূরের বেঞ্চিতে একটা লোক বারবার তাকাচ্ছে। পাগলের নজরে পড়েছে ঠিক—মঞ্জরীর মুখের সামনে দু-হাত চিতিয়ে আড়াল করে ধরে। আর খল খল করে হাসে: রূপ দেখছিলে যে বড্ড—দেখ না, দেখ না! ভাবখানা এই প্রকার।

পাগল স্বামীকে ছেড়ে মঞ্জরী এক-পা কোথাও নড়ে না। অবোধ শিশুর নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া মা যেমন করে দেখে, স্বামীর দায়ভার তেমনি করে সে নিজের কাঁধে নিয়েছে।

মেয়েগুলো দেখতে শুনতে ভাল হলে কী হবে, ভাঙা-কপাল। শেষ মেয়ে মন্দিরা—তারানাথ নেই, দেবব্রতর দায় এখন। উঠতে বসতে গিরিবালা আজ—দেয়ালে মা-কালীর পটের উপর মাথা খুঁড়ছেন: উনি নেই মাগো, আমার ছেলেমানুষ দেবু সংসারের ঘোরপ্যাঁচ কিছু বোঝে না। সুভালাভালি কাজটা হয়ে যায় যেন মা। মন্দার যেন সুখশান্তি হয়।

॥ চার ॥

দেবব্রত স্টেশনে। শ্রীনাথের মিথ্যা ভয়—বড়লোকের ধাপ্পা নয়, গেঁয়ো স্টেশনের প্লাটফরমে অনিল মিত্তির সত্যি সত্যি নেমে পড়লেন। সঙ্গে আর তিন জন। গুরুপদ বলাই দুই মুহুরিই এসেছে, আর এসেছেন উকিল জীবনময় চৌধুরি—অনিলের জুনিয়ার। অনিল মানা করে দেওয়া সত্ত্বেও দেবব্রত দু-খানা গরুর-গাড়ি বলে রেখেছিল, কিন্তু গাড়িতে তোলা গেল না তাঁদের—পায়ে হেঁটে চললেন। তা-ও রাস্তাপথে নয়—পথ সংক্ষেপ করবার জন্য বাঁশতলা আমতলা ক্ষেতের-আল ঘরের-কানাচ পুকুরপাড় দিয়ে, কখনো বা জলজাঙাল ভেঙে। আগে অনিল। সকলের দিকে সগর্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, দেখছ কি হে, আমিও পাড়াগাঁয়ের মানুষ। আমাদের কৈখালির তুলনায় এসব পথ তো কলকাতার চৌরঙ্গি।

নন্দীবাড়ির কাছাকাছি হতে শ্রীনাথ রাস্তা অবধি এসে 'আসুন' 'আসুন' বলে আহ্বান করলেন, বৈঠকখানার ফরাসে নিয়ে বসালেন। বলেন, মহাপ্রাণ আপনি—ধাপধাড়া জায়গায় তাই পায়ের ধুলো পড়ল। নইলে ভাইয়ের বিয়ে দেবেন কানে শুনতে পেলে তা-বড় তা-বড় লোকে পাত্রী ঘাড়ে করে পদতলে নামিয়ে দিয়ে আসত।

অতিশয় ঘুঘুলোক, আলাপনের বাঁধুনিতে অনিল বুঝতে পারছেন। মানুষটাও চেনা-চেনা—

শ্রীনাথ আত্মপরিচয় দিচ্ছেন: দেবব্রত আমার ভাইপো। দাদা হঠাৎ মারা গিয়ে এদের সব অথই সাগরে ভাসিয়ে গেলেন। আপনভাই নন তিনি, জেঠতুতভাই।

বউঠানকে বললাম, দশদুয়োরে কেন ঠেলাগুঁতো খেয়ে বেড়ান—বাস্তুভিটেয় চলে আসুন। আমার ছেলেমেয়ে এক মুঠো খেতে পায় তো আপনার ছেলেমেয়েও পাবে।

মিটিমিটি হাসতে হাসতে শ্রীনাথ বললেন, স্যার আমায় চিনতে পারলেন না—পুরানো মক্কেল। কত মক্কেল কত দিকে, চেনা কঠিন বই কি। বছর পাঁচেক আগে আপনার সেরেস্তায় আমায় যাতায়াত ছিল।

অনিলের না হোক, জীবনময়ের মনে পড়ে গেছে। ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারেন না তিনি. জিজ্ঞাসা করলেন : পাট্টা-জালিয়াতির কেস—তাই না?

পাঁচ বছর আগেকার ফৌজদারি মামলায় এঁরাই সব ছিলেন—এই উকিল দু'টি এবং মুহুরি দু-জনও। মালতীর দেবর সম্পর্কিত বলে গুরুপদকে বিশেষভাবে সুপারিশ ধরেছিলেন শ্রীনাথ। বাইরের মানুষ নেই, সেদিনের সেই ক'জনই শুধু। তবু শ্রীনাথের লজ্জা-লজ্জা লাগে। বললেন, শত্রুরা চক্রান্ত করে জালিয়াতি কেসে ফেলেছিল। ধর্ম সহায়—জাল কেটে বেরিয়ে এলাম।

জীবনময় হেসে উঠলেন : ধর্ম ছাড়া আরও সহায় ছিল মশায়। উকিল ছিলেন অনিল মিত্তির, আমি এ্যাসিস্টান্ট। দুটো সাফাইসাক্ষি হপ্তা ভোর পাখি-পড়ান পড়িয়েছিলাম, তবে বেরিয়ে এলেন। ধর্ম তরিয়ে থাকলে কি হত, পাকালোক আপনি কি আর বোঝেন না?

মেয়ে দেখানোর তোড়জোড় হচ্ছে—শ্রীনাথের বৈঠকখানায় নিয়ে দেখাবে। গিরিবালার মুখ শুকনো একটুকু। মালতীকে বলছেন, এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে যাবে, আমার তো বিশ্বাস হয় না। সুন্দরী মেয়ে চায় ওরা—মানে, ডানা-কাটা পরী। মন্দা তো সে রকম কিছু নয়—মঞ্জী হলেও বা খানিকটা।

মালতী কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, না-মরে ভূত হচ্ছ কেন মা? আমরা সব আছি, তোমার এর মধ্যে মাথা দেবার কোন দরকার নেই। মন্দার ফোটোগ্রাফ দেখেছেন ওঁরা, আর দশজনকে দেখিয়েছেন। চেহারা, গায়ের রং, পড়াশুনো, কাজকর্ম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত দেবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন। তারপরেও বাড়ি বয়ে কষ্ট করে দেখতে এসেছেন, না হবার কি দেখছ তুমি?

দেরি দেখে রাঙাবউ তাগিদ দিতে এসেছেন। সর্বদিকে নজর মানুষটির। রান্নার তদারকে ছিলেন, তার মধ্যে ফুড়ুত করে পাছদুয়ার দিয়ে এ-বাড়ি।

মালতীকে বললেন, বেশি সাজগোজে দরকার নেই মা, সাদামাটাই ভাল। ফর্সা কাপড় একটা পরিয়ে নিয়ে আয়। বেলা হয়ে গেছে, খাওয়ার সময় হয়ে এলো। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ওরা তিনটের গাড়িতে ফিরবেন। ঝটপট এখন একবার দেখিয়ে দে, যাবার মুখে ইচ্ছে হলে আবার দেখতে পারবেন।

মালতী ঘরে ঢুকে গেল।

শোন—গিরিবালা হাত নেড়ে রাঙাবউকে কাছে ডেকে নিলেন। বিড়বিড় করে বলছেন, সোতের শেওলার মতন সারাজন্ম এ-স্টেশনে সে-স্টেশনে ভেসে ভেসে শেষটা শ্বশুরের ভিটেয় এসে উঠলাম। ভরসা এখন তোমরা—তোমরাই বা কেন, তুমি। তোমার কাছে গোপন কি বউ—তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেছেন উনি, ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছেন এই সমস্ত করে একেবারে শূন্য-হাত। প্রভিডেন্ড-ফান্ডেও দেনা করে গিয়েছিলেন—কেটেকুটে তারা হাজার আড়াইয়ের মতন দিল। বিয়ের জন্যে টাকাটা বুক-বুক করে রেখে দিয়েছি। পেট-মোছা কোল-মোছা সন্তান—এদানী উনিও এই মেয়ে চোখে হারাতেন।

রাঙাবউ বললেন, পণ নেবে না, টাকা লাগছে কিসে ?

নগদে না নিলেও গয়না-বরসজ্জা আছে, আরও দশরকম খরচা আছে। আমার বউ-আমলের কাঁড়নেকলেস আর এক জোড়া বালা আছে, সেকেলে ভারী-সারি জিনিস—ভেঙে এখনকার ফঙ্গবেনে গয়না তিন-চার খানা হয়ে যাবে।

রাঙাবউ উঁহু-উঁহু—করে হাত নাড়লেন: আমায় যা বললে দিদি, টাকা-গয়নার কথা মুখাগ্রে আর আনবে না। শেষসম্বল খরচা করে দিয়ে নিজের উপায়টা কি ? কতকাল বাঁচতে হবে, ছেলের হাত-তোলা হয়ে থাকবে নাকি ? মন্দার বিয়ের পরেই তো দেবুর বউ আসবে—পরের মেয়ে যখন তখন যদি মুখঝামটা দেয়। একেবারে চুপ করে যাও দিদি, আগ বাড়িয়ে কোন কথা বলতে যেও না। দেবার ইচ্ছে হলে বিয়ের পরেও অঢেল সময় পাবে।

মন্দিরার হাত ধরে রাঙাবউ নিজেই বৈঠকখানায় ঢুকে গেলেন, লজ্জা করলেন না। চোখ টিপে মালতীকেও ডাকলেন। শুধু মালতীর সঙ্গে ছাড়তে ভরসা হল না, নিজে থাকলে দরকার মতন সামলে দিতে পারবেন।

জলচৌকির উপর কার্পেটের আসন পাতা, সকলকে নমস্কার করে মন্দা বসে পড়ল। রাঙাবউ বললেন, দেখুন আপনারা, জিজ্ঞাসাবাদ করুন। সেজেগুজে আসেনি, বিধাতা যেটুকু দিয়েছেন তাই। চুলটা খুলে দে মালতী।

অনিল হাত নেড়ে নিষেধ করলেন। মুখে কথা নেই, একনজরে কনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

গুরুপদর কানে কানে বলাই বলল, খাসা মেয়ে—

গুরুপদ সগর্বে বলে, চোখে দেখা ছিল না, তবু জানতাম। কনের বড়বোন ঐ যে কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে—আমার বউদি উনি। বিধবা মানুষ, খানিকটা বয়সও হয়েছে, তবু শ্রীছাঁদ দেখ।

ঘর নিস্তব্ধ। দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে টকটক টকটক করে। কিছু একটা বলতে হয়—জীবনময় প্রশ্ন করলেন: নাম কি তোমার ?

নাম বলল মন্দিরা।

পেলে তো নাম ? অনিল হেসে উঠলেন: নাম তো আগে থাকতেই জানা। প্রমাণ হয়ে গেল, মেয়ে বোবা নয়। হেঁটে এসে ঘরে ঢুকেছে, অতএব খোঁড়াও নয়। আর কি জিজ্ঞাসার আছে জীবন—থেমে থেকো না।

জিভের ডগায় প্রশ্ন আরও এসেছিল, কর্তার অভিপ্রায় বুঝে জীবনময় চুপ হয়ে গেলেন।

রাঙাবউয়ের অস্বস্তি লাগে। কী ব্যাপার, মেয়ে দেখতে এসে ধ্যানস্থ কেন সব ? বাইরে থেকে কে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইশারায় ঘাড় নেড়ে দিয়ে মালতীকে বললেন, তুই মা থাক এর কাছে, নয়তো ঘাবড়ে যাবে। রেলের কোয়ার্টারে একা একা থাকত। সেজন্য অন্য মেয়ের মতন নয়। ভীতু।

বলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। অনিল ডেকে বললেন, মেয়েকেও নিয়ে যান, আমাদের হয়ে গেছে।

রাঙাবউ ঘুরে দাঁড়ালেন। স্তম্ভিত। মালতীকে ইঙ্গিত করলেন, দু'বোনে চলে গেল। অনিলকে বললেন, খুব সুন্দরী মেয়ে খুঁজছেন আপনারা। মন্দিরাকে সবাই ভালই তো বলে, নাক চোখ মুখ গায়ের রং গড়ন-পেটন কোনটাই নিন্দের নয়। তা হলেও পটের পরী কেউ বলবে না। দেবব্রতর আরও ভাল করে পরিচয় দেওয়া

উচিত ছিল।

অনিল হেসে বললেন, অনেকক্ষণ ধরে দেখা হয় নি, জিজ্ঞাসাবাদও অতি সংক্ষেপ—সেইজন্যে বলছেন বোধহয়। যা দেখবার দেখে নিয়েছি, পাত্রী তো ভালই—

রাঙাবউ বলে যাচ্ছেন, বোনটা পাত্রস্থ করতে পারলে দেবব্রত বেরিয়ে পড়বে। ওর মতন ছেলে সামান্য একটুকু কাজ নিয়ে পাড়া-গাঁয়ে চিরকাল পচে মরবে না। বেশি তাড়া সেইজন্য। আপনাদের ঘরে মেয়ে যাবে—মেয়ের মা-ও খুব আশা করে আছে।

অনিল জোর দিয়ে বললেন, মেয়ে অপছন্দের নয়। কথা দেবার আগে তবু অনেক-কিছু বিচার-বিবেচনার থাকে। এই তিনজন আমার সঙ্গে এসেছেন—এঁদের কথাও শুনতে হবে। তা সে যা-ই হোক, যাবার আগেই খোলাখুলি সব জানাব—ঝুলিয়ে রেখে যাব না।

কনে দেখার সময়টা শ্রীনাথ ছিলেন না, বর্গাদার এসেছিল—তার কাছে ধানের হিসাব নিচ্ছিলেন। কাজ সেরে লোকটাকে বিদায় দিয়ে—অনেকক্ষণ বসে বসে পা ধরে গেছে, রোয়াকের নিচে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভাঙছেন। জলচৌকির উপর বসে অনিল তেল মাখছেন—গম্ভীর, চিন্তাকুল।

পুকুর অদূরে। জীবনময় ভাল সাঁতারু। আগেভাগে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সাঁতার কেটে স্ফূর্তিতে এপার-ওপার করছে। গুরুপদ বলাই দুই মুহুরিও পুকুর-ঘাটে। গুরুপদ জলচোরা—ঘটি দুই জল মাথায় ঢেলে স্নান সেরে নিয়েছে, গামছা পরে ঘাটের সিঁড়িতে বসে কাপড় ধুচ্ছে। বলাই দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে ডুবের পর ডুব দিয়ে যাচ্ছে।

তার মধ্যে পাত্রীর কথা উঠল।

বলাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সুন্দরী কতই তো দেখেছি, এ মেয়ে সকলের উপর টেক্কা দিয়ে যায়।

গুরুপদ সগর্বে বলে, আমার বউদিদিরা চার বোন। সব ক'টি ভাল।

বলাই বলল, বাবু তো মতামত জিজ্ঞাসা করবেন—কি বলবেন তখন?

শুভস্য শীঘ্রম্। অঘ্রানে হলেই ভাল। অপারগ বিধায় মাঘের ওদিকে আর না যায়।

বলাই রাগ করে বলে, বলবেন তাই?

বলব বইকি! ঘটকালি আমার। ধরতে গেলে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। অনুপমদাদা বেঁচে থাকলে তিনিই হয়তো আসতেন। সেখানে আমি।

বলাই বলে, আপনলোক হয়েও আপনি জুড়ে গেঁথে দিচ্ছেন? আমার কি বলুন—ভালমন্দ খেয়ে যাচ্ছি, বিয়েতে আরও খাব, সেইজন্যে এসেছি। কিন্তু মেয়েটাকে দেখে অবধি কষ্ট লাগছে। সিঁদুর পরিয়ে গলায় মালা দিয়ে হাঁড়িকাঠে পাঁঠা নিয়ে যায় না, সেইরকম ঠেকছে।

গুরুপদ চটে উঠল: শুভকাজে কুডাক ডাকো কেন? ষোলআনা নিখুঁত কোথায় পাচ্ছ। হীরের কলঙ্ক ধরে না, বুঝলে, ধুয়ে নিলেই সাফ হয়ে যায়। পুরুষ-ছেলেও তাই।

শ্রীনাথ এগিয়ে অনিলের কাছে গেলেন: মেয়ে কেমন দেখলেন স্যার?

অনিল ভাবছিলেন। চমক খেয়ে বললেন, অ্যাঁ?

জরুরি একটা কাজ পড়ল বলে আমি তখন থাকতে পারিনি। না থেকে ভালই হয়েছে, কি বলেন? জিজ্ঞাসাবাদে বাধো-বাধো ঠেকত আপনাদের, কনেরও জবাব দিতে

অসুবিধা হত। কিন্তু মনের উদ্বেগ চেপে রাখা দায়। আমারই ছিল্লেয় ওরা সব দশঘরায় এসেছে। কী রকম দেখলেন, বলুন একটু শুনি।

কথার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক শুনতে চাচ্ছেন না, বলতেই চান কিছু। বলুন তাহলে, আপত্তি কি! অনিল তাতিয়ে দিলেন: দু-চার মিনিটে কী আর দেখব। আপনারা অহরহ দেখছেন—বলুন না, সত্যি সত্যি কেমন।

মুখ মলিন করে, প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে এমনিভাবে শ্রীনাথ ভূমিকা করছেন: আপনি আদেশ করলেন, কিন্তু বলাটা কি উচিত হবে। ভাইয়ের মেয়ে, একেবারে আপন—

অনিল বললেন, আমিও কিছু পর নই! পরানো মক্কেল, পাঁচ বছুরে পুরানো সম্পর্ক। বলুন তাই কি কিনা? আর ভাই হলেও আপনভাই নন—বিদেশে থাকতেন, বলতে গেলে চেনা-জানাই ছিল না ভাল মতো।

তা বটে, তা বটে!

তারপরে শ্রীনাথ যেন মরীয়া হয়ে বলে ফেললেন, তারা-দাদার মেয়ে ক'টি দেখতে ভাল। কিন্তু গুণে যে নুন দিতে নেই। বড়টা ঝগড়াটে। কথার এমন বিষ, জামাই হতভাগা জলে ডুবে শীতল হল! তার পরেরটা—আমায় মাপ করুন স্যার, সে কেচ্ছা মুখ দিয়ে বেরুবে না। তারা-দাদা দেখেশুনে যথেষ্ট খরচপত্র করে ভাল ভাল জামাই এনেছিলেন, টিকল না। একটা সুইসাইড করল, একটা পাগল হয়ে গেল, আর একটা জেলে পচছে এখনো। বিষম অপয়া মেয়েগুলো—'সর্বনাশী' একটা গালাগাল আছে না, সাক্ষাৎ সেই জিনিস। যে সংসারে যায়, তাদের সর্বনাশ করে ছাড়ে। শেষ মেয়ে এই মন্দিরা—সম্বন্ধ এক একটা আসে, বৃত্তান্ত শুনে ছিটকে গিয়ে পড়ে। কার ছেলে এত সস্তা যে ঐ ঘরের মেয়ে বউ করে নিতে যাবে।

অনিলের তেল মাথা হয়ে গেছে—দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, সম্বন্ধ তবে কেটে দিয়ে যাই। কি বলেন?

শ্রীনাথ চুপচাপ আছেন।

আচমকা অনিল প্রশ্ন করেন: আপনার নিজের মেয়ে আছে নাকি? থাকে তো বলুন, বউ করে নিই।

শ্রীনাথ থতমত খেয়ে বলেন, আমার মেয়েদের বিয়েথাওয়া হয়ে গেছে।

বোনের মেয়ে, কি শালার মেয়ে?

শ্রীনাথ বলেন, তা অবশ্য আছে। সেজন্যে বলছিনে কিন্তু।

তবে কি জন্যে বলছেন—নিষ্কাম পরোপকার? বাপ মারা যাবার পর আপনাকে সহায় করে এসেছে—ফাঁক পেয়েছেন তো খানিকটা কাজ এগিয়ে দিচ্ছেন?

মুখ ফিরিয়ে অনিল হন-হন করে পুকুরে চললেন। বিনা মেঘে বজ্রধ্বনির মতো সঙ্গে সঙ্গে ডাক এলো: শুনে যাও—

রাঙাবউ বৈঠকখানা-ঘরে। হাতে দুধের হাতা, রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, সেই অবস্থায় চলে এসেছেন। সোজাসুজি প্রশ্ন: কোটনামি করতে গিয়েছিলে?

শ্রীনাথ আকাশ থেকে পড়লেন: কে বলল?

উনিও দুঁদে-উকিল। ঐ হাটে সুঁচ বেচতে গিয়েছিলে। হয়েছেও তেমনি!

হল-টা কী আবার?

কালা নই আমি। কানাও নই। এসে তুমি সুড়বুড় করছ—তখনই বুঝেছি, বিষ খানিকটা না ঢেলে ছাড়বে না। ঠিক তাই।

রাঙাবউ গর্জে উঠলেন : মানুষ নও তুমি, মানুষের মূর্তিতে কেউটেসাপ। এত ইতর মানুষে হয় না।

নিরুত্তরে শ্রীনাথ চলে যাচ্ছিলেন, রাঙাবউ ধমক দিয়ে উঠলেন : যেও না—

কি ?

রাঙাবউ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, পতি পরম গুরু—অকথা-কুকথা বলা পাপ। তা আমার কি সেই কপাল—মেজাজ হারিয়ে পাপের বোঝা বাড়াই। দাঁড়াও—

শ্রীনাথকে দাঁড় করিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। বললেন, যাও। কিন্তু বিশ্বাস নেই তোমায়—কুটুম্বদের সঙ্গে একটি কথাও আর বলবে না। আমার চোখ এড়াতে পারবে না, সে তুমি জানো। বলতে গিয়েছ কি—

হাতের হাতা আন্দোলিত করে বললেন, বলতে গেলে এই হাতার বাড়িতে মাথা চৌচির করে দেব। তারপর নিজের মাথায় মেরে আত্মঘাতী হব।

শ্রীনাথ বলেন, বাড়ির ওপর এসেছেন সব, একটা কথাও বলতে পারব না—এ তোমার বড্ড জুলুম।

রাঙাবউ সদয় হয়ে একটুকু ছাড় করে দিলেন : 'কেমন আছেন' 'ভাল আছি' এই মাত্তোর বলবে। মানুষজন যে সময়টা থাকে তখন। আড়ালে-আবডালে একটা কথাও নয়।

বিকালবেলা অনিল দেবব্রতকে ডেকে বললেন, মা তো ও-বাড়িতে—মায়ের কাছে আমাদের নিয়ে চলো। রাঙাকাকিমাকেও ডাকো ওখানে।

গিরিবালা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি ক'খানা লুচি ভাজতে বসেছেন, মালতী বেলে দিচ্ছে। যাবার আগে কুটুম্বদের চায়ের সঙ্গে লুচি মোহনভোগ দেওয়া হবে। অবুঝ দেবুটা, বলা নেই কওয়া নেই, এর মধ্যে কুটুম্বদের এনে হাজির। তবু রক্ষা, রান্নাঘরে এনে ঢোকায় নি—দাওয়ায় তক্তাপোশের উপর বসিয়েছে।

দেবব্রত মা-মা করে ডাকছে : ইদিকে এসো মা একবার।

হাত ধুয়ে গিরিবালা এসে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে অনিল বললেন, কোন সকালে এসেছি, এতক্ষণে মা'কে দেখলাম। মা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাঙাবউ এসে গেলেন! শ্রীনাথকেও দেখা গেল—জীবনময় আর তিনি কোন এক মজাদার মামলার গল্প করতে করতে আসছেন।

সবাই চুপ। হাকিমের রায় দেবার আগের মুহূর্তে আসামির যে ধুকপুকানি, তেমনি একটা অবস্থা।

অনিল বললেন, মেয়ে সত্যিই ভাল। আপনাদের অমত না হলে ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে নেবো।

গিরিবালা কেঁদে পড়লেন আনন্দে। রাঙাবউ ফিসফিসিয়ে ধমকাচ্ছেন : কী হচ্ছে দিদি? শুভকাজে চোখের জল ফেলে কেউ, ছিঃ!

অনিল বললেন, পাত্র দেখবার কবে সুবিধে হবে, বলে দিন। সামনের রবিবারের দিন হোক না। শনিবারে সদরে যদি যান, আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। হাঙ্গামা কিছু নেই, নৌকো আমাদের বাড়ির ঘাটে গিয়ে লাগবে। সেই ভাল, কেমন?

গিরিবালা বললেন, ফোটো দেখেছি, আবার দেখার কি আছে বাবা? আর এই আপনাকে দেখছি—দেবু তো শতমুখে আপনার কথা বলে—আপনাকে চোখে দেখতে পেলাম, আমায় 'মা' বলে ডাকলেন—

বাধা দিয়ে অনিল বললেন, মা কিন্তু সন্তানকে আপনি-আপনি করেন না।

'তুমি' কিছুতে মুখ দিয়ে বেরোয় না। বললেন, গরিবের মেয়েকে দয়া করে নিচ্ছেন—তার উপরে দেখাশুনো বাছাবাছির কী?

ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে অনিল বলেন, সে হয় না। পাত্রপক্ষ আমাদের কাজ তো সোজা—চোখের দেখা দেখে নিয়ে বউ ঘরে তুললাম। কনেপক্ষের কাজ অনেক কঠিন। কোন্ ঘরে কাদের কাছে মেয়ে যাচ্ছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, বিস্তর ভাবনা ভাবতে হয়। চিরজীবনের বন্ধন—না দেখেশুনে ঝাঁপিয়ে পড়লে চলে না।

জীবনময় শ্রীনাথের কাছে মাঝে একটু টিপ্পনী কেটে নিলেন: পাকা আইনজ্ঞ হয়ে এটা উনি কী বললেন। এখন আর চিরজীবন-টিবন নয়—পদ্মপত্রে জল, টলমল, এই নেই। খেলতে খেলতে ছেলেপুলে ঝগড়া করে না—যাও, তোমার সঙ্গে খেলব না—হুবহু সেই জিনিস।

আগের কথার জের ধরে অনিল বলে যাচ্ছেন, কন্যাপক্ষ আমাদের বাড়ি যাবেন, পাত্র দেখবেন, যাবতীয় খোঁজখবর নেবেন। একবারে না হল তো দশবার বিশবার যাবেন। দেখেশুনে জেনেবুঝে তবে মেয়ে দেবেন। নিজের কাঁধে কোন দায়িত্ব আমি রাখব না।

মহাপ্রাণ মানুষ—উঃ। শ্রীনাথ সরবে বলে উঠলেন। ঝানু ফৌজদারি উকিল হয়েও তলে তলে এমনিধারা গঙ্গাজল—পাটোয়ারি মানুষের মাথায় গোলমাল লেগে যাচ্ছে। কিছু বাজিয়ে নেবার অভিপ্রায়ে একেবারে কাছে এলেন। বলছেন, এমনটা চোখে দেখি নি কানেও শুনি নি—তাজ্জব হয়ে গেছি স্যার। বিয়েয় কিচ্ছু নেবেন না, তা-ও তো শুনলাম।

ঘাড় তুলে অনিল বিস্ময়-দৃষ্টিতে তাকালেন: কই, না তো। এমন কথা কে বলল?

বলো তাই—পথে এসো বাপধন! পারিষদবর্গের মধ্যে বসে বড়লোকেরা দিলদরিয়া সাজেন, বুকের তলে পুঁটিমাছের প্রাণ। এ-ও সেই জিনিস। হিসাব তবে মিলে আসছে, সগর্বে শ্রীনাথ চারিদিকে দৃষ্টি ঘোরালেন। গিরিবালার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। সবাই হতভম্ব—গুরুপদ বিশেষ করে। পাকাকথা দিতে গিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা এই কারণেই তবে।

সহসা উচ্চহাসি হেসে অনিল গুমট উড়িয়ে দিলেন: কিছু চাইনে, এমন কথা বলি নি আমি। বলতে পারিনে। মন্দা-মা'টিকে চাই আমি—সেই দরবারে পায়ে হেঁটে কষ্ট করে এসেছি। দেবেন কিনা, আপনাদের বিবেচনা। শুধুমাত্র শাঁখা-শাড়ি পরিয়ে দেবেন, গয়নাপত্র কিছু নয়। আমার মায়ের অনেক গয়না—অর্ধেক ভাগ করে বড়-বউকে দিয়েছেন, বাকি অর্ধেক ছোটবউর নামে তোলা রয়েছে। মা নিজের হাতে গা ভরে সাজাবেন। আপনাদের রোগা মেয়ে তাতেই গলদ্ঘর্ম হবে—আর দিলে তো মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার ভয়।

পাঁচ

লক্ষ্মীরাণী শুধালেন: কেমন মেয়ে?

অনিল বললেন, ফোটোয় চেহারার আদলটা দেখেছ—চাউনি দেখনি। জলচৌকিতে বসে চোখ তুলে তাকাল—কী সুন্দর, মরি মরি! আমাদের পোষা খরগোসটা তাকাতে তাকাতে এসে কোলে ঢুকে যেত, মনে আছে? সেই রকম। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। তোমার কথাগুলো মন তোলপাড় করছিল তখন। ভেবেওছিলাম, অপছন্দ বলে কেটে দিয়ে আসি।

লক্ষ্মী বললেন, উচিত ছিল তাই। কাজটা খুব খারাপ হচ্ছে।

অনিল হাসতে লাগলেন : নতুন কি শোনাচ্ছ বড়বউ। খারাপ কাজই তো পেশা আমাদের। খুনিকে ছাড় পাইয়ে দিই, যাদের খুন হয়েছে উল্টে তারাই টাকার আণ্ডিল আক্কেল-সেলামি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। এমনি সব অনাচার-অবিচার আখচার হচ্ছে। একটা না-হয় মাতৃ আজ্ঞায় করা গেল।

আবার বলেন, তা যেমন জালে জড়ালাম, কেটে বেরুনোর পথও দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে। পাত্র দেখতে কৈখালি যাচ্ছে। কোটে নিয়ে ফেললাম—দেখুক শুনুক খবরাখবর নিক। সম্বন্ধ ভাঙতে হয়, ওরাই ভেঙে দিক। না ভাঙলে আমার আর কোন দোষ রইল না। যেতে চায় নি ওরা, আমারই চাপাচাপিতে যাচ্ছে।

লক্ষ্মীরাণী বললেন, খুঁত মেরে কাজ করো তুমি—তোমায় জানিনে! কেউ কোনদিন তোমায় কিছু বলতে না পারে।

বটেই তো! ঘড়ার দুধ নির্জলা আমি তো বলবই। খদ্দের তুমি পরখ না করে কিনবে কেন?

আরও ঝঞ্ঝাট। পেস্কারমশায় এসে নিমন্ত্রণ করলেন। নাতির অন্নপ্রাশন। হবে-না হবে-না করে এই ছেলে হয়েছে। বড় আহ্লাদের।

অনিল বললেন, এরা সব যাবে। আমি পারব না, উপায় নেই।

সে কি?

বাড়ি যাচ্ছি রবিবারে। মায়ের অসুখ বেড়েছে, মন বড় উতলা।

জীবনময় বলেন, গেলে ভাল হত স্যার। বুড়োমানুষ নিজে এসেছিলেন। জজসাহেবের পেয়ারের লোক—খাতির রাখলে কাজকর্মের সুবিধা হয়।

ভাল একটা জিনিস পাঠিয়ে দেবো, তা হলেই হবে। খোদ জজসাহেবের নেমন্তন্ন হলেও যেতাম না। কৈখালি যাব ওদের সঙ্গে।

জীবনময় তবু বলেন, তা গুরুপদই তো নিয়ে যেতে পারে। পথের হাঙ্গামা কিছু নেই—উঠবেন নৌকোয়, ঘাটে গিয়ে নামবেন।

তা যদি হত, আমিই বা যেতে যাব কেন? গুরুপদ যায় যাবে, আমি যাবই।

শনিবার রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে সকলে পানসি চাপলেন। কন্যাপক্ষের দেবব্রত। আর গুরুপদ যাচ্ছে, তাকেও খানিকটা যদি ও-পক্ষের বলেন। অনিল দেবব্রতকে শুধালেন : একলা তুমি?

দেবব্রত বলল, আপনি হুকুম করে এসেছেন, সেইজন্যে যাওয়া। মা বললেন, ঘুরে এসো—নৌকোয় বেড়ানোটা হবে। চিরকাল বাংলার বাইরে থেকে নৌকোয় বেড়ানো আমাদের কমই হয়েছে।

মিটিমিটি হাসে : রাঙাকাকিমা বললেন, একজন কেন—মেয়েপক্ষের দু-জনই তোমরা। তুমি যাচ্ছ, আমাদের মানুষ আরও তো একজম সদরের উপর রয়েছেন। মা'কে আপনি যে 'মা' বলে ডেকেছিলেন তাই।

ব্যাপার কিন্তু এইরকম নয়। শ্রীনাথও আসবেন, কথা হয়েছিল। দেবব্রত কী-ই বা বোঝে—তিনি পাকালোক, বহুদর্শী। গিরিবালার ইচ্ছা ছিল তাই। শ্রীনাথও রাজি—ধোবার বাড়ি পাঠিয়ে জামায় কড়া-ইস্তিরি করে নিয়েছেন, ঘাড় কামিয়ে চুল ছাঁটাই হয়েছে, জুতোয় কালি পড়েছে—কুটুম্ববাড়ি যেতে যা-সমস্ত করতে হয়। কিন্তু রাঙাবউ বাগড়া দিয়ে পড়লেন : না, যেতে হবে না, শরীর ভাল নেই।

যেন শ্রীনাথ একটি অপোগণ্ড খোকা⋯নিজ শরীরের ভালমন্দ বোঝেন না, বুঝিয়ে

দেবার জন্য রাঙাবউকে লাগে।

রাঙাবউ বলছেন, পথের ধকলে শরীর ভেঙে পড়বে। পাতের কাছে দশরকম সাজিয়ে দেবে···ছাড়বেন না উনি, খেয়ে আসবেন। তাধপরে পেট ছেড়ে দেবে...ভোগান্তি আমার।

গিরিবালা বলেন, বাজে অজুহাত। বটঠাকুরপো হামেশাই তো সদরে যান, গিয়ে পড়ে থাকেন। তাতে কিছু হয় না। যেতে দেবে না বড়বউ, সে-ই হল আসল কথা।

বলছিলেন মালতীর কাছে। মালতী বলে, মা তুমি ঠিক ধরেছ। রাঙাকাকিমা তিলার্ধ ওঁকে বিশ্বাস করেন না, হয়তো-বা ভন্ডুল ঘটিয়ে বসবেন। আসল আপত্তি জানতে দেবেন না—যাওয়ার কষ্ট খাওয়ার অনাচার হেনো-তেনো নানান রকম বলছেন।

পানসি ভোরবেলা অনিলদের ঘাটে পেঁছে গেল। জেলখানার মতন উঁচু পাঁচিল, গুলপেরেক-বসানো সিংদরজা, দরজার এ-পাল্লায় ও-পাল্লায় মোটা লোহার কড়া। কড়া নাড়তে গোমস্তা চূড়ামণি দাস দরজা খুলে শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন।

অনিলের প্রথম প্রশ্ন : সলিল এসে গেছে?

চূড়ামণি ঘাড় নাড়লেন : আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজে চলে গেলাম যে আমি—মারফতি খবরাখবর নয়।

ভোম্বল?

সে-ও এসেছে।

পাঁচিলের পরেই উঠোন—পরিপাটি করে গোবরমাটি-লেপা। তকতক করছে, সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। পাঁচিল ঘেঁসে গোলা, আর এক দিকে ধানের পালা কয়েকটা। ধান মলার জন্য মেইকাঠ মাঝউঠানে। বিশাল পাকা পাঁচিলের অন্তরালে অবিকল চাষীর উঠোনের চেহারা।

জিনিসটা অনিল বিশদ করে দিলেন : ধান এখনো সব ক্ষেতে—উঠোন তাই খালি। ওগুলো ঝাঁতিকশাল ধান—কার্তিকে পেকে যায়। পুরোপুরি চাষাই তো ছিলাম আমরা। ধানের পালায় পালায় উঠোন গোলকধাঁধা হয়ে উঠত—গোলকধাঁধা ভেদ করে দালানে ওঠা সহজ হত না। ছেলেবয়সে তার মধ্যে কত পলাপলি খেলেছি। নতুন-আইনে জমিজিরেত বেশি রাখার জো নেই, শহুরে বাবু হতে হচ্ছে তাই।

দালানে ফরাস—ধোপদস্ত ধবধবে চাদর, তাকিয়া। শশীমুখী এসে দাঁড়ালেন। অনিল বলে দিলেন, আমার মা। দেবব্রত পায়ের ধুলো নিল।

জাঁদরেল মহিলা। পরিচয় অধিকন্তু—বনেদি বাড়ির গিন্নিবান্নি মানুষ, হাজার লোকের ভিতর থেকে বেছে নেওয়া যায়। হাসতে হাসতে শশীমুখী বলেন, ভদ্দোর-লোকেরা সব আসবেন—গোমস্তা মশায় এসে বললেন। না-জানি কী ভয়ানক ব্যাপার! তুমি যে বাবা একেবারে একফোঁটা ছেলে। আমার সলিলের চেয়েও ছোট। সলিলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আলাপ-সালাপ জিজ্ঞাসবাদ করো। তারপরে একটু ঘুরে-ফিরে দেখেশুনে বেড়িও। দক্ষিণে পুকুরের ওপারে বড়রাস্তা, উত্তর দিকেও রাস্তা—দুই রাস্তার মাঝখানে একছিটে জমি কারো নেই। সমস্ত এদের।

দেবব্রত পাল্টা কিছু বিনয়-বচন ছাড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু কার কাছে? শশীমুখী এই মোটা মানুষ, তার উপরে নাকি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন—পাখির মতন উড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আসুন ছোটবাবু—বলে গুরুপদ তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। সলিল আসছে—সুপুরুষ

স্বাস্থ্যবান। এমন ভাইয়ের জন্য অনিল সেরা সুন্দরী পাত্রী খুঁজবেন, অন্যায় কিছু নয়। সলিলের পিছু পিছু তারই বয়সি একজন···এই বুঝি ভোম্বল।

দেবব্রতর গা টিপে গুরুপদ ফিসফিস করে বলল, জিজ্ঞাসাবাদ করো এইবার। সবাই সরে গেলেন, বুঝতে পারলে না, কথাবার্তা তোমরা যাতে খোলাখুলি বলতে পারো।

কি জিজ্ঞাসা করা যায়, দেবব্রত ভেবে পাচ্ছে না। কনেকে সেকালে নাকি নাম সই করতে বলত, হাঁটিয়ে চলন দেখত। একালে করতে যাও, বুঝবে ঠেলা—কনেই বলবে, আপনি হাঁটুন তো দেখি। মেয়েদেরই যখন এই, জোয়ানযুবা হৃষ্টপুষ্ট পাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভয় লাগে। অথচ খোঁচাচ্ছে গুরুপদ অবিরত।

অগত্যা দেবব্রত মিহি গলায় বলল, বিজনেস করেন তো আপনি?

সলিল ঘাড় নাড়ল। ভোম্বল তাড়াতাড়ি পাশ থেকে বলে দেয়, হ্যাঁ—

তারপর নিঃশব্দ। গুরুপদ ক্রমাগত গা টিপছে। দেবব্রত সাড়া দেয় না, ঘাড় নিচু করে আছে। শশীমুখী এসে উদ্ধার করলেন: ভিতরে এসে জলটল একটু মুখে দাও বাবা। সারাদিনই আছ তোমরা, কথাবার্তা কত হতে পারবে।

পরে এক সময় নিভৃতে পেয়ে গুরুপদ খিঁচিয়ে উঠল: ঠোঁটে কুলুপ এঁটে আছ, একটার বেশি দুটো কথা বেরুল না। বাবুর সেরেস্তায় চাকরি করি, আমিই বা কেমন করে সওয়ালে নামি?

সলিল মানুষটি কানা নয় খোঁড়া নয়। মস্তবড় বাড়িখানা এই চোখে দেখছি। বিশাল গোলা, দীঘির মতন পুকুর। বড়ভাইকে জানি, মা'কে দেখলাম। পাত্র পাশ-টাশ করেনি, গোড়াতেই এঁরা বলে দিয়েছেন। ব্যবসা করে, সে-ও তো জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি। এর পরেও আবার কিসের সওয়াল—এতো ভারি মুশকিলের ব্যাপার হল।

কৈখালি থেকে দেবব্রত সরাসরি দশঘরার বাড়ি যাবে—মা ছটফট করছেন, সুখবর নিজমুখে না বলা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। পাখির ডানা কি সুপারসনিক-বিমান পেলে উড়ে চলে যেত। তা যখন নেই, ট্রেনেরও আড়াই ঘণ্টা দেরি—অনিল ছাড়লেন না। দুটি খেয়ে যেতে হবে, বলে টানাটানি করে বাসায় নিয়ে এলেন।

ভিতরে গিয়ে অনিল বললেন, দেখেশুনে খুশি হয়ে এসেছে।

খুশিতে ডগমগ!

লক্ষ্মীরাণী ঠোঁট উল্টালেন: সর্বকর্ম ফেলে কৈখালি অবধি ছুটলে—তুমি হারবে না জানতাম। মামলায় তুমি হারো না, শুনে থাকি।

বাঃ রে, আমি তো কিছুই করিনি—নিজে সে দেখেছে শুনেছে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

লক্ষ্মীরাণী বলেন, তুমি আচ্ছাদন দিয়ে ছিলে, চোখে তার পরে আর কি দেখবে সে? তুমি সঙ্গে গিয়েছ, শোনাবার লোকও কেউ কাছ ঘেঁসে নি। এত বছর ঘর করছি, তোমায় আর জানলাম না।

বিজয়ীর হাসি হাসতে হাসতে অনিল বললেন, কাজ পাকা করে, ফিরলাম—বাড়ি নিঝুম, এ কেমন? উলু দাও—

উলু আমি পারিনে।

শাঁখ বাজাও সাঁজের বেলা গাল ফুলিয়ে যেমন বাজিয়ে থাক।

আমি পারব না—

বলে দুমদাম পা ফেলে রান্নার তদারকে লক্ষ্মীরাণী বেরিয়ে গেলেন।

॥ ছয় ॥

তারানাথ নেই বলে দেবব্রত বেশি সতর্ক। আগের তিন বোনের বিয়েয় যা হয়েছে,

আয়োজন-আড়ম্বর তার চেয়ে কম না হয়। সকলের ছোট বোন—মায়ের বড় আদরের, বাবাও চোখে হারাতেন তাকে। এমন কথা না ওঠে, নমো-নমো করে দেবু দায় কাটিয়েছে। মন্দিরা নিজেও দুঃখ পাবে মনে মনে।

উল্টো। মন্দাই এসে হামলা দিয়ে পড়েঃ বাবা মালবাবু ছিলেন—উপরি-রোজগার ছিল, দুনিয়াসুদ্ধ জানে। চাকরিতে ঢুকতে না ঢুকতে তুই দাদা বাবাকে ছাড়িয়ে গেছিস।

দেবব্রত বলে, কেন রে?

রাজসূয় আয়োজন। মাইনে তো জানা আছে—উপরি না থাকলে এত টাকা পাচ্ছিস কোথা তুই? সিমেণ্ট সব ব্লাকে বেচে দিয়ে গাঙের পলিমাটির গাঁথনি চালাচ্ছিস নাকি?

অনিলবাবু দয়ায় নগদে গয়নায় একটি পয়সা লাগল না। ক'টা বরসজ্জার জিনিস আর খান দুই শাড়ি কিনেছি, তাতেই তোর চোখ টাটাচ্ছে?

ধমক দিয়ে উঠল মন্দিরার উপরঃ কী বেহায়া হয়েছিস তাই ভাবি। বিয়ের কনে বোবা হয়ে থাকবি—কনে-পিঁড়িতে যখন বসতে বলব, টুক করে ঘাড় গুঁজে বসে পড়বি। তা নয়, নায়েব-গোমস্তার মতন হিসেব করতে লেগেছে দেখ।

বোনেদের আনতে দেবু নিজে চলে গেল। মঞ্জরী একপায়ে খাড়া। বলে, ঘটা করে এই অবধি আবার আসতে গেলি কেন? চিঠি লিখে তারিখটা জ নিয়ে দিলেই হত। মন্দার বিয়েয় যাব না, ধড়ে প্রাণ থাকতে সে হতে পারে না—

একটু ভেবে বলে, ইচ্ছে হচ্ছে তোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। সে তো হয় না—ওকেও নিয়ে যাব, রেখে যাওয়া চলবে না। এত আগে যাই কেমন করে?

অলকেশ খাটে পা ঝুলিয়ে টিপে টিপে হাসছে ভাই-বোনের কথায়। হঠাৎ দেখে কেউ বলবে না মাথার দোষ এই মানুষের—মারমুখি হয়ে ওঠে যখন তখন।

মঞ্জরী বলছে, শ্বশুর-শাশুড়ি জা-ভাসুর সকলে বর্তমান। এতবড়টি তাঁরাই করেছেন। অথচ আজকে তাঁরা এ মানুষকে বুঝতে পারেন না, আমিও সোয়াস্তি পাইনে কারো কাছে রেখে। শ্বশুর-শাশুড়িদের বলে কয়ে তুই চলে যা। কাজের আগের আগের দিন সন্ধ্যের ট্রেনে গিয়ে পড়ব। ওকে নিয়ে যাব। স্টেশনে গরুর-গাড়ি পাঠাবি, ব্যস। কিছু ভাবিস নে, নিশ্চয় যাব, পাকা কথা। দু-জনে গিয়ে পড়ব।

দেবব্রত অবাক হয়ে মঞ্জরীর কথা শুনছিল। বলল, তোদের রেজেস্ট্রি-বিয়ে নিয়ে সেই সময় লোক কি বলাবলি করত, মনে পড়ে।

মঞ্জরী মুখ টিপে হাসল, কিছু বলল না।

দেবব্রত বলে, নাকি রেজেস্ট্রির বউ নিয়ে সংসারধর্ম হয় না। ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াবি কোনো একটা ছুতো করে ডিভোর্স নিয়ে বেরুনোর জন্য।

মঞ্জরী কৌতুককণ্ঠে বলে, ছুতো আজ আমায় খুঁজে বের করতে হবে না। রেজেস্ট্রি-বিয়ে হোক আর সাত-পাকের বিয়ে হোক, ডিভোর্স চাইলে এককথায় মিলে যাবে। কিন্তু ঐ যে—

কণ্ঠ মাধুর্যে অপরূপ হয়ে উঠল পাগল অলকেশের দিকে চেয়ে।

ভালমানুষের মতন ঐ যে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে, কম শয়তান ওটি! তিনটে বছর মাত্র ভাল অবস্থায় ছিল, তার মধ্যেই সর্বনাশ করে গেছে আমার। হাতে-পায়ে ইস্পাতের বেড়ি পরিয়েছে। সে বেড়ি ভেঙে বেরুনো ইহজন্মে আমার হয়ে উঠবে না রে ভাই।

মাধবীর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেবব্রত বলল, এইবারটা চলো মেজদি। সেজদির কত অসুবিধে—পাগল ছেড়ে যেতে পারে না তো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট বোনটির বিয়ে, আমাদের শেষ-কাজ—বিয়ের ঐ দুটো-তিনটে দিন থেকেই না হয় চলে এসো।

মাধবী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বলে, যাব—

একগাল হেসে আবার বলে, একা যাব না—ভানুকে সঙ্গে নিয়ে যাব। রাজি আছিস?

আমতা-আমতা করে দেবব্রত বলে, তাতে লাভ কি?

ভানুকে জড়িয়ে তোরা বদনাম দিয়ে থাকিস, বিয়েবাড়ি জোড়ে গিয়ে দেখাব, আমরা তা থোড়াই কেয়ার করি।

দরজার বাইরে কালোকোলো স্বাস্থ্যবতী একটা মেয়ে দেখা দিল। মাধবী ডাকে, আমার ভাই এসেছে যশোদা। বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছে।

দেবব্রতর পায়ে গড় করে যশোদা চক্ষের পলকে বেরিয়ে গেল। মাধবী বলল, সেই মেয়েটা—

অবাক হয়ে তাকিয়েছে দেখে মাধবী ফিক করে হাসল: আমার সেই সতীন গো। নিঃসহায় ভেসে বেড়াচ্ছিল শুনে ভানুকে দিয়ে আনিয়েছি। বাচ্চাটা সুদ্ধ আছে। তোর মেজো জামাইবাবু বেরিয়ে এলে বলব, বিয়ে করো—

যশোদা জলখাবার এনে দিল। মাধবী স্নেহকণ্ঠে বলে, কিছু বলে দিতে হয় না—ভারি লক্ষ্মী।

খাওয়া সেরে দেবব্রত উঠে পড়ল। মাধবী বলে, কই, আর যে রা কাড়লিনে ভাই। আমরা কিন্তু ঠিক ঠিক চলে যাব। আমি খোকন আর ভানু—

রাস্তায় পড়েছে দেবব্রত। খিল খিল হাসির ধ্বনি পিছনে।

পিওন এলো, তিনটে মনিঅর্ডার আর কিছু চিঠি। গিরিবালা নাড়ুর চাল ধুচ্ছেন—ধুয়ে ধুয়ে খেজুরপাটিতে মেলে দিচ্ছেন শুকিয়ে নেবার জন্য। মন্দাকে ডাকলেন: ঘরের মধ্যে কি করিস, সই করে নিয়ে নে। পিওন কতক্ষণ দাঁড়াবেন?

এখন না-হয় হাতজোড়া। কিন্তু বিনি কাজে শুয়ে বসে থাকার সময়েও যদি সই-টইয়ের প্রয়োজন পড়ে, মেয়েকে ডাকেন। মায়ের হয়ে মন্দাকে সই করতে হয়, চিঠিপত্র পড়ে দিতে হয়।

গিরিবালা বলছেন, আসবে না বলে মনিঅর্ডারে সব লোক-লকুতোর টাকা পাঠাচ্ছে। চিঠিতেও দেখ্ হেনো হয়েছে তেনো হয়েছে—কত রকম বয়ান। কুটম-কুটুম্বিতে আসা-যাওয়া উঠে যাচ্ছে, লোকে আর ঝঞ্ঝাট পোহাতে চায় না।

একটা চিঠি তুলেই মন্দা দাদা, দাদা—করে হুল্লোড় লাগিয়েছে: শিগ্গির আয় দাদা, ঠিক তোর চাকরির চিঠি।

দেবব্রত ছুটে এলো। মন্দা বলে, সরকারি চিঠি—'এস-বি-লিঙ্কস, সুন্দরনগর' ছাপা। সিমলায় ইন্টারভ্যু দিয়েছিলি, ফল ফলল এদ্দিনে।

চিঠি নিয়ে দেবব্রত রোদের দিকে ধরেছে—খাম কোন দিকে ছেঁড়া যায়, ভিতরের চিঠি না ছেঁড়ে। আর কয়েকটি চিঠিতে গিরিবালা যা বললেন হুবহু তাই আসতে পারবে না, এটা হয়েছে সেটা হয়েছে। এবং শুভকর্ম নির্বিঘ্নে যেন সুসম্পন্ন হয়, পত্র-যোগে প্রার্থনা। এক পোস্টকার্ডের চিঠি এর মধ্যে—তাজ্জব ব্যাপার, লেখক নাম দেয়নি। নজর বুলিয়ে নন্দার মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল।

দেবু ওদিকে চেঁচিয়ে লাফিয়ে এক কাণ্ড জমিয়ে তুলেছে : সুন্দরনগরের কাজটা আমারই বোধহয় হয়ে গেল মা। মন্দার বিয়ে, পিঠ-পিঠ আমার চাকরি। আমাদের পুরানো প্রিন্সিপাল বোর্ডের মধ্যে গেছেন, অঘটন তিনি ঘটিয়েছেন বুঝতে পারছি।

মন্দিরা ত্রিসীমানায় নেই—পোস্টকার্ডটা মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ফুড়ুত করে সে ঘরে ঢুকে গেছে। ভাল করে এক একবার পড়ছে। লিখেছে পোস্টকার্ডে—মহামূল্য সংবাদগুলো সকলের কাছে অবাধে যাতে চাউর হয়ে যায়। হতে পারল কই। পড়বি তো পড়, মন্দার হাতেই এসে পড়ল। ঈশ্বর দয়াময়। চিঠির মর্ম মা টের পেলে ঐ যে চাল ধুতে বসেছেন, ঢিপ করে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়তেন।

তক্তাপোশে বসে পড়েছিল, চিঠি বালিশের তলে রেখে মন্দা মুখ গুঁজে পড়ল। ঘোর হয়ে গেছে, ঘরে সন্ধ্যা পড়েনি। চমক লাগল, মায়ের হাত হঠাৎ মাথার উপরে। চেয়ে দেখতে হয় না, স্পর্শ পেয়েই বুঝতে পারে। চাল ধোওয়ার কাজ সারা হয়ে তখন বুঝি কৌতূহল হল—ছিল এই মেয়েটা, আচমকা ঘরে ঢুকে গেল কেন? নিঃসাড়ে গিরিবালা মন্দার পাশটিতে বসেছেন! ফুলে ফুলে কাঁদছে সে। গিরিবালা থাকতে পারেন না, জোর করে তাকে উল্টে দিলেন। আহা রে, দু-চোখ ধারা বইছে, বালিশ ভিজে গেছে। কে বলে, মেয়ে এবার বাইশে পা দিল। বাইশ নয়, বারো কিম্বা আরো কম। নিজের আঁচলে চোখ মুছে দিয়ে এ-গালে ও-গালে চুমু খেলেন দু-বার। আ মরে যাই, কী হয়েছে মা আমার। কী মুশকিল, চিরকাল তুই মায়ের আঁচল ধরে থাকবি নাকি? বড় হবি নে, নিজের সংসারধর্ম হবে না?

যাক, কান্নার কৈফিয়ত লাগল না। ঝট করে বানানো মুশকিল হত—তাড়াতাড়িতে কি বলতে কি বলে বসত। মা নিজে থেকেই কারণ আবিষ্কার করে নিয়েছেন—মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে সেই দুঃখ মেয়ের। মিছা নয় সেটা—মেয়ের দুঃখ, মায়েরও। কিন্তু মায়ের পক্ষে আরও নিদারুণ হবে চলে যাওয়াটা এবারেও ভেস্তে যায় যদি। নিদারুণ দেবব্রতর পক্ষেও। মন্দা পায়ের শিকল হয়ে আছে তার—গ্রামাঞ্চলে থেকে বোনের বিয়ের ঘটকালি আর পাঁচকে কণ্ট্রাক্টরের গোলামি করে দিন কাটাতে হচ্ছে দেবুর মতো ছেলেকে। সাটলেজ-বিয়াস লিংকসের মতন প্রকল্পের মধ্যে ডিজাইন-ইঞ্জিনিয়ারের কাজটা পেয়ে গেল— ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা কে বোমা ছুঁড়ল তাক করে? মা তুমি স্বপ্নেও জান না, পিওন চিঠি দিয়ে গেল—তার মধ্যে রয়েছে আত্মীয়কুটুম্বদের আশীর্বাদ, দাদার চাকরি আর এই সাংঘাতিক জিনিস। যে বালিসে মুখ গুঁজে কাঁদছিলাম, তারই নিচে সন্তর্পণে আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছি।

ভাল করে বসে মা মেয়েকে কোলের উপর টেনে নিয়েছেন। গিরিবালার বুকের ভিতরে মন্দার মুখ, চুল-ভরা মাথা বাইরে। কান্না-টান্না কোথায় গেছে, শান্ত হয়ে পড়ে আছে সে।

কাজের বাড়ি এখনো জমে নি। এবাড়ি-ওবাড়ির দু-চারজন আসছে যাচ্ছে, আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যেও সামান্য এসেছে। মঞ্জরী-অনুপম কাল আসবে। ভেজানো দরজা ঠেলে মালতী ঢুকে পড়ল : ওমা, এখানে তোমরা? তিল কোথায় রেখেছ, দিয়ে যাও। নাড়ু-কোটার জিনিস এক জায়গায় সব গুছিয়ে রাখি। এয়োরা এসে পড়লে তখন দিশে করা যাবে না।

গিরিবালা তিল বের করতে গেলেন। মন্দিরা ইতিমধ্যে রান্নাঘরে বঁটি পেতে থোড় কুটতে লেগেছে। র-র-করে পড়লেন গিরিবালা : তোকে এ কাজ কে করতে বলল? আঙুল কেটে একখানা কাণ্ড ঘটাবি—ওঠ্ শিগগির, বলছি।

বঁটির যখন দখল পেয়ে গেছে, ছেড়ে দিতে বয়ে গেছে মন্দার। খুচ-খুচ করে দ্রুতহাতে কুটে যাচ্ছে। নিরুদ্বেগে বলল, আঙুল বই তো নয়—কেটে দু-খণ্ড হয়ে গেলেই বা কী!

রক্ত পড়বে যে হতভাগী। শুভকাজে রক্তপাত হতে নেই।

হলে কি হয় মা? কাজে বুঝি ভণ্ডুল হয়ে যায়?

আহ্লাদি-সুরে মন্দা বলল, ভণ্ডুল আমি এখনই করে দিতে পারি। রাজি থাকো তো বলো, এক্ষুনি করে দিচ্ছি।

চুপ, চুপ। বড্ড আদিখ্যেতা। ভুলেও ওসব মুখে আনবি নে।

রাগ করে গিরিবালা মেয়ের সামনে থেকে সেরে গেলেন।

মঞ্জরীদের নিয়ে গরুর-গাড়ি উঠানে এলো। শ্রীনাথও সঙ্গে সঙ্গে হাজির: উঁহু, এ বাড়ি নয়। এখানে জায়গা কোথা? মালপত্তোর এখানে নামাস নে। আমার বাড়ি।

মঞ্জরী আগেই নেমে পড়েছে। শ্রীনাথ বললেন, যে ক'টা দিন আছিস মা, আমার ওখানে থাকবি। একই তো বাড়ি—এ-উঠোন আর ও-উঠোন।

মন্দা বলল, তোমাদের বাড়িতেও তো বাড়তি ঘর নেই কাকা।

পুবের কামরা ওদের জন্য খালি করে দিয়েছি।

মন্দা অবাক হয়ে বলে, বউদি কোথা গিয়ে উঠল?

চেপেচুপে শ্রীনাথ প্রসন্নই ছিলেন, এবারে ক্ষেপে উঠলেন: কে জানে কোথায়! জিজ্ঞাসা করু গিয়ে তোর রাঙাকাকিমাকে। বিজয় ভবসিন্ধুদের বাড়ি গিয়ে শোবে, এইমাত্তোর কানে গেল। সব তাতে আমার উপর তম্বি, কাজের বাড়ি জায়গার অনটন সে যেন আমারই দোষ।

গিরিবালার ঘরে রাঙাবউ, স্বামীর কথাবার্তা সব কানে যাচ্ছে। বলেন, শোন দিদি। কী মানুষ, উঃ! সকাল থেকে আমায় বাড়ি তিষ্ঠোতে দিচ্ছেন না। বিজয় এই ক'দিন অন্য বাড়ি যাবে, বউমা আমাদের ঘরে থাকবে—ওঁরই ব্যবস্থা। দিব্যি এখন সব আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। অলক-মঞ্জীকে এক্ষুনি সঙ্গে করে নিয়ে যাই, নয়তো রক্ষে থাকবে না আমার।

গিরিবালা বললেন, ব্যবস্থা কিন্তু ঠিক হয় নি। শুধু বউমা হলেও হত, সঙ্গে তিন বাচ্চা-ছেলেমেয়ে।

কিছু উত্তেজিত হয়ে রাঙাবউ বলেন, জামাই কষ্ট পাবে আর ছেলেবউ মজা করে থাকবে, তাই হয় নাকি দিদি? সে উনি কিছুতে হতে দেবেন না—বোঝাতে পারো, বোঝাও গিয়ে ওঁকে।

মালতী বলে, আমোদ-আহ্লাদ পেলে মঞ্জী আর কিছু চায় না। চিরকাল—সেই একফোঁটা বয়স থেকে। বিধাতা তেমনি বাদ সেধে বসে আছেন। তোমার কামরাটা পেয়ে খুব ভাল হল রাঙাকাকিমা, রোগা জামাই নিরিবিলি থাকতে পারবে, বিয়েবাড়ির হৈ-চৈয়ের মধ্যে কিসে কি ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল। গিন্নিবান্নিরা গিরিবালার কাছে শতমুখে মঞ্জরীর কথা বলেন, সার্থক সন্তান পেটে ধরেছিলে। আজকালকার ফক্কোর মেয়ে নয়, সেকালের সতীসাবিত্রী। কী যত্নটাই করছে দেখগে—পাগলের সেবায় নিজেই তো পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে।

বিয়ের আগের দিন। গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে, এবাড়ি-ওবাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছে মন্দিরা। খাওয়া সেরে ওপাড়া থেকে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। মঞ্জরীর কামরায় ঢুকে সে অবাক : চোখে কি রে সেজদি।

গাঁদাফুলের পাতা বেটে দিয়েছি।

সে তো দেখছি। হয়েছিল কি ?

মঞ্জরী বলল, তোর জামাইবাবুর আদর একটুখানি। চৌকাঠের ঘা খেয়েছিল, রাঙাকাকিমাকে বললাম।

অলকেশ শুয়ে পড়েছিল, তড়াক করে উঠে বসল : পানের ডিবে ছুঁড়ে মেরেছিলাম আমি।

মন্দিরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, বীরত্ব খুব! কেন মারলেন ? চোখ কানা হয়ে যেত আর একটু হলে।

হল না কেন ? নাগর জুটিয়ে ইয়ার্কি মারা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

অশ্লীল গ্রাম্য বিশেষণ কতকগুলো ছেড়ে অলকেশ গজরাতে লাগল। মঞ্জরী ফিকফিক করে হাসে—যেন স্তব গান হচ্ছে তার। বলল, সেই ভাল, কানা-ই করে দিও আমায়। দিয়ে সারাজন্ম হাত ধরে নিয়ে বেড়িও। উঠে পড়লে কেন—শুয়ে পড়ো, ঘুমোও।

ধরে শুইয়ে দিল আবার। গায়ে মাথায় হাত বুলায়, হাতপাখার বাতাস করে। মৃদুকণ্ঠে গানের সুরের মতো বলে, ঘুমোও ঘুমোও—।

অলকেশ আস্তে আস্তে চোখ বুজল।

এতক্ষণে মঞ্জরী ছোটবোনের দিকে ভাল করে তাকাল। বলে, কুইনিন-খাওয়া মুখ করে আছিস কেন রে ? রোগের একটা লক্ষণই হল সন্দেহ-বাতিক। ভালবাসে বলেই তো একান্তভাবে পেতে চায়। ডিবে ছুঁড়ে মারার মধ্যেও আদর-ভালবাসা রয়েছে।

মন্দা বলে, কপালের উপর চিরকাল আদরের পাকা দাগ থেকে যাবে।

শুধু কপাল কেন, দেখবি—দেখবি ?

কাপড় সরিয়ে মঞ্জরী দেখিয়ে দিল, বুকে পিঠে চার-পাঁচ জায়গায় কালশিটে পড়ে আছে। হেসে বলে, সর্বদেহ জুড়ে আদরের ছয়লাপ।

শিউরে মন্দা বলে উঠল—নৃশংস!

আহা, বলিসনে রে অমন করে—হুঁশ জ্ঞান আছে নাকি ওর! যখন ছিল—সেই তিনটে বছরে আমার বুকের কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। আবার যেদিন ফিরে পাব, সোহাগ-ভালবাসাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে। এই সব দাগ দেখিয়ে হাসব আর ও কেঁদে ভাসাবে।

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর আর এক রকম হয়ে গেল। যেন কোন্ স্বপ্নের দেশ থেকে কথা বলছে। বলে, সামান্য সময়—বছর তিনেক মাত্র পেয়েছিলাম। তারই মধ্যে অমৃত দিয়ে গেছে রে মন্দা, আমি মরব না। সেই দিন আসবে ফিরে—তারই লোভে আছি। আনবই ফিরিয়ে, হার মানব না।

অবাক হয়ে মন্দিরা শুনছিল, হঠাৎ পাঁঠা-কাটা কোপের ধরনে মঞ্জরীর পায়ের গোড়ায় ঢপাস করে প্রণাম।

ওকি রে—বলে মঞ্জরী পা সরিয়ে নিল। বলে, হল কি তোর ? এমনি তো তুই-তোকারি করিস, ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের ধুলো হঠাৎ মাথায় তুলে নিচ্ছিস ?

মন্দিরা বলে যাচ্ছে, যে বিধাতা তোর মনে এত জোর দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমার

জন্যেও একটু প্রার্থনা করিস সেজদি।

কণ্ঠস্বর অদ্ভুত লাগে। আজ বাদে কাল বিয়ে—বিয়ে এমন পাত্রের সঙ্গে যে গ্রামসুদ্ধ সকলে মুখে কাষ্ঠহাসি হাসছে, অন্তরে অন্তরে জ্বলে-পুড়ে মরছে। খুশিতে ঝলমল করবে তো কনে—কিন্তু মেঘ উঠেছে, মুখের উপর বিষন্ন ছায়া। উদ্বেগে মঞ্জরী বলে, হল কি রে?

দু-হাতে বোনটির মুখ তুলে ধরতে ফোঁটা কয়েক জল গড়িয়ে পড়ল।

সুখের দিনে চোখের জল কেন রে মন্দা?

তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে সলজ্জ হাসি হেসে মন্দা বলে, দুত্তোর—কেমন করে যে এসে পড়ে জল। চোখে খড়কুটো পড়েছে বোধহয়।

মঞ্জরী বলে, নবেলের নায়িকার জবান। হুবহু একেবারে। কী হয়েছে বল্ আমায়, না শুনে ছাড়ছি নে।

মন্দিরা ভাবল একটুখানি। ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, বলব। জানিসনে সেজদি, কত বড় দৃষ্টান্ত তুই আমার চোখের উপরে। দেখছি তোকে, আর অবাক হচ্ছি। তোকে না বলে কাকে আর বলতে যাব।

উঠে দরজায় খিল দিয়ে এলো। কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল, বলে, বুকের মধ্যে পাষাণভার চেপে আছে। কারো কাছে বলতে পারিনে, দম আটকে মরে যাচ্ছি।

বলতে বলতে জামার নিচে বুকের মধ্য থেকে চিঠি বের করে মঞ্জরীর হাতে দিল। পাঁচটি-সাতটি ছত্রের অধিক নয়, কিন্তু বজ্র:

শুনেছি পাত্রী দেখতে-শুনতে খুব ভাল। ডাক্তার-কবিরাজে হার মানলে লোকে দৈবের শরণ নেয়। ঝাড়ফুঁক করে, তাবিজ-মাদুলি ধারণ করায়। আপনার মেয়ে মাদুলি—এই বিয়ে মাদুলি-ধারণ বই কিছু নয়। আপনার হাবা ছেলেকে ভাল করে একটু খোঁজ নিতে বলবেন। পাত্র মাতাল, লম্পট। সিরাজকাটি বাজারের পরী-খেমটাওয়ালির সঙ্গে তার আসনাই। দেশসুদ্ধ সবাই জানে…

বজ্রাহতের মতন মঞ্জরী বোনের পানে মুহূর্তকাল চেয়ে রইল। বলে, মায়ের নামে লিখেছে—

লিখেছে বড় বড় হরফে, শুধুমাত্র অক্ষর-পরিচয় থাকলেই মোদ্দা-কথা ক'টা বুঝে নিতে যাতে না আটকায়। কিন্তু এমন হাতের খেলা দেখিয়ে দিলাম সেজদি, পেশাদার ম্যাজিসিয়ান কোথা লাগে! মা বিন্দুবিসর্গ জানে না।

বাহাদুরির গৌরবে মন্দা হেসে উঠল। মঞ্জরী তাড়া দিয়ে ওঠে: হাসছিস—পাগল না ক্ষ্যাপা তুই?

মন্দা বলে, ঘর-বরের কথা মা তো আত্মহারা হয়ে সকলকে বলে বেড়াচ্ছে। চিঠি হাতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে দিত। আর এত বড় শক নিজেও সামলে উঠতে পারত না। চিঠি গাপ করে আমি মাতৃবধ ঠেকিয়েছি।

মন্দিরা বলে, আত্মবধ বেছে নিলি তার বদলে।

অবহেলার ভঙ্গিতে মন্দা বলে, কে জানে কি নিলাম। তবে রাত পোহালে বিয়েটা এবারে হয়ে যাচ্ছে ঠিক। মোটমাট তিনবার ভেস্তে গেছে, এবারের এই চার নম্বরও যদি যায়, কলাতলায় যাওয়া এজন্মে আর হবে না। মেয়েমানুষের বিয়ে না-হওয়া যে কী জ্বালা!

মঞ্জরী বিরক্তকণ্ঠে বলে, সেকেলে মেয়ের বেহদ্দ হলি যে তুই। দিদিমা-ঠাকুরমাদের আমলের কথা বলছিস।

মেয়ে আমরা একই আছি সেজদি, সেকেলে-একেলে বলে তফাৎ নেই।

হেসে হেসে মন্দা বলতে লাগল, এম-এ পাশ-করা ইলা সরকারের কথা মনে পড়ে? বাপ দু-লক্ষ টাকা আর শহরের উপর বাড়ি রেখে গেছে। বয়স কালে চেহারাও মন্দ ছিল না। দেমাকে মটমট করত, যত সম্বন্ধ আসে, একধার দিয়ে নাকচ করে দেয়। কেউ বিদ্যেয় খাটো, কারো রং ময়লা, কেউ বা যথোচিত স্মার্ট নয়—নানান অজুহাত। আজকে সেই ইলা সরকারের দশা দেখে বাঁচিনে। সাজলে-গুজলে উৎকট দেখায়—ছাড়বেন না তবু ভদ্রমহিলা, রং-বেরঙের সাজ করে বর ধরবার জন্য পাগল। মানুষ-খেগো বাঘ—'ম্যান-ইটার অব কুমায়ুন' নাম দিয়ে আড়ালে আবডালে হাসাহাসি করে ছেলেরা, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

মঞ্জরী ধমক দিয়ে উঠল: হাসিসনে অমন করে। দেবো পিঠের উপর কিল বসিয়ে।

কপালে আছে ঠিক তাই। তুই না হলেও অন্য কেউ কিল বসাবে—বেনামি চিঠিতে তার আভাস রয়েছে। ঘাবড়াস কেন সেজদি, সেকালে আখরচার তো এই হত। কুলীনের ছেলেকে দুটো বিয়ে অন্তত করতেই হত—কুল করে কুলীনের মেয়ে উদ্ধার, আর আদিরস করে মৌলিকের মেয়ে। এ-ও তাই, ধরে নিলে হল।

মঞ্জরীর মুখে তাকিয়ে আবার ভিন্ন সুরে বলে, এমনও হতে পারে, সত্যি নয়—বানানো। ভাংচি দেওয়া পাড়াগাঁয়ের দস্তুর, আমার বেলা বরাবরই তো দিচ্ছে। উড়োচিঠি আগে বরের বাড়ি পাঠিয়েছে—কনের এক বোন ঝগড়াটে, এক বোন খারাপ, এই সমস্ত। স্ট্রাটেজি বদল করে চিঠি পাঠাল এবার কনের বাড়ি।

মঞ্জরী অত সহজে ভোলে না। বলল, চিঠিটা দেবুকে অন্তত গোপনে দেখালে পারতিস—খোঁজখবর নিয়ে যা করবার সে করত। একালের মেয়ে হয়ে তুই সেকালের মতন ভবিতব্য মেনে বসে রইলি।

একালের বলেই তো তাড়া নেই। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না—বিয়ের পরে ধীরেসুস্থে ভাল করে খোঁজখবর হতে পারবে। সেকালে ছিল, সাত-পাক ঘোরানো হয়ে গেল তো সাতহাজার সাত-শ সাতাত্তর উল্টোপাক দিয়েও আর খুলবে না। বিয়ের আগে সামাল-সামাল পড়ে যেত, খুঁত বেরুলে পরে আর মেরামতের উপায় থাকবে না বলেই।

খিল-খিল করে মন্দা হেসে উঠল: 'প্রজাপতয়ে নমঃ' বলে ফাঁসিতে কাল ঝুলে পড়ি, আপিলের ব্যবস্থা তো রয়েছেই। ফূর্তিফার্তি কর্ সেজদি, মুখ গোমড়া করিস নে। যা লিখেছে, ধরে নিলাম সত্যি। মানুষটা তাতে পচে গেল নাকি? সেকালের সমাজে এই জিনিসটা খুব বড় করে দেখত, এ কালের আমরা এসব থোড়াই কেয়ার করি।

॥ সাত ॥

কৈখালির মিত্তিররা বনেদি গৃহস্থ। গ্রামের তালুকদার ছিলেন। সে আমলের মুরুব্বিরা দাবরাবের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে গেছেন। লেখাপড়া নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না—চাকরি করে যখন খেতে হবে না, ঐ বাবদে নিষ্ফল খাটাখাটনির কি প্রয়োজন? সম্পত্তি দেখাশুনোর মতো যৎসামান্য বাংলা জানা থাকলেই হল।

এ হেন বাড়িতে অনিল সৃষ্টিছাড়া। পড়েই যাচ্ছেন তিনি। কর্তা, ঝানু বৈষয়িক মানুষ, অকালে মারা গেলেন। সরিকেরা মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার করে তুলল। শশীমুখী মাথা ভাঙছেন: পড়াশুনোর খেয়াল ছেড়ে বাড়ি এসে বোস এবারে, নিজেদের যা আছে বুঝেসুজে নে। অনিল কানেও নিলেন না, পাশের পর পাশ করে যাচ্ছেন।

ভালই করেছেন তিনি। নতুন আইনে তালুকমুলুক গেছে, বিষয়ভোগীদের দিন ফুরিয়েছে। আইনকে কলা দেখিয়ে কর্তা অবশ্য স্বনামে-বেনামে কিছু ডাঙা ও ধানজমি রেখে গেছেন, কিন্তু বাইরের রোজগার না থাকলে পিতৃপুরুষের মানসম্ভ্রম বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

কনিষ্ঠ সলিল বংশের ধারা রাখল। স্থানীয় মাইনর-ইস্কুলে খানিকটা পড়ে নিয়ে, কৈখালি নাট্যসমিতি মুমূর্ষু হয়ে ধুকছিল—তারই উন্নতিকল্পে কোমর বেঁধে লাগল সে। কিন্তু অনিল বাগড়া দিলেনঃ ভাইকেও মানুষ হতে হবে। বিদ্যের বয়স হয় না, শহরের বাসায় চোখের উপর থেকে লেখাপড়া করবে। জো-সো করে একটা পাশ দিক না—মোক্তার করে বসাবেন তাকে। একই বাসায় থেকে দু-ভায়ের প্রাকটিশ। খরচা করে উকিল দেবে, আছি আমি। কম-পয়সায় মোক্তার চাও, পাশের ঘরে ঢুকে পড়ো।

শহরে নিয়ে সলিলকে হাই-ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। নাট্য-সমিতির আবার দুঃসময়। সিরাজকাটিতে মিত্তিরদের কাছারি, গোমস্তা চূড়ামণি দাস। গোমস্তা-মশায়ের ছেলে ভোম্বল গঞ্জের ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুল এদিকে বেশ ভাল—ভোম্বলকে ফ্রী করে নিয়েছে, মাইনেকড়ি লাগে না। অসুবিধা হল, মাস্টাররা এই আছেন এই নেই—গাঙের স্রোতে ভেসে-যাওয়া কচুরিপানার মতন। ভুজুং-ভাজাং দিয়ে নিয়ে আসে—দু-দশ দিনেই নতুন মাস্টার বুঝে নেন, চাকরি অবশ্যই পাকা তবে মাইনে মিলবে কিনা ঠিকঠিকানা নেই। তারপর সুযোগ পাওয়া মাত্রেই কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে চলতি নৌকোয় তিনি উঠে পড়েন।

কাছারি গিয়ে একবার অনিল চূড়ামণিকে বললেন, তা ভোম্বলও শহরের ইস্কুলে পড়ুক। আমার বাসায় থাকবে, সলিল আর সে একসঙ্গে ইস্কুলে যাবে। আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে দু-পাঁচটি মক্কেল আসতে লেগেছে। সলিলটা বড্ড একা পড়ে গেছে, দুজনে বেশ হবে।

বয়সের তুলনায় সলিলের নিচু ক্লাস। এর উপরে ফেল করে থাকলে তো চিত্তির। ভেবেচিন্তে সুদক্ষ মাস্টার গঙ্গাধর ভটচাযকে দিয়ে বাড়িতে পড়ানোর ব্যবস্থা হল। ভট্টাচার্যমশায় পড়ান ভাল, তা ছাড়া ভক্ত মানুষ। গলায় তুলসির মালা, মাথায় টিকি, নগ্নগায়ে চাদর জড়িয়ে ইস্কুলে যান, রোমশ বুক ও বর্তুল উদরের উপরে ধবধবে সুপুষ্ট পৈতের গোছা।

দীঘির পাড় ধরে পথ। বিপরীতে একতলা কোঠাবাড়ি, টিনের বাড়ি, খোড়োবাড়ি। সকাল-বিকাল ইস্কুল যাতায়াতের মুখে দেখতে পাওয়া যায়—বাসন মাজছে দীঘির ঘাটে, ক্ষারে কাপড় কাচছে, চান করছে বেশরম ভাবে। হরেক রকম কাজ। মুড়ি খায় রোয়াকে বসে, বিড়ি ফোঁকে, ফড়-ফড় হুঁকো টানে কেউ বা। কটকটে-কালো চেহারা, হাতে ও গলায় একরাশ করে লোহার ও তামার মাদুলি। গল্প করে পাঁচটা সাতটা গায়ে গায়ে বসে, কখনো বা ধুন্দুমার কোন্দল।

সলিল আর ভোম্বল, দ্রুতপায়ে পাড়াটুকু পার হয়ে যায়। একদিন সলিল বিষম হোঁচট খেলো, হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ভোম্বল হি-হি করে হাসেঃ মজে গেলি যে একেবারে—নজর করে পথ হাঁটিসনে। মারা পড়বি একদিন।

সলিল বলল, মারাই পড়ব, ঠিক বলেছিস তুই। চোখ বুঁজি কিনা এইখানটা এসে—

কেন রে, চোখ বুঁজিস কেন ?

মেয়েমানুষ দেখবার ভয়ে। দেখলে গা বমি-বমি করে—সত্যিই বা বমি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তাকাই নে। কাল থেকে ভাবছি, থানার পথ ধরে যাব আমরা। কি বলিস ?

ভোম্বল বলে, ঘুরপথ—অনেক বেশি হাঁটনা—

সলিল বলে, কী করা যাবে। সোজা পথের এই খোয়ার। আজকে অল্পের উপর দিয়ে গেছে, কোন দিন হয়তো একেবারে দীঘির মধ্যে গড়িয়ে পড়ব।

সরস্বতীপুজোর দিন সন্ধ্যার পর ইস্কুলে গানবাজনার আসর। অন্য কিছুতে না হোক, গানবাজনার বাবদে সলিলের ইতিমধ্যেই কিছু নাম হয়েছে। আসর অন্তে সে আর ভোম্বল দীঘির পাড়ের পথে বাড়ি ফিরছে। কী কান্ড, স্বর্গলোকের যাবতীয় অপ্সরী-কিন্নরী এসে জুটেছে দীঘির পাড়ের এই পাড়ার মধ্যে—সেজেগুজে আগাপাস্তলা গয়নায় মুড়ে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। লীলায়িত মন্থর ভঙ্গিমায় চলাচল—সেন্টের উগ্র বাস বাতাসে। হ্যাজাগের জোরালো আলো জ্বলছে। ঘন-কাজল বড় বড় চোখের মনভোলানো দৃষ্টি। মিষ্টি হাসি খিল-খিল খুক-খুক। গানের সুর। নাচের ঘুঙুর। দিনমানের সে-পোড়া আর নয়—ইন্দ্রপুরী।

ইন্দ্রপুরী, সন্দেহ কি—ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণদের আনাগোনা। মুখ ঢেকে সব ঢুকছেন, অথবা বেরুচ্ছেন। একটা পালকি-গাড়ি এসে থামল সুপারিগাছ-ওয়ালা বাড়িটার সামনে। গাড়ির দরজা বন্ধ, খড়খড়ি তুলে-দেওয়া। কী এক রহস্য যেন ঘোড়ার-গাড়ির খোপে আবদ্ধ। দরজা ঈষৎ পরিমাণে খুলে আপাদমস্তক জামিয়ারে ঢাকা একটা মেয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। গাড়ির দরজা পলকে আবার বন্ধ, কোচোয়ান জোরে হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

চলন্ত গাড়ির পানে তাকিয়ে সলিল থ হয়ে আছে। ভোম্বল বলল, দুটোয় গিয়েছিল কোথা, ফুর্তি মেরে এলো।

সলিল বলে, সাইকেল থাকলে ঘোড়ার-গাড়ির পিছু নিতাম। ভাল করে দেখতেও দিল না, ঝট করে দরজা এঁটে দিল।

ভোম্বল প্রশ্ন করে : কে ?

নাম বলে না সলিল, হাসে। বলে গোয়েন্দার বাবারও আন্দাজে আসবে না। হাতে-নাতে ধরি আগে, দেখিস তখন।

এক রকমের মজায় পেয়ে বসল। সন্ধ্যার পর ফাঁক কাটাতে পারলেই সলিল দীঘির পাড়ে চলে যায়। একলা—ভোম্বলকে পর্যন্ত বলে না। তখন আনন্দলোক সেখানে। সাইকেল চেপে চলে যায়—তেঁতুলগাছে সাইকেল ঠেশান দিয়ে ছায়ান্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। দিনমানে যারা ঘোরে-ফেরে তারা নেই—না বারান্ডার ঐ মেয়েরা, না রাস্তার এই এরা। মুখ ঢেকে টুক করে ঢুকে পড়লেন—কোন মহাজন উনি ? আবার অনেকক্ষণ পরে মুখ ঢাকা অবস্থায় বেরুলেন। ঢাকা এক সময় তো সরবেই—মুখচন্দ্র দেখতে হবে, সলিলের পণ। আজব গোয়েন্দাগিরিতে পেয়ে বসেছে। অলক্ষ্যে কত সময় এক মাইল দু-মাইলও পিছন ধরে যেতে হয়।

ভাইকে মানুষ করার সংকল্প অনিলের মিইয়ে গেছে। এবার উল্টো আদেশ : লেখাপড়ায় কাজ নেই। বাড়ি চলে যা। গিয়ে, যা করছিলি—যাত্রা-থিয়েটার আর গেঁয়ো মাতব্বরি করে বেড়াগে। যার যা অদৃষ্টের লিখন।

জ্যেষ্ঠের আদেশের প্রথমার্ধ সলিল এক কথায় মেনে নিল। লেখাপড়ায় ইস্তফা।

কিন্তু বাড়ি যেতে মন নেই। শহরবাসের দোষ এটা, গাঁয়ে গিয়ে কাদা ভাঙতে আপত্তি—সকলে তাই ভাবছে।

কৈখালি গিয়ে অনিল শশীমুখীকে বলেন, কেলেঙ্কারির বেহদ্দ। আমি বলেই কোনরকমে চাপা দিয়ে রেখেছি। মাস্টারের টিকি কেটে নিয়েছে।

নিষ্ঠাবান গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ইস্কুলমাস্টার, এবং সলিলের বাড়ির মাস্টারও বটেন। টিকিহীন অবস্থায় তিনি ক্লাসে এলেন। এবং খালি গা নয়, চুড়িদার পাঞ্জাবি উঠেছে গায়ে। পুরোপুরি ভোল-বদল। ছেলেরা এ ওর গা টিপছে।

সলিল ইস্কুলে যায় নি সেদিন। ভোম্বল এসে খবরের মতন খবরটা দিল: গঙ্গাধর-মাস্টার টিকি কেটে ফেলেছে।

ফেলে নি। চাস তুই?

অবাক করল সলিল। সুপুষ্ট টিকি ঠোঙায় রাখা ছিল, ভোম্বলকে এক-কথায় দান করে দিল: নিয়ে নে—

বাহাদুরি গোপন নেই। লক্ষ্মীরাণী জিভ কাটলেন: মাস্টারমশায়ের টিকি কেটেছ ঠাকুরপো? ছি ছি।

মাস্টারমশায়ই বললেন আমায়। গুরুর আদেশ।

অনিলও শুনলেন। এ নিয়ে বচসা করতে ঘৃণা হয়। গঙ্গাধর পড়াতে আসছেন না—কোন লজ্জায় আর আসবেন! রবিবারের দিন ভোম্বলকে নিয়ে অনিল তাঁর ওখানে গেলেন। যেন কিছুই জানেন না, বললেন, শরীর-টরির খারাপ হয়ে পড়ল কি না—ভাবলাম, দেখে আসি একবার গিয়ে।

ভূমিকার মধ্যেই খপ করে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলেন: মাপ চাইতে এসেছি মাস্টার-মশায়। কেলেঙ্কারি না ছড়ায়—তাতে আমাদের লজ্জা, আপনারও। বংশের কুলাঙ্গার ওটা—ইস্কুল ছাড়িয়ে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গঙ্গাধর ক্ষমা করেই বসে আছেন: বলতে হবে কেন, ছাত্র তো পুত্রতুল্য। সামান্য একটু বজ্জাত আছে, নইলে এমনি তো খারাপ নয়।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। মাসের অর্ধেক হয়েছিল, পুরো মাসের মাইনে মিটিয়ে দিলেন। অধিকন্তু তিনখানা নোটে আরও তিরিশ টাকা।

সবিস্ময়ে গঙ্গাধর মাস্টার বললেন, এটা কিসের?

সলিল চলে যাচ্ছে, নতুন টুইশানি দেখেশুনে নিতে কিছু তো সময় লাগবে—

ভোম্বলের কাছে বৃত্তান্ত শুনে সলিল খল-খল করে হাসে: টিকির দাম। তা আবার নগদ টাকা কেন? টিকি তো ছিলই তোর কাছে, দিয়ে দিলে পারতিস। আর কেটেছি আমি ওঁরই কথায়। গুরুর কথার অবাধ্য হতে পারিনে।

পিছু নিয়েছে, গঙ্গাধর স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। সলিল গ্যাট-ম্যাট করে বাড়ি ঢুকে পড়ল—সুপারিগাছ-ওয়ালা সেই বাড়ি। খুটখুট করে দরজা নাড়ছে। কী না কী—দরজা খুলে দিল। সলিল ঢুকে পড়ে বলে, নমস্কার স্যার।

দু-এক কথায় সলিল গর্জে উঠল: ভণ্ডামি কেন? জুতো-পাঞ্জাবি বেশ তো পরে এসেছেন, এইরকম পরবেন। তুলসির মালা ছিঁড়ুন এক্ষুনি, টিকি কাটুন—

সকরুণ কণ্ঠে গঙ্গাধর বললেন, নিজে কাটব কেমন করে?

সুশীলার ঘর। হেসেই কুটিকুটি—সুট করে উঠে কাঁচি বের করে সে সলিলকে দিল। টিকি কেটে সলিল গুরুর আদেশ পালন করল। গুরু-শিষ্য দু-জনে তারপর

একসঙ্গে বেরুলেন।

গঙ্গাধর হাত ধরে বলেন, যত-কিছু বললি সমস্ত করব আমি। কিন্তু প্রচার না হয়, দেখিস বাবা। হেডমাস্টার এমনি আমার উপর চটা—ছুতো পেলে চাকরি খেয়ে দেবে।

না, প্রচার কেন হবে। পাড়ার মধ্যে কিছুদিন টহল দিচ্ছি স্যার—দেখলাম, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। তবে সাধুর সাজ দেখে মেজাজ বিগড়ে যায়—সাজ ছাড়লেন, আর কোন ঝামেলা হবে না।

এই ইতিহাস। শহর ছাড়তেই হবে, অনিলের পণ। সলিল যেতে চায় না, পলাপলি খেলছে। এই নিয়েও অনিল কানাঘুসো নানান কথা শুনছেন। গ্রাম থেকে শহরে তিনিই এনেছিলেন, সেই পাপ স্খালন করবেন আবার ফেরত পাঠিয়ে। গ্রামে নয়, এবার সিরাজকাটি গিয়ে থাকবে সলিল—সেখানে কয়লার ডিপো খুলে দিচ্ছেন। কয়লার ডিপো তল্লাটের মধ্যে একেবারে নতুন। আরও সুবিধা, ভোম্বলের ইস্কুলের পড়া সাঙ্গ হয়েছে, তাকেও পাওয়া যাচ্ছে।

কোর্ট কামাই করে অনিল ভাইকে নিয়ে ডিপোয় বসিয়ে দিয়ে এলেন। তা সলিলও মুখে রক্ত তুলে খাটছে, খবর পাওয়া গেল। ব্যবসা দেখতে দেখতে জমে যাবে, সন্দেহ কি।

কৈখালি গ্রামের গাঁওটি-দর্গোৎসব ফুর্তিফার্তির ব্যাপারে সলিলের আহার-নিদ্রা থাকে না, এবারে বিপরীত। খবরের পর খবর যাচ্ছে, এক দিনের তরে বাড়ি এলো না। তখন তাগড়া তাগড়া জনকয়েক সিরাজকাটি গিয়ে পড়ল: বলি ব্যাপারখানা কি—থিয়েটার তবে বন্ধ করে দিই?

সলিল বলিল, তোমরা চালিয়েচুলিয়ে নাওগে, আমি কেমন করে যাই। পুজো-থিয়েটার বলে তো গঞ্জের মানুষ কয়লার রান্না বন্ধ করে দেবে না!

ধানাই-পানাই এমনি অনেক। একরকম জোরজার করে মাত্র হপ্তাখানেক আগে সলিলকে কৈখালি এনে তুলেছে।

আর অনিল এসে পৌঁছলেন মহাসপ্তমীর দিন বিকালবেলা, সেদিনের পূজা শেষ হয়ে যাবার পর। অনিল এলে গাঁয়ের মুরুব্বিরা বাড়ি এসে দর্শন দেন।

কোর্ট তো পরশুদিন বন্ধ হয়ে গেছে—এত দেরি?

অনিল বললেন, বলেন কেন! বিষয় না বিষ—গোমস্তামশায় তালগোল পাকিয়ে বসে আছেন, সিরাজকাটি আটকা পড়ে গেলাম।

বউমাকে আনো নি, একেবারে ঝাড়া হাত-পা যে এবারে—

অনিল বললেন, বড় শালা মাদ্রাজে থাকেন, কদিনের জন্য এসেছেন। ছেলেপুলে নিয়ে বড়বউ ভাইয়ের বাড়ি গেল।

শশীমুখীকে দেখে বললেন, সলিলের দোকানও দেখে এসেছি মা।

ঈষৎ ভয়ে ভয়ে শশীমুখী বলেন, ভাল চলছে শুনতে পাই।

বিক্রি খুব ভাল। কাঠের দাম বেড়ে গেছে, মেলেও না তেমন! দায়ে পড়ে লোকে কয়লা পোড়াচ্ছে।

তখন উচ্ছ্বাস ভরে শশীমুখী বলছেন, মন পড়েছে বড্ড। গান-বাজনা-থিয়েটারের নামে পাগল—এখন এমনি হয়েছে, ধরেপেড়ে টেনেহিঁচড়ে আনতে হয়। বলে, দাদা পত্তন করে দিলেন, গড়েপিটে তোলা আমারই দায়।

লোকজন চলে গেলে অনিল দুয়োর ভেজিয়ে দিলেন। ডাকলেন : শোন মা—

আলাদা রকম সুর, শশীমুখীর গা কেঁপে ওঠে।

অনিল বলছেন, বিষয়আশয়ের কিছু নয়—ওসব মিছে কথা। অনেক আশায় কোল-ডিপো গড়ে দিয়েছি, গুণের ভাই তার কী খোয়ারটা করছে দেখার জন্য সিরাজকাটি নেমেছিলাম। বিক্রি খুব ভাল, লাভও ভাল, তবু টাকার অভাবে ওয়াগন খালাস হয় না—ডিমারেজ খেয়ে মরে।

শশীমুখী বললেন, জানি। ভাদ্দরমাসে একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল : টাকা দাও মা, চালানের মালটা বেচেই শোধ দিয়ে দেবো।

শান্ত কণ্ঠে অনিল বললেন, টাকা ছিল না বলে তোমার মকরমুখো-বালা দিয়ে দিলে। ধরতে গেলে বালাজোড়া ওরই।

কৈফিয়তের ভাবে শশীমুখী বলতে লাগলেন, বড়বউ এলে আমার কণ্ঠহার পরিয়ে দিয়েছিলাম, ছোটবউয়ের নামে বালা তোলা ছিল। হাত এড়াতে পারিনে, দিতে হল। খদ্দেরের কাছে অঢেল ধারবাকি দিয়ে এখন আর সামাল দিতে পারছে না।

দোকানের কাগজপত্রেও তাই—দেদার পাওনা। আমার কেমন সন্দেহ হল—ভোম্বলকে নিয়ে দু-চার জায়গায় মুকাবেলা করে এলাম। পাওনা ছিল ঠিকই—কাঁচা-রসিদ দিয়ে আদায় করে এনেছে, খাতায় জমা করেনি। আমি বা কেউ ধরে ফেলে পাছে টাকার কৈফিয়ৎ চাই।

মায়ের মুখে চেয়ে অনিল খপ করে প্রশ্ন করলেন : তোমার বালার খবর জানো ?

বন্ধক-টন্ধক দিয়ে উন্ধার করেছে—ছাড়িয়ে ফেরত দিয়ে দেবে।

দিচ্ছে আর ফেরত। জন্মের মতন গেছে। ঠাকুরমা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়ে-ছিলেন, তুমি আবার ছেলের বউকে পরাবে বলে রেখেছিলে। এখন সে বালা কে পরে বেড়াচ্ছে, জানো ?

ভীত-কণ্ঠে শশীমুখী বলেন, কে ?

পরীবালা পেশাকার—

স্তম্ভিত শশীমুখী, মুখে কথাটি নেই। অনিল বলছেন, গাঙের ধারে পেশাকার-পাড়া। অদৃষ্টের অভিশাপ—টিপিটিপি পাড়ার মধ্যে গিয়ে বালা-পরা পেত্নীটাকে চর্মচক্ষে দেখে এলাম। ইস্কুলের আমল থেকে সেটা ঘাড়ে চেপেছে, যার জন্যে ইস্কুল ছাড়িয়ে সিরাজকাটি গঞ্জে এনে বসালাম। পেত্নী ছাড়েনি, ঐ গঞ্জ পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ। শশীমুখীর চোখে জল। বললেন, দোকান এক্ষুনি তুলে দাও, গঞ্জ ছেড়ে বাড়ি এসে থাকুক।

অনিল বললেন, গঞ্জ আর কতটুকু পথ—বাড়ি থেকে বুঝি যেতে পারবে না।

বৃদ্ধা গর্জন করে উঠলেন : বাড়ি এনে হাত-পা বেঁধে রাখব।

অনিল শান্তভাবে বললেন, কোল-ডিপো তুলে দেবো না মা। দু-দিন ধরে তন্নতন্ন করে দেখেছি, খোঁজখবর নিয়েছি। সামান্য চেষ্টায় ব্যবসা জেঁকে উঠবে। তবে ঐ যা বললে হাত-পা বাঁধতে হবে সলিলের। পাড়ামুখো না হতে পারে :

পথ ভেবে নিয়েছেন অনিল। একটুখানি হেসে বললেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও মা তাড়াতাড়ি।

॥ আট ॥

মায়ের কাছে সলিল তড়পাচ্ছে খুব : সংসারধর্ম আমায় দিয়ে হবে না।

অস্পষ্ট কথা।

সংসার তোকে কে করতে বলছে? শশীমুখী বললেন, সদরের বাসা ছেড়ে বড়-বউমার নড়বার জো নেই। আমি বুড়ো হয়েছি, যখন তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি—কোনদিন জ্ঞান আর ফিরবে না। বিয়ে করে তুই শুধু বউটা এনে দে, সকল দায়ভার সে নিয়ে নেবে।

ভোম্বলও তাই বুঝিয়েছে: ঘাবড়াসনে। না পোষায়, খসে পড়বি। এমন বাড়িঘরদোর, মানসম্ভ্রম, টাকাপয়সা, বাড়ির গিন্নি হয়ে এত মানুষের উপর মাতব্বরি—গরিবের মেয়ে দেখতে পাবি এতেই বর্তে গেছে। তোর উপরে কথা বলার তাগতই হবে না তার।

চুপ করে যায় সলিল, কিন্তু গোঁ ছাড়ে না। তারপরে ঐ বেনামি চিঠি। চিঠি ডাকে ফেলে আশায় আশায় আছে। কনের সান্নিপাত-ক্ষেত্রের জ্বর-বিকার, অতএব অতীব দুঃখের সহিত ইত্যাদি ইত্যাদি গোছের জবাব এলো বলে। অথবা ঐ তরফের কোন লোক। দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছে। কিছুই না। উল্টে অনিলই জীবনময়ের উপর মামলাগুলোর ভার চাপিয়ে সবসুদ্ধ কৈখালি এসে পড়লেন।

নাও, হয়ে গেল। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে একটু-আধটু রাগের শোধ নিচ্ছিল, তারও ইতি। নজরবন্দিতে আটকেছে। ওদিকে ভোম্বল, অনিলেরই নির্দেশে হয়তো, অহরহ সামাল দিচ্ছে: খবরদার, খবরদার। বদ মতলব কিছু ভেবে থাকিস তো ছেড়ে দে। পয়সাকড়ি না থাক, ভালঘরের মেয়ে তো বটে। তুই শটকান দিলে তাদের কি অবস্থা হবে, দেখ ভেবে।

সলিল খিঁচিয়ে ওঠে: মেয়ে না ঘোড়ার-ডিম। বাড়ির জঞ্জাল—ঝোপজঙ্গল আদাড়-আঁস্তাকুড় যেখানে হোক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দায় খালাস হচ্ছে।

পালাবে না, জেদ চেপে গেল তার। কিসের ভয়ে পালাব, কাকে ডরাই? ঘোঁত-ঘোঁত করে সেবার বুনোশুয়োর তেড়ে এলো—সবাই ছুটে পালাল, সলিল নড়ে নি। একটা বাঁশের মুড়ো পেয়ে তাই উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বুনোশুয়োরই সরে গেল। ধর্মের কাছে খালাস আছে—দাদা যা গোপন রেখেছিল, চিঠি লিখে ফাঁস করে দিয়েছে। বিষয় আশয় ঘরবাড়ি দাদার নামডাক দেখেই মজেছে ওরা—আমি না হয়ে এ-বাড়ির বেরালটা-ছাগলটা হলেও দিত বিয়ে। হোক তবে তাই—

ভোম্বল উঠতে বসতে বোঝায়, ভয়ও দেখায়—অনিলের টিপ আছে নিঃসন্দেহ: বর হয়ে গিয়ে বীরত্ব ফলাবিনে। কিন্তু, কুচ্ছোকথা ঘুণাক্ষরে না প্রকাশ পায়। বড্ড পাজি গ্রাম। হুটকো-হুটকো জোয়ান ছোঁড়ারা ভুঁয়ে কোদালি মারে, কুস্তি লড়ে দেহ বাগায়, পান থেকে চুন খসলেই বেধড়ক পিটুনি ঝাড়ে। গ্রামটাকে শুধু দশঘরা নয়, ঠ্যাঙাড়ে-দশঘরা বলে থাকে সেই জন্যে।

দুই বৃহৎ পানসি ঘাটে এনে বেঁধেছে। একটায় বর যাবে, ও এয়ারবন্ধুরা। এবং ভোম্বল অবশ্যই। ছেড়ে দেবার মুখে আচমকা অনিল এই পানসিতেই উঠে পড়লেন। ছোঁড়াদের সিগারেট ফোঁকা ও রসের কথাবার্তা বন্ধ—তার মানে মুখগুলো সম্পূর্ণ কুলুপ-আঁটা হয়ে গেল। কিন্তু অনিল হেন মানুষকে সমঝে কে দেবে। পানসি চলল, চড়ন্দাররাও বেজার মুখে ধ্যানস্থ হয়ে সব চলেছে।

নৌকো ছেড়ে রেল। স্টেশন অবধি পথটুকু অনিল পাশে পাশে যাচ্ছেন। বর যেন ছুটে পালাবে। পালায় যদি সত্যি সত্যি, ধরু ধরু করে অনিল পিছন ছুটবেন না কি? রেলের কামরায় উঠে মুক্তি পাওয়া গেল। দরজার সামনে অনিল পায়চারি

করছিলেন—বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিল, পাশের কামরায় উঠে পড়লেন তিনি।

সলিল হেসে হেসে ভোম্বলকে বলছে, নৌকোয় দাদা বিশ্বাস করতে পারেন নি : জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কী-জানি হয়তো ডুবসাঁতার দিয়ে পালালাম। চলতি রেল থেকে লাফ দেবো না, একটু ভরসা তবে আছে।

ছোট্ট ফ্লাগস্টেশন। কসাড় বাঁশবন বেতবন ঝোপজঙ্গল খানাখন্দ—তার ভিতর দিয়ে সংকীর্ণ পথে মাইল চারেক গিয়ে দশঘরা। চতুর্দিকে তাকিয়ে ভোম্বল সতর্ক করে দেয় : বরাসনে বসেও বেচাল করবিনে কোনরকম। বর হয়েছিস বলে মাথায় শিং ওঠেনি, হাত বুলিয়ে দেখ। খোদ বর বলে তোর হয়তো কানমলাটা আসটার উপর দিয়ে যাবে, মরতে মরণ আমাদের। বাঁশ নিয়ে তাড়া করবে, দৌড়ে কুল পাব না। পিটিয়ে শেষ করে কসাড় জঙ্গলে কি খানাখন্দের পাঁকে চালান করে দেবে, কোন দিন আর হদিশ হবে না।

শ্রীনাথের বৈঠকখানায় বরাসনে সলিল গদিয়ান হয়ে বসেছে। মাথার টোপর রাজমুকুটের মতো, এখন নামিয়ে রেখেছে সেটা। পিছনে ও এপাশে-ওপাশে দৈত্যাকার তাকিয়া। তার ওদিকে বরযাত্রীরা ব্যূহ সাজিয়ে বেষ্টন করে আছে। আর রয়েছে ভোম্বল—সকলকে ছাড়িয়ে প্রশ্ন একটা-দুটো বরের দিকে যাচ্ছে তো ভোম্বল টপ করে ধরে নিয়ে জবাব দিয়ে দিচ্ছে।

কন্যাপক্ষ বলে, বর একেবারে চুপচাপ—বোবা না কি?

ভোম্বল বলে, সৈন্যসামন্তের হাতেই নাজেহাল—সেনাপতি কেন রণে নামতে যাবে?

বৃদ্ধ পুরুতঠাকুর বুঝিয়ে বললেন, এই বয়সে এরা লোহার কলাই চিবিয়ে খেয়ে হজম করে—সারাটা দিন না খেয়ে বর নেতিয়ে পড়েছে। তার উপরে এই ধকলের পথ। আলাপ-সালাপ যাচ্ছে কোথা—এখন না হল, সকালবেলা হতে পারবে।

বরাসন হতে ছাতনাতলা মোটামুটি নির্বিঘ্নে কাটল। বিয়ে অন্তে বাসর, অতিশয় সংকটের স্থান। ফাড়া কেটে রাত পোহালে যে হয়। দুর্ভাবনাটা বেশি করে ভোম্বলের। এবং অনিলেরও। মুখে বলবার মানুষ তিনি নন—মাঝেমধ্যে ভোম্বলের দিকে তাকাচ্ছেন, ভোম্বলের প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

বেশি রাত্রে বিয়ের লগ্ন, সেই বড় সুবিধা—বাসর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে না। পাখি-পড়ানোর মতন করে ভোম্বল শিখিয়েছে : ঘুম ধরেছে বলে ঘন ঘন হাই ছাড়বি, ঢলে ঢলে পড়বি। বাসর মেয়েদের একেবারে নিজস্ব, পুরুষের মধ্যে একটা তুই। একলাই তোকে সামলাতে হবে। গুরুর নাম নিয়ে বুকে বল রাখবি—জেরার তলে না পড়তে হয় দেখিস।

কাঠগড়ার সাক্ষিকে দাদা জেরা করছেন, সলিল দু-একবার দেখেছে। জেরা কী সাংঘাতিক বস্তু, সে জানে।

ভোম্বল বলছে, ঘুমে ঢুলছিস দেখে মেয়েরা সব তো চলে গেল। ফাঁকা বাসরে তুই আর নতুনবউ। বউ যতই হোক আপনলোক—তার সঙ্গে দু-চারটে কথা ফিসফিসিয়ে চলতে পারে। তা হলেও মুখের রাশ আলগা করবিনে। কোন্ মেজাজের মেয়ে এখন তক কিছু জানা নেই। হয়তো বা কট্টর মারমুখি, বাসরঘরেই 'মাগো, আমার কী সর্বনাশ হল রে'—বলে ডুকরে কেঁদে উঠল।

বরাসন সরিয়ে দিয়ে মেজে-জোড়া শপ-সতরঞ্চি-চাদরের ঢালাবিছানা—বরযাত্রীর দল গাদাগাদি হয়ে শুয়েছে। কনের শাড়ি ও বরের চাদরে গেরো এঁটে নারীরা

চতুর্দিক ঘিরে সলিলকে ঘরে ঢুকিয়ে নিল, সেই সময়টা বড় কাতর চোখে তাকাচ্ছিল সে—এই সব ভাবছে ভোম্বল আর এপাশ-ওপাশ করছে। ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছে, ডাক শুনল : ওরে ভোম্বল—

দরজা ঠেলে বরপাত্তোর এসে হাজির। না, বিপদ বলে ঠেকছে না। চেকনাই চেহারা, হাসিতে মুখ ঢলঢল করছে—

উঁহুঁ, একটি কথা নয় এখানে।

হাত ধরে ভোম্বল নিরিবিলি পুকুরঘাটে নিয়ে গেল। আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে নিল, সলিলকে একটা দিল। দুই চাতালে সামনা-সামনি বসে দাঁতন করতে করতে হাসিমুখে ভোম্বল বলল, জিতে এসেছিস, মালুম হচ্ছে। বল—

মেয়েমানুষের দঙ্গল তামাসা-বটকেরার নামে যা-না-তাই বলছে। আর খিক-খিক করে গা-জ্বালানো হাসি। মঞ্জরী এর মধ্যে রাঙাবউকে ডেকে নিয়ে এলো। এসেই তিনি তাড়িয়ে তুললেন : রাত কাবার হয়ে যায়, ছাড়ান দে তোরা। জামাইয়ের মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, হাসকুটে শান্ত ছেলে বলেই চুপচাপ রয়েছে। রীতকর্ম সারা হয়েছে, এবারে একটু ঘুমোক।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন যতক্ষণ না সব চলে যায়। নড়বেন না। ফচকে ছুঁড়ি একটা তারই মধ্যে বলে উঠল, ঘুমুবে সত্যি সত্যি—কথা দিচ্ছ তো জামাই?

কারবাইডের জোরালো আলো জ্বলছিল, রাঙাবউ নিভিয়ে দিলেন। কোণে রেড়ির তেলের প্রদীপটা জ্বলছে শুধু। সারা রাত্রি জ্বলবে, নিভানো যাবে না। মঞ্জী বলল, উঠে ভাই দুয়োরে খিল এঁটে দাও। ফুড়ুৎ করে কখন কোনটা ঢুকে পড়বে, বিশ্বাস নেই। ঢুকে তক্তাপোশের নিচে চলে যাবে।

একটা বড় ফাঁড়া কাটল। এখনো আছে—বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত একের পর এক আসতে থাকবে। পরের নম্বর এইবারে বউয়ের সঙ্গে।

দরজায় খিল আঁটছে, আর আড়চোখে তাকাচ্ছে নতুনবউয়ের দিকে। ঘোমটা টেনে মড়ার মতন পড়ে। ছিল দেড় বিঘত ঘোমটা, ইতিমধ্যেই আঙুল চারেক উঠে এসেছে—তার মধ্য দিয়ে বরের পানে তাকাচ্ছে। প্রদীপের মিটমিটে আলোয় ডাগর ডাগর চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে, মুখেরও খানিক খানিক। তক্তাপোশ অবধি যেতে যেতে ঐ ক'আঙুল ঘোমটাও থাকবে না—নিরিবিলি পেয়ে নতুন-বউ কোমরে আঁচল জড়িয়ে রণরঙ্গিণী হয়ে যুঝবে এবারে। না বুঝে-সুঝে কেন যে চিঠি লিখতে গেল—কিঞ্চিৎ শঙ্কা হচ্ছে, গায়ে পড়ে কেচ্ছা এতখানি না ছড়ালেই হত।

কৌশলটা চট করে ভেবে নিল। রাঙাবউ ঐ যে খেই ধরিয়ে গেলেন, তারই জের টেনে যাবে। ঘুম, ঘুম—ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু, টলতে টলতে কোনরকমে তক্তাপোশ অবধি গিয়ে ধুপ করে শয্যায় পড়বে। যাত্রার নাটকে থাকে 'পতন ও মূর্ছা'—সেই জিনিসই একটু ঘুরিয়ে পতন ও নিদ্রা। সে বড় বিষম নিদ্রা—ধাক্কা দিলে গড়গড় করে গড়াবে, ধরে বসিয়ে আবার যেই ছেড়ে দেবে তৎক্ষণাৎ পতন। চিমটি কাটো কিল মারো চাই-কি মুগুরে দমাদম পেটাও, ঘুম ভাঙবে না। তবে যদি কেউ কাতুকুতু দেয় —নতুনবউ জানে না যে মুগুর মেরে কায়দা করা যায় না, কিন্তু আলতো ভাবে গায়ে আঙুল ঠেকালেই তিড়িং করে উঠে বসে সে-মানুষ হাসির হুল্লোড় বইয়ে দেবে।

বউয়ের আক্রমণ এড়ানোর মনে মনে ফন্দি আঁটছে—হরি হরি, বউটা দেখি তারই দিকে, ষোলআনার উপর আঠারোআনা। কানে কানে বলল, বেড়ায় কান রেখে সব

আড়ি পেতে আছে। একটি কথা নয়, ঘুমোও এখন।

হুকুম ঝেড়ে পাশ ফিরে দিব্যি চুপচাপ শুয়ে রইল। হরি হে, তুমিই সত্য! বিপদ একের পর এক কানের রগ ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। আড্ডা দিয়ে গানবাজনা ফুর্তি-ফার্তি করে রাত্রিগুলো ফুৎকারে উড়িয়ে-দেওয়া মানুষ—বয়ে গেছে সলিলের ঘুমুতে। রক্ত টগবগ করে ফুটছে শিরার মধ্যে। বউয়ের গায়ে হাত ঠেকাতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে একছুটে গিয়ে ভোম্বলকে নিরুদ্বিগ্ন করে আসে।

ঘাটের চাতালে ক্রমশ ছোটখাট মজলিস একটা। বাসরের কথা শোনবার জন্য এসে জমেছে। মওকা পেয়েছে তো সলিলই বা ছাড়বে কেন—যেমন মুখে আসে, রসিয়ে রাঙিয়ে রাতের খবর বলে। ভোম্বল একটা গাড়ু সংগ্রহ করে বলে, গল্প-গাছা কর্ তোরা সব, আমি আসছি।

বাসিবিয়ে, তারপর বাসিবিয়ের ভোজ। 'মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া করিবেন'—ভোজের নেমন্তন্নের বয়ান, কিন্তু হতে হতে রাত দুপুর হয়ে যায়। পুবে ফরসা দেয় কোন কোন বাড়ি। অনিল সাফ বলে দিয়েছেন, তেমন হলে না-খেয়েই সব রওনা হয়ে পড়বেন। কাজের মানুষের ঘড়ি ধরে কাজকর্ম। ঠিক চারটেয় বেরিয়ে সাড়ে-সাতটার গাড়ি ধরবেন। ঘাট-স্টেশনে নেমে পিঠ পিঠ গোন পাওয়া যাচ্ছে—কাল প্রহর খানেকের মধ্যেই বাড়ির ঘাটে পেঁছে যাবেন। বউভাত ফুলশয্যা কালই, বন্দোবস্ত ঠিক আছে। কেন না সেসন্স কোর্টে পরশু থেকেই প্রচণ্ড মামলায় লেগে পড়বেন।

এক গাদা ওরা ঘাটের উপর গুলতানি করছিল, আধঘণ্টা খানেক পরে ফিরে এসে ভোম্বল কাউকে আর দেখতে পায় না। গুরুপদকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে: সলিলকে দেখলেন?

কেন দেখব না? দুটো ছুঁড়ি দুই দিকে হাত ধরে টানতে টানতে অন্দরে নিয়ে গেল।

সেরেছে!

বিয়ের বর যে এখন—কাল আর আজ দুটো দিন। হাসির তোলা টাকা-টাকা। পরে তো আবার সেই ভ্যাবলাকান্ত।

অনিল কোথা ছিলেন, দন্তদন্ত হয়ে এসে পড়লেন। দুঃসংবাদটা গুরুপদ দিয়েছে সন্দেহ নেই—ভোম্বলের অবহেলা ও অমনোযোগ ফলাও করেই বলে থাকবে। এসে চোখ পাকালেন ভোম্বলের দিকে: বলেছিলাম না, চোখের আড়াল করবিনে?

ভোম্বল সকাতরে বলে, আমার কি মাঠেঘাটে যেতে হয় না বড়দা? বাদল ফড়িং ন্যাড়া কালোসোনা সব ঘিরে বসে আছে দেখলাম, বলে-কয়ে গিয়েছি সকলকে—

খাইয়ে-মানুষ বলাই মহোৎসাহে এসে বলছে, যা একখানা খ্যাঁট হবে আজ। পনের-বিশ সেরি দৈত্যাকার রুই বঁটিতে বাগাতে না পেরে কাটারি কুপিয়ে কুপিয়ে মুড়ো কাটছে।

অনিল খিঁচিয়ে ওঠেন: কাটারিতে এবার তোমাদের মুড়ো কাটবে একটা একটা করে।

বলতে বলতে চমক লাগে: কাঁদছে যেন বাড়ির ভিতরে। ভাল করে শোন দিকি। হুঁ, তাই—

হবেও বা, ভোম্বল ভাবছে। সারা বেলাস্ত কাল মুখ খুলতে পারেনি, পেটের মধ্যে ফুটছিল। ভদ্রলোকের মেয়েকে একলা পেয়ে রাত্তিরে খানিক খানিক ছেড়ে

থাকবে। সকালে উঠে মেয়ে বলে দিয়েছে। ডেকেডুকে খপরে নিয়ে ফেলে সবসুদ্ধ এখন জামাই যাচাইয়ে লেগেছে। হয়েছে তাই, সন্দেহ কি।

বাদলদের দেখতে পেয়ে ভোম্বল ছুটে গিয়ে পড়ল: কাল থেকে একলা আমি সামলাচ্ছি, বড় বড় ঝড়-তুফান কাটিয়েছি। একটুখানি নেই আমি, অমনি তোরা ছেড়ে দিলি?

বাদল বলে, দুটোয় দু-হাত ধরে ঝুলে পড়ল। লাঠালাঠি করতে যাব তাদের সঙ্গে? বেটাছেলে হলে তা-ও না হয় করতাম।

ফড়িং বলে, লাঠি মেরে হত না। ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়ে—গায়ের জোঁক ছাড়ানোর মতন দু-দিক দিয়ে টেনে ছাড়িয়ে দূরের দিকে ছুঁড়ে দিতে হত।

ভোম্বল বলে, মেয়েছেলে দেখে মাথা ঘুরেছিল। বুঝেছি।

বলাইও শুনছিল। সে বলে, ক্ষুদে ক্ষুদে বলে দু-হাতের মাপ যা দেখাচ্ছে—একবিঘত দেড়বিঘত করে এক একটা। আমাদের মেয়ে তো পেট থেকে পড়েই ওর দশগুণ বিশগুণ।

কান্নাটা থেমে ছিল, আবার রোল উঠল। তুমুল। বলাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, কী করি! আমার যে আবার পায়ের দোষ, ছুটতেও তো পারব না।

ভোম্বল বলে, ছুটে কেউ ওদের সঙ্গে পারবে না। নিখুঁত নির্দোষ পা দুয়ের জায়গায় চারখানা হলেও না। আংটা-মারা জোয়ান সব। অত বড় কনে, দেখলেন না, পিঁড়িতে বসিয়ে দু-জনেই বনবন করে পাক দিতে লাগল। সাতপাক সারা হয়ে গেছে, পরামাণিক চেঁচাতে লাগল—কার সাধ্য ঠেকায়।

বলছে, আর কান পেতে রয়েছে অন্দরের দিকে। হি-হি করে সে হেসে উঠল হঠাৎ: ভয় নেই রে, বাচ্চাকাচ্চার কান্না। বিয়েবাড়ি অনেক এসে জুটেছে, তাদের ছেলেপুলে। বড়দা যা ভয়টা দেখিয়ে গেলেন—উঃ!

জামাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন গিরিবালা। এ-তাবৎ কেবল চোখের দেখাটুকুই হয়েছে, নিরিবিলি এইবারে দুটো অন্তরের কথা হবে। অন্য মেয়েরা পথিমধ্যে আটক করে দক্ষিণের ঘরে নিয়ে ঢোকাল। বউ-ঝিতে ঠাসা—শেষরাত্রির বাসর জমতে পারে নি, এখন এসে জমিয়ে বসেছে সব। ভাল কাপড়খানা ভাল জামাটা পাট করে তোলা থাকে—বাক্স থেকে বেরিয়ে তাই অঙ্গে উঠেছে। সোনা-রুপো যার যেটুকু আছে, তা-ও।

এসো জামাই, এসো এসো। সকলের মাঝখানে এইখানটায় বোসো তুমি। 'নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশীথে বিহরে সুখে—'বিয়ের সব জড় হয়েছি। কাজ অন্তে ফুড়ফুড় করে যে যার পথে উড়ে চলে যাব। আবার কবে দেখা হয় না-হয়—ভাল হয়ে বোসো জামাই, আলাপ সালাপ করি—

নামজাদা উকিলের কনিষ্ঠ, চেহারা ভাল, বাড়িতে পাকা দালান-কোঠা, ধান যা যা পায় বছরখোরাকি হয়ে গিয়েও বাড়তি থাকে। একটা মানুষের এত ভালো অন্যদের কাছে ভালো ঠেকে না। শোনা গেছে বিদ্যা বাবদে জামাই কিছু কমজোরি—

ঠাট্টার সুরে এক মেয়ে শুধায়: জামাই তুমি কলকাতার কোন কলেজে পড়তে?

সলিল বলে, কলেজে পড়তাম আমি? স্বপ্ন দেখলেন নাকি?

স্বাধীন ব্যবসা গড়বে বলেই নাকি বি-এ পাশের আগে পড়া ছেড়ে দিলে।

সলিল হেসে খুন: বি-এ'টা পাশ করিনি তবে? মিথ্যেও নয়। পাঠশালে যে অ-আ মাত্তোর পড়েছে সে-ও বলতে পারে, বি-এ পাশ করিনি। কিন্তু জিনিসটা

সাজালেন কে—হেডমুহুরি গুরুপদ হালদার নিশ্চয়। কোন-কিছু নেই—মক্কেলের জন্য পুটপুট করে গল্প সাজিয়ে ফেলেন। হালদারমশায়ের সাক্ষি পড়ানো অনেক দেখেছি।

কলেজে পড়ো নি তবে, ইস্কুলে তো পড়েছ?

তুড়ুক-জবাবও ছিল সলিলের মুখে। কিন্তু পলকে মঞ্জরী এসে হাজির: জল-খাবারের জায়গা হয়েছে। এসো।

মেয়েটার দশটা চোখ যেন দশ দিকে। আসে আবার রাঙাবউকে নিয়ে, যাঁর কথার উপর আপিল নেই।

রাঙাবউ বললেন, গরম লুচি ভেজে দিচ্ছে, ঠাণ্ডা হলে ন্যাকড়ার মতন হয়ে যাবে। উঠে পড়ো বাবা।

চলল সলিল। আগে পিছে দুই দুর্ধর্ষ ফৌজদার—রাঙাবউ আর মঞ্জরী। বেলা নামে মেয়েটা পিছন থেকে বলল, খেয়ে চলে এসো, আছি আমরা সবাই।

রাঙাবউ বললেন, না, খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবে। রাতে ঘুমুতে পারেনি, ওর ঘুম পেয়েছে।

সলিল প্রতিবাদ করতে যায়: ঘুম পায় নি—

পেয়েছে কি না-পেয়েছে তুমি তার কি জানো? চলো—

মেজের উপর আসন পাতা, জলের গেলাস পাশে। আসনে বসিয়ে দিয়ে মঞ্জী রান্নাঘরে ছুটল। গিরিবালা সামনে এসে বসে পড়লেন। সজল চোখে বলছেন, মন্দাকে তোমার হাতে দিলাম বা। তোমার দাদা দেবতুল্য মানুষ—প্রথম এসেই 'মা' বলে ডাকলেন। অমন দাদার ভাই তুমিও তেমনি হবে। মেয়ের দোষঘাট মাপ করে মানিয়ে গুছিয়ে নিও।

খপ করে হাত ধরে ফেললেন। সলিলের অস্বস্তি লাগে, নতুন-জামাই না হলে ছুটে পালাত। এমনি তো মুখে খই ফোটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি বলতে হবে ভেবে পাচ্ছে না। মালতী মঞ্জী দু-বোনে এসে থালায় বাটিতে জলখাবারের রকমারি পদ থরে থরে সাজিয়ে দিল। যাক বাঁচোয়া, বন্ধ ছিল মুখ, তবু মুখের এই কাজটুকু পাওয়া গেল।

তালপাতার পাখা তুলে নিয়ে গিরিবালা এদিক-ওদিক নাড়ছেন। হাওয়া করা উদ্দেশ্য নয়—মাছি যাতে না বসে খাবারের উপর। পাখা করতে করতে আঁচলে একবার চোখ মুছলেন। বলছেন, কোল-মোছা মেয়ে আমাদের—বড় আদরের। তোমার শ্বশুর তো চোখে হারাতেন। সুপাত্রে মেয়ে পড়ল, উপর থেকে তিনি চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

বাইরে ভোম্বলের ব্যাস্তসমস্ত কণ্ঠ: সলিল আছে ঘরে?

আর কোন দিক থেকে রাঙাবউ অমনি গরগর করে উঠলেন: খেতে বসেছে, অলপেয়েরা তবু ছাড়বে না।

জনান্তিক উক্তিটুকু ভোম্বলেরও কানে ঢুকেছে। অপ্রতিভ কণ্ঠে সে বলল, খাওয়া হয়ে যাক, তারপরে একটু বাইরে পাঠিয়ে দেবেন। দরকার আছে।

সাফ জবাব: যাবে না। শুইয়ে দেবো এখন, নিরিবিলি ঘুমোবে।

ভোম্বল বলে, আমরাও ঠিক ঐ জন্যে ডাকছি। ঘুমিয়ে নিক খানিকটা। ভ্যানর-ভ্যানর করার সময় হুঁশ থাকে না, অথচ ঘুমের খামতি হলে দেহ ওর ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ে।

প্রীত হয়ে রাঙাবউ বললেন, মাঝের কোঠায় জানালা-দুয়োর বন্ধ করে শুইয়ে দিচ্ছি, নির্ভাবনায় যাও তুমি বাবা। আমার নিজের ঘর—মানুষ তো মানুষ, পিঁপড়েটা মাছিটাও উঁকি দিতে সাহস করবে না। বাসিবিয়ে অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোক।

বাসিবিয়ে সকাল সকাল চুকে গেল। ঠিক দুপুরে ভোজ—তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত। কনের এদিকে যে পাত্তা নেই—খোঁজ খোঁজ, গেল কোথায়? চট করে চাট্টি খাইয়ে দিতে হবে তাকে। তারপর সাজানো-গোছানো, কান্নাকাটি, যাত্রামঙ্গল পড়িয়ে রওনা করে দেওয়া—মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো চাট্টিখানি কথা নয়।

রান্নাঘরে ঢুকে মন্দা হেঁসেলে রান্না চাপিয়ে দিয়েছে।

গিরিবালা মালতীকে বলে দিলেন: তুই যা দিকি, ধোঁয়াকালির মাঝখান থেকে ধরে পাকড়ে বের করে নিয়ে আয়। আমি ডাকলাম, কানেই নিল না। চুলের মুঠো ধরে হিড়-হিড় করে টানতাম, তা আত্মীয়কুটুম্ব বাড়ির উপর—সেইজন্য চেপে যেতে হল।

মালতী গিয়ে হানা দিয়ে পড়ল: রান্নাঘরে কেন রে?

মন্দা বলে, বুঝেছি, মা পাঠিয়ে দিয়েছে। বিয়ের আগে মা গালমন্দ করত, রান্নাঘরের ঝুলকালিতে গায়ের রং হাঁড়ির তলার মতন হয়ে যাবে, কেউ পছন্দ করবে না। পছন্দ-অপছন্দর দায় চুকে গেছে, এখন তো নির্ভয়। কালিঝুলি মাখলে, চাই কি উনুনের আগুনে একটা অঙ্গ পুড়ে গেলেই বা কি ক্ষতি?

উঠে আয়—বলে মালতী হাত ধরে টান দিল। বলে, কুটুম্বরা সব ঘুরছে, তারা দেখে কি বলবে? এত লোকে খাবে—সকলের রান্নাবান্না হচ্ছে, তুই আবার আলাদা এখানে কি রাঁধতে বসলি?

মায়ের রান্না। গাঢ়স্বরে মন্দিরা বলছে, কাল তো রাঁধতে আসব না, মা কি খাচ্ছে না-খাচ্ছে দেখতে পাবো না। আজ আমায় করতে দে। হয়েও গেছে—ভাত ক'টা নামিয়ে মাকে বসিয়ে দেবো। মায়ের সঙ্গে আমিও খাবো, সে আমি কিছুতে শুনব না।

গিরিবালা যে ঘরে শোন, ভাতব্যঞ্জন সেখানে নিয়ে গেছে। খেতে বসেছে মা আর মেয়ে। মালতী দরজায় পাহারাদার—ঢুকবে না কেউ, ঘাড় উঁচু করে উঁকিঝুঁকিও দেবে না। দিলে মালতী রক্ষে রাখবে না, রে-রে করে উঠবে। একবার গিরিবালা বলে উঠলেন, আজকের দিনে নিরামিষ খাওয়া—বলে কি হবে, শুনবিনে তো কারো কথা!

এটা কি বললে মা? মায়ের প্রসাদ অমৃত সমান—আঁশ-নিরামিষ আছে নাকি তার?

মেয়ের সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। গিরিবালা মন্দার মুখে এক একবার ভাত তুলে দিচ্ছেন। একফোঁটা বাচ্চা মেয়েকে একদা যেমন খাওয়াতেন। মন্দা খিল-খিল করে হাসে: কী হচ্ছে মা? রান্না করা দেখলে কুটুম্বরা তো নিন্দেমন্দ করত—এই যদি দেখে?

তাচ্ছিল্য ভরে গিরিবালা বলেন, দেখল তো বয়েই গেল।

মালতীও নির্ভয় করে: না, দেখবে না কেউ। দরজার উপর আমি তবে লাঠিঠেঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে কেন? আসতে দিলে তবে তো দেখবে।

খাবেন কি গিরিবালা, হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসাচ্ছেন। মায়ের চোখের জল দেখে মন্দাও কেঁদে পড়ে। সাহসা সে সজাগ হয়ে উঠল: আমিই রাক্ষসের মতন গিলছি, তুমি কিছু খাচ্ছ না মা, বড্ড চালাকি পেয়ে গেছ না? এতক্ষণ আমি খেয়েছি, এবারে তুমি। তুমি অন্তত তিন গ্রাস মুখে নেবে, তবে আমি একটা।

মা ভাতের দলা পাকিয়ে বাইশবছরের ধাড়ী মেয়ের মুখে তুলে দিচ্ছেন, মেয়েও

খাওয়াচ্ছে মাকে। মেয়ে পাঠানোর দিনে বিধবা মানুষটির আচারবিচার ঘুচে গেছে সমস্ত—মেয়ের-ছোঁওয়া এঁটোকাঁটা অবাধে মুখে দিচ্ছেন। আর মেয়েরও দেখ, আজকে জীবনের একটা দিন—এমন দিনে বিধবার সঙ্গে নিরামিষ খেয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ-অলক্ষণ দেখল না। দেখছেই বা কে—মালতী মারমূর্তিতে দ্বারবান হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতর কী-একটা হচ্ছে—কৌতূহলী অনেকে, কিন্তু উঁকি দেবার তাগত কারো নেই। অলক্ষ্যের বিধাতাপুরুষ, যিনি নাকি যাবতীয় পাপপুণ্যের তৌল করে হিসাব টুকে রাখেন, তাঁরও নেই বোধহয়।

॥ নয় ॥

শ্বশুরবাড়িতে মন্দিরা।

শশীমুখীকে সলিল বলল, মা, ছোটবউয়ের শখ তোমার। বউ এনে দিয়েছি, আমার ছুটি। আর আমায় কিছু বলতে পারবে না।

শশীমুখী বললেন, না, তোকে বলব না—যা-কিছু বলবার, ছোটবউমাকে বলব।

বলেনও তিনি। স্পষ্টাস্পষ্টি নয়, ঠারেঠোরে আকারে-ইঙ্গিতে। বলেন, পুরুষ হল ক্ষ্যাপা-জানোয়ার—কড়া হাতে রাশ টেনে রাখতে হয়। ঢিল দিয়েছ কি মরেছ। তার উপর কৈখালির মিত্তিররা বংশ ধরেই বেয়াড়া। আমার অনিলকে দিয়ে বিচার কোরো না। ওটা সৃষ্টিছাড়া—হিরণ্যকশিপুর ঘরের প্রহ্লাদ। তোমার শ্বশুরের কথা একটা-দুটো বলি শোন। বিষয়আশয়ে তখন ভাটার টান ধরেছে, তা হলেও পুরানো রবরবা আছে বেশ।

মজাদার এক গল্প শুনছে, মন্দিরা এমনি মুখ করে আছে।

শশীমুখী বলছেন, বয়সকালে কর্তার বারফটকা রোগ ছিল। ডাকাবুকো মানুষ—কাউকে পরোয়া করতেন না। সেই মানুষকে শেষটা আমি কেঁচো করে ফেলেছিলাম। রাত্তিরবেলা শরিকদের বাড়ি থেকে মড়া পোড়ানোয় ডাকতে এসেছে—আমার পানে তাকিয়ে রয়েছেন: কি বলো, যাবো? কেমন করে হল বলো দিকি?

শ্বশুর-শাশুড়ির ব্যাপারে কী বলতে যাবে, মন্দিরা চুপচাপ শুনছে। শশীমুখী নিজেই আবার বলছেন, বন্দুক-তলোয়ার লাঠি-শড়কি যত যা-ই বলো, কথার মারের উপরে মার নেই। বুড়ো হয়ে গিয়ে গলায় আমার চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরোয়, তখন ঝাঁজ-ঘণ্টা বাজত। একটু বেচাল দেখলে ঝগড়ার চোটে বাড়িতে কাক পড়তে দিতাম না—ঝগড়া গালাগালি আর ফাঁকে ফাঁকে কান্না। একবার লম্বা রোয়াকে নাকে-খত পর্যন্ত দেওয়ালাম। দুনিয়ার মেয়েছেলে মাত্রেই মা—আমি কেবল বাদ। কালীর পট ছুঁয়ে বলতে হল তাই। আট-দশটা ঝি খাটত বাড়িতে—ওনাকে দাঁড় করিয়ে তাদের দিয়ে বাপ ডাক ডাকিয়ে নিলাম।' সবাই বাবা বলে ডাকত।

(এত সব সত্ত্বেও নাকি রেহাই ছিল না—চূড়ামণি দাস আড়ালে মস্করা করেন: কর্তা বলতেন, 'বাবা' আমার ডাক-নাম।)

মাস খানেক কাটল। বিয়ের পর মন্দা সে-ই এসেছে, বাপের বাড়ি যাওয়া আর ঘটে ওঠেনি। দেবব্রত নিতে এসেছিল—সলিলকেও যেতে হবে, বর-বউ দুজনের জোড়ে যাবার নিয়ম। সলিল নারাজ: বিয়ের ঝঞ্ঝাটে কোল-ডিপোর বারোটা বাজবার গতিক। কুণ্ডুরা সিরাজকাটি গঞ্জের ঝানু ব্যবসাদার, সলিলের দেখাদেখি তারাও কয়েক নৌকো কয়লা এনে ফেলেছে। একেশ্বর ছিল, প্রতিযোগী এসে গেল বাজারে। শ্বশুরবাড়ি

গিয়ে আমোদ-আহ্লাদের উপায় নেই এখন। পরে হবে।

অগত্যা একলা মন্দিরাকেই নিয়ে যাচ্ছিল। তাতেও ভণ্ডুল—যাবার আগের দিন শশীমুখী দুম করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, জ্ঞান কিছুতে আর ফেরে না। মচ্ছব অন্তে বাড়ি ইতিমধ্যে ফাঁকা। বউ-ছেলেপুলে নিয়ে অনিল সদরে গিয়ে উঠেছেন, বাইরে থেকে যারা সব এসেছিল তারাও বিদায় হয়ে গেছে। গ্রামের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার যথাসাধ্য করেও কূলকিনারা পান না। সাইকেল ছুটিয়ে তখন সিরাজকাটি থেকে অনন্ত-ডাক্তারকে নিয়ে এলো। বহুদর্শী চিকিৎসক, বয়সে প্রবীণ—ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করে আঁতকে উঠলেন তিনি। বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করে রোগির জ্ঞান ফিরল, কিন্তু বাঁ-দিকটা অবশ। বয়সটা কম হলে অন্তত জোর করে কিছু বলতে পারতেন। তা হলেও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—যথাবিধি চিকিৎসা ও সেবাযত্ন চালিয়ে যেতে হবে, রোগ আর বেশি খারাপের দিকে না গড়ায়।

অষুধপত্তোর ও ব্যবস্থা দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। অনিলও এক রবিবার এসে মাকে দেখে চলে গেলেন। সেবাটা করছে বটে মন্দা—অহর্নিশি লেগেপড়ে আছে। যেন নতুনবউ নয়, কত কাল ধরে এই সংসারে রয়েছে,—দু-খানা হাতে দশভুজা হয়ে গেছে সে হঠাৎ। দেবব্রতকে বলে দিল, এখন আমার যাওয়া হচ্ছে না দাদা, এই অবস্থায় কার উপর রেখে যাই বলু। তুই চলে যা, দূরের দেশে যাবি—তার জন্যে কত গোছগাছ রয়েছে। দু-এক দিনে সেরে যাবার ব্যাধি নয়। খানিকটা ভাল হয়ে উঠলেই আমি জানাব, তোদের চলে যাওয়ার আগে নিশ্চয় দেখে আসব একবার।

শশীমুখী শয্যায় জীবন্মৃত হয়ে আছেন। নতুন চোখে দেখছেন বউকে, মুখে সর্বক্ষণ মা-মা—বুলি। রূপের মেয়ে দেখে আনলেন, এমন গুণের মেয়ে কে ভেবেছে। এত বড় বাড়িখানা ঐটুকু প্রাণী যেন একেবারে ভরে রেখে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে মন্দিরাকে কাছে ডাকেন : অত ছটফটানি কেন ? বোসো মা, আমার কাছটিতে ঠান্ডা হয়ে একটু বোসো।

বসতে হয় এসে। মুখখানা তুলে ধরে শশীমুখী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। পুঁথি পড়ার মতন মুখের উপরে কী যেন পড়ছেন। মন্দা ঘেমে ওঠে। শশীমুখী বললেন, আমাদের আমলে ছোটবয়সে বিয়ে হত। বিয়ের পর থেকে আজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর সংসার বই কিছু জানি নে। বুড়োবয়সের কালরোগ সেরে আবার যে কোন দিন খাড়া হতে পারব, সে ভরসা করিনে। তোমারই সংসার—এখন থেকে দেখে-শুনে বুঝেসমঝে নাও।

বলতে বলতে জল বেরিয়ে পড়ে কোটরগত চোখে। কাঁপা হাতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলতে লাগলেন, গোলমাল অশান্তি আছে—শক্ত হাতে হাল ধরে তুফান কাটাতে হবে। আমার সাধের গৃহস্থালীতে তুমি মা ধ্বস নামতে দিও না।

সলিল একদিন বলল, তোমার কাছে গোপন রাখতে চাইনে—জিনিসটা খোলসা হওয়া ভাল।

মন্দিরা নিরীহ কণ্ঠে বলে, কিছু গোপন আছে বুঝি ?

আছে। তাই বলব।

পরম উল্লসিত হয়ে মন্দিরা বলল, সেই তো উচিত। নইলে তোমার কথা আমায় বললে না, আমার কথা তোমায় বললাম না, তাতে সুখশান্তি হয় না।

সুখশান্তি না কচু হবে !—সলিল ভ্রূভঙ্গি করে তিক্ত কণ্ঠে বলল, অশান্তি ঠেকানো

কারো বাপের ক্ষমতায় কুলোবে না।

ভয় দেখাচ্ছ কেন গো? নিজের সব খোলাখুলি বলছ, দোষত্রুটি আমার ঢেকে নেবে যাত্রামঙ্গলের সময় বলে এসেছ—তার পরেও যদি কিছু হয়, আমার দোষে হবে, আমি তা হতে দেবো না, দেখো।

সলিল অধীর ভাবে বলল, শোনই না, শুনলে ও-রকম হাসি থাকবে না।

কাজ নেই তবে শুনে। বাব্বাঃ, না হাসতে পেলে আমি মরে যাব।

মুহূর্তকাল থেমে থেকে বোমা ফেলার মতন সলিল বলে উঠল, আমার জীবন ভাল নয়।

চালাকি করছ তুমি, ভয় দেখাচ্ছ। আমি ভয় পাইনে—

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল কথাটা—তরল কণ্ঠে মন্দা বলে, পরী দেবীর কথা ভাবছ বুঝি?

অবাক হয়ে সলিল বলে, চিঠি পেঁছিছিল তবে?

মন্দিরার হাসি বেড়ে যায়। বলে, দেখ তবে, জেনেশুনেও মুখ থেকে হাসি যায় নি। তুমি হেরে গেছ।

বিয়ের আগে জানতে?

হুঁ-উ-উ—টানা আওয়াজ তোলে মন্দা, আর মাথা দোলায়ঃ হার তোমার—হার, হার—

সলিল বলে, তবু বিয়ে ভাঙল না?

বিজয়িনীর ভঙ্গীতে মন্দা বলল, অন্যে জানলে তবে তো ভাঙবে? চিঠি গাপ করে ফেললাম যে।

ভয় হল না?

অত ভয়-টয় নেই আমার। একবার হল কি—জামরুলগাছের গর্তে শালিকের বাচ্চা। আহা, শোনই না গল্পটা। বাচ্চা নিতে হাত ঢুকিয়েছি, ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগে। সাপ ঢুকে পড়েছে বাচ্চার লোভে। ল্যাজ ধরে টেনে ছুঁড়ে দিলাম সাপটা। চেঁচাই নি, মুখের কথাটাও বলিনি কাউকে। টের পেলে মা তেড়ে এসে চুলের মুঠি ধরত।

শুনছে সলিল। টিপে-টিপে চতুর হাসি হেসে মন্দা বলে, বলি নতুনটা কী করেছ যে ঘটা করে সকলকে তাই বলতে যাব? আমার দাদামশায়ের দুই বিয়ে। ছোটবয়সে দুই দিদিমাকে দেখতাম পিঠোপিঠি দুই বোনের মতন।

সলিল বলে, ওসব সেকালে মানাত।

একালে আরও বেশি মানাবার কথা। নানান দিকে এত প্রগতি—এই খুঁতখুঁতানি কেন থাকতে দেবো? তবু তো বিয়ে করোনি পরী দেবীকে—

খিল-খিল করে মন্দা হেসে ওঠেঃ আইন বেয়াড়া। করবার উপায়ও নেই যতক্ষণ না আমায় তালাক দিচ্ছ। সে-ও বড় চাট্টিখানি কথা নয়—

বিরক্ত হয়ে সলিল বলে, দেবী-দেবী করছ—দেবীটির কুলশীল আছে তো জানা।

নেই আবার! সিরাজকাটি থাকেন তিনি, যেখানে তোমার কয়লার ডিপো। গানে-বাজনায় ওস্তাদ। সেতার শেখো তুমি তাঁর কাছে।

জেনেশুনেও দেবী বলছ, তিনি-তিনি করছ?

মন্দা নিরীহ কণ্ঠে বলে, বয়সে বড়। তা ছাড়া গুরু হলেন তিনি তোমার। সে হিসাবে আমারও গুরু।

গুণ বর্ণনায় বাধা দিয়ে সলিল বলল, ওদের কাছে দিনের পর দিন যারা যায়,

শুধুমাত্র বাজনা বাজিয়েই তারা ফেরে না—সেটুকুও জ্ঞান নিশ্চয়। তবে আর কি। জেনেশুনে এসেছ, আমার কোন দায় নেই। একটা কথা বলে রাখি, যখন খুশি ডিভোর্স নিয়ে নিও, আমি বাদী হতে যাব না। খাওয়া-পরা ছাড়া কোন-কিছুর প্রত্যাশা কোরো না আমার কাছে।

ব্যস, ব্যস। প্রসন্নমুখে মন্দিরা বলল, যা বাজার পড়েছে—খাওয়া-পরাটাই কম নাকি? ডিভোর্স কিছুতে নেবো না, অত বোকা ভেবো না আমায়।

সত্যি সত্যি তাই। এক তিল উদ্বেগ নেই বউয়ের। শাশুড়ির সেবাযত্ন করছে, সংসার দেখছে দৌড়ঝাঁপ করে, হাসছে, গল্পগাছা করছে।

গিরিবালাকে মন্দা চিঠি লিখেছে। সলিল বেরুচ্ছে দেখে ডাকে ফেলতে তার কাছে দিল। খামের চিঠি, ঠিকানা ইংরেজিতে। চক্ষুদ্বয় তো ছানাবড়া। পাকা হাতের টান—বি-এ এম-এ'দের কান কেটে দেয়, দাদা অনিল অবধি লজ্জা পেয়ে যাবেন নতুন বউয়ের হস্তাক্ষর বাবদে। পোস্টাপিসের বদলে পুকুরধারে গিয়ে জল লাগিয়ে সলিল খাম খুলে ফেলল। সাপ না ব্যাং—কি আছে আঁটা—চিঠির ভিতরে, পতিদেবতার মহিমা কদ্দুর কি জাহির করল, দেখা যাক। হরি হরি, একেবারে ধোয়া তুলসিপাতা—

মাগো, ঠিক এক্ষুনি কী করে যাই বলো। নতুন যাঁকে মা পেয়েছি, একেবারে শয্যাশায়ী তিনি। চলাফেরা করতে পারেন না, আমায় তো অহরহ চোখে হারান। কাজকর্ম ফেলে তোমার জামাইও সেই থেকে একনাগাড় বাড়ি বসে রয়েছে। খানিকটা খাড়া করে তুলে দু-চার দিনের জন্য হলেও বেড়িয়ে আসব। ব্যস্ত হোয়ো না মা, তোমাদের সুন্দরনগরে চলে যাবার আগে নিশ্চয় গিয়ে হাজির হব। তোমার জামাইও যাবে।

কত কি লিখেছে—চোখে অন্ধকার দেখে সলিল, চিঠি তাড়াতাড়ি খামে ঢুকিয়ে দিল। আস্ত একখানা পাতা জুড়ে গোটা গোটা অক্ষরের মুক্তো সাজিয়ে গেছে—খামে ঢুকিয়ে চোখের অন্তরাল করে যেন বাঁচল। শাড়ি-পরা কোন্ এক ছদ্মবেশী মহামহোপাধ্যায়কে বউ করে ঘরে এনে তুলেছে, ভাবতে গিয়ে বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে যায়।

সলিল একসময় নিজে থেকেই বলে, দশঘরা থেকে চিঠির পর চিঠি আসছে, দেবুবাবু এসে ফিরে গেলেন—তা নড়ছ না কেন তুমি? মায়ের অসুখ দু-দশদিনে সারবার নয়, সেরে যাবে তা-ও ডাক্তার বলছেন না—

মন্দা বলে, তুমিও তো নড়ো না—

সলিল অবাক হয়ে বলে, সিরাজকাটি যেতে বলছ নাকি তুমি?

অমন খাসা ব্যবসা ফেঁদে বসেছ, না গেলে উড়েপুড়ে যাবে যে সব।

ফিক করে মন্দা হাসল একটু। বলে, আমারও বদনাম। লোকে বলবে, বরকে ভেড়াকান্ত বানিয়ে বউ আঁচলের গিঁঠে বেঁধেছে।

থই পাওয়া যায় না দ্বেষহিংসা-বিবর্জিত পরমহংস-ঠাকরুনটির। পরীবালার মোকাম জেনেবুঝেও সিরাজকাটি যেতে বলছে।

মাঝে আবার মন্দা অন্য কথা এনে ফেলল: যাত্রামঙ্গলের সময় বলেছিলে, দোষ-ঘাট তুমি সামলে নেবে।

সলিল হেসে উঠল: নতুনবউ নিয়ে ধন্যি-ধন্যি পড়েছে—কোন দোষ কোন ঘাট আছে বলো তো দু-চারটে, আমার একটু ভরসা হোক।

মন্দা বলে, গান-বাজনায় আমি গোমুখ্যু। ছোট্টবয়সে চেষ্টা হয়েছিল দিনকতক—সা-রে-গা-মা-পা-ধা করলে পড়াশিরা গাধা-গাধা করে উঠত। বলত, গাধা ডাকছে। এবারে তোমার কাছে নতুন করে ধরব। এত বড় গুণী তুমি, আর আমি একেবারে আনাড়ি—কেমন যেন দূরে দূরে যাচ্ছি, কাছে যেতে পারছিনে তোমার।

সলিল বলে, আর তুমি যে ইংরেজি-বাংলা একগাদা কবজা করে বসে আছ, তাতে বুঝি দূর হয় না!

ছাই! বলে মন্দিরা ঠোঁট বাঁকাল।

চোখে ধুলো কদ্দিন আর দিয়ে রাখবে?

প্রাচীন আলমারিটার দেরাজ টেনে তিন-চারটে বই তুলে সলিল রাগে রাগে ছড়িয়ে দিল। বলে, কী এ সমস্ত, শুনি? দাদা যে আমলে বাড়ি থাকত, তখনকার বই। উকিল হয়ে দাদা সদরে উঠল, সেই থেকে আট বচ্ছর আজ আরশুলা ছাড়া অন্য কিছুতে স্পর্শ করেনি। এত কাল পরে আমার ঘরে এ সমস্ত পেঁছিল কেমন করে—বইয়ের পা গজিয়েছে?

॥ দশ ॥

তড়াক করে উঠে সলিল হাত ধরে ফেলল। এমন আজব জিনিসও সম্ভব দুনিয়ার উপর! পাঁচটা বাজে নি, আকাশে তারা জ্বল-জ্বল করছে—এ হেন ঘোর প্রত্যুষেও উঠে বসতে পারে সলিল, উঠে বসে চোখ মেলে। বিয়ে করে এরই মাঝে চরিত্র-বদল—যে না সে-ই এ-কথা বলবে।

কড়া মুঠিতে এঁটে ধরেছে—দাঁতাদানোর মতন জোর। পুরুষ তো এমনিই হবে। নয়তো রোগা টিং-টিং করছে, হাতে গলায় একবোঝা করে মাদুলি, হাঁটতে গেলে টলে পড়ে—ধুস!

চোখে জল বেরিয়ে আসে মন্দার, মটাস করে কবজি না ভাঙে। বলে, ছাড়—

সলিল গজরাচ্ছে: বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—নিত্যি সকালে পায়ে সুড়সুড়ি—কেঁচোর মতন কিছু যেন পায়ের পাতার উপর হেঁটে যায়। ভাবি, চোখ মেলে দেখব! হয়ে ওঠে না, আলসেমি লাগে।

মন্দা অনুনয় করছে: হাত ছাড়। লাগছে সত্যি—

আর করবে না বলো—

না।

যে-ই মাত্র ছেড়ে দেওয়া, মন্দা হাত কয়েক পিছিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বলে, করব-করব-করব। নয় তো কুড়িকুষ্ঠ হয়ে মরব নাকি আমি?

কুড়িকুষ্ঠ কেন?

পাপে—মহাপাপে।

টিপিটিপি হাসে মন্দা। বলে, আমার সজাগ ঘুম। তবু হয়তো এক-আধবার গুরুজনের গায়ে পা ঠেকিয়ে বসেছি। পায়ে মাথা ছুঁইয়ে সেই পাপ খণ্ডন করে যাই।

ভ্যালা আমার গুরুজন রে! ঘর করো কিছুদিন, গুরুজনের ঠেলা বুঝবে। বাড়ির সবাই ভালমতন বুঝে নিয়েছে—দাদার ছেলে এক-ফোঁটা রঞ্জনটা পর্যন্ত। বিজয়াদশমীর দিন জোড়াসন্দেশ কবুল করেও পায়ের গোড়ায় প্রণাম আদায় করতে পারিনে।

বলতে বলতে সলিল আগুন হয়ে ওঠে। বলে, আমি যা আছি, তাই। নিন্দেমন্দ গালিগালাজ এক কানে মধু ছড়াতে ছড়াতে ঢোকে, অন্য কানে বেরিয়ে যায়। কিন্তু

পায়ের উপর মুখ গুঁজে পড়ে ভক্তি দেখানো—ক্ষেপে গিয়ে কোন সময় এক কাণ্ড করে বসব। আলতো ভাবে হাত ধরেছিলাম—তাতেই চিঁ-চিঁ করে উঠলে, যেমন-তেমন এক থাপ্পড় খেলে তো হাড়গোড় চুরমার হয়ে যাবে। খেয়াল রেখো সেটা।

শোয় না আর সলিল, বেরিয়ে গেল। পরে শোনা গেল, বাইরেবাড়ি একটা বেঞ্চির উপর লম্বা হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে, বলা নেই কওয়া নেই, সাইকেল চেপে রওনা দিল। আর পাত্তা নেই। দুপুর নয়, রাত্রে নয়, তার পরদিনও নয়।

গোলমালে পড়লে ভোম্বল আছে। মিত্তিরদের সংসারে তাই ইদানীং হয়ে দাঁড়িয়েছে। শশীমুখীর অসুখে সে ডিপোর কাজকর্ম ফেলে কৈখালি এসে উঠেছে, চিকিৎসার তদ্বির-তদারকে লেগে পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে নতুনবউ মন্দিরা, বাইরের ছুটোছুটিতে ভোম্বল। এই ব্যাপারেও শশীমুখী তাকে ডাকলেন : চলে যা বাবা, ধরে নিয়ে আয়। বউটার মনে কি হচ্ছে, বল্ দিকি।

কোথায় যেতে হবে, বলে দেবার কিছু নেই। এবং ধরে আনা কারো পক্ষে যদি সম্ভব হয়, সে এই ভোম্বল।

অতএব, সিরাজকাটি গিয়ে পড়ল। ঠিক দুপুরে—আহারাদি বাবদে এখন সলিল বাসাবাড়িতে। ভোম্বল বলে, পালিয়ে চলে এলি—ঝগড়াঝাটি হল বুঝি?

হলে তো বাঁচা যেত। পাল্টা আমিও দু-কথা বলতাম। বাঁধা-পথ সেটা, নতুন ঠেকত না। তা নয়, ভোররাত্রে উঠে পায়ে মাথা ঠোকে। বাপরে বাপ, মানুষ থাকতে দেবে না—দেবতা-গোঁসাই বানিয়ে ছাড়বে।

ভোম্বল বলে, বাড়ি চল্—

বিরক্ত কণ্ঠে সলিল বলে, বিয়ে-বিয়ে রব তুলেছিলি, বিয়ে তো সেরে দিয়েছি। তুই বাড়িতে, তার উপর আমিও বাড়ি পড়ে থাকলে ব্যবসা এদিকে যে লাটে উঠে যাবে।

ভোম্বল বলে, মাসিমার অসুখ গা-সহা হয়ে আসছে, গঞ্জে আমি থাকব। নতুনবউ রয়েছে, তাকে ফেলে এ রকম আসতে নেই।

পুরোমাস তো কেটে গেল—বউ কদ্দিন আর নতুন থাকবে বলতে পারিস?

ভোম্বল বিধান দিল : যদ্দিন না একবার অন্তত বাপের-বাড়ি ঘুরে আসছে।

সলিল বলে, সারাজন্ম যদি বাপের-বাড়ি না যায়, খুঁটো পুঁতে কৈখালির সংসারে পড়ে থাকে—বুড়োথুখুড়ে হয়েও নতুনবউ থেকে যাবে? আর বউ আগলে বাড়ি থাকতে হবে আমায়?

যায় কি করে বাপের-বাড়ি? শ্বশুরবাড়ি থেকে হুট করে একলা বেরিয়ে পড়তে পারে না। ভাই ফিরে গেছে, তুই সঙ্গে নিয়ে চলে যা। প্রথমবার জোড়ে যাবার নিয়ম—সেরে আয় রীতকর্মটুকু।

সলিল আঁতকে উঠল : ওরে বাবা! ঘেঁটুর গন্ধ চাপা নেই—হাতের নাগালে পেলেই পেটাবে। দাদা তো ভাইকে আকাশে তুলে এসেছিলেন, তাঁকে আর পাচ্ছে কোথা—একলা পেয়ে আমার উপর দিয়ে শোধ তুলবে। ও তালে নেই বাবা।

আনা গেল না কিছুতে। ভোম্বল ফিরে এলো

॥ এগারো ॥

গঞ্জের হাট বড় জমজমাট। বিস্তর ধানচাল ওঠে, গুড় ওঠে, তামাক ওঠে। মাছও

ওঠে প্রচুর। কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে ব্যাপারি ও খদ্দের এসে জমে। নৌকোয় নৌকোয় ঘাটের দিককার জল দেখা যায় না।

শুরু সকালবেলা থেকে—সারাদিন চলে, সন্ধ্যাবেলা শেষ।

হাটখোলা ছাড়িয়ে গাবতলার ঘাট। ঘাটের দক্ষিণে থানা, সাবরেজেষ্ট্রি-অফিস ইত্যাদি, এবং অনন্ত ডাক্তারের ডাক্তারখানা। পশ্চিমে পেশাকার-পাড়া। হাটের দিন সে পাড়াতেও মচ্ছব জমে খুব। ঠিক দুপুরে হয়তো শুনবেন ঘুঙুরের আওয়াজ, সঙ্গে বেতালা সুরের গান। হাট ভেঙে যায়, পাড়ার হুল্লোড় তারপরেও অনেক রাত্রি অবধি চলে।

এক হাটবারে, ভর সন্ধ্যাবেলা হাট ভাঙো-ভাঙো তখন, মন্দিরা আর ভোম্বল ডিঙিতে করে গাবতলার ঘাটে নামল—অনন্তফার্মেসিতে ঢুকে গেল। হাটবার বলে রোগির ভিড় খুব, ডাক্তারবাবু মহাব্যস্ত। কথাবার্তা বেশি হল না। ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র কিনতে বললেন—তিনিই সব শিখিয়ে বুঝিয়ে দেবেন মন্দিরাকে। রোগের যখন বাড়াবাড়ি নেই, পুরানো ব্যবস্থাই চলুক আপাতত।

সামান্য দু-এক কথায় মিটে গেল। পথে এসে ভোম্বল বলে, এই তো মামলা। কথা ক'টা আমি কি বলতে পারতাম না? তার জন্যে আপনি বউমানুষ এন্দুর ঠেলে আসতে গেলেন কেন?

মন্দিরা বলল, ভিড়ের জন্য আজ মন দিতে পারলেন না—হাটবারে আর আসা হবে না। নইলে প্রাণ বেরিয়ে যেত খুঁটিনাটির জবাব দিতে দিতে। রগচটা মানুষ—সামান্য এদিক-ওদিক হলে ক্ষেপে যেতেন।

ঘাটের কাছে এসে মন্দিরা থমকে দাঁড়াল। ভোম্বল বলে, কি হল বউদি?

খাসা গাইছে, কী সুন্দর গলা!

ভোম্বল বলে, খারাপ পাড়া। সেই যা শুনে থাকেন। ও কি, চললেন কোথা?

গান শুনে আসি। জোয়ারের তো দেরি আছে।

মন্দিরা পা চালিয়ে দিল পশ্চিমমুখো। কী করেন,—বলে ভোম্বল পথ আগলে দাঁড়ায়: ছোড়দারাও থাকতে পারে ওখানে।

মন্দা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, ভালই তো, দেখা হয়ে যাবে। আপনি আসবেন না ঠাকুরপো, নৌকোয় গিয়ে বসুন গে।

একা যাবেন?

আপনাকে দেখলে রাগ আপনার উপরে পড়বে, আপনিই যেন নিয়ে তুললেন। অথচ কিছু আপনি জানেন না। জিজ্ঞাসা করলে আমারই সম্পূর্ণ দোষ বলবেন,—যা সত্যি কথা। রেখে ঢেকে কিছু বলতে যাবেন না।

হাট-ফেরতা লোকে দেখে, একাকিনী মেয়েলোক—সর্বদেহে শাল জড়ানো, দীর্ঘ-ঘোমটা—সুট করে পাড়ায় ঢুকে। কেমন চেহারা, কী আন্দাজের বয়স, উঁকিঝুঁকি দিয়ে কিছু বোঝবার জো নেই। ভাবছে, আমদানি—নইলে এ রকম মুড়িসুড়ি দিয়ে যাবার কথা তো নয়।

উত্তেজনার বশে মন্দা অবস্থাটা গোড়ায় হুঁশ করে নি, পাড়ার ভিতরে এসে থমকে দাঁড়ায়। এসেছে যখন, ফেরাফেরি নেই। খোড়োঘরই সব—দোচালা বাংলাঘর, পাঁচচালা চৌরিঘর। পাড়াটার এবং বিশেষ করে বাড়ির বর্ণনা ভোম্বলের কাছে আগেই শুনেছে। উঠানে বাতাবিলেবু গাছ,—হাঁ, ডালপালা দেখা যায় ঐ, লেবু ফলে আছে।

চারপোতায় চারটে ঘর। কেউ-বা উঁকি দিয়ে দেখল একটু। বিশেষ দিনে আজ সকলে খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত—হাটবার না হলে কাছে এসে আলাপ-সালাপ করত।

গান হচ্ছে, তবলার সংগত। সমের মুখে বাহবা-বাহবা রব উঠল। ভাল গান, অপরূপ সুরেলা কণ্ঠ। ভেজানো দরজা ঠেলে মন্দিরা ঘরে ঢুকে গেল। মেজেয় সতরঞ্চি-পাতা—আসর বসেছে। যেন চেনা পাড়া, চেনা বাড়ি, ঘরের মানুষ ক'টির সঙ্গেও ভাল মতন চেনা-জানা। বসে পড়ল সে—দীর্ঘ ঘোমটা তখনো। সকলে ভাবছে, এ-ঘর ও-ঘরের কোন মেয়ে হবে, বউ সেজে এসে রঙ্গ করছে।

হারমোনিয়াম নিয়ে পরীবালা গাইছে সতরঞ্চিতে ঈষৎ কাত হয়ে, সামনাসামনি বসে সলিল সংগত করছে। বউমানুষ দেখে পরী থেমে গেল। সলিল মসগুল হয়ে বাজাচ্ছিল, রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল। সব রক্ত শুষে গিয়ে মুখ তার পাংশু হল মুহূর্তে, তবলার উপরে হাত দুটো নিশ্চল। সলিলের গতিক দেখে পরী খানিক খানিক আন্দাজে বুঝেছে—বুক ঢিবঢিব করছে তার। ঘরের সব ক'টি মানুষ একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে। না-জানি কী কাণ্ড ঘটে যায় এক্ষুনি।

ঘটল ঠিক উল্টোটি। অতবড় ডাকসাইটে ঘরের বউ—'কি করেন' 'কি করেন' বলতে না বলতে—পরীবালা পেশাকারের পায়ের গোড়ায় ঢিব করে গড় করল।

লাফ দিয়ে দু-পা পিছিয়ে পরীবালা বলে, এটা কি হল বলুন তো ?

মন্দা বলল, আপনি বড়দিদি যে আমার—

যারা সব মহফিলে এসেছে সকলের দিকে মন্দিরা নিঃসংকোচে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। সলিলের দিকেও। সলিলের দু-চোখ দপ-দপ করছে। পরী ঘাবড়ে গেছে—মেজাজের সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে, ঝাঁপিয়ে না পড়ে বউটার উপর। থানার মানুষরা মুকিয়ে আছে—তিলটুকু হলেই মস্তবড় তাল বানিয়ে রোজগারের ফিকির করবে। হাতজোড় করে সকলকে বলে, আজকে আর হবে না, বুঝতে পারছেন। গা তুলুন তবে এবারে।

একটি-দুটির ঘোরতর আপত্তি: মাঝ-আসরে অমনি গা তুলুন। শুরুতে কেন বললি নে ?

পরী বলল, বোন এসে পড়বেন তখন কি জানি। শরীর গতিক খারাপ হলে কি ইষ্টিকুটুম এসে গেলে একটুকু বিবেচনা করবেন না, তবে আর কেমনধারা বন্ধু। উঠে পড়ুন, দেরী করবেন না। পাশে পাঁচীর ঘর, কিম্বা আরও কতজনা রয়েছে।

একে দুয়ে সবাই বেরিয়ে গেল। আছে সলিল আর মন্দা। পরী মন্দাকে বলে, আচমকা এসে পড়ে আসর লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। বন্ধুরা চটেমটে চলে গেল। হাট-বারের দিনটা বড্ড ক্ষতি-লোকসান আমার।

সলিল ফুঁসছিল, লোকজন ছিল বলে বলতে পারে নি। গর্জে উঠল সে: লোকসান যা হয়েছে পূরণ করে দাও, ভালোর তরে বলছি। এত বড় দুঃসাহস, এইখান অবধি ধাওয়া করে এসেছ !

অবোধ দৃষ্টি মেলে মন্দিরা তাকায়, কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। বলে, বোনের বাড়ি বোন এসেছে, তা তুমি চোখ পাকাচ্ছ কেন ও-রকম ?

অন্যসব ঘরের কিছু স্ত্রীলোক উঠানে এসে জমেছে, দু-চারটি পুরুষও। মজাদার বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে রটনা হয়ে গেছে: গৃহস্থবউ পরীবালার ঘরে ঢুকে লুচ্চো-স্বামীকে হাতে-নাতে ধরেছে।

লোকের ভিড় দেখে সলিল পিছন-দরজা দিয়ে তৎক্ষণাৎ গা-ঢাকা দিল।

মন্দিরা হাসছে। এত কাণ্ডবাণ্ড হাসির উপরে তার ছায়া পড়ে নি। আগুনের

আংটি খুলে ফেলল। বলে, আমার অন্যায়—কিন্তু অন্যায় আপনারও আছে দিদি। গলায় এমন মিঠে সুর কেন এনেছেন? ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছি। তা নৌকোয় উঠব কি, গানে যেন পথ ভুলিয়ে টেনে হিঁচড়ে এইখানে এনে তুলল।

পরীবালার হাত টেনে নিয়ে আঙুলে আংটি পরিয়ে দিল। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে: খেটেছে বেশ তো।

উঠানের মানুষ খোলা-দরজায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আরও একবার এমনি ঘটেছিল, বছর কয়েক আগে। রীতিমত জমেছিল সেবার, হাটুরে লোক ভেঙে এসে পড়েছিল। স্বামী বউয়ের চুলের মুঠি ধরে কিলের পর কিল ঝাড়ছে। বউও কম যায় না—উঠানের মুড়োঝাঁটা তুলে নিয়ে স্বামীদেবতাকে যথাসাধ্য পেটাচ্ছে। থানা থেকে কনস্টেবল এসে পড়ে দম্পতিকে শেষটা আলিঙ্গনমুক্ত করে। লোকে দু-চোখ ভরে দেখেছিল। আর, এবারে দেখ—ফুসফাস উঁচু গলায় কথাটি পর্যন্ত নয়। কোনো এক মহৎ কর্ম যেন করেছে—আগন্তুক বউটা পুরস্কার স্বরূপ নিজের আংটি খুলে পরীবালাকে পরিয়ে দিল। এই দেখতে আসে কেউ—দূর!

বেশ খানিকটা বাইরে কাটিয়ে সলিল এলো। বলে, জোয়ার এসে গেছে। বলি, বাড়ি-টাড়ি ফিরবে না এইখানে একটা ঘর নিয়ে থেকে যাবে?

পরীর গা টিপে মন্দিরা বলে, শুনুন দিদি কথার ছিরি—

তারপর একমুখ হাসি নিয়ে সলিলের কথার জবাব দেয়: তুমি থাকলে থাকব বইকি। রামের সঙ্গে সীতা পঞ্চবটীর জঙ্গলে গিয়ে ছিলেন। এ তবু জঙ্গল নয়, মানুষের পাড়া।

জোর দিয়ে আবার বলল, তুমি যেখানে আমিও সেখানে।

বেরুচ্ছে, পরীবালা পিছনে ডাকল: শোন সলিলবাবু, ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছে, আর আসবে না। ওকে কিছু বোলো না তুমি।

ঘাড় নেড়ে মন্দিরার ঘোর প্রতিবাদ: আসব, বোনের বাড়ি আসব না তো কি! একশ বার আসব, হাজার বার আসব।

ফিরে দাঁড়িয়ে সলিল তীক্ষ্ণকণ্ঠে পরীকে বলল, অন্ন কাড়তে এসেছে, তার উপরে দরদ দেখাচ্ছে?

পরীবালা বলে, ঠাকুর যেখানে যে অন্ন মেপেছেন, ঠিক ঠিক তা পেয়ে যাব, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু দেখো, এখানকার এসব ঘুণাক্ষরে না বেরোয়।

সে গরজ সলিলেরই বেশি, কিন্তু ধরা দিতে যাবে কেন? বলল, আমার দু'কান-কাটা—কেয়ার করিনে। ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াব, কুলবধূ হয়ে মাইফেলের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

মন্দাও সতেজে বলে, বোলো তাই—ডরাইনে। তুমি হাজির থাকলে কোনে-কিছুতে দোষ হয় না। সতীনারী পতি-সঙ্গে—নিন্দে না করে লোকে আমায় ধন্যি-ধন্যি করবে।

কথা বলতে বলতে পাড়া ছাড়িয়ে গাঙের ধারে এসে পড়েছে। মুখ বেজার করে সলিল বলে, এ তো বড় আচ্ছা সতীনারীর পাল্লায় পড়া গেল। জোঁকের মতন গায়ে লেপটে থাকবে।

নাটুকে-সুরে মন্দা বলে উঠল, দিবসে-নিশীথে শয়নে-স্বপনে আমি তোমারি।

ফোঁস করে সলিল এক নিশ্বাস ছাড়ল: মরণ ছাড়া রেহাই নেই—

মন্দা বলে, সতীর হাত থেকে মরেও রেহাই মেলে না। মরে গেলেন সত্যবান, তা-ও কি এড়াতে পারলেন? সতী সাবিত্রী যমেরবাড়ি অবধি গিয়ে হিড়হিড় করে মর্তলোকে টেনে নিয়ে এলো।

চুপচাপ যাচ্ছে। এক সময় সলিল বলে উঠল, ঘেন্না হয় না তোমার? আমি হলে তো পোড়া স্বামীর মুখদর্শন করলাম না।

আমার বড়দি মেজদি ঐ মেজাজের, জীবনে তাই শান্তি পেল না। দেখ, দোষঘাট নেই কার? এমন যে চাঁদ, তাতেও কলঙ্ক। রাগ-টাগ হলে নিজের বিচারে বসি। দোষ আমারও কত, চেপেচুপে রাখি তাই। তুমি যে ব্যোম-ভোলানাথ—মনে মুখে আলাদা নেই। সব কিছু চাউর হয়ে যায়। মুখোস পরে দশের একজন হয়ে যাও দিকি।

ব্যস, এইটুকু?

এ জিনিস কম হল নাকি?

ডিঙির কাছে এসে মন্দা কলকল করে ভোম্বলকে ডাকে: কাকে টেনে নিয়ে এসেছি, বেরিয়ে দেখুন। আপনি পারেন নি—থোতামুখ ভোঁতা করে ফেরত গিয়েছিলেন।

চোখ গোল-গোল করে সলিলের দিকে তাকায়: নজর ফেলে ভস্ম করে ফেলবে নাকি? ঠাকুরপো'র কি দোষ?

ভোম্বল কৈফিয়তের সুরে বলে, ডাক্তারবাবুর কাছে আসব বলে ডিঙি ঘাটে এনে রেখেছি—বউদি দেখি আগেভাগে চেপে বসে আছেন। আমি না' করছি তো একলাই উনি চলে আসবেন। কী করি তখন, উঠে বসতে হল।

মন্দিরা হি-হি করে হাসে।

সলিল বলে, মায়েরও আক্কেল বলিহারি যাই। ঘরের বউ তিনি হাটে-মাঠে বের হতে দিলেন।

হাত-মুখ নেড়ে মন্দা সেই বাহাদুরির গল্প করছে: বললাম, ডাক্তারবাবুর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা। আমার মতন তো জানেন না ঠাকুরপো, উল্টোপাল্টা বলে হয়তো বা ভুল-ব্যবস্থা নিয়ে আসবেন। শুনে মা তক্ষুনি ঘাড় নেড়ে দিলেন: তুমিও যাও তবে বউমা—

ডিপোর কি-একটা জরুরি কাজে ভোম্বল থেকে গেল। ডিঙি ছেড়েছে। ক্ষণপূর্বের ঘটনাগুলো তোলাপাড়া করছে সলিলের মনের ভিতর। তিক্তকণ্ঠে বলল, বাজারের মেয়েমানুষের সঙ্গে দিদিসম্পর্ক পাতিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে এলে, কিন্তু মুনাফা তাতে একফোঁটাও হয় নি, জেনে রাখ।

মুখখানা মলিন করে মন্দা বলে, যেটা ইচ্ছে হবে করবই করব—ছোটবেলা থেকে আমার স্বভাব। বরাবর জিতে এসেছি, হার কেবল তোমার কাছে। শোন, কথাটা আমার রাখতেই হবে।

ঘাড় নেড়ে রুক্ষ কণ্ঠে সলিল বলে, ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই আমার। ভাঁওতা দিতে পারব না। পরীবালার ঘরে যাতায়াত, সম্পূর্ণ জেনেশুনেই তুমি এসেছ।

ওসব কে বলতে যাচ্ছে? বোন হয়ে দিদিকে নিয়ে বলব—ছি ছি। একটিবার দশঘরায় যাবে আমায় নিয়ে। এই হপ্তায় না হলে সামনের হপ্তায়। চিঠি এসেছে—সবসুদ্ধ সুন্দরনগর চলে যাচ্ছে বাড়িতে তালা দিয়ে।

সলিল এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়ছে। নাছোড়বান্দা হয়ে মন্দা বলে, বিয়ের পরে আজও দ্বিরাগমন হয় নি। মা অসুখ করে পড়লেন, তোমার আর দোষ কি। কিন্তু দেশ-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কতকাল আর দেখা হবে না, এ-সময়টা না গেলে নানা রকম কথা উঠবে। যেতেই হবে আমার মানসম্মানের জন্য, আমার মায়ের মনে উদ্বেগ-অশান্তি না ওঠে তার জন্য।

সকাতরে তাকিয়ে পড়ল সে। সলিল বলে, গুণপনা এদ্দিনে আর গোপন নেই। সামনাসামনি হলে 'ছি-ছি'টা আরও বেড়ে যাবে। মায়ের অশান্তি তাতে বাড়বে বই কমবে না।

মন্দিরা সত্যি সত্যি রাগ করে উঠল : দেখ, নিন্দেমন্দ করা খুব খারাপ। আত্মনিন্দেও দোষের। একশ'বার বলেছি, অন্য দশজনে যা, তুমিও ঠিক তাই—অভিনয় করে অন্যেরা ভাল সেজে বেড়ায়।

আমি পারি নে।

অথচ অভিনয়ে কত নাম তোমার। ভোম্বল-ঠাকুরপো তাই নিয়ে শতমুখে জাঁক করেন।

সলিল বলে, সে তো নাট্য-সমিতিতে—

খপ করে মন্দা সলিলের হাত চেপে ধরল : চলো না, দশঘরায় কয়েকটা দিন নাটক করে আসিগে। যত তাড়াতাড়ি পারি, বেরিয়ে আসব। ঘরের বৃত্তান্ত জেনে সকলের তাক লেগেছে, বরও এবার দেখবে। আমার ভাগ্য আর তিন বোনের মতন নয়, মা-ভাইবোনেরা জানুক। তার পরে তো কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যাচ্ছে, কবে আর দেখা হবে ঠিকঠিকানা নেই।

হাত ছেড়ে মন্দা পা ধরতে যায়।

॥ বারো ॥

সামনের মঙ্গলবার যাচ্ছে এরা। দশঘরায় চিঠি গিয়ে জবাবও এসেছে। স্টেশনে জোড়া-পালকি থাকবে।

সলিলকে নিয়ে বের করছে—হোক না দু-দিন চার-দিন, শশীমুখী বড্ড খুশি বউয়ের উপর। অসুখের কথা উঠেছিল, তিনি উড়িয়ে দিলেন : যাপ্য ব্যাধি, হঠাৎ মরছিনে রে। ভোম্বল থাকবে, দরকারে ডাক্তারবাবু এসেও দেখে যেতে পারবেন। কত দিন মা দেখিস নি—মায়ের জন্য প্রাণ পোড়ে, সে আর বুঝিনে রে?

তাই বুঝি! মায়ের কাছে কাছেই তো আছি সবসময়—। মন্দিরা হেসে পড়ল। বলে, মা নেই কখনো কি আপনি বুঝতে দেন? আমার মতন ভাগ্য কার?

শশীমুখীর চোখে জল এসে গেল। মন্দাকে কাছে ডাকেন : আয় রে—

একটা হাত বেড় দিয়ে খপ করে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

হেসে মন্দা বলল, সব মা এক রকম। সেই মা-ও আমার মুখ বুকের মধ্যে এমনি নিয়ে নিতেন।

নিবি তুইও রে। কোলে আসুক একটা-দুটো—

দিন এগুচ্ছে, আর সলিল চিন্তিত হয়ে পড়ছে। বলে, নাট্য-সমিতিতে নেপালকাকা ছিলেন। স্টেজের ঘুঘু—মাঝে মধ্যে কলকাতার স্টেজেও নামতেন। পাখি-পড়ানোর মতন করে শেখাতেন, মনের গায়ে বিঁধিয়ে গেঁথে দিতেন। পার্টের কথাগুলো তারই ভঙ্গিতে স্টেজের উপর বলে আসতাম—ধন্য-ধন্য পড়ে যেত। নেপালকাকার মতো পেতাম কাউকে!

মন্দিরা বলে, আমি আছি, ভয় কিসের? কত রকমের কত কত নতুন-বর দেখা আছে—

বলতে বলতে যেন মোচড় দিয়ে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলে, না, আমার বর আর দশটা বরের মতন হলে হবে না। বর কেমনটি হবে, মনে মনে ভেবেছি কতদিন। স্বপ্নে

বরটার যতটুকু পছন্দসই, আমার বরের নামে মনের মধ্যে তাই গেঁথে রেখেছি। তালিম দিয়ে দিয়ে দশঘরার জন্য তোমায় সেই বর বানাবো।

সে তালিম তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যায়। মা গিরিবালা, ভাই দেবব্রত, বোন মালতী, ও-ঘরের শ্রীনাথ-রাঙাবউ, বাইরের মেয়েপুরুষ যারা আসবে-যাবে—ভূমিকা স্বরূপ খানিক খানিক সকলের কথা বলে নেয়। কার সঙ্গে কতখানি মান্য রেখে চলতে হবে, ফষ্টিনষ্টি-ফুর্তিফাতির সীমারেখাই বা কতদূর, হাত-মুখ নেড়ে সবিস্তর বোঝাচ্ছে। শিক্ষানবিশের মতন মুখ করে সলিল শুনে যাচ্ছিল, সহসা উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ে: পাকা মোশানমাস্টার তুমি হে, কোথায় লাগেন নেপালকাকা! কিন্তু যা কথা হল—তিনের বেশি আধলা দিনও নয় সেখানে। তিন দিনের দুর্গোৎসব—দিন বাড়াতে গেলে প্রতিমার রং চটে ভিতরের কাদা-মাটি-খড় বেরিয়ে পড়বে।

স্টেশনে নেমে পালকিতে উঠছে—তখনও সলিল বলে নেয়, স্টেজে প্লে করা অনেক সোজা। দশ মিনিট বিশ মিনিট বাছা বাছা জবান বলে গ্রীনরুমে ঢুকে গেলাম, চুলদাড়ি খুলে বিড়ি ধরিয়ে জিরিয়ে নিলাম খানিক। শ্বশুরবাড়ির প্লে দিবারাত্রি একনাগাড় চলবে। দিন বাড়াতে যেও না, খবরদার! তা হলে কিন্তু নিজমূর্তি ধরে বেরিয়ে আসব, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

জোড়া পাল্কি উঠানে নামাতেই দু-জনে যেন বানের মুখে পড়ল। যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছে। হাসিহুল্লোড়। ভাল কাজ নিয়ে দেবব্রত দূর বিদেশে চলে যাচ্ছে, আবার কবে আসবে ঠিকঠিকানা নেই। মানুষজন আসছে, যাচ্ছে—ভাল ভাল কথা বলছে—প্রায় সর্বক্ষণের মচ্ছব আজ ক'দিন। তার উপরে নতুনজামাই এসে গেল। বিয়ের পর মেয়েরও প্রথম এই বাপের-বাড়ি ফেরা।

সামনে যাঁরা আছেন প্রণামাদি সেরে সলিল বলে, মা কোথায়?

আসছেন মা, তুমি ঘরে চলো। মালতী এসে হাত ধরল।

গিরিবালা রান্নাঘরে, জলখাবারের চন্দ্রপুলি বানাচ্ছেন, তেল-মাখানো কচি কলাপাতার ভাঁজের মধ্যে কাই দিয়ে সুডৌল সাইজে আনছেন। হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঘরে না গিয়ে জামাই রান্নাঘরে হাজির। বাইরে জুতো খুলে রেখে পায়ের গোড়ায় গড় করল।

চন্দ্রপুলি বগিথালার উপর সাজানো। সলিল বলল, খাসা গন্ধ বেরিয়েছে—নলেনপাটালি দিয়েছেন বুঝি। দিন মা, একটা খেয়ে দেখি।

হাত পাতল। নিঃসংকোচ—দেবু-মন্দারাও এমনিধারা হাত পেতে দাঁড়ায় না। বাড়িতে পা দিয়ে অবধি মা-মা করছে। গিরিবালা গলে গেলেন।

রাঙাবউর ভয় মন্দাকে নিয়ে। শ্রীনাথ সলিল সম্বন্ধে একটু-কি বলতে গিয়েছিলেন, দাবড়ি খেয়ে চুপ করে যান। কিন্তু মজাদার কেচ্ছা পেটে নিয়ে চুপচাপ থাকবেন, স্বামীদেবতাটি সে জাতের নন—রাঙাবউ না হলেও তারিয়ে তারিয়ে শোনার ঢের লোক আছে, কান বাড়িয়ে আছে তারা। সারা সকাল তাই তক্কেতক্কে আছেন, মন্দার কাছ থেকে সর্বাগ্রে সকল বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে বাইরে কতদূর কি বলতে হবে যথোচিত তালিম দিয়ে দেবেন তাকে।

মেয়ে-বউগুলো মুকিয়ে আছে, উঠোনে পা পড়তে না পড়তেই ছেঁকে ধরল তারা। রাঙাবউ গিয়ে পড়লেন: পথের ধকল গেছে, একটু ঠান্ডা হতে দে মা-সকল। কথাবার্তা যাচ্ছে কোথা, বিকেলে আসিস।

বলছেন আর অলক্ষ্যে চোখ টিপছেন মন্দার দিকে। ন্যাকা মেয়ে বুঝেও বুঝবে না। উল্টো তর্ক করে অন্যদের পক্ষ হয়েঃ ধকল কোথা কাকিমা? নৌকোয় ট্রেনে পালকিতে এসেছি—পায়ে তো মাটিই ঠেকেনি এতক্ষণ। কদ্দিন পরে এদের সব পেলাম—দুটো গল্পগাছা করছি, তুমি যাও।

রাঙাবউ খানিকটা সরে দাঁড়ালেন। একেবারে গেলেন না—পালগিন্নিকে দেখে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন। গিন্নির এক ননদের যমজ-ছেলে হয়েছে, ডেকে তাই জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। আর ঘন ঘন তাকান মন্দার দিকে। জামাই নিয়ে শ্রীনাথ যা বলতে চেয়েছিলেন, মেয়ের চোখে-মুখে ঠিক তার বিপরীত। বর-সোহাগী গরবে ফেটে ফেটে পড়ছে, শ্বশুরবাড়ির গল্পে খই ফুটছে যেন মুখে। শ্রীনাথ কোথায় কি মিথ্যে খবর শুনে এসেছিলেন—কিম্বা হতে পারে, আদ্যন্ত তাঁর নিজেরই রচনা।

ভাইবোনদের মধ্যে কথা হচ্ছে। মন্দিরা বলে, শুক্কুরবারে চলে যাবে বলছে।

মালতী উড়িয়ে দেয়ঃ নতুনজামাই ও-রকম বলে থাকে। তুইও যেমন! কত শুক্কুর যাবে দেখিস।

দেবব্রত বলে, দশটা দিন বাদে আমরাও তো যাচ্ছি। ঘরে তালা ঝুলিয়ে একসঙ্গে সব বেরুব। না-হয় একটা দিন আগেই যাবি তোরা।

মন্দা বলে, আমার তো ভাল—যত বেশি দিন থাকা যায়। কিন্তু আগে-ভাগে কড়ার করে নিয়ে তবে এসেছে।

মালতী ধমক দিয়ে ওঠেঃ কড়ার করে থাকিস, তুই তো সে কড়ার ভাঙতে যাবি নে। এ বাড়ির কর্তা তুই নোস। শুক্কুরবার না কোন বারে যাওয়া হবে, সে আমরা বুঝব।

এর পর মূল-আসামী সলিলকে পাকড়াল। মহড়ায় মালতীঃ শুক্কুরে যাবার কথা নাকি বলেছ? তার মানে আঁকে-মুখে তেরাত্তিরবাস। সে হয় না। জ্ঞাতিগোষ্ঠি ধরে বাড়ি বাড়ি প্রণাম করে এলে—সবাই এক সাঁজ করে খাওয়াবেন, আশীর্বাদী কাপড় দেবেন। নিয়ম তাই, তাঁদের জামাই এলে আমাদেরও করতে হয়—

সলিল আঁতকে উঠলঃ ওরে বাবা, সে তো দশ-বারো দিনের ধাক্কা। আমার কারবার লাটে উঠে যাবে তা হলে।

বেলা নামে পালেদের মেয়েটা এসেছে—মন্দিরার সমবয়সি। হাসিমুখে সে ঘাড় দোলায়ঃ কুটুম্ববাড়ি আসা নিজের ইচ্ছেয়, যাওয়া পরের ইচ্ছেয়। বেরুবার মুখে কত-কি অঘটন ঘটতে পারে। হয়তো জুতোজোড়াই খুঁজে পেলে না।

সলিল বলে, খালি পায়ে চলে যাব। জুতো হারাতে পারে, তা বলে পাদুটো খোঁড়া হয়ে যাচ্ছে না।

জামা-গেঞ্জিও সরে যেতে পারে।

যাকগে—। নিশ্চিন্ত কন্ঠে সলিল বলল, পাড়াগাঁয়ের মানুষ, তার উপরে কয়লা বেচে খাই। জামা গায়ে জুতো পায়ে ঘট হয়ে বসে থাকলে চলে আমাদের! শুধু কাপড়েই স্বচ্ছন্দে যেতে পারব, জামা-জুতো আটকে ঠেকাতে পারবেন না।

ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবনার ভান করে বেলা বলল, মন্দাকেই আটকে ফেলব তবে। বাড়িতে রাখব না, পাড়ার কোন একখানে—হ্যাঁ মন্দা?

মন্দিরা ঘাড় নেড়ে বলে, আমার তো ভাল। বাপের-বাড়ি কে না থাকতে চায়? আহা, তাই যদি হত রে সত্যি সত্যি—

সলিল বলে, হোক না—বাধা কিসের? থেকে যাও যে ক'টা দিন এঁরা সব আছেন। ভোম্বলকে পাঠাব, তার সঙ্গে কৈখালি যেও।

মন্দিরা আরও বাড়িয়ে বলে, কৈখালি কেন, সুন্দরনগরেই চলে যাব সকলে একসঙ্গে। দেখেশুনে পরে একসময় সুবিধা মতন—

কথা শেষ না করে হি-হি করে হেসে ওঠে: উঃ, কী মানুষ রে বাবা! হাত বেঁধে দিয়েছে, পা বেঁধে দিয়েছে—দিয়ে সকলের কাছে ভালমানুষ হচ্ছে: স্বচ্ছন্দে চরে ফিরে বেড়াওগে যাও।

মালতী কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, বড্ড বেশি বেশি বলিস মন্দা। কিসে তোর হাত-পা বাঁধল শুনি?

সে কি আর দেখতে দিচ্ছে তোমাদের? সবাই ভাববে, জামাই তো সদাশিব—মেয়েটা যত নষ্টের গোড়া। জেদ করে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠল, ক'টা দিন মায়ের কাছে থেকে যেতে পারল না। সেই যে বলে, বেটা বড় মার খেতে পারে—আরে ধরে মারে, উপায়টা কি? নতুনবউ উঠোনে পা দিতে না দিতে শ্বাশুড়ি-মা চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন। চাবির সঙ্গে গোটা সংসার চেপে গেছে। ঘরের করতে হবে, বাইরেরও। এটা কি হবে ওটার কি করব—ঝি-রাঁধুনি-গোমস্তা-মাহিন্দার সর্বক্ষণ এসে জিজ্ঞাসা করছে। মাথা খারাপ হবার জোগাড়। এদ্দিন আমি ছিলাম না, তা যেন ঘরগৃহস্থালী অচল হয়ে ছিল।

রেগে গিয়ে মন্দিরা খাটো গলায় বলছে না—গিরিবালা থ হয়ে শুনছেন। রাঙাবউও এসে জুটলেন। গিরিবালা মধ্যস্থ মানেন: শুনছ বউ? হারামজাদি মেয়ের কথা শোন একবার।

গিরিবালাকে জড়িয়ে ধরে রাঙাবউ বললেন, মেয়ে নিয়ে ভাবনার অন্ত ছিল না—ঠাকুরঘরে বড্ড মাথা কুটেছি, ঠাকুর দয়া করেছেন। ক'টা মেয়ের এমন ভাগ্যি হয়?

ভাগ্যবতী ওদিকে গজরাচ্ছে: জুতো-গড়া থেকে চন্ডী-পড়া দিবারাত্রি চলছে। দুটো দিন মা-ভাইয়ের কাছে থেকে জিরোব, সে হবার জো নেই। এসব জুলুম নয়? বলো তোমরা।

অবশ্যই। তবে জুলুমবাজ বলে যার নিন্দা, সে মানুষ ফিকফিক করে হাসছে। এবং ঘোর বেগে নন্দাকে সমর্থন দিচ্ছে: বলছিই তো, আমি পারছিনে—তুমি অন্তত থেকে যাও। মা-ভাই-বোনের সঙ্গে আনন্দ করো। ভাবনা নেই—আমার মা কিছু না বলেন, সে দায়ভার আমি নিচ্ছি। বুঝিয়ে বলব তাঁকে।

লুফে নিয়ে মন্দা বলে, মা কেন বলতে যাবেন—সে মানুষ তিনি নন। তোমায় কিছু বোঝাতে হবে না।

থাকা না-থাকা পরে আরও বিবেচনা হতে পারবে—এখন তো রয়েছে, তার মধ্যেই বা মা-ভাই-বোনের কাছে মন্দা থাকছে কতটুকু? সলিলকে দেখলেই সর্বকর্ম ফেলে ফুড়ুত করে তার কাছে চলে আসবে। ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর কথার মাথামুন্ডু নেই। বাড়াবাড়িটা বড্ড চোখে ঠেকে। ঠানদিদি সম্পর্কের বৃদ্ধাটি বলেই ফেললেন, কি লো, এত আদেখলেপনা কেন? কত জন্ম যেন বর পাস নি!

মন্দা হাসে, ঠানদিদির কথার জবাব দেয় না। সলিলের কানে ফিসফিসিয়ে বলে, উপোসি মানুষ পান চিবিয়ে মুখ রাঙা করে, মিথ্যে ঢেকুর তোলে, খাওয়াটা বেআন্দাজি রকম বেশি হয়ে গেছে সকলকে জানান দেয়। আমার হয়েছে তাই। থিয়েটারে লভ-সিন করে না—তোমায় বলেই এনেছি, থিয়েটার করে যাচ্ছি আমরা।

ঠিক দিনটিতে মন্দা মনে করিয়ে দিচ্ছে: আজ শুক্কুরবার—

শুক্রবার তা কি ?

তোমার যাবার দিন। কড়া করে বলে দিয়েছি, জুতো-জামা সারাসারি করবে না কেউ। স্বচ্ছন্দে তুমি যেতে পারবে।

চটে গিয়ে সলিল বলে, আছি বলে গায়ে ফুটছে নাকি তোমার ?

তা কেন, চালাকি করে আটকে রেখেছি বলে আমার ঘাড়ে শেষটা দোষ না পড়ে।

সলিল বলল, যাবার যদি ইচ্ছে করি, আমায় আটকাবে তেমন বাপের বেটা-বেটি আজও জন্মেনি। কারো ঘাড়ে আমি দোষ চাপাতে যাব না।

চুপ করে গেল মন্দা। কিন্তু গা কাঁপে, ভাবনা যায় না। মানে মানে এখন বেরুতে পারলে যে হয়! সলিল সম্পূর্ণ যেন ভিন্ন মানুষ—সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিশছে, বানিয়ে বানিয়ে কত রকম বলছে। এতদূর তার রচনাশক্তি, কে জানত। একটা জিনিস দৃষ্টিকটু—কিছু অধিক মাত্রায় যেন সে স্ত্রৈণ, বউয়ের নামে গদগদ হয়ে ওঠে। তখন কোথায় যে মুখ লুকোবে, মন্দা ভেবে পায় না।

তিন দিনের স্থলে পুরো সাত-সাতটা দিন কেটে গেল। আজ রওনা। দেবব্রতরা আরও তিন দিন আছে। যাবার সময় শাশুড়িকে সলিল গড় করল। আনন্দে গিরিবালার চোখে জল এসে যায়। গাঢ়স্বরে বললেন, এমনি হাসিমুখ চিরদিন যেন বজায় থাকে। থাকবেও তা। তুমি বাবা বড্ড ভাল। মন্দার কত জন্মের সুকৃতি, তাই তোমার হাতে পড়েছে।

স্টেশন অবধি এবারে পালকি নয়, গরুর-গাড়িতে যাচ্ছে। গায়ে গায়ে দুজন। পাড়া ছাড়িয়ে এসে সলিল হি-হি করে হাসে: আমি মানুষটা বড্ড ভাল, তাই না ?

মন্দিরা সজোরে সায় দেয়: তাই।

দেশসুদ্ধ লোক বলে থাকে, আমি কি। তোমার মা-ই প্রথম আমায় ভাল বললেন। তার মানে অভিনয়টা উতরেছে ভাল। বুঝতে পারলে, থিয়েটারে নামডাক আমার এমনি এমনি নয়।

মন্দিরা কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করে: বাড়াবাড়ি হচ্ছিল, যাই বলো। জীবনে এমন হয় না।

সলিল বলে, নাটকে হয়। এই সব গেঁয়ো জায়গায় সূক্ষ্ম কাজ কে বুঝবে ? মোটা অ্যাকটিং-এ হাততালি মেলে, স্টেজে পরখ করে দেখেছি।

সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, পালা চুকল রে বাবা। ঘরে গিয়ে সাজপত্তোর খুলে নিজমূর্তি ধরিগে এবার।

॥ তেরো ॥

গরুর-গাড়ি, ট্রেনে তিনটে স্টেশন, তারপর যথানিয়মে ডিঙি। সিরাজকাটি দিয়ে যাচ্ছে।

সলিল বলে, পাড়ে একটু ধরো মাঝি। আমি নেই ভোম্বলও নেই—ডিপোর কি দশা, চট করে দেখে আসি একনজর।

গেল তো গেল, ফেরার নাম নেই। কয়লার ডিপো ছাড়াও দ্রষ্টব্য আছে এখানে—সকৌতুকে মন্দা ভাবছে, সেখানে সময় কিছু লাগবে বই কি! পাশে এক পানসি বেঁধেছে, কর্তা গঞ্জে উঠেছে কী সব কেনাকাটায়, বউটার সঙ্গে কথাবার্তায় দিব্যি কেটে যাচ্ছে। বুড়ি-মায়ের মাথার গণ্ডগোল—ফকিরকে দেখিয়ে তাগা নেবার জন্য মাদারের থানে গিয়েছিল। বউ ছাড়েনি, জুটে পড়েছে এই সঙ্গে। বউয়ের কোলে বছর

খানেকের বাচ্চামেয়ে। বেশ বাচ্চাটি। মন্দা হাত বাড়াল তো ও-নৌকো থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। বউ হেসে বলে, আনকা নেই মেয়ের, যে হাত বাড়াবে, তার কাছে যাবে।

আগনৌকায় এসে বউ মন্দার কোলে মেয়ে দিয়ে দিল। কি দেওয়া যায় বাচ্চার মুখে—কি, কি? কী পাওয়া যায়, দেখতো একটু উপরে উঠে—মাঝিকে মন্দা বলল। ঘাটের উপরেই মিষ্টির দোকান, মাঝি গিয়ে পদ্মপাতায় মুড়ে কাঁচাগোল্লা নিয়ে এলো। একটুকু নিয়ে এলো। একটুকু নিয়ে বাচ্চাকে কোলের উপর বসিয়ে অল্প অল্প করে মুখে দিচ্ছে। খাউন্তি-দাউন্তি বেশ, চুক চুক করে খাচ্ছে কেমন। খান চারেক দাঁত হয়েছে—দাঁত মেলে হাসছে।

নতুন-কেনা বালতি হাতে ঝুলিয়ে, বালতির মধ্যে এটা ওটা ফাটকি-নাটকি জিনিস, কর্তা এসে উঠল। ছেড়ে দিল পানসি—একটু গিয়ে পাশখালিতে ঢুকে গেল। কোন্ এক গাঁয়ের নাম বলে গেল, সেইখানে ওদের বাড়ি। ওদিকে যদি যাওয়া হয় কখনো, আমাদের বাড়ি অতি অবিশ্যি যেও—হেসে হেসে বউটি বলে গেল। সে গাঁয়ের নাম শোনে নি মন্দা, যাওয়ারও কখনো প্রয়োজন ঘটবে না। কিন্তু বাচ্চাটি খাসা।

সলিলও অবশেষে দেখা দিল। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছেঃ দেরি করে ফেললাম মাঝি, উজান মারতে হবে। নেমে এসে তুমি গুণ টানতে লেগে যাও। আমি বোঠে ধরি।

বোঠে হাতে সলিল কাড়ালে বসেছে। মন্দার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, দেরি কেন হল জিজ্ঞাসা করলে না যে?

ডিপোর কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলে। তার আর কি জিজ্ঞাসা করতে যাব?

সলিল বলে, কয়লার ডিপো ছাড়াও পরীবালা থাকে এখানে—সে তো ভোলার কথা নয়।

ওমা, কেন ভুলব? বাড়ি গিয়ে আলাপ-সালাপ করে এসেছি, আমার দিদি হন যে তিনি—

মুখে বলছে, আর মন্দা মাঝির কাঁসার ফেরোটা ব্যস্তসমস্ত ভাবে মেজে-ধুয়ে কলসি থেকে খাবার জল গড়ায়। পদ্মপাতায় কাঁচাগোল্লা বের করে বলল, বোঠে এক হাতে ধরে খেয়ে নাও এটুকু। না, আমি গালে দিয়ে দেবো?

চটেমটে সলিল বলল, এমন উদাসীন কেন? রাগ হয় না?

মন্দিরা বলে, এই বেলা অবধি না খেয়ে শুকনো মুখে এসে পড়বে, মাঝিকে দিয়ে আমি তাই সন্দেশ আনিয়ে রাখলাম। তবু বলছ উদাসীন। নতুনদিদির সঙ্গে বকাঝকা হল বুঝি, সেই ঝাল আমার উপরে ঝাড়ছ।

একগাল হেসে বলে, আমি রাগ করব না। রাগারাগি ঝগড়াঝাটি ভাল লাগে না—হাসিখুশিতে দিন কাটাব।

সলিল বলে, সর্বাঙ্গ আমার রি-রি করে জ্বলছে। কাছারিবাড়িতে দেখলাম একগাদা মিস্ত্রি-মজুর এটা ভাঙছে, ওটা গাঁথছে, ওখানে পলস্তারা লাগাচ্ছে—রৈ রৈ কাণ্ড। ভোম্বল আর আমি দিব্যি পড়ে থাকি, হঠাৎ বাড়ি-মেরামতের ধুম লেগেছে। কনস্টেবল বসানো হবে নাকি আমার উপরে খবরদারির জন্য।

মন্দা অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে।

সে কনস্টেবল তুমি। পরীবালার কাছে না যেতে পারি।

মন্দা বলল, উদাসীন আমি, বলেই তো দিলে। এমন কনস্টেবলে তবে

ভয়টা কিসের ?

গঞ্জের বাসায় মা-ও থাকবেন। কৈখালির বাড়ি আপাতত গোমস্তামশায়ের হেপাজতে। দাদা এর মধ্যে বাড়ি গিয়েছিলেন, তখনই চক্রান্ত হয়েছে।

মন্দা হাসতে হাসতে বলল, বুঝেছি। আরের মন আর দিকে, চোরের মন ভাঙা-বেড়ার দিকে। তোমার কিছু নয় গো, ব্যবস্থা মায়ের জন্য। কথায় কথায় ডাক্তার ডাকা মায়ের ইদানীং বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। বুড়ো ডাক্তারবাবু অত ছুটোছুটি পেরে ওঠেন না। কথা হয়েছিল, মাকেই ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছে নিয়ে রাখা হবে। বড়দা তাই করছেন ।

সলিল প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, ওসব বাজে। আসল হল, আমায় চোখে-চোখে রাখা। কিন্তু পায়ে তো বেড়ি পড়ছে না—ঠেকান কিসে দেখি।

মন্দাও সাহস দিচ্ছে : আমিই রয়েছি তোমার দলে—কেউ কিছু টের পেলে তো! আর এ-ও সত্যি, বারোমাস কৈখালি পড়ে থাকলে ব্যবসা চলবে না—থাকতেই হবে তোমাদের এখানে। একা একা থাক, দেখাশুনোর তেমন কেউ নেই—থাকিই না একসঙ্গে কিছুদিন। ধরো, সামনের বর্ষাকালটা অবধি। অঘ্রানে উঠোনের উপর ধান-কলাই উঠে গেলে মাকে আর রাখা যাবে না—বাড়ি চলে যাব আমরা। দেখই না কেমনধারা কাটে ততদিন।

সিরাজকাটিতে এখন ভালই কাটছে, গণ্ডগোল নেই। ডিপোর কাজে সলিল খুব খাটছে। খাটলে উন্নতি অবধারিত, সে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। একবার এক ছুটিতে আচমকা অনিল এসে উপস্থিত। কোল ডিপোর পুঙখানুপুঙ্খ হিসাব দেখে খুশি হয়ে শশীমুখীকে বললেন, কাজে সত্যিই মন বসেছে মা, লোকসান কাটিয়ে লাভের পথে দাঁড় করাবার জন্য প্রাণপণ করছে।

শশীমুখীর দেহ অর্ধেক-পঙ্গু, কথায় জড়তা। তারই মধ্যে চোখ গরম করেন সলিলের উপর : ফিরতে অত রাত করিস কেন তুই ?

সলিল রাগ করে বলে, কত রাত ? সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘর অন্ধকার করে চোখ বোঁজ, রাতের খবর কি জান তুমি ? হিসেব-পত্তোর মিলিয়ে তবে তো ফিরতে হয়—তবু কত রাত হয়, তোমার বউকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

তবেই হয়েছে! বউ হল একনম্বরের হাঁদা—তেমন-তেমন বউ হলে ভাবনা ছিল কি? কথা না পড়তেই কেটে দিয়ে বসে আছে : না মা, রাত আর কতটুকু তখন! আমি তো শুতেই যাইনি।

শশীমুখী বলেন, সারারাত যদি না আসে, সারারাত তুই শুতে যাবি নে। তোকে আর জানলাম না আমি! বলি, আমার পেটে তোরা হয়েছিস না তোর পেটে আমি ?

এটা অবশ্য ঠিক নয়। বউ শুয়ে পড়ে বই কি! ঘুমিয়েও পড়ে কালেভদ্রে কদাচিত। সকালবেলা সলিল প্রশ্ন করে : দরজা দাও কেন বলো তো ?

ভয় করে, চোর-ছ্যাঁচোড় কখন ঢুকে পড়বে।

সলিল বলে, আমার মতন পাঁড়-বদমায়েস নিয়ে ঘর করছ, চোর-ছ্যাঁচোড়ে তোমার ভয় ?

মন্দিরা চুপ করে রইল।

সলিল বলে, দরজা ধাক্কাধাক্কি করে রাগ চড়ে যায়—তখন পশু হয়ে উঠি। সংশোধন করে নিয়ে আবার বলে, পশু এমনিই আমি। হিংস্র জানোয়ার হই তখন। অপরাধীর মতন মন্দিরা মিনমিন করে বলল, টোকা দিলেই তো খুলে দিই। ধাক্কা

কাল শুধু দিয়েছিলে। জ্বর-জ্বর হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দিনের আলোয় সলিলের এখন কিছু অনুতাপ হচ্ছে। বলে, সত্যি, বড় কষ্ট তোমার। রাত জেগে বসে থাকো নিত্যিদিন—

তুমিও তো জাগো—মন্দিরা বলে। তোমার জাগায় কষ্টটা বেশি। যেটুকু আমি জাগি, দিনের বেলা ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেই। তোমার তা নয়—সকাল থেকে সমস্তটা দিন আবার খাটনি।

কেমনতরো মানুষ বুঝিনে। লেখাপড়া শিখলে তো আত্মসম্মান জাগে। মন বলে পদার্থই নেই তোমার। কাদামাটির পুতুল একটা।

নিপাট ভালমানুষের ভাবে মন্দিরা বলে, কি করব আমি?

সলিল তেড়ে ওঠে: কিছু না পার, ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে থাক—হাসতে হবে না। হাসি দেখে মেজাজ চড়ে যায়।

অতএব পরম বশম্বদ বউ দুই ঠোঁট একত্র করে নিরীহ চোখে তাকাল। হলে কি হবে, হাসির আভা তবু যে চিকচিক করছে দু-চোখের দৃষ্টিতে। বর পেয়ে মেয়েটা বর্তে গিয়েছে, এমনিতরো ভাব।

মাঝে মাঝে সলিল ভয় দেখায়: মোটে তুমি পরোয়া করো না। এমনি যাই হই, পেটে মাল পড়লে নৃশংস জানোয়ার। সেই অবস্থায় কোনদিন খুন করে ফেলব, টের পাবে তখন।

এত বড় সর্বনেশে কথাও মন্দা তামাসা করে উড়িয়ে দেয়: খুনের পরে টের পেয়ে লাভ কি? খুন করবার আগে বরঞ্চ একটু জানিয়ে দিও।

পুলিশে খবর দেবে?

ক্ষেপেছ? ঘরের ব্যাপার বাইরে কেন জানতে দেব। কাগজে লিখে রেখে যাব, খুন নয় আত্মহত্যা। আমার মৃত্যুর জন্য একমাত্র আমি ছাড়া কেউ দায়ী নয়।

চোখে ব্যঙ্গ নিয়ে সলিল বলল, বলিহারি। 'সখি আমায় ধরো ধরো'—এত লাঞ্ছনার পরেও।

মন্দা বলে, অবলা স্ত্রীলোক আর কি করতে পারি বলো।

ডিভোর্স নিয়ে বিয়েই করতে পার আবার।

রক্ষে কর। ভ্রূভঙ্গী করে মন্দিরা বলে, কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ব—সে মানুষ যদি আরও খারাপ হয়। তার সঙ্গেও যদি না বনে, লোকে আমাকেই দুষবে। বলবে, যত দোষ বউটার। ও-তালে নেই আমি।

তাই কাঁঠালের আঠার মতন সেঁটে থাকবে, গালমন্দ মারগুতোন যাই চলুক না কেন।

হ্যাঁ—বলে একগাল হেসে মন্দা হাত খানেক ঘাড় কাত করল। বলে সতীনারী পতি ছেড়ে যাবে কোথা?

একদিন সলিল পকেট থেকে আংটি বের করে মন্দাকে দিল। বলে, তোমার সেই আংটি।

তুমি পেলে কোথায়?

পরীবালা ফেরত দিয়ে দিল। সে রাখবে না।

ও—

তখন কিছু নয়। ঠিক দুপুরে শশীমুখী ঘুমুচ্ছেন, সলিল-ভোম্বল ডিপোয় চলে

গেছে, পথে ঘাটে জনমানব দেখা যায় না—সেই সময়ে মন্দিরা টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ল। রিক্সা নিল না—এ-পথ সে-পথ ঘুরে গাঙের ধারে ধারে পাড়ায় এসে উপস্থিত।

পরীবালার উঠানে—দাওয়ায়। দরজায় খিল-আঁটা। টোকা দিতেই ভিতরে থেকে পরীবালা সাড়া দেয়ঃ কে?

মন্দিরা চাপা গলায় বলে, চুপ। দোর খুলুন দিদি, শব্দ করবেন না।

দোর খুলে পরী গোড়ায় ঠিক ঠাহর করতে পারে নি। অবাক হয়ে বলল, আপনি?

মন্দিরা বলল, চিনেছেন? ঝগড়া করব বলে চলে এলাম।

ঘরে ঢুকে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসলে। পরীবালা কৈফিয়তের সুরে বলছে, আমি কি করব বলুন। আসতে এত করে মানা করি—

ওমা, সেইজন্যে এসেছি না কি? মানুষের বাড়ি মানুষ আসবে, তাতে ঝগড়া-ঝাটির কি? আমি এসেছি—

খপ করে মন্দিরা পরীর বাঁহাতখানা টেনে নিল। আংটি পরাচ্ছে অনামিকায়। পরী তা হতে দেবে না। বলে, ঝগড়ার মুখে লোকসানের কথা তুলেছিলাম, আংটি দিয়ে তার শোধ তুলে গেছেন। গরিব হতে পারি, তা বলে আপনার আংটি কেন নিতে যাব?

মন্দাও নাছোড়বান্দাঃ আংটি খুলে আমার দিদির হাতে পরিয়ে গেছি, সেই আংটি ফেরত পাঠিয়েছেন। কোমর বেঁধে তাই কোঁদল করতে এসেছি। জেদি মেয়ে বলে আমার বদনাম। না নিয়ে পারেন কেমন দেখি।

জোর করে পরিয়ে দিল। বউটার গায়ে জোরও বিষম। পরীবালা এবার অন্য দিক দিয়ে যায়ঃ 'আপনি' 'আপনি' করবেন না আমার মতন মানুষকে। লোকে এসে তুই-তোকারি করে—খুব বেশি তো 'তুমি'। আংটি পরালেন, তার উপরে 'আপনি' বলছেন—জল-বিছুটি মারছেন ধরে আমায়।

যুক্তিটুকু মন্দিরা তৎক্ষণাৎ মেনে নেয়ঃ ঠিক। বোনে বোনে 'আপনি' কেন থাকবে? 'তুমি' এবার থেকে। আর ছোটবোন বলে আমায় বলতে হবে 'তুই'। চার বোন এক ভাই আমরা—সকলের ছোট বলে ওরা আমায় 'তুই' 'তুই' করে। নতুনদিদির কাছ থেকেও তেমনি 'তুই' চাই।

হঠাৎ পরীবালার চোখে জল। মন্দা বলে, কাঁদলে কেন নতুনদিদি? বলতে হবে, না বললে ছাড়ব না।

কথা আদায় করে তবে ছাড়ল। পুরানো দিনের কথা। পরীরও ছিল সব একদিন—ভাই বোন বাপ মা স্বামী পেটের-বাচ্চা পর্যন্ত। আজকে কেউ নেই, দুনিয়ার উপর একেবারে একা।

মন্দা বলে, দেখাসাক্ষাৎ হয় না তাঁদের সঙ্গে?

যমে নিয়ে নিয়েছে—বোন দুটো আছে শুধু। সামনাসামনি পেলে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে। আমি মরে গেছি, রটিয়ে দিয়েছে তারা। মিছেও নয়।

ভাল লাগছিল খুব। ইচ্ছে হচ্ছিল, বেলান্ত বসে বসে গল্প করি। কিন্তু লোক জানাজানি হবে সেই ভয়ে মন্দা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। বলে, আবার আসব নতুনদিদি। এক গঞ্জের উপর আছি, এবার তো যখন তখন আসতে পারব।

এদিক-ওদিক তাকায় আর দ্রুতপায়ে পথ চলে। পরীবালাকে মনে হচ্ছে কত জন্মের আপনমানুষ।

মন্দিরা আরও দু-পাঁচ দিন এসেছে। সলিল একদিন সদরে গেছে করলায় নৌকোর

বন্দোবস্তে, সেদিন একটু বেশিক্ষণ সে থেকে গেল। হারমোনিয়ামে একটু সারে-গামা সাধল।

পরী বলল, চা বানিয়ে দিলে খাবে তুমি ভাই?

আমিই তো বলতে যাচ্ছিলাম। এদ্দিন আসি-যাই—তা নতুনদিদি এককাপ চা খেতেও বলে না।

চা ঢালতে ঢালতে পরী বলে, আমার উপরে রাগ নেই—কেমন মেয়ে তুমি? বরকে তুমি একটুও ভালবাস না।

মন্দা টিপিটিপি হাসছে।

নিজের কথার নিজেই পরী প্রতিবাদ করেঃ তাই-বা কেমন করে। ভালো যদি না বাসবে কিসের টানে তবে এই নোংরা জায়গা অবধি ধাওয়া করেছ? এমনি তো থুতু ফেলতে আসার কথাও নয়। বরকে ভীষণ ভালবাস তুমি।

মন্দিরা বলে, জায়গা নোংরা হলে তোমরা সব আছ কেমন করে?

আমরা নোংরা মানুষরা আছি বলেই তো জায়গা নোংরা হয়ে গেছে।

আমার দিদি নোংরা হতে পারে না। দিদির নিন্দে করবে না, খবরদার!

তাড়া দিয়ে মন্দিরা পরীকে থ বানিয়ে দিল। পরীবালা বলে, অবাক লাগছে ভাই। এমন মিষ্টি করে আমার সঙ্গে কথা বলছ—কোন ধাতুতে তুমি গড়া?

কি করব তবে? লাঠি-ঠেঙা নিয়ে এসে পড়ব, তা-ই চাও?

সেই মানুষই বটে! একটা চড়া কথা পর্যন্ত মুখে এলো না কোন দিন—খালি হাসি, হেসে হেসে খুন হও কেবল। দেখে গা জ্বলা করে।

মন্দা বলে, কী করেছ তুমি নতুনদিদি যে চড়া কথা বলতে যাব?

আর বেশি কি করতে হয়! মেয়েমানুষের সকলের বড় হল স্বামী—তোমার স্বামীকে আমি কেড়ে নিয়েছি।

কোথায়! গানে পাগল—গানের টানে আসে তোমার কাছে। আমি ঘরের বউ হয়েও তো সামলাতে পারি নি—গাঙের ঘাট থেকে টানে টানে এই ঘরে এসে উঠেছিলাম। গুণজ্ঞান আছে তোমার, শাশুড়ি বলেন।

ফিক ফিক করে হাসে মন্দা। বলে, আমিও মানি সেটা। গুণ আছে তোমার, জ্ঞানও আছে—আমার যা কণিকামাত্র নেই। তাই তো ছুটে ছুটে আসি গুণজ্ঞান খানিক খানিক যদি নিয়ে নেওয়া যায়।

পরীবালায়-সলিলে মন-কষাকষি। গান-বাজনায় প্রায় ইস্তফা। পরী আলাপই করে না ভাল করে। বলে, চলে যাও বাবু, মাথা ধরেছে। কোনদিন-বা বলে, পেট নামছে বড্ড আজ। একদিন বলল, খবর পেলাম বোনের ছেলেটার এখন-তখন অবস্থা। মনটা বড় খারাপ হয়ে পড়ল, শুয়ে পড়ে আছি।

সলিল বলল, তোর নিজের অসুখে কুলোচ্ছে না তো এবারে বুঝি বোনকে নিয়ে পড়লি?

ক্ষেপে গিয়ে পরী বলে, অসুখবিসুখ নিয়ে ঠাট্টা কিসের? আমরা বুঝি মানুষ নই—অসুখ হতে পারে না?

সলিল সকৌতুকে বলে, বটে—বটে! বাজারে মেয়েমানুষ বলেই তো জানি, হঠাৎ কখন মানুষ হয়ে পড়লি—বলি, ব্যাপারখানা কি বল্ তো।

পরী বলে, ঠিক বলেছ বাবু, আমরা মানুষ নই। আর আমাদের কাছে যারা আসে তারাও নয়।

চোখ পাকিয়ে সলিল বলে, কি—কি বললি?

অমন সুন্দর বউ তোমার—পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা কি মানুষের কাজ? বাড়ি যাও!

বাড়ি যাই কি কোথায় যাই, আমি বুঝব।

সন্দেহটা ধ্বক করে সলিলের মনে উঠে গেল: বউয়ের এত ব্যাখ্যান তোর মুখে—আসা-যাওয়া চলছে বুঝি খুব?

পরী বেকবুল যায়: ওমা, এই লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় তিনি পা ফেলবেন কোন দুঃখে? সেই কেবল একটা দিন। সুন্দরী—সে কি বারে বারে দেখে বলতে হবে? ঘরদুয়োর আমার আলো হয়ে গিয়েছিল। চোখ নেই তোমার—চোখ থাকলে দেখতে পেতে।

তারপরে তাগিদ দেয়: চলে যাও বাবু, দোর দিই। কথা বলতে পারছিনে, কষ্ট হচ্ছে।

দাওয়ায় নামতে না নামতে সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

রাত দুপুরে সলিল বাসায় ফিরল। রাগে গরগর করছে তখনো। মন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করল: পরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে এর মধ্যে?

মন্দা ঘাড় নেড়ে দিল: কেন হবে না। আমি তো গিয়ে থাকি তাঁর কাছে।

কেন যাও? সলিল গর্জন করে উঠল।

মন্দা বলে, বড্ড ভাল উনি। দিদি সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছি। আহা, তুমি যেতে পার, আমি গেলেই যত দোষ।

চণ্ডরাগ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে এর পর—

চোদ্দ

শিবরাত্রি। শুয়ে শুয়েও শশীমুখীর নির্জলা উপোস। শরীর গতিকের কথা কে তাঁকে বোঝাতে যাবে? বলেন, অনাচার করে বেঁচে থাকব, তেমন বাঁচা বাঁচতে চাইনে আমি।

সকালবেলা মন্দিরা বাসিকাপড় ছাড়িয়ে কাচা-কাপড় পরাল শাশুড়িকে। এত সকাল সকাল স্নান করানো ঠিক হবে না—তুলসির জল ছিটাল শয্যায় ও তাঁর গায়ে। পাথরের গেলাসে ডাবের জল রেকাবিতে ফল-মিষ্টান্ন সাজিয়ে খাটের গায়ে টিপয়ের উপর রাখল।

খাবেন কি শশীমুখী—মন্দার মুখখানা তুলে ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে ইদানীং করেন তিনি এমনি। লজ্জায় মন্দা তখন দিশা করতে পারে না। চোখ বোজে, একবার বা পিটপিট করে তাকায় শশীমুখীর দিকে। পঙ্গু বুড়োমানুষের দু-চোখে জল টলটল করছে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

চোখ মুছিয়ে দিয়ে মন্দা বলে, কি হয়েছে মা?

আমার সঙ্গে অমন মিষ্টি করে কেন বলিস রে বউমা, এত যত্ন-আদর কিসের? গালি দিবি, অকথা-কুকথা বলবি, মুড়োঝাঁটা নিয়ে ধরে ধরে পেটাবি। তাই আমার উচিত প্রাপ্য।

মন্দা ব্যাকুল হয়ে বলে, বলবেন না মা। আমার কষ্ট হয়, ভয় করে।

আমি তোর সর্বনাশ করেছি। বানরের গলায় মুক্তোর হার ঝুলোলাম—নিজের স্বার্থটাই ভেবেছি শুধু।

মন্দা বলে, আজেবাজে কথা বলে কারা আপনার মন খারাপ করে দেয় মা, গালি

দিতে হয় তো আমি অন্যেরই দেবো। বেশ আছি আমি মা, খাসা আছি। আমার কোন কষ্ট নেই।

শশীমুখী প্রবোধ মানেন না : কেমন আছিস আমায় তা বলে বোঝাতে হবে না। ইতরটাকে আমিই পেটে ধরেছিলাম। তুই ঢাক-ঢাক করে বেড়াস—কানে না পৌঁছতে দিলি, মনে মনে আমি টের পেয়ে যাই। হেসে হেসে দশের চোখে তুই ধুলো দিস, তবু আমার কাছে কান্নাটা চাপা থাকে না। আমিই যে তোর কান্নার মূলে, লহমার তরে কথাটা ভুলতে পারি নে।

একটু থেমে আবার বলেন, এই যে তুই পান থেকে চুন খসতে দিসনে, কিসে একটু আরাম-আয়েস পাই সর্বক্ষণ সেই ধান্দায় আছিস, এর চেয়ে কোমর বেঁধে যদি ঝগড়া করতিস অকথা-কুকথা বলতিস আমি সোয়াস্তি পেতাম রে বউমা। ভাবতাম, যেমন করেছি, ফল তার হাতে হাতে পাচ্ছি।

বোবার শত্রু নেই, মন্দা অতএব বোবা হয়ে রইল। শশীমুখীর কাছে তা বলে ছাড়ান নেই। বললেন, বলছিস নে যে কিছু?

বুঝতে পারছি নে মা, কি বলব।

না, বুঝতে পারবে কেন? আমার ন্যাকা মেয়ে কিনা তুমি—কিছু তোমার বোধে আসে না! চুপ-চুপ করে বেড়াস, গলা উঁচু হতে দিসনে। ভাল, খুব ভাল। পাড়ার কেউ টের পায় না, বাড়ির লোকও না। আমায় ভুলোতে পারিসনে কেবল। সন্ধ্যা হলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি, সবাই জানে। তাই ছিল আগে, সারারাত্তির এখন আমি দু-চোখের পাতা এক করিনে। গাছের পাতা একটু খড়মড় করলেই আমি টের পেয়ে যাই, নিশাচর এইবারে বাড়ি ফিরছে।

একটা হাতে মন্দাকে কাছে টেনে খামোকা শশীমুখী প্রশ্ন করলেন : কাল কত রাতে ফিরেছিল, সত্যি কথা বল।

তাচ্ছিল্যের ভংগিতে মন্দা বলল, ঘড়ি কে দেখতে গেছে! শুইনি তখনো, বসে বসে মাফলার বুনছিলাম।

শশীমুখী বললেন, শোওয়ার পাট চুকে গেছে তোর, জানি। শেষরাত্রে ফেরে—তারপরে তার কাজকর্মগুলো সারা করে তবে তো শোওয়া। হড়-হড় করে বমি করে দেয়—জানলা-দরজা এঁটে রাখিস, তবু আমি আওয়াজ পাই। যত পাপ করে আসে, বিছানায় সব উগরে দেয়—আঁচল পেতে তুই ধরে নিস। সর্বদেহে আঁচল বুলিয়ে পাপতাপ মুছে নিস। কোন্‌টা জানিনে বল্।

বুকে দমাদম ঘা দিচ্ছেন : মহাপাপী আমি—সেই পাপে আমার এই দশা। নিজের স্বার্থই ভেবেছি শুধু। দুধে-আলতায় পা রেখে নতুনবউ উঠোনের উপর দাঁড়ালি—সুন্দর মুখ দেখে আহ্লাদ হল : ছেলে ঠিক বাঁধা পড়ে যাবে। তোর দশা একটাবারও ভাবলাম না তখন।

মন্দার কানে এ সমস্ত যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে। পটাপট যা সমস্ত বলে গেলেন, একটাও তো জানার কথা নয়। অন্তর্যামী নাকি? বড্ড তো ভয়ের কথা হল তবে।

পরী একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল। দাওয়ায় পা নামাতে না নামাতেই দরজায় ঝপ-ঝপ করে হুড়কো দিল, খিল দিল, ছিটকিনি আঁটল—যেন কমজোরি পেলেই সলিল দুয়োর ঠেলে আবার ঢুকে পড়বে। এর পরে আর কোন্ লজ্জায় যাবে সেখানে।

বড্ড নেশা। এদিক-সেদিক ঘোরে। গান ভেসে আসে মাঝে-মধ্যে। আন্দাজ করে, পরীর মেজেয় জমজমাট আসর। কতজনা এসেছে, সলিলই কেবল নেই।

দুত্তোর বলে আবার একদিন ঢুকে পড়ল। রাত সামান্য। গানটান নয়, একটা মানুষও নেই তখন। ভাল করে উঁকিঝুঁকি দিয়েই এসেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে খাটের উপর বসল।

পরীবালা বাইরের দিকে ছিল, পিছু পিছু এসে বলল, কি মনে করে?

উদাসীন কণ্ঠ। থতমত খেয়ে সলিল বলে, কেমন আছিস দেখতে এলাম।

দেখা তো হয়ে গেল, এইবারে যাও।

রেগেমেগে সলিল বলল, লাটসাহেবি মেজাজ এ-লাইনে চলে না। মতিচ্ছন্নে ধরেছে, নিজের পায়ে কুড়ুল মারছিস, বুঝবি ঠেলা। পুরানো কথা ভেবেই আসি এখানে—চেনাজানা সমস্ত ছেড়ে আমার পিছু পিছু মফঃস্বল জায়গায় চলে এসেছিলি। তা নিজের পথ যখন দেখেশুনে নিতে শিখেছিস, আমার দায় কাটল। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না—তুই ছাড়াও বিস্তর আছে। ইচ্ছে হলে সেই সবখানে যাব, তোর কাছে থুতু ফেলতেও আসব না।

বলে তেরিয়া হয়ে উঠে পড়ল। ভয় পায় না পরী, খলখল করে হাসে। সলিল থমকে দাঁড়িয়েছে। দু-হাতের বুড়োআঙুল আন্দোলিত করে পরী বলে, সে গুড়ে-বালি। গঞ্জের ভিতর কোনো ঘরে কেউ বসতে দেবে না। বউ হামলা দিয়ে পড়েছিল, সে বউ গঞ্জের উপরেই আছে জানতে কারো বাকি নেই। ঝামেলায় কেন যেতে যাবে?

সলিল বলল, কড়কে দিয়েছি। লজ্জা থাকে তো সারাজন্মে বউ আর এ-মুখো হবে না।

পরী বলল, আমি রয়েছি—আসতেই বা হবে কেন? পাড়ায় কোনোদিন তোমার ছায়া দেখলে হয়। আমি গিয়ে হাসব না তোমার বউয়ের মতন, মিনমিন করে মিষ্টি কথাও বলব না—

তোকে বুঝি সে আমমোক্তারনামা দিয়েছে? আসা-যাওয়া পিরীত-প্রণয় দহরম-মহরম খুব চলছিল, খবর রাখি আমি সব।

সলিলের কথায় আমল না দিয়ে পরী নিজের ভাবে বলে যাচ্ছে, সে হল ভালঘরের মেয়ে, ভালঘরের বউ, নিজেও নিপাট ভালমানুষ। আমি হাড়বজ্জাত, ডাকাবুকো ঝগড়াটে। ঝগড়া করে গালি দিয়ে ভূত ভাগাব, সেইটে বুঝে চলাচল কোরো বাবু।

সলিল বলল, চরিত্র-শোধন করবি, সেই পণ নিয়েছিস তুই?

পরী বলে, বোনের বরটা জাহান্নামে না যায়, আলবৎ তা দেখব। তক্কেতক্কে থাকব, আমার চোখ তুমি এড়াতে পারবে না।

রোদ হাঁ-হাঁ করছে, বাসাবাড়ি একেবারে নিঝঝুম। এমন কখনো হয় না। ঘোর থাকতে মন্দিরা উঠে পড়ে, থরথর করে অর্ধেক কাজকর্ম সারা করে ফেলে এতক্ষণে।

শশীমুখীর কেমন যেন হল—চোখে-মুখে অগ্নিকান্ড। এক অঙ্গ অবশ, তিন মাসের মধ্যে শয্যা ছাড়েন নি—তবু কাউকে ডাকলেন না, টলতে টলতে নিজেই উঠে পড়লেন। উঠে মন্দিরার ঘরে। কাঁপছিলেন, ধপ করে বিছানার উপর পড়লেন।

মন্দিরা মুড়িসুড়ি দিয়ে ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেছে।

রাত্রে হুটোপুটি শুনছিলাম। কিছু-একটা যেন হয়েছে।

মন্দিরা ভিজে-বেড়াল ঃ হবে আবার কি!

নয়তো এত বেলা অবধি পড়ে থাকার বান্দা নোস তো তুই—

আমতা-আমতা করে মন্দা কৈফিয়ত দেয় ঃ গরমের চোটে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, ছোট্ট বাসায় কাজটা আর কি—ভাবলাম, গড়িয়ে নি খানিকক্ষণ।

খাট থেকে নামতে গিয়ে চাপা একটু আর্তধ্বনি যেন—মুখের হাসি ঠিকই আছে। বুড়োমানুষের কান এড়ায় না—গর্জে উঠলেন। কথা এমনি তো অস্পষ্ট, বুঝে নিতে কষ্ট হয়। কিন্তু উত্তেজনার মুখে জিভের আড় কেটে গেছে। বলেন, বিস্তর মিথ্যে বলে থাকিস—জেনেবুঝেই আমি চুপ করে থাকি। কি হয়েছে, খুলে বল্।

মন্দা বলল, এমন কিছু নয় মা। সামান্য কথা-কাটাকাটি। দুটো হাঁড়ি-কলসি এক জায়গায় থাকলেও একটু ঠোকাঠুকি লাগে। মিছে আপনি উতলা হচ্ছেন।

বলে সরে পড়ার তালে ছিল। শশীমুখী আদেশ করলেন ঃ যাবি নে। দাঁড়া, ইদিকটা—এই আমার কাছে আয়। গরমের চোটে ঘুম নেই—তা একগাদা গায়ে জড়িয়ে জুজুবুড়ি হয়ে আছিস কেন? কাপড় সরা, দেখি—

যেমন যেমন বলছেন, মন্দিরা কলের পুতুলের মতন করে যাচ্ছে। চোখ পাকিয়ে শশীমুখী প্রশ্ন করলেন ঃ ফুলে ফুলে উঠেছে, কী ওসব?

পড়ে গিয়েছিলাম।

পড়ে এই রকম হয়? মিথ্যুক হারামজাদা মেয়ে, আমায় বোকা বোঝাতে এসেছিস? হতে হতে এত দূর—গায়ে হাত তুলেছে তোর?

দোষ যেন মন্দারই। রাত্রিবেলা যা-সব ঘটেছে, এখন সকালবেলা মা-জননী তার উপরে আরো ঘা কতক বসিয়ে না দেন। সিংহিনীর মতো গর্জাচ্ছেন ঃ ওর বাপ-ঠাকুরদা-চোদ্দপুরুষের মধ্যে এত আস্পর্ধা কারো হয় নি। কুলাঙ্গারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক-ছেদ, দূর করে দেবো আমার বাড়ি থেকে—

সিরাজকাটির বাসাবাড়ি এবং কিছু ভূসম্পত্তি শশীমুখীর নামে। অনিল-সলিলের বাপ ঝঞ্ঝাটের বাইরে রাখবার জন্য স্ত্রীর নামে এইগুলি বেনামি করেছিলেন। জোরটা সেই। বলছেন, সম্পর্ক তুইও ছাড়বি, দুয়োর থেকে খেদিয়ে দিবি। না ছাড়বি তো আমায় ছাড়্। শেষ কথা আমার।

আপাদমস্তক থরথর কাঁপছে। ভয়ঙ্কর চেহারা। দুম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান বুঝি-বা। মন্দিরা ভয় পেয়ে যায় ঃ কিছু হয়নি আমার মা, আপনি ঠান্ডা হোন—

কাঁদছে আর বোঝাচ্ছে শশীমুখীকে। ধরে নিয়ে ও-ঘরে তাঁর নিজের জায়গায় শুইয়ে দিল। শশীমুখী চোখ বুজে ঝিম হয়ে রইলেন।

সাইকেল নিয়ে সলিল রাত থাকতে বেরিয়ে গেছে। আজ বলে নয়—প্রায়ই যায় এমনি। কাজ-কারবারে প্রাণ ঢেলে খাটছে সে। মালের বন্দোবস্তে সদরে যাতায়াত, কন্ট্রাক্ট ধরা, খদ্দেরের পাওনার তাগিদ—এমনি সব ব্যাপারে সাইকেলের উপরেই বেশি সময় কাটে তার। গোলায় ভোম্বলের কাছে চাকর ছুটল, ভোম্বল ডাক্তার নিয়ে এসে পড়ল। বিষম তোলপাড়—কি-হয় কি-হয় অবস্থা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। টাল সামলেছেন মনে হচ্ছে। রোগি শান্ত। লজ্জা পেয়ে হাসছেনও। টরটর করে কথা বলছেন। বলেন, রাগ বলে পদার্থ নেই তোর শরীরে। এত বড় কাণ্ড—তা হাসছিলি কেমন মিটমিট করে। তাই দেখেই আরও আমি ক্ষেপে গেলাম।

মন্দা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলেছে এতক্ষণে। চোখ-মুখ ঘুরিয়ে সে বলে, এ আর

কী দেখছেন মা। আমার সেজদি, যার নাম মঞ্জরী—কোত্থেকে এক হাণ্টার এনে সেজ-জামাইবাবু তার আগাপাস্তলা পেটাল। আমার এই সামান্য একটু-আধটুতে আপনি মা অমন করতে লাগলেন—আর সেজদির সর্বদেহ ফালা-ফালা করে দিয়েছিল একেবারে। সেজদি তাই আবার জাঁক করে দেখায়, আর হেসে হেসে খুন হয়।

বোনেদের সমস্ত কথা শশীমুখী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছেন। বললেন, সে জামাই তো পাগল—

মন্দা সায় দিয়ে বলে, ছিল তাই। মার খেয়ে সেজদি বলত, পাগলে কি বোঝে কিছু? প্রাণ ঢেলে সেবাযত্ন করেছে সারিয়ে তুলবার জন্য। করেছেও তাই মা—সেজ-জামাইবাবু প্রায় ভাল হয়ে গেছেন।

শশীমুখী নিশ্বাস ফেলে বললেন, সলিলটাও যদি পাগল হত! মনকে তা হলে বোঝাতে পারতাম, জেনেবুঝে কিছু করছে না।

নয় আবার! মৃদুকণ্ঠে বলে মন্দা মুখ টিপে হাসল।

কি—কি বললি?

ছেলের নিন্দেয় আপনি মা রেগে যাবেন। আমি কিন্তু ভাবি, সেজদি'র আর আমার এক কপাল। সেজদি সারিয়ে তুলেছে—আমিও দেখি। আপনি আশীর্বাদ করুন আমায়।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে সলিল সাইকেলে বেল বাজাল বার কয়েক—কোন দিন যা করে না। বেগুনক্ষেতে গরু ঢুকেছে, হেই-হেই করে গরু তাড়ায়। যদু নামে কৈখালির বাড়ির বহু পুরানো ভৃত্য এখানে এসে আছে, তার উদ্দেশে হাঁক পাড়েঃ এই রাত পর্যন্ত গরু ছেড়ে রেখেছিস কেন রে, গোয়ালে তুলে ফেল। এসব ব্যাপার কোন দিন সে তাকিয়েও দেখে না—আজকে প্রথম। অথচ কী আশ্চর্য, সাড়াশব্দ নেই। কোনো দিকে মানুষ আছে, মনে হয় না।

দিনভোর সাইকেল চালিয়ে বড় ক্লান্ত। হাত-পা ধুয়ে বিছানায় পড়ল। চুপচাপ আছে, ঘুমিয়ে পড়েছে এমনিতরো ভাব। জুত হচ্ছে না—ঘুমের বদলে একটুকু গান ভাঁজলে কেমনটা হয়?

যা চেয়েছে তাই। অন্ধকারে শাড়ির খসখসানি। হতেই হবে—গানের টানে গর্তের সাপ অবধি বেরিয়ে আসে, মন্দিরা আসে, মন্দিরা তো সামান্যা মানবী।

ফিসফিসিয়ে, তবু ধমকের সুরে মন্দা বলল, চুপ! মা ঘুমুচ্ছেন। সারাটা দিন তাঁকে নিয়ে যে ধুন্দুমার গেছে। অনন্ত-ডাক্তার যা-তা বলতে লাগলেন, শুনে ধড়ে প্রাণ থাকে না। ভোম্বল ঠাকুরপো গয়নার নৌকো ধরে সদরে বড়দাকে খবর দিতে গেছেন।

যাবতীয় বৃত্তান্ত বলে তারপরে আবার প্রবোধ দেয়ঃ ডাক্তারবাবু যাই বলুন, আমার কিন্তু অত সাংঘাতিক মনে হয় না। ক্ষেপে গিয়েছিলেন বড্ড—বিকেলবেলা সেই মানুষই টরটর করে কত কথা বললেন।

জো পেয়ে সলিল মোলায়েম স্বরে বলল, কালকের সোহাগটা বেশ একটু বেআন্দাজি হয়ে গিয়েছিল। যে-হাতে হয়েছিল, বুঝতেই পারছ, তার উপরে তখন এক্তিয়ার ছিল না।

উঠে বসে সে মন্দিরার হাত ধরে টানল। ক'ফোঁটা অশ্রু এসে পড়ল যেন। সলিল বলে, ব্যথা এখন অবধি গায়ে লেগে আছে?

গায়ের ব্যথা কে বলল?

ও, মনের ব্যথা। কিন্তু কৈফিয়ত তো দিয়েছি। যে হাতখানা মেরেছিল, সে হাত

আমার নয়। বেতালের হাত বেরিয়েছিল, সেই হাতের কাজ।

আচমকা মন্দিরা শশীমুখীর কথাটা বলে দিল, সম্পর্ক-ছেদ তোমার সঙ্গে। চিরজন্মের তরে।

সলিল অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়েছে।

আগাগোড়া পুনরাবৃত্তি করে মন্দা জোর দিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক নেই, আমারও না। শেষ-হুকুম দিয়ে দিয়েছেন মা আমায়।

সলিল জ্বলে উঠল: মা কি ভেবেছেন শুনি। ঐ হুকুম তোমার উপরে ঝাড়তে যান—বলি আসল সম্পর্ক কার সঙ্গে? আমি বিয়ে করেছি বলেই না উনি শাশুড়ি-মা। বিয়ে না করলে তুমিই বা কোথায়, উনিই বা কে?

যুক্তিতর্ক মন্দা ঝেড়ে ফেলে দিল: সে তুমি মায়ের সঙ্গে বোঝোগে, আমি কিছু জানিনে। গুরুজনে আদেশ করেছেন, আমি অমান্য করতে পারব না।

সলিল বলে, গুরুজন আমি নই?

না বলছে কে। একশ-বার তুমি গুরুজন।

তবে?

মা তোমার উপরের গুরু। গুরুর গুরু—তাঁর মান্য সকলের উপরে।

সলিল রাগে রাগে বলল, হোক তাই। তাঁর সঙ্গেই তবে থেকো তুমি আমি বিয়ের আগে যেমন ধারা ছিলাম তেমনিই থাকবো।

মন্দিরা পরম নিশ্চিন্ত সুরে বলল, থাক, বাঁচলাম রে বাবা! মায়ের কথাও ঠিক এই—শোওয়া-বসা তোমার সঙ্গে একদম বন্ধ। মনে মনে তবু কেমন একটা অস্বস্তি ছিল। তোমারও আদেশ পেয়ে গেলাম, এখন আমার কী ভাবনা!

আমার আদেশের জন্য বিস্তর মাথাব্যথা কিনা তোমার—

ব্যঙ্গস্বর হঠাৎ পালটে গেল, কঠিন কণ্ঠে সলিল বলে, যা-খুশি মা বলুনগে। আদেশের কথাই যখন উঠল, এই ঘরেই তোমায় শুতে হবে নিত্যিদিনের মতো।

রাত হচ্ছে—হাত নিশপিশ করছে পেটানোর জন্য?

সলিল রেগে বলল, রোজ তোমায় পেটাই, তাই বলতে চাও?

ওমা, তা কেন বলব! পরশুর আগের আগের রাত্রে, মানে মঙ্গলবার রাত্রে তো পেটাও নি।

মঙ্গলবারে বাড়ি ছিলাম কোথায়, ভোম্বলের মামাতো বোনের বিয়ে ছিল না?

একটু থেমে উষ্ণকণ্ঠে সলিল বলে উঠল, বাড়ি থাকলেই পেটাব, এই বুঝি আমার নিয়ম?

নিরীহ ভালমানুষের মতন মন্দা বলল, নয়? তুমি কি বলো—মাঝেমধ্যে বাদ পড়ে যায় বুঝি? হতে পারে—ভুলোমন আমার, অতদূর খেয়াল রাখতে পারিনে।

সলিল ক্ষেপে গিয়ে বলে, ঘোর মিথ্যুক তুমি—

সন্ধির সুরে মন্দা তাড়াতাড়ি বলে, যাকগে যাক—তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। চিরতরে বিদায় যখন, তর্কাতর্কির কি দরকার?

তার মানে?

ঠোঁট দুটি সরু করে মন্দা এক বুলেট ছুঁড়ে দিল: ডিভোর্স—

সলিল নির্বাক পাষাণ-মূর্তি।

মন্দা বলছে, ভেবেচিন্তে দেখলাম অশান্তি-উপদ্রবের চেয়ে এই বেশ ভাল। আর তোমার তো ঢালা হুকুমই আছে, যখন খুশি ডিভোর্স নিয়ে বিরিয়ে যেতে পারব।

সলিল বলে, হুকুম প্রত্যাহার করছি আমি।

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে মন্দা বলল, কিছু যায় আসে না। ডিভোর্সের জন্য স্বামীর হুকুম চাই, আইনে তা বলে না।

পনের

যদু ছুটে এলো : মা জেগেছেন, শিগগির এসো—

সলিলের সঙ্গে শোওয়া-বসা মানা—কথাটা মন্দিরা তামাসার ছলে শুনিয়েছিল। সত্যি সত্যি তাই ঘটে গেল—এই রাত্রি বলে নয়, অনেক অনেক দিন, ও রাত্রি।

যদু বলে, মা কী রকম করছেন, দেখে ভয় করে।

আহত জন্তুর মতন গোঙানি, চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরুতে চায়। ঘরে পা দিয়ে মন্দিরার হুঁশ হল, সলিলকে দেখলে আরো হয়তো উত্তেজিত হবেন। ইসারায় বাইরে থাকতে বলল। একনজর একটু উঁকি দিয়ে দেখে সলিল অনন্ত-ডাক্তারের কাছে ছুটল।

ডাক্তার কানে শুনেই বুঝলেন। ও-বেলা ঠারেঠোরে এই রকম বলেও এসেছিলেন। বাঁ-অঙ্গের পক্ষাঘাত ডান দিকেও এগিয়েছে। মুখে সাড় নেই—কথা বলবার প্রাণান্তক চেষ্টায় গলা দিয়ে উৎকট আওয়াজ বেরুচ্ছে। বুড়োমানুষের এ কষ্ট চোখ মেলে দেখা যায় না।

মন্দিরাকে একদিকে নিয়ে ডাক্তার চুপি চুপি বললেন, ভোগান্তি তোমাদেরও মা। আশু জীবন-হানি ঘটবে না, কিন্তু রাতারাতি ঝেড়ে ফেলবার ব্যাধিও নয়। ডাক্তার এসেছি— অষুধপত্তোর দেবো না, সেটা হয় না। দিচ্ছি কয়েকটা পাঠিয়ে। আসলে কিছুই না—যন্ত্রণার কিছু উপশম হবে, এই মাত্র।

বিছানার পাশে মন্দিরা ঠায় বসে। পাখা করছে, গায়ে-পায়ে হাত বুলাচ্ছে— আর কি করবে। অনন্ত-ডাক্তারও বলে গেলেন, বাক্‌শক্তি নেই, কিন্তু সম্বিৎ আছে— দেখছেন বুঝছেন সমস্ত। সলিল অতএব বেশি সামনাসামনি হয় না, উতলা হয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছে। রোগির পাশে মন্দিরা একা। রাত্রি যেন কিছুতে আর পোহাতে চায় না।

সকালবেলা অনিল এসে পড়লেন। অনিলের এক বন্ধুপুত্র বিলেত থেকে এম-আর -সি-পি হয়ে এসেছে। ইদানীং হরেক নতুন চিকিৎসা বেরুচ্ছে, সে যদি কোন হদিস দিতে পারে। জিপে তুলে একদিন সেই ডাক্তারকে অনিল সিরাজকাটি এনে হাজির করলেন। ভরসা কেউ বড় দেয় না। এই বয়সের পঙ্গু রোগিকে কলকাতায় নিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। রোগি নিয়ে ঐ দূরদেশে দীর্ঘকাল পড়ে থাকার মানুষই বা কই? অনিল পারবেন না, সলিলের পক্ষেও কোল-ডিপো ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকা অসম্ভব। তা ছাড়া কলকাতা গিয়ে নিরাময় হবেন, এমন কথাও কেউ বলে না। হবার হলে ধীরেসুস্থে এখানে থেকেই হবেন। তাই আছেন পড়ে এক-বিছানায়— মন্দিরা দিনের পর দিন রাতের পর রাত সেবা করে যাচ্ছে। আশ্চর্য এক ক্ষমতা জন্মে গেছে—রোগি কি চাইছেন, মুখ দেখেই দিব্যি সে পড়ে নিতে পারে।

মোমের পুতুলটির মতন রুমকি এসে গেল এরই মধ্যে। রোগি আর বাচ্চা একলা একজনের সামাল দেওয়া মুশকিল। অসম্ভব একেবারে। মাইনে-করা লোক দিয়ে হয় না, তাদের মন্দিরা তিলার্ধ বিশ্বাস করে না।

নিরুপায় হয়ে নিজেই শেষটা গাঙের ধারে পেশাকার-পাড়ায় ঢুকে পড়ল। পাড়ার

শেষে কঁদেস্বরে। বলল, মারা পড়ি নতুনদিদি। একা একা পারছি নে আর। তুমি কি কেবল কানে শুনেই যাবে?

পরী বলে, কী করতে পারি বলো।

ভোম্বল ঠাকুরপোকে পাঠিয়েছিলাম। তাঁকে তো হাঁকিয়ে দিয়েছ।

পরী বলে, দশ রকম ভাবনা-চিন্তায় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই।

এত পরিষ্কার মাথা কখনো আমার ছিল না—

খপ করে সে পরীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। বলে, একদিকে অথর্ব শাশুড়ি আর এক দিকে বাচ্চা মেয়ে আমায় পাগল-পাগল করে তুলেছে। একলা পেরে উঠছি নে নতুনদিদি। মা-বোনেরা কাছাকাছি থাকলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ত।

একটু থেমে কড়া সুরে আবার বলল, আমার মায়ের পেটের বোন হলে মুখ ফিরিয়ে কখনো এমন থাকতে পারতে না।

চোখে জলও যেন। পরীবালা নরম হয়ে বলে, আমায় বাড়ি নিয়ে তুলবে, লোক-লজ্জা নেই তোমার?

না, নেই। ঐ নাম করে অনেক অবিচার ঘটানো হয়েছে সেই রামায়ণের আমল থেকে। এ কালের ভাগ্যে সে উৎপাত চুকেবুকে গেছে। লোকের আমরা কি ধার ধারি?

পরী পুনরপি বলল, তোমার বরের কথাটাও ভেবে দেখ। মুণ্ডু কাটবে আমায় নাগালের মধ্যে পেলে। কুকুর-শিয়ালের মতন দূর-দূর করেছি, সে অপমান জীবনে ভুলতে পারবে না।

তর্কাতর্কির আর সময় দিল না, টেনে-হিঁচড়ে মন্দা তাকে রিক্সায় তুলল। বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে নেবে, তারও সময় নেই। বলে, আর একদিন হবে। আজকে থাক।

সলিলকেও বলেনি। বাড়ির উপর পরীকে দেখে সলিল শিউরে উঠল: এটা কি করলে বল তো।

মন্দিরা সহাস্যে বলে, দুটো হাতে কুলোচ্ছিল না। নতুনদিদির দিয়ে আমাদের চারখানা হাত হল।

কী দুঃসাহস—উঃ।

আত্মগৌরবে মন্দা ফেটে পড়ছে। বলে আজ বলে নয়, চিরকাল আমি এমনি। গাছের খোড়লে শালিকের বাচ্চা ধরতে গিয়ে সাপ মুঠো করে ধরেছিলাম। কতটুকু বয়স তখন।

সলিল রাগ করে বলল, নেশা বিস্তর কষ্টে কাটিয়েছি। সেই নেশার বস্তু সামনের উপর এনে ধরলে। টের পাবে মজা।

মন্দা কলকণ্ঠে বলে, মা সেরেসুরে উঠুন—সত্যি সত্যি মজা হবে দেখো। বাড়িতে গানের আড্ডা হবে, ভেবে রেখেছি। নতুনদিদি তুমি আর আমি।

আরও বছর খানেক শশীমুখী ঐ জীবন্ত অবস্থায় ছিলেন। কথায় না বলতে পারুন, চোখ-মুখ থেকে সমস্ত এরা বুঝে নিত। রোগির চোখে কখনো আলোর ঝিলিক, কখনো বা অশ্রু দু-এক ফোঁটা—মনের ভিতরের আনন্দ ও অনুতাপ ছায়া ফেলত বোধহয়। অবশেষে তিনি দেহ রাখলেন। বাঁচলেন।

গিরিবালারা এত কাল পরে সবসুদ্ধ এসে পড়লেন। দশঘরায় নয়, কলকাতায়। দেবব্রতর বিয়ে উপলক্ষ করে। রুমকিকে নিয়ে সলিল-মন্দা গেল—সিরাজকাটির বাসা-বাড়ি পরী সেই ক'টা দিন আগলে রইল। অলকেশ মঞ্জরীও কাশী থেকে বিয়ের

এসেছে। ভাল আছে অলক, তবু তাকে একা ছেড়ে মঞ্জরী কোথাও যায় না।

দেমাক করে মন্দা একসময় মঞ্জরীকে বলল, হার মানি নি সেজদি, দেখ। এবারে অভিনয় নয়, সত্যি সত্যি। সিরাজকাটি তোমাদের নিয়ে যাব, ক'দিন থেকে আসবে। আরও ভাল করে দেখবে তখন।

শুভকর্ম চুকেবুকে গেল। নতুনবউ নিয়ে দেবব্রতরা ফিরে যাচ্ছে। মন্দিরা নাছোড়বান্দা ঃ দাদাদের ফুরসত হল না, তোমরা চলো সেজদি। যেতেই হবে। জন্ম থেকে জামাইবাবু পশ্চিমে মানুষ, বাংলার গাঁ-গ্রাম জল-জঙ্গল খাল-বিল দেখেন নি কখনো। কয়েকটা দিন থেকে এলে ভালই লাগবে দেখো।

চল্ তাই—

মঞ্জরী এককথায় রাজি। ফিসফিস করে বলে, গ্রাম দেখার চেয়ে আমার লোভ তোর নতুনদিদিটি দেখবার।

ক'দিন আজ সিরাজকাটিতে। মন্দিরা বড়ি দিচ্ছে, মঞ্জরী ফাই-ফরমাস খাটছে। এ বস্তু পাতে পড়লে পশ্চিমা-মানুষ অলকেশের চক্ষু ছানাবড়া হবে। কিন্তু হবার জো আছে! পরীবালার চেঁচামেচি—না গেলে কুরুক্ষেত্তোর করবে এখনই।

উপরের খোলা বারাণ্ডায় রুমকি আর পরীবালা। মন্দিরা বলে, কি দেখতে হবে, বলো?

এতক্ষণে সময় হল! দেখ, তোমার মেয়ের অত্যাচার—

গায়ের জামার ছিন্নাংশ দেখিয়ে পরীবলা নালিশ করছে ঃ কোমরে নিমফল পরিয়ে দিয়েছ, অসহ্য ঠেকছে ঠাকরুনের—খুলে দাও খুলে দাও করছে।—আমি বাপু তা তা পেরে উঠব না। তোমার মা পরিয়ে দিয়েছে, দেখাচ্ছেও খাসা। তা দেখ, ফ্যাস করে আমার জামাটা ছিঁড়ে দিল।

মন্দা কড়া হয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ঃ ছিঁড়েছ তুমি?

পরী সামনে আছে, এখন রুমকি গ্রাহ্য করে নাকি? হ্যাঁ—বলে অনেকখানি ঘাড় কাত করল। এবং জামায় টানদিয়ে আরও খানিকটা ছিঁড়ে হাতে-হাতে প্রমাণ দেখিয়ে দিল।

আর, বাচ্চামেয়ে কী কীর্তিই যেন করছে—দেখ দেখ, বলে পরীবালা হেসে খুন। হাসতে হাসতে বলে, আমার জামা কেন ছিঁড়বি তুই?

ইনুছে—

শোন, শুনছ? মেয়ের ইচ্ছে হয়েছে, তাই ছিঁড়ছে। কিন্তু ছিঁড়ে দিলে আমি কোথা পাই?

মন্দা ওদিকে মঞ্জরীকে বোঝাচ্ছে ঃ 'ইচ্ছে' মুখে আসে না বলে 'ইনুছে'। নতুন-দিদি পাখি-পড়ানোর মতন করে এই সমস্ত শেখায়।

পরীবালা কর-কর করে ওঠে ঃ তোমার ও পাকা-মেয়েকে পড়াতে হয় না, নিজেই কত পড়িয়ে দিতে পারে।

মঞ্জরী রুমকিকে কোলে টেনে বলল, নতুনমাসির জামা ছিঁড়েছ, মজা টের পাবে এইবার।

চোখ দুটো তুলে রুমকি শুধায় ঃ কি?

দমাদম মারবে—

ঘাড় দুলিয়ে রুমকি বলে, আদর করবে।

ঝাঁপিয়ে পরীবালার উপর পড়ে যাচাই করে নিচ্ছে ঃ করবে না আদর?

পরী বলে, করব বই কি। ভাল-জামাটা ছিঁড়ে দিয়েছ সোনা আমার, চাঁদ আমার—চুমু খাচ্ছে মেয়েকে পাগলের মতো।

স্বর্ণসজ্জা

অনুজপ্রতিম কথাকার

শ্রীমান সমরেশ বসু

প্রীতিভাজনেষু

এক

ঝড়-বৃষ্টির দুর্যোগ চলছে ক'দিন ধরে। তারই মধ্যে ছোটরায়—চন্দ্রভানু রায়ের বোট ছাড়ল। নীলরঙের বোট, দেখেই লোকে চেনে। আঙুল দেখায়ঃ ছোটরায় চলেছেন ঐ যে—

দুর্গাপূজা এসে পড়ল। পুজোর কেনাকাটা সদরে গিয়ে। সেখান থেকে বাড়ি। বাড়ির লোকে পথ তাকাচ্ছে। গিয়ে পৌঁছলে কোমর বেঁধে উদ্যোগ-আয়োজনে লেগে যাবে। সে বড় সামান্য ব্যাপার নয়। পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে রায়দেব দুর্গোৎসবের নামডাক। অঞ্চল জুড়ে নেমন্তন্ন। হাজার দুই-তিন মানুষ এসে প্রসাদ পেয়ে যায়। দুর্যোগে তাই বেরিয়ে পড়েছেন, দেরি করবার উপায় নেই।

মাঝ-গাঙ অবধি গিয়ে চন্দ্রভানু সহসা চেঁচিয়ে ওঠেন ঃ বোট ঘোরাও—

কামরা থেকে বেরিয়ে গলুয়ের উপর দাঁড়ালেন। জোয়ার-বেলা। সমুদ্রের যত জল হু-হু করে ধেয়ে আসছে ডাঙার রাজ্যে। আছড়ে পড়ছে বাঁধের গায়ে। ঘাটের উপর এইমাত্র দেখে গেছেন, বৃষ্টিভেজা গেঁয়োগাছগুলো গর্বভরে পাতা দোলাচ্ছে—গাছের আধাআধি এরই মধ্যে জলতলে। একটু পরে চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না, ঢেউ ভাঙবে গাছের মাথার উপর দিয়ে।

বোট ঘুরিয়ে বাক্সর মুখে নিয়ে চলো মাঝি। দেখে যাই আমি একবার।

গলুয়ে দাঁড়িয়েছিলেন চন্দ্রভানু রায়। তৃপ্তি হল না বুঝি, ছাতের উপর উঠে পড়লেন। কূল ঘেঁসে বোট চলল। তীক্ষ্ম নজরে তাকিয়ে আছেন, চোখে পলক নেই। মাঝিমাল্লারা মনে মনে বিরক্ত। মাস ছয়েক একটানা পড়েছিলেন চকে, যখন-তখন বাঁধের উপরে ঘুরতেন। জল-নিকাশের জন্য কাঠের তৈরি বন্দোবস্ত, বাক্স বলে সেই বস্তুকে। বাক্সর ধারে গিয়ে কতবার তো কত রকমে পরখ করে দেখেছেন। ইতিমধ্যে কী এমন ঘটল—বেরিয়ে পড়েও আবার পানসি ঘোরানোর হুকুম। আবার গিয়ে দেখতে হবে।

একটু হেসে কৈফিয়তের ভাবে চন্দ্রভানু বললেন, বড্ড তুফান রে আজ। চোখের দেখা একটিবার দেখে যাই। ঐ পথেই অমনি আমরা বেরিয়ে যাব, দেরি হবে না।

সাগরচক নাম। সমুদ্রের তলে ছিল, চড়া পড়ে ডাঙা জেগেছে। কঠিন প্রশস্ত বাঁধে চারিদিক ঘেরা—চরের খোলে নোনা জল না ঢুকতে পারে লক্ষ্মীঠাকরুন সমুদ্র থেকে চুপিচুপি উঠে এসে ঝাঁপি উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন ; এত ফলন নইলে হয় না। ধান নয়, সোনা ঢেলে দিয়ে যান। প্রতি বছরই এমনি। এক সাগরচকই রায়বাড়ির বিশাল সংসারের যাবতীয় খরচের যোগান দেয়। সমস্ত কুলিয়ে গিয়ে তবু ধান বাড়তি থাকে। বড় আদরের চক—বছরের মধ্যে এগারো মাস চন্দ্রভানু এখানে পড়ে থাকেন। সদাসতর্ক, ভয় কিছুতে ঘোচে না। সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র ছেলে। সাগরচকও যেন আর-এক সন্তান। আবোলা সন্তানকে দুর্যোগের মধ্যে নদীকূলে অসহায় ফেলে যাচ্ছেন—মনের কী অবস্থা, মাঝিমাল্লারা বুঝবে কেমন করে?

বোট থেকে নেমে বাঁধের উপর চক্কোর দিয়ে ঘুরছেন। অতি সন্তর্পণে তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিকে দেখেন। হঠাৎ এক সময় সম্বিত হল, দেরি হয়ে গিয়েছে বড়। বিস্তর গোন নষ্ট হল।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মাঝির উপরে তাড়া ঃ ধেয়ে চলো। এই জোয়ারে আফরার খালে তুলে দিতে হবে। বুঝব ক্ষমতা। সেখান থেকে ভাটা ধরব। নইলে সারা

রাত্তির ভোগান্তি।

কিন্তু মুখের তাড়ায় বোট ছোটে না। আফরার আগে থেকেই বেগোন। গুণ টেনে অনেক কষ্টে খালের মুখ অবধি পেঁছানো গেল। খালে ঢোকা অসম্ভব। আর কি হবে, চাপান দাও তবে এখানে। রাঁধাবাড়া হোক।

মোহনার উপর গোলপাতার ছাউনির প্রকাণ্ড ঘর উঠেছে। চন্দ্রভানু অবাক হয়ে বলেন, অজঙ্গি বনের পাশে ঘর তুলল কে এখানে ?

মিত্তিরবাবুর খটি।

খটি এন্দুর অবধি এসে গেছে ? কোন জায়গা আর বাকি রাখবে না লালমোহন মিত্তির—ছাঁকনি দিয়ে পয়সা জল থেকে তুলে নিচ্ছে।

ব্যাপার তাই বটে। কুচোচিংড়িকে এই অঞ্চলে বলে জলের পোকা। পোকার মতোই অজস্র। স্নানে নামলে ঠোক দিয়ে দিয়ে অস্থির করবে গায়ের তেল খাবার লোভে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তবে বাঁচোয়া। গামছা ছাঁকনা দিলে চিংড়ির ভারে সে গামছা টেনে তোলা দায়। চিংড়ি-ধরা একরকম ঘন জাল আছে, কিন্তু জেলে-মালোরা সে জাল বানাতে চায় না। কী হবে জলের পোকা মেরে, খদ্দের কোথা, পয়সা দিয়ে ও জিনিস কে কিনতে যাবে ?

লালমোহন মিত্তির উত্তরঅঞ্চলের মানুষ। তিনি এসে হাটে হাটে ঢোলশহরৎ দিলেন, যে যত কুচোচিংড়ি নিয়ে আসুক, উচিত দামে কিনে নেবেন তিনি। দরও একটা বেঁধে দিলেন। নতুন এক ব্যবসা ফেঁদেছেন—চিংড়ি শুকিয়ে বাইরে চালান দেওয়া। রোদে শুকানো হবে। এবং বাদার জঙ্গলে কাঠকুটোর অপ্রতুল নেই—বর্ষাকালে রোদের অভাবে আগুনে শেঁকাও চলবে।

গাঙ-খালের বাঁকে বাঁকে কারখানা—চিংড়ি শুকিয়ে বস্তাবন্দি হয় সেখানে, নৌকো বোঝাই হয়ে শুকনো-চিংড়ি চালান যায়। এমনি কারখানাকে বলে খটি। শ' খানেক খটি বসে গেছে দেখতে দেখতে। অহোরাত্রি চিংড়ির নৌকোর চলাচল। জেলেরা অন্য মাছ ধরা ছেড়ে কুচোচিংড়ি ধরছে কেবল। খদ্দের খুঁজতে হয় না, যে কোন খটিতে মেপে দিলেই হাতে হাতে পয়সা। এত শুকনো চিংড়ি যায় কোথা রে বাবা, কারা খায় এত !

নাম লালমোহন তো ক'টা বছরের মধ্যে সত্যি সত্যি তিনি লাল হয়ে গেলেন। অঞ্চলের মধ্যে ডাকসাইটে বড়লোক।

বড়লোক ডাক পড়ে গিয়ে বিপদ দেখা দিল। খটিতে খটিতে লুটতরাজ। জেলেদের দাম মেটানোর জন্য নগদ টাকাপয়সা মজুত রাখতে হয়, তার উপর হরদম মাল বিক্রির টাকা এসে জমে। এতগুলো খটির সর্বত্র সব সময় কড়া পাহারার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। জোলো-ডাকাতরা এই অঞ্চলেরই মানুষ। তারা তক্কে তক্কে থাকে। দেশি কামারের গড়া বন্দুক বল্লম শড়কি নিয়ে নদী-খালের গর্ভ থেকে অকস্মাৎ রে-রে করে এসে পড়ে, টাকার থলি ছিনিয়ে নিয়ে চক্ষের পলকে নৌকো ছুটিয়ে দেয়। ধরিত্রীর শিরা-উপশিরার মতো নদী-খাল ছড়ানো। নৌকো নিয়ে কোন খাল-দোখালার পথে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, কোন রকম তার নিশানা মেলে না।

পুলিশকে যথারীতি জানিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বোট ও লঞ্চ নিয়ে সমারোহ করে জল-পুলিশ টহল দিয়ে বেড়ায়। ডাকাতরাও তেমনি ঘড়েল। পুলিশ এই দিকটায় তো ভিন্ন একদিকে পড়ে তারা কাজ সেরে পালাল। বড় বেশি গণ্ডগোল তো চুপচাপ

রয়ে গেল কিছুদিন।

লালমোহন চোখে অন্ধকার দেখছেন : কি হবে ভক্তদাস ?

কারখানার ম্যানেজার ভক্তদাস। ধবধবে পোশাক এ'টে অফিসে বসে ফাইলে সই মেরে যাচ্ছেন, ভাঁটি অঞ্চলের ম্যানেজার সে মানুষ নয়। নাম সই করতেই কলম ভাঙে, এমনি ম্যানেজার বহু। ভক্তদাস অতদূর নয় অবশ্য। সোনাছড়ি বন্দরে হেডঅফিস—সবগুলো খটির যাবতীয় হিসাবপত্র মাস অন্তে সেখানে চলে যায়, জাবেদা খাতায় ভক্তদাস টুকে রাখে। লেখাপড়ার কাজ শেষ করে তক্ষুনি আবার হয়তো চিংড়ির বস্তা ঘাড়ে নিয়ে নৌকোয় ফেলতে লাগল। এই ম্যানেজার। স্থানীয় লোক বলে ঘাঁতঘোঁত সমস্ত জানে। লালমোহনের দেখতে দেখতে এত উন্নতি, তার একটা কারণ ভক্তদাস হেন করিতকর্মা ম্যানেজারটি পেয়ে গেছেন।

উপায় কি ম্যানেজার ?

ভক্তদাস বিরস মুখে ঘাড় নাড়ে : পুলিশে হবে না বাবু, পুলিশ কি করবে ? ওরা হল গর্তের ই'দুর। যমরাজই খু'জে হদিস পান না—কোন একটা জোলো-ডাকাত মরতে শুনেছেন কখনো ?

লালমোহন বললেন, কি করব তবে ? কাজ-কারবার তুলে দিতে বলো ?

ভক্তদাস একটু ভেবে বলে, বেলডাঙার রায়বাড়ি গিয়ে ধরুন। ভাঁটিঅঞ্চলে থেকে ও'দের শরণ না নিয়ে উপায় নেই। সব তরফের সকলের কাছে যেতে বলিনে, ছোটরায়কে বলুন গিয়ে। চন্দ্রভানু রায়—ঐ একজনেই হয়ে যাবে।

লালমোহন কিছু অবাক হয়ে বলেন, আমার জন্য ও'রা কি ডাকাত তাড়াতে যাবেন ?

কিছু না, মুখের কথাও খসাতে হবে না। ভল্লাটের কোন মানুষ কি করছে ছোটরায়ের সব জানা। মাতব্বর একটা-দুটোকে চোখ টিপে দেবেন—সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ঠাণ্ডা।

গলা খাটো করে ভক্তদাস বলে, রায়েদের এককালে পেশা ছিল গাঙে-খালে নৌকো মেরে বেড়ানো। ছোটতরফই ছিল বেশি দুর্দান্ত। ছোটরায়ের বাপ রুদ্রভানু অবধি চলেছিল। সরকারের কড়াকড়ি বুঝে শেষটা তিনি চকের বন্দোবস্ত নিয়ে চকদার হলেন। পুরানো পেশা ছাড়লেন। ছোটরায়কে টোলে পাঠালেন পণ্ডিত বানাতে। ছোটরায়ের ছেলেটা শুনি আরও ধুরন্ধর। বিদ্যের জাহাজ হয়েছে, বিদ্যের ধান্দায় দেশভু'ই ছেড়ে কলকাতা শহরে পড়ে থাকে। হাত-পা ধুয়ে রায়েরা এখন পুরোপুরি ভদ্দোরমানুষ—তা হলেও পুরানো খাতির যাবে কোথা ? ডাকাতেরা সর্দারমান্য দিয়ে যায় ও'দের। ছোটরায় পেয়ার করেন জানতে পারলে আপনার খটির পাঁচ-শ' হাতের মধ্যে কোন মন্দ-নৌকো ভিড়বে না।

পুলিশের দৌড় বোঝা গেছে। ভক্তদাস যা বলছে, এই হল শেষ উপায়। রায়বাড়ির দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ আসে। অন্যান্য বার ভক্তদাস গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, এবারে লালমোহন নিজে যাবেন। নিজে গিয়ে চন্দ্রভানুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসবেন।

দুই

পুজোর কিছু আগে রায়বাড়ির ছোটতরফে বিষম দুর্ঘটনা। ছোটরায়ের স্ত্রী ইন্দুমতী দোতলার সি'ড়ি থেকে পড়ে চোট খেলেন। শয্যাশায়ী অবস্থা।

বিশাল সংসার, মানুষ কতগুলো হঠাৎ হিসাবে আসে না। সংসারের যাবতীয়

দায়দায়িত্ব ঐ এক ইন্দুমতীর উপর। আঁচলে চাবির থোলো ঝুলিয়ে ছোটখাট মানুষটি সকাল থেকে রাতদুপুরে অট্টালিকার একতলা-দোতলা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন—কোন-কিছু নজরে এড়ায় না। তবু তো চোখ একটি মাত্র, ডান-চোখ কানা। কানাখোঁড়ার একগুণে বাড়া—এক চোখেই যেন এক গন্ডা চোখের দেখা দেখতে পান। লোকজন তটস্থ—বাতাসের মতন নিঃশব্দ পায়ে কখন এসে পড়েন!

এমনিটাই সকলে বরাবর দেখে আসছে। সেই মানুষ দিনের পর দিন বিছানায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। ইন্দুমতীকে বাদ দিয়ে এবারে দুর্গোৎসবের কাজকর্ম কেমন করে হবে, ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

গোবিন্দসুন্দরী সম্পর্কের হিসাবে নাকি পিস-শাশুড়ি। কণ্ঠে কান্নার সুর এনে বলেন, অষ্টপ্রহর পাক দিয়ে বেড়াও বউ, তাতেই সব শাসনে থাকে। দেখাশুনো যতই করি, আমি তো তোমার সিকির সিকিও পেরে উঠব না।

ইন্দুমতী বেখাপ্পা ভাবে বলে ওঠেন, ডাল বাছা হয়ে গেছে পিসিমা?

থতমত খেয়ে গোবিন্দসুন্দরী বলেন, হুঁ, তা একরকম—

হয়ে থাকে তো ধামা ধরে আনুন এখানে। আমার সামনে—চোখের উপর। ছোলার সঙ্গে মুসুরি কেমন করে মিশে যায় জানিনে। বিধবারা খাবেন। মুসুরি আমিষ, একটি দানা থাকলে চলবে না।

সত্যিই তো, সত্যিই তো—। বলে গোবিন্দসুন্দরী সরে পড়লেন। দরদ জানাতে এসে কী দুর্ভোগ!

অন্তরালে গিয়ে গর্জন করেন: বয়ে গেছে, মাইনে-করা দাসী-বাঁদী নাকি! কিচ্ছু করতে পারব না—যাও।

এবং সেই ডালের ধামা নিয়ে বসে গেলেন আবার। ক্ষীরোদা-ঝি'কে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন: ক্ষীরি, শুনে যা। বড্ড সর্বনাশ যে এদিকে—

কাছে নিয়ে এসে বলছেন, মুখ দিয়ে বের না করিস তো বলি। বউমার ব্যথাখানা সহজ নয়। হাড় চুরমার হয়ে মাংস অবধি থেঁতলে গেছে। আর উঠতে হবে না, বিছানায় পড়ে চিঁ-চিঁ করা এবার থেকে। তেষ্টার এক ঢোক জল—দয়া হল তো কেউ এগিয়ে দেবে, নয় তো ছাতি ফেটে মরবে।

আক্রোশ মিটিয়ে বলছেন। একটা গুণ ক্ষীরোদের—এর কথা ওকে গিয়ে লাগায় না। নির্ভাবনায় তাই বলা যাচ্ছে। বলেন, ধর্ম সব দেখে রাখে। দেখেছে বলেই এত খোয়ার। গুরুজন আমি—একবাড়ি লোকের মধ্যে আমার বাক্স হান্ডুলপান্ডুল করে রুপোর বাটি বের করল। রাত্তিরবেলা চোখে ঠাহর হয় না—রুপোর বাটি পিতলের বাটির তফাৎ ধরতে পারি নি। বল্ রে ক্ষীরো, আমি বুঝি ইচ্ছে করে নিয়েছিলাম! আমি চোর! হায় কপাল, তেমনি ঘরের বেটি আমি, তেমনি ঘরে বিয়ে হয়েছিল!

ক্ষীরো-ঝি জিজ্ঞাসা করছিল—রুপোর বাটি পিতলের বাটির কথা নয়, সে বৃত্তান্ত সকলে জানে, বাড়িসুদ্ধ হাসাহাসি হয়েছে তাই নিয়ে। বলতে যাচ্ছিল, অসুখের কথাটা গোবিন্দসুন্দরী আন্দাজি বলেছেন, না ধনঞ্জয় কবিরাজ তাঁর কাছে বলেছে কিছু বিশেষভাবে—

কিন্তু বলবার আগে দুড়দাড় করে ছুটতে হল দোতলায় ইন্দুমতীর ঘরে।

বড় উঠানের অপর দিকে বিনোদের মা আর নকড়ি গোমস্তায় কথাবার্তা—দোতলা থেকে তা-ও ইন্দুমতীর কানে পৌঁছে গেছে। শয্যা থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন:

কি নিয়ে ঝগড়া তোমাদের ? আমার কাছে এসো বিনোদের মা। শুনি।

বিনোদের মা ভয়ে লজ্জায় এতটুকু। ঘরে ঢুকে মিনমিন করে বলে, ঝগড়া নয় মা। মশারি ছিঁড়ে গেছে, মশা আটকায় না। বিনোদকে নিয়ে সমস্ত রাত আলো জেবলে বসে ছিলাম। মশারি কবে আসবে, জিজ্ঞাসা করছিলাম গোমস্তামশায়কে।

মশারির কথা বলেছ তুমি কবে ?

পরশুদিন।

ইন্দুমতী ভ্রূকুটি করলেন : দু-দুটো দিনের মধ্যে একখানা মশারি জোটে না— আমার সংসারের মানুষ মশার কামড়ে আলো জেবলে বসে রাত কাটায় ?

প্রশ্নটা ক্ষীরোদার দিকে তাকিয়ে। খাস চাকরানি যখন, সকল কৈফিয়ত তাকেই দিতে হবে।

ক্ষীরো তাড়াতাড়ি বলে, হাটে লোক পাঠানো হয়েছিল। জালের মতন জিনিস দেখে আনে নি। গঞ্জ থেকে কাল ভাল মশারি এনে দেবে।

ইন্দুমতী অধীর কণ্ঠে বলেন, গোড়াতেই কেন গঞ্জে পাঠানো হল না ? গোমস্তা-মশায়কে জিজ্ঞাসা করবি। শুনতে চাই আমি জবাব।

বচসার মুখে বিনোদের মা-ও ঠিক এই কথাগুলো নকড়ি গোমস্তাকে বলছিল। অবস্থা বিবেচনায় ক্ষীরো এখন নকড়ির পক্ষ নিয়ে বলছে, হাটে মিলে যাবে, উনি ভেবেছিলেন। গঞ্জ অবধি যেতে হবে না। ভালো জিনিস হাটে তো আসেও কখনো-কখনো।

ইন্দুমতী লুফে নিয়ে বললেন, আমি জানি, জানি। দৃষ্টিকৃপণ মানুষ—বারো গন্ডা পয়সার জোলোর মশারিতে যদি কাজ চলে যায়, গঞ্জে পাঠিয়ে খামোকা কেন দু-টাকা আড়াই টাকা খরচ করতে যাবেন ? যাও তুমি বিনোদের মা। দেখছি। আজ আর আলো জেবলে বসতে হবে না।

বিনোদের মাকে সরিয়ে দিয়ে ইন্দুমতী ক্ষীরোকে বললেন, আমার মশারি খুলে ওর বিছানায় টাঙিয়ে দিয়ে আয়।

স্তম্ভিত ক্ষীরোদা বলে, সে কি ! আপনার শরীরের এই দশা মা—

মশারি থেকেও আমার ঘুম হয় না। কাল রাত্রে বিনোদের মা যা করেছে—আমার আজকে তাই। আলো জবালা থাকবে, বসে বসে আমি রাত কাটাব। হাত-পা কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলি যে—হুকুম মানবি নে ? শুয়ে পড়ে আছি, কিন্তু বেঁচে রয়েছি আমি আজও।

তাকিয়ে পড়লেন কর্ত্রীঠাকরুন। চোখের দৃষ্টি একনলা বন্দুকের বুলেট যেন। মশারি খুলতে ক্ষীরোদা দিশা পায় না।

অনতিপরে কবিরাজ এলেন। ধনঞ্জয় কবিরত্ন—লোকে বলে ধন্বন্তরি কবিরাজ। অষুধ লাগে না, হাতে ছুঁয়ে দিলেই রোগ নাকি ছুটে পালায়। সে কবিরাজ গোড়া থেকে দেখছেন—কত মালিশ, অনুপান, বদলে বদলে কত রকমের বটিকা। নিরাময়ের কোন লক্ষণ নেই।

কবিরাজকে পেয়ে নিত্যি দিনের সেই প্রশ্ন : আর কত দিন কবিরাজমশায় ? আমার সংসার যে লন্ডভন্ড হয়ে গেল।

কবিরাজ আজকের মানুষ নন। চন্দ্রভানুর বাপ রুদ্রভানুর যখন শেষ অবস্থা, এই ধনঞ্জয় সেদিন সুচিকাভরণ প্রয়োগ করেছিলেন। বয়সে ছেলেমানুষ তখন, রায়বাড়ি গতায়াত সেই সময় থেকে। আপন জনের অধিক হয়ে গেছেন তিনি।

ইন্দুমতী বলছেন, চোখের উপর ভূতের নৃত্য চলছে, সামান্য মশারির অভাবে লোকে ছেলে নিয়ে রাত জেগে কাটায়—শুয়ে শুয়ে আমায় এই সমস্ত দেখতে হয়। তাড়াতাড়ি রোগ সেরে দিন, নয়তো বিষ বড়ি-টড়ি খাইয়ে শেষ করে দিন একেবারে।

হাস্যমুখ ধনঞ্জয়ের। ছেলেমানুষের মুখে আগড়ুম-বাগড়ুম শুনছেন যেন।

অধীর কণ্ঠে ইন্দুমতী বলেন, আপনি বলেছিলেন পুজোর আগে সেরে উঠব।

সারবেনই তো।

পুজো যে এসে পড়ল। এক মাসও বোধহয় নেই।

নির্বিকার কবিরাজ বলেন, আসুক না।

আমার কিন্তু মনে হয়, খারাপই হচ্ছে দিনকে-দিন। একেবারে অচল হয়ে পড়ছি। পায়ের দিক থেকে ক্রমে যেন অসাড় হয়ে আসছে।

ধনঞ্জয় উড়িয়ে দেন: ও কিছু নয়। অনেক দিন ধরে শয্যাশায়ী, অঙ্গের চালনা হয় না। সেইজন্যে অমনি ঠেকে।

ইন্দুমতী কিছু ভরসা পেয়ে বলেন, বৃহৎ কাজ সামনে। কিছুই গোছগাছ হয় নি। আমি পড়ে থেকে সমস্ত মাটি। সত্যি কথা বলুন কবিরাজমশায়, আগেকার বলশক্তি পাবো তো আবার?

ধনঞ্জয় বলেন, ঠিক পাবেন। হয়েছে কী, বলুন তো? সেরে উঠে ডবল খাটনি খেটে এত দিনের লোকসান সুদসুদ্ধ আদায় করে নেবেন।

চন্দ্রভানু আজকেই এসে পৌঁছেছেন। কবিরাজের পিছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন কথাবার্তা। তারপর দুজনে বাইরে এলেন।

ধনঞ্জয়ের এতক্ষণের হাসিমুখ ঘরের বাইরে এসে অন্ধকার। প্রদীপ নিভে গেলে হঠাৎ যেমন অন্ধকার হয়। বললেন, রোগির সামনে যা-ই বলি, নিজের উপর আমি আর ভরসা রাখতে পারিনে ছোটরায়। ভাল চিকিৎসক কাউকে দেখান।

চন্দ্রভানু বলেন, অবস্থাটা কি, খুলে বলুন।

লক্ষণ খারাপ। প্রাণের শঙ্কা করিনে, বেঁচে থাকবেন ঠিকই। তবে শুয়ে পড়ে থাকতে হবে এমনি।

কত দিন?

ঢোক গিলে কবিরাজ বলেন, হতে পারে সারা জীবন। আমার চিকিচ্ছেয় কাজ হল না। আমি পরাজিত। দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছেন। পায়ের দিক থেকে অসাড় হয়ে আসছে, মিথ্যে বলেন নি সেটা। এমনি হবে, অসাড় হতে হতে ক্রমশ উপর দিকে উঠবে।

চন্দ্রভানু আঁতকে উঠলেন: কী সর্বনাশ!

ধনঞ্জয় বলেন, আমি বলি, দীন নন্দন ডাক্তারবাবুকে দেখান না কেন একবার। তাঁর মতো কে আছে? চকে খবর দিয়ে পাঠান। চিকিচ্ছের কোন উপায় থাকলে তিনিই বাতলে দেবেন।

চন্দ্রভানু বলেন, চক ছেড়ে তাঁর পক্ষে আসা মুশকিল। ডাক্তারখানা সবে জমতে লেগেছে। আসতেই চাইবেন না। আমি ফিরে যাই—বলে-কয়ে দু-চার দিনের জন্যে পাঠাব। পুজোর গোলমালটা কাটলে সদরের ডাক্তার এনে দেখানো যাবে একবার। বড় সর্বনাশের কথা বললেন কবিরাজমশায়। আমি চকে পড়ে থাকি, ছোটবউ সংসার নিয়ে থাকে। দু-জনে দু-দিকে—দিব্যি চলে আসছিল। এই রাবণের সংসার ছোটবউ ছাড়া কে সামলাতে পারে?

কবিরাজ বলেন, রোগিকে স্তোক দিই, তা বলে আপনাকে দিতে পারিনে। আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে যা আসে, খোলাখুলি বললাম। সংসার-সংসার বলে বউমাও ছটফট করছেন। কিন্তু আসল সংসার কতটুকু আপনাদের। স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে। তার মধ্যেও বাপ ছেলে দু-জন আপনারা বাইরে বাইরে। আজেবাজে একগাদা পুষ্যি—ওদের কতকগুলো সরিয়ে দিন, তা ছাড়া উপায় কি?

হেলা করে বলবেন না কবিরাজমশায়। রায়বাড়ি যাঁরা আছেন, আজেবাজে তার মধ্যে একজনও নন—

চন্দ্রভানুর স্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বলেন, যাঁদের পুষ্যি বলছেন, তাঁদের একজনকেও আমরা নিয়ে আসি নি। সরাবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বেলডাঙার এই বাড়ি যেদিন শেষ হল, রায়েরা গৃহপ্রবেশ করলেন, আসবাবপত্তর এলো, সেই সঙ্গে ওঁদেরও বাপ-দাদারা এসে ঢুকেছিলেন। রায়বাড়ি যদি কখনো লয় পায়, একসঙ্গে সকলে আমরা সরব। আগে একজনও নয়।

একটু থেমে আবার বলেন, উপায় নেই। রায়েদের প্রতিশ্রুতি আর রায়বাড়ির ইজ্জত এক সঙ্গে বাঁধা। বাইরের লোকের কাছে আজব ঠেকতে পারে, কিন্তু কী পরিচয় ওঁদের, কোন জোরে রায়বাড়ি ওঁদের বসবাস—আপনার তো কিছু অজানা নেই। আপনি কেন অমন কথা বলবেন কবিরাজমশায়?

পুজোর দিন এগিয়ে আসে, ইন্দুমতী ততই পাগল হয়ে উঠছেন। অঞ্চলের মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে রায়বাড়ির পুজোয় আসবে বলে, এবারে বুঝি সমস্ত পণ্ড। কেলেঙ্কারির পার থাকবে না। বেঁচে থাকে চোখের উপর এ জিনিস তিনি কেমন করে দেখবেন?

দিনের মধ্যে অমন বিশবার স্বামীর উপর অনুযোগ করেন: তুমি কিছু দেখছ না।

চন্দ্রভানু সোজাসুজি মেনে নেন: এ সবের আমি কি বুঝি আর কি দেখব। দেখতে গিয়ে তোমারই চিরকেলে বন্দোবস্ত হয়তো ভন্ডুল ঘটিয়ে বসব।

আবার বলেন, বাড়ি এলেই তো শালগ্রাম-শিলা বানিয়ে ফেল। তাই তো অভ্যাস চিরকাল শুয়ে বসে থাকা, আর ঘন ঘন তোমার প্রণাম নেওয়া।

ইন্দুমতী কেঁদে বলেন, আমি শয্যাশায়ী হয়ে আছি, সকলে মিলে ধর্ম দেখছ তোমরা এই সময়।

ধনঞ্জয় কবিরাজের সঙ্গে দেখা হলেই মারমুখী: ধোঁকা দিলেন আপনি, কিছুই করলেন না। পুজোর মধ্যে সেরেসুরে উঠব—কোথায়?

এই ভয়ে কবিরাজ আর সামনে আসেন না, রোগি দেখা আপাতত বন্ধ।

ধ্রুবভানুর কলেজের ছুটি। সে বাড়ি এসেছে। মাকে প্রবোধ দেয়: যত উতলা হবে, সেরে উঠতে ততই দেরি পড়ে যাবে। ছটফট কোরো না, নির্বিঘ্নে কাজকর্ম হয়ে যাবে দেখো।

হবে কেমন করে? তোরা যে বাপ-বেটা হাতে করে কুটোগাছটিও ভাঙিসনে—

কুটো কি তুমিও কোনদিন ভাঙতে মা?

কি, কি বললি তুই? ক্রুদ্ধ ইন্দুমতী এক-চোখ পাকিয়ে পড়লেন: কাজ করিনে, সংসার কে চালায় শুনি?

ধ্রুব বলে, মিথ্যে বলি নি। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখ তুমি। ছুটোছুটি চেঁচামেচি করে বেড়াও, কিন্তু নিজ হাতে কতটুকু কি করো? যারা বরাবর করে থাকে,

এবারও তারাই করবে।

করবে—তার জন্য ডাক-হাঁক লাগে। ছেলেমানুষ তুই, তোকে কিছু বলছিনে। কিন্তু বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি যে একেবারে চুপ। শালগ্রাম-শিলা হয়ে আছেন—শালগ্রাম কথা বলেন না, তিনিই বা কেন বলতে যাবেন? আমি যে থাকতে পারিনে, শুয়ে শুয়ে এইখান থেকে চেঁচাই—

হাউহাউ করে ইন্দুমতী কেঁদে পড়েন: আমার চেঁচামেচি কেউ আজকাল কানে নেয় না। অভ্যাসবশে মুখ দিয়ে হুকুম-হাকাম যা বেরিয়ে যায়, নিজের কাছেই কান্নার মতো লাগে।

কিরণবালা কমবয়সি মেয়ে। বরে নেয় না, এই রায়বাড়িতে আশ্রয়। কোন সম্বন্ধে জানা নেই, ইন্দুমতীকে মাসিমা বলে ডাকে। সে এসে খবর দেয়: প্রতিমার উপরে চালচিত্র বসে গেছে, ডাকের সাজ পড়েছে। গর্জনতেল মাখিয়ে দিয়েছে, জ্বলজ্বল করছেন ঠাকুর-ঠাকরুনরা।

ঠোঁট উলটে ইন্দুমতী বলেন, ঐ সাজগোজ অবধি। মা-দুর্গার কপালে উপোস এবারে—ছেলেমেয়ে সুদ্ধ।

ক্ষীরো-ঝি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মিছে উতলা হচ্ছ মা। কাজকর্ম ঠিকঠিক চলেছে। গোমস্তামশায় গঞ্জ থেকে এই মাত্তোর কাঁচাবাজার সেরে এলেন, ভাঁড়ারি মিল করে তুলেপেড়ে রাখছে।

বাজার হবে না কেন, গোমস্তামশায়ের দু-পয়সা লভ্য আছে যে। আমি দেখতে পারছিনে, দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকার বাজার। কিন্তু ঐ অবধি, রাঁধাবাড়া হয়ে মানুষের পাত পর্যন্ত পৌঁছবে না। এত চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারিনি—বড় মজা এবারটা, দু-হাতে লুটবে।

তবু যথানিয়ম কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্দুমতী যাকে যখন পান জিজ্ঞাসাবাদ করেন। না, গোলমাল কিছু নেই।

ইন্দুমতী কিন্তু অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়েন: মিথ্যে বলছ তোমরা সকলে। আমার ভয়ে। যজ্ঞিবাড়ি টু-শব্দটি নেই, বাড়িসুদ্ধ যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। কাজ হলে শুয়ে শুয়েই আমি সব টের পেতাম।

চন্দ্রভানুকে ডাকিয়ে এনে বলেন, তোমার পায়ে পড়ি—

চন্দ্রভানু বলেন, শালগ্রাম-ঠাকুরের সে তো সকালবেলার বরাদ্দ। অবেলায় গ্রেপ্তার করে পায়ে পড়ার কি ঘটল?

পায়ে পড়ি তোমার—বসে বসে খালি পাশা খেললে হবে না। যত চোরছ্যাঁচোড় ফাঁকিবাজ—ওদের শাসনে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। কাজে না পেরে ওঠ, মুখে অন্তত খানিক হাঁকডাক করো।

করে থাকি তাই। হাড়ের পাশাও বিষম ত্যাঁদোড়। বিনা হাঁকডাকে কথা শোনানো যায় না।

এমনি সময় ধ্রুব এসে বলল, নেমন্তন্নর ফর্দ মিলিয়ে এলাম বাবা। অন্য বারে যা যায়, এরই মধ্যে তার দেড়া ছাড়া হয়ে গেছে।

আরে সর্বনাশ, কী করি এখন আমি! ইন্দুমতী আর্তনাদ করে ওঠেন: আমি যে ভাবছিলাম, চিঠির নেমন্তন্ন একেবারেই বাদ দিতে বলব। দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার হবে জানি। চোখে না দেখলাম, কানে তো শুনতে হবে। তার আগে মরণ হয় যেন আমার।

তিন

পুজোয় লোকারণ্য। ধুমধাম অন্য বারের চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভক্তদাসকে নিয়ে লালমোহন চলে এসেছেন। রায়বাড়ির অট্টালিকার সদর-অন্দর উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলেন খানিক। পুজোর সমারোহ দেখলেন।

তাজ্জব হয়ে গেছেন। বলেন, খোলামকুচির মতো টাকা ছড়াচ্ছে, খরচ করতে জানে বটে! আলাদা মন-মেজাজ এদের।

ভক্তদাস বলে, ডাকাতের গুষ্ঠি যে! টাকাপয়সা এঁদের কাছে গাঙের জোয়ার-ভাটার খেলা—আসতে যেমন যেতেও তেমনি। খরচা করেই এঁদের আনন্দ, জমানোয় নয়। এখন পেশা বদলেছে, কিন্তু পুরানো রেওয়াজ যাবে কোথা?

লালমোহন বলেন, আনি-দুয়ানি-সিকি করে করে আমাদের টাকা—এ জিনিস আমরা ভাবতেও পারিনে। বাপার-বাণিজ্যের লোকে পারে না।

নৌকো থেকে আগে নেমে পড়ে দুজনে ঘুরছিলেন। চাঙারি ঘাড়ে মাঝি রাইচরণ এতক্ষণে দেখা দিল। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে চন্দ্রভানুর সঙ্গে মুখোমুখি। চাঙারি দেখিয়ে সকৌতুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন: ওতে কি?

লালমোহন বলেন, মায়ের নামে যৎসামান্য ভোগ-নৈবেদ্য নিয়ে এসেছি।

ধ্রুবকে ডেকে চন্দ্রভানু পরিচয় দিয়ে দিলেন: মিত্তিরমশায়—উত্তর-অঞ্চল থেকে এসে দেখতে দেখতে খটির কারবার জাঁকিয়ে তুলেছেন। সোনাছড়ি বন্দরের উপর একখানা বাড়িও করেছেন ছবির মতো।

ছোটরায়ের মতো মানুষ এত সমস্ত খবর রাখেন—লালমোহন অবাক।

চন্দ্রভানু বলছেন, পুজোর ভোগ এনেছেন, পুরুতঠাকুর মশায়ের হেপাজত করে নাম-গোত্র লিখিয়ে দিয়ে এসো। যে যে নামে সংকল্প হবে। পুজো অন্তে প্রসাদ নৌকোয় তুলে দিতে ভুল না হয়—বাড়ি নিয়ে যাবেন।

লালমোহন বলেন, বাড়িতে আমার আপন কে আছে? কেউ এখনো দেশ থেকে আসে নি। বাড়ির ভিতর দিকে কাজ এখনো বাকি। মাঘ মাসে গৃহপ্রবেশ, দেশ থেকে তখন সব আসবে।

আলাপ জমানোর জন্য লালমোহন উসখুস করছিলেন। সুযোগ পেয়ে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু বলছেন কাকে? পাশা পড়েছে বৈঠকখানার ফরাসে। সাড়া পেয়ে চন্দ্রভানু ধ্রুবকে দেখিয়ে দিয়ে পাশার আড্ডায় ছুটলেন।

বিপদ এতে বেশি বই কম নয়। ধ্রুব ছেলেটির হাত কিছুতেই এড়ানো যায় না। প্রসাদ শুধুমাত্র নৌকোয় নিয়ে রেহাই হল না, আসনে বসে রীতিমতো রাজসিক প্রসাদ পেতে হল।

গুরুতর রকমের হয়েছে। বাড়ির নিচে গড়খাইয়ে নৌকো—সেই পথটুকুও হাঁটা মুশকিল। ধ্রুবও ছাড়বে না: এখন কেন নৌকোয় গিয়ে বসে থাকবেন? জো আসুক। এখনো তিন-চার ঘণ্টা দেরি। বিশ্রাম করুন ততক্ষণ।

নিরিবিলি একটা কামরায় বিছানা করে লালমোহন ও ভক্তদাসকে নিয়ে চলল।

লালমোহন মুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, এমন কাজের ছেলে হয়েছ বাবাজী, ছোটরায় মশায় তাই নিশ্চিন্ত। খেলায় গিয়ে বসলেন। আমার মেয়েটাও ঠিক এইরকম। কালেভদ্রে যখন বাড়ি যাই, ছুটোছুটি করে সে-ই আমার সমস্ত করে দেয়। কিছু করতে গেলে তাড়া দেয়। কি করব—শুয়ে-বসে সময় কাটিয়ে আসি। উঃ, কতদিন যে বাড়ি যাই নি! রক্ষে পাই সোনাছড়িতে ওরা সব এসে পড়লে।

ধ্রুব হেসে বলে, এবাড়ির কিন্তু আলাদা ব্যাপার। আমি সত্যিই কিছু করছিনে। করছেন বাবা।

লালমোহন আরও মুগ্ধ হলেন। কী বিনয়ী ছেলে, কেমন মিষ্টভাষী! কথা যেন হাসি না মাখিয়ে বলতে পারে না।

ধ্রুব বলছে, বাবা ঐ নিচের বৈঠকখানায় রয়েছেন, ক্ষণে ক্ষণে গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ভক্তদাস বলে, পাশা খেলার চিৎকার।

ঐ যথেষ্ট। বাবা রয়েছেন, লোকজনের সেটা মনে পড়ে যাচ্ছে। এ উপরে মুখে আবার কী বলতে যাবেন! মুখের হুকুম দরকার হয় না।

ধ্রুব চলে যাবার পরেও তার কথা।

ভক্তদাস বলে, পেটে অঢেল বিদ্যে, তাই অমনধারা ভালো। আমাদের এই তল্লাটে বিদ্যে জিনিসটা বড় কম। মাটির উপরে চাট্টি বীজ ছড়ালেই ধান, একটু জল দেখে জাল ফেললেই মাছ, মাঠের ঘাস খেয়ে গরুর বাঁট টনটন করে, টানলেই দুধ—কেন মানুষ তবে বিদ্যে শিখতে যাবে বলুন। সে জিনিস আরম্ভ হল রায়বাড়ি থেকে—রায়দের এই ছোট তরফে! গাঙের উপর চিরকাল অঢেল মজা লুটে তার পরেই হঠাৎ বিরাগ এসে গেল বুড়োকর্তা রুদ্রভানুর। পুরানো কাজকর্মে তোবা করে সাগরচক বন্দোবস্ত নিলেন, ছেলেকে টোলে পাঠালেন ধর্মপথে মতি যাবে বলে। তাঁর ছেলে এই ধ্রুবভানুতে এসে একেবারে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড—দু-দুটো পাশ দিয়েছে, জলপানি পেয়েছে একটায়। পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। এই বয়স অবধি পড়া ছাড়া কাজ নেই।

লালমোহন বললেন, ছেলেটা বড্ড আমার মনে ধরেছে। সেই যা বলছিলে তুমি ম্যানেজার—ব্যাপারবাণিজ্য এদের সাহায্য ছাড়া বজায় রাখা যাবে না। এসেছিও সেইজন্যে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিন্তু গরজটা কী এঁদের বলো। আমার স্বার্থে কেন এঁরা ডাকাত শাসন করতে যাবেন?

ভক্তদাস ঘাড় নেড়ে বলে, তা করবেন। সেকালে ছিলেন দলপতি, একালে চকদার—লোকের উপর মাতব্বরি এঁদের চিরকাল। সেই মাতব্বরি মেনে নিয়ে শরণ নিলেই হল। বলেই দেখুন না। রক্ত এঁদের আলাদা—এই মচ্ছবের ব্যাপারেই দেখতে পাচ্ছেন। এঁদের রীতব্যাভার অপর দশজনের সঙ্গে মেলে না।

লালমোহন তর্ক করেন: বেশ, একবার না হয় শাসন করে দিলেন—বছর কয়েক নির্ঝঞ্ঝাটে চলল। তার পরে আবার যদি অত্যাচার আসে! বার বার কোন লজ্জায় বলতে যাব? তাই মতলব আসছে একটা মাথায়—

দুটো হাতপাখা নিয়ে ধ্রুবভানু এসে পড়ল এই সময়। মাছি লাগতে পারে, গরম হতে পারে। ছেলে বটে! নজর সকল দিকে—অতিথির আপ্যায়নে তিলমাত্র ত্রুটি হতে দেবে না।

পাখা দিয়ে চলে গেলে লালমোহন হঠাৎ বললেন, ধ্রুব ছেলেটিকে জামাই করব। তুমি কি বলো ম্যানেজার? অনুরোধে একবার হয়তো এঁরা গাঙ-খাল সামাল করে দিলেন। কিন্তু আমার হল চিরদিনের কাজকারবার। রায়দের সঙ্গে বাঁধা-কুটুম্বিতে হলে একেবারে নিশ্চিন্ত।

ভক্তদাস পরমোৎসাহে ঘাড় নাড়ে: খাসা মতলব করেছেন। ছোটরায়ের বেহাই

হতে পারলে তো পাথরে পাঁচ-কিল। খটি দুনো তেদুনো করে ফেলব। কোন গাঙ-খালের মোড় বাদ থাকবে না। টাকাপয়সা খটির উঠোনে মাদুর পেতে শুকোতে দিলেও কোন বেটা চোখ তুলে দেখতে যাবে না তখন। কারবারের দুঃখের কাঁদুনি না গেয়ে তবে আপনি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করুন। আপনা থেকে সব সুরাহা হবে।

সুযোগও পাওয়া গেল। বিদায় নিয়ে লালমোহন নৌকোয় উঠবেন, গৃহকর্তা চন্দ্রভানুকে খুঁজছেন। তিনি দরদালানে এখন। প্রসন্ন মেজাজ। এত বড় ব্যাপার চুকেবুকে গেল, টু-শব্দটি হয় নি। ইন্দুমতীর অভাবে কি-হয় কি-হয়—ধুকপুকানি ছিল মনে। কিন্তু অন্যান্য বারের চেয়েও বেশি শৃঙ্খলা। চন্দ্রভানু নিজে অবশ্য পাশা খেলেছেন, গল্প-গুজব করেছেন, চণ্ডীমণ্ডপে একটা জলচৌকি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে পুজো দেখেছেন। তবে ভোরবেলা উপর থেকে সেই যে নেমেছিলেন, সিঁড়ি বেয়ে আর ওঠেন নি। নিচের তলায় সমস্তটা দিন। কাজকর্ম শেষ হল, এইবারে উপরে যাবেন।

লালমোহন গিয়ে নমস্কার করতে চন্দ্রভানু বললেন, আছেন আপনারা? কে যেন বলল, সন্ধ্যের আগে রওনা হয়ে পড়েছেন।

লালমোহন বলেন, কথা ছিল তাই। কিন্তু বাবাজীর জন্যে হয় নি। সামনে বসে এমন খাওয়া খাওয়ালো, গড়িয়ে না পড়ে উপায় ছিল না। কী সুন্দর ছেলে! পুত্রভাগ্যেও আপনি ভাগ্যবান রায়মশায়।

সুযোগ এসে গেল তো প্রস্তাবে আর দেরি কেন? লালমোহন বললেন, একটা দিনেই মনে হচ্ছে ছেলেটি কত আপন আমার। সত্যি সত্যি তাই হতে দিন, সেই দরবার আপনার কাছে।

চন্দ্রভানু সবিস্ময়ে চোখ তুলে চাইলেন: খুলে বলুন মিত্তিরমশায়।

সে দৃষ্টির সামনে লালমোহন থতমত খেয়ে যান। কণ্ঠের আওয়াজ পেয়েই মানুষজন ছুটোছুটি করে কাজকর্মে লেগে যায়, নিশ্চয় এই দৃষ্টির সামনাসামনি পড়বার ভয়ে। বিনা ভূমিকায় বলে ফেললেন, ধ্রুবকে বড্ড ভালো লেগেছে। মীনাক্ষীকে নিয়ে নিন আপনি—ঐ আমার এক মেয়ে।

ভালো তো অনেকেরই লাগে ধ্রুবকে। কলেজের অধ্যাপকরা শতমুখ ওর প্রশংসায়। সাগরচকে গিয়েছে দু-বার কি তিনবার—খোকাবাবু বলতে আবাদের লোক অজ্ঞান। সত্যি সত্যি ভালো ছেলে।

হেসে বলেন, ভালো লাগল বলেই যদি শ্বশুর হবেন, সে ক্ষেত্রে অনেক জনেরই তো মেয়ে নিতে হয়। কাকে বঞ্চিত করব বলুন। কিন্তু হবার উপায় নেই। রায়বাড়ির নিয়ম, একের বেশি দুই বিয়ে হবে না। সেকালে হত শুনেছি, এখন বন্ধ।

হো-হো করে চন্দ্রভানু হেসে উঠলেন: বাইরে কেউ যদি কিছু করে, উপায় নেই। কিন্তু ফটকের দুই ঠাকুর পাহারা দিয়ে আছেন, আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরে স্ত্রী একজনই।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলেন এবার: এ তল্লাটে আপনি নতুন। কিন্তু ভক্তদাস পুরানো লোক, তার কিছু অজানা থাকবার কথা নয়। রায়বাড়ির বউ আনতে বিস্তর বিচার-বিবেচনা লাগে। নতুন বড়লোক আপনি, মেয়ের সঙ্গে সম্ভবত ভরা সাজিয়ে যৌতুক পাঠাবেন মানুষ-জনের চমক দেবার জন্য—

লালমোহন আরও ফলাও করে দিলেন কথাটা: আজ্ঞে না, চমক দেবার উদ্দেশ্য

নয়। একমাত্র মেয়ে আমার। আইন মতে ছেলেরা ওয়ারিশান। কিন্তু ন্যায়ত ধর্মত মেয়েরও অংশ থাকা উচিত। 'সেই প্রাপ্য অংশ গয়না ও নগদ টাকা আমি বিয়ের সময় একেবারে দিয়ে দেবো।

চন্দ্রভানু অবিচল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, গয়না-টাকাই সব নয়। রায়বংশের কর্তারা শুধু অট্টালিকাই গড়েন নি, সেই সঙ্গে মস্ত বড় ইজ্জত গড়ে বিস্তর দায়দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। যাকে-তাকে এ বাড়ির বউ করে আনা চলে না, কনের বিচারটাই সকলের আগে।

ঘাড় নেড়ে সগর্বে সায় দিয়ে লালমোহন বলেন, খাঁটি কথা। সেদিক দিয়েও জোর আমার খুব। রায়বাড়ির অযোগ্য হবে না আমার মীনা। সোনাছড়ি বন্দরে সামান্য একটু বাড়ি তৈরি হচ্ছে আমার—

হেসে চন্দ্রভানু বলেন, এদেশ-সেদেশের মাঝিমাল্লা নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে আপনার সেই সামান্য বাড়ি দেখতে যায়।

লালমোহন বলেন, মাঘমাসে গৃহপ্রবেশ করে আপনাদের অঞ্চলের পাকা-বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি। পায়ের ধুলো দিতে হবে তখন একবার, নিজে এসে বলে যাব। মীনাক্ষীকে দেখবেন—নিজের মেয়ে নিয়ে মিথ্যে দেমাক করছি কিনা, সেই সময় বিবেচনা করবেন।

চন্দ্রভানু সকৌতুকে বলেন, সুরূপা বুঝি? ভালোই। সেটা কিন্তু কিছুই নয় এই রায়বাড়ির বিবেচনায়। আমার স্ত্রীর চোখই একটা নেই, শুনেছেন বোধহয়। কুমারী অবস্থায় বাঘে থাবা দিয়েছিল। তার জন্যে রায়বাড়ি বিয়ের বাধা ঘটে নি। আমার নিজের মায়ের সম্বন্ধে বলা ঠিক হবে না, কিন্তু এ বাড়ির বউ পদ্মিনী-নুরজাহান কেউ নয়। আমরা রূপ দেখি না, ঘর দেখি।

লালমোহনেরও জেদ চেপেছে। বললেন, কুলীন-ঘর আমরা, মুখ্য-কুলীন না হলেও মধ্যাংশ। ঠিকানা দিচ্ছি, দেশেঘরে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিন। সে দিক দিয়েও হারব না।

হেরেই তো রয়েছেন মশায়, লোক পাঠানোর দরকার হবে না। কিন্তু থাক এখন। আজকে আপনি নিমন্ত্রিত অতিথি। কথাবার্তা অন্য সময় হবে।

লালমোহন বলেন, আবার করে দেখা হয় না হয়—কথা যখন উঠেছে, খোলাখুলি হয়ে যাওয়া ভালো। আপনি বলুন।

নাছোড়বান্দা লালমোহন, শেষ না শুনে নড়বেন না : ঘর আমার কিসে খারাপ বলতে হবে।

চন্দ্রভানু বললেন, বহুজন নিয়ে আমাদের বিরাট সংসার। ছেলের বউ এসে একদিন সংসারের দায়িত্ব নেবে, কর্ত্রী হবে। ধ্রুবর মায়ের যা অবস্থা, সে দিনের খুব যে দেরি, মনে হয় না। তখন আর বউ নয়, গিন্নি হয়ে বসতে হবে। যারা সব এ বাড়ি থাকে, আশ্রিত প্রতিপাল্য তাদের একটিও নয়, সংসারেরই অংশ। আপনার মেয়ের মনমেজাজ এমন সংসারে খাপ খাবে বলে মনে করতে পারছিনে।

লালমোহন আহত কণ্ঠে বলেন, মেয়েকে তো জানেন না আপনি। দেশেঘরে দূরের জায়গায় রয়েছে, চোখের দেখাটাও দেখেন নি এখন অবধি।

আপনাকেই দেখতে পাচ্ছি। খুব ভাল করেই দেখছি এই ক'বছর। সমস্ত জানি! টাকা অনেক আপনার—কুচোচিংড়ি বিক্রির টাকা। দরদাম ঠিক করে তাই থেকেও আবার ঝুড়ি পিছু একপয়সা দু-পয়সা করে কাটা হয় খাতার বৃত্তি বলে। এমনি পয়সা জমিয়ে জমিয়ে তবে আপনার টাকা।

হেসে উঠে চন্দ্রভানু বলেন, ওরাও তঁ্যাদোড় তেমনি—জেলে হয়ে চিংড়ি বিক্রি করে এলো, ডাকাত হয়ে পরক্ষণে বিক্রির লোকসান যন্দুর পারে উশুল করল। কালিঝুলি মেখে খটিতে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে—তাদের বাইরের লোক ভাববেন না মিত্তিরমশায়, দরদাম নিয়ে খানিক আগেই হয়তো কাঁদাকাটা করে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, কুচোচিংড়ি নিয়ে বেশ তো চলে আসছে, হাঙর ধরার ঝোঁক কি জন্যে?

অপমানে মুখ রাঙা লালমোহনের। সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। তা হলেও ঝানু ব্যবসাদার—রাগের মধ্যে হিসাবজ্ঞান হারান না। কর্মসিদ্ধি না-ও যদি হয়, চটিয়ে উল্টো-উৎপত্তি ঘটাতে আসেন নি।

সামলে নিতে কিছু সময় গেল। হাসিমুখে তারপর বলেন, তা সত্যি, এক পয়সার মানুষই আমি। কিন্তু আমার নিজের ব্যাপার কিছু নয়, আরজি মেয়ের বিয়ে নিয়ে—

তাই তো বললাম, ঘর দেখে আমরা মেয়ে আনি। মেয়ের গাঁইগোত্র দেখতে যাইনে, কন্যাপক্ষের মন-মেজাজ দেখি। খেয়ানৌকোর ইজারা নিয়ে প্রথম আপনি পয়সা করেন—দেশেঘরে ছিলেন যখন। আধপয়সা একপয়সা করে খেয়ার মাশুল আদায় হয়, সেই পয়সা। সেটা গর্ব আপনার, গলা ফাটিয়ে জাহির করেন। আমাদের সৃষ্টিছাড়া সংসারের উল্টো ব্যাপার—এলোপাথাড়ি খরচা এখানে। খরচ করতেও ক্ষমতা লাগে—আপনার হিসাবি ঘরের মেয়ে এসে এইসব দেখেশুনে তো পাগল হয়ে যাবে।

দরদালানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। সারা দিনের অবসন্ন চন্দ্রভানু এবারে উপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। অর্থাৎ কথাবার্তা আর চালাতে চান না বিশ্রাম এইবারে।

নৌকোয় এসে লালমোহন বোমার মতো ফেটে পড়লেন: কথা শুনলে ভক্তদাস? খাতার বৃত্তি আদায় হয়, সেটুকু অবধি জেনেছে। কিন্তু আমি যদি হই একপয়সা-আধপয়সার চোর, ওরা যে শ-হাজারের নৌকো-মারা ডাকাত। ডাকাতিতে তোবা করে আজকে চকদার হয়েছেন। দু-দিনের ভন্দোর হয়ে ভাতকে বলেন অন্ন।

ভক্তদাস বলে, এত শোনার পরেও হেসে হেসে কথা বলে এলেন বড়বাবু। ঐটে বড় বুদ্ধির কাজ হয়েছে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া চলে না। বেলডাঙার রায়েরা সত্যি সত্যি একদিন কুমির ছিল। গাঙে গাঙে ভেসে-বেড়ানো কুমির। কুমির কি—কুমির দেখে তো ডাঙায় উঠে পালানো যায়। কুমির-বাঘ দুটো একাধারে—জলে ডাঙায় কোনখানে রক্ষে নেই। ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে এখন নরম হয়েছে—তবু কিন্তু রাগলে বিশ্বাস নেই, পুরানো রক্ত টগবগিয়ে উঠবে।

গুম হয়ে শুনছিলেন লালমোহন। নিশ্বাস ফেলে বললেন, দেমাক ছিল ভক্তদাস, কোন কাজে আমি হারিনে।

হেরে গেছেন, তাই বা এর মধ্যে বুঝলেন কিসে? লক্ষ কথার কমে বিয়ে হয় না, সেই লাখ আগে পুরিয়ে ফেলুন। তার আগে হার-জিতের ব্যাপার নেই। মন খারাপ করে যদি চুপ হয়ে যান, লাখ কেমন করে পুরবে?

দম নিয়ে ভক্তদাস আবার বলে, আপনি জানেন না বড়বাবু, সারা বিকাল আমি ওদিকে আলাদা ভাবে বকবক করে লাখের অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে এসেছি। খাস-চাকরানি ক্ষীরোদা আমাদের গাঁয়ের। তাকে শুনিয়ে এলাম, কাজকর্মে মেয়ে খুব দড়, খাটনির দিক দিয়ে শাশুড়ির কান কাটবে নতুন-বউ। কথাটা চলে যাক গিন্নির কানে। আর নকড়ি-গোমস্তার কাছে কন্যাপণের একটা ভারী রকম আন্দাজ দিয়ে এলাম—

পৌঁছে যাক ছোটরায় অবধি। খটির কারবারের জন্য সম্বন্ধটার বড্ড গরজ, তার উপর বাবাজীকে আপনার এত পছন্দ—এ বর নিলাম ডেকে কিনব বড়বাবু। কথাবার্তা আর কোনখানে এগোলে নকড়ি আমায় খবর পাঠাবে বলেছে।

চার

দশমীতে মণ্ডপের প্রতিমা নিয়ে নিরঞ্জনের জন্য বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে পড়ে থেকে থেকে ইন্দুমতীর কান আরও তীক্ষ্ম হয়েছে। কানে এলো গোবিন্দসুন্দরীর গলা। মৃদু কণ্ঠে কার সঙ্গে যেন বলছেন, ছোটবউ উঠতে পারে না, কাজ কিছু আটকে থাকল তাতে? কলের মতো সব হয়ে গেল, টু-শব্দটি নেই। ও'র কেবল তো চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাটি, মাতবর্বরি দেখানো—লোকে তাতে দিশা করতে পারে না। কাজে ভুলচুক হয়ে যায়। দেখ, অন্য বারের চেয়ে ভালো ভাবে হল কিনা!

আগেকার দিন হলে গোবিন্দসুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ত। কিন্তু কথাগুলো এমন নিদারুণ সত্য, ধমক দিতে আজ লজ্জা করছে।

উৎসবের পর স্তব্ধতা। সন্ধ্যার পর থেকেই সদরবাড়ি অন্দরবাড়ি শ্মশানের মতো থমথম করছে। জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ইন্দুমতীর বিছানায়।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল—অতিশয় মৃদু। মানুষ দেখতে হয় না, শব্দে বোঝা যায়। ইন্দুমতী তবু প্রশ্ন করেন, কে?

কাতর হয়ে বলছেন, ঘরের মধ্যে এসো একবার তুমি। আমার কাছে। উঠতে পারছিনে বলে কি প্রণামটাও নেবে না?

ঘরে ঢুকে চন্দ্রভানু স্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন। বলেন, প্রণাম নিলাম না কেমন করে? সকালেও তো এক দফা হয়ে গেছে। যতদিন চকে পড়ে থাকি, পায়ের ছাপ দেয়ালে টাঙানো থাকে—আমার হয়ে পদতল প্রণাম নিয়ে নেয়।

সে আমার নিত্যিদিনের বরাদ্দ। বিজয়ার দিনে এখনকার এ প্রণাম আলাদা। ওঠো তুমি, খাটের উপর উঠে দাঁড়াও। আমার এই মাথার কাছে।

হাত বাড়িয়ে ইন্দুমতী জায়গাটা দেখাতে গেলেন। কী রকম যেন ঝিনঝিন করে উঠল হঠাৎ, হাত ওঠে না। মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন, তা-ও হল না।

হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়লেন: আমি যে পাথর হয়ে জমে গেলাম অহল্যার মতো। অহল্যার পাপ ছিল, আমার তো কোন পাপ নেই। তুমি জানো, অন্তর্যামী ভগবান জানেন। তবে কেন এতবড় শাস্তি?

অধীর হয়ে ভেঙে পড়লেন ইন্দুমতী। ক্ষণপরে সামলে নিয়ে বলেন, আরও এগিয়ে এসো তুমি। ঠিক আমার শিয়রে। দেখ, আজকে তবু কেঁদে বলতে পারছি—ক'দিন পরে কথাই হয়তো বন্ধ হবে। তখন কিছু বলতে যাবো না। শিয়রে দাঁড়িয়ে পা তুলে দাও আমার কপালের উপর। হাত বাড়াতে পারছিনে বলে পদধূলি পাবো না আজকের দিনটায়?

সত্যি সত্যি তাই করতে হল চন্দ্রভানুকে। স্ত্রীর কপালের উপর এক পা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সেই পা ইন্দুমতী সরিয়ে নিতে দেবেন না: থাকুক, আর একটুখানি রাখো।

কী যেন মধুর তৃপ্তি উপভোগ করছেন। সেই তৃপ্তি যত বেশি সময় বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

তারপর এক সময় চন্দ্রভানু পাশে বসে পড়লেন। আঁচলের প্রান্তে তাঁর চোখ

মুছিয়ে দিলেন।

ইন্দুমতী গাঢ়স্বরে বলেন, সত্যি, কী মন্তোর জানো তুমি বলো।

কেন?

এতবড় কাজের মধ্যে এই পাঁচ-সাতটা দিনে একটিবার তোমার গলা পেলাম না। অথচ একটুকু গন্ডগোল নেই, আপনাআপনি সমস্ত মিটে গেল। একেবারে কলের মতো।

চন্দ্রভানু বলেন, যারা বরাবর করে থাকে তারাই সব করল। তুমি উঠতে না পারলেও তোমার নিয়মে কাজ হয়েছে। বাহাদুরি যদি কিছু থাকে, সে তোমার।

ইন্দুমতী বলেন, নিশ্চয় তুমি মন্তোর জানো। নইলে হতে পারে না। আগে জানলে মন্তোরটা শিখে নিতাম। তা হলে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি করে বাড়িসুদ্ধ বিষনজরে পড়তাম না। এখন আর উপায় নেই। কোন দিন আর উঠতে পারব না, মন্তোর শিখে নিয়ে খাটাব কোথা?

চন্দ্রভানু সান্ত্বনা দেন: কেন উঠবে না, কী হয়েছে তোমার? কবিরাজমশায় তো বলছেন—

এক মাসে সেরে যাবো। মাসের উপর একটা দিনও বেশি নয়। মাস পাঁচ-ছয় ধরে এই এক মাসের কথা বলেন, তার আগে বলতেন এক হপ্তা। আর মনে মনে যা বলেন—আগে বুঝতাম না, এখন সেটা ধরে ফেলেছি। কিন্তু যা বলছি—আর আমি তোমায় কাছ-ছাড়া হতে দেবো না। কখনো না, এক দিনের তরেও না। তোমার ঐ মন্তোর নিয়ে আমার পাশে থাকবে। রায়বাড়ির সাজানো সংসার নইলে ছারখার হয়ে যাবে।

আর আমার সেই সাজানো চক পড়ে আছে দরিয়ার ধারে—তার কি হবে ছোটবউ?

উৎসবের হট্টগোলে চন্দ্রভানু এই ক'দিন সাগরচকের কথা একেবারে ভুলে ছিলেন। হঠাৎ যেন সমুদ্রের কলরোল কানে বেজে ওঠে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে চতুর্দিক থেকে। জয়াল নিয়ে বড় বড় মাটির চাঁই জলে খসে পড়ছে। সৈকতবর্তী নিঃসঙ্গ নিঃসহায় চর এই রাত্রিবেলা আর্তনাদ করছে বুঝি চন্দ্রভানুর উদ্দেশে। ভয়ে কাঁপছে।

শয্যায় শুয়ে চন্দ্রভানু ছটফট করেন। এক ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে। মাটি-কাটা শত শত মজুর—ঝুড়ি, কোদাল। সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে লড়াই—ঢুকতে দেবো না জল, এক ফোঁটাও নয়—

হায়, কোথায়!

পঙ্গু ইন্দুমতী ঠিক পাশটিতে শুয়ে। মরীয়া তিনি—স্বামীকে ছেড়ে দেবেন না। তাঁরও বড় ভয়। একদিন ইন্দুমতীর নাম রটেছিল সিংহিনী-বউ। বিয়ের সময় তেরো বছরের মেয়ে ইন্দু। একটা চোখ নেই বলে পাত্র জোটাতে কিছু দেরি হয়েছিল, নইলে আরও আগে বউ হবার কথা। সিংহিনীর তুলনাটা প্রথম সেই সময়কার। নতুন বউয়ের মেজাজ অসম্ভব রকমের চড়া, ছুঁয়ে কথা বলবার জো নেই—মাথা ঝাঁকিয়ে ফুঁসে উঠবে। কথায় কথায় মাথা ঝাঁকানো ইন্দুমতীর অভ্যাস ছিল সেই বয়সে। মুখখানা ঘিরে থোপা থোপা চুল—ঝাঁকুনিতে চুল দুলে উঠত, সিংহের কেশরের কথা মনে এসে যেত তখন। সতের বছরের কিশোর চন্দ্রভানু নতুন-বউয়ের চালচলন দেখে ইয়ারবন্ধু কারো কাছে বলেছিলেন, বউ কে বলবে? ঘোমটা দিয়ে সিংহ এসেছে রায়বাড়ি। কথাটা সেই চাউর হয়ে গেল।

সেবারে যখন গোবিন্দসুন্দরীর তোরঙ্গের মধ্যে রুপোর বাটি আবিষ্কার করে ইন্দুমতী যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করলেন—চন্দ্রভানু তখন বাড়িতে। তাঁরই চোখের উপর সমস্ত ঘটল। যত দূরসম্পর্কের হোক, পিসিমা তো বটে। তবু চন্দ্রভানু মুখ দিয়ে রা কাড়লেন না। বাইরে এমন দুর্দান্ত পুরুষ, তা সত্ত্বেও স্ত্রীর মুখের উপর কিছু বলতে সাহস হয় না।

এই নিয়ে গোবিন্দসুন্দরী কি বলেছিলেন বুঝি কোথায়, চন্দ্রভানুর কানে পৌঁছে গেছে। গোবিন্দসুন্দরীকে ডাকলেন: শোন পিসিমা. বলে বেড়াচ্ছ আমি নাকি স্ত্রৈণ?

ওমা, এত বড় মিথ্যে কে লাগিয়েছে? গোবিন্দসুন্দরী আকাশ থেকে পড়লেন: সে লোকের যেন কুড়িকুষ্ঠ হয়। মুখে যেন তার পোকা পড়ে।

সহাস্যে চন্দ্রভানু বলেন, কি বলেছ তবে? তোমার নিজের মুখেই শুনি।

ভাগ্যবতী ছোটবউ, সেই কথা আমি বলে বেড়াই। সেকালের বউরা কেঁদে কেঁদে জনম কাটাত। গলায় দড়ি দিয়েছে, বিষ খেয়েছে। এখন নিয়ম উলটেছে। আহা, শতেক পরমায়ু হোক আমাদের ছোটবউর, সুখে-স্বচ্ছন্দে সকলকে নিয়ে সংসারধর্ম করুক।

সরে পড়ছিলেন এমনি সব বলে।

চন্দ্রভানু বললেন, সেকালের বউরা ছিল পল্লবিনী লতা। নাড়া দিলে নীহারবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ত। সিংহিনী এসেছে এই ছোটবউয়ের রূপ ধরে। এখানে মাথা গলাতে যাবো, এত বড় তাগত নেই আমার। সে তোমরা যাই বলো।

ঠিক তাই। সিংহিনীর দাপট নিয়ে ইন্দুমতী এতকাল সংসার করে এসেছেন। আজকে এই দশা। ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল। স্বামীকে ডাকিয়ে এনে পাশে বসান: যেতে পারবে না কোনখানে। কোনদিনও না। আমার শাশুড়ির এই সংসার। মরবার আগে চাবির গোছা আমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেলেন। স্বর্গ থেকে দেখছেন, আমি অবহেলা করি নি। জীবনে সংসার বই আর কিছু জানিনে। আর তুমি ছটফট করছ এই সংসার উচ্ছন্নে দিয়ে পালানোর জন্য।

চোখের মণি বিঘূর্ণিত করে গর্জন করে ওঠেন সহসা: জিজ্ঞাসা করি, সংসারের কোন দায়িত্ব তোমার নেই? এ জিনিস শুধু কি একলা আমার?

জবাবের কথা পেয়ে গেছেন চন্দ্রভানু: সংসারের গরজেই তো চকে পড়ে থাকা। আমার বাবাও মরণ পর্যন্ত সেখানে থেকে গেছেন। সংসারের হাল ধরে আমার মা যেমন ছিলেন, তাঁর অন্তে তুমি ঠিক তেমনি। তোমরা ঘরে আছ, আর পুরুষ আমরা তেপান্তরে থাকি। ঘরে বাইরে দু-দিক সামলানো যাচ্ছে, সংসার তাই কলের মতো চলে। চকে যদি না যাই, ভরা সাজিয়ে কে তোমার ভাণ্ডার ভরে দেবে ছোটবউ?

বলছেন, রাত থাকতে উঠে ভাঁড়ারের চাবি খুলে তোমার কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়, চলে রাতদুপুর অবধি। সেখানে সাগরচকেও এমনি—কাজের অন্ত নেই আমার। বাঁধের পর বাঁধ দিয়ে নোনা জল ঠেকানো, খরার সময় জমির উপর হিসাব মতন সার সাজিয়ে যাওয়া, কাঁকর বেছে ফেলে চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করে রাখা—নতুন বর্ষা পেলে মাখনের মতো যাতে গলে যায়। ক'টা আর বলি ছোটবউ? বিস্তর তোয়াজ করতে হয়, তবে খুশি হয়ে সাগরচক তোমার সংসারের রসদ জোগায়। তোয়াজ শুধু মাটির নয়—মানুষেরও। যারা সব সেই মাটি নিয়ে পড়ে আছে, তাদের।

এই চলল। অষ্টপ্রহর কথা-কাটাকাটি। কলহ রীতিমতো। অবশেষে হাউহাউ করে কান্না। ইন্দুমতী যেতে দেবেন না চন্দ্রভানুকে। সর্বক্ষণ আঁকড়ে রয়েছেন।

না দেখতে পেলে অধীর হয়ে ওঠেন।

পাঁচ

চিঠি এলো বৃন্দাবনের কাছ থেকে। চন্দ্রভানু যখন চকে না থাকেন, বৃন্দাবনই সর্বময়। হাতের লেখাটা নীহারনলিনীর—নীহারকে দিয়ে লিখিয়েছে। পোস্টাপিস যেতে একটা পুরো ভাঁটির পরেও অর্ধেক ভাঁটি লাগে, পুরোপুরি দিন লেগে যায়। এত হাঙ্গামা করে চিঠি পাঠিয়েছে, না জানি কোন খবর।

খবর ভয়ানক।

পাঁচ পাঁচটা জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে। ক্ষেতের পাকাধান নোনা জলে বিস্তর পচে গেছে। অঘ্রানমাসে এখনই এই—চৈত্র-বৈশাখে সাঁড়াসাড়ির বান আসবে, তখনকার অবস্থা কি দাঁড়াবে? গাঙ যেন খেলাচ্ছে—বেলদার যে দিকটা সেখানে কিছু নয়, ভিন্ন একখানে পথ করে নিয়ে উদ্দাম বেগে জল ঢুকে পড়ে। খবর পেয়ে হৈ-হৈ করে সব এসে পড়ল—বাঁধ তার আগেই নিশ্চিহ্ন। জলরাশি খলখল করে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। গাঙ বুঝি টের পেয়ে গেছে, আসল মানুষ ছোটরায় হাজির নেই এখন—যা খুশি তাই করা যেতে পারে।

এমনি সব কথা চিঠিতে, নীহারনলিনীর বাঁধুনি। সত্যি তাই। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, জলের চলাচল সম্পর্কে তেমনি বলা যায় চন্দ্রভানু সম্পর্কে। বাইরের উজ্জ্বল প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ নদী। দেখে কে বুঝবে, শয়তানি মতলব তলে তলে—রূপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখে জলতলে নিঃসাড়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যাচ্ছে। বৃন্দাবন সর্বদা চন্দ্রভানুর সঙ্গে ঘোরে, তবু সে বোঝে না। এক তৃতীয়-নেত্র আছে বুঝি চন্দ্রভানুর, জলের কারসাজি ধরে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করেন।

নকড়ি-গোমস্তাকে ডেকে চন্দ্রভানু চুপিচুপি বললেন, বোটের ছাতটা ঠিক নেই, তাড়াতাড়ি মেরামত করিয়ে দাও। দু-একদিনের মধ্যে।

যাবেন?

চিঠি তো দেখলে। কথাটা চাউর কোরো না তুমি। তোমার বউঠাকরুন টের না পায়।

নকড়ি বলে, বউঠাকরুন নন, আমি ভাবছি অন্য কথা। ভয় আমার বাঁধা-কুটুম্বদের নিয়ে—সদরবাড়ি অন্দরবাড়ি যারা জুড়ে রয়েছে। আপনি চলে গেলে ওরা সব লাঠালাঠি বাধাবে নিজেদের মধ্যে। বুড়োমানুষ আমি সে ঝঞ্ঝাট সামলাতে পারব না—যে মানুষ বরাবর সামলে এসেছেন তাঁর আজ উত্থানশক্তি নেই।

চন্দ্রভানু হাসলেন একটুখানি।

নকড়ি আজকের মানুষ নয়, বুড়োকর্তা রুদ্রভানুর আমলের। নিজের কেউ নেই, রায়েরাই সব। হাসির অর্থ বুঝতে তার বাকি থাকে না—প্রস্তাবনা একেবারে কানে শোনারই যোগ্য নয়।

তবু নকড়ি, বলে, অবস্থাবিশেষ ব্যবস্থা, এদ্দিন তো এসব কথা ওঠে নি। রায়বাড়ি থেকে সরিয়ে ওদের বরঞ্চ নগদ বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিন।

জিভ কেটে চন্দ্রভানু বলেন, অমন কথা মুখেও এনো না নকড়ি। মনে করে নাও, ও'রা উত্তমর্ণ। এক সময় ধেরে খেয়েছিলাম, এখন তার শোধ হচ্ছে। দয়ার দান নয়, উচিত প্রাপ্য নিয়ে নিচ্ছেন ও'রা। এই ভাবটা মনে এনো, ঝঞ্ঝাট পোহাতে বিরক্তি লাগবে না। আমার মা তাই ভাবতেন, ছোটবউ বরাবর তেমনি ভেবে এসেছে।

একটুখানি থেমে জোর দিয়ে আবার বলেন, সত্যি সত্যি তাই। পুরুষানুক্রমে যা করে এসেছি, সেই বৃত্তি বদল করে আমার বাবা চক বন্দোবস্ত নিলেন। চকদার হলেন, বাবুলোক হলেন, ছেলেদের পড়াশুনোয় দিলেন। কিন্তু তার আগে দরিয়ার জলে চরে বেড়ানোর দিনে যাঁরা সব জীবনপণ ধরে সহচর হয়ে ঘুরতেন, তাঁদের সত্যি সত্যি দরিয়ায় ডোবানো যায় না। এতবড় বাড়ি এত ঠাটবাট সমস্ত সৌভাগ্যের মূলে তাঁরাই। নিজের দুই ছেলে, সেই সঙ্গে তাঁরা আর তাঁদের বউ-ছেলে নিয়ে মা আমার রায়বাড়িতে সংসার সাজালেন। তুমি যে জানো না কিছু, তা নয়—জেনেশুনে কেন অবুঝ হও নকড়ি?

নকড়ি বেকুব হয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে বলে, রয়েছেন ওঁরা সব—সেজন্যে বলছিনে। মানুষে দু-মুঠো খাবে মাথা গুঁজে থাকবে, কোন পাষণ্ড তাতে বাদি হতে যাবে? কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে ধুন্দুমার বেধে যায়, সেই ভয় করি। খেয়ে তো কাজ চাই একটা, নইলে পেটের ভাত হজম হয় কি করে?

ঠিক ধরেছ। চন্দ্রভানু লুফে নিলেন কথাটা: বিনি-কাজে রাখাটাই ভুল হচ্ছে, গোলমালের মূল সেখানে। কাজ দিতে হবে। জমা-খরচলিখতে বলব না, কিম্বা নৌকোয় দাঁড় বাইতেও বলব না। তা হলে অপমান বোধ করবেন—খাওয়ার দাম নেওয়া হচ্ছে, এই রকমটা গিয়ে দাঁড়াবে। ভিন্ন রকমের কাজ—

নকড়ি-গোমস্তা তটস্থ হয়ে কাজের নির্দেশ শোনবার অপেক্ষায় আছে।

গান-বাজনার ব্যবস্থা করে দাও। শখের যাত্রা-দল গড়ে বৈঠকখানায় মহলা দিন ওঁরা সব। তাস-দাবা-পাশার দরাজ ব্যবস্থা হোক। বড়-দীঘিতে আর গাঙে-খালে ছিপ হাতে নিয়ে বসুন। উপস্থিত এই সব মনে আসছে। তুমিও ভাবো না গোমস্তা-মশায়, ভেবে ভেবে এমনি অনেক বেরুবে। মেয়েদের কি হবে, সেটা ছোটবউয়ের সঙ্গে পরামর্শ কোরো। মেয়েদের কথা পুরুষ আমাদের বলা ঠিক হবে না।

ব্যবস্থা যত গোপনেই হোক, ইন্দুমতীর জানতে বাকি থাকে না। কত চর কত দিকে—ঠিক ঠিক খবর পেঁছে দিয়ে যায়। চন্দ্রভানুকে এর পর তিনি একেবারে চোখের আড়াল হতে দেবেন না। একটু বাইরে গেলেই ডাক-পাড়াপাড়ি। পালঙ্কের প্রান্ত দেখিয়ে বলেন, বোসো—বসে থাক এখানে—

চন্দ্রভানু ছটফট করেন। তারপর একদিন একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি।

কাতর হয়ে ইন্দুমতী বললেন, বোটের ছাত মেরামতের ধুম পড়ল—পালাবে আমায় ফেলে? যা-কিছু এতদিন সংসারের নাম করে বলেছি—নিজের কথাই বলি আজ। সাগরচকে তুমি বারোমাস পড়ে থাক—যখন এসো, কুটুম্বর মতো ক'টা দিন থেকে চলে যাও। কোন দিন বলতে গিয়েছি কিছু? রায়বাড়ির বউদের থাকে স্বামী-সুখ নয়, সংসারের খাটনির সুখ। সেই সুখটাই আমার চলে গেল, কী নিয়ে থাকি এবার বলো।

জল ভরে আসে ইন্দুমতীর চোখে। এক বিছানায় পড়ে থেকে থেকে সিংহিনী-বউর কী হয়েছে—কথায় কথায় চোখে জল। বলেন, সাধের সংসার পিছলে বেরিয়ে গেছে আমার হাত থেকে। তুমি আছ, সেই সুবাদে খানিকটা তবু ঠাট আছে—তুমি চলে গেলে একটা মানুষও আমার ঘরে আর পা দেবে না। একটা কথা বলি আজ তোমায়। নিজের জন্য কোনদিন কিছু চাই নি—সারা জীবনের মধ্যে আজকে আমার প্রার্থনা—

চন্দ্রভানু অভিভূত হয়ে শুনছিলেন। বললেন, বলো—

চলে যাবার আগে তোমার বন্দুকের গুলিতে আমায় শেষ করে যেও। বেঁচে থেকে চোখ মেলে নিজের হেনস্থা দেখতে পারব না।

রায়বাড়ির চিরকেলে দুর্ধর্ষ সিংহিনী ভেঙে পড়লেন একেবারে।

আর এদিকে চিঠির পর চিঠির বন্যা বয়ে চলেছে। বৃন্দাবনের সেই যে চিঠি এসেছিল। সাগরচকে থেকেও ডাকের চিঠির আনাগোনা চলে, হেন সম্ভাবনা আগে কখনো কারো মনে ওঠে নি। কারণও ঘটে নি। ভুল করেছেন চন্দ্রভানু বৃন্দবনের চিঠির জবাব পাঠিয়ে। চিঠি দিয়েও কথাবার্তা চালানো যায়, তারা এবার বুঝতে শিখেছে। অতএব একের পর এক চিঠি।

খেয়ার ইজারাদার লিখেছে: সাগরচকের বাসিন্দাদের দেখাদেখি সবাই এখন মাংনা পারাপার হতে চায়। হুজুর তো চৈত্রমাসে হিসাব করে বছর-খোরাকি ধান দিয়ে দেন খেয়ামাঝিকে। তারা কি দেবে? পারাণি চাইলে মারতে আসে।

আমিনের চিঠি: চকের মাঝ বরাবর নতুন রাস্তা হবে—চেন নিয়ে সেই জমির মাপজোপ করতে গেলাম। চেন কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাস্তার বাবদে এক ছটাক জমি কেউ ছাড়বে না।

মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার লিখেছেন: ইস্কুল চলছে বটে, কিন্তু ছাত্র নাই। যতদিন না ফিরছেন, ছাত্র-লাভের কোনরকম সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সমস্ত চিঠির একই হস্তাক্ষর। ছোটরায়ের কাছে চিঠি কি ভাবে যাওয়া উচিত—বোধকরি কেউ নিজের উপর ভরসা করতে পারে না, নীহারকে দিয়ে লেখায়।

সর্বশেষ ডাক্তার দীন নন্দনের চিঠি। বুড়োমানুষ দীন-ডাক্তারের হাত কাঁপে, তাঁর চিঠি নীহারনলিনীকে লিখতেই হবে। লিখেছেন: আলমারির কবজায় মরচে ধরে গেল, অষুধ নিতে একটি রোগি আসে না, আলমারি খোলার আবশ্যক হয় না। ছোট-রায় না ফিরলে আসবেও না কোন রোগি। মরচে ধরেছে বোধহয় আমার হাঁটুতেও, চার মাসের মধ্যে বাসাবাড়ির উঠোন পার হয়ে বেরুনোর আবশ্যক ঘটে নি—

কেবল নীহারনলিনীর নিজের নামে কোন চিঠি নেই।

বাপ রুদ্রভানু গত হবার পর থেকে বছরের মধ্যে এগারো মাস চন্দ্রভানুর সাগরচকে কেটে যায়। বিষয়কর্মের দায়ে পড়ে থাকা—গোড়ায় শুধুমাত্র তাই ছিল। তারপরে ভালবেসে ফেলেছেন। ভালবাসেন সাগরচক জায়গাটাকে, এবং জায়গার বাসিন্দা মানুষগুলোকে। দুর্ধর্ষ ছিল তারা সবাই এক কালে—এই বেলডাঙার বাড়ি যারা উঠেছিল, তাদেরই দোসর। বেলডাঙার রায়বাড়ি উঠল বুড়োহাবড়া অশক্তদের যারা—মোটামুটি ভদ্রশ্রেণীর। সমর্থ জোয়ান-যুবারা সাগরচকে ঘরবাড়ি বানিয়ে জমাজমি নিয়ে চাষবাসে লেগে গেল। গাঙে-খালে এদের সকলের বাপ-পিতামহ একদা নৌকো মেরে বেড়াত। পেশাই তাই। এমন হয়ে উঠল, মহাজনের নৌকা ভুলেও তল্লাটের ছায়া মাড়ায় না। মালপত্র যেখানে এক হপ্তায় যাওয়ার কথা, এ-গাঙ সে-গাঙ ঘুরে ঘুরে এক মাসে দু-মাসে পৌঁছয়।

সরকার তখন উঠে-পড়ে লাগল জোলো-ডাকাত দমনের জন্য। জল-জঙ্গলের মধ্যে দু-পক্ষে কতকটা যেন গেরিলা-লড়াই। তাদের হাতে দেশি-কামারের গড়া গাদা-বন্দুক কামারশালে বানানো ছবরা। সরকারের টোটার বন্দুক। হলে হবে কি—জঙ্গলের মধ্যে নদী-খাল জাল বুনে আছে, সকল অন্ধিসন্ধি নখদর্পণে জোলো-ডাকাতের।

আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকো ঘায়েল করে তারা কোন একখানে লুকিয়ে পড়ে। জল-পুলিশ তার পরে সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসে চতুর্দিক তোলপাড় করেও খোঁজখবর পায় না।

অঞ্চলের ব্যাপার-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম—তারও বড়, সরকারের মান ইজ্জতে ঘা পড়েছে। মরীয়া হয়ে লাগল পুলিশ। বাঁকে বাঁকে পুলিশের ঘাঁটি। স্টিমলঞ্চ আর সাদাবোট নিয়ে অহোরাত্র পুলিশের লোক চক্কোর দিয়ে ফিরছে। উৎপাত বন্ধ এক রকম। তা হলেও একটা অঞ্চল নিয়ে পুলিশ চিরকাল কিছু এভাবে পড়ে থাকতে পারে না—নৌকো-মারারা ওত পেতে আছে, সরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই আগের অবস্থা। সরকারি তরফের লোকে সেটা ভাল মতো জানে। পরশ্ব যথেষ্ট হয়েছে।

এমনি সময় জেলার সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে চন্দ্রভানুর বাপ রুদ্রভানু গিয়ে দেখা করলেন। রুদ্রভানু লেখাপড়া তেমন না জানলেও কদর বুঝতেন লেখাপড়ার, চেষ্টা-চরিত্র করে পঞ্চাশ-ষাটটা ইংরেজি কথা মুখস্থ করে নিয়েছিলেন—কথার পৃষ্ঠে কথা জুড়ে সাহেবসুবোর কাছে যা-হোক করে মনোভাব বোঝাতে পারতেন। রায়েদের নাম সাহেবের কানে গিয়েছিল, খাতির করে তিনি রুদ্রভানুকে বসালেন।

রুদ্রভানু বললেন, ডাকাত-দমনে আমি তোমাদের সাহায্য করব সাহেব। সেইজন্যে এসেছি। উপযাচক হয়ে এলাম তোমার কাছে।

সাহেবের বিস্ময়ের অবধি নেই। নৌকো-মারাদের নেতা এরাই। রুদ্রভানুর বাপ ইন্দ্রভানু নৌকোয় নিজে উপস্থিত থেকে দল চালনা করেছেন, এমনি ঘটনাও শোনা আছে। এখন অবশ্য নিজেরা যান না, তা হলেও শোনা যায় ওস্তাদ-ভাগ একটা থাকে তাঁদের নামে। কাজ সমাধা করে বেলডাঙার বাড়ি ভাগ পেঁছে দিয়ে আসে। তাদেরই ছোটকর্তা সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে সাহেবের কাছে নিজে উপস্থিত—

বলছেন, নৌকো-মারা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সাহায্য করব। কিন্তু ভিন্ন পথে। টোটার বন্দুকে ধরুন দশ-বিশজন ঘায়েল করলেন—তার দুনো-তেদুনো এসে পড়বে। এভাবে কোনদিন শেষ হবে না। একেবারে গোড়া ধরে টান দিন।

সেই গোড়ার কথা ফলাও করে বলছেন রুদ্রভানু : মানুষ আসলে কেউ খারাপ নয় সাহেব। অসৎবৃত্তি কেউ শখ করে নেয় না। ভরণপোষণের দায়ে নিতে হয়, তার জন্য মরমে মরে থাকে। সকলে ভোগ-সুখে বহালতবিয়তে আছে—তার মধ্য কতকগুলো মানুষ নিরন্ন, শক্তি-সামর্থ্য আছে কিন্তু খাটবার জায়গা পায় না। ধর্মকথা শুনিয়ে কি শাসনের ভয় দেখিয়ে তাদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। বন্দুক না তুলে জমিজিরেত দাও তাদের সাহেব, গৃহস্থ বানাও। জমির উপর খাটাখাটনি করুক। বোম্বেটে মানুষ তখন দেখবে মাটির মায়ায় পড়ে গেছে। ঘর-বাড়ি পরিবার-পরিজন ছেড়ে নড়তে চাইবে না সে মানুষ।

এই সমস্ত বোঝালেন তিনি সাহেবকে! প্রস্তাবও আছে। লাট বন্দোবস্ত দিতে হবে নামমাত্র মূল্যে, সুবিধাজনক শর্তে। সেই লাটও রুদ্রভানু দেখেশুনে পছন্দ করে এসেছেন। এখন বাদার জঙ্গল, অসংখ্য খাল-দোখালা, গাছের নিচে ছায়াচ্ছন্ন ভূমিতে নোনাজলের তরফা খেলে বেড়ায় দিবারাত্রি। বাঘ সাপ আর বুনোশুয়োরের আস্তানা। জঙ্গল কেটে বাঁধবন্দি করে সোনা ফলাবেন তাঁরা সেখানে—তিনি, এবং নৌকো-মারা যত দুর্জন আছে সকলে মিলে। দলের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও অশক্ত, নোনা নদীর সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি নেই, তারা যাবে চলে বেলডাঙার রায়বাড়ি, সেইখানে থেকে তাদের অংশ নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ করবে।

প্রস্তাব পেয়ে সাহেব লাফিয়ে উঠলেন। এক কথায় রাজি। দলবল নিয়ে রুদ্রভানু উঠে-পড়ে লাগলেন। বেলডাঙার সঙ্গে সম্পর্ক বড় আর নেই। চকেই পড়ে আছেন বারো মাস তিরিশ দিন। সাগরের অনতিদূরে বড় দুই নদীর উপরে বিশাল চর—লোকের মুখে মুখে সাগরচক নাম দাঁড়িয়ে গেল। রুদ্রভানু যা বলেছিলেন ঠিক তাই—চারিদিক প্রায় শান্ত কয়েকটা বছরের মধ্যে। মহাজনি নৌকোর চলাচল শুরু হল আবার। তবে বহর সাজিয়ে যায়—পুরানো বদনামটা রয়েছে, একা-দোকা নৌকো ভাসাতে আজও গা ছম-ছম করে। নৌকো-মারার ব্যাপার একেবারে যে না ঘটে এমন নয়। খুচরো এক-আধটা দল রয়েছে, তারাই করে। তবে নিতান্তই কালে-ভদ্রে।

চর বললে কিছুই হল না, রীতিমতো এক রাজ্যপাট। টিলায় টিলায় গ্রাম। নৌকো-মারা একদা একমাত্র পেশা ছিল—পুরোপুরি গৃহস্থমানুষ এবার তারা। জমির চাষ করে, ফসল তোলে। গরু-বাছুরের কল্যাণে উঠানে মাণিকপীরের গান দেয়। সাঁঝের বেলা শাঁখ বাজিয়ে মেয়ে-বউরা ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো করে। ক'টা বছরের মধ্যেই এত সমস্ত। ওরা যেন মুখিয়ে ছিল সজ্জন হবার জন্যে।

লোভ বেড়ে গেল রুদ্রভানুর। জলের বোম্বেটে চাষী গৃহস্থ হয়েছে—আরও চাই। লেখাপড়া শিখে ভদ্রগৃহস্থ হবে তারা সব।

এক গুরুমশায় জোগাড় করে তিনি পাঠশালা বসিয়ে দিলেন। ছোঁড়াগুলো সাদা-মাটা যোগ-বিয়োগ আর কাঠাকালি বিঘেকালি শিখতে লাগুক। মনের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া শিক্ষার দিকে।

অন্য সমস্ত বেশ চলছিল, এই পাঠশালা করেই বিপদ। তারপরে যে ক'টা বছর রুদ্রভানু বেঁচে ছিলেন, ছেলে জোটাতে হিমসিম হতেন। গরু রাখা এবং ক্ষেতে পান্তাভাত বওয়ার মতো জরুরি কাজ ছেড়ে পাঠশালা ঘরে অলস হয়ে ক-ব-ঠ করবে, কোন মুরুব্বি পছন্দ করে একটা। নিঃসীম মাঠ আর কূলহীন নদী চতুর্দিকে—পড়ুয়াদের মন-উড়ু-উড়ু। কখনো চোখ রাঙিয়ে কখনো বা মুক্তহাতে টাকাপয়সা ছড়িয়ে ছাত্র জোটাতে হত।

রুদ্রভানুর পর চন্দ্রভানুর আমল। পাঠশালার গতিক দেখে আরও তাঁর জেদ বেড়ে গেল। পাঠশালা কি—তিন-চারখানা ঘর তুলে মাইনর ইস্কুল বসালেন তিনি এই জায়গায়। পণ্ডিত একজন ছিলেন, সে জায়গায় পাঁচ-পাঁচজন মাস্টার। ছেলে আসবেই, আনতে হবে যেমন করে হোক। এই ক্ষমতা যদি না থাকে, বৃথাই সমুদ্রকূলে পড়ে পড়ে নোনাজল খাওয়া।

কপালক্রমে এই সময়ে আবার দীননাথ নন্দন ডাক্তারকে জোটানো গেল। সদরে প্রাকটিশ করে দীন-ডাক্তার দস্তুরমতো নাম করেছেন। চন্দ্রভানুর সঙ্গে দহরম-মহরম খুব। বয়সে বুড়ো হয়ে ডাক্তার নিজেই এখন হাঁপানি ডিসপেপসিয়া ইত্যাদি গণ্ডা দুই-তিন রোগে ভুগছেন। রোগির চিকিৎসা বন্ধ করে নিজের চিকিৎসাই করেন শুধু।

চন্দ্রভানু বলেন, চলে আসুন দিকি আমাদের সাগরচকে। এসে টাট্টু-ঘোড়ার পিঠে চড়ে গাঙের ধারে বাঁধের উপর ছুটোছুটি করুন। মাছ-ভাজা, মাছ-চচ্চড়ি, মাছের ঝাল-ঝোল, মাছের অম্বল—এক পাতে বসে মাছের আট-দশটা তরকারি খেতে লাগুন। ভয় পেয়ে রোগ পালিয়ে যাবে। নিজে আরোগ্য হবেন, অন্য দুই-পাঁচটিকে আরোগ্য করে পুণ্যকর্ম করবেন। সে পুণ্য আমি মাংনা করতে বলিনে, কাছারি থেকে যথাবিধি বৃত্তির ব্যবস্থা হবে।

এ হেন বিচক্ষণ ডাক্তারটি পেয়ে ডাক্তারখানা খোলা হল সাগরচকে। শিক্ষা এবং

স্বাস্থ্য—উভয় দিকের ব্যবস্থা। রোগি না আসতে পারে তো ডাক্তার নিজে ঘোড়ায় অথবা নৌকো যোগে গিয়ে ব্যবস্থা দিয়ে আসবেন। অষুধও রোগির বাড়ি গিয়ে পেঁছিবে এবং অবস্থাবিশেষে পথ্য। একটি পয়সা লাগবে না কোন বাবদে।

ডাক্তারখানারও সেই পাঠশালার দশা। আলমারি-ঠাসা অষুধ, ডাক্তারবাবু ধবধবে জামা গায়ে চড়িয়ে বসে আছেন। কিন্তু রোগির টিকি দেখা যায় না। এই খোলা-মেলা জায়গায় লোকের স্বাস্থ্য ভাল, সেটা মানি। তা বলে কি তুচ্ছ জ্বরজারিটাও হতে নেই? হলে গোপন করবে, প্রকাশ হতে দেবে না কিছুতে। ডাক্তারের ভয়ে। ডাক্তারি ওষুধ উৎকট তেতো, এবং ডাক্তার ভাত বন্ধ করেন কথায় কথায়। অসুখে এদের মারতে পারে না, কিন্তু পেটে একটা বেলা ভাত না পড়লে মরার দাখিল হয়।

তবে নীহারনলিনী রয়েছে দীন-ডাক্তারের সঙ্গে। রোগিদের চালাকি বুঝে নিতে কিছুদিন গেল। তার পরে আর রেহাই নেই। নীহারনলিনী মেয়েলোক বলে ভারি সুবিধা—পটাপট লোকের ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। অসুখ করেছে, অথচ ডাক্তার না দেখিয়ে লেপ-কাঁথা জড়িয়ে নিঃসাড়ে পড়ে আছে—সেটি এখন হবার জো নেই। নীহার দেখে এসে দীন-ডাক্তারকে সঙ্গে করে আবার সেই বাড়ি যাবে। ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়ে ফিরবেন, নীহার তার পরেও থাকবে কিছুক্ষণ। নিজ হাতে অষুধ খাইয়ে এবং পথ্যের যথোচিত ব্যবস্থা করে তবে ছুটি। ফাঁকি দিয়ে বিনা চিকিৎসায় রোগ সেরে না ফেলে।

দেখেশুনে মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার নীহারকে ধরলেন: রোগির জন্যে ঘোরা-ঘুরি তোমার তো আছেই, ঐ সঙ্গে আমার ছোঁড়াগুলোর একটু খোঁজখবর নিও মা। নানান ছুতোনাতায় ইস্কুল কামাই করে।

রোগিদের ছিল, এবার ছেলেদেরও বড় বিপাক। ইস্কুলে যাওয়ার বাবদ নীহারের তাড়া খেতে হচ্ছে। যেখানেই পালাক, ঠিক নীহারের নজরে পড়বে, ধরে নিয়ে ইস্কুলে বসিয়ে দেবে। গতিক এমন, মাঠ পার হয়ে বাঘের ভয় তুচ্ছ করে একদিন বাদার মধ্যে গিয়ে পড়ল ইস্কুল-পালানো গোটাকতক ছেলে। বাঘ কোথায় লাগে নীহারনলিনীর কাছে!

দীন-ডাক্তার নীহারের পরিচয় দিয়ে থাকেন: মেয়ে আমার। কখনো বলেন, পূর্ব-জন্মের মা—ছেলে জরায় ব্যাধিতে অথর্ব হয়ে পড়েছে, মা-জননী আড়ালে থাকতে পারল না, ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে। এর অধিক তাঁর মুখ থেকে পাওয়া যায় না।

একা মানুষ ডাক্তার—প্রথম বয়সে বউ আর মেয়ে মারা গেল, তারপরে সংসারের ঝঞ্ঝাটে আর গেলেন না। জীবন-সায়াহ্নে এই নীহার মেয়েটা এসে জুটল। ঘরের মধ্যে ডাক্তারের দেখাশুনা করে, বাইরে রোগিদের অষুধপত্র দেয়। নার্সের কাজও করতে হয় দায়ে-দরকারে। কী যে না করে, বলা যাবে না। ডাক্তারের পুরো গার্জেন সে-ই।

অভাগিনী মেয়েটা, বড় দুঃখের জীবন। কিছু লেখাপড়া জানে, এক বয়সে রূপসী বলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু বিয়েথাওয়ার দিকে গেল না—মা আর ছোট ভাইদের কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবে? মাস্টারি করে সংসার চালিয়েছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে ভাইদের। বড় হয়ে তারা চাকরিবাকরি করছে এখন, সংসারধর্ম হয়েছে। এবারে বিয়ে করলে ক্ষতি নেই। প্রয়োজনও বটে—বউরা খিটখিট করে, সংসারের অনাবশ্যক ভারবোঝা মনে করে নীহারকে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে লালিত্য ঝরে গেছে, বিয়ে আর হবে কেমন করে?

সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এমন শান্ত বুদ্ধিমতী—তবু শেষ পর্যন্ত মাথা খারাপ

হল নীহারনলিনীর। উদ্দণ্ড পাগল। দীন-ডাক্তার দেখছিলেন, চেষ্টাচরিত্র করে তিনিই হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসা করালেন। সুস্থ হল নীহার—কিন্তু তখন সমস্যা, ভাইরা বাড়িতে রাখতে চায় না আর। বউদের ঘোরতর আপত্তি। ভয় করে তাদের, পাগলের চাউনি দেখে আঁতকে ওঠে। ছেলেপুলে কোলে নিতে গেলে বউরা ছিনিয়ে নেয়, পাগলের খেয়াল—দিলই বা মোক্ষম চাপ আদর করতে গিয়ে। এইসব নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধে যখন-তখন। শেষটা নীহারনলিনী নিজেই রাগ করে বেরুল। বাঁচল ভাইরা।

দীন-ডাক্তার আদর করে ডেকে নিলেন : সংসাস-সংসার করে তুই পাগল। আমি ডাক্তার—আসল রোগ তোর কি, সেটা জানি। আমি নিজে আর আমার রোগিপত্তর মিলে এখানেও সংসার একটা। এতবড় সংসার কোনখানে পাবিনে—এই সংসারের মালিক হয়ে তুই থেকে যা।

ধরেছেন দীন-ডাক্তার ঠিকই। নিজ কর্তৃত্বে খাটাতে পারলে নীহারনলিনী আর কিছু চায় না। ডাক্তারের কাছে বড় আনন্দে আছে। যত কাজ, স্ফূর্তি ততই বেড়ে যায়। এ হেন কর্মিষ্ঠা মেয়ে দীন-ডাক্তারের সঙ্গে সাগরচকে এসে উঠল।

চন্দ্রভানুর মাথায় আবার নতুন মতলব উদয় হল। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোই বা বাড়িতে কেন পড়ে থাকবে? নীহারনলিনীকে পাওয়া গেছে তো মেয়ে-পাঠশালা হোক। নীহারনলিনী সর্বময়ী এ ব্যাপারে—ছাত্রী জুটিয়ে আনা থেকে মেয়ে-পাঠশালায় পড়ানো। নতুন খাটনি পেয়ে আহার-নিদ্রা ভুলে লেগে গেছে। কিন্তু এতদিন যা হোক এক রকম হয়েছে, এমন কি মাইনর ইস্কুলও লোকে সহ্য করে নিয়েছে। সে ইস্কুল বেটাছেলের জন্য। এবারে মরীয়া, মেয়ে কেউ পাঠশালায় দেবে না! বাসন-মাজা, রাঁধাবাড়া, গোয়াল-বাড়ানো, ধান-ভানা, ছেলে-ধরা—কাজের তো অন্ত নেই। শৌখিন লেখাপড়া নিয়ে বসবে কখন এর মধ্যে? আমাদের খুন করে ছোটরায় গাঙের জলে ভাসিয়ে দিন, ঘরের মেয়ে কিছুতে পাঠশালায় পাঠাব না।

খোদ চন্দ্রভানুকেই শেষটা আসরে নামতে হল : কী সমস্ত বলাবলি হচ্ছে নাকি মাতব্বর?

ঘাড় তুলে চন্দ্রভানুর সঙ্গে কে মুখোমুখি করবে? বীরত্ব মিইয়ে যায়, বেমালুম অস্বীকার : হুটকো মানুষ কোথায় কি বলল—সে কিছু নয়। সাগরচক আপনার—জমাজমি ঘরবাড়ি ছেলেমেয়ে বাচ্চাবুড়ো সকলের মালিক আপনি। যাকে যেখানে নিয়ে বসালে ভাল হয় সেইখানে নিয়ে বসাবেন। 'না' বললেই বা কানে নিতে যাবেন কেন?

অবস্থা এই। নীহারনলিনী সকলের জধানি চিঠি লিখে পাঠাচ্ছে, নিজের নামে কিছু লেখে নি। চন্দ্রভানুই লিখলেন তাকে : ডাক্তাববাবুকে নিয়ে চলে এসো। বন্দী আমি এখানে। তোমরা এসে উদ্ধার না করলে বোরাবার উপায় নেই। বুঝতে পারছি—আমি গিয়ে না পড়লে ওদিককার সুরাহা হবে না। নিয়ে যাবার উপায় করো।

ছয়

দীন-ডাক্তার ও নীহারনালিনী এসে পড়ল।

ডাক্তার বলেন, চিঠি না পেলেও আসতাম। বলেন কি ভায়া, অব্যবহারে স্টেথিসকোপের নল-দুটো অবধি আরশুলায় ফুটো করে দিয়েছে।

নীহার বলে, ডাক্তারখানার এই দশা শুনলেন। ইস্কুলের অমন সুন্দর ঘরবাড়িতে দিনদুপুরে এখন ইঁদুর-ছুঁচো কিচমিচ করে বেড়ায়। মাইনর ইস্কুলের মাস্টার-মশায়রা সাড়ে-দশটায় ঘণ্টা বাজিয়ে তাস নিয়ে বসেন, চারটের সময় ছুটির ঘণ্টা দিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

দীন-ডাক্তার নিশ্বাস ফেলে বলেন, কিছু গড়ে তোলা গেল না। তাসের ঘর। ক'টা মাস আপনি গরহাজির, চারিদিক দিয়ে দুড়দাড় সব ধ্বসে পড়ল। চকে পড়ে থেকে এদ্দিনে নিজের শরীরটাই কেবল তাগড়াই করে এলাম। অন্যের কোন কিছু হল না।

মানুষের ভাল করা বড় সহজ নয়। চন্দ্রভানু অনেক রকমে ঠেকে বুঝেছেন। সর্বক্ষণ চোখ পাকিয়ে সামলে রাখতে হয়, শৈথিল্য পেলে আর কিছু হতে দেবে না। কিন্তু পরাজয় তিনি স্বীকার করবেন না, মনোবেদনা বাইরে থেকে টের পেতে দেবেন না। হাসিমুখে সব শুনে যাচ্ছেন।

একমুখ হেসে বলেন, ভালই হল। আপনাদের কাজ এবার এখানেই—এই রায়বাড়ি। ডাক্তারখানা নেই, ইস্কুল নেই—এত সহজে তাই দু'জনকে পেয়ে গেলাম। জোর কপাল আমাদের—আমার আর আমার স্ত্রী।

ইন্দুমতীর রোগের অবস্থা বললেন—ডাক্তারের জিজ্ঞাসার উত্তরে যাবতীয় লক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করলেন ঃ ধনঞ্জয় কবিরাজ গোড়া থেকে দেখেছেন। নিজের উপর তিনি ভরসা রাখতে পারছেন না। আপনি নিরাময় করে দিন ডাক্তারবাবু। সংসারের বোঝা ছোটবউ বরাবর বয়ে এসেছে, আমি তাকিয়েও দেখি নি। তাকে সুস্থ করে তার বোঝা তার কাঁধে দিয়ে খালাস হই। আমি গিয়ে পড়লে চকে যেমন ছিল, তেমমি আমার সব চলবে।

ডাক্তার আর নীহারনলিনীকে নিয়ে চন্দ্রভানু রোগিণীর ঘরে গেলেন। দীন-ডাক্তারকে ইন্দুমতী জানেন, সদরে থাকবার সময়ে চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকবার এ-বাড়ি এসে গেছেন। অবাক হলেন নীহারকে দেখে। ধবধব করছে গায়ের রং। বয়স হয়েছে—কিন্তু দেহ ছেড়ে যৌবনের বিদায় নেবার লক্ষণ নেই।

মুগ্ধ চোখে মুহূর্তকাল তাকিয়ে ইন্দুমতী বললেন, এই পদ্মফুল নোনারাজ্যে পড়ে ছিল?

দীন-ডাক্তার হেসে বলেন, নোনারাজ্য থেকে তোমার সরোবরে এসে উঠলাম বউমা। বাপ আর মেয়ে আমরা অসুখের সঙ্গে লড়াইয়ে নামছি—আমার অষুধ আর নীহারের সেবাযত্ন। দেখি, অসুখ কদ্দিন আর তোমায় শুইয়ে রাখতে পারে!

দীন নন্দন হেন ডাক্তারের কথায় ইন্দুমতীর হাসি ফুটল অনেকদিনের পর।

সকাল-সন্ধ্যা দু-বার করে ডাক্তার দেখেন, নীহারনলিনী ছায়ার মতন সর্বক্ষণ ইন্দুমতীর কাছে আছে। কিছুদিন পরে পাকা রায় পাওয়া গেল। নতুন কিছু নয়, ধনঞ্জয় কবিরাজেরই কথা। ইন্দুমতীর বাকি জীবন বিছানার উপরে কাটবে, উঠে বেড়াতে পারবে না আর জীবনে। ধনঞ্জয়ের বিদ্যেসাধ্যি না থাক, ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা আছে। নাড়ি ধরেই সব বুঝতে পারে।

বললেন দীন-ডাক্তার অতিশয় গোপনে—চন্দ্রভানুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে।

ধৈর্য হারিয়ে চন্দ্রভানু হাহাকার করে ওঠেন ঃ উপায়? চক যে আমার রসাতলে যাবার দাখিল। ছুটে গিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করছি। আজকে হয় তো কাল অবধি

সবুর করিনে।

চিন্তাকুল ডাক্তার মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়েন ঃ কোন উপায় দেখিনে। অবস্থা আরও বরঞ্চ খারাপ হবার সম্ভাবনা। দেহের নিচের দিকটা এখন অসাড়—এমন হতে পারে, কোন অঙ্গেরই সাড় থাকবে না। মুখের কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতের এক ছবি খেলে যায় চন্দ্রভানুর মনের উপর দিয়ে।—নির্মম নৃশংস সে ছবি। মানুষের মন বাইরের লোকে দেখতে পায় না, এই বড় রক্ষা। চন্দ্রভানু যেন বিপন্ন সাগরচকে চলে যাচ্ছেন ইন্দুমতীর চোখের সামনে দিয়ে। চকের চেয়ে বড় কিছু নেই তাঁর কাছে। ইন্দুমতীর বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু টনটনে চেতনা। নিষেধ করবার শক্তি নেই, প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখছেন শুধু। জল পড়ছে হয়তো বা চোখের কোণ দিয়ে। হবেই যখন সেই অবস্থা, দীন-ডাক্তারের কথা মিথ্যা হবার নয়—তাড়াতাড়ি এসে যাক। দেরি কেন? ইন্দুমতী দিনে দিনে যত অশক্ত হচ্ছেন, তত জোরে আঁকড়ে ধরছেন চন্দ্রভানুকে। পঙ্গু স্ত্রীর আর্তনাদের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব। এই আর্তনাদ তাড়াতাড়ি বন্ধ হোক, না হলে উপায় নেই।

ক্ষমতা বটে নীহারনলিনীর। ক'টা দিনের মধ্যে ইন্দুমতী তাকে যেন চোখে হারাতে লেগেছেন। গোবিন্দসুন্দরী একটু-আধটু রোগির কাজ করছিলেন, সামনে হাজির থাকলেও এখন আর ইন্দুমতী তাঁকে কিছু বলেন না। নীহার আসার পরে এই হয়েছে। শতমুখে নীহারের প্রশংসা ঃ আপনাদের ডেকে ডেকে সারা হতাম পিসিমা, এখন মুখের কথা মুখে থাকতেই কাজ হয়ে যায়। ভারি গুণের মেয়ে নীহার, একটি দোষ খুঁজে পাইনে।

গোবিন্দসুন্দরী একদিন বলে বসলেন, আছে বইকি দোষ—

অসহ্য লাগে গোবিন্দসুন্দরীর। নতুন একটি আবার উড়ে এসে জুড়ে বসল। তাঁরা সব যেমন তেমনি রয়ে গেলেন। বললেন, দোষ আছে বউমা—সর্বনেশে দোষ। সেই এক দোষে সমস্ত মাটি।

কৌতূহলী ইন্দুমতী প্রশ্ন করেন, কি দোষ পিসিমা?

রূপ। বয়স হয়েছে, কিন্তু রূপের আগুন নিভল কই? আগুনে কতজনের কপাল পুড়িয়ে এলো, ঠিক কি। সামলে রেখো বউমা, খাণ্ডব-দাহন না হয়।

ইঙ্গিতের মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই। ইন্দুমতীর ক্লান্ত মুখের উপর ক্ষীণ হাসি খেলে যায়। বললেন, মনে মনে আমি এমনিই চেয়েছিলাম পিসিমা। দোষ যে আমারও আছে। কুশ্রী মানুষের হাতে খেতে পারিনে, ঘেন্না করে। দেখতে পান না, খাওয়ার সময়টা ক্ষীরো-ক্ষীরো করে ডাক পাড়ি।

চন্দ্রভানু এই সময়টা দীন-ডাক্তারকে নিয়ে আসছিলেন। গোবিন্দসুন্দরী উচিত মতো জবাব পেয়েছেন—খুশি হলেন ইন্দুমতীর কথা শুনে। ক্ষীরোদা গৌরাঙ্গী—গোবিন্দসুন্দরী এখন বুড়ো হয়েছেন বলে নয়, বয়সকালেও তাঁর রূপের খ্যাতি ছিল না। খোঁটা গোবিন্দসুন্দরীর উপরে। ঠিক হয়েছে, যেমন উনি নীহারের পিছনেও লাগতে এসেছিলেন।

ধুক করে একটা জিনিস চন্দ্রভানুর মনে এসে যায়—চকে পালানোর উপায় বোধহয় একটা আছে। সে উপায় সহজেই হতে পারে। স্থির মনে আগাগোড়া ভেবে দেখতে হবে।

ইন্দুমতী ডাক দিলেন ঃ নীহার—

নীহারনলিনী সঙ্গে সঙ্গে বেলের পানা নিয়ে আসে। বেল গুলে ঘরে-পাতা দইয়ের সঙ্গে মেশানো। মশলার কালো গুঁড়ো উপরে ভাসছে। অনেক কষ্টে ঘাড় একটু তুলে ইন্দুমতী একচুমুকে খেয়ে তৃপ্তি ভরে বললেন, আঃ—

গোবিন্দসুন্দরীর দিকে চেয়ে সগর্বে বললেন, দেখলেন! মুখেও কিছু বলতে হয় না আমার। ডাক শুনে বুঝতে পারে, কখন কি লাগবে। সাধে ভালবেসে ফেলেছি! ওর গুণ যে আমার চুলের মুঠি ধরে ভালবাসিয়ে ছাড়ে।

দীন-ডাক্তারকে বলেন, এখন আমার কি ইচ্ছে হয় জানেন? আপনার অষুধ আর নীহারের যত্নে সেরেসুরে যদিই বা ভাল হয়ে যাই, ইচ্ছে করেই আমি পড়ে থাকব। ভাল হলে তো নীহারকে নিয়ে চলে যাবেন। ওকে আমি ছাড়তে পারব না।

আশায় আশায় চন্দ্রভানু বলে ওঠেন, তবে আর কি! নীহারকে নিয়ে সংসারধর্ম কর। ডাক্তারবাবু রইলেন, চিকিচ্ছের ত্রুটি হবে না। সাগরচকের গতিক দেখে বুঝে আসি একবার—

না—। কথা নয়, হঠাৎ যেন গর্জন করে ওঠেন ইন্দুমতী।

চন্দ্রভানু সেই একসুরে তবু বলে যাচ্ছেন, গিয়ে একবার চকমহারাজকে তোয়াজ করি গে। উনি বিগড়ালে রসদ কে যোগাবে? রসদ বিনে রায়বাড়ির সংসার যে অচল।

প্রাণপণ চেষ্টায় ঘাড় একটু নেড়ে ইন্দুমতী জোর দিয়ে বললেন, না-না-না—। এক-চক্ষুর তারাটি দপ করে একবার জ্বলে উঠল। চন্দ্রভানু দেখতে পেলেন সেকালের সেই সিংহিনী—কেশর ফোলানো। অনেকদিন পরে দেখলেন।

হতাশ হলেন। বুঝিয়ে-সুজিয়ে এপথে এমনভাবে যাওয়া যাবে না।

সকলে চলে গিয়ে ঘর একসময় নিভৃত হল। ইন্দুমতী আর চন্দ্রভানু। ইন্দুমতী বললেন, কী কথাই বললে তুমি। নীহারকে নিয়ে সংসারধর্ম করব—নীহার দ্বিতীয় পক্ষ নাকি তোমার? তা হলেও হবে না। ভাঁড়ারের চাবি শাশুড়ি আমার আঁচলে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর শাশুড়ি আবার তাঁর আঁচলে বেঁধেছিলেন। আমি উঠতে পারিনে বলেই সে জিনিস ক'টা দিন তোমার কাছে দিয়েছি। চাবি দিয়ে দেবো ধ্রুবের বউয়ের আঁচলে বেঁধে—সে-ই হবে আসল দেওয়া। রায়বাড়ির শাশুড়িদের যা নিয়ম। রোগ চিকিচ্ছে করে আমায় খাড়া করে দাও, আর নয়তো ধ্রুবের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এসো—যাবার কথা তার আগে বলতে এসো না।

এ-দুয়ের কোনটাই দু-দশ দিনের মধ্যে হবার নয়। আর যে তৃতীয় উপায় মনে এসেছে, ভেবে দেখতে হবে সেটা ভাল করে। ঝড়-বাদলের দুর্যোগের মধ্যে নদীকূলে নিঃসহায় ফেলে-আসা সাগরচক সর্বক্ষণ মন জুড়ে রয়েছে। চক একদিন জলতলে ছিল। নিঃসীম জলের মাঝখানে বাঁধ ঘিরে ছোটরায়ের বাপ রুদ্রভানু রায় ডাঙা আদায় করে নিলেন। সে ডাঙায় ফসল ফলে, সে ডাঙায় মানুষ ঘরের পর ঘর তুলে যাচ্ছে। সে ডাঙায় রাস্তাঘাট সাঁকো-পুল ইস্কুল-পাঠশালা—এবং ডাক্তারখানা। হিংসায় তাই বুঝি নদীজল ফেটে মরছে।

বাঁধের উপর ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রভানুর কত দিন মনে হয়েছে, ষড়যন্ত্র ঐ জলের নিচে। খলখল ছলছল করে কুটিল পরামর্শ—কোনখানে এতটুকু ফাঁক পেলে মাথা গলিয়ে ব্যূহের ভিতর ঢুকে মাটির বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে চক আবার পাতালরাজ্যে নিয়ে যাবে। কোটালের মুখে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ অধীর হয়ে আছড়ে পড়ে চতুর্দিক থেকে। ঘন বর্ষায় অনতিদূরের সমুদ্র ঘোর গর্জনে ডাক দেয়—দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে। সমুদ্রের তলে কামানের লড়াইয়ের মহড়া চলেছে যেন। (পণ্ডিতজনে নাম

দিয়েছেন 'বরিশাল গান'।)

ইন্দুমতী বলেন, অত ছটফটানি কেন তোমার বলো দিকি। কাছে একটু বসে থাকতে চাও না। যেন জল-বিছুটি মারে এখানে।

কাতর চন্দ্রভানু বলেন, এই তো আছি বসে।

বসে ফালুক-ফুলুক করছ। সরে পড়তে পারলে বাঁচো। এমনধারা কই আগে তো ছিল না। ডাক্তারবাবুরা এসে পড়বার আগে।

তোমার মনের ভুল ছোটবউ।

ইন্দুমতী রেগে বলেন, চোখ দুটোই তো কাদা নয়। পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাই, তখন ভূতের নৃত্য কোরো। কিছু দেখতে পাব না, বলতেও যাব না।

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বিস্তর দিন শয্যাশায়ী থেকে মনমেজাজ তিরিক্ষি। বাঁকা-কথা ছাড়া মুখে নেই, কথায় কথায় কেঁদে ভাসান। যখন দৌড়-ঝাঁপ করতে পারতেন, এত মানুষের মস্তবড় সংসার ছাড়া অন্য কিছু তাকিয়ে দেখার ফুরসত ছিল না। দেহ যত অসাড় হয়ে আসছে, স্বামীকে ততই কাছে ধরে থাকতে চান। আতঙ্ক লাগে চন্দ্রভানুর—পঙ্গুর পাশে থেকে থেকে নিজেও বোধকরি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। নদী-সমুদ্রের পাশে মুক্ত জায়গায় থাকার মানুষ—আবন্ধ ঘরে রোগির শয্যার পাশ থেকে পালাবার জন্য আঁকুপাকু করেন তিনি।

কোথায় গিয়েছিলে? দুপুর থেকে একেবারে দেখলাম না।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। দুপুরবেলা ইন্দুমতী চোখ বুঁজে ঝিম হয়ে ছিলেন। ফাঁক বুঝে চন্দ্রভানু পালিয়েছিলেন সেই সময়।

ছিলে কোথায় তুমি?

আমতা-আমতা করে চন্দ্রভানু বলেন, কোথায় আবার। কাছারিঘরে গিয়ে জমা-খরচটা দেখছিলাম।

ক্রুদ্ধ ইন্দুমতী বললেন, মিছে কথা। বাড়িতেই ছিলে না তুমি, খিড়কির বাগানে গিয়েছিলে।

এটাও ঠিক। চন্দ্রভানু খিড়কির পুকুরঘাটে হুইল-ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে-ছিলেন। সংকটাপন্ন স্ত্রীকে একলা ফেলে মাছ ধরা—এ হেন হৃদয়হীনতার ব্যাপার প্রকাশ করে বলা চলে না, এটা-ওটা বলতে হয়। অথচ গোপন নেই আসল মানুষটার কাছে। সংসারটা ইন্দুমতীর—লোকজন তাঁরই অনুগত। ভাল হয়ে উঠে আবার একদিন হাল ধরবেন, সকলে জেনেবুঝে রয়েছে। একজন-কেউ চুপিচুপি খবর পেঁাছে দিয়ে ভাল হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

একবার যা বলা হয়ে গেছে সেই জিনিসই ধরে থাকতে হয়। চন্দ্রভানু তম্বি করে বলেন, হুঁ, বাগানে গিয়েছিলাম! শুয়ে শুয়ে দেখছ তুমি!

দেখতে হয় না, তোমার মুখে তাকিয়ে পড়তে পারি। কেন গিয়েছিলে তা-ও জানি। নীহারনলিনীর সঙ্গে জলকেলি করতে।

ইন্দুমতীর কথাবার্তা এমনি হয়েছে ইদানীং। এক বিছানায় পড়ে থেকে হয়েছে। জ্বলে উঠলেন চন্দ্রভানু। তা সত্ত্বেও সামলে থাকতে হল। দীন-ডাক্তারের উপদেশ: শুনে যাবেন, জবাব দিতে যাবেন না। কথা কাটাকাটিতে উত্তেজনা বাড়বে। পাগলে বলে যাচ্ছে, এমনি মনে করবেন। একদিন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

হয়েছে, ঠিকই তো হয়েছে! চন্দ্রভানুই ভাবছিলেন এমনি কোন উপায়ের কথা।

রাগ নিভে গিয়ে হাসি জাগল ছোটরায়ের মুখে।

নীহারনলিনীকে নিভৃতে নিয়ে বললেন, যা বলছি শোন মন দিয়ে। হাসতে পারবে না কিন্তু।

ইতস্তত ভাব আসছিল বোধহয়। একবার কেশে গলা সাফ করে নিলেন। অতিশয় গূঢ় বৃত্তান্ত, সেটা বোঝা যাচ্ছে। নীহারনলিনী উন্মুখ হয়ে আছে।

চন্দ্রভানু বললেন, প্রেম করতে হবে আমার সঙ্গে।

নীহার মুহূর্তকাল অবাক হয়ে থাকে। ভ্রূভঙ্গি করে তারপর বলে, হাসতে মানা করলেন, তাই হাসব না। কিন্তু প্রেম আমি করলেও আপনি যে করবেন না। কোন জায়গায় হবে সেই প্রেম? বেলডাঙায় আপনার এই রায়বাড়ির শতেক কান শতেক চোখ। বিনি কাজের মানুষে বাড়ি বোঝাই—ঠারেঠোরে এমনিই কত রকমের কথা আমাকে আপনাকে জড়িয়ে। আর সাগরচকে যখন ফিরে যাব—

চন্দ্রভানু তাড়াতাড়ি বলেন, না না, সেখানে প্রেমের গরজ নেই।

আপনার সময়ই বা কোথা সেখানে? দিনরাতগুলো চব্বিশ ঘন্টার না হয়ে আট-চল্লিশ ঘন্টার হলেও তো সিকি মিনিট আপনার অপব্যয়ের ফুরসত হবে না। বুড়ি হতে চললাম—একতরফা প্রেমে মুনাফাটা কী আমার?

মুনাফা মস্তবড়। তোমার না হোক, আমার। আমারই বা কেন—সাগরচকের। ঠিকই বলেছ তুমি নীহার, সাগরচকে সিকি-মিনিটের সময় নেই—কাজ কাজ আর কাজ। প্রেম-প্রণয় যত কিছু বেলডাঙার রায়বাড়ির ভিতরে।

কথাবার্তার ধরন রীতিমতো রহস্যময়। নীহার বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চন্দ্রভানুর মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে বলে, এই বাড়ি? রক্ষে করুন। আমার অত সাহস নেই। বাড়িময় বউঠানের চর। ঐ যে দেখুন, গোবিন্দঠাকরুন—আপনার পিসিমা—

গোবিন্দসুন্দরী একটা ঘটি হাতে কি কাজে এদিকে এসে, দেখছেন না দেখছেন না এমনি ভাবে অড়েচোখে তাকাতে তাকাতে ধীরপায়ে যাচ্ছেন।

নীহার বলে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছেন। বেচাল দেখলেই পুটপুট করে লাগাবেন। কিছু না দেখলেও বানিয়ে বলবেন যদ্দুর কল্পনাশক্তিতে কুলোয়।

চন্দ্রভানু হঠাৎ এক কান্ড শুরু করলেন। নীহারের একেবারে কানের কাছে মুখ এনে অকারণে এদিক-ওদিক বার কয়েক তাকিয়ে ফিসফিস করে কুশল প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন: আছ কেমন নীহার? ঘুম-টুম ভাল হয় রাত্রে? দিনমানটা কেমন লাগে? সাগরচক ভাল না এই বেলডাঙা? সাঁতার জানো তো তুমি—তা দেখ, দীঘিটা বড্ড সদরের উপর, দীঘিতে সুবিধা হবে না। তুমি বরঞ্চ—

অকস্মাৎ থামলেন, কথাটুকু শেষও করলেন না। গোবিন্দসুন্দরীকে দেখানোর জন্যে—সরে গেছেন তিনি, যা বোঝবার বুঝে নিয়ে উপরে উঠে গেছেন। আর এখন ফিস-ফিসানির প্রয়োজন নেই।

ফল অনতিপরেই দেখা দিল। ইন্দুমতী গদগদ নীহারের উপর। বললেন, তোমার মতন কাজের মেয়ে দেখিনি আমি। বিপদভঞ্জনকে বড় ডাকাডাকি করি, তিনিই এনে দিয়েছেন। আজ থেকে পাশের ওই ছোট-ঘরে শোবে তুমি—এক ডাকে যাতে পাওয়া যায়। রাত্রে আমার জলতেষ্টা পায় এক একদিন। ক্ষীরো যেন মরে ঘুমোয়। উঠতে গড়িমসি করে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যায়, তুমি আমায় জল দেবে নীহার।

সেই পাশের ঘরে যাবার একমাত্র পথ ইন্দুমতীর ঘরের ভিতর দিয়ে। বাইরের দিককার দরজা তালা এ'টে বহুকাল থেকে বন্ধ। ব্যবস্থা শুনে চন্দ্রভানু মুখ টিপে হাসলেন। অষুধ ধরেছে তবে। ঠিক এই জিনিসটাই চাচ্ছিলেন তিনি।

তাঁর উপরেও আছে। ছোটরায়কে ইন্দুমতী বললেন, তুমি নিচের তলায় চলে যাও। নীহার পাশে রইল, ক্ষীরোদা বাইরে—আমার জন্যে আর কোন ভাবনা নেই। রোগির কাছে উদ্বেগে তোমার ঘুম হয় না, দেহ আধখানা হয়ে যাচ্ছে। আমি এই পড়ে আছি—এর উপরে তুমি পড়লে তো একেবারে সর্বনাশ। সে আমি হতে দেবো না।

এই নতুন ব্যবস্থা। চন্দ্রভানুকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন ইন্দুমতী, যেন মন্ত্রবলে সেই মুঠো আলগা হয়ে গেল এখন। নীহারনলিনীকে চোখে হারাচ্ছেন তিনি। পাশের ছোট্ট ঘরখানায় নীহারের তক্তাপোশ। রাত্রে ইন্দুমতী একটু-আধটু যা ঘুমোতেন, তা-ও বন্ধ একেবারে। ক্ষণে ক্ষণে সাড়া নেন: ও নীহার—

নীহার বলে, জল দেবো?

না, এমনি ডাকলাম। তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি। পরের ঘরের মেয়ে, কোন দূর-অঞ্চল থেকে এসেছ—যখন যা দরকার হয় বলবে, লজ্জা করবে না—কেমন?

দিনমানে কোন এক নিভৃতে নীহারনলিনী হেসে হেসে চন্দ্রভানুকে বলে, বড্ড ভালবাসা ছোটরায়—ভালবাসার চোটে লহমার তরে ঘুমোতে দেন না। নতুন বিয়ের বরকে হার মানিয়ে দেন আমার উপরে এত ভালবাসা বউঠানের।

চন্দ্রভানু প্রসন্ন। মুক্তি খানিকটা দূর এগিয়েছে। বাড়ি-ছাড়া না হতে পারুন, ঘর-ছাড়া অবধি হয়েছে আপাতত। মনের কথাটা নীহারনলিনীকে খুলে বললেন: অন্যে শুনলে বলত, স্ত্রীর এই অবস্থায় ফাঁক কাটাবার তালে আছ, বড় স্বার্থপর তো তুমি। কিন্তু নয় কে শুনি—নিজের মতন কোন মানুষ কবে অন্যকে ভালবেসেছে? ইন্দুমতীই কি কখনো ভেবে থাকে আমার দিকটা?

সাত

ফাল্গুনের শেষে, খুব দেরি তো চৈত্রের গোড়ায়, সাগরচক থেকে ধানচালের ভরা এসে পৌঁছায়। এবারে কি হল—চৈত্র গিয়ে বৈশাখ পড়ে গেল, ভরার তবু উদ্দেশ নেই। চন্দ্রভানু চকে নেই, তাঁর অভাবে বৃন্দাবনের উপর ভার। 'আসছি' 'আসছি' করছে বৃন্দাবন, বেলডাঙায় দু-দুবার লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে—কিন্তু আসে না। রায়বাড়ির সারা বছরের রসদ—বাড়ির ঘাটে ভরা এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই।

এলো অবশেষে। অন্য বারে যা আসে, পরিমাণে তার অর্ধেক। এই জোটাতেই হিমসিম—গোলার তলা অবধি কুড়িয়ে তুলে এনেছে। তাতে কুলোয় নি—সম্পন্ন চাষীদের গোলা থেকেও আনতে হয়েছে। ধারই বলতে হবে—পাওনা নেই তবু চেয়েচিন্তে আনা, ধার বই কি বলা চলে? এই ধানের মূল্য আগামী সনের খাজনা বাবদে কাটান যাবে।

বৃন্দাবনের কাছে চন্দ্রভানু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চকের কথা শুনছেন। কতদিনের অদর্শন, উদ্বেগের তাই অন্ত নেই। দুই প্রান্তের গাঙ দুটো যেন দুই দুর্বৃত্ত আততায়ী। যেন মানুষ—মানুষের মতোই চোখ-কান আছে তাদের। টের পেয়েছে, আসল মানুষটা—ছোটরায় হাজির নেই এবারে। সুযোগ বুঝে তাই যেন আদাজল খেয়ে লেগে গেল।

পুরানো বেলদার চারজন—অবস্থা বিবেচনায় তার সঙ্গে আরও পাঁচ-সাত জন নতুন বেলদার নিযুক্ত হল।

অত্যন্ত পাকালোক তারা, জলের চলাচল বোঝে। কাঁধে কোদালি দিন নেই রাত নেই সর্বক্ষণ বাঁধের উপর সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ঘুরছে। যোগ হলেও হতে পারে, কোন এক জায়গায় হয়তো সন্দেহ হল—লাফ দিয়ে পড়ে সেখানে। হাঁক দিল অন্যদের উদ্দেশে—হুড়মুড় করে তারা সব এলো। দরকার হলে গৃহস্থ-মানুষরাও এসে পড়বে —ঘরবাড়ি ভাতকাপড় এবং দুনিয়ায় যা-কিছু সম্বল, বাঁধ-ঘেরা ঐ চরের জমির উপরে। শয়তান জল সেই বস্তু পাতালে টেনে নেবার জন্য হামলা দিয়ে বেড়ায়। মানুষও সর্বক্ষণ তৈরি প্রতিরোধের সৈন্য হয়ে।

হলে হবে কি—সৈন্য আছে, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর, কিন্তু সেনাপতি কোথা? সে বটে ছোটরায় চন্দ্রভানু। তাঁর বাপ রুদ্রভানুও ছিলেন। জলের শয়তানি বোঝেন এঁরা —এঁদের মতন অন্য কেউ নয়। ক্ষীণ বীচিভঙ্গে নদী যেন ঢলে ঢলে পড়ছে, আর জলতলে ঠিক সেই সময়টা গুপ্তস্রোত তস্করের মতো সিঁধ খুঁড়ে যাচ্ছে বাঁধের গায়ে। ছিদ্র একটু পেয়ে গেল তা শতেক তরঙ্গ মাথা-ভাঙাভাঙি করছে ঢুকে পড়বার জন্য। মাটির বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে বিশাল পথ বানিয়ে নিল—রূপসী নদী লহমার মধ্যে রাক্ষসী। এমনি কাণ্ড ঘটে গেছে বার পাঁচ-সাত। শীতকালের সামান্য জলে এই—দুরন্ত সময় সামনে পড়ে আছে, বর্ষায় যখন ঢল নেমে আসবে। চকের বাসিন্দারা ব্যাকুল হয়ে পথ তাকাচ্ছে, কবে আসবেন ছোটরায়। কুহকিনী নদীর ছলাকলায় ভোলেন না যে মানুষ—দৃষ্টি যাঁর সেই পাতালতলে গিয়ে পৌঁছায়।

চন্দ্রভানু সবিস্তারে সমস্ত শুনলেন। একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বাঁকে বাঁকে চক্কোর দেওয়া নদী আর পছন্দ করছে না। দু পাশের দুই নদী একটি পথ ধরে এক হয়ে অদূরের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। সেই পথ সাগরচকের মাঝ বরাবর—চক ভেদ করে নদী ধাওয়া করবে। সেই সব দুর্বল স্থান তাড়াতাড়ি রুখে দিতে হবে, নইলে সর্বনাশ। পরে আর সামাল দেওয়া যাবে না। ইতিমধ্যেই হয়তো বা দেরি হয়ে গেছে।

সারারাত্রি চন্দ্রভানুর ঘুম হল না। সাগরচকের মানুষজন 'ছোটরায়' 'ছোটরায়' —করে ডাকছে, অগণন নদী-মাঠ-গ্রাম পার হয়ে রাত্রের নৈঃশব্দে সেই ডাক যেন কানে আসে।

কিন্তু ইন্দুমতী বুঝবেন না কিছুতেঃ চকদার কতই তো আছে—ঘরবাড়ি ছেড়ে তোমার মতো কে বারোমাস পড়ে থাকে?

আছে চক অনেকেরই বটে, কিন্তু সাগরচক কারো নয়। দুর্দান্ত ছেলের মায়ের মতন হিমসিম হয়ে যাই, বারোমাস পড়ে থেকেও তো সামাল দিতে পারিনে।

কালবৈশাখীর ঝড়ঝাপটা গেছে আজ সন্ধ্যাবেলা—সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ অবধি। বৃষ্টি-ধোওয়া জ্যোৎস্নায় এখন চারিদিক ভরা। ঘর থেকে উঠানে নেমে গিয়ে চন্দ্রভানু খানিক পায়চারি করলেন। এত দুশ্চিন্তা একটি মনে আর ধরছে না। ইন্দুমতীর তো ঘুম নেই, রাত্রি বলে কিছু নেই তাই। তাঁর কাছে গিয়ে আবার বলবেন চকের অবস্থা, পরামর্শ করবেন, ছুটি চাইবেন কাতর হয়ে। দীন নন্দনের মতো অমন বিচক্ষণ ডাক্তার বাড়ির উপর, তার উপর নীহারনলিনী—ভাবনার কিছু নেই। এইসমস্ত বুঝিয়ে বলবেন—

বুঝে দেখ ছোটবউ, সংসারের অন্ন-বস্ত্র ঠাটঠমক যত-কিছু ঐ সাগরচক থেকে। আমাদের ভাণ্ডার ধরে টান পড়েছে—অবুঝ হোয়ো না, দাও কয়েকটা দিনের ছুটি। দেখে আসি একবার, চোখে না-দেখা অবধি সোয়াস্তি নেই।

দরজা ভেজানো। চোখ বোঁজা ইন্দুমতীর। চন্দ্রভানু সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়েছেন কি না দিয়েছেন, ইন্দুমতী চিৎকার করে উঠলেন: কে কে তুমি?

সারা রাত্রি তিন-সলতের প্রদীপ জ্বালা থাকে রোগির ঘরে। ইন্দুমতীর বলছেন, যাচ্ছ কোথায় তুমি? কোন মতলবে?

চন্দ্রভানু বলেন, মতলব কী আবার! তোমার কাছেই এলাম ছোটবউ—

রাতদুপুর না করে আসা যায় না বুঝি আমার কাছে? দিনমানে নিন্দে হবে? পা টিপে টিপে চোর হয়ে আসতে হয়? ব্যঙ্গের সুরে ইন্দুমতী কেটে কেটে বলছেন, ন্যাকা আমি—বুঝিনে। ঘুমিয়ে আছি ভেবেছিলে? যাচ্ছিলে পাশের ঘরে—বুঝেসুজিয়ে নীহারকে আমি পাশে এনে আটক করেছি।

হি-হি করে উৎকট হাসি হেসে ওঠেন: বড্ড অসুবিধে ঘটিয়েছি—উঁ? নিজের বাড়ি চোর হয়ে বেড়াতে হয়!

রাত ঝিমঝিম করছে। চেঁচামেচিতে জেগে পড়েছে সকলে। ক্ষীরোদার অলিন্দে শোওয়ার ব্যবস্থা, সে ঘরে ঢুকে পড়ল। গোবিন্দসুন্দরী নিচের তলার সেই শেষপ্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন। দরজা-জানলার বাইরে আরও সব এসেছে, শব্দ-সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির মধ্যে আচমকা এমন মজাদার কাণ্ড—কে ঘরে শুয়ে থাকতে যাবে? থাকলে ক্ষতি ছিল না অবশ্য—গোবিন্দসুন্দরী যখন হাজির আছেন, রায়বাড়ি সামান্য স্থান—গোটা বেলেডাঙা গ্রামের স্ত্রীপুরুষ কারো জানতে বাকি থাকবে না। রাত্রি ভোর হবার যেটুকু অপেক্ষা।

ইন্দুমতী গোবিন্দসুন্দরীকে সাক্ষি মানেন: টিপিটিপি যাচ্ছিলেন পিসিমা। ভেবেছেন ঘুমিয়ে আছি। আমিও কম সেয়ানা নই। চক্ষু বুজে ঝিম হয়ে পড়ে থাকি, একদিন না একদিন হাতে-নাতে ধরবই। হল তাই আজকে।

চোপরও। গর্জন করে উঠলেন চন্দ্রভানু। এ গর্জন রায়বাড়ির কেউ কখনো শোনে নি। জোলো-ডাকাত নৌকোয় উঠে প্রথম যে তাড়ায় আরোহীকে ভয়-চকিত করে, সে বোধহয় এই কণ্ঠ।

সবাই হকচকিয়ে গেছে, ইন্দুমতী কিন্তু ভয় মানেন না। সাহসী চিরদিনই, পঙ্গু হয়ে পড়ে থেকে একেবারে যেন ক্ষেপে আছেন! বলেন, কি করবে তুমি, গলা টিপে ধরবে? এসেও ছিলে সেই মতলবে—আমি জানি। গলা টিপে শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে নীহারের ঘরে যেতে। করো তাই। সাগরচকে চোখের আড়ালে যে রাসলীলা চলে, জোড়া-মন্দিরের বাস্তুভিটেয় আমার সংসারের উপর সে অনাচার জীবন থাকতে ঘটতে দেবো না আমি। মেরে ফেল আমায়, তারপরে।

একবাড়ি লোকের মধ্যে কেলেঙ্কারি। আজ বলে নয়, এই পঙ্গু মানুষটা চিরজীবন ধরে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবে। চন্দ্রভানুর এমনি অবস্থা—দেবেন বুঝি সত্য সত্য গলার উপর হাতদুটো চাপিয়ে।

হঠাৎ কী হয়ে গেল—রাগ একেবারে জল। মুখের উপর চকিতে হাসিও খেলে যায় একটু। বলেন, গোলমালে কাজ কি ছোটবউ। তোমরা রইলে, আমি চকে চলে যাবো। রাতটুকু পোহাক সকালবেলাই যাচ্ছি।

ভ্রূভঙ্গি করে ইন্দুমতী বলেন, সে আর তুমি! খুঁটো পোতা যে এখানে—বাঁধা-গরু

চারিধারে ঘুরে মরবে। সে দিকটা লয় হয়ে যাচ্ছে, খবরের পর খবর—খবর নিয়ে বৃন্দাবন নিজে এসে পড়ল। বাড়ির মধ্যু ছেড়ে এক পা নড়বার জো নেই। ঘরের মধ্যে এনে পুরেছি, রাতদুপুরে সেই অবধি ধাওয়া করেছ। কতখানি বেপরোয়া হলে তবে মানুষ পারে। ছেলেটা দুদিন বাড়ি এসেছে, তা বলে একটু লাজলজ্জা নেই।

অপবাদ ঘাড় পেতে নিয়ে একটি কথাও না বলে চন্দ্রভানু সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। ধ্রুবভানু এসেছে ছুটিতে, দোতলার শেষদিকে তার ঘর। ভিড়ের মধ্যে সে নেই—থাকতে পারে না। কিন্তু কানে যেতে কিছুই বাকি থাকছে না তার। লেখাপড়া নিয়ে শহরের উপর আলাদা ভাবে মানুষ হচ্ছে—আসল ব্যাপার কিছুই সে জানে না। লজ্জা ও বেদনার অন্ত নেই বেচারির—গাঁয়ে-ঘরে আজকের দিনে না-থাকলেই ভাল হত।

চন্দ্রভানু নিচের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন, পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন নীহারনলিনী।

কী আশ্চর্য, যাকে জড়িয়ে এত কুৎসা, পিছন ধরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে নেমে চলে এলো।

লজ্জাসংকোচ নেই—উল্টে জাঁক করে নীহারনলিনী বলে, লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, ওদের চোখের উপর দিয়ে এলাম। তাকিয়েও দেখল না। কে ভাবতে পারে, এত কাণ্ডের পর ছোটরায়ের কাছেই চলেছি আবার।

চন্দ্রভানু অবাক হয়ে বলেন, হাসিমুখ যে তোমার?

বাঃ রে, হাসিরই তো দিন। প্রেম করতে বলেছিলেন—সেই প্রেম নিয়ে বাড়িময় ঢি-ঢি। ফল একেবারে প্রত্যক্ষ—বউঠান নিজেই চাইছেন, আপনি সাগরচকে চলে যান। আমার সঙ্গে যাতে দেখাসাক্ষাৎ না হয়। ভাবনা নেই, নিশ্চিন্তে যান চলে। আমি আছি, ডাক্তারবাবু আছেন—রোগির সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না।

চন্দ্রভানু গভীরস্বরে বলেন, সে আমি জানি নীহার। সংসার যথানিয়মে চলবে, রোগিরও এতটুকু অবহেলা হবে না। তুমি হতে দেবে না। কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি—এতবড় মিথ্যে রটানও তোমার মুখের হাসি মুছতে পারে নি। যে মানুষ রটাল, তার সম্বন্ধে এতটুকু রাগ-দুঃখ নেই তোমার।

মুখ টিপে হাসছিল, এবারে নীহারনলিনী খিলখিল করে হেসে ওঠে: রটিয়ে আমার কি ক্ষতিটা করবেন? আমার কি সমাজ-সামাজিকতা আছে? ছেলেমেয়ে আছে যে কলঙ্কিনী হয়ে তাদের কাছে মুখ তুলতে পারব না? কোন দুর্ভাবনা আমার নেই, আমার মতন ভাগ্যধরী কে!

শান্ত গম্ভীরভাবে চন্দ্রভানু শুনে গেলেন। বললেন, তোমার না হোক, ভাবনা আমার হচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি, ছোটবউয়ের আক্রোশের মুখে তুমি একলা পড়ে রইলে—

নীহারনলিনী একেবারে উড়িয়ে দেয়: কিছু না, কিছু না। প্রতাপ বউঠানের ছিল বটে একদিন, রান্নবাড়ির সিংহিনী আজ পাঁকে পড়ে আছেন। বাড়ির কেউ পারত-পক্ষে সামনে আসে না। আঁচলে চাবি বাঁধা থাকলে সংসারটাও সেই সঙ্গে বাঁধা থাকে না—এ কথাটা বোঝেন না উনি। রাগ কেন হবে, মায়া হয় আমার বউঠানের উপর। আজকে উনি বড্ড অসহায়।

বলে, আমি শুধু ভাবছি আপনার কথা। আপনার নামে কুচ্ছোকথা রটে গেল। আপনার যে অনেক আছে। অঞ্চলজোড়া নাম-ডাক, হাজার মানুষ আপনার মুখ তাকিয়ে থাকে—

চন্দ্রভানু নীহারের সেই আগেকার কথার সুরে বলে ওঠেন, কিছু না, কিছু না।

পুরুষ-মানুষ আমি যে—তায় রায়বংশের পুরুষ। দুর্ণাম এ বাড়ির পুরুষের ভূষণ। কুলাঙ্গার কেবল আমিই ছিলাম। আর এক বড় কুলাঙ্গার হয়ে উঠেছে—আমার ছেলে ধ্রুবভানু। মিথ্যে বলছিনে, গোবিন্দ-পিসির কাছে গিয়ে কথাটা তুলো, শতকণ্ঠে তিনি ওই কথা বলবেন। যে পুরুষ ঘরের রমণীর অনুগত, তাকে ওঁরা পুরুষ বলে মানতে চান না—শিকল-বাঁধা পোষা কুকুর।

হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বলেন, জাতে উঠলাম এদ্দিনে নীহার। খাতির-ইজ্জত গাঁয়ের উপর যা ছিল, শতগুণ হল এবার থেকে।

ঠিক সকালবেলা নয়, গোছগাছ সারা হতে প্রায় দুপুর। নীলবোট ঘাটে এনে লাগিয়েছে। যাকে যা বলবার বলে-কয়ে—যেমন বরাবর হয়ে আসছে—চন্দ্রভানু নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

ইন্দুমতীর ঘরেও গেলেন একবার। ইন্দুমতী বলেন, পালঙ্কের উপর উঠে দাঁড়াও—আমার শিয়রে। বিজয়া-দশমীর দিন যেমন করেছিলে।

দাঁড়াতে হল সেই রকম। বিস্তর চেষ্টায় ইন্দুমতী হাত বাড়ালেন একটু। পায়ের ধুলো কোনক্রমে মাথায় ঠেকিয়ে কেঁদে পড়লেন : এই ভাগ্যটুকু কতদিন আর আছে কে জানে। হাত দুটোও যে অসাড় হয়ে আসছে।

যে ক'জন সেখানে, সকলে চোখ মুছছে। কাল এই ঘরের ভিতর এমন বচসা এত-বড় কেলেঙ্কারি, সে যেন নিশিরাত্রির দুঃস্বপ্ন একটা।

যাত্রামুখে নীহারনলিনীকে দেখা যাচ্ছে না। ইন্দুমতীই ডাকাডাকি করছেন, ও নীহার, তোমাদের ছোটরায় রওনা হয়ে যাচ্ছেন। কোথায় গেলে তুমি? এসো—

আট

সোনাছড়ি বন্দরে লালমোহন মিত্তিরের বাড়ি শেষ হয়ে গেছে। জাঁকিয়ে গৃহ প্রবেশ।

আসল মচ্ছব শেষ হয়ে গেল, শানাইয়ের বাজনা তবু থামে না। সকালবেলাটা এবং সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বেজে চলে। চিরকালই বুঝি বাজবে, কোনদিন থামবে না। নৌকোর দাঁড় থামিয়ে গাঙের উপরে মাঝিমাল্লারা শোনে।

এক আজব বাড়ি—আয়তনে খুব যে বড়, তা নয়। ধরনটা আলাদা—কোন ঘর গোল, কোনটা পাঁচকোণা, কোনটা সাতকোণা। দোতলার একটা বারাণ্ডা গাঙের জলের উপর অনেক দূর অবধি বেরিয়ে এসেছে। কলকাতা শহর থেকে দক্ষ মিস্ত্রি এনে দস্তুরমতো খরচ খরচা করে বানানো।

লালমোহনের দেশের বাড়ি থেকে সবাই এসে পড়েছে। ডাঙার দেশের মানুষ দক্ষিণের ভাঁটিঅঞ্চলে এই প্রথম—যা দেখে তাই অপরূপ। বড় বড় গাঙ, দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ, মাঠের দূরতম প্রান্তে বাদার জঙ্গলের ঘনসবুজ রেখা। প্রথম কয়েকটা দিন তো মীনাক্ষী বারাণ্ডার রেলিং ঝুঁকে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত। সাদা মার্বেলের মেজের সঙ্গে পা দুটো তার যেন পাকাপাকি গেঁথে দিয়েছে, নড়তে ফিরতে পারে না।

নামডাক হয়েছে লালমোহনের বাড়ির, তা বলে নিন্দেমন্দও যে না হচ্ছে এমন নয়। জিনিস চোখে ধরবার মতো বটে, কিন্তু অতিশয় ফঙ্গবেনে। দু-দশ বছরের মধ্যে দেখে নিও ইটে নোনা ধরে পাতলা দেয়াল ফুটো ফুটো হয়ে যাবে। ফুরফুরে শৌখিনতা এ-তল্লাটে চলে না।

তুলনার কথাও ওঠেঃ দালানকোঠা কেমন হওয়া উচিত বেলডাঙার রায়বাড়ি দেখে বুঝবে। অট্টালিকা নয়, পাহাড়। পাকা-পোড়ের ইট, দেয়াল একমানুষের সমান চওড়া। গাঙের বান এসে এসে কতবার আছাড় খেয়ে পড়েছে, ইটের একটা টুকরো খসাতে পারে নি কোথাও।

সেই রায়বাড়ি দেখা হয়ে গেল মীনাক্ষীর। নিতান্ত দৈবক্রমে। ঘাড় হেঁট করে মানতে হয়, বড় জিনিস গড়তে জানত বটে তখনকার মানুষ। দেখাটা তবু তো শুধুমাত্র বাইরে থেকে। কৌতূহল ছিল ভিতরে যাবার, কিন্তু হতে পারে না। কুচোচিংড়ি-ধরা মানুষেরা কলে-কৌশলে হাঙর ধরার তালে আছে, পুনশ্চ উঠে পড়বে সেই কথা। নিজের অধ্যবসায়ের জোরে লালমোহন সামান্য থেকে বড়লোক হয়েছেন, তাঁরই মেয়ে মীনাক্ষী। ইজ্জত তারও কম নয়।

ব্যাপারটা এই নদীকূলে বিশাল বটের তলায় শিবমন্দির—কুসির বটতলা সেই জায়গার নাম। কুসি অর্থাৎ কুসুম নামে কোন এক নিষ্ঠাবতী বিধবা শিব-দর্শন পেয়েছিলেন এখানে। বটের ঝুরির মধ্যে বুড়োশিব লুকিয়ে বসে আছেন, নোনা নদীর জোয়ারে ভেসে এসে মকরবাহিনী গঙ্গা তাঁর পাদ-বন্দনা করছেন—এক রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেলেন কুসুম। পুণ্যমাসের পুণ্যতিথি সে রাত্রি—অক্ষয়তৃতীয়া। ধড়মড় করে জেগে উঠে আশ্চর্য বৃত্তান্ত কুসুম সকলকে বললেন।

তারও অনেক দিন পরে নৌকোপথে যেতে যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল স্বপ্নে-দেখা সেই বটগাছ। বটগাছের আশে পাশে যে ঝোপজঙ্গল স্বপ্নে দেখেছিলেন, সমস্ত হুবহু মিলে যাচ্ছে। নৌকো থেকে নেমে কুসুম ঘুরে ঘুরে দেখেন। খুঁজতে খুঁজতে বৃহৎ শিবলিঙ্গও পাওয়া গেল—আষ্টেপিষ্টে বটের ঝুরি জড়িয়ে ঠাকুর পালিয়ে রয়েছেন।

চাউর হয়ে গেল চতুর্দিকে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন মা-গঙ্গা পতি-সন্দর্শনে চলে আসেন, নোনা গাঙ ঐ দিনে গঙ্গার মাহাত্ম্য পেয়ে যায়। গঙ্গাস্নানের এমন সুবিধা পুণ্যার্থীরা ছাড়বেন কেন? বিস্তর লোক জমে, মেলা বসে যায় কুসির বটতলায়। নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ। নৌকো-বাইচ হয়। কুসির বটতলায় মহাপার্বণ অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে।

বৃত্তান্তটা লালমোহনের সোনাছড়ির বাড়ি এসে পৌঁছল। অতিরঞ্জিত হয়েই এসেছে। লালমোহনের মা সত্তর বছরের বৃদ্ধা। তিনি রোখ ধরলেনঃ পাতকী তরাতে মা-গঙ্গা নিজে এদ্দুর আসতে পারছেন, আর আমরা এই পথটুকু যাব না?

মীনাক্ষী আরও তাঁকে তাতাচ্ছেঃ বুঝে দেখ ঠাকুরমা। হাঙ্গামা-হুজ্জুত নেই, রেল-স্টিমার চড়তে হবে না, অথচ পুরোপুরি গঙ্গাস্নানের ফল।

মীনাক্ষীও যাবে ঠাকুরমার সঙ্গে, কত নদী কত গাঁ-গ্রাম দেখবে! লালমোহনকে বৃদ্ধা বললেন, যাবোই আমি। নৌকোর ব্যবস্থা করে দাও।

নৌকোর অসুবিধে নেই, কিন্তু মুশকিল, নিয়ে যায় কে সঙ্গে করে? খটির কাজে বিস্তর কাঠ লাগে, বাদায় কাট কাটার বন্দোবস্ত করতে হয়। সেই ব্যাপারে লালমোহনের সদরে যাবার প্রয়োজন ঠিক ঐ সময়টা। এবং তাদ্বিরের ব্যাপার রয়েছে যখন, ভক্তদাস ছাড়া হবে না। ভক্তদাস আর লালমোহন দু-জনেই সদরে যাচ্ছেন, এঁদের সঙ্গে কে যাবে তা হলে?

ভক্তদাস বলে, রাইচরণকে আমরা নেবো না। সে ওঁদের নিয়ে যাক। রাইচরণ গেলে ভাবনার কিছু নেই।

অগত্যা তাই। অতিশয় পুরানো দক্ষ মাঝি রাইচরণ—সে নৌকো নিয়ে, এবং এঁদের সব নিয়ে কুসির বটতলায় চলল। মীনাক্ষীর মা মনোরমা গিন্নিবান্নি মানুষ, যাত্রামুখে—কোথাও কিছু নেই—তিনিও নৌকোয় উঠে পড়লেন। ছটফটে মেয়ে আর স্থবির শাশুড়ি সামলানো কি মাঝিমাল্লার কর্ম? মুখে এই বলছেন—আর এদিকে নোনারাজ্যে প্রায় ঘরের দুয়ারে মা সুরধুনী, পুণ্যলাভের বাসনা তাঁরও কি মনে মনে নেই?

চন্দ্রভানু চকে চলে গেলেন, তারই দিন দশেক পরে। ছুটিতে এসে ধ্রুবভানু মনের সাধে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। বাপ না থাকায় আরও জুত হয়েছে। সমবয়সি আট-দশটা ছোকরা সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বাইরে-বাড়ির অদূরে নদী। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদী—এপারে দাঁড়িয়ে অনেক ঠাহর করে ওপারের গাছপালার আভাস মাত্র দেখা যায়। এমন নদী রয়েছে, স্নান তবু দীঘিতে। নদীর জল নোনা, তার উপর কুমিরের ভয়। নদী আর দীঘির মধ্যে প্রশস্ত বাঁধ—বাঁধ বেঁধে নদী থেকে একটুকরো জল আলাদা কেটে নেওয়া হয়েছে যেন। বর্ষার সময়টা নদীর লাবণাক্ত ভাব অনেকটা চলে যায়, বাঁধের উপর নালা কেটে দেয় তখন। নদীর জল দীঘিতে এসে ঢোকে, সেই সঙ্গে গুঁড়ো-মাছ আসে প্রচুর। ভাঙান, ভেটকি, পায়রা-চাঁদা, চিংড়ি—হরেক রকমের মাছ।

দীঘিতেই অতএব ঝাঁপাঝাঁপি করছে এরা। নেমেছে কোন সকালবেলা। ঘাটে অনেক লোক—তারা বলাবলি করছে, শহরে থেকে এত লেখাপড়া করে ঠাণ্ডা হতে পারল কই? একেবারে সেই ছেলেবয়সের মতো।

একজন বলে, রায়বংশের রক্তে যে আগুন। কত পুরুষ ধরে জ্বলছে। দুটো পাশ দিলেই অমনি নিভে যায় বুঝি? বড় জোর বিদ্যের নিচে চাপা থাকতে পারে, একটু বেসামাল হলেই দাউ দাউ করে উঠবে। ছোটরায় নিজে যেমন, তেমনি এই ছেলে। রায়বাড়ির মানুষ নিয়ে আমাদের মতন বাঁধা-হিসাব চলে না।

বাঁধের উপরে আমগাছ জামগাছ কয়েকটা। একটা ডালে আম টুকটুক করছে। আঙুল তুলে ধ্রুব অন্যদের দেখায়।

সঙ্গীরা হেসে খুন: সিঁদুরে-গাছের আম যে। কাঁচা থেকেই অমনি সিঁদুরের ছোপ। কী আশ্চর্য, কলেজে গিয়ে আজব মানুষ হয়ে এসেছ—এই চিনতে পারলে না?

হাসাহাসি ধ্রুবর বরদাস্ত হয় না। বলে, কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা, দূর থেকেই আমি ফারাক বুঝতে পারি। পরখ হোক তা হলে।

বার দুই ইতিমধ্যে দীঘি পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। আবার এই এক নতুন অজুহাত। জলে আছে তো জলের উপর দিয়েই যাবে, ডাঙায় উঠে পায়ে-হাঁটার হাঙ্গামা চলবে না।

সাঁ-সাঁ সকলের আগে ধ্রুব জল কেটে ছুটল। কখনো ভেসে যাচ্ছে, কখনো ডুবসাঁতার। একটি দুটি আরও যাচ্ছিল, খানিকটা গিয়ে ফিরে আসে। এই বড় দীঘি এপার-ওপার করা চাট্টি কথা নয়। এবং আম যে কাঁচা, তাতেও সন্দেহমাত্র নেই। কী হবে পাগলামির পাল্লা দিয়ে? ধ্রুবই দেখে এসে বলুক।

পেঁছে গেছে ধ্রুব ওদিককার বাঁধে। গাছের মাথায় নিরিখ করে দেখে। কী বুঝল, সে-ই জানে। হাঁক দিয়ে বলে, বাজি ধরো তবে, আম ছিঁড়ে এনে দেখাই।

তরতর করে গাছের উপর চড়ে গেল। কাঠবিড়ালির মতো এ-ডাল ও-ডাল করছে। কী হল হঠাৎ—থমকে দাঁড়িয়ে যায়। নদীর দিকে নজর পড়েছে। অবাক কাণ্ড!

মাঝনদীতে মানুষ দাঁড়িয়ে। নৌকোও একটা কাত হয়ে পড়েছে, দেখতে পাওয়া যায়।

বিপদে পড়েছে কারা, নৌকো উল্টেছে। ডালে ডালে পা ফেলে নামবার ধৈর্য থাকে না—দোডালা থেকে ধ্রুব দিল লাফ মাটিতে। ভিজে কাপড়ে বাঁধ ধরে ছুটেছে। রায়বাড়ির তিনদিক ঘিরে কাটা খাল—পুরানো আমলের গড়খাই। ডিঙি পেয়ে গেল একটা খালের মধ্যে। ডিঙি খুলে লহমার মধ্যে বড় নদীতে বেরিয়ে পড়ে।

জল, জল, আর জল—কূলকিনারা নেই। অকূল জলের মধ্যে মানুষ। যোগীঋষিরা শোনা যায় জলের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারেন, এরাও বুঝি তাই। হাঁটছে না, জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। একটির রঙিন কাপড়চোপড়—রঙিন হওয়ায় সকলের আগে নজর পড়ে। জল কেটে ধ্রুব ছুটল সেদিকে।

গঙ্গাস্নানে পাপক্ষয় করে মীনাক্ষীরা কুসির বটতলা থেকে ফিরছিল। পথের মাঝে বিপত্তি। মাঝগাঙের নিচে চর—চরে ঠেকে পানসি কাত হয়ে জল উঠে গেছে। তলির তক্তাও কিছু হয়তো জখম হয়েছে—জল ছেঁচে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সঠিক বোঝা যাবে না। রাইচরণ মাল্লাদের নিয়ে সেই কাজে লেগে গেছে। শেষ-ভাঁটায় এখন ডাঙা জেগেছে, নৌকো থেকে বেরিয়ে মেয়েলোক তিনজন চরের ডাঙায় আশ্রয় নিয়ে আছে।

জোয়ার আসন্ন—কতক্ষণই বা আছে আশ্রয়ের এই পৃথিবীটুকু। এখনই তো ভাসিয়ে দেবে। দেখতে দেখতে হাঁটুভর জল—হাঁটু থেকে কোমর, কোমর থেকে গলা। তা-ই বা কেন—মাঝগাঙে এহেন ভুরিভোজের আয়োজন, কুমিরকামট কি অতক্ষণের অবসর দিতে যাবে?

চরের উপর বোঠের খোঁচ মেরে শক্ত করে ডিঙি ধরে ধ্রুব হাঁক দেয়ঃ উঠে আসুন।

বলার অপেক্ষা মাত্র।

এসো ঠাকুরমা—। বৃদ্ধার হাত ধরে মীনাক্ষী উঠি কি পড়ি চলল। বড় ভয় পেয়েছে। মায়ের উদ্দেশে ডাক দেয়ঃ চলে এসো।

দায়িত্বভার রাইচরণের উপর, সে কর্তা। জল সেঁচার কাজ ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেঃ চললে কোথা ঠাকরুনরা, উতলা হবার কী আছে? আমাদের নৌকোই তো চালু হয়ে যাচ্ছে।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ধ্রুব মনোরমার দিকে চেয়ে বলে, এদিককার গাঙ-খাল বড্ড খারাপ। কুমির এসে কখন লেজের বাড়ি মারবে ঠিক-ঠিকানা নেই।

জানি গো জানি। গাঙে-খালে নতুন নই। মেয়েলোক বলে ভয় দেখিও না। ক্রুদ্ধ হয়ে রাইচরণ মাঝি বলে, বিলেত থেকে আসছিনে বাপু, সোনাছড়ির লোক আমরা।

কুমিরের নামে মেয়েরা আরও ব্যাকুল। চক্ষের পলকে ধ্রুবর ডিঙির উপর উঠে পড়ল।

মাল্লাদের যথোচিত কাজের উপদেশ দিয়ে রাইচরণও দ্রুত ডিঙির দিকে আসছে। ধ্রুব হাত নেড়ে বলে, তুমি কেন, তোমায় উঠতে দেবো না। নৌকো তোমার তো চালু হয়ে যাচ্ছে। যদি না হয়, জোয়ারের জলে সাঁতার কেটে বেড়িও।

বোঠের ধাক্কায় ডিঙি সত্যি সত্যি জলের দিকে ঠেলে দিল।

রাইচরণ চেঁচামেচি করেঃ নিয়ে চলল যে, কী সর্বনাশ! কার নৌকো কি বৃত্তান্ত—মা-ঠাকুরমা-দিদি এক কথায় আপনারা উঠে পড়লেন যে বড়! কে কোন মতলবে ঘোরে হদিস জানেন?

কুমির জলের নিচে চলাচল করে, জলের উপরে আরও বেশি ভয়ের জীব—গাঙে-

খালে রাহাজানি করে যারা বেড়ায়। ইদানীং খ্বেই কম, তাহলেও মান্ষের একেবারে ভয় ঘোচেনি। মনোরমা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন : চলে এসো না তুমি। উঠে পড়ো। জল তা কি হয়েছে! এইটুকু জলে-কাদায় ভয় পেয়ে গেলে?

হাসতে হাসতে ধ্রুবভান্ ডিঙি ঘোরাল। ডিঙিতে উঠে রাইচরণ নদীজলে পা ধ্তে ধ্তে বলে, তুমি কে বলো দিকি? নৌকো নিয়ে ছ্টে এলে—তোমার এত দায়টা কিসের? পরিচয় দাও, কে তুমি?

হাসি থামিয়ে ম্হ্র্তে গম্ভীর হয়ে ধ্রুব বলে, ধরেছে ঠিক। ব্দ্ধি আছে তোমার। জোলো-ডাকাত। হায় হায়, কুমিরের ম্খ থেকে বাঁচতে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ে গিয়েছ।

স্নানের মধ্যে উঠে এসেছে—খালি গা। পাথর কুঁদে যেন শক্ত স্প্ন্ট দেহখানি গড়ে তোলা। বোঠে বাইছে। জোয়ার এসে গেছে ইতিমধ্যে, টান কাটাতে সর্বশক্তিতে বাইছে। বাহ্র শিরা-উপশিরাগ্লো ফুলে ফুলে উঠছে। শিরা যেন ইস্পাতের তার—আওয়াজ বোঠের নয়, তারগ্লোই ব্ঝি কড়-কড় করে ওঠে। জোলো-ডাকাত —চেহারায় সেটা কিছ্মাত্র অবিশ্বাস্য ঠেকে না।

এ হেন বিপদের মধ্যেও হাসি চিকচিক করে মীনাক্ষীর ঠোঁটে। ঐ এক ধরন মেয়েটার। খাসা লাগছে—নিঃসীম জলের উপর দিয়ে ডাকাতে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। রাবণ সীতাকে রথে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এ মান্ষ ডিঙিতে তুলে।

ধ্রুব হঠাৎ রাইচরণের উপর খিঁচিয়ে ওঠে : হাঁ করে কি দেখ? হাতের কাছে বোঠে রয়েছে—দাও না দ্-টান টেনে। তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠে পড়ি।

মন ভাল নয় রাইচরণের, একদ্ন্টে সে মাঝগাঙে নিজ নৌকোর দিকে তাকিয়ে। জোয়ারে এখনই তো জলের উপর ভাসবে—তার আগে ভিতরের জল নিঃশেষে সেঁচে ফেলা দরকার। পারবে তো ওরা? নিজে তাকে চলে আসতে হল এদের এই হাঙ্গামায় পড়ে—তিনটে মেয়েলোক অচেনা নৌকোয় ছেড়ে দেয় কেমন করে? ধ্রুবর ধমকানিতে সক্রোধে চোখ তুলে তাকাল একবার, ভাল-মন্দ জবাব দিল না। মাইনে-করা মাল্লা নাকি তোমার! বাহাদ্রি করে যেমন ডিঙি নিয়ে পড়েছিলে, মরো একলা বোঠে মেরে। রাইচরণকে ডাকো কেন এখন? বয়ে গেছে রাইচরণের!

তা ধ্রুবও পরোয়া করে না। পাকা মাঝি রীতিমতো। সাঁ সাঁ করে ডিঙি ছ্টিয়ে নিয়ে চলল। মীনাক্ষীর লজ্জা-লজ্জা করে। হাতের কাছে বোঠে—তুলে ধরল একটু উঁচু করে। বোঠের মাথা হঠাৎ জলে ফেলে ঝপ্পাস করে দিল টান। টানের পর টান—ঠিক একেবারে মাল্লা মান্ষের মতো।

ধ্রুব হাঁ-হাঁ করে ওঠে : রেখে দিন আপনি—

হচ্ছে না ব্ঝি?

ধ্রুব হেসে বলে, হয় নি এখনো। হতে পারে যে কোন ম্হ্র্তে। ডাঙা-অঞ্চলের মান্ষ বোঠে ধরা শিখবেন কোথা? টাল সামলাতে পারবেন না, জলে পড়ে যাবেন।

রাইচরণের একটু আগের কথাগ্লোই মীনাক্ষীর ঠোঁটের আগায় এসে পড়ে : তুমি কে বলো দিকি, তোমার এত দায়টা কিসের?

আরও বলতে ইচ্ছে করে, তোমায় ভরসা করে বেরিয়েছিলাম নাকি? যা হবার হত—চরের উপর থেকে কুমিরে ম্খে করে নিয়ে যেত। তুমি কি জন্য ডিঙি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে?

মনে মনে এই সমস্ত কথা—অপরিচিত মান্ষকে ম্খ ফুটে কিছ্ বলা যায় না।

বোঠে ডিঙির উপর তুলে রেখে মীনাক্ষী নিঃশব্দে বসে রইল।

লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে ধ্রুব বলে, তাহলেও ধন্যবাদ। চেষ্টা করেছেন, হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে পারেননি।

ডিঙি বাঁধের ধারে আমতলায় এসে পড়েছে। সকলে নেমে পড়ল।

রাইচরণ বলে, দিব্যি ছায়া-ছায়া জায়গা—এইখানে দাঁড়ানো যাক। গাঙ থেকে ওরা ঠাহর করতে পারবে, পানসি নিয়ে আসবে এখানে।

ধ্রুব বিরক্ত কণ্ঠে বলে, করো তাই তুমি, গাঙের ধারে দাঁড়িয়ে থাক। ঘরবাড়ি রয়েছে—মেয়েরা কেন থাকতে যাবেন? আপনারা চলে আসুন, বাড়ির ভিতর গিয়ে বসবেন।

মীনাক্ষী পা বাড়িয়েই আছে। বলে, তাই চলুন। আঁচলটায় কাদা মেখে গেছে, ধুয়ে নিতে হবে।

দীঘির পাড় ধরে চলল। রাইচরণকেও অগত্যা পিছন নিতে হয়। ঠিক যে কারণে নিজের নৌকো ছেড়ে ধ্রুবর ডিঙিতে ডাঙার উপর আসতে হয়েছে। জোরে হাঁটা ধ্রুবভানুর অভ্যাস—হারবে কেন মীনাক্ষী, সে-ও চলেছে সমানে তার সঙ্গে।

গাছপালার অন্তরাল থেকে রায়বাড়ি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সামনে এসে মীনাক্ষী থমকে দাঁড়ায়। বিশাল অট্টালিকা। দু-পাশে দুই মন্দির—কালীমন্দির আর কৃষ্ণমন্দির, প্রকাণ্ড ফটক মাঝখানে। বাড়ি ঢোকা যেন দেবমন্দিরে ঢোকা—এমনি একটা ভাব মনে আসে। যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী—আয়ান ঘোষকে ছলনার জন্য বংশীধর কৃষ্ণ লহমার মধ্যে নৃমুণ্ডমালিনী কালী হয়েছিলেন। রায়বংশের পুরুষেরা সেকালে কালী-ভজনা করতেন। মেয়েদের কৃষ্ণমন্দিরে যাতায়াত, অন্তঃপুর থেকে কৃষ্ণমন্দির অবধি পৃথক পর্দা-ঘেরা পথ—নরলোকের নজরে পড়বার সম্ভাবনা নেই।

অন্যেরাও পিছনে পিছনে এসেছেন। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ধ্রুব আহ্বান করে: আসুন—

রাইচরণ চেনে, নৌকোর মানুষ কে না চেনে বেলডাঙার রায়দের বাড়ি? সবিস্ময়ে বলে, কোথায় নিয়ে চললে? রায়বাড়ি নিয়ে ঢোকাচ্ছ যে?

ধ্রুবভানু ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ—

কাজকর্ম করো বুঝি রায়মশায়দের?

মনোরমা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করেন: রায়েদের কেউ হও নাকি বাবা?

ধ্রুব বলে, ছোটরায় চন্দ্রভানু রায় আমার বাবা।

চকিতে আর একবার দেখে নিয়ে মীনাক্ষী মুখ নিচু করে। মনোরমাও তাকিয়ে পড়লেন: ক' ভাই তোমরা? ছোট রায়মশায়ের একটি ছেলে তো কলকাতায় পড়াশুনো করে শুনেছি।

ধ্রুব মৃদু হেসে বলে, ভাই-বোন আমার কেউ নেই। আমি একা।

চোখ বড় বড় করে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রাইচরণ বলে ওঠে, ছোট রায়মশায় ডাকসাইটে মানুষ। এদেশ সেদেশ একডাকে চেনে তাঁকে। তাঁর মতন লোকের ছেলে হয়ে খালি পায়ে মালকোঁচা মেরে গাঙে গাঙে বোঠে বেয়ে বেড়াচ্ছে, আবার বলো কলকাতায় থাক তুমি!

ধ্রুব বলে, সাঁতার কাটছিলাম, তারই মধ্যে ছুটতে হল যে! গায়ে জামা পায়ে জুতো ফুলকোঁচা-দেওয়া কাপড় কখন পরি বলো।

মনোরমাকে বলে, দাঁড়ালেন কেন? আমাদেরই বাড়ি, ভিতরে গিয়ে বসবেন।

মনোরমা ঘাড় নাড়লেন: না বাবা, রাইচরণ ঠিক বলেছিল, আমতলায় গিয়ে দাঁড়ানো ভাল। নৌকোর লোক দেখতে পাবে। নয়তো সারা দেশ খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে।

ধ্রুব বলে, আমি তার ব্যবস্থা করছি। ডিঙি নিয়ে লোক যাচ্ছে, আপনাদের নৌকোয় খবর বলে আসবে।

না বাবা—

ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁরা। মীনাক্ষী আসবার বেলা যেমন, ফিরছেও তেমনি দ্রুতপায়ে। সকলের আগে আগে।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দেখে ধ্রুব তিক্তকণ্ঠে বলে, তা ছুটোছুটির কি দরকার? বুড়োমানুষ একজন আছেন, তিনি যে পেরে উঠছেন না। মুখে আহ্বান করা হয়েছে, জোর করে তো বাড়ি ঢোকাচ্ছে না কেউ। দেখে শুনে ধীরপায়ে যান।

পাষাণমূর্তির মতো ধ্রুব দাঁড়িয়ে রইল। ফটক অবধি এসে ছুটে পালানো—পরিচয় বুঝতে পেরে বাড়ি ঢুকতে ঘৃণা? নীহারনলিনীর ব্যাপারটা নিশ্চয় সোনাছড়ি বন্দর অবধি চলে গেছে, কোনখানে লোকের জানতে বাকি নেই।

অপমানে জ্বলছে ধ্রুব। সে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল হি-হি করে হাসতে হাসতে রাইচরণও যখন ফিরে চলল। মাঝির কথাই বহাল রইল শেষ পর্যন্ত, সে জিতল। নতুন টাকা হয়েছে লালমোহন মিত্তিরের—বাড়ির মেয়ে দেমাকে ফেটে মরে, মাঝিমাল্লা অবধি দেমাক করে দাঁত দেখিয়ে হাসতে হাসতে যায়।

॥ নয় ॥

দুই নদীর মোহানার উপর পর পর দুটো প্রশস্ত বাঁধ। ভিতর-বাঁধের গায়ে কাছারিবাড়ি। ছাদের উপরে চন্দ্রভানু শখ করে কয়েকটি নতুন ঘর তুলেছেন। একদিকে বাদার জঙ্গল, আর একদিক ফাঁকা—অনেক অনেক দূর, প্রায় সমুদ্র অবধি নজর চলে। মোটা গুঁড়ি ফেলে নদীর উপর কাছারির ঘাট বাঁধানো।

চন্দ্রভানুর নীলবোট ঘাটে এসে লাগল। নামতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান। দৃষ্টি ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখেন। আর্তনাদের মতো স্বর বেরুল কণ্ঠ দিয়ে: না, নামব না, চারিদিক ঘুরে দেখে তারপরে আমি কাছারি ঢুকব।

রওনা হবার দিনও ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটেছিল।

মাঝি অবাক। দুপুর গড়িয়ে বিকাল—পেটে দানা পড়েনি কারো। গোন পেয়ে শেষরাত থেকে অবিরত বেয়েছে। তিলেকের তরে চন্দ্রভানু থামতে দেননি। এক বন্দর-জায়গায় নেয়েরা রান্নাবান্না করতে চেয়েছিল—বললেন, পথেঘাটে হাঙ্গামায় কাজ নেই। কাছারিবাড়ি উঠেই রাঁধা-ভাত খাওয়াবো খানপাঁচেক তরকারি দিয়ে। এই কথা রইল।

বিনা বিশ্রামে প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে এত তাড়াতাড়ি পেঁছে দিল। শরীর ঝিমঝিম করছে ক্ষিধেয়। চন্দ্রভানু নিজেও জলস্পর্শ করেননি। নামতে গিয়ে কোন বাধা ঘটে গেল হঠাৎ—মাঝিমাল্লাদের সর্বক্ষণ জলে বাস, তারা কিছু জানল না বুঝল না—চন্দ্রভানু কী যেন দেখতে পেলেন জলের উপর, ভয়ঙ্কর কথাবার্তা শুনলেন জলের কলধ্বনিতে। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে এই অবেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর হুকুম: নামব না, চারিদিক দেখে আসি আগে।

সে দেখা বোটের উপরে থেকে হল না, নেমে পড়লেন তিনি এক সময়ে বাঁধের উপরে।

নিচু হয়ে, কখনো প্রায় মাটিতে শুয়ে পরখ করেন ফাটলের ক্ষীণতম রেখা আছে কিনা কোনখানে। দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেলেন। ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গল, মহিষমারি বলে জায়গাটাকে—পুরানো বাদাবনের কিছু অবশেষ। মহিষমারি কিছুতে রক্ষে করা যাচ্ছে না, বৃন্দাবন বলেছিল। শুধুমাত্র বাঁধ ভেঙেই জল নিরস্ত নয়, সরু এক খালের রেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকখানি দূরে অবধি। সবুজ বনের উপর দিয়ে ক্ষীণ উপবীতসূত্রের মতো। এখন নগণ্য চেহারা, বিস্তার এক-হাত দেড়-হাতের বেশি নয়—কিন্তু এই তল্লাটের উচ্ছৃঙ্খল সুচতুর জলকে বিশ্বাস নেই। তুচ্ছ জলরেখা কোন এক কোটালের কয়েকটা দিনের মধ্যে দুস্তর হয়ে ওঠে। দু-বছর চার-বছরে ভয়াল এক নদী—এপারে-ওপারে নজর চলা কঠিন। সেই কাণ্ড বুঝি এখানেও হতে চলেছে। ভূমির অঙ্গ থেকে সাগরচক বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটা পৃথক দ্বীপ বানাবে, পুরোপুরি নিজের কুক্ষিতে নিয়ে ফেলবে। আক্রমণ তারপরে চতুর্দিক থেকে—নিঃসীম জলের মধ্যে সামান্য এতটুকু ডাঙা কতদিন যুঝতে পারে, দেখে নেবে তখন। সেই অবস্থা খুব যে বেশি দূরে, মনে হয় না।

এর পরে চন্দ্রভানু যেন পাগল হয়ে উঠলেন। আজ এখানে, কাল সেখানে—পাগলের মতন ছুটোছুটি। নদী শান্ত করা যায় কেমন করে? ভাল ভাল লোক এনে দেখাচ্ছেন। চিরকাল যারা এই সব নদীর চালচলতি দেখে আর হাঁকডাক শুনে ভিতরের মতলব ধরে ফেলে, এক মুঠো মাটি হাতে তুলে তল্লাটের মাটির গুণাগুণ বলে দেয়—তেমনি সব অভিজ্ঞ লোক। একজনে এক এক রকম বলে, ভরসা করা যায় না। সদরে গিয়ে সেচ-বিভাগের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। সেখান থেকে কলকাতা। বিস্তর ধরাপাড়া ও খরচপত্র করে বহুদর্শী ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। ধরেছেন চন্দ্রভানু ঠিকই—চন্দ্রভানুর সন্দেহে ইঞ্জিনিয়ার সায় দিলেন: জলের গর্ভে চকের তলিয়ে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। ঠেকানো সত্যিই দুষ্কর। স্রোতের টান ঘুরিয়ে দিতে হবে কায়দাকৌশল করে। অবস্থা এমনি দাঁড় করাতে হবে—চড়া পড়বে এদিকটা, নদীর যত-কিছু ভাঙন বিপরীত কূলে গিয়ে পড়বে। আপাতত একটা কাজ করে দেখুন—ডাঙা থেকে নদীর সিকিভাগ অবধি বাঁধ দিয়ে যান। সে বাঁধ একটি দুটি নয়—একশ দেড়শ হাত অন্তর চলবে। সাগরচকের এলাকা শেষ হবে, তারও পরে খানিকটা দূর অবধি। দুটো বাঁধের মাঝে বালি জমে জমে চর পড়ে আসবে। বাঁধ অবশ্য ভাসিয়েও নিয়ে যেতে পারে। সঠিক কিছু বলা যাবে না, তবে রক্ষার উপায় একটা বটে। করে দেখুন তো ছোটরায় মশায়, কী রকমটা হয়।

সেই আয়োজন চলল। মাটি ফেলা শুরু হয়ে গেছে। ষাট-সত্তরে কী হবে, অনেক বেশি লোক লাগানোর দরকার। শ-পাঁচেক অন্তত। জলের বেগ আটকাতে স্রোতের জলের মতোই পয়সা খরচ। চলেছে সেই সব ব্যবস্থা।

এমনি সময় এক রাত্রিবেলা হঠাৎ তুমুল কাণ্ড। মহিষমারির কঠিন পুরানো বাঁধ জলের তোড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শোরগোল তুলে শত-সহস্র মুখে নদীজল ঢুকছে। মানুষও যে যেখানে ছিল, আর্তনাদ করে এসে পড়ল। জল ঠেকানোর হরেক চেষ্টা। মাটি ফেলে লাভ হচ্ছে না, যত মাটি ফেলে চক্ষের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গায়ে গায়ে বাঁশের খোঁটা পুঁতে দেদার খড় এনে জড়াচ্ছে খোঁটার গায়ে। এইবারে মাটি। সে মাটি থেকে যায়। এমনি ভাবে জলের বেগ কিছু কমল।

সারারাত্রি ও সারাদিনের পরিশ্রমে কোন রকমে জল আটকানো গেল। কিন্তু ক্ষীণ বাঁধের পরমায়ু কতক্ষণ—যখন খুশি ভাসিয়ে নিতে পারে। এত লোকের আকুতি দেখে

করুণার্দ্র হয়েই যেন বাঁধটুকু থাকতে দিয়েছে। জলরাশি রোদে চিকচিক করছে—চন্দ্রভানু ত তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেন। মনে হল, তাঁরই দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করছে অকূল হাসি বিস্তার করে।

সাগরচকের কেউ কিছু জানে না, চন্দ্রভানু রাতদুপুরে নীলবোটে গিয়ে উঠলেন। চোরের মতন পালিয়ে যাওয়া—টিলায় টিলায় সেই যে আর্তনাদ উঠেছিল, তাই বুঝি তাড়িয়ে তুলল তাঁকে। সন্ধ্যাবেলা মাঝিকে একটুমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন, চলে যাবার প্রয়োজন হতে পারে। তৈরি হয়ে বোটের মধ্যে তারা বসে আছে। প্রবল টান—কুটোগাছটি ফেললে বুঝি দুখানা হয়ে যাবে। টানের মুখে পড়ে বোট হু-হু করে ছুটতে লাগল।

ভরা পূর্ণিমা সেদিন, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। চন্দ্রভানু বোটের ছাদের উপর উঠে বসলেন, ছাদ থেকে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে চরের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন সম্বিত নেই। অনেকক্ষণ পরে অস্পষ্ট আদেশ বেরুল: সোনাছড়ি বন্দর—

সোনাছড়ি দেখতে দেখতে জেঁকে উঠেছে। অঞ্চল জুড়ে লালমোহন মিত্তিরের খটি, তার যাবতীয় বন্দোবস্ত সোনাছড়ির গদি থেকে। খটির হেড-অফিস।

গদিরই লাগোয়া লালমোহনের নতুন বাড়ি। খবর গেল। কানে শুনে লালমোহনের বিশ্বাস হয় না, ছোটরায় চন্দ্রভানু ঘাটে এসে বোট বেঁধেছেন—নিজে চলে এসেছেন দেখা করার জন্য, খবর পাঠিয়ে ছোটরায় অপেক্ষা করছেন। দেখ তো আজ সকালে আকাশের সূর্য কোনদিকে উঠেছে—পুবে অথবা পশ্চিমে?

হন্তদন্ত হয়ে লালমোহন ঘাটে ছুটে গেলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন, কি আদেশ?

আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি। আপনার সঙ্গেই বৈবাহিক সম্পর্ক হবে, তার ব্যবস্থা করতে এসেছি।

কিসে কি হল, লালমোহন বুঝতে পারেন না। মত হঠাৎ ঘুরে গেল কিসে?

চন্দ্রভানু নিজেই ক্রমশ প্রকাশ করে বলছেন, আপনার কন্যা আমার কুললক্ষ্মী হবে। কিন্তু বরপণ লাগবে, আমাদের রায়বাড়ির যা রেওয়াজ—

লালমোহন কৃতার্থ হয়ে বলেন, নিশ্চয় দেবো। তখনই তো বলেছিলাম। আমার ঐ এক মেয়ে। সাধ মিটিয়ে সাজিয়ে দেব।

চন্দ্রভানু বললেন, আজামোজা কথায় কাজ এগোবে না মিত্তিরমশায়। কথাবার্তা শেষ করে যাব বলে নিজে চলে এসেছি। দাবিটা আমি না হয় খোলাখুলি টাকার অঙ্কে বলি—

নতুন নতুন বাঁধ বাঁধা এবং নতুন খাল কেটে স্রোতের গতি ঘোরানো—সমস্ত ব্যাপারের মোটামুটি একটা হিসাব তৈরি হয়েছে। চন্দ্রভানু নিজের সঙ্গতিতে খানিকটা পারবেন। বাকি অঙ্কটা বলে দিলেন। শিহরণ লাগে লালমোহনের, উৎসাহ চুপসে আসে।

মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে চন্দ্রভানু বললেন, ব্যবসাদার মানুষ—লাভ-লোকসান মনে মনে খতিয়ে দেখছেন। দামটা বুঝি বেশি বলে ঠেকছে?

লালমোহন তাড়াতাড়ি বলেন, তা নয়। দেশ থেকে বাড়ির সবাই এসে গেছেন। আমার মা রয়েছেন। সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার—

শেষ করতে না দিয়ে চন্দ্রভানু আগের প্রসঙ্গ ধরেই বলে যাচ্ছেন, বাইরে থেকে এসে

অঢেল টাকা করেছেন, এবারে প্রতিষ্ঠা চান অঞ্চলের মধ্যে। রায়বাড়ির সঙ্গে কুটুম্বিতা করবেন। এর জন্য খরচ কিছু বেশিই হবে। চিংড়ি-খটির হিসাব ধরে তুলনা করতে যাবেন না।

কথায় গা পচে যায় না, অপমানের কথা লালমোহন গায়ে মাখেন না। মিনমিন করে বললেন, খটির হিসাবের কি তুলনা করব রায়মশায়। যদি কিছু করতে হয় সে আমার সঙ্গতির হিসাব।

হাঁক দিয়ে তৎক্ষণাৎ মাঝিকে ডেকে চন্দ্রভানু বললেন, তোমার দাঁড়িরা সব নেমে গেল বুঝি? ছুটে গিয়ে ডেকে আনো, রওনা হতে হবে।

রওনা হবেন কেন? জবাব আমি দিইনি তো এখনো—

হতভম্ব হয়ে গেছেন লালমোহন, হেসে ব্যাপারটা লঘু করতে চান। বললেন, কন্যাদায় মাথার উপর—এ সময় নিজের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি অন্যের কাছে নিতে হয়। আমি নেই কথাটাই বলেছি রায়মশায়।

আমারও মাথায় মস্তবড় দায়। কন্যাদায়ের চেয়ে ঢের ঢের বড়। বেশ কথা, গোনের ঘন্টা দুই-তিন বাকি এখনো। গুন টেনে উজান ঠেলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। কাজ নেই, রইলাম এখানে জোয়ার অবধি। শলাপরামর্শ যা-কিছু এই সময়ের মধ্যে সেরে আসুন গে।

লালমোহন করজোড়ে বলেন, এখানে জলের উপর কেন থাকতে যাবেন? ঘাটের উপরেই কুঁড়েঘর আমার, ঘরে এসে বসুন। মেয়ে দেখাটাও হয়ে যাবে।

চন্দ্রভানু ঘাড় নেড়ে অবলীলাক্রমে বলেন, দরকার নেই। আপনার মেয়ে রূপবতী—সে তো বলেছিলেন আমার বাড়িতে বসে। হয় যদি, আমার সেটা উপরি লাভ। কিন্তু আপনার কোন লাভ নেই। বরপণ তার জন্য কমবে না। রূপ নিয়ে রায়-বাড়ির মাথাব্যথা নেই। রায়বাড়ির কনে দেখা হয় কথাবার্তা পাকা করে একেবারে কনে-আশীর্বাদের দিনে। পাত্র বউ দেখতে পায় শুভদৃষ্টির সময়। কুশ্রী হলেই বরঞ্চ আমাদের বেশি পছন্দ—রূপের দাপ থাকে না। সংসার নিয়ে পড়ে থাকে সেই বউ, অসুরের মতো খেটে যায়।

কিছু কড়া হয়ে বললেন, আপ্যায়নে আপনি কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করছেন মিত্তিরমশায়। জোয়ারের প্রথম মুখে বোট আমি ছাড়বই।—তার মধ্যে জবাব না পেলে ধরে নেবো আপত্তি রয়েছে। সম্বন্ধ আরও কয়েকটা আছে, কোন একটা পাকা-পাকি করে তবে ফিরে যাব।

চন্দ্রভানু বোটেই রয়ে গেলেন। লালমোহনকে দিশা করতে দেন না, তাড়িয়ে তুললেন বাড়ির মধ্যে। চন্দ্রভানুর আসার খবর ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গেছে। কি প্রস্তাব নিয়ে উপযাচক হয়ে চলে এসেছেন, শোনবার জন্য বাড়িসুদ্ধ উন্মুখ। ডাকতে হল না কাউকে। এমন কি ভক্তদাসও এসে বাড়ির লোকের মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

লালমোহন রাগে গরগর করছেন: দেবো না বিয়ে। টাকার জন্যে সম্বন্ধ করতে এসেছে। টাকায় পুষিয়ে দিলে মেয়ের বদলে একটা মেটেকলসি কি একটা পাশবালিশ কনে-পিঁড়িতে বসিয়ে সাতপাক ঘোরালেও বোধহয় আপত্তি করবে না।

লালমোহনের মা গিন্নিঠাকরুন বলেন, মেয়ে তোমার এই একটি বই নয়। দিলেই না হয় টাকা। টাকা হয়েছে, এই জন্যেই বলি। দাদাভাইরা সমস্ত কিছু পাবে কেন, দিদি কি আমার ফেলনা? দিদি আমার গাঙের জলে ভেসে এসেছে?

সেকথা আমিই ছোটরায়কে আগে বলেছি। তাই বলে বেহিসাবি একটা চাইবে?

হিসাবের কথা উঠলে ভক্তদাসের এলাকার মধ্যে পড়ে। সে বলে ওঠে: বিয়ে দেবেন না দেবেন আলাদা কথা। বিবেচনা করে দেখুন, হিসাব কিন্তু বেঠিক নয়। যতগুলো খটি, সব জায়গায় চারটে পাঁচটা করে পাহারাদার। শুধু মাইনে আর বারবরদারি বাবদ কত পড়ে খতিয়ে দেখুন। এক বছর দু-বছরের ব্যাপার, তারপরে চুকেবুকে গেল—সে জিনিসও নয়। ঐ পাহারা চিরকাল ধরে চলবে। তারও উপরে পুলিশের তদ্বির রয়েছে। বিয়ে যদি হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সব রকমের পাহারা বাতিল। ছোটরায়ের বেহাইয়ের জিনিস—ভূতেও তাকিয়ে দেখবে না।

একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, আবার উল্টো-দিকেও আছে। ছোটরায় নিজে এসেছেন—এই অবস্থায় সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে আমাদের আর রক্ষে রাখবে না। রাগলে রায়েরা আর মানুষ থাকে না, বাদার বাঘের মতো ভয়ংকর। আমাদের তখন পাত্তাড়ি গুটিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। পুলিশ সর্বক্ষণ মোতায়েন রেখেও সামলানো যাবে না।

সবিস্তারে এত সব শোনার পরেও মনোরমা বিরূপ। তিক্তকণ্ঠে বলেন, মানুষ ওরা এমনিতেও নয়। কেবল ব্যাপারবাণিজ্যই ভাবছেন ম্যানেজারমশায়, মেয়ের দিকটা দেখবেন না? আমি আরও অনেক খোঁজ নিয়েছি। রায়বাড়ির বউয়ের সুখ হয় না, পুরুষরা বেয়াড়া। আধবুড়ো ঐ ছোটরায়েরই কাণ্ড দেখুন না। স্ত্রী পক্ষাঘাতে বিছানায় পড়ে—তাকে দেখাশুনো করা চুলোয় যাক, উল্টে কোথেকে একটা ঘরে এনে জুটিয়ে কেলেংকারি ঘটাল।

বাড়ির গিন্নির কড়া মন্তব্যে ভক্তদাসের সুর অমনি সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায়: তা বটে, তা বটে। সাতপাকের বিয়ে চৌদ্দবার উল্টোপাক দিয়েও খসানো যায় না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকল দিক দেখতে হবে বইকি। বলছেন খাঁটি কথা। রায়বাড়ি আর দশটা গৃহস্থালির মতন নয়। ধরন-ধারণ একেবারে আলাদা। লোকে বলে সুন্দরবনের বাঘ মরে গিয়ে রায়দের ঘরে জন্ম নেয়। বিশ্বাসও হয় সেকথা। তা দেখুন ভেবে। মেয়ের বিয়ে যখন, ভাবতে হবে বইকি।

বিষম সমস্যা। তবে একথাও ঠিক একালের রায়বাড়ি বদলে যাচ্ছে। অনেক বদলেছে, আরও বদলাবে, আরও বদলাবে। জোলো-ডাকাত জলে জলে বেড়াত—ভূমিলগ্ন হয়ে চকদার হয়েছে এখন। তার উপরে পাত্র শহরে থেকে পাশের পর পাশ দিচ্ছে—সে কি আর বাপ-পিতামহের পথ নেবে!

জোয়ারের আরও কিছু দেরি, অতএব পরামর্শ লম্বা হতে বাধা নেই। বুড়োমানুষ গিন্নিঠাকরুন বেশিক্ষণ বসতে পারেন না, নিজের ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

শাড়ি খস খস করে অন্ধকারে মীনাক্ষী এসে পায়ের কাছে বসল।

গিন্নিঠাকরুন বলেন, কি দিদি?

মীনাক্ষী বলে, পূর্ণিমায় বাতের অসুখ বেড়েছে তোমার। হাত-পা কামড়াচ্ছে। তাই একটুখানি টিপে দিতে এলাম ঠাকুরমা।

কে বলেছে তোকে! কিছু হয়নি আমার। যা তুই, কষ্ট করতে হবে না। আমি ঘুমোই।

মীনাক্ষী জেদ করে বলে, ফী অমাবস্যা পূর্ণিমায় তো বাত বাড়ে, হাত-পা কামড়ায়। না বললেই শুনব? তোমার ঘুম ধরেছে ঠাকুরমা, তা বলে একটুখানি টিপে দিলে বুঝি দোষ?

ঠাকুরমা বলেন, এতক্ষণে ছিলি কোথায় দিদি? কথাবার্তা সব শুনেছিস?

বয়ে গেছে আমার। ঝঙ্কার দিয়ে উঠে মীনাক্ষী পা টিপতে লেগে যায়। ক্ষণপরে বলে, অনেক টাকা চাইছে বুঝি? তা ঠাকুরমা নাতনীটি তোমার কেমন তা-ও তো দেখতে হবে। টাকার লোভে নিতে চাচ্ছে—বিনি টাকায় কে ঘরে নেবে বলো।

ঠাকুরমা চটে গিয়ে বলেন, টাকা দেবার কথা আমিও বলেছি তোর বাপকে। তার জন্যে মিছিমিছি তুই আমার নাতনির নিন্দে করবিনে। মানা করে দিচ্ছি। ঠিক যে টাকার জন্যে আটকাচ্ছে, তা-ও নয় ও-বাড়ির পুরুষগুলো বদ—বাদাবনের বাঘ মরে মরে ঐসব পুরুষ হয়েছে, ম্যানেজার বলছিল। বড় ভয়ানক।

মীনাক্ষী এবারে জেদ ধরে বলে, সেই জন্যেই আরও তো যেতে চাই ওবাড়ি—

কেন রে?

বিড়াল পুষে বশ করে সবাই। বাঘ বশ করায় বাহাদুরি। ডাঙাঅঞ্চলের মানুষ বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ওরা। সেই ডাঙার মানুষের ক্ষমতা একবার দেখিয়ে দিতে চাই।

এমনি সময় চটিজুতার শব্দ বাইরে। পরামর্শ শেষ করে লালমোহন চলেছেন। গিন্নিঠাকরুন ছেলেকে ডাকছেন: ও লালু, শোন। কি ঠিক করলে তোমরা? কি বলতে যাচ্ছ? আমাদের কথাটাও তো শুনে নেবে।

মীনাক্ষী আর নেই। ফুড়ুত করে যেন পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে।

॥ দশ ॥

সোনাছড়িতে কথাবার্তা পাকা হল তো চন্দ্রভানু ঐ পথে অমনি সদরে চলে গেলেন। বিয়ের কেনাকাটা কিছু আছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হল—নদীর সঙ্গে এবার পুরোপুরি লড়াইয়ে নামা, তারই উদ্যোগ-আয়োজন। বিশেষজ্ঞ চলে যাবেন সাগরচকে, দেখেশুনে নক্সা বানাবেন। যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম আমদানি হবে বাইরে থেকে।

এইসব ব্যবস্থায় দিন দশেক কেটে গেল। সদর থেকে তারপর চন্দ্রভানু বেলডাঙা চলে এলেন।

ইন্দুমতীর আরও খারাপ অবস্থা। হাতখানাও উঁচু করে তুলতে পারেন না এখন। কিন্তু চোখে আগুন। একবার নীহারনলিনী আর একবার স্বামীর দিকে চেয়ে.আগুন-ভরা চোখে তিনি মুচকি হাসলেন: অসময়ে হঠাৎ? চকে মন টিঁকল না বুঝি?

স্ত্রীর আপ্যায়নে সর্বঅঙ্গ রি রি করে জ্বলে। মুখের ভিতর বিষের থলি সাপের মতো—সর্ব অঙ্গ গিয়ে মুখটাই বজায় রয়ে গেছে বিষ ছড়ানোর জন্যে। কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হয় না, অবসন্ন কণ্ঠে চন্দ্রভানু বললেন, আসতে হল ছোটবউ তোমারই সংসারের জন্যে। ধ্রুবর বউ ছাড়া অন্য কারো আঁচলে তুমি যে চাবি দিতে নারাজ। নতুন-বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে দায়ভার দিতে সময় লাগবে। বিয়ে পাকাপাকি করে এলাম। কলকাতায় ধ্রুবর কাছেও জরুরি খবর দিয়ে পাঠিয়েছি। এখনো সে এসে পৌঁছয়নি—কাল-পরশুর মধ্যে ঠিক এসে পড়বে। শুভকর্ম মিটিয়ে দিয়ে একনাগাড় এবার থেকে চকে গিয়ে থাকব। রায়বাড়িতে কখনো আর দেখতে পাবে না, চিরবিদায় নিয়ে যাব। অতঃপর চন্দ্রভানু আর স্ত্রীর ছায়া মাড়ায় না, দোতলার সিঁড়িতেই পা ছোঁয়ান না একেবারে। ইন্দুমতী যা বললেন তেমনি সন্দেহ না-জানি আরও কতজনের মনে ঘুরছে। এই নিয়ে কথা উঠবার সুযোগ দেবেন না আর।

বৈঠকখানায় চন্দ্রভানুর দিনরাতের আস্তানা।

প্রকাণ্ড হল, অতিকায় থাম সারি সারি। সেইখানে ফরাসের উপর বসে নিজের ডানহাত চিতিয়ে চোখের সামনে ধরে চুপচাপ বসে দেখেন। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না। কেউ এসে পড়লে দু-কথায় বিদায় করে বাঁচেন। হাতের হিজিবিজি রেখাজালের মধ্যে যেন সাগরচকের গোটা অঞ্চল নিয়ে মানচিত্র। কোথাও নদী কোথাও খাল কোথাও টিলা কোথাও বা ক্ষেত। কত ছুটোছুটি করেছেন এদের উপর দিয়ে—সমস্ত যৌবন কেটে গেছে। জীবনের অপরাহ্নে এসে নদী-খাল বিদ্রোহী—দু-পুরুষ ধরে সাজানো এমন সাগরচক টেনে জলতলে নামিয়ে নিয়ে নিচিহ্ন করবে, তারই ষড়যন্ত্র চলছে।

গড়গড়া দিয়ে গেল। কলকাতা থেকে কিছুক্ষণ আগে ধ্রুব এসে গেছে, খবর পেয়েছেন। বুঝি মায়ের ঘরেই সে এখন। মেলানো হাত মুঠি হল—মুঠিতে নল ধরে চন্দ্রভানু গড়গড়া টানছেন। চোখ বুঁজে আসে—বোধহয় চিন্তায়। হয়তো বা আরামে। অনেকক্ষণ কাটাল।

পায়ের শব্দে চোখ মেলেন: ধ্রুব?

আমি নকড়ি। চক থেকে একদল প্রজা এসেছে, খুব নাকি জরুরি দরকার আপনার কাছে।

চন্দ্রভানু ভ্রুকুটি করলেন: রায়বাড়ি কোনদিন কোন প্রজা আসে না। আসবার কথাও নয়। কত জায়গায় আমার তো ছুটোছুটি—আমি যে বাড়ি এসে উঠেছি, সেটা ওরা জানল কি করে?

খোঁজে খোঁজে এসে পড়েছে। সদরেও গিয়েছিল। না দেখা হলে উপায় নেই, বলেছে।

এদেশ-সেদেশ আসামি খুঁজতে বেরিয়েছে—খুঁজে পেলো অবশেষে। চন্দ্রভানু মনে মনে জ্বলছেন। রায়বাড়ির বিশাল পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজন চাষবাস করে চিরকাল তারা জুগিয়ে এসেছে। বিপদের মুখে রাত্রিবেলা অকস্মাৎ চক ছেড়ে পালিয়ে আসা—পলাতক আসামি ছাড়া অন্য কি ভাবতে পারে?

থমথমে মুখ দেখে নকড়ি কথা বলবার সাহস পায় না। ক্ষণকাল চুপ করে থাকে। মৃদুকণ্ঠে তারপর বলল, ঘণ্টাঘরের নিচে সব দাঁড়িয়ে আছে।

কী করতে হবে আমায় বলো। পাদ্যঅর্ঘ্য নিয়ে ছুটব? ধাপে ধাপে গলা চড়ছে চন্দ্রভানুর: প্রজা এসেছে—তাই নিয়েও যদি আমায় উত্যক্ত করবে, তোমরা আছ কি জন্যে?

নকড়ি হাত কচলে বলে, খাজনা নেবার ক্ষমতাই আমাদের। যদি খাজনা দিতে আসত, নিয়ে নিতাম। আপনা অবধি খবর দেবার কারণ হত না।

তাদেরও রায়বাড়ি অন্য কাজ নেই ঐ খাজনা দেওয়া ছাড়া। থাকতে পারে না। বাকি-যা কিছু রায়েরা নিজে থেকে করে আসছে। বাতলে দিতে হয় না।

নকড়ি বলে, বরাবর হয়ে আসছে তো তাই। এবারেই উল্টো-পাল্টা দেখি। হাতে করে লিখিত দরখাস্ত নিয়ে এসেছে।

জবাব দিলেন না চন্দ্রভানু। গড়গড়া টেনে যাচ্ছেন। কাচুমাচু মুখ করে নকড়ি দাঁড়িয়ে। লম্বা একফর্দ বালির কাগজ ঈষৎ নাড়াচাড়া করছে।

মুখ থেকে নল সরিয়ে চন্দ্রভানু বললেন, পড়ো একটু—কি লিখেছে, শোনা যাক।

পড়ে যায় নকড়ি: মহিমার্ণব হুজুর বিশাল বটবৃক্ষ-স্বরূপ। আমরা যাবতীয়

সন্তানসন্ততিগণ সুশীতল ছায়ায় পরম শান্তিতে বসবাস করিতেছিলাম —

চন্দ্রভানু হো-হো করে হেসে উঠলেন : খাসা লিখেছে হে ! বটবৃক্ষের উপমা —ঝড়ঝাপটা যত আসুক, বটবৃক্ষকে কাবু করা যায় না। ইস্কুল বসিয়ে কাজ হয়েছে তবে ? মুশাবিদা হেডমাস্টারের বোধহয়—ছেলেপুলে নেই, কাজকর্ম খুঁজে পায় না, বসে বসে দরখাস্ত লিখেছে ! মোদ্দা কথাটা কি নকড়ি—নিরবধি বাঁধ ভাঙছে, এই তো ?

নকড়ি বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। চকের দক্ষিণ অংশে লবণাক্ত জলের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—

গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে চন্দ্রভানু ঘন ঘন টানতে লাগলেন। অর্থাৎ যা শোনবার হয়ে গেছে, আর শুনতে চান না। একটা-কিছু জবাব না পেয়ে নকড়িও চলে যেতে পারে না। চুপচাপ আছে।

ধ্রুব কখন এসে দাঁড়িয়েছে পিছন দিকে। বলে উঠল, তারা দেখা করতে চায় বাবা। মুখে তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে বলবে।

মুখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রভানু বলেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়। বলেছেও যা বলবার ?

হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়ে ধ্রুব : কিন্তু আমায় বলে কি হবে ? প্রতিকার তো আমার হাতে নেই।

আছে। তোমারই হাতে সব। বোসো তুমি, জরুরি কথাবার্তা আছে। তোমার হস্টেল অবধি সেইজন্য লোক পাঠিয়েছিলাম।

নকড়ির দিকে চেয়ে বললেন, রাত্রে দেখা হবে না। মণ্ডপবাড়ি চলে যাক ওরা। বেরিয়ে গেলে দারোয়ানকে দেউড়ি বন্ধ করতে বোলো। রাত্রে কি জন্যে ফটক খোলা থাকে, কাল ঐ দারোয়ানদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব হবে।

নকড়ি চলে গেলে চন্দ্রভানু আরও কিছুক্ষণ ধূম উদ্গীরণ করলেন। টিক-টিক করে দেয়াল-ঘড়িতে সময় যাচ্ছে। মুখ তুলে হঠাৎ বললেন, তোমার বিয়ে সাব্যস্ত করে এসেছি ধ্রুব। লালমোহন মিত্তিরের মেয়ে। কাল ওরা আশীর্বাদ করতে আসবে। দশ দিন পরে আঠাশে তারিখ বিয়ে।

ধ্রুব নিরুত্তর।

একটু যেন কৈফিয়তের ভাবে চন্দ্রভানু বলেন, উপায় কি বলো। এর পরেই অকাল পড়ে যাচ্ছে। এক মেয়ে তাদের, অদিনে-অক্ষণে দেবে না। তিন মাস তাহলে বসে থাকতে হয়। তারা পারলেও আমি পারব না।

ধ্রুবভানু যেন পাথর হয়ে গেছে। বলে, জরুরি ডাক পেয়ে মায়ের কথাই মনে হল আমার। পরীক্ষার মুখ—পড়াশুনো ছেড়ে তবু ছুটে এসেছি।

চন্দ্রভানু বলেন, আজকেও না এসে পৌঁছলে আমি নিজে চলে যেতাম। দিনক্ষণ পাকাপাকি করে দশের মুকাবেলা লগ্নপত্র করে এসেছি। মায়ের অসুখের চেয়ে সেটা বেশি জরুরি।

ধ্রুব বলে, আমার পরীক্ষা যে ঠিক ঐ সময়টা। দিন নেই রাত নেই জীবন-পণ করে খাটছি।

পরীক্ষা বাতিল।

বাপের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ধ্রুব নিশব্দে উঠে পড়ল।

চন্দ্রভানু বললেন, কিছু বলে গেলে না ?

আমার মতামত জানতে চাও বাবা ?

অমত নয়। সুশীল সুবাধ্য ছেলের মতন ঘাড় নেড়ে হাঁ বলে যাবে, এইটে চাচ্ছি। এ-বাড়িতে বরাবর যা হয়ে এসেছে। আমিও যেমন একদিন আমার বাবার কাছে হাঁ দিয়েছিলাম।

কিন্তু চন্দ্রভানুর কৈশোরের সে দিনকাল বদলে গেছে। আলাদা রায়বাড়ি এখন। আলাদা সব মানুষ।

বাপের কথার জবাবে ধ্রুবভানু বলে, যদি না পারি?

পারলে ভাল ছিল। তুমি মনের খুশিতে থাকতে পারতে, আমিও হাসিমুখে কাজে নামতাম।

একটু থেমে কঠিন কণ্ঠে বললেন, তোমার অমতে কাজের অবশ্য ইতরবিশেষ হবে না। লালমোহন মিত্তির আশীর্বাদ করে যাবে, আঠাশে তারিখ ঢোল-শানাই বাজিয়ে সোনাছড়ি বন্দরে গিয়ে তুমিও ঠিক বরাসনে বসবে।

নকড়িকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল এমনি সময়।

আবার কি নকড়ি?

মণ্ডপবাড়ি তালাবন্ধ। মহাদেব দারোয়ান বলল, চাবি আপনার কাছে।

তাই বোধহয় হবে। চন্দ্রভানুর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। হাসতে হাসতে বলেন, পুজোর পর মহাদেব দেশে যাচ্ছিল, মণ্ডপবাড়ির চাবি দিয়ে গিয়েছিল বটে আমায়। সে চাবি আমি ছোটবউকে দিলাম।

ধ্রুব শশব্যস্ত হয়ে বলে, মা'র কাছ থেকে নিয়ে আসি আমি।

চন্দ্রভানু সজোরে ঘাড় নেড়ে উঠলেন: না—

তা হলে ওরা থাকবে কোথায় বাবা, খাবেই বা কি?

মস্তবড় দীঘি রয়েছে—খাবে দীঘির জল। থাকবে আমতলায়।

ছেলেকে ঠেশ দিয়ে বলছেন, কলকাতার তেতলা ঘরে থাকা অভ্যাস নেই—ওরা বেশ পারবে। নোনাঅঞ্চলের মানুষের মুখে অমৃতের মতো লাগবে আমাদের দীঘির জল। উতলা হোয়ো না তুমি, রোগামানুষ ছোটবউকে চাবির জন্য রাত্রিবেলা বিব্রত করব না।

নকড়ির দিকে ফিরে তিক্তস্বরে বললেন, তুমি আজকের মানুষ নও নকড়ি। ব্যাপার কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বুঝে দেখ। চরের মানুষদের ভাসিয়ে দিয়ে আমি যেন আরাম করে রায়বাড়ির অট্টালিকায় বসে আছি! এতদূর অবিশ্বাস করছে আজ, রায়েদের এত আলাদা করে দেখছে। দল বেঁধে দরখাস্ত নিয়ে চকের কথা মনে করিয়ে দিতে এলো। রায়বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে উঠানের উপর রাত্রিবেলা জমায়েত হয়ে দাঁড়াল।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলেন, বাইরে যেমন, ঘরের ব্যাপারেও অবিকল তাই। বাড়ির কর্তা ছেলের বাপ, আমি বিয়ে ঠিক করে এসেছি, তা নিয়েও কথা কাটাকাটি। বিয়ে করবে, তার জন্যে নাকি মতামতের দরকার। কী হয়ে গেছে সব, কী ভেবেছে বলো দিকি! সাগরচক যেন আমার নয়! ছেলে যেন আমার নয়! নদীগুলো যা করছে, এ-ও তাই—বাঁধ ভাঙারই ব্যাপার। কোনদিকে কোন বাঁধই আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না নকড়ি।

কলকে বদলে দিয়ে গেছে, গুম হয়ে চন্দ্রভানু তামাক টানতে লাগলেন। নকড়ি চলে যাচ্ছিল—চন্দ্রভানু বললেন, কাল সকালবেলা ফটক খোলার পরেও সাগরচকের একটি প্রাণী উঠানের ত্রি-সীমানায় যেন ঢুকতে না পারে। দারোয়ানকে ভাল করে বুঝিয়ে দিও নকড়ি। আর বাড়ির ভিতরের কেউ যদি বেরুতে যায়, তাকেও বেরুতে

দেবে না আমার হুকুম ছাড়া।

নকড়ির মুখে কথা সরে না। চন্দ্রভানু আরও স্পষ্ট করে বললেন, ধ্রুবের কথাই বলছি। কাল পাত্র-আশীর্বাদ—আশীর্বাদ শেষ হবার আগে ধ্রুবর রায়বাড়ি থেকে বেরুনোর দরকার নেই।

ধ্রুবভানুর হাসিমুখ। হেসে বলে, আটক করলে বাবা?

চন্দ্রভানু ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন: অন্যায়ের সাজা পাবে বইকি। চকের মানুষদের গাছতলায় রেখে সাজা হল, তোমায় ঘরে আবদ্ধ করে। তালা দিয়ে আটকাবে, যদি প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ঘরে আটক করেই কি ঠেকাতে পারবেন? ঠেকানো যায় না।

চন্দ্রভানু বলেন: কী জানি, আমি তো বরাবর এই করে এসেছি—আমাদের এই নিয়ম। বাঁধ আটকে জল ঠেকিয়েছি, দরজা আটকে মানুষ। বাঁধে এখন আর বাগ মানছে না, মানুষই বা কী করে দেখা যাক।

অনেক—অনেক রাত্রি। রায়বাড়ি একেবারে নিশুতি। চন্দ্রভানু ছেলের ঘরের দরজায় নাড়া দিলেন। খিল আঁটা নেই, দরজা হাঁ হয়ে পড়ল। ঘুমোয়নি ধ্রুব। বই একটা পড়ে আছে সামনে, কিন্তু পড়ছে না। বাপকে দেখে চকিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

চন্দ্রভানু হেসে ওঠেন। ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বলিত সরল হাসি। এই নিশিরাত্রে বাইরের কেউ নেই, ইজ্জতের প্রশ্নও নেই। বাপ আর ছেলে—একেবারে ভিন্ন মানুষ বাপ এখন।

বড্ড রাগ হয়েছে—না-রে আমার স্বভাবটা হুবহু পেয়ে গেছ তুমি। বিয়ের সময় আমিও ঠিক এই করেছিলাম।

পাশে বসে পড়লেন। হাসিমুখে ছেলের গায়ে হাত রাখলেন। ধ্রুবর সর্বদেহ কঠিন—বুঝি বা রক্ত-মাংসের নয়। বুঝি নিশ্বাসও পড়ে না। ইস্পাতে-গড়া অচঞ্চল কঠিন মূর্তি একটা।

চন্দ্রভানু আবার হাসলেন। ছেলের মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে বললেন, তোমায় কি দোষ দেবো—আমারও ঠিক এই ব্যাপার। কে এসে কানে কানে তোমার মায়ের খবর বলল, কনের একটা চোখ নেই। ক্ষেপে গিয়ে বাড়ির মধ্যে রাগারাগি করছি: কানা মেয়ে বিয়ে করব?

আবার খবর পেলাম, একটা চোখের বদলে এক হাজার টাকা বেশি ধরে দিচ্ছেন কনের বাপ—আমার শ্বশুরমশায়। সে টাকা ওই সাগরচকেরই জন্য। বন হাসিলে জলের মতন খরচা হচ্ছে—একটি হাজারের অনেক দাম তখন। বলছি, কক্ষনো বিয়ে করতে যাব না—কিছুতেই না। বাবার কানে কি করে কথাটা চলে গেল। একঘর আত্মীয়-কুটুম্বর মাঝখানে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, মতলব কি তোর? আপোসে যাবি, না কান ধরে পানসিতে তুলতে হবে? ভরসা করতে পারেন না। ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করলেন, যাত্রামঙ্গল পড়বার সময় বের হয়ে এলাম।

এবার ধ্রুব না বলে পারে না: তুমিও তো তালা আটকানোর কথা বললে বাবা।

তিনি সত্যি সত্যি আটকে রেখেছিলেন, আমি শুধু মুখে বলেছি একবার। নকড়ি পুরানো লোক, কর্তার আমলও দেখেছে। রুদ্রভানুর ছেলে হয়ে ইজ্জতের দায়ে একবার অন্তত বলতেই হবে আমায়। বলেছিলাম, এখন আবার রাতদুপুরে খোশামুদি

করতে এসেছি। এমন অবস্থা ভাবতে পারতেন সেকালের রুদ্রভানু! তবু তো বউমা আমার কানা নয় খোঁড়া নয়—শুনেছি পরম রূপবতী। আর তুমি মুখের উপরেই ফরফর করে তোমার আপত্তির কথা শুনিয়ে দিলে। দিনকাল বদলেছে, সন্দেহ কি!

সাগরচকের কথা এসে গেল। সমুদ্রজল রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে, চকের সিকিভাগ গ্রাস করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। বাসিন্দারা আর ভরসা করতে পারে না—পালিয়ে চলে এসেছি, এই ধরে নিয়েছে। বাবা আর আমি—দু-পুরুষ আমরা জীবন-পাত করে এলাম, ওরা আজ চকের বিপদ দরখাস্ত করে জানান দিতে এসেছে। রাগ হয় কি না বলো!

বলতে বলতে কণ্ঠ ভারী হল। চোখও অশ্রুসিক্ত নাকি—ম্লান দীপালোকে ঠাহর করবার জো নেই। ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে চন্দ্রভানু আবার বলেন, দলিলপত্রে মালিক যে-ই হোক, সাগরচক সকলের। সকলে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি—যত মানুষ চকে ঘরবাড়ি বানিয়ে রয়েছে, আর যত মানুষ এই রায়বাড়ির ভিতরে আছে। ওদের আর আমাদের বাপ-দাদারা একসঙ্গে জলে-জঙ্গলে হুটোপাটি করে বেড়িয়েছে। চিলেকোঠায় ঘরজোড়া জয়ঢাক ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে আছে এখনো—একদিন ছিল, ঐ ঢাকে একবার কাঠি দিলে অঞ্চল জুড়ে শতেক ঢাকে একসঙ্গে ঘা পড়ে যেত। দীঘির মাঠ জুড়ে কাতারে কাতারে মানুষ এসে জমত। জীবন দিতে কবুল—দিয়েছেও কতজনা। সেই রায়েরা এখন চকদার মানুষ, ফরসা কাপড়জামা রায়বাবুদের অঙ্গে, বাড়ির ছেলে বিদ্বান হচ্ছে—সেইজন্যে সন্দেহ ওদের। সন্দেহ একেবারে অন্যায়, তাই বা বলি কেমন করে?

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

বাঘ মরে রায়বাড়ির পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়—বাপের বাড়ি ভক্তদাসের কাছে শুনেছিল মীনাক্ষী। এখানে শ্বশুরবাড়িতেও সেই কথা।

কিরণবালা মেয়েটা বয়সে মীনাক্ষীর চেয়ে কিছু বড়। বরে নেয় না, কোথাকার অন্য এক রমণী নিয়ে আছে। সহায়হীন অবস্থা—আছে কিরণ রায়বাড়িতে, খায় দায় থাকে। নতুন-বউয়ের বড় ভাব জমল হতভাগিনী এই মেয়েটার সঙ্গে।

কিরণবালা সাবধান করে দেয়: এরা ভাই সুন্দরবনের বাঘ। বাঘ পোষ মানে না, এরাও তাই। পোষ মানাতে পারবিনে, তবে সর্বদা নজরে নজরে রাখবি—বেচাল কিছু করতে না পারে। অন্তত এই রায়বাড়ির ভিতরে। দুয়োরে ঢুকতে জোড়া-মন্দির, দু-দুজন ঠাকুর-ঠাকরুন চোখ মেলে আছেন, এবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অনাচার ঢুকলে রায়বাড়ি ধ্বসে পড়বে। সেইটে দেখিস।

ইন্দুমতীর দৃষ্টান্ত দেয়। এবাড়ির বউয়ের ঐরকম কড়া না হলে উপায় নেই। কী শোচনীয় অবস্থা তাঁর এখন! কথাও একরকম বন্ধ। মুখ দিয়ে ফ্যাসফ্যাস করে আওয়াজ বেরোয়, সে বোঝে বাড়ির মধ্যে একমাত্র নীহারনলিনী; বুঝে নিয়ে ব্যবস্থা করে। তবু প্রতাপটা দেখ সেই পঙ্গু একচক্ষু সিকিখানা মানুষটার। নীহার-নলিনীকে আটকে ফেলেছেন নিজের কাছে, সর্বদা চোখে চোখে রাখেন। আর স্বামীকে তেপান্তরের চকে সরিয়ে দিয়েছেন। চোরে কামারে সাক্ষাৎ হবার উপায় নেই। চন্দ্রভানু আসুন দেখি রায়বাড়ি নিয়মের বাইরে—বছরে দুবারের বেশি তিনবার! হপ্তার বেশি থাকুন দেখি বাড়ি এসে। বাড়ি যে ক'দিন থাকবেন, চোখাচোখি তাকান তো একবার নীহারনলিনীর দিকে। সে আর হতে হয় না! ছোটরায়ের নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, কিন্তু রায়বাড়ির পাঁচিলের ভিতর সেই মানুষ কেঁচো।

কিরণবালা বলে, শাশুড়ির আঁচলের চাবি নিয়েছিস নতুন-বউ, সেই সঙ্গে ওঁর পতি-শাসনের কায়দাটাও শিখে নিবি।

মীনাক্ষী মনে মনে জিভ কাটে। হাসেও আবার মুখ টিপে। সখী হয়েছিস—রাত্রিবেলা ভোঁস-ভোঁস করে না ঘুমিয়ে জানলায় আড়ি পেতে একদিন শুনে গেলে তো পারিস কেমন এই রায়বাড়ির তরুণ বাঘের গর্জন।

নিশিরাত্রি। ভরা-পূর্ণিমা সেদিন। রায়বাড়ির দোতলার অলিন্দে জ্যোৎস্না গড়িয়ে এসে পড়ছে বড় বড় থামের ফাঁক দিয়ে। লোকজনে ভরা বাড়ি নিশুতি হয়ে থমথম করছে। এ রাত্রে দেয়ালের অন্তরালে কে বন্দী হয়ে থাকবে? ধ্রুব আর মীনাক্ষী—দুজনে পায়ে পায়ে অলিন্দে এসে বসল।

মীনাক্ষী বলে, বাঘ নাকি তোমরা—কিরণ-ঠাকুরঝি বলে। বাঘ থেকে রায়বাড়ির পুরুষ হয়ে এসেছ।

ঠিক তাই। জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে ধ্রুবভানু মেনে নিল: অত শক্তি আর অমন সাহস মানুষের কখনো হতে পারে না। রায়দের বলত, বনের বাঘ নয়—জলের বাঘ। গুণীনের মন্ত্র পড়ে নীতিনিয়ম মেনে বনের বাঘ ঠেকানো যায়, কিন্তু জলের বাঘের নামে লোকে একদিন থরথর করে কাঁপত।

দীঘি ছাড়িয়ে তার ওদিকে দিগ্ব্যাপ্ত নদী জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। চেয়ে চেয়ে ধ্রুবভানু উন্মনা হয়ে পড়ে। বলে, খুব যে বেশি দূরের দিন, তা নয়। আমার ঠাকুরদাদা রুদ্রভানু চক বন্দোবস্ত নিয়ে কাছারিতে স্থিতি করলেন। জমিজিরেত বড় পাজি জিনিস—এক জায়গায় কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রুদ্রভানুকে জমির নেশায় জমিয়ে দিল। এলাকা ঠাণ্ডা করে ফেলল। বলশক্তি দৌড়ঝাঁপ সমস্ত চলে গিয়ে চকের জমি সর্বস্ব এখন আমাদের।

ধ্বক করে চন্দ্রভানুর কথা মনে এসে যায়। কোথায় এখন তিনি—আজ এই জ্যোৎস্না-রাত্রে? বউভাতের পর একটা দিনেরও সবুর মানলেন না। এক একটা ঘণ্টারও যে অনেক দাম। শয়তান নদী নতুন নতুন প্রবেশপথ বানিয়ে ঘাঁটি শক্ত করে নিচ্ছে। জমি ছিনিয়ে নেবার চক্রান্তজাল। বিয়ের ব্যাপারটা কোন রকমে চুকিয়ে টাকার কাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। চিঠি আসে কালেভদ্রে কদাচিৎ—'কেমন আছ' 'ভাল আছি' এই জাতীয় পাঁচটা সাতটা কথা। সদরে খুব ছুটাছুটি চলছে। অঞ্চলের মানুষ নানা উপলক্ষে সদরে যায়, দেখা হল হয়তো বা চন্দ্রভানুর সঙ্গে, তারা এসে খবর বলে। আজ এই রাত্রে, অনুমান করা যায়, তাঁরও চোখে ঘুম নেই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখছেন না এদের মতন অলসদৃষ্টি মেলে—মানুষজন জুটিয়ে পূর্ণিমার কোটালের দুর্বার জলস্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বেড়াচ্ছেন।

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। মীনাক্ষীর ভাল লাগে না—ঝুপ করে কোলের মধ্যে সে গড়িয়ে পড়ে। দু-বাহু গলায় জড়ায়। বলে, গুণীনের মন্তোর কোথায় লাগে আমার কাছে—সকলের বড় গুণীন আমি। জলের বাঘ বেঁধে ফেলেছি—পোষা বাঘ এই যে আমার। এ বাঘে হামলা দেবে না কখনো, কামড়াবে না—

সোহাগ-ভরা কণ্ঠে ধ্রুব বলে, কি করবে?

গান গাইবে আমার কানে কানে, গানের ফিসফিসানি—আমি ছাড়া অন্য কেউ যাতে না শুনতে পায়। আদর করবে, ভালবাসার কথা শোনাবে, আমার মনপ্রাণ সর্বক্ষণ সে জুড়ে বসে থাকবে—

চাঁদের আলোয় ধ্রুব মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে বধূর মুখের দিকে। মীনাক্ষী বলেই যাচ্ছে: আজকে বলে নয়—চিরকাল। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তার চেয়ে একটা দিন একটা ঘণ্টা একটা মিনিট কম নয়। আনন্দের ঘোরে তারপরে একদিন মরে পড়ব তোমার পায়ের নিচে। শেষ তখন। আমার সাধের মরণ।

খবরদার!

বেশ চলছিল, তাড়া খেয়ে মীনাক্ষী থতমত খেয়ে যায়।

ধ্রুব বলে, মরার কথাবার্তা কোনদিন আর যেন মুখে না শুনি। খুনোখুনি হয়ে যাবে, এই বলে দিচ্ছি।

ভয়ে ভয়ে একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে মীনাক্ষী বলে, মরব না তা বলে? কোন একদিন—

না, কোনদিনও না।

এ তোমার অন্যায় জুলুম।

বেলডাঙার রায়দের জুলুমবাজ বলে বদনাম আজ কি এই প্রথম হল?

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। চাঁদ পশ্চিমে ঢলেছে। কথার যেন শেষ নেই, কথা বলে বলে সাধ মেটে না। প্রাচীন এক নারিকেলগাছ অন্দরের উঠানে। গাছের ছায়া পড়ে এসে দুজনের মুখে। গাছের পাতা ঝিলমিল করে, মুখের উপরে জ্যোৎস্না ডোরা কেটে যায়। অসহ্য আনন্দে দিশা করতে পারে না, দুচোখে জল এসে পড়ে মীনাক্ষীর।

ধ্রুব ব্যাকুল হয়ে বলে, কি হল?

কেন তুমি এত ভাল! এবাড়ির পুরুষ নিয়ে কত কথা শুনতে পাই—বউদের কত রকম কায়দা-কানুন করতে হয় নাকি বর বাঁধবার জন্য। অলিন্দে অলিন্দে বাড়ির বউদের এক-সমুদ্র চোখের জল ঝরেছে। সংসারধর্ম নিয়ে দিনমানটা তবু একরকম কেটে যায়, চার প্রহর রাত আর কাটতে চায় না। রেলিং ধরে কত কত প্রতীক্ষা। কিন্তু এ আমার কী হল—দেবতা হয়ে বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। একটিবার চাইতে হয় না, আপনাআপনি বর পেয়ে যাই।

দুই সতীনের গল্প বলেছিলেন গোবিন্দসুন্দরী—এই বাড়ির সেকালের দুই বউ, ভিন্ন তরফের। এক-বিয়ের কড়াকড়ি নয় তখন। যে রাত্রে কর্তা বাড়ি এলেন, চুলোচুলি ঝগড়া দু-জনে। কে দখল নেবে স্বামীর? কর্তা বাড়ি না এলে বড় ভাব—দুই বোন তখন, অভিন্নহৃদয় দুই সখী। দাবাখেলা শিখে নিয়েছিল, দাবায় সমস্ত রাত কেটে যেত। বানানো গল্প হতে পারে কিন্তু খাসা লাগে মীনাক্ষীর। কী দুর্ভাগ্য—তার একটা সতীনও নেই যে খানিক ঝগড়া করে বাঁচে। অতই বা কেন—ধ্রুব বাড়ি ছেড়ে দশ-পা দূরে যায় না যে বিরহের একটা জোর নিশ্বাস ফেলে। পরীক্ষাই দিল না এবার—দেদার ছুটি। ঘুরঘুর করে বেড়ায় নতুন-বউকে কেন্দ্র করে। এ বাড়ির চিরকালের নিয়ম মীনাক্ষীতে এসে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দুঃখ কম! বাঘ বশ করবার অহংকার নিয়ে এসেছিল, সে বাঘ কোথায় পাবে সে খুঁজে?

বৈশাখ শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠমাস পড়ে গেল। রায়বাড়ি চন্দ্রভানু আসেন না। লোকমুখে খবর এসেছে, আছেন ভালই—কাজের ঝঞ্ঝাটে দেরি হচ্ছে। না আসুন তিনি, কিন্তু সাগরচকের ভরাও যে এসে পৌঁছল না। এমন কাণ্ড কখনো ঘটেনি—চন্দ্রভানু কিম্বা রুদ্রভানু কারও আমলেই নয়। আর মাসাবধি যদি দেরি হয়—কেলেঙ্কারি ঘটবে। রায়বাড়ির উনুনে তাহলে হাঁড়ি না চড়বার গতিক।

ততদূর নয় অবশ্য। জ্যৈষ্ঠের মধ্যেই চন্দ্রভানু এসে পড়লেন। দীঘির পাড়ে নৌকো বেঁধেছে। নকড়ি-গোমস্তা উদ্বেগে ছুটতে ছুটতে ঘাটে গিয়ে পড়ল। সকলের আগে যেটা মনে এসেছে ঃ বাঁধের কি খবর?

অনেক মাটি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। টাকা অনেক ডুবিয়েছে।

বলতে বলতে চন্দ্রভানু গর্জন করে উঠলেন ঃ আমি ছাড়ব না। মাটি নয়—বুঝলে হে, ইস্পাতের পাতে ঘিরে আমি এবার বাঁধ ঠেকাব। লখিন্দরের লোহার বাসরের মতো।

কথাবার্তা কেমন যেন খাপছাড়া, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। ভয় পেয়ে নকড়ি আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

চন্দ্রভানু অন্দরে গেলেন। ইন্দুমতী চক্ষু-টা মেলে তাকিয়ে পড়লেন, গোঁ-গোঁ করে বললেন কি-একটা। নীহারনলিনী বুঝিয়ে দেয় ঃ খবর জিজ্ঞাসা করছেন।

হয়তো বা কানও গিয়েছে। চন্দ্রভানু চিৎকার করে শুনিয়ে দেয় ঃ বরাবর যেমন এসে থাকে—চাল-ধানের একটি দানা কমতি নেই। ভরা খালাস হচ্ছে, মিলিয়ে দেখে নকড়ি-গোমস্তাই বলে যাবে। রায়বাড়ির পান থেকে চুন খসবে না যতদিন আমি রয়েছি।

মীনাক্ষী এসে প্রণাম করল। গাঢ়স্বরে চন্দ্রভানু আশীর্বাদ করলেন। বলেন, ফর্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে জিনিসপত্র ভাঁড়ারে পাঠাও মা। তোমার শাশুড়ি যা এতদিন করে এসেছে। তার আগে আমার মা-ও করতেন।

কণ্ঠস্বর শুনে মীনাক্ষীর ভয় করে। চকিতে একবার শ্বশুরের মুখে তাকায়। ধ্রুবভানুর কাছে বলে, নৌকো—ভরা মালপত্র—সকলে কেবল সেইটেই দেখছে।

ধ্রুব বলে, তা ছাড়া আর কি করবে?

মানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখে না একবার।

কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ও-মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাবে?

কিন্তু তুমি তো ছেলে—

ছেলে হই যা-ই হই, হুকুম তামিল করবার যন্ত্র। রায়বাড়ির এই বিধি। আজকে তবু এই দেখছ—বিধিনিয়ম আরও কড়া ছিল আগে।

তবু ধ্রুব আজ বাপের কাছে গেল। মীনাক্ষী মিথ্যা দেখে নি। বিয়ের কাজকর্ম সেরে উৎসব-বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন, ব্যস্তসমস্ত মানুষ তিনি তখন। বোঝাই নৌকো নিয়ে আজ সে মানুষ নয়—মানুষটার প্রেতাত্মা ফিরে এসেছেন।

ধ্রুবভানু আকুল হয়ে বলে, কি হয়েছে বাবা?

কিছু না, কিছু না। খুবই খাটনি যাচ্ছে তো! দরিয়ার সঙ্গে লড়াই। লড়াইটা অবশ্য চিরকালের—

গলা হঠাৎ নিচু করলেন। ফিসফিস করে অতি-গোপন খবর দিচ্ছেন যেন ঃ আমি বুড়ো হয়ে গেছি রে ধ্রুব। গাঙের নবযৌবন দিনকে-দিন। আর বুঝি পেরে উঠলাম না!

ছোটরায় হেন মানুষের মুখে এমনি সব কথা—বুড়ো হয়েছেন তাতে সন্দেহ কি! এমনি অন্তরঙ্গ কথাবার্তা ছেলের সঙ্গে আর একটিবার হয়েছিল—সেই নিশিরাত্রে ধ্রুব যখন বিয়ের নামে গুম হয়ে বসে ছিল।

চন্দ্রভানু সত্যি সত্যি বুড়োমানুষ। তবু কিন্তু এবারে সাতটা দিনও নয়। মাল খালাস হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলবোট ভাসালেন।

॥ দুই ॥

এর পরে পুরোপুরি মাসও নয়। যাত্রাগান বারোয়ারিতলায়। ভাল পালা—সুভদ্রাহরণ। বেলডাঙার মেয়ে-পুরুষ কেউ বড় বাড়ি ছিল না, যাত্রার আসরে গিয়ে বসেছে। কিন্তু হলে হবে কি—ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি এলো হঠাৎ। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। বাড়ি এসে তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে সব শুয়ে পড়েছে। ভাতঘুম এসে গেছে। এমনি সময় হরিধ্বনি : বল হরি, হরিবোল।

ঠাকুরদেবতার নামে মানুষ তো গদগদ হয়ে উঠবে—এ নামে আপাদমস্তক কাঁপে। চ্যাটুজ্জেবাড়ির কর্তামশাই বটকৃষ্ণ স্ত্রীকে বলেন, কানে শুনছ ভবীর মা? কে যেন চললেন। তাই না?

ভবীর মা উঠে পড়েছিলেন। হঠাৎ কাঁপুনি ধরে যায়। কাঁপা গলায় পুত্রবধূকে ডাকছেন : অ বউমা, লেপ-কাঁথা যা হোক একটা দাও দিকি নি। শীতে জমে গেলাম। শিগগির দাও।

বউয়ের শব্দসাড়া নেই। রাত-দুপুরে কে আবার এখন ঝঞ্চাট করে। শুনিনি শুনিনি—এই বেশ ভাল। অগত্যা ভবীর মা যে তোষকে শুয়েছিলেন—সেইটাই উঁচু করে তুলে তার ভিতরে ঢুকে পড়ে কুণ্ডলী হয়ে রইলেন।

বটকৃষ্ণও ওদিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন : কে চললেন বলো দিকি? যাচ্ছেন মহাযাত্রায়—তা বেরুলেন কোন বাড়ি থেকে? এখন-তখন অবস্থা চলছে—গাঁয়ের কারো সম্বন্ধে তো শোনা যায় নি। তুমি শুনেছ নাকি ভবীর মা? ভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের শ্মশানঘাটায় আসার শখ কার হল? এই জায়গা এমন ভাল লাগল কিসে?

ভবীর মা কোন-কিছুই শোনেন না। কান দুটো সমেত গোটা মাথা তোষকের নিচে ঢুকে গেছে। বয়সে বুড়ো হয়ে গেছেন, তাঁদেরও এমনি দিন আসছে—হরিবোলে সেই কথা মনে পড়ে যায়। দেহের কাঁপুনিটা ঠিক শীতের কারণে না হরিবোলে, বলা কঠিন। আর বটকৃষ্ণের হয়েছে—কোন মানুষটার ডাক পড়ল, গাঁয়ের না বাইরের, সঠিক না জানা অবধি সোয়াস্তি নেই।

বলছেন, যে-ই হোক, বেয়াক্কেলে মানুষ বলব আমি তাকে। বৃষ্টি-বাদলার এমন অভদ্রা রাত্রে নিজেরই একলা যাওয়া নয়—যাদের কাঁধে চেপে চললেন, নিমোনিয়া হয়ে তাদেরও যে যেতে হবে দু-দশ দিনের ভিতর।

বাইরের দাওয়ায় আওয়াজ পেয়ে বলেন, কে গা? অ্যা—অনাদি উঠে পড়েছ?

বড়ছেলে অনাদিই বটে। বলল, কান্না একটা মনে হচ্ছে বাবা রায়বাড়ির দিক থেকে। রায়বাড়ি কে যাবার মতন? পুরানো রোগি ছোটগিন্নি যদি হন। কষ্ট বিস্তর ভোগ করেছেন, কিন্তু এখন তো কষ্ট-দুঃখের অতীত তিনি। অঙ্গগুলো পড়ে গেছে, বোধজ্ঞান নেই। সব হারিয়ে শুয়ে পড়ে আছেন, এখন আর কেন যেতে যাবেন?

ছেলের উপর বটকৃষ্ণ ধমক দিয়ে ওঠেন : তাগড়া-জোয়ান বসে বসে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়বে কেন? লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো খবরটা নিয়ে এসো। সুখ-অসুখে দেখবে না তো পড়শি হয়েছ কেন?

অনাদি বলে, বৃষ্টিই ছাড়ে না। ঘরের বার হওয়া এখন চাট্টিখানি কথা!

বুড়ো ক্ষেপে যান : আমায় যদি এখন অন্তর্জলীতে নামাতে হত। কি করতে, কাঠুরে ডাকতে যেতে না পড়শির বাড়ি? বৃষ্টি বলে হাত কোলে করে বসে থাকতে?

এমনি সময় ছাতা মাথায় তিনজন রাস্তা দিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে আসে। আসছে রায়বাড়ির দিক থেকেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বটকৃষ্ণ হাঁক দিলেন: কারা তোমরা, এদিকে এসো একবার। শুনি।

বাইতি-পাড়ার গোঁসাইচরণ, সতীশ আর মহেন্দ্র।

কোথায় গিয়েছিলে গোঁসাই? কান্নাকাটি কিসের, কি দেখে এলে বলো।

ছোটরায়ের নীলবোট চক থেকে ফিরল। মানুষটা সন্ন্যাসরোগে গেছেন। লাস নিয়ে এসেছে বোটে করে।

সতীশ বলে, দীঘির পাড়ে বোট একটুখানি রেখে ছোটরায়ের ছেলেকে তুলে নিল। আর একটি মানুষ নয়, নকড়ি-গোমস্তাও নয়। কত লোক যেতে চায়, তা চক থেকেই প্রজাপাটক ঠাসাঠাসি হয়ে এসেছে। বলে, জায়গা নেই চেয়ে দেখ। নিতান্ত জেদাজেদি করো তো লাস ফেলে তোমাদেরই নিয়ে শ্মশানে যাই।

গোঁসাইচরণ বলে, লাস নামাল না। বলল, গিন্নি-মায়ের ঐ অবস্থা—কার জন্যে তবে নামানো? বৃষ্টিবাদলার মধ্যে নামানো-উঠানোয় হাঙ্গামা বিস্তর—নামবেন একেবারে শ্মশানঘাটায় পৌঁছে চিতেয় ওঠার মুখটায়। বোটের ছাতে বিছানা পেতে সাজিয়ে রেখেছে—ফুল, ফুল আর ফুল। ফুলের পাহাড় ঠেলে মড়ার একখানা আঙুল পর্যন্ত দেখবার জো নেই।

বটকৃষ্ণ গুম হয়ে শুনছিলেন। ফোঁস করে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন: ছোটরায়ের পাথরের দেহ সন্ন্যাসে শেষ করে দিল, আমরা তবে তো নেই।

গোঁসাইচরণ বলে, না চাটুজ্জেমশায়, দেশসুদ্ধ চলে যাবে, চটার মতন দেহ নিয়ে আপনি ঠিক টিকে থাকবেন। রসকষ নেই—দুধ মরে ক্ষীর, ক্ষীর মরে চাঁচি হয়ে আছেন আপনি। ও জিনিসের মার নেই।

নিতান্ত এক চ্যাংড়া ছোঁড়ার কথা—তা হলেও সোয়াস্তি একটু পেলেন বোধহয় বটকৃষ্ণ। ঘরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ভবীর মা'র চিঁচিঁ গলা: ও বউমা, ওরে ও আবাগির বেটি, কথা বুঝি কানে-কপালে যায় না? বললাম না, কম্প লেগেছে। কাঁথা-লেপ যা হয় কিছু ফেলে দে।

গোঁসাইরা তিনজন শতকণ্ঠে তারিফ করছে: এই পুরু তোষক-বালিশ-পাশবালিশ। তার উপরে ফুল। অত ফুল জোটালো কেমন করে সেই আবাদ জায়গায়? রাজার বিয়ের ফুলশয্যে যেন বোটের উপরে শখ করে করছে। তা প্রজাপাটকদের কাছে ছোটরায় রাজাই তো বটে। বোট ভরতি তাঁর প্রজারা। অত দূর থেকে বেয়ে বেয়ে নিয়ে এসেছে, তারাই সব ঘিরে বসে আছে। নকড়ি হেন মানুষটাকেও পাত্তা দিল না।

শুনে শুনে অনাদি চাটুজ্জে চঞ্চল হয়ে ওঠে: দেখতে হবে তবে তো। শ্মশানেই যাওয়া যাক।

অপর তিনজনের খুব বেশি আপত্তি নেই। দেখতেই তো গিয়েছিল রায়বাড়ি অবধি। বলে, ভিজে জবজবে আমরা। তা বেশ, তামাকের জোগাড় দেখুন, ভাল করে এক ছিলিম টেনে গা গরম করে বেরিয়ে পড়ি।

ঘরে ঢুকে অনাদি বৃষ্টিবাতাস আড়াল করে কলকের উপর নারিকেল খোসার নুড়ি ধরাচ্ছে। বউ এসে বলল, সর্দিতে ডবডব করছ, নাড়ি ধরে বোধহয় জ্বরই পাওয়া যাবে। যাবে এই অবস্থায়?

অনাদির সংক্ষিপ্ত জবাব: ছোটরায় কি নিত্যিদিন মরবেন? শ্মশানের মচ্ছব কি

রোজ হবে?

এর উপরে জবাব নেই।

দুর্যোগ সত্ত্বেও শ্মশানে বেশ একটি জনতা। হরিবোলের ফলেই এসে জমেছে। যাত্রাগান ভেঙে গেল তো ছোটরায়ের সৎকারের ব্যাপারে খানিকটা তার ক্ষতিপূরণ।

কিন্তু হলে হবে কি—মাঝ-নদী দিয়ে নীলবোট বেয়েই চলল। পাড়ের দিকে আসে না। সকলে তখন হাঁক পাড়ছে: শ্মশান এই যে, চিনতে পারছ না? বোট লাগাও—

বোট কানেই নেয় না। জনতা ক্রমশঃ মারমুখি হয়ে ওঠে: কী আশ্চর্য, মড়া নিয়ে চললে কোথা তোমরা? বলি, ছোটরায় আমাদের বেলডাঙার মানুষ নন? পুরোপুরি তোমাদের হলেন কেমন করে? দেখবার জন্য আমরা সব বৃষ্টি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

বড় বেশি হৈ-হল্লা তো বৃন্দাবন হালের কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ছোটরায়ের জীবনকালে যেমন ছিল, মরণের পরেও সে সকলের বড় মাতব্বর। চেঁচিয়ে বলে: ছোটরায় মা-গঙ্গায় দাহ হতে যাচ্ছেন, আজেবাজে শ্মশানে নামবেন না।

গঙ্গায় পেঁছিতে পচে গিয়ে গন্ধ-গন্ধ হবেন যে। হাত-পা খসে খসে আসবে। ভাঁটি-অঞ্চলে গঙ্গা পাচ্ছ কোথা?

বৃন্দাবনের জবাব: কুসির বটতলায়।

সেখানে গঙ্গা আসেন তো একবার—মরসুমের সময়। তার এখনো একমাস দেড়মাস দেরি।

বৃন্দাবন বলে, একমাস দেড়মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মুক্তিটা তদ্দিন যদি মুলতুবি থাকে, তার জন্য ক্ষতি হবে না।

লোকের আহ্বান গ্রাহ্য না করে নীলবোট ছ-খানা দাঁড় বেয়ে তীব্র স্রোতে দেখতে দেখতে বাঁকের আড়াল হয়ে গেল। উৎসাহী কেউ কেউ যেত চলে হয়তো সেই কুসির বটতলা অবধি। কিন্তু রাত্রিকাল, তায় এই জল-বাতাস—সকলের বড় মুশকিল, জায়গাটা নদীর ভিন্ন পারে। খেয়া পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে—যতই হাঁকডাক করো, মাঝি এই দুর্যোগের মধ্যে সাড়া দেবে না।

কুসির বটতলার শ্মশানে বোট গিয়ে ধরল। ঝুরি নেমে একটা জায়গা বড় দুর্গম, দিনমানেই অন্ধকার হয়ে থাকে—বেছে বেছে সেইখানটা পছন্দ করে প্রকাণ্ড চিতা সাজিয়েছে। মেলার সময়টা ছাড়াও বারোমেসে দোকানপাট কিছু কিছু আছে। সাড়া পেয়ে তাদের দু-চারজন এদিকে এসেছে। হরিধ্বনি দিতে আরও কিছু মানুষ এসে পড়ল।

মড়া চিতায় তোলা হবে, তার আগে নদীজলে স্নান করানো বিধি। বৃন্দাবন ধ্রুবভানুকে বলে, কলসি নিয়ে নাও খোকাবাবু। বাপের শেষ-চানের জল তোমায় তুলে আনতে হবে। পথ পিছল হয়ে আছে, পা হড়কে না যায়। পা টিপে টিপে সামাল হয়ে চলো। আলো ধরে আমি আগে আগে যাচ্ছি।

ঘাটে চলল দুজনে। ঘাট আর কি—খান কয়েক বাবলার গুঁড়ি ফেলা আছে এক জায়গায়। হঠাৎ বৃন্দাবন বলে, শোন একটা কথা। কাছে এসো, একেবারে কাছে। কানে কানে বলব।

ফিসফিস করে করে বলে, মড়ার উপরের কাপড় সরিও না। কাপড়ের উপরেই জল

ঢেলে চান করাবে। কাপড়চোপড় বিছানাপত্তর ফুলটুল সবসুদ্ধ চিতায় তুলে দেবো। যাকে তাকে ধরতে দেওয়া হবে না—তুমি, আমি, আর বাছাই লোক আছে আমার পাঁচজন।

ধ্রুব আর্তকণ্ঠে বলে, বলো কি বৃন্দাবন-কাকা! শেষ-দেখা একটিবার দেখব না আমার বাবাকে?

বৃন্দাবন ঘাড় নেড়ে বলে, না।

আবার বলে, দেখবার মানুষ আরও আছে বিস্তর জন—তুমি একলা নও খোকাবাবু। গিন্নিঠাকরুনের ঐ রকম অবস্থা, তবু তাঁর ঘরে নিয়ে শেষ-দেখা দেখিয়ে আনা যেত। উচিত ছিল দেখানো।

কথা যা বলছে সব সত্যি। এ কাজের মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধ্রুব শুনবে না কিছুতে। জেদ ধরে বলে, অন্যের বেলা যেমন হয় হল—আমি ছেলে, একমাত্র ছেলে, দেখতেই হবে আমায়। মুখ না দেখে মুখাগ্নি হবে কেমন করে?

বৃন্দাবন গম্ভীর অকম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে, ছোটরায়ই নয়—কার মুখ দেখবে?

বাবা নন? ধ্রুব স্তম্ভিত হয়ে বলে, কাকে তবে বোটের উপর ফুলে ঢেকে নিয়ে এলে?

মানুষই নয়। গরানের ছিটেয় খড় জড়িয়ে ছোটরায় সাজানো। জানি কেবল আমি আর ওরা ঐ পাঁচজন। আমাদের বাইরে অন্য কেউ কোনক্রমে যেন টের না পায়, একফোঁটা সন্দেহ কারো মনে না আসে।

বাবা কোথায় তবে?

নেই তিনি, মারা গেছেন।

ঢোক গিলে বৃন্দাবন বলে, মেরে ফেলেছে। মেরে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। লাস নিখোঁজ।

শুনে ধ্রুব সেই জলের ধারে কাদার উপর ধপ করে বসে পড়ল। সম্বিত আছে কি নেই।

ওদিক থেকে মানুষজন ডাকাডাকি করছে: কই গো, চানের জল আনতে এত দেরি কেন? হল কি তোমাদের?

বৃন্দাবন বলে, খোকাবাবু বড্ড ভেঙে পড়েছেন। বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠান্ডা করছি। হোক না দেরি, তাড়া কিসের?

ধ্রুবকে বোঝাচ্ছে: এতবড় মানুষটার এই পরিণাম। বুক ছেড়ে আমাদেরও কাঁদতে ইচ্ছে করে। চেপে চুপে তবু যাত্রার পালার মতো ভড়ং করতে হচ্ছে। লোকে বুঝতে না পারে। ভয় থানাপুলিশ নিয়ে—তারা ঘুণাক্ষরে যাতে টের না পায়।

ধ্রুব মাথা তুলে বলে, খুন করে ফেলেছে বাবাকে—পুলিশে তো আমাদেরই জানানোর কথা।

আরে সর্বনাশ, কিছুতেই নয়! কেন খুন হয়েছেন, তা-ও বেরিয়ে পড়বে তাহলে।

বিড়বিড় করে বৃন্দাবন আদ্যোপান্ত বলে যায়: গাঙের চোনা জল সাগরচকে শতমুখে ঢুকছে। চন্দ্রভানু যা কিছু সম্বল, জলে ভাসিয়ে নিয়ে একেবারে কপর্দকহীন করেছে তাঁকে। মাটি ফেলতে না ফেলতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যত যাচ্ছে, রোখ বাড়ে চন্দ্রভানুর। হারব না, হারব না। যে বাঁধ গেছে, ডবল করে মাটি চাপান দাও সেখানে। তা-ও গেল তো চৌগুণ। মাটির বাঁধ বলা যায় না এখন—চাঁদির বাঁধ। চাঁদির টাকা যত খরচ হয়েছে, মাটির বদলে সেইগুলো ঢেলেই বোধ হয় বাঁধ হয়ে যেত।

টাকা টাকা করে শেষটা পাগল হয়ে উঠলেন। বেপরোয়া। সেকালের সেই পুরানো পথ ধরতে হল আবার, রুদ্রভানু যা তোবা করেছিলেন। গাঙে-গাঙে নৌকোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। নইলে রায়বাড়ির ইজ্জত থাকে না। একদিন যাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, সত্যভঙ্গ হয় তাদের কাছে। ধান-চাল জিনিসপত্র ভরা বোঝাই হয়ে যা সেদিন ভাণ্ডারে উঠেছিল, সাগরচক তার এক কণিকাও দেয়নি। গাঙ-খালের উপরে রোজগার।

বৃন্দাবন বলছে, ছোটরায় বড় জাঁকজমকে বেঁচে ছিলেন, মরণে আমরাও সেই জাঁক দেখিয়ে যাচ্ছি। শ্রাদ্ধশান্তিতেও তাই হবে। তার পরেও যেমন যেমন আছে, তেমনি সব চলবে। একচুল এদিক-ওদিক হবে না। তোমার কাঁধে দায় পড়ল খোকাবাবু, রুদ্রভানু অন্তে ছোটরায়ের উপর যেমন একদিন পড়েছিল। কেমন করে কি হবে, আজ থেকে তোমারই ভাবনা সেটা। কিন্তু রায়বাড়ির চিরকালের জৌলুষ নেভানো চলবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যদি দেশান্তরী হও, সে আলাদা কথা। তার আগে কিছুতে নয়।

॥ তিন ॥

চন্দ্রভানু গেলেন। সাগরচক আগেই নাকি গেছে—বৃন্দাবনের কাছে শোনা। রায়বাড়িরও টলমল অবস্থা—তাসের ঘরের মতো কোন দিন বা ভেঙে পড়ে! কি করবে করো ধ্রুবভানু, তোমার কাঁধের দায় এবারে। একদিন রুদ্রভানুর কাঁধ থেকে চন্দ্রভানুর উপর দায় পড়েছিল, তেমনি আজ ধ্রুবভানুর উপরে। পরাজয় মেনে যদি পালিয়ে যাও —কে কি করতে পারে তোমার তখন? কিন্তু বেলডাঙায় থেকে রায়বাড়ির মর্যাদানাশ চলবে না।

নিরুপায় ধ্রুব। লেখাপড়া-শেখা ভদ্রজীবনই কাল হয়েছে। বছর যেতে না যেতে অট্টালিকা হঠাৎ যেন শ্রীছাঁদ হারিয়ে বুড়ো হয়ে পড়ল। সদর-উঠানে হাঁটুভর ভাঁটুইবন, আগাছার জঙ্গল। কাছারিঘরে নকড়ি-গোমস্তা কাজ করছে, ছাতের এক চাংড়া চুনবালি খসে হুড়মুড় করে খাতাপত্তরের উপর পড়ল। এক জায়গায় এই একটা ঘরেই নয়, সারা ঘরবাড়ি জুড়ে এমনি কাণ্ড। নকড়ি ইদানীং বিষম কঞ্জুষ, তাকিয়ে দেখলে না এসব দিকে।

বলে, জনমজুর দিয়ে জঙ্গল সাফ করা যায়, রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে চুনকামও হতে পারে। আগে বরাবর হয়ে এসেছে, এখন কেন হচ্ছে না—বুঝে দেখ সেটা খোকাবাবু। চকের ঐ তো অবস্থা—এক একটা পয়সা বাপের হাড় এখন। কর্তামশায়রা তার উপরে ভূতপেত্নীর আড্ডা বসিয়ে গেছেন। পান থেকে চুন খসলে ওরা রক্ষে রাখবে না। ওদের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে তবে তো অন্যসব!

আঙুল দিয়ে পাশের বৈঠকখানা নির্দেশ করল। আড্ডা জমজমাট সেখানে। পাশা পড়েছে।

বিষম হুল্লোড়। কচ্চে-বারো ছ-তিন-নয় আ-ঠা-রো—এই কাণ্ড চলেছে বেলা দুপুর থেকে। নকড়ি একটা জরুরি হিসাব নিয়ে পড়েছে, সাধ্য কি তাতে মন বসায়! সেজন্য আরও বিরক্ত। বেলা গড়িয়ে কখন যে বৈকালিক লুচি-হালুয়া এসে যাবে! মুখ বন্ধ হবে খেলুড়েমশায়দের। আড্ডার ইস্তফা।

হুঙ্কার উঠল সহসা: তামাক দেবার একটা লোক থাকে না গোমস্তামশায়, আপনাদের হয়েছে কি বলুন তো? আগে তো কই এমন গাফিলতি ছিল না। কী ব্যাপার?

একটা কিছু বলতে হয়—নকড়ি বলে, তাই নাকি? আচ্ছা, দেখছি।

দেখবেন আর কাকে? সুখময়টাকে বিদায় দিয়েছেন। আছে এক ক্ষীরি-ঝি। সারা দিনে সে মাগীর টিকি দেখবার জো নেই।

নকড়ি বলে, ক্ষীরোদার কী দোষ! ভিতরে কত কত জনের ফাইফরমাস—তাঁরা এক একটি সাক্ষাৎ মা-চামুণ্ডা। তাঁদের খাটনি খেটেই কুলিয়ে উঠতে পারে না। এক লহমা মেয়েটা পায়ের জিরান পায় না।

পুরুষপুঙ্গবদের আত্মাভিমানে লাগে। গর্জন করে উঠল: ভিতরের তোয়াজ হলেই বুঝি হয়ে গেল! আমরা কেউ নই? হুঁকো দুপুর থেকে তিনবার কি চারবার মাত্তোর ঘুরেছে।

নকড়ি বলে, অনেক বেশি। কোটো ভরতি তামাকের তিনভাগ খতম। গেল কোথায় অত তামাক?

কি, কি বললেন? মুখ পচে উঠল তবে কেন? তামাকের বিহনে। ওসব জানিনে, এত হেনস্তা চলবে না। মাহিন্দার না দিতে পারেন, নিজে আপনি তামাক সাজবেন। গণে গণে সাজবেন, ছিলিমের পাকা হিসাব থাকবে।

এক-কথা দু-কথায় লেগে যায় বুঝি ধুন্দুমার! ধ্রুব কোন দিকে যাচ্ছিল, ছুটে এসে পড়ে: গোমস্তামশায়কে কেন? আমি রয়েছি, আমার উপর হুকুম করবেন। দিন কলকে—

কলকে তুলে নিয়ে ধ্রুব তামাক সাজতে যায়। তড়াক করে উঠে নকড়ি ছুটে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে ছুঁড়ে দিল মাটিতে। কলকে খানখান হয়ে যায়।

হাসিতে ভুলিয়ে ধ্রুব নকড়ির ক্রোধ-শান্তির চেষ্টা করে: করলাম না হয় একটু সেবাযত্ন। হাত কি আমার ক্ষয়ে যাচ্ছিল?

নকড়ি অবরুদ্ধ স্বরে বলে, চাকরবাকর নেই—তাই বলে ছোটরায়ের ছেলে তামাক সেজে সেজে ভূতপ্রেতের মুখে এগিয়ে ধরবে, সেই জিনিস চোখ মেলে আমি দেখব!

ধ্রুবভানু মরমে মরে গিয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ কী বলছেন এসব! কর্তারা আদরযত্নে এনে রেখে গেছেন। চাকের মানুষেরা দরখাস্তে সেই যে অশ্বত্থগাছের উপমা দিয়েছিল, ভুলে গেছেন বুঝি গোমস্তামশায়?

রাগে গরগর করতে করতে নকড়ি বলে, অশ্বত্থের ডালে যত ভূতপেত্নীর আস্তানা। গাছ শুকিয়ে আজ কাঠ হতে চলেছে। অপদেবতাগুলোর নড়ন-চড়ন নেই। কবে একদিন মেজাজ হারিয়ে ঝাঁটা ধরব—ঝেঁটিয়ে আপদ সাফ করব। তারপর সে ঝাঁটা আমাকেও তোমরা মারবে, সেটা জানি। চারিদিকে নানান রকমের অশান্তি—তার মধ্যে এদের এই নবাবিয়ানায় মাথার ঠিক রাখতে পারি না খোকাবাবু।

ধ্রুবভানু নকড়িকে কাছারিঘরে টেনে এনে ফরাসের উপর তার নিজের জায়গায় বসিয়েছে। শান্ত করছে: লড়াইয়ে সৈন্যসামন্তর প্রাণ গেলে কিম্বা অঙ্গহানি হলে, তাদের ছেলেপুলের জন্য সরকার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এ-ও তাই। আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন গোমস্তামশায়। এক কালের দুর্দান্ত হিংস্র রায়েরা সৎ আর সম্ভ্রান্ত হয়ে গেছে, তারই খেসারত। প্রতিকারের উপায় আপনার আমার হাতে নেই। এর সঙ্গে জড়ানো রায়বাড়ির ইজ্জত আর পুরানো কর্তাদের প্রতিশ্রুতি। যতদিন রায়বাড়ি আছে এরাও থাকবে। না পোষায় আমাদেরই সরতে হবে। ওঁদের সরিয়ে দিয়ে আমাদের থাকা চলবে না।

সেই রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মীনাক্ষী দেখে ধ্রুব নেই তার পাশে। আনমনা

দেখা যায় ইদানীং—মীনাক্ষীর সাতটা কথার পরে হয়তো বা একটা জবাব দিল। অভিমানে বধূর চোখ ফেটে জল আসে—কিন্তু একটুও ধ্রুবর নজরে পড়ে না। গেল কোথা মানুষটা এই নিশিরাত্রে? ছাঁৎ করে ওঠে মন, কিরণবালার ভয়-দেখানো কথাগুলো মনে ভাসে। রাত্রে ঘরে থাকা একদা এ বংশের পুরুষের রীতি ছিল না। সেই পুরানো উচ্ছৃংখল রক্ত টগবগিয়ে উঠেছে বুঝি ধ্রুবভানুর ধমনীতে।

এমনিই ভাবছিল। হঠাৎ দেখে ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকছে।

আঁতকে ওঠে: কে?

জবাব না পেয়ে প্রায় আর্তনাদ: কে, কে তুমি?

ধ্রুব বলে, ডাকাত। ডাকাতি করতে এসেছি।

খিলখিল করে হেসে ভয় ভাঙিয়ে দেয়। এ হাসি অনেক দিনের পরে।

বলে, কী ভীতু তুমি! একটা কেলেংকারি ঘটাচ্ছিলে এক্ষুনি চেঁচামেচি করে!

লজ্জারক্ত মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি বলে, তাই বুঝি! আমি ভেবেছিলাম—

কী ভাবছিল, বলার ফুরসত হল না। বলতে দিল না বরে, মুখে কুলুপ পড়ে গেছে তখন। রাগ-দুঃখ যত-কিছু জমেছিল, সুদে-আসলে শোধ।

ক্ষণপরে ধ্রুব বলে, যা বললাম সত্যি সত্যি তাই হত যদি! ডাকাতই যদি হত—

এখন মীনাক্ষী নির্ভয় নিশ্চিন্ত। বীরাঙ্গনার ভঙ্গিতে বলে, হল তো বয়ে গেল। তুমি কাছে থাকলে ডাকাতে আমার কী ভয়? তোমার বুকে মুখ ঢেকে পড়তাম। তুমি বাঁচাতে আমায়। বাঁচা না-ই যদি হত, মরে যেতাম। তোমার বুকে মরা হল —তাতে বাঁচার সুখই তো আমার।

॥ চার ॥

লালমোহন মিত্তির বাড়ি এলেন মেয়েজামাই দেখতে। খবরবাদ না দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছেন। চন্দ্রভানুর শ্রাদ্ধের সময়ও এসেছিলেন—নিতান্তই বাইরের একজন হয়ে, মান্যগণ্য কুটুম্ব রূপে। ধুমধাম প্রচুর—তার মধ্যে ক'টা দিন নিঃশব্দে কাটিয়ে চলে গেলেন। তার পরে এই।

নকড়ি ছুটতে ছুটতে ঘাট অবধি গিয়ে আহ্বান করে: আসতে আজ্ঞা হোক, চলে আসুন। এদ্দিনে তবু সময় হল। মাথার উপরে আপনিই এখন একমাত্র—আর কে আছে বলুন? গিন্নিঠাকরুন জ্যান্ত থেকেও নেই।

লালমোহন বলেন, আসিনে কেন জানেন, গোমস্তামশায়? ভয়ে। চকদার মানুষ এদের চাল-চলতি আলাদা। বাড়িতে দীয়তাং ভুজ্যতাং। চিংড়ির কারবারি আমি—তা-ও আবার কুচোচিংড়ি। বুক ঢিবঢিব করে জোড়া-মন্দিরের মাঝখান দিয়ে রায়বাড়ি ঢুকতে।

চন্দ্রভানুর কথাগুলোর শোধ নিচ্ছেন এত দিনে—তাঁর মৃত্যুর পরে। মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন।

বলেন, চক থেকে ধানচাল টাকাকড়ি আসে জোয়ারজলের মতো, খরচা হয়ে যায় ভাঁটার টানে। ভক্তদাস বলল, চলুন দেখেই আসা যাক কী বস্তু সেই সাগরচক। সোজা সেই চক থেকে ফিরছি। স্বচক্ষে দেখে এসে তবেই বাড়ি ঢুকতে সাহস হল। সামান্য মানুষ আমি, কুচোচিংড়ি বেচে খাই—তার মধ্যে কোনরকম লুকোছাপা নেই, যে কেউ গিয়ে আমার খটি দেখতে পায়। আমার সে কাজে ইজ্জত না-ই থাক, ভাঁওতাবাজিও নেই। রায়বাড়ির সাগরচক কিন্তু চোখের নজরে আসে না। চোখে ডবল চশমা লাগিয়েও দেখতে পেলাম না। বুড়োলোক দু-এক জনে বলে, এককালে

ছিল নাকি সত্যি। কিন্তু ভরা সাজিয়ে এই যে সেদিন পর্যন্ত এসেছে—সে জিনিস কখনো সাগরচকের নয়। কোন চকের আমদানি—বেহাইমশায় বেঁচে থাকলে আজ জিজ্ঞাসা করে দেখতাম।

কথা বলতে বলতে লালমোহন দীঘির পাড় দিয়ে আসছেন। ম্যানেজার ভক্তদাস যথারীতি সঙ্গে। চন্দ্রভানুর মৃত্যু এবং তাঁর সাগরচক দিয়ে নানা উল্টোপাল্টা কথা কানে আসতে লেগেছে। লালমোহনের মনে হল, অনভিজ্ঞ জামাইকে অপদস্থ করা ও সম্পত্তি ফাঁকি দেওয়ার জন্য শরিকি চক্রান্ত? সরেজমিনে খোঁজ নেবার জন্য ভক্তদাসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

ধান কাটার মরশুম। ক্ষেতখামারের কাজে মানুষ দলে দলে নৌকো নিয়ে নাবালে নামছে। ক্ষেত-ভরা ফসল, মন-ভরা স্ফূর্তি। হাসিহল্লায় নদী তোলপাড়।

ভক্তদাস চেঁচিয়ে পথ জিজ্ঞাসা করে: সাগরচক কোন দিকে, নিশানা দাও ভাই। সাগরচকে যাব আমরা।

সকলে মুখ তাকাতাকি করে। এ বলে, জানো কোথায়? ও বলে, গিয়েছ সেখানে? এত জায়গায় চলাচল—সাগরচক কই মনে তো পড়ে না।

পুরো দুটো দিন এদিকে সেদিকে ঘোরাঘুরি। শেষটা খোঁজ পাওয়া যায়। এক বুড়ো মাঝি গদগদ হয়ে উঠল: আহা, বড় ভাল জায়গা গো! মিঠেজলের পুকুর—টিউকলের তখন চলন হয়নি, খাবার জলের অভাব পড়লে কতদিন এসে চকের পুকুর থেকে নৌকো ভরে জল নিয়ে গিয়েছি। দোতলা কাছারি, ইস্কুল, ডাক্তারখানা—

রাত হয়ে গেছে তখন, অন্ধকার। ভক্তদাস নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল: কোন্ দিকে সেই চক, ভাল করে হদিস দিয়ে দাও মুরুব্বি। ঘুরে ঘুরে নাজেহাল হচ্ছি।

এই তো—

লালমোহন ছইয়ের তলে ছিলেন, লহমার মধ্যে বাইরে চলে এলেন। মাঝি বলছে, রান্নাঘরে ঢুকে বলে বাড়ি আর কদ্দুর—আপনাদের হল যে সেই বৃত্তান্ত! পানসি এখন চকের বাঁধেই কত্তা।

সীমাহীন জল—জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তবু নাকি সাগরচকে এসে পড়েছেন তাঁরা। সীমানার বাঁধের উপরে। ঠাহর করে দেখে দেখে ভক্তদাসও ক্ষণ পরে বলে, তাই বটে আজ্ঞে। মুরুব্বি মিথ্যে বলে যায়নি। বাঁধের মতোই লাগে।

ভরা জোয়ারে চারিদিক ডুবে আছে, জলস্রোত অন্ধকারে ডাক ছেড়ে ছুটেছে। লালমোহনও দেখতে পাচ্ছেন, কালো রঙের বিসর্পিল রেখা মাইলের পর মাইল পরিব্যাপ্ত। অতিকায় অজগর সাপ ভাসছে যেন জলের উপর। সাগরচকের বাঁধ। বাঁধের অন্তরালে পাকা ধানে ভরা দিগ্‌ব্যাপ্ত প্রান্তর। দোতলা পাকাকাছারি বড়নদীর উপর। টিলায় টিলায় গ্রাম। রাত পোহায়ে দিনমান হবে, ধান কাটতে মানুষ দলে দলে চকের ক্ষেতে নামবে। ক্ষণে ক্ষণে সখীসোনার গান—যেমন এই খানিক আগে পথের মধ্যে কিষাণদের ডিঙির গান শুনে এলাম। ধান কেটে কেটে খোলাটে তুলছে। ডলে-মলে ভরা বোঝাই হয়ে গাঙ-খাল বেয়ে সেই ধান চলে যাবে বেলডাঙার রায়বাড়ি। —আদরের মেয়ে মীনাক্ষীর সংসারে ধুমধাম লেগেই আছে—সে বস্তু এমন, চিংড়ির খটিওয়ালা নতুন-বড়লোক লালমোহন ধারণায় আনতে পারেন না।

মীনাক্ষীদের সাগরচকে এসে পড়লেন অবশেষে!

নোঙর ফেলতে গিয়ে মাটি পাওয়া গেল সহজে—অগভীর জায়গা। রাতটুকু সেখানে

কাটল। শেষরাত্রে ভাঁটা, একফালি চাঁদও দেখা দিয়েছে আকাশে। তখন কিছু আন্দাজ পাওয়া যায়। তারপর ভোরের আলোয় সুস্পষ্ট দেখা গেল—

কোথায় ধানক্ষেত—জলের সমুদ্র। টিলার উপরে দু-চারটে ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি জলের তফরার থরথর কাঁপছে—এককালে বসতি ছিল, বোঝা যায় বটে। অদূরে চন্দ্রভানুর বড় বাহারের কাছারিবাড়ি।

লালমোহনের পানসি সেই কাছারির ঘাটে গিয়ে ধরল। নামলেন তাঁরা। উঠানে একহাঁটু জঙ্গল—সাপখোপ কত লুকিয়ে আছে ঠিক নেই। সীমানার পাঁচিল ভেঙেচুরে স্তূপাকার। নোনা-ধরা পলস্তারা খসে কামরার দেয়ালগুলো দাঁত বের-করা কঙ্কালের মতো ভয় দেখাচ্ছে।

লালমোহন হাহাকার করে ওঠেন: সাগরচকের জাঁক কানে শুনেই মজলাম! মেয়ে দেবার আগে একটিবার চোখে কেন দেখে গেলাম না?

সেই মানুষ এইবার রায়বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকছেন—ঢুকতে গিয়ে সাগরচকের কাছারির সেই চেহারা মনে আসে। এই উঠানও ঠিক তেমনি। মনঃক্ষোভ চেপে রাখতে পারেন না। স্থানকাল ভুলে ভক্তদাসকে বলে ওঠেন, কী করেছি আমরা ম্যানেজার! হায় রে হায়, অট্টালিকাই দেখলাম, ভিতরে চামচিকের বাসা দেখলাম না কেউ আমরা তাকিয়ে!

ধ্রুবভানু কোন্ দিকে ছিল,—কানে গিয়েছে কিনা, বোঝা যায় না। হন্তদন্ত হয়ে এসে সে প্রণাম করল।

শুনে থাকে তো বয়েই গেল, লালমোহন গ্রাহ্য করেন না। সর্বদেহ রি-রি করে জ্বলছে। তিক্তকণ্ঠে জামাই সম্ভাষণ করলেন: তোমাদের সাগরচক দেখতে গিয়েছিলাম, শুধু সাগরই দেখে এলাম বাবাজি। চক দেখতে হলে ডুবুরি হতে হয়। বেহাইমশায় নেই যে, কাকেই বা বলি আজ এসব?

একটু থেমে আবার বলেন, মুখে বলেও শোধ যাবে না—আমার যে আঁতের ঘা। উপায় কি হতে পারে সেই থেকে ভাবছি। কলকাতার পড়াশুনো শেষ করে তুমি কোন কাজকর্মে ঢুকে পড়ো। আমি পিছনে আছি, আমার জামাই-মেয়ের যা হোক এক রকম ব্যবস্থা হবে। কিন্তু রায়বাড়ির নিত্যিদিনের এই ধুমধাড়াক্কা, আর—

দাঁতে দাঁত ঘষে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে ওঠেন, ঐ যে নিষ্কর্মার দল বছরের পর বছর পোষা হচ্ছে—

প্রসঙ্গ উঠে পড়তেই ধ্রুবভানু ব্যস্ত হয়ে বলে, ভিতরে যাই চলুন। বিশ্রাম করবেন।

অর্থাৎ এ সমস্ত আলোচনা কারো সামনে হতে দেবে না। অনুচিত বটে—রাগের বশে লালমোহনই হুঁশ হারিয়েছিলেন। সামলে নিলেন।

অন্দরে যেতে যেতে জামাইকে একেবারে একলা পেয়ে ফলাও করে আরম্ভ করলেন: এক এক মানুষের ব্যাপারে মজা। তোমার বাপ-দাদারা পিঁজরাপোল বানিয়ে গেছেন। অকেজো অক্ষম গরু-মহিষ নিয়ে পিঁজরাপোল করে, তোমাদের এটা মানুষের পিঁজরা-পোল। ভূমিলক্ষ্মী অফুরন্ত দিতেন, তখন এসব পোষাত। এখন আর এসবের দিন নেই। পথ দেখিয়ে দাও ওদের সোজাসুজি—দালানে ছুঁচো-চামচিকে বরঞ্চ বসবাস করুক। সে ভালো, এক পয়সাও তাতে খরচা নেই।

আচমকা ধ্রুবভানু অন্দরের একটা ঘরে আঙুল দেখিয়ে দেয়: আপনার মেয়ে ঐখানে, চলে যান।

বলে মুহূর্তের জন্য আর দাঁড়ায় না। হনহন করে উল্টো দিকে চলল।

লালমোহন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। অশিষ্টতা, অপমান। বাপও একদিন এই বাড়িতে অপমান করেছিলেন। তখন অনেক ছিল, লালমোহনও প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হাঘরের বেটা হাঘরে আজকে এত স্পর্ধা পায় কোথায়?

মেয়ের কাছে গিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়েন: না-হক অপমান করল আমায়। বাপ যেমন ছিল, ছেলেটা অবিকল তাই। এদের রক্তের দোষ।

মীনাক্ষী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনল। বলে, দোষ তোমারই বাবা। ওরা কি করবে না করবে, কুটুম্বমানুষ তুমি তার মধ্যে কথা বলতে যাবে কেন?

কথার মধ্যে থাকব না—বলিস কি তুই? বুকের জ্বালা, তাই বলতে হয়। বিষয় সম্পত্তির দফা নিকেশ—চালাবে কেমন করে? পানসি ভরে বরসজ্জা পাঠিয়েছি, মাথা থেকে পা অবধি তোকে গয়নায় সাজিয়ে দিয়েছি—তার এক কণিকা থাকবে না। বেচে খাবে একটা দুটো করে। শেষ হয়ে গেলে তখন কি হবে এই ফুটো-ইজ্জতের? ভিক্ষের ঝুলি তখন যে কাঁধে!

সন্ত্রস্ত হয়ে মীনাক্ষী বলে, চুপ করো বাবা। পায়ে পড়ি তোমার। যা বললে কক্ষনো আর উচ্চারণ কোরো না। রায়বাড়ির দেয়ালেরও কান আছে।

থাকল তো বয়ে গেল। কানে পড়ে কি করবে? সাগরচক তো জলের সাগর। ভিখারি এখনই, এত ডাঁট তবে কিসের শুনি? তুই চলে আয় আমার সঙ্গে। এবারই নিয়ে যাব। সোনাছড়ি ভাইদের সঙ্গে না থাকতে চাস, তোর জন্যে আমি আলাদা পাকা-ব্যবস্থা করব।

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে মীনাক্ষী বলে, এদের সর্বনাশ দেখে এসে তোমার মন ভাল নেই বাবা। চলে যাও তুমি এবাড়ি থেকে। মন খারাপ সকলেরই। ভয় করছে, আমারও মুখ দিয়ে বেয়াড়া কথা বেরিয়ে না পড়ে। তখন বলবে, মেয়ে হয়ে তুই অপমান করলি।

॥ পাঁচ ॥

রাত দুপুর। ঘুম ভেঙে মীনাক্ষী ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দেখে, ধ্রুব নেই—সেই আর এক রাত্রের মতো বেরিয়ে পড়েছে। কুলুঙ্গিতে সারা রাত রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে—আবছা অন্ধকার, কেমন একটা রহস্যময় থমথমে ভাব চারদিকে। ছোটখাট এক মাঠের মতন বিস্তৃত কক্ষ, অত্যুচ্চ ছাত, তারই সঙ্গে নিতান্ত বেমানান ছোট ছোট ঘুলঘুলি আর আঁটো-মাপের দরজা—এই রাত্রে মনে হচ্ছে, ঘরবাড়ি নয়, রাক্ষসের বিশাল জঠর। তার ভিতরে এসে পড়ে মীনাক্ষী তিলে তিলে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কী করবে সে, কেমন করে বাঁচবে? ডাক ছেড়ে কেঁদে ফেলে বুঝি নিশুতি রায়বাড়ি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে।

কিরণবালা যখন তখন বলে, পুরুষমানুষ বিশ্বাস করতে নেই ভাই নতুন-বউ—এ রায়বাড়ির পুরুষ তো কিছুতেই নয়। মুখ দেখে, মুখের হাসি আর কথাবার্তা শুনে সেকালে কোন বউ ধরতে পারেনি সেই পুরুষই ডাঙায়-জলে সারারাত্তির উৎপাত করে বেড়িয়েছে।

একালে এসে বংশের রীতিনিয়ম বাতিল কি একেবারে—এই ধ্রুব-ভানুর মধ্যে? শহরের আর বিদ্যার আবহাওয়ায় রক্ত একেবারে শীতল হয়ে গেছে? কে জানে। ধ্রুবর বুকে মাথা রেখে মীনাক্ষী পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। একঘুমে রাত কাবার। সকালবেলা মীনাক্ষী উঠে পড়বার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ধ্রুব ঘুমোয়। তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, দেবতার মতো প্রসন্ন হাসি ঘুমন্ত মানুষের মুখে। কিন্তু কে জানে, বিশ্বাস

নেই এই রায়বাড়ির পুরুষকে—রাত্রে কোন এক মুহূর্তে হয়তো পিতৃপুরুষের উচ্ছৃংখল রক্ত দেহের মধ্যে টগবগিয়ে ওঠে। বেরিয়ে পড়ে টিপিটিপি। শেষ-রাত্রে ফিরে এসে আবার দেবতা হয়ে ঘুমোয়। মীনাক্ষী টের পায় না।

বাদার বাঘ রায়বাড়ির পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়—এদের কত রকমের ছলাকলা, কে তার হদিস দিতে পারে?

খুটখুট খুটখুট একটা ক্ষীণ আওয়াজ যেন বাইরে। অতি ক্ষীণ—কান পেতে থাকলে তবেই একটু একটু শোনা যায়। সুসম্বন্ধ তাল রয়েছে—নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যেন এই ঘুমন্ত প্রাচীন অট্টালিকার বুকের উঠানামা। আওয়াজ, বুঝতে পারছে, কক্ষের বাইরে অলিন্দের উপর। খুটখুট খুটখুট। একেবারে দরজা অবধি এসে পড়ছে এখন, এসে তক্ষুনি আবার ফিরে যায়।

দরজা ভেজানো, কী সর্বনাশ! খিল দেওয়া নেই। এই দরজা খুলে ধ্রুব বেরিয়ে গেছে। খাট থেকে মীনাক্ষী নেমে পড়ল—টিপিটিপি গিয়ে খিল এঁটে দেওয়া যাক। আওয়াজটা খুটখুট করে এই সময় একেবারে চৌকাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছে। খিল না দিয়ে মীনাক্ষী দড়াম করে খুলে ফেলল দু-দিকের দুই কবাট।

ধ্রুব!

সদীর্ঘ অলিন্দের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ধ্রুবভানু পায়চারি করছে। থামের পাশ দিয়ে চন্দ্রালোক তেরছা হয়ে পড়েছে—সেই আলো এক একবার মুখের উপর ঝিকমিকিয়ে ওঠে। চলছে যেন ঘড়ির পেন্ডুলাম, দেহের মধ্যে প্রাণ বলে বস্তু নেই। দরজা খুলে মীনাক্ষী বাইরে চলে এসেছে, তবু ধ্রুবর নজরে আসে না। চোখ মেলে থেকেও যেন সে কিছু দেখছে না। শয্যার উপরের পাশাপাশি সেই মানুষটি নয়—প্রেতলোক থেকে সদ্য নেমে এসেছে আলাদা এক ধ্রুব।

গা কাঁপে, বুক শুকিয়ে আসে। ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে মীনাক্ষী তার হাত জড়িয়ে ধরল।

আচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলে যেন ভিন্ন এক জগৎ থেকে ধ্রুব প্রশ্ন করে, কি মীনা?

মীনাক্ষী কেঁদে বলে, ওগো, আমার ভয় করছে। যা ছিলে তুমি তেমনি হও।

নিঃশব্দে বধূর সঙ্গে সে ঘরে ঢুকল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে বেদনাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মীনাক্ষীর দিকে।

গা শিরশির করে মীনাক্ষীর। বলে, কি হয়েছে, খুলে বলো আমায়। বলো, বলো—

ধ্রুব সহসা বলে উঠল, তোমার গয়নাগুলো আমায় দাও।

হায়রে হায়, রূপসী যুবতী বউটাকে চোখে দেখতে পেল না, দেখছিল এতক্ষণ গা ভরে যে সব ছাইভস্ম পরে আছে। গায়ের গয়না হঠাৎ এক চাংড়া আগুন হয়ে ওঠে, গা যেন পুড়েজ্বলে যাচ্ছে মীনাক্ষীর, ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে বেঁচে যায়।

ধ্রুব আবার বলে, দিয়ে দাও গয়নাগুলো। আমার বড্ড দরকার।

কাতর অনুনয়ের কন্ঠ। সম্ভবত জলে-ডোবা সাগরচক নিয়েই ব্যাপার। নতুন বাঁধ বাঁধতে লোক লাগাবে। কিম্বা পুরানো কোন ঋণ মাথার উপর চেপে আছে, গয়না দিয়ে দায়মুক্ত হবে। সেই উদ্বেগে ঘুম নেই চোখে। নিশি-পাওয়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেন, কি বৃত্তান্ত—এতসব জিজ্ঞাসার সাহস নেই। ইচ্ছাও করছে না। চোখ ছলছলিয়ে এলো মীনাক্ষীর। ছাই গয়না! গয়না চলে গিয়ে রাতভোর তোমায় যেন

পাশটিতে পাই। একটি কথাও না বলে মীনাক্ষী একে একে গায়ের গয়না খুলে দিল।

ধ্রুবভানু বলে, আরও দাও মীনা, যেখানে যা-কিছু আছে। তোমার বাক্সপেঁটরায় যত কিছু আছে, সমস্ত গয়না চাই আমার।

বাক্স খুলে আরও যত ছিল মীনাক্ষী বের করে খাটের উপর রাখে। মধুর হেসে বলে, আর নেই—

মণিবন্ধে মকরমুখ কঙ্কণ দুটি—মকরের দু-জোড়া চোখে লাল-টুকটুকে পাথর বসানো। ধ্রুবভানু আঙুল দেখায়ঃ ঐ যে—

সৌভাগ্যকঙ্কণ—ঠাকুরমা আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছেন।

হাত দুটি তাড়াতাড়ি শাড়ির নিচে ঢুকিয়ে নেয়। বলে, আমি দেবো না। সৌভাগ্য শুধু রেখে দিচ্ছি, এ কাউকে দেওয়া যায় না।

সমস্ত—সমস্ত চাই। গয়না একখানাও থাকবে না—গায়ে কিম্বা ঘরে।

মানুষের কণ্ঠ নয়, ধ্রুবর গলার মধ্য দিয়ে আচম্বিতে বাঘে যেন গর্জন করে উঠল। মীনাক্ষীর বুক কেঁপে ওঠে। না দিলে সৌভাগ্যকঙ্কণ বুঝি হাত মুচকে কেড়ে নেবে।

ভয়ে ভয়ে মীনাক্ষী কঙ্কণ খুলে দেয়। দু-হাতে দুটি শ্বেতশঙ্খ মাত্র।

কম নয়, স্তূপাকার গয়না আলো পড়ে ঝিকমিক করছে, দু-হাতের অঞ্জলি ভরে ধ্রুব তুলে তুলে দেখে। গয়না পেয়ে হাসি ফুটল এবার মুখে। শীতের তত্ত্বের শালখানা খুলে সমস্ত গয়না একত্র করে বাঁধল। পুঁটলিটা একবার উঁচু করে তুলে ওজনের আন্দাজ নিয়ে নেয়।

ধ্রুবর হাসি দেখে মীনাক্ষীর মনের মেঘ কাটল। সে-ও হাসে। বলে, আমি দেখি—

দেখাদেখি সে-ও তুলতে গেল। সহজ নয়। সোনার বড় বিষম ওজন। তুলতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। হাত ফসকে পুঁটলি পড়ে গেল খাটে।

ধ্রুব বলে, উঃ, কত দিয়েছেন! বাবা শুধু পণের টাকা চেয়েছিলেন, পণের উপরে বাড়তি সোনা কি জন্য দিতে গেলেন আমার মতন পাত্রকে!

চুপ! মীনাক্ষীর আদরের তাড়ায় ধ্রুবর কথা থেমে যায়। হেসে মীনাক্ষী বলে, মেকি মেয়েটা গছালেন যে! শ্বশুরঠাকুর না-ই চাইলেন, নিজেদের আক্কেল-বিবেচনা থাকবে না! গয়নায় একটু ঝিকঝিকে হয়ে তবেই না তোমার পাশে দাঁড়াতে পারলাম!

ধ্রুব বলে, তা নয়। কেন দিয়েছেন জানো—নির্গুণ জামাই দুঃসময়ে বেচে খেতে পারবে সেইজন্য। শ্বশুরমশায়ের দূরদৃষ্টি আছে।

মীনাক্ষী শিউরে উঠল। লালমোহনের কাছে যে কথা বলেছিল সত্যি সত্যি তাই যে! রায়বাড়ির দেয়াল শুনতে পায়। শুনে রেখেছিল তাদের বাপে-মেয়েয় কথা—জামাই গয়না বেচবে, লালমোহনের সেই রাগের কথাগুলো। তারপর নতুন মনিবের কাছে যথাকালে পৌঁছে দিয়েছে।

ভাল করে তখনো সকাল হয়নি। হঠাৎ বৃন্দাবনকে দেখা গেল।

কি খবর?

ভাল খবর খোকাবাবু। গাঙ যা চেয়েছিল, তাই হয়েছে—দুই গাঙে মিলেমিশে চকের ভিতর দিয়ে সোজা পথ করে নিল। পাশে পাশে মাটি ফেললে এখন আর বোধহয় গোলমাল করবে না, নতুন পথে ঠাণ্ডা ভাবে আপন মনে চলবে। মুরুব্বিরা তাই বলছে। চক ছোট হয়ে গেল, কিন্তু বেঁধে ফেলতে পারলে ফলন আগেকার চেয়ে বেশি বই কম হবে না।

যে জন্য বৃন্দাবন এতদূর চলে এসেছে—মবলগ টাকার দরকার সেই বাঁধবন্দির জন্য। তাড়াতাড়ি চাই—বৃন্দাবনরা নতুন আবার যে অনিশ্চিত পন্থা ধরেছে তার উপরে ঠিক নির্ভর করা যাচ্ছে না।

ধ্রুবর কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো। বলে, কিছুই নেই তোমাদের খোকাবাবুর। একেবারে কিছু নেই। ঐরাবত পড়ে পড়ে তাই ব্যাঙের লাথি খায়।

নাছোড়বান্দা বৃন্দাবনঃ না হলে উপায় নেই। কাছে না থাকে ধারকর্জ করে ব্যবস্থা করো খোকাবাবু। একটা-দুটো বছরের মধ্যে নিশ্চিত শোধ।

লালমোহনের নাম উঠে পড়ল। বৃন্দাবন বলে, তোমার শ্বশুর টাকার আন্ডিল। মুখ ফুটে বলতেও হবে না, দায়ের কথাটা কোন রকমে তাঁর কানে তুলে দাও—

ধ্রুব আগুন হয়ে বলে, রায়বাড়ি গরিব হয়েছে, তার উপরে আবার ভিখারি হতে বলছ বৃন্দাবন-কাকা? চুলোয় যাকগে বাঁধ আর চক—

জোর দিয়ে আবার বলে, কোন দায় আমি মানিনে। ঐ মরীচিকার পিছনে ছুটে বাবার সর্বনেশে পরিণাম—আবার আমায় যেতে বলো? করজোড় করছি, অব্যাহতি দাও তোমরা আমায়—

ছেলেমানুষ বড় বেশি রকম ভেঙে পড়েছে। বৃন্দাবন ধমক দেয়ঃ রায়বাড়ির ছেলে না তুমি? এমনি কথা বেরোয় কেমন করে মুখ দিয়ে?

রায়বাড়ির কুলাঙ্গার। সুখ আর শান্তির সামান্য জীবন চাই আমি। সাগরচক রায়বাড়ি জাঁকজমক মানইজ্জত সমস্ত তোমাদের। আমি বেমানান এর মধ্যে।

সত্যি সত্যি তাই। বাদাঅঞ্চলের উদ্দাম জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে ধ্রুবর কাছে। পুরানো দিনকাল গত হয়ে গেছে। তার শিক্ষা ও রুচির সঙ্গে কোন রকমে আর খাপ খাওয়াতে পারে না। মূল্যহীন এত আড়ম্বর-ঐশ্বর্যের প্রয়োজন নেই—একটা ছোট্ট সুখী সংসার চায় সে, দুটি সৎ শান্ত প্রেমময় জীবন। জোলো-ডাকাতের অভিশপ্ত এই রায়বাড়িতে থেকে কোনদিন তা সম্ভব হবে না। হতে দেবে না এরা। কলকাতায় জানাশোনা সকলকে চিঠিপত্র লিখবে। দেশান্তরী হবে একটা কোন ব্যবস্থা হলে, পালিয়ে যাবে চিরদিনের মতো।

কানেই নিল না ধ্রুবভানু। কি করবে আর বৃন্দাবন—বিরস মুখে ফিরে যাচ্ছে।

ধ্রুব বলে, একটু দাঁড়াও। আমি যাবো তোমার ডিঙিতে। পথে নামিয়ে দিও।

মীনাক্ষীর গয়নার বোঝা কাপড়েচোপড়ে জড়িয়ে পোঁটলা হয়েছে দিব্য একটা। কাপড় ছাড়া যেন অন্য কিছু নয়। পোঁটলা হাতে ধ্রুব বৃন্দাবনের ডিঙিতে উঠল।

॥ ছয় ॥

সেই দিন সেই রাত্রি ধ্রুবভানুর দেখা নেই—পরের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সে বাড়ি ফিরল। ক্লান্তিতে আধখানা, কিন্তু তৃপ্তি আর আনন্দে যেন নেচে নেচে আসছে। কোন এক বড় দায় কাটিয়ে এসেছে, সেটা আর জিজ্ঞাসা করে নিতে হয় না।

কতকাল পরে ধ্রুবকে এমন চঞ্চল এত হাসিখুশি দেখছে—মীনাক্ষীর বড় আনন্দ। গয়না গেছে তো বয়ে গেছে—সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু কেন নিল ধ্রুবভানু, কি বৃত্তান্ত—অমন ডাকাতের মতন লুটেপুটে নিতে গেল কেন? সেই রাত্রির পর থেকেই মীনাক্ষীর কেমন এক আতঙ্ক হয়েছে, শতেক বার ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম ভেঙে দেখতে পায়, বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে ধ্রুবভানু—দুটি হাতে বেষ্টন করে আছে তাকে। এখন ঘুম আর এতটুকুও বিচলিত নয়। গয়না বিদায় হয়ে বউয়ের এই

বেশ নতুন গয়না হল—বরের দুখানা বাহু কণ্ঠহার হয়ে গলায় রয়েছে, ভালবাসার মিষ্টি আবেশ সর্বঅঙ্গ আর মনপ্রাণ জুড়ে গয়নার ঝিনিমিনির মতো বাজছে। ভারি জাঁকের গয়না।

সোনার বোঝা ফেলে ভারমুক্ত এবার মীনাক্ষী। সে ছিল অহংকারের বোঝা, অস্বস্তির বোঝা। ঐ এক ব্যবধান ছিল তার আর ধ্রুবর মধ্যে—ফুটত কাঁটার মতন। বাধা মুছে গিয়ে দুজনে মিলে গিয়ে এক—একজন।

বাড়ির মধ্যে সকলের নজরে আসতে লাগল।

গোবিন্দসুন্দরী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন: তোমার গা এমন খালি কেন বউমা? গয়না কি হল?

খুলে রেখেছি। বড্ড ভারী পিসিমা, বয়ে বেড়াতে কষ্ট হয়।

গোবিন্দসুন্দরী গালে হাত দিয়ে বলেন, ওমা আমার কী হবে! মেয়েমানুষের গায়ে নাকি গয়না ভারী! দাঁড়িপাল্লায় মেপে দিক না একমন সোনা, পাখির পালকের মতো যে-না-সে হাসতে হাসতে সেই সোনা গায়ে বয়ে বেড়াবে। তোমার ও-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না বউ—আছে অনেক বলে দেমাক দেখাচ্ছ, তাই বলাবলি হবে।

কিরণবালা চোখমুখ ঘুরিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে বল না ভাই নতুন-বউ? ঝগড়াঝাটি হল বুঝি?

হাসিতে ভেঙে পড়ে মীনাক্ষী: দূর!

তা-ও বটে! ঝগড়াঝাটির পর এত হাসিস্ফূর্তি আসে না মেয়েমানুষের। কিরণ যে বড্ড ভুগেছে। ব্যাপার তবে অন্য-কিছু।

জবাব একটা মীনাক্ষী ইতিমধ্যে ভেবে নিয়েছে। বলে, রেখে দিয়েছি সামাল করে। মাগো মা, যা সব চুরি-ডাকাতির কথা শুনতে পাই তোমাদের অঞ্চলে।

কিরণ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, আর যেখানে হোক, এ বাড়ি কখনো নয়। এখন অবধি এরা সর্দার-মান্য পেয়ে আসছে।

রায়বাড়ি স্ত্রীলোক অনেক। কানাকানি সকলের মধ্যে, কথা ক্রমে বাহির-মহলে চলে যায়। সেখান থেকে পাড়ার মধ্যে।

সরকারদের বউ সৌদামিনী এসে বলে—হয়তো বা পরখ করবার অছিলায়—তোমার কংকণজোড়া একটুখানি দাও নতুন-বউ। স্যাকরা এসে বসে আছে, তাকে দেখিয়ে এক্ষুনি আবার দিয়ে যাবো। পাথর-বসানো ঐ রকম মকরমুখ দিয়ে আমি অনন্ত গড়াব।

মীনাক্ষীকে অগত্যা স্বীকার করতে হয়: গয়না ওঁর কাছে দিয়েছি ভাই। উনি কোথায় সামাল করে রেখেছেন।

কিরণবালা এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে সে বলে, এই মরেছে! নেকী মেয়েমানুষ তুই। পুরুষের হাতে গয়না কেউ দেয় নাকি—তার উপর এই বাড়ির পুরুষ?

সৌদামিনী বলে, আছে তো কাছে, না চলে গেছে অন্য কোথাও? কিছু বিচিত্র নয়। তুমি ভিন্ন জায়গার মেয়ে, এখানকার রকমসকম জানো না। গয়না চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিও, কাছ-ছাড়া কোরো না। ঘরের পুরুষ ভাল হয়তো বড্ড সুখের কথা। তাই বলে একেবারে গা ঢেলে কেন বিশ্বাস করতে যাবে?

বলছে সৌদামিনী, আর বাঁকা-হাসি হাসে কিরণবালার দিকে চেয়ে চেয়ে। হাসি দেখে মীনাক্ষীর বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। অজানা শংকায় বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করে। কঠিন হয়ে বসে থাকে, মাথা ঘুরে না পড়ে যেন এদের

সামনে।

কিরণবালা পিঠ পিঠ আবার এক গল্প শোনাল—রায়েদেরই বড়তরফের ব্যাপার। ফুল-বউয়ের হাতের রুলি চুরি গেল। নিরেট সোনার জিনিস, বিস্তর দাম। হৈ হৈ পড়ল বাড়ির মধ্যে। বড়বাবু রগচটা মানুষ, চাকরবাকর ধরে পিটুনি : চোর কি বাইরে থেকে এসেছে? বাড়ির মানুষ তোরাই কেউ সরিয়েছিস, প্রাণে বাঁচতে চাস তো সরলভাবে স্বীকার কর। স্বীকার করল এক ছোকরা-চাকর, না করে রেহাই ছিল না। জেলে যেতে হল ছোকরাকে। সেই রুলি তারপরে পাওয়া গেল জেলেপাড়ায় এক জেলের মেয়ের হাতে। ঠসক করে মেয়েটা মেলায় গিয়েছিল, বেলডাঙার একজনে তার হাতের রুলি দেখে এসে বড়বাবুকে বলল। খাঁটি বৃত্তান্ত তখন বেরিয়ে পড়ে : চোর অপর কেউ নয়, খোদ ফুল-বাবুই। প্রণয়োপহার দিয়েছেন ঘুমন্ত স্ত্রীর হাত থেকে গয়না চুরি করে নিয়ে। চাকরটা জেল খাটছে তখনো। চুপ, চুপ—ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে চাউর না হয় যেন। তেমন মানুষ বড়তরফের ঐ ফুল-বাবু একলা নয়, নিয়মই এই রায়বংশের। তাই বা কেন, সব পুরুষমানুষই এই। ধ্রুবভানুও যে একনিষ্ঠ, বিশ্বাস করা শক্ত। হয়ে থাকে তো সেটা ব্যতিক্রম।

হপ্তা খানেক কেটেছে। কিরণবালা হঠাৎ রায়বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে চলল। বিস্তর চোখের জল ফেলেছে হতভাগী, ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। বরের সুমতি হয়েছে, পালকি পাঠিয়েছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। কার মুখে যেন আগেই শুনেছে, সেই রমণী মারা গেছে বরকে যে ছিনিয়ে নিয়েছিল। পালকির সঙ্গে বর নিজে আসেনি—লজ্জা হয় বোধকরি এবাড়ি মুখ দেখাতে। হা-হুতাশ করে চিঠি পাঠিয়েছে—একটা কিরণের নামে, একটা গৃহকর্তা ধ্রুবভানুর নামে।

আহা ভাল হোক—মেয়েটা বড় দুঃখী। বিধবা মা ভাল ঘর-বর দেখে খরচপত্র করে বিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন পরেই গুহ্যকথা বেরিয়ে পড়ল। বরের অন্যত্র যাতায়াত। বুঝতে শিখে কিরণবালা ঝগড়াঝাটি করল তো দূর-দূর করে তাকে খেদিয়ে দিল বাড়ি থেকে। মা ইতিমধ্যে মারা গেছেন—রায়বাড়ির সঙ্গে কী রকমের একটু আত্মীয়-সম্পর্ক, ছোটরায়ের সংসারে এসে জুটল। ধ্রুবকে 'দাদা' 'দাদা' করে। নিশ্বাস ফেলে সকলে : মেয়েটা যৌবনে-যোগিনী হয়ে রইল গো!

কিন্তু যোগিনী-টোগিনী নয়—যোগী তো ঈর্ষা-ঘৃণা-নিন্দার ঊর্ধ্বে। রাগে টগবগ করত কিরণবালা। পুরুষমাত্রই ইতর—ছুঁচো-কেন্নোর মতো ঘৃণার জীব, এমনিতরো ভাব। পুরুষের নানা উচ্ছৃংখল কাহিনী সদাসর্বদা কিরণের মুখে। রায়বাড়ির সেকালের পুরুষদের কথা, এবং বাইরের পুরুষের যত রকম কেচ্ছা শোনা আছে। নতুন-বউ মীনাক্ষীর সঙ্গে বড় ভাব, তার কাছে গল্প করে। গল্পের পর গল্প শুনিয়ে যায়। বলে, পতিব্রতা কথাটা খুব চালু রামায়ণ-মহাভারত অষ্টাদশপুরাণে। এর উল্টো পত্নীব্রত কথা পেয়েছিস কোথাও? নেই আদপে জিনিসটা, কথার চলন হবে কি করে?

এক ব্যাপার ঘটেছিল। মীনাক্ষী আর কিরণে তো বড় ভাব। মীনাক্ষী চুল বেঁধে দেবে কিরণবালার। কিরণ ঘাড় নাড়ে : কী আমার সুখ দেখতে পেলি ভাই নতুন-বউ, খোঁপা বাঁধতে এসেছিস?

বত্রিশ রকমের খোঁপা শেখা আছে মীনাক্ষীর, খাসা খাসা সেই নামগুলো বলে যায়। বলে, মানুষ না পেলে ক্ষমতা দেখাই কোথা কিরণ-ঠাকুরঝি? চর্চার অভাবে ভুলে

যাচ্ছি। একমাস ধরে আমি খোঁপা বেঁধে যাবো—নিত্যি নতুন নতুন। আজকে যে রকমের বাঁধলাম, কাল সে রকমের নয়।

কিরণবালা বলে, তুই তো ভাই, ক্ষমতা দেখিয়ে খোঁপা বাঁধলি। সে খোঁপা আমি দেখাই কার কাছে? কাজ নেই নতুন-বউ, তোর খোঁপা বরঞ্চ আমি বেঁধে দিই—সাদা-মাটা যেমন জানি। তোর দেখাবার মানুষ আছে।

মীনাক্ষী ঘাড় নাড়ে, সেই বা কম হল কিসে? দেবে না।

কলহ। অবশেষে সন্ধি হল, দুজনেই দুয়ের খোঁপা বাঁধবে। খোঁপা শেষ করে কিরণের সিঁথিতে মীনাক্ষী সিঁদুর আঁকতে যায়।

না, না, না—চিৎকার করে ওঠে কিরণ। ডুকরে কেঁদে ওঠার মতো শোনায়ঃ খোঁপা অবধি তোর কথা রেখেছি নতুন-বউ, তার উপরে আর সহ্য হবে না। আমি সিঁদুর পরিনে।

অবাক হয়ে মীনাক্ষী বলে, কেন?

ঘেন্না করে। সেই পাষণ্ডের নামে সিঁদুর ছোঁয়ালে জ্বালা করে উঠবে কপাল। জন্মজন্মান্ত কুমারী হয়ে থাকি, তবু অমন স্বামী না জোটে যেন কপালে।

মীনাক্ষীর গৌরমুখে হঠাৎ কালি মেড়ে দিল। আর একটি কথাও বলে না। এবারে তার চুল কিরণবালা বাঁধছে। আঁচড়ে গুছি-গুছি করে নিয়ে বুনন করে যায়। পাড়াগাঁয়ে খোঁপা-বাঁধার যে চিরকেলে পদ্ধতি। মীনাক্ষীর একবিন্দু নড়াচড়া নেই, পুতুল হয়ে বসে আছে।

খোঁপা শেষ করে কিরণবালা সিঁদুরকৌটো খুলেছে। মীনাক্ষী বলে ওঠে, না—

নতুন-বউয়ের গলা শুনে কিরণবালা থতমত খেয়ে যায়। কথায় যেন ছুরির খোঁচা হানলঃ না, না, না—

বলে, আমার সিঁথি-ভরা সিঁদুর। জন্ম জন্ম যেন এমনি সিঁদুর পরে থাকতে পারি। নিষ্ঠুর হোন স্বামী, অত্যাচারী খুনে হোন, তা হলেও পরব। নিজের হাতে সিঁদুর পরব আমি। মাপ করো ঠাকুরঝি, যার কপালে সিঁদুর নেই তার হাতে পরিনে আমি। অলক্ষণ!

খুব রাগ হয়েছিল কিরণবালার। সেই থেকে নতুন-বউয়ের চুল বাঁধতে আর আসেনি।

সেই কিরণবালা আজ খুশিতে ডগমগ। মীনাক্ষীকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বলে, যাচ্ছি ভাই নতুন-বউ। বয়সে ছোট তুই, আশীর্বাদ চাইতে পারিনে। যেন আবার ফিরে না আসতে হয়, আমার জন্য ঠাকুরের কাছে বলিস।

স্বামীর আহ্বান পেয়েই চলে যাচ্ছে। এত কালের অবহেলা মনে নেই। মনে রাখলেই তো জ্বালা। জনে জনের কাছে বলে বড়দের পায়ের ধুলো নিয়ে সে পালকিতে উঠে বসল।

সবাই বলাবলি করছে, দুঃখী মেয়েটা। কতদিন ধরে নিশ্বাস ফেলছে। আহা, বরের সোহাগ পায় যেন এবার। যেন শান্তির সংসার হয়।

কেবল গোবিন্দসুন্দরী মুচকি হাসেন। হাসির রকম দেখে বোঝা যায় ভিতরে গূঢ় রহস্য।

কথাটা ভাঙুন না পিসিঠাকরুন। কি ব্যাপার?

ধর্মের কল বাতাসে নড়বে। সবুর করো না ক'টা দিন—জানতে কারো বাকি

থাকবে না। আমায় কেন নিমিত্তের ভাগী করো ?

সত্যি বলতে কবে আপনি ডরান পিসি ? ধর্মের কল যবে হয় নড়বে, এখন তো আপনার মুখে শুনি।

বড় চাপাচাপিতে গোবিন্দসুন্দরীকে অগত্যা বলতে হয়।

স্বামী না কচু ! বাড়ির মধ্যে থেকে আমার চোখ-কান ফাঁকি দেবে, সে মানুষ এখনো জন্মায়নি। ধ্রুব নতুন-কর্তা এখন—সাবেকি কর্তারা যা ছিলেন, সে কি আর আলাদা-কিছু হবে ? বাঘের সন্তান কাঠবিড়াল হয় না, বাঘই হয়ে থাকে। বলেই ফেলি তবে। নতুন-বউয়ের গয়না আগে নিয়ে মজুত করা ছিল, পরবার মানুষটা এদ্দিনে গিয়ে পড়ল। কিরণবালার সর্বাঙ্গ দেখগে গয়নায় মুড়ে দিয়েছে। কিন্তু খবরদার খবরদার, নতুন-বউ এ সমস্ত জানতে না পারে। কষ্ট পাবে ছেলেমানুষ।

শেষটুকু জুড়ে দেওয়ার ফলে মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না মীনাক্ষীর কানে পৌঁছতে। সকল কথা সবিস্তারে বলে সংবাদদাতা সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধ দিয়ে ছেলেমানুষ বউয়ের উপর কর্তব্য করে। ছেড়ে দাও না গোবিন্দঠাকরুনের কথা। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় !

বাড়ি-ভরা নিষ্কর্মা মানুষ—একটা-কিছু পেলেই হল। ফুসফুস গুজগুজ। দুটো দলে দাঁড়িয়েছে দস্তুরমতো। একদল বলে, বাজে কথা। আর একদল প্রত্যক্ষদর্শী : কতদিন দেখেছি, ছুঁড়িটা হাসাহাসি করছে ধ্রুবর সঙ্গে। দেখেছেন, তবু কেউ রা কাড়েন নি গোবিন্দসুন্দরী ধরতা দেবার আগে।

কী হল মীনাক্ষীর, মুখ তুলতে পারে না কারো দিকে। বিশাল অট্টালিকার ইটকাঠ অবধি কানাকানি করছে বুঝি। ঘরে ঘরে কুলুঙ্গি ও পুরানো ফাটলগুলোর মধ্যে প্রশ্ন যেন হাঁ করে আছে : ও নতুন-বউ, তোমার বাবা আপাদমস্তক সাজিয়ে গয়না দিয়েছিল, কোথায় গেল সে জিনিস ? কার জন্যে দিয়েছিল, আর কে পরছে ! নিশিরাত্রি অবধি জেগে বসে থাক, স্বামীপ্রভুটি থাকে কোথা তখন ? কী মনে হচ্ছে ভুক্তভোগী কিরণবালার কথাগুলো—সিঁথিতে সিঁদুর দিতে ইচ্ছা হয়, ভাল লাগে সাজ করতে ?

না, না, না,—সভয়ে মীনাক্ষী ঝগড়া করে নিজের মনের সঙ্গে। কপালে বেশি করে সিঁদুর লেপটে দেয়। গয়না না থাক, কাপড়ে-চোপড়ে বাড়াবাড়ি রকমের সাজ করে বসে থাকে।

একদীন মীনাক্ষী মরীয়া হয়ে ধ্রুবভানুকে জিজ্ঞাসা করল, গয়না নিয়ে কি করলে ? কাছে আছে তোমার ?

না, বেচে খেয়েছি।

লালমোহন মিত্তিরের কথাগুলোই অবিকল ছুঁড়ে মারে তাঁর মেয়ের গায়ে। ভ্রূকুটি করল ধ্রুব বধূর দিকে। বলে, হঠাৎ গয়নার কথা কেন ? যেদিন সমস্ত দিয়ে দিলে তখন তো একটি কথাও বলো নি।

মীনাক্ষী থতমত খেয়ে বলে, এমনি—

ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় সামনে থেকে। পালিয়ে যেন বাঁচল।

তারপরে অহোরাত্র ধ্রুবভানুর মনে কাঁটার মতো খচখচ করে : গয়নার শোক হঠাৎ উথলে উঠল—আসল কথাটা কি বড়লোকের মেয়ের মনে মনে ? সাগরচক গিয়েছে, সেই দারিদ্র্যে আজ নিজের স্ত্রীও ব্যঙ্গ করে ?

নিভৃতে পেয়ে একদিন রূঢ়ভাবে সে মীনাক্ষীর হাত চেপে ধরে গয়নায় কথা কি ভেবেছ, সত্যি করে বলো। স্পষ্টাস্পষ্টি জানতে চাই।

ইদানীং এমন হয়েছে, মীনাক্ষী যার মুখের দিকে তাকায়, বাঁকা-চোখ ও চাপা হাসি দেখে যেন সেখানে। দেখে দেখে ক্ষেপে গিয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলল, আমার সৌভাগ্যকঙ্কন সেই গয়নাগুলোর মধ্যে। ঠাকুরমা পরিয়ে দিয়েছিলেন। একেবারে বিক্রি না করে যদি বন্ধক দিয়ে থাকো—

কি হবে তাহলে? বড়লোক বাপের হাতে-পায়ে ধরে বন্ধক ছাড়িয়ে আনবে নাকি?

হাতে-পায়ে ধরতে হবে না। জানতে পেলে নিজে থেকেই বাবা ছাড়িয়ে দিতেন।

যেন মীনাক্ষী নয়—এত কথা অন্য কেউ বলিয়ে নিল তার মুখ দিয়ে।

বলতে বলতে থেমে পড়ে। কেমন করে তাকিয়ে পড়েছে ধ্রুব। এ দৃষ্টি মীনাক্ষী চেনে না, বরের চোখে আর কখনো এ জিনিস দেখেনি। বাঘের কথা শুনেছিল, বাঘ মেরে মেরে রায়বাড়ির এরা সব হয়েছে—বাঘে বুঝি এমনি করেই তাকায় ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে। নির্বান্ধব এই অট্টালিকা যেন মহারণ্য—ভয়াল এক বাঘের মুখোমুখি সেঃ দাঁড়িয়ে। হায়, হায়, কে বাঁচাবে?

মীনাক্ষী কেঁদে বলে, ছাই গয়না। গয়না আমি চাইনে। কথার কথা—একটা ঠাট্টাও কি করতে নেই। আমার ঘরের খবর বাবাকে জানাতে যাবো কেন? রাগ করো না, পায়ে পড়ি তোমার।

কোন কিছুই ধ্রুবর কানে অবধি পেঁছিয় না। সে বলে যাচ্ছে, ঠিক-ঠিক সেই জিনিসগুলো তোমায় দিতে পারব না মীনা। সৌভাগ্যকঙ্কণও গেছে। কিন্তু গয়নায় তোমাকে ঢেকে ফেলব, গয়নার বোঝায় গুঁড়িয়ে দেবো। এই আমার কথা দেওয়া রইল।

॥ সাত ॥

বচসার পর থেকে নতুন উপসর্গ। ধ্রুবভানুকে সন্ধ্যার পর কোনদিন রায়বাড়ি পাওয়া যায় না। ফেরে অনেক রাত্রে। বচসার জন্যে, না অন্য কিছু? যা ওরা বলাবলি করে—কোন এক অজ্ঞাত গৃহের বাসিন্দা কিরণবালার জন্যে? চক্ষুলজ্জার বালাই কেটে আসছে। আর কিছুদিনে রায়বাড়ির সেকেলে কর্তাদেরই একজন হয়ে উঠবে পুরোপুরি।

ঘর ছেড়ে মীনাক্ষী তাদের অলিন্দে এসে দাঁড়ায়। নতুন বর-বউয়ের সেই নিরালা অলিন্দটি। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদী অন্ধকার রাত্রেও চিকচিক করে। অট্টালিকা নিশুতি, নিঃশব্দ। কল্লোলধ্বনি অস্পষ্ট কানে আসে চাপা কান্নার মতো। মীনাক্ষীর মনপ্রাণ ঐ সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাঁদে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে একসময়ে সে গিয়ে পড়ে বিছানায়।

ধ্রুব আসে অনেক—অনেক পরে, রাত্রি প্রায় শেষ করে। মীনাক্ষী সমস্ত টের পাচ্ছে। ঘুমের ভান করে পড়ে আছে, সন্ধ্যা থেকেই ঘুমোচ্ছে যেন। কথাবার্তা দুজনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত, নিতান্ত যেটুকু নইলে নয়। ধ্রুব ক'দিন থেকে উসখুস করছে, নিভৃতে হয়তো কিছু বলতে চায়। মীনাক্ষী সুযোগ দেবে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কাজের অছিলায় সর্বক্ষণ অন্যদের কাছে থাকে। কী হবে আজেবাজে মিথ্যেকথা শুনে? তোমাকেই যখন হারিয়েছি, কথা বলে তুমি কোন সান্ত্বনা দেবে?

এক রাত্রে অমনি দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে কী কিলবিল করে—মীনাক্ষী লাফিয়ে দু-পা সরে যায়। না, নতুন কিছু নয়—নর্দমার ফোকর থেকে ইঁদুর বেরিয়ে

এসেছিল, মানুষ দেখে পালিয়ে গেল। মানুষগুলো ঘুমোয়, পুরানো বাড়ির অন্ধিসন্ধি থেকে ইঁদুর বেরিয়ে কিচকিচ করে। আর আকাশের অন্ধকারে পাখার ঝাপটা দিয়ে বাদুড় উড়ে বেড়ায় এদিক-সেদিক। এদের সব রাজত্ব এখন, এদেরই এই রাত্রিকাল।

গড়খাইয়ের মুখে হঠাৎ নজর পড়ে। বড়নদী থেকে ডিঙি একটা এসে ঢুকেছে। একটিমাত্র মানুষ। হবে তো ঐ একজনই, সাক্ষি রেখে করবার কাজ এসব নয়। বোঠে বাইছে না মানুষটি, আলগোছে ধরে আছে। জোয়ারের ধাক্কায় ধীরে ধীরে ডিঙি খালের মধ্যে ঢুকে গেল। তেঁতুলতলার অন্ধকারে এসে ডিঙি ও মানুষ অদৃশ্য।

অত দূরের হলেও সে মানুষ চিনতে মীনাক্ষীর ভুল হয় না। তুমি—ঠিক তুমি।

আজকে আর ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে না। কথা মুখোমুখি হয়ে যাক। এগিয়ে মীনাক্ষী সিঁড়ির পাশে চলে গেল।

উঠে আসে ধ্রুব অতি নিঃশব্দে—বিড়ালের চলনে। অলিন্দের উপর পা দিয়েছে, শান্তকণ্ঠে মীনাক্ষী আহ্বান করল, এসো।

ধ্রুব হকচকিয়ে গেছে। কৈফিয়তের ভাবে বলে, পড়াশুনোয় বসি। তেমন কিছু নয় অবশ্য, বইটইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখা। ভাবছি, পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলা যাক এবারে। এত রাত্রি হয়েছে, বুঝতে পারিনি মীনা।

যেন অন্যদিন তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। মীনাক্ষী সকাল সকাল শুয়ে পড়ে, তাই জানতে পারে না।

কৈফিয়ৎটা যথোচিত হয়নি, মনে হল। আবার বলে, বাইরে-বাড়ি নয়—এবার থেকে বইটই এই ঘরে নিয়ে আসব।

সে কি গো! হাসিতে ভেঙে পড়ল মীনাক্ষী। ঘাড় দুলিয়ে বলে, না কক্ষনো না। রায়বংশের পুরুষরা বাইরে বাইরে কত কি করে বেড়ায়। তোমার তো ভাল কাজ—নিরিবিলি বাইরে-বাড়ি বসে পড়াশুনো করা। সন্ধ্যাবেলা অন্দরে আসতে যাবে কেন গো? আমার নাম খারাপ হবে—লোকে বলবে, কুহকিনী বউটা বাঘকে ঘরে পুরে ভেড়া বানিয়েছে।

পড়াশুনো কোন অঞ্চলে সেরে কোন পথ দিয়ে চুপিসারে বাড়ি এসে ঢুকলে সে কি আর দেখিনি আমি! লালমোহন মিত্তিরের মেয়ে মীনাক্ষী, পরিশ্রমী কর্মবীর সজ্জন বাপের মেয়ে পাপজর্জর পড়তি-সংসারে এসে পড়েছে—মনে যা হচ্ছে, মুখে তার এতটুকু ছায়া ফুটতে দেবে না। অপমান তাতে, দুশ্চরিত্র পুরুষের কাছে ছোট হয়ে যাওয়া।

কত বড় হাস্যকর কথা বলেছে যেন ধ্রুব, হাসিতে মীনাক্ষী গলে গলে পড়ছে। বলে, না, ওসব হবে না। সন্ধ্যাবেলা ঘরে এসে কেন বসতে যাবে?

ভিতরে এলো দুজনে। কুলুঙ্গির প্রদীপটা মীনাক্ষী ঢাকা-দেওয়া খাবারের কাছে এনে রাখল, ঢাকা আলগা করে গ্লাসে জল গড়িয়ে দিয়ে জাপটে বসে পড়ল সামনে মেঝের উপর।

ধ্রুব বলে, তোমার খাওয়া হয়েছে তো?

হাসি-ভরা চোখ তুলে মীনাক্ষী বলে, কখন, কখন! রোজই খেয়ে নিই আমি। কি করব—ক্ষিধে আমি মোটে সহ্য করতে পারিনে, তা লোকে যা-ই বলুক।

ধ্রুবভানু সত্যি সত্যি খুশি হয়ে বলে, কে কী বলবে! পুরুষমানুষ কখন কোন কাজে আটকে পড়ে, আর একজনে না খেয়ে কেন বসে থাকবে? আমি এ সব পছন্দ করিনে।

এ কিন্তু মিথ্যা বলেছে মীনাক্ষী। খায়নি সে, কোন দিন খায় না। খেতে

প্রবৃত্তি থাকে না রাত্রের খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে এক রকম।

আচমকা বোমার মতো এবারে সেই প্রশ্ন, যার জন্য মীনাক্ষী আজ তৈরি হয়ে সামনে এসে বসেছে : আমার গয়না কোথা ?

হাতের গরাস মুখে না তুলে ধ্রুব তাকিয়ে পড়ল।

মীনাক্ষী কেটে কেটে বলে, গয়নায় ঢেকে দেবে বলেছিলে যে হাঁকডাক করে। গয়নার ভারে নাকি গুঁড়িয়ে দেবে। কত দেরি সেদিনের ? হাত খালি, কান খালি, গলা খালি—লোকের কাছে মিথ্যে অজুহাত দিতে দিতে প্রাণ যায়। সর্বাঙ্গ ঢেকে কাজ নেই, আমার কল্যাণকঙ্কণ দিয়ে দাও শুধু। তা-ও না পারো তো সাদামাটা কঙ্কণ একজোড়া।

পাবে তুমি, নিশ্চয় পাবে। খাওয়া ছেড়ে ধ্রুব উঠে পড়েছে।

বলে, বাপ-ঠাকুরদার বাস্তুর উপর দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যে আশ্বাস দিইনি। বাপের বাড়ি থেকে যেমনটি এসেছিলে, সোনার সজ্জায় আবার আমি তোমায় তেমনি করে সাজাব। আমার প্রতিজ্ঞা।

সকালে ঘুম ভেঙে মীনাক্ষী দেখে, ধ্রুব কখন উঠে বেরিয়ে গেছে। বাড়িতেই নেই। সমস্তটা দিন কেটে গেল। কোথায় গেছে কেউ জানে না, নকড়ি-গোমস্তা অবধি নয়। কান্না পাচ্ছে বড় মীনাক্ষীর—মানুষটাকে কাছে টেনে রাখবে, তা নয় অপমান করে দূরে সরাল। সামনে খাবার নিয়ে বসে এক গ্রাস খেতে পারল না। কিরণবালাকে একদিন তো বড় বড় বুলি শুনিয়েছিল, নিজের বেলা মাথার ঠিক থাকল কই ?

এবারে যখন দেখা হবে, মাথা খুঁড়বে যে ধ্রুবর পায়ে : চাইনে সোনা, কিছু চাইনে আমি। তুমি কাছে কাছে থাকো। সেই আগেকার মতো আদরে আদরে ভরে দাও। সবচেয়ে দামী সোনা আমার যে তাই।

কিন্তু হয় কই দেখা ? আর কি হবে না কোন দিন ? দুটো দিন ও দুটো রাত্রি কেটে গেছে। ধ্রুব ফিরল না।

বাড়ির এতগুলি লোকের মধ্যে কারো কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই। এই যেন নিয়ম পুরুষমানুষের। ছোটতরফে না হোক, অন্য তরফে হামেশাই এ রকম ঘটে থাকে রায়বাড়ি। কিন্তু মীনাক্ষী যে অঞ্চলের মেয়ে সেখানে এ জিনিসের মার্জনা নেই। বাঘ পোষ মানানোর বড্ড দেমাক করে এসেছিল, আজ মীনাক্ষী কোথায় মুখ লুকোবে ভেবে পায় না।

আরও অতিষ্ঠ করে তুলছে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা যখন তখন দরদ জানিয়ে। গোবিন্দ-সুন্দরী বলেন, সোনার অঙ্গ কালি করে ফেললি যে দিদি, আয়না ধরে দেখেছিস ? হয়েছে কি শুনি! কাঁচা বয়সে পাকসাট অমন সবাই মেরে থাকে, রক্তের জোর কমলে আপনি সেরে যাবে। স্ফূর্তি করে খাবি-দাবি, দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিবি। তোদের বয়সের খেলাই তো এই—রাধাকৃষ্ণের মান-অভিমান। আমি তো বলব, একটানা পিরীতে সুখ নেই—পিরীতেও জোয়ার-ভাঁটা চাই।

কিরণবালা নেই, কিন্তু সরকারদের বউ সৌদামিনী আসে নিত্যদিন। নতুন বউটার ব্যথা বুঝেই বুঝি তার মন পড়েছে। সংসারের পাট সেরে সন্ধ্যা হতে না হতেই চলে আসে। এসে গল্পগুজব করে, হাসিখুশিতে ভুলিয়ে রাখে। হঠাৎ এক সময়ে কাঁটা-চিরুনি ফিতে-দড়ি আলতা-সিঁদুর নিয়ে জোর করে ধরে বসায়। চুল বাঁধবে, পাতা কেটে টিপ পরাবে, সিঁদুর পরাবে, আলতা দেবে পায়ে। ছাঁচিপান মুখে পুরে দেবে ঠোঁটদুটি যাতে লাল-টুকটুকে হয়। মুখখানা একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরিয়ে

দেখে তৃপ্তি ভরে বলে, ফাঁদ একখানা সাজিয়ে রাখলাম তাই। যে জায়গায় যায়, তার চেয়ে শতেক গুণে রূপ দেখিয়ে মন কাড়তে হবে। তাই আমি করে দিলাম। একবার যদি এসে পড়ে, ফুড়ুত করে পালাতে হবে না উড়োপাখির। আটক হয়ে থাকবে।

এরা—এই অঞ্চলের যত মেয়েছেলে—এমনিধারা জেনেবুঝে আছে। নিজ দেহকে মনে করে স্বামী-ধরা ফাঁদ। সাজগোজে মীনাক্ষীর সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বালা করে, মুখে তবু কিছু বলতে পারে না। সৌদামিনী চলে গেলে সমস্ত সাজ গা থেকে আক্রোশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে। দরজা এঁটে মুখ থুবড়ে পড়ে কাঁদে।

ক'দিন পরে—যে প্রত্যাশায় আছে মীনাক্ষী—সোনাছড়ি থেকে পানসি নিয়ে ভক্তদাস এসে পড়ল। লালমোহনের মা'র নাকি ভয়ানক অসুখ—বুড়োমানুষ কখন আছেন কখন নেই, নাতনীকে একটিবার দেখতে চান। হয়তো বা শেষ-দেখা।

সমস্ত মীনাক্ষীর কারসাজি। মায়ের কাছে চিঠি লিখেছিল মানে মানে পাপপুরী থেকে যাতে বেরিয়ে পড়তে পারে। বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে।

ইন্দুমতী থেকেও নেই, ধ্রুব নিরুদ্দেশ—মীনাক্ষীর মতন ভাগ্য কার। নতুন-বউ হয়েও সংসারে নিজের কর্তা নিজেই সে এখন। ইচ্ছে হল তো কাউকে একটা মুখের কথা বলবে, একেবারে না বললেও কিছু আসে যায় না।

ঘাটে গিয়ে মীনাক্ষী পানসিতে উঠে বসল। ঘাট অবধি যারা এসেছে, মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাতে সাহস করে না। হয়তো দেখা যাবে, বাঁকা-হাসি হাসছে এ ওর দিকে চেয়ে। হাসিতে আজ বড় ভয়।

॥ আট ॥

গয়না চেয়েছিল মীনাক্ষী—ঝিনমিন ঝুমঝুম গা-ভরা আজ গয়না। স্বর্ণসজ্জা সর্বাঙ্গ জুড়ে। আর মন ভরে উল্লাস। এ পৃথিবী সোনা-সোনা হয়ে গেছে, এতটুকু ধুলো-ময়লা নেই। সমস্ত সুন্দর। কত কথা জমানো রয়েছে! রাত্রি পোহায়ে দিনমান হবে, সকাল গিয়ে দুপুর হবে, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হবে—কথা তোমায় আম র ফুরোবার নয়।

এত দিনে ধ্রুবভানু নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে, খুঁজছে সে মীনাক্ষীকে। খোঁজ পেয়েও সে তো সোনাছড়ি শ্বশুরবাড়ি আসবে না। কেন আসতে যাবে অমন শ্বশুরবাড়ি, যেখানে তার ইজ্জতে ঘা দিয়ে কথাবার্তা হয়। থমথমে অভিমানে ধ্রুব হয়তো তাদের সেই অলিন্দে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাড়ি ফিরে মীনাক্ষী সকলের আগে পড়বে স্বামীর দুটি পায়ে। দু-পায়ে মাথা গুঁজে পড়ে থাকবে। মরে যাওয়ার মতন। যতক্ষণ না আদর করে তুলে ধরে বুকের উপর—বুকে নিয়ে সে মীনাক্ষীর নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। এই তুমি। আমায় একেবারে কিছু জানতে দাও নি—মনে-দেহে তুমি কি আমায় বাদ দিয়ে? আমারও সেই জন্যে বড় অভিমান। কত নোংরা ভেবেছি, ছি-ছি, তোমার সম্বন্ধে। যে যাই বলুক, সম্পর্কে গোবিন্দসুন্দরী যত পূজ্যই হোন—আমি দূর করে দেবো বাড়ি থেকে। দেবোই। না হয় মাসোহারা পাঠাব আমার গয়না বিক্রি করে। বড্ড ইতর মন—ঐ মানুষ কাছাকাছি ঘুরলে মন আপনা থেকেই নিচু হয়ে যায়।

খবর পাঠিয়ে মেয়ে উপযাচক হয়ে এমনিভাবে সোনাছড়ি এসে পড়ায় লালমোহন খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন, জামাই তোর সমস্ত গয়না ফেরত দিয়ে গেছে। আমার গয়না সে বাড়িতে রাখবে না—এক কণিকাও নয়। এর উপর তুই আবার কোন অপমান করতে তেড়ে এসেছিস বল আমায়।

মীনাক্ষী হতবাক্ হয়ে থাকে মুহূর্তকাল। সমস্ত শুনল। গয়না কিরণবালা বা অন্য কারো গায়ে ওঠেনি, অভিমানী ধ্রুব এইখানে লালমোহনকে ফেরত দিয়ে গেছে। সামলে নিতে কিছু সময় লাগে মীনাক্ষীর। কালিমা কেটে গিয়ে তারপর সারামুখ ঝিকমিকিয়ে উঠল।

বাপের কাছে সে মিথ্যা কথা বলে : গয়না তো আমিই খুলে দিয়েছিলাম বাবা। লালমোহন বলেন, সেটা আর বলে দিতে হবে না। নিজের মেয়েই তো বড় শত্তুর! তুই না দিলে জমোই কি গা থেকে কেড়ে আনতে গিয়েছে?

মীনাক্ষী বলে, নতুন গয়না গড়াতে দিয়েছে তোমার জামাই। তোমার গয়নার আমাদের দরকার নেই।

সেই তো আমার জিজ্ঞাসা। জামাইকে বলতে যাচ্ছিলাম, পুঁটুলি ছুঁড়ে তীরের বেগে সে ছুটে বেরুল। একঢোক জল অবধি খেল না আমার বাড়ি। বলি, গয়না আমার হল কিসে? বিয়েয় যৌতুক দিয়েছি, তোদেরই তো সব।

মেয়ের কণ্ঠ কাঁপে অভিমানে : গয়না বেচে খাবে, কি জন্যে তবে বলতে যাও? বেচুক আর জলে ফেলে দিক—আমাদেরই যদি জিনিস হয়, ফিরে তাকাবে কেন সেদিকে? অমন কথা কেন বলবে?

জামাইয়ের কাছে বলতে গিয়েছিলাম? চকের দশা দেখে এসে মনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের মেয়ের কাছে চুপিসারে বলেছি। পরঘরি হয়ে তুই যে এতখানি শত্তুর, বুঝতে পারিনি। পুটপুট করে জামাইয়ের কানে তুলে দিয়ে ঝড় তুলেছিস। এ কাজ তোর ছাড়া অন্য কারো নয়।

দম নিয়ে লালমোহন আবার বলেন, বড্ড দয়া বাবাজির, রাগটা আমার একলার কাছে দেখিয়ে গেছে। বাড়ির অন্য কেউ জানে না। সেই থেকে ভাবছি, বেলডাঙা চলে গিয়ে মানীর বেটার হাত জড়িয়ে ধরে গয়না গছিয়ে আসব। হাতেও না কুলায় তো পা ধরব। চিঠি এলো, তুই চলে আসছিস। বলি, জামাই এসে গেছে, মেয়ে আবার কি নিয়ে আসে দেখা যাক। বয়েস হয়েছে আমার—বুড়োবয়সে লোকে কত রকম আবোল-তাবোল বকে, তা-ও তো ধরে নিতে পারতিস। এক-মেয়ে এক-জামাই তোরা আমার—অনেক হেনস্থা করলি, এইবারে ক্ষমা দে আমায়।

গলগল করে এমনি বলে যাচ্ছেন, থামানো যায় না। বড় দুঃখ পেয়েছেন লালমোহন। মীনাক্ষীর লজ্জার অবধি নেই। সেই সঙ্গে আনন্দ—কী করবে দিশা করতে পারছে না।

একটা বেলা কোনক্রমে কাটিয়ে সেই পানসিতেই বেলডাঙা ফিরে চলল—তার নিজের বাড়ি, ধ্রুব যেখানে পথ তাকাচ্ছে। মা ঠাকুরমা কারো নিষেধে কান দিল না।

বিজয়িনী ফিরে চলেছে। যত গয়না আছে, একটি একটি করে সমস্ত সে গায়ে পরেছে। গলায় পরবার হারই বোধহয় পাঁচ-ছ রকম। হোক গে—

বেমানান হোক যা-ই হোক—স্বর্ণসজ্জায় ঝলমল করে সেই বিয়ের কনের মতো শ্বশুরবাড়ির অঙ্গনে গিয়ে উঠব। এ গয়না জয়ের নিশান—কানাকানি যারা করেছিল, লজ্জায় তারা এবার মুখ লুকোবে। রায়েদের তরফে যত অকীর্তিই শোনা যাক, তুমি অম্লান। আকাশের ঐ সন্ধ্যাতারার মতো। কত নিচুতে আমি, তোমার নাগাল ধরতে পারিনে।

পানসি চলেছে। ভক্তদাস সঙ্গে। তল্লাটের সকল খবর রাখে সে, গল্প করতে করতে যাচ্ছে।

অনেক নতুন কথা। সেই তখন সোনাছড়ি যাবার সময় একদফা বলেছে, আবার এই ফিরতি পথে। সাগরচকে জোয়ানেরা হেঁ-হেঁ করে মাটি ফেলছে আবার। নদী সোজা পথ পেয়ে গেছে, তেমন আর আক্রোশ নেই। যত চাষী উৎখাত হয়েছে, তারাই এবারের উদ্যোগী। টাকার সরবরাহ তাদের।

চোখ টিপে ভক্তদাস বলে, চকের বাসিন্দা হয়ে এরা সব চাষবাস করত বটে, কিন্তু বাপ-দাদারা কোনদিন লাঙলের মুঠো ধরে নি। জমাজমি ভেসে গিয়ে আবার এরা সেই বাপ-দাদার পথ নিয়েছে, শোনা যায়। নাকি চক উদ্ধারের জন্য। বাঁধ বাঁধা নির্বিঘ্নে হয়ে গেলে চাষী হয়ে ফের লাঙল চষবে। আবার শান্ত হবে।

আবছা অন্ধকারে মন্থর অলস বাতাসে পানসি দুলে দুলে চলেছে—পাশের ছিটে-জঙ্গল থেকে কালো কুমিরের মতো ছোট্ট ডিঙি তীরবেগে বেরিয়ে পানসির গায়ে যেন লেপটে গেল।

শঙ্কিত ভক্তদাস চিৎকার করে ওঠে : কি চাও? কারা তোমরা?

ডিঙির লোক বলে, আলচোরা কর্তামশায় গো, তরাস লেগেছে—

বলতে বলতে পানসির উপর লাফিয়ে পড়ে একের পর এক মরদজোয়ান। হা-হা-হা—উদ্দাম হাসি।

বুঝেছে মাঝি-মাল্লারা—ঝপাঝপ জলে লাফিয়ে সাঁতার কেটে পালায়। ভক্তদাসকে জাপটে ধরেছে।

কামরার ভিতরে একাকী থরথর কাঁপছে মীনাক্ষী। বৃন্দাবন বজ্রগর্জনে বলে, গয়না খোল—

মীনাক্ষী চকিতে সর্বাঙ্গ শাড়িতে ঢেকে ফেলে গুটিসুটি হয়ে গবাক্ষলগ্ন হল। এই গয়না এবং তার সকল সত্তা আজ একেবারে এক-বস্তু—স্বর্ণসজ্জা বাদ দিয়ে মীনাক্ষীর যে এতটুকু আর বাকি থাকে না।

দাও—

বাঘে যেমন শিকার ধরে, তেমনি লাফ দিয়েছে আষ্টেপৃষ্ঠে কাপড়-জড়ানো বউটাকে ধরে ফেলবার জন্য। সোনার রাশি টেনে ছিঁড়ে গা থেকে ছিনিয়ে নেবে। তার আগেই মীনাক্ষী জানলার পথে গাঙে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।

ধরো, ধরো—

স্রোতের উপর একবার ঈষৎ ঘূর্ণি উঠল। তারপর আর কিছু নেই। এক ঝাপটা বাতাস বয়ে গেল। কিচির-মিচির করে অদূরের চরের উপর গাঙশালিক ডেকে ওঠে; খলখল ক্রূরহাস্যে রাত্রের নদী ভাঁটা বয়ে চলেছে।

বৃন্দাবন গর্জন করে ওঠে : ঝাঁপ দিয়ে পড়ো সব। খুঁজে বের করতেই হবে।

সেই অবগুণ্ঠনবতীর ভাগ্যে যাই-ই হোক, সোনা কিছুতে নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া হবে না জলতলে। খোকাবাবু মুখ ফুটে চেয়েছে বৃন্দাবনের কাছে : গয়না চাই, গয়নার বড় দরকার। এসব কাজ—এই দস্যুবৃত্তি বড় অপছন্দ খোকাবাবুর। তবু তার প্রথম ফরমাস—জীবনে এই সর্বপ্রথম বৃন্দাবনের কাছে চেয়েছে। সে চাওয়া ভিখারির কাতর মিনতির মতন। বোঝাই যাচ্ছে, আবদার ধরেছে ফুটফুটে যুবতী বউ। বয়সে ছেলেমানুষ, সাধ-আহ্লাদের দিনই তো ওদের। গয়না নিয়ে ধ্রুব নতুন-বউকে পরাবে। আহা, সুখে থাকুক ওরা যুগলে!

কলকাতা চলে গিয়েছিল ধ্রুব। মুক্তি চায় সে লাঞ্ছনার আভিজাত্য থেকে। বাড়ি ফিরে শোনে, মান করে বউ বাপের-বাড়ি গেছে। মান ভাঙাতে যেতে হবে নাকি সেই

অবধি? যাওয়া যাবে তাই না হয়—ভাল খবরটা সেখানেই নিজ মুখে বলব।

বড় ভাল খবর। কারখানা গড়ছে তার এক সহপাঠীর বাবা-কাকারা মিলে, দুই বন্ধু তারা সেই কাজে লেগে পড়বে। শহর কলকাতার ভিতর জন চারেকের ছোট্ট বাসাবাড়ি—একফোঁটা মানুষ মীনাক্ষী, সেখানেই তাকে মানাবে ভাল। পঙ্গু ইন্দুমতীকে নিয়ে যাবে, বড় বিলাত-ফেরত ডাক্তার দেখাবে। যায় তো নীহারনলিনীও যাবে তাদের সঙ্গে।

কিরণবালা কোথা থেকে এসে প্রণাম করল।

ধ্রুব অবাক হয়ে বলে, কেমন আছ কিরণ? কবে এসেছ?

একা নয়, জোড়ে এসেছে—বরকে সঙ্গে নিয়ে। ননদের বাড়ি গিয়েছিল তার ছেলের অন্নপ্রাশনে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, বেলডাঙার ঘাটে নেমে পড়ল। ক'টা দিন থেকে সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে যাবে।

সেই ননদের গ্রামও জানা গেল। বেলডাঙা পথে পড়ে না তাদের, বিস্তর পথ ঘুরিয়ে নৌকো এনেছে। এসেছে কেন, সে কি আর বোঝে না কেউ? জাঁক করে সৌভাগ্য দেখাবে এ বাড়ির সকলের কাছে।

বরকে টানতে টানতে নিয়ে এলো কিরণ। বলে, আমার দাদা। বড়কুটুম্ব তোমার গো। প্রণাম করো।

গলগল করে এক গাদা নালিশ জানায়ঃ আসতে কি চায় দাদা? টেনেটুনে নিয়ে এসেছি। কাছাকাছি এসে আমার আপন-মানুষদের না দেখে গেলে ভাল ঠেকে? তা এসে দেখি তুমি নেই, নতুন-বউও বাপের বাড়ি চলে গেছে। কবে আসবে নতুন-বউ?

ধ্রুব বলে, আসবে, আসবে। বাপের বাড়ি যাওয়া ব্রহ্মাস্ত্র তোমাদের। তুমি যেমন ছিলে এসে। কিন্তু থাকতে তো পারলে না, থাকার উপায় নেই। মীনাকেও আসতে হবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কিরণ আবদারের ভঙ্গিতে বলে, সংসার ফেলে আমরা বুঝি চিরকাল থাকব! তুমি নিজে চলে যাও দাদা। মান-টান করে থাকে তো ঠাণ্ডা করে নিয়ে এসো। চাই আমার নতুন-বউকে।

মুখ টিপে হেসে বলে, বড্ড ঠেকার নতুন-বউয়ের—ঠেকার ভাঙব বলে এসেছি। আমার সিঁথি সাদা ছিল বলে আমার হাতে সিঁদুর পরেনি। অপমান করেছিল। আজকে দেখ কপাল ভরে সিঁদুর পরে এসেছি। তাকে দেখাব। তার কপাল সিঁদুরে ভরে দেবো, দেখি আজ কি বলে!

নকড়ি- গোমস্তা খবর দিল, বৃন্দাবন এসেছে কোন দরকারে। ধ্রুবভানু তাড়াতাড়ি বাইরে-বাড়ি ছুটল।

বৃন্দাবন ফিসফিসিয়ে বলে, এনেছি। যা চেয়েছিলে খোকাবাবু, খাসা-খাসা গয়না। মণ্ডপবাড়ির একটা কামরায় গিয়ে দুজনে দরজা আঁটল।

এত?

সমস্ত একজনের জিনিস।

নিশ্বাস ফেলে বৃন্দাবন বলে, বউটা নেই। মারধোর হয়নি, কিছুই না। ভয় পেয়ে নিজে থেকেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, আমরা কি করব? তা বলে সোনা তো ছাড়া যায় না। খুঁজে-পেতে জল থেকে তুলে গায়ের সোনা খুলে এনেছি।

সকলের আগে যে বস্তুটা বের করে ধরল—সৌভাগ্যকঙ্কন, অপরূপ কারুকর্ম—মকরমুখের দু-জোড়া চোখে লাল-টুকটুকে পাথর জ্বলজ্বল করছে।

খেলাঘর

মিতম্বর্

স্নেহাস্পদেষু

হবে-না হবে-না—করে কালিদাস দত্তের ছেলে হয়েছে। সেই ছেলের অন্নপ্রাশন। মহামচ্ছব দত্তবাড়িতে। শাস্ত্রীয় কাজকর্ম দুপুরের আগেই শেষ হয়ে গেছে—ভোজ এখন। 'মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া করিবেন—' নিয়মমাফিক নেমন্তন্ন। এবং ভোজও বসেছে যথানিয়ম সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার পর। কালিদাস কলকাতায় থাকেন - হাতঘড়ি দেখে সময় বলে দিলেন আটটা—দশ।

শেষ মুখে রসগোল্লায় পেঁছে জবর রকম জমে গেল। পঞ্চু ঘোষ ফড়ু আর পদা তিন খাইয়ের পাল্লাপাল্লি - কে কত গন্ডা সাটতে পারে। উঠোনের এক প্রান্তে পাশাপাশি বসেছে তারা—আলাদা এক পরিবেশক শুধুমাত্র তাদেরই জন্য। আর একজন আছে— ভাঁড়ার থেকে হাঁড়ি হাঁড়ি ভরে এনে অবিরত পরিবেশককে জোগান দিচ্ছে। পাতে পড়তে না পড়তেই শেষ—পুনশ্চ পাতা ভরতি, আবার শেষ। মুখ হাঁ-করাই আছে, রসগোল্লা টপাটপ ছুঁড়ে দিচ্ছে সেই বিবরে—কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলে ফেলার আওয়াজ। খাওয়া দেখে ম্যাজিক দেখার সুখ পাওয়া যায়। যত লোক এই দিকে ঝুঁকছে। পরিবেশক ক্ষণে ক্ষণে ফলাফল শুনিয়ে দেয়: ঘোষ মশায় ন-গন্ডায় উঠলেন, ফড়ুর আট, পদা সাড়ে-ছ গন্ডায় হাঁসফাঁস করছে এখনো। উত্তেজিত আলোচনা: ফাস্টো কে হবে? ফড়ুকে রুখতে পারবে না—শেষ অবধি দেখো, সে মেরে উঠবে। নিজ মূর্তি ধরে নি এখনো—চামড়ার নিচে ওর হাড়-মাংস নয়, তাকিয়া - বালিশের খোলের মতন পেটই একখানা—

ভোজের আসরের মজা শুনে টুনি দাওয়ায় ছুটে এলো। খাওয়া দেখবে কি, হাসির চোটে লুটোপুটি। পিঠের তলে একখানা যেন হাত ঢুকে গেল—ঘাড় কাত করে টুনি এক নজর দেখে নেয়, বুড়িমানুষ। ওমা, সেই মানুষটি—রাঙাঠাকরুন বলে সবাই যাঁকে খাতির-সম্ভ্রম করে। টুনিকে জড়িয়ে প্রায় কোলের উপর নিয়ে নিয়েছেন। বন্দিত্ব টুনির ভাল লাগে না—ঝুপ করে এক লম্ফে দাওয়া থেকে সে উঠোনের উপর—পরিবেশকের একেবারে পাশটিতে। হাঁড়ি থেকে দু-হাতে রসগোল্লা তুলে ধরল—দেবে সে-ও। পরিবেশক হাঁ-হাঁ করে ওঠে: কি করিসরে খুকি, সবাই দিতে লাগলে হিসেব থাকবে কি করে?

রাঙাঠাকরুন বলে উঠলেন, ইচ্ছে হয়েছে—দিক না। এ-হাতে একটা ও-হাতে একটা করে দেবে, এক সঙ্গে জোড়া জোড়া পড়বে। আমিই হিসেব রাখছি।

যা-চ্চলে। বুড়িতে আর খুকিতে একজোট। রাঙাঠাকরুন অন্য কেউ নন, মাদার ঘোষের মা। মাদারের উপর চোখ গরম করতে পারেন, ত্রিভুনের মধ্যে একমাত্র ইনিই। রাঙাঠাকরুনের উপর কে কি বলবে—পরিবেশক অতএব একের জায়গায় দুই হয়ে গেল। কিন্তু কতক্ষণ? বাইরের কচুবনের দিকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ— এঁটোপাতার বখরা নিয়ে লড়ালড়ি লেগে গেছে। ছুটল টুনি বাইরে। পিছু পিছু চেঁচাচ্ছে কে-একজন: যাসনে রে টুনি, কামড়াবে। কিন্তু টুনিকে ধরা চাট্টিখানি কথা নয়—বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে টুনি অদৃশ্য।

কালিদাসের বউ তরুবালাকে রাঙাঠাকরুন গিয়ে ধরলেন: ও মেজো বউ, ছেলের মুখে ভাত দিতে এসে এমন এক পাখি কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলি? এক দণ্ড স্থির থাকতে জানে না, ঝুনুর-ঝুনুর মল বাজিয়ে বাড়িময় উড়ে বেড়ায়।

গোড়ায় বোঝেনি তরুবালা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ঠাকরুন বল্লেন, দু-হাতে বেড় দিয়ে আটক করলাম। বেড় মানল না, উঠোনে গিয়ে পড়ল। একটু পরে সেখানেও নেই।

তরুবালা একগাল হেসে বলল, টুনি? নামের সঙ্গে মিলেছে খাসা. টুনিপাখিই বটে। আমার বড়দির মেয়ে, বৌতখোলায় বাড়ি। পরশুদিন চলে যাবে।

কোথায় তোর বড়দি? ওমা, আমার কি হবে—কোমরে আঁচল জড়িয়ে কুটুম্বর মেয়ে ঝাঁটা ধরেছে নিজ হাতে।

রাঙাঠাকরুন গিয়ে দাঁড়ালেন সুরবালার সামনাসামনি। বললেন, কুটুম্ববাড়ি এসে খাটছ কেন এত? ঝাঁটা ফেলে বোসো দিকি ঠাণ্ডা হয়ে। পরশু তো চলে যাচ্ছ—আমাদের নতুনবাড়ি ঘুরে যেও না কাল একবার। মেজো-বৌকে বলেছি, সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

সুরবালা বলে, আপনাদের মাঠের পুকুরে চান করতে গিয়ে দেখে এসেছি একবার। মস্তবড় বাড়ি।

ঠাকরুন এবার খোলাখুলি বললেন, তোমার টুনিকে বেশ ভাল লাগল। ওকে নাতবউ করে নেবো ভাবছি।

সুরবালা ক্ষণকাল অবাক হয়ে থাকে। ঢপ করে তারপর পায়ের গোড়ায় গড় করল। বলে, একেবারে শিশু এখনো।

বয়স কত হল?

সাতে পা দিয়েছে এই বোশেখে—

রাঙাঠাকরুন রায় দিলেনঃ বেশ, একটা বছর এখনো নেচে খেলে বেড়াক। আট বছরে গৌরী দান হতে পারবে। হরগৌরীর বিয়ে হল, গৌরীর বয়স তখন আট। মেয়ের বিয়ে ঐ বয়সে দিলে গৌরীদানের মহাপুণ্য। আজকাল এ সমস্ত কেউ ভাবে না, মেয়ে থুবড়ো করে রাখে। বিয়ের সময় বরের পাশে এনে দাঁড় করায় —কনে কি কনের ঠানদিদি, লোকে ভেবে পায় না।

ঠাকরুন হাসতে লাগলেন। বলেন, জানো আমার বিয়ে হয়েছিল এগারো বছর বয়সে। তখনই অরক্ষণীয়া রব উঠে গিয়েছিল। সে এক দিন গিয়েছে।

পুলকিত সুরবালা বলে, বাড়ি গিয়ে বলব আমি। কর্তারা কথাবার্তা বলবেন।

রাঙাঠাকরুন সগর্বে বললেন, এ পক্ষের কর্তা আমিই। মাদারের যত দাপট আদালতের জজ-ম্যাজিস্ট্রেরের কাছে, আমার সামনে সে বোবা। তা উপস্থিত রয়েছে যখন, চোখের দেখা সে-ও একবার দেখে যাক। বউমাকে গিয়ে বলতে পারবে। কাল ছাড়া তো সময় নেই—কালই এক সময় দেখে যাবে।

মাদার সদরের এক দুর্দান্ত উকিল। কোন মামলায় নাকি হারেন না তিনি। গাঁয়ের মানুষ হলেই তাঁর আপনলোক। দত্তবাড়ির অন্নপ্রাশনের কাজ তাঁর নিজের বাড়ির কাজেরই সামিল। এই উপলক্ষে গাঁয়ে আসছেন তো রাঙাঠাকরুনও ছেলের সঙ্গ নিলেন। নিজেদের বাগবাগিচা আছে—বোশেখ মাসের দিন ফেরার সময় ঝুড়ি কতক আম-কাঁঠাল বাসায় নিয়ে যাবেন এই মতলব। মাদারকে বললেন, টুকটুকে এক নাত-বউ পেয়ে গেছি—

সহাস্যে মাদার বলেন, আম কাঁঠালের ঝুড়ির উপর নাতবউও চাপাতে চাও?

ঠাকরুন বললেন, কাল গিয়ে একবার দেখে আয় তুই। ওদের বলে এসেছি।

নাতবউ দেখাদেখি করছ, কিন্তু তোমার নাতি কোথায় যার সঙ্গে বিয়ে দেবে ?

গালে হাত দিয়ে রাঙাঠাকরুন বলেন, নন্দু রন্টু দু-দুটো সোনার নাতি—তুই আমার নাতি চোখে দেখিস নে ? নন্দুর সঙ্গে খাসা মানাবে।

মাদার বলেন, মাত্র ক্লাস এইটে উঠেছে—বয়স তেরো।

ঠাকরুন বলেন, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল, তোর বাবার বয়স পনের। খারাপটা কি হয়েছে ? কথা হয়ে থাকুক, শুভকর্ম না-হয় আরো কয়েকটা বছর রয়ে সয়ে করা যাবে।

মাদার বলেন, এত ছোটতে আজকাল কেউ বিয়ে দেয় না মা—

পরিণামে পস্তায়। বর-বউ নয়, দুই লড়নেওয়ালা। ফুলশয্যার রাত থেকেই পায়তারা কষতে লেগে যায়।

হাসতে হাসতে মাদার বলেন, আইন হচ্ছে মা, বয়স বেঁধে দেবে। কমবয়সে বিয়ে দিলে চোর-ডাকাতের মতন ফাটকে নিয়ে পুরবে।

ঠাকরুন ব্যস্ত হয়ে বলেন, তবে তো তাড়াতাড়ি দিতে হবে বাবা—কেরেস্তানি আইন পাশ হবার আগে। কবে চোখ বুঁজব—আইন হয়ে গেলে তারপর আমার ভাগ্যে নাতবউ দেখা ঘটবে না।

শুনে তো মহাখুশি সকলে। দত্তবাড়ির কর্তা বৃদ্ধ শশধর সুরবালাকে ডেকে বললেন, তোমার মেয়ের পরম ভাগ্য ও-বাড়ির বউ হয়ে যদি যেতে পারে। মাদার এমনি ভালো, কিন্তু একরোখা। বিগড়ে গেলে তখন আর কারো নয়। টুনিকে আচ্ছা করে তালিম দিয়ে দাও মা, ধীর শান্ত হয়ে থাকবে, সাত চড়ে রা কাড়বে না—অন্তত পক্ষে কালকের দিনটা—মাদার ঘোষের দেখাশুনো না হওয়া পর্যন্ত। সুরবালা অতএব অনেক রাত্রি অবধি মেয়ের পাশে শুয়ে পাখি-পড়ান পড়ালেন তাকে। টুনিও মায়ের গা ছুঁয়ে দিব্যি করল, ছুটবে না, হাসবে না, চাই কি মুখই খুলবে না মোটে—

এত সব শক্ত শক্ত প্রতিজ্ঞা সকালবেলা রোদ উঠতে না উঠতেই একেবারে নিষ্ফল। তারপর থেকে টুনির উপর অবিরাম গালি-বর্ষণ। দোষ কিন্তু টুনির মোটেই নয়। উঠোনের ঝাঁকড়া-ডালপালা প্রকাণ্ড লিচুগাছ। কী ফলন ফলেছে এবার—গাছের গুঁড়ি ফুঁড়ে থোলো থোলো বেরিয়েছে। এক একটা ডালের পাতা দেখবার জো নেই—টোবা টোবা লিচু পেকে লাল টুকটুক করছে। সারারাত্রি বাদুড়ে ঝাপটা দিয়েছে, ঘুমের মধ্যে বারম্বার কানে এসেছে—টুনির। কাকেরাও ভোর থেকে সোরগোল তুলেছে। হাত-পা থাকতে হেন অবস্থায় পঙ্গু হয়ে থাকা যায় না। বাড়ির লোকজন জেগে উঠবার আগেই বড় ডাল দুটোয় আচ্ছা কয়েকটা ঝাঁকি দিয়েই সড়াক করে তলায় নেমে পড়া। এবং নিপাট ভালমানুষটি হয়ে খুঁটে খুঁটে লিচু কুড়ানো। বাড়ির সবাইকে শোনাবে, বাদুড়ের ঝাপটে সারারাত ধরে এমন সোনার লিচুর কী খোয়ারটা হয়েছে দেখ—

মতলব ঠিক করে যে-ই না টুনি ডালের উপর উঠেছে—মাদার যেন লুকিয়ে ছিলেন, উঠোনে ঢুকে পড়ে সহপাঠী কালিদাসের নাম ধরে ডাক দিলেন : ঘুমুচ্ছ নাকি ও কালিদাস ?

দোষ মাদারকেও দেওয়া যায় না, ইচ্ছাকৃত কিছু নয়। প্রাতর্ভ্রমণ তাঁর চিরকেলে রোগ—দুদিনের তরে গাঁয়ে এসেও রেহাই নেই, ঘুরতে ঘুরতে দত্তবাড়ির কাছে এসে পড়েছেন। মনে ভাবলেন, এসেছি তো মায়ের হুকুমটা মান্য করে যাই।

এইটুকু এক কনে—তাকে আবার ঘটা করে কি দেখতে হবে? লিচুতলায় এসে দাঁড়িয়েছেন—ঠিক মাথার উপরে বৃক্ষবিহারিণী কন্যার অবস্থাটা কি, বুঝে নিন। কাঠবিড়ালির মতন তরতর করে সে মগডালের উপর উঠে পাতালতার সঙ্গে মিশে আছে। বাতাসে পাতা একটু আধটু নড়ে, কিন্তু টুনি স্থির—সাহস করে নিশ্বাসটুকুও নিতে পারছে না।

মাদার হাঁক পাড়ছেন: আর ঘুমোয় না। বেরিয়ে এসো কালিদাস, শোন—

এসো-এসো—করে কালিদাস দাওয়ায় বেরিয়ে এলো। বলে. উঠোনে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে এসো—

না রে ভাই। বিকেলেই সদরে ফিরছি। এই বেলাটা ফাঁক। এ-কাজে সে-কাজে জনা কয়েকের আসার কথা—এসেই গেছেন হয়তো এর মধ্যে। ভাবলাম, কনে দেখার কাজটা সেরে আসি সকলের আগে।

কালিদাস চেয়ার দেখিয়ে বলে, উঠে এসে বোসো, চা খেতে লাগো, তাড়াতাড়ি আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। টুনি বোধহয় ওঠেনি এখনো!

মাদার হেসে উঠলেন: খুব উঠেছে। তোমার মতন আলসে নয়, ঠিক আমারই মতন। পাখপাখালি ডেকে উঠলে আমরা আর বিছানায় থাকতে পারিনে।

ঘাড় তুলে উপরের দিকে চেয়ে বললেন, আমি চলে যাচ্ছি, নেমে পড়ো মা এইবার। আস্তে নেমো, তাড়াতাড়ি কোরো না—পলকা ডাল ভেঙে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়বে।

কালিদাসকে মাদার বললেন, মাতৃ আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি। শুধু চোখের দেখা দেখে গেলাম, তাড়াতাড়িতে আর বেশি হয় না। বোনিখোলা সদর থেকে দূরে বেশি নয়—দুম করে একদিন গিয়ে পড়ব। কথাবার্তা দেখাশুনো তখন ভাল করে হতে পারবে।

বৃদ্ধ শশধর গাড়ু হাতে বাগানের দিকে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। মন্তব্য ঝাড়লেন: যাবে ঘোড়ার ডিম! তা, হোল বেশ ভালোই—কনে দেখতে এসে গাছের মাথায় হনুমান দেখে চলে গেল।

আর ওদিকে সুরবালা করকর করে উঠল: এঁটো পাতের ধোঁয়া স্বর্গে যাবে না—হবে এমনি একটা-কিছু, আমি জানতাম।

সারা বেলা ধরে গালি-বৃষ্টি টুনির উপর মুষলধারে ঝরতে লাগল।

অথচ পুরো হপ্তাও গেল না—বোতিখোলার মত অজ পাড়াগাঁ জায়গায় সদরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাদার ঘোষ, খবর না বাদ না, হঠাৎ এসে উপস্থিত। সেরেস্তার খাস মুহুরি সুরেন বিশ্বাস সহচর হয়ে এসেছে। আসা হয়েছে তা আবার সাইকেলে নয়—ঘোড়ার-গাড়ি হাঁকিয়ে। রাঙাঠাকরুনের ব্যবস্থা—সুরেনকে দিয়ে তিনি ঘোড়ার-গাড়ির বায়না করালেন: একটুকু ননীর পুতুলের মতো মেয়ে—জাঁকজমক বিনে পাকা-দেখায় তার মন উঠবে কেন? গ্রীষ্মে বৃষ্টি-বাদলা নেই, মেটে রাস্তায় গাড়ির চাকা এখন বসে যাবে না—সাইকেলের কিড়িং-কিড়িং নয়, ঘোড়া-গাড়ির ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চতুর্দিক জানান দিয়ে চলে যাও তোমরা—

পথে মোহনপুর গ্রাম। গণপতি সরকারের বাড়ি এখানে। সদরের বড় উকিল তিনিও, মাদারের পরম অন্তরঙ্গ। শনিবারে কাল গণপতি সদর থেকে বাড়ি এসেছেন, সে খবরও জানেন এঁরা। সুরেন মুহুরি বলে, গাড়ি ঘুরিয়ে ওঁর বাড়ি হয়ে গেলে মন্দ হয় না। বললে উনিও যেতে পারেন।

মাদার চমক খেয়ে বললেন, ক্ষেপেছ ?

সুরেন মুহুরি বলে, কেন, দলে ভারি হওয়াই তো ভালো। দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নেই লাজ।

গণপতি কাজ করবে না, কাজে বাগড়া দেবে। রগচটা মানুষ – চেনো না ওকে ? ঐটুকু এক কনে দেখে গালি দিয়ে ভূত ভাগাবে। কুটুম্ববাড়ি বলে রেহাই করবে না।

বাজারখোলা ছাড়িয়ে গাড়ি বেতিখোলা গ্রামে ঢুকল। ঘোড়ায় গাড়ি টানছে— গাঁয়ের মধ্যে আনকা জিনিস, কালে ভদ্রে অতি কদাচিৎ এরকম আসে। পাঠশালার ছেলেপুলে পণ্ডিতের শাসন অগ্রাহ্য করে আটচালার বারান্দায় বেরিয়ে হাঁ করে দেখছে। এগিয়ে যায় গাড়ি। একটা-কেউ, বোঝা যাচ্ছে, টুক করে লাফিয়ে উঠল পিছন দিকে—সহিস দাঁড়ানোর জায়গাটায়। গাড়ি মিত্তিরপাড়ায় এসে গেল। সুরেন মুহুরি মুখ বাড়িয়ে পথের একজনকে জিজ্ঞাসা করে, পরাশর মিত্তির মশায়ের বাড়ি কোনটা ?

পিছনে চড়ে যে আসছিল, কথা শুনেই সে লম্ফ দিয়ে পড়ে চোঁচা দৌড়। দৌড়চ্ছে বাতাসের বেগে – লহমায় অদৃশ্য।

টুনির বাপ পরাশর। পুরনো মক্কেল—ধান-কাটার মরশুমে একবার দাঙ্গার আসামী হয়ে মাদার ঘোষকে তিনি ওকালতনামা দিয়েছিলেন। উকিলের পশার-প্রতিপত্তি স্বচক্ষে দেখেছিলেন তখন। সেই মানুষ হঠাৎ সামনে এসে নাটকীয় ভাবে হাতজোড় করলেন : একটা বিশেষ আরজি নিয়ে এলাম মিত্তির মশায়।

টুনির প্রসঙ্গ, তা ছাড়া অন্য-কিছু হতে পারে না—পরাশর আন্দাজে বুঝলেন। পছন্দ না অপছন্দ ?—যদ্দুর যা শুনেছেন পছন্দের কোন কারণ দেখা যায় না। অথচ পছন্দ না-ই যদি হবে, এত পথ ঠেঙিয়ে আসতেই বা যাবেন কেন ?

শশব্যস্তে পরাশর অভ্যর্থনা করলেন : আস্তাজ্ঞে হয়—আসুন, আসুন। কষ্ট করে নিজে কেন আসতে গেলেন, একটুকু খবর দিলে আমিই তো যেতে পারতাম।

মাদার ঘাড় নাড়লেন : হয় না। আপনার দায় পড়েছিল, সদরে আমার সেরেস্তায় চলে গিয়েছিলেন। আজকে আমার দায়—আমাকেই আসতে হল।

হেসে বললেন, পুত্রদায় আমার।

দাওয়ার তক্তাপোশে ছেঁড়া মাদুর—বসতে দেওয়া যায় কোথায় ? পরাশরের বড় ছেলে ফণী ছুটোছুটি করে ইতিমধ্যে ধোপ-দুরস্ত চাদরে মাদুর ঢেকে ফেলেছে। চাদরের উপর ফর্সা ওয়াড়ের দুটো তাকিয়াও এনে ফেলল।

উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। আড়চোখে দেখে নিয়ে পরাশর বললেন, বসবেন চলুন। হাত-মুখ ধোওয়ার জল এনে দিচ্ছে—

মাদার ঘোষ সায় দিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ, বসতে তো হবেই। কনে দেখা সোনা-খড়িতে হয়ে আছে—সেদিন চোখের দেখা হয়েছিল, আজকে পাকা-দেখা দেখব, মনে করি এসেছি। যদি অবশ্য আপনাদের তরফের অসুবিধা না থাকে।

পরাশর তটস্থ হয়ে বলেন, অসুবিধা কি বলেন—এ তো আমাদের পরম ভাগ্য। মেয়ে একেবারে শিশু, তাই নিয়ে সামান্য একটু দোনামোনা ছিল—

ছেলেও ছোট। পাকা কথাবার্তা হয়ে থাকবে, বিয়ে পরে। একটা দুটো পাশ

কন্যার আগে ছেলের বিয়ে হবে না, মায়ের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছি। তার মানে চার পাঁচটা বছর তো বটেই।

বসলেন মাদার তাকিয়া ঠেস দিয়ে। ঝপ-ঝপ করে খেপলা জাল পড়ছে সামনের সদর পুকুরে।

ছেলেপুলে সব ছুটেছে মাছ ধরা দেখার জন্য। সুরেন মুহুরি বসল না—সেও পুকুর পাড়ে চলল। মাদার মায়ের কথাই বলে যাচ্ছেন—মায়ের সদাসর্বদা আতঙ্ক, আমাদের সামান্য অবহেলায় পাছে অন্য কেউ টুনি পাখিটি ধরে নিয়ে খাঁচায় পুরে ফেলে। দিশা করতে দিলেন না। ব্যাগের মধ্যে গয়না গুঁজে দিয়ে হুকুম করলেন, চলে যাও, আমার ছোট্ট মা'টিকে গয়না পরিয়ে এসো। মায়ের হুকুম আমার কাছে দেবী ভগবতীর হুকুম। কী করি, রবিবার আর ভালো দিন দেখে বেরিয়ে পড়েছি।

জো পেয়ে পরাশর নিজের তরফের কথা বলে রাখছেন. দেওয়া-থোওয়ার সঙ্গতি নেই আমার। ক্ষুদ কুড়ো নিতান্তই যৎসামান্য—মেয়ের গা সাজিয়ে দিতে পারব না।

প্রসঙ্গ বাড়াতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি মাদার বলেন, বলি টুনি পাখিটি দেবেন তো। সে-ই আমাদের অনেক হয়ে গেল। আর কি দিলেন না দিলেন, কেউ আমাদের তাকিয়ে দেখতে যাবে না।

পরাশর কথাবার্তায় আছেন মাদার ঘোষের সঙ্গে, বাড়ির মধ্যে ওদিকে সোরগোল লেগেছে নতুন কুটুম্বের যথোচিত আদর-আপ্যায়নের জন্য। বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে গড়গড়া টানতে টানতে মাদার সবই টের পেয়ে যাচ্ছেন। একথা-সেকথার মাঝে হঠাৎ তিনি তাগিদ দিয়ে উঠলেন, যে কাজে এসেছি, সকলের আগে সেইটা সেরে নেওয়া ভাল। আচার্যি মশায়কে দিয়ে দিনক্ষণ দেখিয়ে তৈরি হয়ে এসেছি—।

পাশের গ্লাডস্টোন-ব্যাগ দেখিয়ে বললেন, মা নিজের হাতে এর মধ্যে গয়না ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর নিজের গায়ের গয়না। টুনি-মায়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে যাব, আমার উপর হুকুম।

বলছেন, দুই ছেলে আমার। ভারী ওজনের দুখানা পুরানো গয়না মজুত রয়েছে দুই নাতবউয়ের জন্য—কেউ বঞ্চিত হবে না।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পরাশর মেজ ছেলে ননীকে ডাকাডাকি করছেন। মাঝে একবার বললেন: বিকেলে দিনক্ষণ নেই? পাকা-দেখা তখনো হতে পারবে। শাক-ভাত চাট্টি সেবা করতে হবে কিন্তু এখানে—

মাদার বলেন, সে তো জানিই। পুকুরে জাল নামিয়েছেন, মিষ্টি-মিঠাইয়ের জন্য বাজারখোলায় লোক ছুটেছে—আপনার বাড়ি থেকে না খেয়ে বেরুব, এত সাহস নেই মিত্তিরমশায়। ধান-কাটা দাঙ্গায় আসামি হয়ে আমার সেরেস্তায় গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক প্রায়ই তো ফরিয়াদি হয়ে যান, আপনি ছিলেন আসামী—সে কথা আমি ভুলে যাইনি।

উচ্চ হাস্য করে উঠলেন মাদার। বলেন, মায়ের হুকুম তামিল করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি। খাওয়া শেষ করেই রওনা। রবিবার বলেও মক্কেলে রেহাই দেয় না। সকালবেলাটা পালিয়েছি, সন্ধ্যায় তারই শোধ তুলবে।

পরাশর হ্যাঁ-হ্যাঁ করে সায় দিলেন: আজ্ঞে আমায় তা বলতে হবে না, নিজের চক্ষে দেখে এসেছি—

মেজ ছেলেকে বললেন, পাঠশালায় যা মনী, ছুটে চলে যা। পণ্ডিত মশায়ের কাছে এখন কিছু ভাঙিস নে। কী একটা দরকারে আমি ডাকছি বলে ছুটি করিয়ে টুনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়।

একমুখ হাসি নিয়ে মাদার নিষেধ করলেন: যেতে হবে না, বোন তোমার পাঠশালায় নেই।

পরাশর অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন। মাদার বলেন, বেতিখোলায় এসে বাড়ি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর পাঠশালায় বসে মা আমার 'ঐক্য' 'বাক্য' করবে—হয় তাই কখনো?

শঙ্কিত পরাশর জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেছে?

এক গাড়িতে একসঙ্গে এলাম। পাড়ার মধ্যে পড়েই এক দৌড়ে হাওয়া। দূরে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, বাড়িতেই আছে দেখুন গে।

পাওয়া গেল বাড়িতে নয়—পাছদুয়ারের পুকুরে। ঝুপ-ঝুপ করে ডুব দিচ্ছে, সাঁতার কাটছে—চিত-সাঁতার ডুব-সাঁতার!

রাগে গরগর করতে করতে সুরবালা ঘাটে এলো। বাড়িতে কুটুম্ব—সশব্দে রাগ প্রকাশের উপায় নেই এখন। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলে, উঠে আয়রে টুনি। তোকে পাকা-দেখা দেখতে এসেছেন সদর থেকে।

জানি—। বলে টুনি নিশ্চিন্তে খানিকটা জল মুখে নিয়ে কুলকুচা করে উপরমুখো ছাড়ল। বলে, দেখ মা, রামধনুকের রং এসেছে জলে—চেয়ে দেখ।

পুনশ্চ জল মুখে নিতে যাচ্ছে—সুরবালা খেঁকিয়ে উঠল: তুই মানুষ না কি! অতদূরে যে এসে তাঁরা বসে আছেন—তুই রামধনুক দেখাতে লাগলি।

টুনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, মনের সুখে একটু চান করব, তা-ও তুমি হ'তে দেবে না। দেখা-টেখা তো বিকেলেও হ'তে পারে।

সুরবালা বলে, তোমার হুকুমমতো! ভালোর তরে বলছি, উঠে পড়। আমি জলে নামলে রক্ষে থাকবে না। বাড়িতে কুটুম্ব বলে রেহাই করব না।

টুনি হি-হি করে হাসে, আজকে তা হবার জো নেই মা। তুমি জলে নামলেই আমি ডুকরে কেঁদে উঠব, কুটুম্বদের কান অবধি কান্না চলে যাবে।

কিছু বকাঝকার পর টুনি অগত্যা জল থেকে উঠে মায়ের পিছু পিছু বাড়ি চলল—সুরবালা গজর-গজর করছে: এবারও কেলেঙ্কারি। দেখতে আসছে—আর তাদেরই গাড়িতে একসঙ্গে তুই বাড়ি এলি।

অবাক হয়ে টুনি বলে, কে বলল?

কথা সত্যি কি না বল্ আমায়—

খানিকটা আবদারের সুরে টুনি বলে, ঘোড়ার গাড়ি গাঁয়ে ক'টা আসে মা? ইচ্ছে হল, একটুখানি পিছনে চড়ে এলাম। জানব কেমন করে ওরা কুটুম্ব। কিছুই ওদের নজরে পড়েনি।

না, পড়েনি আবার। সদরের ঝানু উকিল,—এক ফোঁটা মেয়ে উনি তার নজর ফাঁকি দেবেন! তোর বাবাকেই বলছিলেন, তাই টের পাওয়া গেল। নইলে কেউ কি আর দেখতে গিয়েছিল?

মুখখানা মলিন করে টুনি বলল, আমার কপাল মা। যা করতে যাই উল্টো রকম ঘটে যায়। সেবারে সোনাখড়িতে হল। ভোর থাকতে পাকা জিকুর ডালে ঝাঁকি দিচ্ছি, গাছতলায় কুটুম্ব। ঘাড় তুলে তিনি কনে দেখছেন। আজকেও প্রায় সেই জিনিস।

কেমন করে বুঝি বলো তো মা—

সুরবালা মেয়েকে জ্ঞান দিচ্ছেঃ বিয়ের কনে হ'লে সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। কখন কোন কুটুম্ব কোন দিক দিয়ে এসে পড়ে, ঠিক-ঠিকানা নেই। ছাদনা-তলার কাজকর্ম চুকেবুকে গেল তো—ব্যস্ তারপর পাথরে পাঁচ কিল।

প্রসঙ্গের এই অবধি ইতি, সুরবালা অধিক বাড়াতে চান না। মেয়ের ডানপিটেমির জন্য ক্ষতি লোকসান কিছু হয়নি, বরঞ্চ ভালই মনে হচ্ছে।

এক একজনের এক রকমের পছন্দ—পরাশর যখন শুধালেন, বাড়ি খুঁজতে কষ্ট হয়নি? হবু-বেহাইয়ের জবাবঃ কষ্ট হবে বুঝেই তো মা লক্ষ্মী নিজে গাড়িতে উঠে পথ দেখিয়ে আনল। আর কোনো বরের বাপ এমনভাবে বলতে যেত? দুঁদে উকিল বলেই শোনা আছে, কিন্তু মানুষটি এত সদাশয়, ভাবতে পারা যায় না।

সাজিয়ে গুজিয়ে কুটুম্বদের সামনে কনে পাঠানো হ'চ্ছে, তখনো সুরবালা ফিসফিসিয়ে কানে কানে শাসানি দিলেনঃ সভ্য ভব্য হয়ে থাকবি, একটুও বেচাল না দেখি।

কনে বলে, থাকব মা।

আসন-পিঁড়ি হয়ে ঘাড় নিচু করে বসবি। ছটফটানি না দেখতে পাই।

কন্যা জিজ্ঞাসা করে নেয়ঃ চোখ তখন খোলা থাকবে মা, না বোজা?

ঈষৎ ভেবে নিয়ে সুরবালা বলল, খুলেই রাখিস। বোজা চোখ দেখে হয়তো ভাববে, চোখ টেরা—তাই নজর দেখাতে চায় না।

আবার বলে, খুব ধীর শান্ত চাউনি। ফালুক-ফুলুক করে তাকাবি নে। আগডুম-বাগডুম বকবি নে—আমাদের সঙ্গে যেমন ধারা করিস।

মেয়ে মা'কে বেশি করে নির্ভয় করেঃ কথাই বলব না মেটে—

না রে, অদ্দুর নয়। ভাববে হয়তো বোবা মেয়ে। ও-মাসে যে গাছে-চড়া মেয়ে দেখে গেলেন, তখন তো কথাবার্তা কিছু হয়নি। কথা একটু-আধটু শুনিয়ে দিতে হবে। যেটা জিজ্ঞাসা করবেন, সেইটুকুরই শুধু জবাব দিবি, আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবিনে।

আচ্ছা—

সত্যিই টুনি ঘাড় নিচু করে পরম ভব্যভাবে মাদার ঘোষের সামনাসামনি বসল। দরজার পিছনে সুরবালা এবং এ-বাড়ির ও-বাড়ির কয়েকটি বউ-মেয়ে—তীক্ষ্ন নজর ফেলে আছে দাঁড়িয়ে, বেচাল দেখলেই দায়ভাগী করবে টুনিকে, ভিতরে ফিরে এসে কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাকে।

সুরেন মুহুরি তখনো সদর পুকুর-পাড়ে। মাদার ডাক দিলেন। ইদিকে এসো না মুহুরিমশায়। জিজ্ঞাসাবাদ, যেমন রেওয়াজ আছে, তোমাকেই সব করতে হবে। আমি এসব পারিনে। জানিও না তেমন কিছু।

সুরেন ঘাড় নেড়ে সহাস্যে বলে, পারেন না আপনি আবার! কোর্টে সাক্ষিদের তুলোধোনা করে ছাড়েন।—

অথচ ছোট্ট মায়ের সামনেটায় একেবারে বোবা। সোনাখড়িতে শুধু চোখের দেখা দেখেছিলাম, জিজ্ঞাসাবাদ কিছু করিনি। তার জন্যে বাড়ির ভিতর খোয়ারটা দেখেছ তোমরা। এবারে তাই তোমায় সঙ্গে নিয়ে এসেছি। নিয়মদস্তুর যা জিজ্ঞাসাবাদ করাতে হয়, করো তুমি সমস্ত। ভুল-ত্রুটি হ'লে তোমাকেই দেখিয়ে দেবো। আমি

কিছু জানিনে।

সুরেন বিশ্বাস পুরোনো মুহুরি—মাদারের ওকালতি আরম্ভের গোড়ার দিন থেকে। তার আগে অন্য এক উকিলের কাছে শিক্ষানবিশি করেছে। বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গেছে সে, রাঙাঠাকরুনের কাছে ছেলেরই মতন আবদার করে। মাদারের স্ত্রীকে বউমা বলে, তারও যাবতীয় ফাই-ফরমাশ এই সুরেন মুহুরীর কাছে। ঈষৎ তা না-না করে সুরেন গ্যাঁট হয়ে টুনির মুখোমুখি বসল। মাদার কিছু ঢাকা পড়ে গেলেন।

নাম কি তোমার?

টুনি বলল, কুমারী নির্মলাবালা দাসী।

ঠাকুরের নাম কি?

শ্রীযুক্ত পরাশরচন্দ্র মিত্র।

পরপর এমনি পিতামহ-মাতামহের নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসার পর বিনুনি খুলে কনের চুল দেখা হাসিয়ে কনের দাঁত দেখাও সমাধা হল। এবারে সুরেন বলে, ওঠো এইবারে মা, হেঁটে ঐ দেয়াল অবধি চলে যাও।

মাদার হাঁ-হাঁ করে ওঠেন হাঁটনার কী দেখবে মুহুরিমশায়। আমি দেখেছি, মাটির উপর দিয়ে নয়, তার চেয়ে অনেক কঠিন—গাছের ডালে মা পিলপিল করে করে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

বহুদর্শী সুরেন মুহুরি বলে, হাঁটনা ছাড়াও অন্য জিনিস দেখার আছে বাবু। আচ্ছা, হাঁটতে হবে না, দাঁড়াও তুমি ঐখানটায়।

দাঁড়িয়েছে টুনি। চাল থেকে একগাছা কুটো টেনে নিয়ে সুরেন পায়ের নিচে দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে।

মাদার অবাক হয়ে বলেন, ওটা কি হল মুহুরিমশায়?

খড়ম পেয়ে কিনা পরখ করলাম। কুটো-গাছটা সহজে যদি চলে যায়, বুঝতে হবে, পা চারিয়ে পড়ে না, মাঝখানটা উঁচু হয়ে থাকে খড়মের মতন।

মাদার বলেন, থাকলই বা খড়ম হয়ে। ক্ষতিটা কি?

ক্ষতি এমন কিছু নয়। মানে, অঙ্গের একটা খুঁত।

বের করে কোনই মুনাফা নেই সুরেন। মিছে তোমার খাটনি। খুঁত বের করে সেই বাবদ এক আধেলায় ক্ষতিপূরণ মিলবে না। বোঝ না কেন, গরজটা ওঁদের নয়, আমাদের। কনের দরবারে আমরাই আগ বাড়িয়ে এসেছি। রীত-রক্ষের মত মতো দু চার কথা জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দাও। আহা, গরমে মা আমার ঘেমে উঠেছে দেখ।

অগত্যা সুরেন বিশ্বাস কনে-দেখার বিস্তারিত কায়দা-কানুন বাতিল করে দিয়ে বলল, বোসো মা এবার। দুটো একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। রাঁধতে জানো?

পরাশরই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিলেন: গেরস্ত-সংসারের মেয়ে, রান্না কেন জানবে না?

কি কি রাঁধতে জানো?

মুখস্থের মতন গড়গড় করে টুনি একগাদা নাম করে গেল।

মাদার আঁতকে উঠলেন: ওরে বাবা, নন্দর মা এর সিকিও তো পারবে না। বউয়ের কাছে শাশুড়ি নাকানি-চোবানি খাবে, খাসা হবে আমি বড্ড খুশি হব। এই

বউ আমি চাই-ই।

সুরেন মুহুরি পুনশ্চ এক প্রশ্ন ঝাড়ল : আচ্ছা, ইলিশের ঝাল রাঁধতে কি কি মশলা লাগবে বলো ?

অতটুকু টুনি নিশ্চয় বাড়িতে রান্নাবান্না করে না, তবে দেখে থাকে রান্নাঘরের কাজ। হার স্বীকারের মেয়ে নয়—আন্দাজি সে বলল, সরসে, লঙ্কা ধনে—

সুরেন মাঝখান থেকে বাধা দিয়ে হেসে উঠল : এ কেমন ধারা রান্না তোমার! গোড়ার মশলাই বাদ দিয়ে গেলে ? বলি নুন দেবে না তোমার মাছের ঝোলে ?

বেকুব টুনি সামলে নিল : হ্যাঁ, নুন।

সুরেন মুহুরি এবার নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, কোনটা বাদ দিয়ে রান্না একেবারেই হয় না, বলো সেই আসল মশলার নাম—

জবাব তো টুনি আগেই প্রশ্নকর্তার মুখে পেয়ে গেছে। বললে, নুন—

উঁহু—। ঘাড় এদিক-ওদিক করে সুরেন : ভাত রান্নায় কি নুন দিতে হয় ?

তাই তো বটে ! টুনি ভাবনায় পড়ল। একটু ভেবে নিয়ে বলে, জল—

তা-ও হল না, বেগুন ভাজতে কি জল লাগে ?

একলা টুনি এখন নয়, মাদার ঘোষেরও ভাবনা। টুনির বাপ পরাশরেরও। নুন নয় জল নয়, কোন্ সে জিনিস যা বাদ দিয়ে রান্না করা চলে না ?

সুরেন মুহুরি সগর্বে টুনির দিকে তাকিয়ে আছে, আর মিটি মিটি হাসছে। আর টুনি আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছে মনে মনে। মাদারই শেষটা মুখপাত হয়ে বললেন, পারলাম না আমরা, হেরে গেলাম। তুমিই বলো মুহুরি মশায়।

সুরেন বলে দিল, মন—

কি রকম ? কি রকম ?

সুরেন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, ভেবে দেখুন তাই কি না ? পোলাও রাঁধুন, কালিয়া রাঁধুন—যত রকমের মশলাপাতি আছে দিয়ে দিন—আসলে রান্নার মধ্যে যদি মন পড়ে না থাকে সে রান্না কিছুতেই ওতরাবে না। তাহলে মনোযোগই আসল মশলা কিনা দেখুন ভেবে।

মাদার ঘোষ আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বললেন, ওরে বাবা, এযে জামাই ঠকানোর ধাঁধাঁ! বরাসনে বর বসলে নানান দিক দিয়ে ধাঁধাঁ ছুঁড়ে ছুড়ে মারে।

জামাই-ঠকানো প্রসঙ্গে হঠাৎ ভয় ভেঙে গিয়ে মুখ তুলে কনে মিটি মিটি হাসতে লাগল।

এই রেঃ! পরাশর মনে মনে প্রমাদ গণে : মজার গন্ধ পেয়ে বক্তেশ্বরী মেয়ে স্থান-কাল ভুলে আগডুম-বাগডুম বকুনি না ছেড়ে দেয়। মাদার ঘোষ ওদিকে সমানে আস্কারা দিয়ে যাচ্ছেন : আমাদের নন্দু বরপাত্তোর হয়ে এলে তাকেই এমনি সব জিজ্ঞাসা করবে, না পারলে দুও দেবে সকলে। কনে না পেরেছে তো ঘোড়ার-ডিম!

বলার ভঙ্গিতে টুনিও হেসে উঠল। বলে, আমার রানি-দিদির বর একেবারে

নিপাট ভালমানুষ। বিয়ের আসরে কত জিজ্ঞাসা করলাম আমার একটা ধাঁধারও জবাব দিতে পারেনি।

মাদার ঘোষ সবিস্ময়ে বলেন, বটে! কী জিজ্ঞাসা করেছিলে, মনে আছে তোমার?

সামান্য ভেবে নিয়ে টুনি বলে, আচ্ছা বলুন দিকি—

পরাশরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার গতিক। কনে ভাবী-শ্বশুরের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চালাবে এখন—মাদার ঘোষ হেন উকিল-শ্বশুরের সঙ্গে! মুখে কিছু বলা যাচ্ছে না—মুখ খিঁচিয়ে হাত-পা নেড়ে অলক্ষ্যে যা বলবার বলছেন। টুনিও কিছু থতমত খেয়ে গেছে! মাদার খুঁচিয়ে দিলেন: হুঁ, কি বলতে যাচ্ছিলে—বলতে গিয়ে থেমে গেলে কেন?

টুনি বলে ফেলল, ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে পরমেশ্বর—মানেটা কি হবে বলুন।

সাধারণ একটা ধাঁধা—মাদারের আগেই সুরেন মুহুরি ঝটপট জবাব দিয়ে দেয়: মশারি—

টুনি মুখ ভার করে বলে, আপনি কেন বললেন?

তার পক্ষে সায় দিয়ে মাদারও বললেন, বটেই তো। আগ বাড়িয়ে তুমি কেন বলবে মুহুরিমশায়। আর একটা বলো মা-লক্ষ্মী। পারি তো আমার জিত, না পারলে হার।

ভ্রূ কুঁচকে টুনি নতুন ধাঁধা ভাবছে। পরাশর মুখে হাসি এনে মাদারের কাছেই অনুযোগ করে: পাকা দেখায় আপনারাই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ দেখা যাচ্ছে উল্টো—

মাদার হতাশ ভঙ্গিমায় বললেন, গোড়া থেকেই কেমন সব উল্টো পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। সোনাখড়ির সেই প্রথম কনে দেখা থেকেই। আপনি যান নি বলেই জানেন না কিছু। কনে আসলে বসেনি, গাছে চড়েছিল,—তাই দেখেই দু জুড়িয়ে গেল।

অত বড় বাঘা উকিলের পাঞ্জা-কষাকষি সাত-বছুরে ছোট খুকির সঙ্গে—হাল ছেড়ে দিয়ে পরাশরও এখন মজা দেখছেন। মাদার বলেন, আবার একটা বলো তুমি। মুহুরিমশায় বলে দিও না।

টুনি বলে, এখান থেকে ফেললাম দড়া, দড়া চলে গেল বামনপাড়া—

জবাবের জন্য মাদার আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছেন, ভাবখানা সেইপ্রকার। টুনি হেসে গড়িয়ে পড়ে: পারলেন না তো?

না, পারি আর কই। তুমি বলে দাও।

দড়া মানে পথ। যে পথ বামুনপাড়া অবধি চলে গেছে, তারই কথা বলা হচ্ছে।

ছেলেমানুষের মতন মাদার হাততালি দিয়ে উঠলেন: হেরেছি—হেরে গেলাম আমি। দুও—দুও—টুনি-মা আমায় হারিয়ে দিল। হেরে যাওয়ার উল্লাসে কি করবেন মাদার যেন ভেবে পাচ্ছেন না।

টুনির হাসিমুখ হঠাৎ গম্ভীর। কেমন যেন সন্দেহ হল তার: ইচ্ছে করে হারা। জবাব জেনেও আপনি বললেন না।

যাঃ, তাই বুঝি কেউ করে। হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়ছেন মাদার। হাতের

কাছে গ্লাডস্টোন ব্যাগ—সারা পথের মধ্যে কখনো হাত-ছাড়া করেন নি। ব্যাগ খুলে নীল মখমলে মোড়া গয়না বের করলেন।

পরাশরের দিকে তাকিয়ে বলেন, কণ্ঠহার—এখন আর এসবের চল নেই। আমার মায়ের গায়ের জিনিস। আরও একটা জিনিস যত্ন করে রেখেছেন—চন্দ্রহার। দু'খানি গয়না দুই নাতবউয়ের জন্য। মায়ের হুকুম, কণ্ঠহার আমার এই মায়ের গলায় পরিয়ে যেতে হবে।

ভিতর-দরজার উদ্দেশে উঁচু গলায় বললেন, শাঁখ বাজান মা লক্ষ্মীরা সব, উলু দিন—আমাদের বড় আহ্লাদের দিন আজকে।

একফোঁটা কনের গলায় ঢাউস এক গয়না। সাতনরি—পরপর সাতগাছা হার একত্র সাজানো—ছোট থেকে বড় হ'তে হ'তে হাঁটুর কাছাকাছি নেমেছে। ইঙ্গিতে বলে দিলেন পরাশর—ঢপাস করে টুনি মাদারের পায়ে মাথা ঠেকাল।

মাদার হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: আমায় কেন—আগে বাবাকে। আমরা তো সব পরে আসছি—

বেকুব হয়ে টুনি পরাশরকে গড় করল। মাদারের পায়ের ধুলো নেওয়া হয়নি—পরের আবার সেটুকু সেরে নিল। মাথা ঠেকাল তারপর সুরেন মুহুরির পায়ে।

মাদার বিজয়ীর ভঙ্গিমায় পরাশরকে বলেন, আমার দু-দুটো প্রণাম—আপনার ভাগ্যে কুল্যে একটি। হেরে গেলেন বেহাইমশায়—আপনার মেয়ে এখন আমাদের পক্ষে।

হাসাহাসি ঠাট্টা তামাশা চলল। টুনি, দেখি, গলার কণ্ঠহার খুলে ফেলছে। পরাশর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: এ কি রে খুলিস কেন? দিব্যি তো দেখাচ্ছে। ভিতরে গিয়ে দেখা ওদের সব।

সকাতরে টুনি বলে, যা ভারী। গলা ছিঁড়ে পড়ছে বাবা—

হো-হো করে হেসে উঠে মাদার বললেন, মেয়েছেলের গায়ে গয়না ভারী লাগে আমি এই নতুন শুনলাম।

সুরেন বলল, পুরানো জিনিস—ফাঁকি জুকির কাজ-কারবার ছিল না তখন। এমনি এক একটা গয়না ভেঙে এখনকার দিনে একটা কনেকে পুরোপুরি সাজিয়ে দেওয়া চলে। পাকা সোনায় খাদ নেই – কষ্টিপাথরে ঘষে দেখবেন।

দুপুর বেলাটা না খাইয়ে পরাশর ছাড়লেন না। ছাড়বেন না—সে তো জানা কথা। পাশাপাশি খেতে বসে দুই বেহাইয়ে রঙ্গরসিকতা চলল অনেক কিছু। পরাশর বলেন, আমরা ধরে বসে আছি মেয়ে অপছন্দ – গেছো-মেয়ে কে ঘরে নেবে?

মাদার বললেন, আমার মায়ের উল্টো রকম পছন্দ, দেখতেই পাচ্ছেন। আর মায়ের যেমন, আমাদেরও ঠিক ঠিক তেমনি হতে হবে। কনে দেখা ঘরের মধ্যে বসেই হয়, আমি দেখতে পেলাম, গাছের এ-ডালে ও-ডালে কনে ফুড়ুত ফুড়ুত করে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুনে মা আরও ক্ষেপে গেলেন: ঐ পাখি আনবই আমি ঘরে—বাড়িময় উড়ে বেড়াবে।

সম্বন্ধ সেই তখন থেকে পাকা হয়ে আছে। বেয়াই—ডাকাডাকি এবং পাল-পার্বণে তত্ত্বতালাস চলে। অজুহাত করে মাদার পরাশরের বাড়ি এসে টুনিমণির সঙ্গে আগডম-বাগডম বকেও গেছেন কয়েকবার। নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই শুভকর্মে টালবাহানা হচ্ছে—এক-আধ দিন নয়, পুরো পাঁচ-পাঁচটা বছর গেছে এইরকম। কিন্তু আর নয়—বয়স হয়ে রাঙাঠাকরুনের দেহে নানা ব্যাধি ভর করছে, বাতের

প্রকোপে সময় সময় হাঁটা-চলাই অসাধ্য হয়ে ওঠে। বিয়ে আর তিনি ঝুলিয়ে রাখবেন না, কারো কথা শুনবেন না—চৈত্রের দিন ক'টা কাটিয়ে বৈশাখের শুভলগ্নে নতুন বউ ঘরে এনে তুলবেন। শহরের বাসাবাড়ির খোপে নয়, সোনাখড়ির নতুন বাড়ির ঘরে—মাদারের পিতৃপিতামহের ভিটের উপর। ওই সংসারের নতুন বউরা আলতারাঙা পা ফেলে চিরকাল যেখানে এসে উঠেছে। শহরেও কিছু অবশ্য করতে হবে, এবং নিতান্ত নমোনমো ব্যাপার করলেও রেহাই হবে না। যাকগে, সে পরের কথা। সামাজিক রীতকর্ম সম্পূর্ণ সোনাখড়িতে সমাধা করে তারপরে সবসুদ্ধ শহরে গিয়ে আরো যা-সব করতে হয় করবেন।

পাঁচবছর কাটিয়ে দিয়ে অবশেষে কাল সন্ধ্যায় গোধূলিলগ্নে নন্দলাল—নির্মলাবালার শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। টুনির তোলানাম নির্মলাবালা। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে ও মন্ত্রে বার কতক চমক দিয়ে নির্মলাবালা পুনশ্চ গা-ঢাকা দিল—আমাদের যে-টুনি সে-ই টুনি।

গণপতি সরকারও বরযাত্রী হয়ে এসেছেন। মনে যা-ই থাকুক, মাদারের ছেলের বিয়েয় না এসে উপায় কি? বাসি-বিয়ে অন্তে দিনের আলোয় ভাল করে আর একবার বউ দেখানো হচ্ছে। মুখের ঘোমটা তুলে দিল—একফোঁটা টুনি চোখ বুজে রয়েছে। মাদার এসে ভয়ে ভয়ে সুহৃৎকে জিজ্ঞাসা করেন: কেমন বউ, বলো। মানে, এখানকার কথা নয়, ভবিষ্যতে কী রকমটা দাঁড়াবে মনে কর?

গণপতি ফোঁস করে উঠলেন: বার-লাইব্রেরীতে বসেই তোমার লম্বা-লম্বা কথা। মা-বাপের কোল থেকে দুধের বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছ—তোমায় আমি জেলে পাঠাব।

বুড়ো-আঙুল নেড়ে সহাস্যে মাদার বললেন, সে গুড়ে বালি! আইন পাশ হয় নি—কলা করবে তুমি এখন।

হাসি বন্ধ করে গম্ভীর কণ্ঠে মাদার বললেন, অন্যে যা বলুক, আমার সংসারের খবর সবই তো জানো তুমি ভাই—

মাতৃ আজ্ঞা—তাই তো? ব্যঙ্গের সুরে গণপতি বলেন, কৈফিয়ৎ বড্ড মামুলি শোনাচ্ছে। এত বড় উকিল তুমি—এদ্দিন ধরে ভেবে চিন্তে একটা নতুন কিছু বের করতে পারলে না?

মুখ ঘুরিয়ে দুম দুম করে পা ফেলে গণপতি সরে গেলেন, টুনটুনি বউ দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন না। উঠোনে ওদিকে দ্রুতহাতে পাতা করা হচ্ছে, বরযাত্রী বসানো হবে। সোনাখড়ি দূর কম নয়—বর কনে ও বরযাত্রী বেলাবেলি রওনা হয়ে যাবেন। সন্ধ্যার বেশ খানিকটা আগে পৌঁছানো দরকার। বউপচ্ছে (বউ পরিচয়) সেখানে, তার রীতিকর্মও নিতান্ত কম নয়। সন্ধ্যার আগেই সব সেরে ফেলতে হবে। ঘোর হলেই কালরাত্রি—বরকনের আর তখন চোখোচোখি হবার উপায় নেই। হওয়া অশাস্ত্রীয়।

হুড়োহুড়ি চারিদিকে। এ খরচ সে-খরচ এঁর প্রণামী তাঁর বিদায়—স্যুটকেশ থেকে বারম্বার মাদারকে টাকা বের করতে হয়েছে। হঠাৎ হুঁশ হল, পকেটে চাবি নেই—স্যুটকেশ বোধ হয় খোলা, চাবি নিশ্চয়ই স্যুটকেশের গায়ে লাগানো রয়েছে। দ্রুতপায়ে পুবের ঘরে চললেন। কাল রাতে মাদার ও গণপতিকে ওই ঘরে শুতে দিয়েছিল। স্যুটকেশও সেখানে।

ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বিকালে বর-কনে বিদায়—নিরিবিলি এই ঘরের মেজেয় টুনিকে খেতে বসিয়েছে। বাপসোহাগী মেয়ে বসেছে একই থালায় বাপকে নিয়ে। সে নিজে বড় মুখে দিচ্ছে না, খাওয়াচ্ছে বাপকে। পরাশরই জোরজার করে যা পারেন দু-এক গ্রাস মুখে গুঁজে দিচ্ছেন। খাবে কি—কেঁদে আকুল মেয়ে-বাপ দু-জনাই। কচি মেয়ে আর পাটোয়ারি বাপে কান্নার পাল্লাপাল্লি—চারখানা চোখে পাশাপাশি ধারা বয়ে যাচ্ছে। মাদারেরও চোখে জল এসে যায়। ভাগ্যিস দরজার দিকে ওদের মুখ নয়—সেজন্য, মাদার দাঁড়িয়ে পড়েছেন, ঘুণাক্ষরে তা টের পায়নি। এক একবার টুনি ডুকরে কেঁদে ওঠে: আমি যাবো না বাবা, তোমার দুখানি পায়ে পড়ি। তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না—দু'দিন বাদেই খবর পাবে, মরে গেছি আমি!

পরাশর 'ষাট' 'ষাট' করে মেয়ের মুখে হাত চাপা দেন: কী সব অলক্ষুণে কথা! অমন বলতে নেই মা। কত বড়লোক ওঁরা, কত রকম মজায় থাকবি—আমাদের কথাই মনেই পড়বে না।

টুনি ক্ষেপে যায়: চাইনে মজা। আমি যাবো না—দেখি, কেমন করে পাঠাও। শিয়ালের গর্তে ঢুকে যাবো, গাছের মাথায় চড়ে বসে থাকব—খুঁজে পেলে তবে তো পাঠাবে!

বলতে বলতে ফিক করে হেসে ফেলল। দুষ্টু মেয়ের যা রকম-সকম। বলে, আশীর্বাদের সময় গলার হার পরাচ্ছিলেন—আমার হাসি পাচ্ছিল বাবা! মাথা-জোড়া টাক যেন সুগোল বড় একটা ওল—

এর পর মাদার ঘোষ পালানোর আর দিশা করতে পারেন না। চেহারা নিয়ে শুরু হয়েছে—আরও কত রকমের কুচ্ছো করবে ঠিক কি। মনের মধ্যে রাগ নয়, বরঞ্চ অনুতাপ। মা-বাপ ভাই-বোনেদের মাঝে টুনি পাখিটি হয়ে নেচে খেলে বেড়াচ্ছিল—এইবারে তাকে পালকী বন্দী করে নিয়ে রওনা দেবেন। বাড়ি নিয়ে তুলবেন। গণপতির গালিগুলো কটু বটে, কিন্তু মিথ্যা নয়—সত্যিই তো দুধের বাচ্চাকে স্নেহের কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। কেমন এক আতঙ্ক উঠল মাদারের মনে—বেড়ার কোন খানে চোখ রেখে গণপতিটাও ভিতরের দৃশ্য দেখছে না তো? তাহলে রক্তারক্তি করবে সে—কুটুম্ববাড়ি বলে রেহাই দেবে না। ঘাড় ঘুরিয়ে সত্যি সত্যি মাদার এদিক-ওদিক দেখছেন।

না, নেই গণপতি—সর্বরক্ষে! উঠোনের ভোজেই পয়লা ক্ষেপেই তিনি বসে পড়েছেন। তাঁর কিন্তু তাড়াহুড়োর আবশ্যক ছিল না। যাবেন মোহনপুর নিজের বাসগ্রামে—সাইকেলে পুরো ঘন্টারও পথ নয়। বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকালেই সদরে চলে যাবেন যথারীতি কোর্ট কাছারি করতে। ছেলের বিয়ের দরুন মাদার ঘোষ সদরের বাসাবাড়িতে আলাদা মচ্ছব করবেন, গণপতি তারই মধ্যে।

বিয়ের লগনশা চলেছে, তার উপর চাষীর ক্ষেতে ষোল আনা কোপে এখন। পালকি জোটানো সাতিশয় দুরূহ হয়ে পড়েছে। আবার পালকি যদিই বা জুটল, বওয়াবয়ির বেহারা মেলে না। তবু বর বউয়ের জন্য অনেক কষ্টে জোড়া পালকির জোগাড় হয়েছে। মাদারের জন্যও চেষ্টা হচ্ছিল অতিরিক্ত আর এক খানার, মাদার শুনে ক্ষেপে উঠলেন: পুণ্যপাদ গুরুজনেরা যাচ্ছেন গরুরগাড়িতে, নয়তো পায়ে হেঁটে আর আমি পালকি হাঁকিয়ে যাব? মনে আসে কি করে এমন-সব?

বরযাত্রীদের মধ্যে গন্টি কয়েক শিশন্ আছে এবং জনাকয়েক পাকাচুল মনুরুব্বি। এঁরা গরুর গাড়িতে অবশ্যই। এবং আরও যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন। গাড়ির গরু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে—শক্ত সমর্থ পা থাকতে কেউ গাড়ি চাপতে চায় না। তাড়াতাড়ি ভোজ খেয়ে দুরদ্পুরে তাই গাড়ির মানুষরা সব রওনা হয়ে গেছেন। পায়ে হাঁটবেন যারা তাঁরাই রয়েছেন, বরকনের সহযাত্রী হবেন তাঁরা। মাদারও এদের মধ্যে। আর আছে সাইকেল যাত্রী কয়েকজন। কিন্তু সোনাখড়ির বিলের রাস্তার যা গতিক, সাইকেলের উপর চড়তে হবে না কারো, সাইকেলকেই পাশে পাশে সন্তর্পণে হাঁটিয়ে নিতে হবে।

টুনির মাথায় পুরোহাত ঘোমটা—কী অঘটন ঘটানো হয়েছে বুঝুন। সেই ঘোমটা বারম্বার পড়ে যায়, তুলে দিচ্ছে আবার। 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে'! সিঁথি ভরে সিঁদুর পরেছে কাল রাত্রিবেলা—সাজো-বিয়ের সময় বরে পরিয়ে দিল। কুট-কুট করছে সেই থেকে—যেন হাজারো ছারপোকায় কামড় জুড়েছে জায়গাটায়। ঘোমটার উপরে আবার মৌর—একবার হঠাৎ আয়নায় নজর পড়ে গিয়েছিল—রাণীর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, এমনি যেন। বরের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে টুনি ঘর থেকে বেরুল। পা চলে কি চলে না—'বিয়ের কনের হাঁটনা' লোকে যার নাম দিয়েছে।

টুনির পতিগৃহে যাত্রা। ঠাকুরমশায় যাত্রামঙ্গল পড়াচ্ছেন। তারই মধ্যে কে যেন হুঁশ করিয়ে দিল: মধু দিয়েছিস তো রে? টুনির বড় বোন রানি ঝিনুকে মধু এনে নন্দুর এ-কানে ও-কানে আচমকা খানিকটা করে ঢেলে দিল। মধু গড়িয়ে পড়ল কানের নেতি বেয়ে। তা হোক, তা হোক, যেটুকু ঢুকেছে তাতেই হবে—আমাদের কনে ভাল কথা বলুক মন্দ কথা বলুক, ঝগড়া করুক গালি দিক, বরের কানে মধু হয়ে ঢুকবে।

যাত্রামঙ্গল অন্তে ঠিক বেরুনোর মুখে রীতিব্যাভার আরও কিছু আছে। কনের মা সুরবালা কোন দিক দিয়ে এসে আঁচল পেতে দাঁড়ালেন। রানি এবার ঘুঁচিতে করে ধান আর মুঠো ভরে ইঁদুরের মাটি এনে ধরেছে। টুনি ধান নিল চাট্টি, মাটি নিল চাট্টি—মায়ের আঁচলে ফেলে দিয়ে বলল, তোমার লক্ষ্মী তোমায় দিয়ে গেলাম মা, আর—। মাটি-মেশানো ধান আরো চাট্টি নিজের মাথার উপর দিয়ে পিছনদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, আর, আমার লক্ষ্মী আমি এই নিয়ে যাচ্ছি। এমনি বলতে হয়, এমনি ধারা করতে হয়—চিরকালের মেয়েরা টুনিরই মতন বউ হবার দিনে এইভাবে মায়ের ঋণ শোধ করে গেছে। সুরবালা কেঁদে ভাসাচ্ছেন, টুনিও মায়ের বুকে মুখখানা রেখে ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি আরও বড় করে দিল। পাড়ার এক বউ চোখ মুছতে মুছতে বলল শ্বশুরবাড়ি যাওয়া সামান্য কথা নয়—টুনি হেন মেয়েকে কাঁদিয়ে ছাড়ল। অন্যে জুড়ে দেয়: ঘোমটা এত টানছে, কান্না যাতে কেউ না দেখতে পায়—তাতে টুনির অপমান। কারো মুখে আবার সম্পূর্ণ উল্টো কথা: কাঁদছে না, আরো কিছু! টুনি পাখি আমাদের কাঁদতেই জানে না—শেখায় নি কেউ, কী করবে? ঢোলের বাদ্যি সানাই পালকি উলু শঙ্খ এসবের মাঝে সে নতুন মজা পাচ্ছে। একটানে মাথার কাপড় নামিয়ে দাও। দেখবে ঘোমটার নিচে টুনি হেসে কুটিকুটি হচ্ছে এখন।

মন্তব্যটা মাদারের কান অবধি গেল। টুনি কাঁদতেই জানে না, বউটির ধারণা এই প্রকার। জানো না মা-লক্ষ্মী, একটু আগেই কী সাংঘাতিক কান্না কেঁদেছিল

তোমাদের ঐ হাসকুটে বজ্জাত টুনটুনি পাখি। আমার মতন পাষণ্ডের চোখ ফাটিয়ে জল বের করেছিল, এখনও চোখ আমার ভিজে-ভিজে।

পালকি কাঁধে উঠল। এ-পালকিতে আট ও-পালকিতে আট—ষোল বেহারা সমস্বরে ডাক ধরেছে: ও-হো এ-হে। তিন ঢোল তিন কাঁসি দুই সানাই—চতুর্দিক তোলপাড়। বউয়ের দুয়োর আঁটা পালকি কোন এক সময় সড়াক করে বেশ খানিকটা হাঁ হয়ে গেল। ভিতরের বউটি তাহলেও কিন্তু ঘোরতর লজ্জাবতী, ঘোমটার বহর আরো খানিকটা বেড়ে গেছে। গাঁ গ্রাম মাঠঘাট পার হয়ে যাচ্ছে—কখনো উঁচুতে উঠে যায় কখনো নিচুর দিকে নামে। ঘোমটার তলে বউয়ের চোখের মণি ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে দেখছে সমস্ত, অথচ তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। ঘোমটা বিনে এমন মজা আর কিসে?

সামনে কালরাত্রি। চলেছে। অতি দ্রুত চলেছে সব। বেহারা বাজনদারের হাঁটনার সঙ্গে তুমি-আমি পারব কেমন করে? বরযাত্রী ক্রমশ অনেক পিছনে পড়ে গেছে। শুধু মাতব্বর কয়েকজন কায়ক্লেশে সঙ্গ ধরে আছেন।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাগুরখালি। রাস্তার ধারে মাইনর ইস্কুল—বেহারার ডাক ও বাজনাবাদ্যিতে ছেলেরা ক্লাস ছেড়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো। মাস্টারও কয়েক-জন। পথ আটকেছে তারা, বেহারার কাঁধ থেকে পালকি নামাল। হিমচাঁদ ভুয়োদর্শী—এসব ঝঞ্ঝাট আসবেই, জানা কথা। ছুটে তিনি মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। কণ্ঠে মধু ঢেলে প্রশ্ন করেন: কি গো বাপধনেরা পালকি আটক করলে কেন?

আপনাদের মধ্যে বরকর্তা কে?

সুরেন মুহুরি ইতিমধ্যে কাছে এসে গেছে! অদূরের মাদারকে সে দেখিয়ে দিল: বরের বাপ ঐ রয়েছেন—

নিজের বুকে থাবা মেরে হিমচাঁদ বলেন, বাপের বড় জেঠা—আমি বরের জেঠা-মশাই। বরকর্তা আমিই—বলো কি বলবার আছে।

মাস্টার একজন অগ্রবর্তী হয়ে ভূমিকা করছেন: প্রবীণ মানুষ আপনি—এতাবৎ কত বিয়েথাওয়া দিয়েছেন। অধিক কি বলতে হবে। বর-কনে ফেরার সময় পাবলিক কাজে আমরা কিছু কিছু পেয়ে থাকি।

বটেই তো, বটেই তো—করে হিমচাঁদ লুফে নিলেন কথাটা: শুভ কর্ম সেরে ফিরছি—ভালকাজে দিতেই তো হবে।

মাস্টারমশায় পরম পুলকে বললেন, মাইনর ইস্কুল তো সামনের উপর দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়া উত্তর পাড়ায় আছে আপার প্রাইমারি ইস্কুল দক্ষিণ পাড়ায় লোয়ার প্রাইমারি ইস্কুল—

আঙুলের কর গুণে হিমচাঁদ হিসাব যাচ্ছেন: তিন দফা হল। তারপর?

ছাত্র একটি বলে, ফুটবল ক্লাব আছে। রোদের ঝাঁঝটা কমলেই দেখতে পাবেন, ইস্কুল ছেড়ে সবাই মাঠের উপরে পড়ে দমাদ্দম বল পেটাচ্ছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, চামড়ার ফুটবল—চোদ্দ সিকের ভি-পি হয়ে এসেছে।

এক বৃদ্ধ ইস্কুলের পণ্ডিত হবেন তিনি, তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলেন: হরিসভা আছে আমাদের—

হিমচাঁদ বলেন, থাকবেই তো। শখের থিয়েটারও আছে—তাই না? লাইব্রেরি আছে, দরিদ্রভাণ্ডার আছে, খরাত্রাণ সমিতিও আছে মনে হচ্ছে।

পণ্ডিত বললেন, খরা নয়, বন্যাতেই ফি বছর হাবুডুবু খাই আমরা। কিন্তু

আমাদের গাঁয়ের এত সমস্ত খুঁটিনাটি আপনি জানলেন কি করে?

ভদ্রগ্রাম হলে থাকবেই—আলাদা করে জানতে হয় না। কাজকর্ম না হলেও তক্তার টুকরোয় নাম লেখা সাইনবোর্ড বেড়ার গায়ে নিশ্চিত ঝুলানো থাকবে। সে যাকগে, বিতণ্ডার দরকার নেই—মোটমাট কতগুলো হবে আদামোজা বলে দিন পণ্ডিমশায়।

সুরেন মুহুরি চোখ তাকাতাকি করে মাদারের দিকে: করছেন কি দেখুন হিমচাঁদ বাবু। পরের পয়সা বুঝে দানসত্র লাগালেন পথের উপর?

বিড়বিড় করে হিসাব নিয়ে পণ্ডিত বললেন, তা ধরুন গোটানয়েক তো হবেই—

হিমচাঁদ আরও দরাজ: নয় কেন, দশই ধরে নিন না। হিসাবের সুবিধা।

মাদারের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, আর কি হবে, ছাড়ো একটা পাঁচটাকার নোট। তরফে তরফে আধুলি—দিব্যি হল।

এবং সর্দার-বেহারা পাঁচুর উপর হুমকি দিলেন: তোরা কোন আক্কেলে পাল্কি নামিয়ে বাজনা থামিয়ে বসে পড়েছিস—বলি, বারবেলা পড়ে যাচ্ছে না? তোলু পালকি পা চালিয়ে চলু।

কয়েকটা ছেলে—মাইনর ইস্কুলের পক্ষে অতিরিক্ত রকম তাগড়াই তারা—লম্ফ দিয়ে সামনে এসে পড়ল: পালকি তুললেই হল। পাঁচ টাকা ফকিরের ভিক্ষে নাকি?

নাঃ, পাঁচে হবে না—পাঁচ লাখ চাই। পাঁচশো হাত মাটি খোঁড় তো বাপধনেরা—পাঁচটা পয়সা কেমন বেরোয় দেখি?

এক কথা দুকথায় লেগে যায় আর কি। পথ চলতি লোক দাঁড়িয়ে পড়ছে। পণ্ডিত মাঝে পড়ে নিরস্ত করছেন: আহা, শুভকর্মের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কেন? এত বড় এই ইস্কুল, দুশো ছাত্র, পাঁচজন শিক্ষক, তাদের ভাগে মোটমাট অণ্টগণ্ডা পয়সা, প্রবীণ এ কী রকম ব্যবস্থা করলেন।

মাদার আরও দুটো টাকা পণ্ডিতের হাতে দিয়ে বললেন, ইস্কুলের জন্য অতিরিক্ত—এ টাকার ভাগাভাগি নেই। হল তো?

চাপাগলায় হিমচাঁদ ভর্ৎসনা করে উঠলেন: এই জন্যেই আমি আগ বাড়িয়ে বরকর্তা হয়েছিলাম। তুমি হলে এদের নোলা এমন বাড়িয়ে যেতে, এর পরে গরিব লোকেরা বিয়ে করে বউ নিয়ে যেতে পারত না। বউ ফেলে দৌড় দিত।

পালকির উদ্দেশে বললেন, ছুটে চলরে এইবার। সময় যা গেছে, পুষিয়ে নিতে হবে।

হতে দেবে তাই। আবার এক ফ্যাসাদ। বউ দেখবে বলে পাড়ার এক দঙ্গল মেয়েবউ শ্রীফলতলায় ভিড় করে আছে। সাজগোগ করতে একটু এই দেরি হয়েছে। সর্দার-বেহারাকে মাদার বললেন, পালকির দরজা খুলে দাও পাঁচু, দেখে যান এঁরা। কাঁধ থেকে নামতে গেলে দেরি হবে।

হয় নাকি তাই? শুধুমাত্র নজর ফেলে দেখা তো নয়, নাক চোখ-মুখ গায়ের রং দেখবে, গয়নাগাঁটি দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—বউয়ের চেয়ে বরঞ্চ তার সর্বাঙ্গের গয়না অধিক দর্শনীয়। পালকি নামিয়ে একগলা ঘোমটা শুদ্ধ টুনিকে বাইরে এনে দাঁড় করাল। বাঃ বা রে টুনি, কী রকম গুটিসুটি পুতুলটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'বউ দেখি' 'বউ দেখি' করছে চারিদিক থেকে⋯ঘোমটা সরিয়ে দেখা গেল নতুন-বউয়ের চোখ বোজা। লজ্জাবতী প্রতিমা একখানি—। আজকালকার ধিঙ্গি বউগুলোর মতন নয়। এই টুনি বাপের বাড়ি থেকে যখন পালকিতে উঠল—চোখ মোছামুছি চারদিকে, তার

মধ্যেও মা সুরবালা কানে কানে বলে দিলেন নরম-শরম হয়ে চলবার জন্য—যাতে কেউ নিন্দেমন্দ না করতে পারে। মা তুমি শুনতে পাচ্ছ না, পথের লোকে তোমার মেয়ের সম্বন্ধে কী সব ভাল ভাল কথা বলছে। শুনলেও তুমি বিশ্বাস করতে না কানে ভুল শুনছ, ভাবতে।

জোড়া পালকি আবার কাঁধে উঠল। কিন্তু থাকতে দেবে কতক্ষণই বা। অদূরে মানুষজন দেখা যায়—গতি নির্ঘাৎ এই পালকি মুখো। এবং উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহ হরিসভা ইত্যাদি, এবং বউ দেখা। এলো রে—এসে পড়ল ওই। হিমচাঁদের সর্বক্ষেত্রে রসিকতা—সর্দার-বেহারার দিকে দুই হাত আন্দোলিত করে বলেন, দৌড় দাও পাঁচু। কারা হারে কারা জেতে, দেখা যাবে। ধরতে পারলে কিন্তু রক্ষে নেই। পালকি নামিয়ে ফেলে অত মানুষ ঘিরে দাঁড়িয়ে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনের সাধে বউ দেখবে। তার মানে কমসে কম আধ ঘণ্টা—

মাদার ঘোষও বিষম বিচলিত। এমনটি হতে থাকলে বাড়ি পেঁছিতে রাত দুপুর করে দেবে যে! বউ-পচেছ, জো-খেলানো ইত্যাদি কত কি স্ত্রী-আচার আছে—কাল রাত্রির মধ্যে কোন কিছুই হতে পারবে না।

সুরেন মুহুরি বলে, রাঙা মা-ঠাকরুন পথ তাকাতাকি করছেন। যত ঝাল আমার উপরে ঝাড়বেন: তুমি সঙ্গে থাকতে কি করে ঘটল? গালি দিয়ে ভূত ভাগাবেন আমার উপর—

ধান কেটে নেওয়া ফাঁকা বিল ডাইনে—শুকনো ঠনঠনে। সে-দিকে হাত বাড়িয়ে কারো তোয়াক্কা না রেখে হিমচাঁদ হুকুম ঝাড়লেন: বিলে নামো, রাস্তাপথে একটুও আর নয়—

মাদারও সায় দিলেন: তাই। পথ সংক্ষেপ হবে, আমাদের তাড়াতাড়ি পেঁছানোর দরকার।

হারু মিস্তির বলে, ধানের নাড়াগুলো রয়েছে—শূলের মতন সূচালো। বিল ভাঙতে ভাঙতে পা জখম হয়ে যাবে কিন্তু।

হিমচাদ বলেন, তা যাবে, তবু যাওয়া যাবে ভালো। তেপান্তরের বিলে ইস্কুল লাইব্রেরি থিয়েটারের উৎপাত এখনো জেঁকে বসেনি।

আবার বললেন, রাস্তাপথে রাজীবপুর পড়বে। হুঁশ থাকে যেন। ইস্কুল লাইব্রেরি ওখানে পাড়ায় পাড়ায়—চাঁদা নিয়ে শেষটা ল্যাঙট সম্বল নাগা সন্ন্যাসী করে ছাড়বে।

বিনাবাক্যে মাদার রাস্তা ছেড়ে বিলের-পথে নামলেন। পাশে সুরেন মুহুরি মাদারের সর্বকর্মে যে ডানহাত বিশেষ। বেহারা-বাজনাদারেরাও অগত্যা পিছন ধরল। আরও পিছনে হিমচাঁদ প্রমুখ পেয়ারের লোক তিন-চারটি। বরযাত্রীদের নিয়ে কিছু নয়—রাস্তাপথে যেমন যাচ্ছেন, চলে যান এমনি সরাসরি।

মস্ত বড় বিল—এক এক জায়গায় আলাদা নাম এক একটা। ছোট বউ মজা পাবে বলে মাদার শুনিয়ে যাচ্ছেন। যেমন চাতরার বিল, বউডুবির বিল, খ্যাংড়াবুড়ির বিল, জেলের জাঙাল, নিকারির বাঁধাল—আর, দেখ দেখ, নিকারির বাঁধালে ফুল ফুটেছে কত, লাল শাপলা আর শ্বেত শাপলায় ভরে গেছে। ন্যাড়া শিমুলগাছটা ঐ দেখ ফুলে ফুলে চারিদিকে আলো করে ফেলেছে—

উচ্ছ্বাস ভরে মাদার একনাগাড়ে বলে চলেছেন, সুরেন মুহুরি ঠোঁট বাকিয়ে ডানহাত ঘুরিয়ে নিঃশব্দে টুনির পালকিটা দেখিয়ে দিল। পালকির দুদিককার দরজা

নিশ্ছিদ্রভাবে আঁটা। চোখ দিয়ে ফুল ইত্যাদির শোভা দেখা, দূরস্থান, মাদারের এত সব কথার একটি বর্ণও পালকির ভিতরে যাবার কোন রন্ধ্রপথ নেই। উঁচু-নিচু পথের ঝাঁকিতে দরজা একবার-দুবার ফাঁক হয়ে যায় নি এমন নয়, কিন্তু টুনি তাই থাকতে দেবে—আলো-বাতাসে লজ্জা জখম হয়ে যাবে না। দরজা আরও কষে এঁটেছে সে, ঘোমটা ডবল করে টেনে দিয়েছে।

কী আশ্চর্য, নজর পড়ে নি এতক্ষণ—মাদার ছি-ছি করে উঠলেন! ফাঁকা বিল, বাইরের মানুষ কোন দিকে কেউ নেই—এখানেও আঁটিসাঁটি কেন? মায়ের যে দম আটকে যেতে পারে।

রঙ্গরসের মানুষ সুরেন ভয়ের ভঙ্গি করে বলে, পুলিশের হামলা হতে পারে। হাসবেন না বাবু। লক্ষ টাকায় মণিমাণিক্য পালকির মধ্যে এঁটে-সেঁটে বিলের মধ্য দিয়ে পাচার করছি, ভাবতে পারে পুলিশ।

বড় মিথ্যেও নয়। হাসিমুখে মাদার বলছেন, টুনিমণি মণিমাণিক্যই বটে। পালকির দরজা খুলে দাও পাঁচু। এমন সুন্দর বিকেলবেলা—সারাক্ষণ দুয়োর খোলা থাকবে।

হুকুম হল সর্দার-বেহারার উপর—তার আগেই তুড়িলাফ দিয়ে সুরেন এসে দরজা খুলে দিল।

দিয়েই ভিতরে নজর ফেলে সে হাহাকারের মতন আওয়াজ তুলল: ও বাবু, আমাদের নতুন বউ কোথা পালাল? নিজে পালিয়েছে—বেনারসি শাড়ির ঢাউস একটা বোঁচকা ফেলে গেছে।

উকিলে মুহুরিতে তখন গভীর গবেষণা। মাদার বললেন, না হে, বোঁচকা নয় বোধহয়। খুক খুক করে যেন চাপা হাসি হাসছে, কান পাতলে শুনতে পাবে।

সুরেন সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, মানুষ হলে হাত-পা নাক-মুখ-চোখ গেল কোথায়?

লজ্জায় সব বোঁচকায় ঢুকে গেছে।

বোঁচকার হাসি তীক্ষ্ণতর এবারে। মাদার গদ-গদ হয়ে আবার বললেন, টুনি-পাখি আমাদের বড় লজ্জাবতী।

সুরেন মন্তব্য করে: টুনিপাখি না আজ্ঞে—টুনি কচ্ছপ। দরকারে সর্বদেহ বোঁচকায় গুটিয়ে নেয়।

হাসির তোড়ে বোঁচকা এখন রীতিমত দুলছে। সুরেন বলে, হাসছ তো ঘোমটা ফেলে প্রাণ খুলে হেসে নাও। বন্ধ হাসি ভাল না, দম আটকাতে পারে।

মাদার বলেন, পাকাদেখার দিন তো কথার তুবড়ি ফুটিয়েছিলে, সম্বন্ধ পুরো-পুরি হল তো তুবড়ি বন্ধ?

সুরেন আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়: শ্বশুরদের সঙ্গে কথা বলতে মানা নেই—শাস্ত্রে রয়েছে। আসার সময় স্পষ্টাস্পষ্টি বলেও তো দিলেন, বোবা হয়ে থেকো না। শোনেন নি বাবু, আপনি তো ছিলেন সেখানে?

বোঁচকার একটা প্রান্ত প্রবল বেগে নড়ছে। অর্থাৎ 'মিছে কথা' 'মিছে কথা' বলে বোঁচকা ঘাড় নাড়ছে যেন। মাদার বললেন, আমরা শুনলে কি হবে সুরেন, 'টুনি-মা'র কানে যায় নি। যাবে কি করে, যা কান্নাকাটি গণ্ডগোল বাচ্চাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ—

বাঘা এক ফৌজদারি উকিল এবং তস্য ঘুঘু মুহুরি একত্রে লেগেছেন—ধাপ্পা

দিয়ে নিত্যদিন কত 'নয়' কে 'ছয়' করে থাকেন—এক ফোঁটা মেয়ে আর কতক্ষণ লড়বে! বোঁচকার বেনারসি একটুকু সরে গিয়ে হাসি-হাসি মুখ দেখা দিল। বিদায় বেলা এত চোখের জল—সে জলের চিহ্নমাত্র নেই।

পালকির এ-দরজায় মাদার ও দরজায় সুরেন, পায়ে পায়ে চলেছেন। বেহারারাও ধীর পায়ে যাচ্ছে। বরের পালকির পাশে হিমচাঁদেরা—সে পালকি এগিয়ে উঠল।

সরু খাল ডান দিকে। সুরেন মিছামিছি নাম বলে দিল, নাক-কাটির খাল। লজ্জাবতীর ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি—শ্বশুর পাশে যাচ্ছেন—তা সত্ত্বেও পরোয়া নেই, পালকির বাইরে মুখ বাড়িয়ে নাককাটির খাল দেখে নিল।

সুরেন শুধায়ঃ কার নাক কে কেটেছিল, জানো বউমা?

গল্প কে না জানে? ঘর দুপুরে যক্ষিরা গড়াতে গড়াতে গাঙের দিকে যাচ্ছে। এক যক্ষি দুধওয়ালির কাছ থেকে দুধ খেয়ে নিল, সকলের পিছনে যে আসছে সে দাম দেবে। এলো সেই সর্বশেষ যক্ষি, হাঁ করল। মুখ ভরতি সোনার মোহর। বলে, এক মুঠো তুলে নাও তোমার এক পো দুধের দাম। মুঠো ভরে নেবার পর লোভের বশে আবার নিতে যাচ্ছে—যক্ষি অমনি ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে কচাৎ করে নাক কেটে দিল। রক্তের ধারা বইল—সেই রক্তে খাল লাল হয়ে গেল, যার নাম নাক-কাটির খাল। সোনার মোহরগুলো চাঁদামাছ হয়ে দুধওয়ালির কোঁচড় থেকে খালে গিয়ে পড়ল।

পুরানো পচা গল্প। কিন্তু নাক কাটার ঘটনা নাকি ঠিক এখানেই ঘটেছিল, হাত বাড়িয়ে সুরেন সঠিক জায়গা দেখিয়ে দিল। আর যাবে কোথায়—গল্প জমজমাট।

মাদার এতকাল ওকালতি করলেন—মিথ্যে বানানোয় তিনিই বা কম যাবেন কেন? যা মুখে এলো, আরম্ভ করে দিলেনঃ খ্যাংরা বুড়ির বিলের কথা হচ্ছিল না—দেখ দেখ সেই জায়গা। ঠাহর করলে বুড়ির ভিটেও দেখতে পাবে। ন্যাড়া শিমুল গাছের ডালে ডালে রাঙা ফুল—ঐগাছের ঠিক নিচে। আদ্যিকালের বুড়ি, চিরকাল ধরে আছে, রাত্তিরবেলা ঘররু-ঘররু করে ভিটের ঝাঁট দেয়। হাতের খ্যাংড়া মহাস্ত্র, কখনো ছাড়ে না। অর্জুনের গান্ডীব, ভীমের গদা, খ্যাংরাবুড়ির তেমনি খ্যাংরা—

সে না হয় হল, কিন্তু শুধুমাত্র শিমুলতলায় ঝাড়ু দিয়ে গল্প জমে না—খ্যাংরা বুড়িকে দিয়ে জবর রকম কিছু করানো চাই। কিন্তু বিলের ফেলোবল ভাঙতে ভাঙতে কিছুই আপাতত মাথায় আসছে না। আর মাদার ঘোষ নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছেন।

বিধাতা বাঁচালেন। বিলকিনারে শ্যামল গাছগাছালি—তার মধ্যে গ্রাম সোনাখড়িও আছে। ভাবোদয় হয়ে সুরেন আহা-ওহো করে উঠলঃ দেখ বউমা, চেয়ে দেখ, ওই তোমাদের সোনাখড়ি। মাসতুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে ঐখানে সেবার এসেছিলে। সে দিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলে, জন্মজন্মান্তর যে হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছ সে হাঁড়ি ওখানে?

প্রসঙ্গ পালটেছে, রক্ষা পেলেন মাদার। কিছু ফলাও করে নতুন বউকে তিনি গ্রাম দেখাচ্ছেনঃ ঐ যে সব গাছের মাথা—তাল নারকেল আম জাম জামরুল—মনে হচ্ছে, আমাদেরই বড়বাগের গাছ। তা-ই না মুহুরি মশায়? তোমার বড়-

বাগে মেলা ফলসা গাছ মা-লক্ষ্মী আর কারো এত দেখা যায় না। কিন্তু হলে হবে কি—পেটের ধান্দায় শহরে পড়ে থাকি, বারো ভূতে সব লুটেপুটে খায়, আমাদের ভোগে আসে না।'

এসে গেল তবে শ্বশুরবাড়ি। মুখ বাড়িয়ে টুনি গ্রাম ও গাছগাছালি দেখে নিচ্ছে। কাপড় চোপড় এঁটে নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসল সে, এখনই যেন নেমে পড়বে এই রকম একটা ভাব। মাদার একগাল হেসে বললেন, দূরের হলেও বিলের মধ্যে এইরকম কাছাকাছি দেখায়। এখনো দেরি আছে মা, কম সে কম এক ক্রোশ—

টুনি বলল, দুই মাইল—

মাদার বলেন, পাটিগণিতে তাই বলে, কিন্তু আমাদের পাড়াগাঁয়ের হল ডাল-ভাঙা ক্রোশ। মানে, গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম— তাজা পাতা যখন একেবারে নেতিয়ে পড়বে তখনই বুঝে নেবো, ক্রোশ পুরল এতক্ষণে।

ঐ এক ক্রোশ যেতে সত্যি বেলা গড়াল। বিল ছেড়ে ডাঙায় সোনাখড়ি এসে গেছে। বেহারা—বাজনদার চুপচাপ ছিল—ফাঁকা বিলে আওয়াজ তুলে কি হবে, কে শুনবে? বর-কনে বাড়ি ঢুকবে—যত কেরামতি এইবার। জোড়া পালকির ষোল জন বেহারা, তার সঙ্গে ঢোল, কাঁশি, শানাই, মিলে আকাশ ফাটানোর গতিক।

সরাসরি বাড়ি যাওয়া নয়—সর্বাগ্রে দেবস্থান হরিতলা, গ্রামের সব বর বউকে যেতে হয়। মাদার গিয়েছিলেন। রাঙা ঠাকরুণকেও যেতে হয়েছিল সেই দূরকালে কর্তাটির হাত ধরে। মহাবট কত যুগ ধরে গ্রামরক্ষায় আছেন, কেউ তার হিসাব জানে না।

সবাই চলল, শুধু মাদার একটুখানি দল ছাড়া হবেন এইবারে। বললেন, হরিতলায় নামাওগে যাও, ঠাকুর-প্রণাম হতে থাকুক—বাড়িতে একটা পাক দিয়েই আমি গিয়ে পড়ব। দুটো দিন বাইরে বাইরে আছি, 'বউ-পচেছ'র (বউ-পরিচয়) গোছগাছ কদ্দুর কি হয়েছে নিজ চোখে একবার দেখে আসিগে।

বলে দ্রুতপায়ে তিনি চললেন। আসলে কিন্তু 'বউপচেছ' নয়—রাঙাঠাকরুন স্বয়ং বাড়ি রয়েছেন, পান থেকে চুন খসতে দেবেন না তিনি। ছুটেছেন মাদার, মায়ের কাছে নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর খবরটা দেবেন। বেহারার ডাক ও বাজনার বাদ্যিতে তিনি কি আর টের পাচ্ছেন না? তবু এক ছুটে গিয়ে মাদার নিজ মুখে বলতে চান, মাগো, তোমার হুকুম মান্য করে এলাম। বেতিখোলার জঙ্গুলে গাঁ থেকে তোমার পছন্দের টুনিপাখি পালকিতে পুরে এনে ফেলেছি।

নাম বটে নতুনবাড়ি দালান কোঠা সব পুরানো। ইটের পাঁচিল খানিক খানিক ভেঙে পড়েছে—তা নিয়ে শরিকদের মাথাব্যথা নেই, নজর তুলে কেউ তাকিয়ে দেখে না। এ হেন নতুনবাড়ি বিয়েবাড়ি হয়ে চেহারা আগাগোড়া পালটেছে। ভিতরের উঠোনেও ঘাসবন ছিল, আজকে সাফ-সাফাই ও গোবর-মাটি লেপা হয়ে চারিদিক ঝকঝক তকতক করছে—যেন এমন, সিঁদুরটুকু পড়লে প্রতিটি কণা তুলে নেওয়া যায়। আলপনায় আলপনায় বাড়ি ঘরদোর ভরে রয়েছে—শঙ্খ পদ্মফুল লক্ষ্মীর পা আরো কত কি। পায়ের ছাপ ফেলে মা-লক্ষ্মী যেন উঠোন পার হয়ে রোয়াক পার হয়ে

মাঝের দালানে ঢুকে বসে আছেন নতুন বর বউ ও পাড়ার মেয়েছেলেরা যেখানটা বাসর জমাবে। তাকিয়ে দেখে মাদারের বড় ভাল লাগল। পাঁচিলের দরজা থেকেই ডাক ছাড়ছেন ঃ তোমার টুনিপাখি নিয়ে এসেছি মা—

রাঙাঠাকরুন বললেন, পালকিসুদ্ধ পথে রেখে এলি কেন বাবা? সকলে পথ তাকাচ্ছি—

নন্দর মা তমাললতা শাশুড়ির কাছে টিপ্পনী কাটে ঃ আহ্লাদি বউয়ের আদর-আহ্বানের কী রকম ব্যবস্থা, স্বচক্ষে দেখে নিয়ে তবে আনবে মা। আমাদের উপর ভরসা করতে পারে নি।

মাদারকে রাঙাঠাকরুন তিষ্ঠাতে দেন না ঃ নিয়ে আয় শিগগির দেরি হতে দিবিনে। সন্ধ্যে না হতেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে তুলে নেবো। নয়তো কালরাত্রি পড়বে।

ছুটলেন মাদার হরিতলায়। রাঙাঠাকরুন চেঁচামেচি লাগালেন ঃ ওরে ফুন্টি, দুধটা চাপিয়ে দে এইবার। এসে পড়ল বলে।

হরিতলাতেও ছোটখাট একটু ভিড়, জরদ্গব বুড়িমানুষ একটি তার মধ্যে। থুঁড়িয়ে চলেন তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে। কথা কাঁপে, মুখ দিয়ে স্পষ্ট হয়ে বেরোয় না। ত্রিসংসারে কেউ নেই—একদা ছিল অনেক। সাত সাতটা মেয়ে, সর্বশেষ ছেলে একটি। একে একে সব চলে গেছে। ছেলেটা বেশি বেয়াক্কেলে—সে গেল বেছে বেছে ঠিক তার ফুলশয্যার রাত্রে। দুপুরে কলেরা, পহর রাতে চোখ বুজল। ফুলের শয্যায় শোবে তা নয়, চিতার উপর আগুনের বিছানায়। ফুলশয্যার ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল চিতায় নিয়ে ঢালল। নতুন বউ অচেতন, সেই অবস্থায় তাকে দিয়ে মুখাগ্নি করাল।

পুরানো শোকতাপ মুছে গেছে নিশ্চয় বুড়ির মন থেকে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে। জীর্ণ খোড়োঘরে একলা প্রাণী পড়ে থাকেন। শুধু সর্বঘটে আছেন তিনি —সব সময় ফষ্টিনষ্টি ঠাট্টা-বটকেরা। নাম হয়ে গেছে আনন্দী বুড়ি—আনন্দ-সাগরে দিবা-নিশি ভাসমান, রকম-সকম এই প্রকার।

মাদারের তাড়ায় নন্দু পালকিতে ঢুকতে যাচ্ছে আনন্দীবুড়ি হাতের লাঠি কাত করে দিয়ে পালকির দুয়োর আটকালেন ঃ আমার পালকি কই ও মাদার, আমায় বুঝি হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে? সেটি হচ্ছে না।

মনের মধ্যে উদ্বেগ যা-ই থাকুক, আজকের এ দিনে মুখ-ভরা হাসি—হাসি না মিশিয়ে কথা হবে না। হাসতে হাসতে মাদার বললেন, সে কি কথা! তুমি হলে আমার মায়ের কত প্রাচীন নাতবউ—যে দিন নন্দু হল, তার আঁতুড়ঘর থেকেই। তোমায় হাঁটালে মা রক্ষে রাখবেন? কনেবউ ছোট পালকিতে আছে—বেশ আছে। বড় পালকিটা তোমার—নন্দু নয়, তুমি উঠে পড়ো। নন্দুই হাঁটুক। এইটুকু পথ হাঁটতে পারবে না—কেন, বর হয়ে কি লাট হয়েছে?

বুড়ি ভয়ের ভঙ্গি করে বলেন, না, বাবা, কাজ নেই। বিয়ের বরকে পায়ে হাঁটালে নতুন সতীন গোঁসা করবে আমার উপর। ধপ করে হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে বসে পড়লেন তিনি টুনির পালকির পাশে। দরজা ফাঁক করে বউয়ের মুখ দেখছেন। বললেন, ওমা, সত্যিই যে চোখ বুজেছে—সতীনের সত্যি সত্যি মুখদর্শন করবে না।

মাদারই বা ছাড়বেন কেন, ফাঁকতালে বউয়ের খানিকটা গুণ বলে নিলেনঃ বড্ড লজ্জাবতী খুড়ীমা—আজকালকার মেয়ের মতন নয়। আমার ঠাকুরমার কাছে শুনতাম, বিশ বছর ঘরকন্নার মধ্যেও দিনমানে কোনদিন ঠাকুরদাদার সামনা-সামনি আসেন নি—রাত দুপুরে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে তার পরে। ঠাকুমা'র মুখে গল্প শুনেছি, আর মা-লক্ষ্মীকে এই চোখে দেখতে পাচ্ছি।

ডুবন্ত বেলা, বেশি কথার সময় নেই। আনন্দীবুড়ি নিজেই পালকি তুলতে বললেনঃ দাবি ছাড়লাম, ওরাই আজ পালকি চড়ুক। আমিও তা বলে হাঁটব না, নাচতে নাচতে যাবো। বুঝলে গো নতুন বউ, হাঁটিনে আমি কখনো। নেচে নেচে চলি—

ফোকলা মুখের খলখল হাসি হেসে লাঠি ভর করে আনন্দীবুড়ি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললেন। উঁহু, খোঁড়ানো নয়—তিনি বলেন নাচনা।

মেয়েছেলে সোনাখড়ির কোন বাড়িতে বুঝি নেই এখন—নতুন বাড়ি বউ দেখতে এসেছে। যার যেটুকু সঙ্গতি—কাপড়-চোপড় গয়নাগাঁটিতে সেজেগুজে এসেছে। তমাললতা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলছেন, দুধের কন্দুর ওরে ফুন্টি? ওরা কিন্তু এসে গেল।

পাঁচিলের দরজায় বড় বকুলগাছ। জোড়া পালকি বকুলতলায় পাশাপাশি নামাল। পালকির চালে খই ছড়াচ্ছে বৃষ্টির ধারে—কড়িও ছড়াচ্ছে। উলুর ঝাঁক চতুর্দিক থেকে। মুখ ফুলিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে মেয়েরা।

শানাই এইবার বড় মিষ্টি তান ধরেছে। তমাললতা ঘটি হাতে ছুটে এলেন। দুই পালকির আটখানা খুরো ধুয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন ঘটির জলে—গৃহস্থবাড়ি মহামান্য অতিথি ধুলোপায়ে এসে পড়লে পা ধুইয়ে দেবার যেমন রীতি। গোলার ধারে চারটে কলাগাছ পুঁতে 'বউপচ্ছের' জায়গা—পালকির দুয়োর থেকে ধবধবে কাপড় পেতে দিয়েছে সেই অবধি। সেখান থেকেও অমনি কাপড়ে পথ চলে গেছে রোয়াকের উপর দিয়ে দরদালান পার হয়ে মাঝের দালানে। সমস্তটা জীবনের মধ্যে আজকের এই বিশেষ দিন—চলাচলের মধ্যে বরকনের পায়ে ধুলোর একটা কণিকা লাগতে দেবে না।

বড় পালকি থেকে নন্দু বেরুল। মাথায় টোপর তুলে দিতে রূপকথার রাজপুত্রের আদল এসে যায়। আর রাঙাঠাকারুন মুকিয়ে রয়েছেন—টুনি বউ পালকি থেকে বেরুতে না বেরুতে টুপ করে তাকে কোলে তুলে নিয়ে নন্দুর বাঁয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দিয়ে তাকালেন যুগলের দিকে বিমুগ্ধ চোখে—আহা, কি মানিয়েছে রে। ছোট্ট ছোট্ট বর বউ না হলে কি দেখে সুখ—সবাই এমনি বলাবলি করছে। টুনির মাথায় মৌর তো আছেই—তার উপরে আবার চড়ে বসল লক্ষ্মীর ঝাঁপি। ডান হাতে মাছের ল্যাজা, কাঁধে ঝকঝকে পিতলের কলসি। ঝুন-ঝুন ঝুনুর-ঝুন পায়ের গুজরি বাজিয়ে রাজহংসের পাখনার মতো নিষ্কলঙ্ক সাদা কাপড়ের পথে বরের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে চলল টুনি কলাতলায় 'বউপচ্ছের' জায়গায়। পা চলে কি চলে-না—শামুকও জিতে যাবে সঙ্গে হাঁটবার যদি পাল্লা-পাল্লি হয়। রোয়াক থেকে মাদার এক নজর দেখলেন, মুখ ভরে তাঁর হাসি এসে গেল—কনে দেখে এসেছিলেন, কনে তখন গাছের মগডালের উপর। সেই কনের বউ

হয়ে গিয়ে আজ এই দুর্দশা।

সামান্য দূরে ক'খানা ইট সাজিয়ে অস্থায়ী উনুন। উনুনে কড়াই চেপেছে, কড়াইতে দুধ। এই কাজের ভার ফুল্টি নামে মেয়েটার উপর। সতর্ক আছে সে—ঠিক যে সময়টা নতুন বউয়ের কলাতলায় প্রবেশ, কাঠ-পাতা দিয়ে উনুন দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে—কড়াইয়ের দুধ উথলে উঠে কড়াই ছাপিয়ে পড়ল। আর উল্লাসও যেন উঠানটুকুতে আর ধরে না, ছাপিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ছে। নতুন বউ আসার সঙ্গে সঙ্গে সুখসৌভাগ্যে উথলে উঠেছে, ভাবখানা এই প্রকার।

পাথরের থালায় আলতা আর দুধে গোলা। আলতা রাঙানো টুকটুকে পা দুটি তার মধ্যে ডুবিয়ে টুনি বরের গায়ে গায়ে দাঁড়াল। দাঁড়াতে হয় রে পাগলি, সবাই দাঁড়ায়। মাথায় ঘোমটা, ঘোমটার তলে চোখের মণি দুটো ভাঁটার মতন ঘুরছে। ঘোমটা তুলে মুখ দেখতে চাও যদি, দেখবে কিন্তু বোজা চোখ। উনুনে জ্বাল ধরিয়ে দিয়ে ফুল্টি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল—টুক করে এই সময়টা কনে বউয়ের গায়ের উপর পড়ে আবার এক কাজ করল। তার উপরে আরও এই ভার আছে—চড়ুইয়ের পালক মধুতে ভিজিয়ে টুনি বউয়ের কানের ফুটোয় বুলিয়ে দিয়ে গেল। বেতিখোলায় বরের কানে দিয়েছিল—এখানে বিপরীত, মধু ঢুকিয়ে দিল বউয়ের কানে। বকাঝকা করো গালমন্দ দাও—বউ শুনবে কেবল মধু আর মধু, শুভলগ্নের এই তুকতাকের গুণে। পাড়ার ও গাঁয়ের যত বউ ঝি এসে ঘিরে ধরেছে। হাত কাঁপিয়ে, এবং ক্রমশ সর্বদেহ কাঁপিয়ে বরণ করছে। ঢোল শানাইয়ে বরণের বাজনা। কাজের গতিকে দু-একজন যারা আসতে পারেনি ঘরে বসেই তারা টের পাচ্ছে, বরণ আরম্ভ হয়ে গেছে। এ-মেয়েতে ও-বউতে বরণের পাল্লাপাল্লি। রকম ফেরই বা কত! শুধু হাতের বরণ। বরণডালার শঙ্খ তুলে হাতের মুঠোয় নিয়ে বরণ—এ হল ফুল শঙ্খ বাজে না, শুধু দেখনাই। ধান দূর্বা হাতে নিয়ে নিল, বরণ চলল যুগলের আপাদমস্তক হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, বরণ অন্তে দূর্বা ধান মাথায় ছড়িয়ে আশীর্বাদ করল। শেষটা রম্ভা নিল বরণডালা থেকে—দুহাতে দুই ঠোঁটেকলা। যথোচিত বরণ হয়ে গেল, বরণ শেষে দুই কলায় ঠোনা মারল নন্দুর দুই গালে। বলে, কলা খাও কলা খাও। বউরা সব ঘোমটার ভিতর খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসির মুখগুলো অলক্ষ্য, জলতরঙ্গের মতো সুরটা কেবল বাজে। টুনি বেশি সেয়ানা। কলার তাক তার দিকেও ছিল—ঠিক সময়টিতে ঝুপ করে সে বসে পড়ল। বেকুব ওরাই একফোঁটা এই নতুন-বউয়ের কাছে।

•

আনন্দীবুড়িও খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কিংবা বলুন নাচতে নাচতে, নতুনবাড়ি এসে গেছেন। স্ত্রী-আচারের মধ্যে বিধবাদের থাকতে নেই—দূরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন। খলখল করে হেসে নন্দুকে সেখান থেকে বললেন, ও দাদাভাই, আমার নতুন সতীনের বুদ্ধির এক কানাকড়ি নেই তোমার ঘটে। অদৃষ্টে অনেক খোয়ার—ও তোমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে।

পুববাড়ির অলকা-বউ খরখর করে বলল, নাকে কেন দড়ি দিতে যাবে ঠাকুরমা? বেয়াড়াগরুর নাক ফুটো করে দড়ি পরিয়ে শাসনে রাখে। ভাল মানুষ ঠাকুরপো আমাদের গলা বাড়িয়ে হারের মতন দড়ি নিয়ে নেবে।

উঠোনের পর্ব কতক্ষণ ধরে চলত ঠিকঠিকানা নেই। মাদারের তাড়া এলো সহসা: কালরাত্রি পড়ে যাবে, হুঁশ আছে? উঠোনের হয়ে গিয়ে থাকে তো ঘরে

চলে যান। ঘরের কাজও তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

তাই বটে। যে রাত্রে বিয়ে হল, তার পরের রাত্রিটা কালরাত্রি। সন্ধ্যা হতেই সামাল সামাল—বর বউয়ের চোখের দেখাটুকুতেও দোষ।

সকলে এবার মাঝের দালানে চলল। রোয়াকের উপর উঠে গেছে—তমাললতা কোথায় ডুব দিয়ে ছিল, হঠাৎ নন্দুর মুখোমুখি। একেবারে কিছুই জানে না, এমনি ধারা ভাব দেখিয়ে প্রশ্ন করেঃ বাড়িতে কাকে এই নিয়ে এসেচিস বাবা?

জবাবটা উত্তমরূপ তালিম দেওয়া আছে, কথাগুলো নন্দু গড়গড় করে বলে গেল তোমার দাসী এনেছি মা! নিয়ে নাও।

তমালিনী টুনি বউকে বুকের মধ্যে নিয়ে নিল (কাজটুকু যদি চ নিয়মে নেই)। মুখখানা তুলে আদর করছেঃ দাসী, সোনামণি দাসী আমার। আ মরে যাই, চাঁদপানা মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

এক গিন্নি সেই সময় পাশ থেকে ফোড়ন কাটছিলেনঃ বউ আজকাল দাসী হয় না। দাসীবাঁদী বরঞ্চ শাশুড়িদেরই হতে হয়।

গিন্নির পানে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে তমাললতা বলে, ঠিক বলেছ দিদি, দাসী কেন হতে যাবে। মা আমার ঘরের লক্ষ্মী। বাপের বাড়ি আহ্লাদি মেয়ে ফুড়ুত ফুড়ুত করে উড়ত, মা-লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে, দেখ দেখ, কেমন সে মূর্তিমতী লক্ষ্মী হয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে।

জোড়ে আবার পায়ে পায়ে এগোয়। দরদালান দিয়ে মাঝের দালানে যাবে—চৌকাঠের দু-দিকে দু-হাত দিয়ে নন্দুর ছোটভাই রুণ্টু বীরমূর্তিতে দুয়োর আটকাল। ছেড়ে দেবে না, কিছুতেই না—যতক্ষণ না সন্তোষজনক জবাব পাচ্ছে। বয়স মোটে আট, ছোট মুখের পাকা পাকা কথা শুনতে মজা লাগে। প্রশ্ন দাদার কাছে নয়,—এই যে তার নতুন বউদিদি এলো তারই কাছেঃ আমার বউ কবে আনবে? আগে বলো বউদিদি, তারপর যেতে দেবো।

চমক খেল টুনি ঘোমটার মধ্যে। বউদিদি ডাকছে—বিয়ের ফুল ফুটতে না ফুটতে সে বউদিদি হয়ে গেছে! বেতিখোলার এ-বাড়ি ও-বাড়ি কত বউদিদি আছে, দু-তিন ছেলের মা তারা—পদদাপে মাটি কাঁপিয়ে তাদের চলাচল। দুয়োর আটকে এক ফোঁটা এই শিশু টুনিকেও এই ভারিক্কি পদে তুলে দিল। নতুন কিছু নয়—

এও এক রীতকর্ম। ছোট্ট দেওর থাকলে এই প্রশ্ন চিরকাল ধরে সে নতুন বউকে করে আসছে। নির্ভুলভাবে সে কথা কয়টি বলল—বাহাদুরিটা ষোল আনা রাঙাঠাকরুনের, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে কচি মুখ দিয়ে পাকা এই কথা বের করার জন্য।

হাসির লহর বয়ে যায়। লম্বা ঘোমটার ভিতরেও ঈষৎ আওয়াজ যেন—লজ্জাবতী বউও হেসে ফেলল নাকি?

দু'হাত বাড়িয়ে রুণ্টু পথ আগলেছে। অচল অটল—কথা না নিয়ে দুয়োর ছাড়বে না। চারদিক থেকে নির্দেশ আসছেঃ চুপচাপ থাকলে হবে না নতুন বউ। দেওরে আবদার ধরেছে, বলো একটা কিছু! বেলা যাচ্ছে—শিগগির বলো।

টুনি বউ অগত্যা বলল, বোশেখ মাসে। অস্পষ্ট গলা সঠিক বোধগম্য হল না সকলের। হৈ-হৈ পড়ে গেলঃ লজ্জা ভেঙেছে, কথা ফুটেছে মুখে আমরা ধরে নিয়েছিলাম, বউ বোবা।

হুঁ, বোঝা না আরো কিছু!—পাড়ার সেই গিন্নি পুনশ্চ মন্তব্য করলেন : সবুর করো, জমে উঠতে দাও। বাড়িতে কাক পড়তে সাহস পাবে না চেঁচানির ঠেলায়। ঘরে ঘরে তো দেখি তাই।

মাঝের দালানের সমস্তটা মেজে জুড়ে ফরাস, মেয়ে বউয়ে ঠাসাঠাসি তার উপর। তবু জায়গায় কুলোয় নি—দরদালানে দাঁড়িয়েছে, জানলায় ভিড় জমিয়ে যন্দুর পারে দেখছে, কান খাড়া করে শুনছে। ফরাসের ঠিক মাঝখানটিতে বড়-বউয়ের জায়গা—তাদের নিয়ে জো খেলানো হচ্ছে। এবং ফষ্টি নষ্টি ঠাট্টা-বটকেরা—

স্ত্রী-আচার—মন্তোর পড়তে হয় না, তবু বিয়ের বিশেষ একটা অঙ্গ। শুধুমাত্র মেয়েদের ব্যাপার, পুরুষ আসতে পারে না। মেয়ের মধ্যেও মান্য বয়স্কেরা দূরে দূরে রয়েছেন কেবল পশ্চিম বাড়ির রাজির মা ছাড়া। টুনির সে আপন মাসি, আবার মাদারও দেওর সম্পর্কিত—নন্দু তাকে সেজো খুড়িমা বলে ডাকে। ঐ যে বলে থাকে কোনের মাসি বরের পিসি—পিসি না হলেও খুড়ি তো বটে। তার উপরে রাঙা ঠাকরুণ চোখ টিপে দিয়েছেন—ছুঁড়িগুলো নন্দুকে যদি-ই বা ছাড়ে, কনে বউকে সহজে ছেড়ে দেবে না। তুমি ওদের মধ্যে গিয়ে রীতকর্মগুলো তাড়াতাড়ি সেরে দাও গে। কালরাত্রি না পড়ে যায়—খবরদার, খবরদার। রাজির মা তাই আসরে চেপে বসেছেন দরকারে হুকুম- হাকামও ছাড়ছেন। বলেন, আজকে তোরা মেলা লম্বা করিস না। এক দিনে ফুরিয়ে যাচ্ছে না—ফুলশয্যা কাল—সারা রাত্তির ধরে হুল্লোড় করিস, কেউ কিছু বলতে যাবে না। তাতেও না কুলোয়, পরশুদিন আছে। এই তো এখন চলল—

জো খেলানো। মাথার টোপর ডানপাশে নামাল বর, মাথার মৌর কনে বাঁ-পাশে। বরের বাঁয়ে কনে। খেলার মতোই পাল্লাপাল্লির মজা—আর বর কনে দুটিই তো ছেলেমানুষ। বসতে না বসতে জমে গেল। তামার টাটে জল ভরা আছে। টোপর ও মৌর থেকে এক এক টুকরো শোলা ভেঙে ছেড়ে দিল সেই জলে। নন্দুকে বলে, আঙুল ঘোরাও জলের মধ্যে। টোপরের শোলা ভাসতে ভাসতে মৌরের শোলার দিকে যায়। জোরে ঘোরাও, আরও জোরে—বউ পালাচ্ছে, ধরে ফেলো বউকে। মৌরের শোলা যেন বউ, টোপরের শোলা বর। সংসার-সাগরে ভাসমান তারা। কিন্তু দুষ্ট বউ ধরা দেয় না—কাছে আসে, দূরে পালিয়ে যায়। মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই দিকে : কনে বউকে তাড়া করেছে, বউ ভয়ে পালাচ্ছে কেমন, দেখ। এরই মধ্যে ধরল রে ধরল—করে চেঁচিয়ে উঠল হয়তো কয়েকটা মেয়ে। কিন্তু বিফল শেষ পর্যন্ত। মৌরের শোলা আবার দূরে চলে গেল।

না : হবে না—। হাল ছেড়ে দিয়ে নন্দু ঘাড় তুলল : ঘোরাতে ঘোরাতে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল আমার।

জবাবে ভৎসনা : একেবারে আনাড়ি তুমি ঠাকুরপো। এইটুকু বউকে শাসনে আনতে পারো না : ক্ষমতা দেখা গেছে, হাত তোল—কনে বউ এবারে হাত দিল।

টুনির প্রতি উপদেশ : বউ ফেলে ঠাকুরপো বাইরে বাইরে না ঘোরে—ধরে ফেল তো ওকে। ঘরে তালা-চাবি দিয়ে রাখবি ॥

লম্বা ঘোমটার নিচে টুনিও খুক খুক করে হাসছে। একবারের বেশি দু-বার বলতে হল না। গয়না ঝিনমিন বাজিয়ে লালচেলির নিচে থেকে ছোট্ট নিটোল এক

খানা হাত বের করে টাটের জলে আঙুল ডুবিয়ে ঘোরাচ্ছে। কী কায়দা ঘোরানোর শোলার টুকরো দুটো ভিজে জবজবে হয়ে গেছে তো। এক জায়গায় এসে লেপটে গেল। লেপটে গিয়ে একসঙ্গে ঘুরতে লেগেছে—আর এখন আলাদা হয় না। হাসি হুল্লোড় মেয়ে মহলেঃ জিতেছে কনে বউ। মোটে বাগ মানতে চাচ্ছিল না—বরের কাঁধে চেপে এখন ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। অত হাসি দেখে তমাললতাও একবার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে গেল। টুনির হাসি যেন আর ঘোমটায় আটক থাকছে না ঘোমটা ফেটে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

পরিপাটি রকমে সাজানো-গোছানো বরণকুলো। নন্দুকে বলা হল, বউয়ের হাতে দাও তুমি। কিন্তু হাতের নাগাল পেলে তবে তো হাতে দেওয়া—গুটিয়ে সুটিয়ে পরম যত্নে শাড়ির মধ্যে হাত ঢোকানো। এরা হাঁকডাক করছেঃ দাও না গো তুমি। আমরা তাড়া খাচ্ছি জো-খেলানো তাড়াতাড়ি সেরে দেবার জন্য, তা নন্দুই মোটে কুলো তুলে ধরবে না। এক ফোঁটা বউকে এত ভয়।

নন্দুর পৌরুষে লাগে! না-ই বা হাত পাতল, বরণকুলো নিয়ে ধরল আন্দাজি হাতের জায়গায়। টুনি দিল এক ঝটকা (নিশ্চিত আগে-ভাগে তালিম দেওয়া)—বরণকুলোর ধানকড়ি ছিটকে দূর দূরান্তর গিয়ে পড়ল। খুঁজে পেতে কুড়িয়ে কাড়িয়ে বরকে পুনশ্চ দিতে হবে অমনি করে। অভিমানের সুরে নন্দু বলে, বয়ে গেছে - আমার যেন মান-অপমান নেই। আমি পারব না বউদিদি—

পারতে হবে। নিয়ম—

বারে, ছুঁড়ে ফেলবে আর আমি এনে এনে দেবো। কত বার?

সারা জন্ম ধরে। পরের মেয়ে ঘরে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়।

কনের মাসি রাজির মা ব্যাখ্যা করে দেয়ঃ কড়ি হল টাকাকড়ি ধন-দৌলত, আর ধান হল ধানচাল খাবার-দাবার। তুমি জোগাড়-যন্তোর করে আনবে, আর বউ ফেলে ছড়িয়ে যেমন খুশি খরচা করে যাবে—

নন্দু সামলাতে পারে না—বলেই ফেললঃ বড্ড উড়নচণ্ডী বউ সেজো-খুড়িমা, ঐ কড়ি কোথায় গিয়ে পড়েছে দেখুন—

বউয়ের পক্ষ নিয়ে একসঙ্গে চারটে পাঁচটা মেয়ে দাবড়ানি দিয়ে ওঠেঃ খবরদার। বউয়ের নিন্দে—এত বড় আস্পর্ধা? বউ যা-ই করুক, ধমক-ধামক চলবে না—চুপচাপ সমস্ত সয়ে যেতে হবে। কী কথা দিয়ে এসেছ, মনে নেই?

রাজির মা জুড়ে দিলঃ আমারই সামনে তো। দিদিকে যখন বললে, তাঁর পাশটিতে তখন আমি—

নন্দ শুধায়ঃ কি বলেছিলাম আমি?

একলা তুমি কেন, সব বরই বলে আসে যাত্রামঙ্গলের সময়। বলতে হয়, মেয়ের যত দোষ-অপরাধ সমস্ত আমি সারাজীবন ঢেকে নিয়ে চলব।

কুটুম্ব যারা বিয়েবাড়ি এসেছে তাদের ভিতরের একটি লেখাপড়া জানা মেয়ে, ছবি, কথায় দস্তুর মতো বাঁধুনি—বলল, ফালতু দুটো মুখের কথা নয় ভাই, কণ্ট্রাক্ট পাকাপোক্ত রকমের। সর্ত হয়েছে, বউয়ের দোষ কোনদিন চোখ দিয়ে দেখবেন না—কান দিয়ে শুনবেন না। সর্তে রাজি করে নিয়ে তবেই না ঘরের মেয়ে পর করে দিয়ে আপনার সঙ্গে পাঠাল।

বেকুবির ভঙ্গিতে শুকনো মুখ করে নন্দু বলে, একজনে আগে আগে তড়বড় করে

কি-সমস্ত বলতে লাগল, আমিও তোতাপাখির মত আউড়ে গেলাম। অতশত বুঝে দেখিনি, ভাবিনিও কিছু।

এই কথাগুলো বাংলা বলেই এখন খেয়ালে এলো। সংস্কৃত মন্তোরে আরও সব সাংঘাতিক জিনিস বলতে হয়েছে, দিনের পর দিন ধীরে সুস্থে বুঝবেন। আদরে যত্নে মানুষ করে তুলে ইটপাটকেলের মতন বাপ-মা ঘরের মেয়ে পরের ঘরে ছুঁড়ে দেন না।

সন্ধ্যা হতেই কালরাত্রি—নন্দুকে সরিয়ে দিল। টুনিবউ ফুসফুস গুজগুজ করছে সমান বয়সের কয়েকটির সঙ্গে, হাসছে খুক-খুক করে। এই রাত্রে বউয়ে-বরে চোখা-চোখি হওয়াটুকুও দোষের! দৈবাৎ চোখ পড়ে গেলে মুখ ঘোরাবে। এবং তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করবে। ভাগ্যিস এই নিয়ম—কালরাত্রিই বাঁচিয়ে দিল। নইলে নন্দুর কপালে আরও কত ভোগান্তি ছিল কে জানে। এই আতঙ্কেই সম্ভবত হবু-বরেরা ইদানীং বিয়ের নামে দু-পা এগোয় তো দশ-পা পিছিয়ে যায়।

যত মেয়ে-বউ এসেছে, নতুনবাড়ি এখন জলযোগ করে যেতে হবে। জলযোগ মানে রাতের মধ্যে কারো আর জলস্পর্শ করার তাগত থাকবে না। তমাল এইসব ব্যাপারে ঘোরতর ব্যস্ত। ব্যস্ত মাদার ঘোষও—লোকজন নিয়ে কালকের দিনের বিলি-ব্যবস্থা, যতটা পারা যায়, সেরে ফেলছেন।

টুনিবউ ওদিকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াল কিছুক্ষণ—লোকজন চলে গিয়ে কখন মাদার নিরিবিলি হবেন, বাইরের ঘর থেকে শোবার ঘরে চলে আসবেন! নতুন বউ তখন কাছে গিয়ে বসবে। টুনি আর শ্বশুরঠাকুর—এবং রুণ্টুও থাকবে, গল্পের গন্ধে যাতে তার চোখের ঘুম পালিয়ে যায়। বলতে হবে মাদারকে সেই খ্যাংরাবুড়ির গল্প, আরম্ভে চাপা পড়ে আছে। মনের মধ্যে বুড়ি সেই থেকে কতবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল—কিন্তু উপায় কি, এখনো মাদার যে বাইরের ঘর থেকে উঠতে পারলেন না।

আজকে তো কেবল 'বউ পছেছ'টা হয়ে গেল—ভারী ভারী ব্যাপার সমস্ত কাল। বউভাত—টুনিবউ ছোট্ট মুঠোয় তুলে আত্মীয়কুটুম্বদের পাতে দুটো দুটো ভাত দিয়ে যাবে—নতুনঘরের ঘরনী হয়ে সংসারধর্ম করবে, তার ঐ সূচনা। উঠোনে সামিয়ানার নিচে সামাজিক পংক্তিভোজ, ক্ষেপে ক্ষেপে বার তিনেক অন্তত নিমন্ত্রিতের খাওয়া—দুপুরে শুরু হলেও শেষ হতে সন্ধ্যা। আবার সাঁজ লাগাতেই ওদিকে মাঝ-কুঠুরিতে ফুলশয্যা লেগে যাবে। দিনেরাত্রে কাল টুনিবউকে মোটে দিশা করতে দেবে না, অথচ আজকের এই রাত্রি, দেখ, বিনিকাজে বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত বিরক্ত টুনি শুয়ে পড়ল শাশুড়ির বিছানায়। দেখতে পেয়ে তমাল আলো নিভিয়ে দুয়োর ভেজিয়ে দিয়ে গেল: আহা, পরশু থেকে ধকল যাচ্ছে—ফুরসৎ হল তো ঘুমিয়ে নিক একটু বেচারি। খাওয়ার সময় ডেকে তুলে নিয়ে যাব।

চটি ফটফট করে হাতে হুঁকো-কলকে নিয়ে মাদার অবশেষে ভিতরে আসছেন। তমালিনী চিলের মতন ছোঁ মেরে হুঁকোর মাথার কলকে নিয়ে উধাও। এতক্ষণে জিরান পেয়ে মাদার তাকিয়া ঠেশ দিয়ে পড়লেন, কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে তমালিনীরও আঁচরে প্রবেশ। হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে দিয়ে হাসিতে সে শতখণ্ড হয়ে পড়ল।

প্রসন্ন চোখে তাকিয়ে মাদার শুধালেন, বউ পছন্দ তা হলে।

ভারি হাসকুটে মেয়ে। গোড়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—ঐটুকু মেয়ের অতবড়

ঘোমটা, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। বেতিখোলার গিন্নিবান্নিরা কনেকে তরিবৎ শিখিয়ে দিয়েছে—এই আর কি। তারপর রণ্টু গিয়ে যখন পড়ল: আমার বউ কবে আনবে, বলো আগে—

মাদারের বিশাল শয্যার একপাশে রণ্টু বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। অন্যদিন সে সে মায়ের কাছে শোয়, কালরাত্রি বলে নতুনবউ আজ সেখানে শুয়ে পড়েছে, রণ্টু বাপের বিছানায়। এই রাত্রিটুকুর মতো।

ঘুমোন্ত ছেলের দিকে স্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে তমাল বলল, দুদিকের চৌকাঠ দুহাত রেখে রণ্টু বলল, বউ কবে আনবে বলো আগে বউদিদি—তবে পথ ছাড়ব। ভঙ্গিমা দেখে আর কথা শুনে হাসির কী ঘটা তখন ঘোমটার ভিতর—

মাদার বললেন, ঘোমটা টেনে ফেলে দিলে না কেন?

ইচ্ছে হচ্ছিল তাই। কিন্তু গাঁয়ের বউ-ঝিরা কী মনে ভাবত—

ভাবত বউ নয়—আমাদের মেয়ে। মেয়ে নেই বলে মাদার উকিল আর তার মা খুঁজে খুঁজে ফুটফুটে এক মেয়ে জুটিয়ে এনেছে।

শাশুড়ির বিছানায় টুনিবউ। চোখ বোজা—দেখাচ্ছিল ঘুমন্তের মতন, কিন্তু ঘুমোতে বয়ে গেছে তার। শাশুড়ি যে-ই না ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, পা টিপে টিপে সে চলে এসেছে।

বাবা!—অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রায় ফিসফিসানির মতন। মাদারের বিছানার উপর ঝুপ করে বসে পড়ে বিনা ভূমিকায় বলল, খ্যাংরাবুড়ি এতক্ষণ ঝাটপাট আরম্ভ করে দিয়েছে, তাই না বাবা?

এখন আর মাদার ডরান না। খ্যাংরার প্রতাপ নিয়ে জবর গল্প মাথায় এসে গেছে। অর্জুনের গাণ্ডীব ভীমের গদা আর বুড়ির খ্যাংরা—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। আদ্যিকালের কথা, আকাশ তখন অনেক নিচুতে, অসাবধানে মাথায় ঠেকে যেত। চাঁদের মা বুড়ি সুতো কাটতে কাটতে এই খ্যাংরাবুড়ির সঙ্গেই সুখ-দুঃখের কত গল্প করেছেন। এক রাত্রে সারাক্ষণ দুর্যোগ, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিকে। খ্যাংরাবুড়ির ঠাহর হয় না, ঠিক কোনখানে উঁচুতে আকাশ। খ্যাংরা চালাচ্ছে, ঝাটপাট দিয়ে বৃষ্টির জল বের করতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে খাড়া দাঁড়াতে গেছে…ঠকাশ করে মাথার উপর আকাশের ঘা। জোরে লেগেছে, মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ি আকাশের গায়ে নিদারুণ খ্যাংরা মারে। আর বলে, দূর হ—দূর-দূর! অত বড় মার আকাশ সহ্য করতে পারে না—কড়-কড় মড়-মড় করে আর্তনাদ তুলল। ত্রিভুবন কাঁপছে—প্রলয় বুঝি এসে গেল। ব্যাপারও তাই। বুড়ি সমানে খ্যাংরা মারছে, আকাশ ভেঙে চৌচির—মেঘসুদ্ধ সুপ্রকাণ্ড আচ্ছাদনটা তালগোল পাকিয়ে ক্রমশ একেবারে অদৃশ্য। মাথার উপরে দেদার ফাঁকা। বুড়ির হাতের খ্যাংরাগাছির এতখানি প্রতাপ।

প্রহর রাত থাকতে জেলেরা এসে গেল। মাঠের পুকুরে দড়াজাল নামাবে। মাছ এদিক-ওদিক না হয়ে যায়, সুরেন মুহুরির উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব। জেলেদের সঙ্গে সঙ্গে সে আছে। ঢেঁকিশালের পাশে কাঁঠালগাছ—বড় বড় রুই-কাতলা জেলেরা ঢপাস ঢপাস করে কাঁঠালতলায় ফেলছে। ইচ্ছে করেই শব্দ সাড়া করছে, বাড়ির

সকলে ঘুম থেকে উঠে জেলেদের বাহাদুরি ভিড় করে দেখুন, তারিপ করুন কোটা-বাছা হয়ে যাবার আগে।

মাদার আছেন, নন্দু আছে, বাতের রোগি রাঙাঠাকরুন পর্যন্ত উঠে এসেছেন। তমাল-বউও উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, মাদার বললেন, টুনিমণিকে একটিবার আনো না।

তমাল বলল, ভিড়ের মধ্যে নতুনবউ—

একগলা ঘোমটা থাকবে, লজ্জার ঘাটতি তোমার বউ হতে দেবে না দেখো। ছেলেমানুষ কত আহ্লাদ করবে।

মুখের কথা মুখে থাকতেই যেন মন্ত্রবলে টুনির উদয়। এবং যা বলেছেন — ঊষাকাল হলেও ঘোমটার কিছুমাত্র কমতি নেই। গায়ের গয়না কেবল খুলে রেখেছে। শব্দ নেই, চুপিসারে চলাচল বিড়ালের মতন। শ্বশুরের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, রুইমাছ একটা ছাইগাদার মধ্যে। ওদের কিছু বলবেন না বাবা, এমন মাছ দেখে কার না লোভ হয়? ওদের নেমন্তন্ন হয় নি, কি করবে?

রাঙাঠাকরুন নাতবউকে জড়িয়ে ধরলেন: গোয়ালের কানাচে ছাইগাদা—কি করে দেখলে তুমি দিদি? গোয়ালের গরু হয়ে লুকিয়ে ছিলে বুঝি?

নন্দু ফস করে টিপ্পনী কাটল: উঁহু নুলেবাছুর হয়ে।

সুরেনকে ডেকে মাদার বললেন, ছাইগাদার ভিতরে নাকি মাছ। খুঁজে আনো তো দেখি।

উনুনের ছাই একটা জায়গায় গাদা দিয়ে রাখে। হতে হতে প্রায় এক হিমালয়। সুরেন খুঁজে পেতে এসে বলল নেই। তাই তো বলি, আমার নজর এড়িয়ে মাছ সরাবে!

মাদার টুনিকে আদরের সুরে বললেন, দেখিয়ে এসো তো মা। সুরেন আমার ভাইয়ের মতো, ওর কাছে লজ্জা নেই।

রাঙাঠাকরুন আরও জুড়ে দিলেন: ঘোমটা রয়েছে তো। ঘোমটার নিচে খেমটা নাচলেও লজ্জা ষোলআনা বজায় থাকে।

টুনি গিয়ে আঙুল দেখাল। যেন তারই সঙ্গে পরামর্শ করে জেলেরা জায়গা বেছেছে। উপরের সামান্য ছাই সরিয়ে সুরেন মাছ তুলে আনল। মাদার সর্দার-জেলের নামে হাঁক পাড়লেন: এককড়ি।

কড়ামানুষ মাদার, চোর-ছ্যাঁচোড়ে নিদারুণ ঘৃণা। মাছ পাচারের দরুন কী শাস্তি দেবেন না-জানি! বমালসুদ্ধ ধরা পড়ে এককড়ি তো কাঁপছে। অবাক কাণ্ড! মাদার মোলায়েম সুরে বললেন, তোমাদেরও নেমন্তন্ন পাড়ুইমশায়রা। নানা ঝঞ্ঝাটে রাত্তিরবেলা বলার ফুরসৎ হয় নি। কিন্তু আমার নতুন-মায়ের হাতের চাট্টি অন্ন মুখে দিতে হবে। না খেলে ছাড়বই না মোটে।

তারপর মা-ছেলের মধ্যে কথা। মাদার বলেন. মেয়ে এক ফোঁটা, কিন্তু নজর কত দরাজ ভেবে দেখ মা। মাছ কেন সরায়. কেউ আমরা কোনদিন তালিয়ে দেখতে যাইনে।

রাঙাঠাকরুন গদগদ হয়ে বলেন, উঠন্তি মুলো পত্তনে চেনা যায়। দিদি আমার অন্নপূর্ণা। ওর সংসারে গরিব-দুঃখী সকলের জন্য অন্ন থাকবে।

নিমন্ত্রণ-চিঠিতে থাকে বটে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া, কিন্তু সামাজিক পংক্তিভোজন কোন বাড়িতে মধ্যাহ্নে হয় না, কেউ প্রত্যাশাও করে না হতে হতে সন্ধ্যা, কোথাও বা

রাত্রি—রাত দুপুরেও হয়ে যায়। কিন্তু মাদার ঘোষের বাড়ি তা চলবে না। এত মানুষ একবারে একসঙ্গে হতে পারে না—তিন ক্ষেপ অন্তত পক্ষে। মাদার অতশত বুঝতে চান না—সাতটা না হোক আটটার ভিতর ভোজের ব্যাপার সম্পূর্ণ সমাধা করতে হবে। তারপরে ফুলশয্যা। ছোট্ট কনে ছোট্ট বর—বেশি রাত জাগানো চলবে না, শরীর খারাপ করবে। মাদারের ছুটোছুটি ও হাঁকডাকে পয়লা ক্ষেপ দুপুর গড়ানোর আগেই বসে গেল। গেড়োর পদগুলো পাতায় পাতায় পড়ে গেছে, কিন্তু মুখে তুলছে না কেউ, হাত উঁচু করে বসে আছে। বউভাতের ভোজ—নতুন বউ সারির মধ্যে এসে এ-পাতায় ও-পাতায় দু-এক হাতা করে ভাত দেবে, তবেই ভোজনের আরম্ভ।

টুনিবউ ভোজের সভায় নামছে, তার আগে ছুঁড়িগুলো মনের সাধে সাজিয়ে দিল। রাঙা শাড়ি পরনে, সিঁদুরের টানা সিঁথি, কপালে আধুলির মাপের সিঁদুরফোঁটা, পা দুটিতে টুকটুকে তরল আলতা, নাকে নথ—নথের টানা কানের পাশে চুলের ভিতর ঢুকে গেছে। পায়ের জলতরঙ্গ মলে ঝুমুর-ঝুমুর ঝম-ঝম মিঠা আওয়াজ। নতুন বউয়ের সঙ্গে আছে ফুন্টি আর হরিদাসীর মা—ডেগচির ঘি-ভাত তারা পিতলের বালতিতে ঢেলে তুলে টুনি-বউয়ের হাতের কাছে এনে ধরছে। সবগুলো পাতায় দিয়ে পারবে কেন, সে কত খাটনি, বিশেষত বউ যেখানে এত ছোট। সারির মধ্যে দুটো চারটে পাতায় পড়লেই নিয়ম-রক্ষা হয়ে গেল—তারপর ভিন্ন সারিতে চলে যাও।

কিন্তু শুনছে তাই টুনি! দেওয়া-থোওয়ায় বিষম স্ফূর্তি: মানা মানে না, ধরতে গেলে পিছলে যায়। সারবন্দী পাতার সামনে দিয়ে যেন ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে হাতা উপুড় করতে করতে। দুজনে এরা হিমসিম হচ্ছে এক ফোঁটা ঐ বউ সামাল দিতে। কিছু নিন্দে মন্দও না হচ্ছে এমন নয়: কী দুরন্ত বউ রে বাবা, বউয়ের হবে গুটিগুটি চলন—

সুরেন মুহুরির কানে যেতে ঝটিতি সে জবাব দিয়ে দেয়: ব্যাঙ-বউ নয়, পাখি-বউ খুঁজে পেতে আমরা এনেছি।

এরই মধ্যে ফুলশয্যার তত্ত্ব এসে পড়ল বেঁতিখোলা থেকে। এমন কিছু নয়—সাধারণ দরগরিব গৃহস্থবাড়ি থেকে যেরকম এসে থাকে। কাপড়চোপড় এসেছে এবং নতুন সতরঞ্চি ও শঙ্খ। নিয়মদস্তুর মিষ্টি মিঠাই ছাড়াও আছে ক্ষীর ও মুড়কি। আর আছে সাতটা মালা—দুটো গোড়ের মালা বরকনের জন্য, বাকি পাঁচটা পাঁচ এয়োস্ত্রীর, যারা ফুলশয্যার রীতকর্ম করবে। সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ খানিকটা রাত্রি। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে। বিকালের কোকিল এখনো ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। ফুলশয্যার আর দেরি করা যায় না। মুশকিল হয়েছে, খাওয়ানোর পাট সম্পূর্ণ সারা হয় নি এখনো, পাড়ার বউ-ঝিদের কতক কতক বাকি। বসিয়ে দাও ওদের—বাড়ির লোক এবং আত্মীয় কুটুম্ব যারা এসেছে তারাই মিলে এদিককার ব্যবস্থা করে ফেলুক। খাওয়া-দাওয়া সেরে পাড়ার ওরা পরে এসে জমবে।

নন্দু কাঁই কুঁই করছিল: আমায় এত আগে কেন, ওদিক তো এখনো উঠোনের উপর। টুনিবউ এখনো পরিবেশনে মত্ত, আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। কিন্তু বাঘের মতন পিতৃদেব রোয়াকে পাদচারণা করছেন—বীরত্ব অধিক দেখানো গেল না। নিষ্ঠুর সমবয়সিরা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল তাকে মেয়েদের হেপাজতে। রক্ষে নেই আর—খড়কেকাঠির ফোঁটা ফোঁটা চন্দন কপালে দিয়ে ফুলের মুকুট মাথায় চড়িয়ে

খুশি মতন তারা বর সাজাচ্ছে। আর নিরুপায় হাত পা ছেড়ে বসে আছে নন্দু।

কিন্তু আসলটিকে এখনো তো বাগে আনতে পারল না। এবারের খাওয়ানোতেও আছে সে, মাথায় যথারীতি একহাত ঘোমটা—নেচে নেচে পরিবেশন করছে। ঘোমটা সামান্য এদিক-ওদিক হলে সঙ্গে সঙ্গে টেনে ঠিক করে নেয়। 'বউ দেখব' 'বউয়ের মুখ খানা তুলে ধরো, কে আমাদের খাওয়াচ্ছে দেখে নিই—' খেতে খেতে মেয়েরা বলে। হরিদাসীর মা হাতের বালতি নামিয়ে ঘোমটা তুলে বউয়ের মুখ দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে টুনি অসাড়, চোখ দুটি বুজে গেছে, মুখ এদিকে ঘোরাচ্ছে ওদিকে ঘোরাচ্ছে —কলের পুতুলের মতন আপনাআপনি যেন ঘুরে যাচ্ছে। 'বেশ বউ' 'খাসা বউ' সকলের মন্তব্য। হরিদাসীর মা যে-ই না আবার বালতি হাতে তুলেছে—টুনি ঝাঁকি দিল মাথায়, ঘোমটা গলা অবধি নেমে এলো, আবার সেই দুরন্ত এবং লাজবন্দী বউটি।

না, লহমারও দেরি চলবে না—বউ ধরতে ছবি আর বেউলো লাইনের মধ্যে চলে এলো। হিড়হিড় করে চোরাকুঠুরিতে নিয়ে সাজগোজে বসিয়ে দেবে। যেতে কি চায় টুনি—হাত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছবি তখন ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ল : কাকামশায় পাঠিয়েছেন। যেও না বেশ। তাই বলি গে—

আগুনে অমনি যেন জল। কাকা মানে মাদার ঘোষ। ঘাড় নিচু করে নরম পায়ে টুনি-বউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না—

মাঝের কোঠায় হাঙরমুখো সেকেলে পালঙ্ক। এই-উঁচু গদি, গদির উপর চাদর। তন্বে যে সতরঞ্চি এসেছে, মেজে জুড়ে সেটা পড়ল। নন্দুকে ষোলয়ানা বর সাজিয়ে দিল : থাকো বসে চুপচাপ বউ যতক্ষণ না আসে। এক-পা নড়বে না—খবরদার! শাসানি দিয়ে মেয়ের দঙ্গল তারপর চোরাকুঠুরি ছুটল, বউ সাজানো হচ্ছে যেখানটা। স্বয়ং রাঙাঠাকরুনের সেখানে তদারকি, এদের কিছু করণীয় নেই। হাল আমলের কাপড়ে সাজসজ্জা যেমন হয় হোকগে, সোনায় রুপোয় গয়না কি পরিমাণ গায়ে পায়ে উঠল, সেই দিকে ঠাকরুণের দৃষ্টি। পা-দুখানার উপরেই ধরো তিনরকম—মল, ওজারিপঞ্চম এবং অঙ্গুষ্ঠে আংটি। ঠাকরুণ কোনটাই বাদ দিতে দেন নি। জঙ্গলের পশু সজারুর পর্যন্ত চলতে ফিরতে ঝমর ঝমর বাজে, আর নতুন বউয়ের চরণে বাজনাবাদ্যি হবে না—কী রকম কথা!

ডাইনে ছবি বাঁয়ে বেউলো সজ্জিত টুনিকে মাঝের কোঠায় নিয়ে চলল। ফুন্টি সতর্ক করে দেয় : গোটা বউয়ের যা ওজন, গয়নার ওজন তার চেয়ে বেশি। শক্ত করে ধরি দু-পাশ দিয়ে, গয়নার ভারে গড়িয়ে না পড়ে।

সতরঞ্চিতে মুখোমুখি বরবউ। প্রমীলা-রাজ্য—মেয়েরাই শুধু ফুলশয্যার বাসরে, পুরুষের ঢুকতে মানা। বড় গোড়ের-মালা দুটো দু-জনের গলায়। মালার বদলা-বদলি—টুনির মালা খুলে নন্দুর গলায় দিল, নন্দুরটা টুনির গলায়। ঝাঁকে ঝাঁকে উলু পড়ছে। মুখ ফুলিয়ে এয়োতিরা শাঁখে ফুঁ পাড়ছে। শানাইয়ে পোঁ ধরল রোয়াকের উপর। উঠোনে সামিয়ানার নিচে যারা খাচ্ছিল, কোনরকমে খাওয়া সেরে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। নইলে ফুলশয্যার কিছু দেখা হয় না। নতুন বউ সচকিত—ছবির গা টিপল, কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে কি বলল। ছবি অমনি বাইরে। অনতি পরেই রাঙা ঠাকরুণের গলা—কাদের যেন নালিশ মেনে বলছেন, কী গুণের মেয়ে, কত হুঁশজ্ঞান বোঝ তোমরা। একটা দিনেই সংসারের দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে।

ছবি ফিরে এসে বসল। হরিদাসীর মা শুধায়ঃ কি গুণ শুনিয়ে এলি রে ছবি? ঠাকরুন একেবারে গদগদ।

নন্দু ফোড়ন কেটে ওঠেঃ গুণ আবার আলাদা করে শোনাতে হয় নাকি? দিদার কাছে সবই ওর গুণ। চাঁদে কলঙ্ক আছে, তোমাদের নতুন বউয়ের নেই। ভাবছি কেবল বউদিদি, এইটুকু এক টুনিপাখি এত গুণের বোঝা বয়ে বেড়ায় কেমন করে?

ছবি বলে, হিংসে করলে কি হবে নন্দুভাই, কথা তো ঠিকই। ফুলশয্যার মধ্যেও কান দুটো খোলা। নেমন্তন্নেরা পান চাচ্ছিল না—বউয়ের কাছে শুনে নিয়ে তক্তাপোশের নিচে থেকে পানের ডাবর বের করে দিলাম।

হরিদাসীর মা জুড়ে দিল: শুনলে তো ঠাকুরপো? কপালগুণে এমন বউ পেয়েছ, আদর করে এবারে ক্ষীর-মুড়কি খাওয়াও—

নিয়ম এই। মালা বদলাবদলি, তার পরে ক্ষীরমুড়কি। রেকাবিতে কিছু মুড়কি নিয়ে তার উপরে ক্ষীরের বাটি উপুড় করল। কনে তুলে দিল বরের গালে। ঘোমটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বরও পরম যত্নে ধীরে ধীরে বউয়ের গালে দিচ্ছে। আবার বউ দিল, তারপরে বর আবার। এমনিই চলচে—তালভঙ্গ হঠাৎ। উ-হু-হু করে উঠে নন্দু ঝটকা মেরে ঘোমটার ভিতর থেকে হাত বের করে নিল। হাত নাড়া দিচ্ছে এদিক ওদিক—

কি হল নন্দু?—

নন্দু বলে, বউ কামড়ে দিয়েছে!

কামড়েছে কী বলিস—বউ কি বেড়াল?

হাত টেনে ধরে দেখল ক'জনে। দুটো আঙুলে দাঁতের দাগ—কামড়ে দিয়েছে ঠিকই তো। হরিদাসীর মা বলে, রাঙা ঠাকরুনকে ডাকো। হাল আমলের ধেড়ে বউরা বাসরে শুয়ে নাকি ব্যাঙ্কের হিসাব নেয়। আর ওঁর পছন্দের কচি বউ বরকে কামড়ে খেতে চায়, সেটাও দেখে যান।

ছবি বলে, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। এমনি এমনি করে নি—

তারপর কেমন একটা টান পড়েছে ছটফটে এই ছোট্ট বউটার উপর। একটানে ঘোমটা নামিয়ে মুখ আলগা করে ফেলল। করেছে কী দেখ—জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতন সোনামুখের উপর পাকা গোঁফের তাড়া। ক্ষীর দিয়ে বানানো, তাই সাদা রং। নন্দর হাত ক্ষীর-মুড়কি সহ বারম্বার ঘোমটার ভিতর ঢুকেছে—একটি কণিকাও বোধ হয় বউয়ের মুখে যায় নি, মুখের উপরের চিত্রকর্মে লেগে গেছে। টুনির কী মুশকিল—ঘোমটার নিচে বাইরের কেউ দেখছে না, আর লজ্জার দায়ে নিজেও বলতে পারছে না কিছু মুখে। একবার দুটো আঙুল কি গতিকে ঠোঁটের নাগালের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় দাঁতের কামড়ে টুনি সামান্য প্রতিহিংসা নিয়ে নিয়েছে।

বেউলো মেয়েটা ফুঁসছে। বউ সাজানোয় অনেক কসরৎ করেছে, সবই নন্দু বরবাদ করে দিল। ক্ষেপে গিয়ে বলে, কামড়ালী তো কেটে নুলো করে দিলি নে কেন বজ্জাতির ঐ পুরো হাতটা। নুলো বরের গুঁফো বউ—মানাতো ভাল।

পিছন বারান্দার এদিকটা বেশ নিরিবিলি। কলাবনের ছায়ান্ধকারে কে আবার একটা টুল পেতে রেখেছে—রাত্রিবেলা বউয়ের ভোগান্তি জানত নাকি সেই লোক? আছে তো বসে পড়ো এই টুলের উপর।

সাবান-তোয়ালে ও টুনিকে নিয়ে বেউলো আর ছবি এসেছে। বেউলো বলল,

বরের সঙ্গে একটা কথাও আজ বলিস নে। যত খোশামোদ করুক, কিছুতে নয়।

টুনি সায় দিল: হুঁ—

ছবির মুখে উল্টো কথা: না রে টুনিবউ, রাগ করতে নেই। এসব তো খেলা।

টুনি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ে: হ্যাঁ—

সমবয়সী না হলেও পাড়ার এই মেয়ে দুটোও টুনি সখীস্থানীয় হয়ে পড়ছে। ঘোমটা ওদের সামনে কপাল অবধি, তার নিচে নামে না। এবং মুখ থেকেও আবশ্যক মতো হুঁ-হাঁ বেরিয়ে যায়।

নিজেই ছবি ফিক ফিক করে হাসে। বলছে, ঘোমটা তুলে বর যদি দেখতে পায় টুনির মুখে সত্যি সত্যি পাকা গোঁফ—আঁকা গোঁফ নয়, বিধাতার দেওয়া পাকাপোক্ত গোঁফ এক জোড়া—টানলে ছেঁড়ে না, জলে ধুয়ে ফেলা যায় না—

টুনির চাপা হাসি। ছবির বড় ইচ্ছে করে গাল টিপে টিপে দিতে—গাল টিপলে হাসি যদি উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে আসে। আর বেউলো ভাবছিল বোধহয়, ফুলশয্যায় শুয়ে আনকোরা নতুন বউয়ের পক্ষে পুরোপুরি বোবা হয়ে থাকা উচিত হবে কিনা। কিছু নরম হয়ে সে রায় দিল: মিষ্টিকথায় গলে যাবি নে, তবে নিতান্ত যদি হাত-পা ধরাধরি করে—

শিউরে টুনি-বউ জিভ কাটল। ছবি বলল, ও তুই কি বললি রে বেউলো? পতি পা ধরবে, পাপ হবে না?

নিঃশঙ্কে বেউলো বলে, পতিরও পা আছে। শুয়ে থাকা অবস্থায় প্রণাম চলে না—সকালে উঠেই ধাপ্পা দিবি: মেজের উপর সাপের খোলস, ওরে বাবা! কই, কোথায়?—ধড়মড়িয়ে উঠে যে-ই না নন্দু নেমে দাঁড়াবে, ঠকাস করে তার জোড়াপায়ে মাথা ঠুকে দে দৌড়। ফ্যালফ্যাল করে বর তাকিয়ে পড়বে। সব পাপ ধুয়ে গেছে—খাও কলা!

এত সুন্দর সাজানোটা মাটি করে দিয়ে নন্দুরও মনে মনে অনুতাপ। ভাল ভাল কিছু নবোল কথা মনে মনে সে মক্স করছে। রীতকর্ম চুকিয়ে বুকিয়ে ঘর খালি করে এরা সব চলে যাবে—ঝাঁকে ঝাঁকে তখন কথাগুলো ছাড়বে। অত সব কবিত্বের সামনে পুঁচকে মেয়ে কতক্ষণ মান করে থাকতে পারে, দেখা যাক।

আরও সুবিধা হল—ঈশ্বর, তুমি পরম দয়াময়—দরজার উপরে স্বয়ং মাদারের আবির্ভাব। যুক্ত-কর, কণ্ঠ-গদগদ—যা মাদারের কখনো হয় না। বলছেন, দশটা বাজে মা-সকল, আর আধঘন্টার মধ্যে সমস্ত সেরে নিন। ভোজের পরিবেশনে পাগলী বেটি কী ছুটোছুটি করেছে, দেখেছেন সকলে। এখন আর নড়বার তাকত নেই। বাপ-মা ছেড়ে নতুন জায়গায় এসে—এখন যদি একটা অসুখ বিসুখ হয়, আমি শুধু সেই ভয় করছি।

এবং 'একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর'। পিছন পিছন রাঙাঠাকরুন এসে ঢুকে পড়লেন। বলেন, আসল কাজকর্ম হয়ে গেছে—সোনামানিকরা বাড়িঘরে যা এবারে। আত্মীয়-কুটুম্ব বলেও ছাড়ি নি, সবাইকে ঘরে ঘরে শুইয়ে দিয়েছি। বাতের ব্যথা সন্ধ্যে থেকে বড্ড চেপে ধরেছে, তারই মধ্যে উঠে এসেছি, দেখ। আমাদের ছটাকি বউ, পোয়ার মাপের বর—এত বড় ভুত-খাটনির পর এইবারে শান্তিতে একটু ঘুমোক।

কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, রাঙাগিন্নির এই সমস্ত বাক্যের পরেও ফষ্টিনষ্টি চালাবে। হুড়ুম করে পিছনে সদর-দরজায় হুড়কো পড়ল—বাড়ি ফিরবার পথে ঝি-বউদের কানে আসে।

দিন ভোর হৈ-চৈ চলেছে, এইবারে চুপচাপ। জোরালো হ্যাজাক-আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে—কুলুঙ্গিতে মিটমিটে পিদ্দিমের আলো। ফুলশয্যার এই আলো রাতের মধ্যে নেভানো যাবে না। ঝাপসা রকম নজর চলছে, তার মধ্যে নন্দু চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। টুনি গুটিসুটি হয়ে মেজের সতরঞ্চিতে শুয়ে পড়েছে—হাত দেড়েক জায়গা নিয়েছে বড় জোর। অত বড় পালঙ্ক তেপান্তরের মাঠের মতো হা-হা করছে। ক্রোধ গুরুতর রকম সন্দেহ কি, বিশেষত বেউলো ফুল্টিরা যেমনভাবে তাতিয়ে গেছে। সর্বাগ্রে নন্দু পিদ্দিমের মুখ কুলুঙ্গির ভিতর দিকে ঘুরিয়ে দিল—সামান্য যে আলো আসছিল তা-ও ভিতরে আটক হয়ে গেল। বাইরে যা রয়েছে, সে বস্তু আলো নয়—একটুকু রহস্য। মানভঞ্জনের জন্য যে সব প্রণালী ও জবান শ্রীমান নন্দু ভেবে রেখেছে, এই রকম রহস্যান্ধকারেই তা জমবে ভাল।

রণে নামবার আগে বীরগণ আগে রণক্ষেত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। অতএব নন্দু কুঠুরির বাইরেটাও ঘুরে ঘুরে দেখছে, রাঙাঠাকরুনের মানা সত্ত্বেও দুঃসাহসিকা কেউ যদি লুকিয়ে চুরিয়ে থাকে। নাঃ, নেই। বর-বউয়ের প্রেমালাপ নিয়ে মাথাব্যথা নেই আজকাল মেয়েদের—ভোঁস-ভোঁস করে তারা ঘুমিয়ে বাহার দেয়।

নন্দু পরমানন্দে দুয়োরে খিল দিচ্ছে, পিছনদিকে কী আশ্চর্য! টিপিটিপি নতুন বউ এসে কাদার মতন গায়ে লেপটে গেল। মানভঞ্জনের এত কসরৎ ভেবে রেখেছে—কোন-কিছুই কাজে এলো না। কী হাঁদারাম বউ রে, দুটো মিনিট মুখ ঘুরিয়ে থেকে বরের কাতরোক্তি শুনবে—সে সবুরও রইল না তার। ভেবেছিল, বউকে আড়কোলা করে তুলে পালঙ্কে ছুঁড়বে—উল্টে—বউই উঠে এসে ছোট্ট দুটো আঙুল নন্দুর ঠোঁটে চেপে ধরল। অর্থাৎ, মুখের একটি কথাও নয় এখন। এবং বাঁ হাত ঘুরিয়ে লম্বা করে পালঙ্কের দিকে আঙুল দেখাল। অর্থাৎ তুমি শুয়ে পড়ো ওখানে। মহারাণীর নিঃশব্দ আদেশ—কলেজি বর হয়েও সুবোধ বালকের মতন নন্দু বিনাবাক্যে শয্যায় গিয়ে পড়ল, পিটপিট করে দেখছে বউয়ের কান্ডবান্ড। দরজায় খিল এঁটেছিল নন্দু, সেই খিল টুনি আবার খুলে রাখল। বিছানায় এলো না। বিছানার ধারের জানালা, বন্ধই থাকে সেটা বারোমাস—জলের ঘটিটা হাতে নিয়ে কবাটের গায়ে কান রেখে নিঃসাড়ে সে বসে রইল জানালার উপর। নন্দু মহা বিরক্ত—ফুলশয্যার রাত বসে বসেই ঐ রকম কাটিয়ে দেবে নাকি? বসেই আছে, আর হাত নেড়ে মাঝে মাঝে চুপচাপ থাকার হুকুম ঝাড়ছে তার উপর। ইঁদুরের গর্তের মুখে বিড়াল যেন ওৎ পেতে রয়েছে, টুনির সেইরকম গতিক।

হঠাৎ একটানে জানলার কবাট খুলে ফেলে পুরো ঘটির জল হড় হড় করে বাইরে ঢেলে দিল। আর ঘটি ফেলে দু-হাত আন্দোলিত করছে নন্দুর দিকে। অর্থাৎ চোর ধরোগে বাইরে ছুটে গিয়ে! এতখানি ভেবেই কি দরজার খিল খুলে রেখেছে? টুনি মেয়েটা কক্ষনো বউ হয়ে থাকবে না, উপন্যাসের গোয়েন্দা হবে ঠিক। দুড়দাড় করে নন্দু ঘারাণ্ডা ঘুরে চোর ধরতে ছুটল। টুনিও পিছনে—দেখেশুনে ধীরভাবে পা ফেলছে। চোর ধরতে যাক আর যা-ই করুক, বাড়ির বউ তো বটে!—পরম লজ্জাবতী বউ।

বুড়োমানুষ চোর, তার পা-দুখানা বাতে জখম—ধরা কিছুমাত্র কঠিন হল না।

জড়িয়ে ধরে নন্দ, বলে উঠল, ও-দিদা তুমি? পাড়ার সকলকে তাড়িয়ে তুড়িয়ে বাড়ির সকলকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কলাঝাড়ের জঙ্গলে সাপখোপের মধ্যে একলা এসে বসেছ—

রাঙাঠাকরুন ক্রমাগত থামানোর চেষ্টা করছেন ঃ চুপ কর্ নন্দ, ক্ষমা দে। লোকে শুনলে কি বলবে, দিনমানে কাল পাড়ার ছুঁড়িগুলো 'কেয়োখোঁচা' (কাকের ঠোঁটে খোঁচা খাওয়ার অবস্থা) করে মারবে আমায়—

বেতোরোগির রাত দুপুরে ঠাণ্ডা জলে স্নান—নন্দ একছুটে কাপড় নিয়ে এলো রাঙাঠাকরুনের ঘর থেকে। ভিজে কাপড় বদলে গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে পরম যত্নে এদের এই ফুলশয্যার পালঙ্কে নিয়ে বসাল। দিদার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসার সম্পর্ক—নন্দ বলল, খাট পালঙ্কে ফুলের বিছানায় তোমার নাতবউকে তো শোয়ানো যায় নি। তুমি শুয়ে পড়ো দিদা। আমিও শুই।

চমক খেয়ে রাঙাঠাকরুন বললেন, কেন, শোয় নি কেন রে?

সত্যি না মিথ্যে, জিজ্ঞাসা করো। জলের ঘটি হাতে সারাক্ষণ ঐ জানলার উপরে।

টুনি টিপেটিপে হাসছে। রাঙাঠাকরুন তাকে শুধালেন ঃ খাটে না শুয়ে জানলায় ছিলি কেন রে তুই?

নন্দই বলে দিল, রোগামানুষকে রাত দুপুরে নাওয়ানোর জন্য। আবার কেন?

কৌতুককণ্ঠে ঠাকরুন বলেন, কেমন করে জানলি আমি ঠিক ঐখানটায় আসব?

ভিতরের কথা টুনি আর চেপে থাকতে পারে না, হাসিতে ভেঙে পড়ল। হাসে আর বলে, মুখের গোঁফ ধোয়াতে ঐখানটায় নিয়ে গিয়েছিল—দেখলাম ঘাসবনের মধ্যে টুল পাতা। বোঝা গেল, কেউ না কেউ এসে ঐ টুলের উপর বসে পাতান দেবে। সে মানুষ আপনি হবেন, স্বপ্নেও ভাবি নি দিদা।

রাঙাঠাকরুন অবাক হয়ে বলেন, উ-রে মেয়ে, হাড়ে হাড়ে তোমার বজ্জাতি বুদ্ধি—

আর যাবে কোথায়। নন্দর উল্লম্ফন ও হাততালি।

মুখ তুলে রাঙাঠাকরুন সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। নন্দ বলেই যাচ্ছে, চাঁদে কলঙ্ক আছে, তোমার টুনিতেও তেমনি কলঙ্ক আছে—মেনে নিলে তা হলে দিদা?

কি বলেছি আমি?

বজ্জাত বলে গালি পাড়লে, তার উপরে আবার কি বলবে?

গালে হাত দিয়ে ঠাকরুন বলেন, ও মা, কখন?

বললে না, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি বুদ্ধি। মানেটা কি দাঁড়ায়?

জোর দিয়ে রাঙাগিন্নি বলেন, মানে দাঁড়ায়—নাতবউয়ের বুদ্ধি আছে। তোর মতন হাঁদারাম নয়।

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে নন্দ বলে, তুমি তো সব কথায় আমায় টেনে আনো। এক-চোখো দিদা। এই রাত্রে পুরো ঘটি তোমার মাথায় ঢালল—আমি যদি এক ঝিনুক জল গায়ে ছিটিয়ে দিতাম, কী গালাগালিটা দিতে আমায় বলো দিকি।

রাঙাগিন্নি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, বউকেও দেবো। দেখিস কাল।

নন্দ বলে, তোমার যে হল—'ছেলে নিল শিয়ালে, কাজকর্ম সেরে নিই,—কাঁদব বসে বিকালে'। কাণ্ড এখন ঘটাল—উনি তার শোধ নেবেন দিনমানে কাল পাঁজির

দিনক্ষণ দেখে। রাগ ততক্ষণে জুড়িয়ে যাবে না?

ঠাকরুনের সাফ জবাবঃ সবাই ঘুমুচ্ছে, একটা কুরুক্ষেত্তোর করে এখন আমি জাগিয়ে তুলতে পারব না। তা তুই একচোখো বলিস আর যা-ই বলিস। সকলে ভাববে, দেখ, আমাদের সব সরিয়ে দিয়ে একলাই রাঙাগিন্নি নাতি-নাতবউয়ের সঙ্গে বাসর জাগছে।

কথা না বাড়িয়ে ঠাকরুন নেংচে নেংচে আপন ঘরে ঢুকে গেলেন। পিছন থেকে নন্দু অগত্যা বলে দেয়, বেশ, কালই হবে। কথা পাকা হয়ে রইল। আর সময় যখন পেয়ে যাচ্ছ, ছড়ায়-গাঁথা মোক্ষম একখানা চাই তোমার কাছ থেকে—সেকেলে বউ-কাটকি গিন্নিরা যা ছাড়তেন।

গালি পড়বে এসে টুনির উপর—কিন্তু আবদার তারও দেখা যাচ্ছে, নন্দুর চেয়ে বেশি বই কম নয়। বলে, হ্যাঁ দিদামণি, তাই চাই আমি। ছড়ার গালাগালি কেউ আমায় কখনো দেয় নি।

ফুলশয্যার পরে সোনাখড়ির কাজকর্ম মোটামুটি সারা। সকাল হতেই শহরে ফেরার তোড়জোড়। মাদার ঘোষের মতন মহাব্যস্ত উকিল আজ আট আটটা দিন সদরে নেই—মক্কেলরা হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। তা বলে আজ নয়—আজকের দিনটা বিশ্রাম। রওনা কাল সকালে, অতি-অবশ্য—পালকি পৌঁছে দিয়ে আসবে নাগরগোপের পাকারাস্তা অবধি, সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে শহরে, শহরের বাসাবাড়িতে। সেখানেও কিছু লোকের নিমন্ত্রণ আছে সামনের রবিবারের পরের রবিবারে। বউ দেখবেন তাঁরা, আহারাদি করবেন—স্ত্রী-পুরুষে তা-ও দেড়-শ'র মতো হবেন।

সুরেনকে নিয়ে মাদার ঘোষ হিসাবপত্রে পড়েছেন। যার যা পাওনা, পাইপয়সা অবধি মিটিয়ে যাবেন। ভিতর-বাড়িতে তমালও ঘোরতর ব্যস্ত—এক সংসার জিনিসপত্র গোছগাছ করে বয়ে নিতে হবে।

ব্যস্ততা উপরওয়ালাদের যত বেশিই হোক, ভবী কিন্তু কাজ ভোলে না। একটি ভবী নয়—ভবীযুগল। তাগিদের পর তাগিদ, ঘুরতে ফিরতে এসে তাগিদ করে। টুনিবউটারই বেশি দাপট: সাদামাটা হলে হবে নাদি দা, ছড়াবন্ধ চাই—। সেকালের সেই সব ছাইভস্ম মনে কে গেঁথে রেখেছে, ঠাকরুন পাশ কাটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। আহ্নিক সেরে জলটল খেয়ে, দরদালানের তক্তাপোশে একটু বসেছেন, টুনিও এসে মুখোমুখি জেঁকে বসল: আর দেরি নয়—যা বলবেন, বলুন এইবারে দিদা। আমরা বাজি ধরেছি। ও বলছে, গালি না ঘোড়ার-ডিম। গালি নাকি আপনার মুখেই আসবে না—এটা ওটা বলে এড়িয়ে যাবেন। আমি বলেছি, আদায় করে ছাড়ব। দেখুন, ঐ দেখুন, বুড়ো আঙুল নাচাচ্ছে দুয়োরে দাঁড়িয়ে—

নন্দু সত্যিই দরজায় ছিল, কলা দেখাচ্ছিল। রাঙাঠাকরুন তাকিয়ে পড়তে সুড়ুত করে পালাল। টুনি কাতর হয়ে বলে, ও দিদা গো, আপনি চেপে থাকলে ও বাজি জিতবে—আমি হেরে মরব।

রাঙাগিন্নির খাপছাড়া এক প্রশ্নঃ নন্দুর বড় স্ফূর্তি দেখছি। হারলে তাকে কি দিতে হবে রে?

যান, বলব না। মুখ রাঙা হল টুনিমণির। একটা নাচন দিয়ে অধীর কণ্ঠে সে বলে, বেলা তো দুপুর হতে যায়। আপনি কথা দিয়েছেন দিদা—

হচ্ছে রে, হচ্ছে। আহ্নিকে বসে আজ ঠাকুরকে ভাবতে পারি নি, শুধু

গালিগালাজ ভেবেছি। চোস্ত জিনিস হুটজলদি মাথায় আসে না। একটা পান সেজে আন দিকি লক্ষ্মীদিদি আমার—

টুনি ডিবেয় করে পান সেজে এনে দিল।

রাঙাগিন্নি বলেন, অ আমার কপাল! পান আমি চিবোতে পারি? হামান-দিস্তেয় ভাল করে সেঁচে নিয়ে আয়।

ঠনঠন ঠকাস-ঠকাস আওয়াজে টুনিবউ অতএব পান সেঁচতে বসল এক-ছড়া উৎকৃষ্ট গালি খাওয়ার লোভে। সেঁচা পানের সবটুকু ঠাকরুন নড়বড়ে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজলেন। টুনি চাতকের মতন মুখের উপর হাঁ করে আছে।

কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ঠাকরুণ হতাশ হয়ে ঘাড় নেড়ে দিলেন: নাঃ, হবে না। জিভের ডগায় এসেও তোর ঐ গিলে খাওয়ার ভঙ্গি দেখে পালিয়ে যাচ্ছে।

বালিশের উপর গড়িয়ে পড়ে ডাকলেন: শিয়রের এইখানটা এসে বোস। বসে বসে পাকা চুল তুলে দে। আরাম পেয়ে চট করে যদি মাথা থেকে বেরোয়।

মাথা নয়, শনের ক্ষেত—সবই পাকা চুল। কাঁচা চুল এক-আধটা দৈবেসৈবে যদি থাকে। এ মাথায় পাকা চুলের বদলে কাঁচা চুল তুলতে বললে তবু একটা মানে হত। আদেশ শুনে, অন্য সময় হলে, টুনি হেসে গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এখন সঙ্গিন অবস্থা—বাজি জিতে পতি দেবতার দর্পচূর্ণ করতেই হবে। বউ অতএব কাজে লাগল। এবং আরাম পেয়ে ঠাকরুনও চোখ বুজে গালি-চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

মাদার ও সুরেন হিসাব ঠিক করছেন, কখানা ফর্দের প্রয়োজন পড়ে গেল। সেগুলো পকেটেই রয়ে গেছে, মাদারের খেয়াল হল। ফর্দ আনতে শোবার ঘরে যাচ্ছেন, দরদালানে পা দিয়েই অবাক। ঘুমন্ত মা—নানা ধ্বনিও মাঝে মধ্যে। নতুন বউয়ের দৃকপাত নেই, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সে পাকা চুল তুলে কাঁড়ি করছে। মাদার হেসে উঠলেন: এ কাজে কে লাগিয়েছে রে? দশ বছর এক নাগাড় তুলেও তো সাফাই করতে পারবে না মা।

আর, রাঙাগিন্নী মুকিয়ে ছিলেন যেন। চোখ খুলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রস্তাব: আমার বদলে বরঞ্চ তোমার শ্বশুরের পাকাচুল ক'টা তুলে দে। কানের কাছে বড্ড বিশ্রী দেখায়। তাড়াতাড়ি সারা হয়ে যাবে, তার মধ্যে আমার মাথায় কিছু একটা আসবেই।

টুনির বড় আহ্লাদ। অপার সমুদ্র থেকে দয়াময়ী দিদা গোষ্পদে তুলে আনলেন। শ্বশুরকে এনে বসাবে, হাত ধরতে গেছে—বিদ্রোহী। মাদার টেকো মাথায় দুদিককার অবশিষ্ট সামান্য চুল দু-হাতে চেপে ধরলেন। জেদ ধরে বলেন, পাকা হোক কাঁচা হোক মাথার একটি চুলও আমি বেহাত হতে দিচ্ছি নে।

কেন রে?—রাঙা ঠাকরুন শুধালেন।

টাক বেড়ে যাবে।

টুনি কলকল করে ওঠে: টাক বাড়লে টাকাও বাড়ে। এ তো জানা কথা।

মানুষে যে হাসবে—

টুনি এক কথায় রায় দিল: সে মানুষ পাগল।

মাদার বলে যাচ্ছেন, 'ওদের মতন দেখাচ্ছে'—বলবে দুষ্টু দুষ্টু মেয়েরা সব।

টুনি বলে, ওদের মতন নিটোল চকচকে—খুবই তো ভালো।

মুখ বাঁকিয়ে আবার বলল, আমার তো বাবা চুলো মাথাগুলোই বিশ্রী লাগে—ঘটি ঘটি কালি ঢেলে দিয়েছে যেন কারা। বিধাতা পুরুষ এক আধখানা মাথা নিয়ে সোনার পাতে মুড়ে দেন। তবেই আপনার মতন টাক হয়। তাই না?

অগত্যা মাদারকে বসতে হলো তক্তাপোশের প্রান্তে। এবং সোনার পাতে মোড়া মহামূল্য মাথাখানা সঁপে দিতে হল টুনিমণির হাতে। যা প্রাণ চায় করুকগে পাগলী মেয়ে—যতক্ষণ ধরে খুশি। সুরেনকে হাঁক পেড়ে বললেন, দেখে যাও আমার অবস্থা। মাথা দখল করে নিয়েছে। যে ক'টা চুল আছে, তুলে শেষ করে তেপান্তর টাক না করে ছাড়বে না কিছুতে। মাথা ফেলে কি করে যাবো মুহুরি-মশায়, হিসাব তুমি একাই করে যাও। বিকেলবেলা ফর্দ মেলানো যাবে।

এত চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও ডোবালেন শেষ পর্যন্ত রাঙাগিন্নিই। ছন্দোবন্ধ গালা-গালি দূরস্থান, যেমন তেমন ঘরব্যাভারি একটা-কিছুও ভেবেচিন্তে তিনি পেলেন না। বাজি হেরে টুনি মরমে মরে আছে। বিজয়ী নন্দু তাকে আর তৃণজ্ঞান করে না। টুনি তা বলে সঙ্কল্প ছাড়ে নি। দিদামণির অক্ষমতার দরুণ পতি দেবতা জিতে আছে, শোধ এর তুলবেই।

সদরের বাসাবাড়িতে এসে গেছে সব। ক'দিন পরেই পরাশরের চিঠি নিয়ে বেতিখোলা থেকে লোক এসে হাজির। জামাই-মেয়েকে জোড়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব—আদেশ পেলেই ব্যবস্থা করে ফেলবেন। চিঠি যথানিয়ম রাঙাগিন্নির নামে, জবাবটা মাদার দিয়ে দিলেন—প্রস্তাব আপাতত নাকচ। রাঙা ঠাকরুনের বাত বেড়েছে, অধিকাংশ সময় শয্যাশায়ী। তখন বউ সেবাযত্ন করে। সেবা আর কী এমন—দিদামণির কাছে বসে আগডুম-বাগডুম বকে, অসুখের কষ্ট সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে রাঙাগিন্নি হাসেন প্রাণ খুলে হা-হা করে। জোড়ে পাঠানোর পক্ষে এটা অবশ্য বাধাই নয়—রোগীর সেবার এই নতুন পদ্ধতি শুনিয়ে দিলাম, বেহাই মশাই বেয়ান-ঠাকরুণ শিখে রাখতে পারেন। বিবাহ অন্তে সোনাখড়িতে যা করণীয় ছিল, হয়ে গেছে। কিন্তু শহরে ভাতভিত্তি আমাদের, বহুজনের সঙ্গে প্রীতি-প্রণয়। এখানেও কিছু করতে হবে। এইটুকু সমাধা হয়ে গেলে, তারপরে আর তিলার্ধ দেরি হবে না, আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে শ্রীমতী টুনিমাতা ও শ্রীমান নন্দু বাবাজিকে আপনা-দের সকাশে হাজির করে দেবো।

চিঠি দেওয়া ও জবাব পাওয়া হয়ে গেল। তারপরে আর উচ্চবাচ্য নেই। হঠাৎ পরাশর দুম করে একদিন মাদারের সদরের বাসাবাড়িতে এসে উপস্থিত। কোর্ট-কাছারির ঝামেলা থাকে না বলে রবিবার বেছে এসেছেন। ও হরি, মাদার নাকি আজ বাজারে গিয়েছেন যা তিনি কখনো যান না। কী করেন পরাশর—রাঙাগিন্নীর ঘরে গরুড়-পক্ষীর মতো বসে বাতব্যাধি সম্পর্কে জ্ঞান নিতে লাগলেন। টুনি এসে দাঁড়িয়েছে—তা মেয়ের সঙ্গে কেমন আছিস, ভাল আছি, জাতীয় কথা বলারও ফুরসৎ নেই।

হেনকালে উচ্চহাসির ঝড় বইয়ে মাদার ঢুকলেন: নতুন বউকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এখানে কেন গো টুনিমনি? বাবাকে নিজের ঘরে নিয়ে প্রাণ খুলে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির নিন্দেমন্দ করোগে। মুখের উপর দুয়োর দিতে লজ্জা করে তো আমিই

বাইরে থেকে ছিটকিনি এঁটো দেবো। জায়গা হয়ে গেলে আমিই গিয়ে দরজায় ঘা দেবো, সবশুদ্ধ আজ পাশাপাশি বসা যাবে। আপনার বেয়ানকে অবশ্য রাজি করতে পারব কিনা জানি নে।

মেয়ের সঙ্গে পরাশর পায়ে পায়ে এগোচ্ছিলেন, মাদারের কথায় তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন : খাওয়া এখানে নয় বেহাই। ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি। পিসতুত ভায়ের বাসায় খাবো, তাদের বলে এসেছি।

বলেন কি ?—একটু বিরক্তও যেন হয়েছেন মাদার। বললেন, মেয়ের বাড়ী আসছেন—খাওয়ার ব্যবস্থা অন্যত্র করলেন কেন ? এত অজাত-কুজাত কিসে হলাম আমরা ?

পরাশর সহাস্যে বলেন, তাই হয়েছেন সত্যি সত্যি। একটা নাতি হোক, তখন আবার জাতে উঠবেন।

একটি কথাও আমলে না নিয়ে মাদার বলে যাচ্ছেন, ভাল দিনে এসে পড়েছেন বেহাইমশায়, টুনিমণির আজ বউভাত আধাবিলাতি মতে। সাবজজ সাহেবের সঙ্গে খুব দহরম মহরম আমার। তিনি ছুটিতে ছিলেন বলেই রিসেপসনে দেরি করিয়ে দিয়েছি। মেয়ে-জামাই-র দ্বিরাগমনেও তাই দেরি। শহরের অনেক ভাল ভাল লোকের পদধুলি পড়বে আমাদের গরিবখানায়। এবেলা যদিই বা ছেড়ে দিই সন্ধ্যা-বেলা কোনক্রমে ছাড়ান নেই বেহাইমশায়। মিষ্টি কথায় অনুনয় বিনয়ে না হলে ফৌজদারি আসামি বানিয়ে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে সাবজজ সাহেবের পাশাপাশি বসিয়ে দেবো—সদরে আমার ক্ষমতাটা বুঝবেন তখন।

পরাশর বললেন, ক্ষমতা নতুন করে কি বুঝব। সে তো সেই কবে বুঝে রেখেছি—মক্কেল হয়ে প্রথম যেদিন এই বাড়ি আপনার অফিস ঘরে এসে উঠেছিলাম। আপনার বেহাই পথের-কুকুর শুঁক শুঁক করে বেড়াবে, সত্যি সত্যি তাই চান আপনি ?

সবিস্ময়ে মাদার বলেন, কেন ? একথা কিসে উঠছে ?

রাঙাগিন্নি আদ্যন্ত শুনছিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন : জামাইয়ের অন্ন পেটে পড়লে পথের-কুকুর হতে হয়।

পরাশর টীকা জুড়ে দিলেন : এ জন্মে নয়—পরের জন্মে।

মাদার শুধালেন, কে বলেছে ?

শাস্ত্র—

মাদার বললেন, কোন শাস্ত্র ?

সেটা কেউ জানে না। তবে আছে নিশ্চয়, নয় তো তাবৎ মেয়ের বাপ বিষয়টা মানতে যাবে কেন ? আপনার মেয়ে হয় নি, তাই জানেন না।

মাদার তর্ক জুড়ে দিলেন : এ বাড়ির অন্নের মালিক নন্দু হল কি করে, বুঝিয়ে দিন। সে তো সিকিপয়সাও রোজগার করে না।

পরাশর বলেন। শাস্ত্রের বিধান এইরকম, মজাই তো এইখানে। ক-বছর বাদে আবার সোনার নাতি আসবে—অন্নের মালিকানা তখন আর নন্দুতে থাকবে না, সদ্য আগন্তুক নাতি বাহাদুরে গিয়ে বর্তাবে। সেই কয়েকটা বছর সবুর করুন, নাতি আসতে দিন। তখন আর ডাকতে হবে না—সকাল বিকাল আপনি এসে পড়ে নাতির অন্ন খাবো, আমোদ-আহ্লাদ করবো, তাড়ালেও যাবো না।

দু হাত যুক্ত করলেন পরাশর : আজকে মাপ করবেন বেহাইমশায়। সন্দেশটা

আশটার বেশি গলায় ঢুকবে না। নৌড়-ঝুত্তা হয়ে পথে পথে ঘোরা আর লাঠি-ঠেঙা খাওয়ার বড় কষ্ট। আমি তা পেরে উঠব না।

রিসেপসন কবে চুকে বুকে গেছে, দ্বিরাগমন সম্পর্কে কেউ গা করেন না। টুনি নিজেই তো করে না—অন্যে পরে কা কথা।

ঠিক দুপুর, আকাশে আগুন ঝরছে। তমালিনী আজ বাড়ি নেই, গণপতিদের গ্রাম মোহনপুর গেছে। দু-খানা গরুরগাড়ি নিয়ে পাড়ার মহিলারা দলবদ্ধ হয়ে গেছে সব। মোহনপুরের শিবমন্দিরে জনৈক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, বয়স সাতশ' সাতাত্তর। অলৌকিক শক্তিধর তিনি—হাত ঘুরিয়ে শূন্য থেকে সন্দেশ চাঁপাফুল এবং তাম্র ও অষ্টধাতুর আংটি মুঠোভরে আদায় করে এনে সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণেও কল্পতরু বটেন, ভক্ত তাই গাদায় গাদায় যাচ্ছে। এরাও গেছে, সন্ধ্যা লাগাত ফিরবে।

দাদার কোর্টে, রুস্টুর ইস্কুল খুলেছে সে ইস্কুলে। এবং রাঙাঠাকরুনও যথারীতি দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। দিনমানে আজ বাড়ি একেবারে ফাঁকা। বাড়ির কর্তাগিরি এই মুহূর্তে নন্দুতে এসে বর্তেছে, ইচ্ছে করলে সে হাতে মাথা কাটতে পারে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাথা সে কাটল না, টুনিবউয়ের গলা ধরে আদেশ করল: চলো—

কোথায়?—টুনি শুধাল।

পতির সঙ্গে—

কোন জায়গায়?—টুনির পুনরাপি প্রশ্ন।

ধরে নাও পঞ্চবটী বনে।

বনে আমি যাবো না—তা সে যেমন বনই হোক। বনে মশা কামড়ায়, জোঁক কিলবিল করে—

নন্দুও বলে যায়, কাঁচা আম থোলো থোলো ঝুলছে, ছিঁড়ে নুন মাখিয়ে খাবো। ছিপ ফেলে পুকুরের পুঁটি মাছ ধরব—রুপোর মতন ঝিকমিকিয়ে টানে টানে উঠবে। ওদিকে কেউ বড় যায় না—চাতালের উপর দু-জনে একলা হয়ে চুপচাপ কোকিলের ডাক শুনব—

কবিত্ব করে বউকে সে মাতিয়ে দিল। আয়োজন সেরেই এসেছে। ঘাটে ছিপ-সুতো-বড়শি মজুত, ছুরি ও নুন আছে—কাঁচা আমের সদগতির জন্য। গায়ে গায়ে মিশে একলাটি হয়ে বসলও সত্যি সত্যি।

মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই টুনি উসখুস করে। মাছ-ধরা বিদ্যায় সে-ও কিছু কম যায় না—ছিপ পেলে একবার দেখিয়ে দিত। আবদারের সুরে বলল, আর একটা ছিপ আনো না, আমি ঘাটের ওপাশে বসব। পাল্লাপাল্লি হবে, কার ছিপে কত মাছ ওঠে। বাজি ধরব।

একবার বাজি হেরে বড্ড যে মজা পেয়ে গেছ!—পতি-দেবতা কড়া ধমক দিল: বউমানুষ দিনদুপুরে ছিপ পেতে বসবে বই কি, নইলে মুখ আমার উজ্জ্বল হবে কিসে?

এ প্রস্তাব নাকচ। চুপচাপ ভাবছে টুনি। অন্য যে কথা আছে, নুন-লঙ্কা সহযোগে কাঁচাআম খাওয়া, সেটাও কিছু মন্দ নয়। কোথায় সব থোলো থোলো কাঁচাআম—ছিঁড়ে আনা যাক কিছু। উঠল টুনি। ঘাটের উপরেই লম্বাধিড়িঙে এক গাছ, তাতেই যে অবাক কাণ্ড!—রাঙা টুকটুকে খাসা একটা পাকা আম ঝুলছে।

ছিপের যাতনা থেকে জোর করে ঘাড় ঘুরিয়ে নন্দুকে সে বলল, আম, পাকে নি বলছিলে—ঐ দেখ।

সিঁদুরে আমগাছ—কাঁচা আমও এমনি পাকার মতন দেখায়। আসলে কাঁচা।

না, পাকা।—মাথা দুলিয়ে নন্দুর কথা টুনি উড়িয়ে দিল।

নন্দুরও জেদ : না, কাঁচা। আমি বলছি।

আমিও বলছি, পাকা। বাজি ধরো। ছিপ নিয়ে বসতে দিলে না বাজিতে হেরে যাবে সেই ভয়ে। এবারে দেখ এসে।

সিঁদুরে গাছের গোড়ায় এসে নন্দু উঁকিঝুঁকি দিয়ে ভাল করে দেখল : হোক তবে বাজি। আবার হারবে, বলে দিচ্ছি।

বাজির সর্ত এরা বাইরে বলে না, দুয়ের চোখে চোখে জানান হয়ে যায়। টুনি বলে, আনো আমটা পেড়ে—

নন্দু বলল, মুশকিল! গুঁড়িতে ডাল পালা নেই একেবারে তাল-নারকেলের মতো। কিসে পা রেখে যে উঠি—

টুনি বলে, তাল-নারকেলেও লোকে উঠে থাকে।

নন্দুর সাফ জবাব : আমি পারি নে।

তলায় কয়েকবার লম্ফ ঝম্ফ করে দেখল। অনেক উঁচুর ঐ ডাল ধরা কোনমতে সম্ভব নয়। নন্দু রায় দিল : এখন থাক। কোর্ট ফেরতা তিনকড়ি পিওন আসবে, তাকে দিয়ে পাড়াব।

টুনি বলে, আমি তোমার কাঁধে চড়ি। কাঁধ থেকে হাত বাড়িয়ে পেয়ে যেতে পারি।

নন্দু বলে, আমার গায়ে পা রেখে দাঁড়াবে—পাপ হবে না তোমার?

হবেই তো। নেমে এসেই গড় করব। পাপ ধুয়ে মুছে গেল—ব্যস!

বাজির ফয়শালা হয়ে যাক, নন্দুরও লোভ রয়েছে। দাঁড়াল সে গাছ ধরে সটান হয়ে—আলগোছে টুনি উঠে গেল। এই কর্মেও বউ যে রীতিমত ওস্তাদ, সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কাঁধে উঠে টুনি শুধায় : বসে বসে তো হচ্ছে না। দাঁড়াই দুই কাঁধে দুই পা রেখে—কি বলো?

নন্দু বলল, দুই পায়ে ডবল পাপ হবে কিন্তু।

টুনি বলে, ডবল করে পায়ের ধুলো নেবো—তা ছাড়া যে হচ্ছে না! না-হয় চারবার নিয়ে নেবো—পুণ্যে পাপে কাটাকাটি হয়ে গিয়ে বাড়তি পুণ্য জমার ঘরে থাকবে।

দু-কাঁধে দাঁড়িয়ে পড়েও আম নাগালের মধ্যে এলো না। নন্দু বলে, দিব্যি তো কালী করালিনী হয়ে দাঁড়িয়েছ—এ রকম সারাদিন থাকবে নাকি? ফেলে দেবো, দিলাম কিন্তু ফেলে—ওয়ান—টু—

চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। ঝাঁকি দিচ্ছে, নৃত্য করছে। আর টুনি কাঁধ থেকে নিঃশঙ্কে বলছে, দাও না ফেলে কেমন পারো দেখি। দাও—

ঝুপ করে সে নন্দুর মাথার উপর বসে পড়ল। দুই পায়ে তার বগল বেড় দিয়েছে, সামনের লম্বা চুল দু-হাতে মুঠো করে ধরেছে। বলে, থামলে কেন গো, নাচো দৌড়ও যা-ইচ্ছে করো, আমি পড়ব না।

নন্দুও বুঝে নিয়েছে, সত্যি সত্যি তাই বটে। দু-জনে এক হয়ে যাবার কথা

উঠেছিল না—টুনিবউ তাই করে ছেড়েছে। টুনিকে ফেলতে গেলে নিজেও পড়বে—বউ-চাপা হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

রণে ভঙ্গ দিয়ে অতএব নন্দু দাঁড়িয়ে পড়ল : নেমে পড়ো—। কাঁধ থেকে এক লম্ফে টুনি ভুঁয়ে নামল। আমের বিচারটা মুলতুবি রইল, ভাল লাগছে না-তার। নন্দু আবার ডাকে : পাপের বোঝায় যে নড়তে পারছ না পদধূলি নিয়ে নাও, দাঁড়িয়ে আছি—

ঠিক বটে। মনে পড়ে গিয়ে টুনি তাড়াতাড়ি গড় করল। এবং পতির পক্ষে যেমন উচিত, পা তুলে টুনির মাথায় ঠেকিয়ে পবিত্র দেবভাষায় আশীর্বাদ করল : কল্যাণমস্তু।

কী সর্বনাশ, পদতলে গোবর। পতি দেবতা বটেন, কিন্তু অতিশয় খচ্চর। বউ মাথায় তুলে নৃত্য করতে গোবরের জায়গায় গিয়ে পড়েছিল। সেটা ইচ্ছে করেই।

ছিপ ধরে নন্দু আবার বসেছে। চারে বড্ড মাছ লেগেছে আজ, এমন বড় হয় না। জলের ধারে টুনি সিঁথির গোবর ধুচ্ছিল। বাজি ধরেছে, সে জিনিস ত্রিশংকুর অবস্থায় রইল, মোটেই ভাল লাগছে না তার। তাকাল একবার নন্দুর দিকে—তার দৃষ্টিতে ছিপের ফাতনা ও পুঁটিমাছ, বিশ্বভুবনের আর কিছু নেই। কাঠবিড়ালের মতন টুনি পিলপিল করে সিঁদুরে গাছের গুঁড়ি বেয়ে একেবারে মগডালে আমের কাছে পৌঁছে গেল। এতটুকু শব্দ নেই, ডাল একটুকু নড়ে না, টুনি যেন ভারশূন্য।

টানে টানে মাছ—তাই ছেড়ে নন্দু দেখি গাছতলায় এসে উধর্বলোকে সহধর্মিণীর জিমন্যাস্টিক খেলা দেখছে। মাটিতে পা পড়ছে কি না-পড়েছে, হাত থেকে বিনা বাক্যে আম ছিনিয়ে নিয়ে জলে ছুঁড়ে দিল। টুনিমণির চোখে জল : এত কষ্ট করে আমি পেড়ে আনলাম—

ওদিকে পতিজনোচিত ঘোর গর্জন (চাপা গলায় অবশ্য) : গাছ-মর্কট একটি! ঘোমটা দিয়ে বউ হয়েছ কেন, গাছে গাছে লাফঝাঁপ করে বেড়াও গে।

একরত্তি বউ দপ করে জ্বলে উঠল : বাজিতে হার হয়েছে, জলে ফেলে দিয়ে রক্ষে পেতে চাও। সেটি হচ্ছে না মানিক। আম আমি এক্ষুনি তুলে নিয়ে আসছি।

এঁদোপুকুরে সতি সত্যি পড়বে নাকি? ভয় পেয়ে গিয়ে নন্দু ভয় দেখাচ্ছে : পুকুরে কিন্তু সাংঘাতিক পাঁক। পাঁকের মধ্যে রক্তচোষা পেত্নী। বাগে পেয়েছে কি, পাঁকে পা টেনে ধরবে আর পেত্নী গায়ের রক্ত শুষে খাবে।

কিন্তু পাঁক বা পেত্নী কোন কিছুই রুখতে পারল না—ঝপাৎ করে টুনি দিল জলে লাফ। এবং লহমার মধ্যে তলিয়ে গেল। জলে ভুড়ভুড়ি কাটছিল, তা-ও থেমেছে—কোন দিকে কোনরকম নিশানা নেই। নন্দু নিজে সাঁতার জানে না, কী করবে দিশা করতে পারে না সে। বাড়িতে একমাত্র দিদা, বুড়ো-অথর্ব মানুষ, শুনলে তো পাগল হয়ে উঠবেন তিনি। চেঁচামেচি করে বাইরের লোক জড় করা, তাতেও কেলেঙ্কারি।

টুনি, টুনি গো, উঠে এসো—বলতে বলতে হতবুদ্ধি নন্দু জলে নেমে পড়ল।—হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে আম ছুঁড়ে দিয়েছে সেই আন্দাজি জায়গায়। হাঁটুজল—কোমরজল—গলাজল—পায়ের ওপর অগণ্য আরশোলা বেড়াচ্ছে যেন, কুনোব্যাং থপ-থপ করে লাফাচ্ছে। কিসে যেন তাকে ঠেলে দিচ্ছে আরও গভীরে—নন্দু নড়বে না, খুঁটির মতন দাঁড়াল।

অশরীরী শব্দ সহসা ভুস করে ভেসে উঠল। আত্মপরিচয় দিচ্ছেঃ আমি রক্তচোষা—

নন্দ বলে, পেত্নী সেটা বেশ বুঝেছিলাম। জলের নিচে দম আটকে এতক্ষণ ছিলে কি করে?

ছিলাম উ'ই কলসিঝোপের ভিতর। দিনরাত ঐখানে তো থাকি।

বেশ করো। বুঝে নিয়েছি। নাকি-কথা ছেড়ে এইবারে টুনটুনিটি হও দেখি লক্ষ্মীসোনা।

পেত্নী তৎক্ষণাৎ টুনিবউ হয়ে গিয়ে সর্ত পাকা করে নিচ্ছেঃ বলো, আর কখনো রাগ করবে না—

নন্দ বলল, রাগ করব না।

কক্ষনো না, কোনদিনও না—

না না-না—

কান মলো—

তা ও হয়তো করতে নন্দ কিন্তু বিপদ কেটে গিয়ে ভিতরের পতিদেবতা ইতিমধ্যে খানিক চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বলল, কান মলাচ্ছ, পাপ হবে কিন্তু।

থতমত খেয়ে টুনি বলল, হবে বোধহয়। যাকগে, আমিই মলছি।

নিজের দুই কান দু-হাতে মলে টুনি বরের গলায় ঝুলে পড়ল। এঁদোপুকুরের জলে ছিল—তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় ছাড়া ও গা-হাত-পা ধোওয়ার প্রয়োজন। ছিপ ঘাটে পড়ে রইল, পুটিমাছ খালুইতে। রাঙাবউ ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে—ঐ সব বাজে জিনিস বওয়াবয়ির স্থান কোথায়?

বেতিখোলা থেকে বেহাই পরাশরের সকাতর চিঠিঃ বড়মায়ের অনুমতি হইলে টুনি-মা'কে আনিবার জন্য পালকি পাঠাইতে পারি। কন্যাদর্শনের জন্য উহার জননী বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে—ইত্যাদি।

বড়মা অর্থাৎ রাঙাঠাকরুন। চিঠি মাকে পড়ে শুনিয়ে মাদার বলেন, কন্যার জন্য জননী শুধু ব্যাকুল নন, জনক মশায় অনেক বেশি। কনে বিদায়ের সময় দেখে ফেলেছিলাম—

সে গল্প রাঙাঠাকরুন অনেকবার শুনেছেন। বললেন, মেয়েরা বড় মায়াবিনী —মেয়ে নেই তাই ঠাট্টাতামাসা করিস। নিয়ে যেতে লিখে দে। নন্দও যাক, কলেজ খুলে গেলে তখন আর হবে না।

নন্দটা তক্কে তক্কে থাকে। খবর সঙ্গে সঙ্গে পেঁছিলঃ তোমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে টুনি।

কেন?

আমায় মান্য করো না, ঝগড়াঝাটি করো। পড়াশুনোয় ভণ্ডুল দাও—

নন্দর কথা টুনি তেমন আমলে আনে না। শ্বশুরের কাছে গেল যাচাই করে নিতে। মাদারের সাজগোজ সারা, কোর্টে রওনা দেবেন এক্ষুনি। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে টুনি বলল, বাবা, আমায় নাকি বেতিখোলা পাঠাচ্ছেন?

'তাড়িয়ে দিচ্ছেন' বলল না বটে, কিন্তু ভাবখানা অবিকল তাই। মাদার বুঝিয়ে বলেন, বেহাই-বেয়ান কাতর হয়ে পড়েছেন। আমাদেরই দোষ—বিয়ের সময় এসেছিস, আজও দ্বিরাগমন হল না।

ইংরাজি পড়া যে বন্ধ হয়ে যাবে—

মাদারের এই নতুন চাকরি। দিনমানে ওকালতি করেন, সন্ধ্যার পর মাস্টারি—টুনিকে ইংরেজি শেখানো। টুনি মনোযোগী ছাত্রী, নন্দুর মতো ফাঁকিবাজ নয়। ক'টা দিন পড়া বন্ধ থাকবে, সেই তাই কত উদ্বেগ তার।

মাদার সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, দুটো চারটে দিনে কিছু ক্ষতি হবে না। ফিরে এসো মা, ডবল করে পড়িয়ে পূরণ করে দেবো।

আরজি ডিসমিস করে তিনি এগিয়ে চললেন। নাছোড়বান্দা টুনি পিছন থেকে বলে, আমি গেলে দিদামণির কি হবে? ডান হাঁটু ফুলে তো ঢোল—

ব্যস্ত মাদার চাপা দিয়ে দিলেন: আচ্ছা আচ্ছা, ফিরে এসে ঠান্ডা মাথায় সব শুনব।

সকলের বড় উপরওয়ালা রাঙাগিন্নি, মাদারের রায় অঙ্গুলি হেলনে যিনি নস্যাৎ করতে পারেন। তাঁর কাছে টুনিবউ করকর করে গিয়ে পড়ল: বাড়ি থেকে নাকি দূর করে দেবেন—আপনার নাতি ভয় দেখাচ্ছে। ওকে মানা করে দিন দিদা!

রাঙাঠাকরুন বলেন, ওমা, সে কী কথা! বাড়ি তো তোরই—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা তাড়ানোর কথা বলবে!

তারপর নরম সুরে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললেন, অনেক দিন বাপ-মা দেখিস নি—একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। কেমন?

ঘাড় নেড়ে টুনির স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব: এখন নয়। আপনার অসুখ সেরে গেলে তারপর—

তাঁকে নিয়ে এমন ব্যাকুল—রাঙাঠাকরুন মনে মনে প্রসন্ন। মিনমিন করে তবু বললেন, থাকবি দুটো চারটে দিন—বেশি দিনের কথা কে ভাবছে?

একটি দিনও নয়, একটি ঘন্টাও নয়। মালিশ করে দেবে কে আপনাকে, ব্যথার জায়গায় সেঁক দেবে কে? গায়ে হাত বুলিয়ে কে ঘুম পাড়াবে?

রাঙাগিন্নি একেবারে গলে গিয়ে বলেন, তা সত্যি, সেবা তোর মতন কেউ পারে না। দেখলাম তো কত জনাকে।

টুনি জুড়ে দেয়: ভাল করে সেরেসুরে খাড়া হবেন দিদামণি, হেঁটে বেড়াবেন, উপর-নিচে করবেন—তবে আমি যাবো।

এই বয়সে আবার উপর-নিচে করব? – ম্লান হেসে রাঙাঠাকরুন বললেন, বাপের-বাড়ি যাওয়া তবে তোর কোন দিনই ঘটবে না দিদি।

পাকা গিন্নির মতো হাত ঘুরিয়ে টুনি বলল, কপালে না থাকলে কি করে হবে বলুন।

মুখ শুকিয়ে এতটুকু, মনে মনে রীতিমত উল্লাস। উপরের আদালতকে নরম করা গেছে। কোর্ট থেকে ফিরেই মাদার মায়ের কাছে আসেন—শেষ কথাবার্তা সেই সময়। বই-টই নিয়ে টুনি যথানিয়ম শ্বশুরের কাছে গিয়ে বসল। বুক ঢিবঢিব করছে তার।

বিনা ভূমিকায় মাদার বললেন, ভেবেচিন্তে দেখলাম মা, যাওয়াই উচিত। গিয়ে একদিন দু-দিন থাকবি, তারপরে কোন একটা ছুতো করে নিয়ে আসব। মোটে না গেলে বেহাই-বেয়ান দুঃখ পাবেন, তোর উপর বিষম রাগ করবেন।

নিরীহ কণ্ঠে টুনি বলল, আমার কোন দোষ, আমার উপর কেন রাগ করতে যাবেন, আপনারা না পাঠালে কেমন করে যাবো আমি? আর আপনার উপরেও দোষ দেবার জো নেই—দিদার এই অবস্থায় কেমন করে পাঠাবেন?

মাদার হো-হো করে হেসে উঠলেন : ইংরেজি শিখিয়ে আইন পড়িয়ে তোকে আমি উকিল করে দিয়ে যাবো। আমার চেয়ে অনেক ভাল উকিল হবি তুই।

হাসি মস্করায় টুনি আসল বস্তু ভোলে না। হাহাকারের ভঙ্গিমায় বলে উঠল, কী করেছি আমি, যে দিদার এই অবস্থায় 'দূর' 'দূর' করে সকলে তাড়িয়ে তুলছেন?

আর, এ মেয়ের চোখে তো কলসি কলসি জল সারাক্ষণ মজুত থাকে, ইচ্ছে মতন ঢালতে পারে। হাউ-হাউ করে টুনি কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে হাসেও আবার—যাত্রামঙ্গলের দিন বাপ পরাশরের সঙ্গে যেমনটা করেছিল। এবং তখন যে কথাগুলো বলেছিল, এখনকার কথাও প্রায় তাই : ঢুকবোই না মোটে পালকিতে—দেখি কেমন করে পাঠান। লুকিয়ে পড়ব—সিন্দুকে ঢুকে যাবো, সিঁদুরে গাছের মগডালে উঠে বসে থাকব।

গণপতি হঠাৎ এসে পড়লেন। এক বড় মামলায় দু-জনেই আছেন, তারই সাক্ষি সাজানো নিয়ে কিঞ্চিৎ শলাপরামর্শ। টুনি চোখ মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এক নজর চেয়ে দেখে গণপতি বন্ধুর দিক দন্ত-কড়মড়ি করলেন। বলেন, তুমি নৃশংস। বাইরেই কেবল লম্বা লম্বা কথা—

সকৌতুকে মাদার বলেন, কি কথা বলেছি?

কনের বয়স বিশ, বরের পঁচিশ—বিয়ে-থাওয়া সংসার-ধর্ম তার আগে নয়—

মাদার বলেন, সংসার ধর্মের সে বয়স হতে ওদের এখনো পাঁচ-ছ' বছর বাকি।

বেশ ভালো। সংসার তখন ওরা করবে, এখন খেলা করছে তাই করুক। গৃহস্থ-বাড়ি যাবে—আবার কি! বয়সের মেয়ে হলে কান্নাকাটি করত না, ছোট বলেই কাঁদছে।

মাদার সহাস্যে বলেন, ঠিক উল্টো, যাবে না। জিজ্ঞাসা করো টুনি মা'কে—শ্বশুর তুমিও তো বটে!—ওর মুখে শুনে নাও।

সমস্ত শুনলেন গণপতি—শুনে তো অবাক। গলা খাটো করে শুধালেন : প্রণয় বন্ড এঁটেছে বুঝি নন্দুটার সঙ্গে! হায় রে কপাল, এক এক ফোঁটা শিশু বললেই হয়—

প্রবল ঘাড় নেড়ে মাদার বলেন, প্রণয় দেখছ তুমি—আদায় আর কাঁচকলায়, চালে আর তেঁতুলে। কোর্টে গিয়ে হাকিমকে মামলা শোনাই, বাড়ী ফিরে হাকিম হয়ে ওদের মামলার বিচার করি। আমার বিচার অপছন্দ হলে সুপ্রীম কোর্ট আছেন—আমার মা।

স্ত্রীর কাছে গণপতি এই আজব গল্প শোনাচ্ছেন : মায়ের কাছে যাবার নামে কচি বউ কেঁদে ভাসায়, শুনেছ কখনো?

সৎ-মা বুঝি—জ্বালা যন্ত্রণা দেয়?

ঠিক উল্টো। মেয়ে নয়নের মণি—মা-বাপ দুজনেরই।

তবে?

কোর্ট থেকে ফিরে মাদার এখন আর উকিল থাকেন না—মোটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েও একছত্র মক্কেলের কাগজ পড়ানো যায় না। নতুন বউকে ইংরেজি শেখান, আর বিন্তি খেলেন ওদের দলের মধ্যে ঢুকে। এই বিন্তি খেলার গুরু আবার রাঙা-ঠাকরুণ। কোন এক কালে খেলতেন—তিন কাল কাটিয়ে এসে আবার ঝালিয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছেন। মাদারের বউও, শোনা গেল, ভাঙা-হারমোনিয়াম মেরামত করে এনে নিয়মিত সারে-গামা সাধে। কুমারী বয়সে নাকি গাইত—বউয়ের সঙ্গে

গলা মিলিয়ে আবার গাইবে। আর নন্দকে বরাবর দেখে এসেছ, পারতপক্ষে সে বাপের কাছ ঘেঁসে না—সে নন্দ আর নেই। বাপ-মা ঠাকুরমা আর টুনিবউ চার খেলুড়ে তাসে বসেছে—সে দেখি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে জুত দিচ্ছে। কোন দিন নিজেই বা বসে পড়ে।

মাদার উকিল বিষ্ণুর মুশাবিদা করে বেহাইয়ের চিঠির জবাব দিলেন:

মাতা ঠাকুরাণীর অসুখ সাংঘাতিক রকম বাড়িয়াছে, ব্যথা সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হেন অবস্থায় তিনি নাতবউকে দৃষ্টির আড়াল করিতে চাহেন না। আপনারা চিন্তিত হইবেন না। গাড়ি-পালকি পাঠাইবার প্রয়োজন নাই—অসুখের কিছু উপসম ঘটিলেই শ্রীমতী টুনিমাতাকে আপনাদের চরণে হাজির করিয়া দিব। আমি নিজে এই দায়িত্বভার লইতেছি। এ মাসে যদি না-ও ঘটিয়া ওঠে, পুরা জ্যৈষ্ঠমাস রহিয়াছে, তাহার মধ্যে পেঁছাইয়া দিব -

চিঠি পাঠানোর পর পুরো হপ্তাও কাটে নি। ভোরবেলা। বেতিখোলার বাড়িতে সুরবালা পাঁচিলের দরজা সবে খুলেছেন, এদিকটায় একটু গোবর-ছড়া দেবেন—মেয়ের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি। টুনি এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। কড়া নাড়ে নি, ডাকে নি কাউকে, চুপচাপ আছে দাঁড়িয়ে। একা—একেবারে এক-কাপড়ে। দরজা খোলা পেয়ে সুড়ুত করে সে ভিতরে ঢুকে গেল।

সুরবালা স্তম্ভিত। চেতনা হারিয়ে ভুঁয়ে পড়বার গতিক।

কোত্থেকে এলি তুই?

এমন অবস্থাতেও মেয়ের কথার জুত শোন। বলে, আকাশ থেকে—

সুরবালা বলে, ব্যাপার তো সেইরকম। সঙ্গে কে এসেছে?

থাকলে দেখতে পেতে না?

দাঁড়া বলছি, পালাবি নে—। সুরবালা হুঙ্কার দিয়ে উঠল: সব কথার জবাব দিয়ে তারপরে যাবি। কে নিয়ে এলো তোকে?

আমি কি খোঁড়া যে অন্য একজনে ঘাড়ে করে আনবে? তকরার করতে পারি নে মা। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, খানিক ঘুমিয়ে নিই গে—

সুরবালা গর্জে উঠল: না, সমস্ত আগে বল্ হারামজাদী।

মেয়ের কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই। মা ধরতে আসছে তো ছুটে পালাল সে। ঘরে ঢুকেই মায়ের আগে দুয়োরে খিল এঁটে দিল। খিক্-খিক্ করে হাসির আওয়াজও পাওয়া গেল যেন।

সাড়া পেয়ে বাপও ঘুম থেকে ছুটে এসেছেন। দরজা ঝাঁকিয়ে বলেন, কী সর্বনাশ, শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস নাকি?

টুনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, জানলে আসতে দিত?—তেমনি পাত্তোরই বটে। অথচ তুমি এমন করে লিখেছ—শেষ রাত্রে খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়লাম। একঘুম ঘুমিয়ে নি লক্ষ্মীবাবা, একটা একটা করে সমস্ত খুলে বলব।

উদ্বেগে সুরবালা বারম্বার জানলায় এসে দেখছে। রাজরাণী বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছেন! ওটা কি মানুষ—ঘুম আসে এমন অবস্থায়?

বিকালবেলা মাদার ঘোষ সাইকেলে এসে নামলেন। পরাশর ছুটে এলেন:

আসতে আজ্ঞা হোক বেহাইমশায়। খবর সব ভাল তো? বউমা কেমন এখন?

শুষ্ক মুখে মাদার শুধালেন: টুনিমণি এসেছে এখানে?

কই, না তো—। পরাশর আকাশ থেকে পড়লেন: এখানে এসে খোঁজ নিচ্ছেন, ব্যাপার কি?

সামান্য ঝগড়াঝাটি হয়েছিল—রাগে কাউকে না বলে পালিয়েছে।

বেহান সুরবালাও আলুথালু বেশে পাগলিনী প্রায় এসে পড়লেন: আমাদের টুনুর নাকি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না?

সংশয় যা-ও বা একটু হচ্ছিল, বেহানের এই থিয়েটারি ব্যাপারের পর ধুরন্ধর উকিলের বুঝতে কিছু বাকি রইল না। বাপ মা ও মেয়ে তিন মিলে জমিয়েছে বেশ। মাদার জবাব দিলেন, নিখোঁজ কতক্ষণ থাকবে? সন্ধ্যার আগেই বের করে ফেলব। আচ্ছা চলি—

ক্রীং-কীং ক্রীং-ক্রীং ক্রীং-ক্রীং—আচ্ছা করে বেল বাজিয়ে মাদার সাইকেলে উঠে বসলেন। পরাশর বলেন, একি বেহাই, বসলেন না—ধুলো-পায়েই চলে যাচ্ছেন?

মাদার বললেন, বসবার কি সময় এখন? তিনটে জায়গায় যাবো ভাবছি। বের করি আগে মা-লক্ষ্মীকে—বসা-ওঠা খাওয়া দাওয়া তার পরে?

মা-লক্ষ্মীকে দেখি তীর বেগে সাইকেলের পিছন পিছন ছুটছে: একি, আমায় রেখে যাচ্ছেন—নিয়ে যাবেন না বাবা?

তুমি তো এসোই নি মোটে—নিয়ে যাবো কাকে? বেহাই-বেয়ান দুজনেই কখনো মিথ্যে বলতে পারেন।

জলযোগে বসেছেন মাদার। বসতেই চাচ্ছিলেন না রাত হয়ে আসছে বলে—টুনিকে ও'রা চোখ টিপে দিলেন, গ্রেপ্তার করে নিয়ে সে বসাল—খেতে খেতে টুনির মাথায় গভীর সন্দেহে বাঁ হাতখানা রেখে মাদার বললেন, টুনি-মা ফাঁস করে দিয়েছে তো আমিও এবার শোধ তুলে নিই—কি বলেন বেহাই মশায়? ছোট্ট একটুকু মাথা, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধির হাঁড়ি। আজকের চক্রান্ত সমস্ত ওই মাথা থেকে বেরিয়েছে। মোহনপুরের মহাপুরুষ আংটি পরিয়ে নাকি বাতের অসুখও সেরে দেন—বন্ধু গণপতির সঙ্গে ঠিক করলাম, রবিবার ছুটির দিনে মহাপুরুষ দর্শনে আসব। টুনি-মা বায়না ধরল, সে-ও আসবে—আপনাদের দেখে যাবে। কিছু না বলে কয়ে আপনাদের দরজায় ফেলে যাওয়া ওরই বুদ্ধি। অথচ বিলকুল ফাঁস করে দিয়ে বাপের মায়ের লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে সারাদিন ঘুরঘুর করেছে।

পরাশর বললেন, ফাঁস করেছে সহজে? আমি পাগল হয়ে দাপাদাপি করছি, ওর মায়ের চোখে সমুদ্দুর বয়ে যাচ্ছে, দুপুরের খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে আছে—দয়াময়ীর দয়া হল তখন। তাই বলছিলাম, শ্বশুরবাড়ি প'চিশটা দিন থেকে এই হয়েছে—প'চিশ মাস থাকলে তখন তো বাপ-মাকে একেবারেই চিনবে না।

মাদার হাসতে হাসতে বললেন, মেয়ে পর করে দিচ্ছি, আমাদের উপর খুব রাগ হচ্ছে—তাই না?

সুরবালা বলতে কইতে বেশ ভাল। বললেন, খুব আনন্দ হচ্ছে। আমাদের না-ই বা চিনল নিজের ঘরসংসার চিনে নিয়েছে, বাপ-মা তার বেশি কিছু চায় না।

মাদার আপত্তি করে উঠলেন : ঘরসংসার কোথায় যে চিনবে ? বলছি কি তবে ! আমাদের খেলাঘর। ওকালতি সিকেয় ওঠার গতিক—দিনরাত্তির নানান খেলা খেলছি আমরা। এই যেমন আপনাদেরও সঙ্গেও এক খেলা হয়ে গেল। টুনি-মা আপনাদেরও ছাড়ে নি, খেলুড়ে করে নিয়েছে। সাফ সাফাই আপনারা বলে দিলেন, মেয়ে আসে নি এখানে। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলাম—বুদ্ধি এসে গেল, সাইকেল ঘুরিয়ে দিলাম। টুনি-মা তখন ছুটে কুল পায় না। আমার জিত, টুনটুনির হার। বলুন বেহাইমশায়, বলুন বেয়ান ঠাকরুন, তাই কিনা।

———

ডক্টর শ্রীমান দীপক চন্দ্র

পরম প্রীতিভাজনেষু

॥ এক ॥

রুবি থিয়েটার—একমাত্র স্বত্বাধিকারী মণিসুন্দর চৌধুরি। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক, সেই মণিসুন্দর। সে যুগের যা দস্তুর—বোমা-রিভলভারের দলে ছিলেন তিনি, বক্তৃতায় আগুন বইয়ে দিতেন। ফলে জেলের ঘানি ঘোরাতে হত যখন তখন, একবার কালাপানি পাড়িও দিয়েছিলেন। বয়সে রোগ আরোগ্য হয়ে গিয়ে থিয়েটার ফাঁদলেন। 'ছি-ছি'র আর অন্ত রইল না: এমন একটা মানুষের পরিণাম হল কিনা বাজারের নটী নাচিয়ে দিন-গুজরান। মণিসুন্দরের কান অবধি কিছু কিছু পৌঁছে যেত। হাসতেন তিনি: বুঝলে না—কবিরাজি অনুপানে অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে—মধু অভাবে গুড়। আমাদেরও সেই জিনিস। তারক বাড়ুয্যে ছিল যত অ্যাকশনের পাণ্ডা, এখন সে মাংসের দোকান করেছে। বলে, ইংরেজের বদলে এখন পাঁঠা-খাসির ঘাড়ে কোপ বসাই। আর আমার ছিল গলাবাজির কাজ, এখন ইংরেজ-রাজার বদলে মথুরার রাজা কংসের উপরে গালি ঝাড়ি। নিজের গলায় জোর নেই তো তারামণি পুলোমা সেজে সেই কাজটা করে দেয়।

মণিসুন্দরের নিন্দে হোক যা-ই হোক, রুবি থিয়েটারের নাটক লোকে কিন্তু খুব নিত। নতুন নাটক খুললেই হাউস-ফুল। বেশির ভাগ পৌরাণিক। অথবা ঐতিহাসিক। ঘটনা হুবহু পুরাণে বা ইতিহাসে রয়েছে, তবু যেন ভিতরে ভিতরে নতুন জিনিস আরও কী-সব। ঝানু দর্শক ভক্তি-বিশ্বাসে গদ-গদ হত না, নাটকীয় চরিত্রগুলোর সঙ্গে স্বদেশিওয়ালাদের মিল খুঁজত। তর্ক ঘোরতর: একজন বলে, নাটকের অর্জুন আসলে কানাই দত্ত, অন্যে বলে, না, বাঘা-যতীন। কংসের কারাগার বলে দেখাচ্ছে—দেউলি-ক্যাম্প। ওর মধ্যে কৃষ্ণের জন্ম। ভাদ্র মাসের ঘোরা নিশীথিনী। উদ্দাম ঝড়, অবিরল বৃষ্টি, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমক বজ্রগর্জন। সুকোমল রাজশয্যায়

ঘুমন্ত কংস—স্বপ্ন দেখে সহসা তাঁর আরামের ঘুম ভেঙে যায়। আর্তনাদ করে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি। নেপথ্য কণ্ঠ: পরিণাম ঘনিয়ে আসছে অত্যাচারী রাজা। যে তোমায় শেষ করবে তোমারই বন্দীশালার সতর্ক প্রহরার মধ্যে এইমাত্র সে জন্ম নিল।

নাটকের নাম 'বন্দীশালা'। পৌরাণিক অবশ্যই। তারামণি পুলোমা সাজত। পুলোমা পুরাণে নেই, সম্পূর্ণ কল্পনায় বানানো দেবকীর কিঙ্করী—কংসের বন্দিনীদের মধ্যে সে-ও একটি। তারামণির মতন অতবড় অভিনেত্রীকে দিয়েছে দেবকী নয় কংসের পাটরাণী নয়, সামান্য চাকরাণীর পাঠ। দুর্দান্ত নির্ভীক ক্ষুরধার-রসনা। 'সাবধান, সাবধান, যত রক্ত ঝরায়েছ এই বারে প্রতিদান—' 'মুকুটহীন ছিন্নমুণ্ড—চিনি হে তবু চিনি, এই পরিণাম দেখব বলে মরেও তো মরি নি'—পুলোমার গানের এই সমস্ত লাইন লোকের মুখে মুখে। কংসের উদ্দেশ্যে হলেও ভিতরের মানেটা সরকার বোঝে না, এমন নয়। কিন্তু বেশ খানিকটা ফাঁপরে পড়েছে। তড়িঘড়ি কিছু নয়, ধীরে-সুস্থে বিচার-বিবেচনা করে এগোতে হবে। কেন না ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাপার—ধর্মের উপর আঘাত সন্দেহ হলে ধর্মপ্রাণ জাতি ক্ষেপে যেতে পারে। সিপাহি-মিউটিনির অভিজ্ঞতা রয়েছে কর্তাদের।

পুলোমার কয়েকটা গান গণেন গুপ্তর। মণিসুন্দরের বন্ধুলোক তিনি, খাতিরে দিয়েছেন। কিন্তু কানাঘুসোই শুধু, হাতে-নাতে প্রমাণ নেই। গান টুকে নিয়ে মূল-পাণ্ডুলিপি সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ফেলে দেয়। রিহার্শালেও কোন দিন গুপ্তমশায়কে দেখা যায় নি—থিয়েটার-বাড়িতেই তিনি তখন পা ছোঁয়াতেন না। স্বদেশি-যাত্রার অনেক গানই তাঁর—সেখানেও ঠিক এই রকম বন্দোবস্ত। ফলে অধিকারীর হয়তো জেল, গণেন গুপ্তর ধরা-ছোঁওয়া পায় না। অধিকারী খুশি: আমি গেলে নতুন অধিকারী মিলবে, গুপ্তমশায় জেলে গিয়ে বসে থাকলে আগুনে আর জোর থাকবে না। পুলিশের

লোকও তাঁকে ভালবাসে—দৈবে সৈবে যদিই-বা সুলুকসন্ধান কিছু কানে আসে, তারা চেপে যায়—উচ্চবাচ্য করে না।

পুলোমার গানের রেওয়াজ থিয়েটারে নয়—তারামণির বস্তি-বাড়িতে। রাত দুপুরে গণেন গুপ্ত চলে যান সেইখানে। কারো কোন সন্দেহ জাগে না—ও-পাড়ায় ঐ সময়টা ঘরে ঘরে গান।

কিন্তু তারামণি গোলমাল করছে। গান নিয়ে তার ঘোর আতঙ্ক। গণেনের কাছে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে: ফষ্টিনষ্টি গান গাই, তা বলে এই আগুন? সৎলোক কাউকে গিয়ে গাওয়ান বাবা, আমার মুখে ও-জিনিস বেরুবে না। লোকে থুতু দেবে।

গণেন গুপ্ত ধমক দিয়ে উঠলেন: কী বেরুবে না-বেরুবে, আমার চেয়ে বেশি বুঝিস তুই? পাকামি করবি নে—যেমন যেমন দেখাচ্ছি, গেয়ে যা।

গেয়ে যেতে হয় অতএব। দু-চার পদ গেয়ে তারামণি হাপুস নয়নে কেঁদে ওঠে। তখন আবার মিষ্টি কথা: এই রেঃ, পাগলি ক্ষেপে গেছে। আচ্ছা, গাইতে হবে না তোকে। আমি গাইছি, তুই কেবল ঠোঁট মিলিয়ে যা।

পরের দিন গণেন গুপ্ত ভীমনাগের সন্দেশ হাতে করে এসেছেন। বলেন, মিষ্টি খেয়ে নে—ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি নয়, মিষ্টিকথা বেরুবে। কথাই তো হয়ে গেছে—উইংসের আড়াল থেকে আমি গাইব, স্টেজের উপর তুই কেবল ঠোঁট নেড়ে যাবি।

শেষ পর্যন্ত গাইল কিন্তু তারামণিই। সজ্ঞানে গায়নি—তারামণি দিব্যি করে বলে, গণেন গুপ্ত যেন কণ্ঠে ভর করেছিলেন, সম্মোহিত অবস্থায় গেয়ে শেষ করল। বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—তুমুল বন্দেমাতরম্-ধ্বনি। পর্দা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। তারামণি গ্রীনরুমে গেল না, যাওয়ার তাড়াও নেই, স্টেজের উপর ঐখানে ঢলে পড়ল। নাটক পৌরাণিক, দ্বাপর যুগের কথা, কংসের

কারাভ্যন্তর দৃশ্য—তার মধ্যে বন্দেমাতরম্ কেন? থামে না সে ধ্বনি, অডিটোরিয়াম ফেটে চৌচির হয়ে যায় বুঝি।

প্রথম রাত্রে গণেন গুপ্ত আজ উইংসের পাশে, এবং প্রোপ্রাইটর মণিসুন্দর অডিটোরিয়ামে সকলের পিছন দেয়াল ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে। দুজনেই ছুটে এসে পড়লেন। গণেন গুপ্ত এসেই তো তারামণির গালে ঠাস-ঠাস করে চড়। বলেন, কী আস্পর্ধা ছুঁড়ির—বলে কিনা, গান শুনে লোকে থুতু দেবে। থুতু না কি দিচ্ছে শুনতে পাস? আর, মার খেতে খেতে তারামণি ওদিকে উঠে বসে বারবার গড় করছে গণেন গুপ্তর পায়ে।

মণিসুন্দর বলছেন, চলবে না। এ যা হয়েছে, পরমায়ু তিন-চার রাত্রের বেশি নয়। আর্টিস্ট কেউ তোমরা চলে যেও না। দরকারে সারা রাত্তির থাকতে হবে। থিয়েটারেই খাবার আনিয়ে দেবো।

ম্যানেজার ব্যাখ্যা করে দেয়: চলবে না মানে হল পুলিশে চলতে দেবে না। পয়লা অভিনয় আজ, পাঠ মুখস্থ হয় নি ভাল করে, স্টেজে চলাচল রপ্ত নয়—তাতেই লোকের এই রকম মাতামাতি। বই বন্ধ করার নোটিশ এলো বলে।

তারামণি চড়চাপাটি খেয়ে কাঁদে নি, এইবারে কেঁদে ভাসাল। মণিসুন্দরকে জোড়হাত করে বলে, আমার পাঠের একটা কথাও যদি কাটা পড়ে, সে আমার হাত-পা কাটার শামিল হবে বাবা।

কাট-ছাঁট অনেক হল ডায়ালোগের উপর। গানেরও লাইন বাদ গেল, কিছু কিছু কথা পালটাল। পোস্টারেও কেবল বুড়োবুড়ি ও ধার্মিকদের আকর্ষণের চেষ্টা:

> পৌরাণিক নাটক। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের পুণ্যকথা, পরিণামে কংসের নিধন। পাপের ক্ষয়, ধর্মের জয়। ধর্মপ্রাণ নরনারী দলে দলে আসুন—

নাটকের যথাসম্ভব রদ-বদল এবং চেষ্টা-তদ্বির সত্ত্বেও মাস ছয়েক হতে না হতেই অভিনয় বন্ধ, 'বন্দীশালা' বাজেয়াপ্ত।

ঐতিহাসিক নাটকও অনেক হয়েছে। যথা—'ছত্রপতি শিবাজী'। তারামণি জিজাবাই সেজে বলত, দেশের মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে আমি যে গর্ভধারিণী মা, আমারও মুণ্ডপাতে দ্বিধা কোর না বৎস শিবাজী। 'রাজপুত-বীর' নাটকে ঐ তারামণিই যশোবন্ত-মহিষী সেজে বলত, আমার স্বামী নও—তুমি প্রবঞ্চক। আমার স্বামী শত্রুর দিকে পিঠ ফেরায় না—বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, সম্মুখরণে প্রাণ দেয়।

এমনি সব পাঠ তারামণির। পুলিশ এসে ভয় দেখায়: অ্যাক্টিং তো নয়—আগুনের ফুলকি। রাজদ্রোহ ছড়াচ্ছ, ধরে তোমার জেলে পোরা হবে।

নিতান্ত ন্যাকাবোকা তারামণি। বলল, মুখ্যু মেয়েমানুষ হুজুর, বইয়ের কথা মুখস্থ বলি। যেমন ধারা শিখিয়ে দেয়, তোতাপাখির মতন তেমনি আউড়ে যাই। ছাইভস্ম কি বলে এলাম, অর্ধেক কথার মানেই তো বুঝতে পারিনে—

মণিসুন্দরকে পুলিশে জিজ্ঞাসা করে: আপনার এখানে বেছে বেছে কেবল এমনি সব নাটক কেন হয়?

মণিসুন্দর জল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন: এক এক থিয়েটারের এক-রকমের নাম পড়ে যায়। সামাজিক নাটকে জুবিলি থিয়েটার। নবরঙ্গে যায় হালকা নাচগান রংতামাশা যাদের পছন্দ—

ম্যানেজার পাশ থেকে ফোড়ন কেটে ওঠে: আদিরসের বোঁটকা-গন্ধ যার মধ্যে।

মণিশঙ্কর প্রশ্রয়ের সুরে তাড়া দিয়ে উঠলেন: আঃ, ওসব কেন আবার?

ম্যানেজার বলে, সোজাসুজি বলে ফেললাম। চোখ বুঁজে থাকলে কি হয়, সারেরাও না জানেন কোনটা?

মণিসুন্দর পূর্বকথার জের ধরে বলে যাচ্ছেন, আমরাও তেমনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিকে কিছু নাম করেছি। শিবের জটা থেকে

গঙ্গা বেরুনো, বসুদেবের মাথায় ছাতার মতন বাসুকীর ফণা মেলে ধরা—রকমারি সিনসিনারি, নন্দনকানন, মোতিমহল শিশমহল, নবাব-বাদশা বেগম-বাঁদী এই সমস্ত দেখতে লোকে আসে এখানে। দেখে হাসিখুশিতে ফিরে যায়।

ছেঁদো কথায় পুলিশ-অফিসার ভোলে না, ঘাড় নাড়ে: শুধু এইটুকু নয় মশায়, সাজগোজ আর গঙ্গাবতরণের চমক ছাড়াও ভিতরে ভিতরে শয়তানি খেল আছে। জীবনভোর বিস্তর খোয়াব হয়েছে, এখন এই শেষ বয়সে আবার কোনও ঝঞ্ঝাটে না পড়েন!

মণিসুন্দর নিরীহভাবে বলেন, ঝঞ্ঝাটে পড়ব না বলেই তো ভেবে-চিন্তে এই লাইনে আসা। বাজারের নচ্ছার নোংরা মেয়েমানুষ নিয়ে আমাদের কাজকারবার—পুণ্যবানেরা তো থিয়েটার-বাড়ির পথটা পর্যন্ত কাউকে দেখাতে নারাজ। আবর্জনা-আঁস্তাকুড় বলে হ্যাক-থু করেন তাঁরা। আপনাদের কিন্তু সার ঘেন্না নেই—হয়তো-বা আমারই নামের গুণে। যেদিন যমালয়ে যাব, পিছন পিছন সেই অবধি আপনারাও চর পাঠাবেন, বুঝতে পারছি—

ছি-ছি, ভুল ধারণা।—অফিসার প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল: আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমরা। ভ্রান্ত পথ বটে, তাহলেও দেশের মঙ্গল ভেবেই সারাজীবন আপনি কষ্ট করেছেন। নতুন ব্যবসায় নেমেছেন, সোজাসুজি তাই নিয়ে থাকুন—যে ক'টা দিন পরমায়ু আছে, সুখশান্তিতে কেটে যাক। কথা দিচ্ছি, কখনো পুলিশ উৎপাত করতে যাবে না। দরকারে বরঞ্চ সাহায্যই পাবেন।

মৃদু হেসে মণিসুন্দর বললেন, বটে!

ম্যানেজার বলে, সোজাসুজি ব্যবসা কাকে বলছেন সার, বুঝতে পারলাম না।

অফিসার বলল, নবরঙ্গ করছে জুবিলি করছে—আপনারাও তেমনি করুন। তাদের কোন হাঙ্গামা নেই, আপনাদেরই বা কেন হবে?

মুখফোঁড় ম্যানেজার বলে উঠল, মোটা সরকারি মাসোয়ারাও পায় নাকি, নবরঙ্গের নামে বাজারে গুজব।

বাজে কথা, সরকারের টাকা সস্তা নয়। পুলিশ-অফিসার উড়িয়ে ছিল একেবারে। ঈষৎ ইতস্তত করে বলে, তবে মণিবাবুর কথা আলাদা। সারাজীবন নানান শাস্তি-ভোগ হয়েছে, এখন যাতে আরামে থাকতে পারেন, সকলেরই সেটা দেখা উচিত। আমি বলি, নবরঙ্গের মতো আপনারাও নির্ঝঞ্ঝাটের পথ ধরুন। সুপথে ফিরেছেন বুঝলে সরকারের সর্বরকম সহযোগিতা পাবেন।

মণিসুন্দরের একমাত্র ছেলে সত্যসুন্দর তখন বয়সে যুবা। বাপের থিয়েটারে আসেন যান, অল্পসল্প শিক্ষনবিশি করেন। অফিসার বিদায় হয়ে গেলে একগাল হেসে বাপকে বললেন, তোমাকেও শোধরাতে চায় বাবা।

মণিসুন্দর বললেন, পারলে তো ভালই হত। থিয়েটার নিয়ে ঝামেলা থাকত না। হল খা-খা করুক যাই হোক, তাকিয়েও দেখতাম না। নাটকের ক্ষমতা ওরা জানে। চাক্ষুষ আবেদন—চোখের সামনে ঘটে, বুকের পরতে পরতে বসে যায়। ছাপা বই কিম্বা মুখের বক্তৃতা এর ধারে-কাছেও দাঁড়াতে পারে না। খবর আছে, আই-সি-এস'কে মাথায় বসিয়ে এর জন্য আলাদা এক গুপ্ত ডিপার্টমেণ্ট হয়েছে। তা-বড় তা-বড় লেখক দিয়ে তারা ফরমায়েস মতন মাল বানায়, 'আর্টস ফর আর্টস সেক' বুলি কপচে লেখক পকেট-ভরতি টাকা নিয়ে নেয়। ছাপা হয়ে সেই সমস্ত ছেলে-বুড়োর হাতে হাতে ঘোরে, নাটক হয় সেই মালে, সিনেমা-ছবি হয়।' মানুষ আয়েসি ইন্দ্রিয়পর অপদার্থ খয়ের-খাঁ হয়ে গেলে স্বদেশিরা আর তখন পাত্তা পাবে না, জেল-ফাঁস না দিয়েও নির্গোলে তারা নিশ্চিহ্ন হবে। সরকার হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

পুলিশ বুঝল, এ বড় শক্ত ঠাঁই। নবরঙ্গ থিয়েটার এবং আর বিশ-পঞ্চাশটা ক্ষেত্রে (নাম জেনে কাজ নেই, স্তম্ভিত হবেন।

দেশহিতৈষী বলে জেনে বসে আছেন, তাই থাকুন না।) যা হয়েছে, রুবি থিয়েটারে তা কোনক্রমে সম্ভব হবে না। অতএব আদা-জল খেয়ে লাগল তারা। জরিমানা কত বার যে হল, গোণাগণতি নেই। মণিসুন্দর সঙ্গে সঙ্গে টাকা জমা দিয়েছেন। বিস্তর খাটাখাটনি ও খরচখরচা করে নতুন বই খুললেন, পাঁচ-সাত রাত্রি হতে না হতে সে বই বন্ধ করে দিল। এমন অনেকবার হয়েছে। এত খেসারৎ দেবার পরেও লোকসান নেই, রুবি বরঞ্চ ফেঁপে উঠছে। লোকে যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। রুবি থিয়েটারে নতুন বই খুলেছে—বাজারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়ঃ তাড়াতাড়ি দেখে আসি চল—পুলিসে কবে আবার বন্ধ করে দেবে। কাউন্টারে খদ্দের সামলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার—টিকিট বিক্রি দেখতে দেখতে শেষ। 'হাউস-ফুল' বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। নাছোড়বান্দা দু-একজন তবু কাকুতি-মিনতি করে, বাড়তি চেয়ার দিয়ে কোনরকমে একটু জায়গা করে দিন। কিংবা, না-ই বা দিলেন চেয়ার—টিকিট দিন, দাঁড়িয়ে দেখব।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশি-যাত্রা—পাশাপাশি রুবি থিয়েটারের নাম। জুবিলি হিংসায় বাঁচে না। বলে, পুলিসের কারসাজি। মণিসুন্দরবাবু ওদের মোটারকম খাওয়ান। রুবিতে কি বলল না বলল—শুঁক-শুঁক করে পুলিসে গন্ধ শুঁকে বেড়ায়, আমরা স্টেজে ঝড় বইয়ে দিলেও ফিরে তাকাবে না। আমাদের হলে তাই ছুঁচোয় ডন কষে, আর ওরা এক্সট্রা-চেয়ার দিয়ে দিয়ে কূল পাচ্ছে না।

•

পুলিসের বিষনজর—আবার প্রাজ্ঞ পণ্ডিতজনেরাও কালে-ভদ্রে দেখতে গিয়ে নিন্দেমন্দ করেনঃ পৌরাণিক নাটক ঐতিহাসিক নাটক বলে বিজ্ঞাপন ছড়ায়—আসলে দশটা বিশটা পুরাণ-ইতিহাসের নাম ও ঘটনার ছায়া, বাকি সমস্ত কল্পনার খেলা। তখন 'বঙ্গকেশরী' নাটক অন্য সব থিয়েটার কানা করে দিয়ে সাংঘাতিক রকম চলছে। রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। বাঘা ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ সরকার

এলেন একদিন। ড্রপ পড়তেই ফুঁসতে ফুঁসতে তিনি গ্রীনরুমে ঢুকলেন। 'আসুন' 'আসুন' করে উঠে দাঁড়াল সকলে। চা আনতে ছুটল।

গোঁফজোড়া টেনে খুলে প্রতাপাদিত্য এসে শুধাল: কেমন লাগল?

রাবিশ! নাট্যকারের ঠিকানাটা দিন, তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

নাট্যকার সেদিন থিয়েটারেই ছিলেন। উপরের অফিসঘরে। খবর পেয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়ালেন।

অনিরুদ্ধ বলেন, প্রতাপাদিত্যের এই ইতিহাস কোথায় পেলেন আপনি?

রামরাম বসুর বইয়ে যেটুকু পাওয়া যায়। বাকি সব দরকার মতন বানিয়ে নিতে হল।

প্রতাপাদিত্যের মা মহারাণী সৌদামিনী?

ওটা সম্পূর্ণ বানানো।

অনিরুদ্ধ বলেন, নাটকের সেরা চরিত্র বলতে গেলে ঐ। আগাগোড়া সেটি কল্পনার জীব?

নাট্যকার বলেন, সেরা-অ্যাকট্রেস তারামণি—থিয়েটারের ভিড় তাঁরই জন্যে। ঠিক মতন তাঁকে খাটিয়ে নিতে হবে, তেজস্বিনী মা তাই একটা দরকার হয়ে পড়ল। মণিবাবু মুখে মুখে বলে গেলেন, ডায়ালোগগুলো আমি সিনে সিনে খাপ খাইয়ে বসিয়েছি।

আরে সর্বনাশ!—অনিরুদ্ধ শিউরে উঠলেন: এই জিনিস আপনারা ঐতিহাসিক নাটক বলে ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছেন!

স্বত্বাধিকারী মণিসুন্দর কোন দিকে ছিলেন, এমনি সময় এসে পড়লেন: কি বলছেন সার?

বানানো গল্প আপনারা ইতিহাস বলে চালাচ্ছেন। কাজটা ক্রিমিনাল—তা জানেন?

হো-হো করে মণিস্মুন্দর উচ্চহাসি হাসলেন। বলেন, গালিটা নতুন নয় সার। ইংরেজও বরাবর আমাদের এই বিশেষণ দিয়ে এসেছে।

অনিরুদ্ধ বলেন, প্রতাপাদিত্য নিয়ে নাটক করেছেন, কিন্তু ইতিহাসের প্রতাপাদিত্য কি এই?

মণিস্মুন্দর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে দিলেন: আজ্ঞে না—

তবে?

মণিস্মুন্দর বললেন, গরজে পড়ে করতে হল। বীররসের নাটকে কেবল সিংহমশায়দের প্রতাপ। প্রতাপসিংহ ভীমসিংহ রাজসিংহ— রাজপুতবীরের ছড়াছড়ি। থিয়েটার দেখে আমাদের বাঙালিরা। মতলব হল, বাঙালি বীর নিয়ে একটা নাটক ফাঁদতে হবে।

তাই বলে এই? মিথ্যেমিথ্যি কত গুণ চাপিয়েছেন আপনারা প্রতাপাদিত্য আর তার কাল্পনিক মায়ের ঘাড়ে।

মণিস্মুন্দর তবু লজ্জা পান না। বলেন, মিথ্যে বই আমাদের কোনটা সত্যি বলুন তো? পর্দা টাঙিয়ে দেখাচ্ছি অরণ্য, পর্দা তুলিয়ে তার উপর আলো ফেলে দেখাচ্ছি নদীর ঢেউ। থিয়েটারে যাঁরা আসেন, মিথ্যের জন্য তৈরি হয়েই আসেন তাঁরা।

অবশেষে অনিরুদ্ধ সন্ধিস্থাপনা করে বললেন, ঐতিহাসিক কথাটা তুলে দিন, তার পরে কিছু আর বলতে যাব না। লোকে জানুক কল্পনার জিনিস। ডায়ালোগ চরিত্র তার পরে একই থাকুক—আমার বিশেষ আপত্তি নেই।

এক থাকলেও অনেক ফারাক সার। কল্পনার গল্প মাটি পায় না, বাতাসে ভাসে। কমবয়সি ছেলে-মেয়ে অনেক আসে, ঝুটো ইতিহাসকেই সাচ্চা জেনে বুক ভরে আত্মবিশ্বাস নিয়ে যায় তারা— এই বাংলার মাটির উপরেই এমনিধারা হতে পেরেছে তো এখনকার আমলেই বা না-হবে কেন? বানানো গল্প জানলে অত বেশি আপন করে নিতে পারবে না।

অনিরুদ্ধ বিরক্ত সুরে বলেন, কমবয়সি ছাড়াও তো আসে। আপনাদের 'বঙ্গকেশরী' দেখে জ্ঞানবুদ্ধি সব গুলিয়ে যায়।

মণিসুন্দর হাসেন: সুবিধে আছে সার, জ্ঞানী লোকে ঘেন্নায় এ-মুখো বড় হন না। যারা দেখতে আসে, ঝুটো-সাচ্চার তফাত তারা বোঝে না। ঝুটো 'বঙ্গকেশরী'ই, দেখতে পাচ্ছেন, বাজার একেবারে মাত করে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে গেলেন। যা বলেছেন মণিসুন্দর—'বঙ্গকেশরী'র জয়-জয়কার। থিয়েটার মহলে বহুকাল এ রকম শোনা যায় নি। গোড়ার তিনটে চারটে অভিনয় থেকে চাউর হয়ে পড়ল—তারপর আজ সাত মাস ধরে শনি ও রবিবার একনাগাড়ে হাউস-ফুল যাচ্ছে—

উঁহু, ভুল বললাম—মাঝের একটা শনিবার শুধু বাদ। টিকিট প্রায় সব বিক্রি হয়ে হাউস সেদিনও গম-গম করছিল। কিন্তু তারামণি গরহাজির। তারামণির বদলে শৈলবালা অগত্যা রাজমাতা সৌদামিনীর পাঠ করবে। কিন্তু ছাগলের পায়ে যদি ধান পড়ত, কী না হত তবে! বৃত্তান্তটা চাউর হয়ে যেতে বক্স-অফিসে দলে দলে টিকিট ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। অত বড় প্রেক্ষাগৃহে সাকুল্যে জন পঁচিশেক টিম-টিম করছে এখন। মণিসুন্দরকে তারামণি বাবা বলে—তাঁরই আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে সে।

সকলের মন খারাপ। ম্যানেজার লোক পাঠিয়েছিলেন তারামণির আস্তানায়। হঠাৎ আজকে সে আদি-বৃত্তিতে নেমে পড়েছে। মস্তবড় মহফিল। চার-পাঁচটা শৌখিন বাবু এসে জুটেছে —নাচ-গান-হল্লা চলছে, মদের ফোয়ারা উঠে যাচ্ছে। যে ডাকতে গিয়েছিল, তাকে যাচ্ছে-তাই করে শুনিয়েছে: থিয়েটারের কাজ বলে কি একটা দিন দেহের ভাল-মন্দ হতে নেই? যাব না, বলে দাও গে—তাতে চাকরি থাকুক কিংবা চলে যাক।

তার মানে এখন তার স্বাভাবিক অবস্থা নেই—থাকলে এমন সব কথা মুখে বেরুত না। জোরজার করে এনে স্টেজে দাঁড় করালেও রাজমাতার পাঠ বলা আজ রাত্রে তার ক্ষমতার বাইরে। মণিসুন্দর ক্ষেপে গেছেন: একশো টাকা ফাইন করলাম। টাকা নগদ দিয়ে পায়ে ধরে মাপ চাইবে, তবে ওকে স্টেজে উঠতে দেব।

হাঁকডাক করে বললেন মণিসুন্দর। সকলে প্রমাদ গণে। ফাইনের পরিমাণটা কিছু নয়। কিন্তু অত বড় আর্টিস্টের পক্ষে ঘোরতর অপমান। কানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তারামণি ইস্তফা দেবে। আর জুবিলি থিয়েটার মুকিয়ে আছে, বেশি টাকা কবুল করে দলে টানবে।

মণিসুন্দর নিরুদ্বেগ: যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। তা বলে বেলেল্লাপনা বরদাস্ত করব না। তারামণি ছাড়া থিয়েটার না চলে তো তুলে দেব থিয়েটার।

কিছুই না, ভয়-ভাবনা একেবারে মিছে। পরের দিন থিয়েটারে এসে তারামণি ফাইনের টাকা গণে গণে মণিসুন্দরের হাতে দিল। পা ছুঁয়ে শতেকবার মাপ চাইছে: কখনো আর এমন কাজ করবে না। সকলের সামনেই করছে এ সব—তারা তো অবাক: মেয়েমানুষটার গায়ে বোধহয় মানুষের চামড়া নয়, গণ্ডারের চামড়া। অপমান চর্ম ভেদ করে মর্ম অবধি পৌঁছয় না। ফূর্তি-ফার্তি অধিকন্তু যেন বেড়ে গেল মণিসুন্দরের মার্জনা পেয়ে।

থিয়েটারের তহবিলে ফাইনের একশো টাকা যথারীতি জমা পড়ল। তারামণিকে তারপর আলাদা ভাবে ডেকে নিজের ব্যাগ থেকে মণিসুন্দর একশো টাকার ছুটো নোট বের করলেন।

অবাক হয়ে তারামণি শুধায়: ডবল করে দিচ্ছেন কেন বাবা?

ফাইনের টাকা ফেরত একশো টাকা। আর একশো টাকা তোর অভিনয়ের শিরোপা। স্টেজের উপর অভিনয় করিস, বাড়ির অভিনয় তার অনেক বেশি উতরেছে।

তারামণি বলে, অভিনয়ে টাকা নেওয়া আমার পেশা। কিন্তু কাল রাত্রের কাজও যদি পেশার মধ্যে ফেলি, আমার যে পুণ্যটুকু হয়েছে তা বিক্রি করা হয়ে যাবে।

একটা নোট ফেরত দিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে তারামণি বলে, শিরোপা বলে যা দিচ্ছেন, আমি তা নেব না বাবা।

আজ বলতে বাধা নেই—পুলিশ জালে ঘিরেছিল, কোন রকমে ছেলেটার বেরুনোর আর উপায় ছিল না। ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মাছিটাও গলে বেরুবে হেন সম্ভাবনা নেই। তারই ভিতর তারামণির ঘরে একদল পাঁড় মাতাল সারারাত হুল্লোড় করেছে—সকালবেলা বোতল বগলে প্রকাশ্যভাবে টলতে টলতে বেরিয়ে থার্ড-ক্লাসের ঘোড়ার-গাড়ি খান তিনেক ভাড়া করে চলল। পুলিস ভাল মতন জানে এগুলোকে—পয়লানম্বুরি লুচ্চো বড়ঘরের বয়াটে ছেলে সব। তার মধ্যে একটা যে ভেজাল সেঁধিয়েছে, আলাদা করে তাকে বেছে নেবার তাগত পুলিসের হল না। চাঁদপালঘাট থেকে জাহাজে চেপে দরিয়ায় ভাসল সে। মণিসুন্দর যে যৎকিঞ্চিৎ খেল দেখিয়েছিলেন তারামণির সহায়তায়, এ বৃত্তান্ত কোনদিন কেউ জানল না। রসিক নাগর রূপে সারারাত ছেলেটা হুল্লোড় করেছে, সকালবেলা যাবার মুখে মা বলে তারামণির পায়ের গোড়ায় ঢুম করে এক প্রণাম: যাচ্ছি মা এবার।

এসো—। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে তারামণি কেঁদে ফেলল: যখনই দরকার পড়বে, অভাগিনী মায়ের কাছে চলে এসো বাপধন।

ইংরেজ বিদায় হয়েছে, দিনকাল এখন আলাদা। তারামণি আজও আছে—ধনুকের মতন বাঁকা-দেহ বুড়োথুথুড়ে স্ত্রীলোক। মণিসুন্দর নেই—রুবি থিয়েটার নাম বদলে মণিসুন্দরের নামে মণিমঞ্চ হয়েছে। একমাত্র স্বত্বাধিকারী মণিসুন্দরের ছেলে সত্যসুন্দর চৌধুরি। সত্যসুন্দরেরও বয়স হয়েছে বেশ।

॥ দুই ॥

'উঁকিঝুঁকি'—সাপ্তাহিক পত্রিকা। নানান রঙের ছবি ছাপে, যাচ্ছেতাই সব গল্প বানায়। সত্যি তার মধ্যে রতি পরিমাণ, বাকি সব পাঠক- বিশেষ করে পাঠিকা-পছন্দ রংদার বানানো মাল। গল্প বলা হয় আকারে-ইঙ্গিতে—আলো-আঁধারিতেই রোমান্স জমে ভাল। খদ্দেরের কাছে উঁকিঝুঁকি মুড়ি-মুড়কি-তেলেভাজার মতো কাটে।

লেখক সম্পাদক মুদ্রাকর স্বত্বাধিকারী বিনোদ সমাদ্দার—একাধারে সমস্ত। এই বিনোদই সেকালে 'শঙ্খধ্বনি' চালাত। কলমে আগুন ঝরত তখন। ভণ্ড নেতারা তটস্থ। কাগজ বেরুতে না বেরুতে অনুবাদ হয়ে চলে যেত লাটসাহেব অবধি। ফলে জেলের পর জেল—এই বেরুল, ছুটো চারটে মাস যেতে না যেতেই আবার ধরে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার পরে ঝামেলা চুকল, 'শঙ্খধ্বনি' উঠে গেল। বিনোদ উদ্বাস্তু। এক ছড়া লিখে 'শঙ্খধ্বনি'র অন্তিম সংখ্যায় সে ছেপেছিল :

> যাদু, এ তো বড় রঙ্গ, এ তো বড় রঙ্গ,
> ন্যাজা মুড়ো কেটে দেশ করিল ত্রিভঙ্গ।
> কাটুনিরা বঁটি ছেড়ে মসনদে চড়ে—
> উদ্বাছ উদ্বাস্তুগণ জয় জয় করে।

এপারে এসে পড়ে, তখনকার যা দস্তুর, সাকিনশূন্য হয়ে ভেসে ভেসে বেড়াল বেশ কিছু দিন। বনেদি নেশা যাবে কোথায়—পুনশ্চ কাগজ। 'শঙ্খধ্বনি'র বদলে 'উঁকিঝুঁকি'। যে কালে যার চাহিদা—কলম আজ নটনটীদের কেচ্ছাকাহিনী প্রসব করছে। খুব জমেছে। টাকা পায়—তারও বেশি পায় খোশামুদি। সিনেমা-থিয়েটার রাজ্যে 'বিনু-দা' 'বিনু-দা' নামে সির্নি পড়ে। মুটিয়ে গেছে দস্তুরমতো, ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে।

কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার দরুন 'চার্বাক' নামে আর একটি লেখক জুটিয়েছে। আসল নাম হেমন্ত কর—নাম যেন প্রকাশ না পায়, খবরদার! মাস্টারি করে সে, 'উঁকিঝুঁকি'তে লেখে জানলে চাকরি সঙ্গে সঙ্গে খতম। হেমন্তর কলমটি খুব ভাল, বিনোদ মুক্তকণ্ঠে তারিপ করে। বলে, শালগ্রাম-শিলা দিয়ে পেঁয়াজ-লঙ্কা বাটাচ্ছি। উপায় নেই, ভাল কাগজে যারা ভাল ভাল লেখা ছাপে, তাদের কোটারির মধ্যে ঢোকা তোমার ইস্কুলমাস্টারি ট্যাঁকে কুলোবে না। তা হলেও কোকিল-বাচ্চা তুমি, কাকের বাসায় থেকে কা-কা চেল্লাচ্ছ—কিন্তু 'কুহু' একেবারে ছেড়ো না। আশা জিইয়ে রাখো, কোন একসময় হয়তো দিন আসবে নিজমূর্তিতে বেরিয়ে পড়বার।

হঠাৎ একদিন বলিল, নাটক লেখো দিকি। মণিমঞ্চের মালিক সত্যসুন্দরবাবুকে আমি নিজে গিয়ে ধরব। বাজার-চলতি রদ্দি মাল নয়—যা আমার তিরিশ বছরের ভাবনা, নাটকে গেঁথে দাও তুমি। নাটকের নাম এখনই বলছি: 'প্রতারক'। ঘটনাও আগাপাস্তলা বলব। মাতব্বরটি সকলের হয়ে মাল গস্ত করতে গিয়েছিল—ফিরল ভূষিমাল নিয়ে—নিজের আখের-ইজ্জত গুছিয়ে, অন্য সকলকে পথের-ফকির বানিয়ে। কিন্তু বোঝে না কেউ—ধিতিং-ধিতিং নাচে, আর মাতব্বরের জয়ধ্বনি করে। হাসি-তামাসার নাটক—হাসবে লোকে, কিন্তু হাসির তলায় কান্না—সে কান্নার পারাপার নেই।

হেমন্ত বলে, আপনি নিজে লিখলে তো হয়—

হবে না। আমার কলম একেবারেই জাত খুইয়েছে। আর খুঁজেপেতে যদিই বা সে-কালের কলমটা নিয়ে বসি, রঙ্গরস বেরুবে না—তিরিশ বছরের জমা আগুন বেরিয়ে পড়বে। আর তার যে কি পরিণাম, বুঝিয়ে বলতে হবে না—

হি-হি করে কেমন এক উৎকট হাসি হেসে ওঠে বিনোদ সমাদ্দার। বলে, ইংরেজ তবু আদালতে তুলে রয়ে-সয়ে জেলে পুরত। এঁরা কাঁচা-খেগো দেবতা, সবুর মানে না, ঘোড়া কি ভেড়া চেয়েও

দেখে না। সঙ্গে সঙ্গে মিসা, বা ঐ জাতীয় কোন বেআইনি আইন। তারই হাত ধরে পাতাল-প্রবেশ। ছুনিয়া অন্ধকার।

হেমন্ত ইতস্তত করে বলে, আপনি যা পারবেন না, আমি পারব?

লিখবে, কাটবে, আবার লিখবে। আমি তো পাশেই আছি। না যদি পারো, আমিই লিখব তখন। লিখে স্টিলের কৌটোয় করে মাটিতে পুঁতে রাখব। বলে যাবো, মরার পঞ্চাশ বছর বাদে বের করো। মওলানা আজাদ যেমন করেছেন। ততদিনে হয় তো দিনকাল বদলাবে।

উঁকিঝুঁকির কাছে নানা জনের রকমারি নালিশ, এবং আবদারও। অফিসে এসে পড়ে। গোড়ায় গোড়ায় চার্বাক অর্থাৎ হেমন্ত তো ভয়ে কাঁটা। লেখে কুৎসা-কেলেঙ্কারি—বেশির ভাগই ডাহা মিথ্যে (মজাদার গরমাগরম সত্যি নিত্যিদিন মেলে কোথায়?)। চ্যাংড়া-চিংড়িরা তো হুড়মুড় করে ঢুকে যায়—ক্রোধবশে হয়তো-বা পায়ের স্লিপার হাতে নিয়ে, এবং যেহেতু হেমন্তর চেয়ার দরজার পাশেই—হাতের মাথায় তার পিঠখানা পেয়ে চটাস-চটাস শব্দে দিল ঘা কতক বসিয়ে! অন্যত্র হুবহু এই ঘটেছে—কাগজে আন্দোলনও হয়েছে এমনি ঘটনা নিয়ে।

দেখেশুনে তারপরে হেমন্ত নির্ভয় হল—না, এ কাগজের অফিসে আগন্তুকদের মারমুখী কেউই নয়। প্রতিবাদ আসে সামান্য দু'চারটে—ডাকযোগেই প্রায় সব। সশরীরে যারা এসে পড়ে, তাদের বরঞ্চ উল্টো রকম দরবার। কুৎসা যথোচিত প্রকট হয় নি, শ্লেষ বক্রোক্তি এবং ভাষার কারিকুরির চোটে আসল বস্তু তলিয়ে গেছে—এমনি ধরনের নালিশ। নতুন মালমশলাও দিয়ে যায় অনেকে, আগামী লেখা যাতে অধিক রংদার হয়ে ওঠে।

নতুন নাটক নিয়ে অতঃপর মণিমঞ্চের সঙ্গে হেমন্তর যোগাযোগ ঘটেছিল। উঁকিঝুঁকিতে যারা দরবারে যেত, তাদের তিনজনকে

অন্তত ওখানে সে চিনতে পারল। একজন শান্তিলতা। বিশাল দেহ নিয়ে বিনু-দা যথারীতি জাঁকিয়ে আছেন। হেমন্ত নিজ টেবিলে প্রুফ দেখছে। কথাবার্তা শুনে সে সকৌতুকে একবার মুখ তুলে শান্তিলতাকে দেখছে। প্রুফ দেখা ভণ্ডুল হয়ে যায়। শান্তিলতা বলছে, আমায় নিয়ে লিখুন দাদা।

আপনার কি আবার?

শান্তিলতা ফিক করে হেসে পড়ল: মুখ ফুটে বলাই তো মুশকিল।

বিনোদ উৎসাহ দেয়: বলুন, বলুন—অদ্দূর থেকে তোড়জোড় করে বলার জন্যই তো এসেছেন।

মানে, নতুন কিছু নয়। আমাদের বয়সের মেয়েদের নিয়ে যা সমস্ত করে—

[বয়সটা কত শুনি? বিস্তর কসরৎ করেছ, স্নো-পাউডার মেলা খরচা হয়েছে, বয়সের দাগ চন্দ্রাননে তবু যে দিব্যি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ষোলআনা সামলাতে পারলে কই?—হেমন্তর স্বগত উক্তি।]

বিনোদও হাসি চাপছে। উদ্বেগের ভাব দেখিয়ে বলে, কি হয়েছে, খুলে বলুন।

ছোঁড়াগুলো পিছু লেগেছে। অকথা-কুকথা বলে আমার উদ্দেশ করে। গায়ের উপর চিঠি ছুঁড়ে দেয়।

[চিঠি তোমার গায়েও—হায় অদৃষ্ট। কলকাতা শহরে স্ত্রীলোকের আকাল পড়ল নাকি?—হেমন্ত এই সব ভাবছে।]

শান্তিলতা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলছে, পথে বেরুনো দায় হয়ে পড়েছে। আপনার কাছে এলাম দাদা, বদমাসগুলোকে আচ্ছা করে ঠুকে দিন।

একই সুরে বিনোদ বলে, কলমে ঠুকলে জানোয়ারে জব্দ হয় না দিদি। লাঠি লাগে। পুলিসের কাছে যান, ধরে আগাপাস্তালা ধোলাই দেবে—

[দাদা-দিদি নিয়েই দেখছি দিব্যি লড়ালড়ি এঁদের—কে বড়, কে কার দাদা অথবা দিদি ?]

বিনোদ বলছে, ধোলাই খেয়ে দিব্যজ্ঞান পাবে। যে রোগের যে ওষুধ। তারপরে শত হস্তেন বাজিনঃ—আপনার স্বরূপ বুঝে নিয়ে একশো হাত দূরে দূরে চলবে ছোঁড়ারা।

তবু নাছোড়বান্দা শান্তিলতাঃ বলেন তো নালিশগুলো আমি আপনার কাছে লিখে রেখে যাই। যে-সব উৎকট প্রস্তাব দিয়ে চিঠি ছুঁড়ে মারে, তারও দু-পাঁচটা দিয়ে যাব। এত লোক নিয়ে এত সব লিখছেন, আমায় নিয়েও লিখুন কিছু।

বিনোদ বোঝাচ্ছেঃ আমার কাগজে বেরুলে প্রতিকার হবে না, উৎপাত বেড়ে যাবে বরঞ্চ। এই মানুষকে এত জনে জ্বালাতন করছে, আমি কেন পারব না, আমিই বা কম রোমিও হলাম কিসে ?

তা হোক, উঁকিঝুঁকিতে বেরিয়ে তো যাক। তারপরে দেখা যাবে।

আরও বিস্তর বলে-কয়ে উৎকট প্রেমপত্রের বাণ্ডিল পাঠাবে শাসানি দিয়ে শান্তিলতা বিদায় হল।

বিনোদ বলে, ছাড়বে না, মরীয়া হয়ে লেগেছে। ক'টা দিন আপাতত নিশ্চিন্ত—লোক ধরে ধরে জবর প্রেমপত্র বানানো চলবে এখন। দেখা যাক কি আসে। কিছু না ছেপে রেহাই নেই, বুঝতে পারছি।

পাশের খোপে চায়ের সরঞ্জাম। জল চাপানো হয়েছিল, বাইরের একজন এসে পড়ায় ভৃত্য দেরি করছিল। শান্তিলতা চলে যাবার পর চা বানিয়ে এনে দিল—কাপে চা, প্লেট দুটোয় সন্দেশ ভরতি।

হেমন্ত অবাক হয়ে বলে, সন্দেশ কোথায় পেলি হরেকেষ্ট ?

উনিই তো আনলেন। বাক্সটা আমার হাতে দিয়ে তারপরে ঘরে ঢুকেছিলেন।

বিনোদ হাসতে হাসতে বলে, নাঃ, লিখতেই হবে। প্রেমপত্র আসুক বা আসুক সন্দেশের উপর নিমকহারামি করতে পারব না—

হেমন্তর দিকে তাকিয়ে বলে, শেষ চেষ্টা! শত কসমেটিকেও কুলোচ্ছে না। এখন যা করে উঁকিঝুঁকি। সন্দেশের বাক্স নিয়ে সুপারিশ ধরেছে।

হেমন্ত মানে বোঝেনি, ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

বিনোদ বলে, মণিমঞ্চে এখন মাসি-পিসি সাজে—রংতামাশা করে। তার মানে, বয়স হয়ে গেছে আর কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে হয়েছে, কর্তাদের সেটা নজরে পড়ে গেছে। এর পরেই আসবে ঝিয়ের পার্ট। তার কিছু পরেই অবসর—মঞ্চের উপর প্রবেশ-নিষেধ। সেইটে যদি খণ্ডন হয়।

হেমন্ত শুধায়: মস্তান ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

ছোঁড়া-টোড়া বানানো—এটা বুঝলে না? আসল হল, উঁকিঝুঁকিতে কিছু রসালো গল্প আর প্রেমপত্র বেরুনো। তবে তো শান্তিলতার উপর এখনো লোকের নজর ধরে। কমেডিয়ান থেকে হেন ক্ষেত্রে উপনায়িকা-সহনায়িকায় প্রোমোশন পেলেও পেতে পারে। শান্তিলতার শেষ আশা—উপরওয়ালা যদি ধাপ্পায় পড়ে যায়।

উঁকিঝুঁকি-অফিসে মণিমঞ্চের আরও এক আর্টিস্ট একদিন গিয়ে পড়ল। সাধন মজুমদার—কমেডিয়ান বলে তার রীতিমত খ্যাতি। অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তার মানে নাট্য-সমালোচনা লিখতে হবে। এসব কাগজের কাজই এই। ছাপা কার্ড সাধন সসম্ভ্রমে বিনোদের হাতে তুলে দিল।

চাকরি-স্থলে কাজ না থাকলে বাইরের অভিনয়ে বাধা নেই। এই পন্থায় কিছু উপরি-রোজগার। আবার মুফতেও করে—ভিন্ন ধরনের পার্ট করে মুখ বদলানো যায়। তেমনি এক ব্যাপার—নিমতিতা বারোয়ারিতলায় সীতার অভিনয়।

বিনোদ বলে, তোমার কি পার্ট সাধন? ঢাকের মতন মাদুলি ঝুলিয়ে বলবে, আমার এটি মাদুলি নয়—বাবাদুলি, তাই না?

সাধন মজুমদার ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, যেখানে যাই, এমনি সব কথা। বাল্মিকী করব আমি। যাবেন দয়া করে।

বিনোদ বলে, সীতা নাটক ডি. এল. রায়ের আর যোগেশ চৌধুরির। নতুন কেউ লিখেছেন বুঝি বাল্মিকীকে বিদূষক বানিয়ে?

সাধন দুই হাত যুক্ত করে বলে, সেই জন্যেই তো এত করে বলছি। গিয়ে দেখবেন, মনোরঞ্জন ভটচাজের চেয়ে খুব খারাপ হবে না।

বিনোদ বলে, তদ্দূর যাওয়া হয়ে উঠবে না সাধন। অভিনয় করে সুভালাভালি ফিরেছ, খবরটা দিও। তারপরে ঢেলে লিখব তোমার যদি উপকারে আসে। মহর্ষি মনোরঞ্জন ম্লান হয়ে গেছেন, লিখে দেব।

মুখ তুলে সাধনের চকিত প্রশ্ন: ফেরার কথা বলছেন কেন?

মফস্বল জায়গা কিনা। না পছন্দ হলে শহরের মতন সিটি মেরেই সারা করে না। ইট মেরে ধরাশায়ী করে দেয়। স্টেজ থেকে আর্টিস্টকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে তোলে।

সাধন মজুমদার আহত কণ্ঠে বলে—জানেন না সার, পাবলিক থিয়েটারে গোড়ায় গোড়ায় আমি সিরিয়াস পাঠে নামতাম। জুবিলি থিয়েটারের 'পিতাপুত্রে' জনার্দন রায় সেজেছিলাম। কমেডিয়ান নিতাই সাধুর একদিন ধাইপাই জ্বর এল। তখন নতুন গিয়েছি—ম্যানেজার বলল, জনার্দন রায়ের ডুপ্লিকেট আছে। নিতাইয়ের দু-সিনের পাঠটুকু চালিয়ে দাও তুমি—এই চারটে পাঁচটা রাত, তার মধ্যে নিতাই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সাদামাটা জ্বর ভাবা গিয়েছিল, সেখানে টাইফয়েড। খুব বেশি তো পাঁচ রাত্রি, সকলে আন্দাজ করেছিল—সেখানে পাক্কা পাঁচ মাস কাটিয়ে সেরে-সুরে সুস্থ হয়ে নিতাই এল। নিতাইয়ের কমিক পাঠেও খুব জমিয়েছি —ফিরে আমি নিজের পাঠে গেলাম। ইতিমধ্যে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেছে—যা বলি, লোকে হাসে। রেগেমেগে জনার্দন রায়

ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বউ এসে পা জড়িয়ে ধরল তো পায়ের ধাক্কা বউকে। কত যেন রঙ্গরসের ব্যাপার—মুখের কথা শুনতে দেয় না, হাসির হুল্লোড়। ম্যানেজার গ্রীনরুমে ছুটে এসেছে। চোখে আমার জল এসে গিয়েছে তখন—জনার্দন রায়ের গোঁফ আর চাপদাড়ি ছুঁড়ে দিলাম বদ্যিনাথের দিকে, জনার্দন কেড়ে নিয়েছে সে—আমার এত সাধের সাজানো জিনিস। ম্যানেজারও বলল, পরের সিন থেকে তুমিই চালাও বদ্যিনাথ, সাধনকে ঐ পাঠে লোকে আর নিচ্ছে না। পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার বলল, অভিনেতা বৈদ্যনাথ ট্রেন ফেল করে সময়মত পৌঁছতে পারেন নি। আগের সিন অন্যকে দিয়ে চালানো গেছে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এসে গেছেন—ইত্যাদি।

হেমন্তর চোখে-মুখে বুঝি সমবেদনার ভাব দেখতে পেয়েছে। তার দিকে ফিরে সাধন সকাতরে বলে, আমাদের অবস্থা বাইরে থেকে ঠিক আন্দাজে আসে না। কাজ মন্দ হলে কপালও মন্দ, নাটক থেকে বিদায়, চাকরি খতম। কিন্তু উৎকৃষ্ট কাজেরও উৎকট পরিণাম। যেমনধারা আমার হয়েছে—রাতের পর রাত ভাঁড়ামি করে যাচ্ছি। ধরুন, কোন এক নাটকে ঝগড়াটে চরিত্রে কেউ খুব জমিয়ে নিয়েছে। তারপর যে নাটকই হোক, স্টেজে উঠে তাকে কেবল ঝগড়া করতে হবে। নাটকে না থাকলেও ফরমাশ দিয়ে তার জন্য ঝগড়ার দৃশ্য লেখানো হবে। যেন মিষ্টি কথা ভাল কথা তার মুখ দিয়ে বেরুবে না, গলায় আটক হয়ে থাকবে। তেমনি খল চরিত্র যে ভাল করল, সারা জন্ম স্টেজের উপর তাকে ভ্রূ কুঁচকে খল হয়ে বেড়াতে হবে। নায়কে যে একবার নাম করল, বাহাত্তর বছরে পৌঁছেও সে মেকআপ ম্যানকে বলবে সাতাশ বছরেরটি বানিয়ে দাও আমায়। গ্রহের ফেরে আমি ভাই কমেডিয়ান বনে গেছি। কেমন করে রেহাই পাই, এখন আঁকুপাকু করছি। পাবলিক থিয়েটারে ছাড়বে না—বাইরে যা করি, সব জায়গাতেই গুরুগম্ভীর

পাঠ। আপনাদের উঁকিঝুঁকিতে যদি ভালরকম একটু প্রচার পাই, হয়তো-বা ভাঁড়ামি থেকে নিস্তার পেয়ে কোন একদিন ভদ্রলোক হয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচব।

একদিন এক ঝকমকে মেয়ে এসে উপস্থিত। যুবতী, এবং রূপসী দস্তুর মতো। সিনেমা-থিয়েটারের নয়—অফিসে কাজ করত, এখনো করে কিনা জানা নেই—ওভারসীজ মার্কেটিং কোম্পানিতে। নাম জয়ন্তী মিত্তির।

নামটা শুনেই বিনোদ বসুন, বসুন—করে সামনের চেয়ার দেখাল। এবং পাশের খোপের উদ্দেশে হাঁক দিল: চা-টা নিয়ে আয় হরেকেষ্ট। কেবল মাত্র চা নয়, চা-টা। নিজের টেবিলে হেমন্ত ঘাড় নিচু করে প্রুফ দেখছিল, আদেশ শুনে চকিতে ঘাড় তুলে দেখে নিল মেয়েটিকে। বিনোদ খাতির করছে তাকে—মধ্যম রকমের খাতির অবশ্য। হরেকৃষ্ণকে বলার মধ্যে সঙ্কেত আছে। একটা চা তিনটে চা—এই রকম নিরলঙ্কার ভাবে যখন বলবে, শুধুমাত্র চা-ই আসবে, সঙ্গে আর কিছু নয়—কাপের সংখ্যা আদেশ অনুযায়ী এক বা তিন। চা-টা শব্দের অর্থ চায়ের সঙ্গে দুখানা বিস্কুট—জয়ন্তী সম্পর্কে সেই আদেশ হল। আর যখন বলা হবে, চা দিয়ে যাও হরেকৃষ্ণ—বিশেষ সম্ভ্রমশালীর আগমন হয়েছে, বুঝবে তখন। পাশের দোকান থেকে একখানা সিঙাড়া ও একটি রসগোল্লা চায়ের সঙ্গে যোগ হয়ে আগন্তুকের সামনে আসবে।

জয়ন্তী মিত্তিরের নাম ও কেচ্ছা-কাহিনী কিছু কিছু জানা আছে—মুখোমুখি এই প্রথম। সুবিখ্যাত অভিনেতা প্রেমাঞ্জনকে জড়িয়ে রসালো রটনা—ব্যাপার সামান্য নয়—আর এই সমস্ত নিয়েই তো উঁকিঝুঁকির কাজকারবার। চা-টার অর্ডার দিয়ে নিজ চেয়ারে বিনোদ আসন-পিঁড়ি হয়ে বসল: বলুন—

বলবে কি জয়ন্তী, কেঁদেই আকুল। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে

বলতে হয় তবু দু-এক কথা। স্বামী তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বেধড়ক পিটুনি দেয় কথায় কথায়—সর্বাঙ্গে কালশিরে বটে গেছে। গা খুলে দেখানো যায় না যে—দেখলে ঠিক ক্ষেপে যেতেন।

অপরাধটা কি?—বিনোদ শুধায়।

জয়ন্তী বলে যাচ্ছে, প্রেমাঞ্জনের কথা আপনার কাছে কি বলব। তাঁর নামযশের মূলে তো আপনি। আমাদের অফিসেই কম মাইনের সামান্য কেরানি ছিলেন—পজিসন আমারও অনেক নিচে। মণিমঞ্চের সঙ্গে আপনিই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। আজ তাঁর জয়জয়কার। নটাধিরাজ বলে সকলে। তাঁর অভিনয় আমার দারুন ভাল লাগে।

কথা যাতে সংক্ষেপে শেষ হয়—বিনোদ মাঝখান থেকে প্রশ্ন করল: অপরাধ এই? তা হলে আপনি তো একা নন—কলকাতা শহরের অন্তত অর্ধেক মেয়ে-বউ এই অপরাধে অপরাধী।

ম্লান হেসে জয়ন্তী বলল, আমার হল ডবল অপরাধ—শাখের করাতের মতো দু-দিকে কাটছে। প্রেমাঞ্জনের অভিনয় আমার ভাল লাগে। তেমনি আমার অভিনয়ও প্রেমাঞ্জন বড় পছন্দ করেন।

বটে!—সবিস্ময়ে বিনোদ তাকিয়ে পড়ল: আপনি অভিনয় করেন নাকি? উঁকিঝুঁকির এডিটার হয়েও এ খবর তো কানে যায় নি!

যেতে দিলে তো! সেই তো দুঃখ আমার। দেহের মার মারছে, আর মনের দিক দিয়ে একেবারেই মেরে ফেলছে আমার। দেহে কালসিটে, মনও কালি-কালি হয়ে গেছে।

জয়ন্তী কেঁদে পড়ল। চোখে জল গড়াচ্ছে। আঁচলে জল মুছে কিছু শান্ত হয়ে আবার বলে, অফিসের ড্রামাটিক ক্লাব বলতে গেলে প্রেমাঞ্জনের সৃষ্টি। চাকরি ছেড়েছেন, কিন্তু ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়েননি। পাঠ বিলি থেকে শুরু করে প্রতি জনকে ধরে ধরে

শেখান। এমেচার মহলে ওভারসীজ ক্লাবের সেইজন্য এত নাম। ও-বছর 'রানী দুর্গাবতী' হয়েছিল—রানী দুর্গাবতীর পাঠ প্রেমাঞ্জন আমাকেই দিলেন।

প্রেমাঞ্জনের ধরাধরিতে গিয়েছিলাম বটে 'রানী দুর্গাবতী' দেখতে। সত্যিই ভাল হয়েছিল। কিন্তু দুর্গাবতী কি আপনি সেজেছিলেন?

স্মৃতি মন্থন করে বিনোদ ঘাড় নাড়ল: আপনি নন—যদ্দুর মনে পড়ছে, কুসুমলতা—

শেষ পর্যন্ত ঐ কুসুমলতা। প্রেমাঞ্জনের সঙ্গে নাকি আসনাই আমার, জোড়ে খুন করবে আমাকে আর প্রেমাঞ্জনকে—স্বামী এই সমস্ত তড়পে বেড়াতে লাগল। প্রাণের দায়ে দুর্গাবতীর পাঠ ছুঁড়ে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে একেবারে লক্ষ্ণৌ জামাইবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠতে হল। কুসুমলতারা হল ভাড়াটে প্লেয়ার—ক্লাবের অভিনয়ে ওদের কাউকে আনবেন না, প্রেমাঞ্জন পণ করেছিলেন। আমায় না পেয়ে শেষমেশ ঐ কুসুমের হাতে-পায়ে ধরে নগদ একশো টাকা কবুল করে তাকেই দুর্গাবতী সাজিয়ে নামালেন। সুযোগ আমার মুঠোর মধ্যে এসেও ফসকে গেল—

কথার মাঝে গর্জে উঠল জয়ন্তী: আমার ঐ দুশমনটার জন্য। স্বামী বলিনে—দুশমন। সম্পর্ক কাটিয়ে সেই থেকে আলাদা থাকি।

বিনোদ লুফে নিয়ে বলে, খাসা করেছেন। যেমন কর্ম তেমনি ফল। বুঝুন এইবারে বাছাধন, স্ত্রী মানে খেলার পুতুল নয়—তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করা চলে না।

জয়ন্তী অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, আপনি কিছু লিখবেন না? আপনার কলমে হীরের ধার।

লিখব না মানে?—বিনোদ আকাশ থেকে পড়ল: কাজই তো আমাদের এই—গোপন কুচ্ছোকথা বাইরে চাউর করি দেওয়া। ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে গুহ্য খবর টেনে বের করি, কাগজের নাম তাই

উঁকিঝুঁকি। আপনি এসে পড়ে আমাদের কাজটা এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

পরমাগ্রহে জয়ন্তী প্রশ্ন করে: কবে বেরুবে?

শুক্কুরবারে কাগজ বেরুবে, সেই সংখ্যাতেই কিছু পাবেন। তারপর হপ্তায় হপ্তায় পেতে থাকবেন। যা বললেন, মোটামুটি এই সমস্ত—কিছু কিছু রংদার মশলা-মেশানো। আপনি চলে গেলেই দরজা ভেজিয়ে কলম নিয়ে বসব।

চা-বিস্কুট শেষ। অতএব নিজ স্বার্থেই জয়ন্তী এবার উঠল। ট্যাক্সি সেই থেকে রাস্তায় অপেক্ষা করছে। কথা বলতে বলতে বিনোদ এগিয়ে দিচ্ছে। অফিসের বাইরে আমাকেই জয়ন্তী খপ করে হাত জড়িয়ে ধরল: একটা দরবার—

একগাল হেসে বিনোদ বলে, হাত ছেড়ে মুখেই বলুন না।

মণিমঞ্চের কর্তা সত্যসুন্দরবাবু আপনাকে বড় খাতির করেন। আমার কথা তাঁকে একটু বলুন না।

নিশ্চয় বলব—একশো বার বলব।—বিনোদ সমাদ্দার একেবারে গঙ্গাজল। জিজ্ঞাসা করে, পাবলিক থিয়েটারে নামতে চান?

এখন আর বাধা কিসের—কাকে ডরাই? প্রেমাঞ্জনের দৃষ্টান্ত তো চোখের উপর দেখছি। সামান্য করেসপণ্ডেন্স-ক্লার্ক থেকে কোথায় উঠে গেছেন।

বিনোদ উসকে দেয়: আপনিও যে কি হবেন কোথায় উঠবেন, কেউ বলতে পারে না।

জয়ন্তী বলল, আপনাকে দেখানোর সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু অভিনয় সত্যিই আমি খারাপ করিনে—

শেষ করতে দিল না বিনোদ: খুব ভাল করেন আপনি। দেখতে হবে কেন, কথাবার্তা চালচলন থেকেই বুঝে নিয়েছি।

গাড়িতে উঠে হাসি-ভরা মুখে বলে, দরবার মঞ্জুর তা হলে?

বিনোদ বলল, দরবার কিসের। নাট্যামোদী হিসাবে আমারই

তো কর্তব্য। রঙ্গমঞ্চকে যারা ভালবাসে, সবাই আপনাকে চাইবে।

জয়ন্তীকে ছেড়ে এক-ছুটে ঘরে ঢুকে বিনোদ সত্যি সত্যি দরজা ভেজিয়ে দিল। হেমন্ত শুধায়ঃ লিখবেন এখনই ?

না, হাসব। দম ফেটে মরে যাচ্ছি, হেসে হালকা হয়ে নিই খানিক। মদ্দাহাঁসের মতন ফ্যাসফেসে গলা—তিনি নাকি স্টেজে দাঁড়িয়ে অ্যাক্টো করবেন, দ্বিতীয়-প্রেমাঞ্জন হবেন—কর্তামশায়ের কাছে তাঁর জন্যে বলতে হবে আমায়।

খিকখিক করে বেশ একচোট হেসে নিল সে। গলায় মেরে দিয়েছে—নয়তো অভিনয়ে পরিপক্ক মানতেই হবে সেটা। কথার সঙ্গে চোখ দুটোয় ইচ্ছে মতন ঝিরঝিরে পানি, ইচ্ছে মতন ঝিকমিকে হাসি। সরোজা যেমন করত। বলি, যেসব কথা হচ্ছিল শুনেছ তো সব ?

প্রুফ থেকে মুখ তুলে হেমন্ত ঘাড় নাড়ল: যৎসামান্য, কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আর অদ্দূর থেকে স্পষ্ট তেমন কানেও আসে না।

নাঃ, বদরসিক তুমি। হাতের কাজ বন্ধ রেখে কানটা খানিক বাড়িয়ে দিলেই কানে আসত। এমন-কিছু ফিসফিস করে বলেনি।

হেমন্ত বলে, অন্যের গোপন ব্যাপার শোনা ঠিক হত কি ? বিশেষ করে মহিলার ব্যাপার।

গোপন ব্যাপার নিয়ে মহিলা নিজেই বেশি করে ঢাক পেটাতে চায়। এসেছে তো সেই তদ্বিরে।

বিনোদ চুম্বকে বৃত্তান্ত বলল। বলে, জাতক্রোধ স্বামীর উপর—সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করছিল দেখলে না ? দুর্মতি পুরুষ দশের মাঝে মুখ না দেখাতে পারে, এমনি কাণ্ড করতে চায়।

হেমন্ত বলে, এই সংখ্যাতেই খানিকটা দেবেন, বলে দিয়েছেন। মোটে কিন্তু জায়গা নেই। কম্পোজ-করা ম্যাটার তাহলে চেপে রাখতে হবে।

বিনোদ সহাস্যে বলল, এ সংখ্যায় নয়—কোন সংখ্যাতেই নয়। জয়ন্তী মিত্তিরের কোন কথাই উঁকিঝুঁকিতে বেরুবে না।

কিন্তু আপনি কথা দিলেন—

আমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—এদ্দিন একসঙ্গে কাজ করে এখনো সেই ধারণা তোমার? আগাপাস্তলা মিথ্যে দিয়ে কাগজ ভরাই, ধারণা তবু যায় না। নাঃ, লেখক হলে কি হবে—জাত-ইস্কুলমাস্টার তুমি।

হেমন্ত তবু বলে, মহিলা এত কান্না কেঁদে গেলেন, স্বামীর উপরে সত্যিই আমার রাগ হচ্ছে।

আমারও হচ্ছে, অপদার্থ স্বামীটার উপরেই—সত্যি সত্যি কেন পিটুনি দেয় না? কেন দেয় না, একেবারে যে না-বুঝি তা নয়। সোনার অঙ্গে হাত তুলতে মায়া লাগে।

—বিনোদ সমাদ্দার বলতে লাগল, স্বামী প্রদীপ মিত্তির—তাকে আমি চিনি। সুন্দরী বউ পেয়ে হতভাগার গদগদ অবস্থা। আর ইনি শুধু তারই জীবন নয়, প্রেমাঞ্জনের জীবনও বিষময় করে তুলেছেন। সুন্দরী যুবতী মেয়ে বাড়িতে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে সামনের উপর বিতিকিচ্ছি কাণ্ডবাণ্ড করতে লাগলে সাময়িক দুর্বলতা আসা, প্রেমাঞ্জন কেন, ঋষিতপস্বীর পক্ষেও অসম্ভব নয়। তারই সুযোগ নিচ্ছে সাংঘাতিক সর্বনেশে মেয়েটা। একেবারে পেয়ে বসেছে। একে নিয়েই পুরোদস্তুর আলাদা এক নাটক লেখা যায়।

॥ তিন ॥

মণিমঞ্চ। শনিবার—থিয়েটারের দিন আজ। আরম্ভের এখনো ঘণ্টা দুই বাকি। লোকজন সামান্যই এখন। সত্যসুন্দর নিজের কামরায় নিবিষ্ট মনে জমা ও খরচের হিসাব মিলিয়ে দেখছেন।

মথুরানাথ নামে পরম বিশ্বাসী ছোকরা দরজার বাইরে যথারীতি টুল পেতে আছে। যতক্ষণ সত্যসুন্দর আছেন, সে থাকবে। স্লিপ নিয়ে মথুরা ভিতরে ঢুকল। তিলেক মাত্র অপেক্ষা নয়, পিছু পিছু ঢুকল বিনোদ সমাদ্দার। এবং তার পিছনে হেমন্ত কর।

তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে 'এসো' 'এসো' বলে সত্যসুন্দর আহ্বান করলেন।—তোমার উঁকিঝুঁকি চলছে কেমন?

খুব ভাল।—হেসে হেসে বিনোদ বলছে, সোনার বঙ্গভূমে ইক্ষু-রস চলে না, তাড়ি বানিয়ে দিলে তখন আর পড়তে পায় না। কাগজ বেরুতে না বেরুতেই শেষ—চাহিদা অনুযায়ী মাল যোগান দিয়ে উঠতে পারি নে।

ইত্যাদি গৌরচন্দ্রিকার পর বিনোদ হেমন্তর নাম-ধাম-পরিচয় দিল। বলে, শিক্ষকতা করেন। আবার লেখকও—আমার উঁকি-ঝুঁকিতে লেখেন। বাজারে তিন-চারটে বই বেরিয়ে বেশ নাম পড়ে গেছে। নাটক লিখেছেন, বলে-কয়ে আমিই লিখিয়েছি। অমিয়-শঙ্করের সঙ্গে সেই সূত্রে মোটামুটি কথাবার্তা হয়েছে। সে কোথায়?

আসেনি তো এখনো।

এইসময় আমাদের আসতে বলেছিল—

বাইরের মথুরানাথকে সত্যসুন্দর হেঁকে বললেন, নতুনবাবুর ঘরে গিয়ে দেখে আয়, সে এসেছে কিনা। কখন আসবে, খোঁজখবর নিস।

নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'জয়-পরাজয়ের' গতিক বোঝা যাচ্ছে না,

শুনেছ নিশ্চয় অমিয়র কাছে। এসে পড়েছ যখন, আর একবার দেখ।

আরে সর্বনাশ! আজ কাগজ বেরুবে, কেটে ফেললেও অতক্ষণ থাকতে পারব না।—তারপর বলে, মণিমঞ্চের ভার অমিয়র উপর ছেড়ে দিলে। এবারের বই তো সে করবে।

ছেলেপুলে নেই, চোখ বুঁজলে ওরই তো সব। করতে চাচ্ছে, করুক। চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, যা সে করবে নির্ঘাৎ সুপার-হিট। দেখা যাক।

একটু থেমে বেদনাহত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দু-পুরুষ থিয়েটার নিয়ে আছি। কিন্তু এখনকার এদের, মনে হচ্ছে, একটুও চিনিনে। অমিয়ও তাই বলে—সেকেলে হয়ে গেছি, নতুন জেনারেশনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে—দিবারাত্রি ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান। স্টেজে একেবারে নাকি নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আসবে। আমিও কড়ার নিয়েছি, অমিয়শঙ্কর সর্বময়—তাকিয়েও দেখব না আমি, চোখ বুঁজে থাকব।

বিনোদ বলল, সেই রকম কথা আমার সঙ্গেও হয়েছে। পুরনো ঘাগিদের বাঁধাছকের নাটক নেবে না সে। হেমন্তর কদর তো সেইজন্য।

সত্যসুন্দরের সকল দৃষ্টি এবার হেমন্তর উপরে। সাগ্রহে শুধালেন: আপনার কোন কোন বই, বলুন তো?

হালের উপন্যাসটা উতরেছে চমৎকার। কাগজে কাগজে প্রশংসা। এই নামটাই তার সর্বাগ্রে মনে পড়ল: কান্না—

আকাশ-পাতাল হাতড়েও সত্যসুন্দর হদিস পান না। বললেন, কান্নাকাটি লোকে তো তেমন নেয় না শুধু স্ত্রীলোক ছাড়া। বলে, সংসারে কান্নাকাটি লেগেই আছে—আবার এখানেও? 'কান্না' নামের বই—কই, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। বলি, হিন্দী না বাংলা?

মনে মনে বিরক্ত হয়ে হেমন্ত বলে, বাংলাতেই লিখি আমি।

তাই তো। কিছু মনে করবেন না মশায়, বোধহয় ফ্লপ-বই। তা হলেও বিলকুল ভুলে যাব—এমন তো হয় না। সুপার-ফ্লপ নাকি—এক-আধ নাইটেই খতম? বলো না বিনোদ, কী ব্যাপার।

বিনোদ তো হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বলে, সিনেমায় হয় নি, থিয়েটারেও নয়। তোমার মনে পড়বে কি করে? লাইনে হেমন্ত আনকোরা-নতুন, তোমায় বললাম তো সে-কথা।

হতবুদ্ধি হেমন্তকে ফিসফিসিয়ে বুঝিয়ে দেয়: বই বলতে এরা বোঝে সিনেমা-ছবি কিংবা থিয়েটারের পালা। তার বাইরে বই এরা আমলে আনে না। পড়ে না এরা—চোখে দেখেন, আর কান দিয়ে শোনে।

সত্যসুন্দরকে বলে, ধরেছ ঠিক। আজতক হেমন্তর কোনও বই হয়নি। নতুন বই নিয়ে প্রথম এই থিয়েটারে পা দিয়েছে।

বেশ, বেশ!—সত্যসুন্দর বললেন, অমিয়ও ভরসা দিয়েছে—তবে আর কি! নাম কি নাটকের?

হেমন্ত বলল, প্রতারক—

ক্রাইম ড্রামা বুঝি?

বিনোদ লুফে নিয়ে বলে, এর চেয়ে বড় ক্রাইম হয় না। বিশ্বাস-ভঙ্গ। মুখে লম্বা লম্বা রচন আউড়ে ভদ্রসজ্জন মক্কেলদের ধীরে ধীরে গুণ্ডা লুচ্চো কালোবাজারি বানানো।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন সত্যসুন্দর: বটে!

মজাটা হল, তলিয়ে বোঝে না তারা কেউ। সর্বনাশ হয়ে গেল, অথচ স্ফূর্তির চোটে তারাই ধিতিং-ধিতিং নাচে।

সত্যসুন্দর গম্ভীর হয়ে রায় দিলেন: সিরিও-ঝমিক বই—জমতে পারে। এ লাইনের নাড়িনক্ষত্র তোমার মতন ক'জন জানে? তুমি যখন পিছনে রয়েছ—

হেমন্ত বলে ওঠে, পিছনে থাকা কি, নাটক আসলে বিনুদারই।

প্লট, চরিত্রের বুনানি সমস্ত ওঁর। ওঁর মুখের কথা আমি শুধু কাগজের উপর সাজিয়ে গেছি।

সত্যসুন্দর শুধালেন: উপসংহারটা কী রকম দাঁড় করালে—জেল না, ফাঁস?

কিছু না, কিছু না। নাটকের বাহাদুরি এইখানে। পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় স্টেজে দেখে দেখে চোখ পচে গেছে—সাদা চোখে ক'টা দেখেছ, আঙুলে গণে বলো দিকি। যা সত্যি, নাটকও ঠিক তাই। গদি, শিরোপা—প্রতারকের পুরস্কার। ভাটেরা চিল্লাচ্ছে: এত গুণান্বিত দুনিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়টি নেই—তারই মধ্যে ড্রপ পড়ল।

হেনকালে মথুরানাথ এসে খবর দিল, নতুনবাবু নিজের ঘরেও নেই। হাবুলকে বলে গেছেন, আসতে একটু দেরি হবে—কেউ এসে চলে না যান।

বিনোদ বলল, আমার কী দরকার—আমি চলি কর্তামশায়। নাট্যকার রইল।

নিচের বক্স-অফিস। কাউণ্টারের পিছনে তিনজন। একজনের হাঁটুর উপর নভেল খোলা—নির্বিঘ্নে পড়ছে। আর দু-জন হাই তুলছে বসে বসে, খদ্দের এলে টিকিট দিয়ে ঢেরা কাটছে চার্টের উপর। 'জয়-পরাজয়' চলছে—এমন-কিছু পুরনো নাটক নয়। সুবিখ্যাত জগন্ময় রায়ের রচনা। বাঘা বাঘা প্লেয়ার। একজন কেবল দেহ রেখেছেন—রজত দত্ত। তবু বাকি যাঁরা আছেন—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হ্যাণ্ডবিলে আছে: অষ্টবজ্র সম্মেলন—

কিন্তু ভিড় কই তেমন?

জন আট-দশ লাউঞ্জের গদিতে গা এলিয়ে আছে। আর কিছু

লোক দেয়ালের গায়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছে। দেয়াল জুড়ে 'জয়-পরাজয়ে'র নানা দৃশ্যের ফটোগ্রাফ। জনৈক ঝানু ব্যক্তির আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন : ইনি কে, বল তো কাটু।

কাটু নামের ব্যক্তিটি, বোঝা যাচ্ছে, তাদৃশ ধুরন্ধর নয়—প্লেয়ারদের কুলজি নিয়ে তত বেশি মাথা ঘামায় না। কাটুর পাল্টা প্রশ্ন : সাধন মজুমদার ?

হাসির চোটে ছাত ফেটে যাবার গতিক। তাড়াতাড়ি লোক বদলে কাটু বলে, বোদে চক্কোত্তি বোধহয়।

বোদে ভিলেন সাজে, সাধন কমেডিয়ান—বিতিকিচ্ছি সাজগোজ দেখেই ধরে নিলি ঐ দুয়ের একজন না হয়ে যায় না।

এলেমদার তৃতীয় এক ব্যক্তি মাথা গলিয়ে সমাধান করে দিল : আরে, এ তো প্রেমাঞ্জন। সিনেমা-থিয়েটার আসেন আর প্রেমাঞ্জনকে চিনতে পারেন না—কী কাণ্ড।

কাটু রে-রে করে ওঠে : প্রেমাঞ্জন বই কি। সেদিনও তাকে ক্রাউনে দেখেছি। সিরাজদৌল্লা সেজেছিল। লম্বা-চওড়া চোখ-জুড়ানো চেহারা—ঘ্যাচাং করে মীরন তলোয়ার বসিয়ে দিল, গোটা হল হায়-হায় করে উঠল। কপালে আব কানা-চোখ কটকটে কালো এ মানুষ কেন প্রেমাঞ্জন হতে যাবে ?

ক্রাউনের নবাব মণিমঞ্চে এবারে যে খুনে ফেরারি জিতু পাহাড়ি। প্রেমাঞ্জন জিতু পাহাড়ি সেজেছে। অ্যাকটিংয়ে প্রেমাঞ্জন সিদ্ধপুরুষ, মেক-আপেও তাই।

এক দঙ্গল কাউণ্টারে ঝুঁকেছে। মফস্বলের মানুষ—কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে।

আরম্ভ ক'টায় ?

কাউণ্টারের লোক পোস্টার নির্দেশ করে বলে, ছাপা রয়েছে, দেখুন না—

মানুষটি ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ছাপা-জিনিস ঢের ঢের দেখা আছে

মশায়। আপনাদের ছ'টা ঠিক ঠিক ক'টার সময় বাজবে, জিজ্ঞাসা করছি।

আরও প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেয়ঃ ঘর-বাড়ি আমাদের এখানে নয়। সারাটা দিন টহল দিয়েছি। সাড়ে-সাতটা নিদেন পক্ষে সাতটা অবধি সময় পেলেও হোটেলের পাট সেরে একপিঠে হয়ে বসতে পারি।

কাউণ্টার বলে দেয়: ঘড়ি ধরে থিয়েটারের কাজকর্ম। পাঁচটা-উনষাটের পর আর একটা মিনিট—সিকিমিনিটও তার এদিক-ওদিক হবে না। থার্ড বেলের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরে অরণ্যের সিন।

পুনরপি প্রশ্ন: ভাঙবে ক'টায়?

ন'টা চল্লিশে। সে-ও ঘড়ি-ধরা।

নিজেদের মধ্যে তখন তারা বলাবলি করছে, এই হয়েছে আজকাল। শহরের লোকের মুখ চেয়ে যত নিয়মকানুন—খেতে শুতে যাতে বেশি রাত না হয়ে যায়। দশ বাজবার আগেই এরা তো চুকিয়েবুকিয়ে দিচ্ছেন, আমরা হতভাগারা তখন কোন চুলোয় যাই—কে ভাবতে যাচ্ছে বল।

থিয়েটারের সেই সত্যযুগীয় প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। একই রাত্রে তিন-চারখানা নাটক হত তখন। একটা হয়ে গেল তো আর একটা। শেষ নাটকটা শেষ হয়ে গিয়ে সর্বশেষ ড্রপ পড়ল—বাইরেও তখন ফর্শা। ময়লার গাড়ি ছড়-ছড় করে যাচ্ছে। রাত কাটানোর ঝামেলা নেই—গঙ্গায় ছুটো ডুব দিয়ে চারপয়সার কচুরি আর এক পয়সার হালুয়ায় জলযোগ সেরে ঢেকুর তুলতে তুলতে শিয়ালদহের রেলগাড়িতে গিয়ে চাপলেই হয়ে গেল।

পরনে ধবধবে পাজামা ও আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখে সোনালি চশমা পরমশৌখিন একজন জুতো মস-মস করে এসে কাউণ্টারের

চার্ট টেনে নিয়ে মনোযোগে দেখছে। মফস্বল-দলের একজন পাঁচ টাকার নোট বের করে দিল : এক টাকার টিকিট চারখানা—

কাউণ্টার বলল, এক টাকার টিকিট হয় না। সাত সিকে সকলের নিচে।

শৌখিন লোকটি এদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, প্রেমাঞ্জনকে জানেন ?

জানি বই কি। তাঁকে দেখতেই তো আসা।

এক টাকার টিকিট কেটে প্রেমাঞ্জন দেখা যায় না।

মানুষটা তর্ক করে : এক টাকা লাগেও না। ভাই আমার দশ আনার টিকিটে দেখে গেছে।

সে সিনেমার ছবি—মানুষ কক্ষনো নয়। মানুষ প্রেমাঞ্জন দেখতে হলে সর্বনিম্ন সাতসিকে—

বলে সে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে গেল।

কাউণ্টারের লোক জুড়ে দিল : সাত সিকের সিট পিছনে, একেবারে দেয়ালের ধারে। আগে-ভাগে বলে দেওয়া ভাল—চোখে-দেখা কানে-শোনা কোনটাই ভাল মতন হবে না।

ওদিক থেকে একজনে শুধায় : এই যিনি এসেছিলেন, কে বলুন তো মানুষটি ? মনে লাগছে যেন—

মনে ঠিকই লেগেছে।

বলেন কি মশায়!

সিঁড়ির উর্ধ্বভাগে প্রেমাঞ্জনের গমনপথের দিকে মানুষটি সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল, বক্স-অফিসে প্রেমাঞ্জন—কী আশ্চর্য।

কাউণ্টারের লোক বলে, বক্স-অফিস হল থিয়েটারের নাড়ি। এসে নাড়িটা দেখে গেলেন।

আর একজন বলে, খোঁচা দিয়ে শুনেও গেলেন, কার জন্যে লোকে মণিমঞ্চে আসে।

থিয়েটার দেখে যাবে হেমন্ত—কর্তামশার সত্যসুন্দর বলেকয়ে পাঠাচ্ছেন। এক নম্বর অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল বক্সে বসে দেখবে, মথুরানাথ করিডরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পায়ের উপর থপ করে হঠাৎ প্রণাম। এদিকে ওদিকে মানুষজন সব তাকিয়ে পড়েছে। সবগুলো চোখের মণি ঠিকরে বেরুনোর যোগাড়। প্রণাম সেরে মাথা তুলতে হেমন্তও তাজ্জব। খুদ প্রেমাঞ্জন পদতলে। প্রেমাঞ্জনকে না জানে কে? চাক্ষুষ দেখেছে কিনা, হেমন্তর মনে পড়ছে না—সিনেমায় বহুত বহুত দেখা। এ হেন প্রেমাঞ্জন হাত বাড়িয়ে পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

একলা চলাচল প্রেমাঞ্জনের পক্ষে দুর্লভ। ইচ্ছা হলেও সাধ্য নেই—দুটো পাঁচটা ফ্যান আশেপাশে জুটবেই। তাদের কাছে হেমন্তর পরিচয় দিচ্ছে: আমার শিক্ষক। সামান্য যা-কিছু আমার শিক্ষা, এঁরই দয়ায়।

এক মান্যগণ্য ইস্কুলের হেমন্ত নগণ্য শিক্ষক। অনেক কাল ধরেই বিদ্যাদান চলছে। প্রেমাঞ্জন থিয়েটার-সিনেমায় দিকপাল—অবশ্যই হেমন্ত এই বিদ্যার পাঠ দিতে যায় নি। ইস্কুলের লেখাপড়া কী ঘোড়ার-ডিম করেছে, জানা নেই—সেই বস্তুর সবটুকুই নাকি হেমন্তর দয়ার দান। অজান্তে কতটা কি দান করে বসে আছে, বিস্তর ভেবেও হদিস পাচ্ছে না। ক্লাসে অবশ্য পঙ্গপালের মতন ছেলের ঝাঁক, কিন্তু প্রেমাঞ্জন তো ঝাঁকের মধ্যে বেমালুম হবার মতো নাম নয়।

সন্তর্পণে 'আপনি'-'তুমি'র ঝামেলা বাদ দিয়ে শুধাল: পড়াশুনো সাউথ-এণ্ড হাই ইস্কুলে?

হ্যাঁ সার।

কিন্তু প্রেমাঞ্জন বলে কোন ছাত্রের নাম—মানে, নামটা কিছু নতুন ধরনের কিনা। ছেলেদের সঙ্গে বরাবর আমার মেলামেশাটা

কিছু বেশি।—ডিবেটিং-ক্লাব চালাই, ইস্কুল-ম্যাগাজিনের ভারও আমার উপরে। এইরকম নাম কখনো যে কানে গেছে—

প্রেমাঞ্জন হেসে বলে, আপনি কেন, আমার বাবার কানেও কখনো যায়নি। মারা গেছেন বাবা, আর তিনি শুনতে আসবেন না। মা বর্তমান আছেন, তিনি ইদানীং খুব শুনছেন।

কি নাম ছিল তখন?—হেমন্তের প্রশ্ন।

এককড়ি। ছেলে হয়ে হয়ে মরে যেত—আঁতুড়ঘরে মা একটা কড়ির দামে ধাইয়ের কাছে আমায় বেচে দিলেন। বেঁচে রয়েছি আমি ধাইয়ের কপালে। মানে, বিধাতাকে ধাপ্পা দেওয়া—বিধাতা জেনে-বুঝে আছেন, ধাইয়ের সম্পত্তি আমি, গর্ভধারিণী মায়ের বিক্রি করে-দেওয়া মাল।

একচোট হেসে নিল প্রেমাঞ্জন। বলে, সিনেমা-থিয়েটারে এককড়ি অচল। এককড়ি নামের মানুষের অ্যাকটিং শুনতে কেউ টিকিট কিনে থিয়েটারে আসবে না। বিনি পয়সার পাস দিলেও তা-না না-না করবে। মনোলোভা নাম চাই—পেশার দায়ে এককড়ি হয়ে গেল প্রেমাঞ্জন। নাম কেমন হয়েছে সার?

এত কথার পরেও হেমন্ত সন্দিগ্ধ চোখে আপাদমস্তক দেখে। প্রেমাঞ্জন বলে, মুখ-চেনাও ঠেকছে না—তাই না? চেনা যাতে না হয়, ক্লাসে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই তো করতাম। ভাল ছেলে ছিলাম না, বুঝতেই পারছেন। 'বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো' না হলে থিয়েটার করতে আসে কেউ? লেখাপড়া ছিল বাঘ। অর্ধেক দিন ক্লাস কামাই। হাজির হয়েছি তো সর্বশেষ বেঞ্চিতে সকলের পিছনে ঘাড় নিচু করে থাকতাম—কোন সারের সামনে না পড়ে যাই, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করতে পারেন। আপনার ডিবেটিং-ক্লাব যেখানে, সেই তল্লাটের ছায়া কোনদিন মাড়াইনি। আপনি আমায় চিনে ফেলবেন, সে রকম কাঁচাছেলে ছিলাম না আমি। তাই বলে আমি চিনব না কেন? বই-টই লিখছেন, সে খবরও রাখি।

পয়লা ঘণ্টা দিল—ছ'টা বাজতে দশ মিনিট। থিয়েটারে তেমন আসা-যাওয়া নেই, হেমন্ত কিছু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রেমাঞ্জন বলে, দেখবেন বুঝি সার?

হ্যাঁ। একটু কাজে এসেছিলাম—তা সত্যসুন্দরবাবু বললেন, দেখেই যান নাটকটা।

প্রেমাঞ্জন মথুরাকে জিজ্ঞাসা করে: কর্তামশায় আছেন ঘরে?

মথুরা ঘাড় নেড়ে বলল, আছেন।

আর কেউ আছে?

মথুরা বলে, নতুনবাবু এইমাত্র এলেন। তাছাড়া পাশ নিতে এক-আধ জন আসছে, চলে যাচ্ছে।

প্রেমাঞ্জন বলে, সারকে বসিয়ে দিয়ে এসো মথুরা। আর হাবুলকে আমার নাম করে বলো, সর্বক্ষণ খবরাখবর নেবে, চা-লেমনেড দেবে। মস্তবড় মানুষ—থিয়েটারে এঁদের পাওয়া ভাগ্যের কথা। যত্নের ত্রুটি যেন না হয় কোনরকম।

স্বয়ং প্রেমাঞ্জন পদতলে মাথা রাখল, এবং এমনধারা খাতির জমাচ্ছে—এর পরেও কি মুখে বলতে হবে, মস্ত মানুষ। হেমন্তর দিকে সবাই ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছে। হতভম্ব হেমন্তই কেবল মালুম পায় না, সামান্য ইস্কুলমাস্টার কিসে অকস্মাৎ মস্ত মানুষ হয়ে পড়ল।

দ্রুত যাচ্ছিল প্রেমাঞ্জন, দু-এক পা গিয়ে থেমে পড়ে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন: সারের ঠিকানা কি আজকাল?

শহরে থেকেও সে এক মফস্বল জায়গা।—হেমন্ত সঙ্কোচ ভরে বলে, কুঠিঘাটা ছেড়ে বেশ খানিকটা গিয়ে পাঁচু মণ্ডল লেন—

প্রেমাঞ্জন আর বলতে দিল না: বিনোদ সমাদ্দার—আমাদের বিনু-দা'ও তো ওইখানে থাকেন। যাব সার আপনার বাড়ি।

নিরস্ত করবার অভিপ্রায়ে হেমন্ত বলে, কাঁচা ড্রেন, ঘিঞ্জি গলি—গাড়ি ঢোকে না।

প্রেমাঞ্জন বলে, পায়ে হাঁটা ভুলে যাইনি সার। গাড়ি ক'দিন বা চড়ছি। আর, যে পেশা নিয়েছি—কতদিন চড়ে বেড়াব, তাই বা কে বলতে পারে। বিনু-দার সঙ্গে জানাশুনো নেই আপনার?

হেমন্ত বলে, তিনিই তো সত্যসুন্দরবাবুর কাছে নিয়ে এলেন।

তবে আর কি, বিনু-দাকে নিয়ে হঠাৎ একদিন গিয়ে পড়ব।

হেমন্তকে ছেড়ে প্রেমাঞ্জন কর্তার ঘরে চলল। হাবুল বেরিয়ে আসছে। প্রেমাঞ্জন বলে, আমার মাস্টারমশায় বক্সে বসেছেন। প্রোগ্রাম দিয়ে এসো। চা-টা যেন ঠিক মতো পান। ড্রপ পড়লেই তাঁর কাছে গিয়ে কী লাগে না-লাগে জিজ্ঞাসাবাদ কোরো।

হাবুলের দু-হাতে হাউস-ফুল লেখা দুই বোর্ড। নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলেছে।

সহাস্যে প্রেমাঞ্জন বলে, টাঙাতে চললে? সব সিটে ঢেরা পড়ে গেছে—আমিও দেখে এলাম।

হাবুলও হাসতে হাসতে বলে, এর উপরে এক্সট্রা-চেয়ার পড়বে পাঁচ-সাতখানা। বিষ্যুদের প্লে-তেও পড়েছিল।

প্রেমাঞ্জন বলে, না পড়ে পারে। একখানা পাশ আমি চেয়েছিলাম, ম্যানেজার একজোড়া দিল। বলে, থিয়েটার একা-একা দেখে মজা পাওয়া যায় না। যিনি আসবেন, আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলবেন।

হাবুল দু-হাত উঁচু করে দেখায়: ডবল বোর্ড ঝুলবে। কারও নজর না ফসকায়। একটা বক্স-অফিসের সামনে। আর একটা বাইরের গেটে—বড়রাস্তার উপর। জুবিলি থিয়েটারের লোকজন আসতে-যেতে দেখবে—দেখে বুক ধড়ফড় করবে তাদের।

আবার বলে, এক্ষুনি নয় তা বলে। বোর্ড ঝুলোব প্লে শুরু হবার পর। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

না টাঙিয়ে হাউস ফুল হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে

এখন। পাবলিসিটির অঙ্গ। সর্বজনে চেয়ে দেখুক, হাউস-ফুল হয়ে এলো বলে, নয়তো বোর্ড বের করেছে কেন ? পারঘাটায় খেয়ানৌকো নিয়ে যেমন করে। ছাড়ে নৌকো-ও-ও-ও—বলে মাঝি হাঁক পাড়ে, আর মাঝগাঙের দিকে নৌকো নিয়ে যায়। আবার ঘাটে ফিরিয়ে আনে। কিছু প্যাসেঞ্জার এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল— তাড়াতাড়ি নৌকোয় চড়ে বসে। অর্থাৎ এবারে না ছাড়লেও ছাড়ার বেশি দেরি নেই। এ-ও তেমনি। লাউঞ্জে গুলতানি করছে, থিয়েটার দেখার সত্যি ইচ্ছে থাকে তো এইবারে টিকিট কিনে তারা ঢুকে পড়বে।

মামা-ভাগনে, সত্যসুন্দর ও অমিয়শঙ্কর, পাশাপাশি দুই চেয়ারে। নিম্নকণ্ঠে শলা-পরামর্শ হচ্ছিল। দরজা ঠেলে প্রেমাঞ্জন ঢুকে গেল। কর্তার ঘরে এমনি ঢোকা যায় না, স্লিপ পাঠাতে হয়। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, প্রেমাঞ্জনকে স্লিপের জন্য আটকাবে। টুপ করে বসে পড়ে কর্তার দিকে চেয়ে প্রেমাঞ্জন বলে, নাটকের তো নাভিশ্বাস উঠেছে।

সত্যসুন্দর নীরব। অমিয় কর-কর করে ওঠে: বুঝলেন কিসে ?

হাবুল দেখলাম হাউস-ফুল টাঙাতে চলল। একটা নয়, দু-হাতে দুই বোর্ড। মাঝ-সপ্তায় পর্যন্ত হাউস-ফুল হতে লেগেছে। এক্সট্রা-চেয়ারও দিতে হয়। এর পরে বুঝতে বাকি থাকবে কেন ?

অমিয় বলে, হাউস-ফুল যাচ্ছে, ভালই তো।

এত ভাল ভাল নয়—তাই না কর্তামশায় ?

সত্যসুন্দরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন। তিনি রা কাড়েন না— পাষাণমূর্তিবৎ বসে আছেন।

প্রেমাঞ্জন বলে, উঁকি দিয়ে চার্টটাও দেখে এসেছি। সব সিটে তখনই ঢেরা পড়ে গেছে।

তবে ?

ঢেরা নীল পেন্সিলের। লাল-ঢেরা সিকিভাগও নয়।

অমিয় বলে, তফাতটা কি? পেন্সিলের ছুটো মুখ – যখন যেটায় দাগ পড়ে যায়।

প্রেমাঞ্জন বলে, মামার কাছে এসেছেন বেশিদিন অবশ্য নয়, তাহলেও লাল-নীলের তফাত জানেন না এমন হতে পারে না। ভান করছেন। আমরা অভিনয় করি সবাই জানে, কিন্তু থিয়েটার-জগতে, খোদ-ম্যানেজার থেকে দেয়ালের টিকটিকি অবধি, কে যে অভিনেতা নয়, বলতে পারিনে।

কর্তামশায়ের দিকে সোজা মুখ ফিরিয়ে সরাসরি প্রশ্ন: 'জয়-পরাজয়' মুখ থুবড়েছে – নতুন নাটক কিছু ঠিকঠাক হল?

চমক খেয়ে সত্যসুন্দর বলেন, হলে জানতে পারবেন না? দাঁড় করাবেন তো আপনারাই। আপনাদের না শুনিয়ে মতামত না নিয়ে কেমন করে হবে?

প্রেমাঙ্কুর বলে, আমি যেটার কথা বলেছিলাম—নকুল ভদ্রের লেখা—

হুঁ—বলে সত্যসুন্দর ঘাড় নাড়লেন।

অমন জিনিস কালে-ভদ্রে ওতরায়। পাত্রপাত্রী স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র কথাগুলো বলে গেলেই নাটক জমে যাবে। পাণ্ডুলিপি শোনেন নি মোটে?

অমিয়শঙ্কর ফোড়ন কেটে ওঠে: না শুনে রেহাই আছে? ভদ্রমশায় তেমন পাত্রই নন।

সত্যসুন্দর ধমক দিয়ে উঠলেন: আঃ, এসব কি কথা! সকলকে নিয়ে আমাদের কাজ, সবাই আপনজন, সকলের আশীর্বাদ আছে বলেই মণিমঞ্চ এই বাজারে টিকে রয়েছে।

প্রেমাঞ্জন বলে, নকুলবাবু ডাঁটের উপর থাকেন বলে ভাল লিখেও তেমন কলকে পান না। আর 'জয়-পরাজয়ের' মতন রদ্দি মাল শিরোপা পেয়ে গেল জগন্ময় দাসের পা-চাটার গুণে।

সত্যসুন্দর বলেন, তখন কিন্তু মোটামুটি ভাল জিনিস বলে সবাই রায় দিয়েছিলেন।

আমি নই। রজত দত্ত একাই চেঁচিয়ে টেবিল ঘুসিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আপনাকে রাজি করালেন। করবেন না কেন, সারা বই জুড়েই তিনি। যেখানে একটু-আধটু খামতি ছিল, অথরকে দিয়ে ইচ্ছা মতন লিখিয়ে নিয়েছেন। তাই দেখুন, দত্তমশায় চলে গেলেন —নাটকও অমনি ধ্বসল। এত সব বড় বড় আর্টিস্ট মিলে চল্লিশটা নাইটও ধরে রাখা যাচ্ছে না।

অমিয় বলে, নাটক না লাগলেই তখন হাজার খুঁত বেরোয়। লেগে গেলে দোষও গুণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দেখেছি প্রেমাঞ্জনবাবু, অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছি। থিয়েটারে নতুন—কিন্তু বম্বে-মাদ্রাজ মিলিয়ে সিনেমা লাইনে আমার তো কম দিন হয় নি।

প্রেমাঞ্জন আগের সুরে নিজের কথাই বলে যাচ্ছে: নাটকে বস্তু না থাকলে শত চেষ্টাতেও কিছু হয় না। দেখুন না কেন, মাস মাস আমায় এতগুলো করে টাকা দিচ্ছেন—কাজ কতটুকু পাচ্ছেন বলুন তো? নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে পড়ে প্রথম মুখ দেখাচ্ছি। তা-ও জুত মতো দুটো ডায়ালগ পাইনে—কি করব, কানা-চোখ হয়ে কপালের উপর ফজলি-আমের সাইজের আব বের করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরুই। লোকে তাই দেখে, আর তারিফ করে। পরের বইতে আমি এরকম সং সেজে বেরুতে পারব না, স্পষ্ট কথা।

দেয়ালঘড়ির দিকে চেয়ে প্রেমাঞ্জন উঠল। অমিয় বলে, বসুন, কফি আনতে গেছে। আপনার তো সেই সেকেণ্ড অ্যাক্ট থেকে—বসুন একটু, এক্ষুনি এসে যাবে।

প্রেমাঙ্কুর বলে, চোখ উল্টে ঢেলা বের করতে হবে, প্যাড বসিয়ে আব বানাতে হবে—এ সবে অনেক সময় নেয়। কফি আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রেমাঞ্জন মস-মস করে গ্রীনরুমে চলল।

অমিয়শঙ্কর ফেটে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে : সং সাজতে পারবেন না—কানা চোখের মেক-আপ নিচ্ছেন, তাই সং সাজা হল। পাঠ ওঁর ফরমাশ মতো বানাতে হবে! কানা তো অনেক ভাল, নতুন নাটক নামাব আমি—রাবণ বধ। তাতে ওঁকে হনুমান সাজাব। হনুমান হয়ে সারা স্টেজে হুপ-হুপ করে লাফাবেন। না পারেন তো বাদ।

সত্যসুন্দর ভাগনেকে আবার ধমক দেন : আজেবাজে বকছ কেন? থিয়েটার জায়গা—দেয়ালেরও কান আছে।

থাকল তো বয়ে গেল। না মামা, এলাকাড়ি দিয়ে দিয়ে এদের সব মাথায় তুলেছ। যেন বিনি-মাইনেয় এসে দয়া করে যান। নাটক কি নেবো না-নেবো, আমাদের বিবেচনা। যাকে যে পাঠ দেব, তাই করতে হবে। কড়া ডিসিপ্লিন ছাড়া ব্যবসা চলবে না। থিয়েটারের সম্পর্কে যারাই আছে, সব নাকি অভিনেতা। তার মানে মিথ্যেবাদী আমরা সকলে। তুমিও বাদ নও মামা।

সত্যসুন্দর বলেন, যত যাই বলুক, খদ্দেরও এরাই টেনে আনে। যে গরু দুধ দেয়, খুরের চাটি তার খেতেই হবে।

দুধ তো ভারি—এ দুধে নব্বই পারসেণ্ট জল। নীল চেরা—মুফতের পাশই প্রায় সব। গোপনও নেই, সকলে জেনে গেছে। জোর করে হাউস-ফুল টাঙিয়ে কোন লাভ নেই।

আছে বইকি। শোন। যাদের হাতে নগদ গুঁজে দেওয়া যায় না, পাশ দিয়ে তাদের কিনে রাখি। তা ছাড়া, হল হা-হা করছে, সে অবস্থায় প্লেয়ারে মন বসিয়ে কাজ করতে পারে না, প্লে জমে না। খালি-হল বলে খরচা যে দুটো পয়সা কম হবে, তা-ও তো নয়।

অমিয় হেসে ফেলল : তোমার কথাটা দাঁড়াচ্ছে মামা—ট্রেন যখন কাশী অবধি যাচ্ছেই, সিট কেন খালি যাবে, বিনা টিকিটে নিয়ে গিয়ে মানুষকে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে দিই। আমার যে নতুন

নাটক হবে, মুফতের পাশ তাতে একেবারে বন্ধ। তা হলেও দেখো হাউস-ফুল নিত্যিদিন—সমস্ত লাল-পেন্সিলের ঢেরা।

নিচে হৈ-চৈ। উত্তাল হয়ে উঠল ক্রমশ। কথাবার্তা থামিয়ে সত্যসুন্দর উৎকর্ণ হলেন। ছ'টা বেজে গিয়ে আরো সাত মিনিট—কী আশ্চর্য, এখনো প্লে আরম্ভ হল না। অমিয়, গিয়ে দেখ তো একবার—

নিজেও বসে থাকতে পারেন না, খটাস করে কামরার দরজা খুলে বাইরে এলেন।

॥ চার ॥

হলে প্রচণ্ড হাততালি ও চেঁচামেচি। সামনের পর্দা যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে। নড়ার লক্ষণ নেই। মফস্বলের দলটার উপর তখন কাউণ্টার দাবড়ি দিয়েছিল, সিট ছেড়ে বাইরে এসে তারা এবারে ঘিরে ধরেছে: কি গো মশায়, ঘড়িতে কখন ছ'টা বেজে গেছে। আপনাদের ছয় ক'টার সময় বাজবে? খাঁটি-খাঁটি বলুন।

বেরিয়ে পড়ে সত্যসুন্দর পায়ে পায়ে সিঁড়ি অবধি এসেছেন, ভৃত্য ন্যাড়া ছুটতে ছুটতে এল: নতুনবাবু পাঠালেন। আপনাকেই যেতে হবে, নয়তো হচ্ছে না।

স্টেজের ছোট্ট দরজার মুখে ম্যানেজার। সত্যসুন্দর শুধালেন: কি ব্যাপার, সাড়ে-ছ'টা বাজতে যায়—ড্রপ ওঠে না কেন এখনো?

ম্যানেজার তিক্ত কণ্ঠে বলে, আমি কি করব, ভিতরে গিয়ে দেখুন।

পর্দার বাইরে হলের মধ্যে তুমুল হে-চৈ, এদিকে ভিতরে স্টেজের উপর এমন নিঃশব্দতা যে সুঁচটা পড়ে গেলেও বোধকরি শব্দ কানে এসে পৌঁছবে। মেক-আপ নিয়ে আর্টিস্টরা উইংসের কাছে লুকিয়ে আছে, ড্রপ উঠলেই পলকে নেমে পড়বে। এখন নির্বাক নিশ্চল স্থিরচিত্রের মতন। প্রম্পটারকে সত্যসুন্দর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন: ব্যাপার কি বাণীকণ্ঠ?

বাণীকণ্ঠ চুপিসাড়ে বলল, ঘোষালমশায় বিগড়ে আছেন। গোড়াতেই তাঁর কাজ। নতুনবাবু কত করে বললেন, তা কানে নিচ্ছেন না।

নাট্যজগতে বাঘা-আর্টিস্ট যাঁদের বলে, শঙ্কর ঘোষাল তাঁদের একটি। পাঠ নিয়ে কোনরকম বায়নাক্কা নেই—রাজা সাজা থেকে তামাক সাজা, স্টেজের উপর যা করতে বলবে তাতেই রাজি। এবং সাতিশয় অধ্যবসায়ী—যে পাঠই করুন নিশ্চয় তা উতরে দেবেন,

তেমনটি আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না। আরও একটা গুণ, সময় নিয়ে সদাসতর্ক, আধ মিনিটও কখনো এদিক-ওদিক হয় না। আবার কাজ অন্তে বসে বসে ফষ্টি-নষ্টি করবেন, তা-ও নয়। এইসব কারণে উপরওয়ালা কর্তাদের খুব পছন্দ। কিন্তু হলে কি হবে, পয়সাকড়ির ব্যাপারে পয়লানম্বুরি চশমখোর—চুক্তির পাই-পয়সাটি অবধি আদায় করে ছাড়েন। সিনেমা-থিয়েটার, কে না জানে, মায়ার জগৎ। কত কি দেখাচ্ছে-শোনাচ্ছে—আসলে অলীক সব। এখানকার মুখের প্রতিশ্রুতি এবং লিখিত কন্ট্রাক্টও খানিকটা তাই। ব্যতিক্রম শুধু শঙ্কর ঘোষালের ক্ষেত্রে। লাইনে বিশ বছর আছেন, পাওনা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছেন, একটি পয়সা কেউ মারতে পারেনি। সকলের মাসমাইনে, শঙ্কর ঘোষালের বেলা দিনের রোজ সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিতে হয়। বলেন, একসঙ্গে গুচ্ছের টাকা দিতে বুক চড়-চড় করবে—কী দরকার, কাজ হয়ে গেলে চল্লিশটা টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেবেন, গায়ে লাগবে না। দিতে হয় তাই। অন্তরালে কটুকাটব্য: অর্থপিশাচ মানুষটা আর্টিস্ট না হয়ে চোটার কারবারে গেল না কেন?

ঘোষাল বিগড়েছেন, কর্তামশায় ছুটে তাঁর ঘরে গিয়ে পড়লেন। পর্দা উঠলেই অরণ্যের সিন। শঙ্করের ব্রিচেস-পরা শিকারীর বেশ। মেক-আপ চমৎকার নিয়েছেন—যৎসামান্য কাজ বাকি। আণ্ডারওয়ারের উপর ব্রিচেস আলগা ভাবে রয়েছে—টেনে-কষে বোতামগুলো আঁটলেই হয়ে যায়। সেইটুকু করছেন না শঙ্কর—আয়নায় দেখে মুখের উপর ঈষৎ পাফ বুলোচ্ছেন। বোদে চক্কোত্তি অন্তরঙ্গ ও আজ্ঞাবহ—সে আছে, আরও দু-তিনটি আছে। তাদের সঙ্গে একটু-আধটু হাসি-মস্করাও করছেন।

সত্যসুন্দর ব্যাকুল হয়ে বললেন, পর্দা ওঠে না কেন?

শঙ্কর ঘোষাল উদাসভাবে বললেন, ওঠালেই হয়। বাধা তো কিছু নেই।

আপনি তবে উঠে পড়ুন—

কেন উঠব না? উঠবার জন্যেই তো সাজগোজ নিয়ে আছি। বলে শঙ্কর কর্তামশায়ের দিকে হাত বাড়ালেন: টাকাটা দিয়ে দিন।

সত্যসুন্দর বলেন, যাবার সময় নিয়ে যাবেন।

তাই তো নিয়ে থাকি। কিন্তু বিষ্যুদের টাকা অর্ধেকের বেশি তো দিতে পারলেন না—

চটে-মটে সত্যসুন্দর বলেন, ঐ কুড়ি টাকা না দিয়ে কি পালিয়ে যাব? বিক্রি আজ খারাপ নয়—হল গম-গম করছে। লোকে বিরক্ত হচ্ছে, সিনটা করে দিয়ে আসুন। ততক্ষণে আমি বক্স-অফিস থেকে টাকা এনে রাখছি।

শঙ্করের কিছুমাত্র চাড় দেখা যায় না। বলেন, এনেই দিন না মশাই। আজকের চল্লিশ আর বিষ্যুদের কুড়ি—একুনে ষাট। ঝঞ্ঝাট চুকেবুকে যাক।

টাকা হাতে নগদ নগদ না পেলে নামবেন না আপনি—পনেরো বিশ মিনিটের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারেন না? এই সিনেই যে শেষ হয়ে গেল, তা নয়। পরেও আপনার যথেষ্ট কাজ।

খুব যেন একটা কৌতুকের ব্যাপার, তেমনিধারা অমায়িক-হাসির সঙ্গে শঙ্কর বললেন, যতক্ষণ এই কথাবার্তা হচ্ছে, তার মধ্যেই কিন্তু বক্স-অফিস থেকে টাকা আনা হয়ে যেত কর্তামশায়।

আচ্ছা—।

গজরাতে গজরাতে সত্যসুন্দর ছুটলেন। টিকিট বিক্রির দরুন খুচরো টাকা অনেক—এক টাকার নোট দু-হাতে মুঠো করে এনে ছুঁড়ে দিলেন শঙ্করের টেবিলের উপর। ছড়িয়ে পড়ল, মেঝেতেও পড়ে গেল খান কয়েক। শঙ্করের কিছুমাত্র দৃকপাত নেই। মেঝের গুলো কুড়িয়ে তুললেন। সমস্ত গুণেগেঁথে—হ্যাঁ, পুরোপুরি ষাটই বটে—পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে শঙ্কর ঘোষাল

ভিন্ন এক মানুষ। পটাপট ব্রিচেসের বোতাম এঁটে কোমরে বেল্ট কষে লম্ফ দিয়ে উঠে পড়লেন। তীরের বেগে স্টেজে গিয়ে আদেশ: ঘন্টা মারো, পর্দা তোল। যার যেমন কাজ, গিয়ে দাঁড়াও—

সত্যসুন্দর নিশ্চিন্তে ঘরে চললেন। আর দেখতে হবে না অভিনয় এখন গড়-গড় করে চলবে। শঙ্কর ঘোষালের যতক্ষণের কাজ—তার মধ্যে ভূমিকম্পে যদি বাড়ি ধ্বসে পড়ে অথবা গঙ্গার প্লাবন এসে অডিটোরিয়াম ভাসিয়ে দেয়, অভিনয় তবু সমানে চলবে।

অমিয়শঙ্কর আগেই চলে এসেছে। রাগে ফুঁসছিল। কর্তামশায়কে পেয়ে বোমার মতন ফেটে পড়ল: আমার নতুন নাটকে শঙ্কর ঘোষালও বাদ। লোকটা আর্টিস্ট নয়, চামার।

সত্যসুন্দর ধীরকণ্ঠে বললেন, ঘোষালমশায় বাদ হয়ে গেলেন। রজত দত্ত ইহলোকই ছেড়েছেন, প্রেমাঞ্জনকে ঘোর অপছন্দ—কাকে নিয়ে চলবে তোমার নাটক ?

নতুনরা সুযোগ পাবে। কোনো বায়নাক্কা নেই তাদের, স্টেজে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পেলেই বর্তে যায়।

সত্যসুন্দর বলেন, খদ্দের টানতে পারবে ?

খদ্দের নাটকের টানে আসবে, আর্টিস্টের নামে নয়। বড় বড় করে নাম ছেপে কয়েকটার লেজ ফুলিয়ে দিয়েছ—থিয়েটার-সিনেমায় তাদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া। কোন আর্টিস্টের নামই দেব না আমার নাটকের পোস্টারে।

কী জানি, কেমন হবে !—কর্তামশায়ের ইতস্তত ভাব।

অমিয় বলে, নাটুকে লেখকও তোমাদের বাঁধা—সাকুল্যে পাঁচটি সাতটির বেশি হবে না। ফরমাশ মতন তাঁরা থিয়েটারে থিয়েটারে নাটক যুগিয়ে বেড়ান।

সত্যসুন্দর বলেন, কাজের সুবিধা হয়। থিয়েটার ঘুরে ঘুরে ঘাঁতঘোঁত জেনে-বুঝে আছেন, কাকে দিয়ে কোন জিনিস কতখানি ওতরাবে নখদর্পণে ওঁদের।

অমিয় বলে, আর্টিস্টের মুখ চেয়ে নাটক বানালে কি সর্বনাশ হয়, হালফিল তোমার চেয়ে কে বেশি জানে মামা? এত তোড়জোড় করে 'জয়-পরাজয়' নামালে—রজত দত্ত মারা গেলেন, নাটকেরও সঙ্গে সঙ্গে বারোটা বাজল। প্রেমাঞ্জন, শঙ্কর ঘোষাল, পঙ্কজিনী এতসব আর্টিস্ট মিলেও ধরে রাখতে পারছেন না। এবারে প্রেমাঞ্জন নকুল ভদ্রের নাটক নামানোর জন্য লেগেছেন। নকুল প্রেমাঞ্জনের লোক—নাটকে অন্যদের ছেড়ে ওঁকেই সে ঠেকনো দিয়ে আকাশে তুলবে। ঠারে-ঠোরে নাকি বলেছেনও, ঠিকমতন পাঠ না পেলে নকুল ভদ্রের বই নিয়ে তিনি জুবিলির সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করবেন। কিন্তু শাসানিতে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। উঁকিঝুঁকির আনাচে-কানাচে মেলা নটনটী নাট্যকার-গীতিকার ঘুরে বেড়ায়। বিনু-দাকে ধরলাম, বেছেগুছে নাট্যকার একটা দিন—ঝুনো-ঝানু নয়, হাত পাকাচ্ছে এমনি আনকোরা মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে উনি হেমন্ত করের কথা বললেন। ওঁর খুব আপন। হেমন্তবাবুর নাটকের আইডিয়াও বিনু-দার। গতানুগতিক নয়—অবিশ্যি আগাপাস্তলা ভাল করে ঝাড়াই-বাছাই করতে হবে।

কথাবার্তার মাঝে ম্যানেজার হরপদ ভারি-সারি এক লেফাপা সহ হাজির।

কাগজের অফিস থেকে? আস্ত গন্ধমাদন যে!—হাত বাড়িয়ে অমিয় নিয়ে নিল। টেবিলের ছুরিটা নিয়ে লেফাপার মুখ কাটে। একগাদা আঁটা খাম।

ওরে বাবা!—ভয়ের ভান করে অমিয় তাকায়। দু-চারটে খাম ছিঁড়েও ফেলল। ভিতরে যথারীতি সুন্দরীর ফোটো ও বিবিধ গুণাবলীর তালিকা।

অমিয় বলে, পরশু এসেছিল, কাল এসেছিল, আজকে আবার এই গাদা। আরও কত আসবে না জানি!

সত্যসুন্দর আরও ভয় পাইয়ে দেন: হপ্তা ভোর আসবে—হয়েছে কি এখনো। দরখাস্ত আর ফোটোগ্রাফের পাহাড় জমে যাবে।

তুমি মামা কিন্তু উল্টোকথা বলেছিলে: মিছে অর্থব্যয়—কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে ভালঘরের মেয়েছেলে একটাও সাড়া দেবে না।

সত্যসুন্দর বলেন, তাই তো জানতাম। হেন কাণ্ড আমাদের বয়সে কোনদিন কেউ স্বপ্নে ভাবে নি। দুটো-পাঁচটা মেয়ে গৃহস্থ-বাড়ি থেকে আসেনি যে তা নয়—ভাঁড়ে মা-ভবানী, মুখে অথচ প্রগতি কপচে বেড়ায়, এমনিধারা কয়েকটি। এ যে দেখা যাচ্ছে পঙ্গপালের ঝাঁক। মেয়ে-বউরা ফোটো তুলে সেজেগুজে ঘরে ঘরে তৈরি, বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামী-পুত্তুরে রুচি নেই—ডাকটা পেলেই তোমার নতুন নাটকের নটী হয়ে স্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আরও আগে—একেবারে আদি-আমলের গল্প। ঠিক হল, থিয়েটারে স্ত্রী-চরিত্র স্ত্রীলোক দিয়েই করানো হবে। কিন্তু খানিকটা সুদর্শনা এবং নাটক করতে রাজি—এমন আর মেলে না। থিয়েটারের দালাল খারাপ-পাড়াগুলো চষে ফেলছে: দেহ-বিক্রি কেন আর মা-লক্ষ্মীরা? সৎপথে থেকেই রুজি-রোজগার—সেইসঙ্গে নাম-যশ, কাগজে কাগজে লিখবে তোমার নামে, ছবি বেরুবে—

নাম-যশ কি ধুয়ে খাব বাবুমশায়? দেহখানা জখম হয়ে গেলে কেউ তখন পুঁছবে না—যে লাইনে করে খাচ্ছি সেখানে যেমন, আপনাদের থিয়েটার-লাইনেও তেমনি। (ঠিকই বলেছিল, তাই না? আমাদের তারামণিকে দেখ।) নিজের ঘরে শুয়ে বসেই দুনো রোজগার, হাটের মাঝে তবে আর নাচতে কুঁদতে যাব কেন?

তখনকার কথা এইরকম। ধরে পেড়ে অনেক কষ্টে এক একটা জুটিয়ে আনতে হত। আর এখন? কাগজে মাত্র দু-লাইনের বিজ্ঞাপন: নতুন নাটকের জন্য যথার্থ সুন্দরী তরুণী নায়িকা চাই।

অমুক বক্স-নম্বরে ফোটো সহ নাম-ধাম-বিবরণ—। ব্যস, বাঁধ ভাঙল। বন্যা। হু-হু শব্দে চিঠির স্রোত।' মণিমঞ্চ ডুবিয়ে দেবে।

অমিয় বলে, বিজ্ঞাপনে কি রকম চোখা চোখা কথা লাগিয়েছি, তা-ও দেখেছ তোমরা। সুন্দরী চাই—যেমন তেমন হলে হবে না, সত্যিকার সুন্দরী। সেই সুন্দরী আবার তরুণীও হবে একাধারে। ইচ্ছে করেই বাঁধন-কষন—উমেদারনী কম হবে ভেবেছিলাম। ওরে বাবা, সুন্দরীর ঠ্যালায় এখন যে চোখে অন্ধকার দেখছি।

ম্যানেজার হরপদ অমিয়র প্রায় সমবয়সী। সে মুখ খুলল: আহা, দেশের কী সুদিন! সুন্দরীতে সুন্দরীতে ছয়লাপ—

ফোটোর সঙ্গে গুণের বিবরণ এসেছে—একটা দুটোয় চোখ বুলিয়ে অমিয় বলে উঠল, সুন্দরী কি যেমন-তেমন! উর্বশী রম্ভা তিলোত্তমা, নয় তো পদ্মিনী নুরজাহান ক্লিওপেট্রা—তার চেয়ে কম কেউ যাবে না। বিউটি কমপিটিসানে রকমারি প্রাইজ কব্জা করেছে নাকি—লম্বা লম্বা ফিরিস্তি।

আর তরুণী চেয়েছিলেন—হরপদ একটা ফোটো টেবিলের মাঝামাঝি ঠেলে দিল: তরুণীর নমুনা দেখুন কর্তামশায়।

সেদিকে চোখ তাকিয়ে অমিয়শঙ্কর বলে, তরুণী ছিল বটে একদিন, মিছেকথা নয়, সেটা বছর পঁচিশেক আগে।

মৃদু হেসে সত্যসুন্দর বললেন, সামনাসামনি দেখ, মনে হবে তরুণীই। স্টেজের উপরে তো স্বচ্ছন্দে চালানো যাবে। জবর জবর কসমেটিক বেরিয়েছে, পঁচিশ-তিরিশ বছর চুরি মেয়েরা তো আখচার করে থাকে, সাদা-চোখে কার সাধ্য ধরে! ক্যামেরায় বজ্জাতি ধরতে পারে নি, তাহলে এ ছবি পাঠাত না।

হেমন্ত মগ্ন হয়ে থিয়েটার দেখছে। মস্তমানুষ বলে প্রেমাঞ্জন পরিচয় দিল, নিজেরও সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পদে পদে মালুম হচ্ছে, ঘোরতর মস্তমানুষ সে। মথুরানাথ পরম যত্নে

পয়লানম্বুরি বক্সে বসিয়ে দিয়ে গেল। পিঠ পিঠ ছাপা-প্রোগ্রাম নিয়ে হাবুলের আবির্ভাব। পিছনে গরম চা সহ পুনশ্চ মথুরানাথ, এবং সামান্য পরেই ঠাণ্ডা ঘোলের শরবৎ সহ ন্যাড়া। শরবতে চুমুকের মধ্যেই পর্দা উঠে গিয়ে অরণ্যের সিন—শঙ্কর ঘোষাল শিকারী বেশে তুড়িলাফ দিয়ে স্টেজে পড়লেন। পান-টান এই-সময়ে নিয়ে এলে রসগ্রহণে বাধা পড়ে—তাই যেন মুকিয়ে ছিল হাবুল, প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়তে না পড়তে পানের দোনা ও সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে উপস্থিত। সঙ্গে রেস্তোরাঁর বয়, ট্রে-তে করে চা কেক এনেছে—এবং হুকুম মাত্রেই এক-ছুটে গরমাগরম কবিরাজি-কাটলেট এনে দেবে, সেজন্য সাধাসাধি করছে। হলের মধ্যে ধূমপান নিষেধ বলে কষ্ট করে গাত্রোত্থান করে দু-পা দূরের ঐ করিডরে গিয়ে সিগারেট ধরাতে হবে, হাবুল সবিনয়ে বলছে—

এমনি সময় গটমট করে, অন্য কেউ নয়, স্বয়ং অমিয়শঙ্কর। বলে, চা-টা পাচ্ছেন তো ঠিক? পাশের চেয়ার নিয়ে গা ঘেঁষে সে বসল। হাবুলকে বলে, আজকে আবার একগাদা—খবরের কাগজ থেকে এইমাত্র দিয়ে গেল। তাই খানিক নাড়াচাড়া করছিলাম—ম্যানেজার এখন ঘরে নিয়ে গিয়ে বাছাবাছি করছে। একলা মানুষের সাধ্য কি! তুমিও যাও হাবুল, মিলেমিশে অপ্সরী-কিন্নরী বাছো গে। আমার জন্যে পনেরো-বিশ খানার বেশি রেখো না, তার ভিতর থেকে ফাইন্যাল করব।

হাবুল তৎক্ষণাৎ বেরুল। সুন্দরী তরুণী উমেদারনীদের ফোটোগ্রাফ ও আত্মকথা—এ জিনিসে ভারি উৎসাহ তার।

হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, পটে চা রয়েছে। আর একটা কাপ পাওয়া গেলে—

অমিয় নিরস্ত করে: একটু আগেই কফি খেয়েছি। এখন আর খাব না। তারপর হাসতে হাসতে বলে, প্রেমাঞ্জনবাবু পায়ের ধুলো-টুলো নিলেন তো খুব—

সামান্য ব্যাপারটুকুও কানে গিয়ে উঠেছে—আশ্চর্য তো! হেমন্ত বলল, আমার ছাত্র।

আপনার ছাত্র একটি জিনিয়াস। আবার অত্যধিক বিনয়ী—এই তো দেখলেন। পায়ের ধুলো নেওয়া অতীতে কি হয়েছে কখনো, না এই প্রথম?

কথার ধরনটা ভাল না। তবু আমল না দিয়ে হেমন্ত বলে, দেখাই হয় নি এতদিন।

ভাগ্যিস হয় নি। হলে চিনতে পারতেন না। আর আজ যদি এভারেস্টের চূড়োয় গিয়ে বসেন, খুঁজে সেখানে গিয়ে পদধূলি নেবেন। কেন বলুন তো?

জবাব চায় না অমিয়, সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য: থিয়েটার দেখতে বসা কিন্তু উচিত হয় নি হেমন্তবাবু। যাচ্ছে কোথা—নাটক আপনার সুভালাভালি লেগে যাক, থিয়েটার কত দেখবেন।

কথাগুলো মোটেই ভাল না। হেমন্তই যেন মাথা-ভাঙাভাঙি করে এসেছে! ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বলল, কর্তামশায় হাতের মধ্যে পাশ গুঁজে দিলেন। বললেন, নাট্যকার হতে হলে হর-হামেশা থিয়েটার দেখতে হবে। সব দিনের কাজ এক রকমের হয় না—সেজন্য একই নাটক দেখতে হবে পাঁচ-সাত বার করে। দেখতে দেখতে বুঝে ফেলবেন, কোন প্লেয়ার দিয়ে কি রকমের কাজ আদায় হতে পারে। খদ্দেরে কি জিনিস চায়, অডিটোরিয়ামের হাততালি আর ভাবগতিক দেখে তা-ও বুঝবেন। এত সমস্ত কথার পরে আমি কি করতে পারি বলুন?

বেজার মুখে অমিয় বলল, মামাই ডোবাবেন, বুঝতে পারছি। দু-পুরুষ ধরে এক নিয়মে কাজ করে এসে এখন তার বাইরে যেতে কিছুতেই ভরসা পান না। যত ঘুঘু নিয়ে আমাদের কাজ-কারবার—নাট্যকার বলে আপনাকে সন্দেহ করেছে, কানাঘুসো শুরু হয়ে গেছে। সামাল, খুব সামাল। আপনি কিন্তু মশায়, কাঠবোবা

আর বন্ধকালা। নাটক নিয়ে কিছু বললেই হুঁ-হাঁ করতে করতে সরে পড়বেন সরাসরি আপনার সেই পাঁচু মণ্ডল লেন অবধি।

বেল বাজল। দ্বিতীয় অঙ্ক এইবার। ড্রপ উঠে গেল। মানুষজন হুড়মুড় করে ঢুকছে। নিচে হলের দিকে ঝুঁকে পড়ে অমিয়শঙ্কর বলে, 'বি' সারির ষোল নম্বর সিটে তাকান। প্রথম অঙ্কে খালি ছিল। এইবারে এসেছে।

কোনটা ষোল নম্বর, বাইরের মানুষ হেমন্ত কেমন করে বুঝবে? অমিয় হেসে বলে, আঙুল দেখাতে পারব না—পেত্নী-শাঁকচুন্নীদের আঙুল দেখাতে নেই। পয়লা সারি হল 'এ'—তার পিছনের সারি 'বি'। মাঝামাঝি যে প্যাসেজ, তার দক্ষিণে ষোল নম্বর। ষোল আর তার পাশে সতের—দুটোই এতক্ষণ খালি পড়ে ছিল। সতের এখনও খালি—এই ছাড়া খালি সিট আর কোথাও নেই।

বুঝে নিল হেমন্ত, ষোল নম্বরে আসীন পেত্নীকেও দেখল। অমিয় বলে, দেখতে পাচ্ছেন?

হেমন্ত বলে, সাজগোজওয়ালা দস্তুরমতো সুন্দরী পেত্নী—

নাম জয়ন্তী মিত্তির—থিয়েটারের ঝাড়ুদারটা অবধি জানে।

হেমন্তর মনে পড়ে গেল। বলে, জানি আমিও। একদিন উঁকিঝুঁকি অফিসে এসেছিলেন বিনুদার কাছে।

অমিয় বলে যাচ্ছে, 'জয়-পরাজয়' নাটকের আজ আটত্রিশ রাত্রি। ও-মেয়ের এর মধ্যে বিশ-পঁচিশ বার দেখা হয়ে গেছে।

হেমন্ত সবিস্ময়ে বলে, বলেন কি?

সিটও নেবে সামনের দিকে—চার-পাঁচ সারির মধ্যেই।

হেমন্ত বলে, এতবার দেখতে ভাল লাগে? একঘেয়ে হয়ে যায় না?

অমিয়শঙ্কর বলে, জয়ন্তী মিত্তির নাটক দেখে না, প্রেমাঞ্জন দেখে। পঁচিশ কেন, পাঁচশো রাত্রি হলেও আশ মিটত না। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রেমাঞ্জনের প্রথম প্রবেশ। জয়ন্তীর সিট প্রথম অঙ্কে বরাবরই

খালি পড়ে থাকে। উদ্দেশ্যটা সেই জন্যে আরও বেশি নজরে পড়ে যায়।

ছুম করে অমিয় আর এক খবর দিল: প্রেমাঞ্জনের স্ত্রীও এসেছেন।

দারুণ কৌতূহলে হেমন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল: কোথায়—কোন জন তিনি?

নজরে আসবে না। সকলের পিছনে দেয়াল-ঘেঁষা ঐ যে কয়েকটা সিট, ওখানে?

পিছনে কেন?

অমিয় তিক্তকণ্ঠে বলে, বুঝুন তাই। পাশ তো আজকাল দু-হাতে ছড়ানো হচ্ছে। জয়ন্তী মিত্তিরও পাশে এসেছে, প্রেমাঞ্জন পাশ নিয়ে গিয়েছিল। ওর নিজের বউ কিন্তু কখনো পাশে আসেন না। থিয়েটার থাকলেই এ-পাড়ায় আসেন, শুনতে পাই। হলে ঢোকেন কদাচিৎ। পিছন দিককার ঐ কয়েকটা সিট প্রায় খালিই থাকে—ঢোকবার ইচ্ছে হলে টিকিট কেটে ওরই একটায় বসেন।

হেমন্ত বলে, শোনা যায় কিছু ওখান থেকে? ভাল দেখাও বোধহয় যায় না।

প্লে দেখতে রেখা দেবীও আসেন না। খুশি মতন আসেন, খুশি মতন বেরিয়ে যান। মাথা খারাপ—এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন না। কী জানি, জয়ন্তী মিত্তিরকেই হয়তো দেখে যান একনজর।

ছাত্রের স্ত্রী পাগল শুনে হেমন্ত চুক-চুক করে: আহা!

অমিয় উত্তেজিত হয়ে উঠল: অথচ প্রেমের বিয়ে—তাই নিয়ে কত রকম কাণ্ড-বাণ্ড! পরের নাটক লিখুন না প্রেমাঞ্জনকে নিয়ে—আমি মালমসলা দিতে পারি। আমি কেন—বিনুদার সঙ্গে আপনার ভাব, তিনি নাড়িনক্ষত্র জানেন জয়ন্তী প্রেমাঞ্জন দুটোরই। দেখুন, আপনার ঐ ছাত্র আস্ত স্কাউণ্ড্রেল একটি। নাটক লিখুন, আমি অভিনয় করাব, খুব জমবে।

পাঁচ

রজত দত্ত জাতশিল্পী। জীবনভোর কেবল থিয়েটারই করলেন—সিনেমা দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। বলতেন, তাক লাগিয়ে বোকা লোকের পকেট-কাটার ফন্দি। দু-জনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে—এইটুকু বানাতেই নিদেন পক্ষে দশটা টুকরো জুড়বে—কোনটার ছবি আজ তুলল, কোনটা বা একমাস পরে। অভিনয়ের তাতে ছন্দোপাত ঘটে, খাঁটি জিনিস ওতরায় না। লম্বা-চওড়া ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ, মধুক্ষরা কণ্ঠ, অভিনয়-কালে প্রতিটি অঙ্গ যেন সশব্দে কথা কইত। মুখ একেবারে বন্ধ করে থাকলেও বক্তব্য বুঝতে আটকায় না—এমনি ছিলেন রজত দত্ত।

'জয়-পরাজয়' রজতের বড় পছন্দের নাটক। নাট্যকার জগন্ময় দাস কাঠামো গড়ে দিলেন, তার উপরে তাঁর রকমারি কারুকর্ম—অনেক চিন্তাভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। সত্যসুন্দরও টাকা ঢালতে কৃপণতা করেন নি। লেগে যেত নির্ঘাৎ, পাঁচটা অভিনয়ের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বিধাতা বিমুখ—পঞ্চম রাত্রে অভিনয় সেরে রজত বাড়ি গিয়ে যথারীতি শুয়ে পড়লেন। ভোরবেলা বুকে যন্ত্রণা—অবশেষে অচেতন। অ্যাম্বুলেন্স এল, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনো অবধি সবুর সইল না—পথের মধ্যেই শেষ।

আর্টিস্ট রজত স্টেজের উপরে কালও মহাধনী উচ্ছৃঙ্খল হিরণ্য চৌধুরি সেজে টাকাকড়ি দু-হাতে খোলামকুচির মতন ছড়িয়ে এসেছেন, সেই মানুষটি চোখ বোঁজার পর আজকে তাঁর নিজস্ব ক্যাশবাক্স কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সর্বসাকুল্যে পাওয়া গেল তিনটাকা বারো পয়সা—তাতে ঠ্যাং মুড়ে চিতায় তোলাও খরচে কুলিয়ে ওঠে না।

কাজ অবশ্য আটকে রইল না—সত্যসুন্দর এসে পড়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যাবতীয় বন্দোবস্ত করলেন। এবং রজতের বিধবাকে কথা দিয়ে গেলেন, ছেলে প্রণব যদি চায়, তাকে থিয়েটারে নিয়ে নেবেন। এসব না-হয় হল—কিন্তু এত নামযশ, ভক্তবৃন্দ বলত নাট্যজগতের শাহানশা তিনি, সেই মানুষটির ট্যাঁকের অবস্থাও এই প্রকার। কারণ জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল, অভিনয়ে সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধিলাভ—তুচ্ছ অশনবসনের সমস্যা কোনদিন রজত দত্তের মাথায় ঢোকেনি। জীবনের সর্বশেষ সেই অভিনয়টাও উতরেছিল অতি চমৎকার, হাততালির চোটে অডিটোরিয়াম ফেটে পড়ছিল। রজত বাড়ি রওনা হলেন, আবিষ্ট ভাব কাটেনি তখনো। অফিস থেকে মাইনেটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, রোজই ভুলে যান। আজকে বউ বিশেষ করে বলে দিয়েছিল, যাওয়া মাত্রেই সে হাত পাতল। জিভ কাটলেন রজত: এইরেঃ। বউ শাসাচ্ছে: চাল বাড়ন্ত, ঘরে একটি দানা নেই। রজত দত্ত বিশেষ বিচলিত নন। বললেন, নেই বুঝি? ভাতে-ভাত করো তবে। নিরন্নের ঘরের বহুপ্রচলিত রসিকতা। বলে তিনি হো-হো করে প্রচণ্ড হাসি হেসে উঠলেন। আর্ট বুঝতেন রজত, আখের বুঝতেন না।

শঙ্কর ঘোষাল যে কাণ্ডটি আজ করেছেন, পাশাপাশি রজত দত্তের প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। তুললেন শঙ্কর নিজেই—গ্রীনরুমের মধ্যে শঙ্করের নিজস্ব খোপ, সেইখানে। প্রথম অঙ্কের শেষে ইন্টারভ্যাল চলছে তখন। এর পরের সিনে শঙ্করের কাজ নেই। আর রজতের ছেলে প্রণব তো নতুন ঢুকেছে—তার খুব ছোট পার্ট, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দিকটায় মিনিট কয়েকের জন্য স্টেজে মুখ দেখিয়ে আসবে, তারপর তৃতীয় অঙ্কে। শঙ্করের সঙ্গে রজত দত্তের খুব ভাবসাব ছিল—সেই সুবাদে শঙ্কর প্রণবের কাকাবাবু। কাকাবাবুর কাছে প্রায়ই এসে সে অভিনয়ের এটা-ওটা জেনে নেয়।

আজকে এসে দরজাটা সন্তর্পণে সে ভেজিয়ে দিল। শঙ্কর নিজেই

কথাটা তুললেন : যে সিনটা আমি আজ করলাম, তোমার বাবা মরে গেলেও তা পারতেন না। অসাধ্য ছিল তাঁর পক্ষে। আশ্চর্য অভিনয়-যোদ্ধা, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি একেবারে ছিল না। ফল প্রত্যক্ষ। অতবড় আর্টিস্ট মারা গেলেন, বাক্স হাতড়ে পুরো পাঁচটা টাকাও মিলল না।

প্রণব বলে, কর্তামশায় নাকি দুঃখ করছিলেন—

শেষ করতে না দিয়ে শঙ্কর গড় গড় করে বলে যান : ঘোষাল মশায় শিল্পীমানুষ—কত বড় সম্মানের পাত্র। 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—বাজারের দোকানদারের মতন এমনধারা ব্যবহার কেন তাঁর হবে ?—এমনি সব বলছিলেন, কেমন ?

হাস্যমুখে শঙ্কর তাকিয়ে পড়লেন। অবাক হয়ে গেছে প্রণব। বলে, কথা সব শুনেছেন তবে ?

আগেও তো ঘটেছে, নতুন করে কেন শুনতে হবে ? এ সমস্ত বাঁধা গৎ। শিল্পী আমি, সন্দেহ কি। কিন্তু সে আমার রসিক দর্শকদের কাছে। তাদের কখনো ফাঁকি দিই নে, ভাল মতো জানেন তাঁরা। থিয়েটারওয়ালাদের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক—ওঁরা টাকা দেবেন, আমি কাজ দেব। পুরোপুরি ব্যবসার ব্যাপার। তার মধ্যে খামোকা শিল্পের নাম ঢোকানো কেন ? কথার ধোঁকাবাজিতে আমি ভুলিনে, রজত-দা গলে যেতেন।

প্রণব বলল, কর্তামশায়ের মনে খুব লেগেছে। ঐ ক'টা টাকা মেরে আমি কি পালিয়ে যেতাম ? দশের মাঝে উনি আমায় এমনি করে অপদস্থ করলেন।

খুব রেগে আছেন আমার উপর ?

প্রণব বলে, হাবুল-দা তা অবশ্য বলল না। রেগেছেন নতুনবাবু—রাগে গর গর করছেন।

হাসতে হাসতে শঙ্কর বলেন, রাগের চোটে ভাত চাট্টি বেশি করে আজ খাবে। আর কি করতে পারে ?

প্রণব বলে, জানেন না কাকাবাবু, পরের নাটক থেকে নতুনবাবুই আসল মনিব।

শঙ্কর ঘাড় নাড়লেন : কিছু না, কিছু না—আসল মনিব হলেন সামনের দিকে অডিটোরিয়াম জুড়ে যাঁরা সব থাকেন। যদ্দিন ওঁরা খুশি থাকবেন, কেউ কিছু করতে পারবে না। আজ তো শুধু কথা-কথান্তর—যদি বাপান্ত করি জুতোপেটা করি, অন্তরালে গালিগালাজ করবে—দরকারে দড়াম করে পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে।

হেনকালে দরজা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি দিলেন—আরে, তারামণি এসে গেলেন। মণিসুন্দরের আমলের সেই তারামণি, প্রবাদের রমণী। শঙ্কর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, উঠে পড়ো প্রণব, চেয়ার নিয়ে গিয়ে জুত করে বসিয়ে দাওগে।

সেই তারামণি—যাঁকে নিয়ে কতরকম গল্প লোকের মুখে মুখে। বুড়ো-খুনখুনে। গায়ের রঙটা ধবধবে সাদা এখনো—কিন্তু হলে কি হবে, চামড়া সর্বত্র কোঁচকানো। বিধাতাপুরুষ একদিন অনেক খাটনি খেটে পরম সুষমায় মুখখানি গড়েছিলেন—শেষটা কি কারণে বুঝি ক্ষেপে গিয়ে নিজের অনুপম সৃষ্টির চিহ্নটুকুও রাখতে নারাজ। এদিক ওদিক থেকে ঢেরা কেটে তার উপরে খিচিমিচি করে দিয়েছেন। মুখাকৃতি নিয়ে এখন রয়েছে বলিরেখায় ঢাকা বীভৎস এক বস্তু।

যে চেয়ারটায় প্রণব বসেছিল, কাঁধে তুলে নিয়ে সেটা উইংসের গা ঘেঁষে রাখল। তারামণি বসবেন। প্রম্পটার বাণীকণ্ঠ বেজার : লাও, ঘট-স্থাপনা হল। নড়তে চড়তে ঘা খেতে হয়—কানে শোনেন না, চোখেও ঝাপসা দেখেন, নিত্যি নিত্যি কেন যে ঝঞ্ঝাট করতে আসা।

গজর-গজর করছে—কিন্তু শঙ্কর ঘোষালের ব্যবস্থা, কর্তামশায়ের সমর্থন—জোরে বলবার জো নেই।

বসে পড়বার আগে তারামণি রীতকর্মগুলো সেরে আসছেন :

ঠাকুর-প্রণাম—রামকৃষ্ণদেবের ছবির পদতলে মাথা ঠেকানো।' গিরীশ ঘোষ-অর্ধেন্দু মুস্তফি-শিশির ভাদুড়ির পাশাপাশি তিন ছবি—তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম। মেয়েদের-সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে—সব মেয়েই নয়, অনভিজাত গণিকা-পল্লী থেকে যেগুলো আসে তারাই শুধু—ঢিবঢাব গড় করছে তারা তারামণিকে। এগিয়ে তারামণি স্টেজের ধারে এসেছেন—পা দেবার আগে নত হয়ে ডানহাতখানা বুলিয়ে মাথায় ঠেকালেন। কত কত শিল্পী-মহাজনের অভিনয়ক্ষেত্র—তাঁদেরই পদরজ নিয়ে নিলেন যেন। বসলেন তারামণি, প্রণব আবার শঙ্করের খোপে চলে গেল।

শঙ্কর বললেন, রাজগঞ্জের বড়কুমার তারামণির নামে একদিন কুমারডিহি মৌজার তিনআনা-চারগণ্ডা দানপত্র করে দিচ্ছিলেন। তারামণির শয্যার দাবি নিয়ে বঙ্গদেশের দুই সুসন্তান—আই-সি-এস'-এ ও রায়বাহাদুরে লড়ালড়ি, আই-সি-এস'কে চাকরি খোয়াতে হল এই বাবদে—সে-ও এক রীতিমত রোমাঞ্চক উপাখ্যান। ঐ পথ ছেড়ে তারপর তারামণি অভিনয়ে মেতে গেলেন, মানুষ পাগল হয়ে ভিড় করত তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর গান-অ্যাকটিং শোনার জন্য। আজকের তারামণিকে দেখে কে তা বিশ্বাস করবে?

স্টেজ তারামণির কাছে আজও দেবমন্দির। থিয়েটারের দিন আসতেই হবে এখানে—না এলে প্রাণ আইঢাই করে, সাধ্য কি চুপচাপ ঘরে বসে থাকেন। হলে ঢুকতে দিত না এই কোলকুঁজো ত্রিভঙ্গ বুড়িমানুষটাকে—বারান্দায় মেঝের উপরেই জাপটে বসতেন তিনি। দারোয়ান সেখানেও এক একদিন তেড়ে এসে পড়ত, এমনি অবস্থায় একদিন শঙ্কর ঘোষালের মুখোমুখি পড়ে গেল: আরে সর্বনাশ, কার উপর লাঠি তুলেছিস—জানিস, কে ইনি? তোর কর্তামশায়কে জিজ্ঞাসা করে আয়।

ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে একেবারে মঞ্চের উপর উইংসের পাশে জায়গা করে দিলেন।

নিশ্বাস ফেলে শঙ্কর বলেন, আজকে আমি প্রচণ্ড ডাঁট দেখাচ্ছি, কর্তার উপরেও তম্বি করছি, কিন্তু 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। ক্ষণস্থায়ী এসব—'নিশার স্বপন সম'। ক'টা বছর পরে দারোয়ানের লাঠি আমার উপরেও তেড়ে আসবে—'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' সর্বক্ষণ আমার চোখের উপর। খোশামুদি কথা তাই এ-কান দিয়ে শুনি, ও-কান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিই। যার যা খুশি বলুক গে, দু-হাতে আখের গুছাই। অডিটোরিয়ামের মহামান্য মনিবরা যেদিন বরখাস্ত করে দেবেন, সেদিন আর একটি তারা-মা কিংবা আর একজন রজতদা না হতে হয়।

নাঃ, হেমন্ত মস্ত লোকই—সান্দহ মাত্র নেই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে ড্রপ পড়েছে। করিডরে বেরিয়ে ঠোঁটে সিগারেট নিয়েছে সে, দেশলাইয়ের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছে—কোন দিক দিয়ে কে এসে ফস্‌স্‌ করে কাঠি জ্বেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একজন সামনে এসে দাঁড়াল: পান নিয়ে আসি সার? ভুজঙ্গর পান, বিখ্যাত জিনিস—সেই বালিগঞ্জ-বেহালা থেকেও বড় বড় গাড়ি হাঁকিয়ে ভুজঙ্গর পান খেতে আসে।

তারপর প্রশ্ন: নতুন নাটক তো আপনারই?

হেমন্ত অবাক হবার ভান করে বলল, কই, আমি তো কিছু···কে বলল?

বলতে হবে কেন সার? আপনাকে দেখেই ধরেছি।

হেমন্ত বলে, আমায় চেনেন?

হেঁ-হেঁ, ত্রিভুবনে আপনাকে না চেনে কে? অধীনের নাম সূর্যমণি সোম। এই অঙ্কের গোড়াতেই 'আসুন' 'আসুন' করে নায়ক হিরণ্য চৌধুরিকে ঐ যে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম সে আমিই। কেমন লাগল বলুন সার?

কথা তো মোটমাট 'আসুন' আর 'আসুন'—তা নিয়ে কতদূর

আর তারিপ করা যায়। ভাসা-ভাসা ভাবে হেমন্ত ঘাড় নাড়ল: হুঁ, ভালই তো।

সবাই ভাল বলে—তবু পাঠের মধ্যে কথা মোটমাট তিন-চারটে। দুঃখের কথা কি বলব, এতাবৎ তেরোখানা নাটকে কাজ করেছি—কথা সর্বসাকুল্যে তেরো গণ্ডাও হবে কিনা সন্দেহ। নতুনবাবু বলেছেন, তিনি একটা নাটক করবেন, তার নাম-ভূমিকায় থাকব আমি। কবে কি করবেন—এতখানি আমার ঠিক বিশ্বাসে আসে না। আপনার কাছে দরবার, নতুন নাটকে পাঠ যাই হোক, কথা যেন বেশি করে থাকে। মুখে বোবা থেকে শুধু হাত-পা নাড়া আর ভাবের অভিব্যক্তি দেখানো—এতে লোকের নজর কাড়া যায় না।

হেমন্তর একবর্ণও আর কানে ঢুকছে না—সভয়ে দেখছে, এদিক-সেদিক থেকে অনেক ব্যক্তি এই মুখো ধাওয়া করেছে। রণক্ষেত্রে ফৌজের দল রে-রে করে এসে পড়ে, সেই গতিক। নাট্যকার সে-ই, কারো বোধহয় জানতে বাকি নেই—নিঃসন্দেহ তদ্বিরে আসছে। সিগারেটে কয়েকটা মাত্র টান দিয়েছে—ধূমপান মাথায় উঠে গেল। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে বক্সের খোপে অন্তর্ধান—বিপদের মুখে দুর্গ-মধ্যে লুকিয়ে আত্মরক্ষার মতো।

বাইরে বেশ একটু ভিড়, হেমন্ত আন্দাজে পাচ্ছে। সূর্যমণি তার মধ্য থেকে সুট করে ঢুকে পড়ল। হাতে পাশপোর্ট রয়েছে, বাংলা-পানের দোনা—উত্তম অজুহাত। পান হাতে দিয়ে সূর্যমণি বলে, অধমের আর্জিটা মনে রাখবেন সার। বীর-করুণ-হাস্য সব রকমের পাঠ চলবে। একটা বিশেষ গুণ, ইচ্ছে মতন চোখে জল বের করতে পারি। এক্ষুনি পরীক্ষা দিতে পারি—সীতে কোথা তুমি প্রিয়তমে, বলতে না বলতেই দর-দর করে অশ্রু বেরুবে। দু-চোখেই।

পরীক্ষা আর ঘটে উঠল না। অমিয়শঙ্করের প্রবেশ। কটমট করে তাকায় সে সূর্যমণির দিকে: এঁর সঙ্গে কি?

আজ্ঞে না। বাংলা-পান দিতে এসেছিলাম।

ঘুর-ঘুর করছ কেন?—মুচকে হেসে অমিয় বলল, শিগগিরই আমরা শরৎবাবুর একটা বই নামাব ঠিক করেছি। মহেশ। নাম-ভূমিকা তোমার—তুমিই মহেশ সাজবে।

কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে সূর্যমণি বলে, যে আজ্ঞে—

আমার যে কথা সেই কাজ। তবে আর ছটফট কর কেন? গরু কেমন হাম্বা হাম্বা করে জান?

কেন জানব না। পাড়াগাঁ থেকেই এসেছি—

তবে আর কি, খাসা হবে।

সূর্যমণি সরে পড়ল। নতুনবাবুর সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল।

অমিয় বলে, আপনার পাণ্ডুলিপিতে মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়েছি হেমন্তবাবু। হাতের লেখা পড়ে সম্পূর্ণ রস পাওয়া যায় না। আপনি পড়ে যাবেন, আমরা কানে শুনব—আর কোথায় ছাঁটতে হবে কোথায় জুড়তে হবে মনে মনে ছকে যাবো খানিকটা। পরশু সোমবার যদি পড়া হয়—অসুবিধা হবে?

না, অসুবিধা কিসের।

অমিয় বলল, তড়িঘড়ি কাজ আমার, দেরি করা ধাতে সয় না। নাটকের উপসংহার বেশ ভালো—ভিলেনেরই জয়-জয়কার। বস্তা-পচা চিরকেলে মাল নয়। পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়—আজকের জগতে হরহামেসা যা দেখতে পাই! কিন্তু 'প্রতারক' চলবে না, বদখত নাম বদলাতে হবে। 'ছিঁচকে চোর' বলে থাকে না—প্রতারক কথাটার মধ্যে ঐরকম ছিঁচকে-ছিঁচকে গন্ধ। সূক্ষ্মবিচারে কাজকর্ম অবশ্য প্রতারণাই, কিন্তু গুণীজ্ঞানী অভিজাতদের সম্পর্কে ইতর কথায় মানহানির দায়ে পড়বেন যে। ভেবেচিন্তে ভিন্ন নামকরণ করবেন—কেমন?

সেটা কিছু কঠিন নয়।—হেমন্ত ঘাড় নাড়ল।

হাস্যমুখে অমিয় শুধায়: থিয়েটার কেমন দেখছেন বলুন। বলে সে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল।

হেমন্ত উচ্ছ্বসিত : প্রেমাঞ্জনের তুলনা নেই সত্যি। রজত দত্তর নাম হয়েছিল, মানে বোঝা যায়। বড় শিল্পী, তার উপর অথর চরিত্রটিকে একেবারে আকাশে তুলে দিয়েছেন। প্রেমাঞ্জনের উল্টো —তার অভিনয় লোকে নিয়েছে তারই নিজের ক্ষমতায়, অথরের সাহায্য একেবারে নেই। মেক-আপ থেকে আরম্ভ করে চলন বলন সম্পূর্ণ নিজের। জিনিয়াস—ওর এই জিতু সর্দার দেখেই মালুম হচ্ছে।

অমিয় বলে, আরও কিছু মালুম হবে—'বি' সারির সতেরো নম্বর সিটে তাকিয়ে দেখুন এবার। জয়ন্তী মিত্তিরের বাঁ-দিকের সিট, প্রথম অঙ্কে যা খালি ছিল।

হেমন্ত বলে, এক ভদ্রমহিলা বসেছেন।

আপনার জিনিয়াস ছাত্রের স্ত্রী—রেখা। প্রেমাঞ্জনের নামে দুটো সিটের কমপ্লিমেণ্টারি পাশ। একটা খালি যাচ্ছিল—হকের বউ ছাড়বে কেন, সে এসে এবার চেপে বসল।

হেমন্ত তারিফ করে বলে, বাঃ, দিব্যি রূপবতী তো!

প্রেম করে বিয়ে করেছিল বিস্তর বাধাবিপত্তি কাটিয়ে। তখন তো 'সখি আমায় ধরো ধরো'—অবস্থা। আর আজকে এই। মজাটা দেখুন—পাশাপাশি দুজনে, অথচ কেউ কারো মুখ দেখছে না! রেখা উত্তরে মুখ ফিরিয়ে আছে, জয়ন্তী দক্ষিণে। আপনার কপালে থাকে তো ওখানেই আলাদা এক নাটক জমে যাবে। মুখ ফেরাবে ওরা, চোখাচোখি হবে। রেখা হয়তো থুঃ করবে জয়ন্তীর দিকে—মাথা খারাপ তো! জয়ন্তী পাল্টা মুখ ভ্যাংচাবে। চোখের সামনে দুই লড়নেওয়ালীর লড়াই দেখতে দেখতে স্টেজের উপর প্রেমাঞ্জন পাঠ ভুলে গিয়ে ভ্যাবা-গঙ্গারাম হয়ে দাঁড়াবে। দেখুন কি ঘটে—

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে অমিয় বলে, কিছু মনে করবেন না—আপনার ছাত্র একটা স্কাউণ্ড্রেল। অমন বউটার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। গল্পটা দেব আপনাকে, নাটক বানাতে হবে। দরকারে তাই দিয়ে ওর পিণ্ডি চটকাব।

উঠে পড়ল সে: যাকগে, যা বলতে এসেছি। যত মক্কেলে ছেঁকে ধরবে আপনাকে— অল্প-সল্প তার নমুনাও পাচ্ছেন। সেইজন্তে ব্যবস্থা করলাম, হাবুল আসবে ভাঙো-ভাঙো সময়ে—থিয়েটারের গাড়িতে আপনাকে গোলদীঘি অবধি নিয়ে নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে সোজা একেবারে বাড়ি, থামবেন না কোথাও। নতুন নাটক তাহলে পরশু সোমবার পড়বেন। সকাল ন'টায়, মামার ঘরে দরজা বন্ধ করে। ঐ দিনে, বিশেষ করে ঐ সময়টা, একদম ভিড় থাকে না। রবিবারের দু-দুটো পারফরম্যান্সের পর পড়ে পড়ে সব ঘুমোয়। শুনব আমি আর মামা, অন্য কাউকে এখন শোনানো হবে না।

হেমন্ত বলে, বিনুদাকেও নিয়ে আসব।

ব্যস, আর কেউ না। আর্টিস্টরা পরে শুনবে—কাটছাট করে পাকাপাকি হয়ে যাবার পর। আগে ডাকলে অনাছিষ্টি। এটা বাড়াও, সেটা কমাও, ওটা বদল কর—তারাও ধরাধরি করবে। নিজের কোলে কিসে বেশি ঝোল পড়ে, কে কাকে মেরে বেরুতে পারে, এই চেষ্টা। সেটি হচ্ছে না। যা করবার আমরাই শেষ করে তারপরে ডাকব। একটি কথারও তারপরে রদবদল নয়।

হেসে আবার বলল, একাসনে বসে এবারে ডবল-প্লে দেখতে থাকুন—স্টেজে প্রেমাঞ্জনের প্লে, নিচে ওদের দুজনের। কোনটা কেমন জমে, বলবেন আমায়।

॥ ছয় ॥

হলের 'বি' সারিতে ষোল ও সতেরো নম্বরের নিঃশব্দ প্লে কতদূর কি জমল, হেমন্ত ঠাহর করতে পারেনি। অভিনয়-কালে হলের আলো নেভানো—আধ-অন্ধকারে উপরের বক্স থেকে অত নিচেকার এবম্বিধ সূক্ষ্ম কলা নজরে আসে না। আর এই তৃতীয় অঙ্কে এসে প্রেমাঞ্জনও মিইয়ে গেছে কেমন—অভিনয়ে প্রাণ নেই।

এরই মধ্যে এক দুর্ঘটনা।

সিন বদলের সময় স্টেজও অন্ধকার করে দেয়, নতুন সিন এসে পড়লেই আলো জ্বলে—মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। একবার আলো নিভল তো নিভেই আছে। ভিতরে চাপা গলায় কথাবার্তা, ব্যস্ততা। প্রেক্ষাগৃহ অধীর: হল কি আপনাদের—সিন ঘুরতে কতক্ষণ লাগে? সিটি মারছে। পর্দার বাইরে তখন যুক্তকরে অমিয়শঙ্করের আবির্ভাব, ফ্লাস-আলো তার মুখে পড়ল। বলছে, আমাদের একজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অভিনয়ে বাধা ঘটল বলে মাপ চাইছি। এক্ষুনি আরম্ভ হবে।

অসুস্থ থিয়েটারের কেউ নয়—তারামণি। খুনখুনে বুড়ি, অর্ধেক-মরণ মরেই আছেন। লাঠি ঠুকঠুক করে আসা তবু চাই-ই। উইংসের পাশে শঙ্কর ঘোষালের চেয়ারখানার উপর দুই পা তুলে উবু হয়ে বসবেন, নড়ন-চড়ন নেই, চোখের পলকও পড়ে না বোধহয় —শবদেহের মতো নিশ্চল। শীত নেই বর্ষা নেই—অভিনয়ের একটা রাত কামাই দেওয়া যাবে না। আবার থিয়েটার' ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, কারও দিকে না তাকিয়ে কারও সঙ্গে একটি কথাও না বলে লাঠি ঠুকঠুক করে ফিরে যান।

আজকেও যথারীতি স্থানুর মতো ছিলেন—ঢপাস করে আওয়াজ। কি হল—কী পড়ল রে, দেখ। তারামণি কাঠের মেঝেয় পড়েছেন।

চোখ বোঁজা, সাড়া নেই। প্রম্পটার বাণীকণ্ঠ উঁকি দিয়ে বলে, ব্যস—খতম। বুড়ি বাঁচল, আমরাও বাঁচলাম। কর্তারা এলাকাড়ি দিয়েছেন—এখন ডাক্তার এনে সার্টিফিকেট লেখান, শ্মশানের ব্যবস্থা করুন। আপদবালাই সরিয়ে ফেলে থিয়েটার তো চালিয়ে দিন আগে।

কিছু ভিড় ঐখানটা। শঙ্কর ঘোষাল খোপ থেকে এসেছেন। এমন কি দোতলার অফিসঘর থেকে সত্যসুন্দর পর্যন্ত। মড়া হঠাৎ চোখ পিট-পিট করে তাকায়, চিঁ চিঁ করে কথা বলে ওঠে: আমি মরিনি বাবাসকল। ভিরমি লেগেছিল।

তবে আর কি! হঠ যাও সব—। শঙ্কর ঘোষাল আজ আরম্ভে যেমন বলেছিলেন: পর্দা তোল, যার যেমন কাজ—গিয়ে দাঁড়াও।

নাটকে প্রণবের কাজ যেটুকু ছিল, সারা হয়ে গেছে। উইংসের পাশে একটা ইজিচেয়ার এনে তারামণিকে ধরাধরি করে তার উপর শোয়াল। নিয়ে গেল শঙ্করের খোপে। শঙ্কর দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। থিয়েটারের অনুরাগী এক ডাক্তার কাছাকাছি থাকেন—খবর পেয়ে তিনি ছুটে এলেন। দেখে-শুনে বললেন, দুর্বল খুব—দেহে বলশক্তি কিছু নেই। ব্যাধি, মনে হচ্ছে, ঐ দুর্বলতাই। তবে এখনই কোন ভয় নেই। ডাক্তারখানা থেকে কয়েকটা ট্যাবলেট ও এক ডোজ ভাইনাম গ্যালিশিয়া পাঠিয়ে দিলেন: এইগুলো খেয়ে যেমন আছেন তেমনি শুয়ে থাকুন। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম, তার পরে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

শঙ্কর প্রণবকে বলেন, আমায় তো সিনে যেতে হবে। তোমার কাজ হল, এখানে মোতায়েন থাকা—কথাবার্তা গোলমাল কোনকিছু না হয়। ধকল কাটিয়ে উঠলে তারপর বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।

অভিনয় পুরোদমে চলছে। হল ছেড়ে জয়ন্তী বেরিয়ে পড়ল।

দেখে সে প্রেমাঞ্জনের অভিনয়। আপাতত প্রেমাঞ্জন স্টেজে নেই, তাই কোনরকম আর মজা পাচ্ছে না। স্টেজের পিছনে পাইকারি গ্রীনরুমের পাশে শঙ্কর ঘোষালের মতোই পৃথক খোপ প্রেমাঞ্জনের জন্য। দরোয়ান জয়ন্তীকে খুব চেনে, মুখ টিপে হেসে সে পথ ছেড়ে দিল।

হাবুল হাত-মুখ নেড়ে তড়বড় করে কী সব বলছে প্রেমাঞ্জনকে—থিয়েটারি পলিটিক্স, আবার কি! এর কথা ওর কানে টুকটুক করে বলে সেই ব্যক্তিরই একান্ত অনুগত সে, এইরূপ প্রমাণের চেষ্টা। প্রেমাঞ্জন আয়নার সামনে বসে শুনে যাচ্ছ, আর মুখের মেক-আপের একটু-আধটু যা ঝরে গেছে নিঃশব্দে দাগরাজি করছে।

জয়ন্তী ঢুকে পড়ে বিনা ভূমিকায় বলে, একটু কথা আছে অঞ্জনদা।

হাবুল তটস্থ হয়ে উঠে পড়ল। প্রেমাঞ্জন বলে, বাইরে থাকো গে হাবুল। হয়ে গেলেই এসো আবার।

একেবারে কাছে এসে জয়ন্তী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, খুব শিগগির নতুন নাটক রিহার্সালে পড়বে। আপনি আমায় একবর্ণ জানাননি।

কিছু অবাক হয়ে প্রেমাঞ্জন বলে, নিজেই তো জানিনে।

আমি জানি। আর নাট্যকার কে, তা-ও বলতে পারি। সে ভদ্রলোক উপরের বক্সে বসে অভিনয় দেখছেন এখন। পায়ের ধূলো-টুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই আপনি খাতির জমাতে লেগে গেছেন। এত খবর জানি আমি।

প্রেমাঞ্জন রাগ করে বলে, পায়ের ধূলো নিয়েছি—তিনি তো আমার ইস্কুলের মাস্টারমশায়।

বাঃ, খাসা! মাস্টারমশায় যখন নাট্যকার, তাঁর উপরে অনেক আবদার চালানো যাবে—এই পাঠটা বাড়িয়ে দিন, ওটা এইরকম করা যায় কিনা দেখুন। আমার জন্য যদি কিছু করতে হয়—এখনই। নতুন মেয়ের জন্য কাগজে এরা বিজ্ঞাপনও দিয়েছে। দেখতে চান?

বলার অপেক্ষা না করে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে কাগজের কাটিংস বের করল।

প্রেমাঞ্জন বলে, বক্স-নম্বরে দিয়েছে। বিজ্ঞাপন মণিমঞ্চের, তোমায় কে বলল?

যে কাগজে বেরিয়েছে, তাদেরই ভিতরের লোক। খুঁজে বের করতে হয়েছে—। উচ্ছ্বাস ভরে জয়ন্তী বলে, পড়ে দেখুন। ঠিক যেন আমাকেই চাচ্ছে, আমাকে সামনে রেখেই যেন রূপ-বর্ণনা—

কিন্তু গুণ-বর্ণনায় যে গণ্ডগোল করে দিয়েছে। 'অভিনয়ে কিছু অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়'—তার কি জবাব?

মুখ কালো করে জয়ন্তী বলে, দায়ী তার জন্য আপনিই। অফিস-ক্লাবে পাঠ দিয়ে পাঠ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন আপনি, আমি শুধু মুখস্থ করে মরলাম।

প্রেমাঞ্জন জুড়ে দিল: ঘরোয়া থিয়েটারেও পাঠ দিয়ে ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল।

জয়ন্তী সুর নরম করে বলে, মানলাম সুবিধে হচ্ছিল না। আপনি শিখিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু সে হল কবেকার কথা, একেবারে পর-অপর তখন, খাটতে যাবেন কেন আমার জন্যে। এখন নিশ্চয় তা হবে না।

কিঞ্চিৎ খোশামুদি সুর মিশিয়ে বলল, সরোজা ছিল অজ-পাড়াগেঁয়ে আনাড়ি মেয়ে—তাকে নিয়ে তো হৈ হৈ পড়ে গেল। আপনার শিক্ষার গুণে। লোকে বলে গাধা পিটিয়ে আপনি ঘোড়া করতে পারেন।

প্রেমাঞ্জন হেসে বলে, লোকে বাড়িয়ে বলে। সরোজা কোনদিন গাধা ছিল না, জন্মসূত্রেই ঘোড়া। অমনটি স্টেজে আর দেখলাম না। অদ্বিতীয়া।

জয়ন্তী নাক সিঁটকে বলে, অদ্বিতীয়া বই কি। নাক থ্যাবড়া, ময়লা রং—

রূপের দিক দিয়ে সরোজা তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়। কিন্তু গলায় মধু ঢালত। সিনেমায় চেষ্টা করো জয়ন্তী, রূপের হয়তো কদর পাবে। স্টেজে আমাদের রূপ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আর্টিস্ট আসছে যাচ্ছে, দর্শক বেশ কিছুটা দূর থেকে দেখে—মেক-আপ নিয়ে তাদের চোখ সহজেই ফাঁকি দিই। এমনি যে মেয়েটার দিকে চোখ তাকিয়ে চাওয়া যায় না, রূপের রাণী নূরজাহান সেজে দিব্যি সে প্লে করে যায়—কণ্ঠের খেলা দেখাতে পারলেই হল। কিন্তু সিনেমায় ক্যামেরার চোখ, সে চোখে ধাপ্পা দেওয়া মুশকিল। কণ্ঠের ফাঁকি চলে সেখানে। গান গাইতে গিয়ে যে গাধার আওয়াজ তোলে, অন্যের সুরেলা গান তার গলায় দিব্যি বসিয়ে দেওয়া হয়। আগেও বলেছি জয়ন্তী, আবার বলি—স্টেজে তোমার সুবিধে হবে না। সিনেমায় হলেও হতে পারে, বলো তো চেষ্টা দেখি।

থাক, কিছুই করতে হবে না আপনাকে। যা পারি নিজের ক্ষমতায় করব।

জয়ন্তী ক্ষেপে গেছে একেবারে। বলে, আপনি আর্টিস্ট যত বড়ই হোন, মানুষটা সর্বনেশে। সামান্য মুখের কথাটা বলে দিতেও কৃপণতা, অথচ সোনার সংসার ভেঙে দিয়ে সর্বনাশ করেছেন আপনি।

প্রেমাঞ্জনের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে। সামলে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, সর্বনেশে আমি ঠিকই—কিন্তু ভেবে দেখ জয়ন্তী, তোমার সংসার তুমি নিজে ভেঙেছ, আমি নই। সর্বনাশ যদি করে থাকি সে আমার নিজের।

একটুখানি চুপ থেকে আবার বলে, তোমার পাশাপাশি রেখা এসে বসেছিল। থিয়েটার দেখেনি সে—চোখ সারাক্ষণ জলে ভরা, দেখবে কি করে? যাকগে। চারিদিকে লোক ঘুরছে, এসব কথা না হওয়াই ভাল। তুমি যাও।

দুম দুম করে পা ফেলে জয়ন্তী বেরিয়ে গেল।

তারামণি চাঙ্গা হয়েছেন, টরটর করে কথা বলছেন। উইংসের পাশে তাঁর জায়গাটিতে নিয়ে বসাতে বলছেন। সেটা উচিত হবে না, অন্তত আজকের রাতটা তো নয়ই। তার চেয়ে এবারে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হোক। থিয়েটার ভাঙলে ভিড় হবে, এক্ষুনি নিয়ে যাওয়া ভাল।

শঙ্কর ঘোষাল বললেন, কর্তামশায়ের গাড়িটা নিয়ে তুমি সঙ্গে থেকে পৌঁছে দিয়ে এসো প্রণব।

গ্রীনরুমের পাশে সত্যসুন্দরের গাড়ি আনল। ইজিচেয়ার থেকে তারামণি গাড়িতে। পাশে প্রণব—ধরে বসেছে। স্টার্ট দিয়েছে। চন্দ্রিমা—আর এক উদ্বাস্তু মেয়ে, থিয়েটারে নতুন যোগ দিয়েছে—ওদিকে হাত তুলে ছুটল : রোখো, রোখো। সে-ও যাবে। ম্যানেজার হরপদকে বলে এসেছে, ঐরকম মানুষ নিয়ে যাওয়া—একা না বোকা—অন্তত দু-জন থাকা ভাল? হরপদ হেসে সায় দিয়েছে।

গাড়ি চলল—তারামণির এপাশে প্রণব, ওপাশে চন্দ্রিমা। দুজনে ধরে বসেছে।

গলির গলি, তস্য গলি—ঘিঞ্জি বস্তি। বড়রাস্তার এত কাছে বড় বড় অট্টালিকার কানাচে এমন পাড়া বর্তমান আছে, চোখে না দেখলে প্রত্যয়ে আসে না। হঠাৎ তার মধ্যে কোঠাবাড়ি—বহু পুরনো, একতলা, মেরামতের অভাবে খসে গলে পড়ছে। মালিক তারামণি দাসী—নতুন বয়সে কোন এক প্রেমিক নাকি বানিয়ে দিয়েছিল। নিজের জন্য একখানা ঘর ও ঢাকা-বারান্দা, বাকি দু'খানায় ভাড়াটেরা থাকে। ভাড়া যৎসামান্য, অশন ও বসন তারই মধ্যে চালাতে হয়—নিজের, এবং একটা বাচ্চা মেয়ে কোত্থেকে এসে জুটেছে, রাঁধেবাড়ে দেখাশুনো করে, তারও। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়েছে, ভাড়ার বৃদ্ধি নেই। তারামণির তাই বড় কষ্ট।

আজ রাত্রে সেই বাড়ির দুয়ারে ঝকঝকে মোটরগাড়ি। বস্তির অনেক লোক ভিড় জমিয়েছে। থিয়েটারের দুটি সুবেশ সুন্দর ছেলে ও মেয়ে তারাবুড়ির দুই ডানা ধরে পরম যত্নে নিয়ে ঢুকছে—দেখবার বস্তু বই কি।

স্যাঁতসেতে ঘর, কিন্তু আয়তনে বেশ বড়। তারামণির বসবাস বারান্দায়, ঘর প্রায় বন্ধই থাকে, দৈবে-সৈবে ভাল লোক এলে দরজা খুলে বসানো হয়। জোরালো ইলেকট্রিক আলো—সুইচ টিপতে প্রণব স্তম্ভিত হয়ে যায়। চন্দ্রিমাকে বলে, দেখ দেখ—

এ যে বড় বিস্ময়—ঘর মণিমাণিক্যে সাজানো। মাজাঘষা চারখানা দেয়াল ঝকঝক তকতক করছে। মেঝেও তাই—ধুলো-ময়লার কণিকামাত্র নেই কোনদিকে। ঠিক চোখের সামনে দেয়ালের গায়ে কোন মহীয়সীর বিশাল ছবি। অঙ্গে রূপ ধরে না। পাশের তারামণিকে শুধায়: কে ইনি?

আমি, আমি—আবার কে। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী।

মাজা পড়ে-যাওয়া সত্তর বছুরে বুড়ি মানুষটি আর নেই—হাতের লাঠি ফেলে টনটনে খাড়া হয়েছেন। কোটরগত চোখ দুটো জ্বলছে যেন। ঘরময় ছবি। আঙুল ঘুরিয়ে দেয়ালের গায়ে গায়ে চক্কর দিয়ে ফিরছেন: আমি—আমি—আমি—আমি—আমিই সব।

পাগল হলেন নাকি? কে বলবে, এই খানিক আগে মারা গিয়েছেন বলে সকলে ভেবেছিল, ধরাধরি করে ইজিচেয়ারে তুলতে হয়েছিল। হাত ধরে টেনে, কখনো প্রণবকে কখনো-বা চন্দ্রিমাকে, এক একটা ছবির কাছে নিয়ে পরিচয় দেন: আমি নূরজাহান, আমি রিজিয়া, আমি লক্ষ্মীবাঈ, আয়েসা, ইন্দিরা, মীরাবাঈ, পদ্মিনী, শৈবলিনী—। ইতিহাসের আর উপন্যাসের যত নাম-করা নায়িকা, ভাঙা কোঠার দেয়ালে সবাই আসর জমিয়ে আছেন।

ঘরে কয়েকখানা জলচৌকি। উত্তেজনার শেষে তার একখানায় তারামণি বসে পড়লেন। হাঁপাচ্ছেন। প্রণব ও চন্দ্রিমা ঘুরে ঘুরে

দেখছে—দুজনের মধ্যে ভিট-ভিট করে অন্যের অবোধ্য কথাবার্তা। কিছু ইতস্তত করে প্রণবের প্রশ্ন: পুলিস-সার্জেণ্টদের ধাপ্পা দিয়ে স্বদেশি ছেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন—সে তো এই ঘরেই?

আমার সবচেয়ে বড় অভিনয়—কে বলেছিলেন জানো? তখনকার মালিক, এই সত্যবাবুর বাবা মণি-কর্তামশাই। যাঁর নামে থিয়েটার।

পুরানো স্মৃতির ভারে তারামণি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। বলেন, মা-মা করত, আমার পেটের ছেলেরও বেশি হয়েছিল ছেলেটা। তাকেই নাগর বানিয়ে বেশরম নাচ, অসভ্য গান, কত রকম ঢলাঢলি বেলেল্লাপনা—আমি কি কম?

হাসছিলেন ফিক ফিক করে। জিভ কাটলেন তার মধ্যে লজ্জায়। হাসতে হাসতে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন—অক্ষিকোটর জলে ভরতি। বলছেন, এত কষ্টে সরিয়ে দিলাম—নেচে-কুঁদে আমার গায়ের রক্ত জল করে। আমার এসেছিল মরতে—ফাঁসির দড়ি গলায় না দিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছিল না পাজি হতচ্ছাড়া বজ্জাতের ঝাড়—

অনেক রাত্রি। পথে বেরিয়েছে যুবা প্রণব আর যুবতী চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমা বরানগরে থাকে, সেই অবধি যাবে প্রণব—পৌঁছে দিয়ে ফিরবে। নির্জন পথে পায়ের শব্দ বাজছে। সহসা প্রণব কথা বলে ওঠে: মা-কুরু ধনজনযৌবন-গর্বম্—। তারামণির গানে নাচে মানুষ পাগল, তারামণির রূপ দেখতে সারা শহর ভেঙে এসে পড়ত, একলা তারামণিকে ভাঙিয়েই নিউ ক্যালকাটা থিয়েটারের মালিক লাখ লাখ টাকা করল—থুত্থুড়ে-বুড়ি ওই মানুষটিকে দেখে কে তা বিশ্বাস করবে আজ?

॥ সাত ॥

প্রেমাঞ্জন সম্পর্কে অমিয়শঙ্কর বলল, জিনিয়াস। আবার পরক্ষণেই বলল, স্কাউণ্ড্রেল। তাকে নিয়ে নাটক লিখতে বলে। সিনেমা-থিয়েটারে সে নাটক করে—এদিকে তার নিজের জীবনই এক নাটক। লিখবে হয়তো হেমন্ত কোন একদিন। 'প্রতারক' নাম বললে এখন হয়েছে 'মানুষের কান্না'—আপাতত তারই কাপি বগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে, একটা গতি হয়ে গেলে যে হয়। প্রেমাঞ্জন-নাটক পরে ভাবা যাবে।

আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় না—প্রেমাঞ্জন হয়েছে শালগাছ। বাপ ভবসিন্ধু। অবস্থা মাঝামাঝি। গলির মধ্যে ছোট্ট একতলা বাড়ি। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, তিন কাঠা জমির উপর কায়ক্লেশে ভবসিন্ধু চারটে কুঠুরি তুলেছিলেন।

প্রেমাঞ্জন নয় তখন—এককড়ি, নিরলঙ্কার পিতৃদত্ত নাম। ভারসিজ মার্কেটিং কোম্পানির পাবলিসিটি বিভাগের কেরানি। ভবসিন্ধু অ্যাটর্নি-অফিসে কাজ করেন। থিয়েটারওয়ালাদের অনেকেই সেই অ্যাটর্নির মক্কেল। সেই সুবাদে ভবসিন্ধু ইচ্ছামাত্রেই পাশ পেয়ে যান। মার্কেটিং কোম্পানির বড় অফিসারকে বছর খানেক ধরে দেদার পাশ বিলিয়েছেন তিনি—বাড়ি এসে এসে পাশ দিয়ে যান মিসেসের হাতে। অতএব ছেলের এই চাকরিটুকু না হয়ে যাবে কোথা?

এককড়ির অভিনয়ে বড় ঝোঁক। টালিগঞ্জের এক শখের যাত্রা-দলে পুরুষের পার্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি, কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রের জন্য লোক জোটানো দায়। গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজতে কেউ চায় না। এককড়ি রাজি। উপরন্তু চেহারা ভারি চটকদার—রাজকন্যা-রাজপুত্র

যা-ই সাজুক, খাসা মানায়—লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখে। পাঠে কিছু গড়বড় হলেও আমলের মধ্যে আনে না।

এরই মধ্যে এক বিষম কাণ্ড—এককড়ি ও পাশের বাড়ির মেয়ে রেখা দারুন প্রেম জমিয়ে বসেছে। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে রেখা, এককড়িও সুন্দর। কিন্তু জাত আলাদা—এককড়ি কায়েত, রেখা গোয়ালা। রেখার বাপ মধুসূদন ঘোষ ঘি-মাখনের ব্যবসায়ে লাল হয়ে গেছেন। বয়স কম রেখার, লেখাপড়া যৎসামান্য জানে, কিন্তু আহ্লাদে মেয়ে—গোঁ বিষম। বাপ-মা-ভাই কেউ কিছু নয়, এককড়িই সব—সে যা বলবে তাই বেদবাক্য। সকলের মাথা-ভাঙাভাঙিতেও তা থেকে নড়াচড়া নেই। মধুসূদন মেয়ের জন্য ভাল সম্বন্ধ আনলেন—স্বশ্রেণীর মধ্যে যতদূর ভাল হতে হয়। সুশ্রী সুন্দর, এম-এ'তে ফার্স্টক্লাস-ফার্স্ট—কাজকর্মে ঢোকেনি এখনো। মধুসূদন চানও না, তাঁর জামাই পরের গোলামি করবে। বিয়ের পর দিন থেকে নিজের কারবারে নিয়ে নেবেন জামাইকে, কোন ঘরে কোন চেয়ার-টেবিলে বসবে তার ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে আছে।

রেখা এসে খবর দিল : আমার যে বিয়ে এককড়ি-দা। বাবা উঠে-পড়ে লেগেছেন।

মা-দুর্গা বলে ঝুলে পড়্—আবার কি !

বর সেই ননীগোপাল—

ভাল হবে, তোর বাড়ি গিয়ে ক্ষীর-ননী খেয়ে আসব।

রেখা বলে, হবে কেমন করে ? বিয়ে তো করব আমি। আমি যে তোমায় ছাড়া বিয়ে করব না।

এককড়িও তেমনি সুরে বলে, হবে কেমন করে পাগলি ? আমি যে করব না।

ইস্, না করে আর পারতে হয় না।

জাত আলাদা যে। আমার সেকেলে বাবা তোকে বউ করে নিতে রাজি হবেন না।

রেখা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বিয়ে করবে তুমি। তুমি রাজি হলেই হয়ে যাবে।

এককড়ি বলে, তোকে বউ করে নিয়ে বাড়ি উঠলে বাবা কেটে দু'খণ্ড করে ফেলবে।

রেখার সাফ জবাব: বাড়িতেই যাব না তাহলে।

খাব কি? ভালবাসা খেয়ে পেট ভরে না রেখা।

নির্ভীক রেখা বলে, তবে খালি পেটেই থাকা যাবে। না হয় মরব। মরার বেশি তো কিছু নয়।

না, তার বেশি আর কি হবে।

একেবারে জোঁকের মতন লেপটে আছে। মরীয়া হয়ে এককড়ি ভবসিন্ধুকে বলে ফেলবে ঠিক করল। কিন্তু দরকার হল না, মধুসূদন ঘোষই একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। বড়লোক মানুষ উপযাচক হয়ে কি জন্য এসেছেন, ভবসিন্ধু বুঝতে পারেন না। আসুন, আসুন—করে তটস্থ হয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

মধুসূদন বিনা ভূমিকায় বললেন, আমার মেয়ের একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে।

খুব আনন্দের সংবাদ।

কিন্তু বাগড়া দিচ্ছে—না হবার গতিক।

ভবসিন্ধু সবিস্ময়ে বলেন, সে কি কথা। কে এমন শত্রুতা করছে?

কপালের কথা কি বলি। শত্রু বাইরের নয়, আমার মেয়েটাই।

কী মুশকিল! মা অতি শান্তস্বভাব বলেই তো জানি। এমন কুবুদ্ধি হল কেন?

কিছু ইতস্তত করে মধুসূদন বলেন, জুড়ি হল এককড়ি বাবাজী —মেয়ে সর্বদা তারই নাম করছে।

ঢোক গিলে মধুসূদন আবার বলেন, সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্র—সন্দেহ কি। কিন্তু বিপদ হয়েছে, জাত্যাংশে আলাদা হওয়ায় সমাজে আপত্তি উঠবে।

আপত্তি ভবসিন্ধুরও। তবু অপর পক্ষ কেঁচো হয়ে পদতলে পড়েছে, এ মওকা ছাড়বেন কেন তিনি? বললেন, আমরা কুলীন কায়স্থ, মধ্যাংশ-দ্বিতীয়পো—সামাজিক ভাবনা আমারও যথেষ্ট। তবে কি জানেন—ছেলে-মেয়ে উভয়ে যখন একমত, আমার ছেলেকে পারলেও আপনার মেয়ে সামলানো তো বেশি কঠিন। মা-লক্ষ্মী বড্ড জেদি।

মধুসূদন বললেন, সে আমি বুঝব। ছেলের দিকটা আপনি দেখুন।

ইতস্তত ভাব দেখে খপ করে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলেন: ছেলে ঠেকান। আমি চিরকাল কেনা হয়ে থাকব।

মধুসূদনের চোখে জল, মুঠোয় নোট। নোটগুলো ভবসিন্ধুকে দিয়ে হাত মুঠোয় এঁটে দিলেন।

এ তো বড় মজা। ভবসিন্ধুর পাঁচ ছেলে—আঁচ করে রেখেছিলেন, ঐ পাঁচ শুভবিবাহে খরচখরচা বাদে নগদ পাঁচটি হাজার নিট মুনাফা রাখবেন। তাতে চার কুঠুরির দোতলা এবং সিঁড়ির ঘরের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এ দেখি, যেমন ছেলে তেমনি রইল—বিয়ে ভাঙার জন্য ফাঁকতালে টাকা আসছে। মধুসূদন চলে যাবার পর গণে দেখলেন, একশো টাকার নোট পাঁচখানা। অতএব রেখায় ও এককড়িতে অবস্থা সবিশেষ ঘনীভূত, সন্দেহ নাস্তি। চাপ দিলে হেন অবস্থায় একশো টাকার আরও যে খান পাঁচেক বেরিয়ে আসবে না, এমন মনে করার হেতু নেই।

চোখ পাকিয়ে এককড়িকে বললেন, মেয়ের কি মন্বন্তর হয়েছে? কত গণ্ডা বিয়ে করতে চাস বল্। এই মাসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি।

এককড়ি চুপ করে থাকে।

সরকার-বাড়ি পাকা-কথা দিচ্ছি—সে-ও আহা-মরি মেয়ে। মধু ঘোষের মেয়ের সঙ্গে হবে না। রেখাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বাতিল করে দিয়ে আয়।

এককড়ি ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল। এবং পরের দিন বিকালবেলা ফিরে এসে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। পিছনে নেমেছে মাথায় ঘোমটা সিঁথি-ভরা সিঁদুর ও-বাড়ির রেখা। কালীঘাটে মা-কালীকে সাক্ষি রেখে এককড়িই সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে। এবং বস্তির একটা ঘরে পুরুত-পরামাণিক ডেকে বিয়ের রীতকর্মও মোটামুটি সেরে নিয়েছে।

ভবসিন্ধু গর্জে উঠলেন: ছেলের জায়গা আছে, বউয়ের এ-বাড়ি জায়গা হবে না।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, জোড়ে আবার উঠে পড়ল।

গলির গলি তস্য গলি, তারই মধ্যে এক কুঠুরি—জেনেবুঝেই আগে থাকতে ভাড়া করে এসেছে। যা কষ্টটা করছে রেখা। বড়লোকের মেয়ে—জুতো খুট-খুট করে বেড়াত, পায়ে ধুলোমাটি লাগে নি এদ্দিন, গায়ে আগুনের আঁচ লাগে নি। সেই রেখার কী খাটনি—কাপড়-কাচা জল-তোলা রাঁধাবাড়া সমস্ত একহাতে। একটা ঠিকে-ঝি আছে—বাসন ক'খানা মেজে ঘর মুছে দিয়ে চলে যায়। তা-ও ক'দিন রাখতে পারবে, কে জানে।

রেখার মা সর্বমঙ্গলা এক একদিন হঠাৎ এসে পড়েন। মায়ের প্রাণ বুঝ মানে না। কেঁদে বলেন, সোনার বর্ণ যে কালি-কালি হয়ে গেল মা। ক'দিন থেকে যা আমাদের কাছে।

রেখা বলে, আমি তো ভাল থাকব ভাল খাব মা, কিন্তু আর একজনকে খুন করলেও তো বড়লোকের বাড়ি যাবে না।

তার খাবার দুইবেলা ঠাকুর পৌঁছে দিয়ে যাবে।

আমি সামনে না থাকলে তার খাওয়া হয় না মা।

সর্বমঙ্গলা রেগে বলেন, তিলে তিলে আত্মহত্যা করবি তুই?

তিলে তিলে করব না মা, করি তো একই সঙ্গে একদিন জোড়ে করে ফেলব। হৈ-হৈ পড়ে যাবে—

হি-হি করে হাসছে রেখা। বলে, লিখে যাব, 'আমাদের মৃত্যুর

জন্য কেউ দায়ী নয়' এমনি মামুলি জিনিস নয়—লিখব, 'এই মৃত্যুর জন্য আমাদের উভয়ের মা-বাবারা দায়ী'। পুলিস মহলে ছুটোছুটি —আত্মহত্যা না খুন? কাগজে কাগজে নাম-ধাম আর ছবি—জ্যান্ত থাকতে তো হবে না—মরে যাবার পরে। দু-জনের জোড়া-ছবি।

আজকে কত জায়গায় কত ছবি—জোড়া নয়, শুধু প্রেমাঞ্জনের। রেখা বড় একাকী।

এই অবস্থায় সেই এক-কুঠুরির অন্ধকারে প্রথম-বাচ্চা হয়েছিল। ফুটফুটে ছেলে, লম্বা-চওড়া চেহারা। কোন খেয়ালে না-জানি, নাম দিয়েছিল রণবিজয়। ছ'মাস হতে না হতে চলে গেল—তার মধ্যে ছেলের পায়ে একজোড়া জুতো পর্যন্ত দিতে পারে নি। আজকের পাগল রেখা সেই সব বলে কখনো-সখনো, হাউ হাউ করে কাঁদে।

বিনোদ সমাদ্দারের মাথায় তখন 'উঁকিঝুঁকি' চেপেছে। থিয়েটার ও স্টুডিও-পাড়ায় ঘোরাঘুরি খুব। সেকালের 'শঙ্খধ্বনি'র কথা অনেকে জানে, সেই বাবদে খাতির-সম্ভ্রম করে। বিশেষত মণিমঞ্চের একমাত্র স্বত্বাধিকারী সত্যসুন্দর চৌধুরি, যেহেতু তাঁর বাপও ঐ পথের পথিক। বিনোদকে এককড়ি গিয়ে ধরল—উঁহু, এককড়ি নয়, প্রেমাঞ্জন এবার থেকে। প্রেমাঞ্জনকে নিয়ে বিনোদ সত্যসুন্দরের কাছে উপস্থিত।

আপাদমস্তক বারম্বার তাকিয়ে দেখে সত্যসুন্দর মন্তব্য ছাড়লেন: আহা রে!

বিনোদ বলে, কেমন দেখছ?

সত্যসুন্দর খিঁচিয়ে ওঠেন: এদ্দিনেও তোমার আক্কেল হল না। লাইনের নয়—একে নিয়ে এলে কেন?

এলেম আছে হে। যাত্রা-পার্টিতে স্বচক্ষে কাজকর্ম দেখে তবে এনেছি। থিয়েটারে আসতে চায়। অধ্যবসায়ও আছে।

সত্যসুন্দর সরাসরি এবার প্রেমাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানে কেন মরতে এসেছ ?

বিনোদ হেসে বলে, তোমরা ফাঁদ পেতে রেখেছ কি মানুষের মরণের জন্ম ?

সত্যসুন্দর একই সুরে বলে যাচ্ছেন, এখন এই দেবতার মূর্তি, তাকালে নজর ফেরে না—আর পরিণামে হয়তো সামনে এলে দেখার ভয়ে চোখ বুজতে হবে। লুচ্চো, নেশাখোর, বিতিকিচ্ছিরি চোয়াড়ের চেহারা—

বিনোদ বলে, সবাই কি আর হয়! ভালও তো আছে।

সামান্ত। সারা জন্ম এদের নিয়েই তো কাটালাম। ছোকরা-ছুকরি নতুন এলে গোড়ায় আমি এমনি করে বলি। ধর্ম তরাই। মনে-মনে ঠাকুরকে বলে রাখি, সাক্ষি তুমি ঠাকুর, আমি কিন্তু সামাল করেছিলাম।

বিনোদ সহাস্তে বলে, যাকগে, ধর্ম-তরানো তো হয়ে গেল। নামটা লিখে নাও দিকি এইবার।

কর্তার সঙ্গে মোলাকাতের এই গল্প প্রেমাঞ্জন রেখার কাছে করেছিল। রেখা তো হেসেই খুন: তুমি কোন ধাতুতে গড়া, কর্তামশায় জানেন না।

প্রেমাঞ্জন ভয় দেখিয়েছিল: বহু আর্টিস্ট পা পিছলেছে ওখানে। তারা অভিনয় করতে যায় না, ঐসব করতে যায়।

এককথায় উড়িয়ে দিয়ে রেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তোমায় জানি বলেই বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সকলকে বিসর্জন দিয়ে তোমায় নিয়ে ভেসেছি।

রেখা তখন মা হতে যাচ্ছে। একদিন প্রেমাঞ্জন বলল, বিনুদাকে ট্যুইশানির কথা বলেছিলাম। একটার তিনি খোঁজ দিয়েছেন।

রেখা বলে, বাতিল করে দাও। এক্ষুনি।

প্রেমাঞ্জন বলে, সংসার তো বাড়তে যাচ্ছে। চলবে কিসে শুনি ?

বাড়ুক না। তোমার এত ক্ষমতা, এমন করে মানুষ মাতাতে পারো। তুমি যাবে প্রাইভেট পড়াতে—ছিঃ!

রেখা দারুন রাগ করল: সংসার আমার। তার উপরে তুমি কেন টিপ্পনী কাটতে আসবে। খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু অসুবিধা হচ্ছে—কী সেটা, বলে দাও। নিজে আমি বাজারে যাব, ঝিকে দিয়ে হচ্ছে না বুঝলাম।

মণিমঞ্চের অভিনয়ে সর্বপ্রথম সেদিন প্রেমাঞ্জন যাচ্ছে। রেখাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। ট্রামে উঠল প্রেমাঞ্জন—রেখাও।

প্রেমাঞ্জন বলে, তুমি কোথা যাবে? ভিতরে যাওয়া ঠিক হবে না কিন্তু। টিকিট করেও না—থিয়েটার জায়গায় কোন-কিছু গোপন থাকে না। বলবে, দেখ, আদেখ্‌লের মতন ল্যাজ ধরে এসেছে। হতাম বড়দের কেউ, রাস্তা অবধি ছুটে এসে খাতির করে তোমায় নিয়ে বসাত।

রেখা বলে, হবে তুমি তাই—বেশি দেরি হবে না। তোমায় ছাই-চাপা দিয়ে রাখবে কার সাধ্য? দপ করে আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে।

দৃঢ়স্বরে আবার বলে, স্টার আর্টিস্টের বউ আমি—মালিক বাড়ি এসে গলবস্ত্র হয়ে নেমন্তন্ন করবে, তোমাদের থিয়েটারে সেইদিন প্রথম আমি পা ছোঁয়াব।

পাগল আর কাকে বলে! প্রেমাঞ্জন তামাশা করে: আগুনের দপদপানি রিহার্শালেই ওরা মালুম পেয়ে গেছে। গলবস্ত্র হয়ে আজকেই তোমার কাছে গিয়ে পড়ত, কিন্তু বস্তির মধ্যে যে গাড়ি ঢোকে না—কি করবে!

ট্রাম থেকে নেমে পড়ল দু-জনে একসঙ্গে, থিয়েটারের একেবারে সামনে। এতক্ষণ ধরে রেখা সেই আগের ভাবনাতেই বুঝি মসগুল ছিল—প্রেমাঞ্জন স্টার-আর্টিস্ট, প্রেমাঞ্জনের বউ বলে রেখারও খাতির খুব। বলল, তখনও কিন্তু ঐখানে থাকব। চিরকাল না

হোক, ছ-মাস ছ-মাস অন্তত। মস্ত মস্ত গাড়ি রেখে মানুষ হেঁটে তোমার কাছে আসবে। কতবড় তুমি—পাড়ার লোকে কদর বুঝবে সেদিন।

বিপরীত ফুটপাথে উঠে রেখা সড়াক করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এই দিকে ওদের এক আত্মীয় থাকে। বিয়ের পর থেকে যাতায়াত বন্ধ। আনন্দের অতিশয্যে হয়তো-বা সেখানে গিয়ে ডাক করতে বসে গেছে।

ছুটো সিনে প্রেমাঞ্জনের কাজ—ডায়ালোগ সর্বসাকুল্যে আট নম্বর। কথা ক'টি কখন বলা হয়ে গেছে—স্টেজের পিছনে কিছু দূরের আধ-অন্ধকারে আছে বসে সে চুপচাপ। বাড়ি গিয়ে কী হবে—তার চেয়ে নাটুকে রসে যতক্ষণ মজে থাকা যায় পর্দার পিছনে এই রহস্যময় জগতে। যারা অভিনয় করছে তারা তো বটেই, যারা অভিনয় করে না—স্টেজ ঘোরায় সিন সাজায় প্রম্‌ট্ করে কনসার্ট বাজায়, এমন কি যারা চা-পান এনে দেয় নটনটীদের, সকলেই এই রহস্য-জগতের বাসিন্দা। প্রেমাঞ্জন সমস্তটা দিন (এককড়িবাবু তখন) মার্কেটিং কোম্পানির কেরানি। দিনের আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে এইখানে তার প্রবেশাধিকার—অফিসের চালচলনের সঙ্গে তখন আর তিলার্ধ মিলবে না।

আবিষ্ট হয়ে ছিল সে সারাক্ষণ। সাড়ে-ন'টায় শেষ ড্রপ পড়ল। দর্শক বেরিয়ে গেল, প্রেক্ষাগৃহ খালি। গ্রীনরুমও ক্রমশ জনহীন হচ্ছে। কথাবার্তা ঘরোয়া এখন—কার ছেলের অসুখ, কার বাড়িতে কবে চোর এসেছিল, ইলিশমাছের এবার আমদানিই নেই মোটে। মাটির জগতে সবাই নেমে এসেছে। প্রেমাঞ্জন বেরিয়ে পড়ল অগত্যা।

হন-হন করে যাচ্ছে। মোড় অবধি এগিয়ে গিয়ে ট্রামে উঠবে, ছুটো পয়সা কম লাগবে। পিছনে হাতের স্পর্শ—ভারি মিষ্টি হাত। তাকিয়ে দেখল—রেখা। অবাক লাগে, ভালও লাগে।

তুমি এখানে—এই রাত্রি অবধি? সেই থেকে রয়েছ—বাড়ি যাও নি?

একলা বাড়ি বসে কি করব? দু-জনের রান্না—সে তো সেরে রেখে এসেছি।

প্রেমাঞ্জন বলে, আমি স্টেজের ভিতর ছিলাম, তুমি কি সারাক্ষণ পথে পথে ঘুরছিলে?

বসবার জায়গা নেই বুঝি আমার?

প্রেমাঞ্জন বলে, তা কেন হবে। সুধা-মাসিমা তো এই দিকেই—

শেষ করতে দিল না রেখা, দপ করে জ্বলে উঠল: তোমায় যে নিন্দেমন্দ করে সে আমার মাসি নয়—কেউ নয়। বসবার পুণ্যস্থান দক্ষিণেশ্বর—ঠাকুর রামকৃষ্ণের জায়গা।

জিজ্ঞাসা করে: থিয়েটারের দেবতা হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ—তাই না?

মাথা নিচু করে প্রেমাঞ্জন সায় দেয়: সব গ্রীনরুমে পরমহংসদেবের ছবি—নিত্যি সেখানে ধূপধুনো দেয়। ঠাকুরকে প্রণাম করে তবে আর্টিস্ট স্টেজে যাবে। রীতকর্ম এই সব। প্রোগ্রামেও দেখ—শুরুতে শ্রীদুর্গা সহায় নয়, শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা।

রেখা হাসছে। হাসতে হাসতে বলে, স্টেজে তুমি অভিনয় করছিলে, আর সারাক্ষণ আমি মন্দিরের চাতালে বসে কাকুতি-মিনতি করছিলাম: তোমার যেন জয়-জয়কার পড়ে যায়।

প্রেমাঞ্জন বলল, কথা মোটমাট পাঁচটা কি সাতটা—লোকের কানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সিন পালটে যায়। জয়-জয়কার পড়বার একটু সময় তো চাই।

কিন্তু হল তাই। অঘটন ঘটল। আনকোরা-নতুন আর্টিস্টের মুখের সামান্য কয়েকটা কথা—দু-চার রাত্রের মধ্যেই তাই নিয়ে সাংঘাতিক রকম নাম বেরিয়ে গেল। হল-ভরা দর্শক তাকিয়ে থাকে কতক্ষণে প্রেমাঞ্জনের সিনটুকু আসবে। ধনী বাপের কনিষ্ঠ ছেলে হয়েছে সে—উচ্ছৃঙ্খল, অপদার্থ। এমনিতেই সুরূপ, তার উপর মেক-আপ নিয়ে অপার্থিব চেহারা খুলেছে। বাপের এক নৃশংসতার

প্রতিবাদে কড়া কড়া কথা বলে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। নাটক থেকেও ঐ একেবারে বেরোনো—পরবর্তী দুই অঙ্কের মধ্যে কোনখানে আর প্রবেশ নেই। হল ঐ সময়টা ফেটে পড়ে। রজত দত্ত শঙ্কর ঘোষাল ইত্যাদি পয়লানম্বুরি আর্টিস্টরা তলিয়ে গেলেন—লোকে ঘরে ফিরছে, সবগুলো মুখে প্রেমাঞ্জনের কথা।

খোশামুদি করে হাতে-পায়ে ধরে সেদিন মাত্র থিয়েটারে ঢুকল—দেখতে দেখতে কত খাতির তার! ম্যানেজার হরপদ খোঁজ করে স্টেজের পিছনের সেই আধ-অন্ধকার জায়গায় গিয়ে ধরল: কর্তার সঙ্গে কেবল তো মুখের কথা—এইবারে একটা এগ্রিমেণ্ট হওয়া উচিত প্রেমাঞ্জনবাবু, সব আর্টিস্টের সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে। আসুন।

অফিসে নিয়ে চলেছে, আর সমানে জ্ঞানদান করছে: হাততালি শুনে অমনি 'আমি কী হনু রে—' ভাববেন না। মনে দেমাক হলেই বুঝবেন আর্টিস্টের বারোটা বেজে গেল। হাততালির মধ্যে আপনার কতখানি পাওয়া আর নাট্যকারের কি পরিমাণ, তা-ও বিচার করে দেখবেন। যে সিচুয়েশনখানা দেওয়া হয়েছে, ওখানে আপনি না হয়ে আমাদের সূর্যমণি যদি কথা ক'টা বলে ছুটে বেরুত, তার পিছনেও হাততালি পড়ে যেত।

বাইরেরও নজর টেনেছে। বাণী থিয়েটারের লোক ঠিকানা নিয়ে একদিন ওদের বস্তিপাড়ায় গিয়ে পড়ল: আমাদের পরের নাটক নকুল ভদ্র লিখছেন। ভদ্রমশায়কে জানেন তো—বাঁ-হাতে লিখে দিলেও ফেলে-ছড়িয়ে দুশো নাইট। আপনার কাজ দেখেছেন তিনি—আপনাকে ধরেই নাটকটা বানাতে চান।, নায়ক হবেন আপনি—মাইনে ডবল। বুঝুন।

ঝামেলা এড়ানোর জন্য প্রেমাঞ্জন মুখ শুকনো করে রীতিমত একখানা অভিনয় করে দিল: ভালই তো হত। কিন্তু কণ্ট্রাক্টে সই মেরে বসে আছি যে। তিনটি বছরের আগে নড়াচড়ার উপায় নেই।

আবার জুবিলি থিয়েটারের এক খবর। উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে

সরোজিনী নামে (থিয়েটারি নাম—সরোজা) একটি মেয়ে পাওয়া গেছে—পাবলিক-থিয়েটারে এই প্রথম নামছে। মেয়ের মতন মেয়ে—সেকালের তারাসুন্দরী নরীসুন্দরীরা যা ছিলেন। সেই মেয়ে নাকি বলেছে, ফাঁকা মাঠে একলা ঢোলের বাদ্যি বাজিয়ে করব কি ? পেতাম প্রেমাঞ্জনবাবুকে, নব পর্যায়ে 'কুসুম ও কাঁটা' করে দেখিয়ে দিতাম অভিনয় কারে কয়।

প্রেমাঞ্জন শুনল। শুনে মুখ বিষণ্ন করে বলল, লোভ তো হচ্ছে খুব। কিন্তু কি করব, কন্ট্রাক্টে হাত-পা বাঁধা যে আমার।

তাজ্জব ঘটল কিছু দিনের মধ্যে। প্রেমাঞ্জন জুবিলিতে গেল না তো সরোজাই এসে পড়ল মণিমঞ্চে। এলো উপযাচক হয়ে কম মাইনে স্বীকার করে, প্রেমাঞ্জনের জুড়ি হয়ে নামবে সেই লোভে। মণি-কাঞ্চন যোগাযোগ যাকে বলে। খুব অল্প দিন নেমেও সরোজা রীতিমত নাম করে ফেলেছে।

গেঁয়ো নাম সরোজিনী ছেঁটে কেটে সরোজা বানিয়ে নিয়েছে সে। ফরিদপুরে বাড়ি ছিল। চার ভাইয়ের পরের বোন, আহ্লাদি মেয়ে। উদ্বাস্তু দলের সঙ্গে এসে এক জবরদখল কলোনিতে উঠেছিল। ইস্কুলে পড়ত, পড়াশুনোয় ভাল। কলকাতায় এসে পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরোজিনী কেঁদে বাঁচে না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করল শেষটা। বড় ভাই তখন ইস্কুলে নিয়ে গেল ভরতির জন্য—পেটে না খেয়েও তার মাইনেপত্তর জোগাবে। কিন্তু ইস্কুলে ঢোকানো চাট্টিখানি কথা নয়, বেকারের চাকরি জোটানোর মতোই। বিশেষত উদ্বাস্তুর যখন ধরাচারা নেই—কোন মিনিস্টারের চাপড়াসিটাও সরোজিনীর হয়ে সুপারিশ করতে যাবে না।

হেডমিস্ট্রেস ঘাড় নেড়ে বলে দিলেন, উপায় নেই, ক্লাস সেভেনে সব সিট ভরতি।

চার ভাইয়ের বোন সরোজিনীর চোখ দুটো বড়ো বড়ো—

সামান্যে চোখ ভরে জল এসে যায়, অঝোর ধারায় গাল বেয়ে গড়ায়। বাড়ির লোকে বলত, লেবুর পানি—সাবেক কর্তারা কাগজি-পাতি-কলমভাগ লেবু দেদার আর্জে গেছেন। কথা পড়তে পায় না—সেইসব লেবুর রস জল হয়ে চোখে এসে পড়ে। ইচ্ছে মতন কেঁদে ফেলা—এই জিনিসটা কিন্তু সিনেমা-থিয়েটার জীবনে সরোজার খুব কাজে এসেছে। গ্লিসারিন লাগে না এই আর্টিস্টের—কান্নাটা তাই অতি স্বাভাবিক হয়ে লোক কাঁদাতে পারে।

ইস্কুলের ব্যাপারেও চোখের জল গালে গড়িয়ে এলো। হেডমিস্ট্রেস গলে গেলেন: কেঁদো না তুমি। পরশুদিন এসো—একটা মেয়ের ট্রান্সফার নেবার কথা আছে, দেখব।

ইস্কুলে ঢুকল সরোজিনী। চালাক-চতুর মেয়ে, আন্টিরা খুশি। অন্য মেয়েরা সাজগোজ করে আসে, নিত্যিদিন সাজ বদলায়—আজ যে পোশাক কাল তা নয়। কিন্তু সরোজিনী পাবে কোথায়, একই কাপড় ময়লা না হওয়া অবধি পরে আসতে হয় তাকে। অন্যেরা সরে সরে বসে, কী গন্ধ কী গন্ধ—বলে নাক সিঁটকায়। একদিন কালি ঢেলে কাপড় নষ্ট করে দিল—অসাবধানে যেন পড়ে গেছে পরের দিন অগত্যা কামাই—বিস্তর সাবান ঘষাঘষি করে, খানিকটা কালি তুলে সেই কাপড়েই আবার আসতে হয়। চরম হল কয়েকটা দিন পরে। ইস্কুল থেকে সরোজিনী বাড়ি ফিরছে—সহপাঠিনী এক মেয়ে কাগজে মুড়ে পুরানো শাড়ি একখানা হাতে গুঁজে দিল। বলে, দু-খানা তো হল—বদলে বদলে পরে এসো ভাই। আর, সেই পথের উপরেই গরিব মেয়ের হাপুসনয়নে কান্না।

কান্না একেবারে পোষাপাখি,—ইচ্ছা মাত্রেই বেরিয়ে আসে। পরিণামে তাই সরোজিনীর সকলের বড় সম্পদ হয়ে উঠল। কলোনিতে বাস—নানান জেলার নানা ধরনের মানুষের পাশাপাশি ঘর। পুজোর সময় সর্বজনীন দুর্গাপুজো হবে, এবং সেই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী থিয়েটার। সে থিয়েটার নিজেরাই যা পারে করবে। এমন কি

স্ত্রী-চরিত্রের জন্যে বাইরে যাবে না—ক'টি ছোঁড়া গোঁফ কামিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি। কিন্তু মেয়ে-তরফের আপত্তি: তা কেন, আমরা কি সব বোবা? অর্থাৎ শহরের প্রগতি ঐ উদ্বাস্তু কলোনিতেও সেঁধিয়েছে। বেশ ভাল—পুরুষ-ভূমিকায় বেটাছেলে, স্ত্রী-ভূমিকায় মেয়েলোক। সরোজিনীও নামল—বেছে বেছে তার জন্য একখানি পাঠ, যাতে উঠতে বসতে কান্না। কেঁদেই সে মাতিয়ে দিল। লোকের মুখে মুখে জয়-জয়কার। এমেচার থিয়েটারে স্ত্রী-চরিত্রের জন্য প্লেয়ার ভাড়া করে প্রায়ই। সরোজিনীর ডাক আসতে লাগল। রোজগার মন্দ নয়। খবর ক্রমশ পাবলিক থিয়েটার অবধি পৌঁছে গেল। তাদের লোক আসছে। জুবিলি থিয়েটার এসে গেছে, বাণী থিয়েটার বেশ একটা পছন্দসই দর হাঁকল। সরোজিনীর মন ওঠে না। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার—সে মণিমঞ্চের দিকে তাক করে আছে। মণিমঞ্চে প্রেমাঞ্জন—'নাট্যাকাশে নব সূর্যোদয়' বলে যার নামে ঢাক পেটাচ্ছে। প্রেমাঞ্জনের সঙ্গে এক মঞ্চে অভিনয় করতে চায় সে। অবশেষে হাবুল দেখা দিল একদিন কর্তামশায় সত্যসুন্দরের তরফ থেকে। মাইনে বড্ড কম, বাণীর প্রায় আধাআধি। তবু সরোজিনী হাতে-স্বর্গ পেয়ে গেল।

গোড়ার একখানা দু-খানা নাটকে যেমন-তেমন। নাট্যকার নকুল ভদ্র মশায় অডিটোরিয়ামে বসে নতুন মেয়েটার উপর সুতীক্ষ্ণ নজর রেখে যাচ্ছেন। তারপর তিনি নিজে একখানা ছাড়লেন। ঘোরতর বিয়োগান্ত নাটক। সরোজিনী নয় আর এখন, সরোজা হয়েছে। তারই কান্নার ছবিটা মনের সামনে রেখে ভদ্রমশায় নায়িকা চরিত্র গড়েছেন। নায়িকা সরোজা, এবং নায়ক অবশ্যই প্রেমাঞ্জন। কেঁদেই মাতিয়ে দিল সরোজা, প্রেমাঞ্জনের বিপরীতে সমান দাপটে পাঠ করে গেল। পালা সুপার-হিট—শহরময় এখন আর একলা প্রেমাঞ্জন নয়, দুই নাম সরোজা-প্রেমাঞ্জন। দুই নাম একসঙ্গে জুড়ে সকলের মুখে মুখে চলছে। শুধু যে স্টেজের অভিনয়ের কারণে, তা

নয়। সরোজা-প্রেমাঞ্জন দুজনকে জড়িয়ে বাজারে নানাবিধ রসালো গুজব। সত্যি মিথ্যে খোদায় মালুম—লোকে বলে সুখ পায়। সরোজার চেহারা আহা-মরি কিছু নয়, কিন্তু প্রাণ-ঢালা তার অভিনয়। তার পাশে প্রেমাঞ্জন মেতে যায় একেবারে। প্রেমাঞ্জন ভাল অভিনয় করে, সকলে জানে। কিন্তু অভিনয় যে কতদূর উঠতে পারে, সেটা বুঝতে পারি নায়িকা হয়ে সরোজা যখন মুখোমুখি দাঁড়ায়। ভুলে যায়, সাজগোজ করে অভিনয়ে নেমেছে তারা—সামনের ছায়ান্ধকারের মধ্যে শত শত নরনারী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে। কে—কে তুমি?—আবিষ্ট আর্তকণ্ঠ প্রেমাঞ্জনের: রেবা, আমার রেবা, কোন মূর্তিতে এলে তুমি আজ? সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহ থর থর করে কাঁপছে যেন ভূমিকম্পের মতন। সরোজার দু-চোখে ঢল নেমেছে। দর্শক, থিয়েটারের কর্মী এমন কি নটনটীদের মাঝেও একটি মেয়ে নেই একটি পুরুষ নেই, যার চোখ শুকনো। মায়ের কোলে অবোধ শিশুটির অবধি থমথমে ভাব। সরোজার সম্বিত একেবারে বুঝি লোপ পেয়েছে, সম্মোহিতের ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রেমাঞ্জনের বুকে। আলিঙ্গনে দৃঢ়সম্বদ্ধ। রেবা, আমার রেবা—অনতিস্ফুট কণ্ঠে অবিরত প্রেমাঞ্জন বলে যাচ্ছে। সে কথা শোনা যায় না খুব-একটা বাইরে—সকলে তবু উৎকর্ণ! চরম ক্লাইম্যাক্সে পর্দা পড়ল, আলো জ্বলে উঠল। দর্শক উন্মাদ, করতালিতে চতুর্দিক ফাটিয়ে দিচ্ছে। নায়ক-নায়িকার ঘোর কাটেনি, রেবা রেবা রেবা আমার—চলছে এখনো।

হি-হি করে হেসে প্রম্পটার বাণীকণ্ঠ বলে, ছাড়ুন এইবারে প্রেমাঞ্জনবাবু। পরের সিন সাজাতে হবে না?

রেখার কানে উঠেছে। প্রেমাঞ্জন আর সরোজা বড় বেশি গদগদ—গতিক ভাল না কিন্তু। ও-বাড়ির বউ অমলা এসে বলে, শহরময় ঢি-ঢি, তুমিই কেবল জানো না কিছু? স্টেজের উপরেই

সরোজা সাপের মতো জড়িয়ে ধরে, ছোবল মারে সাপেরই মতন। তাবৎ মানুষ ভেঙে এসে পড়ছে, তুমিই কেবল দেখলে না।

অভিনয়ের মাঝে অনেক স্থলে সরোজা কেঁদে পড়ে—কান্নায় দক্ষ বলে তার নাম। কিন্তু প্রেমাঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে যে কান্না সে কাঁদে, তার বুঝি জাত আলাদা। চোখের অশ্রু নয়, বুকের রক্তই যেন জল হয়ে চোখ দিয়ে বেরোয়। সরোজার কথাগুলো শেষ হয়ে গিয়ে প্রেমাঞ্জন বলছে—কাছের দর্শকেরা তখনও দেখে, সরোজার ঠোঁট নড়ছে। বিড়বিড় করে কত কী যেন বলে যাচ্ছে, তা-ও বোঝা যায়। ফল অতি আশ্চর্য—একবর্ণ না বুঝেও হলের এ-মুড়ো ও-মুড়ো হাততালি।

সরোজা বলছিল—(নাটকে নেই, পাঠের বাইরে সরোজার নিজেরই ছাইভস্ম বানানো কথা এসব)—প্রেমাঞ্জনের বাহুবন্দী হয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠের মতন সে বলছে, জানো, এই জীবনই চেয়েছিলাম আমি। বিয়েও হবো-হবো—আর-একজনে হয়তো এমনি করেই জড়িয়ে থাকত। কে চায় নাম-যশ, কে চায় টাকাকড়ি? একখানা ঘর, সামান্য একটুকু সংসার, ছোট্ট এক খোকা—তাতেই তো বর্তে যেতাম আমি।

বিড়বিড় করছে—বুকের উপরে মুখ, তবু প্রেমাঞ্জন তার একটি বর্ণ বোঝে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এমন জোরালো অভিনয় একেবারে মিইয়ে গেল। সিন থেকে বেরুনোর মুখে সরোজার হাত টেনে প্রেমাঞ্জন বলে, পরের সিনে তুমি নেই আমিও নেই। জিরিয়ে নিয়ে আমার ঘরে এসো, কথা আছে—জরুরি কথা।

গিয়েছে তাই। প্রেমাঞ্জন, দরজায় একেবারে খিল এঁটে দিল। যুবতী মেয়ে নিয়ে সকলের সামনে—বিশেষত যাবতীয় থিয়েটারি চোখের সামনে খিল আঁটা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রেমাঞ্জন তাই করল—হুঁশজ্ঞান ঠিক লোপ পেয়ে গেছে তার, এত বেপরোয়া সজ্ঞানে হওয়া সম্ভব নয়। হেসে হেসে অভিনয়ের ঢঙেই বলছে, তুমি

যদি রক্ষে করো সরোজিনী—নয়তো নটাধিরাজের নির্ঘাৎ অপমৃত্যু। তোমার প্রেমিক সেজে অভিনয় করি—সেটা আর অভিনয় নেই এখন। শুধুমাত্র মুখস্থ কথা এত বেশি জীবন্ত হয় না। সেকালের গিরিশ ঘোষ একালের ভাদুড়ি মশায়রা হয়তো-বা পারতেন, আমার ক্ষমতার বাইরে। আজকে বড় ধাক্কা খেয়েছি। চরিত্র হয়েছে চুলোর ছাই, পাঠের কথাগুলো দায়সারা ভাবেই কেবল আউড়ে এলাম। তুমি নিশ্চয় তা ঠাহর পেয়েছ, অডিটোরিয়ামের রসিক দু-দশ জনও বুঝেছেন। দর্শক ঠকিয়েছি। এ রকম হতে থাকলে তারা ভিড় করে আসবে না, থুতু দেবে আমার গায়ে।

সরোজা ব্যাকুল হয়ে শুধায়: কি হয়েছে প্রেমাঞ্জন-দা?

প্রেমাঞ্জন হাসিমুখে তেমনি বলছে, আমার বিয়ের সময়কার নাটক থিয়েটারের কে না জানে? বউ কখনো থিয়েটারে পা ঠেকাতে আসে না। কতবার নেমন্তন্ন গিয়েছে, আমি নিজেও বলেছি—ঘাড় নেড়ে দিয়েছে: না—। আমায় জানতে না দিয়ে আজ সে সরাসরি টিকিট করে ঢুকেছে। কোন আড়ষ্ট ভাব নেই—যেন থিয়েটারের পোকা, হরহামেশা এসে থাকে। হলের মধ্যে প্রায় সামনাসামনি—দেখছে না সে, দু-চোখ দিয়ে গিলছে আমাদের। তোমার আমার কাহিনী কতদূর অবধি গড়িয়ে গেছে, বোঝ। এর পরে কি তাগত থাকে তোমায় কাছে টেনে প্রণয়ের ডায়ালোগ বলা?

একটু থেমে থেকে ছুম করে বলে বসল, হয় তুমি মণিমঞ্চ ছাড়ো, নয়-তো আমি।

কিছু টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত হল তাই। প্রেমাঞ্জন মণিমঞ্চেই গড়ে উঠেছে—কর্তামশায় প্রাণান্তেও তাকে ছাড়বেন না। গেল সরোজা, জুবিলি লুফে নিল তাকে। সবজান্তারা ঘাড় নেড়ে বলে, হবেই। চাঁদ-সুয্যি এক-আকাশে থাকতে পারে কখনো? সরোজার জায়গায় সিনেমা-তারকা রূপালিকে এনে বিজ্ঞাপন ঝাড়তে লাগল: ছবি দেখেই দর্শক পাগল হতেন, এবারে স্টেজের

উপর রক্তমাংসের চেহারায় চাক্ষুষ দেখুন। সঙ্গে রয়েছেন নটাধিরাজ প্রেমাঞ্জন। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

কিন্তু কিছুতে কিছু নয়, ভাঙা নাটক আর জমানো গেল না। মাসখানেকের মধ্যেই নতুন নাটক রিহার্সালে ফেলতে হল। জুবিলিতে ওদিকে সরোজাও সুবিধা করতে পারছে না। অভিনয়ে সে ধার নেই। ভক্তেরা বলে, একলা একজনে কি করবে? জুড়িদার নইলে হয় না। খোল-বাজনার সঙ্গে কত্তাল লাগে, ঢোলের সঙ্গে কাঁশি। জুবিলির মালিক বক্সঅফিস ঘুরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসেন: এত মাইনে কবুল করে এনে এই ফল? রোগা হয়ে যাচ্ছে সরোজা দিনকে-দিন, খিটখিটে মেজাজ, নাড়িতেও নাকি সামান্য জ্বর। চার ভাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে মোটা ভিজিটের ডাক্তার এনে দেখায়। সাহস দিচ্ছে: ভাবিস নে বোন, চিকিচ্ছের ত্রুটি হবে না, মিনিস্টারকে বলে সরকারি ব্যবস্থায় সারিয়ে তুলব।

সরোজিনী বলে, সারাবি তো নিশ্চয়। নইলে তোদের সংসারের খরচা কে সামলাবে?

নরেশ নামে এক ধনীপুত্র, টুকটুকে রং নাদুসনুদুস চেহারা গলায় সোনার হার, সরোজার উপর বড্ড ঝুঁকেছে। আসা-যাওয়া খুব। সরোজার মা তাকে 'বাবা' ছাড়া ডাকেন না, গলায় মধু ঝরে তখন। সর্বকনিষ্ঠ ভাইটা তো এক একবার 'জামাইবাবু' ডেকেই ফেলে—ভুল করে অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে। সরোজা-নরেশে বিয়ে, রটনা থিয়েটার অবধি চলে গেছে। একটা মেয়ে সে কথা তুলতে গেলে সরোজা তাড়া দিয়ে উঠল: ক্ষেপেছিস? পাকাপাকি কিছু হতে গেলে ঐ ভাইরা-ই দেখিস ভণ্ডুল দেবে তখন। নিজের সংসার হলে ওদের অন্ন জোগাবে কে? নরেশবাবুর নেশা তো কাটল বলে —পরেশ গণেশ আরও কত আসবে। মা 'বাবা' 'বাছা' ডাকবেন, ভাইরা 'জামাইবাবু' 'জামাইবাবু' করবে। থিয়েটারের নামটুকু যেতে যেতে যদ্দিন থাকে, ততদিন।

কণ্ট্রাক্টে হাত-পা বাঁধা—ইত্যাদি বলে প্রেমাঞ্জন সেবারে জুবিলির লোককে ভাগিয়েছিল। আসলে ভাঁওতা। নতুন নাটক খোলার মুখে গোড়ার দিকে দু-একবার কণ্ট্রাক্টের মতো কিছু হয়েছিল বটে—সেই নাটকের চালু অবস্থায় অন্য থিয়েটারে যোগ দেওয়া চলবে না। এখন প্রেমাঞ্জন মণিমঞ্চের একেবারে আপন লোক হয়ে গেছে—লেখাজোখার মধ্যে তাকে যেতে হয় না। তখন জুবিলিতে যায় নি—এতদিন পরে সময় বিশেষে একটু-আধটু ভয় দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই। সত্যসুন্দরের উপর সে কৃতজ্ঞ—তাঁরই দয়ায় পাবলিক-মঞ্চে প্রথম এসে দাঁড়াল, এবং সিনেমা-থিয়েটার রাজ্যে তার 'নটাধিরাজ' নাম। সত্যসুন্দর মানুষটি নাটক বোঝেন না, বুঝতেও চান না। থিয়েটারি ব্যবসা সম্পর্কেও প্রায় তদ্রূপ—চালু জিনিসটা যন্ত্রবৎ চলে আসছে, এই পর্যন্ত। তবে মানুষটি উদার। যার যা উচিত প্রাপ্য—বলতে হয় না, নিজে থেকেই যথাসাধ্য দিয়ে দেন। প্রাতঃস্মরণীয় পিতার কিছু কিছু গুণ তাঁর মধ্যেও বর্তেছে। বলেও থাকেন, ব্যবসা চলছে আমার ক্ষমতায় নয়—পিতার পুণ্যে।

কিন্তু আর বুঝি চলে না। হালফিলের ধরন ধারণ একেবারেই মিলছে না তাঁদের কালের সঙ্গে। মণিমঞ্চ ধারদেনায় ডুবতে বসেছিল। ভাগনে অমিয়শঙ্কর ঝাঁপিয়ে পড়ে দায়দায়িত্ব নিয়েছে, ঘরের টাকা এনে জরুরি দেনা মেটাল। থিয়েটারের ভার তার উপরে দিয়ে সত্যসুন্দর নিজে খানিকটা সরে থাকতে চান। অমিয় বলছেও লম্বা লম্বা, সিনেমা থিয়েটারে প্রতিযোগিতা—বাঁচতে হলে থিয়েটারকে এখন সিনেমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে দিয়ে চলতে হবে। তাই করবে সে। এই এখানেই দেখতে পাবেন, দিনের পর দিন মাসের পর মাস টিকিট কেনার জন্য কালোবাজারি চলছে।

॥ আট ॥

পাণ্ডুলিপি নিয়ে হেমন্ত সোমবার যথাসময়ে মণিমঞ্চে গিয়ে হাজির। একা এসেছে। বিনোদ কী দরকারে আগে-ভাগে বেরিয়েছে—সত্যসুন্দরের বাড়ি হয়ে তাঁদের সঙ্গে আসবে।

জনশূন্য থিয়েটার—নিঃশব্দ। কর্তার কামরার মুখে যথারীতি মথুরা। সসম্ভ্রমে সে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে পাখা চালিয়ে দিয়ে বলল, বসুন সার, চা নিয়ে আসি ?

হেমন্ত ঘাড় নাড়ল : চা খেয়ে এসেছি, একবারের বেশি খাইনে।

তবে শরবৎ ?

কিছুই লাগবে না এখন।—হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, কর্তা আসেন নি—খবর-টবর পাঠিয়েছেন কিছু ?

মথুরানাথ বলে, আমাকেই তো পাঠিয়েছেন। এসে যাবেন এক্ষুনি। ড্রাইভার দেরি করে ফেলেছে—ছোটখুকিকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে অমনি আসবেন।

অনুনয় কণ্ঠে বলল, রোদ বেশ চড়ে উঠেছে সার, শরবৎ নিয়ে আসি। এক চুমুক খেলে ঠাণ্ডা হবেন।

মানা শুনবে না। ছুটোছুটি করে শরবৎ আনল। বড়লোকের ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও এমন ভাল এতদূর ভদ্র, হেমন্ত এই প্রথম দেখল।

শরবৎ খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখল। মথুরানাথের খাতিরের অন্ত নেই—খুঁজে-পেতে কোথা থেকে ছবিওয়ালা সিনেমা-পত্রিকা এনে দিল খানকয়েক। বলে, পাতা উল্টাতে লাগুন। এসে যাবেন কর্তামশায়, দেরি হবে না।

তারপর ফিক করে হেসে বলে, আপনি কেন এসেছেন আমি কিন্তু জানি।

সহাস্যে হেমন্ত মুখ তুলে তাকাল। মথুরা একগাল হেসে বলল,

আপনি নাট্যকার। পাণ্ডুলিপি পড়া হবে আজ। বাইরে দাঁড়িয়ে আমিও শুনব।

আবার প্রশ্ন: বলুন তাই কিনা?

হেমন্ত বলে, তুমি কি করে জানলে মথুরা? কাউকে তো বলা হয়নি। গোপন ব্যাপার।

মথুরানাথ সগর্বে বলে, হেঁ হেঁ, কর্তামশায়ের বাড়িতে আর থিয়েটারে আমার এই তেইশ বছর হয়ে গেল। চলন দেখেই আমি ভিতরের খবর বলে দিতে পারি।

তেইশ বছর—বল কি হে? তোমার নিজের বয়স কত মথুরানাথ?

মথুরা বলে, যেমন দেখছেন, তা নয় সার, মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। সাত বছর বয়সে বাবার সঙ্গে এসে কাজে লেগেছিলাম। এখন তাহলে তিরিশে পৌঁছে গেছি।

তারপর যা বলার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল: আচ্ছা সার, আপনার নাটকে চাকরবাকর আছে নিশ্চয়—

আছে বোধহয়, ঠিক মনে পড়ছে না।

আমি তো রাজা-উজির হতে চাইনে, চাকরবাকর কিছু একটা পেলেই বর্তে যাই। কর্তামশায় বলেন, তুইও স্টেজে নামবি তো বাড়ির ঝাড়পোঁছ থিয়েটারের ছুটোছুটি কে করে? ঝাড়পোঁছ, বলুন দিকি, চব্বিশ ঘণ্টাই কি লেগে পড়ে করতে হয়? সন্ধ্যের পর হপ্তায় দুটো-তিনটে দিন না-হয় বন্ধই রইল। কর্তা রাজি নন। তা আপনি বইতে জায়গা রাখুন—ঠিক করেছি, এবারে গিন্নিকে বলব। হয়ে যাবে।

এত খাতিরের কারণ এইবারে বোঝা যাচ্ছে। আর কি, হেমন্ত তো সৃষ্টিকর্তা বিধাতাপুরুষের সমতুল্য। কিন্তু বাবার উপরেও বাবারা সব থাকেন—বড় দুঃখে নাট্যকার হেমন্ত কর ক্রমশ মালুম পেতে লাগল। থাক এখন—সে পরের কথা।

দোরগোড়ায় আর একজন লোক। মথুরা পরিচয় দেয়, ওদেরই চা-শরবতের দোকান, গেলাস নিতে এসেছে। লোকটা বলে, 'জয়-পরাজয়' দেখে গেছেন—আমি ও-বইতে নেমেছি। মুখ দেখে চিনবেন না—বরযাত্রীদের ভিতরে একজন। নতুন নাটকেও আমি থাকব। জনতার সিন হলেই ম্যানেজার ডেকে পাঠান। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের মুখের কাছে চা-শরবৎ এসে পড়ে, এ জিনিসও তাই—ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ম্যানেজারের কাছে হাজির হই। বলছিলাম অথর-মশায়, আমাদের মুখে একখানা-আধখানা কথা দেওয়া যায় না ?

অদূরের বাথরুমে ঝাড়ুদার ফেনাইল ঢালছে, ঝাড়ুদারনি মেঝেয় ঝাঁটপাট দিচ্ছে। হেমন্ত ভাবছে, ওরাও আসবে নাকি এবার ? মিউ মিউ করে বিড়াল এলো একটা। বিড়ালের কথা মানুষে বোঝে না, দরবারটা সেই কারণে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

সর্বরক্ষে, হেনকালে সত্যসুন্দর ও বিনোদের প্রবেশ। সবাই সরে পড়ল, বিড়ালটা অবধি।

হেমন্ত বলল, নতুনবাবু এলেন না ?

জবাব দিলেন সত্যসুন্দর: তাকে লাগবে না। পাণ্ডুলিপি খানিক খানিক পড়েছে, বিমুর কাছে জিনিসটা শুনে নিয়েছে। তার মোটামুটি পছন্দ।

বিনোদ বলে, কানে শুনে তার নাকি মনে ঢোকে না। পাণ্ডুলিপি আলাদা ভাবে আরও একবার দেখে নেবে। এক নাচওয়ালীর খবর পেয়ে সেইখানে সে ছুটল।

হেমন্তর বুকের ভিতর ছাঁৎ করে উঠল: নাচওয়ালী কেন ?

নাটকে লাগাবে, আবার কি !—প্রশ্রয়ের সুরে সত্যসুন্দর বলেন, প্রথম নাটক নামাতে যাচ্ছে। জমানোর কলকৌশল কোনটাই বোধহয় বাকি রাখবে না।

হেমন্তর মুখ শুকায়। কে জানে, এদের খাঁটি মতলবটা কি।

পাকাঘুঁটি কেঁচে যায়, থিয়েটার এমনি জায়গা। আর্টিস্টরা পার্ট মুখস্থ করে ফেলেছে, সিন-আঁকা সারা, একটা-দুটো রিহার্সালও হয়ে গেছে—রাত পোহালে শোনা গেল, নাটক বাতিল। নাকি, কোন জ্যোতিষী মানা করেছেন, অথবা স্বত্বাধিকারীর গিন্নি খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন। এমন নাকি আখচার হয়ে থাকে।

ভয়ে ভয়ে হেমন্ত বলল, আমার নাটকে নাচের তো কোন সিচুয়েশান নেই—

সিচুয়েশান বানাতে কতক্ষণ!—হেসে উঠে সত্যসুন্দর বললেন, কলমের একটি আঁচড়ের ওয়াস্তা।

বিনোদ সায় দিয়ে বলে, ঠিক। এঁরা সব পারেন, করেনও সেইরকম। জুবিলি সেবারে 'চিতা-বহ্নি' নাটক করল—শেষ দৃশ্যে পাশাপাশি তিনটে চিতা। মালিক বললেন, রিলিফ দিন মশায়, নয়তো মানুষ দম ফেটে পটাপট ফ্লোরে পড়বে, আমাদের মামলায় জড়াবে। তাই তো, কী করা যায়? ডিরেক্টর ভেবে-চিন্তে বলল, জবর রকমের নৃত্য লাগিয়ে দেব একখানা, চিতার ধকল কাটিয়ে উঠবে দর্শক। নিশিরাত্রের শ্মশানে ডাকিনী-হাঁকিনীর নৃত্য। একে অন্ধকার, তায় ডাকিনী—বিশেষ-কিছু বাধা রইল না। লোকের হুল্লোড়। বুড়ো-বুড়িরা উঠে চলে গেলেন। দর্শকে চেঁচাচ্ছে: আলোর জোর হচ্ছে না কেন? জোর হতে পারে না—যেহেতু আব্রু মাত্র অন্ধকারটুকুই।

বেশি সময়ক্ষেপ না করে হেমন্ত খাতা খুলল। ঢাউশ খাতা, কুচি কুচি লেখা। বিনোদের দিকে চেয়ে সত্যসুন্দর বিনয় করেন: ভাগনের উপর ছেড়ে দিয়েছি, আমায় আবার কেন? এ যুগে আমরা বাতিল। মনে লাগে, তাই মানতে চাইনে—কিন্তু কথা ষোলআনা খাঁটি। নাটক একের পর এক মার খেয়ে গেল—কই, আগে তো এমন হত না। নতুন অথর এঁরা সব যা লিখছেন, আমি সত্যিই বুঝিনে।

বিনোদ বলে, বোঝ না মানে? ঐ সব বোষ্টম-বুলি আমার কাছে কপচো না। একবার মাত্র কানে শুনে তুমি এখানে সেখানে এমন মোচড় দেওয়াবে, একই গল্প থেকে ঝির ঝির করে নবরস বেরুবে। থিয়েটার-লাইনে এ জিনিস ক'জনে পারে শুনি?

নিরুপায় ভাবে সত্যসুন্দর চেয়ার ছেড়ে সোফায় গেলেন। ছোট্ট তাকিয়াটা কোলের মধ্যে নিয়ে নড়ে চড়ে জুত হয়ে বসলেন তিনি। আরম্ভ সময়ে দু'চোখ মেলা ছিল। শুনতে শুনতে চোখ বুজে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। সর্বদেহে এতটুকু সাড়া নেই—নিবাতনিস্কম্প প্রদীপশিখা। নিজের লেখা হেমন্ত পরমানন্দে পড়ছে—পড়েই যাচ্ছে সে। বিনোদ ইশারা করে মাঝে-মধ্যে বাদ দিয়ে বস্তুটা সংক্ষেপ করে নিতে। হেমন্ত প্রাণ ধরে তা পেরে ওঠে না—নিজ হাতে কে সন্তানের অঙ্গচ্ছেদ করে? বারংবার ইঙ্গিত আসছে তো দুটো কি চারটে লাইন বাদ দেয় বড়জোর। বিনোদ তখন হাত বাড়িয়ে খাতার পনেরো-বিশ পাতা একসঙ্গে উল্টে দিল। কয়েক সেকেণ্ড হেমন্ত থতমত খেয়ে থাকে, তারপর সেখান থেকেই আবার পড়ে চলল। শ্রোতার দিক থেকে কিছুমাত্র আপত্তির লক্ষণ নেই—যেমন নিস্পন্দ হয়ে শুনছিলেন, তেমনি শুনে যেতে লাগলেন। সাহস পেয়ে গেছে বিনোদ—আবার এক দফা বেশ কিছু পাতা উল্টে দিল। আবার। আবার। আদ্যন্ত পড়লে ঘণ্টা তিনেকেও হবার কথা নয়, সেখানে পুরো ঘণ্টাও লাগল না। বিনোদ হাঁক পেড়ে উঠল: কেমন শুনলে, বল এবার।

সত্যসুন্দর ধড়মড় করে চোখ মেললেন: খাসা বই, দারুন জমবে। 'মানুষের কান্না'—একেবারে গোটা দুনিয়া ধরে টান দিয়েছেন, আমার-তোমার দুজন পাঁচজনের কোঁতকোঁতানি নয়। চাট্টিখানি কথা!

রসজ্ঞ হিসাবে কিছু আলাদা রকমের মন্তব্য নিশ্চয় প্রয়োজন। সত্যসুন্দর বলেন, এই বই যখন হবে, আমি ভাবছি কি, প্লে ভাঙবার

মুখে ক'জনে আমরা গেটের মুখে দাঁড়াব। যে-লোকের চোখ শুকনো, টিকিটের দাম তাকে ফেরত দিয়ে দেব। মানে, দেখেনি সে-লোক, দেখে থাকলেও তা মঞ্জুর নয়।

পছন্দ হয়েছে তবে ?—বিনোদ শুধায়।

আরে, তোমার পছন্দের বই তুমি সুপারিশ করে পাঠিয়েছ—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, সে জিনিস অপছন্দ করবে। অন্য সব থিয়েটার কানা হয়ে যাবে। শহরের মানুষ ভেঙে এসে পড়বে, থিয়েটার দেখতে দেখতে হাপুস নয়নে কাঁদবে। লোক চলে গেলে তখন ঝাঁটা ধরে হলের অশ্রু সাফ করতে হবে।

ফিরছে হেমন্ত আর বিনোদ। খাতা রেখে এসেছে, অমিয়শঙ্কর নিরিবিলি পড়বে, কাটছাঁট জোড়াতালির যেখানে যতটুকু প্রয়োজন নোট করে রাখবে। হপ্তার মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। পরের সোমবার সন্ধ্যাবেলা স্টেজের উপরে সব সুদ্ধ বসে নাটক-পাঠ। নতুনবাবুর তড়িঘড়ি কাজ। এই রকম সে ব্যবস্থা করেছে, কদ্দর কি হয় দেখা যাক।

হেমন্ত গদগদ। বলে, কর্তামশায় রীতিমত সমঝদার মানুষ। এতখানি কিন্তু ধারণায় ছিল না।

বিনোদের মুখে উল্টো কথা: ঘণ্টা। নিরেট মাথা, মোটা বুদ্ধি। কিচ্ছু বোঝে না—বুঝতেও চায় না। বাপের এমন জমজমাট থিয়েটার ডকে তোলার গতিক করেছে। তবে মানুষটি সৎ। এ লাইনে সেটা গুণ নয়—দোষ। ভাগনেটা ঘোরতর ঘুঘু—অতএব থিয়েটার চালানোর ব্যাপারে মহাগুণী বলতে হবে।

হেমন্ত মেনে নিতে পারে না, প্রতিবাদের সুরে বলে, আমার নাটক সম্বন্ধে যা-সমস্ত বললেন—নাট্যরসিক বলেই তো মনে হল।

ঘোড়ার ডিম!—কথা পড়তে দেয় না বিনোদ, ভ্রূভঙ্গি করে বলে, একবর্ণ শুনেছে নাকি, চোখ বুজে তো ঘুমুচ্ছিল। নাটকের

নাম বলেছিলে, সেইটেই শুধু মনে ছিল। আমি যা বললাম, তারই উপর কিছু রং ফলিয়ে বিম্ভে জাহির করল।

হেমন্ত বলে, এক গল্পে মোচড় দিয়ে নবরস বের করেন—এমনি সব ভাল ভাল জবান তুমিই তো করলে বিশুদা।

করবই তো। থিয়েটার-সিনেমা নিয়ে আমার উঁকিঝুঁকির জীবন। থিয়েটারের মালিক ঐ কর্তামশায়। এতাবৎ একলা ওকে নিয়ে করেছি, এখন থেকে ভাগনে অমিয়শঙ্করকেও এক জোয়ালে জুড়ে আমড়াগাছি করব।

॥ নয় ॥

ক'দিন পরে বিকালবেলা মথুরা হঠাৎ হেমন্তর বাড়ি হাজির। একগাল হেসে বলল, ন'টায় কাল থিয়েটারে নেমন্তন্ন।

কেন বল তো?

ভাল খবর। নাটক পাকাপাকি পছন্দ। কাটকুট ঝাড়পোঁছ এইবারে। নেমন্তন্ন এখন রোজই থাকবে। আমার কথাটা মনে আছে তো সার? দেখবেন।

হেমন্ত বলে, ঠিক তো চিনে এসেছ মথুরানাথ।

চিনে চিনে কত জনা আসবে, দেখতে পাবেন। এ-বাড়ি এখন তো গয়া-কাশী হয়ে উঠল।

ব্যস্ত খুব। থিয়েটারের দিন—সোজা থিয়েটারে যাচ্ছে এখান থেকে।

হেমন্ত যথাসময়ে গিয়ে হাজির। মামা-ভাগনে তুজনেই আছেন। কর্তামশায় আহ্বান করলেন: এসো হে নাট্যকার। এই যাঃ— 'তুমি' বলে ফেললাম। বই করতে যাচ্ছি, এখন একেবারে আপন লোক—মুখ দিয়ে 'তুমি' বেরিয়ে গেল।

হেমন্ত পুলকিত কণ্ঠে বলে, আপনার মতো মানুষ 'আপনি' বলতেন, তাতেই তো আমার লজ্জা।

সত্যসুন্দর বলেন, নাটক নিয়ে কিছু বলছি নে, যা-কিছু বলবার নতুন ডিরেক্টর নতুনবাবু বলবে। 'প্রতারক' বদলে নাম দিয়েছ 'মানুষের কান্না'—নামটা নিয়ে সেদিন কত রসালাপ করলাম। তখন তলিয়ে দেখিনি। আগেকার নাম 'প্রতারক' বরঞ্চ পদে ছিল, 'মানুষের কান্না' আমার বাপু মোটেই ভাল লাগছে না।

হেমন্ত মৃত্ব হেসে বলল, 'ছাগল-ভেড়ার কান্না' বিমুদা বলছিলেন।

কর্তামশায় চমক খেয়ে বলেন, কেন? নাটকে ছাগল-ভেড়া আছে—কই, মনে পড়ছে না তো।

আছে কতকগুলো চরিত্র—দু-হাত দু-পা ওয়ালা হলেও আসলে মানুষ নয়, ছাগল-ভেড়ার শামিল তারা। বিনুদা তাই নিয়ে মজা করেন।

সত্যসুন্দর বলেন, আমি বাপু সিরিয়াস। 'মানুষের কান্না'—অমন পাইকারি হারে নাম দিলে বক্তব্যে দানা বাঁধে না, লোকে দিশা করতে পারে না। স্পষ্ট হও—অমুক নামধারী মানুষটার কান্না। নাটকের নায়িকা কে যেন—

হেমন্ত বলে দিল, মেনকা।

মেনকাই কাঁদুক না যত খুশি, কেঁদে আছাড়ি-পিছাড়ি খাক—

উঁহু, উঁহু—। ডিরেক্টর ওদিকে ঘাড় নাড়ছে : যখন বদলানোই হচ্ছে, 'কান্না' কথাটাই বাদ। দুঃখধান্দা কান্নাকাটি সংসারে তো আছেই। থিয়েটার-সিনেমায় লোকে যায় দু-দণ্ড ভুলে থাকার জন্য। সেখানেও যদি কান্না, টিকিট কেটে খরচা করে কি জন্যে লোকে আসবে ?

তাহলে 'মেনকার কান্না' নয় বাপু, মেনকার হাসি। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন—দাও লাগিয়ে, ডিরেক্টরের ইচ্ছে যখন।

অসহায় করুণ দৃষ্টিতে হেমন্ত সত্যসুন্দরের পানে তাকাল। বাঁচালে তিনিই হয়তো বাঁচাবেন, এই একটুখানি ভরসা। বলে, নিদারুণ ট্রাজেডি। আপনি হয়তো তেমন মনোযোগে শোনেননি সেদিন—

আজ সত্যসুন্দরের সাফ জবাব : নাঃ, শুনে লাভটা কি ? যা সমস্ত লিখেছ, তার এখানটা ছাঁটবে ওখানে জুড়বে। থিয়েটারের দস্তুর এই। সে সমস্ত নতুনবাবুই করবে—আমি মিছে কেন মাথা দিতে যাই।

হেমন্ত বলছে, চরম ক্ষণে নায়িকা মেনকা বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল—সেই অবস্থার মধ্যে কি করে ওকে হাসাই বলুন তো ?

আত্মহত্যার জন্যেই বা কে মাথার দিব্যি দিয়েছে শুনি ?

সত্যসুন্দর হা-হা করে হেসে উঠলেন। বলেন, কলম তোমার হাতে—মারতে পারো তুমি, রাখতেও পারো। নায়ক এসে ধরে ফেলুক না মোক্ষম সময়টাতে। তার পরে মিলন, হাসি-তামাশা, জবর ডুয়েটগান—ইচ্ছে করলে সবই হতে পারে।

হঠাৎ সুর পালটে তাড়াতাড়ি বললেন, আমি কিছু জানি নে বাপু। যার কর্ম তাকে সাজে—তোমার ডিরেক্টরই বলে দেবে সব।

অমিয় বলে, মুখে বলবার কিছু নেই। পাণ্ডুলিপিতে সমস্ত নোট করা আছে। হেমন্তবাবু শুধু গুছিয়ে লিখে দেবেন। হাতে কলম চলে না বলেই না একজন করে লেখক লাগে।

পাণ্ডুলিপি হেমন্তর হাতে দিল। গোটা খাতা জুড়ে লাল-পেন্সিলের দাগ, নীল-পেন্সিলের দাগ। কোথায় বাড়বে কোথায় কমবে কোথায় নতুন করে লেখা হবে, তারই সব চিহ্ন। চিহ্নিত জায়গার পাশে সরু পেন্সিলে লেখা বিবিধ নির্দেশ—কি লিখতে হবে, কি কাটতে হবে ইত্যাদি।

এখানে সেখানে হেমন্ত চোখ বুলিয়ে দেখে। যেন ঘোর অরণ্য, শ্বাপদসঙ্কুল—এর মধ্য থেকে কী করে উত্তীর্ণ হবে ভাবতে গিয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

অমিয় এতক্ষণ বুঝি নামকরণ নিয়েই ভাবছিল। বলে, নাটকের নাম তাহলে—

সত্যসুন্দর বলে দিলেন, মেনকার হাসি।

না—। অমিয়শঙ্কর বলে, মেনকা মোটেই ভাল লাগছে না—মেনিমুখো গোছের শোনাচ্ছে। উর্বশী রম্ভা মেনকা সবাই ওঁরা অপ্সরা—একই জাতের। মেনকা উর্বশী হয়ে যাক না কেন। শুনতে ভাল, জৌলুস বেশি।

সত্যসুন্দর তারিফ করে ওঠেন : 'উর্বশীর হাসি'—তোফা নাম। তোফা, তোফা! নামেই লোক দলে দলে ঢুকবে। হাউস-ফুল।

শুধু বোঝাই নয়, উপচে পড়বে। ভিতরে কি মাল আছে, অত শত দেখতে যাবে না।

হেমন্তর দিকে তাকিয়ে পড়ে সত্যসুন্দরের দৃষ্টি কোমল হল। মোলায়েম সুরে তিনি সান্ত্বনা দিলেন: মুসড়ে গেলে নাকি নাট্যকার? যে বিয়ের যে মন্তোর—বদলাবদলি এখনো কত করতে হবে! তোমার বলে নয়—থিয়েটারওয়ালা আমাদের নিয়মই এই।

অমিয় বলে, এই যে 'জয়-পরাজয়' চলছে, তার বেলাতেই বা কী? ঘাঘি নাট্যকার জগন্ময় দাস লিখে এনে দিলেন। রজত দত্ত রিপুকর্মে বসে ফরমাস ঝাড়তে লাগলেন—কত যে ছাঁটতে হল কত যে জুড়তে হল তার সীমাসংখ্যা নেই। জগন্ময় বললেন, নাটক যে আমারই লেখা, বিশ্বাস হচ্ছে না মশায়। রজত দত্ত খুশি হয়ে রায় দিলেন, তবে এবারে রিহার্সালে ফেলা যেতে পারে। রিহার্সালে পড়েও কি রেহাই আছে? এই শব্দটা উচ্চারণ করতে পারছে না, বদলে দিন নাট্যকার—

টাইপ-করা কাগজপত্র হাতে অডিটরের লোক দেখা দিল। সত্যসুন্দর ব্যস্ত হয়ে বলেন, তোমার ঘরে নিয়ে যাও অমিয়। আমরা এদিককার কাজে বসি।

অমিয় বলে, আজকে ঘরে নিয়ে যাবার কিছু নেই। পাণ্ডুলিপি নিয়ে উনি কাজ করুন গে। চার-পাঁচ দিনের বেশি লাগাবেন না হেমন্তবাবু। আমি ব্যস্তবাগীশ মানুষ, তড়িঘড়ি কাজ আমার।

কর্তামশায় বললেন, থিয়েটার-সিনেমায় বই করবে তো লেখার সম্বন্ধে মায়ামমতা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দাও। খোল-নলচে বদল হতে হতে ঘটনার বড় কিছু থাকে না, চরিত্রের নামগুলোই থাকে শুধু। তোমার কপালে তা-ও টিকছে না। পরের নাটক তুমি পেশাদার থিয়েটার নিয়ে লিখো—লেখারই জিনিস।

এখানেই শেষ হল না। রাস্তায় নেমে হেমন্ত ট্রামের অপেক্ষায় আছে, পিছন থেকে কাঁধে হাত। অমিয়শঙ্কর ওদিককার ফুটপাথে

কফিখানায় যাবে—কফি খাবে, আড্ডা দেবে এখন খানিকক্ষণ। দেখা হয়ে গেল তো আরও কিছু উপদেশ ছাড়ে। বলে, যেমন যেমন চাই চুম্বকে লিখে দিয়েছি, যত্ন করে পড়ে নেবেন আগে। কাজ দেখবেন কত সহজ। ডায়ালোগ যত সংক্ষেপে পারেন, একটা কথায় হলে হুটো কথা নয়—প্লেয়াররা পশ্চারে মেরে দেবে। বানিয়ে ছিলেন তো সাংঘাতিক ট্রাজেডি—যেমনধারা ছকে দিয়েছি, কী মধুর কমেডি হয়ে দাঁড়াবে দেখবেন। জয়-জয়কার পড়বে আপনার, থিয়েটার-সিনেমার লোক 'বই দিন' 'বই দিন' করে আপনার হুয়োরে হত্যে দিয়ে পড়বে তারকেশ্বরে যেমন দেয়।

এমন করে আকাশে তুলছে, হেমন্ত তবু চাঙ্গা হয় না—যেমন ছিল, ঝিম হয়ে রয়েছে। খপ করে অমিয় প্রশ্ন করে: প্রেমাঞ্জন কি গিয়েছিলেন আপনার বাড়ি?

হেমন্ত হতভম্ব। বলল, না, কেউ যায় নি। এ কথা কেন বলছেন?

গুরুদর্শনে হঠাৎ যদি উতলা হয়ে থাকেন। নাটকের মন্দার চরিত্রটির উপর নাট্যকারের বড্ড বেশি পক্ষপাত দেখলাম কিনা—সেই জন্যে সন্দেহ হল।

মুখ কালো করে হেমন্ত বলল, পাঠ এখনো বিলি হয় নি। আপনি কোনটা কাকে দেবেন—আমিই জানিনে, প্রেমাঞ্জন জানবে কেমন করে?

আপনি না জানুন, থিয়েটারের ঝানুরা একবার শুনেই ঠিক ঠিক বলে দেবে। ঘষা-মাজা সারা হলে শেষ-পাণ্ডুলিপি আর্টিস্টদের কাছে পড়া হবে—তখন দেখবেন। কার জন্যে কোন পাঠ, কিছুই বলে দিতে হবে না।

হঠাৎ গলা নামিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে অমিয় বলে, নিজের লোক মনে করে গুহ্যকথা বলছি। কাউকে বলবেন না, এমন কি বিনুদাকেও না। হুই নায়ক মন্দার আর অরুণাভ'র মধ্যেকার টাগ-

অফ-ওয়ার—এই জিনিসটাই বিশেষ করে চাচ্ছি আমি, আপনার নাটক এই জন্যেই এত পছন্দ। রজত দত্ত ছিলেন মস্ত গুণী আর্টিস্ট, আমাদের কাজের মধ্যে থেকেই দেহ রাখলেন। তাঁর ছেলে প্রণবকে নিয়ে নিয়েছি, ছেলেটি ভাল—

হেমন্ত সায় দিল: সত্যি সত্যি ভাল। সামান্য আলাপ হল, তাতেই বুঝেছি।

প্রেমাঞ্জনের অসহ্য দেমাক। শাসিয়েছে, না বনলে বাণী থিয়েটারে চলে যাবে। আমি চাচ্ছি প্রেমাঞ্জনকে চেপে প্রণবকে তুলে ধরা। আপনার নাটক খুব যত্ন করে পড়েছি—বিশেষ করে মন্দার আর অরুণাভ চরিত্র দুটো। কপালে থাকলে এক অরুণাভ থেকেই প্রণব বাপকা-বেটা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। মন্দার কমাবেন, অরুণাভ বাড়াবেন—ক্লাইম্যাক্সগুলো অরুণাভর উপরে চাপিয়ে দেবেন। পাণ্ডুলিপিতে যত নোট দিয়েছি, মূল লক্ষ্যটা হল এই।

থিয়েটার থেকে হেমন্ত সোজা উঁকিঝুঁকি-অফিসে—বিনোদের কাছে।

বিতিকিচ্ছি কাণ্ড বিনু-দা, পাণ্ডুলিপির উপর দাগচোকগুলো দেখ—খানিক-খানিক বুঝবে। 'মানুষের কান্না' হয়ে যাচ্ছে 'উর্বশীর হাসি'। ট্রাজেডি ছিল, আনতে হবে মধুর মিলন। অমুক আর্টিস্টকে মই দিয়ে আকাশে তোলা, তমুককে ল্যাং মেরে পাঁকে ডোবানো—

বিনোদ সহজ ভাবে বলল, কলম নিয়ে বোস। হয়ে যাবে।

হেমন্ত কিছু উত্তেজিত হয়ে বলে, তোমায় দিলে তুমি পারতে বিনু-দা?

কেন পারব না। এই মানুষ আমি শঙ্খধ্বনিতে লিখতাম, এখন আবার উঁকিঝুঁকিতে লিখি। পারছি নে? টাকা আসছে, নাম বেরুচ্ছে—আবার কি!

হাসছিল বিনোদ। হাসি থামিয়ে ভিন্ন এক সুরে বলে, বস্ত্র-হরণের সময় দ্রৌপদী লজ্জাহারী মধুসূদনকে ডেকেছিলেন। তুমিও

মনে মনে লজ্জাহারীকে ডেকে যথা-আজ্ঞা লেগে পড়। জো-সো করে একবার কোটারির মধ্যে ঢুকে যাও, নাট্যকার বলে লোকের মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে যাক—

নাম ছড়াবে না বিনু-দা, বদনাম ছড়াবে। ভিত গড়া হয়েছে ট্রাজেডির, সেই মতো ধাপে ধাপে এগিয়েছি—শেষ মুখে, মাথা নেই মুণ্ড নেই, গায়ের জোরে মিলন ঘটিয়ে দিলেই হয়ে গেল। খুশি হবে না লোকে, নাট্যকারের বাপান্ত করবে।

মাভৈঃ—বলে হাত তুলে থিয়েটারি ভঙ্গিতে বিনোদ অভয় দিল। ন-আটক—কোন-কিছুতে আটক নেই, যা খুশি করা যায় বলেই না নাটক। আমাদের দর্শক-শ্রোতা-পাঠক মশায়দের জানো না, তাই ভয় পাচ্ছ। তাঁরা সর্বংসহা—সামান্যে তুষ্ট, মনের মতো উপসংহারটা পেলেই মজে যান। মাথা-মুণ্ডু নিয়ে বেশি ভাবনা-চিন্তা করতে গেছ কি মরেছ।

লেখার বাবদে বিনোদ সমাদ্দার হেমন্তর গুরু—ওস্তাদ—আচার্য। ওস্তাদ সবুজ আলো দেখিয়েছে, আবার কি! হেমন্ত মরীয়া হয়ে লেগে গেল। দিন চার-পাঁচ আর দেখা নেই, উঁকিঝুঁকিতেও আসে না। কাটছে, ছাঁটছে, পলস্তারা লাগাচ্ছে। কলম যাদু জানে। ছিল 'প্রতারক', একটি খোঁচায় হয়ে গেল 'মানুষের কান্না'। হুকুম পেয়ে পুনশ্চ এক খোঁচা। কান্না হয়ে গেল হাসি, ধুলোমাটির মানুষ ফুসমন্ত্রে উড়ে গিয়ে হলেন সুরলোকের উর্বশী। আসুক না হুকুম—ঐ 'উর্বশীর হাসি'কে লহমায় নাট্যকার 'হনুমানের লম্ফ' করে দেবে।

কাজ সমাধা করে হেমন্ত বিনোদের কাছে এলো। বলে, কর্তাদের শোনাতে যাচ্ছি।

বিনোদ দাঁড়িয়ে পড়ে: চল, আমিও শুনব। 'প্রতারক' নাটকটা সত্যি সত্যি ভাল ছিল হে। নাক-কান কেটে হাত-পা ভেঙে দিয়ে কোন চিজ বানিয়েছ দেখি।

কর্তামশায়ের কামরায় খিল পড়ল, ছিটকিনি পড়ল। দরজায় পরমবিশ্বাসী মথুরানাথ মোতায়েন। পড়া শেষ হতে ঘুণ্টা দুয়েক— তার মধ্যে একবার চা, একবার কফি। মথুরানাথ ঐ দু-বার দরজায় ঘা দেবে, দোর খুলে নিয়ে নেওয়া হবে তখন। এ ছাড়া আর খোলাখুলি নেই—রাজভবন থেকে খুদ লাটসাহেব এসে দাঁড়ালেও না। হেমন্ত পড়ে যাচ্ছে, বিনোদ অমিয় আর কর্তামশায় মনোযোগে শুনছেন।

না, খাসা জমিয়েছে। সমালোচকে হয়তো ভ্রূকুটি করবেন—তাঁরা পয়সা দিয়ে তো টিকিট করেন না, চুলোয় যানগে। এখন যা দাঁড়িয়েছে—প্রেমাঞ্জন ঢুকবে, অ্যাক্টো করবে, বেরুবে—ব্যস, খতম। হাততালি যত কিছু অরুণাভই টানবে—ঠিক যেমন যেমন অমিয়শঙ্কর নোট দিয়েছে। পড়া শেষ হতে হেমন্তর হাত টেনে সে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল: নকুল ভদ্র, জগন্ময় দাস রসাতলে গেল—আগামী দিনের সকলের সেরা নাট্যকার আপনি—দিব্যচক্ষে আমি দেখছি। একটা জিনিসেরই খাঁকতি কেবল হেমন্তবাবু। রিলিফ কই? কিছু রংতামাশা জুড়তে হবে যে ভাই।

হেমন্ত হতভম্ব। ছিল নিদারুণ ট্রাজেডি, সেই নাটক রীতিমত মিষ্টি কমেডিতে দাঁড়িয়েছে। তারও উপরে কী রংতামাশা জুড়বে, সে ভেবে পায় না।

বিনোদ বুঝিয়ে দেয়: রিলিফ অর্থাৎ ভাঁড়ামি—মোটা রসিকতা। ঐ সমস্ত না হলে লোকে নাকি মজা পায় না।

অমিয় জুড়ে দিল: অমন যে শিশির ভাদুড়ী মশায়, তিনিও বাদ দিতে পারেন নি—'সীতা'র মতন নাটকে ভাঁড়-চরিত্র নামিয়ে গলায় মাদুলির বদলে বাবাদুলি ঝুলিয়েছিলেন।

'জয়-পরাজয়' দেখেছ হেমন্ত, তার মধ্যে বুড়ো-বুড়ির কোন্দল মনে পড়ছে?—বলতে বলতে বিনোদ হেসে খুন। বলে, পেয়েছে

তো ছোট্ট আধখানা সিন—তারই মধ্যে কমেডিয়ান সাধন মজুমদার আর বুড়ি শান্তিলতা কী কাণ্ডটা করল। হাসি-হুল্লোড়ে হল ফেটে যাবার গতিক। আমিও বলি হেমন্ত, ঐ দুই আর্টিস্ট যেন বসে না থাকে—নাটকে একটু ঠাঁই দিও।

অমিয় বলে, দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝামাঝি আর তৃতীয়ের শেষ দিকে দুটো জায়গা চিহ্নিত করে দিয়েছি—হেমন্তবাবুর নজর পড়ে নি বোধহয়। ওদের নিয়ে খাটনি নেই। ডায়ালোগ উপস্থিত মতন নিজেরাই বানিয়ে নেয়, বইয়ের ডায়ালোগ সামান্যই বলে। রোখ চেপে গেল তো মরীয়া হয়ে লেগে যায়, থামাথামি নেই, বাড়িয়েই চলেছে। প্রম্পটারকে দিয়ে তখন হুঁশ করিয়ে দিতে হয়: থামো। অফিসে নিয়ে গিয়ে কড়া ধমক দিতে হয়।

মাঝের বড় চেয়ারখানায় সত্যসুন্দর। গোটা পাণ্ডুলিপি পড়া হয়ে গেল, তারপরেও এত সব কথাবার্তা—বোবা তিনি। বিনোদই শুধায়: কিছু বলছ না যে কর্তামশায়?

সত্যসুন্দর বললেন, বলি। ডিরেক্টর নতুনবাবু রাখতে পারে, না-ও পারে। প্রেমাঞ্জনের খেতাব কি জান? নটাধিরাজ। সরকারি খেতাব নয়, লোকে মুখে মুখে দিয়েছে।

সহাস্যে বিনোদ টিপ্পনী কাটল: আজকের গণতন্ত্রের দিনে রাজা-মহারাজাদের তারি দুর্গতি।

কর্তামশায় বললেন, দেখা যাচ্ছে তাই বটে। প্রেমাঞ্জনকে দিয়ে এই রকম মন্দার করানো শালগ্রাম-শিলায় জিরেমরিচ বাটনার মতো।

বিনোদের কথারই প্রতিধ্বনি করে অমিয়শঙ্কর বলে উঠল, শালগ্রাম বলে আলাদা-কিছু থাকছে না আর মামা। সবই নোড়া। মুড়ি আর মিছরি একদরে বিকোবে।

কর্তা বললেন, সে যখন হবে তখন হবে। মন্দার প্রেমাঞ্জন, আর পাশাপাশি অরুণাভ করবে প্রণব দত্ত—কালকের ছেলে, মুখ টিপলে এখনো মায়ের-দুধ বেরোয়। প্রেমাঞ্জন ভাবতে পারে—

পারে কেন, ভাববেই—ইচ্ছে করে তাকে খাটো করা হয়েছে। আর বাণী থিয়েটার তো মুকিয়েই আছে।

অমিয়শঙ্কর একেবারে গঙ্গাজল : কি করব বলে দাও তবে মামা। পাঠ পালটা-পালটি করব ?

সত্যসুন্দর জোরে জোরে ঘাড় নাড়লেন : মানাবে না। প্রেমাঞ্জন গোঁফ কামিয়ে কচি সাজবে—আর প্রণব কাঁচা-পাকা গোঁফ এঁটে মুরুব্বি হয়ে দেখা দেবে—সে বড় বিশ্রী।

আরো ভেবে বললেন, শেষ ক্লাইম্যাক্সটা অন্তত মন্দার, মানে, প্রেমাঞ্জনের উপর রাখো। অরুণাভ পারবে না, আসর জুড়িয়ে ফেলবে, নাটক মার খেয়ে যেতে পারে। গোড়ায় ছিল—মেনকার শবদেহ জড়িয়ে ধরে মন্দারের হা-হুতাশ, তার উপরে ড্রপ। এবারও প্রায় তেমনি—জ্যান্ত মেনকাকে, উঁহু মেনকা তো উর্বশী হয়ে গেছে, জ্যান্ত মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে মন্দারের হাসি-হুল্লোড়, তারই উপর ড্রপ।

অমিয়র কি হয়েছে—মামা যা বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজি। হেমন্তকে বলে, শুনে নিলেন তো ? আগের জিনিস প্রায় রইল—হা-হুতাশের জায়গায় হুল্লোড়।

তখন সত্যসুন্দর আশ্বস্ত হয়ে বলেন, কিছু এলেম তো দেখাতে পারবে—প্রেমাঞ্জন আমায় বড় মান্য করে, এইটুকু দিয়েই ওকে আটকাতে পারব। বুঝে দেখ, রজত দত্ত দেহ রেখেছেন, শঙ্কর ঘোষালকে সরিয়ে দিচ্ছ, তার উপর আবার প্রেমাঞ্জনও যদি না থাকে, তোমার থিয়েটারে লোকে আসবে কিসের টানে ?

আসবে মামা। আমি এক মন্তর জানি—সেই মন্তরে টেনে আনব। লোক ভেঙে এসে পড়বে। প্রেমাঞ্জন যদি না-ও থাকে, তবু আসবে।

হেমন্তর দিকে এক রহস্যময় দৃষ্টি হেনে হাসতে হাসতে অমিয়শঙ্কর সকলের আগে উঠে পড়ল।

॥ দশ ॥

পাণ্ডুলিপি পড়া আজ। নট-নটী একজন কেউ বাদ নেই। অন্য কর্মীরাও উপস্থিত। থিয়েটারের দিন নয়—স্টেজ জুড়ে গালিচার উপর সব বসেছে। পড়ছে হেমন্ত। পড়ার শেষে সঙ্গে সঙ্গে পাঠ বিলি। দুটো দিন বাদ দিয়ে রিহার্সাল আরম্ভ। সিনসিনারি আগে থেকেই বানাতে লেগে গেছে। নতুনবাবুর তড়িঘড়ি কাজ। 'জয়-পরাজয়' টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে। যত দিন যাবে, লোকসানের পরিমাণ বাড়বে ততই। 'উর্বশীর হাসি' তিন হপ্তার মধ্যে মুক্তি পাবে—নতুন পরিচালকের সেই ব্যবস্থা।

এরই মধ্যে হেমন্তকে একটু একান্তে পেয়ে প্রেমাঞ্জন ঝট করে তার পদধূলি নিয়ে নিল: আপনার বাড়ি যেতে পারি নি মাস্টারমশায়। সিনেমা আমায় মেশিন করে তুলেছে। সারাটা দিন এ-স্টুডিও থেকে সে-স্টুডিওয় ছুটোছুটি—কোথায় কোন ভূমিকা, সব সময় খেয়াল রাখতে পারিনে, মেকআপ নেবার সময় জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। তবু যাওয়া উচিত ছিল, বুঝতে পারছি। মন্দার চরিত্রে বিস্তর সম্ভাবনা ছিল, কাছে থাকলে ধরিয়ে দিতে পারতাম। শেষ মারটা যা ই হোক আমার উপরে রেখেছেন—খেল কিছু দেখানো যাবে মনে হচ্ছে।

অমিয়র নজরে পড়েছে। হেমন্তকে শুধায়: কি বলে প্রেমাঞ্জন?

অখুশি নয়। পাঠ মোটামুটি পছন্দ। শেষ ক্লাইম্যাক্সে বাজিমাত করবে—এই সমস্ত বলল।

ঘোড়ার-ডিম করবে।—খিক-খিক করে হেসে অমিয়শঙ্কর বুড়ো-আঙুল নাচায়। বলে, তোমারে মারিবে যে, গোকুলে রয়েছে সে। নেচে-কুঁদে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে নানান কসরতে প্রেমাঞ্জন যেটুকু যা করবে, সেই জন বেরিয়ে পড়ে লহমার মধ্যে ফুৎকারে সব নেভাবে।

লোকের মুখে মুখে তার পরে আর প্রেমাঞ্জন নয়—আমার সেই আর্টিস্ট।

হেমন্ত বলে, কে তিনি ?

সেটি বলব না। তুরুপের তাস, গোপন রেখেছি। সময়ে দেখবেন।—রহস্যময় দৃষ্টি অমিয়র, মুখে মিটিমিটি হাসি।

কোন পাঠ দিয়েছেন তাকে ?

তা-ও গোপন।

হেমন্ত বলে, যত বড় আর্টিস্টই হোন, রিহার্সাল তো চাই।

হচ্ছে বইকি। আমি ঘুমিয়ে নেই। এই থিয়েটারেরই পুরানো কায়দা—মামার কাছে শুনবেন। তারামণির স্বদেশি গানে সেকালে জয়-জয়কার পড়ত—সে গানের রেওয়াজ কিন্তু হত অতি গোপনে বস্তিবাড়িতে—আগে কেউ ঘূণাক্ষরে না টের পায়। আমিও তুরুপের তাস বানিয়ে তুলেছি থিয়েটারের ধারে-কাছেও নয়—গোপন জায়গায়, কাকপক্ষীও খবর জানে না। তুম করে যেদিন সামনে এনে ফেলব, সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে, বাজ পড়বে প্রেমাঞ্জনের মাথায়—

মনের সুখে বেশ একচোট হাসল নতুনবাবু। বলে, জেনে রাখুন হেমন্তবাবু, আপনার ছাত্র গোল্লায় গেল এবারে। দেমাক ধুলোয় লুটোবে। একলা প্রেমাঞ্জন কেন, ছোট-বড় সবাই। সবাই এরা প্রতিমার চালচিত্র হয়ে গেল, এদের দেখতে কেউ আসবে না। দেখবে আমার সেই অজানা আর্টিস্টদের।

হেঁয়ালি-ভরা কথাবার্তা। বোঝাচ্ছে অমিয় কৌতূহলী হেমন্তকে :- ধৈর্য ধরুন। 'উর্বশীর হাসি' মুক্তি পাবে আসছে মাসের পয়লা বিষ্যুৎবার। তার আগের রবিবার অভিনয় বন্ধ—ফুল-রিহার্সাল আমাদের। সেইদিন দেখতে পাবেন। দেখাব আপনাদের সবাইকে, মতামত নেব—

ফুল-রিহার্সালের সেই রবিবার। সন্ধ্যাবেলা সবাই এসেছে—নতুন আর্টিস্ট কই, কোনদিকে তো দেখা যাচ্ছে না। আরম্ভের ঘণ্টা পড়তেই কোন দিক দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক দিতে দিতে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ। ক্যাবারে-গার্ল—মিস রাকা বর্মণ। থিয়েটার-পাড়ায় নতুন—বার-হোটেলের পাড়ায় নাম আছে। বিশেষ এক ধরনের নৃত্যে ঘোরতর পটীয়সী। ক্যাবারে-রানী—অনুরাগীরা নাম দিয়েছে।

তিন অঙ্কে তিনখানা বিশেষ ধরণের নাচ। নাটকের শুরুতেই অজন্তা-নৃত্য—অজন্তা-চিত্রের অনুকরণে। বেশবাস তদনুরূপ। দ্বিতীয় অঙ্কের নাচ হাওয়াইয়ান—হাওয়াই দ্বীপের সমুদ্রে জাহাজ এসে দাঁড়াত, আর দ্বীপবাসিনীরা তটভূমিতে হুড়-মুড় করে এসে এমনি নাচ নাচত যে নাবিকেরা ঝুপঝাপ ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে মেয়েদের কণ্ঠলগ্ন হত। রাকা বর্মণের নাচখানারও মোটামুটি একই উদ্দেশ্য—বেলেঘাটা-বেহালা-বরানগর-বারাসত এবং আরও দূর-দূরান্তরের বাসিন্দারা গাড়িঘোড়া-জনতার ভিড়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে থিয়েটারে এসে পড়বে। শেষ অঙ্কের সর্বশেষে ব্লু-ডান্স, অনুবাদে দাঁড়াবে নীলনৃত্য—মোক্ষম বস্তু। মন্দার রূপী প্রেমাঙ্কুর নিদারুণ কসরতে অডিটোরিয়াম মাতিয়ে ফেলেছে—সবাই ভাবছে, নাটকে ইতি হল এইবার। কিন্তু ইতির পরেও পুনশ্চ—সে এই সাংঘাতিক নৃত্য। নটাধিরাজ প্রেমাঞ্জন একেবারে ঘায়েল। আগেকার অজন্তা ও হাওয়াইয়ান নিতান্তই গঙ্গোদক ও বিল্বপত্র এই নীলনৃত্যের তুলনায়। একগাদা কাপড়-চোপড় পরে এসে দাঁড়াল রাকা বর্মণ—কর্ণার্জুন নাটকের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সিনে কৃষ্ণভামিনী যেমন আসতেন। মৃদু করুণ বাজনা। নাচছে রাকা। আর বাসাংসি জীর্ণানি বিহায়—শ্রীশ্রীগীতায় আছে না, রাকার অঙ্গবাস মোটেই জীর্ণ নয়—প্রচণ্ড রকমের জিল্লাদার। সেইগুলো দু'হাতে খুলে খুলে ঝলমলে আলোয় বিদ্যুৎ খেলিয়ে এদিকে-সেদিকে

ছুঁড়ে দিচ্ছে। নিরাবরণ হচ্ছে ক্রমশ, নাচ জোরালো হচ্ছে, এবং বাজনাও। ব্লাউজ খুলে ছুঁড়ে দিল, তারপর বক্ষোবাসটুকুও। নৃত্য উদ্দাম, বাজনা উদ্দাম। পরনের শাড়িটাও একটানে খুলে দলা পাকিয়ে দু-পায়ে চটকায়। আরে আরে, করে কি হারামজাদা বেহায়া মেয়ে, বিকিনি ধরে টানছে—

রাকা বর্মণ ছাড়াও আছে। নাটকের মাঝামাঝি এসে বেশ একখানি চমক—পাগলিনী বেশে জয়ন্তী মিত্তির। কবে তার অমিয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা, কোন কায়দায় অমিয়কে পটিয়েছে, সাতিশয় গোপন। রিহার্সালও গোপনে হয়েছে—গণ্ডা দেড়েক কথার জন্য রিহার্সালের আদৌ যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রেমাঞ্জন সেজেছে মন্দার—ধুরন্ধর কালো-বাজারি। বিপরীতে আছে অমিতাভ-রূপী প্রণব—বেকার যুবক। অধরের দরদ প্রণবের দিকে, যে না সে-ই বলবে। তবু কিন্তু প্রেমাঞ্জন তুলো-ধোনা করল ছেলেমানুষ প্রণবকে। দম্ভ করে বলে, উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা—ধরে নেবার অপেক্ষা। আমি পারি তো তুমি পারবে না কেন? অক্ষম অপদার্থের দল 'আমি গরিব' 'আমি গরিব' বলে নাকি-কান্না কেঁদে বেড়ায়—

বিস্তর ভেবেচিন্তে কায়দা-কসরৎ করে এবং ঈশ্বর-দত্ত অপরূপ বাচন-ভঙ্গিমার গুণে এই জিনিসের উপরেই প্রেমাঞ্জন আপন স্বপক্ষে একখানি ক্লাইম্যাক্স জমিয়ে তুলেছে। অডিটোরিয়াম মুগ্ধ হয়ে শুনছে, কল্পনায় ভেবে নেওয়া যায়। এবং সম্বিৎ পেয়ে পরক্ষণে তুমুল হাততালির উদ্যোগে দু'হাত দু'দিকে তুলেছে, অকস্মাৎ—

উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা—কই! কোথা? বলতে বলতে মাথা-পাগলা উদ্বাস্তু ভিখারিণী মেয়ের প্রবেশ। এক চিলতে ছেঁড়া-কাপড় পরণে। মূল নাটকে নেই—জয়ন্তী মিত্তিরকে নামাবে (এবং প্রেমাঞ্জনের দফারফা করবে!) বলেই ডিরেক্টর অমিয় অ্যাকসনটুকু জুড়ে দিয়েছে। এখন এই—হাউস-ফুল স্টেজের উপর রূপসী যুবতী

ভিখারিণীর মেক-আপে জয়ন্তী মিত্তির আরও বেশি ঝকমক করবে।

উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা—কই গো, কোথায়? বলে গৌরবরণ নিটোল হাত ছ'খানা উপর মুখো তুলে পাগলিনী কী যেন মুঠো করে করে ধরে। ধরে, আবার মুঠো খুলে উপুড় করে দেয়: নাঃ, কিচ্ছু না—। হাউ-হাউ করে সে কেঁদে পড়ল। এবং কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান। সাকুল্যে এই মাত্র। বিদ্যুতের চমক দিয়ে অদৃশ্য হল—প্রেমাঞ্জনের মাথায় বাজ হেনে গেল যেন। থ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের ঐ জনহীন প্রেক্ষাগৃহ হাততালিতে ফেটে পড়ছে, কানে যেন শুনতে পায়। এ হাততালি আসলে ছিল প্রেমাঞ্জনের উপরে—তারই কষ্টের উপার্জন লহমায় ছিনিয়ে নিয়ে ছিন্নবাস পাগলিনী ছুটে বেরুল।

বেরিয়ে কারো পানে জয়ন্তী তাকায় না। মুহূর্তমাত্র দেরি নয়—আচ্ছন্নের মতো সোজা চলে গেল প্রেমাঞ্জনের ঘরে। প্রেমাঞ্জন তখনো স্টেজে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সোফায় গড়িয়ে পড়ল। অঙ্ক শেষে প্রেমাঞ্জন আসতেই মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে পড়ল বিজয়িনীর ভঙ্গিতে: মুখের একটা কথা বলে দিতেও আপনি নারাজ। তার জন্যে কিন্তু আটকে থাকল না প্রেমাঞ্জনবাবু।

প্রেমাঞ্জন বলে, দেখছি তো তাই।

জয়ন্তী উচ্ছ্বাস ভরে বলে, ডিরেক্টর নতুন হলে কি হবে—ক্ষমতা ধরেন, গুণের কদর বোঝেন।

প্রেমাঞ্জনের সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী: গুণের নয়, রূপের—

জয়ন্তী ক্ষেপে যায়: ঈর্ষ্যা আপনার। আমার অভিনয়ের সময় আপনি চোখ বুঁজে থাকবেন জানি। কিন্তু অডিটোরিয়াম তা করবে না, চ্যালেঞ্জ করছি।

না, করবে না—। প্রেমাঞ্জনও ঘাড় নেড়ে সজোরে সায় দিল: দু-চোখ দিয়ে তারা গিলতে চাইবে বেআবরু ভিখারিণীকে। সিটি মারবে।

আবার বলে, ক্ষমতা আছে ডিরেক্টরের—তা-ও মানি। নাটকে সিনটা বানিয়েছিল করুণরস-প্রধান, ক্লাইম্যাক্স ছিল অমিতাভর উপর। সেই ক্লাইম্যাক্স কায়দা করে আমি কেড়ে নিচ্ছিলাম। অমিয়শঙ্করের পছন্দ নয়—তোমাকে এনে ঠেকনো দিল, কাপড়-চোপড়ে কৃপণতা করে উল্টেপাল্টে তোমাকে দেখাল। জমিয়ে দিল শৃঙ্গাররস অন্য সমস্ত রস মুছে দিয়ে।

পরের অঙ্কে এক্ষুনি আবার নামতে হবে। মুখের উপর তাড়াতাড়ি কয়েকবার পাফ বুলিয়ে প্রেমাঞ্জন আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

ড্রেস-রিহার্সালের শেষ। শেষের পরেও পুনশ্চ আছে, নতুন ডিরেক্টর অমিয় দর্শকদের নিরামিষ মুখে ফিরতে দেবে না। রাকা বর্মণের সব চেয়ে সরেস নৃত্যখানা—নীলনৃত্য এইবার। দুঃসাহসী বেহায়া মেয়েটা খুলতে খুলতে শেষমেশ বিকিনিটুকু ধরে টানছে—একেবারে দিগ্বসনা হয়ে নাচবে আমাদের এত দিনের এই মণিমঞ্চের উপরেই? হলের পিছন দিকটায় অন্ধকারের মধ্যে সত্যসুন্দর। ভাগনে ডিরেক্টর হয়ে প্রথম নাটক নামাচ্ছে—নতুন প্রজন্ম নাকি কথা বলে উঠবে নাটকের ভিতরে, লোভে লোভে তিনি দেখতে এসেছেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে বুড়োমানুষ ফুড়ুত করে পালিয়ে যান। একটি কথা নয় কারো সঙ্গে, মুখও দেখাবেন না কাউকে বুঝি—

অমিয়শঙ্করের দারুন স্ফূর্তি—রণবিজয়ের মনোভাব। বিনোদকে বলে, নাটক লাগবেই—কি বলেন বিনু-দা? হেমন্তর হাত টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল: নাট্যকার নতুন হলে কি হবে, কলমে ধার খুব। প্রথম নাটকেই জয়-জয়কার পড়বে, দিব্যচক্ষে দেখছি। একটু চা-টা খাওয়া যাক, আমার ঘরে চলুন।

যাচ্ছে তিনজনে। সিঁড়ির ধারে প্রেমাঞ্জন। বলল, একটু কথা আছে অমিয়বাবু।

গলা রীতিমত গম্ভীর। স্টার-আর্টিস্টের উষ্মায়, কর্তামশায় হলে, গলা শুকিয়ে জলতেষ্টা পেয়ে যেত। অমিয়শঙ্কর মনে মনে মজা পায়। বলুন না—বলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিনোদকে বলে, যেতে লাগুন আপনারা। হাবুল চা নিয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনে আসি।

প্রেমাঞ্জন বলল, নাটক নিয়ে কিছু বিবেচনার আছে—

অমিয় অবাক হয়ে বলে, ফুল-রিহার্সাল হয়ে গেল, রিলিজের পোস্টার পড়ে গেছে—বিবেচনা এখনও? পাঁচ-দশ নাইট হয়ে যাক, জরুরি যদি কিছু বেরোয় তখন দেখা যাবে।

অমিয় উড়িয়ে দিল, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর ছাড়ে না। বলল, দ্বিতীয় অঙ্কের ঐখানটা পাগলী ভিখারিণী এসে রসভঙ্গ ঘটিয়েছে। জিনিসটা অবান্তরও বটে।

অমিয় কিছু উষ্ণ হয়ে বলে, আমি তা মনে করি না। লোকের হেনো-কষ্ট তেনো-কষ্ট, মুখের কথাতেই কেবল শুনছিলাম—আমি একটা চাক্ষুষ নমুনা দেখালাম, দর্শক-মনের পরতে-পরতে যাতে ছাপ পড়ে যায়।

সেই পাঠটুকুর জন্য জয়ন্তী মিত্তিরের মতন মেয়ে?

অমিয় বলে, ভেবেচিন্তেই দিয়েছি। আনকোরা নতুন মেয়ের প্রথম এই স্টেজে ওঠা—বড় পাঠ হলে গুলিয়ে ফেলতেন। একটা-দুটো কথা বলেই দিব্যি চালিয়ে গেলেন।

হাসল সে। বলে, আপনার নিজের গোড়াটাও ভাবুন প্রেমাঞ্জনবাবু। মামার কাছে শুনেছি। প্রথম তো দু-কথার পাঠ নিয়ে নামেন। এলেম দেখিয়ে তারপরে এত বড় হয়েছেন।

প্রেমাঞ্জন বলে, কিন্তু জয়ন্তী হবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। মিড়মিড়ে গলা, এক্সপ্রেশন বলতে নেই। ওদের ক্লাবের থিয়েটারে ভাল পাঠ দিয়ে প্রাণপাত করে শেখালাম, ভস্মে ঘি-ঢালা হয়েছিল। মগজে কিছু নেই, দেহে রূপযৌবন অফুরন্ত। রাজকন্যা সাজলে

চেহারায় অন্তত মানাত, পাগলা ভিখারিণী কি ভেবে সাজালেন আপনিই জানেন।

অমিয় বলে, হ্যাঁ, ভিখারিণী কুরূপ-কুৎসিত হলেও চলত। তা বলে রূপসী ভিখারিণীকেও অডিটেরিয়াম খ্যাক-থু করবে না—উপরি-পাওনা হিসাবে লুফে নেবে, দেখবেন।

প্রেমাঞ্জনও জোর দিয়ে বলে, নেবে তো বটেই। একফালি ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়ে রূপযৌবন উল্টেপাল্টে দেখালেন—তারপরেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে ?

তিক্ত কণ্ঠে অমিয় বলে, ছেঁড়া ন্যাকড়া না পরে কি করবে—এই তো স্বাভাবিক। ভিখারিণীকে বেনারসিতে কে মুড়ে দিতে যাবে বলুন।

নিজের ঘরে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। রাগে তখনও গরগর করছে। বিনোদ শুধায় : কি বলে প্রেমাঞ্জন ?

অমিয়শঙ্কর বলে, নটাধিরাজের সিংহাসন টলোমলো। ক্ষেপে গিয়ে অযাচিত টিপ্পনী ছাড়লেন কতকগুলো। হয়েছে কি এখনো—সবে তো সন্ধ্যেবেলা!

কলির-সন্ধ্যে বলো। বেশি স্পষ্ট হবে।

অমিয় বলছে, গণতন্ত্রের যুগ। মুখের উপর কেউ একজন যে ছড়ি ঘোরাবেন, যে দিনকাল চলে যাচ্ছে। এর পরে এমনি করে তুলব, প্রেমাঞ্জন চেয়ারে বসে মন্দারের পাঠ করল, সূর্যমণি টুলে-বসা তার খানসামা—পরের অভিনয়ে বদলা-বদলি, সূর্যমণি চেয়ারে বসেছে, প্রেমাঞ্জন টুলের উপর। না পোষায় তো পথ দেখ। সবাই এক-সমান। পোস্টারে বিজ্ঞাপনে কোন আর্টিস্টের নাম থাকবে না—

থাকবে কেবল নীলনৃত্যের রাকা বর্মণ, বস্ত্রহীন ভিখারিণী জয়ন্তী মিত্তির—। অমিয়র সঙ্গে এক সুরে বিনোদ জুড়ে যাচ্ছে : আর থাকবে আলোর খেলোয়াড় চন্দ্রমোহন, ম্যাজিক-মাস্টার ভানু সরকার—

হাবুল চা এনে ফেলল। সঙ্গে রেস্তোরাঁর ছোঁড়া, একটা নয়—একজনে পেরে ওঠেনি, দু-জন। ক্ষিধে পেয়ে গেছে সত্যি। খেতে খেতে অমিয় সগর্বে শুধায়: চলবে না—বিনু-দা, কি বলো?

বিনোদ বলে, চলবে না কি গো—ছুটে চলবে। রাজধানী-এক্সপ্রেসকে হার মানাবে। কায়দাটা সকলের আগে তোমারই মাথায় এলো। পাইওনিয়র তুমি—মঞ্চের উপর এ জিনিসের প্রথম আমদানি তোমার। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তোমার নাম কেউ বাদ দিতে পারবেন না। শহরে মফঃস্বলে যত থিয়েটার আছে, তোমার দেখাদেখি হুড়মুড় করে সকলে এই সহজ পথে এসে পড়বে, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যাত্রাপার্টিরাও বাদ থাকবেন না।

পুলকে গদগদ হয়ে অমিয় বলে, আপনি এই কথা বলছেন বিনু-দা—এই লাইনের বিশেষজ্ঞ আপনি একজন।

বিনোদ বলে যাচ্ছে, বিস্তর বাগানবাড়ি ছিল কলকাতার আশেপাশে—শনি-রবিতে সেখানে স্ফূর্তির বান ডাকত। এখন লোপাট, উদ্বাস্তুরা দখল করে বাগানবাড়িতে কলোনি বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মানুষ তো সে-ই আছে—ক্ষিধেও আছে ঠিক। তোমার থিয়েটার বাগানবাড়ির অভাব ঘোচাল। সেই হররা—শহরের একেবারে মাঝখানে বসেই। এ জিনিস পড়তে পারে না। আরো এক ব্যবস্থা করো দিকি এইসঙ্গে।

কি? কি? আগ্রহে অমিয় তাকিয়ে পড়ল।

বার খুলে দাও বুকিং-অফিসের পাশটিতে। দুর্দান্ত চলবে।

অমিয় উড়িয়ে দেয়: হ্যাঃ, লাইসেন্স যত্রতত্র দিল আর কি!

বিনোদ নিরীহ কণ্ঠে বলে, আরে ভায়া, যে অষুধের যে রকম অনুপান। এটার দিচ্ছে তো ওটারই বা কেন দেবে না? কত লাভ সেটাও তো ভেবে দেখবে কর্তারা! পেটের ক্ষিধে চেপে প্রজাবর্গ এইসবে মসগুল হয়ে থাকবে, 'মিছিল-নগরী' একেবারে মৃতবৎ শীতল—রূপকথার সেই রাক্ষসে-খাওয়া পুরীর মতন।

বুঝেছে অমিয় বিনোদের রঙ্গরসিকতা—উঁকিঝুঁকিতে যে ধারায় সে লিখে থাকে। বলল, এ ছাড়া উপায় ছিল না বিনু-দা। আমাদের খবর আপনি না জানেন কোনটা। দেনা বাড়তে বাড়তে বাড়তে দেড় লক্ষ টাকার মতো—সবটা আমি ঘাড় পেতে নিলাম। তার পরেই মামা আমার উপর সমস্ত ভার দিলেন। দিয়েছেন বলেই মণিমঞ্চ বাঁচল।

বিনোদ ঘাড় নাড়ে: উঁহু, মঞ্চ মরল। তোমরা বাঁচলে। দোষ কি, চাচা আপনা বাঁচা—এ-যুগের এই নিয়ম। টাকা কিসে ঘরে আসে, তারই ভাবনা। তোমার দাদামশায় কি মামার মতন আজেবাজে দশরকম ভাবতে গেলে ব্যবসা হয় না।

অমিয় বলল, নিজের হাতে হ্যাণ্ডবিল একটা ছকে ফেলেছি বিনু-দা। আপনি আছেন, হেমন্তবাবু আছেন—আপনারা একবার করে চোখ বুলিয়ে দিন:

বড় বড় অক্ষরে লেখা কাগজখানা টেবিলে এদের সামনে রাখল:

॥ নবীন নাট্যকার হেমন্ত করের যুগান্তকারী নাট্য-নিবেদন ॥

উর্বশীর হাসি

(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

পরম উপভোগ্য বিস্ময়কর প্রমোদনাট্য। হাসির হুল্লোড়। জীবনের সর্বসমস্যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পুরো তিনটি ঘণ্টা প্রমোদ-তরঙ্গে ভাসুন। ক্যাবারে-রানী মিস রাকা বর্মণের লাস্যনৃত্য। স্টেজের উপরেই বন্যাস্রোতে রেললাইন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হুড়মুড় করে পুল ভেঙে পড়ছে···

হাবুলও ঘাড় লম্বা করে উঁকি দিচ্ছে। বলল, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য—ওটা আবার কেন নতুনবাবু? ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাও বিস্তর আসে থিয়েটার দেখতে।

বিনোদ বলে, সেইজন্যেই আরো বেশি দরকার হাবুল। হ্যাণ্ডবিল দেখে এরপর নার্সারীর বেবিগুলো পর্যন্ত টিকিট কিনতে লাইন দেবে। বয়স পরীক্ষার জন্য লাঠিসোঁটা নিয়ে কেউ তো গেটে থাকে না। তবে একটা লাইন জুড়ে দিতে পারো নতুনবাবু। চুম্বকে সব বলা হয়ে যাবে—

সাগ্রহে অমিয় বলে, বলুন—বলুন—

একই মঞ্চে একসঙ্গে থিয়েটার ম্যাজিক অ্যাক্রোবেটিকস—

হেমন্ত জুড়ে দেয়: এবং উদ্যান-বাটিকা। আসলটাই বাদ দিও না বিনু-দা।

বলে কলমটা নিয়ে হ্যাণ্ডবিল থেকে নিজের নাম কেটে অমিয়শঙ্কর বসিয়ে দিল: নবীন নাট্যকার অমিয়শঙ্করের যুগান্তকারী নাট্যনিবেদন উর্বশীর হাসি—

অমিয় সবিস্ময়ে বলে, এটা কি করলেন?

হেমন্ত বলে, কীর্তি তো আপনারই, আপনার প্রাপ্য যশ আমি কেন নেবো?

পরিচালক আছেই, তার উপর নাট্যকার হতে যাচ্ছে—অমিয়শঙ্কর মনে মনে নিশ্চয় খুশি। তবু বলতে হয় তাই বলল, মূল-নাটক তো আপনারই। দরকারে কিছু জোড়াতালি পড়েছে।

হেমন্ত হেসে বলল, তালি পড়তে পড়তে তালিয়ানাই হয়ে গেছে। মূল-সামিয়ানার ইঞ্চিখানেকও আর বজায় নেই। এ জিনিস আপনার।

কী মানুষ আপনি। নাম বাদ পড়লে কষ্ট হবে না?

থাকলেই বরঞ্চ খচ-খচ করে কাঁটার মতো বিঁধবে।—হঠাৎ হেমন্ত জোড়হাত করে সকাতরে বলল, আমায় অব্যাহতি দিন নতুনবাবু।

অমিয় বলল, বেশ, নামে যখন এত আপত্তি—বিশেষ ইস্কুলের শিক্ষক আপনি—আপনার ক্ষতির কারণ হতে চাইনে। নাট্যকার

আমিই হলাম, তবে প্রতিটি অভিনয়ের রয়্যালটি পঁচিশ টাকা হিসাবে বরাবর আপনিই নিয়ে যাবেন।

রাত অনেক। উঠতে যাচ্ছে। কিন্তু চরম হতে বাকি ছিল একটু।

সহসা সত্যসুন্দরের আবির্ভাব : ভেবে দেখলাম অমিয়, মণিমঞ্চ নামটা তুমি যদি বাদ দিয়ে দাও।

কেন মামা, থিয়েটারের নাম বদলানোর কি হল ?

সত্যসুন্দর বলেন, বাবার নাম জড়িয়ে মণিমঞ্চ হয়েছে। মঞ্চ নিয়ে তিনি জীবনপাত করে গেছেন, মঞ্চকে তিনি মন্দির ভাবতেন। ঐ নাম রয়ে গেলে স্বর্গ থেকে বাবা অভিশাপ দেবেন।

কাঁপছেন তিনি, কণ্ঠস্বরে যেন কান্না। বললেন, বাড়ি যাচ্ছি। থিয়েটারে আর আসব না। এই কিন্তু আমার শেষ কথা। আদেশই বলতে পার।

বলে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

স্তম্ভিত এরা, চার জনেই। সামলে নিয়ে ক্ষণপরে অমিয় বলে, একালের মানুষ টিকিট কেটে মন্দিরে ঢুকতে আসে না। ওঁরা এখনো সেকালের মধ্যে ঘুরছেন। মন্দির করে করেই তো এমন চালু ব্যবসা ডকে ওঠার গতিক। এতখানি এগিয়ে এত খরচখরচার পর এখন আর পেছনো সম্ভব নয়। যা বলে গেলেন, হোক তবে তাই। থিয়েটারের নাম-বদল—কি নাম দেওয়া যায়, বলুন তো একটা বিনু-দা।

বিনোদের হাজির-জবাব : বিবসনা—

তাই হয় বুঝি—ধুস !—হাসে অমিয়শঙ্কর।

ও, শক্ত কথা হয়ে গেল—সকলে বুঝবে না। তবে উলঙ্গিনী করো—উলঙ্গিনী থিয়েটার।

ঠাট্টা নয় বিনু-দা। বলুন—

বিনোদ বলে, যেটা তোমার আসল পুঁজি, যা ভাঙিয়ে রোজগার, সরাসরি বলে দেওয়াই তো ভাল। খদ্দেরে বেশি ঝুঁকবে।

অমিয়শঙ্কর বলে, রাকা কিন্তু একেবারে বিবসনা হয় না—আপনাদের দৃষ্টিভ্রম। ডবল বিকিনি পরে আসে। উপরের মোটা বুননের বিকিনি খুলে দেয়, তলায় অতি-মিহি আর একটা, হুবহু দেহচর্মের রং, সেইটে থেকে যায়। একেবারে সেঁটে থাকে, আপনারা ধরতে পারেন না। বেয়াড়া আইন—আব্রু একটুকু চাই-ই। থিয়েটারের নামের বেলাও তাই—আব্রু রাখতে হবে। আচ্ছা, 'অপ্সরা' হলে কেমন হয়? হরে-দরে একই হল। অপ্সরাদেরও কোমরে শাড়ি থাকে না বলে জানি। নামের মধ্যে থলথলে কবিত্ব, শুনতেও খাসা। রসিক সুজন ভিতরের বক্তব্য বুঝে নেবে। লাগসই নাম—তাই না? মণিমঞ্চের চেয়ে ঢের ঢের ভাল—থিয়েটার অপ্সরা।

শেষ